আনন্দ-প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ। সেটাতে যদিও শিক্ষার সহায়তা করে না কিন্তু জীবনকে সার্থক করে। আমাদের ছেলেরা বৃষ্টিতে ছুটে বেড়ায়, জ্যোৎস্নারাত্রিতে আনন্দ ভোগ করে, তারা রৌদ্রকে ডরায় না, তারা গাছে চড়ে বসে পড়া করে, এগুলোকে আমি সামান্য জিনিষ মনে করি নে। চারি দিকের সঙ্গে জীবনের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া, আনন্দের ছোট বড় নানা [illegible]তের পথ খুলে দেওয়া যে কত বড় লাভ তা বলে শেষ করা যায় না। এ যেন জগৎকে দান করা। আমরা হতভাগারা বিদ্যাসাধ্য খ্যাতিমান টাকাকড়ি যত সহজে পাই জগৎকে তত সহজে পাই নে—আমরা যার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে রয়েছি তাকেই হারিয়ে বসেছি—ঈশ্বর যা আমাদের দিয়ে রেখেছেন তা আমাদের তুলে নেবার শক্তি নেই—এই [illegible]শোধ না[illegible]র খোলস ভেঙে ফেলে ছেলেদের মন [illegible] সমস্ত জগতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এখানকার মাটিতে জলেতে আলোতে অবাধে সঞ্চরণ করবার অধিকার লাভ ক'রে এইটে আমি একান্ত মনে কামনা করি। বোলপুরের মাঠে আমাদের ছেলেরা এই জিনিষটা পাচ্ছিল—তারা নিজের ছোট ছোট মুঠো তুলে ভগবানের এই দক্ষিণ হস্তের দান গ্রহণ করছিল। তোমরা দেখো আমাদের বিদ্যালয়ে এই জিনিষটার যেন ব্যাঘাত না হয়। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এবং শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের হৃদয়ের প্রত্যহ অব্যবহিত যোগই আমাদের বিদ্যালয়ের সকলের চেয়ে বড় বিশেষত্ব। এইটেকে কোনোমতে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করতে দেওয়া চলবে না। আমি চলে আসার পর তোমাদের বিদ্যালয় থেকে অনেক পুরাতন অধ্যাপক একসঙ্গে চলে এসেছেন—তেজেশ, হীরালাল, কালীমোহন, বঙ্কিম এঁরা সবাই পলাতক—ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে এঁদের জীবনের যোগসূত্র বেঁধে গিয়েছিল—হঠাৎ এঁদের জায়গায় অনেকগুলি নূতন শিক্ষক এসেছেন—এঁরা ছেলেদের সঙ্গে আপনার জীবনকে তেমন ক'রে জড়িত করতে পারবেন কিনা কিছুই জানি নে। এই যোগ কর্ত্তব্য-জ্ঞানের দ্বারা হ'তে পারে না—এর মূলে একটা উদার প্রেম থাকা চাই—সেই প্রেমের উৎস যেন কিছুমাত্র শুকিয়ে না যায়, এই কথাই আমি বার-বার ভাবি। বাধা হ'লেই দেখতে পাবে যা সবুজ ছিল তা ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে হলদে হয়ে যাবে—যা প্রাণের জিনিষ ছিল, তা কলের জিনিষ হয়ে উঠবে। মুক্ত-নির্ঝরিণী যদি না [illegible] তাহ'লে আমাদের শুষ্কতাকে কেউ দূর করতে পারবে না। আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃতির পার্থক্য, শিক্ষার প্রভেদ, বাধাব্যবধান এমন কি, [illegible] কিছু-না-কিছু ছিলই এবং থাকবেই—কিন্তু তৎসত্ত্বেও [illegible] সেই জিনিষটাই একান্ত হয়ে ওঠে নি—বেসুরের উপরেও সুর বেজেছে; গ্রন্থি যতই কঠিন হোক তা ক্রমশই শিথিল হবার দিকে গিয়েছে। এখনও সেই অমৃতের ধারাটিকে তোমরা রক্ষা ক'রে চ'লো—ছেলেদের হৃদয় প্রত্যহ পূর্ণ হোক্, তারা প্রত্যহ আনন্দিত হোক্। তারা প্রত্যহই বড়র দিকে তাকাতে শিখুক্। তাদের চিত্তের বোধশক্তি বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হ'তে থাক্—তাদের হাসি উজ্জ্বল হোক্, তাদের আনন্দ গানের সুরে মুখরিত হয়ে উঠুক্। সেই প্রান্তরের মধ্যে ছেলেদের আনন্দ-সম্মিলনের কলধ্বনি সমুদ্র পার হয়ে আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করছে—আনন্দের নির্ম্মল আলোকে তাদের হৃদয়কুসুম পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠুক্ এই আমি তাদের আশীর্ব্বাদ করছি।

১০ই আশ্বিন, ১৩১

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লণ্ডন

কল্যাণীয়েষু—

অজিত, এখানে শীত কাটানোটা আমার একেবারেই ইচ্ছা নয়। কিন্তু মোটের উপর শরৎকালটা ভদ্রব্যবহার করছে—মনে হচ্ছে গ্রীষ্মকাল-ভোর এখানকার আকাশ যে রকম মাৎলামি করছিল এখন তার জন্যে অনুতাপ প্রকাশ করতে আরম্ভ করছে—সেপ্টেম্বরের শেষ দুই সপ্তাহ দিব্য সূর্য্যালোক ভোগ করা গেছে। গত দুই দিন আবার বাদলা এসে ভয় লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ সকালে রৌদ্রে আকাশ ঝলমল করছে। আমাদের দেশে সূর্য্যালোকের তো কৃপণতা নেই কিন্তু তবু আজ পর্য্যন্ত আমার সূর্য্যালোকের তৃষ্ণা মিটল না। যেদিন এখানে সূর্য্য দেখা দেয় সেইদিনই তার আহ্বানে আমার মন উতলা হয়ে ওঠে। ইচ্ছা করে কোনো দূর সমুদ্রপারে

আলোর দেশে গিয়ে ঘর বাঁধি—পিছনে আমার তমাল-তালীবনে ঘনীভূত সমুদ্রবেলা, সামনে নিস্তব্ধ শুভ্র বালুতটের পাশে নীল জলরাশির সফেন চাঞ্চল্য, পশ্চিম তীরে পৃথিবীর আকাশমুখী দুরাশার মত পাহাড় উঠেছে এবং ঝাউবনের ভিতর দিয়ে নদীটি বয়ে এসে সমুদ্রে পড়েছে; আকাশে "সিন্ধুশকুন" উড়ে চলেছে, নীলজলের উপর জেলেদের নৌকো সাদা পাল মেলে দিয়েছে—এবং এই সমস্ত দৃশ্যটির উপর অবাধপ্রসারিত আলো, আমার কল্পচিত্রখচিত অবকাশের গভীর পাত্রটি সোনার আলোয় উপচে পড়েছে—এবং গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া বাজছে আমার মনোবীণা আকাশের আলোর সমান সুরে সমান তালে—সময় নদীর জলের মত মৃদুমন্দ কলস্বরে কালসমুদ্রে মিলিয়ে যাচ্ছে, কেউ তার কোনো হিসাব দাবি করে না। মানুষকে বিধাতা মন্থরগামী করে সৃষ্টি করেছেন—সে ঘোড়ার মত দৌড়তে পারে না, পাখীর মত উড়তে পারে না—তার পালাবার পথে অনেক বাধা—সেই জন্যেই সাহস ক'রে তার মনের মধ্যে এত গতিসঞ্চার ক'রে দিয়েছেন। নইলে আজ এমন সকালে কে আমাকে ধরে রাখতে পারত? ইতি

১৫ আশ্বিন
১৩১৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেনা-পাওনা

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

চারিত্র-নীতির ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন যে মানুষের ভাল-মন্দের ধারণা চিরকাল এক রকম থাকে না। ইতিহাসে এরূপ ধারণার অনেক অদল-বদল ঘটিয়াছে। কোনও এক দেশে কিংবা এক সময়ে যাহা ভাল, অন্য দেশে কিংবা অন্য সময়ে তাহাকেই আবার লোকে মন্দ মনে করে,—এরূপ দৃষ্টান্তের সংখ্যা বহু। এ-সম্পর্কে একটা অতি পুরাতন, জীর্ণ দৃষ্টান্ত এই যে, স্পার্টাতে ধরা না পড়িয়া চুরি করাটাকে এক সময় শৌর্য্যগুণের অন্তঃপাতী মনে করা হইত; কিন্তু এখন বোধ হয় এমন লোক খুব বেশী নাই, যারা চুরি-বিদ্যাকে সত্য সত্যই বড় বিদ্যা মনে করে। এই ধরণের পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত আরও যথেষ্ট দেখা যায়।

অতীতকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানে উপস্থিত হওয়াটাই উন্নতি কি-না বলা কঠিন; কিন্তু অনেকেই মনে করেন, চারিত্রনীতির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মানুষের ক্রমিক উন্নতিই হইতেছে। যে-সব ধারণা আমরা ত্যাগ করিয়াছি, বর্ত্তমানের তুলনায় সেগুলি অনুন্নত ছিল; আর বর্ত্তমানে আমরা যে-সব আদর্শ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা অতীতের চেয়ে উচ্চতর। শুধু তাই নয়, এই বর্ত্তমানও এক দিন অতীত হইবে; অনাগত যে ভবিষ্যৎ তাহা আবার এই বর্ত্তমানের চেয়েও উচ্চ। তার মানে এই যে, মানুষের ইতিহাস মোটের উপর উন্নতির ইতিহাস, অবনতির নহে। অনেক প্রাচীনপন্থী মনে করেন, সত্য যুগ অতীত হইয়াছে; কিন্তু অন্য অনেকের আবার ধারণা এই যে, উহা এখনও আসে নাই,—তবে আসিবে।

মানুষের ইতিহাস সত্য সত্যই অনবচ্ছিন্ন উন্নতির ইতিহাস কি-না, সে-বিচারে এখানে প্রয়োজন নাই। তা ছাড়া কোনটা উন্নতি, কোনটা উন্নতি নয়, সে-বিষয়ে সকলের ঐকমত্য আছে কি-না সন্দেহ। তবে এ-কথা নিশ্চিত যে, আমাদের ভাল-মন্দের ধারণা সনাতন নহে—উহা পরিবর্ত্তন-সহ। বর্ত্তমানে জগতের চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারা যাঁরা ভাল করিয়া অনুধাবন করিয়া থাকেন, তাঁরাই লক্ষ্য করিবেন যে, আমাদের অনেক ধারণা এখনও চোখের সামনে দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে।

একটা সময় ছিল যখন মানুষ দেনা-পাওনা সম্বন্ধে

বড় সাবধান ছিল, এবং সে-সময়ে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কথারও একটা বড় দাম ছিল। যাহা ঋণ বলিয়া মানিয়াছি, তাহা শোধ দিতেই হইবে—আর যেখানে যে-কথা দিয়াছি, সেখানে সে-কথা রক্ষা করিতেই হইবে—এইটি ছিল প্রাচীন কালের নৈতিক আদর্শ। ইহাতে ফলাফলের বিবেচনার কোন স্থান ছিল না। প্রাচীন চিন্তাপদ্ধতি অনুসারে ঋণ না-দেওয়া পাপ। ঋণী সাধারণতঃ নিজেই ঋণ করে; যেখানে ঋণ নিজকৃত সেখানে ঋণের সঙ্গে সত্য জড়িত থাকে। আমি স্বীকার করিয়াই লই, একটা সময়ে এক জনকে একটা কিছু দিব; এখানে যাহা দিব বলিয়াছি তাহা ঋণ; আর, দিব যে বলিয়াছি, উহা অঙ্গীকার। ঋণ না-দিলে পাপ, সুতরাং যাহা দিতে চাহিয়াছি তাহা দেওয়া উচিত। আর, যাহা করিব বলিয়াছি তাহা না-করিলে সত্যধর্ম্মের অপলাপ হয়। সুতরাং স্ব-কৃত দেনা পরিশোধ না করা দ্বিগুণ পাপ।

অনেক সময় আবার ঋণ নিজকৃত নহে, ঘটনাচক্রে সঞ্জাত হয়। সেখানেও অঋণী হওয়া মানুষের কর্ত্তব্য, ইহাই প্রাচীন ধারণা। যেমন, পিতার ঋণ পরিশোধ করা পুত্রের কর্ত্তব্য। এ-সম্বন্ধে আইনের ব্যবস্থা সর্ব্বত্র এক ছিল না হয়ত; কিন্তু সাধারণ বিশ্বাস এই ছিল যে, পিতার নিকট হইতে বিত্তলাভ না করিলেও পিতৃঋণ শোধ করা পুত্রের ধর্ম্মতঃ উচিত। "জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণ স্ত্রিভি র্ঋণৈ র্ঋণবান্ ভবতি"—জন্মমাত্রেই ব্রাহ্মণ তিন প্রকার ঋণে ঋণী হইয়া পড়েন;—ইহা প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ। এই তিন প্রকার ঋণ—দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ। যজ্ঞ, স্বাধ্যায় ও পুত্রোৎপাদন—এই তিন উপায়ে এই সব শোধ করিবার উপদেশ আছে। নিজের কথাদ্বারা বাধ্য হইয়া ঋণ না করিলেও যে ঋণ শোধ করিতে হয়, এ-সম্বন্ধে প্রাচীনদের মনে আর কোন সন্দেহ ছিল না।

ঋণ যেখানে স্ব-কৃত সেখানে উহার দায়িত্ব আরও বেশী। সোক্রেটিসের মৃত্যুর প্রাক্‌কালে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তাঁর কোন শেষ ইচ্ছা জানাবার আছে কি না, তাহাও জানিতে চাহিয়াছিলেন। সোক্রেটিসের অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছে, শরীর আড়ষ্ট, অতিকষ্টে কথা কহিতে পারেন। কিছুক্ষণ চক্ষু নিমীলিত রাখিয়া সোক্রেটিস বলিয়াছিলেন, "দেবতার কাছে আমার একটা ঋণ আছে। আমি একটা মোরগ মানত করিয়াছিলাম—তা দেওয়া হয় নাই। তোমরা সেটি দিও।"* এইটি ঋণশোধের একটা প্রমাণ। মানুষের কাছেই হউক আর দেবতার কাছেই হউক, যাহা দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি তাহা দেওয়া আমার কর্ত্তব্য—এই ছিল প্রাচীনদের চিন্তা।

শুধু অঙ্গীকৃত বস্তু দান করাই যে কর্ত্তব্য ছিল, তা নয়; কোন বস্তু দিতে অঙ্গীকার করা যেমন অঙ্গীকার, তেমনি কোন কার্য্য করিতে বা কোন কার্য্য না-করিতে অঙ্গীকার করা অঙ্গীকার। অঙ্গীকার হিসাবে উভয়ই রক্ষণীয়। কথা দিলে তা রাখিতে হইবে, ইহা অতি প্রাচীন আদর্শ। ইহার নামান্তর সত্যপালন। পিতার সত্যপালন করিতে রাম বনে গিয়াছিলেন; নিজের সত্যপালন করিবার জন্য ভীষ্ম চিরকুমার ছিলেন। কথা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই পাণ্ডবদের এত বড় ত্যাগটা করিতে হইয়াছিল। ঋণও একপ্রকার সত্য; দিব বলিলেই কথা দেওয়া হইল; সুতরাং না-দিলে সে সত্য আর রক্ষিত হয় না।

এইরূপে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ঋণ-শোধের পবিত্রতা-বোধ, এই দুইটা কারণ হইতে অনেক কালের লোক ঋণ না-দেওয়াটাকে একটা বড় পাপ মনে করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে পৃথিবীতে একটি নূতন বিজ্ঞানের আধিপত্য প্রবল হইয়াছে—তার নাম অর্থবিজ্ঞান। এখন আর দেনা-পাওনার কথা শুধু চারিত্রনীতির দিক্ দিয়াই বিচার করা হয় না—ইহাকে প্রধানতঃ ধনবিজ্ঞান অর্থাৎ ইকনমিক্সের দিক্ হইতে হিসাব করিয়া দেখা হয়। ইহার ফলে দেনা-পাওনা সম্বন্ধে আমাদের উচিত-অনুচিত বোধ ছিল, তাহা দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে।

আগে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের সম্পর্ক শুধু ব্যক্তিতে

* "But now the parts around the lower belly were almost cold; when uncovering himself, for he had been covered over, he said, and they were his last words, 'Crito, we owe a cock to Aesculapius; pay it, therefore, and do not neglect.'"—*Phædo*, Plato (155).

ব্যক্তিতেই হইতে পারিত। কিন্তু এখন উহ একটা আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধের মধ্যেও পরিগণিত হইয়াছে। এখন এক জাতিও আর এক জাতির নিকট ঋণী হইতে পারে। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের পরে জগতের প্রধান প্রধান জাতিগুলি প্রায় সকলেই এই সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মেনী প্রভৃতি কয়েকটি জাতি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের নিকট ঋণী হইয়া পড়িয়াছে এবং ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতিও আমেরিকার নিকট ঋণী হইয়া আছে। ঋণের এই আধুনিক পরিণতি—ইহার এই আন্তর্জ্জাতিক ভাব, শুধু যে ধনবিজ্ঞানের একটা নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে তা নয়; ইহার ফলে জগতের ব্যক্তিসমূহের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারেও একটা নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অধমর্ণ যদি তাহার ঋণ অস্বীকার করে কিংবা উহা পরিশোধ করিতে না-চায়, তবে সেটা তার পক্ষে নিন্দনীয়; এখনও আমরা অনেকেই হয়ত তাই মনে করি। কিন্তু এই সেদিন ইংলণ্ড তার ঋণ দিতে অস্বীকার করিল;—অজুহাত ন্যায়ের দিক্ দিয়া কিছু নাই, কিন্তু অর্থনীতির দিক্ দিয়া অনেক কথা বলা হইয়াছে। এ-সম্পর্কে ধনবিজ্ঞানের যে-সব কূটতর্ক উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই খুব জটিল এবং শিক্ষাপ্রদ। ঋণ নগদ টাকা দিয়াও শোধ করা যায়, আবার সেই মূল্যের বাণিজ্যদ্রব্য দিয়াও শোধ করা যায়। এক জাতি যখন আর এক জাতির প্রাপ্য ঋণ শোধ করিবে, তখন এ-দুইয়ের কোন্ উপায়ে শোধ করিবে? কোন্ উপায়ে শোধ করিলে অন্যান্য নিরপেক্ষ জাতির, অর্থাৎ সমগ্র জগতের উপকার হইবে? এই বিরাট প্রশ্নের উত্তর আমেরিকা একরূপ দেয়, আর ইংলণ্ড দেয় আর এক রকম। উভয়ের মতের মিল হইল না, সুতরাং আপাততঃ ইংলণ্ড দেনা শোধ করা স্থগিত রাখিল।

তা ছাড়া, আরও এর চেয়ে বড় একটা তর্ক আছে। আমেরিকা অত্যন্ত ধনী দেশ—বহু নগদ টাকা ও সোনারূপা তার মজুদ আছে। এ-ক্ষেত্রে ইংলণ্ড যদি তার দেনা শোধ করিয়া আমেরিকাকে আরও ধনী করিয়া দেয়, তবে তাতে কি পৃথিবীর অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই? এই সব প্রশ্ন লইয়া আলোচনা আন্দোলন চলিতেছে; এবং নিশ্চয়ই আরও কিছুকাল চলিবে। কিন্তু এসম্বন্ধে কোন মত-প্রকাশ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা শুধু ভাবিতে চাই, চারিত্র-নীতির উপর ইহার প্রভাব কিরূপ দাঁড়াইবে!

ইংলণ্ড ঋণ দিতে নারাজ হইয়াছে; সুযোগ বুঝিয়া জার্ম্মেনীও তার দেনা দিতে অস্বীকার করিতেছে। তার যুক্তি সরল; যে-দেনার বোঝা তার কাঁধে চাপানো হইয়াছে, সে-সব শোধ করিতে গেলে সে আর মাথা তুলিতে পারিবে না। এ-দেনা অবশ্যই এক সময়ে সে স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু সে ত দায়ে পড়িয়া। তার পরাজয়ের সুবিধা পাইয়া বিজেতারা তার স্কন্ধে যে ঋণের ভার চাপাইয়াছিল, আজ সে উহা অস্বীকার করিবার মত শক্তি রাখে, সুতরাং উহা সে অস্বীকার করিতেছে।

মনে পড়ে ভীষ্মের কথা। পিতার একটা দুর্ব্বলতার জন্য হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী এক ধীবরের নিকট একটা কথা দিয়াছিল; বলিয়াছিল, রাজমুকুট পরিব না এবং চিরকাল অকৃতদার থাকিব। সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া ধীবর ভীষ্মের পিতার সঙ্গে তার কন্যার বিবাহ দেয়। এই বিবাহের পর ভীষ্ম যদি বিবাহ করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে হয়ত পারিতেন; আর পিতার মৃত্যুর পর যদি তিনি বিবাহ করিতে চাহিতেন, তবে, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি ছিল না যাহা তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিত। কিন্তু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা সুবিধা-অসুবিধা বিচার করে নাই। আবার যখন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা নিঃসন্তান মারা গেলেন, তখন এই ধীবর-কন্যা রাণী সত্যবতীই ভীষ্মকে দারপরিগ্রহের জন্য কত অনুরোধ করিলেন! তথাপি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা টলিল না। কথা দিয়া সে-কথার অবমাননা হস্তিনাপুরের রাজার ছেলে করিতে পারে না। ভীষ্ম ত এ-কথা বলেন নাই, বিপদে পড়িয়া একটা কথা বলিয়াছি, এখন ত আর সে বিপদ্ নাই, সুতরাং সে-কথাও আর রক্ষা করা চলে না। আজ জার্ম্মেনীর যে যুক্তি তাহা ভীষ্মের সময়েও যুক্তি হইতে পারিত, কিন্তু হয় নাই। এই ছিল প্রাচীন আদর্শ।

ব্যক্তির জীবনে এখনও এই আদর্শ বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখনও কথা দিয়া যে-কোন অজুহাতে যদি কোন ব্যক্তি সে-কথা পালন না করিতে চায়, তবে আমরা তার নিন্দা করি। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কের

ভিতর এ-আদর্শ আর থাকিতেছে না ; তা যদি না হইত, তবে জার্ম্মেনীই বা তার দেওয়া কথা অস্বীকার করে কি করিয়া আর ইংলণ্ডই বা তার ঋণ অস্বীকার করে কেমন করিয়া ?

ঋণ-সম্বন্ধে জগতের জাতিসমূহ যে বিচারপদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে, তাহার অর্থ এই যে, ঋণ অবশ্যই দেওয়া উচিত, তবে নিজের অত্যন্ত অনিষ্ট কিংবা অসুবিধা হইলে উহা না দেওয়াই উচিত। স্বীকার করিতেই হইবে, উহা ন্যায়-অন্যায় বিচারের একটা নূতন ধারা ; আর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই নূতন বিচারপদ্ধতি ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হইলে, ব্যক্তির এবং জাতির জীবনধারাও অনেক পরিবর্ত্তিত হইবে। অনেক আগে, যখন আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কের ধারণা খুব স্পষ্ট হয় নাই, তখন হয়ত এই প্রকার জাতীয় ঋণশোধ সম্বন্ধে জাতিসমূহের ধারণাও অস্পষ্টই ছিল। কিন্তু আজ জাতিতে জাতিতে সম্বন্ধটা একটা বিরাট সত্য ; অথচ এই সম্বন্ধ-স্বীকৃতি সত্ত্বেও ঋণ-সম্বন্ধে জাতিসমূহ এক নূতন চিন্তাধারা গ্রহণ করিতেছে। ইহাতে আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধই যে কেবল পরিবর্ত্তিত হইবে এমন নহে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্বন্ধের উপরও ইহার প্রভাব অনিবার্য্য। মানুষের সামাজিক পদমর্য্যাদা, তার ধনসম্পত্তি, তার ক্রিয়াকলাপ ও চিন্তাধারা —এক কথায় তার সমগ্র জীবন, তার ভালমন্দের ধারণাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, এই ভালমন্দের ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিলে তার জীবনপদ্ধতির পরিবর্ত্তনও অপরিহার্য্য। একটা দৃষ্টান্ত সহজেই দেওয়া যাইতে পারে। আমরা সাধারণতঃ কোন সভ্য গবর্ন্মেণ্টকে টাকা ধার দিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। বিনা সন্দেহে যেমন দেশে 'কোম্পানীর কাগজ' কিনিয়া টাকাটা নিরাপদ্ হইল মনে করি, তেমনি ফ্রান্স বা জার্ম্মেনীর কাগজ কিনিতেও আমাদের কোন ভয়ের কারণ ছিল না, কেন না, ওরা সভ্য দেশ, টাকা দিবে, এ বিশ্বাস সকলেরই ছিল। কিন্তু ক্রমে যদি এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, অসুবিধা বোধ করিলে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন গবর্ন্মেণ্ট ঋণ দিতে অস্বীকার করিয়াছে, তখন আর লোকে অত সহজে দেশী কিংবা বিদেশী কোম্পানীর কাগজ কিনিতে চাহিবে না।

আরও একটা কথা। যারা অভাবে পড়িয়া কিংবা নৈতিক আদর্শের পরিবর্ত্তনের ফলে ঋণ দিতে [illegible] করে, তারা আগের ঋণ সব পরিশোধ করিয়া জগৎকে নূতন আদর্শের কথা জানাইয়া দিয়া শুধু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই এই নূতন নিয়ম অনুসরণ করে না। সুতরাং যে মুহূর্ত্তে কোন দেশ এই নূতন আদর্শ গ্রহণ করিবে, সেই মুহূর্ত্তে বহু ধনী নির্ধন হইয়া যাইবে। কারণ, সে-দেশের কাছে টাকা ধার রাখিয়া অনেকেই নিজদিগকে ধনবান্ মনে করিতেছিল ; কিন্তু ঐ দেশ যখন তার ধার-করা টাকা দিতে অসম্মত হইবে, তখনই ত ধনীদের ধন কর্পূরের মত উবিয়া যাইবে! কত লক্ষপতি শুধু কোম্পানীর কাগজে লক্ষপতি। এই কোম্পানীর কাগজের টাকা পরিশোধ করিতে যারা প্রতিশ্রুতি করিয়াছে, তারা যদি সে প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে, তবে আর লক্ষাধিপতিদের লক্ষ টাকা কোথায় রহিল! সুতরাং জগতের নৈতিক আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটিলে সমাজে ধনী-নির্ধন প্রভৃতি যে শ্রেণী-বিভাগ আছে তাহাও অবিকৃত থাকে না।

ঋণের আদান-প্রদান সম্বন্ধে যে নূতন ধারণা জগতে দেখা যাইতেছে, তাহা ইউরোপ আমেরিকার জাতিদের দেনা-পাওনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গত দুই-তিন বৎসরের ভিতর বাংলায়, তথা ভারতবর্ষে, কয়েকটি আন্দোলন হইয়াছে, যাহার ভিতরও ঋণ-সম্বন্ধে এই নূতন ধারণার প্রভাব দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ কংগ্রেসের অনুমোদন অনুসারে খাজানা বন্ধ করিবার জন্য যে একটা আন্দোলন হইয়াছিল, তাহাতেও ঋণ অস্বীকারেরই প্রকারান্তর দৃষ্ট হয়। খাজানাও একপ্রকার ঋণ—এবং এক হিসাবে দেখিতে গেলে, অঙ্গীকৃত ঋণ, সুতরাং তাহা না-দেওয়া ঋণ অস্বীকারেরই নামান্তর। এক সময়ের নৈতিক ধারণা অনুসারে উহা অন্যায় বলিয়া মনে করা হইত, কিন্তু আজ যে একটা অবস্থাবিশেষে উহা না দেওয়ার উপদেশ হইল, তাহাতে ইহাই প্রকারান্তরে বলা হইল যে, রাষ্ট্র বা সমাজের অবস্থা-বিশেষে ঋণ অস্বীকার করিলে কোন অন্যায় বা পাপ হয় না। সুতরাং মানুষের নৈতিক আদর্শের একটা পরিবর্ত্তন যে ইহাতে সূচিত হইল সে-বিষয়ে আর সন্দেহ করা চলে কি ?

কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াও বাংলা দেশের কো[illegible] কেউ জেলায় খাজানা এবং কর্জ্জ টাকা পরিশোধ না-ক[illegible]

বিকেলে

একটা আন্দোলন হইয়াছে—এবং এখনও ইহা একেবারে দূর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। খাজানা সম্বন্ধে আন্দোলনটা আপাততঃ কতকটা মন্দীভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কারণ শিষ্টমত অনুসারে বর্ত্তমানে রাজস্ব যেমন দেওয়া উচিত, জমিদারের খাজানাও তেমনি দেওয়া উচিত; এখন পর্য্যন্ত এই অভিমতই প্রবল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কর্জ্জ টাকা—অর্থাৎ অঙ্গীকৃত ঋণ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে শিষ্টসমাজেও প্রবল ধারণা এই যে, উহার ভিতর একটা জুলুম রহিয়াছে। দেনাদার অঙ্গীকার করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে দায়ে পড়িয়া; সুতরাং সমাজের উচিত তাহাকে রক্ষা করা এবং এই রক্ষার উপায়, তাহাকে এই অঙ্গীকৃতির দায় হইতে মুক্তি দেওয়া। এ-ধারণাই যদি প্রবল না হইত তাহা হইলে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্ কিছুদিন হইল সে-সব আইন পাস করিয়াছে, তাহা হইত না। অতিরিক্ত সুদ ডিক্রী না দেওয়ার জন্য আদালতকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে দেনাদারের যে উপকার হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার কর্ত্তব্যবোধেরও পরিবর্ত্তন ঘটান হইয়াছে। এক সময়ে হাজার অসমর্থ হইলেও সে মনে করিত, যাহা অঙ্গীকার করা হইয়াছে, যেমন করিয়াই হউক তাহা দেওয়া উচিত। সে বোধটা আর তাহার রহিল না। সে আজ ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে অন্যরূপ ধারণার অধীন হইয়াছে। আইনের উপদেশ অনুসারে এখন সে ইহাই মনে করিবে যে, স্বীকৃত হইলেও কর্জ্জ-টাকার বেশী সুদ তাহার না দেওয়াই উচিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদে এক জন এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, তিন বৎসরের জন্য দেশের দেনাদারদের দেনা দেওয়া স্থগিত থাকুক এবং এ-তিন বৎসরের জন্য তাদের দেনার সুদবৃদ্ধিও বন্ধ থাকুক। এ-প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই। তাতে কিছু আসে যায় না। শিক্ষিত সমাজে দেনা সম্বন্ধে যে একটা নূতন ধারণা ক্রমশঃ মাথা উঁচু করিতেছে, তাহার প্রমাণ এই প্রস্তাবে পাওয়া যায়। আর, সেদিন বোধ হয় বেশী দূরেও নয়, যখন এরূপ প্রস্তাব অনায়াসেই গৃহীত হইয়া যাইবে।

এ-কথা আমরা বলিতে চাই না যে, এ-দেশে খাজানা ও কর্জ্জ টাকার সম্বন্ধে যে-সমস্ত ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে তাহার ভিতর অবিচারের লেশমাত্র নাই, যেমনটি ছিল তেমনটিই উহা থাকা উচিত। আমরা শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, দেনাদার যদি শক্তিমান্ হইয়া দেনা অস্বীকার করে, তাহা হইলে পাওনাদারদের আর্থিক অবস্থারই যে কেবল পরিবর্ত্তন হয়, এমন নহে; ইহাতে সমাজের নৈতিক আদর্শেরও পরিবর্ত্তন ঘটে এবং সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, তাহারও পরিবর্ত্তন ঘটে। এক কথায়, সমাজের গঠনই অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সুতরাং আইনের সাহায্য বা অন্য উপায়ে ঋণ-সম্বন্ধে নূতন ধারণার প্রবর্ত্তনের ফল যে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, ইহা আমাদের ভাবা উচিত।

এটা একটা সাধারণ সত্য যে, সমাজ মানুষের কর্ত্তব্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক জনের যা অধিকার, আর এক জনের সেটাই কর্ত্তব্য। পরদ্রব্যে লোভ না-করা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়াই দ্রব্য-স্বামীর স্বামিত্ব রক্ষিত হয়। কেহ যদি তাহার কর্ত্তব্য অবহেলা করে, তাহা হইলে তাহাতে আর এক জনের অধিকার খর্ব্ব হয়। ব্যাঙ্কে আমার যে টাকা আছে, আমার প্রয়োজন অনুসারে সে-গুলি আমায় প্রত্যর্পণ করা ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য। ব্যাঙ্ক যদি সে-কর্ত্তব্য অস্বীকার করে এবং তাকে উহা স্বীকার করাইবার যদি কোন উপায় না থাকে, তবে তার ফলে আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতে পারি। আমার ধনসম্পত্তি এইরূপে অপরের কর্ত্তব্যবোধের উপর নির্ভর করে।

অন্যকে আমি টাকা ধার দিয়াছি, এই আশায় যে, উহা আমি আবার পাইব। আর, আমার ধনসম্পত্তির হিসাব করিবার সময় আমি ঐ টাকাটাও গণনা করি। কিন্তু দেনাদারেরা যদি একবাক্যে সকল দেনা অস্বীকার করে, তবে এক মুহূর্ত্তেই জগতের সমস্ত উত্তমর্ণ নিঃস্ব হইয়া যাইবে না কি?

জাতিতে জাতিতে যেখানে ঋণসম্পর্ক রহিয়াছে, সেখানে এইরূপ ঋণ অস্বীকার করিলে উত্তমর্ণ জাতি হয়ত একেবারে নিঃস্ব হইয়া যাইবে না; কিন্তু ব্যক্তির বেলায় যদি ঋণ অস্বীকৃত হয় এবং যদি ঐ অস্বীকৃত ঋণ আদায়ের কোন উপায়ান্তর না থাকে, তবে শ্রেণী-বিশেষের একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

বাংলা দেশের সমস্ত লোককে যদি উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, উত্তমর্ণ-শ্রেণীর বেশীর ভাগই হিন্দু আর অধমর্ণ শ্রেণীর বেশীর ভাগই মুসলমান। শুধু তাই নয়; খাজানার পাওনাদার ও দেনাদারের মধ্যেও ঠিক এইরূপ সাম্প্রদায়িক বিভাগ রহিয়াছে। খাজানা দেয় বেশীর ভাগই মুসলমান—পায় বেশীর ভাগই হিন্দু; কারণ জমিদার বেশীর ভাগই হিন্দু। ইহা বড়ই দুর্ভাগ্য। কেননা, এই ক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শের পরিবর্ত্তনের ফলে শুধু যে সমাজে অর্থনৈতিক সম্পর্কই পরিবর্ত্তিত হইবে, এমন নয়; সাম্প্রদায়িক সম্পর্কটাও ইহার ফলে জটিল হইয়া পড়িবে এবং সম্প্রদায়গুলির পদমর্য্যাদাও পূর্ব্ববৎ থাকিবে না।

এতকাল ধনী ও মজুরদের ভিতর যে কলহ চলিতেছিল, তার ভিতর দেনা-পাওনা সম্পর্কের আদর্শের একটা পরিবর্ত্তনও লক্ষিত হইত। তার পর বিগত শতাব্দীতে সোসিয়ালিজ্‌ম্, কম্যুনালিজ্‌ম্ প্রভৃতি যে-সব মতবাদ পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়াছে, তাতেও সমাজের অর্থ-বিভাগ প্রভৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নৈতিক আদর্শের আমুল সংস্কারও অভিপ্রেত। সমাজে শ্রেণীবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের অধিকার লোকের কর্ত্তব্য-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত; এই কর্ত্তব্য-বোধের পরিবর্ত্তন না ঘটাইলে তাদের অধিকার খর্ব্ব বা নষ্ট হয় না। এইজন্যই বর্ত্তমান রুশিয়ায় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এত বড় অভিযান চলিতেছে। ধর্ম্ম একপ্রকার কর্ত্তব্য-বোধের প্রশ্রয় দেয়; সেই কর্ত্তব্য-বোধের উপর আবার শ্রেণী-বিশেষের অধিকার নির্ভর করে। সুতরাং ঐ সব শ্রেণীর অধিকার যদি নষ্ট করিতে হয়, তবে ঐ কর্ত্তব্য-বোধও দূর করিতে হইবে এবং তারই জন্য উহার প্রশ্রয়দাতা ধর্ম্মেরও উচ্ছেদ প্রয়োজন।

আজ যে আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কে এবং অন্যত্র ঋণ অস্বীকার সমীচীন মনে করা হইতেছে, তাহাতে আপাততঃ অর্থনৈতিক যুক্তিরই প্রয়োগ দেখা গেলেও ভিতরে ভিতরে উহার ফলে মানুষের নৈতিক আদর্শের এবং তার কর্ত্তব্য-বোধেরও প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, এবং তার ফলে সমাজের একটা বিরাট পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সমস্ত জগতে উহার ফল কিরূপ দাঁড়াইবে স্পষ্ট কল্পনা করা কঠিন; কিন্তু বাংলা দেশে উহার আশুফল যাহা হইবে, তাহা বঙ্গবাসীর, বিশেষতঃ ধনশালী হিন্দুসমাজের, প্রণিধানযোগ্য।

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তম পরিচ্ছেদ

৩

সন্ধ্যার সময় আটঘরা পৌঁছে দেখি সত্যিই মায়ের অসুখ। আমাদের ঘরখানায় মেজের ওপর পাতা বিছানায় মা শুয়ে। অন্ধকারে আমায় চিন্‌তে না পেরে ক্ষীণস্বরে বললেন—কে ওখানে—হারু?

তারপর আমায় দেখে কেঁদে উঠে বললেন—কে জিতু, আয় বাবা আয়, এতদিন পরে মাকে মনে পড়লো তোর? আয় এই বালিশের কাছে আয়—ওমা, একি হয়ে গিয়েচিস্ রে! রোগা, কাল চেহারা—ওরা সত্যিই বলত তো!

মা একটি ঘরে শুয়ে—জনপ্রাণী কেউ কাছে নেই। সন্ধ্যা হব-হব, ঘরে একটা আলো পর্য্যন্ত কেউ জ্বালে নি। এমনিই বাড়ি বটে! কেন, এত ছেলে মেয়ে বৌ বাড়িতে, এক জন কাছে থাকতে নেই? অথচ পরের দোষ দিয়ে লাভ কি, আমিই কোথায় ছিলুম এতদিন?

বললাম—মা, দাদা কোথায়? সীতা আসে নি?

মা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। বললেন—ওরা কেউ চিঠি দেয় না, ব'লে ব'লে আজ বুঝি হারু একখানা পত্র দিয়েচে সীতাকে।

—ক'দিন অসুখ হয়েচে তোমার মা? ওরা কেউ দেখে না? জ্যাঠাইমা, কাকিমারা আসে না?

—ভুবনের মা মাঝে মাঝে আসে। এই বিকেলে

সাবু দিয়ে গেল—তা সাবু কি খেতে পারি, ওই রয়েচে বাটিতে। ছোটবৌ এসেছিল বিকেলবেলা। বট্‌ঠাকুর বাড়ি নেই বুঝি—আর কেউ এদিকে মাড়ায় না।

তারপর আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—হ্যারে জিতু, তুই নাকি সন্নিসি হয়ে গিয়েচিস্‌—দিদি, হারু, মেজবৌ, ঠাকুরপোরা সবাই বলে—সত্যি? বলে আর সে আসবে না, সে কোন্‌ দিকে বেরিয়ে চলে গিয়েচে। তার ঠিকানা কেউ জানে না। আমি ভাবি জিতু আমায় ভুলে যাবে এমনি হবে? আবার ভাবি আমার কপাল খারাপ নইলে এ-সব হবেই বা কেন—ভেবে ভেবে রাতে জেগে বসে থাকি।

—কেঁদো না, কাঁদে না, ছিঃ। ওসব মিথ্যে কথা। কে বলেচে সন্নিসি হয়ে গেছি! এই দ্যাখ না শাদা কাপড় পরনে, সন্নিসি কি শাদা কাপড় পরে?

মনে বড় অনুতাপ হ'ল—কি অন্যায় কাজ করেচি এত দিন এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে! আর এদেরও কি অন্যায়, সবাই মিলে মাকে এমন ক'রে ভয় দেখানোই বা কেন, মা সরল মানুষ, সকলের কথাই বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমার দোষ ছিল না, আমি ভেবেছিলাম মা আছেন দাদার কাছে। নিশ্চিন্ত ছিলুম অনেকটা সেজন্যে। জিগ্যেস্‌ করলাম—মা, দাদা তোমায় নিয়ে যায় নি!

—সে অনেক কথা। নিতু নিতেও এসেছিল, বট্‌ঠাকুর বললেন—যাও, কিন্তু আমার এখানে আর আসতে পাবে না। সীতার শ্বশুরবাড়ির লোক ভাল না—এখন দেখ্‌চি—তারাও বট্‌ঠাকুরের হাতের লোক, বললে তা হ'লে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচে যাবে। মেয়ে তারা আর পাঠাবে না। বৌমাকেও এখনও দেখি নি, এমনি আমার কপাল। বট্‌ঠাকুর সে বউকে এ-বাড়ি নাকি ঢুকতে দেবেন না। তা নিতু আমায় লিখলে, মা এই কটা মাস যাক—কোথায় নাকি ভাল চাকরি পাবে—এখানে পাড়াগাঁয়ে বাসাও পাওয়া যায় না। আমি আবার গিয়ে ওর শ্বশুরবাড়ি উঠবো সেটা ভাল দেখাবে না। মাঘ মাসে একেবারে নিয়ে যাবে এখান থেকে। এই তো নিতু ওমাসেও এসেছিল। আহা বাছাকে কি অপমান করলে সবাই মিলে! আমার কপালে কেবল চারি দিকে অপমান ছাড়া আর কিছু জোটে না—

কেন চাকরি ছেড়ে দিলাম? কেন এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াই? এখন দেখতে পাচ্ছি সীতার বিবাহ হয়ে গেলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়েচে ভাবা উচিত ছিল না। মাকে আমি উপেক্ষা ক'রে এসেচি এত দিন, দাদা সাধ্যমত অবিশ্যি করেচে—কিন্তু আমি কিছুই করি নি। কেন আমার এমন ধারা মতিগতি হ'ল! কোথায় আমার কর্ত্তব্য, সে-সম্বন্ধে এমন অন্ধ ছিলাম কেন?

লজ্জিত ও অনুতপ্ত সুরে বললাম—মা আঙুর খাবে?···আঙুর এনেচি, ভাল আঙুর—শেয়ালদ' থেকে—

—ভূতোকে বললাম, একটা আলো দিয়ে আয়, তা দেয় নি দেখচি—বল্‌তে বল্‌তে ছোটকাকীমা ঘরের দোরের কাছে এসে আমায় দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে বললেন—কে বসে ওখানে?

আমি অপরাধীর মত কুণ্ঠিত স্বরে বললাম—আমি, কাকীমা।

এগিয়ে এসে বললেন—কে, নিতু?

—না, আমি।

কাকীমা অবাক হয়ে বললেন—ওমা, জিতু যে দেখচি, কোত্থেকে, কি ভাগ্যি তোমার মায়ের! তারপর কি মনে ক'রে?

কাকীমা বললেন—তোমার কাণ্ডজ্ঞান যে কবে হবে, তা ভেবেই পাই নে। একেবারে এ-কটা বছর নিরুদ্দেশ নিখোঁজ—আর এই এ-ভাবে মাকে ফেলে রেখে? তোমাদের একটু জ্ঞান নেই যে এটা কার বাড়ি? এখানে কে দ্যাখে তোমার মাকে? সবই তো জান—বয়েস হয়েচে এখনও এ-বুদ্ধি হ'ল না? বট্‌ঠাকুর বাড়ি নেই, একটা ডাক্তার-বদ্যি কে দেখায় তার নেই ঠিক। হরি ডাক্তারকে একবার আনতে হয়—টাকাকড়ি কিছু আছে? নেই বোধ হয়, সে দেখেই বুঝেচি—নেই? আচ্ছা, টাকা আমি দেব-এখন ভেব না, ডাক্তার আন।

ছোটকাকীমার পায়ের ধুলো নেবার ইচ্ছা হ'ল। এ-বাড়িতে সবাই পশু, সবাই অমানুষ—সত্যিকার মেয়ে বটে ছোটকাকীমা।

রাত্রেই ডাক্তার এল। ওষুধপত্রও হ'ল। দাদাকে পত্র দিলাম পরদিন সকালে।

আমায় নিয়ে খুব হৈ চৈ হ'ল। জ্যাঠাইমা আমায় রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে খেতে দেবেন না—আমি জাত-বিচার মানি নে, বাগ্‌দি-দুলে সবার হাতে খেয়ে বেড়াই, এ-সব কথা কে এসে গাঁয়ে বলেচে। নানা রকম অলঙ্কার দিয়ে কথাটা রাষ্ট্র হয়েচে গাঁয়ে।

মায়ের অবস্থা শেষরাত থেকে বড় খারাপ হ'ল। সকালে আমাকে আর চিন্‌তে পারেন না—ভুল বক্‌তেও লাগ্‌লেন।

সন্ধ্যার সময় একটা মিটমিটে টেমি জ্বলচে ঘরের মেজেতে—আমি একা বসে আছি মায়ের শিয়রে, এমন সময়ে বাইরে উঠোনে একখানা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াবার শব্দ হ'ল। একটু পরেই ব্যস্তসমস্ত ভাবে মাটিতে আঁচল লুটোতে লুটোতে সীতা ঘরে ঢুক্‌ল। আমায় দেখে বললে, ছোড়দা? মা কেমন আছেন ছোড়দা? আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম। সীতা একেবারে বদলে গিয়েচে, মাথায় কত বড় হয়েচে, দেখতেও কি সুন্দর হয়েচে—ওকে যেন চেনা যায় না আর।

মাকে বললাম—মা, ওমা, সীতা এসেচে,—

মা চাইলেন, কি বললেন বোঝা গেল না। বোধ হয় বুঝতে পারলেন না যে সীতা এসেচে।

সীতা খুব শক্ত মেয়ে। সে কেঁদেকেটে আকুল হয়ে পড়লো না। আমায় বললে—দাদা, আমার বালাজোড়াটা দিচ্চি, তাই দিয়ে ভাল ডাক্তার নিয়ে এস। এখানকার হরিডাক্তার তো? তার কাজ নয়।

আমি অক্ষমতার লজ্জায় কুণ্ঠিত সুরে বললাম—তার পর তোর শ্বশুরবাড়ির লোকে তোকে বক্‌বে। সে কি ক'রে হয়—

সীতা বললে—ইস্! বক্‌বে কিসের জন্যে, বালা কি ওদের? মায়ের বালা, মা দিয়েছিলেন বিয়ের সময়। বাবা গড়িয়ে দিয়েছিলেন মাকে। তুমি বালা নিয়ে যাও, তার পর ওরা যা বলে বলবে—

এই সময় সীতার স্বামী ঘরে ঢুকল। আমি যে-রকম চেহারা কল্পনা করছিলাম, লোকটা তার চেয়েও খারাপ। কালো তো বটেই, পেটমোটা, বোধ হয় পিলে আছে, কাঠখোট্টা গড়ন, চোয়ালের হাড় উঁচু—গায়ে একটা ছেলে-মানুষের মত ছিটের জামা, একটা রাঙা আলোয়ান, পায়ে কেম্বিসের জুতো। আমায় দেখে দাঁত বার ক'রে হেসে বললে—এই যে ছোটবাবু না? কখন আসা হ'ল? বড়বাবু বুঝি এখনও আসবার ফুরসৎ পান নি—তার পর, অসুখটা কি?...এখন কেমন আছেন?

তার পর সে খানিক ক্ষণ বসে থেকে বললে—বস তোমরা। আমি জ্যাঠাইমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি—একটু চায়ের চেষ্টা দেখা যাক্‌, গরুর গাড়িতে গা-হাত ব্যথা হয়ে গিয়েচে।

ওর কথার ভঙ্গিতে একটা চাষাড়ে ভাব মাখানো। এই লোকটা সীতার স্বামী! সীতার মত মেয়ের! সীতাকেও আমরা সবাই মিলে উপেক্ষা করেচি।

এই সময় হঠাৎ শৈলদিদির কথা আমার মনে পড়ল। শেয়ালদ' ষ্টেশনে ছোট-বৌঠাকুরুণ বলেছিলেন শৈলদি এখানেই আছে। সীতার বালাজোড়াটা নেবো না—ওকে তার জন্যে অনেক দুঃখ পোয়াতে হবে সেখানে, ও যে-রকম চাপা মেয়ে, কোন অভিযোগ করবে না কখনও কারু কাছে। শৈলদিদির কাছ থেকে টাকা ধার নেবো, মায়ের অসুখের পরে যে-ক'রে হোক্‌, দেনা শোধ হবেই।

একবার বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখি সীতার স্বামী ওদের রান্নাঘরে বসে হুঁকো-হাতে তামাক খেতে খেতে খুব গল্প জমিয়েচে—আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভায়েদের সকলেরই প্রায় বিয়ে হয়ে গিয়েচে এবং বৌয়েরা সকলেই সম্পর্কে ওর শালাজ—তাদের সঙ্গে।

রাত দশটার সময় শৈলদিদি এসে হাজির। আমায় দেখে বললে—এই যে সন্নিসি-ঠাকুর ফিরে এসেচ, দেখচি। এই যে সীতা—এস এস, সাবিত্রী সমান হও, কখন এলে ভাই? আমি শুনলাম এই খানিকটা আগে, আমাদের ও-পাড়ায় কে খবর দেবে বল।

আমি আর সীতা শুধু ঘরে মায়ের পাশে বসে। সীতার স্বামী খেয়ে দেয়ে শুয়েচে, অবিশ্যি সে বসে থাকতে চেয়েছিল—আমি বলেছিলাম তার দরকার নেই। তুমি খেয়ে একটু বিশ্রাম কর—দরকার হয় ডাকব রাত্রে।

শৈলদিদিও রাত্রে থাকতে চাইলে, বললে—আজ রাতে লোকের দরকার। তোরা ছুটিতে মোটে বসে আছিস্। আমি খেয়ে আসি, আমিও থাকব।

আমি বললাম—না শৈলদি, আমরা দু-জনে আছি, ভগ্নীপতি এসেচে—তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না।

তারপর বাইরে ডেকে টাকার কথা বললাম। শৈলদি বললে—কত টাকা?

—গোটাকুড়ি দাও গিয়ে এখন। কাল সকালেই আমি তা হ'লে চলে যাই ডাক্তার আনতে—

—তা হ'লে কাল সকালে যাবার সময় আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবি। ওখান দিয়েই তো পথ—কেমন তো?

ছোটকাকীমা এই সময় এলেন। শৈলদিদিকে দেখে বললেন—ঠাকুরঝিকে নিয়ে বেজায় মুস্কিল হয়েচে ভাই—ওরা ছেলেমানুষ, কি বা বোঝে, নিতু এখনও তো এল না। হঠাৎ চার-পাঁচ দিনের জ্বরে যে মানুষ এমন হয়ে পড়বে তা কি ক'রেই বা জানবো। তবুও তো জিতু কোথা থেকে ঠিক সময়ে এসে পড়েছিল তাই রক্ষে।

রাতে জ্যাঠাইমা এসেও খানিকটা বসে রইলেন। অনেক রাত্রে সবাই চলে গেল, আমি সীতাকে বললাম—তুই ঘুমিয়ে নে সীতা। আমি জেগে থাকি। রাতে কোন ভয় নেই।

সকাল বেলা আটটা-নটার পর থেকে মা'র অবস্থা খুব খারাপ হ'ল। দশটার পর দাদা এল—সঙ্গে বৌদিদি ও দাদার খোকা। বৌদিদিকে প্রথম দেখেই মনে হ'ল শান্ত, সরল, সহিষ্ণু মেয়ে। তবে খুব বুদ্ধিমতী নয়, একটু অগোছালো, আনাড়ি-ধরণের। নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, বাইরে কোথাও বেরোয় নি বিশেষ, এই বোধ হয় প্রথম, কিছু তেমন দেখেও নি। গরম জলের বোতল গায়ে সেঁক করতে হবে শুনে ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিপন্ন মুখে সীতার দিকে চেয়ে রইল। কাপড়-চোপড় পরবার ধরণও অগোছালো—আজকালকার মত নয়। বৌদিদি যেন বনে ফোটা শুভ্র কাঠমল্লিকা ফুল, তুলে এনে তোড়া বেঁধে ফুলের দোকানে সাজিয়ে রাখবার জিনিষ নয়। আর একেবারে অদ্ভুত ধরণের মেয়েলী, ওর সবটুকুই নারীত্বের কমনীয়তা মাখানো।

সীতা আমায় আড়ালে বললে—চমৎকার বৌদিদি হয়েচে, ছোড়দা। আহা, মা যদি একটিবারও চোখ মেলে দেখতেন! আমাদের কপাল!

বেলা তিনটের সময় মা মারা গেলেন। যে মায়ের কথা তেমন ক'রে কোনদিন ভাবি নি, আমাদের কাজ-কর্ম্মে, উদ্যমে, আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, উচ্চাভিলাষে মায়ের কোন স্থান ছিল না, সবাই মিলে যাকে উপেক্ষা ক'রে এসেচি এত দিন—আজ সেই মা কত দূরে কোথায় চলে গেল—সেই মায়ের অভাবে হঠাৎ আমরা অনুভব করলাম অনেকখানি খালি হয়ে গিয়েচে জীবনের। ঘরের মধ্যে যেমন প্রকাণ্ড ঘরজোড়া খাট থাকে, আজন্ম তার ওপর শুয়েচি, বসেচি, খেলেচি, ঘুমিয়েচি, সর্ব্বদা কে ভাবে তার অস্তিত্ব, আছে তো আছে। হঠাৎ এক দিন খাটখানা ঘরে নেই—ঘরের সে পরিচিত চেহারা একেবারে বদলে গিয়েচে—সে ঘরই যেন নয়, এক দিনে ঘরের সে নিবিড় সুপরিচিত নিজস্বতা কোথায় হারিয়ে গেল, তখন বোঝা যায় ঘরের কতখানি জায়গা জুড়ে কি গভীর আত্মীয়তায় ওর সঙ্গে আবদ্ধ ছিল সেই চিরপরিচিত একঘেয়ে সেকেলে খাটখানা—ঘরের বিরাট ফাঁকা আর কিছু দিয়েই পূর্ণ হবার নয়।

সীতার ধৈর্য্যের বাঁধ এবার ভাঙলো। সে ছোট মেয়ের মত কেঁদে আবদার ক'রে যেন মাকে জড়িয়ে থাকতে চায়। মা আর সে দু-জনে মিলে এই সংসারে সকালে সন্ধ্যায় দু-বেলা খেটে দুঃখের মধ্যে দিয়ে পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসেছিল—সে-সব দিনের দুঃখের সঙ্গিনী হিসাবে মা আমাদের চেয়েও ওর কাছে বেশী আপন, বেশী ঘনিষ্ঠ—অভাগী এত দিনে সত্যি সত্যি নিঃসঙ্গ হ'ল সংসারে। ওর স্বামী যে ওর কেউ নয়, সে আমার বুঝতে দেরি হয় নি এতটুকু। কিন্তু ও হয়ত এখনও তা বোঝে নি।

দিন-দুই পরে বৌদিদি দুপুরবেলায় ওদের রান্নাঘরে একটা ঘড়া আনতে গিয়েচেন। জ্যাঠাইমা বলেচেন—ওখানে দাঁড়াও, দাওয়াটাতে—অমনি হুট ক'রে ঘরে ঢুকলে যে?

বৌদিদি অবাক্ হয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েচেন,

জ্যাঠাইমা ঘড়া বার ক'রে দিয়েচেন দাওয়াতে। বৌদিদি নিয়ে এসেচে। কিন্তু বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা কি, বুদ্ধিমতী মেয়ে হ'লে তখনই বুঝত।

এ-কথা তখন সে কাউকে বলে নি।

পরদিন মেজকাকা আমায় ডেকে বললেন—একটা কথা আছে শোন। তোমার মায়ের কাজটা এখানে না ক'রে অন্য জায়গায় গিয়ে করো। মানে তোমার দাদার বৌয়ের এখানে তো পাকস্পর্শ হয় নি, বড়দাদাও নেই বাড়ি—এ-অবস্থায় শ্রাদ্ধের সময় কেউ খেতে আসবে না। তোমার দাদার বৌকে আমরা সে-ভাবে ঘরে তো নিই নি? এই বুঝে যা হয় ব্যবস্থা করো। ব'লো তোমার দাদাকে।

তলায় তলায় এরা সীতার স্বামী গোপেশ্বরকে কি পরামর্শ দিয়েচেন জানি নে, সে হঠাৎ বেঁকে দাঁড়িয়ে বললে চতুর্থীর শ্রাদ্ধ সীতাকে বাড়ি নিয়ে গিয়েই করবে—অথচ আগে ঠিক হয়েছিল চতুর্থীর শ্রাদ্ধ এখানেই হবে। কালই শ্রাদ্ধের দিন, সুতরাং আজই সে সীতাকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত হ'ল। এর কোনও দরকার ছিল না, সীতা এখানে শ্রাদ্ধ করলে তাতে কোনো দোষ সমাজের মতেও হবা'র কথা নয়—কিন্তু সে কিছুতেই কথা শুনলে না। এই অবস্থায় বৌদিদিকে পেয়ে সীতা অনেকটা সান্ত্বনা পেয়েছিল—কিন্তু সে ওদের সইল না। বৌদিদির সঙ্গে সীতার বেশী মেশামেশিটা যেন গোড়া থেকেই আমার ভগ্নীপতি পছন্দ করে নি। নিজেই হোক্ আর ওদের পরামর্শেই হোক্।

যাবার সময় সীতা বৌদিদির গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগল। আমায় আড়ালে বললে—ছোড়দা আমায় বনবাসে ফেলে রেখে ভুলে থেকো না যেন, মাঝে মাঝে আসবে বল? আর শোনো, বৌদি বড্ড ভালমানুষ, ও এখনও জানে না যে ওর জন্যেই মায়ের কাজ এখানে করতে দিচ্চে না ওরা। এ-কথা যেন বৌদিদির কানে না যায়, ব'লে দিও দাদাকে।

বৌদিদিকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল এখানে শ্রাদ্ধ করতে খরচ বেশী পড়বে, কারণ জ্যাঠামশায়দের নাম বেশী, লোকজন নিমন্ত্রণ করতে হয় অনেক। গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধের কাজ করলে অনেক কম খরচ হবে। বৌদিদি তাই বুঝে গেল।

যাবার সময় আমাদের ঘরের চাবীটা ছোটকাকীমার হাতে দিয়ে বললুম—এ-বাড়িতে আর কাউকে আপন ব'লে জানি নে, কাকীমা। সীতার খোঁজখবর মাঝে মাঝে একটু নিও—ওর তো এ-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক একরকম মিটেই গেল।

ছোটকাকীমার চোখে জল এল। বললেন—আমার কোন ক্ষমতা নাই, নইলে নিতুর বৌকে এ-বাড়ি থেকে আজকে অন্য জায়গায় যেতে বলে?

আমি বললুম—সে-কথা ব'লো না কাকীমা। আমরা এখানে এসেছিলাম প্রার্থী হয়ে, পরের দয়ার উপর নির্ভর করে। এখানে কোন অধিকার নেই আমাদের।

কাকীমা বললেন—তুই ওকি কথা বলচিস্ জিতু? এ তোদের যে সাতপুরুষের ভিটে। জায়গা-জমি আর দুখানা ইট থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? এ ভিটেতে হারুর কি যোগেশের যে অধিকার, তোদের দু-ভায়ের অধিকার তার চেয়ে এক চুল কম নয়।

ছোটকাকীমার এক মূর্ত্তি দেখেছিলাম বাল্যে, এ আর এক মূর্ত্তি। এই এক জনই এ-বাড়ির মধ্যে বদলে গিয়েচে একেবারে। গাড়ীতে যেতে যেতে সেই কথাটা বার-বার মনে হচ্ছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

মাস পাঁচ ছয় পরে ঘুরতে ঘুরতে একবার গেলাম দাদার বাড়িতে।

দাদা ছিল না বাড়ি, বৌদিদি বাটনা-মাখা হাতে ছুটে বার হয়ে এল—আমার হাত থেকে পুঁটুলিটা নিয়ে বললে, —এস এস ঠাকুরপো, রদ্দুরে মুখ রাঙা হয়ে গিয়েচে একেবারে। কই, আসবে ব'লে চিঠি দেও নি তো? তা হ'লে একখানা গরুর গাড়ী ষ্টেশনে যেত।

তখনই বৌদিদি চিনি ভিজিয়ে সরবৎ ক'রে নিয়ে এল। বললে—ঠাকুরপো তোমার মায়া নেই শরীরে। এত দেরি ক'রে আসতে হয়? উনি কেবল বলেন তোমার কথা।

বিকেলে দাদা এল। আমায় পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলে। কিসে আমার সুখ-সুবিধে হবে, কিসে আমার

বড় মাছ, ভালটা-মন্দটা খাওয়ানো যাবে, এই যোগাড়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এরা বেশ সুখে আছে। দাদা যা চাইত, তা সে পেয়েচে। সে চিরকালই সংসারী মানুষ, ছেলেপুলে গৃহস্থালী নিয়েই ও সুখী, তাই নিয়েই ও থাকতে ভালবাসে। ছেলেবেলা থেকে দাদাকে দেখে এসেচি, সংসার কিসে গোছালো হবে, কিসে সংসারের দুঃখ ঘুচবে, এই নিয়েই সে ব্যস্ত থাকত। লেখাপড়াই ছেড়ে দিলে আমাদের দু-পয়সা এনে খাওয়াবার জন্যে। কিন্তু পরের বাড়িতে পরের তৈরি ব্যবস্থার গণ্ডীর মধ্যে সেখানে তো কোন স্বাধীনতা ছিল না, কাজেই দাদার সে সাধ তখন মেটে নি। যার জন্যে ওর মন চিরকাল পিপাসিত ছিল, এত দিনে তার সন্ধান মিলেচে, তাই দাদা সুখী। দাদা ও বৌদিদি একই ধরণের মানুষ। নীড় বাঁধবার আগ্রহ ওদের রক্তে মেশানো রয়েচে। বৌদিদির বাপের বাড়ির অবস্থা খারাপই। একান্নবর্ত্তী প্রকাণ্ড পরিবারের মেয়ে সে। তার বাপের বাড়িতে সবাই একসঙ্গে কষ্ট পায়, সবাই ছেঁড়া কাপড় পরে, একঘরে পুরনো লেপকাঁথা পেতে শীতের রাতে তুলো-বেরুনো, ওয়াড়-বিহীন ময়লা লেপ টানাটানি ক'রে ছেলেপুলেরা রাত কাটায়—সব জিনিষই সকলের, নিজের ব'লে বিশেষ কোন ঘরদোরও নেই, তৈজসপত্রও নেই—সেই রকম ঘরে বৌদিদি মানুষ হয়েচে। এতকাল পরে সে এমন কিছু পেয়েচে যাকে সে বলতে পারে এ আমার। এ আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমার ঘরদোর—আর কারও ভাগ নেই এতে। এ অনুভূতি বৌদিদির জীবনে একেবারে নতুন।

দাদা আমায় তার পরদিন সকালে ওর কপির ক্ষেত, শাকের ক্ষেত, দেখিয়ে বেড়ালে। বৌদিদি বললে—শুধু ওদিক দেখলে হবে না ঠাকুরপো, তুমি আমার গোয়াল দেখে যাও ভাই এদিকে। এই দ্যাখো, এই হচ্চে মুংলী। মঙ্গলবারে সন্ধেবেলা ও হয়, ওই সজ্‌নেগাছতলায় তখন গোয়াল ছিল। ও হ'ল, সেই রাতেই বিষম ঝড় ভাই। গোয়ালের চালা তো গেল উড়ে। তার পর এই নতুন গোয়াল হয়েচে এই বোশেখ মাসে। বৌদিদি বাছুরের গলায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললে—বড্ড পয়মন্ত বাছুর, যে-মাসে হ'ল সেই মাসেই ওঁর সেই মনিব আমায় শাঁখা-শাড়ী পাঠিয়ে দিলে, ওঁর দু-টাকা মাইনে বাড়ালে।

দিনকতক যাবার পরে বৌদিদির একটা গুণ দেখলাম, লোককে খাওয়াতে বড় ভালবাসে। অসময়ে কোন ফকির বৈষ্ণব, কি চুড়িওয়ালী বাড়িতে এসে খেতে চাইলে নিজের মুখের ভাত তাদের খাওয়াবে। নিজে সে-বেলাটা হয়ত মুড়ি খেয়ে কাটিয়ে দিলে।

এক দিন একটা ছোক্‌রা কোথা থেকে একখানা ভাঙা খোল ঘাড়ে ক'রে এসে জুটলো। তার মুখে ও গালে কিসের ঘা, কাপড়-চোপড় অতি নোংরা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল। ছ-সাত দিন রইল, দাদাও কিছু বলে না, বৌদিদিও না। আমি এক দিন বৌদিদিকে বললাম—বৌদি, দেখচো না ওর মুখে কিসের ঘা। বাড়ির থালা-গেলাসে ওকে খেতে দিও না। ও ভাল ঘা নয়, ছেলেপুলের বাড়ি, ওকে পাতা কেটে আনতে বললেই তো হয়, তাতেই খাবে। আট দিন পরে ছোকরা চলে গেল। বোধ হয় আরও আট দিন থাকলে দাদা বৌদিদি আপত্তি করত না।

বৌদিদি খাটতে পারে ভূতের মত। ঝি নেই, চাকর নেই, একা হাতে কচি ছেলে মানুষ-করা থেকে সুরু করে ধানসেদ্ধ, কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা, জল-তোলা—সমস্ত কাজই করতে হয়। কোনদিন বিরক্ত হ'তে দেখলাম না সে-জন্যে বৌদিদিকে।

এদের মায়ায় আমিও যেন দিনকতক জড়িয়ে গেলাম। এরকম শান্তির সংসার কতকাল ভোগ করি নি—বোধ হয় চাবাগানেও না, কারণ সেখানে বাবা মাতাল হয়ে রাত্রে ফিরবেন, সে ভয় ছিল। ভেবে দেখ্‌লাম সত্যিকার শান্তি ও আনন্দভরা জীবন আমরা কাকে বলে কোনদিন জানি নি—স্রোতের শেওলার মত বাবা স্ত্রীপুত্র নিয়ে এ-চাবাগানে ও-চাবাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, শেষকালে না-হয় কিছুদিন উমপ্রা' বাগানে ছিলেন—এতে মন আমাদের এক জায়গায় বসতে না-বসতেই আবার অন্য জায়গায় উঠে যেতে হ'ত—এই সব নানা কারণে নিজের ঘর নিজের দেশ, এমন কি নিজের জাতি ব'লে কোন জিনিষ আমাদের ছিল না। তার অভাব যদিও আমরা কোনদিন অনুভব করি নি—অত অল্পবয়সে করবার

কথাও নয়—বিশেষ ক'রে যখন হিমালয় আমাদের সকল অভাবই পূর্ণ করেছিল আমাদের ছেলেবেলাতে।

এখানে সকলের চেয়ে আমার ভাল লেগেচে বৌদিদিকে। আমি বৌদিদির ধরণের মেয়ে কখনও দেখি নি। যা তা জিনিষ দিয়ে বৌদিদিকে খুশী করা যায়, যে-কোন ব্যাপার যত অসম্ভবই হোক্ না কেন—বৌদিদিকে বিশ্বাস করানো যায়, খুব অল্পেই ভয় দেখানো যায়—ঠকিয়ে কোন জিনিষ বৌদিদির কাছ থেকে আদায় করা মোটেই কঠিন নয়। অথচ একটি সহজাত বুদ্ধির সাহায্যে বৌদিদি ঘরকন্না ও সংসার সম্বন্ধে দাদার চেয়েও ভাল বোঝে, বড় কিছু একটা আশা কখনও করে না, ভারি গোছালো, নিজের ধরণে ঠাকুরদেবতার ওপর ভক্তিমতী। কেবল একটা দোষ আমার চোখে বড় লাগে—নিজে যে-সব কুসংস্কার মানে, অপরকেও সেই সব মানতে বাধ্য করবে। অনেক ব্যাপারে দেখলাম ভাবটা এই রকম, আমার সংসারে যত ক্ষণ আছ তত ক্ষণ তোমায় মান্‌তেই হবে, তার পর বাইরে গিয়ে হয় মেনো না-হয় না-মেনো। কড়া কথা ব'লে নয়, মিনতি অনুরোধ ক'রে মানাবে। কড়া কথা বলতে বৌদিদি জানে না—টকের ভাঁজ নেই কোথাও বৌদিদির স্বভাবে, সবটাই মিষ্টি।

সপ্তাহ দুই পরে ওদের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আস্‌বার সময়ে দাদা বললে—শোন্ জিতু, আটঘরার বাড়ি সম্বন্ধে কি করা যাবে, তুই একটা মত দিস্। ছোটকাকীমা ঠিকই বলেচেন—ওবাড়ি আমরা ছাড়বো না। আর একটা কথা শোন্, একটা চাকরি দেখে নে, এরকম ক'রে বেড়াস্ নে। তোর বৌদিদি বলছিল এই বছরেই তোর একটা বিয়ে দিয়ে দিতে। তার পর দুভায়ে ঘরবাড়ি করি আয়, দু-জনে মিলে টাকা আন্‌লে ভাবনা কিসের সংসার চালাবার? সংসারটা বেশ দাঁড়ে তুলতে পারবো এখন। আর দ্যাখ্, পয়সা রোজগার করতে না পারলে, ঘরবাড়ি না থাকলে কি কেউ মানে? নিজের বাড়ি কোথাও একখানা থাকা চাই, নইলে লোকে বড় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে।

দাদার শুধু সংসার আর সংসার। আর লোকে আমার সম্বন্ধে কি ভাবলে না-ভাবলে তাতেই বা আমার কি? লেখাপড়া শিখলে না কিছু না, দাদা যেন কেমন হয়ে গিয়েচে। লোকে কি বলবে সেই ভাবনাতেই আকুল। দাদার ওই সব ছাপোষা গেরস্থালী-ধরণের কথাবার্ত্তায় আমার হাসি পায়, দাদার ওপর কেমন একটা মায়াও হয়।

ভাবলুম, কোথায় যাওয়া যায়? কলকাতায় গিয়ে একটা চাকুরি দেখে নেবো? দাদা যদি তাতেই সুখী হয়, তাই না-হয় করা যাক। আমি নিজে বিয়ে করি আর না-করি, ওদের সংসারে কিছু কিছু সাহায্য করা তো যাবে? নৈহাটির কাছে অনেক পাটের কল আছে, কলকাতায় না গিয়ে সেখানে গেলে কেমন হয়? পাটের কলে শুনেচি চাকুরি জোটানো সহজ।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কলকাতাতেই এলাম। মাস দুই কাটল, একটা মেসে থাকি আর নানা জায়গায় চাকুরির চেষ্টা করি। কোন জায়গাতেই কিছু সুবিধে হয় না।

২

এক দিন রবিবারে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড্ ধরে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর চলে গেছি, দমদমাও প্রায় ছাড়িয়েচি, হঠাৎ বড় বৃষ্টি এল। দৌড়ে একটা বাগানবাড়ির ঘরে আশ্রয় নিলাম। ঘরটাতে বোধ হ'ল বহু দিন কেউ বাস করে নি, ছাদ ভাঙা, মেজের সিমেণ্ট উঠে গিয়েচে। বাগানটাতেও জঙ্গল হয়ে গিয়েচে।

একটা লোক সেই ভাঙা ঘরে বারান্দাটাতে শুয়ে ছিল, বোধ হয় ক'দিন থেকে সেখানে সে বাস করচে, একটা দড়ির আল্‌নায় তার কাপড়-চোপড় টাঙানো। আমায় দেখে লোকটা উঠে বস্‌ল, বললে—এসো বসো বাবা। বেশ ভিজেচ দেখচি বৃষ্টিতে? বসো।

লোকটার বয়েস পঞ্চাশের ওপর, পরনে গেরুয়া আলখেল্লা, দাড়ী-গোঁপ কামানো। আমায় জিগ্যেস্ করলে—তোমার নাম কি বাবা? বাড়ি এই কাছাকাছি বুঝি?

নাম বললাম, সংক্ষেপে পরিচয়ও দিলাম।

বললে—বাবা, ভগবান তোমায় এখানে পাঠিয়েচেন আজ। তুমি বসো, তুমি আমার অতিথি। একটু মিষ্টি খেয়ে জল খাও—

আমি খেতে না চাইলেও লোকটা পীড়াপীড়ি করতে

লাগল। তার পর কথা বলতে বলতে হঠাৎ ডান হাতটা শূন্যে একবার নেড়েই হাত পেতে বললে—এই নাও—

হাতে একটা সন্দেশ।…

আমি ওর দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে আছি দেখে বললে—আর একটা খাবে? এই নাও।

হাত যখন ওঠালে, আমি তখন ভাল ক'রে চেয়েছিলাম, হাতে কিছু ছিল না। শূন্যে হাতখানা বার দুই নেড়ে আমার সামনে যখন পাতলে তখন হাতে আর একটা সন্দেশ। অদ্ভুত ক্ষমতা তো লোকটার! আমার অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল, বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল কিন্তু আমি আর নড়লাম না সেখান থেকে।

লোকটা অনেক গল্প করলে। বললে—আমি গুরুর দর্শন পাই কাশীতে। সে অনেক কথা বাবা। তোমার কাছে বলতে কি আমি বাঘ হ'তে পারি, কুমীর হ'তে পারি। মন্ত্রপড়া জল রেখে দেবো, তার পর আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলে বাঘ কি কুমীর হয়ে যাব—আর একটা পাত্রে জল থাক্‌বে, সেটা ছিটিয়ে দিলে আবার মানুষ হবো। সাতক্ষীরেতে ক'রে দেখিয়েছিলাম, হাকিম উকিল মোক্তার সব উপস্থিত সেখানে—গিয়ে জিগ্যেস্ ক'রে আস্‌তে পার সত্যি না মিথ্যে। আমার নাম চৌধুরী-ঠাকুর—গিয়ে নাম করো।

আমি অবাক হয়ে চৌধুরী-ঠাকুরের কথা শুনছিলাম। এসব কথা আমার অবিশ্বাস হ'ত যদি-না এই মাত্র ওকে খালি-হাতে সন্দেশ আনতে না-দেখতুম। জিগ্যেস্ করলাম—আপনি এখন কি কলকাতায় যাচ্চেন?

—না বাবা। মুরশিদাবাদ জেলায় একটা গাঁয়ে একটি চাঁড়ালের মেয়ে আছে, তার অদ্ভুত সব ক্ষমতা। খাগড়াঘাট থেকে কোশ-দুই তফাতে। তার সঙ্গে দেখা করবো ব'লে বেরিয়েচি।

আমি চাকুরি-বাকুরী খুঁজে নেওয়ার কথা সব ভুলে গেলাম। বললাম—আমায় নিয়ে যাবেন? অবিশ্যি যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়।

চৌধুরী-ঠাকুর কি সহজে রাজী হন, অতিকষ্টে মত করালুম। তার পর মেসে ফিরে জিনিষপত্র নিয়ে এলাম। চৌধুরী-ঠাকুর বললেন—এক কাজ করা যাক্ এস বাবা। আমার হাতে রেলভাড়ার টাকা নেই, এস হাটা যাক্।

আমি বললাম—তা কেন? আমার কাছে টাকা আ[ছে] দু-জনের রেলভাড়া হয়ে যাবে।

চাঁড়াল মেয়েটির কি ক্ষমতা আছে দেখ্‌বার আগ্রহে আ[মি] অধীর হয়ে উঠেচি।

খাগ্‌ড়াঘাট ষ্টেশনে পৌছতে বেলা গেল। ষ্টেশ[ন] থেকে এক মাইল দূরে একটা ছোট মুদির দোকান সেখানে যখন পৌছেচি, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। দোকানে সামনে বটতলায় আমরা আশ্রয় নিলাম। রাত্রে শোবা[র] সময় চৌধুরী-ঠাকুর বললেন, আমার এই দুটো টাকা রে[খে] দাও গে তোমার কাছে! আজকাল আবার হয়ে[ছে] চোর-ছেঁচড়ের উৎপাত। তোমার নিজের টাকা সাবধা[নে] রেখেচ তো?

চৌধুরী-ঠাকুরের ভয় দেখে আমার কৌতুক হ'ল পাড়াগাঁয়ের মানুষ ত হাজার হোক্, পথে বেরুলেই ভ[য়ে] অস্থির। বললাম কোন ভয় নেই, দিন্ আমাকে। এ[ই] দেখুন ঘড়ির পকেটে আমার টাকা রেখেচি, বাই[রে] থেকে বোঝাও যাবে না, এখানে রাখা সব চেয়ে সেফ্—

সকালে একটু বেলায় ঘুম ভাঙলো। উঠে দে[খি] চৌধুরী-ঠাকুর নেই, ঘড়ির পকেটে হাত দিয়ে দে[খি] আমার টাকাও নেই, চৌধুরী-ঠাকুরের গচ্ছিত দুটা টাকা[ও] নেই, নীচের পকেটে পাঁচ-ছ আনার খুচরা পয়সা ছি[ল] তাও নেই।

মানুষকে বিশ্বাস করাও দেখচি বিষম মুস্কিল। ঘণ্টা খানেক কাটল, আমি সেই বটতলাতে বসেই আছি। হা[তে] নাই একটি পয়সা, আচ্ছা বিপদে তো ফেলে গেল লোকটা মুদিটি আমার অবস্থা দেখে শুনে বললে—আমি চাল ডা[ল] দিচ্চি, আপনি রেঁধে খান বাবু। ভদ্রলোকের ছেলে এমন জুয়োচোরের পাল্লায় পড়লেন কি ক'রে? দামের জন্যে ভাব্‌বেন না, হাতে হ'লে পাঠিয়ে দেবেন। মানুষ দেখ্‌লে চিনতে দেরি হয় না, আপনি যা দরকার নিন্ এখা[ন] থেকে। ভাগ্যিস্ আপনার সুটকেসটা নিয়ে যায় নি?

দুপুরের পরে সেখান থেকে রওনা হয়ে পশ্চিম মু[খে] চল্‌লাম। আমার সুট্‌কেসে একটা ভাল টর্চলাই[ট] ছিল, মুদিকে ওর চাল-ডালের বদলে দিতে গেলাম কিছুতে নিলে না। ক্রমশঃ

রাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ইং ১৮৮৯ সাল। সে বৎসর গ্রীষ্মের ছুটির পর আমি দ্বিতীয় বার কটক কলেজে গেছি। দেখি, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের সঙ্গে এক সৌম্যমূর্তি শাদা-পেনটুলেন-চাপকান-পরা এক ছাত্র আমার ব্যাখ্যান শুনছে। এ-পাশে সে-পাশে দৃষ্টি নাই, ধীর ও স্থির। বালকটি কে?

পরে শুনলাম ময়ূরভঞ্জের ভাবী রাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও।

রাজপুত্রই বটে। সুকুমার মুখ আভিজাত্যের অভিমানে মণ্ডিত হয়েছে। মৃদুভাষী, অল্পভাষী, বিনীত, নম্র। কেবল আমি নই, কলেজের অন্য শিক্ষকেরাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

যিনি দু-তিন বছর পরে ময়ূরভঞ্জের রাজা হবেন, তাঁর সঙ্গে ভাব ক'রতে পারলে একটা-না-একটা ভাল চাকরি জুটবে। তাঁর সহপাঠীদের মনে এ চিন্তা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু দেখতাম ব্যাখ্যানের অবকাশে শ্রীরাম ঘরের বাইরে এক আশুদগাছের তলায় দাঁড়িয়েছেন, সেই দু-তিনটি সহপাঠীর সঙ্গে কথা কইছেন, অন্য কোন ছাত্রকে দেখতে পেতাম না। হয়ত তারা কাছে যেতে সঙ্কুচিত হ'ত। আলাপ-বিমুখের কাছে কেহ যায় না।

ওড়িষ্যার বড় নদী, মহানদী। কটকের সাত-আট মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে এর এক শাখা বেরিয়েছে। এই শাখার নাম, কাঠজুড়ি। দক্ষিণে কাঠজুড়ি, উত্তরে মহানদী। এই দুই নদীর মধ্যে ত্রিকোণ ভূমিতে কটক। কলেজ কাঠজুড়ির নিকটে। আমার ও কলেজের অন্য শিক্ষকদের বাসা কলেজের কাছে ছিল। মহানদীর দিকে, কলেজ হ'তে প্রায় দুই মাইল দূরে, একটা গ্রামের নাম তুলসীপুর। সেখানে একটা কুঠীতে শ্রীরাম থাকতেন। গোবিন্দবাবু তাঁর গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। তিনি শ্রীরামকে পুত্রবৎ চোখে চোখে রাখতেন। তাঁর শিক্ষার গুণেও শ্রীরামের স্বভাব মধুর হয়েছিল। তিনি বেশভূষার আড়ম্বর আসতে দেন নি।

কলেজের বাইরে শ্রীরামের সঙ্গে দেখা হ'ত না। এক দিন শুনলাম শ্রীরামকে বিলাত পাঠাবার কথা হ'চ্ছে। দৈবাৎ সেদিন ঘরের বাইরে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, ইংরেজীতে, 'আপনার বিলাত যাবার' কথা শুনছি। প্রজারা বিরক্ত হবে না?' তিনি উত্তর করো়েছিলেন, 'বিরক্ত হবার কারণ দেখি না। যদি কেহ হয়, বিলাত হ'তে ফিরে এলে সে কারণ পাবে না।' বুঝলাম, বালক বটে, বয়স আঠার বছর, কিন্তু দৃঢ়চিত্ত ও পরিণামদর্শী। পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে, বিশেষতঃ ওড়িষ্যায়, সমুদ্রযাত্রা ক'রলে জাতি-নাশের শঙ্কা ছিল।

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের বিলাত যাওয়া হয় নাই। ইং১৮৯০ সালে এফ-এ পাস হ'য়ে কলেজে বি-এ পড়তেও আসতে পারেন নি। দুই বৎসর পরে তাঁকে রাজ্যভার নিতে হবে, এখন রাজকর্ম শিখতে হবে, কলেজে পড়তে আসতে গেলে সে শিক্ষা হবে না। ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদা। তিনি সেখানে থেকে ইং১৮৯০ সালে জুন মাসে আমাকে এক পত্র লেখেন। এই আমাকে তাঁর প্রথম পত্র। তিনি লেখেন, তিনি বাড়ী বস্যে বি-এ পরীক্ষার জন্য প'ড়বার সংকল্প করো়েছেন, বিজ্ঞান শাখা প'ড়বেন। ভূতবিদ্যা (Physics) শিখতে কি কি যন্ত্র কিনতে হবে, তার একটা তালিকা চান। তাঁর এই সংকল্পে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম, এবং যন্ত্র-মূল্যপুস্তকে চিহ্নিত করো় তালিকা পাঠিয়েছিলাম। দিন পনর পরে তিনি দ্বিতীয় পত্রে জানতে চান, আমি তাঁর কাছে যেতে পারব কিনা। নানা কারণে আমি সম্মত হ'তে পারিনি।

কটক কলেজে তখন মোহিনীমোহন ধর, এম-এ, বি-এল, গণিত-বিদ্যার 'লেকচারার' ছিলেন। তাঁর চাকরি বেশী দিন হয় নি। রাজা তাঁকে পত্র লেখেন, এবং মোহিনীবাবু কলেজের কর্ম ছেড়ে দিয়ে রাজার কাছে চল্যে যান। অক্টোবর মাসে রাজা আমাকে লেখেন, তিনি কতক

যন্ত্র কিনেছেন, এবং মোহিনীবাবুকে বারিপদায় নিয়ে গেছেন। তিনি এঁর কাছে গণিত ও ভূতবিদ্যা প'ড়বেন, আইন শিখবেন, এবং বিচারপদ্ধতি জেনে নিবেন। রাজার শিক্ষা সমাপনের পর মোহিনীবাবু ময়ূরভঞ্জের দেওয়ান (প্রধান বিচারপতি) হ'য়ে বারিপদায় র'য়ে গেছলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজাকে অনুমতি দিলেন না, তাঁর বি-এ পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না। কিন্তু বাড়ীতে পাঠ্য বিষয় শিখেছিলেন। একবার রাজা দুঃখ ক'রে আমায় লিখেছিলেন, তাঁর অধিকাংশ সময় রাজকার্যে যাচ্ছে, পড়ার সময় হ'চ্ছে না।

নিসর্গে ও রাষ্ট্রে ওড়িয্যার দুই ভাগ। ব্রাহ্মণী, বৈতরিণী, মহানদী ও মহানদীর শাখার পলি ও বালি দ্বারা বালেশ্বর, কটক, ও পুরী, এই তিন জেলার উৎপত্তি হয়েছে। এই তিন জেলা ওড়িয্যার পূর্বভাগ, পরে সমুদ্র। পশ্চিম ভাগ উন্নতানত, পর্বতময়, অরণ্যময়। ওড়িয্যার তিন ভাগের দুই ভাগ এই রূপ। পূর্বকালে সমুদয় ওড়িয্যা খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। মোগলেরা পূর্ব দিকের সমস্থলী স্বীয় অধিকারে এনেছিল। এই হেতু এই ভাগের নাম মোগলবন্দী হয়েছিল। ব্রিটিশেরা ইং ১৮০৩ সালে মোগলবন্দী দখল করেন। বিষমস্থলীর রাজারা অল্পস্বল্প কর স্বীকারে ব্রিটিশের সহিত সন্ধি করেন। রাজারা এক এক গড়ে থাকতেন। গড়, যৎসামান্ত গিরিদুর্গ। গড়ই তাঁদের রাজধানী। যত রাজ্য, তত গড়। এই কারণে করদরাজ্যগুলির নাম গড়জাত (গড়সমূহ)। ব্রিটিশেরা এই সকল রাজ্যের নাম ওড়িয্যার গড়জাতমহল অথবা করদমহল (Tributary Mahals) রেখেছিলেন। কয়েক বৎসর হ'তে সামন্তরাজ্য (Feudatory States) নাম হয়েছে। ইংরেজ দপ্তরে নাম যাই হ'ক, সাধারণে গড়জাত জানে, গড়ের রাজা স্বীকার করে। এককালে ১৮টি গড় বা রাজ্য ছিল। অধিকাংশ ছোট ছোট। ময়ূরভঞ্জ ও কেঙঝর (ঙ উচ্চারণে ওঁ) সর্বাপেক্ষা বড়। দুই রাজ্যেরই আদি প্রতিষ্ঠাতা ভঞ্জ-বংশ। দুয়েরই লাঞ্ছন ময়ূর।

ব্রিটিশের সহিত সন্ধির পর রাজাদের রাজ্যশাসন ক্ষমতা খর্ব হয়েছে। যখন করদরাজ্য নাম ছিল, তখন ওড়িয্যা-বিভাগের অর্থাৎ বালেশ্বর কটক পুরীর কমিশনার সাহেব গড়জাতের অধ্যক্ষ (Superintendent) ছিলেন। সামন্ত রাজা নাম হবার সঙ্গে এক পৃথক অধ্যক্ষ (Political Agent) নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্রের সময় ময়ূরভঞ্জ ও অন্যান্য গড়ের ব্রিটিশ অধ্যক্ষ, ওড়িয্যার কমিশনার ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি ময়ূরভঞ্জ-রাজ্যাধিকারী, তিনিই রাজা। ইং ১৮৯২ সালে তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজা তাঁর পৈতৃক পদবী। ইং ১৯০৩ সালে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তাঁকে মহারাজা উপাধি দিয়েছিলেন। সেটা উপাধি, তদ্দ্বারা তাঁর পদবৃদ্ধি হয় নি।

২

কটক কলেজে পৃথক বিজ্ঞানশালা ছিল না। এই অভাবহেতু কষ্টের সীমা ছিল না। শ্রীরামচন্দ্র দেখে গেছলেন। এজার (S. Ager) নামে এক সাহেব প্রিন্‌সিপাল ছিলেন। তাঁকে ব'লে ব'লে দেখিয়ে দেখিয়ে কষ্টে ফেলেও গবর্মেণ্টের কাছে চিঠি লেখাতে পারি নি। তিনি টাকা চাইতে ভীত হ'তেন। কলেজের ছাত্র এখন রাজা হয়েছেন, তাঁর কাছে টাকা চাইতে লজ্জা কি? তাড়াতাড়ি একটা বিজ্ঞানশালার চিত্র লিখে নির্মাণব্যয় ১৮,০০০৲ নিরূপিত হ'ল। রাজাকে প্রার্থনামাত্র তিনি টাকা দিতে সম্মত হ'লেন। অবশ্য প্রিন্‌সিপাল পত্র লিখেছিলেন। সরকারী ইঞ্জিনিয়ার সে-টাকায় গৃহনির্মাণ করিয়ে দিলেন। তখনকার পক্ষে সে গৃহ যথেষ্ট হয়েছিল।

রাজা হবার পাঁচ-সাত বৎসর পরে শ্রীরামচন্দ্র কটক এসেছিলেন। তিনি এসেছেন জানলে দেখা ক'রতে যেতাম। জানলাম তাঁরই নিমন্ত্রণে, রাত্রে ভোজনের নিমন্ত্রণ। সেবারে তিনি মহানদীর তীরে একটা কুঠীতে ছিলেন, আমাদের পাড়া হ'তে দেড় মাইল দূরে। তখন নীলকণ্ঠ মজুমদার কলেজের প্রিন্‌সিপাল। তিনিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁর বেরতে দেরি হ'ল, ঘোড়ার গাড়ীর অশ্বযুগলও যেতে দেরি ক'রলে। প্রায় রাত্রি ৯টার সময় কুঠীতে পঁহুছিলাম। দেখি, একটা বড় ঘরে গালিচা পাতা, কটকের গণ্যমান্য পদস্থ বিশ-পঁচিশ জন বসেছেন, রাজা ঘরের মাঝে, আর সাত-আট জন তাঁকে ঘিরে বসেছেন। সে ব্যূহ ভেদ করা আমার কঠিন, তাঁরও কঠিন। রাজা

একটা ছোট যাত্রাদল, বোধ হয় বালেশ্বর হ'তে, নিয়ে এসেছিলেন। তারা সেখানেই ছিল। কিন্তু কে তাদের অভিনয় দেখে, রাজার সহিত বাক্যালাপ করো অধিক মনোরঞ্জন হ'চ্ছিল। একটু পরে রাজা উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে ভোজনের আসনে যেতে আহ্বান ক'রলেন। ঘরের পেছু, মহানদীর দিকে বারাণ্ডায় আসন। আসন, ভোজ্য-পাত্র, আচমন-পাত্র প্রভৃতি দেখে বুঝলাম রাজা সে-সব গড় হ'তে আনিয়েছেন, পাচক পরিচারক গড় হ'তে এসেছে। ভোজন সমাপন ও আচমন হ'য়ে গেল। একে একে উঠতে লাগলেন। দেখলাম পাশের এক ঘর দিয়ে পথ। রাজার পরণে কোঁচানা ধুতি, গায়ে শাদা কোট, বা কাঁধে কোঁচানা উড়ানী। তিনি দ্বারে দাঁড়িয়ে, পাশে এক পরিচারকের হাতে একটা বড় থালায় বেলফুলের মালা, আর এক পরিচারকের হাতে চন্দনের বাটি। যিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন, রাজা তাঁর কপালে চন্দনের তিলক, গলায় মালা দিয়ে করমর্দন ক'রছেন। আমার পালা প'ড়ল। আমি ভাবছি, দেখি শ্রীরাম কি করেন। তিনি ক্ষণমাত্র স্থির থেকে ব'ললেন, 'আমরা এখন বন্ধু' (We now meet as friends), আমিও হেসে ব'ললাম, 'নিশ্চয়' (certainly)। তথাপি হাত বাড়াতে পারলেন না, আমাকেই বাড়াতে হ'ল। তাঁর এই ব্যবহার স্মরণ হ'লে আজিও আমার আনন্দ হয়। কি বা পরিচয়, কিছুই নয়। কলেজ-ঘরে চল্লিশ-পঞ্চাশ ছাত্রের সঙ্গে তিনি ব'সতেন, ব্যাখ্যান শুনতেন, চল্যে যেতেন। ঘরের বাইরে এক দিন দু-তিন মিনিটের কথা হয়েছিল। এইটুকু আলাপ। তখন আমার বয়স ত্রিশ, গুরু মানাবার বয়স নয়। আমাদের দেশের গুরুভক্তির তুলনা নাই।

সেকালের একটা শিষ্টাচার এখন বাংলা দেশ হ'তে লুপ্ত হ'তে বস্যেছে। উত্তরীয় বিনা রাজা হ'ন, প্রজা হ'ন, কেহ কান ভদ্রলোকের সহিত দেখা ক'রতেন না। গায়ে কিছু নাই, কিন্তু কাঁধে উত্তরীয় থাকত। নিজের বাড়ীতে উত্তরীয় বিনা দেখা দিতেন না। ওড়িয়ায় এই রীতি সর্বদা দেখতে পেতাম, প্রশংসাও ক'রতাম। রাজার গায়ে কোট ছিল, কিন্তু সে কোট পর্য্যাপ্ত নয়, উড়ানী না থাকলে ভদ্রলোকদিকে অসম্মান করা হ'ত।

কয়েক বছর পরের কথা। এক দিন বিকালবেলা আমি বেড়াতে বেড়াতে মধুসূদন দাস-মশায়ের বাড়ীর সম্মুখের পথ দিয়ে পূর্বমুখে যাচ্ছিলাম। দেখি, রাজা সে পথে হেঁটে কোথায় আসছেন। পেছুতে এক চাকর। কোঁচানা ধুতি, গায়ে শাদা কোট, বা কাঁধে কোঁচানা উড়ানী। কাছে এলে তিনি ডান হাত তুলে নমস্কার ক'রলেন, আমিও ক'রলাম। 'কবে এলেন' জিজ্ঞাসা ক'রতে যাচ্ছি, তাঁর কোটের দিকে চোখ প'ড়ল। শাদা ছ-আনা গজের জিনের কোট, তারও স্থানে স্থানে সূতা বেরিয়ে পড়্যেছে। বা পাশের পকেটের কাছে মনে হ'ল তালি দেওয়া। আমি বিস্মিত হ'য়ে কুশল প্রশ্ন ক'রতে ভুলে গেলাম। ব'ললাম, 'রাজা, আপনার কোটটি পুরানা হয়ে গেছে। দেখলে লোকে কি ব'লবে।' তিনি একটু হেসে পকেটের দিকে দৃষ্টি রেখে ব'ললেন, 'নাঃ। তত পুরানা হয় নি।' পথে দাঁড়িয়ে অপর কথা হ'ল না, তিনি চল্যে গেলেন। আমি ভাবলাম, রাজা কি কৃপণ হয়েছেন, জীর্ণ কোটকে ব'লছেন জীর্ণ হয় নি! বোধ হয় তিন মাইল দূরে রেল ষ্টেশন হ'তে হেঁটে আসছিলেন। কথাটা মনে রইল।

এর বছর-খানেক পরে রাজা তাঁর কয়েক জন উচ্চ কর্মচারী সঙ্গে ল'য়ে কটক এসেছিলেন। আমার জানবার সম্ভাবনা ছিল না। সে সময় এক দিন সন্ধ্যার পর মোহিনীবাবু ও আর এক উচ্চ কর্মচারী দেখা ক'রতে আমার বাসায় এসেছিলেন। অনেক কাল পরে দেখা, এ-কথা সে-কথা নানা কথা হ'তে লাগল। হঠাৎ সে কোটের দশা মনে প'ড়ল। আমি মোহিনীবাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "আপনি রাজাকে অনেক দিন দেখছেন, মানুষটি কেমন?" তাঁরা দুজনেই ব'ল্যে উঠলেন, "মানুষ কেমন আর কি? আমরা প্রভু, কি তিনি প্রভু, আমরা বুঝতে পারি না।"

"রাজা বুঝি অলস, আপনাদের কাজ দেখেন না।"

"অলস একটুকু ন'ন, ঘড়ির কাঁটা। কাজকম সব দেখেন, সব বুঝেন। কিন্তু কিছু বলেন না। আমাদের বিপদ এই। প্রাণপণে যথাসাধ্য ক'রতে হয়।"

"মোহিনী বাবু, আপনি যাই বলুন, রাজাটি দারুণ কৃপণ।"

তাঁরা বুঝতে পারলেন না, আমি কোর্টের বর্ণনা ক'রলাম। তখন তাঁরা হেসে উঠলেন, আর বললেন, "যদি তাঁর খাস কামরা দেখতেন, আপনি ঢুকতে চাইতেন না। দুখানা চেয়ার, কোন্‌খানা ভাল, তা দেখতে সময় লাগবে। টেবিলের চাদরে কালীর দাগ, এক কোণ ছেঁড়া। নিজের কাপড়চোপড় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।"

"আপনার এজলাসের দশাও কি ঐ রকম?"

"আমার এজলাস ব্রিটিশ জজকোর্ট অপেক্ষা কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট নয়, বরং কোন কোন বিষয়ে ভাল।"

"তাহ'লে দেখছি, আপনিও বিগড়ে গেছেন। আপনি বসেন সুসজ্জিত ঘরে, আর আপনার রাজা যে ঘরে বসেন সে ঘরে আপনার কেরানীও ব'সতে চাইবে না। রাজাকে এই বিসদৃশ বলেন না কেন?"

"অনেকবার বল্যেছি, হার মেনেছি। তিনি বলেন, পদগৌরবের যোগ্য ঘর ও যোগ্য সজ্জা চাই। তাঁর নিজের ওতেই চল্যে যাচ্ছে।"

"চল্যে যাচ্ছে বটে, চেনা বামুনের পইতার দরকার হয় না। তবু। রাজা কি বই প'ড়তে ভালবাসেন?"

"দর্শনের বই।"

এতক্ষণে বুঝলাম, রাজা দর্শন-জ্ঞান নিজের চরিতে ফলাতে চান। তিনি ব্যসন-মুক্ত।

পরদিন বৈকালে রাজার সহিত দেখা ক'রতে গেলাম। পথেই দেখা হ'ল, তিনি হেঁটে কোথায় যাচ্ছিলেন। সঙ্গে এক জন চাকরও নাই। সেই নমস্কার। দু-এক কথার পর আমি ব'ললাম, 'রাজা, আপনার মন্ত্রীরা আপনার অত্যন্ত অনুগত, অনেক চেষ্টা করেও আপনার নিন্দা করাতে পারি নি।' রাজা তৎক্ষণাৎ উত্তর ক'রলেন, আমি আমার কর্মচারী-সংগ্রহণে ভাগ্যবান্ (I am very fortunate in the choice of my officers)। কথাটা সত্য, যেমন প্রভু তেমন সেবক।

আমি রাজার সহিত কদাচিৎ পত্র-ব্যবহার ক'রতাম, কদাচিৎ দেখা ক'রতাম। যখন ক'রতাম, তখন তাঁর রাজ্যের উন্নতি কামনা ক'রতাম, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছা ক'রতাম। আর, আমার কি এক স্বভাব ছিল, আমি আমার ছাত্রদিকে বালক মনে ক'রতাম। তিনি রাজা হন, মহারাজা হ'ন, শ্রীরামচন্দ্রকে বালক মনে ক'রতাম। তিনি মহারাজা হবার পরেও তাঁকে রাজা সম্বোধন ক'রতাম। পত্রে ও আলাপে কখনও কখনও তাঁর বিবেচনার দোষ দেখাতাম। কিন্তু তিনি ধীরভাবে উত্তর ক'রতেন। আলাপের সময় আক্ষেপ একটু গুরুতর দেখলে তিনি ইংরেজীতে উত্তর ক'রতেন। তাঁর দু-একখানা উত্তর আমার পুরানা কাগজপত্রের মধ্যে পড়্যে ছিল। একখানা দেখছি, ইং ১৯০২ সালে মার্চ মাসে লিখেছিলেন। ভাবে বুঝছি, রাণীর অকালে স্বর্গপ্রাপ্তির সংবাদে তাঁকে সান্ত্বনা করেছিলাম। পত্রখানি প্রতিপত্র। দারুণ শোকের সময় লোকের কপট সভ্যতা থাকে না। তখন অন্তরের গূঢ় বাসনা মনে আসে। পত্রখানিতে তাঁর প্রগাঢ় ধর্মভাব পরিস্ফুট ছিল। তখন তাঁর বয়স একত্রিশ বৎসর।

৩

অনেকে জানেন মিষ্টার পি-এন বোস (প্রমথনাথ বসু, প্রায় এক বৎসর স্বর্গগত) ময়ূরভঞ্জে লোহার আকর আবিষ্কার করেছিলেন, এবং সে আবিষ্কারের ফলে টাটা-কোম্পানীর বিপুল কারখানার উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু অনেকে জানেন না, বসু-মশায় কি সূত্রে ময়ূরভঞ্জে এসেছিলেন। বসু-মশায়ও আদি বৃত্তান্ত জানতেন না। তিনি ইং ১৯০৩ সালে নভেম্বর মাসে গবর্মেণ্ট ভূবিদ্যা-বিভাগের কর্ম হ'তে অব্যাহতি পেয়েছিলেন, ডিসেম্বর মাসে রাজার ভূবিদ্যাবিৎ হয়েছিলেন। তার পর ময়ূরভঞ্জের গোরুমহিষানি পাহাড়ে লোহার আকর দেখতে পান।

আদি বৃত্তান্ত একটু লিখি। ইং ১৯০১ সালের জানুআরি মাসে মধুসূদন দাস-মশায়ের উদ্যোগে কটকে ওড়িষ্যার শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনী হয়। এইটি প্রথম। সে সময়ে রাজা কটক এসেছিলেন। উদ্যোক্তারা রাজাকে ও আমাকে এক দ্রব্য-জাতের ভালমন্দ বিচারক করেছিলেন। ১২টার সময় যেতে হবে, আমি একটু আগে যেয়ে সব দ্রব্য একবার দেখে রাখলাম। প্রায় পনর আনা নানা গড় হ'তে এসেছে। একস্থানে চার হাঁড়ী কাল গুঁড়া মাটি ছিল।

মাটি কোথা হ'তে এসেছে, তাতে কি আছে, জেনে রাখলাম। ১২টার সময় রাজা এলেন। তাঁর সঙ্গে আবার সব দেখতে লাগলাম। নানা প্রকার বস্ত্র, লোহার অস্ত্রশস্ত্র, পিতল-কাঁসার তৈজসপাত্র ইত্যাদি ছিল। ময়ূরভঞ্জ হ'তেও এসেছিল। আমরা এক একটি দেখি গুণপণার প্রশংসা করি। এক একটা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমাদের, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর, বর্তমান চোখে সব সুন্দর নয়, কিন্তু কত কালের উদ্যমে ও সাধনে কলার তেমন উৎকর্ষ হয়েছে! আমি রাজাকে এক একটা দেখাই, আর বলি, 'রাজা, এই যে কলা, একি লুপ্ত হবে? এই যে কৌশল, একে একটু নূতন পথে চালিয়ে দিবার কেহ নাই কি?' দ্রব্যগুলি রাজার কাছে নূতন ছিল না, কিন্তু তিনি গুণপণা ভেবে দেখেন নি। পরে সেই চার হাঁড়ীর কাছে এলাম। একটু কৌতুক ক'রে রাজাকে ব'ললাম, 'রাজা, গড়জাতী বুদ্ধি দেখেছেন, মাটি পাঠিয়েছে!' রাজাও দেখলেন মাটি। একটা হাঁড়ী তুলে ব'ললেন, 'ভারী ঠেকছে, মাটিতে কিছু থাকবে।' 'এক হাঁড়ী মাটি, ভারী ত হবেই।' কিছু মাটি নিয়ে দেখালাম, সোনার আঁষ চিক্‌চিক ক'রছে। কেরানী কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, 'বল ত কোথা হ'তে এসেছে।' 'এই দু-হাঁড়ী ময়ূরভঞ্জ হ'তে, এই দু-হাঁড়ী অমুক গড় হ'তে।' সোনা ও ময়ূরভঞ্জের নাম শুনে রাজার আগ্রহ হ'ল, জায়গার নাম শুনে বিশ্বাস হ'ল। 'তাই ত, সেখানে সোনা পাওয়া যায়, আমি জানতাম না।' 'কে জানবে? ময়ূরভঞ্জ রাজ্য আপনার। আমার মনে ক'রলেও আপনার ক্ষতি হবে না।' রাজা অবশ্য মর্ম বুঝলেন।

এর প্রায় পাঁচ-ছয় মাস পূর্ব হ'তে আমি কুম্ভকলা জানতে বস্যেছিলাম। আমি তখন বাসায় কুম্ভকার। এই কাজের নিমিত্ত একটা পাথর খুজছিলাম। পাথরটা ইংরেজীতে ফেল্‌স্‌পার (felspar), বোধ হয় সংস্কৃত নাম চপল। কটকের নিকটের পাহাড়ে পেলাম না। তালচেরের রাজাকে (বর্তমান রাজা), কেঁওঝরের মহারাজা ও ময়ূরভঞ্জের রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে প্রার্থনাপত্র লিখলাম, তাঁদের রাজ্যে যত রকম পাথর আছে অনুগ্রহ করে্য এক এক টুকরা পাঠিয়ে দিবেন। সংক্ষেপে বাহ্যলক্ষণ দিয়েছিলাম। তথাপি এই বুদ্ধি ক'রতে হয়েছিল। কারণ, থাকলে দেশী নাম থাকবে, সে নাম আমি জানি না, সকলে বাহ্যলক্ষণ বুঝবে না, নমুনা পাঠালে খাঁটি কিলাস (crystal) খুজবে, না পেলে 'নাই' ব'লবে। ইং ১৯০১ সালের মার্চ মাসে পত্র লিখি। তিন চার মাস মধ্যে তালচের ও কেঁওঝর পাথরের অনেক টুকরা পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু একটাও চপল নয়। রাজা শ্রীরামচন্দ্র আমার পত্র পেয়েই লিখলেন, তিনি এক ভূবিদ্যাবিৎ দ্বারা ময়ূরভঞ্জের কিয়দংশ পর্যবেক্ষণ করিয়েছেন, কিন্তু কাজ ভাল হয় নাই, স্থগিত রাখতে হয়েছে, অবসর পেলেই আবার করাবেন। আরও লিখলেন, তাঁর এক শিলা-সংগ্রহ আছে, আমার দেখবার তরে তিনি সেটি পাঠাতে পারেন, কিন্তু দিতে পারবেন না। আমি পত্র পেয়ে আহ্লাদিত হ'লাম, শিলা-সংগ্রহ পাঠিয়ে দিতে লিখলাম। রাজা লিখলেন, 'তাই ত। খুজে পাচ্ছি না। কোথায় গেল, কেউ ব'লতে পারছে না। মোহিনীবাবু জানতে পারেন, তাঁকে লিখবেন।' মোহিনীবাবুকে লিখলাম, তিনি শিলা-সংগ্রহ দেখেন নি, পাথর-টাথর চিনেন না। তিনি অরণ্য-বিভাগের এক কর্মচারীকে পরোয়না পাঠালেন, আমার যখন যে পাথর দরকার হবে, তিনি পাঠিয়ে দিবেন। অগত্যা আমাকে এঁকে পত্র লিখতে হ'ল, কিন্তু ছ-মাস পরে ইনি সেরখানেক ওজনের স্ফটিকের একটা কিলাস পাঠিয়ে দিলেন! আমি হতাশ হয়ে আক্ষেপ করে্য রাজাকে লিখলাম, 'রাজা, আপনার রাজ্যে কোথায় কি আছে, কেহ জানে না, চিনে না।'

সে বৎসর বোধ হয় এপ্রিল মাসে, টি-চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসেন। কথায় বুঝলাম, রাজা এঁকেই শিলা-সংগ্রহে নিযুক্ত করে্যছিলেন। এঁর লম্বা লম্বা কথা শুনে আমার শ্রদ্ধা হ'ল না। ইনি সীসার আকর, 'গেলিনা'র (Galena) কিলাস দেখালেন, ময়ূরভঞ্জে পেয়েছেন। আমার বিশ্বাস হ'ল না। রাজা মূর্খ নহেন যে এই আবিষ্কারের মূল্য বুঝতে পারেন নাই। চৌধুরী-মশায়ের ইচ্ছা আমি রাজাকে পত্র লিখি, ইনি যোগ্য লোক, এঁকে রাখলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আমি অবশ্য লিখলাম না।

সে সময়ে আমি বালেশ্বরের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুরের নিকট হ'তে পোয়াটাক ভারী একটা কাল-পাথর

পেয়েছিলাম। তাতেও আমার খানিক কাজ চ'লতে পারত। পত্র লিখে জানলাম রাজা বাহাদুর রাজা শ্রীরামচন্দ্রের এক আলমারিতে পেয়েছিলেন। রাজাকে পত্র লিখলাম, তিনি কিছুই জানেন না। দৈবক্রমে কিছুদিন পরে দুই রাজা কটকে এসেছিলেন, একত্র ছিলেন। আমি পাথরটি নিয়ে চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন ক'রতে গেলাম। রাজা শ্রীরামচন্দ্র বলেন, তিনি সে পাথর কখনও দেখেন নি; রাজা বৈকুণ্ঠনাথ বলেন, অমুক ঘরের অমুক আলমারিতে ছিল। খানিক ক্ষণ তর্কাতর্কির পর আমি রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে ব'ললাম, 'রাজা, আপনার কত শিলা হারিয়ে যাচ্ছে, আপনি দেখছেন না।' (পাথরটা আমায় ভারি ভুগিয়েছিল। বস্তুতঃ সেটা কৃত্রিম কাচ)।

রাজা গড়ে যেয়ে মাসখানেক পরে আমাকে পত্র লিখলেন, তিনি ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের কাছে এক জন ভূবিদ্যা-প্রাজ্ঞ চেয়েছিলেন, কিন্তু গবর্মেণ্ট কাকেও দিতে পারেন না, সম্প্রতি কেহ উদ্‌বৃত্ত নাই। প্রমথনাথ বসু-মশায় রাজার পত্র দেখে থাকবেন, এবং সরকারী কর্ম হ'তে অবসর পেয়েই ময়ূরভঞ্জে এসেছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি, লোহার আকর আবিষ্কার ক'রতে তাঁকে তেমন কষ্ট ক'রতে হয় নি। পূর্বে ওড়িশ্যার তিন চার রাজ্যে আকর হ'তে লোহা কাড়া হ'ত; ময়ূরভঞ্জ হ'তেও হ'ত। কোথায় হ'ত, বসু-মশায় দেখতে পান। বিলাতী লোহা এলে এদেশের লোহার নাম দেশী লোহা হয়েছিল। দেশী লোহা 'টান লোহা', এর আদর ছিল। কামারকে কাটারী গ'ড়তে দিলে সে দেশী লোহা দিয়ে কাটারীর ধার ক'রত। কেঙঝরের দেশী লোহায় সেতারের তার হ'ত, কটকে কিনতে পাওয়া যেত। নিজাম হায়দারাবাদের তার উৎকৃষ্ট ছিল। অনেক কাল পর্যন্ত তালচের রাজ্যে ও বামড়া রাজ্যে দেশী লোহা পাওয়া যেত। এই বাঁকুড়া জেলায় লোহার নামে এক জাতি আছে। তারা জানে না, তাদের পূর্বপুরুষ দেশে লোহা যোগাত। সস্তা বিলাতী কাপড় এসে তাঁতীর অন্ন মেরেছে, সস্তা বিলাতী লোহা এসে লোহারের অন্ন মেরেছে।

৪

রাজা শ্রীরামচন্দ্র ময়ূরভঞ্জে নূতন নূতন কলা প্রতিষ্ঠা ক'রতে উৎসাহী ছিলেন। আমি দুইটার বৃত্তান্ত জানি। কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে দুইটাই বিফল হয়েছিল। ইং ১৯০৬ সালে কটক কলেজ হ'তে কৈলাসচন্দ্র ভরতকার বি-এ পাস হয়ে জাপানে কলা শিখতে ইচ্ছুক হ'ল। আমি তাকে কলিকাতার Industrial and Scientific Association হ'তে জাপানে শিক্ষাযোগ্য কলা, কলাশালায় প্রবেশের কাল, শিখবার সুবিধা অসুবিধা জানতে পাঠালাম। উক্ত সভা ভরতকারকে জাপানে যাবার জাহাজ-ভাড়া দিতে সম্মত হ'লেন, কিন্তু জ্ঞাতব্য সম্বন্ধে কিছুই ব'লতে পারলেন না। ভরতকার ময়ূরভঞ্জের প্রজা, কিমিতি (Chemistry) বিদ্যায় বি-এ পাস। তার বুদ্ধিশুদ্ধিও মন্দ ছিল না। আমি রাজাকে পত্র লিখলাম। তিনি জাপানে থাকবার খরচ দিতে সম্মত হ'লেন। জাপান যাবার আগে আমি ভরতকারকে বুঝিয়ে দিলাম, 'বড় কলার দিকে যাবে না, সৌখীন কলার দিকেও যাবে না, একটা ছোট লৌহ-কলা শিখে আসবে। লোহার তারের পেরেক কিনছি, তুমি ফিরে এসে এই রকম পেরেক দিও।' আমার বিশ্বাস ছিল, এই নির্মাণ অল্পব্যয়ে হ'তে পারবে, রাজাও টাকা দিবেন। ভরতকার জাপানে যেয়ে লিখলে, কলাশালায় প্রবেশের কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, জাপানী ভাষা শিখতেও ছ-মাস লাগবে, শুধু বসে না থেকে সে কৃষিবিদ্যা কলেজে ঢুকতে চায়, সেখানে তখনও ছাত্র নিতে পারে। আমি পত্র পড়ে হতাশ হলাম, তার জাপান যাওয়া বৃথা, রাজার টাকা খরচও বৃথা হ'ল। দু-বছরের পর আরও দু-মাস থেকে ভরতকার ফিরে এল। রাজার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল জানি না। আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এল। আমার জানা ছিল, তার বিদ্যা কোনও কাজেই আসবে না। কথাবার্তায় তাই বুঝলাম। সে চীনি ক'রতে শিখে এসেছে, রাজা কারখানা খুলতে টাকা দিতে চান না। রাজা তাকে একটা চাকরি দিতে চান, জমি নিরিখের কাজ, সে-কাজ সবাই পারে, ইত্যাদি। ময়ূরভঞ্জ আখচাষের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না, কেমনে চীনি হবে? একথারও উত্তর নাই। তথাপি রাজাকে লিখলাম, ভরতকার যে-বিদ্যা শিখে এসেছে, সে-বিদ্যার ফলভাগী হওয়া উচিত। আমি রাজার উত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'লাম। তিনি লিখলেন, যার জ্ঞানের

পরিচয় নাই, কর্মসামর্থ্য জানা নাই, তাকে রাজকোষ হ'তে লক্ষ টাকা দেওয়া উচিত হবে না। তিনি ঠিক লিখেছেন। ভরতকার আমাকে এত টাকার কথা বলে নি। দুঃখের বিষয়, এর বছরখানেক পরে ভরতকার হঠাৎ মারা যায়।

আর এক কাজে রাজা আমার পরামর্শ চেয়েছিলেন। আমি প্রকারান্তরে নিরস্ত হ'তে বল্যেছিলাম, কিন্তু তিনি শুনেন নি। সাল মনে প'ড়ছে না। এক দিন সকালবেলা দেখি, যোগেশ উপস্থিত। তার পুরা নাম অবিকল আমার নাম। যোগেশ রাজার সঙ্গে প'ড়ত, পরে রাজার এক প্রাইভেট সেক্রেটরী হয়েছিল। পদের ওড়িয়া নাম ব'লতে হ'লে, ছামুবেবর্তা (সম্মুখ ব্যবহর্তা)। 'কেন এসেছ?' 'রাজা তাঁতীশালা খুলবেন, সেখানে কি শেখানা উচিত, ক মাসে শেখাতে পারা যাবে, ইত্যাদি জানতে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।' আমি অবস্থা বুঝলাম। 'রাজা বেশ লোকের কাছে পাঠিয়েছেন! আমি তাঁত-টাঁত জানি না। চিঠি লিখলে এত কষ্ট করো আসতে হ'ত না।'

যোগেশ এত স্পষ্ট কথা মানলে না। প্রত্যহ আসতে লাগল, মনে ক'রলে আমার অবসর হ'লে আমি শিক্ষাক্রম লিখে দিব। এক দিন শনিবার, সন্ধ্যার পর আসতে ব'ললাম। নিকটে মধুসূদন রাও-মশায়ের বাসায় ছিল, সন্ধ্যার পর এল। আমি ব'ললাম, 'দেখ যোগেশ, আমার বিশ্বাস, মন্ত্রণাটি রাজার নয়, তোমার। তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা, বল, ময়ূরভঞ্জে কত তাঁতী আছে? তারা কি কাপড়, কত রকমের কাপড় বুনে? কাট্‌তি কেমন? দুঃখ কিসের? ওড়িয়্যায় এমন তাঁতী আছে, যাদের পায়ের ধুলা নিতে ইচ্ছা হয়। তুমি তাদিকে কি শেখাবে?'

উত্তর শুনে বুঝলাম, যোগেশের কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। সে মন্ত্র চায়, যে-মন্ত্র জপ ক'রলে ময়ূরভঞ্জের তাঁতী লক্ষ্মীমন্ত হ'তে পারবে। কিন্তু সে ছাড়লে না। পরদিন রবিবারে দুই বৎসরের ও অতিরিক্ত আর এক বৎসরের শিক্ষাক্রম



স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও বাহাদুর

লিখে দিলাম। লিখন পঠন গণন চিত্র-লিখন বয়ন-বিদ্যা বয়ন-কলা প্রথম দুই বৎসর। পরে যে ইচ্ছা ক'রবে, সূতা রঙ্গাতে শিখবে। ওড়িয়্যায় তাঁতী নিজে সূতা রঙ্গাত। মাস দুই পরে রাজার সঙ্গে দেখা হ'ল। কটক রেল-ষ্টেশনের কাছে। এক রাজপুরুষের আগমনে সম্মান দেখাতে যেতে হয়েছিল, রাজাও এসেছিলেন। পথে দেখা, দুই এক কথা

হ'তে পেরেছিল। তিনি ব'ললেন, আমি তাঁতীকে দু-তিন বছর শেখাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কলিকাতা হ'তে তিনি জেনেছেন, ছ-মাস যথেষ্ট। আমি এই আশঙ্কা করেছিলাম। ব'ললাম, 'রাজা আমি জানতাম না, আপনি কল-তাঁতী চান। আমি মানুষ-তাঁতী চিন্তা করেছি। কল-তাঁতী অনেক আছে। আপনার তাঁতীশালা চ'লবে না।'

পরে শুনেছিলাম, রাজার তাঁতীশালা উঠে গেছে। কতকগুলি টাকা অকারণে জলে পড়েছে। সে টাকায় ঠক-ঠকি তাঁত গড়িয়ে গ্রামে বিলিয়ে দিলে উপকার হ'ত। এক-শ টাকায় দশটা তাঁত হ'ত।

রাজার সঙ্গে আমার শেষ আলাপ এই।

রাজার ইচ্ছা ছিল, তিনি একটি বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ খুলবেন। কৃষি, রাজ্যের প্রধান সম্পদ। কিন্তু আবহ-জ্ঞান ব্যতিরেকে অসম্ভব। পার্বত ও জাঙ্গল দেশে কৃষি একমাত্র ভরসা হ'তে পারে না। দেশী কলা রক্ষার ও উন্নতির চেষ্টা না ক'রলে প্রজা-পরিপালন হ'তে পারবে না।

দেশের দুর্ভাগ্য, তিনি অকালে (ইং ১৯১২ সালে) এক-চল্লিশ বৎসর বয়সে চলে গেলেন।

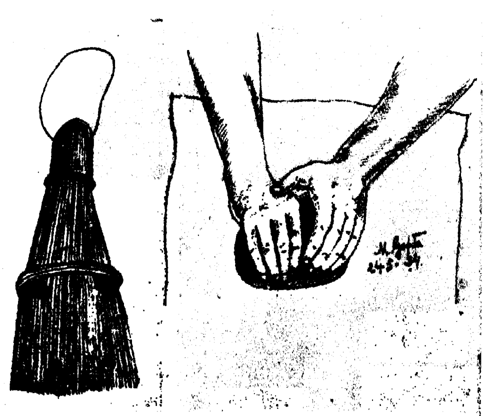
আড়িয়লের কাগজ

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার কয়েকটি গ্রামে এক সময় প্রচুর পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হইত এবং বহু পরিবার ইহা দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বড় বড় কারখানা হইতে বহু পরিমাণে নানাদ্রব্য আমদানী হওয়াতে যেমন অনেক কুটীরশিল্প বিনষ্ট হইয়াছে এই কুটীরশিল্পও তেমনি বালি, শ্রীরামপুর, টিটাগড়, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি মিলের কাগজের প্রচলন হওয়াতে বিনষ্ট হইয়াছে। পুঁথি, দোকানের হিসাবের খাতা, জমিদারী সেরেস্তার দলিল প্রভৃতির কাগজ পূর্ব্বে হাতে তৈয়ারী হইত।

বর্ত্তমান যুগ কলকারখানা ও প্রচুর উৎপাদনের যুগ হইলেও, বিবিধ কুটীরশিল্পের পুনরুজ্জীবনেরও কথা শোনা যায়। মিলে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র উৎপন্ন হইলেও খদ্দরের প্রচলন হইতেছে। সেই রকম হাতে-তৈয়ারী কাগজের প্রচলন হইবে না কেন? অবশ্য এ-ব্যবসাকে আজকালকার দিনে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা একেবারে অসম্ভব; তবে আমার বিশ্বাস খুব অল্প আয়াসেই এ-কাগজের উন্নতি-বিধান এবং প্রচলন করা যাইতে পারে।

আড়িয়ল, ধাইরপাড়া, দুলিহাটা, কুরমিরা, নাগেরপাড়, দীঘিরপাড় এই কয় গ্রামে কাগজের ব্যবসা ছিল। পাশাপাশি এই কয় গ্রামের ভিতর আড়িয়ল বড় গ্রাম বলিয়া এখানকার



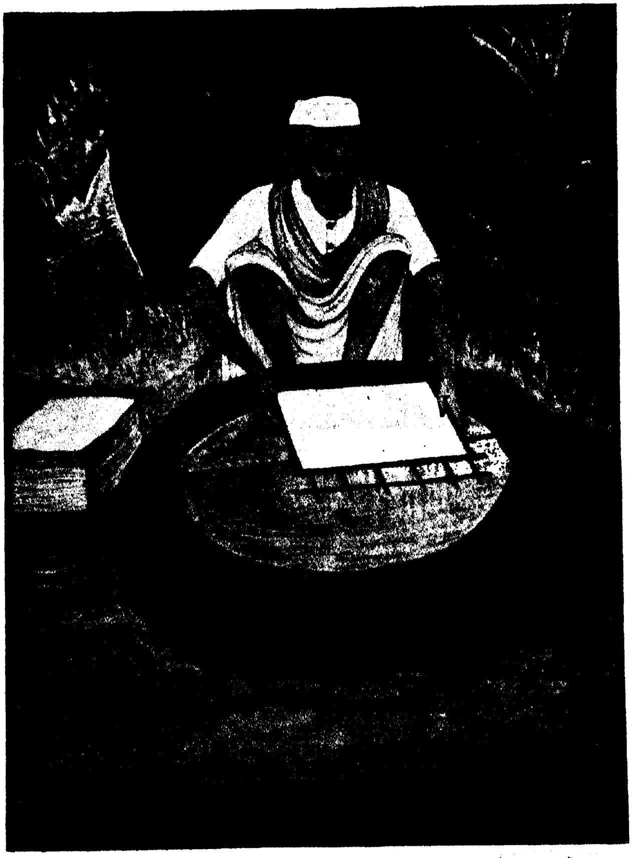
ফালাহি কাগজ পালিশ করা

কাগজ 'আড়িয়লের কাগজ' বলিয়াই পরিচিত। এক সময় ৭৫০টি পরিবার এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল; প্রত্যেক বাড়িতেই কাগজ তৈয়ারী হইত। ইহারা সকলেই

মুসলমান। এখন যদিও ইহাদের বংশানুক্রমিক ব্যবসা নাই, তবুও ইহারা সাধারণের কাছে কাগজী বলিয়াই পরিচিত। বোধ হয় পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল ছিল। তার পর হইতেই অবনতি আরম্ভ হইয়াছে এবং সকলে অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কাগজীরা এখন দপ্তরী, দরজী, দোকানদার, নৌকার মাঝি, চাষী হইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। লোহজঙ্গ, তালতলা বন্দরে এবং এতদঞ্চলে যে-সব নৌকার মাঝি দেখা যায়, তাহাদের ভিতর অনেকেই কাগজী।

এখনও কাগজীদের অনেকের বাড়িতেই দেখা যায় কাগজ-নির্ম্মাণের যন্ত্রপাতি অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। হাতে-তৈয়ারী কাগজের চাহিদা বাড়িলেই বহু পরিবার আবার পৈতৃক ব্যবসায় সুরু করিতে পারে। ধাইরপাড়া গ্রামের ১৫০ পরিবারের জায়গায় এখন মাত্র একটি পরিবারের দু-তিন সরিক তাহাদের পৈতৃক ব্যবসা কোনও রকমে টিকাইয়া রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে রজ্জবালী কাগজী বড় কারিগর। তাহাদের দু-তিন সরিক নাকি এখন বৎসরে ৬০০৲ টাকার মত কাগজ বিক্রী করিয়া থাকে। ঢাকার কয়েকটি মনোহারী দোকানে ইহাদের কাগজ কিনিতে পাওয়া যায়। বাহিরে সামান্য কিছু চালান যায়। ফাল্গুন মাসে চাঁদপুর, ভৈরব, কুমিল্লা অঞ্চলের দোকানে দোকানে বিক্রী করার জন্য লাল খেরোর বাঁধা হিসাবের খাতা চালান যায়; সঙ্গে কিছু আড়িয়লের কাগজও যায়। কাগজীরা পূর্ব্বে তাহাদের নিজেদের তৈয়ারী কাগজেই এ-সব খাতা তৈয়ার করিত, এখন মিলের কাগজ ব্যবহার করিতেছে।

রজ্জবালী বলিল, সে নাকি তাহার বাপদাদার মুখে শুনিয়াছে বহুপূর্ব্বে যখন মিলের কাগজের আমদানি হয় নাই তখন মীরকাদিমের এক হাটেই নাকি ১৫০০৲ টাকার উপর কাগজ বিক্রী হইত। টাকার সংখ্যাটা বোধ



কাগজী

হয় একটু আশ্চর্য্য রকম ঠেকিবে। কিন্তু খুব কম করিয়া প্রতি পরিবারে তিন জন করিয়া লোক ধরিলে ১৫০ পরিবারে দুই হাজারের উপর লোক কাগজ নির্ম্মাণে নিযুক্ত ছিল এবং সপ্তাহে দেড় হাজার টাকার কাগজ উৎপাদন করিত—ইহা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না। মীরকাদিমের হাট হইতে বাহিরেও কাগজ চালান যাইত।

বৃদ্ধদের মুখে শোনা যায়, শেষরাত্রি হইতেই কাগজীপাড়ায় ঢেঁকিতে কাগজের উপকরণ কুটিবার আওয়াজ পাওয়া যাইত। দু-তিন মাইল দূরের গ্রামের



পাট চূর্ণ করা

লোকেরাও ঢেঁকির শব্দ শুনিতে পাইত। সেই ঢেঁকি আজ একেবারে নীরব!

বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভঙ্গের সময় আড়িয়লের কাগজের কিছু চাহিদা হইয়াছিল; প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি পরিবার তখন কাগজ প্রস্তুত করিত।

কাগজপ্রস্তুতপ্রণালী

কাগজ-প্রস্তুতের প্রণালী খুবই সহজ; সাজসরঞ্জাম বিশেষ কিছুই নাই। কাগজ ও পাটের মণ্ড হইতে এই কাগজ প্রস্তুত হয়। এক মণ কাগজের সঙ্গে পাঁচ সের পাট মিশাইতে হয়। দপ্তরীদের দোকানে কাটা টুকরা কাগজ কিনিতে পাওয়া যায়। এগুলি খাতার ছাঁট কাগজ। ছাপা কাগজেও কাজ চলিতে পারে, কিন্তু তাহার মণ্ডে কাগজের রং পরিষ্কার হইবে না। এই কাগজ জলে দিয়া ভিজাইয়া রাখা হয়, কাগজ ইহাতে সহজে গলে সেজন্য কিছু সোডা মিশাইতে হয়। এক দিন ভিজাইয়া রাখিলেই কাজ চলে।

পাট রাখিতে হয় চুণের জলে ভিজাইয়া। যে-কোন পাটে কাজ চলে না; মিহি ও মোলায়েম পাটের প্রয়োজন। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ক্ষেত হইতে কিছু কিছু পাট তুলিয়া ফেলা হয়; এ-সব ছোট ছোট পাটকে বাছ-পাট বলে। আজকাল যথেষ্ট পরিমাণ কাগজ পাওয়া যায় বলিয়া কাগজ ও পাট দুই-ই মণ্ডপ্রস্তুতকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে শুধু পাট দিয়াই মণ্ড প্রস্তুত হইত। সেজন্য



কাগজের মাড় ধুইয়া ফেলা হইতেছে

এখনকার কাগজ দেখিতে আগেকার অপেক্ষা অনেক ভাল। কিন্তু আগেকার কাগজ বেশী শক্ত ছিল। পূর্ব্বে যে পাট ব্যবহার করা হইত তাহাকে বলে মেছট পাট (পশ্চিম-বঙ্গে—মেছতা)। এ-অঞ্চলে মেছট পাটের চাষ ছিল না। চাঁদপুর ও ফরিদপুরে ইহার চাষ হইত। লৌহজঙ্গে এ-পাট কিনিতে পাওয়া যাইত। সাধারণ পাট হইতে মেছট পাট ভিন্ন। এ-পাটের বীজ কলাইয়ের মত বড়, ফুল হয় দেখিতে কতকটা ঢেঁড়স ফুলের মত।

চূণের জলে পাট ভিজাইলে এর রং হলদে হইয়া যায়। এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। এর পর শুকনা পাট ঢেঁকিতে গুঁড়া করা হয়। এই ঢেঁকি লম্বায় হাত-দশেক; ইহার মুষলে লোহা পরান থাকে। কাগজীরা এই মুষলকে থরতম বলে। এই ঢেঁকি খুব ভারী; ইহাতে পাড় দিবার জন্য তিন-চার জন লোকের প্রয়োজন হয়।

এখন প্রচুর পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হয় না বলিয়া ঢেঁকির ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। এখন বড় একখণ্ড পাথরের উপর শুধু এই লোহাদ্বারা পাট ছেচা হয়। ইহার পর গুঁড়া পাট জলে-পচান কাগজের সঙ্গে মিশাইয়া পা দিয়া ভাল করিয়া চটকাইতে হয়। কিছু ক্ষণ এই জিনিষটাকে ভাল করিয়া পা দিয়া মাড়াইলে কাদা বা মাখা-ময়দার মত একটা জিনিষে পরিণত হইবে। এই হইল কাগজের মণ্ড—ইংরেজীতে ইহাকে বলে 'পেপার পাল্প'। নূতন কাপড়ের মত কাগজে মাড় লাগা থাকে। জলে ধুইয়া এই মাড় দূর করার প্রয়োজন। কাপড়ের এক অংশ কাগজীর কোমরে বাঁধা থাকে; অপর অংশ জলের ভিতরে পোঁতা একটি বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধিতে হয়, তাহার পর দুই হাতে জলের ভিতরে জিনিষটাকে ভাল করিয়া কচলাইতে হইবে। এইরূপে কাগজের মাড় জলে ধুইয়া যাইবে। এবার এই জলে-ধোওয়া কাগজের মণ্ডকে জলপূর্ণ বড় একটা জালার ভিতরে রাখা হয়। খুব বড় জালা মাটির ভিতর পোঁতা থাকে; জালার উপরের অংশ কাটা থাকে। এখনও কাগজীদের বাড়িতে যে-সব জালা মাটিতে পোঁতা দেখা যায় সে সবই তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের আমলের।

বাঁশের একটা কঞ্চি দিয়া জালার ভিতরের জলটাকে ঘুঁটিয়া দিলে, মণ্ড জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। এক রিম কাগজ তৈয়ার করা যায় এ-পরিমাণ মণ্ড একটি জালার ভিতর ধরে।

পূর্ব্বে যে-সব কাজের কথা বলিয়াছি তাহা কেবল শারীরিক পরিশ্রমসাপেক্ষ। এইবার যাহা করিতে হইবে তাহাতে কাজে অভ্যাস ও কৌশলের প্রয়োজন। জালার ভিতর চালুনী (কাগজীদের ভাষায় ছাব্‌রি) ডুবাইয়া তুলিতে হয়। চালুনীর ফাঁক দিয়া জল ঝরিয়া পড়ে এবং মণ্ডের একটা স্তর চালুনীর উপর পাতলা সরের মত পড়িয়া যায়। এই হইল কাগজ। মণ্ডের স্তর সমানভাবে ফেলা কঠিন। চালুনীটা দেখিতে ছোট একটা চীকের ন্যায়; ইহা খাটান



পচান-কাগজ মাড়াই হইতেছে

যায়। যাহাতে টান হইয়া থাকে, সেজন্য সেটাকে রাখা হয় বাঁশের চাঁচারির মাচার উপর। এই চাঁচারির মাচাকে কাগজীরা থাপাহি বলে। চালুনীর দুই পাশে যেখানে হাত থাকে, সেখানে দুটি আলগা মোত্রা (যে গাছ হইতে পাটী তৈয়ারী হয়) থাকে; কাগজ চালুনী হইতে তুলিবার সময় মোত্রা দুটি খুলিতে হয়; পরে জালার ভিতর চালুনী ডুবাইবার সময় আবার লাগাইতে হয়।

চালুনী হইতে তুলিয়া কাগজ একটার উপর আর একটা রাখা হয়। কাগজের স্তূপের নিকট মাটির ভিতর একটা হাঁড়ী রাখা হয়, কাগজের স্তর হইতে জল চুইয়া গিয়া হাঁড়ীর ভিতর পড়ে। অনেক কাগজ জমা হইলে, তার উপর কলাপাতা এবং তক্তা রাখিয়া জন দুই লোক চাপিয়া বসে—ভিতরে যেটুকু জল আছে, সেটুকু ঝরিয়া পড়ে। আশ্চর্য্য এই যে, প্রত্যেকটি কাগজ আলাদা আলাদা থাকে, গায়ে লাগিয়া যায় না। এবার টিনের উপরে মেলিয়া দিয়া কাগজ রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। টিনের উপর একটা ছোট ঝাঁটা (কাগজীদের ভাষায় 'ফালাহি') দিয়া কাগজটাকে সমান করিয়া ফেলিতে হয়। রৌদ্র না পাইলে কাগজ প্রস্তুত করা চলে না, সেজন্য বর্ষাকালে আষাঢ় হইতে আশ্বিন এই চারি মাস কাগজ প্রস্তুত করা বন্ধ থাকে।

শুকান হইলে কাগজের চারিপাশ ছুরি দ্বারা সমান করিয়া কাটা হয়। আতপ চাউলের গুঁড়া দ্বারা মাড় প্রস্তুত করিয়া নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা কাগজের উপরে প্রলেপ দেওয়া হয়। এই মাড় দেওয়ার নাম হইল "কলপ" (সাইজিং) দেওয়া। কলপ না দিলে লিখিবার সময় কাগজে কালি চুপসিয়া যায়।

কলপ দেওয়া হইলে কাগজের দুই পিঠ পাথর দিয়া ঘষিয়া পালিশ করা হয়। পালিশের পর কাগজ প্রস্তুত শেষ হইল। হলুদে রঙের যে-কাগজ দেখা যায় তা শাদা কাগজে নারিকেলের ছোবড়ায় পিউরি রং লাগাইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। এই রং প্রস্তুত করিতে পিউরির সহিত তেঁতুল-বিচির আঠা মিশাইতে হয়। স্থানীয় লোকেরা এই হলদে কাগজকে তুলট কাগজ বলে এবং হলুদে রং লাগানকে তুলট করা বলে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা অনেক সময় সাদা কাগজ কিনিয়া বাড়িতে নিজেরাই তুলট করিয়া লইতেন এবং বাঁশের কলমে লিখিতেন। অভিধানে "তুলট" শব্দের অর্থ যে-কাগজ তুলা হইতে প্রস্তুত করা হয়। এখানে কাগজ প্রস্তুত করিতে কখনও তুলা বা ন্যাকড়ার প্রচলন ছিল না।* পাট দিয়াই কাজ চলিতেছে।

কাগজ-প্রস্তুতের সমস্ত প্রক্রিয়াই ঘরের বাহিরে উঠানে গাছতলায় হয়, সেজন্য মণ্ডের ভিতর ধুলা বালি খড় অনেক ময়লা উড়িয়া আসে, ঘরের ভিতরে করিতে পারিলে কাগজ আরও ভাল হইতে পারে।

পাঁচ জন এক দিনে এক রিম কাগজ প্রস্তুত করিতে পারে। আলোর আড়ালে ধরিলে কাগজে যে শাদা লাইন বা লেখা দেখা যায় তাহাও ইহারা করিতে পারে। ইচ্ছা করিলে, সকলেই তাঁহাদের ট্রেডমার্ক এবং কোম্পানীর নাম কাগজে লিখাইয়া লইতে পারেন।

সাধারণতঃ বাজার-চলতি কাগজ ৪ রিম বা দুই হাজার তা কাগজ ইহারা রিম-প্রতি দুই টাকা হিসাবে ৮ টাকায় বিক্রী করে। ঢাকায় এ-কাগজ ৵০ আনা দিস্তা হিসাবে বিক্রী হয়। চার রিম কাগজ প্রস্তুত করিতে লাগে ১ মণ দপ্তরীর ছাঁট কাগজ, মূল্য ২৲ টাকা, পাট পাঁচ সের মূল্য ।।৵০, সোডা ও চূণ ।৵০, মোট ৩৲ টাকা খরচ। ইহা হইল কেবল কাঁচা মালের দাম। মজুরী ধরিলে মোট খরচ আরও বেশী পড়িবে। খরচ বাদ দিয়া কাগজীদের লাভ খুব বেশী থাকে না। মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে দাম কমাইতে হইয়াছে।

শিল্পীদের অনেক সময় চীনা, জাপানী ও নেপালী হাতে-তৈয়ারী কাগজে (হ্যাণ্ডমেড্ পেপারে) ছবি আঁকিতে হয়; এ-সব কাগজ সহজলভ্য নয়। কিন্তু আমাদের ঘরের পাশেই বহুকাল হইতে উত্তম কাগজ তৈয়ার হইতেছে—শিল্পীরা তাহার খোঁজ রাখেন না। এই ধরণের কাগজেই একদিন মোগল বা কাংড়া চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—তখন কাগজ বিদেশ হইতে আসে নাই। এ-কাগজে ছবি আঁকিতে আরাম আছে, রং চমৎকার লাগে, অন্যান্য সুবিধাও আছে, যাহা অন্য কাগজে পাওয়া যায় না।

* ন্যাকড়া হইতে প্রস্তুত কাগজ (rag-made papor) উৎকৃষ্ট। অন্যত্র তুলা ও ন্যাকড়ার ব্যবহার ছিল।—প্রবাসীর সম্পাদক।

জীবিকা

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কালুর বাবা মাধব দাস দিনমজুরী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। লোকে তাহাকে ভাড়া লইত দিনহিসাবে। মফস্বলে ঘণ্টা ধরিয়া সময়ের হিসাব নাই। ঘড়ি ক'জনেই বা রাখে! দিন যাহার আদি-অন্তহীন কীর্ত্তি সময়ের হিসাব করিতে মফস্বলের লোক কাজে লাগায় তাহাকেই। এই নিয়ম স্থির করা আছে। পূব দিকের গাছপালার মাঝামাঝি সূর্য্য উঠিয়া আসিলে মজুর কাজে লাগিবে, আর পশ্চিমের গাছগুলির আড়ালে গেলে পাইবে ছুটি। ঘড়ির কাঁটা নয়, তরুছায়ার আবর্ত্তন, পশ্চিম হইতে পূবে। মাঝখানে দুপুরবেলা খাওয়ার জন্য কিছু ক্ষণের ছুটি। তা ছাড়া, কাজের ফাঁকে ফাঁকে মজুর যদি পাঁচ মিনিট গাছের ছায়ায় বসিয়া তাহার কালো কলিকাটিতে তামাক টানিতে চায়, কারও কিছু বলিবার নাই। এ-কথা কে না জানে যে, মানুষ যন্ত্র নয়, মাঝে মাঝে সধূম দম টানার আরাম না পাইলে মানুষ খাটিতে পারে না? মাধব কিন্তু চালাকি করিয়া খাওয়ার ছুটি ও তামাক টানার বিরাম ছাড়াও সুযোগমত ফাঁকি দিয়া আলস্য ভোগ করিয়া লইত। হয়ত সে বৈশাখী দ্বিপ্রহর। ঘর ছাইতে ছাইতে চালার উপরেই দারুণ রোদে পিঠ দিয়া খানিকক্ষণ হাত পা শিথিল করিয়া বসিয়া থাকিতে সে আরাম বোধ করিত কিনা সে-ই জানে, কিছু কিছু ফাঁকি না দিলে তাহার চলিত না। কাজের শেষে মজুরীরও শেষ। হাতের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া যদি দুটি দিনও ঘরে বসিয়া থাকিতে হয়, দিনমজুরের সে অপূরণীয় ক্ষতি। মাধবের কাজ ছিল রকমারি। সে ঘর ছাইত, বেড়া বাঁধিত, কাঠ চেলাইত এবং এমনি আরও অনেক কিছু করিত। অল্প বয়সে কালুও এই-সব কাজ শিখিতেছিল। কিন্তু হারাণের ছেলে মধুর পাল্লায় পড়িয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহার জীবিকা অর্জ্জনের পথটা দাঁড়াইয়া গেল অন্য প্রকার। হারাণ কূয়া খুঁড়িত আর হারানো জিনিষের সন্ধানে ডুব দিত বিশ হাত জলের তলে। সে-কালের কালুর বয়স ছিল কম, পেটভরা ছিল প্লীহা আর মাথাভরা বোকামি। মধুর সঙ্গে সে হারাণের জলে ডুবিবার প্রক্রিয়া দেখিতে যাইত। হারাণ জলের তলে অদৃশ্য হইয়া গেলে ছোট ছোট চোখ দুটি প্রাণপণে মেলিয়া মুখটা হাঁ করিয়া ঢেউতোলা জলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। কারও বারণ না মানিয়া এমন ভাবে কূয়ার মধ্যে ঝুঁকিয়া পড়িত যে এক দিন বিপদ না ঘটিয়াই পারে নাই। সাঁতার কালু সেই বয়সেই মন্দ জানিত না। কিন্তু কুড়ি বাইশ হাত নীচে জলের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বোধ হয় পেটের প্লীহাতেই আঘাত লাগিয়া সে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। হারাণ নীচে না থাকিলে সে-দিন সে আর বাঁচিত না। শুধু হারাণের জলেডোবা দেখিতে নয়, কাছে হোক দূরে হোক সে কূপ-খনন আরম্ভ করিলে প্রতিদিন সেখানে হাজিরা না দিলে কালুর চলিত না। হারাণ ও তাহার সঙ্গীরা কোদাল দিয়া মাটি কাটিয়া তুলিত, কালু কৌতূহলের সঙ্গে চাহিয়া দেখিত। গর্ত্তটি কিছু গভীর হইলে ভিতরে নামিবার জন্য তাহার মন ছটফট করিত। কিন্তু অতটুকু ছেলের ব্যাকুলতা কেহ বুঝিত না, নীচে তাহাকে কেহ নামিতেও দিত না। একফাঁকে সকলের চোখ এড়াইয়া নামিয়া গেলেও পাতালের সেই কাম্য স্বর্গে কয়েক মুহূর্ত্তের বেশী সে থাকিতে পাইত না, তাড়া খাইয়া উপরে উঠিয়া আসিতে হইত। কালুর কান্না আসিত। তার পর বয়স বাড়িবার সঙ্গে বুকে কিছু সাহসের সঞ্চার হইলে জ্যোৎস্নারাত্রে একা সে বাহির হইয়া যাইত গ্রামান্তরে অর্দ্ধসমাপ্ত ইঁদারার উদ্দেশে। জ্যোৎস্নালোকে ইঁদারার ধারে দাঁড়াইয়া সে উত্তেজিত হইয়া উঠিত। খানিক তফাতে মাটির স্তূপ, ইঁদারার মধ্যে রহস্যঘন গভীর অন্ধকার, আর এই মনোহর স্বর্গ ও পাতালের কাছে একা সে উদগ্রীব বালক। যত ক্ষণ খুশী খেলা করুক, কেহ বারণ করিতে আসিবে না। কিন্তু খেলায় কালুর মন ছিল না, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া

থাকিত। কয়েক হাত গর্ত্ত কাটিয়া চারি দিকে গোল করিয়া ইটের গাঁথনি তোলা হইয়াছে। ভিতরের মাটি কাটিয়া তোলার সঙ্গে সঙ্গে এই গাঁথনি নীচে নামিতে থাকিলে তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া উপর হইতে গাঁথিয়া চলা হয়। ইঁদারা-সৃষ্টির এ-সমস্ত কলকৌশল কিছুই কালুর অজানা নয়। দ্রোণাচার্য্যের অন্ত্যজ শিষ্যের মত কেবল অখণ্ড নিবিড় পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা সে সব শিখিয়া ফেলিয়াছে। সাবধানে সে ইঁদারার মধ্যে নামিয়া যাইত। তলার ভিজা নরম মাটিতে পা দিয়া শিহরিয়া উঠিত। পিপাসু ক্ষুধার্ত্ত কীটের মত মৃত্তিকার এই ক্ষতের মধ্যে সে বোধ করিত অপরিমেয় উল্লাস। মাংসের মত কোমল মৃত্তিকায় দুই হাতের দশটা আঙুল ঢুকাইয়া দিয়া সে থাবলা থাবলা মাটি তুলিয়া ফেলিত। তার পর আঙুল ব্যথা করিতে থাকিলে ইটের আবেষ্টনীতে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া সে দেখিত স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখিত এমনি একটি বিস্ময়কর সৃষ্টির অবাধ অধিকারের।

কালুর এ-স্বপ্ন হয়ত সফল হইত না। হয়ত সে মাধবের মতই ঘরের চালে ধানের ক্ষেতে দিনমজুরী করিয়া মরিত। কিন্তু হারাণ মরিয়া গেলে মধু তাহাকে বাপের ব্যবসায়ে নিজের সঙ্গী করিয়া লইল। এত দিনে কালুর স্বপ্ন দেখিবার অভ্যাস বন্ধ হইয়াছে। পেটে আর তাহার প্রাহা নাই, মাথার জমজমাট বোকামিও সাফ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার আদিকালের সেই সৃষ্টির প্রেরণা আজও হইয়া আছে অক্ষয়। সকালে পূব দিকের গাছের ডগা পর্য্যন্ত সূর্য্য উঠিলে সে কোদাল তুলিয়া লয়, চকচকে ফলাটা বার-বার মাথার উপর হইতে নামিয়া আসিয়া মাটিতে আমূল প্রোথিত হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে পাশের ঝুড়িটি ভরিয়া ওঠে। পিঠ বহিয়া বুক বহিয়া দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে থাকে। হাতের ও বুকের মাংসপেশীগুলি এক সময় ব্যথা করিতে থাকে, কোমর ধরিয়া যায়। সূর্য্য উঠিয়া আসে আকাশের মাঝখানে।

মধু বলে, 'তামুক খা কালু, একটানা কাঁহাতক চালাবি ?'

অন্য এক জন বলে, 'তোর যন্তনায় কাজ করা ভার বাপু, তোকে দেখিয়ে বাবু মোদের আলসে কয়।'

কালু সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া কোমরের টনটনানিতে মুখ বাঁকাইয়া বলে, 'বাবুকে দু-কোপ কোদাল চালাতে বলিস, ভির্মি যাবে'খন।'

মাটির স্তর-বিভাগের বৈচিত্র্যে কালু অবাক হইয়া যায়। এঁটেল মাটি, বালি মাটি, ধূসর পাটল কালো রঙের মাটি, কত রকমের মাটিই যে পর-পর থাকে-থাকে সাজানো আছে! পৃথিবী যেন তাহার সহিত তামাশা করিতে ভালবাসে। কোদাল বসে না এমনি শক্ত কাঁকর-মেশানো মাটিতে খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ-ছয় হাত নীচে হয়ত বালি-মেশানো আলগা ঝুরঝুরে মাটির দেখা মেলে, আরও খানিকটা খুঁড়িয়া পুনরায় শক্ত মাটি পাওয়া না গেলে সেখানে কূপ-খননই বন্ধ করিয়া দিতে হয়। মাটির বর্ণ ও প্রকৃতির বৈচিত্র্য ছাড়া আরও অজস্র বিস্ময় কালুর জন্য মাটির তলে সঞ্চিত হইয়া থাকে। পনর হাত খুঁড়িয়া গাছের শিকড়ের দেখা পাইয়া কৌতূহলভরে উপরে উঠিয়া সে চারি দিকে তাকায়। চারি পাশের গাছগুলির মধ্যে যে রসিক তরুটি রসদের সন্ধানে এত নীচে শিকড় পাঠাইয়াছে, সেটিকে বাছিয়া লইবার চেষ্টা করে। কোনদিন অনেক নীচে মাটির হাঁড়ি-কলসীর ভাঙা টুকরা দেখিতে পায়, কোনদিন তাহার কোদালের ফলায় উঠিয়া আসে মানুষের হাতে তৈরি ইট, মানুষের ব্যবহৃত লোহার জিনিষের মরিচা! কালু আশা করে এক দিন এমনিভাবে সে গুপ্ত ধনের সন্ধান পাইবে। টাকা ও মোহর ভরা কলসীর গায়ে কোদাল ঠেকিয়া টং করিয়া একটি শব্দ হইবে। সে সাঙ্কেতিক আওয়াজ সে চিনিতে পারিবে চোখের পলকে। বুঝিতে পারিবে, কলসীটি একক নয়, সে আর ছ'টি কলসীর নকিব কোদালের ঘা খাইয়া সাড়া দিয়াছে। সাত কলসী মোহর। মাটির বুকে গোপন-করা যত গুপ্ত ধনের রূপকথা কালু শুনিয়াছে, সব সাত কলসী মোহরের, সোনার চকচকে মোহর, সাত কলসীর এক কলসী কম নয়। এত মোহর দিয়া সে কি করিবে কালু তাহা জানে না। কল্পনায় ধনী হইতেও সে একান্ত অক্ষম। দশ-বিশ টাকার ব্যবহার সে জানে, তার বেশী নয়। তবু,

পাইতে দোষ কি? সবগুলি মোহর সে তো একসঙ্গে খরচ করিবে না, একটি বাহিরে রাখিয়া সবগুলি পুঁতিয়া ফেলিবে ঘরের মেঝেতে। কর্ণেলবাজারে রাজীব পোদ্দারের কাছে মোহরটি ভাঙাইয়া সে-টাকা যত দিন না খরচ হইতেছে আর একটি মোহর বাহির করিবে কে? সুতরাং সাত কলসী মোহর পাইয়াও কালু অনায়াসে তাহার ধারণক্ষম চরম উল্লাস বোধ করিতে পারে, দশ-বিশ টাকার অসীম সুখ, যে টাকার একটিও জমানোর দরকার নাই। কিন্তু লাভের কল্পনায় অনাবিল আনন্দ সে ভোগ করিতে পারে না। আরাম নয়, বিলাসিতা নয়, যশ ও প্রতিপত্তি নয়, যে-মানুষ সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া শুধু জীবিকা অর্জন করে, তার দিবাস্বপ্নেও ভিড় করিয়া আসে রাত্রির দুঃস্বপ্ন। সকলে জানিয়া ফেলিয়া যদি ভাগ চায়! যার জমি সে যদি সব মোহর দাবি করিয়া বসে! পুলিস যদি কাড়িয়া নেয়! কালুর বুক যেন তবে ফাটিয়া যাইবে! তার চেয়ে গুপ্ত ধনের সন্ধান না পাওয়াই যেন ভাল।

মোহরের কলসী নয়, কালু একবার একটা ঘটি পাইয়াছিল। তখন খাওয়ার ছুটির সময় হইয়া আসিয়াছে। বৈশাখের ঝলসানো আকাশ হইতে দিগন্তব্যাপী নিরেট আগুনের হলকার মত নামিয়া আসিতেছে রোদ। খানিক আগে কালুর তৃষ্ণা উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, এখন ঝিমাইয়া আসিয়াছে। কড়া রোদে দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ঘামিবার পর কড়া তাড়ির নেশার মত, শীতের দিনে উষ্ণ জলে ডুব দিবার মত, যে অবশ শিথিল শিহরণ থাকিয়া থাকিয়া সর্বাঙ্গে বহিয়া যায়, কালু তাহা প্রায় উপভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এমন সময় কোদালের কলায় উঠিয়া আসিল কাঁসার একটি ঘটি। ঘামে কালুর দৃষ্টি ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছিল। কনুই পর্যন্ত হাত মাটি-ভরা, কাঁধের নীচে বাহুমূলে চোখ মুছিয়া কালু অবাক হইয়া ঘটিটার দিকে চাহিয়া রহিল। টাকা আছে? না মোহর?

আলগা মাটিতে ঘটিটা সে গুঁজিয়া দিল। এখান হইতে বাড়ি তাহার প্রায় তিন মাইল তফাতে, ভাত খাইতে সে বাড়ি যায় না। তিনি মুড়ি কাটাইতেছেন মজুরী দু-আনা কমাইয়া এক বেলা আহারের ব্যবস্থা তিনিই করিয়া দিয়াছেন। কোদাল রাখিয়া উপর হইতে গামছাটা আনিয়া ঘটিটা কালু গামছায় জড়াইয়া লইল। তার পর স্নান করিতে গেল পুকুরে।

মধু বলিল, 'ঘাম না মরলে জলে নেমো না কালু-দা, সর্দি-গর্মি হয়ে মরবে।'

কালু বলিল, 'ঘাটে বসব।'

'চল, আমিও যাই।'—বলিয়া মধু তাহার সঙ্গ নিল।

পুকুরের ধারে তেঁতুলগাছের ছায়ায় বসিয়া তাহারা বিশ্রাম করিতে লাগিল। কালু কথা বলে না, উসখুস করে। মধু কি সন্দেহ করিয়াছে?

হঠাৎ মধু বলিল, 'গামছায় কি কালু-দা?'

'তোর মাথা।' রাগের ভানে ভয় চাপা দিয়া কালু পুকুরে নামিয়া গেল, ঘাম মরিবার জন্য আর অপেক্ষা করিল না। সাঁতরাইয়া ঘাটে গিয়া ঘাটের পাশে পাঁকের মধ্যে তখনকার মত ঘটিটা সে গুঁজিয়া রাখিয়া দিল।

খাওয়ার সময় সে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া রহিল। ঘাটের পাশে ঘটিটা রাখিয়া আসিয়া তাহার ভয় করিতেছে। বোকা আর কাহাকে বলে। ঘাটে কত লোক স্নান করে, কত দুরন্ত ছেলে ঘাটের জল তোলপাড় করিয়া খেলা করে। ঘটিটা যদি কারও পায়ে ঠেকিয়া যায়?

কয়েক বার আড়চোখে তাহার মুখের ভাব দেখিয়া মধু বলিল, 'ভাব কি কালু-দা? খারাপ লাগে নাকি শরীল?'

'অ্যাঁ? উঁহুক। শোন দিকি মধু, কাল এক কাজ করিস, আমার বাড়ি রাত্তিরে তোর নিমন্তন্নো।'

দিনের কাজ সমাপ্ত হইল অপরাহ্নে, গাছের ছায়া যখন পুবে অনেক দূর আগাইয়াছে। সকলের শেষে নির্জন ঘাটে গিয়া কালু পুকুরে নামিল। ঘটিতে কিছু নাই শুধু মাটি। অর্ধেক গলিয়া গিয়াছে, বাকীটা হইয়া আছে কাদা।

বাড়ি ফিরিবার পথে অনুকূল বৈরাগীর বিড়ির দোকানের সামনে মধু অপেক্ষা করিতেছিল। সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দেরি হল যে?'

কালু বলিল, 'এমনি।'

মধু বলিল, 'হাঁ কালু-দা, কাল নিমন্তন্নো কিসের?'

'নিমন্তন্নো?' কালু সশব্দে হাসিয়া উঠিল। 'তামাশা বুঝিস না মুখ্যু!'

নিমন্ত্রণ অসাধারণ ব্যাপার। মধু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। এবার নিশ্চিন্ত হইয়া সেও হাসিল।

'তামাশা? তাই বল! আমি ভাবলাম কি না কি।'

ডুবুরির কাজ পাইলে কালু বড় খুশী হয়। সর্ব্বাঙ্গে সে ভাল করিয়া তেল মাখে। নাকে ও কানে তেল ভরিয়া দেয়; কুয়ার পাড় তিন বার স্পর্শ করিয়া কপালে হাত ঠেকায়। বিড়বিড় করিয়া কি যেন সে মন্ত্র বলে। তার পর দড়ি ধরিয়া খাঁজে খাঁজে পা দিয়া নামিয়া যায় ভিতরে। অল্পদূর নামিয়াই সে একটি জলসিক্ত নিবিড় শীতলতা অনুভব করে। ক্রমে উপরের পৃথিবীর শব্দ মৃদু হইয়া আসে। কানে হাত চাপা দিলে যে গুঞ্জরিত স্তব্ধতা শুনিতে পাওয়া যায়; তাহাই চারি দিকে ঘিরিয়া আসিয়া কালুকে যেন তাহার সদ্যঃপরিত্যক্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। জলে পৌঁছিয়া একটা ছোটখাট ডুব দিয়া সে মাথা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া লয়। তারপর দড়ি ধরিয়া খানিক ক্ষণ ভাসিয়া থাকে। এই কূপখননের ইতিহাস হয়ত বেশী দিনের পুরনো নয়। তারই ছেলেবেলায় হয়ত হারাণ ও তাহার সঙ্গীরা এই ছায়াচ্ছন্ন শ্যাওলাধরা গহ্বরটি সৃষ্টি করিয়াছিল। এমনি কত গহ্বরে সে কতবার নামিয়াছে, তবু কালুর মধ্যে অজানা জগতের একটি পরম উপভোগ্য ভয়ের উত্তেজনা জাগিয়া থাকে। ছায়া-অস্বচ্ছ জলের তলে বর্ণহীন অন্ধকারে কি রহস্য, কি বিভীষিকা লুকাইয়া আছে কে বলিতে পারে? সে জানে কূপের একটা তল আছে, কিন্তু তাহার সংস্কারবদ্ধ কল্পনায় কূপের গভীরতা বাস্তবতার সীমা ছাড়াইয়া পাতাল পর্য্যন্ত চলিয়া যায়, যেখানে বড় বড় গহ্বরে স্পর্শায়ত্ত কালো জল আবর্ত্ত রচিয়া পাক খাইতেছে। দড়ির নীচে পাথর বাঁধা থাকে। এক সময় জোরে জোরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া ফুসফুসে যতখানি পারে বাতাস পূরিয়া দড়ি ধরিয়া সে তলাইয়া যায়। নিমেষে জলের আলিঙ্গন নিটোল স্পর্শ দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে। কূপের জল যে এত শীতল, এমন স্নিগ্ধকর, এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আকণ্ঠ জলে ডুবিয়াও কালুর যেন সে ধারণা ছিল না। তাহার শরীর জুড়াইয়া যায়। কে বলিল জীবিকার জন্য? জীবনের বিরক্তি ও সন্তাপের সহবাস এড়াইতে স্বেচ্ছায় সে এই প্রগাঢ় মধুর মমতায় নামিয়া আসিয়াছে। কালুর মনে একটি প্রসন্ন সন্তোষ দেখা দেয়। তাহার আরামের সীমা থাকে না। জলের পরিচিত আকাশে রং তাহার চোখের তারায় মাখা হইয়া বাহিতে থাকে। এই ছায়ার আকাশে বালুকণাগুলি তারার মত উজ্জ্বল। কালুর সবচেয়ে রোমাঞ্চকর মনে হয়, দেহের বিপরীত ভার, হাল্কা মৃদু, ঊর্দ্ধগ। জল যেন তাহার সেই গোড়ার দিকে লাজুক নূতন বউয়ের মত তাকে সন্তর্পণে ঠেলিয়া দিতে চায়। তার পর চারি দিক ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসে। বালুকা-তারাগুলি নিষ্প্রভ হইয়া নিবিয়া যায়। কানে সে জলের চাপ অনুভব করিতে আরম্ভ করে। তলায় তরল পাঁকে পা ঠেকিলে অসংখ্য বুদ্বুদ চারি দিক হইতে তাহার দেহে ঠেকিয়া ঠেকিয়া সুড়সুড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া যায়।

কালু রূপকথার দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। এই তাহার বাল্য কামনার স্বর্গ।

এ-সব কাজে বিপদের ভয় কম নয়। ইঁদারা-খনন অনেকটা নিরাপদ, ইটের গাঁথনিতে চারি দিকের মাটি আটকানো থাকে। কিন্তু কাঁচা কুয়া খুঁড়িবার সময় সর্ব্বদাই চারি দিক ধ্বসিয়া পড়িবার আশঙ্কা। কুয়া বড় হইলে চারি দিকে তক্তা বসাইয়া আড়াআড়ি ভাবে কাঠের বীম দিয়া আটকাইয়া সাবধানতা অবলম্বন করা চলে, কিন্তু তাতেও বিপদের সম্ভাবনা একেবারে ঘুচিয়া যায় না। এই ব্যবস্থায় খরচ আছে। যিনি কূপ খনন করান সংক্ষেপেই তিনি কাজ সারিবার চেষ্টা করেন। কতবার কাজ করিতে করিতে উপর হইতে রাশি রাশি আলগা মাটি কালু ও তাহার সঙ্গীদের গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। এই ব্যাপারটাই আরও বিশদভাবে ঘটিলে তাহাদের একেবারে জীবন্ত সমাধি। বিপদ ডুবুরীর কাজেও যথেষ্ট। জল বেশী গভীর হইলে জলের চাপে কানের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। এ যদিও কদাচিৎ ঘটে, কয়েক বছর জলে ডোবাডুবি করিলে কানের আর কিছু থাকে না। হারাণ তো শেষ বয়সে বদ্ধ কালা হইয়া গিয়াছিল, বজ্রপাতের আওয়াজ স্পষ্ট শুনিতে পাইত না। তার পর আছে ফুসফুস। ডুব দিবার কিছুক্ষণ পরেই বুকে হাতুড়ির ঘা পড়িতে আরম্ভ

য়, প্রথমে আস্তে, শেষে জোরে জোরে। আটকান বাতাস এমন চাপ দিতে থাকে যে খানিকটা বাহির করিয়া দিতেই হয়। তখন বুকের মধ্যে একটা নিস্তেজ বেদনা স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করে। কান দিয়া, দুই জ্রর মাঝখান দিয়া, ঝাঁঝালো জ্বালা যেন হল্‌কার মত চারি দিকে শীতল জলে মিশিয়া যাইতে থাকে। কয়েক বৎসর এমনিভাবে চলিলে ফুসফুসের পেশীগুলি ঢিলা হইয়া দেখা দেয় শ্বাসকষ্ট। নিঃশ্বাস টানিবার সময় মনে হয় পৃথিবীর বাতাস বুঝি ফুরাইয়া গিয়াছে। শরীর শুকাইয়া যাইতে থাকে,—ধীরে ধীরে জীবনের মারাত্মক শ্লথ অপচয়! নানা স্থানে দেহের শিরাগুলি নীল হইয়া ভাসিয়া উঠে। পরিশ্রম করিবার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

তবু, জীবিকা অর্জ্জনের এই পথ যখন সে বাছিয়া লইয়াছে সব সময় কাজ জুটিলেই কালু বাঁচে। জগতে যার যা পেশা, তাই তার তপস্যা। তাহা না হইলে কোন্ সৈনিক মাসিক কয়েকটা মুদ্রার জন্য কামানের সামনে গিয়া দাঁড়াইত? কালু কাজ চায়, প্রত্যহ বিপজ্জনক কাজ তাহার প্রয়োজন। তা সে পায় না। মফস্বলের যে শহরটির প্রান্তভাগে কালু বাস করে ধনীর সংখ্যা সেখানে এত বেশী নয় যে, সারা বছর কূপ ও ইঁদারা খননের মরসুম লাগিয়া থাকিবে। নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াও সকলে বাড়িতে কুয়া কাটাইতে পারে না, পাড়াপ্রতিবেশীর অথবা সরকারী কূপ ও পুষ্করিণীতেই কাজ চালাইয়া দেয়। কালুর পশার শুধু শহরে নয়, আশপাশে দশখানা গ্রামে তাহার নাম আছে। কুয়া কাটাইতে, কুয়া সাফ করিতে, হারানো জিনিষ তুলিতে লোকে তাহাকেই প্রথমে খোঁজে। তবু কালুকে বছরের অনেকগুলি দিন বেকার বসিয়া থাকিতে হয়। কালুর অসুবিধা বিশেষ করিয়া এই কারণে। সারা বছর অপেক্ষা করিয়া পুণ্য বৈশাখ মাসে লোকে কূপ খনন করায়—সকলে একসঙ্গে। বর্ষার আগে সকলের একসঙ্গে কুয়া সাফ করাইবার ঝোঁক চাপে। দলে দলে আনাড়ি মানুষ কাজ পায়, মরসুম ফুরাইলে কালুর মত পাকা লোক কাজের অভাবে বসিয়া থাকে, পুঁজি ভাঙিয়া খায়। বেশী দিন ভাঙিয়া খাওয়ার মত পুঁজি, দিন মজুর সে, পাইবে কোথায়? সে আধপেটা খায়, বউ গালাগালি দেয়, ছেলেমেয়ে ক্ষুধায় চেঁচামেচি করে,—অভাবের পীড়নে ক্ষেপিয়া উঠিয়া খাদ্যের ভাগীদার কমানোর জন্য যে পিসি তাহাকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিল তাহাকেই কালু একদিন তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু পিসি যায় না। একবেলা মধুর বাড়িতে বসিয়া থাকিয়া গুটি গুটি ফিরিয়া আসে। কালুকে শুনাইয়া বউকে ডাকিয়া বলে, 'দুটি চাল মেগে এনেছি বউ, ছেল্যাদের রেন্ধে দে গো।'

এ-কাহিনী শেষ বর্ষার। ভাদ্রের শেষে কালু সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়, ধান-কাটা সুরু হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকে। বিঘা-তিনেক জমি তাহার আছে, রাখাল ভুঁইয়া চাষ করিয়া তাহাকে ধানের ভাগ দেয়। যত শীঘ্র সম্ভব সে ধান পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় চালে। মাঠে ধান কাটিতে গিয়াও কালু কিছু কিছু রোজগার করে।

এ-বছর ভাদ্রের গোড়াতে কাঁসাই-নদীর জল বাড়িয়াছিল। শহরের কাছে নদীর বাঁধ ভাঙিয়া যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় দিন-সাতেক কালু বাঁধে মাটি ও পাথর ফেলিবার কাজ পাইয়াছিল। ভাদ্রের শেষ পর্য্যন্ত আর কোথাও কাজের সন্ধান মেলে নাই। তার পর কালু পড়িয়াছে জ্বরে, ম্যালেরিয়ায় আর দুশ্চিন্তায়। ম্যালেরিয়া যেন ওৎ পাতিয়া থাকে। সাত দিন পেট ভরিয়া খাইতে না পাইয়া শরীর একটু কাবু হইলে সহসা হি হি করিয়া কাঁপাইয়া আসে জ্বর। সমিতি-বাবুদের দেওয়া কুইনাইন গিলিয়া শরীর আরও কাবু হইয়া যায়। হোক, এমনি দুর্ব্বল শরীর লইয়া কালু এক দিন কৃষ্ণেন্দু সরকারের ইঁদারায় ডুব দিতে গেল। কৃষ্ণেন্দু সরকারের ছোট-বৌ হাতের অনন্ত খুলিয়া ইঁদারার ধারে রাখিয়া গায়ে সাবান মাখিতেছিল, একটি অনন্ত কেমন করিয়া ইঁদারার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে।

কালু বলিল, 'ভাল রকম বকশিশ চাই, কর্ত্তা।'

কৃষ্ণেন্দু সরকার বলিলেন, 'দেব।'

বর্ষার জলে ইঁদারা ভরিয়া গিয়াছে। ইঁট-বাঁধা দড়ি নামাইয়া জলের গভীরতা মাপিয়া কালুর মুখ শুকাইয়া গেল। মাথা নাড়িয়া সে বলিল, 'জল বড় বেশী কর্ত্তা।'

কৃষ্ণেন্দু সরকার বলিলেন, 'পারবি না কালু? তবে তো

বিপদ হ'ল বাপু! কাল বাদে পরশু বৌমা যে বাপের বাড়ি যাবেন! তাছাড়া, পুরনো ইঁদারা, জল কমতে কমতে পাঁকের মধ্যে কোথায় তলিয়ে যাবে শেষকালে হয়ত পাওয়াই যাবে না।'

কালু সায় দিয়া বলিল, 'আজ্ঞে সেও কথা বিবেচ্য বটে কর্ত্তা।'

কৃষ্ণেন্দু সরকার বলিলেন, 'একবার নেমে দ্যাখ বাপু পারিস যদি। সাত ভরি সোনা আছে ওতে। পুরো একটা টাকাই দেব তোকে, যা।'

খানিক ভাবিয়া তেল মাখিয়া কালু ইঁদারার ভিতরে নামিয়া গেল। এ বড় সহজ কথা নয়। অবিশ্রাম গোলা-বৃষ্টির মধ্যে যে উন্মাদ আগাইয়া যায় সে সৈনিক, কালু তার চেয়ে কম সাহসী নয়। সে পাকা ডুবুরী, জলের পেষণে মানুষ কি হইয়া যায় সে তাহা জানে। একটি টাকার জন্যই সে কি জানিয়া শুনিয়া কৃষ্ণেন্দু সরকারের পঙ্কিপূর্ণ ইঁদারায় ডুব দিল? অথবা এমনি ভাবে মানুষ জীবিকা অর্জ্জন করে, ক্ষুধা ও তপস্যা প্রয়োজন ও কাব্যকে একত্র মিশাইয়া। কিন্তু তল কালু পাইল না। ভাসিয়া উঠিয়া মড়ার মত দড়ি ধরিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

কৃষ্ণেন্দু সরকার হাঁকিয়া বলিলেন, 'পেলি?'

কালু শুনিতেও পাইল না, জবাবও দিল না। খানিক পরে অতিকষ্টে সে উপরে উঠিয়া আসিল। ইঁদারার পাশে বর্ষার শাওলায় পিছল সিমেণ্ট করা স্নানের জায়গাটুকুতে বসিবামাত্র গলগল করিয়া তাহার নাক দিয়া এক ঝলক রক্ত বাহির হইয়া গেল। কিন্তু ইহাতেই সে যেন একটু সুস্থ বোধ করিল। বুকে একটা অসহ্য ভার চাপিয়া ধরিয়াছিল, রক্ত হইয়া তাহা বাহির হইয়া গিয়াছে। কালুর রক্তবর্ণ চোখ জলে ভরিয়া গেল। সমস্ত জগৎ যেন অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সব স্তব্ধ, কোথাও এতটুকু শব্দ নাই। এখনও সে যেন জলে ডুবিয়া আছে। এ শুধু আশ্চর্য্য নয়, এ ভয়ানক। সে কালা হইয়া গিয়াছে।

দিন-তিনেক সে বিছানায় শুইয়া রহিল। বুকের যন্ত্রণা একরাত্রি ঘুমাইয়াই কমিয়া গেল। কিন্তু আকস্মিক বধিরতা সারিতে সময় লাগিল। সম্পূর্ণ সারিলও না। কালু কানে কম শুনিতে লাগিল। জলস্পন্দনে গুঞ্জরিত যে-স্তব্ধতা এতকাল কূপে ইঁদারায় তাহার প্রিয় ছিল, এখন তাহাই স্থায়ী ভাবে লাভ করিয়া কালুর মন নিরানন্দে ভরিয়া গেল। তাহার জগৎ এবার ক্রমে ক্রমে একেবারে শব্দহীন হইয়া যাইবে এই ভয় সে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারিল না।

কিন্তু সে মরে নাই। সে জীবিত। তাহার জীবিকা চাই।

সে আধপেটা খায়, বউ গালাগালি দেয়, ছেলেমেয়েগুলি ক্ষুধায় কাঁদে। কালু আবার গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। বাড়ি বাড়ি খোঁজ করিয়া শুনিল, তাহাকে কাহারও প্রয়োজন নাই। নদীর ধারে গিয়া দেখিল, অটুট বাঁধ দাঁড়াইয়া আছে, নদীর পঙ্কিল স্রোত শান্ত। মাঠে ধানের শিষগুলিতে রং ধরে নাই, রোদ লাগিয়া সবুজ রংকে হলদে দেখাইতেছে, ফাঁকি ঘুচিয়া এ-রং কায়েমী হইতে অনেক দেরি। বর্ষার আগে যে যেমন পারিয়াছে ঘরের চাল মেরামত করিয়াছে, যে পারে নাই সে কালুকে ডাকিবে না, কালুর মতই হয়ত সে আধপেটা খাইয়া সুদিনের পথ চাহিয়া আছে! শহরের পথে মন্থর পদে চলিতে চলিতে কালু লক্ষ্য করে, জীবিকা অর্জ্জনের মরসুম সকলের ফুরাইয়া যায় নাই। গাড়োয়ান কর্দ্দমাক্ত পথে গাড়ী চালাইতেছে, ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া ফিরিতেছে, কুলি মোট বহিতেছে, স্যাকরার ঘরে অবিরাম ঠুকঠুক শব্দ, কুমোরের দাওয়ায় চাকার আবর্ত্তন, ধোপার পিঠে কাপড়ের বোঝা। দিনের পর দিন তাহার কোদাল চালানোর ইতিহাস কালু ভুলিয়া যায়ঃ সৃষ্টির সেই অফুরন্ত উল্লাস, ইঁদারায় ডুব দিবার রোমাঞ্চ, সাত কলসী মোহরের স্বপ্ন, সুখ ও সচ্ছলতার সেই সানন্দ দিনগুলি। সে ঈর্ষা বোধ করে। তাহার আপশোষ হয়। ভাঙা রাস্তার যেখানে মিউনিসিপ্যালিটির কুলিরা মাটি ফেলিতেছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহাদের কাজ দেখে।

তার পর এক দিন সকালে দড়ি-হাতে গামছা-কাঁধে মধুকে সে কৃষ্ণেন্দু সরকারের বাড়ির দিকে যাইতে দেখিল।

'কোথা যাস্ মধু?'

'সরকার-মশা'য়ের বাড়ি। অনন্ত তুলে দিলে পাঁচ টাকা কবুল করেছেন।'

'জল কত জানিস্? মরবি তুই মধু, মরবি।'

মধু উদাস ভাবে বলিল, 'কপালে লেখা থাকে মরব— অদেষ্ট কে ঠেকাবে কালু-দা, এঁ্যা?'

কালু মুখ কালো করিয়া বলিল, 'চ, আমিও যাই।'

পাঁচ টাকা? কালুর বুকের ভিতরে কেমন করিতে লাগিল। বর্ষার জল প্রথমটা তাড়াতাড়ি কমিয়া যায়, ক'দিনে ইঁদারার জল না-জানি কত নীচে নামিয়া গিয়াছে। এখন হয়ত অনন্ত তুলিয়া আনা আর অসম্ভব নয়! পাঁচটা টাকা তাহা হইলে মধুই পাইবে? কালু আড়চোখে মধুর মুখের দিকে চাহিয়া রাগিয়া উঠিতে লাগিল। মধু এক দিন এ-ব্যবসায়ে হাতেখড়ি দিয়াছিল, তাই না পৃথিবী-সুদ্ধ সকলে যখন কাজে ব্যস্ত, পথের ধাঙ্গর মেথর পর্য্যন্ত, কাজের মরসুমের অপেক্ষায় ঘরে তাহার অন্ন নাই! আর সেই মধু আজ তাহার হকের ধনে ভাগ বসাইতেছে। কৃষ্ণেন্দু সরকার তাহাকে প্রথম ডাকিয়াছিল, অনন্ত তুলিয়া পুরস্কার-লাভের অধিকার সে ছাড়া আর কাহারও নাই। এ কি অন্যায় মধুর! ওকি ডাকাত নাকি? সমস্ত পথ কালুর রাগ বাড়িতে লাগিল। কৃষ্ণেন্দু সরকারের বাড়ি পৌঁছিয়া মধুর সঙ্গে সে এমন কলহ জুড়িয়া দিল বলিবার নয়।

কৃষ্ণেন্দু সরকারই মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিয়া দিলেন। বলিলেন, 'পারিস যদি, নাম, তুই-ই নাম বাপু।'

কালু সর্ব্বাঙ্গে তেল মাখিল, নাকে ও কানে তেল ভরিয়া দিল, তারপর দড়ি ধরিয়া নামিয়া গেল ইঁদারার ভিতরে। জল কয়েক হাত কমিয়াছে। ডুব দিয়া কালু ভাসিয়া উঠিল একেবারে অজ্ঞান অবস্থায়। জ্ঞান নাইবা রহিল, জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে; দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিয়া দেখা গেল, অনন্তটি সে শক্ত করিয়া ধরিয়া আছে। প্রকৃতপক্ষে, কালু জ্ঞান হারায় নাই। সহ্যের অতিরিক্ত কিছু, যাহা জলের চাপ ছাড়া হয়ত আর কিছুই নয়, সহ্য করিয়া সে অশক্ত, বিহ্বল ও মুহ্যমান হইয়া গিয়াছিল। গলগল্ করিয়া নাক দিয়া কয়েক ঝলক রক্ত বাহির হইয়া যাওয়ার পর সে একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল।

সে পাঁচটা টাকা রোজগার করিয়াছে।

সাগরিকা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

জগৎ জুড়িয়া যত ক্রন্দন, হা-হুতাশ,
ফোঁস-ফোঁস-শ্বাস, আকুল বাষ্পবিন্দু—
ছড়ানো বেদনা কুড়ায়ে কুড়ায়ে বারো মাস
ঐ বুকে তব বাঁধিয়া রেখেছ সিন্ধু!

অশ্রু তোমার শুকায় না তাই, জননি,
কভু তা' জমিয়া মুক্তা শুক্তি-অঙ্কে
শোণিতের মাঝে ধ্বনিত যে ব্যথা, জানি নি—
রক্তপ্রবালে পরিণত তব পঙ্কে!

চঞ্চলতার শেষ নাই আর জীবনে
বৎসলতায় চির অশান্ত চিত্ত,
আর্ত্ত ধরায় কল্যাণ মাগি' বিজনে
কোটি জিহ্বায় জপো কার নাম নিত্য?

মাঝে মাঝে বুঝি থাকিতে পার না নীরবে—
অন্তর তব গুমরিয়া উঠে গর্জ্জনে,
বিসরিয়া তাই অপার উদার গরবে
ডুবাও সৃষ্টি ও তর্জ্জনীর তর্জ্জনে

কোটি সন্তানে ঘেরিয়া আদরে চারিধারে
পালন করিছ অমৃতসরস স্তন্যে,
যে স্নেহ তোমার বক্ষে বহিছে বারিধারে—
সে-কথা তোমার কেমনে জানিবে অন্যে?

ওগো মহীয়সি প্রথমা জননি পৃথিবীর,
লহ মা প্রণাম হে আদি প্রকৃতি চণ্ডি,
কবে মুছাইয়া ক্ষুদ্র জীবের আঁখিনীর
পার করি' দিবে দুঃখসুখের গণ্ডী?

বিলাতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সম্মান

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪২ সনের ৯ই জানুয়ারি স্বনামধন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম বার বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার বিলাত-প্রবাসের কথা সেকালের একখানি সাময়িক পত্রে যেটুকু বাহির হইয়াছিল এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। কাগজখানির নাম—'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর'। প্রধানতঃ রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্রই ইহা পরিচালন করিতেন।

(বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর, ১ অক্টোবর ১৮৪২)

আগষ্ট মাসীয় স্থলপথগামি ডাক।—এতন্মাসীয় ১৭ দিবসে বেলা ১০॥ সাড়ে দশ ঘটিকার সময় আগষ্ট মাসের স্থলপথগামি ডাক আসিয়া পঁহুছিয়াছে, তদ্দারা অবগত হওয়া গেল, শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে রাণী তৎপরিবার এবং লার্ড প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তি ও অন্যান্য মান্য ভদ্রলোকের নিকটে যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন; উক্ত বাবু এবং শ্রীযুত চন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহাঁদিগকে লার্ড মেয়ার ভোজ দিয়াছিলেন এবং বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর "রাজা দ্বারকানাথ ঠাকুর জমীদার" এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বাবু মহারাণীর সহিত অনেকবার ভোজন করিয়াছেন কিন্তু ঐ খ্যাতি ইংলণ্ডেশ্বরী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন কিনা তাহা আমরা বিশেষরূপে জানিতে পারি নাই; আমরা শুনিতে পাই ঐ বাবু ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ডের মধ্যবর্ত্তি যে সকল গ্রামে শিল্পকর্ম্মের প্রাচুর্য্য আছে তথায় অতিশীঘ্র গমন করিবেন।

(বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর, ১লা নবেম্বর ১৮৪২)

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর আগষ্ট মাসে স্কটলণ্ড দেশ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছিলেন; এডেনবরু নগরের কৌন্সেলিরা এক মহাসভা করিয়া উক্ত বাবুর যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়াছেন এবং তত্রস্থ মাজিষ্ট্রেট ও কৌন্সেলিরা নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এবং লার্ড প্রবোষ্ট সাহেব ঐ বাবুর সুখ্যাতির বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া তাঁহাকে নগরবাসির মধ্যে গণ্য করিয়াছেন এবং বাবুও উত্তম বক্তৃতা করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তিনি কহিয়াছেন যে আমার শ্রোতারা আমাকে যে সম্ভ্রম প্রদান করিলেন ইহাই আমার জন্মদেশের উপকারের চিহ্নস্বরূপ, এবং যাহাতে বাঙ্গালা দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় এতাদৃশ কর্ম্মে তাঁহারা উৎসাহী হইবেন, এমত যদি জানিতে পারি তবে আপনকারদিগের দত্ত এই সম্ভ্রমকে অতিশয় কিম্মতীরূপে গণনা করিব। শুনা গেল যে উক্ত বাবু সাধারণ উপকারজনক কর্ম্মের মধ্যে নিষ্কর ভূমির বিষয়ে এক আবেদন পত্র তত্রস্থ প্রধান২ কর্ত্তৃপক্ষ লোকদিগের নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম যে ঐ বাবু আক্টোবর মাসের জাহাজে ইংলণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন কারণ তিনি আর অধিক দিন তথায় বাস করিলে সেথানকার শীতে তাঁহার শারীরিক পীড়া হইবার সম্ভাবনা হইত।

(বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর, ১ ডিসেম্বর ১৮৪২)

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্কটলণ্ড দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, সেথানে যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন; উক্ত বাবু কোন্ দিবস তথা হইতে ইংলণ্ড দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন তাহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। শুনা গেল যে তিনি ইংলণ্ডের মহারাণীকে এক মহামূল্য শাল এবং প্রিন্স আলবর্টকে এক কিম্মতীয় ছোরা উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন, ঐ বাবু ৩০ সেপ্টেম্বরে উইণ্ডসর দেশের রাজপ্রাসাদে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহাতে মহারাণী ও প্রিন্স আলবর্টের নিকট যথেষ্ট সৎকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং ঐ স্থানেই মহারাণীর নিকটে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার বিদায় লইয়াছেন। অবগত হওয়া গেল যে ইংলণ্ডেশ্বরী উক্ত বাবুকে আপনার ও প্রিন্স আলবর্টের এক প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিবার মানস প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বাবু ১৫ আক্টোবরে পেরিস নগরে গমনার্থে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছেন, তৎস্থান হইতে মারসেলিস এবং আলেকজেন্দ্রিয়াতে যাত্রা করিবেন। আমরা শুনিলাম, যে বাবু 'নাইট' উপাধি গ্রাহ্য করেন নাই তিনি সুএজে গত মাসের ২৫ পঁহুছিয়া থাকিবেন ও আগামি মাসের শেষে এতন্নগরে আসিতে পারেন।

(বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর, ১ জানুয়ারি ১৮৪৩)

শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত মহারাণীর নিকট বিদায় গ্রহণের পর বোর্ড আব কণ্ট্রোলের সভাপতি লার্ড ফিডজর লাণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ঐ সাহেব শ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞানুসারে উক্ত বাবুকে ইংলণ্ডেশ্বরীর পরমানুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ এক সুবর্ণ মিডেল প্রদান করিয়াছেন, এবং বাবুর প্রশংসা করিয়া এক বক্তৃতা করিয়াছেন। ২১ আক্টোবর কোর্ট আব ডিরেক্টরেরা ঐ বাবুকে তদ্রূপ এক স্বর্ণমিডেল এবং তাহার সাধারণোপকারিত্ব গুণের প্রশংসাসূচক এক পত্র প্রদান করেন, বাবুও অতিশয় সম্মান পুরঃসর তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন। ২৮ আক্টোবরে তিনি ফ্রান্সদেশে গমন করত তথাকার রাজার নিকট যথেষ্ট অভ্যর্থনা পাইয়াছেন, বাদসাহদিগের যে সকল নিয়ম আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া ঐ রাজা বাবুকে স্বীয় পরিবারের মধ্যে উপবেশন করাইয়াছিলেন। এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া রাণী ও অন্যান্য রাজা এবং রাজ্ঞীর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় করিয়া দিয়াছেন; এবং তাঁহার সম্মানার্থ রাজবাটী আলোকময় হইয়াছিল। আর রাজা বাবুকে বাটীর সকল অংশ দেখাইয়াছেন, এবং তাহার সহিত ভারতবর্ষের অবস্থা ও তৎসম্বন্ধীয় আর২ বিষয়ে অনেক কথোপকথন করিয়াছেন এবং বাবুকে পুনর্ব্বার তদ্দেশে যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন, বাবুও ১৮৪৩ শালে শীতকালে যাইতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। উক্ত বাবু গত মাসের ১৩ তারিখে এটলোণ্টর জাহাজ দ্বারা রোমে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং ধন আনয়নের নিমিত্ত ইণ্টর প্রাইজ নামক যে জাহাজ রোমে প্রেরিত হইয়াছে তদ্দারা তিনি মান্দ্রাজে আসিবেন, অনুমান হয়, অবিলম্বে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

দ্বারকানাথ বাবু সাধারণের অথবা আপনার কোন কর্ম্মের ভারগ্রস্ত হইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন নাই, তিনি শুদ্ধ আমাদের নিমিত্ত ও নানাবিধ আশ্চর্য্য বিষয় সন্দর্শন ও দেশভ্রমণের জন্য গমন করিয়াছেন, যাহা হউক, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে দেশভ্রমণার্থ উৎসাহ প্রথমে কেবল তাঁহারি দৃষ্ট হইল। এক্ষণে অস্মদ্দেশের অন্যান্য ধনাঢ্য জ্ঞানবান্ মনুষ্যেরা ইংলণ্ড গমনের এই এক দৃষ্টান্ত পাইলেন, কিন্তু এবিষয়ে আমরা যদিও আপাতত আশা করিতে পারি না তথাপি ঐ সকল মহাশয়দিগকে এই অনুরোধ করিতে পারি যে তাঁহারা স্ব সন্তানগণের শিক্ষা পূর্ণ করণার্থ একং বার তাহাদিগকে ইংলণ্ড স্বরূপ মহাতীর্থে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করুন। এখান হইতে ইংলণ্ডে যাইতে ৫০ দিন লাগে এবং ৪০ দিনে তথা হইতে এখানে আসা যায়, ইহাতে প্রায় তিন মাসের মধ্যেই গমনাগমন নিষ্পন্ন হয় আর সেখানে গিয়া বিবিধ বিষয় দর্শন ও কিঞ্চিৎ কাল অবস্থিতি করণ ইহাও দুই মাসের মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে অতএব সর্ব্বশুদ্ধ ছয় মাস অপেক্ষাও ন্যূন কালে ঐ আশ্চর্য্য দেশভ্রমণ নিষ্পন্ন হইবেক; আমারদের দেশের বারাণসী প্রয়াগাদি তীর্থ যাত্রিরা ঐ সময়ের মধ্যে তীর্থযাত্রা সাঙ্গ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন না।

(বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর, ১ জানুয়ারি ১৮৪৩)

শুনা যাইতেছে, ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সোসাইটীর উৎসাহী সভ্য, এবং এতদ্দেশের বিশেষ মঙ্গলার্থি মেং জার্জ্জ তামসন সাহেব···শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমভিব্যাহারে এতদ্দেশের বিষয় সকল উত্তমরূপে অবগত হইবার নিমিত্ত আসিতেছেন; তাঁহার মানস এই, ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া ভারতবর্ষের প্রজাদিগের উপর যে২ অত্যাচার হয় তাহার আন্দোলন করিবেন।

কবি ও কর্ম্মী অতুলপ্রসাদ

ডক্টর শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ

যে গভীর শোকে শুধু বাঙালী নহে লক্ষ্ণৌবাসী সকলে মুহ্যমান, তাহা পাছে ভাষাকে শ্লথ ও রুদ্ধ করে সেইজন্য আমার এই লিখিত অভিভাষণ। অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের ব্যক্তিত্ব উদার ও বিশাল ছিল। তিনি যেমন বাঙালীর, তেমনি এদেশবাসীরও নেতা ছিলেন। এদেশবাসীর সঙ্গে নিবিড় সামাজিক প্রীতির নিগড়ে তিনি যাবজ্জীবন আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রাজনীতিও বাঙালীর রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন। তিনি ছিলেন উদার লিবারাল। মনোমোহন ঘোষের মত গোখলেও ছিলেন তাঁহার রাজনৈতিক গুরু। বাঙালীর প্রাদেশিকতা ভুলিয়া তিনি কি রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে, একটা সমগ্র আদর্শ অনুধাবন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এদেশের জননায়কত্বের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এইজন্যই আমাদের বড় শোক যে তাঁহার মৃত্যুতে আমরা শুধু যে তাঁহাকে হারাইলাম তাহা নহে। তাঁহার জীবন এদেশবাসীর কৃষ্টি, রাষ্ট্র ও সমাজনীতির সহিত একটা মিলন-গ্রন্থি ছিল। এই মিলন-গ্রন্থি ছিঁড়িয়া যাওয়াতে আমরা প্রবাসের রাষ্ট্র ও সমাজজীবন হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইব। আমি কিন্তু এ-সম্বন্ধে একেবারে আশা ত্যাগ করিতে পারি না। কারণ বাঙালীর ব্যাপকতর জীবনের এই প্রতিভু, অতুলপ্রসাদ সেনের সমগ্র জীবনের দান ও ত্যাগধর্ম্ম ও তাঁহার পরিশীলনের প্রসারতা আমাদিগকে সঙ্কীর্ণতা হইতে অনেকটা রক্ষা করিবে, সন্দেহ নাই।

১৮৭২ সালে ঢাকা শহরে ডাঃ রমাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পুত্র অতুলপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাঃ সেনের সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। শিশু অতুলপ্রসাদ বাড়িতে অহরহ তাঁহার সুললিত সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি শুনিতেন। তখন হইতেই একটা ছন্দের নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। এদিকে তাঁহার দাদামহাশয় শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্তের প্রভাব তাঁহার উপর কম হয় নাই। তিনি সে-সময়কার এক জন প্রসিদ্ধ বাউলগান-রচয়িতা ছিলেন। প্রবাসী-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় যে নিজেকে বাংলা-সাহিত্যের বাউল বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন, সত্যই ইহাতে তাঁহার উত্তরাধিকার।

স্কুল ছাড়িয়া অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং আঠার বৎসর বয়সে তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে যান। ইংলণ্ডে অরবিন্দ ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, লোকেন পালিত, চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার মৈত্রী বিলাতী

রসাস্বাদনে দিন কাটিত। বিখ্যাত ঘোষ-ভ্রাতাদ্বয় তখন বিলাতে কাব্যরচনায় খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন। সে-সময় আরভিঙের শেক্সপীয়রের নাটকগুলির অভিনয় বিলাতে এক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় বহুদিন ধরিয়া পাশ্চাত্য নাট্যকলারও সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য উপভোগ করিতেছিলেন। বিলাতে চিত্রকলার চর্চ্চাও তিনি কিছু দিন অধ্যবসায়ের সহিত করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধেও একটি গবেষণা-পূর্ণ, রসাবিষ্ট প্রবন্ধ ইংলণ্ডে পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে প্রথম তাঁহার দেশীয় সঙ্গীতের স্বতন্ত্র ধারা সম্বন্ধে মত পরিস্ফুট হইয়াছিল।

অথচ নেপল্‌স্ বন্দরে যখন জাহাজ থামিয়াছে তখন গণ্ডোলা-বিহারী ভিখারীদিগের মুখে ফাউষ্টের গান শুনিয়া তিনি ভাঙা ইটালীয় সুরে নূতন গান রচনা করিয়াছিলেন। যে-গানে বাংলার গান-রচনায় এক রকম প্রথম দেশী-বিদেশী সুরের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল, সেই গানটি হইতেছে

> উঠগো, ভারত-লক্ষ্মী! উঠ আজি জগত-জন-পূজ্যা!
> দুঃখ দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লজ্জা!
> ছাড় গো, ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা
> পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে!

১৮৯৫ সালে তিনি দেশে ফিরেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গগনেন্দ্র ঠাকুর, সুরেশ সমাজপতি, লোকেন্দ্র পালিত, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি মিলিয়া একটা মধুচক্র রচনা করিয়াছিলেন। সে বৈঠকটির নাম ছিল 'খেয়ালী'। সেখানে অতুলপ্রসাদ সেন তাঁহার অনেক নূতন রচিত গান গাহিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আযৌবন বন্ধুত্ব তাঁহার সাহিত্য-সাধনার কম সম্পদ ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান অতুলপ্রসাদ এতই ভাল গাহিতেন যে, রবীন্দ্রনাথ এই আসরে তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন 'নন্দলাল,' যে 'নন্দলাল একদা করিল ভীষণ পণ।'

এই যুগে ক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের প্রভাব এতই বেশী হইয়াছিল যে, অতুলপ্রসাদ সেনের অনেক সুললিত গান রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়াই লোকে গাহিত। অতুলপ্রসাদও সাত বৎসর পরে তখন প্রবাসী হইলেন। সুদূর প্রবাসে তাঁহার কাব্য ও গানের নিবিড় রসসঞ্চার হইতে লাগিল। উত্তর-ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা বাংলা দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা হইতে অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র। যে উদার প্রাণে অতুলপ্রসাদ সেন এদেশের সামাজিক মিষ্টালাপে আপনাকে ঢালিয়া দিয়া এদেশবাসীর সহিত নিবিড় আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার কবি-জীবনের রসপ্রেরণা হইয়াছিল। অতুলপ্রসাদ সেন যেমন তুলসীদাস ও কবীরের ভাব ও সাহিত্যে মাতিয়া গেলেন, তেমনই মুসলমানের গীতিকবিতাও তাঁহাকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল। তাই বাঙালী কবির পদাবলী উত্তর-ভারতে একটা নূতন ছাঁদ পাইয়াছে, যাহা বাংলা-সাহিত্যে একেবারে নূতন জিনিষ। যে-দেশে তুলসীদাস কবি, সেখানে সাহিত্য সার্ব্বজনীন। সাহিত্যিক বলিয়া নূতন কোন জীব এদেশে দেখা দেয় নাই, কারণ সাহিত্যে সকলের সমান অধিকার, সাহিত্যের অনুভূতি সহজ সরল লৌকিক অনুভূতি। কবি অতুলপ্রসাদ সেন তাই কবি হইয়াও নিজের সঙ্গে অপরের কোন ব্যবধান সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার কবিতার সহজ লৌকিক আবেদন ও তাহার সরল ভাব প্রকাশের মূলসূত্র এইখানে। যে-সমাজে তিনি কবি সে-সমাজে গায়ক, দোঁহা ও গজল রচয়িতার ভাব প্রকাশ বাংলা দেশ অপেক্ষা উদারতর ও আভিজাত্যহীন বলিয়া তাঁহার গান ও ছন্দ বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে, এমন কি নিরক্ষর অশিক্ষিতকেও এত আকৃষ্ট করিয়াছে।

ঊর্দ্দু ভাব ও সাহিত্য তাঁহার গান ও ছন্দকেও কম ভূষিত করে নাই। তাঁহার গানে ও ছন্দে আছে আরব-মরুভূমির তৃষ্ণার জ্বালা, অপর দিকে আছে একটা কঠোর বৈরাগ্য। এক দিকে আছে ওয়েসিসের ভোগের চঞ্চল-চরণ-ভঙ্গ, অপর দিকে মায়ামরীচিকার পরপারে চিরশান্তি। প্রকৃতি ও জীবন তাঁহাকে যত দান করিয়াছিল তাহাদের সম্পদ, তাহা অপেক্ষা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিল অধিক,—মরুজীবনের বিজলতা আনিয়া দিয়া, তৃষ্ণার অমৃতের পরিবর্ত্তে গরলের পেয়ালা বার-বার তাঁহার শুষ্ক ওষ্ঠপুটে ধরিয়া,—

প্রেম-নীরে ভরি, আশার কলসা
কত না যতনে সেচিনু তায় !
ফুলদল আসি কহে পরিহাসি,
কোথায়, তব বঁধু কোথায় ?

কিন্তু জীবনের এই নিদারুণ পরিহাস তাঁহার অন্তরকে তিক্ত না করিয়া বরং মধুর, স্নিগ্ধ ও কোমল করিয়াছিল। কবি স্বল্পভাষী ছিলেন। উর্দ্দু-মার্শীয়া ও গজল গানের মর্ম্মন্তুদ দুঃখের আড়ালে একটা সহজ বিশ্বাস যেমন তাঁহাকে মুগ্ধ করিত তেমনই তাহাদের সহজ প্রকাশভঙ্গিও তিনি আপনার রচনায় আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গীতি-কবিতার এ ছাঁদ বাংলায় আর নাই। এমন ছন্দেরও বৈচিত্র্য নাই। শুধু ছন্দের দিক হইতে

(পিলু)

বাদল রুম ঝুম বোলে,
না জানি কি বলে !
বুঝিতে পারি না কথা,
তবু নয়ন উছলে !
কাহার নূপুরধ্বনি
শুনাইছে আগমনী ?
বিরহী পরাণ তারে যাচে ;
আশা-ময়ূরগুলি পুচ্ছ মেলি নাচে ;
রাখিব পরাণ-খানি তার চরণতলে !

(সাওয়ন)

ঝরিছে ঝর ঝর
গরজে গর গর,
শ্বসিছে সর সর
শ্রাবণ মাঃ।

এই গানগুলির সুর বাঙালীর প্রাণকে কাড়িয়া লইয়াছে তাহাদের গতির চঞ্চলতা ও কমনীয়তার জন্য। কিন্তু ...লার গ্রামে ও শহরে এই গানগুলি গাহিতে গাহিতে ...র ভবিষ্যতে কবে কোন্ বাঙালী মনে করিবে টেরাইয়ের ...ই নিঝুম, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির রাত্রি, উদাস কবি যখন ...রেইচের ডাক-বাংলার বারাণ্ডার রেলিংএ ভর দিয়া ...টার পর ঘণ্টা বর্ষাপ্রকৃতির বিরহবেদন ভোগ করিতেন, ...র বাহির দুই ভরিয়া একটা ঘন অন্ধকার দামিনীর ...ভাষে যখন তাঁহাকে অসীমের প্রেম-সম্ভাষণ জানাইত ? ...মনই

চাঁদিনীরাতে কে গো আসিলে

...লা অপেক্ষা উত্তর-ভারতের তীব্রতর জ্যোৎস্নারাত্রির ...লি ছটা এই গানে নূতন ছন্দের সমাবেশ আনিয়াছিল।

বাস্তবিক উত্তর-ভারতের লৌকিক হোলি, কাজরী, চৈতী, শাওয়নী, লাউনী, ভজন, রামায়ণী ও গজলের সুর তাঁহার অন্তরে নিগূঢ়ভাবে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের ছন্দ ও তাল অতুলপ্রসাদের গীতি-কবিতায় ললিত নূতন



অতুলপ্রসাদ সেন

রূপ পাইয়াছে। এই সংযোজনাতেই তাঁহার প্রতিভার কৃতিত্ব। বলা বাহুল্য, দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও কনক দাস তাঁহার নিকট হইতে গান লইয়া বাংলা দেশকে তাঁহার সুর ও তালের সহিত নিবিড় পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু বাংলা দেশে তাঁহার গান অনেক সময়ই পরিবর্ত্তিত, এমন কি বিকৃত হইয়াও গীত হয়।

কিন্তু সুর ও তালের আবেদন অপেক্ষা তাঁহার গীতি-কবিতার আকর্ষণ হইতেছে তাঁহার নিদারুণ ব্যথা. শেলীর সেই নির্দ্দেশ Our sweetest songs are those

that tell of saddest thoughts. জীবন-মরুতে তাঁহার গানগুলি যেন বাসরার গোলাপ, কাকটাস-বনের রক্তকুসুম। কাঁটার বনে বৈরাগী একতারা লইয়া যখন ব্যথাভরে গান গায়

সুরভি পবন মোরে বুরাইছে মিছে ঘোরে—
শুধু কি ফুটাও কাঁটা? ফুটাও না কি মুকুল?

তখন যিনি ব্যথার ব্যথী তিনি চরণের ব্যথা দূর করিয়া অন্তর কুসুমের গন্ধে ভরপুর করিয়া দেন। এই যে আমাদের বাউল, অতুলপ্রসাদ, যাঁহার 'অন্তরে মোর বৈরাগী গায় তাইরে তাইরে নাইরে না,' তিনি কিন্তু বাংলা দেশের মত বাউল নহেন। তিনি যেন উত্তর-ভারতের পল্লীবাটের দরবেশ। উত্তর-ভারতের মাঠে মাঠে শিমুল পলাশের রক্তিম শোভা তাঁহার হৃদয়কে রাঙিয়া দিয়াছে। রাজপুতানার মার্ত্তণ্ড-পীড়িত ধূসর মাঠ তাঁহার হৃদয়কে বিদগ্ধ করিয়াছে। যমুনার দুকূল-প্লাবন কত প্রেম কত গানে এই দরবেশকে টানিয়াছে। গঙ্গা-সরযূর উদার শ্যামল অঙ্গে চৈত, কাজরী, ঝুলন ও হোলী উৎসব ঋতুপর্য্যায়ে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে। বিন্ধ্যগিরির পর্ব্বতগাত্রে ও রামগড়ের উপত্যকায় যে বীর্য্য ও স্বাধীনতা প্রতিধ্বনিত হইতেছে তাহাও তিনি শুনিয়াছেন। সেই স্বাধীনতার দুঃসাহসের গান আজ কলিকাতার হাজার কর্পোরেশন স্কুল ছাত্রদের মুখে প্রতিধ্বনিত, "বল,বল, বল সবে শত বীণা বেণু রবে, ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।" কিন্তু এই দরবেশের গানের উন্মাদনা একটানা দুঃখ হইলেও তিনি গানগুলি বাজাইয়াছেন ভাষার সূক্ষ্ম চুম্‌কির কাজে, সুর ও ছন্দের লীলাবৈচিত্র্যে। এদেশের ঘরে ঘরেই যে সুন্দর কারুশিল্প। উত্তর-ভারতের পল্লীবধূর কেশবিন্যাসে ও নানাবর্ণ বিভূষণে, তাহার চিকণের শোভন বয়নে, যে সুষমা তাহার অন্দরের আনন্দকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই এই দরবেশ আপনার গানে ধরিয়াছেন। তাই তাঁহার এক-একটি গান যেন গেরুয়া জমিনের উপর চিকণের কাজ-করা এক একখানি রুমালের মত। দুঃখময় ভগবানের দিকে বিপদের ঝটিকায় উদ্বেল হইয়া তাঁহার গানগুলি কত না লীলাতরঙ্গে ভাসিয়া চলিয়া যায়।

কিন্তু আজ আমরা এই প্রসঙ্গে অতুলপ্রসাদ সেনের গান ও কবিতার আর আলোচনা করিব না। শুধু প্রবাস নহে, বাংলা দেশ হইতেও তাঁহার গীতি-কবিতার যথোচিত সমাদর আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে থাকিব। তাহা ছাড়া আমরা যাঁহাকে হারাইয়াছি তিনি শুধু যদি কবিই হইতেন, তাহা হইলে আমাদের শোক এত আন্তরিক ও দুর্ব্বহ হইত না। তিনি আমাদের প্রবাসী সমাজের নায়ক ছিলেন। আজীবন তিনি বাঙালী ইয়ং মেন্‌স্ য়্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। সম্মিলিত বাঙালী ইয়ং মেন্‌স্ য়্যাসোসিয়েশনের ও বেঙ্গলী ক্লাবেরও তিনি সভাপতি ছিলেন। সামাজিক হিসাবে তিনি লক্ষ্ণৌবাসী বাঙালীর সঙ্গে এত নিবিড় ভাবে মিশিতেন যে, প্রত্যেক বাঙালী তাঁহার মৃত্যুতে ব্যক্তিগত শোক অনুভব করিতেছে। সেদিনকার বিরাট বিষাদযাত্রায় কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বাঙালী, কি অবাঙালী যে শোকে তাঁহার শবানুগমন করিয়াছে, তাহাও তাঁহার জনপ্রিয়তার নিদর্শন। তিনি প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের এক জন জন্মদাতা। উহার প্রথম অধিবেশন কানপুরে এবং গত অধিবেশন গোরক্ষপুরে সভাপতি হইয়া তিনি প্রবাসী বাঙালীর সংহতির উপদেশ দেন। এমন কোন বাঙালী অনুষ্ঠান এ প্রদেশে নাই যাহা তাঁহার নিকট ঋণী নহে। তাঁহার দান কিন্তু জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ছিল। তিনি বহুকাল ধরিয়া অযোধ্যা সেবাসমিতির সভাপতি ছিলেন এবং নানা লোকহিতকর কার্য্যে তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। অস্পৃশ্যতা-নিবারণ-আন্দোলনেও তিনি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক বার চামার-বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে দেখিয়াছি। এ-সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ পল্লীর সংস্কারে, তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল। গোখলে ভ্রাতৃ-সংঘের তিনি সভাপতি ছিলেন। দূর পথ অতিক্রম করিয়া তিনি গ্রামে গ্রামে কৃষকগণের নিকট দেশের বাণী পৌছাইয়া দিতেন। কবি ও ভাবুক হইয়াও তিনি এক জন অধ্যবসায়শীল কর্ম্মী ছিলেন। লোকশিক্ষাপ্রচার, পল্লীগঠন, অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা বা প্লাবন-পীড়িতের জন্য কল্যাণ কর্ম্ম—সব উদ্যোগে সর্ব্বদাই অগ্রণী হইয়া তিনি দেশের লোককে আহ্বান করিতে জানিতেন। সে আহ্বান এদেশবাসী শুনিত। তিনি

রাজনীতিতে গঠনবাদী ছিলেন এবং দুইবার যুক্ত-প্রদেশের প্রাদেশিক উদারনৈতিক সম্মিলনের সভাপতি হইয়া গঠনের দিকের প্রতিই বিশেষ জোর দিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ তাঁহাকে রাজনৈতিক নেতা বলিয়া চিনে, কিন্তু তিনি যে গান রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন এ-খবর বাংলার বাহিরে অবিদিত। লিবারাল-নেতা হইয়াও তাঁহার একটা বহুদর্শিতা সাহস ও ত্যাগ ছিল যাহা পুরাতন নেতাশ্রেণীর মধ্যে বিরল। তিনি আপনা ভুলিয়া দান করিতে জানিতেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বাভাবিক, অভ্যাসগত দানধর্ম্মের ব্যত্যয় পাছে ঘটে এইজন্য নীরোগ না-হওয়া সত্ত্বেও অর্থোপার্জ্জন তাঁহার মৃত্যুরও প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। মৃত্যুর পর তিনি যে দানপত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেও তাঁহার উদারতা, জাতীয়তা, ও নিঃস্বার্থ দান প্রকাশ পাইয়াছে। এমন একটি সুরসিক অথচ বৈরাগী, ভাবুক অথচ কর্ম্মপ্রাণ, উদার অথচ সাহসী, ক্ষমতাশীল অথচ মৃদুকুসুম লোক পৃথিবীতে বিরল। এই মৃদুকুসুম লোকটির অন্তর হইতে তাঁহার মৃত্যুর পর যে সুবাস ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমাদের প্রবাস-জীবনকে ধন্য করিবে। যিনি গন্ধ বিতরণ করিয়া গেলেন তাঁহার জীবনের যে সার্থকতাই এই অযাচিত, অফুরন্ত দানে। তিনি নিজেই গাহিয়াছেন

ফুলটি ফোটে যবে, ভাবে কি কাল কি হবে,
না হয় তাদের মত শুকিয়ে যাবি গন্ধ করি বিতরণ।"

* লক্ষ্ণৌবাসী বাঙালীর শোকসভায় সভাপতির অভিভাষণ।

রাজমহলের মালপাহাড়িয়া ধর্ম্ম

শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার

সাঁওতাল-পরগণার রাজমহল পাহাড়ের বর্ব্বর জাতি-গুলির মধ্যে মালপাহাড়িয়ারা অপর জাতিগুলি অপেক্ষা কিছু সভ্য। ইহারা এককালে রাজমহল পাহাড়ের শিখরবাসী 'মালে' নামক দ্রাবিড়ভাষী জাতির অন্তর্গত ছিল। দৈহিক আকার, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, প্রভৃতিতে এখন এই দুই জাতির মধ্যে বহু সাম্য আছে; এমন কি দুই-এক জেলায় ইহাদের মধ্যে অন্তর্বিবাহও চলিতে দেখিয়াছি। আদমসুমারীতে ইহাদিগকে বাঙালীর মধ্যে গণনা করা হইয়া থাকে এবং 'ওয়েষ্টার্ণ ডায়ালেক্ট অব বেঙ্গলি' নামক এক ভাষার ভাষী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, অথচ এখন ইহাদের মধ্যে অনেকে ইহাদের আদিম 'মালতো' ভাষায় কথা বলে এবং ইহাদের বাংলা ভাষার মধ্যে বহু 'মালতো' কথা আছে। মালপাহাড়িয়ারা এখন সমতল-ভূমিতে বাস করে এবং এই সমতল স্থানে বসবাস করার ফলে ইহারা অপরাপর নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বাঙালীর কৃষ্টিই গ্রহণ করিয়াছে। সাঁওতাল কিংবা মালেদের মত ইহাদের নিজস্ব গ্রাম অতি অল্পই আছে। বিভিন্ন গ্রামে আসিয়া অপরাপর নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বাঙালীর সহিত প্রতিবেশীর মত বসবাস করিতেছে। নিজস্ব গ্রাম হইলে গ্রামের মোড়ল স্বজাতির মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইতে পারে, কিন্তু মালপাহাড়িয়াদের এই স্বত্ব বহু গ্রামেই লুপ্ত হইয়াছে। জীবিকানির্ব্বাহের জন্যই হউক, অথবা এক গ্রামে এইরূপ নবাগত জাতি যাহাতে গ্রামবাসিগণ অপেক্ষা অধিক বিস্তার লাভ না করে গ্রামবাসিগণের এই দ্বেষের ফলেই হউক, মালপাহাড়িয়ারা সাঁওতাল-পরগণা ব্যতীত বাংলা দেশের বহুস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাংলা দেশে বিগত আদমসুমারীতে ১১,৭৮৯ মালপাহাড়িয়া পাওয়া গিয়াছে।

মালপাহাড়িয়া ধর্ম্মে এখন ইহাদের আদিম ধর্ম্ম এবং হিন্দু ধর্ম্ম, উভয় ধর্ম্মেরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ঈষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের লুপ লাইনের পাকুড় ষ্টেশন হইতে পশ্চিমে গোড্ডা পর্য্যন্ত একটি মোটামুটি সরল রেখা অধুনা 'মালে' এবং 'মালপাহাড়িয়া'দের বিভাগস্থল। এই সরল রেখাটির উত্তর হইতে গঙ্গার উপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত অঞ্চলটি মালেদের বাস এবং এই রেখাটির

হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এই ভৌগোলিক বিভাগের কথা বলিয়াছি।

(ক) পাকুড় মহকুমা এবং পাকুর-গোড্ডা সংযোগস্থল

(১) রাক্‌সী থান ঃ—ইহা একটি মালে দেবতা। গ্রামে ব্যাঘ্রের উপদ্রব হইলে এই দেবতার আরাধনা করা হয়। সিন্দূর দ্বারা একটি ব্যাঘ্রের আকার করিয়া গভীর বনের মধ্যে এই পূজা করা হয়। কোথাও কোথাও মালপাহাড়িয়ারা ইহাকে গ্রামদেবতা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

(২) কালী থান; মাঝি থান; বা বুড়ন থান ঃ—মাঝি থান হইল মালে দেবতার নাম। গ্রামের মোড়লের বাড়ির পার্শ্বে এই দেবতার স্থান প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম মাঝি থান। কোন কোন মালপাহাড়িয়া কালী দেবীর উপর গ্রামের মঙ্গল নির্ভর করিয়া থাকে বলিয়া কালী থান গ্রামদেবতার সহিত সংশ্লিষ্ট। বুড়ন থান সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

(৩) জাহির থান বা চালদই থান, এবং বোকা-পাহাড়ী ঃ—ইহাও একটি মালে দেবতা। সাঁওতালেরাও জাহির থানের পূজা করে। বন, পাহাড় প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া এই দেবতা ইহাদের মধ্যে পরিচিত। ফাল্গুন মাসে শাল বৃক্ষের ফুল ফুটিলে এই দেবতার পূজা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহা এক প্রকার শস্য-দেবতা (harvest deity) বলিয়া মনে হয়। পাকুড় মহকুমার মালপাহাড়িয়ারা বোকা পাহাড়ী নামক দেবতাটির আবিষ্কারক। এখানকার মালপাহাড়িয়ারাও ইহাকে বনদেবতা বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ইহার পূজাপাঠ নূতন শস্যের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া ইহাকেও এক প্রকার শস্য-দেবতার মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

(৪) সিংমানী ঃ—এই দেবতাটি মালপাহাড়িয়াদের নিজস্ব দেবতা। বৎসরে দুইবার এই দেবতার পূজা হয়—একবার বর্ষাকালে আর একবার শীতকালে। একটি প্রস্তরফলকে এই দেবতার ঠাঁই প্রস্তুত হয় এবং ইহাকেও হিন্দু দেবতার মত পশুবলি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতে হয় এবং ছাগ ও মহিষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণিবলি নিষেধ। সিংমানী শব্দটি সিংবাহিনী (সিংহবাহিনী) শব্দের অপভ্রংশ। মাল-পাহাড়িয়ারা, বিশেষতঃ দুমকা মহকুমাবাসীরা, দুর্গাকে এই নামে ডাকিয়া থাকে। পাকুড় মহকুমার মালপাহাড়িয়াদের মধ্যে দুর্গাপূজার প্রচলন নাই বটে, কিন্তু দুমকার এই দেবতার নামটি আসিয়া পড়িয়াছে। পাকুড় মহকুমায় সিংমানীও শস্য-দেবতারূপে পূজা হইয়া থাকে।

(৫) জোক্‌ ঃ—গ্রাম রোগমুক্ত করিতে হইলে এই



ধারতী বসুমতী থান। গ্রাম—গান্দো, দুমকা

দেবতার পূজা করিতে হয়। নদীর তীরে দুইটি হাঁস অথবা পায়রা, কয়েকটি মোরগের ডিম এবং সিন্দূর দ্বারা এই দেবতার পূজা হয়।

(৬) কুরি আড্ডা ও শিব গোঁসাই ঃ—কেবল মাত্র পাকুড়-গোড্ডা সংযোগস্থলের মালপাহাড়িয়া গ্রামে এই দেবতা দুইটির সন্ধান পাইয়াছিলাম। ইহারাও 'মালে' দেবতা। কুরি আড্ডা এক প্রকার গ্রামদেবতা এবং গো মহিষ প্রভৃতি পশ্বাদির আপদে শিব গোঁসাইয়ের পূজা হয়। এই মালপাহাড়িয়া গ্রামখানিতে এই দুইটি দেবতার স্থান ছিল না, তবে গ্রামবাসীরা তাহাদের আপদে এই দেবতার স্মরণ করিতে ভুলিয়া যায় না।

(খ) দুমকা মহকুমা।

(১) মাড়ো ঃ—মালপাহাড়িয়াদের মধ্যে বিবাহকালে

রপক্ষ কন্যাপক্ষের গৃহে যাত্রার পূর্ব্বে এই পূজা রিয়া থাকে। ডুমকা মহকুমা ব্যতীত অন্য কোথাও ই দেবতার নাম শুনি নাই। 'মালে'দের মধ্যে এই সময় ক্সি দেবতার পূজা হয়। ডুমকার মালপাহাড়িয়াদের মধ্যে লপাহাড়িয়া পুরোহিত কেবল এই পূজা করিতে পারে।

তিন শ্রেণীতে সারি সারি নয়টি খুঁটি পোতা হয় এবং ইগুলির মধ্যের খুঁটিতে এই পূজা করা হয়। খুঁটিগুলির ধ্যে এরূপ বিস্তৃত স্থান রাখা হয় যাহাতে ইহার মধ্যে তাবাদ্য প্রভৃতি চলিতে পারে। পূজার সময় সাধারণতঃ কটি ছাগ বলি দেওয়া হয়।

(২) সূর্য্যদেবতা :—মালপাহাড়িয়ারা অধুনা প্রতি বিবার সূর্য্যপূজা করিয়া থাকে। পূজার সময় যে-সকল শু বলি দেওয়া হয় তাহাতেই এই পূজার বিশেষত্ব। মুখে য-কয়টি পশুর কথা প্রার্থনা করা হয় বলি দিবার সময় াহার দ্বিগুণ দিতে হয়।

(৩) ধারতী বসুমতী :—ধারতী অর্থে ধরিত্রী বুঝায়। য এবং আষাঢ় মাসে যখন বীজ বপন করা হয় তখন এই দেবতার পূজা করা হয়। মালপাহাড়িয়া পুরোহিত এই জা করিয়া থাকে। প্রত্যেক গ্রাম হইতে চাঁদা তুলিয়া এই জা করা হয় এবং সাধারণতঃ পক্ষীই এই পূজার্থে বলির ন্য ব্যবহৃত হয়। দুইটি শালবৃক্ষের নিম্নে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা এই দেবতার পূজা হইয়া থাকে। মালে'রা এই পূজা গ্রাম-দেবতার নিকট করিয়া থাকে।

মালপাহাড়িয়াদের কোন এক ধর্ম্ম-বিশেষের মধ্যে বিভক্ত রা অত্যন্ত কঠিন। কয়েক বৎসরের মধ্যে হয়ত সমস্ত জাতিটি হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে আসিয়া পড়িবে। কৃষ্টি-সংঘর্ষে পড়িয়া আপন বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারে লোপ পাইতেছে; সভ্যতার চাপে মালপাহাড়িয়াদের সামাজিক অবনতি ঘটিয়াছে, সমাজে নানা প্রকার দুর্নীতি দেখা দিয়াছে।



মালপাহাড়িয়া দম্পতি। গ্রাম—কেরোঙ্গুলি, পাকুড়

নূতন গোত্রস্থাপনের ফলে স্বগোত্রে অন্তর্বিবাহও প্রচলিত হইয়াছে। ওদিকে 'মালে'রাও অনাহারে—অস্বাস্থ্যকর পাহাড়ের উপরের গ্রামগুলি ধ্বংসপ্রায়। মালপাহাড়িয়ারা আজ এই দুইটি অবস্থা হইতে মুক্ত, কিন্তু পাহাড়-জঙ্গলের ও-পারেই এই বিরাট সমতলভূমির জাতিগুলির সহিত সমান তালে নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবে কি?

শব্দপ্রসঙ্গ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

হং হো, হম্ ভো, অম্ ভো।

লৌকিক সংস্কৃতে 'সম্বোধন' অর্থে আমরা হং হো এই শব্দটিকে দেখিতে পাই। প্রাকৃতেও (হেমচন্দ্র, ২.২১৭) ইহার প্রয়োগ আছে। সংস্কৃতে আছে "হং হো ব্রাহ্মণ" 'ওহে ব্রাহ্মণ।'* ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে, এই আলোচ্য পদটি হম্ ভো (ঃ< স্) অথবা হং ভো (ঃ<স্) হইতে ভকারের স্থানে হকার হওয়ায় হইয়াছে, যেমন, বৈদিক মূল √গ্রভ্ হইতে √গ্রহ্ হইয়া থাকে। ভ>হ প্রাকৃতেও অতিপ্রসিদ্ধ: যেমন, বিভান>বিহান। এই হম্ ভো শব্দটি সংস্কৃতের ন্যায় (দিব্যাবদান, ৩৮৩. ৪, ৬২১. ২৬ ; মহাবস্তু, ৩য় খণ্ড, ২০৪.১৬, ২১৫.১) প্রাকৃত (সুরসুন্দরীচরিঅ, অথবা 'কহা, কাশী, ১১.২৩৪) ও পালিতেও (জাতক, ১ম খণ্ড, ১৮৪, ৪৯৫) প্রযুক্ত হয়। পালিতে আমরা এই 'সম্বোধন' অর্থেই অম্ ভো শব্দও দেখিতে পাই (জাতক, ২য় খণ্ড, ৩)। এ স্থলে হকারের শ্বাসটা চলিয়া যাওয়ায় হম্-এর অম্-মাত্র থাকে। আবার এই হম্ ভো শব্দটি হইয়াছে সংস্কৃতের অহম্ ভোঃ 'ওহে আমি' হইতে। কাহারো মনোযোগের জন্য সংস্কৃতে অহম্ ভোঃ বলিয়া ডাকা হয়। আমরা দেখিতে পাই, অভিজ্ঞানশকুন্তলে (পিশেল-সংস্করণ, ৪. ০. ২০) দুর্ব্বাসা মুনি আশ্রমে প্রবেশ করিয়া (শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া) বলিতেছেন—"অয়মহম্ ভোঃ" 'ওহে এই আমি!' হং হো প্রভৃতির হং (অথবা হম্) হইয়াছে অহং শব্দের আদিস্থিত অকারের লোপে, যেমন সংস্কৃতেই ধি< অধি, পি<অপি, ব<অব ; পালি-প্রাকৃতে তো কথাই নাই, যেমন, ব<ইব, বি অথবা পি<অপি, ইত্যাদি।

হঞ্জে

সংস্কৃত নাটক- বা দৃশ্যকাব্য-সমূহের প্রাকৃত অংশে দাসীকে বা কথনো-কথনো সখীকে* সম্বোধন করিতে হঞ্জে এই শব্দটির প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। ইহার আসল অর্থটি কি? আমাদের কোশ-কারেরা বলেন 'কন্যা' অর্থে হঞ্জা শব্দ, এবং তাহারই সম্বোধনের একবচনে হঞ্জে। আলোচ্য শব্দটির অর্থ যে, 'কন্যা' তাহা তিব্বতী প্রমাণের দ্বারা সমর্থন করিতে পারা যায়। শ্রীহর্ষের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ নাগানন্দ নাটকের একখানি তিব্বতী অনুবাদ আছে। তিব্বতী ভাষায় ইহার নাম ক্লু-কুন্তু দ্গা' ব। ইহাতে বহু স্থানে (দ্রষ্টব্য—তঞ্জুর, মৃদো, খে, পাতা ২৬৯ খ, ১ ; ২৭০ ক, ৫ ; ইত্যাদি) মূলের হঞ্জে শব্দটিকে বুমো এই শব্দ দ্বারা অনুবাদ করা হইয়াছে। বুমো শব্দের অর্থ 'কন্যা'। কিন্তু এই তিব্বতী অনুবাদের স্বতন্ত্র কোনো মূল্য নাই ; কেন-না ইহাতে কেবলমাত্র সংস্কৃতকে অনুসরণ করা হইয়াছে, এবং সাধারণতও তিব্বতী অনুবাদে তাহাই করা হইয়া থাকে। আমাদের কোশকারগণ হঞ্জে শব্দের কোনো উপযুক্ত সমাধান দেখিতে না পাইয়া অগত্যা হঞ্জা শব্দ কল্পনা করিয়াছেন, এবং স্বামিনী ও দাসীর সম্বন্ধ মাতা ও কন্যার সম্বন্ধের ন্যায় মনে করিয়া দাসীর সম্বোধনে প্রযুক্ত শব্দটির অর্থ 'কন্যা' ভিন্ন আর কিছু সঙ্গততর হয় না বলিয়া উহাই ধরিয়া লইয়াছেন। যাহাই হউক, সংস্কৃতে এই হঞ্জা হইতে হঞ্জিকা শব্দও কল্পিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা মোটেই সন্তোষাবহ নহে। অতএব, যদি সম্ভব হয়, আরও একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক।

হঞ্জে ইহা মূলত একটি শব্দ নহে, দুইটি ভিন্ন-ভিন্ন শব্দের যোগে ইহা হইয়াছে, হং আর জে। এখানে হং হইয়াছে পূর্ব্বের ন্যায় অহং হইতে, আর জে হইতেছে একটি অব্যয়। পালি ও প্রাকৃত উভয়েতেই এই জে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার অর্থ কি? হেমচন্দ্র (২.২১৭) বলিয়াছেন, ইহা

---

* সাহিত্যদর্পণ (৬.১৩৮) অনুসারে মধ্যম শ্রেণীর পুরুষেরা পরস্পরকে এই শব্দে সম্বোধন করেন।

* সাহিত্যদর্পণ, ৬.১৫৫ ; দশরূপক, ২ ১০৪ ; নাট্যশাস্ত্র, ১৭. ৮৯।

"পাদ-পূরণের" জন্য প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ কবিতার কোনো চরণ পূর্ণ করিতে হইলে ইহার প্রয়োগ হয়। শুভচন্দ্র (২.১.৭৭) ও ত্রিবিক্রম (২.১.৭৬) হেমচন্দ্রেরই কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, পূর্ব্বে ইহার একটা বিশেষ কোনো অর্থ ছিল, কিন্তু হেমচন্দ্রেরও সময়ে লোকেরা সেই অর্থটিকে ভুলিয়া গিয়াছিল। সেই অর্থটি কি?

পালিতে নিম্নোদ্ধৃত ও তৎসদৃশ বাক্যে আমরা আলোচ্য শব্দটির প্রয়োগ দেখিতে পাই:—কালী নামে একটি দাসীকে তাহার কর্ত্রী ডাকিতেছেন "হে জে কালি" (মজ্ঝিম নিকায়, ১.১২৬) 'হে লো কালী'; "কিং জে দিবা উট্‌ঠাসি" (ঐ) 'কি লো (এতটা) দিনে উঠ্‌ছিস্?' "ভো জে ত্বং অনেকবারং মম সন্তিকং আগতা" (ধম্মপদ—অট্‌ঠকথা, ৪.১০৫) 'ও লো, তুমি অনেকবার আমার নিকটে এসেছ'; বিশাখা নিজের দাসীকে আদেশ করিতেছেন—"গচ্ছ জে আরামং" (বিনয়পিটক, ১.২৯২) 'ও লো বাগানে যাও।' দ্রষ্টব্য বিমানবত্থু—অট্‌ঠকথা, ১৮৭ ("স চে জে বিহারে ঠপেত্বা বিসসরিতং")। এই সমস্ত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, কেবলমাত্র "পাদপূরণের" জন্য জে শব্দের প্রয়োগ হইত না, কারণ ইহা গদ্যেও প্রযুক্ত হইয়াছে। স্বয়ং হেমচন্দ্র (২.২১৭) যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাও গদ্যেরই মধ্যে বলিয়া মনে হয়। অতএব তাঁহার মতে সম্ভবত ইহা পদপূরণের জন্য ("পাদপূরণে"র জন্য নহে) একটি অব্যয় (enclitic)।

প্রাকৃতে (মাহারাষ্ট্রী, অর্দ্ধমাগধী, ও জৈন মাহারাষ্ট্রীতে) আমরা একটি জে শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই; অপভ্রংশে ইহার আকার হয় জি (হেমচন্দ্র, ৪.২২০)। কিন্তু এই জে শব্দের সহিত আমাদের আলোচ্য জে শব্দের কোনো যোগ নাই; কারণ, প্রথম জে শব্দটি মূলত সংস্কৃতের এব (> প্রাকৃত য়েব) হইতে ক্রমশ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহারই অর্থে প্রযুক্ত হয়। দ্রষ্টব্য Pischel, §§ ১৫০, ৩৩৬।

পূর্ব্বে উদ্ধৃত পালি বাক্যগুলি হইতে স্পষ্ট জানা যাইবে যে, জে শব্দটিও লো প্রভৃতি শব্দের ন্যায় কোনো স্ত্রীলোককে সানুনয় ভাবে সম্বোধন করিতে প্রযুক্ত হয়। এই জে, এবং অহং শব্দের হং একত্র যুক্ত হইয়া হংজে অথবা হঞ্জে।

কিন্তু জে শব্দের আসল অর্থ কি তাহা এখনো ধরা পড়ে নাই। আমরা আরও একটু চেষ্টা করিয়া দেখি। সংস্কৃতে, বিশেষত তাহার দৃশ্যকাব্যসমূহে, দেখা যায় যে, কোনো স্নেহাস্পদ বালককে জাত (প্রা. জাদ, জাঅ) ও বালিকাকে জাতে (প্রা. জাদে, জাএ) বলিয়া সম্বোধন করা হয়; যেমন, উত্তররামচরিতে, ৪র্থ অঙ্কে, কৌশল্যা লবকে বলিতেছেন "জাত কথয়িতব্যং কথয়*" 'বাবা, ইহা বলা উচিত, বল'; অভিজ্ঞানশকুন্তলে ৪র্থ অঙ্কে গৌতমী শকুন্তলাকে বলিতেছেন "জাদে* এসো দে গুরু উবট্‌ঠিদো" 'মা এই তোমার গুরু উপস্থিত হইয়াছেন।' সংস্কৃতের জাতে প্রাকৃতে জাদে, জাএ। এই জাএ হইতে আকার ও একারের সম্মেলনে পালি বা প্রাকৃতের সন্ধির নিয়মানুসারে জে।

পূর্ব্বে যেরূপ আলোচনা করা হইল তাহাতে জানা যাইবে যে, সংস্কৃত জাত ও জাতা শব্দে যথাক্রমে 'পুত্র' ও 'কন্যা'কে বুঝা যায়। এখানে আমরা বুঝিতে পারি, কোশকারেরা হঞ্জে শব্দের অর্থ যে, 'কন্যা' করিয়াছেন, তাহার মূল কোথায়। সম্বোধনের জাতে হইতে উৎপন্ন জে শব্দেরই অর্থ 'কন্যা', কিন্তু তাঁহারা ঠিক ইহাই অনুসরণ না করিয়া সমগ্র হঞ্জে শব্দটিরই 'কন্যা' অর্থ ধরিয়া লইয়াছেন।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। সংস্কৃতে জাত ও জাতা শব্দ যথাক্রমে 'পুত্র' ও 'কন্যা' অর্থ কিরূপে প্রকাশ করে। ইহার উত্তর এই:—সংস্কৃত ভাষায় আমরা পিতাকে বলি জনক (বৈদিক জনিতা, লৌকিক জনয়িতা), আর মাতাকে বলি জননী (বৈদিক জনিত্রী, লৌকিক জনয়িত্রী)। এই উভয় শব্দেরই √জন্ হইতে উৎপত্তি, এবং যৌগিক বা আক্ষরিক অর্থ 'যিনি জনন বা জন্ম প্রদান করেন'। এখন পিতা ও মাতার নাম যদি যথাক্রমে জনক ও জননী হয়, তবে তাঁহাদের হইতে জাত পুত্র ও কন্যার নাম যথাক্রমে জাত ও জাতা হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

---

* Pischel সাহেবের সংস্করণে সর্ব্বত্র জাদে পদের স্থানে জাদ মুদ্রিত হইয়াছে। জানি না, ইহার কারণ কি।

মরাঠী ভাষায় "জে দেবা" 'হে দেব' ইত্যাদি স্থলে সসম্মানে সম্বোধন করিতে জে শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু যদিও মূলত 'কর্ত্তা'-অর্থে প্রযুক্ত জে শব্দের সহিত এই জে শব্দের কোনো সম্বন্ধ আছে কি না একবারে ঠিক করিয়া বলা শক্ত, তথাপি মনে হয় ইহারা উভয়েই অভিন্ন।

মরাঠীর এই জে আর হিন্দী ও গুজরাতী প্রভৃতির জী একই, জে শব্দই জী এই আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং কালক্রমে অবিশেষে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই সম্বোধন করিতে প্রযুক্ত হইয়াছে; যেমন, হিন্দীতে 'করো জী' ('ওগো কর'); প্রশ্ন—'তুম বহাঁ গএ থে য়া নহীঁ' ('ওগো তুমি কি ওখানে গিয়াছিলে?'); উত্তর—'জী হাঁ' ('ওগো হাঁ')। গুজরাতীতে 'মারে মাটে পুস্তক লাবশো জী' ('ওহে আমার জন্ত বই আনিবে')।

গে, হে গে।

মগহী ও বাঙ্‌লায় (অর্থাৎ বাঙ্‌লার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের অর্থাৎ মালদহের চলতি কথায়) স্ত্রীলোকের সম্বোধনে গে শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন, 'কি গে?' ('ওগো কি?')। কখনো-কখনো এই গে শব্দের পূর্ব্বে হে শব্দও লাগান হয়; যেমন 'হে গে মামী' ('ওগো মামী')। এই গে আমাদের পূর্ব্বে আলোচিত জে হইতেই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। জকার ও গকারের পরস্পর পরিবর্ত্তন হয়, ইহা সুপ্রসিদ্ধ; যেমন, √গম্ হইতে জগাম, আর √জি হইতে জিগীষা। দ্রষ্টব্য Pischel, 234.

দে, হে দে।

প্রাকৃতে দে একটি অব্যয় (হেমচন্দ্র, ২.১৯২); সিংহরাজ, ১৩.২৩; ত্রিবিক্রম, ২. ১. ৫৯; শুভচন্দ্র, ২, ১. ৬১)। প্রাকৃত ব্যাকরণ-সমূহে দেখা যায়, নিজের দিকে কাহারো মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে ("সমুখী-করণে") ইহার প্রয়োগ হয়। গদাধর ভট্ট হালের সপ্তশতীর টীকায় (১৬, ৪৮) বলিয়াছেন যে, ইহা "সানুনয় সম্বোধনে" অথবা (৩৪৫) সাধারণত সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রাকৃত ব্যাকরণে ইহা লিখিত হয় নাই, আর সাহিত্যেও দেখা যায় না যে, ইহা কেবল স্ত্রীলোকেরই সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে। অবিশেষে পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়কেই ইহা দ্বারা সম্বোধন করিতে পারা যায়।

আমার মনে হয় এই দে আমাদের পূর্ব্বে আলোচিত জে হইতে হইয়াছে। জকারের স্থানে দকার হওয়া বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন সং. (=সংস্কৃত) প্রসেনজিৎ, পা. (=পালি) পসেনদি; সং. জিঘৎসা, পা. দিঘচ্ছা; সং. জাজ্বল্যতে, পা. দাদল্লতে; সং. জ্যোৎস্না, পা. দোসিনা; সং. জিহ্বা, সিং হদী দিবা; সং. তেজস্, সিং হলী তেদ।

পূর্ব্বে হে শব্দের যোগে এই দে শব্দের প্রয়োগ হে দে এই আকারে আমাদের বাঙ্‌লায় আছে; যেমন 'হে দে হাভাতির ঝি'। এই বাক্যে দে স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিতে প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু পুরুষেরও সম্বোধনে বাঙ্‌লায় ইহার প্রয়োগ হয়; যেমন 'হে দে ও নগরবাসী'।

হণ্ডে, টে

প্রাকৃতে ও ভারতীয় প্রাদেশিক আর্য্যভাষা-সমূহে দকারের স্থানে ডকার হওয়ার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়; যেমন, সং. দংশ, প্রা. ডংস, বাঙ্‌লা ডাঁশ; ইত্যাদি। এই নিয়মে দে হইয়া যায় ডে। এই ডে শব্দের পূর্ব্বে হঞ্জে শব্দের ন্যায় অহম্ অথবা অহং শব্দের হম্ অথবা হং যোগ করিলে হণ্ডে শব্দ উৎপন্ন হয়। ইহা সাধারণত নীচ শ্রেণীর ব্যক্তিকে সম্বোধন করিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যেমন শকুন্তলায় (৬. ০. ২) রক্ষী পুরুষেরা জেলেদের বলিতেছেন—"হণ্ডে কুম্ভিলআ" 'হারে চোর'। আমাদের কোশ-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হণ্ডা একটি শব্দ আছে (ঠিক যেমন হঞ্জা)। ইহা নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোককে বুঝায়। এই হণ্ডা হইতেই সম্বোধনে হণ্ডে। অতএব ইহা নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হণ্ডে শব্দের সমাধান করিতে না পারিয়াই যে, হণ্ডা শব্দ কল্পিত হইয়াছে ইহা না বলিলেও চলে।

দে শব্দ পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এই দে শব্দ অঘোষ হইলে টে হইয়া যায়, অর্থাৎ দকার স্থানে টকার হইয়া পড়ে। বাঙ্‌লায় বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ও মালদহে এই টে শব্দ স্ত্রীলোকের সম্বোধনে প্রয়োগ করা হয়; যেমন 'কি টে', 'আয় টে', 'হা টে রামীর মা', ইত্যাদি। অসমীয়াতে এই টে শব্দ স্থানে 'টি' দেখা যায়।

স্বর্ণযজ্ঞ

শ্রীমনোজ বসু

শ্মশান-কালীতলায় এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। চেহারার বা জলুস,—সিদ্ধপুরুষ-টুরুষ না হইয়া যায় না। রাধাচরণ সিকদার মহাশয় ভোরবেলা ষ্টেশনে নামিয়া বাড়ি আসিতে-ছিলেন, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া বর্ণনা দিলেন। দেখিতে দেখিতে কালীতলার মাঠ মানুষের মাথায় ছাইয়া গেল। সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ। পরনে রক্তবাস, সমস্ত কপালটা ভরিয়া সিঁদুরমাখানো, কাচের কড় ও রুদ্রাক্ষের মালায় বুকের উপরে তিল পরিমাণ জায়গা নাই। ভক্তের দল জমায়েত হইয়া বিপুল উৎসাহে আধ্যাত্মিক আলোচনা জুড়িয়া দিল।

ধ্যান আর উহার মধ্যে টিকিবে কতক্ষণ! সন্ন্যাসী চোখ মেলিলেন। অমরনাথ অমনি সকলের আগেভাগে গিয়া সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িল। তার পর মাথা তুলিয়া প্রশ্ন করিল—তৈলকন্দ চেন, বাবাঠাকুর?

সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল—ও সুকেশীর মা, পাগল ঠেকাও, পাগল ঠেকাও—

ভিড়ের মধ্য হইতে এক জন প্রৌঢ়া-গোছের বিধবা-মানুষ ছুটিয়া গিয়া পাগলের হাত ধরিলেন। কিন্তু অমরনাথ শুনিবার পাত্রই নয়। বলিতে লাগিল—দোহাই সন্ন্যাসী-ঠাকুর, জান ত ব'লে দাও—কোথায় পাওয়া যায়। কাল-কেউটে রাত-দিন তার গোড়ায় পাহারা দিয়ে বেড়ায়; সে গাছের চারি দিকে তেল চুঁইয়ে চুঁইয়ে দশ-বিশ হাত জায়গা ভিজে জবজবে…

ষণ্ডাগোছের জন-দুই-তিন উঠিয়া তৎক্ষণে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে তাকে সীমানার বাহির করিয়াছে।

সন্ন্যাসী হাত নাড়িয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন এবং কেবল অমরনাথ বলিয়া নয়, হাতজোড় করিয়া সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—বাবা-সকল, মা-সকল, তোমরা বাড়ি-ঘরে যাও। আমি সামান্য লোক, কিছু জানি নে। আজকে শনিবার, অমাবস্যা, রোহিণী নক্ষত্র—সমস্ত সুপ্রসন্ন। একটা মস্ত কাজে বসেছি, তোমরা বাধা দিও না।—

বলিয়া নির্ব্বিকার মনে আবার তিনি চোখ বুজিলেন।

অশ্বত্থগাছের আবছায়ে একটি বছর-আষ্টেকের ছেলে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। ভিড় সরিয়া গেল, আর সে-ও কোলের ঝুলিটা ঠিক করিয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—বাবা!

কটমট করিয়া তাকাইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—ঠাকুর—

ছেলেটিও সংশোধন করিয়া লইল—ঠাকুর!

—হ্যাঁরে হ্যাঁ, ঠাকুর—। সন্ন্যাসী ফিস-ফিস করিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন—এক-শ বার ব'লে দিইছি না!… কিন্তু এখন আর কিছু কথা নয়। রাত জেগে ঘুম পায় যদি, শিকড়ের ঐ ঐখানটায় ঘুমিয়ে পড়্।

পুনশ্চ ধ্যানস্থ হইবার আগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চারি দিক দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন, তখনও একটা লোক সাদা কাপড় মুড়ি দিয়া নদীর কিনারা ঘেঁসিয়া বসিয়া আছে।

—কে?

মেয়েলোক। কুণ্ঠিত পদে ধীরে ধীরে আসিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসিল।

—এখনও বাড়ি যাও নি সুকেশীর মা?

কোমল করুণার স্বরে সুকেশীর মা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—বড্ড কষ্ট তোর মা, প্রথম দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। ঐ পাগল বুঝি তোর ছেলে!

—ছেলে নয়, জামাই। আঁচল দিয়া চোখ রগড়াইয়া সুকেশীর মা শান্ত হইয়া বসিলেন। বলিলেন—জামাই আমার মস্ত বিদ্বান্। তাই দেখেই সুকেশীকে ওর হাতে সঁপে

দিই। কলেজে মস্ত চাকরি করত। তার পর কি হয়ে গেল। কত চেষ্টাই হচ্ছে, কিছুতে কিছু হয় না —

সন্ন্যাসী গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন।

—কি করব মা, আমার যে নিষেধ রয়েছে। আমার হাত-পা বাঁধা। ঝাড়-ফুঁক মন্তোর-তন্তোর—করিনি যে কখনও, তা নয়—ঢের করেছি এককালে। কিন্তু ও-সব হ'ল সিদ্ধাই, নীচের থাকের জিনিষ—

সুকেশীর মা তখন একেবারে দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া মাথা কুটিতে লাগিলেন। তুমি মহাপুরুষ বাবা,—কিছু করতে হবে না, শুধু দুখিনীর বাড়ি একটাবার পায়ের ধুলো দিও। ওতেই মঙ্গল হবে···

মাথা তুলিয়া মুখের দিকে চাহিয়া সুকেশীর মা আবার বলিতে লাগিলেন—দয়াময়, দয়া কি হবে? সে শুনব না; ঐ পাদপদ্ম ছেড়ে উঠব না আমি তবে।···ঐ যে হাসছ, আমার দয়াল। কখন যাবে? দুপুরবেলা? ঐখানে আজকে সেবা হবে।

হাসিমুখে সন্ন্যাসী বলিলেন—শুধু যাব আর চলে আসব। গৃহস্থের বাড়ি আমি সেবা নিই নে।

—কিন্তু আমার বাড়ি? সেখানে ত কোন অনাচার নেই।

সন্ন্যাসী বলিলেন—তাই কি বলা যায়?

এক মুহূর্ত্তে সুকেশীর মা'র চোখে যেন আগুন ফুটিয়া উঠিল।

—বলা যায় ঠাকুর, খুব বলা যায়। সমস্ত গ্রামের মানুষ বলবে। পঁচিশ বছর বয়সে দু-মাসের মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছি; সেও আজ বিশ-কুড়ি বছর হয়ে গেল। গ্রামসুদ্ধ মানুষকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ। সবাই বলবে। তবু কিসে যে কি হচ্ছে—

একটু চুপ থাকিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—ঠাকুর, হয় আমার পাগল জামাই সেরে উঠুক, নয় ত সুকেশী আমার পাগল হয়ে যাক। আমি যে চোখের সামনে আর দেখতে পারছি নে।

তখন বেশ বেলা হইয়াছে। মাঠের মধ্যে রৌদ্রের তেজ খর হইয়া উঠিয়াছে। ওপারে কুকশিমার বিলে চাষীরা এক কোমর চাষ করিয়া ছায়ায় আসিয়া বসিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন—মা, বাড়ি যাও···

সুকেশীর মা নিরুত্তরে উঠিয়া অশ্বত্থ-তলায় চেলা-সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া তুলিলেন। বলিলেন—তুমি সেবা না নেও ঠাকুর, আমি এই গোপালকে নিয়ে চললাম। গোপাল আমার সেবা নেবে—

হাসিয়া কোমল কণ্ঠে সন্ন্যাসী কহিলেন—সেবা আমরা দুই জনেই নেব। তুই যে মহাভক্ত—তুই মুখ ভার করিস নে মা। একটি মুঠো চাল রেখে দিবি, মাত্র এক মুষ্টি—তার বেশী নয় কিন্তু, খবরদার। আমার একেবারে হাত-পা বাঁধা, বড্ড কঠিন নিষেধ রয়েছে কি না ···

চাল ঐ এক মুঠাই, কিন্তু ডাব-কলা-আতা-আনারসে যখন একটা ঝুড়ি ছাপাইয়া দ্বিতীয় আর এক দফা বোঝাই হইতে লাগিল সুকেশী কোন্ দিক হইতে দেখিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল।

—রও, রও মা,—আমি একটা সাজাই; আমায় একটু পুণ্যির ভাগ দেও। আজকে কয় নম্বর?

মা আমতা-আমতা করিয়া জবাব দিলেন—দু-জন মোটে। একটি ত একেবারে বাচ্চা। কেমন ফুটফুটে সুন্দর। বলিতে বলিতে চোখের কোণ চকচক করিয়া উঠিল, স্বর গাঢ় হইল, বলিতে লাগিলেন—তুই অমন মোটে দেখিস নি সুকেশী। ঠিক যেন আমাদের গোপালের মত। আজকে তুই রাগ করতে পারবি নে মা আমার···

কিন্তু রাগ কোথায়, অকস্মাৎ আর্ত্ত অসহায়ের মত সুকেশী কাঁদিয়া উঠিল।—ও মা, মা গো, তুমিও আমায় ছাড়লে! এক জনে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী ক'রে সর্ব্বস্ব ভাসিয়ে দেছে, আবার তুমি যদি ছেড়ে যাও, কার দুয়োরে যাব আমি?

—বালাই! তোর কিসের অভাব মা?

ছেলে বয়স হইতে মেয়ের দেমাকই দেখিয়া আসিয়াছেন, আজকাল সেই মেয়ে যখন-তখন এমনি কাঁদিয়া ভাসাইয়া থাকে। মা সকল আয়োজন ফেলিয়া সুকেশীর চোখের জল মুছাইতে লাগিলেন। বলিলেন—কেন মা, তোর কিসের অভাব? আজকে সিদ্ধপুরুষ এক জন আসবেন বাড়িতে—তোরই ভালর জন্যে—

—সিদ্ধ কচু—বলিয়া মায়ের হাত সরাইয়া দিয়া সুকেশী মুখের উপর আঁচল চাপিতে চাপিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

অতিথিরা যথাসময়ে দর্শন দিলেন। মা জল ও আসনের ব্যবস্থা করিয়া তাড়াতাড়ি উপরের ঘরে আসিয়া দেখেন, সুকেশী পরম নিরুদ্বেগে চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

—প্রণাম করতে যাবি নে?

—মাথা ধরেছে।

মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন—সেই ছেলেটা এসেছে—

হুঁ—বলিয়া সুকেশী পাশ ফিরিল।

—বড্ড চমৎকার চেহারা কিন্তু।—মা বলিতে লাগিলেন—চুলগুলো ঠিক আমাদের গোপালের মত—

খোকার কথা বলছ মা? সুকেশী উঠিয়া বসিল; চোখ দুটা ধ্বক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বলিতে লাগিল—ঐ গাঁজা-খেগো রোদ-পোড়া ছেলেটা আমার খোকা? ছি ছি, অমন কথা আর ব'লো না। প্রথমে একবার দেখে এলাম; আবার ভাবলাম, মা কি একেবারে মিথ্যে বলেছে? আবার গেলাম। ফিরে এসে মন বোঝে না—ফের আর একবার। অমন মিথ্যে ক'রে আমায় লোভ দেখিও না মা, গোপাল আমার আর ফিরে আসবে না—

মা চলিয়া গেলেন। তার একটু পরেই অমরনাথ আসিয়া হি হি করিয়া হাসিয়াই খুন। বলিল—মজা দেখে যাও গো, গজপুটে সাপ পাক হচ্ছে।…আমায় একটা পয়সা দেবে?

—কি হবে?

স্বরের অনুকৃতি করিয়া পাগল কহিল—কি হবে! দেখো বিকেল নাগাত। সাপের মুখের মধ্যে একভরি পারা। সেই পারায় ফুঁ দিয়ে দেব, আর পয়সা হয়ে যাবে সোনার মোহর। বিকেলবেলা দেখো।

স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ সুকেশী সকরুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—আমাদের খোকা কোথায় বল দিকি?

—গোপাল চক্কোত্তি বাবু? একগাল হাসিয়া অমরনাথ বলিল—ঘুমুচ্ছেন বুঝি! কিন্তু খবরদার ওকে জাগিয়ে দিও না যেন। তা হ'লে আর ছাড়বে না।

সুকেশীর চোখে জল চকচক করিতেছে, তাহারই মধ্যে হাসিয়া আবদারের ভঙ্গিতে বলিল—না, ডাকব আমি। খোকা—খোকা—

পাগল সভয়ে পিছাইয়া দরজা অবধি গেল। বলিল—ওরে বাস্ রে, তা হ'লে রক্ষে থাকবে না; কেঁদে-কেটে এমন বায়না ধরবে…না না, আমি চললাম। পয়সাটা দাও—

সুকেশী শুনিল না—ওরে খোকা,—মাণিক,—গোপাল!

পয়সা না লইয়াই অতি ব্যস্তভাবে অমর পলাইয়া গেল। তখন নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুকেশী ভাবিতে লাগিল, যদি ইহা হইত, ডাক শুনিয়া খোকা তার এতক্ষণে যদি জাগিয়া উঠিত! কোল ভরিয়া যেন খোকা ঘুমাইয়া ছিল, কত দিন কত বৎসরের পর জাগিয়া বসিয়া এই ঘর বারাণ্ডা সমস্ত ছাপাইয়া দুপুরের নিদারুণ স্তব্ধতা মথিত করিয়া কচি অথচ সূচের মত তীক্ষ্ণ গলায় তেমনি করিয়া যদি খোকা অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিত—মা, মা, মাগো—তবে ওঁর যাইতে হইত না আজ; আঙুল দিয়া সে খোকাকে দেখাইয়া দিত—ওরে খোকা, ধর্ ধর্—ঐ দেখ্, পালাচ্ছে…

ঘণ্টাখানেক পরের কথা। মা অগ্নিমূর্ত্তিতে উপরে ছুটিয়া আসিলেন।—ওরে হারামজাদা মেয়ে, কি সর্ব্বনাশ করেছিস্?

—কি?

—জান না কিছু? বলিয়া তিনি সুকেশীকে এক রকম টানিতে টানিতে নীচে নামাইয়া আনিলেন।

ঝুড়িভর্ত্তি অত যে ফল, প্রত্যেকটি রসগোল্লার মত করিয়া কেরোসিনে চুবানো। ডাবের খোলেও জলের সঙ্গে অর্দ্ধেকটা আন্দাজ কেরোসিন। সন্ন্যাসী এক ঢোক মুখে লইয়া তার পর খিল-খিল করিয়া হাসিয়া আকুল। সুকেশীকে দেখিয়া বলিলেন—এই কেশীর কাণ্ড? আমার বড্ড মজা লাগে। এক বেটী কেশী ত নাকে দড়ি দিয়ে শ্মশানে-মশানে ঘুরিয়ে মারছে। ঘর-সংসার ছেড়ে তারই ধান্দায় সমস্ত জীবনটা গেল—

মা বলিলেন—পায়ে ধর্‌।

অপ্রতিভ ভাব কাটিয়া সুকেশীর মুখ ক্রমশ কঠিন হইয়া আসিল। শুম্‌ হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

মা বলিলেন—ধর্‌।

—কেরোসিন দিইছি, বিষ দিই নি ত? থর থর করিয়া ওষ্ঠ কাঁপিয়া দু-ফোঁটা জল সুকেশীর গাল বহিয়া পড়িল। বলিল—গোপালের নাম ক'রে কেন তুমি ঠকালে মা, তিন-তিনবার আমি এসেছি তাকে দেখতে। একবার ফিরে যাই আবার আসি।···সাধু-সন্ন্যাসীরা কত অসাধ্য সাধন করেন, শুনতে পাই। তোমার ঐ সিদ্ধপুরুষ একটা বার এক পলক তাকে দেখিয়ে দিলে ত পারতেন।

সন্ন্যাসীর হাসি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল।

মা'র কিন্তু অত রাগে একেবারে জল পড়িয়া গেল। সহসা কথা ফুটিল না, তার পর বলিলেন—কিন্তু ঐটুকু ঐ ছোট্ট ছেলে খেনা খেয়ে থাকল তা-ও একবার ভেবে দেখলি নে, মা; মেয়েমানুষ হয়ে এমন নিষ্ঠুর তুই কি ক'রে হলি। ও যদি তোর ছেলে হ'ত?

সুকেশী বোমার মত ফাটিয়া পড়িল।—আমার মরা ছেলের কথা বার-বার তুলো না বলছি, আমি এক্ষুনি একদিকে চলে যাব—

মা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসীর পায়ে আছড়াইয়া পড়িলেন—তুমি অভিশাপ দিও না ঠাকুর। মেয়ে আমার শোকে তাপে পাথর হয়ে গেছে। ওর মাথার ঠিক নেই।

একটি দুইটি করিয়া বারাণ্ডায় তখন ভিড় জমিয়া গিয়াছে। পাড়ায় আর একটি মেয়েলোক নাই। সন্ন্যাসী চেলার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুকেশীর মা পথ আটকাইয়া দাঁড়াইলেন।—সে হবে না বাবা। আমি একদণ্ডের মধ্যে সমস্ত আবার জোগাড় ক'রে আনছি। সেবা না হ'লে যেতে দেব না, খুন হয়ে মরব।

—ঐ ত হ'ল রে—তার পর হাসিয়া ফেলিয়া সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—রাগ করি নি মা। যেদিন ঘরসংসার ছেড়েছি, ঐ আপদগুলোও সেদিন সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে এসেছি। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক্‌ বরং। আজকে দিনটা ভাল, যাবার সময় তাড়াতাড়ি একটু হোম ক'রে দিয়ে যাই—

সুকেশীর মা কহিলেন—বেশ, ততক্ষণে আমি ওদিকে যা হয় গুছিয়ে ফেলি, কিন্তু রাত্রেও এখানে ফিরে আসতে হবে—

—সে হবে, হবে। মা-সকল, তাড়াতাড়ি আয়োজন ক'রে দাও ত। এই—সামান্য একটু ঘি, দু-চার খান কাঠ···যা যা লাগে। আমার সময় বেশী নেই। খুব তাড়াতাড়ি।

মা গেলেন সেবার জোগাড় দেখিতে, এদিকে ছুটাছুটি করিয়া হোমকাঠের ব্যবস্থা হইল; কুলা-ভর্ত্তি অপরাপর জিনিষ আসিল। তার এক কোণে একটা দেশলাই। সেটা হাতে তুলিয়া হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসী বলিলেন—বিলাতী আগুন। কি হবে এতে?

খাঁটি স্বদেশী আগুন আবার মিলিবে কোথায়? সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। দেশলাই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—এ অশুচি। এতে কাজ হবে না। আমার কাছে এ-সবের ব্যাভার নেই—

সুকেশী নিস্পৃহভাবে একদিকে দাঁড়াইয়া ছিল, ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করিল—তবে?

সন্ন্যাসী বলিলেন—দেখতে পাবে মা-লক্ষ্মি, আগে একটু ধুনো আর নারকেলের খোলা আন দিকি।

মুখের কথা মুখে থাকিতে সমস্ত আসিয়া পড়িল। কৌতূহলে এতগুলি লোকের নিঃশ্বাস পড়ে কি না-পড়ে। এক জন ফিস ফিস করিয়া বলিল—মন্তোরে আগুন হবে বুঝি—

তাচ্ছিল্যের ভাবে সুকেশী বলিল—ছাই—

সন্ন্যাসী মুখ তুলিয়া আবার হাসিয়া উঠিয়া নিরুত্তরে জোড়জোড় করিয়া বসিলেন। ধুনা, নারিকেলের খোসা হাঁড়ির খোলে রাখিয়া মন্ত্র আরম্ভ হইল। প্রথমটা ধীরে ধীরে, ক্রমে বেগ বাড়িল, শেষে আর মন্ত্র পড়া নয়—কথাগুলি মুখের উপর যেন টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে মা-চণ্ডীর দোহাই—সে দোহাই আকাশ ফুঁড়িয়া মা-চণ্ডীর দেশে পৌঁছিবার মতই বটে। কোলের ছেলে সব আঁৎকাইয়া কাঁদিয়া ওঠে, মায়েরা হাত চাপা দিয়া কান্না ঠেকাইবার চেষ্টা করেন—ওরে, চুপ—চুপ! কিন্তু তা বলিয়া সাধ্য কি, কেহ এক পা নড়িয়া দাঁড়াইবে। চোখ দু'টা লাল হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে হুঙ্কার দিয়া সন্ন্যাসী ডাকিতেছেন—দোহাই মা-চণ্ডী, দোহাই মা—

সুকেশী টিপ্পনী কাটিল—কই হে ঠাকুর!

সন্ন্যাসী জবাব না দিয়া হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢুকাইয়া বন-বন করিয়া পাক দিলেন। তার পর প্রবলতম আরও দু-তিনটা দোহাই পাড়িয়া একেবারে স্থির অচঞ্চল। যেন পাথরের মুর্ত্তি।

আর সঙ্গে সঙ্গে এদিকে বহু কণ্ঠের কোলাহল।

মানুষের ভিড়ে তখন আর তিলধারণের জায়গা নাই; যারা পিছনে ছিল, হুড়মুড় করিয়া আগের লোকের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। সত্যই হাঁড়ির মধ্যে মৃদু ধোঁয়া দেখা দিয়াছে। কেবল যে সত্যযুগেই মুখের কথায় আগুন জ্বলিত, তাহা নয় তাহা হইলে। ধোঁয়া ক্রমশঃ ঘন হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতে লাগিল। হঠাৎ কি হইল—কি হইল— বলিতে না বলিতে সুকেশীর মা দড়াম্ করিয়া একেবারে বাবা-ঠাকুরের পায়ের উপর।

সমাধি অন্তে সন্ন্যাসী ঠাকুর মৃদুকণ্ঠে মা-মা-মা করিতে লাগিলেন। একটু একটু করিয়া আবার সহজ মানুষ। হাঁড়িতে আগুন গন-গন করিতেছে। সন্ন্যাসী চারিদিকে একবার সগর্ব্ব দৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন; একটা যুদ্ধ জয় হইয়াছে, এমনি গোছের একটু হাসি মুখের উপর।

সুকেশীর মা তখনও পড়িয়া; যেন তার সম্বিৎ নাই। মাথায় মৃদু মৃদু করাঘাত করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—ওঠ্ বেটী, ওঠ্…এই একবিন্দু একটু ছিটেফোঁটা—এতেই অবাক হোস্…আর সে রত্নাকরের যে তল নেই। কত মণিমাণিক্য হাঙ্গর-কুমীর তার কোলে পাশাপাশি রয়েছে, কিছু তার অবধি আছে?…

এবারে হোম আরম্ভ হইল। সে-ও নিতান্ত সহজে সমাধা হইল না। বেলা একেবারে ডুবিয়া গেল। বাবার মুখে সুকেশীর মা পুনশ্চ মনে করাইয়া দিলেন—বাবা, আসবে ত রাত্তিরে?

—হ্যাঁ—

—তুমি ঐ হোমের ফোঁটা দেও একটা সুকেশীর কপালে; একটু মাথায় হাত রেখে ওকে আশীর্ব্বাদ করে যাও। আয় হতভাগী—

কিন্তু কোথায় সে! কখন যে সরিয়া পড়িয়াছে। মা চীৎকার শব্দে ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—সুকেশী, সুকেশী!

সুকেশী এদিকে একেবারে চিলে-কোঠায়। সে অনেকক্ষণ পলাইয়া আসিয়াছে, সন্ন্যাসী মন্ত্রবলে যখন আগুন জ্বালাইয়া সকলের তাক লাগাইয়া দিয়াছেন ঠিক সেই সময়। একা নহে—আসিবার সময় দেখে, রোয়াকের উপর বাচ্চা সন্ন্যাসীটি করুণ শুষ্ক মুখে বসিয়া আছে— ইসারা করিয়া ডাকিতেই ছেলেটি দালানের মধ্যে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

—কি গো খোকা-ঠাকুর, ভোগে যুৎ হয় নি?

মারিয়া ফেলিয়াও আবার মড়ার উপর খাঁড়া চালায়, ইহার কথার জবাব কি? ছেলেটি চোখ দু'টি তুলিয়া কাঁদ-কাঁদ ভাবে সুকেশীর মুখের দিকে তাকাইল।

এবার নরম সুরে সুকেশী প্রশ্ন করিল—খিদে পেয়েছে?

—হ্যাঁ—

—তুই গাঁজা খাস?

হাত-মুখ নাড়িয়া তাড়াতাড়ি ছেলেটি সাফাই দিয়া উঠিল—না-না মা, কক্ষনো না…

—মা বললে আমি ভিজি নে, আমার মায়াদয়া নেই— রুক্ষ ভৎর্সনার কণ্ঠে সুকেশী বলিতে লাগিল—কে শিখিয়ে দিয়েছে, বল শীগ্‌গির। ও তোদের ব্যবসাদারী ডাক— দশ দুয়োরে মেগে খাস ঐ ব'লে ডেকে,—না?

আবার নূতন করিয়া রাগের পাত্র হইয়া ছেলেটি ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত সুকেশী স্তব্ধ হইয়া তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ হিড়হিড় করিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া রান্নাঘরে পিঁড়ির উপর তাকে বসাইয়া দিল। তার পর নিজের হাতে ভাত বাড়িয়া দিয়া বলিল—খা।

যেই মাত্র বলা অমনি আরম্ভ। আর খাওয়া ত নয়, টপটপ করিয়া কোনগতিকে গোগ্রাসে গিলিয়া ফেলা। যেন কে আসিয়া কাড়িয়া লইয়া যাইবে, তার আগে যতটা বোঝাই করিয়া লওয়া যায়। চুপ করিয়া করিয়া সুকেশী ক্ষুধিত বালকের খাওয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ চোখে জল আসিয়া পড়িল। আঁচল দিয়া মুছিয়া প্রশ্ন করিল—নাম কি তোর?

—রতন।

—মা বেঁচে নেই?

রতন ঘাড় নাড়িয়া সঙ্কেতে জানাইল—নাই। হাত ও মুখ সমানে চলিয়াছে, বারংবার অত কথা বলিবার ফুরসৎ কোথায়?

—বাবা?

বড় একটা গ্রাস কোঁৎ করিয়া গিলিয়া ছেলেটি জবাব দিল—হুঁউ—উ—

—তবে এই চুলোয় মরতে এসেছিস কেন?

ইহার সদুত্তর দেওয়া কঠিন। অন্ততঃ হুঁ-হাঁ করিয়া দু-এক কথায় দিবার নয়। সভয়ে রতন মুখ তুলিল। এই অপরাধে পুনশ্চ কেরোসিন-ভোগের ব্যবস্থা না হইয়া যায়।

সুকেশী বলিল—এই চেলাগিরি এখন থেকে ছেড়ে দিবি, বুঝলি?

যাক্—রক্ষা! রতন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল; ঘাড় নাড়িয়া তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল।

—ঠিক ত! না মিথ্যে বলছিস্?

—হ্যাঁ—বলিয়া রতন আবার সজোরে ঘাড় নাড়িল।

ঠিক এমনি সময়ে চটি ফট ফট করিতে করিতে অমরনাথ।

—ঘরে আছ, ও সুকেশী?

—এস, এস—ছুটিয়া সে আগাইয়া গেল। বলিল—এই তিন পহর বেলায় মাথায় এক ফোঁটা তেল জল পড়েনি যে…হায় আমার কপাল! একটু তেল মাখিয়ে এক ঘটি জল ঢেলে দিয়ে ভাল ক'রে মুছে-টুছে দিই আমি…লক্ষ্মিটি, বেশ?

অধীর উত্তাক্ত কণ্ঠে অমরনাথ বলিল—না, না, না,—সময় কোথায়? পাক শেষ হয়েছে, হাঁড়ি নামিয়েছি, কিন্তু পারদভস্ম খুঁজে পাচ্ছি নে। তাড়াতাড়ি একখানা আসন বিছাইয়া বসিয়া বলিল—চট ক'রে দাও ত চারটি। বড্ড খিদে পেয়েছে।

আঁচল দিয়া মুখ মুছাইয়া স্বামীকে খাইতে বসাইয়া সুকেশী বাতাস করিতে লাগিল। দু-এক বার মুখে দিয়াই হঠাৎ অমরনাথ চিন্তিত মুখে খাওয়া বন্ধ করিল।

সুকেশী বলিল—কি?

জবাব নাই, সে যেন অন্য এক জগতে।

সুকেশী ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল—ওগো, কি হ'ল বলবে না আমায়?

অমরনাথ বার-কয়েক আপন মনে মাথা নাড়িল। কহিল—পারা পাওয়া যাচ্ছে না, তাই ভাবছি—…সাপের দাঁড়ায় যদি লেগে থাকে। হুঁ—তাই-ই।

ভাত ফেলিয়াই সে উঠিল। সুকেশী খপ করিয়া হাত ধরিয়া বলিল—সাপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে আমি দেব না তোমায়—

—সেদ্ধ-করা মরা সাপ যে। হা-হা করিয়া অমরনাথ হাসিতে লাগিল। বলিল—জ্যান্ত যখন ছিল তখনই ছিল ভয়। তখন কি আর টের পেয়েছ?…কিন্তু এত পারা দিলাম, এক ফোঁটাও ত পাইনে—

এক মুহূর্ত্ত চুপ থাকিয়া দৃঢ়কণ্ঠে আবার কহিতে লাগিল—শোন সুকেশী, দু-এক আনাও যদি পাই খুঁজে, একটু ক'রে লাগাব পয়সার গায়ে, আর পয়সা হয়ে যাবে ঝকঝকে মোহর। কষ্টিপাথরে ঘষে দেখবে, একেবারে পাকা সোনা। তন্ত্রের কথা—তোমার আমার নয়—। হাত ছেড়ে দাও, আমি যাই—

বার-কয়েক টানাটানি করিয়াও হাত ছাড়াইতে পারিল না। হঠাৎ পাগল সুকেশীর চোখাচোখি হইয়া টিপিটিপি হাসিতে লাগিল। বলিল—সুকেশী, দেখনহাসি, এ কাণ্ডখানা কি বল দিকি।

—মনে আছে? মনে পড়ল নাকি? আনন্দে সুকেশীর মুখ জলজল করিতে লাগিল। বলিল—কত দিন অমন ক'রে আমায় ডাক নি বল ত? আর সেই যে কি ছাইভস্ম ব'লে ঠাট্টা করতে…

—বলব? দেখবে, বলব? কৌতুকদীপ্ত চোখে মুখ ঘুরাইয়া সেই কতকাল আগের মত অমরনাথ সুর ধরিল—

ও সুকেশী, দেখনহাসি,—ভালো-ও-বাসি-ই-ই গো…

মুখ ফিরাইয়া হঠাৎ ছিঃ ছিঃ করিয়া সে থামিয়া গেল। জিব কাটিয়া বলিল—সর্ব্বনাশ! ছেলের সামনে—

রতন তখন খাওয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাগলে তাহার বড় ভয়। এমন-তেমন দেখিলে পিছনের দরজায় চম্পট দিবে এই মতলব। সুকেশীরও তার কথা মনে ছিল না। অপ্রতিভ মুখে তাড়াতাড়ি সে স্বামীর হাত ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

অমরনাথ বলিতে লাগিল—বেশ তুমি যা হোক।

গোপাল চন্দোর বাবু ওদিকে পিটপিট ক'রে তাকিয়ে রয়েছেন আর তুমি তার সামনে···বলিতে বলিতে মুখ-চোখের ভাব কেমন এক অদ্ভুত ধরণের হইয়া উঠিল। ব্যাকুল দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সে রতনের দিকে ছুটিল—

—এস, এস,—মাণিক এস, সোনামণি এস। ভয় কি রে পাগলা? সোনার লাটিম গড়িয়ে দেব, সোনার বাঁটের ছাতি—। রতন ততক্ষণ এক ছুটে একেবারে ঘরের বাহির।

অমরনাথ ধপ করিয়া আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া হতাশ কণ্ঠে সুকেশীর দিকে চাহিয়া বলিল—এল না।

সুকেশী বলিল—আর আসবে না। পালিয়ে গেছে।

—কোথায় গেল?

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সুকেশী বলিতে লাগিল—অনেক, অনেক দূর। কত দেশ-বিদেশ ছাড়িয়ে বাতাসে মিশে সে চলে গেল, আর আসবে না।

—কেন?

—তুমি তাকে ভালবাস না।—তুমি কেবল সোনা সোনা ক'রে বেড়াচ্ছ, তার দিকে ফিরেও চাইতে না। তাই সে রাগ ক'রে গেছে। আর আসবে না।—অশ্রু ঝর ঝর করিয়া সুকেশীর গাল বাহিয়া ঝরিতে লাগিল। বলিতে লাগিল—সে নেই, সে আর আসবে না। তুমিও ভুলে গেছ। একা আমি থাকি কাকে নিয়ে?

—না আসে না-ই এল। বয়ে গেছে। হা-হা করিয়া উন্মাদ হাসির স্রোতে অমরনাথ ঘর কাটাইতে লাগিল। বলিল—দুঃখ কিসের সুকেশী? খোকা গেছে, তোমায় আমি সোনার খোকা গড়ে দেব—একেবারে পাকা সোনা, কষ্টিতে ক'ষে দেখো—

টলিতে টলিতে পাগল বাহির হইয়া গেল।

সুকেশী তখন রতনকে খুঁজিয়া আনিয়া একেবারে চিলে-কোঠায় গিয়া দোর দিল। বাক্স খুলিয়া খোকার পোষাকের বোঝা টানিয়া আনিল। তিন বৎসর আগে খোকা গিয়াছে, তিন বৎসর ধরিয়া সমস্ত পাটে পাটে সাজাইয়া রাখা—সে জামা রতনের গায়ে কুলায় না, তবু টানিয়া ছিঁড়িয়া সুকেশী অধীর আগ্রহে সমস্ত পরাইতে লাগিল। বলিল—সব তোর—সমস্ত। আরও কত দেব। তুই এখানে থাকবি—বুঝলি?

রতন বলিল—হ্যাঁ।

—সন্ন্যাসীরা সব ঠক জোচ্চোর। ভাল মানুষকে পাগল ক'রে দেয়—ওদের পিছনে ঘুরে মানুষ ঘর-সংসার উচ্ছন্ন ক'রে দেয়। ওদের সঙ্গে যাবি নে—বুঝলি?

রতন বলিল—হ্যাঁ।

এমনি সময়ে—সুকেশী! সুকেশী!

উপর-নীচে মা চীৎকার শব্দে ডাকিয়া বেড়াইতেছেন। পোষাক খুলিতে রতনের মন সরে না। হাসিয়া সুকেশী বলিল—কি পাগল তুই! এ গায়ে লাগে নি—সবাই যে হাসবে। আমি তোমাকে নতুন নতুন কত পোষাক কিনে দেব, বাবা। এ-ও থাকবে। চল, নীচে যাই।

সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণ চোখে একবার দু-জনের দিকে চাহিলেন, তার পর রতনকে প্রশ্ন করিলেন—কোথায় ছিলি রে বেটা?

—মার কাছে।

সে সুকেশীকে দেখাইয়া দিল।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—তা বুঝেছি। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার উজাড় করছিলে। কম পেটুক তুমি! কিন্তু এদিকের সে সব—

—সমস্ত ঠিক আছে ঠাকুর?

—উত্তরসাধক?

রতন বলিল—হুঁ।

—শব? করোটি? কারণবারি?

রতন বলিল—সমস্ত জোগাড় আছে, উত্তরসাধক সে সব সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন।

সন্ন্যাসী নিশ্চিন্ত হইয়া নিঃশ্বাস ফেলিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—আর বেলা নেই—চল্ বেটা।··· কিন্তু মায়েরা এদিকে কি মুস্কিলে ফেলেছেন দেখ্। আমি বলছি, এ সমস্ত কি হবে—

সামনে নৈবেদ্যের মত করিয়া সাজানো থান-পঞ্চাশেক সিধা—বারকোশের উপর চাল ডাল তরকারী দু-একটা

পয়সা—ঠিক যেমনটি হইতে হয়। পাড়ার গৃহিণীরা সমস্ত সাজাইয়া গুছাইয়া চারি পাশে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—এ সবে কি দরকার, মা-সকল? আজ যে বেলা নেই,—নইলে মার কৃপায় একদানা চাল না রেঁধে তোমাদের এই কয়জনকে ভর পেট প্রসাদ পাইয়ে দেওয়া যায়—

বলিতে বলিতে আড়চোখে একবার সুকেশীর দিকে চাহিলেন; সে-মুখে ব্যঙ্গের হাসি নাই—প্রত্যয় বা অপ্রত্যয় কোন ছবিই ফুটে নাই।

সন্ন্যাসী কাশিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন—খবরের কাগজ পড় না মায়েরা? সেই সেবার রাজশাহীতে খড়ম-পায়ে পদ্মা পার হওয়া…লাটসাহেব কাগজে তুলে দিয়েছিল—হাজার দশ হাজার মানুষ, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, বড় দারোগা, নৌকো, ষ্টীমার সব কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে।…তাই বলি মা-সকল, ও-সব আমি নেব না—তোমরা বাড়ি চলে যাও।

কিন্তু ইতিমধ্যে রতন হাত পাতিয়াছে, মায়েরা সিধার পয়সাগুলি তুলিয়া তুলিয়া দিতেছেন। দেখিতে পাইয়া সন্ন্যাসী চোক পাকাইয়া বলিলেন—কি হচ্ছে?

রতন আবদার ধরিল—আমি পয়সা নেব ঠাকুর।

—নেও বাবা, তাই নেও। যে-কজন বাকী ছিল, তাড়াতাড়ি তাহারাও রতনের হাতের মধ্যে পয়সা গুঁজিয়া দিল।

সন্ন্যাসী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—লোভী, অর্ব্বাচীন,—

কিন্তু তিরস্কারে শিশু রাগ মানে না; তেমনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একবার সন্ন্যাসীর দিকে চায়, একবার আর সকলের দিকে।

সন্ন্যাসী বলিলেন—ওরে বেহায়া, সেদিন অমনি হাত পাতলি—দু-হাত ভর্ত্তি ক'রে দিলাম না?

রতন বলিল—সে তো সোনার পয়সা ঠাকুর, এ রকম পয়সা আমার একটাও নেই—

রাগ ভুলিয়া সন্ন্যাসী অকস্মাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—বলিস কি হতভাগা! চণ্ডীর কাছে আমার পয়সা চাইতে যাব? লজ্জা করে না আমার? সেই—তাই আদায়ই যদি করতে হয়—স্রেফ সোনা—

—সন্ন্যাসী-ঠাকুর, সোনা করতে পার তুমি?

হঠাৎ সে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড। কখন যে ইহার মধ্যে অমরনাথ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কেহ তাহা দেখে নাই। হঠাৎ সে তীব্র আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, মুখে হাসির বিদ্যুৎ জ্বলিতেছে, মেয়েদের ঠেলিয়া সরাইয়া সে আগাইতেছে আর বলিতেছে—সোনা করতে জান তুমি? ঠিক তুমি তৈলকন্দের গাছ চিনেছ তা হ'লে। সাপের মুখে পারাভস্ম হয় না—সমস্ত ধাপ্পা—আমি মিছে খেটে মরেছি—

এত কথার একটিও যেন কানে যায় নাই এমনি ভাবে ধীরে সুস্থে আপন মনে সন্ন্যাসী রতনের হাত ধরিয়া চলিলেন। একবার বেলার দিকে চাহিয়া বলিলেন—একদম সন্ধ্যে হয়ে গেছে রে—চল্, চল্—

পিছন হইতে সুকেশীর মা ডাকিলেন—আসবে ত ঠাকুর?

—আসব। বড় শক্ত বাঁধনে বেঁধেছিস্! ভক্তির বাঁধন। বলিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে তিনি অদৃশ্য হইলেন।

মাঠ ছাড়াইয়া গ্রাম ছাড়াইয়া নির্জ্জন নদীকূলে গিয়া রতন ডাকিল—বাবা!

—চুপ! চুপ!—চারিদিকে তাকাইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—বল্, ঠাকুর। মানুষ নেই,—তাতে কি? ও অভ্যেসটাই খারাপ। কোন্ দিন মানুষের মধ্যে ডেকে বসবি।

রতন করুণ কণ্ঠে বলিল—না, তা ডাকব না, আজকে একটু ডাকি। উপরে নিয়ে গিয়ে আমায় আজ কত জিজ্ঞাসাবাদ করলে, বলে—তোর বাবা কোথায় থাকে? আমি বললাম—কোথায় কে জানে?

—বেশ, বেশ! সন্ন্যাসী খুব বাহবা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—আজকে সমস্ত ঠিকঠাক হয়েচে, একটাও ভুল হয়নি। তবু কাজ কি, তুই ঠাকুর বলেই ডাকিস্।

নিঃশব্দে কয়েক পা গিয়া আবার সন্ন্যাসী কথা বলিলেন।

—এত লোকে বাবা বলছে, আর তুই বললেই যে সর্ব্বনাশ হয়, তা নয়। কিন্তু তোর ডাকটা যে অন্য এক রকম—আমারই গোলমাল লেগে যায়। ঐ চেলা আছিস বেশ

আছিস—ঐ-ই ভাল। কি জানি, কে কি ভাববে— যে দিনকাল হয়েছে···

বৈঁচিবন, বাঁশ, সারি সারি গোটা তিন-চার ছাতিম গাছ। সেইখানে জঙ্গলের মধ্যে বাপ ও ছেলে চুরি করিয়া বসিয়া রহিল।

সেদিনের সেই অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রে আকাশ ভরিয়া মেঘ করিয়া আছে, একবিন্দু বাতাস নাই, গাছের পাতাটি নড়ে না। সুকেশী ঘুমাইতেছিল, ঘুমের মধ্যে শুনিতে লাগিল গুন্‌-গুন্‌ করিয়া গান হইতেছে—

ও সুকেশী দেখনহাসি,—ভাল-ও-বাসি-ই-ই-গো—

মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত তার থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চোখ বন্ধ আছে, কিন্তু সে দেখিল, অস্পষ্ট ছায়ার মত একখানা মুখ—সে মুখ দুলিতে দুলিতে কাছে—খুব কাছে—তার চোখ দুটির চুল-পরিমাণ ব্যবধানে এক-একবার আসিয়া দাঁড়ায়—আবার ভাসিয়া চলিয়া যায়। ঘুম ভাঙিয়া কতবার সুকেশী উঠিয়া বসে—তখন আর মুখখানি নাই, গানের গুঞ্জন নাই, কিছু নাই—নীরন্ধ্র অন্ধকার, শূন্য বিছানা। চোখ বুজিতেই সঙ্গে-সঙ্গেই আবার—ও সুকেশী ও সুকেশী। মনে হইতে লাগিল, যেন এই রাত্রে জানালা দিয়া কত জ্যোৎস্না আর কত বকুলফুল তার বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে!

খুব ভোরবেলা, অল্প অল্প অন্ধকার আছে, কেহ কোন দিকে জাগে নাই। সন্ন্যাসী কেবল খট করিয়া বৈঠকখানার দরজা খুলিলেন, অমনি সুকেশী স্বপ্নমূর্ত্তির মত সামনে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াইল।

—সন্ন্যাসী-ঠাকুর, শ্মশানে-মশানে ছোট ছেলে নিয়ে যেতে আছে—আর অমন রাত্রিবেলা?

সন্ন্যাসী অবাক হইয়া চাহিলেন।

সুকেশী বলিল—রতন তোমার সঙ্গে আর কোথাও যাবে না। ও এখানে থাকবে।

—কেন?

—ও আমার ছেলে।

ঘাড় নাড়িয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—দেবী চণ্ডিকা ওকে গ্রহণ করেছেন। ওর জন্মের রাশি-নক্ষত্র বড় চমৎকার। ওকে তুমি পাবে না মা। .

ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া সুকেশী প্রশ্ন করিল—পাব না?

দৃঢ়কণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিলেন—ন.। কোন আশা নেই। আমার চিরজীবনের সমস্ত সাধনা ওর উপর নিয়োগ করেছি। ঐ ছোট ছেলে দেখছ—কিন্তু ও ক্ষণজন্মা, অদ্ভুত!

স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ মর্ম্মভেদী আকুল কণ্ঠে সুকেশী বলিয়া উঠিল—তবে আমার গোপালকে এনে দাও।

সন্ন্যাসী বলিলেন—ব'সো তুমি মা।

রোয়াকের চাতালে সন্ন্যাসী বসিলেন, নীচে সুকেশী। ভোরের স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া বহিতে লাগিল; মেঘ আর বড় বেশী নাই, প্রায় স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে।

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন—গোপাল—তোমার খোকা?

ম্লান ছলছল চোখে সুকেশী বলিল—শত্তু্র। তিন বছর আগে চলে গেছে। সে-ও গেল,—উনিও ছন্নছাড়া। তারপর এই দশা। এক সন্ন্যাসী এসে সোনা-তৈরির খেয়াল ধরিয়ে দিল, এখন রাত-দিন কেবল বনে-জঙ্গলে—আর সন্ন্যাসী দেখলেই তার পেছনে পেছনে ছুটে বেড়ান। সে থাকলে উনি কি অমনি ক'রে সর্ব্বস্ব ভাসিয়ে দিতে পারতেন?

সুকেশী আঁচলে মুখ ঢাকিল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—মৃত্যু অমোঘ, ওর হাত থেকে ত্রাণ নেই। কেউ তোমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না মা—

—তবে আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও। সুকেশী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—সন্ন্যাসী-ঠাকুর, উনি ত বেঁচে আছেন, আবার ওঁকে আগেকার মত ক'রে দাও—

সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—আমাদের শক্তিতে বিশ্বাস আছে তোমার?

সুকেশী বলিল—না। কিন্তু বিশ্বাস আমি করব। তা ছাড়া উপায় যে নেই। আমার কেউ নেই, একলা আমি থাকি কি ক'রে?

গর্ব্বিতা নারী কান্নার ভারে আবার ভাঙিয়া পড়িল।

সন্ন্যাসী ধীর পায়ে মাঠের মধ্য দিয়া চলিলেন। অনেক দূর অবধি গেলেন, আবার ফিরিলেন। এমনি কতক্ষণ পায়চারি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার যথাস্থানে বসিলেন। বলিলেন—তোর ছেলের গায়ের সোনার গয়না চাই একটা কিছু—

—কেন ?

—ভেঙে ফেলব।

সুকেশী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—শোন্ তবে। ষড়রিপুর কাম প্রথম, ক্রোধ দ্বিতীয়, লোভ তৃতীয়, আর মোহ হ'লগে চতুর্থ। তোর স্বামীর সন্তান-মোহ বড় প্রবল ছিল। তাকে বড্ড বেশী ভালবাসতেন। নয় ?

সুকেশী মাথা নাড়িল—ঠিক।

—সেই মোহ এখন তৃতীয়ে পৌঁচেছে—লোভ, স্বর্ণ-লোভ। এ কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয়। ঈড়া আর সুষুম্নার উপরে চৌম্বক প্রক্রিয়ায় বহির্ভেদ হয়েছে। এখন বিষস্য বিষমৌষধম্। সেই যে সন্তান-মোহ তারই অভিজ্ঞান-স্বরূপ তোর ছেলের গায়ের সোনা দিয়ে স্বামীর ঐ ভয়ানক স্বর্ণলোভের প্রতিক্রিয়া হবে। বুঝতে পারলি কিছু ?

সুকেশী বলিল—কিচ্ছু না।

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—আশ্চর্য্য নয়। এ-সব গুহ্যাৎ গুহ্যতর। কেবল ঐ গহনা নয়, সিকি ভরি সিঁদুর চাই, কপিত্থমূল—তালের জটা, মোছব্বর—সে সমস্ত আমি গুছিয়ে নেব। সিঁদুর আর ঐ সমস্ত কারণবারিতে গুলে তার মধ্যে সোনা ফেললে একদম মিলিয়ে যাবে।

—এক দম যাবে ? কোন চিহ্ন থাকবে না ? একটু-খানি বাঁকা হাসি সুকেশীর মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী শান্তকণ্ঠে বলিলেন—অবিশ্বাস হয়ত কাজ নেই।

—না–না। সুকেশীর মুখ একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। বলিল—আমার মনই এই রকম ঠাকুর, তুমি কিচ্ছু মনে ক'রো না। বিশ্বাস এবার আমাকে করতেই হবে। ডাক্তার, কবিরাজ, ফকির, অবধূত, কালী, শীতলা, ঘেঁটু, মাকাল কিছু আর বাকী নেই। হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে, একটা গয়নার আর কি-ই বা দাম ? কেবল গোপালের গায়ের জিনিষ···তাই—

এতক্ষণে রতন উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে উহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সকল ব্যথা ভুলিয়া সুকেশী স্নিগ্ধ হাসিয়া উঠিল। তার মাথায় হাত বুলাইয়া মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কত রাত্রে এসেছিলি ? খাওয়া হ'ল কি না, আমায় ত একটি বার ডাকলি নে তুই রতন ?

সে কিছু না বলিতেই সন্ন্যাসী আগেভাগে বলিয়া উঠিলেন—মহাভক্ত তোমার মা। তিনি জেগে ছিলেন, তাঁর সেবার কি কোন ত্রুটি আছে ? তোমার ঘুম ভাঙাবে ও কি দুঃখে ?

সরল প্রশান্ত দৃষ্টি সন্ন্যাসীর মুখে স্থাপিত করিয়া সুকেশী বলিয়া উঠিল—ঠাকুর, সন্ন্যাসীতে আমার বিশ্বাস নেই ;—কিন্তু রতন আমার সন্ন্যাসী নয়, সে আমায় কাল বলেছে, তোমার অনেক ক্ষমতা। গোপালের গয়না চাও, যা চাও—দিচ্ছি, ওঁকে আবার তেমনটি ক'রে দাও, ঠাকুর।

ছেলের হাতের এক গাছি বালা আনিয়া তাঁর পদপ্রান্তে রাখিয়া সুকেশী প্রণাম করিল।

সেইদিন গভীর রাত্রে আনন্দের আতিশয্যে রতন আবার ভুল করিয়া ডাকিয়া বসিল—বাবা !

ব্যস্ত হইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—এখন নয়, এখানে থাকতে নয়—

উজ্জ্বল মুখে রতন বলিতে লাগিল—গয়না কিন্তু আমার—

—আচ্ছা।

—দাও তবে—।

—না, না—এখানে নয়।

রতন বায়না ধরিল—একটিবার দাও শুধু, আমি দেখে রেখে দেব—

সন্ন্যাসী বলিলেন—অন্ধকারে দেখবি কি রে ?

—হাত বুলিয়ে দেখব।

ঝুলির মধ্য হইতে বালা বাহির করিতেই হইল, না করিলে শোনে না।

সন্ন্যাসী বলিলেন—একটা রদ্দি পচা পোষাক, তোর

ায়ে পরিয়ে দিল সেদিন তা-ও তুই নিতে পারলি নে। ার দেখ দিকি—আস্ত সোনার গয়না—কত ভারী দেখেছিস ?

রতন তখন গহনা পরিবার প্রাণপণ চেষ্টায় আছে। শেষে হতাশ হইয়া কহিল—হাতে ঢোকে না যে—

সন্ন্যাসী কহিলেন—ছোট্ট ছেলের জিনিষ; ঢুকবে কন ? বড় ক'রে দেব—

—মোটে এক হাতের হ'ল—

—আর একটা গড়িয়ে দেব।

নিশ্চিন্ত হইয়া শিশু তখন চোখ বুজিল। হাতের মধ্যে ালাগাছি। সন্ন্যাসী লইতে গেলে কিছুতে দিল না। ুমাইয়া পড়িয়াছে, মুঠি তবু ছাড়ে নাই।

তার পর দিন-তিনেক কাটিয়াছে। স্বর্ণঘটিত সিঁদুর প্রস্তুতের নানাবিধ প্রক্রিয়া চলিয়াছে, সমাধা হইতে অতি ামান্যই বাকী, আর একটা দিন মাত্র লাগিবে। ভক্তের নির্ব্বন্ধে ইতিমধ্যে সেবার বিষয়ে সন্ন্যাসী একেবারে হাল ছাড়িয়া বসিয়াছেন, এক মুষ্টি চাউল লইয়া প্রথম দিনকার মত জেদাজেদি আর নাই। দিনে রাত্রে প্রহরে প্রহরে নিরুপদ্রব সাধুসেবা চলিতেছে। আজিকার রাত্রিটা কাটাইয়া আগামী দিন অতি প্রত্যুষেই সন্ন্যাসী সুকেশীকে সিঁদুর পরাইয়া দিবেন, সিঁদুর পরিয়া সে গিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইবে,—সমস্ত ঠিকঠাক।

দুপুরবেলাটায় দুজনে ঐ সকল পরামর্শই হইতেছিল, এমন সময় অমরনাথ একেবারে দৌড়িতে দৌড়িতে আসিল। কোটরের মধ্য হইতে জবাফুলের মত চোখ দুটি ঠিকরিয়া বাহির হইতেছে, লম্বা লম্বা রুক্ষ চুলগুলি সজারুর কাঁটার মত খাড়া, কৃশ সুদীর্ঘ ডান হাত সন্ন্যাসীর মুখের উপর তুলিয়া সে বলিয়া উঠিল—তৈলকন্দের গাছ চেন কি না ব'লে দাও—

সন্ন্যাসী বলিলেন—না।

মহাক্রুদ্ধ হইয়া অমরনাথ কহিল—তবে যে বললে সেদিন, মুঠোমুঠো সোনা তৈরি করেছ—

সন্ন্যাসী বলিলেন—তৈরি কোথায় ?—চণ্ডী-মা দিলেন।

—মিথ্যে কথা। চণ্ডী-মা বাতাস থেকে দিলেন না কি ? স্বর পর্দায় পর্দায় চড়িতে লাগিল।—বাতাসে সোনার গুঁড়ো ভাসে, তাই চণ্ডী-মা অমনি হাতের উপর ধরে দিলেন। সোনার স্পেসিফিক গ্রাভিটি কত জান ?

সন্ন্যাসী চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু পাগল থামিল না। বলিল—তুমি নিশ্চয় জানো তৈলকন্দ। কালকেউটে সাপ রাতদিন সে গাছের গোড়ায় পাহারা দিয়ে বেড়ায়। এমনি তার বিষ, ছুঁচ বিঁধলে ছুঁচটা অবধি গলে জল হয়ে যায়। ঠিক চেন তুমি—বলতে চাও না। কিন্তু আমি ছাড়ব না।

বজ্রমুষ্টিতে সে সন্ন্যাসীর হাত ধরিল। রোগা লোকটি, কিন্তু গায়ে যেন অসুরের বল। হাতের কনুই অবধি কড়-কড় করিয়া উঠিল।

—ওকি ? কি কর—কি কর বলিতে বলিতে সুকেশী মাঝখানে আসিল। এতক্ষণে অমরনাথ সুকেশীকে দেখিল। সন্ন্যাসীর হাত ছাড়িয়া দিল; আর সে মানুষ নয়, অকস্মাৎ হাহাকার করিয়া উঠিল—হ'ল না সুকেশী। সেই সাপ সিদ্ধ হ'ল কিন্তু পারাভস্ম হয় নি। কাঁচা পারা জলের নীচে সব তলানি পড়ে রইল, কোন কাজে এল না।

মাথায় হাত দিয়া সে বসিয়া পড়িল। বলিল—এ-সমস্ত বুজরুকী, সমস্ত প্রক্ষিপ্ত। আসল হচ্ছে স্বর্ণ-তন্ত্র। কিন্তু তৈলকন্দ যে চেনা গেল না। তিন বচ্ছর বনবাদাড়ে ঘুরেছি, কত বেটা সন্ন্যাসী আশা দিয়েছে, শেষে পালিয়ে গেছে। একে আমি ছাড়ব না কিছুতে।

আবার পাগল রুখিয়া উঠিল। তাহাকে টানিয়া পাশে বসাইয়া অনেক করিয়া সুকেশী শান্ত করিল। ভয়ে দুঃখে সুকেশী একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

—ভাল করতে গিয়ে এ আমার কি হ'ল, সন্ন্যাসী ? উনি নিজের মনে বসে বসে জঞ্জাল ঘাঁটতেন, যা-খুশী করতেন—আজকে এ কি ভয়ানক রাগ !

সন্ন্যাসী সপ্রতিভ হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—ঐ ত মজা, নিববার আগে আলোটা দপ-দপিয়ে জ্বলে। তৃতীয় রিপু লোভ এবারে দ্বিতীয়ে পৌছুল। এ-ক্রোধ আর কি-ই বা ? এমন দেখেছি, খুনখারাপি করতে যায়—

শান্ত মানুষ খুনের কথায় আবার লাফাইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—আমিও খুন করব। শীগ্‌গির তৈলকন্দ ব'লে দাও—নইলে জান্ থাকবে না—

গতিক আরও ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল। ঘণ্টাখানেক পরে দড়াম করিয়া দরজায় লাথি। চকচকে একখানা বলির খড়্গ হাতে পাগল ঘরের মধ্যে আসিয়া লাফাইতে লাগিল।

—গর্দ্দানে একটা কোপ···ব্যস! বলিয়া হা-হা করিয়া ছাত ফাটাইয়া হাসি। বলিল—বলে দাও শীগ্‌গির—

রতন সেখানে ছিল, আকুল চীৎকারে কাঁদিয়া উঠিল। যে যেখানে ছিল, আসিয়া পড়িল। সুকেশী আসিতেই ভালমানুষের মত তার হাতে খাঁড়াখানা দিয়া পাগল হাসিয়া বলিল—ঠাট্টা করছিলাম।

—কিন্তু ভাল কথা নয় মা। সন্ন্যাসীর মুখ শুকাইয়া গিয়া এতটুকু; তাহারই মধ্যে একটু হাসির মত ভাব করিয়া বলিতে লাগিলেন—আজকের দিনটা ওকে শিকল দিয়ে রাখ। একেবারে গোড়া ধরে টান দিয়েছি কি না, তাই অমন। মন্ত্রের ফলটা হাতে হাতে দেখে নাও।

—ছাই মন্তোর, মিথ্যে কথা। পাগল চোখ পাকাইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল—ঠাকুর, অনেক ঠকেছি। জবুথবু বুঝিয়ে পালিয়ে যাবে—সে হচ্ছে না। রাতে আমি ঘুমুই নি—তিন বছর ঘুমুই নি। ভাল চাও ত ব'লে দাও—আর নয়ত এক-শ কুচি ক'রে রেখে যাব, কেউ ঠেকাতে পারবে না—

বাস্তবিক, ঠেকানো মুস্কিল। সুকেশী নিরস্ত করিতে গেলে মাথা ঝাঁকাইয়া পাগল বলিয়া উঠিল—বলছ কি, সুকেশী। ও জানে, তবু বলবে না। আমি খাইনে, ঘুমুই নে—খোকা মরল চোখের দেখা দেখি নি—ঘর-সংসার সমস্ত ভুলে গেছি,—চাকরি ছাড়লাম,—পাগল হলাম—। কেবল একটু···একটু···একটুখানি—সামান্য এতটুকু কাজ—ঐ গাছটা মাত্র বাকী। সন্ন্যাসী জানে, তবু বলবে না।

আর পাগলের প্রলাপ নয়, আগাগোড়া কাহিনী এমন করিয়া বলিয়া যাইতেছে যে চোখের জল রাখা দায়। সুকেশীর মা সন্ন্যাসীর পায়ের উপর পড়িয়া মাথা কুটিতে লাগিল—বাবা তুমি সমস্ত জান ব'লে দাও। বাছা আমার সেরে উঠুক—তুমি আমাদের বাঁচাও—

পাগলও আসিয়া নতজানু হইয়া মিনতি করিতে লাগিল—ব'লে দাও—ব'লে দাও—

সন্ন্যাসী সুকেশীর দিকে চাহিলেন। করুণ সজল চোখে সে চুপ করিয়া ছিল, সেও আসিয়া পায়ের উপর পড়িল—ঠাকুর, আমি সমস্ত বিশ্বাস করি। তুমি আমাকে বাঁচাও—ওঁকে ব'লে দাও—

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া অমরনাথকে ডাকিলেন—এস আমার সঙ্গে—

দু-জনে সমস্ত বিকাল বনে বনে ঘুরিয়া সন্ধ্যার পর এক বোঝা গাছ-গাছড়া লইয়া উত্তরের কোঠায় অধিষ্ঠান করিল। তারপর দাউ-দাউ করিয়া উনান জ্বলিল। পাত্রের উপর জল ফুটিতেছে। ঘরে মাত্র একটা মিটমিটে আলো। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। জল টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। আবছা অন্ধকারে উনানের উপর বড় বড় ফুল্‌কী উঠিতেছে। গাঢ় নীল জলের বর্ণ। উগ্র কটু গন্ধে ঘরের বাতাস বিষের মত লাগিতেছে।

আগুনের তাপে অমরনাথের সর্ব্বাঙ্গে ঘামের ধারা চলিয়াছে। চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এইবার?

সন্ন্যাসী বলিলেন—সবুর।

চারিদিকে আবার নিঃশব্দতা, কেবল আগুনে ও ফুটন্ত জলে মিলিয়া একটা অদ্ভুত ধরণের ক্ষীণ আওয়াজ।

আবার খানিক পরে সন্ন্যাসী জ্বলন্ত একখানা চেলাকাঠ তুলিয়া আর একবার পাত্রের ভিতরটা দেখিলেন।

—এখন?

ঘাড় নাড়িয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—উঁহু—

অমরনাথ অধীরকণ্ঠে কহিল—একেবারে শুকিয়ে গেল। কখন তবে?

—শুকোক। সন্ন্যাসী নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলিলেন—শুকিয়ে এক বিঘৎ থাকবে, তখন কাঠকিরি দিয়ে তার পর—

অমরনাথ নিবিষ্ট মনে কাঠি দিয়া জল মাপিতে লাগিল।

ন্ন্যাসী টিপি-টিপি নিজের ঘরে গিয়া ঘুমন্ত রতনের কাঁধে হাত দিলেন।

—ওরে রতন, ওঠ্—বেটা, ওঠ্—

রতন বার-দুই উ-উ করিল, কিন্তু উঠিবার লক্ষণ দেখাইল না। তখন সন্ন্যাসী হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। ঠির ভিতর সেই সোনার বালা, রোজ রাত্রে শুইবার ময় বালা তার চাই। ঠক্ করিয়া বালা মেজের উপর ড়াইয়া পড়িল।

মৃদু পায়ের শব্দ।

মুখ বাড়াইয়া সন্ন্যাসী আবছা দেখিলেন, ঠিক দরজার কাছে অমরনাথ চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিক্ত কণ্ঠে কহিলেন—আবার এই অবধি ধাওয়া করেছ? বিকেল থেকে এক পা আগ-পাছ হ'তে দিচ্ছ না—ব্যাপারটা কি?

—না না ঠাকুর, তা নয়। ঘরের মধ্যে আসিয়া অমরনাথ দুই হাতে সন্ন্যাসীর পদধূলি মাথায় লইল। হাসিয়া বলিল—অনেক ঠকেছি কি না···যাবার সময় সাধু-মশায়রা প্রায়ই পায়ের ধুলো না দিয়ে চলে যান···। তাই—

উত্তরের কোঠায় ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসী কাঠি ডুবাইয়া জল মাপিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। বলিলেন—যা ভেবেছি তাই। এক বট বেশী শুকিয়েছে। দোষ তোমার বাপু। পই পই ক'রে বললাম,—ফটকিরি না ফেলে তুমি আমায় ডাকতে গেলে কেন?

—এতে হবে না?

সন্ন্যাসী বলিলেন—অসম্ভব।

—বেশ! তাতে কি? এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা না করিয়া অবিচল মুখে অমরনাথ পাত্র উপুড় করিয়া ঢালিল। তখনই উনেরায় চড়াইবার উদ্যোগ। একটু ক্লান্তি নাই, একটি সেকেণ্ড আর নষ্ট করিবার উপায় নাই, এমনি ভাব।

সন্ন্যাসী দরজায় পা বাড়াইয়া বলিলেন—এবার আমার বিশ্রাম।

—আর একটু। বলিয়া পাগল পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল। আবার সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলা লইয়া বলিল—ঠাকুর, সোনা যখন চকচক করবে ঐ জলের নীচে, বিশ্রাম-বিশ্রাম তখন···তার আগে পা বাড়ালে খাঁড়া দিয়ে দুই ঠ্যাঙে দুই কোপ। বলিয়া উদ্দাম হাসিতে হাসিতে বলিল—ঠাট্টা করলাম, ঠাকুর—মিছে কথা।

ঠাকুর কিন্তু আবার স্বস্থানে ফিরিয়া কাঠ হইয়া বসিলেন। তখন আকাশে শুকতারা দপদপ করিতেছে, পূর্ব্বাকাশে রক্তিম আভা। বিশাল পাত্র পরিপূর্ণ হইয়া আবার জল চড়িল। হিসাব করিয়া সমস্ত উপকরণ পরিমাপ করিয়া অমরনাথ জলের মধ্যে ঢালিয়া দিল।

সকালবেলা সুকেশী আসিয়া সে ঘরে ঢুকিতেই সন্ন্যাসী হাসিলেন—অনেকটা কান্নার মত হাসি। বলিলেন—আজও সমস্ত দিন ছুটি নেই মা, এই সিদ্ধি হ'তে রাত্তির হয়ে যাবে। তত ক্ষণ এই ঘরে আটক।

ঘাড় কাৎ করিয়া হাসিমুখে আবদারের ভঙ্গিতে সুকেশী বলিল—না—না, আমি নিয়ে যাচ্ছি। আমার একটু দরকার আছে। লক্ষ্মিটি, যাবে?

অমরনাথ হাসিয়া বলিল—খুব—খুব! তুমি ওঁর কথা বিশ্বাস করলে, সুকেশী? সমস্ত ঠাট্টা—

বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসী হাঁপ ছাড়িলেন।

সুকেশী বলিল—আমার সিঁদুর?

—কালকে ভোরে। আজই হ'ত, কিন্তু সমস্ত রাত্রি যে ছাড়লে না। না আর নয়, নেহাৎ ছাড়বে না যখন, আজই দেব সোনা ক'রে। কাল সকালে দেব তোর ভৈরবী-সিঁদুর। তার পর তোদের সুখে-স্বচ্ছন্দে রেখে বিদায় নিয়ে চলে যাব—

সুকেশী বলিল—হবে ত ঠাকুর? সত্যি বলচ, হবে? তার চোখ ছল-ছল করিয়া আসিল। বলিল—ভাঙা কপাল, বিশ্বাস হ'তে চায় না···আমার গোপালের গয়না কি ভেঙে ফেলেছ?

সন্ন্যাসী বলিলেন—হুঁ।

গাঢ়স্বরে সুকেশী বলিল—যেন সিদ্ধি হয় ঠাকুর। বড্ড সুখে ছিলাম, এখন আর কিছুই নেই। গোপাল নেই—তার গয়নাও দিয়ে দিলাম—ওঁকে যেন ফিরে পাই।

নিঃশব্দে মাথায় হাত দিয়া সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। জল টগবগ ফুটিতেছে,

অমরনাথ নিষ্পলক সেই দিকে তাকাইয়া। সারাদিন খায় নাই, তিলার্দ্ধ উঠে নাই। এবারে বড় সাবধান, কিছুতেই কোন ত্রুটিতে যাহাতে পণ্ড না হইতে পারে। সন্ন্যাসীকেও সমস্তটা দিন একরকম ঠায় বসাইয়া রাখিয়াছে, উঠিবার চেষ্টা করিলে দেয়ালে-টাঙানো চকচকে সেই খাঁড়াখানা দেখাইয়া এমন ঠাট্টা করে যে উঠিতে ভরসায় কুলায় না।

সন্ধ্যার কাছাকাছি সুকেশীকে খবর দিয়া আনাইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—আমার জন্য নয় মা, আমার এ-সমস্ত অভ্যাস আছে। যেমন ক'রে পার চারটি ওর মুখে দিয়ে দাও, নইলে অনর্থ করবে। যত্ন ক'রে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বসাও। আজকে শেষ-মুখ, তাই বড্ড বাড়াবাড়ি। খুব সাবধান আজকের দিনটা।

সুকেশী অনেক বলিয়া-কহিয়া অমরনাথকে খাইতে বসাইল। সেই ঘরেই—ঘর হইতে এক পা আজ সে নড়িতে পারিবে না। কয়েক গ্রাস মাত্র মুখে পুরিয়াছে,—সন্ন্যাসী কাঠি দিয়া নীল জল নাড়িতেছিলেন, হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন—দাও—ফটকিরি দাও এইবার—

অমরনাথ খাওয়া ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিয়া ফটকিরির গুঁড়া লইয়া বসিল।

জল শুকাইতে লাগিল। সুকেশীর মা ছুটিয়া আসিয়াছেন, রতন আসিয়াছে, এতগুলি চোখের দৃষ্টি ঠিকরিয়া যাইতেছে। সুকেশীর বুকের মধ্যে এমন ঢিব-ঢিব করিতেছে, যদি—

এমনি সময়ে জল শুকাইয়া পাত্রের মধ্যে ঝকমক করিয়া উঠিল

সোনা! সোনা! সোনা!

প্রকাণ্ড পাত্রটি অমরনাথ সিংহের বিক্রমে মেজের উপর উপুড় করিয়া ফেলিল। অল্প জল এক পাশে গড়াইয়া গেল—পড়িয়া রহিল ছোট একটি সোনার তাল। হাত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, অমরনাথ তাড়াতাড়ি কষ্টিপাথর লইয়া দু-তিনটা টান দিল। রেখাগুলি বিদ্যুতের মত পাথরের গায়ে জ্বলিতে লাগিল।

সোনা!

সে চীৎকারে তার হৃৎপিণ্ড বুঝি-বা ফাটিয়া যায়। হাল্কা একটা পুঁটলীর মত সন্ন্যাসীকে কাঁধের উপর বসাইয়া অমরনাথ সারা বাড়িময় তাণ্ডব নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তারপর শান্ত হইল যখন, অমরনাথ একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ।

সে-রাত্রে সে-অঞ্চলে যত কিছু মিলিতে পারে, সমস্ত দিয়া সন্ন্যাসীর সেবা হইল। অমরনাথ স্নান করিল, তেল মাখিল, ফরসা জামা পরিল, দিব্য সহজ মানুষের মত হাসিয়া আনন্দ করিয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া থাইল। তার পর আবার ধীরে ধীরে উত্তরের কোঠার দিকে চলিল দেখিয়া সুকেশীর মা সভয়ে প্রশ্ন করিলেন—ওদিকে যে?

সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া অমরনাথ বলিল—বাবা থাকতে থাকতে আর একটা জ্বাল চড়িয়ে দিই গে। প্রক্রিয়াটা পাকাপাকি শিখে নেওয়া দরকার—ভুলচুক না থাকে। এবারে একেবারে শ-খানেক ভরির মত ব্যবস্থা করা যাক—

মা তবু মৃদু আপত্তি তুলিলেন—রাত্তিরটা থাকলে হ'ত। বাবা ত থাকবেন এখানে, আমি ছেড়ে দেব না।

—ক'দিন থাকেন ঠিক কি, আর একবার দেখিয়ে শুনিয়ে নেওয়া ভাল। দেরি করা কিছু নয়—

অমরনাথ চলিল। পিছন হইতে সুকেশী বলিল—আমি যাচ্ছি গো, আমিও শিখে নেব। মাও হাসিয়া সঙ্গ ধরিলেন। একটি পাগল ছিল, সোনায় এখন সবসুদ্ধ পাগল করিয়া দিয়াছে!

সন্ন্যাসী ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন—কিন্তু আমি যাব না। আমি বিশ্রাম চাই—

সুকেশী কাছে আসিয়া করজোড়ে মিনতি করিতে লাগিল—একটুখানি,—আরম্ভটা বড্ড গোলমেলে শুনেছি। শুধু ঐটে আপনি দেখিয়ে দেবেন। এবারে আমি শিখে নিতে চাই।

সন্ন্যাসী ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—ভৈরবী-সিঁদুর?

সুকেশী বলিল—থাক গে।

সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া কাজ সুরু করিতে দুপুর রাত্রি হইয়া গেল। অমরনাথ প্রণাম করিয়া কহিল—স্বচ্ছন্দে শুয়ে পড়ুন গে, বাবা। যদি আটকায় কোন জায়গায়, তখন না-হয় ডেকে নিয়ে আসব।

সুকেশীর মা আজ আর শোবার তদারক করিতে আসিলেন না, বলিয়া দিলেন—কম্বল-টম্বল পাতা আছে। আলো জ্বালা আছে। আমি যাব খানিকটা পরে। দেখে আসি এদের কাণ্ডকারখানা—

বলিয়া তিনিও ফুটন্ত জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

সন্ন্যাসী ঘরে আসিয়া দেখিলেন, দুটি বিছানা পাতা—একটিতে রতন ঘুমাইয়া। নিজের বিছানার কম্বলটি তাড়াতাড়ি গুটাইয়া লইয়া রতনকে টানিয়া তুলিলেন।

ঘুমচোখে রতন বলিল—কি?

সন্ন্যাসী বলিলেন—সেই পোষাকের বাক্সটাক্স যা দিয়েছিল তোকে—কোথায় নিয়ে আয় শীগ্‌গির।

এ কর্ম্ম নূতন নহে এবং কিছু ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবারও প্রয়োজন হয় না। ফিস-ফিস করিয়া রতন বলিল—পোষাক উপরের ঘরে; দরজায় তালা দেওয়া। চাবি খুঁজে দেখব?

সন্ন্যাসী বলিলেন—না—না। এক্ষুনি হয়ত এসে পড়বে, আর ধরে নিয়ে উত্তরের কোঠায় ঢুকিয়ে দেবে। না, দেখে কাজ নেই, তুই চল—

তবু রতন এখানে-ওখানে হাতড়াইয়া যাহা পাইল লইল। পিছনের খিড়কী দিয়া জঙ্গলাবৃত গ্রাম-পথের উপরে আঁধারে আঁধারে দুইজনে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। হঠাৎ সন্ন্যাসীর পিছনের কাপড়ে টান। দৌড়িবার ঝোঁকে রতন হাঁপাইতেছে—হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে বলিল—ঠাকুর, বালা এনেছ?

—হুঁ—

—দাও আমাকে—

—দেব, চল্—

দৌড়িতে দৌড়িতে গ্রাম পার হইয়া গাঙের সাঁকো পার হইয়া তারা বিলে আসিয়া পড়িল। সরু আলপথ। হঠাৎ পা সরিয়া পড়িয়া রতন কাঁদিয়া উঠিল। বিনাবাক্যে সন্ন্যাসী তাকে কাঁধে তুলিয়া লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—হাতে কি রে?

রতন শান্ত হইয়াছে। বলিল—সেই নতুন হাড়িটা। সেখানে পেলাম ত নিয়ে এলাম। ভাঙে নি ঠাকুর, ও ঠিক আছে।

বিল শেষ হইয়াছে। একটা বটতলায় তাহারা বসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন—বোঁচকা খোল্—

বোঁচকা খুলিয়া রতন বাহির করিল গাঁজার কলিকা।

মুখ বাঁকাইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—ও এখন কোথায় কি হবে? আর কিছু নেই? দেখ দিকি খুঁজে—

এবং নিজেই খুঁজিয়া পাতিয়া একটি বিড়ি বাহির করিয়া মুখে দিলেন।

রতন বলিল—আগুন?

—মন্তোরে হবে। বলিয়া উল্টা গাঁট হইতে লাল দেশলায়ের কাঠি বাহির করিয়া হাঁড়ির তলায় খস করিয়া টানিয়া আগুন ধরাইলেন। হাসিয়া বলিলেন—সেদিন আগুন করলাম, তুই দু-হাত ভর্ত্তি পয়সা নিলি, সব ভুলে গেছিস?

শেষরাত্রির হিম হাওয়া বহিতেছে, লতাপাতা খসখস করিতেছে, রতন চুপি চুপি আঙুল দিয়া দেখাইল—ঠাকুর, সাদা কাপড় পরা… ঐ মানুষ—না?

—দূর, উলুবন। পোড়া বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া সন্ন্যাসী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বাপ রে বাপ! বড্ড বেঁচেছি। একেবারে বাড়িসুদ্ধ* পাগল্! অমন আর দেখি নি।

—এইবার আমার গয়না…

—গয়না কি আছে? টানিয়া রতনকে একেবারে কোলের মধ্যে আনিলেন। কত দিন পরে শিশু আবার কোলে উঠিল। সন্ন্যাসী বলিলেন—বালা ভেঙেচুরে ফুটন্ত জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলাম। নইলে রক্ষা ছিল! যাদের গয়না, তারাই নিয়ে নিয়েছে, বাবা। এবারে আর হ'ল না।

—নিক গে—স্নেহে গলিয়া গিয়া রতন খানিক ক্ষণ কথাই বলিতে পারে না। বলিল—গয়না আমি চাই নে। কিন্তু এবার আমি বাবা বলব। আর ঠাকুর ব'লে ডাকছি নে—

জুয়াচোর নিঃশঙ্কে ছেলের গালে চুমা খাইয়া মাথাটি বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

ডালাকার্লিয়া ও ডালাকার্লিয়ান

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

স্কাণ্ডিনেভিয়ান দেশসমূহের অধিবাসীদের মধ্যে জাতির সংমিশ্রণ ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের তুলনায়



জন-নির্ম্মিত বর্ত্তমান সুইডেনের জন্মদাতা রাজা গোস্তাব ভাসার প্রস্তর মূর্ত্তি। ইহা জর্নের নিজ শহর—মোরাতে স্থাপিত।

অপেক্ষাকৃত কম। হয়ত দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ইহার কারণ। স্কাণ্ডিনেভিয়ার উত্তর-সীমান্ত প্রদেশ ও নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানসমূহে ল্যাপ জাতি লোকেরা বাস করে। জাতিতে, ভাষায় ও আহার-বিহারে ইহারা একেবারে ভিন্ন শ্রেণীর



জর্নের অঙ্কিত নিজের চিত্র

লোক; অন্য ভাষায় বলিতে গেলে, ইহারা ইউরোপীয় সভ্যতার প্রায় বাহিরে বাস করে। সমস্ত স্কাণ্ডিনেভিয়ার, যথা—সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও আইসল্যাণ্ডের, অধিবাসীরা জাতিতে ও ভাষায় এক পরিবারের অন্তর্গত; সেই জন্য ইহাদের প্রত্যেকের ভাষা পৃথক ও স্বতন্ত্র প্রকৃতির হইলেও



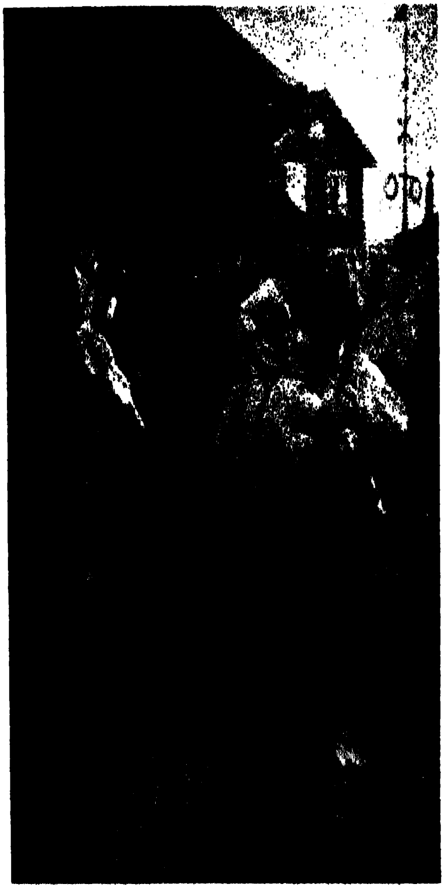
শিল্পী জর্নের বাসগৃহ। এখন ইহা মিউজিয়মে পরিণত হইয়াছে এবং সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি

তাহাদের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নহে। আজ এখানে শুধু সুইডেনের মধ্যস্থ একটি প্রদেশ—ডালার্না (Dalarna) ও ইহার অধিবাসীদের সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি।

ডালার্না প্রদেশের অধিবাসীদিগকে সাধারণ

ইহাদেরই সাহায্যে বর্ত্তমান সুইডেনের জন্মদাতা বিখ্যাত রাজা গোস্তাব ভাসা ডেনিশদের কবল হইতে দেশকে মুক্ত করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে এই খনি দেশের রাজকোষের বড় সম্পদ ছিল। এই খনির গভীরতা উপরের সমভূমি হইতে প্রায় ১১৫০ ফুট এবং ইহার সমগ্র সুড়ঙ্গপথ বার মাইলেরও অধিক লম্বা। হইয়াছে তাহাদের সকল প্রকার মডেল রক্ষিত আছে। ১১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কোম্পানীর আসল ছাড়পত্র বা document



জর্ন-অঙ্কিত মধ্যরাত্রির সূর্য্যাভিনন্দন ও তদুপলক্ষে নাচগান। মূল চিত্রটি ন্যাশন্যাল মিউজিয়মে রক্ষিত



সিলিয়ান-হ্রদের তীরে রেৎভিক নামক স্থানে বার গোস্তাব ভাসার স্মৃতিস্তম্ভ

ও তা ছাড়া বহু খনিজ দ্রব্যও সেখানে সংরক্ষিত আছে। এই খনি এখন অতি অল্পই তামা দান করে। তবে এই একই কোম্পানী এখন দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ লৌহ-কারখানার মালিক। এই কারখানা ফালুন শহরের দক্ষিণে দমনারভেট (Damnervet) নামক স্থানে অনতিদূরে অবস্থিত। ডালএলবেন নদী ইহার পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই নদীর মুখে স্কুটস্যার (Skutskar) নামক স্থানে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কাঠের কারখানা অবস্থিত। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যে, ফালুন শহরের মিউজিয়মে সপ্তদশ শতাব্দীর বৃহৎ তাম্রমুদ্রা সংগৃহীত রহিয়াছে এবং ইহাদের ওজন একত্রে ৮০ পাউণ্ড।

বলা বাহুল্য, উক্ত খনিজ সম্পদও প্রাচীনকাল হইতে এই প্রদেশবাসীদিগকে সমৃদ্ধি দান করিয়া আসিতেছে। গ্রেঞ্জ্‌গেসবের্গ নামক শহরের



রবিবার উপাসনাগৃহের দিকে বৃদ্ধারা স্বরচিত পোষাকে চলিয়াছেন

কাঠের ব্যবসা চারিদিকের পর্ব্বতমালার উচ্চশ্রেণীর লৌহপূর্ণ প্রায় ৫০০ শত লৌহখনি রহিয়াছে। এই শহরে অবস্থিত বৃহৎ লৌহকারখানায় উক্ত খনিসকল বৎসরে গড়ে ২৫ কোটি টন লৌহধাতু সরবরাহ করিয়া থাকে। তা ছাড়া এই একই প্রদেশে কয়েকটি বৃহৎ কাগজের কারখানা ও ইলেকট্রিক কোম্পানী রহিয়াছে। প্রদেশের দক্ষিণ-সীমান্তে ভেষ্টেরস নামক শহরে অবস্থিত "এশিয়া" ইলেকট্রিক কোম্পানীর কারখানায় গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ কাজ শিখিতে আসিতেছেন এবং কয়েক জন কাজ শিখিয়া আপাততঃ দেশে ফিরিয়াছেন। এখানকার সম্পদ ও সমৃদ্ধির কথা সংক্ষেপে লিখিলাম। অন্য দিকে স্কাণ্ডিনেভিয়ার বিখ্যাত সাহিত্যিক, কবি ও আর্টিষ্ট, যাঁহাদের নাম দেশ-বিদেশে ছড়াইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই এই প্রদেশের লোক।



ডালাকার্লিয়ার প্রতিঘরে মেয়েরা চরকায় এইভাবে সুতা কাটে

বিখ্যাত কবি কার্লফেলড্‌ট্‌, ডন আণ্ডেরসন, নামজাদা চিত্রকর কার্ললারসন, আণ্ডের্স জর্ন, এই ডালাকার্লিয়া প্রদেশের সন্তান।

কবি কার্লফেলড্‌ট্‌ ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন।

জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি নোবেল প্রাইজ কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯১৮ সালে তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া স্থির হয়। কিন্তু তিনি এই কমিটির



স্বহস্তে প্রস্তুত রঙীন পোষাকে ডালাকার্লিয়ান গীটার বাদ্যরত মহিলা

সেক্রেটারী বলিয়া উক্ত সম্মান গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। পরে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া স্থির হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার প্রাপ্য সম্মান তিনি জীবিতাবস্থায় দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। উক্ত প্রদেশের ফালুক স্যারণা নামক স্থানে কবি জন্মগ্রহণ করেন। ভেষ্টেরস শহরে উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া কালফেলড্‌ট্‌ উপসালা-বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বিদ্যালয়ে পাঠকালেই তাঁহার কবি-প্রতিভা ধরা পড়ে। তাঁহার রচনার অধিকাংশই উচ্চাঙ্গের প্রেমের কবিতা। ফ্রিললিন নামক নায়কের মুখ দিয়া তিনি তাঁহার কবিতায় সুর দিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রথম বয়সের যৌবনের উচ্ছ্বাস ও কল্পনায় পরিপূর্ণ।

সিলিয়ান-হ্রদ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সকল—বিশেষ ভাবে মোরা (Mora), লেকসান্দ (Leksand) ও রেটভিক্ (Rattvik), এ দেশের প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থান; বহির্জ্জগতের প্রভাবের পূর্ণ বিস্তার সত্ত্বেও এই হ্রদের তীরবর্ত্তী গ্রামগুলিতে এখনও মেয়েরা ঘরে নিজেদের হাতে তাঁতে কাপড় বুনে। হাতে-তৈরি রঙীন কাপড়-জামা এখনও অধিবাসীরা অন্ততঃ প্রতি রবিবারে ও গ্রীষ্মের ছুটির দিনে পরিয়া থাকে। পুরুষেরা এখন প্রাচীন ধারায় কাঠের নানা প্রকার প্রয়োজনীয় ও খেলার জিনিষ ঘরে তৈরি করে। গৃহনির্ম্মাণেও প্রাচীন ধারা সেখানে রক্ষিত। সিলিয়ান-হ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রায় ত্রিশ মাইল। এই প্রদেশের অধিবাসীদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে জ্ঞানলাভের জন্য গত জানুয়ারি মাসটা সিলিয়ান-হ্রদের চারিদিক ঘুরিয়া কাটাইয়াছিলাম। তাহার বৃত্তান্ত পরে লিখিব।

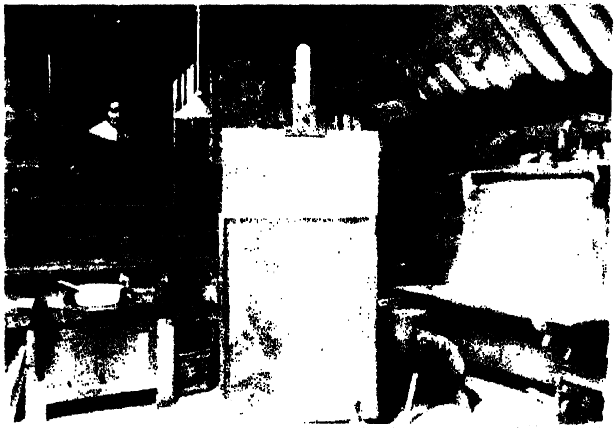
পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রদেশের চিত্রকর আণ্ডের্স জর্ন ও কার্ল লারসন সুইডেনের জাতীয় চিত্রকর বলিয়া খ্যাত। ফালুন শহর হইতে মোটরে করিয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যে



সুণ্ডবর্ণ গ্রামে বিখ্যাত চিত্রকর কার্ল লারসনের বাসগৃহ

সুণ্ডবর্ণ (Sundborn) নামক স্থানে কার্ললারসনের বাড়িতে পৌছানো যায়। বাড়িখানি বাহির হইতে দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহা চিত্রকরের বাড়ি,—চতুর্দিকের ঘরবাড়ির সঙ্গে ইহার পার্থক্য এত বেশী। তাঁহার অধিকাংশ প্রসিদ্ধ চিত্র এখন ষ্টকহলমের জাতীয় মিউজিয়মে রক্ষিত। তা সত্ত্বেও সুণ্ডবর্ণে তাঁহার বাড়ির কয়েকখানা কোঠা এখনও তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে পরিপূর্ণ। বিশেষভাবে গ্রাম্য অধিবাসীদের বাড়ির ভিতরের দৃশ্য তাঁহার তুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাড়ির ঘর দরজা ও আসবাবপত্রের সকল স্থানেই তিনি কিছু-না-কিছু ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বাড়ির অংশবিশেষ মিউজিয়মে পরিণত হইয়াছে।

চিত্রকর জর্ন প্রসিদ্ধ মোরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। শিল্পরাজ্যে জর্নের প্রতিভা বহুমুখী এবং তাঁহার চিত্র-সংখ্যাও কম নহে। এচিং এবং জীবিত মানুষদের চেহারা আঁকায় তিনি সুইডিশ চিত্রকরদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁহার বহু ছবি নানা দেশের মিউজিয়মে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার দুইটি প্রসিদ্ধ চিত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দিতেছি। একটি গ্রাম্য বালিকার চিত্র, ইহার নাম কিংস কারিন (Kings Karin)। সাধারণতঃ গৃহস্থ ঘরের শান্ত সুস্থ সবল সরল মেয়ে; তাহার গালের হাড় দুইটি বেশ উঁচু, মুখখানা টুকটুকে লাল। সে যেন গ্রাম্য সরল পবিত্রচেতা সুইডিশ মেয়ের প্রতিমূর্ত্তি, যে ধরণের মেয়েরা চিরকাল ধরিয়া পুরুষদের প্রাণে শক্তি ও শান্তি যোগাইয়া আসিতেছে।



জর্নের চিত্রশালা



ডালাকার্লিয়ান পোষাকে বর ও কনে

তাঁহার আর একখানি চিত্র গোথেনবার্গ (Gothenberg) মিউজিয়মে রক্ষিত। ইহার নাম "মুক্ত বাতাসে" ("Out in the Open Air")। চিত্রখানি দেশ-বিদেশে বহু প্রদর্শনীতে সমাদর লাভ করিয়াছে। চিত্রিত বিষয়টি ও বিষয়ের আবেষ্টনী পুরোপুরি সুইডিশ। সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে মসৃণ কঠিন ধূসর রঙের পাথরের গায়ে স্নানোদ্দেশে মাথায় পীত সোনালী রঙের চুলে ভরা দুই তরুণী নিরালায় জলে নামিবার জন্ত প্রস্তুত। কঠিন পাথরের উপর তারুণ্যভরা দেহ, নৌকাবিহার, মনের সহজ আনন্দের অভিব্যক্তি—

ইহা দেশের সামাজিক জীবনের অতি স্বাভাবিক চিত্র,—তাহাতে বিন্দুমাত্র পঙ্কিলতার আভাস নাই।

জর্নের অধিকাংশ ছবি তাঁহার বসত-বাড়ির মিউজিয়মে রক্ষিত। তাঁহার বিধবা স্ত্রী অতি সযত্নে সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণ করেন। প্রতিবৎসর, বিশেষ করিয়া গ্রীষ্ম কালে, দেশ-বিদেশ হইতে শত শত লোক উপমাবিহীন সিলিয়ান-হ্রদ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সকল দেখিবার জন্য সেখানে ভিড় করে।

ঘাসের ফুল

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাণীগঞ্জ-টাইলে ছাওয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বাংলোটা কলিয়ারীর আপিস। আপিসের উত্তরেই পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা খড়ে ছাওয়া বাংলোটা কলিয়ারীর বাবুদের মেস। বাংলো দুটোর কোলে প্রকাণ্ড বড় খোলা মাঠখানায় অতুল পায়চারি করিতেছিল। চারিদিক অন্ধকার। 'পিট'গুলার মুখে, বয়লারগুলোর চিমনীর মাথায় শুধু আগুনের শিখা হু হু করিতেছে। আর এখানে ওখানে কুলীদের কেরোসিনের কুপী খদ্যোতের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মেসের একটা ঘরে কুলী-রিক্রুটার চন্দ্রকান্ত হুঁকা টানিতে টানিতে সার্ভেয়ারকে বলিতেছিল—আমার ভাই ষোল আনার মধ্যে সাড়ে পনের আনা মিছে কথা।......সে আমি মিছে কথা বলব না।

বড় টেবিলটার উপরে খনির ম্যাপখানায় নূতন একটা লাইন টানিতে টানিতে সার্ভেয়ার উত্তর দিল—হুঁ—তা নইলে চাকরি থাকবে কেন? আলোটা একটু বাড়িয়ে দেন ত চন্দ্রবাবু। চশমা নইলে আর চলছে না।

পাশের ঘরে লেবার-রেজিষ্ট্রার সীতাপতি আপন মনে একখানা ছবি আঁকিতেছিল। সম্মুখে গম্ভীর ভাবে আর এক জন বসিয়া আছে স্থাণুর মত—চোখের পলক পর্য্যন্ত পড়ে না।

তার পাশের ঘরে বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার চশমা-চোখে স্ত্রীকে পত্র লিখিতেছিলেন—"এখানে ৺বৃষ্টি খুবই হই[illegible]। ওখানে ৺বৃষ্টির অবস্থা কিরূপ পত্রপাঠ জানাইবে। [illegible]আবাদের অব[illegible] বুঝিয়া ধান্যগুলি ধার দিবার ব্যবস্থা করিবে।"

আর একখানা ঘরে লটারির টিকিট কেনা হইতেছিল। ম্যানেজারের নামে একখানা লটারীর টিকিট-বই আসিয়াছে—সেইখানা হেডক্লার্ক বাবু লইয়া বিক্রয় করিতেছেন। আট আনা করিয়া টিকিটের দাম। প্রথম পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা। কালীপদ একটা ছদ্মনাম খুঁজিয়া সারা হইয়া গেল। হেডক্লার্ক বাবু কলম ধরিয়া বসিয়া ছিলেন—বলিলেন—কি নাম দেবে বল হে কালীপদ?

কালীপদ বলিল—শ্রীবৎস—কি বলেন? ও নামে শনির দৃষ্টিও চলে না।...দাঁড়ান, দাঁড়ান,—মহালক্ষ্মী কেমন হবে বলুন দেখি?

একেবারে এ-পাশের ঘরে একটি সুরূপ তরুণ হারমোনিয়ম লইয়া গলা সাধিতেছিল—'কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!' ছেলেটি কলিয়ারীর মালিকদের থিয়েটারে নায়িকা সাজে। এখানে চাকরিও তার সেই জন্য। বেতন বাইশ টাকা ছিল—এখন দুই টাকা কমিয়া হইয়াছে কুড়ি।

পাশের বারান্দায় ষ্টোরকিপার অমূল্য কুলিদের তেল মাপিতে মাপিতে বলিল—তুমি একটা যাত্রার দলে ঢুকে পড়, বুঝলে বিনোদ! মোটা মাইনে হবে। কেন কুড়ি টাকায় পড়ে আছ বল দেখি! গান থামাইয়া বিনোদ বলিল—ভারী চুক হয়ে গেছে গুদোম-বাবু! সেবার বীণাপাণি অপেরা আমাকে সাধাসাধি করলে। বলে—পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনেতে তুমি ঢোক—তার পর ছ-মাস পরে পঞ্চাশ ক'রে দেব। তিন বছরে এক-শো টাকা। তা যাত্রার দল ব'লে আর—!

অমূল্য বলিল—আমি একটা দোকান করব ভাই। বেগুনী-ফুলুরী কলাই-সেদ্ধ বুঝলে! বউ ক'রে দেবে, একটা ছোঁড়াকে দিয়ে বিক্রী করব। ভারী লাভ।

গুটিতিনেক ছেলেমেয়ে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বিনোদের বিছানায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। একটি মেয়ে বলিল—বাড়িতে গান করতে হবে বিনো-কাকা। চল, মা ডাকছে।

অপর মেয়েটি নাকিসুরে বলিল—ধ'রে নিয়ে যাব হ্যাঁ।

ছোট ছেলেটি তখন হারমোনিয়মের রিড চাপিয়া ধরিয়া একটা বেসুরের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। বিনোদ হাসিয়া বলিল—চল্ চল্ যাই। চিরুনীটা কোথায় রাখলেন গুদোম-বাবু?···আমার আবার ডিউটী আছে—তা চল, দুখানা গান গেয়েই চলে আসব।

প্রথম মেয়েটি বলিল—বই নিয়ে যেতে বলেছে মা।

কুঠীর মালিকদের কয়েক জন এখানে সপরিবারে বাস করেন। বিনোদকে মাঝে মাঝে বাসার ভিতর গান শুনাইতে হয়, রেলের বাবুদের লাইব্রেরী হইতে উপন্যাস আনিয়া যোগানিও তাহার একটা কাজ। নিজেই হারমোনিয়মটা লইয়া বিনোদ চলিয়া গেল। গুদামবাবু বলিলেন—দেখলে হে বাবুর চুল আঁচড়ান?

বিহুর ঘরের অংশীদার বিনোদের পরিত্যক্ত চিরুনীখানা লইয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিল—হুঁ।

তারপর আয়নাখানায় নানা ভঙ্গীতে মুখ দেখিয়া বলিল—বেশ আছে বাবা। আর থাকবে নাইবা কেন বল? চেহারা ভাল, গলা ভাল।

স্টোর-বাবু ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—বই যোগান—সেটা বল। আর মেয়েগুলোর দেখেছ! ষ্টেশনবাবু বলতে পাগল।

অতুল ভাবিতেছিল, হেন্‌রী ফোর্ড জীবন আরম্ভ করিয়াছিল কাঠের মিস্ত্রী রূপে—এডিসন আগে একটা রেলে খবরের কাগজ বেচিত। অতুল এখানে আসিয়াছে দুই শত মাইল পায়ে হাঁটিয়া—পথে বর্ষার নদী—নৌকা ভাড়া না থাকায় সেই নদী সে সাঁতার দিয়া পার হইয়া আসিয়াছে। পারের পয়সা দিতে পারেনি··· তারের প্রথমার··· পড়িবার··· আজ ··· কলিয়ারীর ম্যানেজার হইতে চলিয়াছে। এক বৎসর পরে মাইনিং পরীক্ষা দিবে।

অদূরে একটা আলোর পিছনে দুই জন বাবু আসিতেছিল। এক জন উচ্চকণ্ঠে অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে। অতুল বুঝিল ম্যানেজার ও ওভারম্যান আসিতেছে। ম্যানেজার আসিয়া বলিলেন—এই যে অতুলবাবু, আপনাকেই খুঁজছিলাম আমি। আজ খাদে বারুদ জলে গেছে। ক্রমশঃই খাদ গরম হয়ে উঠছে—এখন ফায়ার না হয়।

অতুল মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—গান-পাউডার জলে গেল?

ওভারম্যান খাটো মানুষ, কিন্তু শক্তিশালী দৃঢ়দেহ। সে কথা কয় যেন বক্তৃতা করে। হাত-পা নাড়িয়া অভিনয় করিয়া প্রত্যেক কথাটি বুঝাইয়া দেওয়া তাহার স্বভাব। সে বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। দক্ষিণ দিকের মেন গ্যালারীর পাশে ৫৮ নং সুঁদের মধ্যে-দেওয়ালে-হেই—এতখানি এক চাঙড় কয়লা জমে আছে। ঠাণ্ডারাম সর্দার বললে—বাবু ওই কয়লাটা দেগে দি। টোটা তোরের ক'রে ঠাণ্ডারামকে নিয়ে গেলাম দেখতে—বলি নিজের চোখে একবার দেখে দি। হঠাৎ গুঁড়ি হইয়া ওভারম্যান বলিল—ঠাণ্ডা বারুদের—জায়গা নামিয়ে রেখে—।

আবার খাড়া হইয়া হাত তুলিয়া বলিল—আমাকে দেখাইতেছে—বলে বাবু—ঐ চাংটা—আর ইদিকে অমনি ফ্যাঁস ক'রে নিয়ে নিয়েছে তখন। সঙ্গে সঙ্গে আলোয় একেবারে দিন দীপ্যমান।

একটু থামিয়া তাড়াতাড়ি হাত কয় পিছাইয়া গিয়া ওভারম্যান আবার আরম্ভ করিল—আমি তখন হঠ্‌তে লেগেছি। বুঝতে পেরেছি কিনা। ঠাণ্ডা বেটা কিন্তু হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে।

হাঁ করিয়া বুদ্ধিহীনের অভিনয় করিয়া সে থামিল। তারপর আপনার বাঁ-হাতখানা খপ্ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল—খপ্ ক'রে বেটার হাতটা ধরে হিড় হিড় ক'রে আনলাম টেনে।

তারপর সে পানিপথক্ষেত্রে বিজয়ী ··· শান্ত ··· গম্ভীর ভাবে নীরব হইল।

ম্যানেজারটি ··· মানুষ—বুদ্ধির ··· ভুল। ভদ্রলোক বলিলেন—কি করা যায় অতুলবাবু?

অতুল চিন্তা করিয়া বলিল—ও 'পিট'টায় কাজ বন্ধ ক'রে দিন।

ম্যানেজার বলিলেন—কিন্তু যদি ফায়ারই হয় ধর।

হাসিয়া অতুল বলিল—ফায়ার ত হবেই।

মহাচিন্তান্বিত ভাব ম্যানেজার বলিলেন—তা হ'লে ?

—সে আর আমরা কি করব? আপনি, এখানে যাঁরা মালিক আছে, তাঁদের জানান—আর হেড আপিসেও টেলিগ্রাম ক'রে দিন। তা হলেই খালাস।

ম্যানেজার বলিলেন—তাই ত হে—কলিয়ারীটা আমার নিজের হাতে তৈরি করা—

অতুল হাসিয়া বলিল—চল্‌লাম আমি তিন নম্বর পিটে। আমার ডিউটি আছে।

*　　*　　*

প্রকাণ্ড লোহার বিম্—র‍্যাফ্‌টারে ছাঁদাছাঁদি করিয়া একটা অতিকায় কঙ্কালের মত গীয়ারহেডটা দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই তলে বিরাটকায় সাড়ে তিন-শো ফুট গভীর একটা কূপ মাটির বুক ভেদ করিয়া নামিয়া গেছে। ওপাশে ইঞ্জিন-শেড। তাহার পাশেই দুইটা বয়লারের বুকের ভিতর রাবণের চিতা জ্বলিতেছে। ইঞ্জিন-শেডের বিপরীত দিকে আর একটি ছোট শেড। এটি পিট-ক্লার্কদের আপিস। একদিকে ছোট একখানি বেঞ্চ—মধ্যে একটি টেবিল—এপাশে একখানা চেয়ার। টেবিলের উপরে একটা হারিকেন চারিপাশের বিপুল অন্ধকারের মধ্যে অসহায় ভাবে জ্বলিতেছিল। শেডের বাহিরেই একটা লোহার ঠেঙোর উপরেই একচাপ কয়লা দাউ দাউ করিয়া পুড়িতেছে।

সেই আগুনে সেঁকিয়া একটি কুলীর মেয়ে তাহার ভিজা ঝুড়িটা শুকাইয়া লইতেছিল। চেয়ারে অতুল চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ও-পাশের বেঞ্চে বিনোদ—সেই ছেলেটি একখানা খাতায় কুলিদের উঠা-নামার হিসাব করিতেছিল। ওই ওর কাজ। লেবার-রেজিষ্ট্রার পদবী। বিনুর পাশে বসিয়া ছিল শ্যামাপদ—দু নম্বর ওভারম্যান। বলিয়া উঠিল—এই—এই মাগী, ঝুড়িটা কি পোড়াবে বিবি না কি? [illegible]

এদিকে পিটমাউথে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—ঘং-ঘং-ঘং। খাদের তলা হইতে সঙ্কেত হইতেছে, লোক উঠিবে।

উপরের 'টালোয়ান' ঘণ্টার সঙ্কেতে উত্তর দিয়া হাঁকিল—হো—ই। এ সঙ্কেত ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে।

বিপুল শব্দে ইঞ্জিন গতিশীল হইয়া উঠিল। ইঞ্জিনের গতির সঙ্গে গীয়ারহেডের চাকা বাহিয়া মোটা তারের দড়ায় ঝুলান একটা লোহার খাঁচা সন্ সন্ শব্দে অন্ধকূপের গর্ভে নামিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে পাশের আর একটা দড়া উপরে উঠিয়া আসিতেছিল। সেই দড়া বাহিয়া একটা কেজ পিটের মুখে সশব্দে আসিয়া লাগিল।

খাঁচার মধ্যে চার জন লোক।

বিনু প্রশ্ন করিল—কারা বটিস রে ?

উত্তর হইল—আমরা গো—ভক্তার দল। নারাণ ভক্তা।

খাঁচার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল—জলসিক্ত, কয়লার কালিতে সর্ব্বাঙ্গঢাকা বীভৎস কালো মূর্ত্তি। জ্বলন্ত কয়লার আলোয় মনে হয় যেন প্রেত! নগ্নপ্রায়—পরণে শুধু একটা কৌপীন, কাঁধে গাঁইতি, হাতে একটা কেরোসিনের ডিবিয়া। মেয়েদের হাতে ঝুড়ি। কয়লার কালিতে কালো দেহের মধ্যে সাদা দুইটা চোখ দেখিয়া ভয় হয়। কথা কহিলে দেখা যায় সাদা দাঁত। শেডের বাহিরে গিয়া তাহারা উপরের দিকে মুখ তুলিয়া দাঁড়ায়। অতুল ভাবিতেছিল ম্যানেজারশিপ পরীক্ষায় সে প্রথম হইবে। তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। খনি-বিজ্ঞান তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছে। এই যে আগুন—পৃথিবীর বুকের ভিতর লক্ষ লক্ষ টন কয়লার স্তরের মধ্যে যে বিরাট অগ্নিদাহ—যে আগুন জ্বলে নিভিবে না—সে আগুন নিভাইবার উপায় সে আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু কেন সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া পরের উপকার করিতে যাইবে! তাহার জীবনের মূল্য পঞ্চাশ টাকা নয়।

ঘং ঘং—!

আবার সঙ্কেত হইল। একটা কেজ নামিয়া গেল, একটা উঠিয়া আসিয়া পিটের মুখে দাঁড়াইল—খটাং! কেজটার মধ্যে কয়লা-বোঝাই টব-গাড়ী—লেবার-রেজিষ্ট্রার প্রশ্ন করিল—কি বটে—কয়লা না লাক? উত্তর-

ম্যান এক জন কুলিকে বলিতেছিল—ওরে ইয়া—কি নাম তোর? শুক্চরণা—শুন্ শুন্ ইধারে শুন্। হোই—হুসিয়ার!

ছোট লাইনের উপর কয়লাভর্ত্তি টবগাড়ীটা ঠেলিয়া ঠেলিয়া দিয়া টালোয়ান হাঁকিয়া উঠিল। সশব্দে গাড়ীটা লাইন বহিয়া চলিয়া গেল।

ওদিকে পিটের মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিতেছিল। কেজ ওঠে-নামে। গুরুচরণ বলিতেছিল—আমাকে খাদে নামতে বলছেন না-কি?

ওভারম্যান বিরক্তিভরে বলিল—না—বলছি গুরুপুত্তুর আমার হেথাকে বসেন দয়া ক'রে—আমি পা পুজা করব।

লেবার-রেজিষ্ট্রার বিনু খাতা লিখিতে লিখিতে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছিল—'ওহে সুন্দর তুমি এসেছিলে আজি প্রাতে।'

অতুল মনে মনে একটু হাসিল। সত্যই বেশ আছে ছেলেটি! বাড়িতে মায়ের ছেঁড়া কাপড়ে হয়ত চোখের জল মুছিবার স্থান নাই—আর ও পোষাক পরিয়া রাণী সাজে। দুই টাকা মাইনে ওর কাটা যায়—আর ও বাড়ির ভিতর গান শুনাইয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। কয়লার হিসাব লিখিতে লিখিতে ও গায়—'সুন্দর তুমি!'...

নীচে খাদের তলদেশ হইতে অন্ধকূপ বাহিয়া অতি ক্ষীণ মানুষের সাড়া ভাসিয়া আসিল।

ওভারম্যান বলিল—হাঁকা-হাঁকা-হাঁকা!

পিটের মুখে টালোয়ান দুই জন একটু ঝুঁকিয়া সাড়া দিল—ও—ই!

অতুল একটু অন্যমনস্ক হইয়া চারিপাশের অন্ধকারের দিকে চাহিল। চারিদিকের কলিয়ারীতে কয়লার চাপ গভীর অন্ধকারে রাত্রির অঙ্গে দূষিত ক্ষতের মত ধবক্ ধবক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

ঘং—ঘং—ঘং।

এবার উঠিয়া আসিল আর কয়েক জন কুলি। বিলাসপুর অঞ্চলের অধিবাসী। মেয়েদের অঙ্গে মোটা মোটা রূপদস্তার গহনা—হাতে তাগা, গলায় হাঁসুলি, পায়ে বাঁক, নাকে বেসর, কব্জিতে একহাত কাঁসার চুড়ি।

আবার খানিকটা বিরাম। ইঞ্জিন স্তব্ধ, কেজটা নিথর ভাবে ঝুলিতেছে। শুধু কয়লাটা টিনের শব্দিতে কাঁপে—সে কম্পনের আঘাত বায়ুস্তর বহিয়া শেডের খাপরার চালে আসিয়া চালের মধ্যেও কম্পন তোলে। চালের খাপরাগুলা কাঁপে—ছোট একটা জানলা—সেটাও ভূমিকম্প-বিক্ষুব্ধের মত থরথর করিয়া কাঁপে। অবসর পাইয়া কেজম্যান-'টালোয়ান' কড়ি গুণিয়া 'রেজিং'এর হিসাব করে।

যেখানে লোহার ঠেঙোটায় কয়লার চাপ জ্বলিতেছিল সেখানে কুলিরা দুই-চারি জন করিয়া আসিয়া জমিতেছিল। ইহারা এইবার খাদের নীচে নামিবে। একটা কেরোসিনের ডিবের আলোতে একটি তরুণী বিড়ি ধরাইয়া ফুঁ দিয়া দপ করিয়া আলোটা নিবাইয়া দিল। সে বলিল—দে নামাই দে বাবু। ক-ত ব'সে রইব?

অতুল চিন্তা করে, এ ওদের নেশা না, ক্ষুধার প্রেরণা?

বিনু বলিল—এখন খাদে গিয়ে ত ঘুমুবি। তার পর সেই রাতে কাজে লাগবি। ঘরে ঘুমুলেই ত পারিস।

তরুণীটি হাসিয়া বলিল—তবে তু একটি গান কর বাবু।

ওভারম্যান বলিল—তু নাচবি বল!

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—মালকাটা যে মারবে বাবু ধুমাধুম—গতর ভেঙে দিবে আমার। লইলে—

তার পর অকস্মাৎ এক বুড়ীকে ধরিয়া বলে—এই দেখ্ ই নাচবে। ইয়ার মালকাটা মরে গেইচে।

আশপাশের তরুণীর দল হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। ওপাশে জ্বলন্ত কয়লার ধারে বসিয়া একটা আঠারো-উনিশ বৎসরের ছেলে অকারণে জ্বলন্ত চুল্লীটায় ঢেলা মারিতেছিল। দূরে এই কুঠারই সাইডিং-লাইনের উপর লোকোমোটিভের বাঁশী তীক্ষ্ণস্বরে বাজিয়া উঠে। অতুল পিছন ফিরিয়া চাহিল। দক্ষিণে বহুদূরে রেলওয়ে জংসনের ইয়ার্ডে অগণিত বিজলী বাতি সারি সারি স্থির খদ্যোতের মত জ্বলিতেছে। এ-পাশে বয়লারের চোঙ হইতে ঊর্দ্ধমুখী আগুনের শিখা সাপের জিবের মত লক্-লক্ করিতেছে। শিখার মাথায় অন্ধকারের চেয়েও গাঢ়-কৃষ্ণ রাশি রাশি ধোঁয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শিখার মাথায় হাজারে হাজারে আগুনের ফুলকি-ঝুরঝুরির মত ধোঁয়ার রাশি ভেদ করিয়া বহু উর্দ্ধে উড়িতেছে—জোনাকির মত নিভিয়া যাইতেছে।

এদিকে তিন মিনিট চার মিনিট অন্তর কেজ ওঠে, নামে। একদিকে দলে দলে কুলি ওঠে, অন্য দিকে দলে দলে নামে। মানুষের দুর্দ্দান্তপনায় বোবা রাত্রি অস্থির হইয়া উঠে। বিনোদ চমকিয়া উঠিল। কে তাহাকে ছোট একটা ঢেলা ছুঁড়িয়া মারিয়াছে। লোহার কেজটা সন্ সন্ শব্দে নীচে নামিয়া গেল। কূপের মধ্যে খিল্ খিল্ হাসি অতি দ্রুত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল।

* * *

রাত্রি প্রগাঢ় হইয়া আসিয়াছে।

খাদের মুখে সবারই চোখে ঘুম জড়াইয়া আসে। যন্ত্রগুলারও যেন ঘুম পাইয়াছে। কেজ—ইঞ্জিন স্তব্ধ—শুধু বয়লারের ষ্টীমের শব্দ উঠিতেছিল ফ্যাঁস—ফ্যাঁ—স। কেজম্যানটাও বেদীর উপর বসিয়া ঢুলিতেছে। ওভারম্যান দেওয়ালে ঠেস দিয়া গাঢ় নিদ্রামগ্ন—নিঃশ্বাস সশব্দ হইয়া উঠিয়াছে। বিনোদ টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া তন্দ্রামগ্ন।

অতুলের মাথাও ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। হেন্‌রী ফোর্ড কি এডিসনের নাম এখন মনের মধ্যে নাই। মনে পড়ে বাড়ির কথা—মাকে মনে পড়ে। ইচ্ছা হয় ছুটি লইয়া একবার বাড়ি যাইতে হইবে। অতুল একটা বিড়ি ধরাইল। ধোঁয়াটা ছাড়িতে ছাড়িতে বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া মনে হইল ঠোঁটে যেন মৃদু হাসি ফুটিয়াছে। হয়ত স্বপ্ন দেখিতেছে।

মেসের কোলাহল নীরব। ক্যাশিয়ার হয়ত স্বপ্নের ঘোরে ক্যাশ মিলাইতেছে। ম্যানেজার হয়ত আগুনের স্বপ্ন দেখিতেছে। কালীপদ হয়ত পাঁচ হাজার টাকার প্রাইজটার খরচের বিলি-ব্যবস্থা করিতেছে।

ঘং—ঘং—ঘং। সঙ্কেতের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

কলিয়ারীর চৌকীদার এক চোখ কাণা সোমরা হাঁক দিয়া চলিয়াছে—হো—হো—ও—হো!

টালোয়ান বা কেজম্যান সজাগ হইয়া পিটের মুখে গিয়া সঙ্কেত করিয়া ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে ডাকিল। ইঞ্জিন চলিতে আরম্ভ করিল।

ওভারম্যানেরও ঘুম ভাঙিয়াছিল—সে তন্দ্রারক্ত চোখে বলিল—চাকরে আর কুকুরে সমান। চাকরি মানুষে করে?

বিনোদও কখন সোজা হইয়া বসিয়াছে—সে মেসের নিস্তব্ধতার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—এরা বেশ ঘুমুচ্ছে, নয়?

কেহ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সশব্দে কেজটা আসিয়া পিটের মুখে আবদ্ধ হইয়া গেল। কেজ হইতে বাহির হইয়া আসিল পিটক্লার্ক বাবু।

সে বলিল—খাদের অবস্থা বড় খারাপ অতুলবাবু। বড় গরম হয়ে উঠেছে খাদ।

অতুল বলিল—সে আর আমি কি করব?

—খাদে মালকাটারা টিকতে পারছে না।

অতুল নির্ব্বিকার ভাবে বলিল—ম্যানেজার বাবুকে খবর দিচ্ছি।

—ওদিকের কাঁটা খুঁদে ত ধোঁয়ায় ভর্ত্তি—আর উত্তাপ কি! ভেতরে কয়লাতে আগুন লেগেছে মনে হ'ল।

অতুল বলিল—সেগুলো ত বাদ দিতে বলছি।

—হ্যাঁ, সেগুলো বাদই আছে। কিন্তু ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে মনে হচ্ছে যে! একবার নীচে যেতে হবে মশায়। এ সব ত আমার ডিউটি নয়!

অতুল হাসিয়া বলিল—বেশ আমি নীচে যাচ্ছি। আপনি আর ওভারম্যান বাবু বরং ম্যানেজারকে সব জানিয়ে আসুন। টালোয়ান, ঘণ্টা দাও নীচে।

গ্যাস-বাতিটা জ্বালিয়া লইয়া সে কেজের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল।

উপরের শব্দ পিছনে ফেলিয়া অতল গহ্বরের মধ্যে কেজটা সন্ সন্ শব্দে নীচে নামিয়া চলিয়াছিল। পিটের গাঁথনি দ্রুতবেগে উঠিয়া চলিয়াছে। মাথার মধ্যে কেমন একটা অনুভূতি রন্ রন্ করিয়া উঠিল। প্রথম দিনের কথা মনে করিয়া অতুল একটু হাসিল। এখন এ-অনুভূতি তাহার অভ্যাস হইয়া গেছে। প্রথম তলার খাদটা পার হইয়া গেল। যে-কেজটা উপরে উঠিতেছিল সেটা পার হইয়া গেল। কোন সাঁওতালের মেয়ে ওই কেজে বসিয়াই গান গাহিতে গাহিতে উপরে উঠিয়া গেল। সে সুর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে—ইঞ্জিনের শব্দও আর ভাল শোনা যায় না। দুই পাশে পিটের গা বহিয়া জল ঝরিতেছে। নীচের জল ঝরার শব্দ ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া আসিল।

:কেজের গতি মন্দ হইয়া আসিয়া সশব্দে কেজটা এইবার থামিয়া গেল।

উপরে পিটের মুখে ও-কেজটাও সঙ্গে সঙ্গে থামিল। বিনোদ স্তব্ধ ভাবে বসিয়া ছিল—সে বলিল—উঠে এলি যে তুই?

কেজ হইতে বাহির হইয়া আসিল সেই মেয়েটি। মেয়েটির নাম চুড়কী। চুড়কী বলিল—যে ধুঁয়ো আর গরম থাদে—পালায়ে এলম। তারপর ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—তুর গান শুন্তে এলম।

বিনোদ বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল—ভাগ্ এখান থেকে। শেডের বাহিরে কয়লার ধুলার উপরেই আঁচল বিছাইয়া চুড়কী শুইয়া পড়িল। বলিল—তুর ভারি গোমোর হইছে, লয় গো বাবু!

বিনোদ কোন উত্তর দিল না।

চুড়কী আপন মনেই বলিল—তুর চেঁয়ে আমি ভাল গান জানি। শুন্‌বি! সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া সে নিজের ভাষায় গান আরম্ভ করিয়া দিল। গান করিয়া সে নীরব হইল। কিছুক্ষণ পর আবার সে বলিল—আকাশে হুই যি তারাটি দিপ্ দিপ্ করছে—ওইটি ভুক্কো তারা, লয় গো বাবু?

বিনোদ তবুও কোন উত্তর দিল না। চুড়কী এবার উঠিয়া আসিয়া তাহার কাছে বসিল, বলিল—একটি গান কেনে বলবি না বাবু? সোবাই তুর গান শুনে-ছে। হামাকে আমার মাঝি শুনতে দেয় না। বলে কি জানিস—ইল—তু বাবুকে ভালো-বেসে ফেলাবি।

বিনোদের ক্রমে যেন নেশা ধরিয়া আসিতেছিল। তাহার নবজাগ্রত যৌবন অহঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া বলিল—গান ত আমি তোকে শোনাব—তুই কি দিবি আমাকে?

চুড়কী যেন চিন্তিত হইয়া পড়িল। তার পর বলিল—একটি ক'রে রাঙা জবাফুল তুকে আমি রোজ দিব।

বিনোদ বলিল—দেৎ, জবাফুল নিয়ে কি করব আমি?

—কেনে কানে পরবি—লয়ত চুলে গুঁজবি। তু হামাকে রোজ গান বলবি হোক্।

* * *

প্রকাণ্ড একটা টানেলের মধ্য দিয়া অতুল চলিয়াছিল। দু-পাশে কয়লার নিবিড় কঠিন স্তর। গ্যাসের আলোকের প্রতিচ্ছটায় কয়লার তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম কোণগুলি ছুরির মত চকমক করিয়া উঠিতেছে। হাতের আলোটা তুলিয়া অতুল তাহাতে একটা বিড়ি ধরাইতে গেল। কিন্তু নিঃশ্বাসের ফুৎকারে আলোটা নিবিয়া গেল। অন্ধকার! কোথাও কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই। ধোঁয়ার উত্তাপে শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে কষ্ট বোধ হইতেছে। অদ্ভুত—বিচিত্র! পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া অতুল আবার আলোটা জ্বালিয়া ফেলিল। টানেলটা একটু বাঁকিয়া গিয়াছে। বাঁকটা ফিরিয়া দূরে ধোঁয়ার মধ্যে জলন্ত অঙ্গারের মত শিখাহীন কয়টা দীপ্তি দেখা গেল। মানুষের কথার আওয়াজ পাওয়া যাইতেছিল—কে আবার বাঁশীও বাজাইতেছে। টানেলের পাশে পাশে কুলিরা দিব্য শয্যা বিছাইয়া দিয়াছে। দুটি ছেলে আপন মনে বাঁশী বাজাইতেছিল। কতকগুলি মেয়ে গান করিতেছে। অতুল পশ্চিমের গ্যালারীর দিকে মোড় ফিরিল। এইদিকেই আগুন। উত্তাপ—ধোঁয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। অতুল দাঁড়াইল। তাহার জীবনের অনেক দাম। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তোরা সব পিটের মুখের কাছে গিয়ে ব'স। ম্যানেজার এলে কাজে লাগবি।

* * *

অবস্থা দেখিয়া মালিক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ম্যানেজার ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। অতুল বলিল—আমি পারি। অবশ্য যে-যায়গায় আগুন লেগেছে সেখানটা চিরদিনের মত বাদ যাবে। কিন্তু বাকী খাদ নিরাপদ হবে।

মালিক তাহার হাতে ধরিয়া বলিলেন—তাই করুন যত খরচ হয়, কোন ভাবনা নাই।

অতুল দ্বিধাহীন পরিষ্কার ভাবে বলিল—কিন্তু কি স্বার্থে আমার জীবন বিপন্ন ক'রে আপনার উপকার করব? আমার পারিশ্রমিক কি দেবেন বলুন।

মালিক অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে পড়িল, কয় বৎসর পূর্ব্বের ছিন্নবাস উপবাসক্লিষ্ট একটি ছেলের কথা। সেদিন তিনি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে একটি চাকরি দিয়াছিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—

এ-কথাটা আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করি নি অতুলবাবু।

অতুল হাসিল, বলিল—বোধ হয় আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়ে চাকরি দিয়েছিলেন সেই কথা ভাবছেন। কিন্তু এই যে এত দিন আপনার এখানে রয়েছি, বিনা পরিশ্রমে কোন দিন ত আপনার কাছে বেতন আমি নিই নি। আমি পরিশ্রম করেছি তার পারিশ্রমিক আপনি দিয়েছেন। খাঁটি বিনিময়—দান নয়। আজ পর্য্যন্ত আমি আমার কর্ত্তব্যে একবিন্দু অবহেলা করি নি।

মালিক বলিলেন—কি চান আপনি?

অতুল বলিল—এক জন বড় মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার যা নিত তাই নেব আমি। অবশ্য আমার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাদ দেবেন তা থেকে।

মালিক রাজী হইলেন। বলিলেন—তাই পাবেন।

অতুল বলিল—কণ্ট্রাক্ট ঠিক বিধান মতে হওয়া দরকার। কাগজে কলমে একখানা চিঠি দিতে হবে আমাকে।

তাও হইয়া গেল। অতুল বলিল—ফায়ার ব্রিকস আর ফায়ার ক্লে দরকার। যে গ্যালারীগুলোতে আগুন হয়েছে ওগুলো বন্ধ ক'রে দিতে চাই আমি।

মালিক প্রশ্ন করিলেন—তাতে কি হবে?

অতুল হাসিয়া বলিল—তাতেই আগুন নিববে স্যর। নইলে জলে খাদ ভর্ত্তি করেও নিববে না। যেদিন জল মেরে কাজ আরম্ভ করবেন সেইদিনই আবার গ্যাস হতে সুরু করবে।

ইঞ্জিনটা আজ নিস্তব্ধ—খাদ বন্ধ। শুধু ষ্টীমের শব্দের সঙ্গে পাম্পিঙের শব্দ উঠিতেছিল অলস ভাবে।

* * *

লরীর শব্দে কলিয়ারীটা মুখরিত হইয়া উঠিল। লরীতে জিনিষপত্র আসিতেছিল। বিপুল উদ্যমে দ্রুতবেগে উদ্যোগ-আয়োজন শেষ হইয়া গেল। কিন্তু কাজ আরম্ভ করিয়া গোল বাধিল। কুলিরা কেহ নামিতে চায় না। কুলি-রিক্রুটার কুলিদের বড় প্রিয়। সে দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আজ্ঞে কেউ নামতে চাইছে না। বলছে বিনা দম নিয়ে আমরা মরে যাব বাবু। উ আমরা লারব। কতকগুলো কুলি কালরাত্রে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

হাফপ্যাণ্টের পকেটে হাত দুইটা পুরিয়া দিয়া অতুল বলিল—দু-টাকা ক'রে হাজরী দেব—চার ঘণ্টা কাজ। ফের আপনি গিয়ে বলুন

রিক্রুটার চলিয়া গেল। অতুল নিজেই ফায়ার-ব্রিকস বোঝাই একটা টবগাড়ী পিট দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল—ইডিয়ট কোথাকার? টাকায় দুনিয়া কেনা যায়—মানুষ কি দুনিয়ার বাইরে?

তারপর নিজেই ঘণ্টার সঙ্কেত করিয়া হাঁকিল—হো—ই! ইঞ্জিন চলিতে লাগিল।

* * *

মেসের ঘরে ঘরে বাবুদের ব্যস্ততার সীমা নাই। কার কখন ডাক পড়িবে কে জানে। কালীপদ লটারীর টিকিটের নম্বরটা ভুলিয়া গিয়াছে। সার্ভেয়ার-বাবু প্ল্যান খুলিয়া বসিয়া আছেন। কতদূর গ্যাস আগাইয়া আসিল, দাগের পর দাগ টানিতেছেন। বিনুর হারমোনিয়মটা বন্ধ। কেরাণী সীতাপতির ছবির খাতা বাক্সে বন্ধ হইয়া আছে—রঙের বাটিগুলা শুকাইয়া গেছে। ষ্টোরবাবু জিনিষ জমা করিয়া আর খরচ লিখিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। বিনোদ খাদে নামিবার পোষাক পরিতেছিল। ঘরের উত্তর দিকে খোলা মাঠ। উত্তর দিকের জানলা হইতে কে বলিল—একটি গান কর কেনে বাবু।

বিনোদ ফিরিয়া দেখিল চুড়কী। শুধু চুড়কী নয় আর দুই-তিনটি মেয়ে। বিনোদ বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই কুশ্রী কালো বর্ব্বর মেয়েগুলার অত্যাচারে তাহার গ্লানির আর পরিসীমা নাই। নানা জনে নানা কথা বলে। নিজেরও ঘৃণা বোধ হয়। সে কহিল—যা—যা বিরক্ত করিস না।

আর একটি মেয়ে বলিল—রাগ কর্‌ছিস কেনে বাবু? একটি গান শুনায়ে দে আমরা চলে যাই।

এক জন বলিল—চুড়কী তুর লেগে জবাফুল এনে-ছে। দে গে—চুড়কী বাবুকে ফুলটি দে।

চুড়কী জবাফুলটি ছুঁড়িয়া বিনোদের বিছানায় ফেলিয়া দিয়া বলিল—লে বাবু কানে উটি পর। বড়া ভাল লাগবে তুকে।

বিনোদের ইচ্ছা করিল ফুলটাকে ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু তাও সে পারিল না। এইটা তাহার একটা অক্ষমতা—সে তাহা জানে। রূঢ়ভাবে কাহাকেও আঘাত করিতে সে পারে না। বিব্রত হইয়া বিনোদ অনুরোধ করিয়া বলিল—পালা বাবু তোরা এখন। জ্বালাস নে আমায়। খাদে যাব দেখছিস্ না।

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চুড়কী বলিল—খাদ ত পুড়ে গেইছে তুদের।

—তোদের মাথা হইছে। তোরা কাজ করবি না—আর তোদের কাজ আমাদিগে করতে হচ্ছে।

চুড়কী বলিল—সত্যি বলছিস তু? খাদে গেলে মরে যাবি না?

আপন মনেই হাসিয়া বিনোদ বলিল—আচ্ছা বোঙা জাত বটে বাবু।—মরে কেন যাবি? এই ত আমি চল্‌লাম। তোদিগে দু-টাকা তিন টাকা ক'রে হাজরী দেবে। আসবি তোরা?

একটি মেয়ে বলিল—হা—বাবু সত্যি—তিন টাকা ক'রে দিবি তুরা? আর মরে যাব নাই?

—না—না—না। কতবার বলব তোদের বল!

চুড়কী বলিল—তু থাকবি ত বাবু খাদে? না—আমাদিগে ফেলে দিয়ে পালায়ে আসবি?

—ভ্যালা বিপদ বাবা। ওরে পালিয়ে আসবার যো কি? চাকরি যাবে যে।

নিজেদের ভাষায় কি সব বলাবলি করিয়া চুড়কী বলিল—মালকাটাদিগে বলি গা বাবু। তুকে কিন্তুক গান শুনাতে হবেক্।

তারপর সঙ্গীদের পানে চাহিয়া বলিল—দেলা বোঁ! অর্থাৎ—চল চল।

বর্ব্বর কালো মেয়েগুলি নাচিতে নাচিতে, ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর কয় জন মাঝি আসিয়া প্রশ্ন করিল—সত্যি তুরা তিন্ টাকা ক'রে দিবি!

অতুল বলিল—তাই পাবি।

—হাঁ বাবু—তুরা আমাদের সাথে রইবি ত?

হাসিয়া অতুল বলিল—তোদের পাশে আমি দাঁড়িয়ে থাকব। তা ছাড়া রাজমিস্ত্রী থাকবে, অন্য বাবুরা থাকবে। তোরা একা থাকবি না।

—বেশ্ বাবু তবে আমরা নামব। মাঝিন্ নামতে দিবি ত?

অতুল জানিত এই মাঝিনদের ফেলিয়া ইহারা কোথাও যায় না। রাজসিংহাসন পাইলেও না। সে হাসিয়া বলিল—বেশ তারাও নামবে।

ম্যানেজার ক্ষীণ ভাবে প্রতিবাদ করিলেন—সে যে বে-আইনী হবে অতুলবাবু।

কেজে ব্রেকটা খুলিতে খুলিতে অতুল বলিল—নেসেসিটি হ্যাজ নো ল। আইন মানতে গেলে খাদ পুড়তে দিতে হবে।

তার পর হাঁকিল—হো—ই—ইঁটার গাড়ী লাও।

* * *

অন্ধকার খাদের তলে মানুষের কর্ম্মকোলাহলের আর বিরাম ছিল না। উপরেও তাই। খাদের মুখে খাজাঞ্চী বাক্স লইয়া বসিয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে কুলিদের বেতন মিটিয়া যাইতেছে। শেডের মধ্যে বসিয়া বুড়া ডাক্তার। গীয়ারহেডের চাকা দুইটা অবিরাম ঘুরিতেছে—ঘং—ঘং—ঘং।

নীচে হইতে সঙ্কেত আসিতেছে লোক উঠিবে।

টালোয়ান ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে সঙ্কেত করিল, হো—ই। মিনিট দুই পরেই বিপুল শব্দ করিয়া কেজটা উপরে আসিয়া লাগিল। এক জন বাবু একটি কুলি এক জন কামিনকে লইয়া নামিল। মেয়েটির বুকে ব্যথা ধরিয়া শ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। অক্সিজেন-সিলিণ্ডারের চাবি আলগা করিয়া দিয়া টিউবটা মেয়েটির নাকের কাছে ডাক্তার ধরিয়া বলিল—ভয় নাই।

নীচে হইতে আবার সঙ্কেত আসিল—ঘং—ঘং—ঘং।

আবার লোক উঠিয়া আসিয়া বলিল—মাটি—মাটির গাড়ী জলদি চালাও।

মাটির গাড়ী লইয়া কেজ নামিল।

খাজাঞ্চী হিসাব করিতেছিল—তিন দু-গুণে ছয়—এই লে মাঝি, ছ-টাকা হাজরী তোদের।

খাদের নীচে লাইন ধরিয়া মাটি-বোঝাই টব-গাড়ীটা চলিতেছিল ধীরে ধীরে; এক জন আসিয়া ঠেলিয়া

সেটার গতি দ্রুত করিবার চেষ্টা করিল। আরও ভিতরে যেখানটায় আগুন লাগিয়াছে সেখানে গ্যালারীর মুখে মুখে গাঁথনি উঠিতেছিল। বিশ-পঁচিশ মিনিট অন্তর লোকে স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। গ্যাসে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, বিবর্ণ পাংশু মানুষগুলি টলিতে টলিতে অক্সিজেন-সিলিণ্ডারের ফানেলের মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। অতুলের পিঠে ডুবুরীদের মত ছোট একটা অক্সিজেন-সিলিণ্ডার বাঁধা, তাহার দুইটা নল নাকের কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করিতেছে। সে অনবরত ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্যালারীর মুখে মুখে ফিরিতে ছিল।

সে বলিল—জল্‌দি—জল্‌দি—আর মাত্র তিনটে গ্যালারী। চালাও ভাই চালাও। দেরি হ'লে সব নষ্ট হবে। গ্যাস-সব ঐ গ্যালারী দিয়ে বেরুতে আরম্ভ করবে।

বিনোদ একটা গ্যালারীর মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। চুড়কী বহিতেছিল কাদা, তাহার মাঝি ইঁট যোগান দিতেছিল। কাদার পাত্রটা ফেলিয়া দিয়া চুড়কী বলিল—নারব আর আমি। সে হাঁপাইতেছিল। বিনোদ বলিল—যা-যা ঐখানে যা। বাতাস নিয়ে আয়—বাতাস নিয়ে আয়।

—হট যাও—হট যাও। ইঁটাকে গাড়ী যাতা হ্যায়।

বিনোদ সরিয়া দাঁড়াইল, হড় হড় শব্দে গাড়ীখানা চলিয়া গেল।

—কাদা—কাদা—ফায়ার-ক্লে। অতুল হাঁকিতেছিল।

ওপাশ হইতে কে হাঁকিল—আদমী গির গিয়া হিঁয়া। জলদি লে যাও।

অতুল দ্রুতবেগে বিনোদের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল—আর দুটো—আর দুটো গ্যালারী!

ধোঁয়ার পরিমাণ যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। বিনোদের কষ্ট হইতেছিল। সে একটু সরিয়া আসিয়া ২৫ নম্বর গ্যালারীর মুখে দাঁড়াইল। স্থানটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। ওদিকে ২৮ নম্বরে কাজ চলিতেছে। ২৭ নম্বর বন্ধ হইলেই যুদ্ধের শেষ হয়। ধরণীগর্ভে আগুন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যাইবে। কে তাহার চোখ চাপিয়া ধরিল। বিনোদ এক ঝটকায় তাহাকে ফেলিয়া দিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল। ক্রোধের আর তাহার সীমা ছিল না। চুড়কী পড়িয়া গিয়াও খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। জুতার ডগায় চুড়কীর মুখে একটা ঠোক্কর মারিয়া বিনোদ বলিল—লাথি মেরে তোর মুখ ভেঙে দেব আমি।

চুড়কী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বিনোদ সেখান হইতে পলাইয়া গেল। যাইতে যাইতে সে আবার ফিরিয়া চাহিল।

ধোঁয়ায় বাষ্পে ভাল করিয়া দেখা গেল না। কিন্তু অস্ফুট কান্নার শব্দ সে যেন তখনও শুনিতে পাইতেছিল। বিনোদ ফিরিল। ডাকিল—চুড়কী—এই চুড়কী কাজে যা—উঠে যা।

—না—আমি যা-ব না। তু কেনে আমাকে লাঁথায়ে মেলি?

ওদিক হইতে হড় হড় শব্দে টব-গাড়ী আসিতেছিল, যে ঠেলিয়া আনিতেছিল—সে হাঁকিল—হো-ই হট যাও।

বিনোদের আর সাহস হইল না। সে পলাইয়া আসিল। সিলিণ্ডারের মুখে অক্সিজেন লইবার অছিলায় পিটের মুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল। হুড় হুড় শব্দে টবগাড়ী যন্ত্রপাতি ফিরিয়া আসিতেছে। কাজ বোধ হয় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কয় জনে কাহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিল।

—ঘণ্টি মারো টালোয়ান—ঘণ্টি মারো জল্‌দি। পাঁচ আদমী গির গিয়া।

পিছনে পিছনে আবার এক জন আসিল। বিনোদ প্রশ্ন করিল—কি—ব্যাপার কি হে?

—আর কি? গ্যাস একদিক দিয়ে জোর ধরেছে। ২৭ নম্বর আর বন্ধ হ'ল না। পিছিয়ে আসতে হ'ল।

—ক নম্বর পর্য্যন্ত পেছুতে হ'ল?

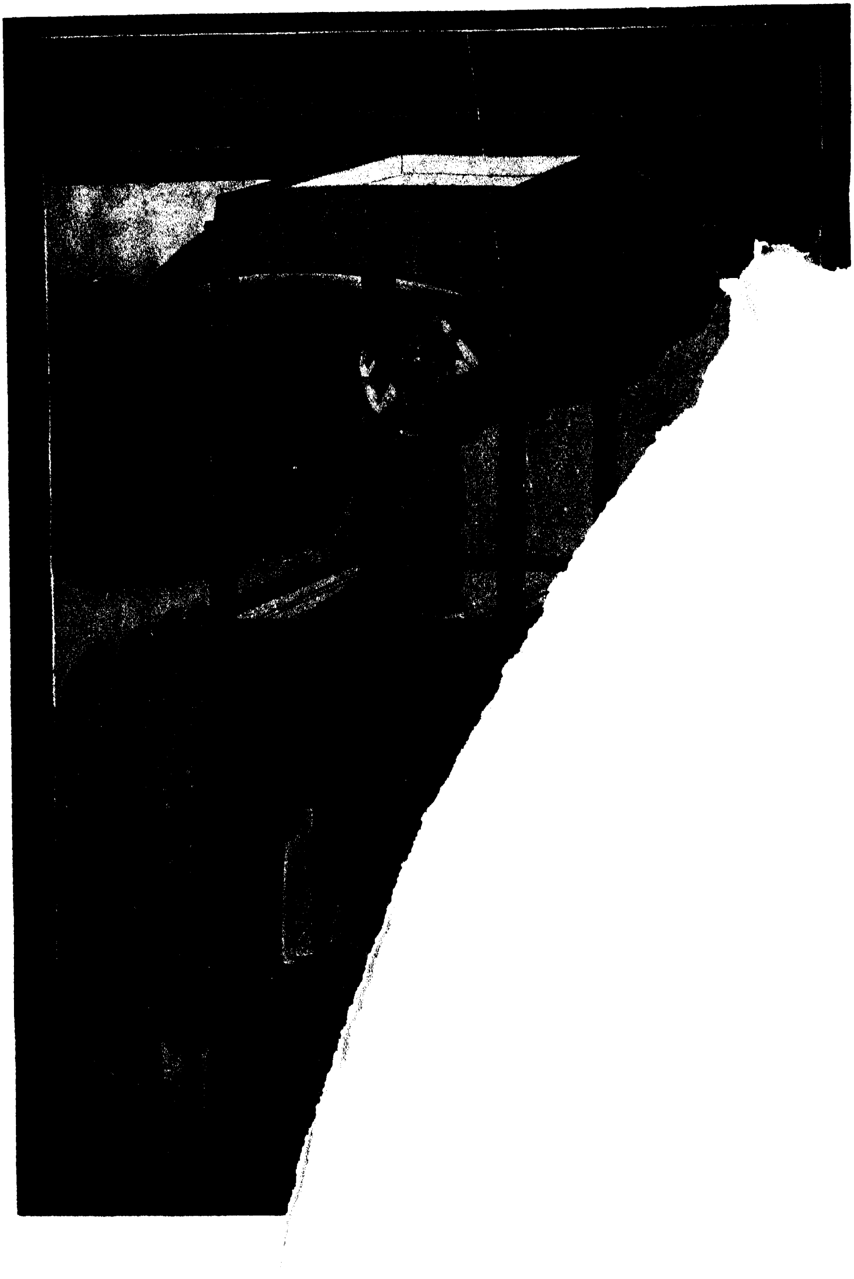
সন্‌ সন্‌ শব্দে কেজটা উঠিয়া গেল, উত্তর আর শোনা গেল না। বিনোদ দ্রুতপদে খাদের মধ্যে আগাইয়া গেল।

বন্ধ হইতেছিল ১৫ নম্বরের মুখ।

অতুল কাহাকে বলিতেছিল—উপায় নাই—বারোটা গ্যালারী ছেড়ে দিতে হ'ল।

বিনোদ চীৎকার করিয়া উঠিল—ভাঙো—গাঁথনি ভাঙো। ভেতরে লোক—

তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া অতুল বলিল—গেট্‌-আউট।



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বিনোদ সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আর একবার বলিল—চুড়কী—

বাধা দিয়া অতুল বলিল—ওপরে যাও তুমি। তার পর ইংরেজীতে একটা চিরকুট লিখিয়া হাতে দিয়া বলিল—ক্যাশিয়ারকে দাও গে।

ক্যাশিয়ার কাগজখানা পড়িয়া কুড়িটি টাকা বিনোদের হাতে দিয়া বলিল—তোমার মাইনে। এক ঘণ্টার মধ্যে কলিয়ারী ছেড়ে চলে যাও। ছট্টু সিং!

—হুজুর! ছট্টু সিং সেখানে হাজিরই ছিল।

—এক ঘণ্টার মধ্যে বাবুকে কুঠীর সীমানা থেকে বের ক'রে দেব।

নীচে তখন কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে। অতুল রুমালে কপাল মুছিতে মুছিতে আপন মনেই বলিল—হি হার। প্রকাশ ক'রে ফেলবে। ফুল্! জানে না বাঁচল তাতে ওই মেয়েটির মত কত হাজা জীবিকার সংস্থান হ'ল। প্যাকিং দাও— দিয়ে দাও—যেন এক বিন্দু গ্যাস না

* *

আগুন থামিয়া গেছে। চলে। কেজ ওঠে-নামে। করিয়া আসে—বাবুরা নাম টালোয়ান হাঁকে—হো ইঞ্জিন চলে—কেজটা

রুশিয়ার রাজ-অল

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল,

র‍্যাসপুটিনের হত্যাকারী রাজকুমার ইউসুপফ, তাঁহার কার্য্যাবলীর দ্বারা লণ্ডন শহরে প্রসঙ্গক্রমে রুশিয়ার রাজ-ঐশ্বর্য্যের রহস্যময় কাহিনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত মণিকার কার্ল ফেবার্গ বিরচিত, 'জার' তৃতীয় আলেকজান্দারের স্বর্ণময় 'ইষ্টার এগ্'ও এই লণ্ডন শহরে প্রকাশ্যভাবে নীলামে বিক্রয়ের জন্য আনীত হয়। রুশীয় বিপ্লবের অব্যবহিত পরে নিহত 'জার' ২য়-নিকোলাসের সমুদয় নিজস্ব সম্পত্তিও এইরূপে ইংলণ্ডে বিক্রয়ের নিমিত্ত আনী হইয়াছিল। এই ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান অভিনেতা নর্ম্মান উইল্স। ইনি বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণি বলিয়া পরিচিত। তাঁহার নিকট সাক্ষাৎে কোনও সংবাদিকের নিকট রুশীয় সম্রাটগণের অলঙ্কারাদি ক্রয়সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত প্রদান করেন :—

ইংরে বে

যদিও আমি একজন হাঙ্গেরিয়ান তথাপি প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি। আম

ন্ত হইল। যাহা হউক আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল; একটি ছোট স্বর্ণকারের দোকানে কাজ পাইলাম। আমি নিজেকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া রাত্রিকালে যখন আমার একমাত্র অবসরের

10 & 11, Austin Friars,
Throgmorton Street,
London ... 19 21

to Russia with a view
... authorise you to
...ounds (£1,000,000)
...provide the purchases
...ondon.

লিপি

রা

ব

প্রাচীন মিশর দেশে ইহা পাওয়া যাইত, কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক তত্ত্ব কেহ জ্ঞাত ছিলেন না। আমি এক দিন উক্ত প্রস্তর ক্রয় করিবার জন্য আমার এক অতি বিশ্বস্ত বন্ধুর সহিত আমার যৎসামান্য সঞ্চিত অর্থসমেত বহির্গত হইলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বন্ধুটি আমার সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করিলেন! সুতরাং আমাকে পুনরায় দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ব্যাকুল হইতে হইল; উপায়ান্তর না



বিখ্যাত ইংরেজ জহুরী মিঃ নর্ম্যান উইস্‌জ। ইনিই রুশিয়ার রোমানফ রাজ-বংশের বহু অলঙ্কার ক্রয় করিয়াছেন

থিয়া আর একটি স্বর্ণকারের দোকানে কর্ম্মে নিযুক্ত ম। এক দিন যখন আমি দোকানে কাজ করিতে- । তখন উক্ত বন্ধুটিকে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম। দ্রুতপদে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া । "শীঘ্র আমার সমুদয় অর্থ ফিরাইয়া দাও।" সে একটি দরজার আড়ালে লুকাইয়া গিয়া জানাইল যে । সমস্ত অর্থ হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার

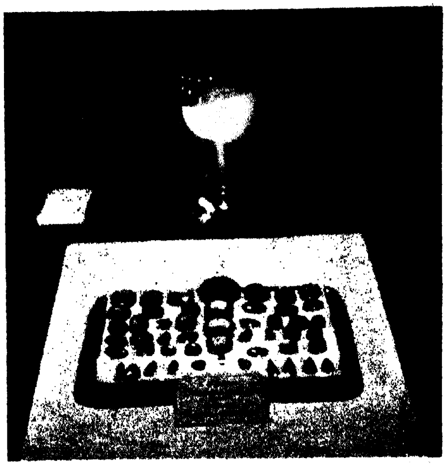
অতি সূক্ষ্ম উন্নত ধরণের কারুকার্য্য-ক্ষোদিত স্বর্ণপাত্র যে গঠিত হইতে পারে তাহা আমার কল্পনারও অতীত। পাত্রটির ওজন সর্ব্বসমেত ১০৮ আউন্স; ১৭৯১ সালে ইহা গঠিত হয়। পাত্রটির চতুর্দ্দিক এক হাজার তিন শত পঞ্চাশটি বৃহদাকার এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র হীরকখণ্ড দ্বারা শোভিত। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, বহু পূর্ব্বে ইহা পূজার্চ্চনার পাত্রহিসাবে ব্যবহৃত হইত। সমসাময়িক পোপ কর্ত্তৃক প্রদত্ত একটি অঙ্গুরীও ইহাতে সন্নিবিষ্ট ছিল। হীরকখণ্ডগুলি কিঞ্চিৎ নীল আভাবিশিষ্ট ও শ্বেত বর্ণের। স্বর্ণময় পাত্রটি পীটারস্‌বার্গের গীর্জ্জা হইতে আনীত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে রাজকীয় পানপাত্র-হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমানে লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ মণিকার মিঃ ওয়াটস্‌কি ইহার স্বত্বাধিকারি।

ইহার পর আমি যেস্থানে গমন করিলাম সেখানে এক সেট চায়ের সরঞ্জাম ছিল। স্থানটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কিন্তু এই মণিখচিত পানপাত্রের ঔজ্জ্বল্যে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছিল। ইহা 'জার' দ্বিতীয় নিকোলাসের জগদ্বিখ্যাত স্বর্ণময় চা-পানের পাত্র। সর্ব্বসমেত ছয়টি পাত্র ছিল। সবগুলিই স্বর্ণময়, কিন্তু ইহাদের হাতলগুলি সুদৃশ্য হস্তিদন্তে নির্ম্মিত। ইহাদের মোট ওজন ২০ পাউণ্ড এবং ক্ষোদন-কার্য্য অতুলনীয়। কোন্ স্বর্ণকার যে ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা জানিবার উপায় নাই, কারণ পাত্রে তাঁহার নামের উল্লেখ ছিল না। তবে তিনি যে এক জন সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ জহুরী ছিলেন সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

একতলার একটি প্রকাণ্ড কক্ষে গ্রীক্ ক্যাথলিক পুরোহিতের স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদ ছিল। এই অপূর্ব্ব স্বর্ণ-সমারোহে আমার চক্ষু ঝলসাইয়া গেল। পরে আমি যে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম সেখানে সোনার ফ্রেমে বাঁধান কতকগুলি ছোট ছোট ছবি দেখিতে পাইলাম। চিত্রগুলির অঙ্কন এত সুন্দর যে সাধারণ শিল্পীর পক্ষে ইহা চিত্রিত করা সম্ভবপর নহে। পার্শ্বে টেবিলের উপর একটি কারুকার্য্যময় বাঁশরী শায়িত অবস্থায় ছিল, আজকাল এই প্রকারের একটি বৃহৎ হস্তিদন্ত অত্যন্ত দুর্লভ।

অতঃপর নানাবিধ জন্তু-জানোয়ার-ক্ষোদিত কতকগুলি মূল্যবান প্রস্তর একস্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে দেখিলাম। পৃথিবীর মৃত জীবজন্তুদের ইহা এক ক্ষুদ্র চিড়িয়াখানা বলিয়া আমার প্রতীয়মান হইল।

ঐ কক্ষের আর একটি টেবিলে নানা প্রকারের হীরক ও অন্যান্য প্রস্তর ক্ষোদিত হাতলওয়ালা একটি তরবারি



রোমানফ্ রাজ-বংশের পদ্মরাগমণির সমারোহ

দেখিতে পাইলাম, ইহাই 'পীটার দি গ্রেটের' ব্যবহৃত অস্ত্র। এলিজাবেথ বার্গনারের প্রযোজনায় যে 'ক্যাথারিন দি গ্রেট' শীর্ষক চিত্র প্রদর্শিত হয় তাহাতে ডগলাস্ ফেয়ার-ব্যাঙ্কস্ (জুনিয়ার) 'পিটার দি গ্রেটের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া এই অস্ত্রের অনুকরণে রচিত একটি অস্ত্র ব্যবহার করেন। মারলিন ডিটারিক্‌ও এই অসিসংক্রান্ত একটি ছায়াচিত্র তুলিবার আয়োজন করিয়াছেন; তিনি এই অস্ত্রটি ব্যবহারের জন্য আমাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। বর্ত্তমানে এই অস্ত্রটি আমার নিকট আছে।

রক্তবর্ণ ভেলভেটের উপর কোণাকুনি ভাবে স্থাপিত ছয়টি প্রকাণ্ড আসল প্রস্তর ও দুই সারি উজ্জ্বল ছোট ছোট প্রস্তর দ্বারা সমাচ্ছাদিত একটি মুকুট দেখিতে পাইলাম। ইহা সম্রাজ্ঞী 'ক্যাথারিণ দি গ্রেট' বিবাহোৎসবের সময় ব্যবহার করিয়াছিলেন। অতঃপর একটি মহামূল্য মণিময় টায়রা দৃষ্টিগোচর হইল। ইহার সন্নিকটে একটি প্রকাণ্ড হীরক-পত্র-ক্ষোদিত ব্রোচ দেখিলাম; ইহার উপরিভাগে

কতকগুলি সুদৃশ্য চুনী-পান্না, মধ্যখানে দুইটি স্বচ্ছ রক্তময় মূল্যবান প্রস্তর এবং তিনটি প্রকাণ্ড আসল মুক্তা বসান ছিল। এই ধরণের কারুকার্য্যময় সুন্দর ব্রোচ আমি কোথাও কখনও দেখি নাই। মেঝের উপর একটি সবুজ



শেষ রুশ-সম্রাটের মরকতমণি-সন্নিবিষ্ট নস্যাধার

বর্ণের সুন্দর কৌটা দেখিতে পাইলাম: ইহা পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকালে নির্ম্মিত স্বর্ণ ও হীরকে খচিত একটি নস্য ডিপা; চতুর্দ্দিকে ইহার উজ্জ্বল আভা বিচ্ছুরিত হইতেছিল। ইহার পর আরও কতকগুলি স্বর্ণ পেটিকা, প্রস্তরক্ষোদিত ঘড়ি, হীরা-বসান চসমা এবং অন্যান্য মহার্ঘ জড়োয়া দেখিলাম। আমার সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ কোন্ দ্রব্য আমি ক্রয় করিব। উত্তরে তাঁহাকে জানাইলাম, দরে ঠিক হইলে আমি সবগুলি ক্রয় করিব। লোকটি মূল্য বলিবার অগ্রে জারের গ্রীষ্মাবাসে লইয়া গেল। এখানে জড়োয়া গহনা, জহরৎ অপেক্ষা আসবাবপত্র, কলাশিল্প, নানাপ্রকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র ও উজ্জ্বল দর্পণগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম কক্ষের মধ্যস্থলে একটি বীণা দেখিতে পাইলাম, ইহার অবস্থা তখনও পর্য্যন্ত বেশ ভালই ছিল। ইহা অপূর্ব্বসুন্দরী ফরাসী রাজ্ঞী মেরী এ্যান্টোইনেটকে একটি ফরাসী প্রতিষ্ঠান উপহার-স্বরূপ প্রদান করিয়াছিল। রুশ-ফরাসী সন্ধিকালে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী প্রেসিডেণ্ট লোবে রুশিয়ার গ্রাণ্ড ডিউক পলকে এই বীণাটি উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। ইহা পরে জারের অধিকারে আসে।

রুশ-সরকার আমাকে চিন্তা করিবার জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় দিলেন। পরদিবস তাহারা আমাকে এই প্রস্তরাদি ক্রয় করিবার জন্য আমি প্রস্তুত আছি কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে জানাইলাম যে তাঁহাদের চাহিদার উপর আমার ক্রয় নির্ভর করিতেছে। যাহা হউক তাঁহারা আমাকে যে-দর বলিলেন তাহা আমার নির্দ্দিষ্ট অর্থ হইতে অল্প ছিল। সরকারের নিকট প্রতিশ্রুত আছি বলিয়া আমি মূল্যের কথা এখানে প্রকাশিত করিতে পারিলাম না।

সত্য কথা বলিতে কি এই মূল্যের কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলাম। কারণ আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম জার্ম্মান-সরকারের প্রেরিত প্রতিনিধি উক্ত ঐশ্বর্য্যগুলি ক্রয় করিবার জন্য তিন মাস ধরিয়া মস্কোতে অবস্থান করিতেছেন। বুঝিতে পারিলাম জার্ম্মান-সরকার রুশ-সরকারের চাহিদা অপেক্ষাও অল্প দিতে চান। যদি আমি ঐ দামে উহা গ্রহণ না করি তাহা হইলে রুশ-সরকার জার্ম্মান-সরকারকে সমুদয় ঐশ্বর্য্য বিক্রয় করিবেন—সে-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। যাহা হউক প্রথমে আমি ২০,০০০ পাউণ্ড কম দিতে চাহিলাম, কিন্তু রুশ-সরকার আমার প্রস্তাব সম্মত হইলেন না। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদের প্রার্থিত মূল্য দিয়া সমস্ত রুশ-রাজ-ঐশ্বর্য্য ক্রয় করিলাম। বৃটিশ ও রুশ সরকারের সর্ত্তানুযায়ী আমি ক্রীত মূল্যের দাম জ্ঞাপন করিতে পারিলাম না, কিন্তু মোটের উপর যে অর্থ আমি প্রস্তরাদি ক্রয় করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা অনেক কম।

এখন ঐশ্বর্য্যগুলি চালান দেওয়াও একটি ভীষণ দায়িত্বপূর্ণ কাজ। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত আমার সুদক্ষ কর্ম্ম-চারীর সাহায্যে সমস্ত জিনিষগুলি গুছাইয়া লইলাম। প্রত্যেক অলঙ্কারটি এত দৃষ্টি-আকর্ষণ যে আমি প্রায় কোনটারই কথা বিস্মৃত হই নাই। যাহা হউক আমাদের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত রাজঐশ্বর্য্য জাহাজে চালান দেওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত অর্থ দিতে হয় নাই। আমাদের জাহাজটি লাট্‌ভিয়ার রাজধানী রিগাতে নোঙ্গর করিয়াছিল, সমস্ত মাল জাহাজে তোলা

হইলে রুশ-সরকারকে একটি মোটা রকমের চেক্ কাটিয়া দিলাম। যাহা হউক যত দিন আমি জাহাজে ছিলাম তত দিন আমি নিদ্রা যাই নাই।

কয়েক দিন পরে জাহাজটি নিরাপদে লণ্ডনের বন্দরে আসিলে হঠাৎ কাহার আহ্বান আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। ভাবিলাম আমার কোন পরিচিত বন্ধু বোধ হয় আমাকে লইতে আসিয়াছেন। কিন্তু পরে জানিলাম বন্দরের শুল্ক-কর্ম্মচারী আমাকে ডাকিতেছেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি কি মিঃ নর্ম্যান উইস্‌জ? উত্তর দিলাম, হাঁ আমিই বটে।—আমি রুশরাজঐশ্বর্য্য ক্রয় করিয়াছি কিনা সে-বিষয়ে আমাকে কর্ম্মচারীটি প্রশ্ন করিলেন। আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলাম। এই সংবাদটি গোপন করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম আমার অজ্ঞাতসারে ইহা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়াছে। কর্ম্মচারীটি আমাকে জানাইলেন যে বর্ত্তমানে মালগুলি শুল্ক-আফিসের গুদাম-ঘরে জমা হইবে। এই খবর শুনিয়া আমি একবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। কি উত্তর দিব বুঝিতে পারিলাম না। সমস্ত ব্যাপার ক্রমশঃ স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিলাম।

যে বীণাটির কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা এক্ষণে অধিকারসূত্রে ডিউক পলের বিধবা-পত্নী রাজমহিষী পেলীর প্রাপ্য; সুতরাং যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে আমি রাজঐশ্বর্য্য ক্রয় করিয়া ফিরিতেছি তখন নিশ্চয়ই ঐ বীণাটি ও তাঁহার অন্যান্য সম্পত্তিও ক্রয় করিয়াছি। তিনি এক্ষণে ইংরেজ বিচারালয়ে এই বলিয়া দাবি উত্থাপন করিলেন যে তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে কাহারও অধিকার নাই এবং কেহ উহা ক্রয় করিতেও পারেন না। যাহা হউক আমাদের কৌতূহলোদ্দীপক বিচার আরম্ভ হইল। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার স্যর পেট্রিক হেষ্টিংস ছিলেন আমার প্রধান কৌন্সিল; ইঁহার হস্তে মোকদ্দমার ভার অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমি জয়লাভ করিবই করিব; রুশ-সরকারের কর্ম্মচারিগণ আমার সাক্ষী হইয়াছিলেন। কোর্ট রাজমহিষী পেলীকে আমার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার ডিক্রী দিলেন; কিন্তু জানিতাম ইনি কপর্দ্দকশূন্য, সুতরাং টাকার জন্য তাঁহাকে আমি পীড়ন করি নাই। তাঁহাকে আমি শুধু একটি অনুরোধ জ্ঞাপন করিলাম যে যেন উক্ত বীণাটি বিক্রয়ের সময় তিনি উপস্থিত থাকেন। রাজ্ঞী সহজেই সম্মত হইলেন এবং এক বার ঐ বীণাটি শেষ বারের মত বাজাইতে



পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ব্রোচ। ইহার কারুকার্য্য অপূর্ব্ব। মধ্যভাগের মণিটির সাদৃশ্য নিতান্ত বিরল

দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। এই ঘটনাটি অচিরাৎ জগতের প্রত্যেক খ্যাতনামা সংবাদপত্রে ও চিত্রে প্রকাশিত হয়।

'ক্রিষ্টি'তে রাজঐশ্বর্য্য প্রকাশ্যভাবে নীলামে বিক্রয়ের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। ধনী গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, লেখকগণ ও অন্যান্য শ্রেণীর বহু দর্শক দলে দলে লণ্ডনে আগমন করিতে লাগিল।

এই বিশ্ব-আকর্ষণের কেন্দ্রস্থানীয় ছিলেন রাজমহিষী পেলী। মার্কিন ধনকুবেরগণ এই বিক্রয়ের শ্রেষ্ঠ ক্রেতা হইয়া দাঁড়াইলেন, অধিকাংশ তাঁহারাই ক্রয় করিলেন। ইংরেজগণ ক্রেতা হিসাবে ইঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিলেন না। ফরাসী পোর্ত্তুগীজ এবং অন্যান্য দেশের লোকেরা অল্প মূল্যের অলঙ্কারপত্র ক্রয়

করিলেন। এই সূত্রে বলা প্রয়োজন যে ক্যাথারিন দি গ্রেটের বিবাহমুকুট, হীরকগঠিত নস্যাধার ও মণিময় টায়রাটি মার্কিন ধনকুবেরগণ ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই সুন্দর ব্রোচটি এক জন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ মহিলা ক্রয় করিলেন। বীণাটির কথা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচারিত হইয়াছিল। সকলেই ঐটি ক্রয়ের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু আমি এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জিনিষটি নিজের জন্য রাখিয়াছি। অবশিষ্ট ঐশ্বর্য্য একসঙ্গে এক জনকে বিক্রয় করা হইবে; জানি না কাহার ভাগ্যে ঐ বিরাট ঐশ্বর্য্য লিখিত আছে; তবে সাধারণকে এ-গুলি পুনরায় দেখান হইবে না। সম্ভবতঃ ঐশ্বর্য্যগুলি পৃথিবীর কোন দূরান্তরে স্থিত রক্ষণাগারের জন্য ক্রীত হইবে।



শারদ-শ্রী
শিল্পী—শ্রীযজ্ঞেশ্বর সাহা

জাগরণী

শ্রীসজনীকান্ত দাস

তুমি বলিয়াছ, তোমার মনের ক্ষুধা
আজো জাগে নাই, আমারে কেন্দ্র করি,—
অসহ আবেগে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাঙে সুধা,
মরু-বালুতটে তিলে তিলে যায় মরি।
তব বালুতলে বহে কি ফল্গুধারা,
তরঙ্গ মোর তাই নাহি পায় সাড়া?
উন্মাদ ঢেউ উঠে পড়ে দ্বিধাহারা,
গুমরিয়া কাঁদে চিরদিব বিভাবরী।
তুমি বলিয়াছ, তোমার মনের ক্ষুধা
আজো জাগে নাই, আমারে কেন্দ্র করি।

মরুপথে আমি চলেছিনু উদাসীন,
শুষ্ক স্রোতের শীর্ণ রেখাটি টানি,
ভেবেছিনু মনে, শেষ হয়ে এল দিন,
মূক হয়ে এল মনের মুখর বাণী!
তিমির বনানী উদার অন্ধকারে
ঢাকিবে আমার দুঃসহ দুখভারে,
হেনকালে তুমি সুগোপন পদচারে
সহসা সুমুখে দাঁড়ালে বনের রাণী,—
মরুপথে আমি চলেছিনু উদাসীন,
শুষ্ক স্রোতের শীর্ণ রেখাটি টানি।

দিনের রৌদ্র স্তিমিত পত্রছায়ে
আপনি আড়াল, ঘুঘু যেন দিল ডাক,
শ্রাবণ-গহনে যেন ঝঞ্ঝার বায়ে
ঘন কালো মেঘে উঁকি দিল বৈশাখ!
শ্যামতৃণদল ছুঁয়ে যায় রবিকর,
শাখা-অবকাশে হাসিছে দ্বিপ্রহর,
মায়া-গোধূলির এ নহে আড়ম্বর—
নির্বাক নহে, বাণী মোর হতবাক্‌।
দিনের রৌদ্র স্তিমিত পত্রছায়ে
আপনি আড়াল, ঘুঘু যেন দিল ডাক।

বিস্ময় মানি চাহিলাম আঁখি তুলে,
ফুলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ,
মরুবুকে যেন তরঙ্গ উঠে দুলে,
দুই কূল ভেঙে ছোটে জীবনের বান!
তুমি গান গাহ বনের আড়ালে বসি,
আমার আকাশে পড়ে না উল্কা খসি,
এযে খররবি, নহে দ্বাদশীর শশী,
তরুণ দিবস, নহে দিবাঅবসান!
বিস্ময় মানি চাহিলাম আঁখি তুলে,
ফুলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ।

প্রথম আবেগে দুটি তব হাত ধরি
নিবে-আসা প্রেম নিবেদন করিলাম,
কোন্ অতীতের কোন্ পরিচয় স্মরি,
সহজ প্রণামে দিলে কি প্রেমের দাম!
বলিলে, 'আমার থাক' প্রণম্য তুমি,'—
ছল ছল জল, সুগভীর বনভূমি,
দুর্মদ স্রোত তটেরে চলে না চুমি—
খরবেগে তার পূর্ণ মনস্কাম।
প্রথম আবেগে দুটি তব হাত ধরি
নিবে-আসা প্রেম নিবেদন করিলাম।

তখন বুঝি নি, আজো না বুঝিতে পারি,
কি ছিল তোমার মনের অন্তরালে,
আকাশের মেঘ চালে অকারণ বারি,
আমি পড়ি বাঁধা আপনার মায়াজালে।

তোমারে স্মরিয়া তোমারেই ভালবাসি,
ভক্তিসাগর পার হয়ে প্রেমে ভাসি,
আপনার মনে রচিয়া কান্নাহাসি,
প্রেমের তিলক পরাই তোমার ভালে।
তখন বুঝি নি, আজো না বুঝিতে পারি,
কি ছিল তোমার মনের অন্তরালে।

ক্ষুধা তব আজো জাগেনি আমারে ঘিরি,
কবে তা জাগিবে, আমিও জাগিয়া রব,
দখিন পবন বহে যাবে ধীরে ধীরি,
আমারে একদা মনে হবে অভিনব।
মরু-বালুতটে হাসিবে তৃণের দল,
তারে ছুঁয়ে জল ছুটে যাবে কল কল,
তোমারে ছলিবে আমার মনের ছল,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে কানে শুবের বচন কব,
ক্ষুধা তব আজো জাগেনি আমারে ঘিরি,
কবে তা জাগিবে, আমিও জাগিয়া রব।

প্রেয়সী, আজিকে তোমার প্রণামখানি,
লইনু প্রেমের প্রথম স্মরণরূপে,
আমার মনের কাটুক সকল গ্লানি,
তোমার নতির পূত মঙ্গলধূপে।
শুভ জাগরণে যাক স্বপ্নের জ্বালা,
দেহবেদীতলে পড়ে থাক ফুলডালা,
জানি একদিন তুমিই গাঁথিবে মালা—
পরিব একদা সেই মালা চুপে চুপে।
প্রেয়সী, আজিকে তোমার প্রণামখানি,
লইনু প্রেমের প্রথম স্মরণরূপে।

সন্তান

শ্রীশান্তা দেবী

বড় বউ প্রসাধনে ব্যস্ত। আয়না টেবিলের পাশেই খাটের উপর ময়ূরকণ্ঠী, বেগুনফুলি ও আগুন রঙের তিনখানা জরির জংলা বেনারসী শাড়ী পড়িয়া রহিয়াছে, হাতকাটা কিংখাবের জামা ও চওড়া সুরাটি জরির পাড়-বসানো হলুদ রঙের জামা দুটির ভিতর কোন্‌টি বেনারসীর সঙ্গে বেশী মানাইবে ভাবিতে ভাবিতেই মুকুল চুলের রাশির ভিতর দিয়া চিরুণী চালাইতেছে। টেবিলে একটা ছোট গালার কাজ-করা বাক্সের ডালার উপর একছড়া মুক্তার মালা ও একটি হীরার কণ্ঠী ঝকঝক্ করিতেছে। খোঁপাটা মুকুলের মনের মত হইল না, বড় ঘাড়ের কাছে নামিয়া পড়িয়াছে; আবার গোড়ার ফিতাটা খুলিয়া ফেলিয়া বড় চিরুণী দিয়া সমস্ত চুলের গোছা সে ঠেলিয়া মাথার প্রায় মাঝখানে আনিয়া ফেলিল। ফিতাটা বাঁধিয়া টেবিলের আয়নার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়-করা আয়নার ভিতর চাহিল, দুই হাতে আলগা খোঁপাটা তুলিয়া ধরিয়া দেখিল এবার দিব্য মানাইয়াছে; উঁচু খোঁপার তলায় অজন্তার ছবির মত চূর্ণ কুন্তলগুলি শুভ্র ঘাড়ের কাছে দুলিতেছে। এমন খোঁপা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া ফেলিতে হইবে বলিয়া মনে দুঃখ হইতেছে বটে, কিন্তু যেমন তেমন খোঁপার উপর মাথার কাপড়ই কি তেমন মানায়?

ছোট ননদ মায়া ঘরে ঢুকিয়াই গালে হাত দিয়া বলিল, "বাপরে বাপ, আজ কার বিয়ে বৌদি, দাদার না—ছোড়দার? রূপে ত নূতন বৌদিকে হার মানিয়েইছ, আবার সাজেও যদি সকলকে তাক লাগিয়ে দাও ত সে বেচারীকে যে কেউ দেখবেই না।"

মুকুল মুখনাড়া দিয়া বলিল, "তা কি করতে হবে শুনি? মুখে খানিকটা কালি মেখে আর গয়না কাপড়গুলো আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে এলে যদি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ত বল তাই না হয় করা যাচ্ছে।"

মায়া বেচারী ভালমানুষ, তাড়াতাড়ি নরম হইয়া

বলিল, "না ভাই, তা কেন? তোমার দিব্যি ঝাড়া হাত পা, তুমি সাজবে না ত কি আর আমার চারটে ছেলে কোলে কাঁখে ঝুলিয়ে সেজে বেড়াব?"

মুকুল ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "ঐ ত বিপদ! ঝাড়া হাত-পার হিংসেতেও বাঁচ না, আবার যত দিন না একটি এসে চাঁ ভ্যাঁ করবে তত দিন নেই নেই ক'রে নাকে কান্নারও শেষ নেই। আমি বাপু ও-সবের ধার ধারি না। আমার কোনোদিনই ও-সব সাধ ছিল না। বাঙালীর ছেলে আজ পেট ছাড়ছে, কাল পিলে বাড়ছে, অমন সম্পদ একটি পেয়ে লাভের মধ্যে নিজেরও ত আহারনিদ্রা যায় ঘুচে, তার চেয়ে যেমন আছি বেশ আছি।"

মায়া বলিল, "তাই ব'লে একেবারে খালি খাঁ খাঁ বাড়ি আবার কারুর ভাল লাগে শুনি নি।" মুকুল বেগুনফুলি শাড়ীটা ঘুরাইয়া পরিয়া মাথার কাপড় টানিতে টানিতেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মায়ার কথার আর উত্তর দিল না।

মেজ পিসিমা পিছনের দরজা দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঢুকিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "হ্যাগা বৌমা, মিষ্টির ঘরের চাবি খোলা পড়ে রয়েছে, সব যে লুট হয়ে যাবে বাছা।"

মায়া বলিল, "বৌদি নিজের গয়না-কাপড়ের ভাবনাতেই অস্থির ত ভাঁড়ার সামলায় কখন বল। এই ত সবে সাজ শেষ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমাদের চারটে ছেলে টেনেও বিশ্ব মাথায় ক'রে বেড়াতে হয় আর এঁদের নিজেদের খেয়ে শুয়েই কোনো কাজের আর অবসর মেলে না।"

পিসিমা বলিলেন, "বেঁচে থাক ওরা যেটের কোলে। তুই এসেছিস ব'লে তবু ঘরে দুটো কচি-কাচার মুখ দেখে বাঁচ্ছি। নইলে বাড়ি নয়ত পিঁজরাপোল। ওদিকে দাদা বা জর ব্যথা নিয়ে কোঁকাচ্ছে, এদিকে হাঁপানি নিয়ে আমি ফোঁস্ ফোঁস্ করছি। ছেলে দুটোর ত সারা দিনে দেখা নেই, রাত দশটা বাজলে তবে ঘরে পা দেয়। বৌও হয়েছেন তেমনি, দোকান বাজার স্যাকরা আর দরজির সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক, ল্যাজে একটা মোটর বেঁধে সারা দিন ত তাই ক'রে বেড়াচ্ছেন। থাকত কোলে একটা কিছু ত দুদণ্ড নাড়তে চাড়তেও ঘরে মন বসত।"

মায়া বলিল, "সাত বছর ত হয়ে গেল বিয়ে হয়েছে, আর কবে হবে বল? আমারই ত বয়স, বৌদির বিয়ের সময়ই আমার পানু ছ-মাসের ছেলে। এইবার একটা ডাক্তার-টাক্তার দেখালে পারে। বলতে গেলে ত মারতে আসবে সব।"

পিসিমা বলিলেন, "তা মারতে আসবে বইকি! অমন স্বভাব না হ'লে আর অমন কপাল হবে কেন? ছেলের মা হওয়া কত তপিস্যার ফল তা কি আর একালে কেউ বোঝে? হ'ত সেকাল ত বুঝত লো। কাকীমার, আমার বিয়ের আট বছর পেরিয়ে যেতেই ঠাকুমা এনে গলায় সতীন গেঁথে দিলেন; চিরটা কাল সতীলক্ষ্মী সব সহ্য করেছেন, কিন্তু নিজের অদৃষ্ট ছাড়া কাউকে দোষ দেন নি। একটা সখের জিনিষ কখনও চৌন নি, বলতেন— কোন্ ভাগ্যে আমি ওসব চৌব, সিঁথির সিঁদুরটুকুই আমার বজায় থাকুক।"

মায়া বলিল, "সে-সব সেকালের কথায় কাজ কি বাপু, এখন নতুন বৌটি বংশ বজায় রাখলেই আমরা বর্ত্তে যাই। এও মস্ত উনিশ বছরের মেয়ে, কেমন হবে কে জানে?"

পিসিমা বলিলেন, "তার মার ত শুনি পাঁচ ছেলে তিন মেয়ে। এই ভরসাতেই ত আনা যে যাহোক দুটো-চারটে কিছু হবে। নইলে শুধু টাকা ওড়াবার জন্যে ত বৌ করা নয়।"

মুকুল নববধূর বৌভাতের শাড়ীটা আলমারীতে তুলিয়া রাখিবার জন্য ঘরে আসিতেছিল আড়াল হইতে কথাটা শুনিল। নিমেষের জন্য তাহার মুখখানি অন্ধকার হইয়া গেল। তবু জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া সে ঘরে ঢুকিল। তখনও শুনিল মায়া বলিতেছে, "বাবার ঐই ঝিংজোড়া ঘরবাড়ি, মা'র কত সাধের সংসার, ঠাকুরমারই কি কম স্মৃতি এর মধ্যে? খাট আলমারী বাসন-কোশন সোনা রূপো সবের সঙ্গে তাঁদের এতকালের মায়া পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। বৌ দুর যদি ছেলে পিলে না হয় তবে আর এ সবের অর্থ কি?—"

মুকুল চৌকাঠে পা দিয়াই বলিল, "কেন ভাই ঠাকুরঝি অত ভাবনা কিসের? আমার মতই ত সবাই হয় না।

হলেও ত তোমার ছেলেরা রয়েছে, তারাই না হয় সংসার সাজিয়ে রাখ্‌বে।"

পিসিমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বৌমা, আপন মামী হও, যেটের বাছাদের অমন ঠেস দিয়ে কথা ব'লো না।"

২

মুকুল তাহার রূপ যৌবন ও অলঙ্কার প্রসাধন লইয়া বেশ ছিল। মধ্যবিত্ত পরিবারের পাঁচ সন্তানের এক সন্তান সে, বিবাহের আগে ঐশ্বর্য্য কি বিলাসের পরিচয় বিশেষ পায় নাই। ধনী আত্মীয়বন্ধুদের দেখিয়া যখন ইচ্ছা করিত বেনারসী শাড়ী পরে তখন তাহাকে শান্তিপুরে ডুরে পরিয়াই খুশী হইতে হইত, যখন ইচ্ছা করিত প্রতি অঙ্গক্ষেপে রত্ন অলঙ্কার ঝঙ্কার দিয়া উঠুক, তখন দুই হাতে দুই গাছা তার-জড়ানো শাঁখা পরিয়াই তাহার দিন কাটিত। আয়নায় আপনার প্রসাধনের সহস্র ত্রুটি দেখিয়া মন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিত, কিন্তু মুখে কিছু বলিবার উপায় ছিল না—সে যে গরিবের ঘরের পাঁচটার একটা! উজ্জ্বল গৌরবর্ণ রঙের জোরে হঠাৎ তাহার বিবাহ হইয়া গেল এমন ধনী লোকের ঘরে। মুকুল তাহার কুমারী জীবনের যত অপূর্ণ সাধ ও যত অনাস্বাদিত সুখের কথা নিজের কাছেও স্বীকার করিতে ভয় পাইত, আজ তাহারা সব নিজ নিজ দাবি লইয়া উপস্থিত হইল। শাড়ী গহনা, গাড়ী আসবাব, আমোদ আহ্লাদ কোনও ভোগের ইচ্ছাই সে মিটাইতে ভুলিল না। এখনও একটা ইচ্ছা আর একটা ইচ্ছা জাগাইয়া তুলিতেছে। সাত বছরে মুকুল অনেক সুখের মধ্যে বুঝিয়াছে মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। সারা জীবন যদি নিত্য নূতন আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে জীবনে আর কাম্য রহিল কি? ইহাই ত জীবন। কিন্তু আনন্দের এই পূর্ণ পসরার মাঝখানে শিশুর কচি মুখ কোনদিন উঁকি দেয় নাই। মুকুল মনে করিত সে-সবের জন্য জীবন ত পড়িয়াই আছে, এখন দুই দিন ও-সকল দায় ভুলিয়া জীবনটা ভোগ করিয়া লওয়াই ত পরম লাভ।

কিন্তু সাতটা বছর যে কাটিয়া গিয়াছে, সমস্ত সংসারে যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে তাহা মুকুল টের পাইল সুখস্বপ্নের মাঝখানে আজ প্রথম দেবরের বিবাহের পর।

ছোটবউ মাস-আষ্টেক হইল আসিয়াছে। তাহার শরীর ভাল যাইতেছিল না। তাহার মা তাহাকে অবিলম্বে পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছেন। তাহারই ব্যবস্থা করিতে মুকুল আসিয়াছিল স্বামীর দরবারে।

দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে ইজিচেয়ারের উপর বৈদ্যুতিক পাখা চালাইয়া জয়ন্তবাবু মুসোলিনি-চরিত্রের বিশেষত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু নিদ্রাদেবীর মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া তিনি প্রায় মুসোলিনিকে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছেন, এমন সময় মুকুল আসিয়া মাথার চুলের ভিতর আঙুল চালাইয়া বলিল, "ওগো শোন, পরশু একটা ভাল দিন আছে, আজ যদি সুবিধে-মত খবর দিয়ে দিতে পার, তাহলে ওরা পরশু সকাল-সকাল ছোটবৌকে নিয়ে যেতে পারে।"

জয়ন্ত চেয়ারের হাতল হইতে পা নামাইয়া সোজা হইয়া বসিয়া অর্দ্ধজড়িত স্বরে বলিলেন, "কেন, কেন, বৌমাকে নিয়ে যাবে কেন?"

মুকুল স্বামীকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, "কেন আবার? ন্যাকামি রাখ! জান না যেন কিছুই। প্রথমবার, এ সময় বাপের বাড়ি না পাঠালে কি চলে? মার মত যত্ন কে করতে পারবে?"

জয়ন্ত মুকুলের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "সুকান্তও দু-দিন বাদে ছেলের বাপ হবে? এই সেদিন বই-বগলে কলেজ ফাঁকি দেবার মতলব আঁটত, ভাবলেও হাসি পায়।"

জয়ন্ত হাসিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার হাসিটা নিছক হাসির মতই শুনাইল না, মুকুলের কানেও সে হাসিটা বেসুরা ঠেকিল। সে চিরকালের মত হাত নাড়িয়া কানের ঝুমকা দুলাইয়া ঠাট্টার সুরে কোনও জবাব দিতে পারিল না। জয়ন্ত মুকুলের হাতভরা চুড়িগুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে নিজেই কথা তুলিল, "আর কি? এইবার সুকান্তই হবে বাড়ির কর্ত্তা; বুড়ো বয়সে তার ছেলেপিলের হাততোলা খেয়েই আমরা থাকব। তার চেয়ে লোকদেখানো সংসার ছেড়ে এখন থেকেই বানপ্রস্থ অভ্যাস করা যাক্, কি বল?"

মুকুলের মনের ভিতর সজোরে একটা ধাক্কা লাগিল। সে নারী হইয়াও একথা এতদিন ভুলিয়াছিল কি করিয়া?

লোকচক্ষে তাহার এ সাজানো ঘর-সংসার আড়ম্বর আয়োজন অলঙ্কার প্রসাধন সকলই নিরর্থক, সকলই মন ভুলাইবার ক্ষণিক চেষ্টা ছাড়া আর কি? সে যে সত্যসত্যই জীবনের আনন্দরস এই সকলের মধ্য হইতে আকণ্ঠ পান করিতেছিল বলিলে কে বিশ্বাস করিবে? জীবনযাত্রার এই সমারোহে বসন্তের পুষ্পসম্ভারের মত বর্ণগন্ধের প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু সৃষ্টিলীলায় এ যে নিষ্ফল, একথা সে আজ প্রথম অনুভব করিলেও স্বামী তাহার পূর্ব্বেই বুঝিয়াছেন ভাবিয়া মুকুলের মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। তবু অভিমানের সুরেই জয়ন্তর গা ঘেঁষিয়া বসিয়া লাল ঢাকাই শাড়ীর পাড়টা আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে সে বলিল, "কেন আমরা দুজনে দুজনের কি যথেষ্ট নই? আমাদের নিজেদের বর্ত্তমান সুখ-সাধের কি কোনো মূল্য নেই? সবই ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে?"

জয়ন্ত মুকুলের গালে টোকা দিয়া বলিল, "মূল্য আছে বইকি মুকুল? কিন্তু বর্ত্তমান কতটুকু, একটা মুহূর্ত্তেরও কম নয় কি? জীবন মানেই একটুখানি অতীত আর অনেকখানি ভবিষ্যৎ। সেই দিকে চেয়েই আমরা বেঁচে থাকি।"

মুকুল বলিল, "বাবা রে বাবা, দার্শনিকের তত্ত্ব-কথা এখন থাক্। ও-সব আমার মাথায় ঢুকবে না। তোমার যদি নিতান্তই ভবিষ্যৎ না হ'লে চল্‌ছে না ত সেকালের কর্ত্তাদের মত আর একটা বিয়ে কর গে না।"

জয়ন্ত বলিল, "থাক্ মুকুল, তোমার মুখে ওসব কথা আর শুন্‌তে চাই না। ও-সব বল্‌বার জন্তে এখনও অনেক সেকেলে বুড়ো বুড়ী বেঁচে আছে।"

মুকুলের বুকের ভিতর কে যেন একটা জলন্ত ছ্যাঁকা লাগাইয়া দিল। ইহারই মধ্যে এ-কথাও তবে উঠিয়াছে! তাহার সাত বৎসরের ঘর-সংসার, তাহার একান্ত নিজস্ব স্বামী, সমস্তই এক কথায় অনায়াসে মিথ্যা করিয়া দিবার কথা এই বিংশ শতাব্দীতেও মানুষ ভাবিতে পারে? মুকুলের চোখদুটি জলে টল টল করিয়া উঠিল। সে দূরে সরিয়া বসিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া স্বামীকে বলিল, "এসব কথাও তোমাদের হয়েছে, অথচ আমাকে তুমি লুকিয়ে রেখেছ? আচ্ছা বেশ!" আর বেশী কথা মুকুলের জোগাইল না।

জয়ন্ত বলিল, "অন্যে যদি তোমার মনে কষ্ট দেবার মত কথা বলে তাহলেও সব এসে তোমার কানে কানে ব'লে যেতে হবে?"

মুকুল অভিমানভরে বলিল, "তোমার যদি শুন্‌তে মিষ্টি লাগে ত আমাকে আর বল্‌বে কেন বল?"

জয়ন্ত কথার উত্তর দিল না। আবার ইজি-চেয়ারে ঠেস দিয়া বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল। মুকুল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কোন্ সেকেলে বুড়ো বুড়ী বলেছে ও-কথা বল না একবার! সাত বছর এক সঙ্গে ঘর ক'রে মুখ বুজে কথাগুলো শুনে এলে, একটা জবাব দিতে পার নি?"

জয়ন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি যন্ত্রণা! আমার গলা ধরে কি তারা বল্‌তে এসেছিল যে আমি জবাব করতে যাব? ওঁরা বলাবলি করছিলেন আমি শুনেছি। এ-রকম অবস্থায় মানুষ অমন দু-চার কথা ব'লে থাকে, তাতে রাগ করবার কি আছে?"

"তুমিও তাই বল্‌বে?" বলিয়া মুকুল দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

৩

বিবাহ হইয়া পর্য্যন্ত মুকুল বাপের বাড়ি থাকে নাই। কখনও কিছু উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ থাকিলে সেই দিনই সন্ধ্যায় আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়া আসিত। একে ত জয়ন্তদের বাড়ির বৌরা বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ নয়, মস্ত মানী ঘর কিনা। তাহার উপর এ-বাড়ির ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর বাপের বাড়ি গিয়া দেখাইতে মুকুলের লজ্জা করিত; সে গরিবের মেয়ে, শ্বশুরবাড়ির ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া বাপকে কেন ছোট করিতে যাইবে? অথচ এই-সব রাজসমারোহ ছাড়িয়া যাইতেও মন চাহিত না।

কিন্তু এত দিন পরে সামান্য একটা ছুতা করিয়া স্বামীর সঙ্গে মস্ত কলহ বাধাইয়া সে বাপের বাড়ি চলিয়া গেল। দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা কে বলিয়াছিল জয়ন্ত কিছুতেই নাম করিল না, মুকুলের তাই প্রচণ্ড অভিমান।

বাপের বাড়ির সাদাসিধা সংসার। দুই ভাই, দুই ভাজ, দুই জনের কোলেই ক্ষুদ্র শিশু। তাহাদের সকল আদর-

চিন্তা সাধ-আহ্লাদ এই শিশু দুইটিকে ঘিরিয়াই। বড়-বৌ সুধার মেয়ে আড়াই বছরের, ছোটবউ বীণার খোকা এই সবে এক বছরের হইল। সুধার খুকী টুকু সারাদিনই তোতাপাখীর মত ছড়া বলে, "বিষ্টি পলে তাপুল তুপুল," নয়ত ছোট দুইটি কচি হাত মাথার উপর তুলিয়া পা বাঁকাইয়া নাচ সুরু করে, অথবা ছোট কোলটি পাতিয়া ভাইকে আদর করিবার জন্য কচি দুটি হাত বাড়াইয়া কাকীমাকে সাধাসাধনা করে, "একটু বাচ্চাকে আমাল কোলে দাও না।"

টুকুর পাকামি দেখিয়া দুই জায়ের হাসাহাসির অন্ত নাই। টুকুর রাগ হইলে সে যখন ফোলা ফোলা গাল দুটি আরও ফুলাইয়া ঘাড়ের ভিতর মুখ গুঁজিয়া বলিত, "তোমাল সঙ্গে আড়ি," তখন সুধা ঘরসংসার সব ফেলিয়া ছুটিয়া আসিত খুকীকে কোলে তুলিয়া অজস্র চুমা দিয়া রাগ ভাঙাইবার জন্য।

খোকনকে লইয়া ত বাড়িসুদ্ধ পাগল। একে সে ছোট্ট একরত্তি, তাহাতে আবার বাড়ির প্রথম পুত্র। ঠাকুমা তাহার জন্য সারাদিন পুরানো পাড়ের রঙীন সুতা তুলিতেছেন আর ছোট ছোট কাঁথায় ছড়া সেলাই করিতেছেন—"আমার বুক জুড়ানো ধন, আমার পদ্মলোচন।" মা বিকালবেলা রান্নাবান্না সারিয়া কাজল-লতায় কাজল পাড়িয়া খোকাকে সাজাইতে বসে; তার পর তার কপালে মস্ত একটা কাজলের ফোঁটা পরাইয়া আদর করিয়া বলে,

> "সাঁঝের বাতি নড়ে চড়ে,
> যে আমার খোকনকে খোঁড়ে
> পুড়ে মরে সে আঁধার কোণে"

খোকা কি বুঝে জানি না, কিন্তু খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠে। বাপ জ্যাঠা আপিস হইতে ফিরিয়া সকলের আগে খোকনমণির খোঁজ করে। এক গা ধূলা মাখিয়া হামা দিতে দিতে খোকা জ্যাঠার জুতা দুটা গিয়া চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া বসিয়া নাচে। কোলে উঠিবার ভিক্ষা, সে যে আপনি উঠিতে জানে না। সেদিনও প্রতিদিনের মত সন্ধ্যায় খোকাখুকুকে ঘিরিয়া সভা বসিয়াছিল। কাকী বলিল, "টুকু, তুমি কাকে সবচেয়ে ভালবাস?" টুকু বলিল, "মাকে, বাবাকে, তোমাকে, ছোটভাইকে আল ঠাকুমাকে।"

মা বলিল, "সবাইকেই সবচেয়ে ভালবাসিস্, মুখ্খু কোথাকার?"

কাকী বলিল, "আমাকে কতটা বাসিস্?"

টুকু দুটি হাত যথা সম্ভব ছড়াইয়া বলিল, "এই এত্তখানি।"

মা বলিল, "আর আমাকে?"

টুকু বলিল, "আলো আলো আকাশ পর্যান্ত।"

কাকী বলিল, "তবে রে দুষ্টু, তুমি না সবাইকে সমান ভালবাস?"

খোকা হামা দিয়া আসিয়া মার পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ডুইটু বোকা।"

এমন কথা জগতে বোধ হয় আর কেহ কখনও বলে নাই। সকলে গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা দেখেছ, এরই মধ্যে ছেলের কি বোলচাল! পাকা ছেলে কোথাকার!"

টুকুও আঙুল তুলিয়া খোকার মুখের কাছে গিয়া নাড়িয়া বলিল, "পাকা ছেলে কোথাকার!"

যতটুকু সময় অবসর সুধা বীণার মুখে খোকা খুকু ছাড়া অন্য কথা নাই, যেন পৃথিবীতে আর কোন জীব কি পদার্থের অস্তিত্ব থাকা না-থাকায় তাহাদের কিছু আসিয়া যায় না। মুকুলের অলঙ্কার শাড়ী দুই দিন পুরাতন হইয়া যায়, তাহার পর নূতন একটার কথা না ভাবিলে কোন রস পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহাদের খোকটুকু যে নিতাই নূতন। হাজার হাজার বার মানবশিশু যে কথা বলিয়াছে, যে লীলা-চাঞ্চল্যের লহর তুলিয়াছে তাহা এই খোকা-খুকুর প্রতি কথায় প্রতি পদক্ষেপে যেন সৃষ্টিতে প্রথম দেখা দিতেছে। মুকুল এই পৃথিবীতে পচিশ বৎসর বাস করিয়াও আজ তাহা প্রথম আবিষ্কার করিল।

খোকার চোখে ঘুম আসিয়াছিল। মা তাহাকে কোলের উপর টানিয়া আস্তে আস্তে দোলাইয়া গান ধরিল—"ধন, ধন, ধন, এ-ধন যার ঘরে নাই তার বৃথাই জীবন।" খোকা ছোট কচি মুঠিতে মার গলার হার চাপিয়া বুকের কাছে আগাইয়া আসিল।

আজ মুকুলের মনবেদনার কাঁটা তাহাকে বুঝাইয়া দিল, মানুষ এ-সকল কথা শুধু ছড়া কাটিবার জন্যই লিখে

নাই। কত যুগ ধরিয়া কত মায়ের মনের কথা এই ছোট ছড়াটুকুর ভিতর পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহাদের বহু সাধনার আভাসও এই কথাগুলির ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই বুঝি তাহার আজ সত্যসত্যই বিশ্বাস হইল সন্তানের অভাবে স্বামী হয়ত আবার বিবাহ করিয়াও বসিতে পারে। মুকুল হঠাৎ উঠিয়া গিয়া ঠাকুরঘরে উপুড় হইয়া প্রণাম করিয়া জোড়করে বলিল, "হে ঠাকুর, তোমায় কোনো দিন ডাকি নি, আজ বড় দুঃখে ডাকৃছি। কাণা খোঁড়া যা-হোক একটা কোলে দাও ঠাকুর, কিন্তু সতীন-যন্ত্রণা দিও না।"

নীচে তখনও বীণা খোকনকে সুর করিয়া ঘুম পাড়াইতেছিল,

"তারা কিসের গরব করে।
(তারা) আগুনে পুড়ে কেন না মরে।"

মুকুলের মনে হইল বীণা যেন তাহারই ধন-ঐশ্বর্য্যকে বিদ্রূপ করিয়া তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেছে।

৪

মুকুল আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে। বিধাতা তাহার জেদ রক্ষা করিয়াছিলেন তাহার অজ্ঞাতেই। সে জানিত না যে, যে-সন্তান না-হওয়ার দুঃখে ও অপমানে সে এত দিনের স্বামীর সংসার এক দিনেই ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিল সেই সন্তানকে সে তখনই আপনার শরীরে বহন করিয়া বেড়াইতেছে।

একথা বুঝিবার পর আর সে অভিমান করিয়া স্বামীর নিকট হইতে দূরে পড়িয়া থাকিতে পারিল না। এ-সুসংবাদ স্বামীর আগে আর কাহাকেও সে দিতে পারে না, দেওয়া চলে না।

বাড়ি আসিয়া মকুল সবার আগে তাহার রেশমের শাড়ীগুলা বাহির করিয়া কাটিতে বসিল। এই কাপড়ের বোঝা আলমারীতে সাজাইয়া রাখিয়া কি হইবে? তাহার চেয়ে তাহার অনাগত শিশুদেবতার পূজা ইহাতে করিলে মনে অনেক তৃপ্তি পাওয়া যাইবে।

জয়ন্ত দেখিয়া বলিল, "ওকি ওকি, এ আবার কি রকমের পাগলামী? ছেলের মা'রা কি কেউ ভাল কাপড় আর পরে না? ওগুলোকে মিথ্যে কেটে কুটিকুটি করছ কেন? বাজারে এখনও অনেক সিল্কের দোকান আছে। তোমার ছেলের জামা-কাপড়ের কিছু অভাব হবে না।"

মুকুল লজ্জা পাইয়া বলিল, "না না, তার জন্যে নয়। ও কাপড়গুলো পরতে আর আমার ভাল লাগে না, তাই কেটে ফেল্‌ছি। মানুষে কাট্‌লে তবু কোনো কাজে আসে, পোকায় কাটলে ত সবটাই লোকসান।" তার পর মুখ ম্লান করিয়া বলিল, "তাছাড়া এই বুড়ো বয়সে ছেলেপিলে হওয়া, বাঁচব কি মরব কে জানে? তখন এক-আলমারী কাপড় দেখে তোমরা আপশোষ করবে, নয়ত সতীন এসে পরবে। বিয়ে ত তোমার ঠিকই হচ্ছিল, মাঝের থেকে আমি আবার ক'মাসের জন্যে বাগড়া দিলাম।"

জয়ন্ত বলিল, "আচ্ছা থাক্‌, অত বাজে কথা ব'কে কাজ নেই। সমস্ত ইউরোপ আমেরিকা সুদ্ধ মেয়ের বুড়ো বয়সে ছেলে হ'তে পারছে, আর তোমার বেলায় যমরাজা ওৎ পেতে ব'সে রয়েছেন আর কি?"

মুকুলের মনে সত্যসত্যই ভয় ঢুকিয়াছিল, হয়ত এবার তাহার যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। সব সুখ কি মানুষের বরাতে একসঙ্গে সহ্য হয়? তবু সে ভয়টা ঠেকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত আপনাকে নানা তত্ত্বকথা শুনাইয়া। মরণ ত মানুষের হইবেই এক দিন, দীর্ঘ আয়ুর পিছনে চিরকালব্যাপী শূন্যতা ফেলিয়া রাখিয়া মরার অপেক্ষা এই মরণই ত তাহার ভাল। তাহার স্বল্পায়ু জীবনের মধ্যে হিন্দুনারীর কাম্য সকল সুখই সে ভোগ করিয়াছে; এখন যাইবার বেলা যদি বংশধারাকে চির-প্রবাহিত রাখিবার আশা ও গৌরব লইয়া মরিতে পারে তাহা হইলে না-ই বা পৃথিবীতে আর কুড়ি-পঁচিশ বৎসর একই সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখিল এবং একই অন্নজল বার বার করিয়া খাইল! যাহা সে কোনদিন দেখে নাই সেই সন্তানের মুখ একবারটি দেখিয়া হাসিয়া সে জগতের নিকট বিদায় লইতে পারিবে।

মুকুলের সন্তানের অভ্যর্থনার নানা আয়োজনের সঙ্গে দিন অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। ছেলের জামা,

মোজা, টুপি, দোলা, খাট, গাড়ী কোনটারই অভাব পিতা মাতা থাকিতে দিল না।

আশ্বিনের পূজার বাজনার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তদের বাড়িতে শঙ্খধ্বনির হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। পিসিমা, মায়া সবাই মহা ব্যস্ত। মুকুলের খোকা হইয়াছে। পিসিমা বলিলেন, "ওরে ডাক্ রে ডাক্, দাদাকে ডাক্। দুই হাতে গিনি নিয়ে আস্‌তে বল, এত দিনে বংশপ্রদীপ ঘর আলো করতে এসেছে।"

মায়া বলিল, "গিনি হবে এখন, বৌদির ত চোখ উল্টে গিয়েছিল, সে আছে না গেছে তাই দেখ আগে। ছেলের আগে মাকে বাঁচিয়ে তোল, তার পর ওসব মাথা-মুণ্ডু ক'রো যত পার।"

ধাত্রী বলিল, "না গো না দিদিমণি, বৌদিদি ঠিক সাম্‌লে উঠেছেন। তাঁর জন্যে কোনো ভয় নেই। সোনার চাঁদকে একবার দেখিয়ে দাও, সকল দুঃখকষ্ট সব যন্ত্রণা এক মুহূর্ত্তে ভুলে যাবেন।"

ঝি ছেলেকে তুলিয়া মুকুলের মুখের কাছে ধরিল। কি করুণ অসহায় মুখখানি। দেখিয়া মমতায় মুকুলের সারা প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। এ-ছেলে তাহার বাঁচিবে ত!

মোহর, গিনি, টাকা লইয়া, ঠাকুর্দ্দাদা ঠাকুমা, কাকা পিসি সকলে দেখিয়া গেল। মুকুলের মনের ভিতর কেবলই দুরু দুরু করিতে লাগিল। ভগবান এত সুখ তাহার সহিবে ত? এ-ছেলে যেন তাহার কোলজোড়া করিয়া বাঁচিয়া থাকে।

৫

মুকুলের বুকভরা ভালবাসা ও দেহ-মন-প্রাণের যত্ন আদর লইয়া মুকুলের ছেলে এক বছরের হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মুকুলের মুখের হাসি একেবারে ম্লান হইয়া গিয়াছে। ছেলে তাহার এত দিনেও উপুড় হইতে বসিতে কথা বলিতে কিছুই শিখে নাই। কলিকাতা শহরের কোন চিকিৎসার সাহায্য লইতে মুকুল বাকি রাখে নাই, কিন্তু সকলেই বলিয়াছে এ-রোগ শিবের অসাধ্য। ছেলের মেরুদণ্ডই জন্ম হইতে বিকৃত। ইহার চিরজীবন এমনই করিয়া কাটিয়া যাইবে।

শিশু মাকে চিনিতে শিখিয়াছে, মাকে দেখিলে হাসে, মা চলিয়া গেলে কাঁদে। ডাক্তার বলে, "ইহার বুদ্ধির কোনো অভাব হইবে না। সবই বুঝিবে, তবে চিরজীবনই পরের উপর নির্ভর করিতে হইবে।"

মুকুল বলে, "ভগবান সবই যদি ওর বাদ দিলেন বুদ্ধিটুকুও না দিলেই পারতেন, আপনার দুর্ভাগ্য তা হলে আর কোনো দিন বুঝতে হ'ত না।"

ছেলে যত মা'র মুখের দিকে চাহিয়া হাসে, মা'র চোখ দিয়া ততই জল পড়ে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া মুকুলের দুই চোখ লাল হইয়া গিয়াছে। সে দিবারাত্রি ছেলে লইয়াই পড়িয়া আছে, তাহার বেশভূষা আমোদ-আহ্লাদ সব যেন পূর্ব্বজন্মের বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। এ-মুকুল যেন সে-মুকুলই নয়। জয়ন্ত দেখিল, এমন করিলে ইহাকে বাঁচানোও মুস্কিল হইবে। মুকুলকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইয়া সে বলিল, "দেখ, মানুষের পাঁচটা আঙুল কিছু সমান হয় না একটা ছেলে অমন হয়েছে ব'লে তার জন্যেই কি প্রাণটা দিতে হবে। বেঁচে থাক্‌লে আরও পাঁচটা ভাল ত হ'তে পারে। সবগুলোই অমনি হবে না।"

মুকুল বলিল, "আর আমার বেঁচে পাঁচটা ছেলে নিয়ে কাজ নেই। আমি স্বার্থপরের মত দেবতার দোর ধরে কাণা-খোঁড়া ছেলে চেয়েছিলাম। ভগবান আমাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছেন। এর চেয়ে আমার সতীন হওয়াও ভাল ছিল। দুঃখ পেতাম আমিই পেতাম। আমার বন্ধ্যা নাম ঘোচাতে চিরটা জীবন ধরে আমার প্রাণের বাছা বাছা ত দুঃখ পেত না।"



বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য—শ্রীসুকুমার সেন। রঞ্জন প্রকাশালয়, কলিকাতা ১৩৪১। পৃ. ২২২।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের নাম বাঙ্গালা ভাষা সমালোচনার ক্ষেত্রে অপরিচিত নহে। তাঁহার এই সারগর্ভ পুস্তকখানি যে শুধু তাঁহার পাণ্ডিত্যের উপযুক্ত হইয়াছে, তাহা নহে,—বর্ত্তমান ভাষা-বিকৃতির যুগে এরূপ ঐতিহাসিক সমালোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে বলিয়া, ইহা সময়োপযোগীও হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, বাঙ্গালা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য কীর্ত্তির মধ্যে, গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিও একটি প্রধান কীর্ত্তি। সেই গদ্য-সাহিত্য-সৃষ্টির ধারাবাহিক ইতিহাস সাধারণ পাঠকের অজ্ঞাত না হইলেও, খুব সুস্পষ্ট নহে। সুকুমার বাবুর বহুপ্রযত্নসাধ্য রচনা, উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, সেই সাহিত্যের যে তথ্যপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, তাহা শুধু বিশেষজ্ঞের নহে, সাধারণ পাঠকেরও আদরণীয় হইবে। এ-পর্য্যন্ত এই বিষয়ে যে-সকল পুস্তক বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য বিবরণ হইতে পারে নাই; কারণ, এই সকল রচনা হয় তথ্য ও অতথ্য নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছে, অথবা শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাসে পর্য্যবসিত হইয়াছে। জ্ঞাতব্য তথ্য-সংগ্রহ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হিসাবে সুকুমার বাবুর পুস্তক নাতিদীর্ঘ হইলেও মূল্যবান্, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমগ্র বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে, তাঁহার রচনাই পূর্ণাবয়ব না হইলেও, এ-পর্য্যন্ত একমাত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবরণ বাঙ্গালী পাঠকের গোচরে আনিয়াছে।

কিন্তু সুকুমার বাবু যে-মনোভাব লইয়া তাঁহার গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-রসিকের নহে, তথ্যমাত্র সন্ধানী বৈয়াকরণের মনোভাব। ব্যাকরণ-অভিধানের দিক লইয়া যাঁহারা চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিশ্রম নিরর্থক, এ-কথা বলিতেছি না; কিন্তু একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকার জন্য, নিছক বৈয়াকরণ অনেক সময় মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া বসেন। সুকুমার বাবু বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা লেখকদের গদ্য-রীতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। গবেষণা হিসাবে তাহার মূল্য কেহই অস্বীকার করিবেন না; কিন্তু ভাষার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণই কোনও বিশিষ্ট গদ্য-রীতির প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায় নহে। ইহা ভাষাতত্ত্ব হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্ব সকল সময়ে সত্য না হইতেও পারে। বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ-পদে স্ত্রীপ্রত্যয়ের বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, অথবা অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রচুর ব্যাকরণ দুষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন, অথবা তৎসম ও তদ্ভব শব্দের নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ বিশ্লেষণের দ্বারাই কি বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব গদ্য-রীতির প্রকৃত সৌন্দর্য্য-বোধ হইবে? দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, সুকুমার বাবুর বিবরণ পড়িয়া মনে হইল যে, লোকে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-রচনার অযথা অত্যুক্তিপূর্ণ সুখ্যাতি করে; বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে অতি বিশ্রী গদ্যই লিখিতেন। সুকুমার বাবুর বহু পরিশ্রমপ্রসূত পুস্তকের অযথা গুণাপকর্ষণ আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু তিনি পুস্তকের নামকরণ ব্যাপক নামকরণ করিয়াছেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য'। এ-ক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে আলোচনা একেবারে অপ্রয়োজনীয় নহে; কিন্তু সাহিত্যে গদ্য-রীতির বিচারে এ-কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভাষার অস্থি-সংস্থান এবং তাহার দেহ-লাবণ্য এক বস্তু নহে; একের বিচারে অপরটির উপর শাসন জারি করিলে, উভয়েরই অবিচার করা হয়।

শ্রীসুশীলকুমার দে

নরবাঁধ—শ্রীমনোজ বসু। রসচক্র সাহিত্য সংসদ, ১৫, খাজা বসন্তরায় রোড, কলিকাতা। মূল্য ১।০

'নরবাঁধ' আর 'মাথুর'—এই দুইটি গল্পে প্রায় আধাআধি করিয়া ১৫০ পাতায় বইখানি জুড়িয়া আছে।

যে অতি অল্পসংখ্যক প্রতিভাবান লেখক একেবারে জয়পতাকা লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে নামেন, শ্রীমনোজ বসু তাঁহাদেরই মধ্যে এক জন। এর ব্রত বাংলাকে বাঙালীর কাছে পরিচিত করা। দেশের অন্তর্লক্ষ্মীর পরিচয় পাইতে হইলে যেখানে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে সেই মর্ম্মস্থলটির পথ লেখকের ভাল ভাবেই জানা আছে।

লেখার মধ্যে এমন একটি অপরূপ সরসতা আছে যে, যে বিস্ময় আর অবোধ আনন্দের সহিত ছেলেবেলায় রূপকথা শোনা যাইত, বইখানি পড়িবার সময় তাহারই যেন একটা আবছায়া স্মৃতি মনকে অভিভূত করিয়া বসে। ভাষা বেশ সুরাল—মাঝে মাঝে ঝঙ্কারে ক্ষত হইয়া উঠে। চরিত্রগুলি খুব সজীব—ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া ঘুরে।

এমন বইখানিতে এক জায়গায় কিন্তু একটু নিরাশ হইতে হইল। 'নরবাঁধ' গল্পটি ২৪ পাতায় আসিয়া শেষ হইয়া গেছে; তাহার পর আর টানিয়া লইয়া যাওয়া ভাল হয় নাই। ২৪ হইতে ৭০ পাতার মধ্যেও লেখার সব বিশিষ্টতাই বর্ত্তমান, কিন্তু ঐ ২৪ পাতার জোড়ের কথাটা বরাবরই মনকে পীড়া দেয়। সম্পূর্ণতার বাহিরে যায় নাই বলিয়া মাথুর গল্পটি নিখুঁৎ হইয়াছে।

ছাপা, বাঁধাই, কাগজ—সবই বেশ ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বকোষ—বঙ্গের বহু সাহিত্যিকের সহযোগিতায় প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি তত্ত্বচিন্তামণি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও ৯ নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, হইতে শ্রীবিশ্বনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ৷০ আনা, ১২ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৫৲, এক ভাগ বা ২৫ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ১০৲ টাকা।

বঙ্গভাষায় এই বিখ্যাত এন্‌সাইক্লোপীডিয়ার পরিচয় আমরা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর দিয়াছি। ইহা নিয়মিত রূপে পূর্ব্ববৎ বিদ্যাবত্তার সহিত সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইতেছে। আবশ্যকমত ছবি ও মানচিত্র ইহাতে দেওয়া হইতেছে।

বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের শিক্ষাসংক্রান্ত সব গ্রন্থাগারে, সাধারণ পুস্তকালয়ে এবং সচ্ছল অবস্থার লোকদের পারিবারিক পুস্তকসংগ্রহে ইহা রাখা উচিত।

পুরাতনই নূতন—''ভিক্ষার ঝুলি'' ও ''মন পাগলের বুলি''র অনুক্রম। 'প্রেম ভিখারী' শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত। ৩৩ নং ম্যাকলাউড ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

২১৬ পৃষ্ঠার এই বহিখানিতে ছড়ার ছন্দে খুব সহজ ভাষায় লেখা ২৪২টি কবিতা আছে। কবিতাগুলি পারমার্থিক ও ধর্ম্মনৈতিক তত্ত্বে পূর্ণ, কিন্তু নীরস নহে। অনেকগুলি পড়িয়া প্রীত ও উপকৃত হইয়াছি।

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। ''বিশ্বভারতী'' কর্ত্তৃক প্রকাশিত, শান্তিনিকেতন। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা, ডাকমাশুল এক আনা। ত্রৈমাসিক ১৸৵০, ষাণ্মাসিক ৩৷৵০, বার্ষিক ৬৷০। মাসে এক খণ্ড প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষার এই বৃহত্তম অভিধানের পরিচয় আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। পঞ্চদশ খণ্ডে ''আ'' শেষ হইয়াছে। শেষ শব্দ ''আহ্বর'' আহ্বান, প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং বহুবর্ষব্যাপী অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার জন্য শ্রদ্ধাভাজন। অধিকন্তু, তিনি ধনশালী না-হইলেও এবং কোনও বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশকের সাহায্য না-পাইয়া থাকিলেও যে নিজের ব্যয়ে এতবড় একটি অভিধান ছাপাইতেছেন, তাহার জন্য বঙ্গসাহিত্যানুরাগী সকল ব্যক্তির নিকট হইতে উৎসাহ পাইবার দাবি করিতে পারেন। বাঙালীদের সমুদয় বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারে এই অভিধান ক্রীত ও রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। যে-কেহ বাংলা-সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে চান, ইহা তাঁহারই কাজে লাগিবে।

বঙ্গবীণা—শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৫৮+৩২। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী মুখপাতের রঙীন ছবিটি আঁকিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হাল্দার প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনার রচয়িতা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

এই সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত বহিখানি ২৯২টি গীতিকবিতার সমষ্টি। পুস্তকখানির ''পরিচয়'' দিয়াছেন স্বয়ং কবিসার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথ। কবিতাগুলি ছাড়া ইহাতে কবি-পরিচয় ও কবিতা-পরিচয় আছে। তাহার সাহায্যে কবিতাগুলি বুঝিবার ও তাহার রস আস্বাদন করিবার সুবিধা হইবে। কবিতাসমূহের প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী এবং কবিদের বর্ণানুক্রমিক সূচী থাকায় পুস্তকখানি ব্যবহার করিবার খুব সুবিধা হইবে। সংকলন ভালই হইয়াছে।

''ভূমিকা''য় লেখা হইয়াছে, ''বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত লেখা গীতিকবিতাগুলি হইতে কিছু কিছু চয়ন করিয়া বঙ্গবীণার চারিটি স্তবক রচিত হইয়াছে।'' ''চতুর্থ-স্তবকে জীবিত কবিদের ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত লেখা কবিতা গৃহীত হইয়াছে।'' এই সালটি কেন সঙ্কলকরা নির্ব্বাচন করিয়াছেন তাহা বলেন নাই। রবীন্দ্রনাথেরই বহু উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা ১৯০০ সালের পরে লেখা।

বিদ্যাসাগর চরিত।—শ্রীশরৎকুমার রায়। প্রকাশক রায় এণ্ড কোং, ২২০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। ১৩৪ পৃষ্ঠা এবং কয়েকখানি স্বতন্ত্রমুদ্রিত ছবি।

এই পুস্তকখানি পড়িলে পাঠকগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত, নানা প্রকারের কৃতিত্ব, বহু কীর্ত্তি ও তাঁহার চরিত্রের সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। আগে যে-সকল বিখ্যাত লেখক তাঁহার সম্বন্ধে পুস্তক বা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মন্তব্যও ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বহিখানি সুলিখিত। ভুল কিছু আছে। যেমন চতুর্থ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার ''আঁতুড়'' ঘর না লিখিয়া ''আতুর'' ঘর লিখিয়াছেন। বহিখানির ছাপা ভাল।

কালিদাসের পাখী।—শ্রীসত্যচরণ লাহা, এম্-এ, পিএইচ-ডি, এফ-জেড্-এস্, এম্-বি-ও-ইউ, প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা ১৯৩৪। মূল্য ছয় টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৯৬+১২। ছইখানি বহুবর্ণ ও এগারখানি একরঙা স্বতন্ত্র মুদ্রিত ছবি। কাগজ ও ছাপা অতি উৎকৃষ্ট। মজবুত কাপড়ে বাঁধান ও তাহার উপর সুন্দর রঙীন ছবি। পৃষ্ঠা 'প্রবাসী'র চেয়ে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এক ইঞ্চি আন্দাজ ছোট।

পক্ষিতত্ত্ববিষয়ে যাঁহাদের কথা প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়, ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বস্তুতঃ, বাংলা দেশে, পক্ষীদের সম্বন্ধে তাঁহার সমান জ্ঞান আর কাহারও আছে বলিয়া অবগত নহি। তাঁহার নিজের একটি চিড়িয়াখানা আছে। তাহাতে নানাজাতীয় পক্ষী পালিত হয়। এই চিড়িয়াখানার সাহায্যে তিনি তাহাদের জীবনের সমুদয় ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করেন।

''কালিদাসের পাখী'' বহিখানিতে তিনি কালিদাসের নাটক ও অন্যান্য কাব্যে বর্ণিত বা উল্লিখিত পাখীদের সম্বন্ধে কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কিরূপ বিজ্ঞানসম্মত তাহা দেখাইয়াছেন। কালিদাস ছিলেন কবি, কিন্তু কবি বলিয়া তিনি পক্ষীদের সম্বন্ধে কল্পনা বা অনুমানের আশ্রয় লয়েন নাই, পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি অবগত হইয়াছিলেন।

বহিখানি মনোহর। পাইবার পরই পড়িয়া শেষ করি। ইহার বিস্তারিত বর্ণানুক্রমিক সূচী ইহার একটি বিশেষত্ব। কালিদাসের গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত প্রায় ত্রিশ রকমের পাখীর কোথায় কিভাবে কিরূপ উল্লেখ আছে, তাহা সূচীর সাহায্যে অনায়াসে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

র. চ.

অলঙ্কার

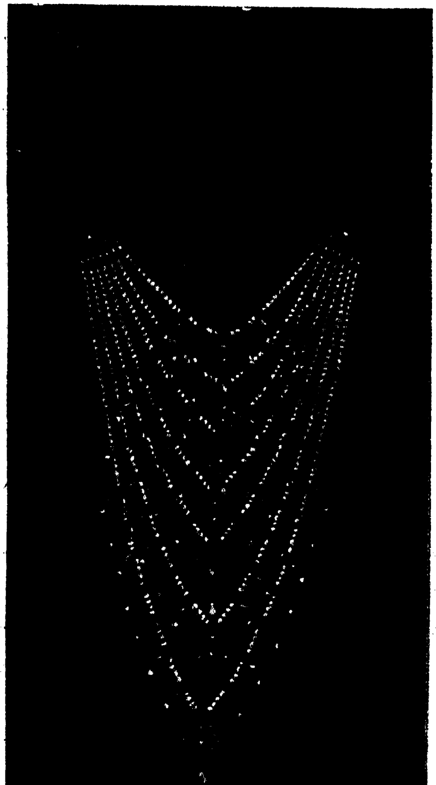
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

"নাভি কা সুগন্ধ মৃগ নহী জানত;
ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোই॥"

হরিণ দেখে তাহার চারিদিক্ সুগন্ধে আমোদিত, সারা বন গন্ধে ভরিয়া গিয়াছে। হরিণ গন্ধে মাতোয়ারা হইয়া বনের চারিদিকে, ঝোপের এদিক্-ওদিক্ অন্বেষণ করে; বুঝিতে পারে না সে—এ মধুর প্রাণ-মাতান গন্ধ কোথা হইতে আসিল। গন্ধের আকর যে তাহারই মধ্যে বিরাজ করিতেছে, তাহারই অভ্যন্তরস্থ কস্তুরীর গন্ধ যে তাহারই পাশপাশ সৌরভে মাতাইয়া তুলিয়াছে—অজ্ঞান হরিণ বেচারা তাহা বোঝে নাই; তাই সে চারিদিকে এমন করিয়া ব্যাকুল হইয়া ঢুঁড়িয়া বেড়াইতেছে।

সকল যুগে সকল অবস্থায় মানুষ সৌন্দর্য্যের উপাসক। সে সৌন্দর্য্যের অন্বেষণে চিরজীবন ঘুরিয়া বেড়ায়। মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়, সেখানে সৌন্দর্য্য উপলব্ধির জন্য কিছু দিন সুখ-দুঃখ ভোগ করে, হাসে-কাঁদে, এই করিয়া মৃত্যুকে বরণ করে। কিন্তু যত দিন সে পৃথিবীতে থাকে, সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া তাহারই সন্ধানের জন্য ধন, ঐশ্বর্য্য, সুখ, যশ, প্রতিপত্তির মধ্যে সৌন্দর্য্যের অন্বেষণে সে ছোটে। সৌন্দর্য্যের জন্য সে লালায়িত, কিন্তু জানে না সে, তাহার সৌন্দর্য্যোপলব্ধি কিসে হইবে। অথচ তাহার নিজের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহাকে পাইবার জন্য সে নিরবধি অসহ্য দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে চায়। নিজের অজ্ঞাতসারে নিশ্চয়ই সে এমন একটা কিছুর আস্বাদ পাইতেছে যাহাকে ছাড়িয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহাকে সেই অজ্ঞাত বস্তুর জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াই যেন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের আকর যে তাহারই মধ্যে মানুষ তাহা না বুঝিয়া সংসারের আবর্ত্তে নিরন্তর ঘুরিয়া মরিতেছে। আপনার শরীর ও মনের আশ্রয়ে সে যে-সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, যত দিন সে তাহাদের নিগূঢ় মর্ম্ম ও চূড়ান্ত অর্থ আবিষ্কার করিতে না পারে তত দিন সে বাহ্যসৌন্দর্য্যের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। যখন তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য মানুষের প্রাণ আকুল হয়, তখন সে এই বিশ্বসমস্যার নির্বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রস্তুত হইতে প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। ফলে জীবের চরম লক্ষ্য কি তাহারই অনুসন্ধান করিতে থাকে। কিন্তু যত দিন বাহ্যসৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা যাহা তাহা লাভ করিবার সৌভাগ্য মানুষের না-হয়, তত দিন সে বাহ্যসৌন্দর্য্যের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া থাকে। এই বহিঃসৌন্দর্য্যভাবপ্রণোদিত হইয়াই, একদিকে নিজের মতিবুদ্ধি এবং অন্যদিকে সমাজের প্রচলিত রুচির অনুবর্ত্তী হইয়া মানুষ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। সমাজের সঙ্গে তাহার একটা সম্বন্ধ আছে, এ-কথা সে কখনও ভোলে নাই। তাহার নিজের দায়িত্বের কথাও তাহাকে ভাবিতে হইয়াছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে দশ জনের এক জন হইয়া থাকিতে হইবে,—সুতরাং তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে যে হইবে তাহাও সে উপলব্ধি করিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে নানা বাধাবিঘ্ন অন্তরায়ের হাত হইতেও আত্মরক্ষা করিতে হইবে। শরীরে কোন ব্যাধি না হয় এবং পারিপার্শ্বিক ও দৈব ঘটনা হইতে তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে তজ্জন্য তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে। এইজন্য প্রথম প্রথম মানুষ আভিচারিক তন্ত্রে নানা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিল। অঙ্গে রক্ষা-কবচ ধারণ করিল। ক্রমশঃ তাহার মধ্যে তাহার সুপ্ত সৌন্দর্য্যবোধ জাগিয়া উঠিল। দেশকালপাত্রানুসারে আত্মরক্ষা ও সৌন্দর্য্যপ্রকাশের প্রচেষ্টা হইতে রক্ষা-কবচগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিল। স্ত্রীপুরুষভেদে তাহাদের তারতম্য হইল। শনৈঃ শনৈঃ অলঙ্কারের সৃষ্টি হইল। বিবাহিত ও অবিবাহিতের পরিচ্ছদের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কারেরও পার্থক্য ঘটিল। ব্যক্তিগত রুচি এবং সমাজের প্রচলিত রুচির প্রভাব অলঙ্কারকে নানা রূপ প্রদান করিল।

সমাজের সকল অবস্থাতেই অলঙ্কারের প্রতি ঝোঁক, সাজসজ্জার প্রতি ঝোঁক মানুষের রহিয়াছে। যখন মানুষে মৃৎপাত্রের ব্যবহার জানিত না, যখন তাহাদের মধ্যে কৃষির প্রচলন হয় নাই, যখন মানুষে জন্তুদিগকে গৃহে পালন



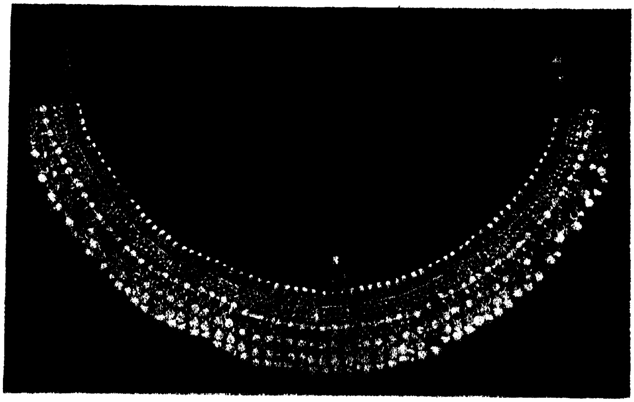
পঞ্জাবের সাতনরী হার

করিতে শেখে নাই, সেই আদি প্রস্তরযুগেও মানুষের মনে শরীরকে অলঙ্কৃত, ভূষিত ও মণ্ডিত করিবার প্রবৃত্তির উন্মেষ হইয়াছিল। ফুজিয়ান জাতি, আণ্ডামান দ্বীপের প্রাচীন জাতি প্রভৃতি যে-সকল আদিম জাতি আজও বাঁচিয়া থাকিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্য শরীর-মণ্ডনের আদিম প্রথার নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া যায়। আদি প্রস্তরযুগের মানুষ শরীরের শ্রী ও শোভা সম্পাদনের জন্য স্থায়িভাবে অঙ্গবিশেষের বিকৃতি সাধন করিত, উল্কি-চিত্রণে অঙ্গ বিভূষিত করিত, অঙ্গে রং ফলাইত এবং রত্নাভরণ প্রভৃতি দিয়া দেহ মণ্ডিত করিত। রত্নাভরণের মধ্যে কণ্ঠে পরিহিত হারের ব্যবহারই আদিম জাতিদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল। এই হার নানা আকারে, নানা উপকরণে নির্ম্মিত হইত। কণ্ঠাভরণ, নাসালঙ্কার, অধরভূষণ, হস্তাভরণ, চরণ-মণ্ডন ও কটি-মেখলা নানা জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ, কাল ও জাতিভেদে রুচির বিভিন্নতা অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় অলঙ্কারবিষয়েও সুস্পষ্ট। আদিম যুগে প্রকৃতিজাত সৌন্দর্য্য-উপকরণে অঙ্গাভরণের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। পাখীর পালকে শরীর অলঙ্কৃত করিবার প্রথা এখনও রহিয়াছে। প্রশান্ত-মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপের অধিবাসীরা কাকের পালকে দেহ শোভিত করে। তাহারা কড়ির হারও পরে। ইউরোপের সুসভ্য ইংরেজ অথবা ফরাসী জাতি উটপক্ষী ও ময়ূর প্রভৃতির চাকচিক্যময় পালকের সজ্জা এখনও ভালবাসে। অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসিগণ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের চিহ্নস্বরূপ জন্তু ও বৃক্ষাদি, দেবক প্রভৃতি নিজেদের শরীরে প্রচ্ছান করিয়া থাকে। এক সময়ে মানুষ প্রজাপতির ডানা, নানাপ্রকারের বীজ, অত্যুজ্জ্বল প্রস্তর, বিচিত্র পত্র প্রভৃতি অঙ্গে ধারণ করিয়া তাহার অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। তারপর জ্ঞান ও সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা ধাতুর অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছে। কেমন করিয়া এই সমস্ত প্রসাধনের ব্যাপার ঘটিল তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

যে করিয়া হউক অলঙ্কার-প্রীতি মানুষের মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। অলঙ্কার কোন দিন মানুষ ত্যাগ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। আমরা বলিয়া থাকি কামকাঞ্চনত্যাগী সংসার-বিরাগী তাপসেরা অলঙ্কারের প্রতি বিরূপ। তাঁহারা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের জন্য সাধনা করেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও অলঙ্কার ছাড়িতে পারেন না। তাঁহারা যে জটাধারণ করেন, চীর ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, ভস্ম বিলেপন করেন এবং সাম্প্রদায়িক প্রথানুযায়ী রুদ্রাক্ষ, দণ্ড, কমণ্ডলু, সিন্দূর, কর্ণাভরণ, কটি-শৃঙ্খল, চিমটা, ত্রিশূলাদি ধারণ করেন.

সেগুলি কি অলঙ্কারের রকমফের নয়? বৈষ্ণব-বৈরাগীর কৌপীন, বহির্বাস, মালা, তিলক, শিখা, এগুলিও পূরাদস্তুর অলঙ্কার-প্রিয়তার নিদর্শন।

অলঙ্কার শোভা বর্দ্ধন করে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র তাহা বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। যে-দেশের নীতি উপদেশ দেয় অর্থ অনর্থের মূল—অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্,—সে-দেশে কেবল শোভা-সংবর্দ্ধনের জন্য অর্থসাপেক্ষ অলঙ্কারকে বিলাস-ব্যসনের নিদান ভাবা সুযুক্তি ভিন্ন আর কি বলিব? সাধু, সন্ন্যাসী, বৈরাগী অলঙ্কারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'ন হউন, কিন্তু গৃহীর পক্ষে অলঙ্কার ত্যাগ করা দুষ্কর। একেবারে অনাবশ্যক এ-কথা বলিতে তো আমার সাহসে কুলায় না। অলঙ্কার আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাদের সহায়। বিবাহে আমাদের সালঙ্কারা কন্যা দান করিতে হয়। সর্ব্বকর্ম্মের প্রারম্ভে দেবতা ও গুরুপুরোহিতের অঙ্গুরীয়-বরণ প্রয়োজন। পারিবারিক স্নেহ-প্রীতি-বন্ধনে অলঙ্কার আমাদের প্রধান অবলম্বন। অর্থবিজ্ঞানের বহু সমস্যার সাধক অলঙ্কার। ইহার প্রসাদে কত শিল্প-কলা, কত বিজ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছে, কত ধাতু ও রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান জাগিয়া উঠিয়াছে।

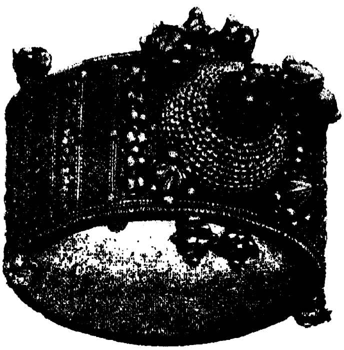


সিন্ধুদেশের রৌপ্যের কণ্ঠহার

সকল দেশের চেয়ে ভারতে গহনার আদর বেশী। প্রাচীনতম না হইলেও অপেক্ষাকৃত পুরাতন আর্য্যগণ অলঙ্কারের খুব প্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের বড় বড় বীর যোদ্ধারা অলঙ্কার পরিতেন। আমাদের স্থাপত্যে গহনাপরা এরূপ যোদ্ধমূর্ত্তি যথেষ্ট আছে। আর সেগুলি সবই এক ধরণের—উৎসবের বেশে সজ্জিত—তদুপযোগী আভরণে অলঙ্কৃত। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে এই সমস্ত মূর্ত্তি যেন একই ছাঁচে ঢালা—পরিবর্ত্তন কাহাকে বলে তাহারা যেন জানেও না, বোঝেও না। আশ্চর্য্য, ভারতের আশপাশের দেশেও এই একই অপরিবর্ত্তনীয় লীলার অভিনয় হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন আর্য্যদের এবং আর্য্য-ঔপনিবেশিকদের উৎসবোপযোগী অলঙ্কারের আকৃতি ও প্রকৃতি ভারতের গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে। অবশ্য দেশ-বিশেষের বিশেষ বিশেষ রুচি ও পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইয়া একই অলঙ্কার বহু আকারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বর্মা ও সায়ামে, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ায়, বালি ও যবদ্বীপে রাজাদের উৎসব-বেশে, বরকন্যার সাজসজ্জায় সেই পুরাতন ভারতীয় উৎসবের অলঙ্কার কথঞ্চিৎ সংস্কৃত আকারে আজও দেখিতে পাওয়া যায়। নাট্যশালাগুলিতেও যেখানে প্রাচীন চরিত্রের অভিনয় করিতে হয়, সেখানে প্রাচীন অলঙ্কারগুলিও বাদ যায় না। আরও আশ্চর্য্যের কথা ভারতের অনার্য্য-অধ্যুসিত প্রদেশে, অথবা প্রাচীন সুসভ্য প্রদেশবাসী জাতি-সকলের নিম্নস্তরের মধ্যে প্রাচীন অলঙ্কারের নিদর্শন যত বেশী পাওয়া যায়, ভারতের প্রাচীন সুসভ্য রাজ্যগুলিতে তাহার একাংশেরও কল্পনা করা যায় না। সুসভ্য দেশে লোকে বেশভূষায় কালপ্রভাবেরই বশবর্ত্তী হইয়া থাকে।

প্রাচীন অলঙ্কারের মধ্যে শিল্পরুচি ও শিল্পচাতুরী সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তখনকার বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি অসাধারণ কারুকার্য্যখচিত—শিল্পীর প্রশংসনীয় শিল্পবুদ্ধি অলঙ্কারের ভিতর দিয়া সর্ব্বপ্রকারে আত্মরক্ষা করিয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধদের ভাস্কর্য্য ও মৃৎশিল্পকৌশল কোনোদিন আসীরীয়দের অলঙ্কৃতির অভ্যাসসিদ্ধ একঘেয়ে একটানা পদ্ধতির মধ্যে আত্মাবমাননা বিঘোষিত করে নাই।

বেশভূষায় দেহমণ্ডনের আকাঙ্ক্ষা সকলেরই মধ্যে প্রবল। আমরা বাঙালী, আমরা আবার অলঙ্কারের অতিমাত্রায় ভক্ত। বাঙালী কতকগুলি অলঙ্কারকে পুণ্যদায়ক মনে করে। অনন্ত তাহাদের মধ্যে একটি।



কটকের রূপার বাজু

নবরত্নের অঙ্গুরী, অষ্টধাতুর তাগা, নাভিশঙ্খের কেয়ূর আমাদের সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিয়া থাকে। কতকগুলি অলঙ্কার পতিপুত্রের কল্যাণবর্দ্ধন করিয়া থাকে, নিজের আয়তি রক্ষণ করিয়া থাকে বলিয়া [illegible] নিকট সেগুলি আদর, যত্ন ও পূজা পাইয়া থাকে। শাঁখ, নৎ, নোয়া—এই শ্রেণীর অলঙ্কার। সাধারণের বিশ্বাস, গলায় মাদুলী, হাতে কবচ বা তাগা, আঙুলে আংটী, পায়ে কড়া প্রভৃতি ধারণে দেবদোষ, গ্রহদোষ ও রোগশান্তি হয়, বিষদোষ নষ্ট হয়, ভূতপ্রেতের ভয় থাকে না। কোনো কোনো রোগ সারাইবার জন্য লোকে কুমীরের নখ সোনা দিয়া বাঁধাইয়া কোমরে ধারণ করে। কেহ বা সোনা, রূপা ও তাঁবা একসঙ্গে জড়াইয়া অঙ্গুরী করিয়া হাতে দেয়। মৃতবৎসা রমণীরা শিশুর দীর্ঘজীবন কামনায় সদ্যঃপ্রসূত সন্তানের নাক ফুঁড়িয়া সোনা, রূপা বা লোহার মাকড়ি অথবা বামপদে লৌহমল কিংবা সোনার আবরণ দিয়া উচ্ছিষ্ট আমড়া, বাঘনখ ও কুমীরের দাঁত গলায় পরাইয়া দেয়।

আমাদের দেশে একই অলঙ্কার স্ত্রীপুরুষের ব্যবহার্য্য হইলে আকৃতির পার্থক্য হয়। শিশু, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার গহনার আকার ও প্রকারভেদ আছে। আমাদের দেবদেবীর অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য নানা প্রকারের। এক দেবতার যে অলঙ্কার থাকিবে, অন্য দেবতার তাহা থাকিবে না। অলঙ্কার দেখিয়া অনেক সময় দেবমূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দেশবিশেষের ধাতুবিশেষ, রত্নবিশেষ, অলঙ্কারবিশেষ ব্যবহার নিষিদ্ধ। এইরূপ বহু ব্যবহার ও সংস্কার লইয়া আমাদের অলঙ্কারতত্ত্ব বিপুলায়তন হইয়াছে। বাঙালীর গায়ে আজকাল কিছু বেশী মাত্রায় পশ্চিমে হাওয়া লাগিয়াছে ও শিক্ষাদীক্ষার রীতিও বদলাইয়া গিয়াছে, কাজেই আদর্শ ভিন্ন পথ ধরিয়াছে। তাহার উপর, কালে পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। আগেকার গহনা এখন বেয়াড়া বেখাপ্পা বোধ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। তখনকার দিনে বাঙালীর কানের অনেক গহনা ছিল। ঝুমকো লতার ফুলের অনুকরণে ঝুমকা বা ঝুমকো[১]; পোস্তদানার ফলের অনুকরণে ঢেঁড়ি,[২]—তাহার উপর ঘণ্টার মত ঝুমঝুম করিবে বলিয়া ঝুমকা ঢেঁড়ি; ইহার আর চলন নাই। চাঁপাফুলের অস্ফুট কলি হইতে 'চাঁপা'[২]—ইয়ারিঙ্, তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। পিপুলপাত, কর্ণফুল[৩] বা কানফুল, মাকড়ি, দুল, কান, কানবালা, কনকবৌলী,[৪] চৌদানি। পুরুষরাও কানে অলঙ্কার পরিত—নাম বীরবৌলী[৫]। এছাড়া আরও কানের গহনা ছিল। কণ্ঠাভরণ ছিল—মটরমালা,—ঘুরিয়া ফিরিয়া আজকাল পুনরায় ইহার চলন হইয়াছে। আর ছিল চাঁপাকলি,—এটি চম্পক-কলিকার মালা, বোঁটায় বোঁটায় গাঁথা, দেখিতে অনেকটা নেকলেসের মত। হংসগ্রীবার অনুকরণ করিয়া হাঁসুলী[৬]; নির্বিষ হেলে সাপের লেজের অনুকরণে হেলেহার, কামরাঙা-হার, দড়াহার, কণ্ঠমালা, মুক্তমালা, তেনরী, ধুকধুকি, পাঁচ লহর বা পাঁচ হালীর পাঁচনরী, সাতনরী, দানা, মোহনমালা, ঝিলমিলি হার[৭]

১ হিন্দুস্থানীদের মধ্যে আছে ঝুমক, ঝুম্মক।

২ 'ঢেড়ি চাঁপি মাকুড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল।'—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

৩ 'সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয়।'—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।—হিন্দুস্থানীদের 'করনফুল,' 'কনফুল'।

৪ 'সুবর্ণের কড়ি বৌলি রজতমুদ্রা পাশুলি সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।'—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি

৫ হিন্দুস্থানীদের 'বীঁড়'।

৬ হিন্দুস্থানীদের হঁসুলী।

৭ গলায় তাহার দিল হার ঝিলমিলি।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ

প্রভৃতি অনেক রকমের হার ছিল; মেয়েদের কটিভূষণ ছিল—কিঙ্কিণি,[৮] গোট, কোমরপাটা, মেখলা, চন্দ্রহার। শিশুদের কটিভূষণ ছিল নিমফলের মত দানাওয়ালা নিমফল, কুলের আঁটির মত দানাগাঁথা সোনা-রূপার বোর, বোরপাটি, বোরপাটা—এগুলি বোর ও তাবিজের মত সোনা-রূপার পাতা গাঁথা; তেঁতুলে বিছার অনুকরণে বিছা। তেঁতুলে বিছার আকৃতি হারও ছিল, তার নামও বিছা—নিমফুলের অনুকরণেই হার নিমফুল। শিশুদের কোমরে বেড়ও দেওয়া হইত। আবার গোঁপ-হারও ছিল। গোঁপহারের কল্পনা কিছু উদ্ভট বা উৎকটও মনে হইতে পারে; গোঁপের সঙ্গে এ হারের কোন সম্বন্ধ নাই—পশ্চিমবঙ্গের অনুনাসিকের পাল্লায় পড়িয়া হিন্দুস্থানী পুরুষদের গোপ নামক হার আমাদের মেয়েদের গোঁপহার হইয়াছে। যাহা হউক, রমণীদের করতলপৃষ্ঠের শোভা বর্দ্ধন করিত রতনচূড়, তাহারা হাতে পরিত পলাকাঁটি, যবদানা, মরদানা, মুড়কী আকারে গড়া মুড়কী মাদুলী, মটরীকঙ্কণ, থেয়ে কঙ্কণ, থৈয়ে নোয়া: কঙ্কণ, খাড়ু, নারিকেল ফুল, বালা, শাঁখা,[৯] লবঙ্গফুল; পৈঁছা, বাউটী: উপর হাতে পরিত তাড়,[১০] তাগা, বাজু,[১১] জসম, ইত্যাদি। কলুপা শঙ্খ অনেক দিন আগে বাঙ্গালায় চলিত। এটি নাচি-করা শাঁখা। সাধারণতঃ দু-সেট হইত। এক সেট হলদে, এক সেট সবুজ। হলদে সেটকে লক্ষ্মণ বলিত, সবুজ সেটের নাম রাম। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণে আছে —"কলুপা দু-বাই শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ"। বাই মানে সেট। মাথার অলঙ্কার ছিল, সীঁথি, ঝাঁপা, ঝাপটা,[১২] শিরোমণি; খোঁপার শোভা ছিল—প্রজাপতি, ফুল, চিরুণী, কাঁটা; রমণীদের নাসাশোভা ছিল নোলক, নথ, বেশর,[১৩] লবঙ্গ, শতেশ্বরী ইত্যাদি। পায়ের গয়না ছিল মল, বেঁকি, বাঁকমল,* ঘুমুরগাঁথা মল, ঘুজ্মুর পাতামল, হীরাকাটা মল, নূপুর,[১৪] নেউর, কেয়ূর, পাশুলি, আনট বিছা,[১৫] গুজরিপঞ্চম, পঞ্চম, পাঁজর, মঞ্জীর, তোড়া, খলখলি, ছরা, ঝুমুর চরণচাপ প্রভৃতি। পায়ের বুড়ো আঙুলের গহনা আঙ্গট, কড়া, চুট্‌কি। হাতের আঙুলের আংটি, মুদরি।

আমি দিগ্‌দর্শন হিসাবে অলঙ্কার সম্বন্ধে দুইটা কথা বলিলাম। এইবার প্রাচীনতম যুগ হইতে আমাদের দেশে অলঙ্কারের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আরও দুইটা কথা বলিব।

চারিখানি বেদের কোনো বেদে 'অলঙ্কার' বলিয়া কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। বেদে কিন্তু 'অরংকৃত', 'অরংকৃতি' শব্দ পাওয়া যায়—অর্থ অলঙ্কার। বৈদিক 'অরম্' শব্দ হইতে 'অলম্' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঋ হইতে অর নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয়ার একবচনে অরম্ [অব্যয় (adv. Acc.)] 'অরম্' হইতে 'অলম্'=ঠিক, যথেষ্ট (fit, fitly, justly)। 'অলঙ্কার' শব্দ বেদে নাই বলিয়া তখন নরনারীর অঙ্গশোভারূপ অলঙ্কার অথবা কাব্যশোভারূপ অলঙ্কার ছিল না, একথা বলা যাইতে পারে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ভূষণ, আভরণ প্রভৃতি অলঙ্কার-পর্য্যায়ের কোন শব্দই বেদে নাই। বেদে অনেক অলঙ্কার বা গহনার নাম পাওয়া যায়। অলঙ্কারবাচক শব্দও বেদে নাই তাহাও নয়। ঋক্‌সংহিতায় দেখা যায় মরুদ্‌গণ অলঙ্কারের বিশেষ প্রিয় ছিল (১.৬৪ ; ৮.২০ ; ১০.৭৮)। তাহারা সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার পরিয়া শরীরের শোভা বর্দ্ধন করিত। রুদ্রকে ঋগ্বেদে উজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কারমণ্ডিত ও কণ্ঠহারশোভিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মরুদ্‌গণ ও অশ্বিদ্বয়েরও অনুরূপ বর্ণনা আছে। দেবপ্রতিদ্বন্দ্বী অসুরদেরও স্বর্ণ ও মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কার ছিল। ঋষি কক্ষিবান্ স্বর্ণকুণ্ডল ও রত্নহার-শোভিত পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারাদির কথা আছে।

---

৮ কটিতে কিঙ্কিণিধ্বনি শুনি মনোহর। ঘনরাম

৯ শঙ্খের উপর সাজে সোনার কঙ্কণ।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ
'হাতে বালা, পায়ে মল, কাঁকালেতে গোট।'—হেমচন্দ্র

১০ ভুজে বিরাজিত তাড় ভুবন উজর।—ঘনরাম

১১ নানা ছন্দে বাজুবন্দ হেম ঝাঁপাঝুরি। পরিয়া পাইল শোভা পরম সুন্দরী॥ শিবায়ন

১২ 'মাথায় ঝাপ্‌টা সিথী কটিতটে বেড়ি চন্দ্রহার।'—মাইকেল

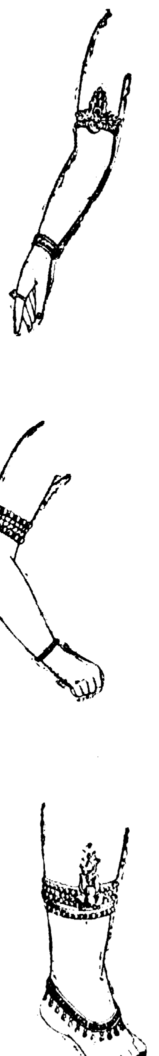
১৩ নাকেতে বেশর দিল মুক্তা সহকারে।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ
'বেশর খচিত—শতেশ্বরী পহিরল।'—ভূপতিনাথের পদ
'লবঙ্গবেসরে কাঙ্গো মুখ করে আলো।'—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী

* দুবাহুতে দিব্যশঙ্খ রজতের মলবঙ্ক স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ।—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি। 'দুবাহু শঙ্খেতে শোভিল বিলক্ষণ।'—কৃত্তিবাসী রামায়ণ

১৪ দুই পায়ে দিল তার রজত নূপুর।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ

১৫ পাতামল, পাশুলি আনট বিছা পায়। গুজরিপঞ্চম আর শোভা কিবা তায়।—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী

বৈদিক অলঙ্কার বুঝাইতে একটি সাধারণ শব্দের প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। সে শব্দটি 'অঞ্জ' বা 'অঞ্জি'। একটা উদাহরণ দেওয়া গেল—



উড়িষ্যা। কোণার্ক। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দী। কঙ্কণ, বলয়, বাজু, পাঁজোর ও পদভূষণ। মণিসংযোজিত দৃঢ়সম্বদ্ধ গহনার নিদর্শন।

চিত্রৈরঞ্জিভির্বপুষে ব্যঞ্জতে বক্ষঃসু রুক্মাঁ। অধি যেতিরে শুভে।
অংসেম্বেষাং নি মিমৃক্ষু ঋষ্টয়ঃ সাকং জজ্ঞিরে স্বধয়া দিবো নরঃ॥
—ঋক্ ১.৬৪.৪.

—"শোভার জন্য মরুদ্‌গণ নানাবিধ অলঙ্কারদ্বারা স্বশরীর অলঙ্কৃত করেন। শোভার নিমিত্ত বক্ষে সুন্দর হার ধারণ করেন; অংসদেশে আয়ুধ ধারণ করেন, নেতা মরুদ্‌গণ অন্তরীক্ষ হইতে স্বকীয় বলের সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।"

ম্যাকডোনেল ও কীথ তাঁহাদের 'বৈদিক সূচী'তে মাত্র একুশটি অলঙ্কারের নাম দিয়াছেন। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায়—

(ঋগ্বেদ)

১। আনূক। ২। ওপশ। ৩। কর্ণশোভন। ৪। কুরীর ৫। কৃশন। ৬। কৃশনিন্। ৭। খাদি। ৮। নিষ্ক। ৯। ন্যোচনা ১০। পুণ্ডরীক। ১১। পুষ্কর ১২। প্রভূষণ ১৩। বর্হন ১৪। ভূষণ ১৫। মণি। ১৬। মন্ত্র। ১৭। রুক্ম। ১৮। রুক্মি। ১৯। ললামী। ২০। বরিমৎ। ২১। ব্যঞ্জন। ২২। বিষন। ২৩। শতপত্র। ২৪। সিবন। ২৫। সুনিষ্ক। ২৬। স্তুকা। ২৭। হিরণ্যয়ী। ২৮। হিরণ্যশিপ্র। ২৯। হিরণ্যমৎ।

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় আরও কয়েকটি নূতন নাম—

৩০। পুণ্ডরিস্রজ্। ৩১। প্রাকাশ। ৩২। ভোগ। ৩৩। স্রজ্।

অথর্ববেদে আরও কয়েকটি নূতন নান—

৩৪। কুম্ব। ৩৫। জীবভোজন (অঞ্জন)। ৩৬। দেবাঞ্জন। ৩৭। নলদ। ৩৮। নিষ্কগ্রীব। ৩৯। নীনাহ (=কোমরপাটা) ৪০। প্রসাধন। ৪১। মধুলক। ৪২। রুক্মস্তরণ। ৪৩। ললাম। ৪৪। ললামগু। ৪৫। ললামী। ৪৬। সীমন্। ৪৭। সুরুক্ম। ৪৮। সুস্র। ৪৯। স্বন্দাঞ্জি। ৫০। হরিতস্রজ্। ৫১। হিরণ্যাজ ৫২। হিরণ্যস্রক্। ৫৩। হৈরণ্য।

এইগুলির কোন-কোনটির অর্থ সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন; যেমন গেল্‌ডনার (Geldner) বলেন, 'আনূক' শব্দের অর্থ 'ভূষণ'; কিন্তু রোট (Roth), লুড্‌ভিগ (Ludwig), ও ওলডেনবার্গ (Oldenburg) বলেন, ইহা ক্রিয়ার বিশেষণ। ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ 'ভূষণ' অর্থই স্বীকার করিয়াছেন। আমাদেরও তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

উপরিলিখিত শব্দগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখি যে, বৈদিক যুগে স্বর্ণালঙ্কার ও মণিমুক্তার অলঙ্কারের প্রচলন ছিল। তখন 'ওপশ' ছিল—কেশালঙ্কার। মাথার ভূষণ ছিল 'কুম্ব'। কর্ণশোভন তো ছিলই। সে যুগে রমণীরা মাথায় আরও একটা গহনা পরিত—তার নাম ছিল

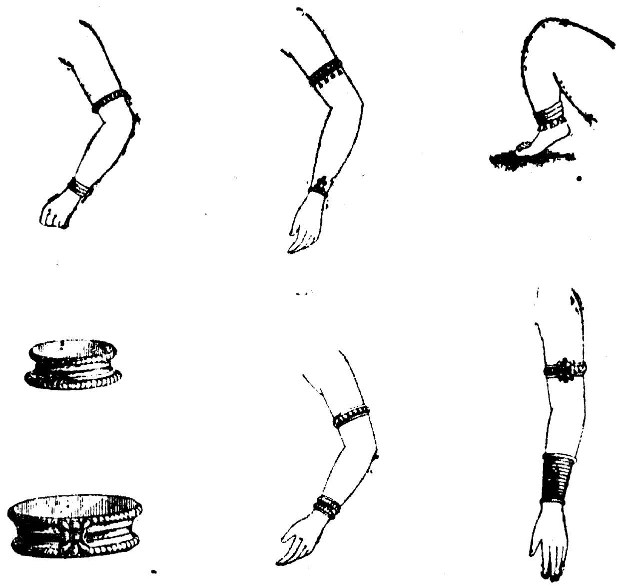
'করীর'। তাহারা পায়ে পরিত 'খাদি'। গলায় পরিত 'নিষ্ক'। এ ছাড়া 'প্রবর্ত্ত' নামে এক রকম গোলাকৃতি অলঙ্কার ছিল। তখনকার মেয়েরা মাথার সম্মুখের দিকে ঝালর-দেওয়া রত্নখচিত সীঁথি পরিত। এই সিঁথির :মাঝখানে চন্দ্রাকৃতি খচিত থাকিত। খোঁপার সঙ্গে ইহারই একাংশ লাগাইয়া দেওয়া হইত। এই সঁীথি চার রকমের, তাহাদের নাম—ললাম, ললামী, ললাম্য ও ললামগু। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে সুবর্ণনির্ম্মিত স্রকের কথা আছে। বৈদিক কালে সোনার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একরকম হার ছিল তাহার নাম 'রুক্ম'। ইহা বক্ষের শোভাসম্পাদন করিত। তারপর 'ফণ' 'প্রাকাশ,' 'মণি,' 'মনা,' 'শঙ্খ,' স্তুক—আরও কত রকমের ভূষণ ছিল।

অলঙ্কার শব্দ চারি বেদে নাই বটে, কিন্তু উল্লেখের অভাব অনস্তিত্বের কারণ হয় নাই। শতপথব্রাহ্মণে অলঙ্কার শব্দের প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায়—

"অঞ্জনাভ্যঞ্জনে প্রযচ্ছত্যেষ হ মানুষোঽলঙ্কারঃ"

—১৩.৮.৪.৭ ; ৩.৫.১.৩৬

তারপর উপনিষদ্‌-যুগে অলঙ্কার শব্দের প্রচার হয়। মৃত্যুর পর পরজীবনে বস্ত্রালঙ্কার ব্যবহারের জন্য শবের সহিত বস্ত্র ও অলঙ্কার দেওয়া হইত। অথর্ববেদে (১৮.৪.৩১) তাহার নিদর্শন আছে। উপনিষদেও তাহার নজির পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮.৮.৪) গহনা (ornament) অর্থে অলঙ্কার শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়—"প্রেতস্য শরীরং বসনেনালঙ্কারেণ সংস্কুর্বন্তি" ৮.৮.৫। এখানে প্রেতের শরীরকে বসন দিয়া অলঙ্কার দিয়া সংস্কার করা হইতেছে। ছান্দোগ্যে গহনারও নাম আছে—রাজা জানশ্রুতি রৈক ঋষিকে ছয় শত গরু, একটি নিষ্ক ও অশ্বতরী-যুক্ত রথ দান করিয়াছিলেন। এ নিষ্ক ছিল হার। "রৈক্কেমানি ষট্‌শতানি গবাময়ন্নিষ্কোঽশ্বতরীরথো। নুজজাতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতা মুপাস্স ইতি। তমুহপরঃ প্রত্যুবাচাহহারে ত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত"—৪র্থ অধ্যায়। বৈদিক যুগে 'স্বক্কা' নামে অত্যুজ্জ্বল হারের নাম কঠবল্লীতে (১.১৬) পাওয়া যায়। যম নচিকেতাকে



খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর উড়িষ্যার হস্ত ও পদের গহনা। স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণ-চাতুর্য্য ও চারু-পরিকল্পনার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন

একটি স্বক্কা দিয়াছিলেন।

"তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ স্বক্কাঞ্চেমা মনেকরূপাং গৃহাণ" (১.১৬)

গহনার নাম অলঙ্কার হইল কেন? প্রাচীন কালের ঋষিদের মধ্যে এক জন ইহা লইয়াও মাথা ঘামাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নারীকে যতকিছু দাও না কেন, তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না। তাহাকে ভাল কাপড়, ভাল খাবার, ভাল জিনিস, যাহাই দাও, সে 'না' বলিবে না—যেমনি তাহাকে গহনা দিবে অমনি সে খুশী হইয়া বলিবে 'আর না' 'অলম্' 'বেশ হইয়াছে'। এই অলং-করা হয় বলিয়া গহনার নাম হইয়াছে 'অলংকার'। অলঙ্কারের এটি একটি প্রাচীন সুরসিক শাব্দিকের সরস তাৎপর্য্য।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের পূর্ব্বে অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা কোথাও দেখা যায় না। পরবর্ত্তী কোষগ্রন্থে অলঙ্কারের নাম ও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রের ২১শ

অধ্যায়ে ভরত অলঙ্কার লইয়া অনেক কথাই বলিয়াছেন। তিনি অলঙ্কারকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অলঙ্কার আবেধ্য, বন্ধনীয়, ক্ষেপ্য ও আরোপ্য। কুণ্ডলাদি আবেধ্য; শ্রোণীসূত্র, অঙ্গদাদি বন্ধনীয়;



উৎকলের মস্তক ও কর্ণাভরণ

নূপুর, বস্ত্রাভরণ ক্ষেপ্য; স্বর্ণসূত্র ও নানাপ্রকার হার আরোপ্য।

চতুর্বিধন্তু বিজ্ঞেয়ং দেহস্থাভরণং বুধৈঃ।
আবেধ্যং বন্ধনীয়ঞ্চ ক্ষেপ্যমারোপ্যকন্তথা॥
আবেধ্যং কুণ্ডলাদীহ যৎস্যাচ্ছ্রবণভূষণম্।
শ্রোণীসূত্রাঙ্গদৈর্মুক্তা বন্ধনীয়া বিনির্দিশেৎ॥
প্রক্ষেপ্যং নূপুরং বিদ্যাদ্বস্ত্রাভরণমেব চ।
আরোপ্যং হেমসূত্রাণি হারাশ্চ বিবিধাশ্রয়াঃ॥

নাট্যশাস্ত্র—২১,১১-১৩

তারপর তিনি বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, চূড়ামণি আর মুকুট হইল শিরোভূষণ। কর্ণের অলঙ্কার—কুণ্ডল। মুক্তাবলী অর্থাৎ মুক্তাহার হর্ষক এবং সূত্র কণ্ঠভূষণ। অঙ্গুলির আভরণ হইল বটিকা ও অঙ্গুলিমুদ্রা। কেয়ূর ও অঙ্গদ—কূর্পরের ভূষণ। ত্রিসর ও হার গ্রীবা ও স্তনমণ্ডলের ভূষণ; তরল ও সূত্রক এই দুইটি কটিভূষণ ছিল। তখন দেহভূষণ বলিলে বুঝাইত মুক্তাহার ও মালা। এগুলি সাধারণতঃ বেশ বিলম্বিত হইত। এই সমস্ত অলঙ্কার পুরুষরা পরিত।

চূড়ামণিঃ সমুকুটঃ শিরসো ভূষণং স্মৃতম্।
কুণ্ডলং কর্ণমেবৈকং কলাকরণমিষ্যতে॥
মুক্তাবলী হর্ষকঞ্চ সসূত্রং কণ্ঠভূষণম্।
বটিকাঙ্গুলিমুদ্রা চ স্যাদঙ্গুলিবিভূষণম্॥
ত্রিসরশ্চৈব হারশ্চ গ্রীবাবক্ষোজভূষণম্।
তরলং সূত্রকঞ্চৈব ভবেৎ কটিবিভূষণম্॥
অয়ং পুরুষনির্যোগঃ কার্য্যস্ত্বাভরণাশ্রয়ঃ।
ব্যালম্বিমুক্তিকা হারা মালাদ্যা দেহভূষণম্॥ ২১,১৫-১৯

তারপর দেবতাদের ও মর্ত্ত্যবাসিনী রমণীদের অলঙ্কারের কথা ভরত মুনি বর্ণনা করিয়াছেন। সেই অলঙ্কারগুলির নাম ভরতনাট্যশাস্ত্রে (২১।১৯-২১) এইরূপ—

শিখাপাশ। কুণ্ডল। শিখাজাল। খড্গপত্র। খণ্ডপত্র; বেণীগুচ্ছ। চূড়ামণি। দারক। মকরিকা। ললাটতিলক। মুক্তাজাল। গুচ্ছ (ভ্রূ এবং কক্ষের উপরিভাগে ধারণ করা হইত)। গবাক্ষি। কুসুম (নানা রকম ফুলের অনুকরণে স্বর্ণাভরণ)।

এ ছাড়া, কানের গহনার নাম (২১।২২-২৪)—কর্ণিকা, কর্ণবলয়, পত্রকর্ণিকা, আপেশ্রক, কর্ণমুদ্রা, কর্ণোৎপল, নানারত্নখচিত দন্তপত্র। গণ্ডস্থলেরও গহনার নাম—তিলক ও পত্রলেখা। যাস্কের নিরুক্তে এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে শুধু অলঙ্কারের উল্লেখ আছে তাহা নহে, বিভিন্ন প্রকার নানা অলঙ্কারের নাম ও বর্ণনা আছে। একটা উদাহরণ দিতেছি—পাণিনি ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। এক জায়গায় (৪.৩.৬৬) দুইটি ভূষণের নাম করিয়াছেন। কর্ণে থাকে বলিয়া একটি গহনার নাম 'কর্ণিকা', ললাটে থাকে বলিয়া আর একটি অলঙ্কারের নাম 'ললাটিকা'। তাঁহার সূত্র হইল—"কর্ণললাটাৎকনলঙ্কারে"। ইহার বৃত্তি এই—"কর্ণললাট-শব্দাভ্যাং কন্ প্রত্যয়ো ভবতি তত্র ভব ইত্যেতস্মিন্ বিষয়েঽলঙ্কারেঽভিধেয়ে।" 'বৎ' প্রত্যয় (৪.৩.৫৫) না হইয়া সেইখানে আছে এই অর্থে 'কন্' প্রত্যয় হইবে।

রামায়ণে (সুন্দর ২.৬) লিখিত আছে, লঙ্কাপুরযোষিদ্-গণের কর্ণে বজ্র অর্থাৎ হীরকখচিত বৈদূর্য্যমণিখচিত কুণ্ডল ছিল। মহাভারতেও (বন প.-৫৭) মণিকুণ্ডলের উল্লেখ আছে। ভাগবতেও (১০.২৯.৪) গোপাঙ্গনাদের কৃষ্ণাভিসার বর্ণনায় তাঁহাদের বলা হইয়াছে—আজগ্মুরন্যোন্য-মলক্ষিতোদ্যমাঃ সবত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলা। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের একটি স্ত্রীমূর্ত্তির কর্ণে 'তালপত্র' নামক কর্ণাভরণের নিদর্শন আছে। অমরকোষের বর্ণনার সহিত ইহার মিল আছে। ভুবনেশ্বরের (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *Indo-Aryans*) ৬৪ সংখ্যক চিত্রের কর্ণাভরণ বাঙ্গালা দেশের ঝুমকার অনুরূপ। ৬৫ সংখ্যক মূর্ত্তি—অনিকর্ণিকা। ৬৬ নং চিত্র পুরীর কাষ্ঠশিল্প হইতে গৃহীত। এই মূর্ত্তির অনুরূপ কর্ণাভরণ বাঙ্গালা দেশের 'চেড়ী' নামে পরিচিত। ৬৩, ৬৪, ৬৫ নং চিত্রের

কর্ণাভরণগুলি সুবর্ণনির্ম্মিত ও তাহাতে মণি-মুক্তা সূক্ষ্মভাবে খচিত ছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন কালে বহুপ্রকার অলঙ্কারের প্রচলন ছিল। বহুবিধ কণ্ঠহারের মধ্যে শীর্ষক, উপশীর্ষক, প্রকাণ্ডক, অববাটক ও তরলপ্রতিবন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার মুক্তাহারের উল্লেখ বহু গ্রন্থে পাওয়া যায়। সমান আকৃতির মুক্তামালায় হার রচনা করিয়া কেন্দ্রস্থলে একটি বড় মুক্তা দিয়া 'শীর্ষক' প্রস্তুত হইত। এইরূপ হারের কেন্দ্রস্থলে পাঁচটি বড় বড় মুক্তা থাকিলে তাহাকে উপশীর্ষক বলিত। 'প্রকাণ্ডকে' ক্রমহ্রাসমান মুক্তামালায় রচিত হারের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় মুক্তা থাকে। অবঘাটক সমান অবয়বের মুক্তামালায় রচিত হইত। মুক্তাহারের কেন্দ্রস্থলে একটি উজ্জ্বল মুক্তা দিয়া যে হার রচিত হইত তাহার নাম—তরলপ্রতিবন্ধ। এক হাজার আট লহরে 'ইন্দ্রচ্ছন্দ,' ইহার অর্দ্ধেক লহরে 'বিজয়চ্ছন্দ' এবং চৌষট্টি লহরে 'অর্দ্ধহার' নামক মুক্তাহার রচিত হইত। এতদ্ভিন্ন চুয়ান্ন গাছি মুক্তা-মালার লহরে 'রশ্মিকলাপ,' বত্রিশ লহরে 'গুচ্ছ', সাতাশ লহরে 'নক্ষত্রমাল,' চব্বিশ লহরে 'অর্দ্ধগুচ্ছ', বিশ লহরে 'মানবক' এবং দশ লহরে 'অর্দ্ধমানবক' হার রচিত হইত। উপরোক্ত হারগুলির ঠিক মধ্যভাগে একটি বড় মুক্তা বসাইয়া দিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইত; এইরূপ হার 'বিজয়চ্ছন্দ-মানবক' 'অর্দ্ধহার-মানবক' ও 'রশ্মিকলাপ-মানবক' প্রভৃতি আখ্যা পাইত।

অনেক গাছি মুক্তামালার লহরের হারগুলি আবার শীর্ষক, উপশীর্ষক, প্রকাণ্ডক, অবঘাটক এবং তরলপ্রতিবন্ধ প্রভৃতির আদর্শেও প্রস্তুত হইত। উপরোক্ত আদর্শে রচিত হারগুলিকে 'শুদ্ধহার' বলিত; এইরূপ 'ইন্দ্রচ্ছন্দ-শীর্ষক' 'ইন্দ্রচ্ছন্দ-উপশীর্ষক' প্রভৃতি হার ছিল।

মুক্তামালায় রচিত অন্য প্রকার হারের নাম ফলকহার; এই সকল হারের মধ্যভাগে তিনটি, পাঁচটি করিয়া চ্যাপ্টা মুক্তা বসান থাকিত; এইরূপ তিনটি চ্যাপ্টা মুক্তাখচিত হারকে 'ত্রিফলক' এবং পাঁচটি মুক্তাখচিত হারকে 'পঞ্চফলক' বলিত। একগাছি লহরে রচিত মুক্তাহারকে 'একাবলি' এবং 'একাবলি'র মধ্যভাগে একটি 'মণি' বসান থাকিলে তাহাকে 'যষ্টি' বলিত। এইরূপে হারের মধ্যে মধ্যে স্বর্ণমালা থাকিলে তাহাকে 'রত্নাবলী' বলিত।

পর পর এক গাছি করিয়া মুক্তাহার এবং সমান অবয়বের স্বর্ণহারে রচিত হারকে 'অপবর্ত্তক' হার বলা হইত। দুই-গাছি মুক্তাহারের মধ্যে একগাছি স্বর্ণলহর দিয়া 'সোপানক' প্রস্তুত হইত; এইরূপ হারের মধ্যভাগে একটি 'মণি' খচিত থাকিলে তাহাকে 'মণি-সোপানক' বলা হইত। স্বর্ণখচিত অপবর্ত্তক, সোপানক, মণি-সোপানক, যষ্টি, একাবলি প্রভৃতি প্রাচীনকালে শিরোহার, কঙ্কণ, বলয় ও ঘুন্টিকা প্রভৃতি মুক্তাখচিত অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায়।

অর্থশাস্ত্রে স্বর্ণকারদের কথাও আছে। সদর রাস্তার কেন্দ্রস্থলে স্বর্ণকারের দোকান থাকিত; উচ্চবংশের সচ্চরিত্র নিপুণ কারিগর ভিন্ন অন্য কেহ দোকান খুলিতে পারিত না। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার বিভাগ বা ব্যবসায় যাহাতে সততার সহিত চালিত হয়, সেই জন্য রাষ্ট্রের এক জন তত্ত্বাবধায়ক থাকিতেন; তাঁহার অধীনে 'অক্ষশালা' থাকিত। এই অক্ষশালায় স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতুর কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হইত এবং স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হইত। স্বর্ণকারগণ স্বর্ণের গুণনির্ণয়ে এবং ধাতুদ্রব্যাদি সম্বন্ধে রসায়ন-বিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অক্ষশালায় চারিখানি কক্ষ এবং মাত্র একটি দ্বার থাকিত; অক্ষশালায় স্বর্ণকারগণ এবং যাহাদের সেখানে কাজ রহিয়াছে তাহারা ভিন্ন কেহই প্রবেশ করিতে পারিত না; ইহার নিয়মাবলী অত্যন্ত কঠোর ছিল। স্বর্ণকারগণ বিশুদ্ধ স্বর্ণের কাঞ্চন, পৃষিত (শূন্যগর্ভ), তষ্ট্রী বা মণিখচিত স্বর্ণ এবং তপনীয় প্রভৃতি বিবিধ স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতে নিযুক্ত থাকিত। অক্ষশালায় যে স্থানে বসিয়া স্বর্ণকারগণ কার্য্য করে, তাহাদের কোন কার্য্য যে-পর্য্যন্ত সমাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত সেইস্থানে অসমাপ্ত দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি থাকিত। তাহারা কার্য্যের জন্য যে স্বর্ণ গ্রহণ করিত, দৈনিক কার্য্য সমাপন করিয়া তাহার হিসাব তাহাদের বুঝাইয়া দিতে হইত। যে-সকল অলঙ্কার সমাপ্ত হইত তাহা কারিগর ও তত্ত্বাবধায়কের শীলমোহরে বন্ধ করিয়া রাখা হইত।

ক্ষেপণ, গুণ এবং ক্ষুদ্র—এই তিন প্রকার অলঙ্কারের কাজ ছিল। কাচের দানায় স্বর্ণখচিত-করণের কাজকে

ক্ষেপণ বলা হয়। স্বর্ণের লহরকে গুণ বলিত। এতদ্ভিন্ন নিরেট অথবা শূন্যগর্ভ বিবিধ মালা তৈয়ারী হইত, তাহাকে 'ক্ষুদ্র' বলা হইত।

স্বর্ণকারগণকে স্বর্ণ দিলে সেই পরিমাণ রাজমুদ্রাও প্রস্তুত করিয়া দিতেন; সাধারণ লোকও এইরূপ স্বর্ণবিনিময়ে স্বর্ণকারগণের নিকট হইতে মুদ্রা গ্রহণ করিতে পারিতেন। স্বর্ণকারগণ এইজন্য রাষ্ট্রের অধীনে বিশেষ তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইতেন।

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে এক জন মণিকারের বিপণি-বর্ণনায় আমরা মুক্তা, হীরক, মণিমাণিক্য, পদ্মরাগমণি, প্রবাল, গোমেধ, বৈদুর্য্যমণি প্রভৃতির এবং স্বর্ণে খচিত বিবিধ মণি-মুক্তার কারুকার্য্যের উল্লেখ পাই। বিভিন্ন অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্যবিচারে ইহার উপাদান, দেশ কাল ও পাত্রভেদে ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি ও সংস্কৃতির কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হয়; শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে শিল্পের উপাদান বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট; যে দ্রব্য বা পদার্থ হইতে যে অলঙ্কার প্রস্তুত হয়, তাহার সঙ্গে সেই অলঙ্কারের মৌলিক যোগ রহিয়াছে। কর্দ্দম অথবা পাথরে যে কারুকার্য্য করা হয়, তাহার সঙ্গে নিশ্চয়ই সূতার কারু-কার্য্যের পার্থক্য রহিয়াছে। প্রত্যেক কারুকার্য্যেই একটি ছন্দ ও একটি সুর রক্ষিত হয়; তাহা দেখিলেই শিল্পীর রুচি ও সংস্কৃতির আভাস পাওয়া যায়।

কাব্যেও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি। পুরুষরাও নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করিত। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। মেঘদূতের যক্ষ "কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ"—প্রকোষ্ঠ হইতে তাহার কনকবলয় ভ্রষ্ট হইয়াছে। আবার ভাল কাজ করিলে তাহার পুরস্কারের জন্য এগুলি দানও করা হইত। চারুদত্ত কর্ণপূরককে পুরস্কার দিতে উদ্যত হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহার ধন ছিল, তখন গহনা পরিতেন। এখন অদৃষ্টের পরিহাসে তিনি নিঃস্ব,—কিন্তু তাঁহার মনে নাই—তাঁহার অঙ্গে ভূষণ নাই; পূর্ব্ব অভ্যাস-বশতঃ শীঘ্র অলঙ্কার খুলিয়া দিতে গেলেন। কিন্তু অঙ্গের যেখানে যেখানে অলঙ্কার ধারণ করা হয়, সেই সেই স্থানে হাত দিয়া দেখিলেন—আভরণ নাই। তখন নিরুপায় হইয়া দীর্ঘনিশ্বাসসহ উত্তরীয় নিক্ষেপ করিলেন।

মুদ্রারাক্ষসে দেখা যায়, রাক্ষস অলঙ্কার পরিয়া মলয়কেতুর নিকট যাইতেছেন। পর্ব্বতকও এই অলঙ্কারগুলি পরিতেন। রাক্ষস নিবেদন করিতেছেন—"উচ্যতাং শকটদাসঃ। যথা পরিধাপিতা কুমারেণাভরণানি বয়ম্। তন্নযুক্তমনলঙ্কৃতৈঃ কুমারদর্শনমনুভবিতুম্। অতো যত্তদলঙ্করণত্রয়ং ক্রীতং তন্মধ্যাদেকং দীয়তাম্।"—শকটদাসকে বল, কুমার আমার অলঙ্কার পরিয়াছেন; অলঙ্কার না পরিয়া কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করা অনুচিত। সুতরাং যে তিনটি অলঙ্কার কেনা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একটি যেন পাঠাইয়া দেন। "রসাকর" একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মল্লিনাথ মেঘদূতের টীকায় এই গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। মল্লিনাথকৃত একটি বচন এই—

> কচধার্য্যং দেহধার্য্যং পরিধেয়ং বিলেপনম্।
> চতুর্ধা ভূষণং প্রাহুঃ স্ত্রীণামন্যচ্চ দেশিকম্॥
>
> —উত্তরমেঘ, ১৩ শ্লোকের টীকা

এই গ্রন্থের মতে রমণীদিগের অলঙ্কার চতুর্বিধ (১) 'কচধার্য্য,' অর্থাৎ যাহা মস্তকে ধারণ করা হয়, (২) 'দেহধার্য্য'—অঙ্গশোভা অলঙ্কার, (৩) 'পরিধেয়'—বস্ত্রাদি, (৪) 'বিলেপন'—চন্দন, কস্তুরী প্রভৃতি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার 'দেশিক' নামে অভিহিত।

সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় তখন নূপুর, বলয়, কাঞ্চী, হার ও কুণ্ডলের খুবই প্রচলন ছিল।

রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী'তে পাই—

> মরগ অমঞ্জীরজুঅং চরণে সে লম্ভিআ বঅস্সাহিং।
> ভীএ নিঅম্বফলএ ণিবেসি আ পঙ্করাঅ মণিকঞ্চী।
> দিণ্ণা বলআ বলিও করকমল পট্টাল জুঅলম্মি।"

—বয়স্যরা চরণে নূপুর পরাইয়া দিল। নিতম্বফলকে পদ্মরাগমণির কাঞ্চী নিবেসিত হইল। করকমলে বলয়, কণ্ঠে মুক্তাহার দেওয়া হইল, আর কর্ণে কুণ্ডলযুগল স্থাপিত হইল।

কর্পূরমঞ্জরীর অন্যস্থানেও পাওয়া যায়—সুন্দরীর হিন্দোল-লীলার আন্দোলনের সহিত তাহার মণিনূপুর রণিত হইতেছে, হার ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতেছে, মেখলার কিঙ্কিণী কণিত হইতেছে, চঞ্চল বলয়ের মধুর নিনাদ শ্রুত হইতেছে।

তখনকার দিনে সুচতুর স্বর্ণকারদের দক্ষতাও লক্ষণীয়। মৃচ্ছকটিকের চতুর্থ অঙ্কে ইহার বেশ আভাস পাওয়া যায়। শিল্পিগণ বৈদূর্য্য, মৌক্তিক, প্রবাল, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল,

কর্কেতরক, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতির রত্ন বাছাই করিতেছে। স্বর্ণ দিয়া মাণিক্য বসাইতেছে। সোনার গহনা তৈরি করিতেছে। লাল রঙের সূত্র দিয়া মুক্তাভরণগুলি গাঁথিতেছে। বৈদূর্য্যমণি ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিতেছে। শঙ্খ কর্ত্তন করিতেছে—শানে প্রবাল ঘর্ষণ করিতেছে।

প্রাচীন কালে কণ্ঠাভরণ দুই রকমের ছিল। যাহা কণ্ঠে সংলগ্ন থাকিত তাহার সাধারণ নাম ছিল 'গ্রৈবেয়ক'। হৃদয়দেশে কথঞ্চিৎ বিলম্বিত হইলে তাহার নাম হইত 'ললন্তিকা'। ললন্তিকা সোনার হইলে তাহাকে 'প্রালম্বিকা' বলিত—আর মুক্তার হইলে 'উরঃসূত্রিকা' নামে অভিহিত হইত।

সুশ্রুত (সূত্রস্থান ১৬ অধ্যায়) বলিয়াছেন—

রক্ষা-ভূষণনিমিত্তং বালস্য কর্ণৌ বিধ্যতে।

বাণ তাঁহার হর্ষচরিতে 'ত্রিকণ্টক' নামক কর্ণাভরণের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

কদম্বমুকুলস্থূলমুক্তাফলযুগলমধ্যাধ্যাসিত মরকতস্য ত্রিকণ্টককর্ণাভরণস্য প্রেঙ্খত্তঃ প্রভয়া"

শিশুপালবধে কৃষ্ণের কুণ্ডলে গারুত্মত-মণির কথায় পাই—

"তস্যোল্লসৎ কাঞ্চনকুণ্ডলাগ্র-প্রত্যুপ্তগারুত্মতরত্নভাসা"—২।৩৩

তারপর শিল্পশাস্ত্রে ও কোষগ্রন্থে অলঙ্কারের বেশ একটি পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। নিঘণ্টু ও যাস্কের নিরুক্ত ও পাণিনির পরে অমরাদির কোষগ্রন্থে অলঙ্কারের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মিশ্রকল্প—পত্র, রত্ন ও অন্যান্যের সংমিশ্রণে তৈরি। এইগুলি দেবতা ও রাজাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি।

সাধারণ অলঙ্কারের নাম—

পাদনূপুর, কিরীট, মল্লিকা, কুণ্ডল, বলয়, মেখলা, হার, কঙ্কণ, শিরোভূষণ, কর্ণভূষণ, কেয়ূর, কর্ণ, চূড়ামণি, বালপট্ট, নক্ষত্রমালা (২৭টি মুক্তা দেওয়া), অর্দ্ধহার (৬৪ লহরযুক্ত), সুবর্ণসূত্র (হৃদয়শোভা), রত্নমালিকা, চির (চারকেরা নেকলেস), সুবর্ণকঞ্চুক, হিরণ্যমালিকা (সোনার চেন), লম্বহার, পাদজাল, মকরভূষণ, মিশ্রিত ও রত্নকল্প, (রাজা ও দেবতা ব্যবহার্য্য), রত্নপুষ্প, রুদ্রবন্ধ, লম্বপত্র, বলয়।

ময়মত প্রভৃতি শিল্পশাস্ত্রে অলঙ্কারের যথেষ্ট পরিচয় আছে। মানসারেও অনেক কথা আছে। মানসার বলে—শরীরের সাধারণ অলঙ্কারের নাম 'অঙ্গভূষণ'—গৃহের আসবাব 'বহির্ভূষণ'। মানসার-মতে অলঙ্কার চতুর্বিধ—পত্রকল্প, চিত্রকল্প, রত্নকল্প ও মিশ্রিত বা মিশ্রকল্প। এগুলি দেবতার উপযোগী। তবে চক্রবর্ত্তী রাজা পত্রকল্প ব্যতীত আর তিনটি ব্যবহার করিতে পারেন। অধিরাজ ও নরেন্দ্র নামক রাজা রত্নকল্প ও মিশ্রিত পরিতে পারেন। অন্যান্য রাজাদের ভূষণ মিশ্রকল্প। লতা ও পত্র হইতে তৈরি বলিয়া নাম হইয়াছে 'পত্রকল্প'। পুষ্প, পত্র, অঙ্কন, বহুমূল্য প্রস্তর ও অন্যান্য অলঙ্কারের নাম চিত্রকল্প। রত্নকল্প—পুষ্প ও রত্ন (jewellery) দিয়া তৈরি।

মনুতে স্বর্ণ-শিল্প একটি বিশিষ্ট জাতির ব্যবসা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; স্বর্ণকারগণ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতেন; মনু স্বর্ণ-ব্যবসায়ে কৃত্রিমতার জন্য কঠোর শাস্তিরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। অমরসিংহের অভিধানে মুকুট, কিরীট প্রভৃতি বিবিধ শিরোভূষণ, অঙ্গুরীয়ক, বিবিধ কর্ণ-কুণ্ডল, কর্ণপুষ্প, শতনরী প্রভৃতি বিভিন্ন হার, অনন্ত, বলয়, কঙ্কণ, মেখলা, বেষ্টনী, হস্ত ও পদের বিভিন্ন প্রকার কঙ্কণ, নূপুর ও বলয় প্রভৃতির উল্লেখ ও বর্ণনা রহিয়াছে।

প্রাচীন যুগের অলঙ্কারাদির অধিকাংশই বর্ত্তমান কালে প্রচলন না থাকিলেও ভুবনেশ্বর-মন্দির, সাঁচী ও অমরাবতীর খোদিত মূর্ত্তি হইতে আমরা হস্ত, পদ, কোমর, কণ্ঠ এবং মস্তক প্রভৃতির বিবিধ অলঙ্কারের নিদর্শন পাই।

সাঁচী এবং অমরাবতীতে আমরা বলয়, কঙ্কণ প্রভৃতি যে-সকল অলঙ্কারের নিদর্শন পাই সেগুলি তত উন্নত পদ্ধতির নহে; অবশ্য সাঁচী অপেক্ষা অমরাবতীর কারুকলা একটু উন্নত পদ্ধতির। ভুবনেশ্বরের কারুকলা বিশেষ উন্নত ও পরিস্ফুট।

মুকুট, কিরীট, চূড়া প্রভৃতির কারুকার্য্য বিশেষ সূক্ষ্ম ছিল। যাজপুরের দেবমন্দিরে 'ইন্দ্রাণীর' মুকুটের কারুকার্য্য অতুলনীয়। ইহা দেখিতে ইরাণীয় টুপির (cap) মত, কিন্তু অতি সুন্দরভাবে রত্নখচিত।

মণিমুক্তাখচিত কারুকার্য্যময় নাকছবি ও নাসাঙ্গুরীক প্রভৃতি নাসিকার অলঙ্কারের প্রচলন এখনও বঙ্গদেশে এবং ভারতের সকল প্রদেশেই রহিয়াছে। এক জন অন্ধ্র-মহিলার বর্ণনায় তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত নাসাঙ্গুরীর সঙ্গে দোলায়মান মুক্তা দুলিতেছে—এইরূপ বর্ণনা সাহিত্য-

তিলকে রহিয়াছে। প্রাচীন ভাস্কর্য্য বা স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

ভুবনেশ্বরের প্রাচীরগাত্রে খোদিত যে-সকল বড় বড় প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে, সেই সকল মূর্ত্তিতে বিবিধ সুন্দর হারের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই হারগুলি দেখিলে বোধ হয় মণিমুক্তাখচিত বিভিন্ন আদর্শের হারের প্রচলন ছিল।

হাতে বালা-পরা বাঙ্গালী মেয়েদের বিশেষ আদরের; বিশেষতঃ স্বামী বর্ত্তমানে ইংরেজ মহিলারা বিবাহের চিহ্নস্বরূপ বিবাহ-অঙ্গুরীয়ককে যেরূপ সম্মান দেয়, বাঙ্গালী মেয়েরা তদপেক্ষা অধিক সম্মান লৌহযুক্ত স্বর্ণবলয়কে দিয়া থাকে। উৎকলে বালার পরিবর্ত্তে খাড়ু ব্যবহৃত হয়, খাড়ু একটু বড় ও উঁচু। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে (*Indo-Aryans*, Vol. I, pp. 234, 235) ৭০ নং চিত্রে অন্য প্রকার খাড়ুর নমুনা আছে। ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪ নং চিত্রে বিভিন্ন প্রকার বালার নিদর্শন আছে। ৭৪ নং চিত্রের অনুরূপ বালা বঙ্গদেশে পটুরী নামে পরিচিত। ৭৫, ৭৬ নং চিত্রে সুপরিচিত শাঁখার চিত্র আছে, ইহা শাঁখ কাটিয়া প্রস্তুত হয়।

বর্ত্তমানে লোকের রুচির পরিবর্ত্তন হওয়ায় চুড়ি প্রভৃতির প্রচলন হইয়াছে। বাজু, তাবিজ, তাড় প্রভৃতি হস্তাভরণের পরিবর্ত্তে বাঙালী মেয়ে অন্য অলঙ্কার অথবা সাদাসিধা অলঙ্কার ধরিয়াছে। কিন্তু উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশে বাজু, তাবিজ, তাড়, পেটা চুড়ী প্রভৃতি রৌপ্য ও স্বর্ণাভরণ এখনও প্রচলিত। ভগবতী ও কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তিতে বাজু ও বলয়ের অতি উচ্চাঙ্গের নিদর্শন রহিয়াছে।

গ্রীকেরা মেখলা পরিতে ভালবাসিতেন। ইহা শুধু অলঙ্কার ছিল না, কটিবন্ধের কাজও ইহা করিত। ভারতে শুধু সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য ইহা সজ্জাভরণ রূপে ব্যবহৃত হইত, শুধু স্ত্রীলোকেরা নহে বয়স্ক পুরুষেরাও মেখলা পরিধান করিত। ইহা শুধু একটি নরীতে সীমাবদ্ধ ছিল না, অনেকগুলি নরীতে ইহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইত। চন্দ্রহার-মেখলা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শীতপ্রধান দেশে পায়ের কোনরূপ অলঙ্কার পরা কঠিন, কারণ গরম মোজা বা জুতা প্রভৃতি দ্বারা পদদ্বয় সব সময়েই ঢাকিয়া রাখিতে হয়; কিন্তু ভারতের অবস্থা ভিন্ন রূপ। প্রাচীন কালে পায়ের বহু প্রকার অলঙ্কার প্রচলিত ছিল; কিঙ্কিণী পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা উভয়েই পরিত। পাঁজর, নূপুর, গুজরি প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার এখনও প্রচলিত। নূপুরের ঝুমুঝুমু এবং কিঙ্কিণীর রিণিঝিনি শব্দ এখনও শুনিতে পাওয়া যায়।

উড়িষ্যায় প্রচলিত কন্ধমালা অন্যরূপ পদাভরণ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে (*Indo-Aryans,*) ৮৪, ৮৫ এবং ৭৮ নং চিত্রের পদাভরণ শুধু উড়িষ্যা এবং তেলেঙ্গী দেশে সীমাবদ্ধ ছিল। পাঁজর মুসলমান মহিলারা এখনও পরিয়া থাকেন। ৭৮, ৭৯ এবং ৮০ নং চিত্রে ভিন্ন ভিন্ন কিঙ্কিণীর ছবি আছে। ৮১, ৮২ এবং ৮৩ নং চিত্রে ঘুণ্টিকার (ঘুঙ্গুরের) চিত্র আছে।

অতি প্রাচীন যুগের নির্ম্মিত কোন অলঙ্কার পাওয়া যায় নাই; শুধু ভাস্কর্য্য চিত্রাদি হইতে আমরা মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারের পরিচয় পাই। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের বহু পূর্ব্ব হইতেই করমণ্ডল উপকূলে মুক্তা সমুদ্র হইতে আহরিত হইত তাহার প্রমাণ আমরা পাই। মনুতে মূল্যবান্ রত্ন ও প্রস্তরাদির উল্লেখ এবং ইহার ব্যবসায়ের কঠোর বিধান রহিয়াছে। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে মণিমুক্তাদি স্বর্ণডোরে গ্রথিত করার কথা পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টের জন্মের অন্ততঃ ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। মণি ও রত্নাদিকে 'কাচ' বলা হইয়াছে; কাচ বলিতে পদ্মরাগমণি, হীরক প্রভৃতিকেই বুঝাইত।

বিভিন্ন যুগের কারু-শিল্প অথবা অলঙ্কার পরীক্ষা করিয়া তাহার বিভিন্ন ধারা ও সংস্কৃতির ক্রমপরিণতি অতি সহজেই ধরা যায়।

কোন কোন আদর্শ অন্ধভাবে অনুকরণ করা হইয়া থাকে, এবং শত শত বৎসরেও তাহার পরিণতি হয় নাই। পুরাতন হইতে নূতনে যে পরিণতি, তাহাতে সূক্ষ্মভাবে পুরাতনের আভাস পাওয়া যায়। পরিণতির একটি উচ্চ আদর্শ লাভ করিয়া অনেক সময়ে শিল্পের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, শিল্পী তখন পুরাতনে ফিরিয়া যায়; এইরূপে অনেক দেশে প্রাচীন শিল্পের পুনরুদ্ভব হইয়াছে।*

* এই প্রবন্ধ-সঙ্কলনে নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্য গ্রন্থকারগণের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

১। P. K. Acharya—Dictionary of Indian Architecture.

২। Coomaraswamy—History of Indian and Indonasian Art.

৩। R. L. Mitra—Antiquities of Orissa এবং Indo-Aryans.

৪। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ—প্রাচীন শিল্পপরিচয়।

৫। Ruth Bunzel—Social Sciences.

৬। Westermarck—The History of Human Marriage.

৭। R. Karsten—The Civilization of the South-American Indians.

৮। Frazer—Totemism and Exogamy.

৯। Haddon—Evolution in Art.

১০। Holmes—Origin and Development of Form and Ornament.

১১। F. Boas—Primitive Art.

আলোচনা

শ্রীযুক্ত "প্রবাসী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মান্যবরেষু—আপনি যে আশ্বিনের প্রবাসীতে "জমশেদপুরে বাঙ্গালী" শীর্ষক প্রসঙ্গে বাঙ্গালীদের উপর অযথা আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বাংশে আপনার উপযুক্ত হইয়াছে। এ-বিষয়ে আপনাকে কিছু তথ্য জানাইতেছি।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে মিঃ এ. আর. দালাল, এম-এ, আই-সি-এস (অবসরপ্রাপ্ত) এর "Contribution of Tatas to Bengal" শীর্ষক একটি লেখা দৈনিক সংবাদ-পত্রে (খুব সম্ভবতঃ অমৃতবাজারে) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে বাঙালী ও বঙ্গদেশ টাটা কোম্পানী হইতে কি উপকার পায় দালাল-মহাশয় তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। দালাল-মহাশয় টাটা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর; সুতরাং তাঁহার তথ্যসমূহ যে সম্পূর্ণ নির্ভুল, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনিও ইহা দেখাইতে পারেন নাই যে, জমশেদপুরের অধিকাংশ পদ বাঙ্গালার অধিকারে। পরন্তু তাঁহার প্রবন্ধ হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ভারতের অনেক প্রদেশের তুলনায় জমশেদপুরে বাঙালীর সংখ্যা কম। প্রবন্ধটি দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলেও ইতিমধ্যে টাটা কোম্পানীতে খুব বেশী পরিবর্ত্তন (বিশেষতঃ চাকুরীর বিষয়ে) হওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং প্রবন্ধে বর্ণিত অবস্থা বর্ত্তমান সময়েও প্রযোজ্য। দালাল-মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে কোন্ প্রদেশের কত লোক জমশেদপুরে টাটা কোম্পানীতে কাজ করিত তাহার তালিকা দিয়াছেন:—

বিহার ৩৩৫২, যুক্তপ্রদেশ ২৭৪৫, মধ্যপ্রদেশ ২৬৫০, পঞ্জাব ২৫৪৯, বাংলা ২৪৯৭, মান্দ্রাজ ১৭৩০, উড়িষ্যা ১৬২৬, বোম্বাই ৬১০, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ৩২০, আসাম ২৩৬, বিদেশী ৯৮।

ইহারা মাসের শেষে মাহিনা পায়। ইহা ব্যতীত সপ্তাহের শেষে মাহিনা পায় এরূপ লোকের সংখ্যা:—আদিম অধিবাসী ২৫০০, ছত্রিশগড়িয়া ২৪৪১, উড়িয়া ও তেলেগু ভাষী ৩০০।

এই স্থানে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই তিন শ্রেণীর লোকেরা প্রায় সবাই বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের অধিবাসী।

দালাল-মহাশয় হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রথম শ্রেণীর (অর্থাৎ যাহারা মাসিক বেতন পায়) চাকুরেদের মধ্যে শতকরা মোটে ১৩ জন বাঙালী, অর্থাৎ ১/৮ অংশ অপেক্ষা কিছু বেশী। দ্বিতীয় শ্রেণী (অর্থাৎ যাহারা সাপ্তাহিক বেতন পায়) তাহাদের সহিত মিলাইয়া হিসাব করিলে বাঙালীর অনুপাত আরও কম হইবে। ইহাই কি বাঙালীর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন?

কোম্পানীর মূলধন (subscribed capital) ১০,৪৫,৬৮,০০০ টাকা। ইহাতে কোন্ প্রদেশের কিরূপ অংশ আছে দেখা যাউক:—

বোম্বাই	৭,৪১,৪৭,০০০	পঞ্জাব	৫,৫৯,০০০
বিহার-উড়িষ্যা	৬৩,৪১,০০০	মান্দ্রাজ	৫,৫৪,০০০
বাংলা	৪১,৪৫,০০০	উ. প. সীমান্ত	৩,০৪,০০০
আগ্রা-অযোধ্যা	১৮,৮৭,০০০	ব্রহ্মদেশ	৭০,০০০
মধ্যপ্রদেশ	১৭,২৮,০০০	আসাম	৬১,০০০

ভারতীয় দেশীয়রাজ্য সমূহ—১,৩৯,৬৫,০০০ ও বিদেশ ৮,০৭,০০০।

ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, বাঙ্গালীর মূলধন মোটেই নগণ্য নহে। দেশী রাজ্যসমূহের মিলিত অংশ বাদ দিলে বঙ্গদেশ এ-বিষয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

জামশেদপুরে ২৫০, ও তদপেক্ষা উচ্চবেতনের যে-সব কার্য্যে ভারতীয় নিযুক্ত আছে তন্মধ্যে শতকরা ৪১টি পদে বাঙালী আছে; কিন্তু এ-হিসাবে বিদেশী কর্ম্মচারীদের ধরিলে বাঙালীদের অনুপাত অনেক কমিয়া যাইবে। টাটা কোম্পানীতে ১৯৩২ সালে ৯৮ জন বিদেশী চাকুরে ছিল। তাহাদের অধিকাংশ কিংবা প্রায় সবই ২৫০৲ টাকা অপেক্ষা অধিক বেতনভোগী, এরূপ অনুমান মোটেই অসঙ্গত নহে। বাঙালীরা যে কিছু কিছু উচ্চপদ পাইয়াছে তাহা তাহাদের যোগ্যতার বলে। এ-বিষয়ে মিঃ দালাল বলিয়াছেন:—The proportion of Bengalees holding the higher posts is 41 p. c. and is by far the largest of any province. This is a fact which in itself is creditable to Bengal and it is only brought out here to show that competent and deserving men from the province here received due recognition of their merits at the hands of the Company." সর্ব্বশেষে তিনি বলেন, "If Bengal has benefited by the establishment of Tata Iron & Steel Co.…it is due to the favourable geographical position of the province.

If the abilities and energies of the sons of Bengal have enabled them to capture a substantial proportion of the higher appointments in the Company's service and to play their part in the progress of this great national industry, that also should be a matter of gratification and of pride to Bengal."

নিবেদক
শ্রীনক্ষত্রলাল সেন

আশ্বিনের 'প্রবাসীর' ৯০২ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে 'ঝুমুর' সম্বন্ধে যে তথ্য দেওয়া হইয়াছে এবং যে দুইটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা ১৩৩৯ সালের 'সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা' দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৮ পৃঃ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ হইতে লওয়া হইয়াছে, কিন্তু লেখক তাহা স্বীকার করা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

শ্রীকুমুদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্বিন সংখ্যার প্রবাসীতে প্রকাশিত "বাংলার মৃৎশিল্প ও কুম্ভকার জাতি" প্রবন্ধটি নাতিদীর্ঘ, উপাদেয় ও সময়োপযোগী। প্রবন্ধের চিত্রগুলিও মনোরম। লেখক-মহাশয় কিন্তু একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন, হয়ত ইহা তাঁহার অনিচ্ছাকৃত। প্রবন্ধের "রিইনফোর্সড পদ্ধতি নির্ম্মিত যমুনা মূর্ত্তি" ও "দগ্ধ মৃত্তিকা নির্ম্মিত গণেশ-মূর্ত্তি"র ডিজাইন শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় কৃত। এই ডিজাইনগুলি কুম্ভকার জাতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্তি

শ্রীআশালতা দেবী

২১

প্রত্যেক দিন সকালবেলায় ডাক আসিবার সময় দারোয়ানটা যখন ছেলেদের দুয়ারে দুয়ারে ডাকিয়া বেড়ায়, 'চিঠ্‌ঠি হ্যায়!' সে সময় প্রত্যেক দিনই যামিনীর হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হইতে থাকে। মনে হয় দরোয়ান এইবারে তাহার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, এইবারে তাহার দিকে একখানা নীলাভ রঙের খাম হয়ত প্রসারিত করিয়া ধরিবে। তাহার নামেও হয়ত চিঠি আছে। আর সে চিঠি লিখিয়াছে নিশ্চয় নির্ম্মলা। কিন্তু কোনদিনই আশা পূর্ণ হয় না। প্রতীক্ষার পালা দীর্ঘতর হইতে থাকে। কিন্তু এমনি দুর্ব্বার আশা যে আবার ঠিক পরের দিন চিঠি আসিবার সময় হইলেই তাহার পক্ষে কোন কাজ করা কি লেখাপড়া করা অসাধ্য হইয়া উঠে। সেই কয়েকটি মুহূর্ত্ত ব্যাকুল আশার উত্তেজনায় কাটিয়া যায়। তাহার পরে তাহার বারংবার প্রশ্নের জবাবে দরোয়ান যখন ঠিক একই ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিতে থাকে, না বাবু, আজও আপনার নামে কোন চিঠিপত্র নাই, তখন কিছুক্ষণের জন্য তাহার মনের সমস্তটা একেবারে অন্ধকার হইয়া যায়। একটা দিনের জন্য সমস্ত আশা গেল।

সেদিন বেলা ন'টার সময় ডাক বিলি হইয়া যাইবার পরে যামিনী নিরাশ মনে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় জাফ্‌রানি পর্দ্দা-ঝোলান পাশের বাড়ি হইতে খুব একটা সোরগোল, একটা স্ত্রী-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। যামিনী সেইদিকের জানালাগুলা বরাবর বন্ধ রাখিত, টানিয়া খুলিয়া দেখিল গেটের সামনে গোটাদুই-তিন মোটর দাঁড়াইয়া আছে। একটা হল্লা উঠিয়াছে। নিখিলকে ডাকিয়া কহিল, "ওহে ব্যাপার কি? এত গোলমাল কেন? নাঃ, এ ঘর দু'টো আমাকে জ্বালাতে হ'ল দেখচি। এমনিতেই ত দিবারাত্রি সারেঙ্গির নিক্কণ, গানের সুর আর মাতালের অশ্রাব্য ভাষায় কান ঝালাপালা। তার উপরে কোন কোন দিন যদি বিশেষ পালা সুরু হয় তাহলেই ত চমৎকার!"

নিখিল সেই বাড়ীর ফটকের কাছে গেল ব্যাপার কি দেখিবার জন্য। কোন এক বেহারী বড় জমিদারের ছেলে এক জন রক্ষিতার মত স্ত্রীলোককে আনিয়া কিছুদিন হইতে ওই বাড়ীতে রাখিয়াছে। লোকে এইরূপই বলে। অনেকটা আন্দাজও তাই হয়। মেয়েটিকে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে যামিনী অনেকবার দেখিয়াছে। কালো দীর্ঘ ঘনপক্ষ্ম চক্ষু। অপূর্ব্ব সুন্দরী। চকিতের মত জাফ্‌রানি পর্দ্দা সরাইয়া তাহার কালো চক্ষু চঞ্চল হইয়া উঠে, আবার তখনই সরিয়া যায়। দিনের বেলায় সমস্ত বাসাটা নিস্তব্ধ থাকে। কেবল এক জন দাসীকে সদরদরজা খুলিয়া মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। কিন্তু সন্ধ্যা লাগিতে না-লাগিতে প্রকাণ্ড এক মোটরের হর্ণ ঘন ঘন বাজিতে থাকে। তাহা হইতে যে বেহারী ভদ্রলোক নামে তাহার পাঁচ আঙুলে পাঁচটা হীরার আংটি এবং বেশভূষার দিকে চাহিলেই তাহার শিক্ষা এবং রুচি সম্বন্ধে সংশয় করিবার আর অবকাশ থাকে না। তাহার পরে আরও দুই-একটা জুড়িগাড়ী লাগে ও সারারাত্রি ধরিয়া সুরা এবং বীভৎসতার যে প্রমত্ত লীলা চলে, দূর হইতেও ক্ষণে ক্ষণে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

নিখিল ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "হবে আবার কি, মাতাল জমিদারটা আজ অন্যদিনের চেয়ে মাত্রা চড়িয়েছে, তাই হয়ত বেধেচে কোন গোলযোগ। যাক্‌গে ও-সবে আর মনোযোগ দিয়ে কি হবে ব'ল। দেখি যদি এই রকম রোজই চলে, তা'হলে অন্য মেস দেখতে হবে। এখানে আর অন্য কোন ঘর ত খালি নেই। তুমি কি বল? কিন্তু এ-বাড়ীটা খুব সুবিধের ছিল।"

বাড়ী বদলাইবার নাম শুনিবামাত্রই যামিনীর মুখ শুকাইয়া গেল। তাহার সমস্ত দেহ-মন যেন ক্লান্তির অবসাদের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। এতটুকু চেষ্টা উদ্যোগ তাহাতে আর সহিবে না। চেয়ারটায় ভাল করিয়া হেলান দিয়া বসিয়া সে অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে কহিল, "থাক, অত

হাঙ্গামে কাজ কি, বেশ আছি। ওসব গোলমালে কান না দিলেই হ'ল।"

নিখিল তাহারই নির্দ্দেশমত সেইদিক্‌কার জানালা দু'টা আবার বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া স্মিতহাস্যে বলিল, "কিন্তু তাও বলি, তোমার অত বাড়ির ভাবনা কেন দাদা? বৌদির কাছে সোজা চলে যাও। সকালবেলায় উঠেই প্রাইমাস্ ষ্টোভের পাম্প ঠেলতে হবে না চা'য়ের জন্যে। বরঞ্চ সেখানে সোনালি চায়ের সঙ্গে সোনার বর্ণের করকমলের যে ছায়াটুকু এসে মিশবে তাতে ক'রে চায়ের স্বাদের আর অন্ত থাকবে না। তাই যাও না ভাই। অনর্থক অভিমান ক'রে শরীরপাত কেন?

"বল কি!" যামিনী গম্ভীর মুখে কহিল, "একবার ফেল করেছি। আমার পড়াশোনা?"

"আর পড়াশোনা? পড়াশোনা যা করছ তা স্বর্গের ঈশ্বর দেখছেন।"

"সত্যি কিছু পড়ছি নে। নয় নিখিল?" সে এমন ভাবে নিখিলের মুখের দিকে চাহিয়া এমন স্বরে কথাটা জিজ্ঞাসা করিল যে সেইটুকু প্রশ্নের মধ্যেই তাহার অন্তরের অপরিসীম ভার, অসহ্য ব্যথা একেবারে উন্মুক্ত হইয়া যেন চোখে পড়িল। নিখিল তাহারই পাশে নিজের চৌকিটা সরাইয়া লইয়া গিয়া যামিনীর একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "কি হয়েছে আমাকে খুলে বল যামিনী। সেই প্রথম যখন আই-এ পড়তে তুমি কলকাতায় এস, তখন থেকেই তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। আমার কাছে কিছুই লুকিও না।"

যামিনী ধীরে ধীরে হাতটা মুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কিছুই হয় নি। এক দিন এক জনকে প্রাণপণে পাবার চেষ্টা ক'রে মনে করেছিলুম, বাইরের সব বাধা কাটিয়ে তাকে বিয়ে করতে পারলেই বুঝি সমস্তই সুগম হয়ে আসবে। এখন দেখতে পাচ্ছি বাইরের চেয়ে ভিতরের বাধাই বেশী। সেইটেই সবচেয়ে বড় সমস্যা নিখিল, যেখানে পাশাপাশি রয়েছি, অথচ মিলতে পাচ্ছি নে।"

"দেখ,তোমাদের নব্য পুরুষদের এই একটা ভারি দোষ—" নিখিল একটু উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তোমরা আজকাল মেয়েদের হার মানিয়েছ। বসে বসে সূক্ষ্মতমরূপে ভাষা থেকে ভাবটুকু এবং তাৎপর্য্য হইতে তত্ত্বটুকু বেছে চিনে বার করা চাই। কিন্তু দোহাই তোমাদের, সংসারের সর্ব্বত্র অত সূক্ষ্ম মনের আমদানী ক'রো না। যা সহজ এবং সরল মুখে মুখে ছড়াকেটে তাকেই কাব্য বানিয়ে তুলো না।"

যামিনী উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "ভাই নিখিল, আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে না, সে চেষ্টাও ক'রো না। সংসারের বারো আনা লোক ঘরের গৃহিণীকে পেলেই সুখী হয়, স্বস্তিতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু আমার সে স্বস্তিতে দরকার নেই। আর সে সুখেও আবশ্যক নেই— না না, সুখ চাই নে এ কথাটা অবশ্য এখন অত জোর দিয়ে বলতে পারি নে। কারণ এখন অত হৃদয়হীন হই নি। কিন্তু আমি যে-পরিপূর্ণতাকে চেয়েছি সে ত শুধু ঘরের গৃহিণীকে দিয়ে মেটে না। আমি তারই জন্য অপেক্ষা ক'রে রইলুম। যদি কখন পাই তেমনি ক'রেই পাব। তার চেয়ে কমে আমার মন ভরবে না ভাই। এর জন্যে যদি সমস্ত জীবন অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয় সেও স্বীকার, কিন্তু আমার চাওয়াকে আমি ছোট করব না।"

"হয়েছে গো মশাই হয়েছে। সারাজীবন তপস্যার পালা এখন শিকেয় তোলা থাক, দুটো মাস বিরহ সহ্য হ'লে বাঁচি। রোজ ডাক আসবার সময় যখন হয়, তখন মনটা যেন মেঘের পানে চাতকের চেয়ে থাকার মত সেই দিকপানে অনিমেষ হয়ে থাকে। দেখি দাদা, আর দু'টো দিন সবুর কর, ডাকটা আগে কোনদিক থেকে আসে!

২২

রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। মেসের সমস্ত ঘর অন্ধকার। আলো নিবাইয়া দিয়া সকলেই ঘুমাইতেছে। যামিনীর পাশের ঘরে নিখিলও গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন। কেবল সে নিজেই এত রাত্রি অবধি ঘুমাইতে পারে নাই। আলোর অভাবে বই পড়িতে না পারিয়া চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল। এমন সময় তাহারই পাশের ঘরটায় কে যেন ধাক্কা দিয়া ডাকিতে লাগিল, "বাবুরা কেউ জেগে আছেন গো? ভারি বিপদে পড়েছি। দোহাই আপনাদের যদি জেগে থাকেন ত দোর খুলুন।"

স্ত্রী-কণ্ঠের স্বর। কণ্ঠস্বরে আর্ত্ত ব্যাকুলতা।

যামিনী মাথার কাছে টিপায়ে-রাখা মোমবাতি ও দেশলাই দিয়া আলো জ্বালিয়া দরজা খুলিয়া দিল। খুলিয়া দিয়া ডাকিল, "কে? কি বলছো।"

সাড়া পাইয়া স্ত্রীলোকটি তাহার ঘরের দিকে আগাইয়া আসিল। যামিনী দেখিয়া চিনিল, ও-বাড়ীর দাসী। যাহাকে প্রায়ই সে সদর দরজা খুলিয়া যাতায়াত করিতে দেখিয়াছে।

"কি হয়েছে?"

"সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবু। বাড়িতে দাঙ্গা হয়েছে। দিদিমণির মাথায় ছুরি মেরে···আর কি বলব বাবু? সে সব নোঙ্‌রা কথা। ঝগড়া-ঝাঁটির পর কে কোন্ দিকে পালিয়েছে। একা বাড়িতে কি করব ভেবে পাচ্ছি নে। এক জন ডাক্তার ডাকা ত দরকার। কিন্তু কি করব, একলা তাঁকে ফেলে রেখে কোথায় যাব? এদিকে ডাক্তার ডাকতে বেশীক্ষণ দেরি হ'লে হয়ত ওনাকে বাঁচান যাবে না।"

যামিনী কিছুকাল ভাবিয়া কহিল, "তুমি একটু দাঁড়াও, দেখি আমি কি করতে পারি।" নিখিলকে ডাকিয়া উঠাইয়া সে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল।

নিখিল গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইয়া কহিল, "চল। বিপদের সময় আর কোন কথা ভাবতে নেই। একটা ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে চলে আসব।"

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দোতালার বড় ঘরে আসিয়া সকলে দেখিল মেঝেময় ফরাস পাতা। দলিত ফুলের মালায়, সিগ্রেটের পোড়াটুকরায় সমস্ত জায়গাটা লণ্ডভণ্ড। একধারে সোফার উপর মেয়েটি মুদিত চক্ষে শুইয়া আছে। জ্ঞান আছে কি না ঠিক বোঝা গেল না, রগের পাশে কালশিরার স্পষ্ট দাগ। নিখিল দুয়ারের কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, "ঘরের মধ্যে যেতে আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। আমি চললুম। একটা ডাক্তার ডেকে এনে দিচ্ছি। ততক্ষণ তুমি বারান্দায় ব'স।"

নিখিল চলিয়া গেল। যামিনী বাহিরে বসিয়া রহিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—অন্ধকার। আকাশের তারাগুলি যেন কাহার অনিমেষ দৃষ্টির মত স্থির হইয়া চাহিয়া আছে। সেই দিকে তাকাইয়া সে আপনার চিন্তার মধ্যে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। দাসী পিছনে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কই ডাক্তার বাবু ত এখন এলেন না। ওঁর কি আর জ্ঞান হবে না?"

যামিনী তাহাকে ভয়ে অভিভূত দেখিয়া কহিল, "চল ভিতরে গিয়ে দেখে আসি গে।" সোফার পাশে একটা টুল লইয়া গিয়া সে বসিল। দাসীকে বলিল, "তোমাদের বাড়িতে যদি গোলাপজল থাকে নিয়ে এস। আর অমনি একটা হাতপাখাও।" দাসী প্রার্থিত জিনিষপত্র খোঁজ করিয়া আনিতে গেল। ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল আলো। সেই বিমথিত, বিশৃঙ্খল কক্ষের মাঝে নিস্পন্দ নারীমূর্ত্তির দিকে সে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। কী সুন্দর মুখ! সুকুমার ললাটখণ্ডটুকুতে কি অসহায় করুণতা! সমস্ত মুখ বিবর্ণ। ইহারই মুখের দিকে তাকাইয়া কে বলিতে পারে দিন কাটে ইহার নিঃশব্দ গ্লানিতে, রাত্রি যাপন হয় প্রমত্ত লালসার মাঝে। দাসী আসিয়া মাথায় গোলাপজলের পটি দিয়া পাখা করিতে লাগিল। যামিনী তাহার হাতের মণিবন্ধ স্পর্শ করিয়া দেখিল নাড়ী ক্ষীণ।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে সে চোখ খুলিয়া চাহিল। শূন্য অর্থহীন দৃষ্টি। বাড়ির গেটের কাছে একটা মোটরের হর্ণ বাজিতে লাগিল। সিঁড়ির আলোটা জ্বালিয়া দিয়া দাসী কহিল, "ওই যে ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

ডাক্তার আসিয়া কয়েকটা বলকারক ঔষধ লিখিয়া দিয়া গেলেন। খানিকটা গরম দুধে ব্যাগ হইতে কয়েক ফোঁটা ব্রাণ্ডি মিশাইয়া পান করিতে দিয়া আঘাত পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "তেমন কিছুই নয়। হঠাৎ শক্ পেয়ে এতক্ষণ জ্ঞান ছিল না।···আজ্ঞে, না। রাত্রিতে আমি বত্রিশ টাকাই নিই।"

যামিনী তাহার পার্স হইতে দশ টাকার চারিখানা নোট বাহির করিল। নিখিল সেইদিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল। সোফা হইতে মেয়েটি ক্ষীণস্বরে কি কহিল ঠিক শোনা গেল না। ডাক্তার পকেট হাতড়াইয়া কহিলেন, "আমার কাছে চেঞ্জ নেই।" নিখিলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনি টাকাটা আর ওষুধ কয়েকটা নিয়ে যান আমার ডিস্পেনসারী থেকে। ওঁর যে-রকম অবস্থা, আজ রাত্তিরেই দু-দাগ ওষুধ পড়া চাই।" নিখিল নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাহার সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। শিয়রের কাছে পাখা হাতে করিয়া দাসী ঢুলিতেছে। মেয়েটি চোখ খুলিয়া তাহার কালো চক্ষুর পূর্ণ দৃষ্টি যামিনীর উপর মেলিয়া ধরিয়া কহিল, "এমন আমি কোথাও দেখি নি।"

কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের মত মধুর। যামিনী অন্যমনস্কের মত জানালা দিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়াছিল, চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, "কি বলছেন?"

"ভাবছি কি ব'লে আপনাদের কাছে পরিচয় দেব। আমার নাম অমলা। আমার নামটাই যেন আমাকে করছে সকলের চেয়ে পরিহাস। হয়ত কত কি-ই ভাবছেন।"

"কিছুই ভাবছি নে। পরের সম্বন্ধে কোন রকম কিছু ভাবা আমার স্বভাব নয়। আপনি যা তাই। কিন্তু এখন আর বেশী কথা বলবার প্রয়োজন কি? ডাক্তার বলেছে আপনার শরীর এবং মস্তিষ্ক দু-ই এখন দুর্ব্বল।"

মেয়েটির মুখে আতঙ্কের গাঢ় কালিমা পড়িল। কহিল, "আচ্ছা, কি ক'রে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম, জানেন?"

"জানি নে। আমরা আপনাদের বাড়ির ঐ পাশের মেসে থাকি। আপনার দাসী গিয়ে আমাদের খবর দেয়।"

"জানি। আমি আমার এই জানালা দিয়ে কতবার আপনাকে দেখেছি।"

অমলা কি যেন স্মরণ করিতে আবার চক্ষু মুদিল। বাহিরে নিখিলের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। দাসীকে উঠাইয়া দিয়া যামিনী কহিল, "আপনার ইতিবৃত্ত শোনবার জন্যে আমরা তত ব্যস্ত হই নি। আপনি শান্ত হয়ে বিশ্রাম করুন। আমরা চললুম। যদি কোন প্রয়োজন হয় খবর দেবেন।"

নিখিলের সঙ্গে আসিয়া রাস্তাতে পড়িতেই সে গম্ভীর হইয়া কহিল, "যামিনী, বাড়ি বদল'বার কথা বলছিলে, এবারে আর তামাসা নয়। এবার একটা ভাল বাড়ি দেখে কাল-পরশুই উঠে যাচ্ছি।"

"কেন কি হয়েছে? এত তাড়া কিসের?"

"তাড়া নয়ই বা কেন? রোজ-রোজ এই-সব কাণ্ড-কারখানা আরম্ভ হ'ল। আজ তো দেখছি একরাশ অর্থদণ্ড হ'ল। তবুও যদি এইটুকুর উপর দিয়েই যায় তাহ'লে ভাগ্য ব'লে মানি।"

"এত ভয় কিসের?"

"ভয় আমার জন্যে নয়। তোমারই জন্যে ভাবনা। তোমাদের মত ঝোঁকালো, আবেগপ্রবণ লোকগুলোকে আমি বিশেষ ভরসা করি নে। তার উপরে একবার শাঁসের সন্ধান পেলে সহজে কি ওরা..."

"নিখিল, কোন এক জন স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে কিছুই না জেনে অসম্ভ্রম ক'রে কথা ব'লো না।"

"ওই রে! কপালে যা ছিল এখন থেকেই তা ঘটতে সুরু হয়ে গেল বুঝি। স্ত্রীলোক আবার কি? গণিকা সম্বন্ধেও সম্ভ্রম ক'রে কথা কইতে হয় না কি?"

"অত সব জানি নে নিখিল। মেয়েদের বাড়তির ভাগ সম্ভ্রম ক'রে ঠকতে বরঞ্চ রাজী আছি, কিন্তু আগেভাগে হিসেব ক'রে সাবধানী হ'তে পারব না।"

২৩

দুপুরবেলায় নিখিল কলেজ গিয়াছে। যামিনী তাহার ঘরের বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছিল কাল রাত্রিবেলার ঘটনাগুলা। সে সমস্তই এত আচম্বিতে এত তাড়াতাড়ি ঘটিয়া গিয়াছে যে এখনও তাহাদের সত্য বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় অন্ধকার রজনীর অন্তরাল ছিন্ন করিয়া কোন এক অলীক কাহিনী কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নামিয়া আসিয়াছিল। নির্ম্মলা ছাড়া এ-অবধি কোন স্ত্রীলোকের পানে যামিনী ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নাই। তাহার কবি-প্রকৃতির সমস্ত নীরব পূজা এবং শ্রদ্ধা উদ্যত করিয়া ধরিয়াছিল তাহারই দিকে। কিন্তু এত দিয়াও সে এক জনের মন তেমনই করিয়া জাগাইতে পারিল না। কোনও হৃদয়ে সে নিজের জন্য দৃঢ় আশ্রয়-ভিত্তি রচনা করিতে পারিল না। তাই এই নিরন্তর শূন্যতার মাঝে তাহার সমস্ত মন অতুল তৃষ্ণায় চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছিল। কোন-কিছুতেই স্থির হইয়া মন বসে না, কোন কিছুর জন্যই চেষ্টা করা, আগ্রহ করা ভাল লাগে না। মনের মধ্যে ক্লান্তি এবং শূন্যতার ভাব ছাড়া আর কিছুই নাই। কিছু করিতে গেলেই এক জনের উপর নিদারুণ অভিমান জাগিয়া উঠে। মনে হয় আমার কিছু করা, আমার ভাল থাকা সে যেন তাহারই গরজ। সে-ই যদি থাকিল উদাসীন হইয়া তবে এ-সব অর্থহীন চেষ্টার

দরকার কি ? লেখাপড়ায় আদৌ মন বসে না। সে চেষ্টা করাও সে এবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। খাটের উপর বিছানায় শুইয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, আর কত দিন এই নির্ম্মম নীরবতায় দিন কাটিবে। অভিমান ভাসাইয়া দিয়া সে-ই না হয় প্রথমে নির্ম্মলাকে চিঠি লিখিবে। চিঠি লিখিবে স্থির করিয়া সে ফাউণ্টেন পেন এবং কাগজ টানিয়া লইয়া বসিবে বসিবে করিতেছে, এমন সময় ওবাড়ির দাসী আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। যামিনী উঠিয়া দরজা খুলিবার উপক্রম করিতেই কহিল, "দরজা খুলবার দরকার নেই বাবু। তিনি ভাল আছেন। এই চিঠিখানা আপনাকে দিয়েছেন।"

একটা ফিকে ফিরোজা রঙের পুরু খাম তাহার হাতে জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিয়া সে অন্তর্ধান করিল।

যামিনী নির্জ্জন মধ্যাহ্নে সেই খামখানা হাত পাতিয়া লইয়া চেয়ারে আসিয়া বসিতেই তাহার সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু কৌতূহল সংবরণ করিতেও পারিল না। খামখানা ছিঁড়িয়া দেখিল লেখা আছে :—

"কাল তুমি যখন ঘর হইতে চলিয়া গেলে তখন মনে হইল আমার জীবনে একবার মাত্র আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাও দপ করিয়া নিবিয়া গেল। তোমাকে তুমি বলিলাম বলিয়া রাগ করিও না। কারণ দূর হইতে অনেকবার তোমাকে মনে মনে তাহাই বলিয়া ডাকিয়াছি। মনে মনে যাহা করিয়াছি, প্রকাশ্যেও তাহাই করিলাম ; কারণ তোমার কাছে আমার লুকাইবার কিছুই নাই। কিছু লুকাইব না, বোধ হয় সে সাধ্যও নাই। যদি আমার ইতিহাস শুনিতে তোমার প্রবৃত্তি না হয় তবুও বলিব, কারণ না-বলিয়া আমার মুক্তি কোথায় ? দূর হইতে জানালা দিয়া কতবার তোমার ধ্যানমগ্ন মুখের দিকে বিস্ময়ে ডুবিয়া গিয়া তাকাইয়াছি। মনে করিয়াছি কাহার এত ভাগ্য, কে এমন তপস্যা করিয়াছে, যাহার ধ্যানে তুমি নিজের মনেই এত তন্ময় হইয়া আছ ? না, সে আর কোন চিন্তা ? কিন্তু থাক সে কথা, তোমার কথা জানিবার আমার কি অধিকার ? কিন্তু আমার কথা যে তোমাকে শুনিতেই হইবে। আমার স্বামীর নাম বলিব না। তিনি বাংলা দেশের এক সুদূর পল্লীপ্রান্তের কোন এক নগণ্য ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টারী চাকুরি করিতেন। সেখানকার জমিদারের নজরে আমি পড়িয়া যাই। লোকে বলে আমি না-কি রূপসী, যদিও এ ছাই রূপের দিকে কোন দিন চোখ মেলিয়া চাহি নাই। তাহার পরে সেই অশিক্ষিত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার আমার স্বামীকে ভয় দেখাইয়া এবং বলিতে লজ্জা করে বিস্তর টাকা ধরিয়া দিয়া তাঁহারই সহিত ষড়যন্ত্র যোগে আমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসেন। স্বামী অত্যন্ত অকিঞ্চন। মাসান্তে পনেরটি টাকা করিয়া বেতন পান। বোধ করি টাকার লোভ সামলাইতে পারিলেন না। এই ত আমার পুরুষের সহিত পরিচয়। কিন্তু আমার অনন্ত দুর্গতির মাঝেও বিধাতাকে ধন্যবাদ যে এই পরিচয় সম্বল করিয়াই আমাকে মরিতে হয় নাই। তোমার পরিচয় পাইলাম। আমার জীবনের কালো অন্ধকারের মাঝে সোনার একটি রেখা পড়িল। হউক তাহা দু-দণ্ডের। তবু ত তাহাকে দেখিয়াছি। কিন্তু কাল রাত্রি বলাকার ব্যাপারটা এখনও বলা হয় নাই। যিনি আমাকে এই বাড়ি ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন, কয়েক দিন হইতে তাঁহার সহিত এক বেহারী ভদ্রলোক আমার বাড়িতে প্রায়শঃ পদধূলি দিতেন। ক্রমশঃ তাহার অন্তরঙ্গতা করিবার সখ বাড়িয়া উঠিল। দুই জনের মাঝে সুরু হইল ঈর্ষা, প্রতিযোগিতা, বিসম্বাদ। অবশেষে কাল রাত্রিতে দুই জনে একত্র হইয়া মদের ঝোঁকে মারামারি সুরু করে। আমি বাধা দিতে যাইয়া আহত হইলাম। আমার জ্ঞান ছিল না। পরে দাসীর কাছে শুনিয়াছি বেহারী ভদ্রলোকটি খুব গুরুতর রূপে জখম হওয়ায় তাঁহার সঙ্গের লোকজন ধরাধরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। ভয় পাইয়া জমিদার বাবুও মোটরে অন্তর্ধান করিয়াছেন, যদিও জানি ভয় ভাঙিলেই আসরে আবার আসিবেন। আবার আরম্ভ হইবে আমার দুঃসহ গ্লানির জীবন। কিন্তু এই অবসরে, হে আমার দেবতা, দূর হইতে তোমাকে প্রণাম করিয়া লই। আমার কলঙ্ক-সমুদ্রের বহু, বহু ঊর্দ্ধে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে। তাহারই জ্যোতিতে আমার সমস্ত কূল আলোকিত হইল। প্রভু, ভয় পাইও না। জোয়ারের জল তোমার উদ্দেশ্যে যতই উচ্ছ্বসিত হইয়া

উঠুক, জানি তাহা তোমার কাছেও পৌছাইতে পারিবে না। কিন্তু এক এক সময় ভাবি কাহার অভিশাপে আমার জীবনভরা এই অন্ধকার। বিধির বিধানে বিনাদোষে মরণের শেষদিন পর্য্যন্ত আকণ্ঠ পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া থাকা। ইহার কি শেষ নাই? এ জীবন হইতে কি উদ্ধার নাই?"

যামিনী যদি সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিত তবে এই চিঠির সাজান নাটকীয় ভঙ্গী হয়ত ধরিতে পারিত। আমাদের ত মনে হয় তাহার ধরিতে পারা উচিত ছিল। কারণ আজকালকার দু-পয়সা তিন পয়সা দামের সাপ্তাহিক কাগজগুলাতে পতিতার কথা এবং পতিতার ব্যথা নাম দিয়া রসে-ভেজা বাষ্পগদগদ তাল তাল যে-সকল লেখা বাহির হয়, সে ধরণের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বহু উর্দ্ধে তাহার মন। কিন্তু সেই সময়ে যামিনীর মন অভিমানে, বেদনায় এমনই বিকৃত হইয়াছিল যে, তাহাকে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থা বলা চলে না। নির্ম্মলার ব্যবহারকে সে তাহার পৌরুষের অবমাননা বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছিল। এক জনের কাছে আপনার যথার্থ মূল্য না পাইয়া সে নিজের উপর নিজের শ্রদ্ধা হারাইতে বসিয়াছিল; ঠিক সেই সময়ে আর এক জনের কাছে নিজের স্তুতির যথার্থতা ধরিতে পারিল না। তাহাকে যথার্থ মনে করিয়া তাহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। যে-ভাষায় চিঠিখানা লেখা, তাহা যে হৃদয়ের ভাষা নয়, তাহাতে আন্তরিকতা মাত্র নাই, এমনতর সহজ কথাটাও তাহার নজর এড়াইয়া গেল। তাহার অবমানিত পুরুষের চিত্তে যত করুণা যত শক্তি সুপ্ত হইয়াছিল তাহারা একসঙ্গে জাগিয়া উঠিল। মনে মনে সে কহিল, "আমি ত ইহার মধ্যে অন্যায় কোনখানটায় দেখিতে পাই না। কারণ আমি কোন উদ্দেশ্য লইয়া তাহার কাছে যাইতেছি না। আমার মধ্যে কোন আসক্তি নাই। কিন্তু কেহ যদি আমার কাছে মুক্তির উপায় খোঁজে, সাহায্য চায়, তবে তাহা না-দিয়া থাকি কি করিয়া?"

তখন দুপুর বেলায় মেসের সমস্ত বাড়িটা খালি। যে যাহার কলেজ, কোর্ট আফিস গিয়াছে। আলনা হইতে চাদরটা টানিয়া লইয়া যামিনী পাশের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। অমলা মুখের হাসি কোন রকমে চাপিয়া, গম্ভীর মুখে যামিনীর হাত হইতে চাদরটা লইয়া রাখিল। সোরাই হইতে ঠাণ্ডা জল গড়াইয়া রাখিল। গোলাপ জল, সুগন্ধী পান বাহির করিল। আপনার হাতে হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, "আমার উপরে যে তোমার এত দয়া তা জানতুম না।" যামিনী কহিল, "থাক, আমার অত সবে প্রয়োজন নাই। তুমি আমাকে ডেকেচ তাই আমি এসেছি। যদি তোমার উদ্ধারের কোনও উপায় থাকে ত বল। আমি যথাসাধ্য করতে রাজী আছি।"

অবরুদ্ধ হাস্যবেগে অমলার পক্ষে আপনাকে সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। মনে মনে হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে খাইতে সে মনে মনেই কহিল, "আমি ডেকেছিলাম অমনি এসেছ, এমন জান্‌লে যে আরও আগেই ডাকতুম।"

কিন্তু মুখে বিষণ্ণ সুরে কহিল, "উদ্ধার করবে কি ক'রে, একবার যখন এ-পথে আমাকে জোর ক'রে টেনে এনে ফেলা হয়েছে তখন সংসারে সমাজে আর ত আমার স্থান নাই।"

"তা না-ই থাক, কিন্তু তোমাকে স্বাধীন ভাবে সৎ উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহের কোন উপায় হয়ত দেখিয়ে দিতে পারি। কোন নারীমঙ্গল সমিতিতে—" যামিনী থামিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। কারণ এ-সব বিষয়ে তাহার জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিছুই জানা নাই। ভাসা-ভাসা ভাবে লোকের মুখে শুনিয়াছে, কাগজে পড়িয়াছে মাত্র। অমলা হাত-পাখাটা তুলিয়া লইয়া আবার মৃদু মৃদু পাখা করিতে করিতে কহিল, "আচ্ছা, সে ধীরে-সুস্থে ভেবে ঠিক করা যাবে। কিন্তু আমার কপালে যা-ই থাক আমার জন্যে যে ভেবে-ভেবে তুমি সারা হবে, সে আমার কিছুতেই সইবে না। তুমি আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হ'তে পাবে না। এখন ক'দিন আমি স্বাধীন। কাল রাত্তিরের ব্যাপারের পর ভয়ে সেই দু'টো লোকই আর এখন সহজে এমুখো হচ্ছে না। ইতিমধ্যে কিছু একটা উপায় ভেবে স্থির করছি।"

"তুমি এখন কেমন আছ?" যামিনী এতক্ষণ মুখ নামাইয়া ছিল। এইবারে মুখ তুলিয়া অমলার দিকে চাহিল। কাল রাত্রির দীপালোকে অবসন্ন বিবর্ণ নারীমূর্ত্তি অন্যরকম লাগিয়াছিল, আজ দিনের উজ্জ্বল আলোয় তাহার অনাবৃত

প্রখর সাজসজ্জা, মুখের উগ্র প্রসাধন, ঠোঁটের পানের দাগ বড় বেশী স্পষ্ট হইয়া নজরে পড়িতে লাগিল। বাহিরে শান্ত নীলাকাশ, কতদূরে একটা চিল উড়িয়া চলিতেছে। কপোতের বিশ্রব্ধ কলগুঞ্জন শুনা যাইতেছে। হঠাৎ যেন ভিতরের একটা ধাক্কা খাইয়া যামিনী তীরের মত সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিতৃষ্ণায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। মাতালের নেশা ছুটিলে যেমন কোন অপ্রত্যাশিত কদর্য্য স্থানে নিজেকে দেখিয়া লজ্জায় তাহার মাথা কাটা যায়, তেমনি এই জনহীন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে এই ঘরে এই জাতীয় স্ত্রীলোকের মুখোমুখি বসিয়া তাহাকে চুপি চুপি প্রশ্ন করা, "তুমি কেমন আছ?" যামিনীকে কে যেন চাবুক দিয়া মারিল। সে উঠিয়া চেয়ারের উপর হইতে চাদরখানা টানিয়া লইয়া আর কোন কথা না বলিয়া, কোন কথার জবাব শুনিবার জন্য অপেক্ষা না-করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় সায়ান্স কলেজ হইতে নিখিল ফিরিয়া আসিতেছিল, যামিনী কোনদিকে না চাহিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতেছিল। তাহার সহিত ধাক্কা লাগিল। নিখিল অবাক হইয়া চাহিয়া কহিল, "এত ব্যস্ত কেন? হাওয়াটা বইছে আজ কোথা দিয়ে?"

যামিনী কোন উত্তর দিল না। দুই জনে একসঙ্গে আসিয়াই ঘরে ঢুকিল। মনের অধীরতায় যামিনী যাইবার সময়ে অমলার চিঠিখানা টেবিলের উপর তেমনি খোলা অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। নিখিল ফিরোজা রঙের সেই খামখানার দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিল, "অনেক দিনের প্রতীক্ষার পরে আজ বুঝি বৌদির চিঠি এসেছে? যদি অভয় দাও তা'হলে পড়ে দেখি।" যামিনীকে কথা বলিতে না দেখিয়া সে টেবিলের কাছে অগ্রসর হইয়া চিঠিখানা চোখ বুলাইয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গম্ভীর হইয়া যামিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, "এই চিঠিখানা পেয়েই বুঝি সেই মেয়েটার কাছে দৌড়েছিলে?"

একথারও কোন উত্তর না দিয়া যামিনী নিখিলের হাত হইতে চিঠিখানা কাড়িয়া লইয়া মুঠোর মধ্যে দলা পাকাইয়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। কহিল, "তোমার কাছে এখন কৈফিয়ৎ দিতে পারব না নিখিল। আমার মন ভারি খারাপ। আমি একটু একলা থাকতে চাই।"

নিখিল তীব্র দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। নিজের ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল যামিনীকে এই বিপদ্ হইতে কি করিয়া উদ্ধার করা যায়। নির্ম্মলাকে সেই বিবাহের দিনটিতে ছাড়া আর সে কখনও দেখে নাই। কিন্তু আজ তাহার উপর বিমিশ্রিত রাগ হইতে লাগিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিল, যদি প্রয়োজন হয় তবে নির্ম্মলার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার সহিত পরিচয় করিয়াও সে কিছু বলিবে। স্নেহের মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া কহিবে, 'তোমার মত বোকা মেয়ে পৃথিবীতে আর ত দুটি দেখি না। এত অতুল রূপগুণের অধীশ্বরী হইয়াও তোমার কোমল কঠোর বন্ধনে এক জনকে বাঁধিতে পারিলে না।'

মনের আবেগ, বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের উদ্বেগে সে আরও কত কি-ই না মনে মনে বলিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু বাহিরে লাল বাইকে করিয়া টেলিগ্রামের পিয়নকে দেখিয়া সশঙ্কিত হইয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল। পিয়ন হলদে খামখানা বাহির করিয়া কহিল, যামিনীভূষণ রায়ের নামে জরুরি তার আসিয়াছে। যামিনীর নামে সাইন করিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া দেখিল তাহার পিতার শক্ত অসুখ, তাহাকে অবিলম্বে বাড়িতে যাইবার অনুরোধ।

যাক্, নিখিল নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিল, এ যা হইল ভালই হইল। তাহার বাবার অসুখ আজ না-হয় দু-দিন পরে সারিবেই। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে ঠিক এই সময়েই যামিনী যে কিছুদিন অন্ততঃ কলিকাতার বাহিরে গেল ইহার চেয়ে ভাল আর কিছু হইতে পারিত না। সেই রাত্রেই সাড়ে নয়টার এক্সপ্রেসে যামিনী বাড়ি গেল। নিখিল তাহাকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া কহিল, "তাড়াতাড়ি করবার কোন দরকার নেই। তোমার পরীক্ষার এখন ত প্রায় দু-মাস দেরি। তা'ছাড়া লেক্চার-টেক্চার সবই তোমার এটেণ্ড করা রয়েছে, পড়াশোনাও প্রায় সব তৈরি। দিন-পনের আগে এলেই যথেষ্ট। তোমার বাবা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হ'লে তবে এস।"

যামিনী তখন নিঃশব্দে ট্রেনের জানালায় মুখ বার

করিয়া অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া, বাবার অসুখের কথাও চিন্তা করে নাই, পড়াশোনার কথাও ভাবে নাই। ভাবিতেছিল আজই দুপুরবেলায় নির্ম্মলাকে যে চিঠিখানা লিখি-লিখিবে করিতেছিল সে কি আর কখন লেখা হইবে না? নিয়তির অলঙ্ঘ্য আদেশে সে লিপি কি চিরদিনই অলিখিত হইয়া থাকিবে? মাঝখানে আসিয়া পড়িবে একটার পর আর একটা বাধা।

ক্রমশঃ

রোমের সাগরতীরে

শ্রীপ্রমথনাথ রায়, এম-এ

মুসোলিনীর ইটালীতে বাস করিয়া সুখ আছে। প্রকৃতি ইটালীকে শ্রী দিয়াছে। মুসোলিনী এ-দেশে বাস আরামপ্রদ করিয়াছেন।

মুসোলিনী স্বজাতির চরিত্র জানেন। কি করিয়া রাজ্য শাসন করিতে হয় সে কলাও তিনি ভাল করিয়াই জানেন। তিনি জানেন ইটালীয়ানদের জাতীয় চরিত্র তীব্র দাহিকাপ্রবণ উপাদানে গঠিত; ইটালীয়ানদের ব্যক্তিগত ও সাধারণ জীবন প্রবল ঈর্ষাতে ভরা। এ-দেশীয় লোকের ভিতর প্রাদেশিকতা অত্যন্ত প্রবল। ইটালীর ঐক্য স্থাপনের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত এ-দেশের ইতিহাসে এই প্রাদেশিকতার অনুভূতি ও প্রাদেশিকতার দেমাক সুস্পষ্টরূপে বিকশিত হইয়াছে। এখন এই প্রাদেশিকতা অনেকটা সংযত হইয়াছে, কিন্তু একেবারে নির্ম্মূল হয় নাই। ম্যাট্‌সিনি গারিবল্ডী ও কাভুরের নেতৃত্বে ইটালীর যে ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহা রাজনৈতিক ঘটনা মাত্র। জাতির নৈতিক একতা সাধনের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। যদি এই নৈতিক একতা সাধনের কাজে শৈথিল্য দেখা দেয় তাহা হইলে ইটালীয়ানদের ভিতর আবার ব্যক্তিগত দলাদলি ও রাজনৈতিক কলহ-বিবাদ ফিরিয়া আসিবে।

মুসোলিনী এ সমস্ত জানেন। জানেন বলিয়াই তিনি কড়া ভাবে রাজ্য শাসন করেন ও কড়া শাসনের প্রয়োজন অনুভব করেন। কিন্তু তিনি এও জানেন, শাসিতের আরামের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোন শাসনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। লোকের নিকট হইতে ট্যাক্স আদায় করিতে হইবে? লোকে যদি ট্যাক্স দিয়া তার পরিবর্ত্তে আরাম পায়, তাহা হইলে ট্যাক্স দিতে আপত্তি করিবে না। আমি যদি লোকের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখি তাহা হইলে লোকেও আমার আজ্ঞাবহ হইয়া চলিবে।

ইহাই মুসোলিনীর রাজ্য শাসন করিবার গূঢ় রহস্য, তাঁর সাফল্যের কারণ। তিনি লোকের জন্য কি করিয়াছেন তাহারা সর্ব্বদা স্বচক্ষে তাহা দেখে আর চুপ করিয়া থাকে। আনন্দের সুযোগ সকল শ্রেণীর লোকের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বহু উৎসব লোপ পাইতেছিল, সেগুলির পুনরায় প্রচলন করা হইতেছে। সিনেমা ও থিয়েটারে টিকিটের দাম কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকের ভ্রমণের সুবিধার জন্য রেলের ভাড়া সস্তা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একাধিপত্যের ফল যদি এরূপ সুন্দর হয় তাহা হইলে লোকে যে একাধিপত্য সহ্য করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

আমি সুন্দর বলিয়াছি। এই গরমের দিনে প্রতি রবিবার নামমাত্র ভাড়ায় পাহাড়ে কিংবা সাগরতীরে বেড়াইয়া আসিতে পারা কি সুন্দর নয়? মুসোলিনী জন-সাধারণের জন্য কতকগুলি বিশেষ ট্রেনের চলন করিয়াছেন। প্রতি রবিবার হাজার হাজার যাত্রী বোঝাই হইয়া এই ট্রেনগুলি পাহাড়ে কিংবা সাগরের ধারে কিংবা পল্লীতে যায় ও শহরের কলুষিত হাওয়ায় আবদ্ধ বাসিন্দাকে কয়েক ঘণ্টা প্রকৃতির সান্নিধ্যে কাটাইবার সুযোগ দেয়। ভাড়া অতি সামান্য। একটা উদাহরণ দিই, নেপল্‌স্ রোম হইতে

প্রায় তিন ঘণ্টার পথ। সাধারণ ট্রেনে শুধু যাইতে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৪৮ লিরা। কিন্তু রবিবারের এই বিশেষ ট্রেনে রোম হইতে নেপলস্ যাতায়াতের ভাড়া মাত্র ১৮ লিরা। সকালবেলা উঠিয়া এইরূপে একটি বিশেষ ট্রেন ধরুন, যেস্থান আপনার পছন্দ হয় সেইখানেই যান (পূর্ব্ব হইতেই খবরের কাগজে ট্রেন ছাড়িবার সময় ভাড়া ও স্থানের নাম ছাপাইয়া দেওয়া হয়), সারাদিন আনন্দে কাটাইয়া রাত্রে ১১টা ১২টার মধ্যে ফিরিয়া আসুন। এজন্য আপনার পকেট বেশী হাল্কা হয় না, অথচ আপনি তৃপ্ত মনে ফিরিয়া আসেন।

মুসোলিনী রোমানদিগকে যে-সকল সুন্দর জিনিষ উপহার দিয়াছেন, তাহার মধ্যে সকলের চেয়ে সেরা ও সুন্দর উপহার হইতেছে রোমের লিদো•বা সমুদ্রতীর। রোম সমুদ্রতীর হইতে মাত্র ১৫ মাইল দূরে। কিন্তু এত দিন রোমের সমুদ্রতীর বলিয়া কোন কিছু ছিল না। মাত্র কয়েক বৎসর আগে তাহার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন এই সমুদ্রতীর রোমানদিগের পক্ষে গ্রীষ্মের সন্ধ্যা কাটাইবার প্রিয় স্থান হইয়া উঠিয়াছে। রোম হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত ইলেকট্রিক রেলওয়ে আছে। ট্রেনে আধ ঘণ্টার পথ। ট্রেন প্রতি দশ মিনিট অন্তর ছাড়ে। মোটরে যাওয়ার জন্য একটি বিশেষ মোটর রোডও আছে। রাত্রে অসংখ্য দীপমালায় যখন এই পথ আলোকিত হয়, তখন মনে হয় স্বর্গের পথ ধরিয়া চলিয়াছি। স্নান করিবার জন্য চমৎকার বন্দোবস্ত আছে। ইচ্ছা হয় আপনি স্নান করিতে পারেন কিংবা কাফেতে বসিয়া বাজনা শুনিতে পারেন ও সমুদ্রের হাওয়া সেবন করিতে করিতে তরঙ্গের খেলা ও স্নানার্থীদের দৃশ্য দেখিতে পারেন।

জনসাধারণের কাছে রোমের এই সমুদ্রতীর অস্তিয়া নামে পরিচিত। প্রকৃত অস্তিয়া এখান হইতে খানিকটা দূরে। প্রাচীন রোমান যুগের ধ্বংসাবশেষে ভরা। সেই সুদূর অতীতে অস্তিয়া ছিল রোমের বাণিজ্য ও ফৌজ বন্দর। কিন্তু কালের অগ্রগতির সঙ্গে সমুদ্র দূরে সরিয়া যায়। এই অপসরণের ফলে যে ভূখণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে তাহারই উপর নূতন অস্তিয়া নির্ম্মিত।

সেদিন ছিল রবিবার। কয়েক ঘণ্টাব্যাপী ক্রমাগত মানসিক পরিশ্রমের ফলে মাথাটা ঝিম ঝিম করিতেছিল। কি করিব ভাবিয়া না পাইয়া কোটটা গায় দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তা তখন জনবিরল। কদাচিৎ কোন পুরুষ কিংবা নারী যাইতেছিল। তখনও বাহিরে যাইবার সময় হয় নাই। উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ মাথায় আসিল সমুদ্র-তীরে গেলে মন্দ হয় না। তৎক্ষণাৎ ট্রামে চাপিয়া বসিলাম ও আধ ঘণ্টার মধ্যে সেণ্ট পলস্ গেট ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এই ষ্টেশন হইতে অস্তিয়ার ট্রেন ছাড়ে।

সেণ্ট পলের গির্জ্জার কাছে বলিয়া ষ্টেশনের নাম সেণ্ট পলস্ গেট। এই গির্জ্জাটি রোমের একটি অপরূপ সুন্দর অট্টালিকা। সেণ্ট পিটারের গির্জ্জার খ্যাতি বেশী, কিন্তু এই গির্জ্জার গঠন-শ্রী অধিক চিত্ততোষিণী। সেণ্ট পিটারের গির্জ্জা বৃহদায়তন ও জাঁকজমকে ভরা; এই আয়তন ও জাঁকজমক মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে। ইহা খৃষ্টান ধর্ম্মের উপর প্যাগান প্রভাবের পরিচায়ক। রেনাসাঁসের যুগে প্যাগানিজমের যে বীজ ইটালীর উর্ব্বর ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছিল এই গির্জ্জা তারই একটি ফল। কিন্তু সেণ্ট পলের গির্জ্জার অনাড়ম্বর ও শান্ত সৌন্দর্য্যে আধ্যাত্মিকতা অধিক পরিস্ফুট, কাজেই মনের উপর ইহার প্রভাবও সূক্ষ্মতর।

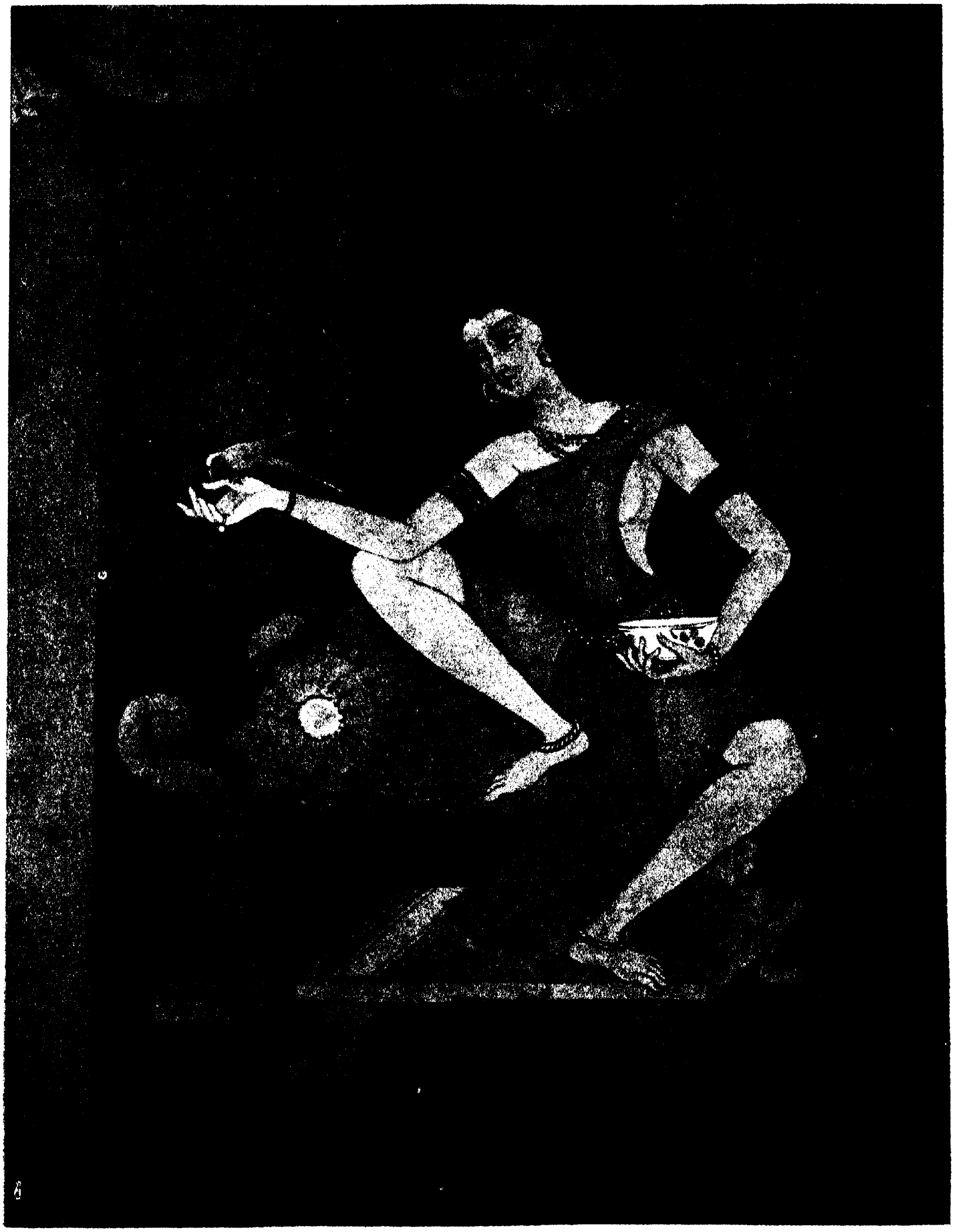
ষ্টেশনের পাশেই ইংরেজদের সমাধিভূমি। এখানে দুই জন অমর ইংরেজের কবর রহিয়াছে—শেলি ও কীট্‌সের। তাঁহাদের যশ ও তাঁহাদের কবরের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ! ঘাসে-ঢাকা দুইটি অতি সাধারণ কবর। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত কিছুই নাই। শুধু কবরের উপরকার শিলালিপি হইতে বুঝিতে পারি কত বড় দুই জন লোকের মৃতদেহ এখানে নিহিত রহিয়াছে। শেলির কবরের শিলালিপিতে লেখা আছে :—

Nothing of him doth fade
But doth suffer a sea-change,
Into something rich and strange.

কীট্‌সের কবরের শিলালিপি এইরূপ :—

This grave contains all that was mortal of a young English poet, who on his death-bed, in the bitterness of his heart, at the malicious power of his enemies, desired these words to be engraved on his tomb-stone: Here lies one whose name was written in water.

আমি যখন ষ্টেশনে পৌঁছিলাম তখন একটা ট্রেন প্রায়



প্রিয়

কুমারী নিবেদিতা ঘোষ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ছাড়ে ছাড়ে। ছুটিয়া গিয়া একটা কামরায় ঢুকিলাম। কিন্তু বসিবার পূর্ব্বেই ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিল। কামরাটা লোকে ভরা—সকল বয়সের লোক, ছেলে, মেয়ে, পুরুষ, নারী—প্রায় সকলেরই সেইরূপ সুন্দর মুখের গঠন যা আমরা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের প্রস্তর-মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। এ-দেশের শিল্পে কেন যে দেহবাদ এত বেশী উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা এখানে বাস না করিলে বুঝা যায় না। ইটালীয়ান শিল্পীদের দেহ-প্রীতি বুঝিতে হইলে ইটালিয়ান নরনারীর সৌন্দর্য্য পান করা দরকার। মাডোনারা এখানে আপনার চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। মন সংস্কারবর্জ্জিত ও খোলা রাখুন, আর এই সকল চলন্ত মাডোনাদের সৌন্দর্য্যের প্রভাব মনের ভিতর চুপি চুপি প্রবেশ করিতে দিন, তারপর গ্যালারীগুলি দেখিতে যান। তখন আপনি পেরুজিনো ও র‍্যাফায়েলের বিস্ময়প্রদ মূর্ত্তিগুলি আরও দরদের সহিত বুঝিতে পারিবেন, যে-প্রেরণা ফ্রা লিপ্পো লিপ্পি দোনাতেল্লো, বত্তিচেল্লি, তিশিয়ান ও অন্যান্য অসংখ্য শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাহা আপনার কাছে স্পষ্টতররূপে পরিস্ফুট হইবে। ইটালীয়ান শিল্পের প্রাণ দুইটি জিনিষে—ক্যাথলিক চার্চ্চের আধ্যাত্মিকতায় আর ইটালীয়ানদের—বিশেষ করিয়া ইটালীয়ান নারীর—মদালস সৌন্দর্য্যে।

আমি সবেমাত্র একটু জায়গা খুঁজিয়া বসিয়াছি এমন সময় আমার নিকটবর্ত্তী একটি বেঞ্চ হইতে কে এক জন ডাকিয়া বলিল—ভারতীয়? যে-দিক হইতে ডাক আসিল সেই দিকে চাহিয়া দেখিলাম আর এক জন ভারতীয় সেখানে বসিয়া। মধ্যবয়সী অল্প দাড়িওয়ালা লম্বা চেহারা, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, মুখ দেখিয়া বুঝা যায় জীবনযাত্রা বেশ সুখেই সম্পন্ন করিতেছেন। ইনি আমাদের গভর্ণমেণ্টের এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। আট মাসের ছুটি লইয়া ইউরোপ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কাইরোতে ছিলেন, বাগদাদ, জেরুজালেম, ইস্তাম্বুল ও এথেন্স হইয়া আসিয়াছেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথোপকথন আরম্ভ করিলাম। কি কথোপকথন হইল তাহা এখানে আগাগোড়া তুলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। নানাবিধ বিষয়েই আলাপ করিতে লাগিলাম—ইনি যে-সব দেশ দেখিয়াছেন সেখানকার অধিবাসী ও তাহাদের রীতিনীতি, সেখানকার জলবায়ু, সেখানকার ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ইত্যাদি। ভদ্রলোক তাঁহার হাতব্যাগ খুলিলেন ও তাহার ভিতর হইতে আর একটি ছোট থলে বাহির করিয়া বলিলেন, "আপনি ত অনেক কাল পান-সুপারি কিছুই খান নি, নিন একটু।" এই বলিয়া তিনি আমাকে কিছু সুপারি দিলেন।

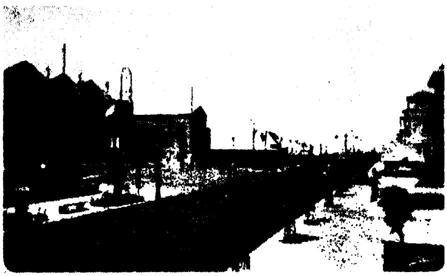


অস্তিয়ায় সমুদ্র-স্নানের দৃশ্য

ট্রেন চলিতে লাগিল। কামরার ভিতর জনতার বাচালতা। বাহিরে উজ্জ্বল রৌদ্রালোকিত শস্যভরা ক্ষেত। এখানে-সেখানে দু-একটা কৃষকের কুটীর। এখানে-সেখানে দু-একটা গরু চরিতেছে। মাঝে মাঝে শস্যগন্ধ বহন করিয়া হঠাৎ বিকালবেলার হাওয়ার প্রবাহ কামরার ভিতর প্রবেশ করিতেছে।

পথ ফুরাইয়াছে। আমরা অস্তিয়াতে পৌঁছিয়াছি। নবপরিচিতকে সঙ্গে করিয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। ষ্টেশনের বাহিরে আসিলাম। সম্মুখে আনন্দ স্ফূর্ত্তি হাসি কোলাহল ও জনতায় ভরা নূতন শহর; সুন্দর ঘরবাড়ি, সুন্দর রাস্তাঘাট। দশ বৎসর আগে এখানে এই শহরের চিহ্নও

ছিল না। তখন যে-কেহ সমুদ্রে স্নান করিবার জন্য ইচ্ছা-মত ময়দানে নির্ব্বস্ত্র হইলে কেহ দেখিবার বা কিছু বলিবার ছিল না। এখন সেই বসতিবিহীন ভূভাগ লোকালয়ে, হোটেলে ও কফিখানায় ভর্ত্তি, তীর ধরিয়া স্নানের জন্য



সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজপথ—অস্তিয়া

শত শত ক্যাবিন ও তাঁবু: বালুকার উপর সকল বয়সের শত শত লোক সূর্য্যালোকে শায়িত, শত শত লোক সমুদ্র-তরঙ্গের সহিত স্বাস্থ্যপ্রদ লড়াইয়ে মত্ত।

এ সমস্তই মুসোলিনীর কাজ। তিনি যে বৎসর দেশের শাসন-বল্গা হাতে নেন, সেই বৎসরই তাঁর মনে রোমান-দিগকে তাহাদের সমুদ্রতীর ফিরাইয়া দেওয়ার সঙ্কল্প জাগে ও কালক্ষেপ না করিয়া রোম হইতে অস্তিয়া পর্য্যন্ত রেলপথ-নির্ম্মাণের আদেশ দেন, পর বৎসর ১৯২৪ সালের ১০ই আগষ্ট এই রেলপথ খোলা হয়।

ইতিপূর্ব্বে ১৯১৮ সালে জোসেফ এলমি নামে রোমের এক বিনয়ী ও সাহসী বাসিন্দা অস্তিয়ার "রোম" নামে স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ১৯২০ সালে "বাস্তিস্তিনা" নামে ঘাট তৈয়ার হয়। ১৯২২ সালে তৈয়ার হয় "প্রিন্সিপে" নামীয় ঘাট।

১৯২৪ সালের ১০ই আগষ্ট সকালবেলা রোম-অস্তিয়া রেলপথ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সেণ্ট পলস্ ষ্টেশন নিশানে নিশানে সাজানো হয়। বেলা ১০টার সময় মুসোলিনী সদলবলে ষ্টেশনে হাজির হন ও সর্ব্বপ্রথম গাড়ীতে আরোহণ করেন। এই প্রথম ট্রেনে সর্ব্বসমেত পাঁচখানা গাড়ী ছিল। তাঁর অনুচরেরা বাকী গাড়ীগুলি দখল করিয়া বসেন।

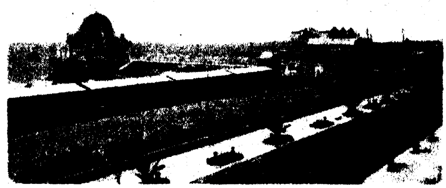
গাড়ী যখন প্রাচীন অস্তিয়াতে পৌঁছে তখন মুসোলিনী ট্রেন হইতে নামিয়া সমবেত জনতার সম্মুখে এক বক্তৃতা দেন ও জনতার নিকট হইতে তাহাদের কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য গ্রহণ করেন। বক্তৃতাশেষে ট্রেন আবার চলিতে আরম্ভ করে ও বেলা সাড়ে দশটার সময় লিদো ষ্টেশনে পৌঁছে। এখানে পূর্ব্ব হইতেই রোম হইতে আগত বহুলোক অস্থির ভাবে মুসোলিনীর আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুসোলিনী ট্রেন হইতে নামা মাত্র তাঁর উপর রীতিমত পুষ্প বর্ষণ হইতে থাকে।

তারপর তিনি নূতন অস্তিয়ার মিউনিসিপালিটির ও স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেন।

সেইদিন হইতে অস্তিয়ার কি দ্রুত উন্নতিই না হইয়াছে!

স্নানের ঘাটগুলি ও লোকালয় ছাড়া এখন আরও অনেকগুলি সুরম্য সৌধ ও পার্ক এই শহরের শোভা বাড়াইয়াছে। অনেকগুলি গৃহ ফিউচারিষ্টিক থিওরী অনুযায়ী নির্ম্মিত হইয়াছে—সাদাসিধা সরলরেখায় তৈয়ারী। বাহিরে ও ভিতরে সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর।

ফিউচারিষ্ট আর্টের মূলকথা আর্টের ভিতর হইতে বক্ররেখার কাজ যতদূর সম্ভব বাদ দেওয়া। আঁকান-বাঁকান, হেলান-দুলান কিছুই থাকিবে না: সমস্তই হইবে



সমুদ্রতীর—অস্তিয়া

সরলরেখার সৌন্দর্য্য। এই আর্ট যে শুধু গৃহ-নির্ম্মাণ আর চিত্রাঙ্কণেই আবদ্ধ তা নয়। ইটালীতে ঘরের আসবাবপত্রও আজকাল এই আদর্শ অনুসারে তৈয়ার হইতেছে। যে-ঘর এই ফিউচারিষ্টিক আসবাবে সাজান, সে ঘরের ভাড়াও বেশী।

শহরের ভিতর দিয়া পায়চারি করিতে করিতে ভদ্র-

লোককে আমি এই সব কথা বলিতে লাগিলাম। তার পর স্নানের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে; স্নান করিবার সময় আর নাই, বিশেষতঃ আমরা স্নানের জামাও সঙ্গে আনি নাই। তাই সমুদ্রের উপরে স্থিত প্রকাণ্ড রেস্তোরাঁতে গিয়া বসিলাম। দুই গ্লাস 'ভিনো'র অর্ডার দিলাম ও সমুদ্র-বায়ু বীজিত হইয়া স্নানের দৃশ্য ও ঢেউয়ের খেলা দেখিতে লাগিলাম। ভারতীয় হইয়া ভিনোর অর্ডার দিলাম বলিয়া দোষ দিবেন না। ভিনো মন্দ নয়। কবি কার্দুচি বলিয়াছেন ভিনো আঙ্গুরের রক্ত। তাছাড়া মনে রাখিবেন ইটালী ব্যাকাস-দেবতার দেশ; মনে রাখিবেন প্রাচীন রোমের নীতিবাগীশ কেটো নিজের বুকে তরবারি চালনা করিবার পূর্ব্বে চাকরকে ভিনোর জন্য হুকুম করিয়াছিলেন।

রেস্তোরাঁ লোকে ভরা। শুধু আমরা দুই জন কালো আদমী। কাজেই ক্ষণেকের জন্য সকলেরই দৃষ্টি আমাদের উপর পড়িল। এক জন যুবক ও যুবতী আমাদের পাশের টেবিলে বসিয়াছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া বলিলেন—"ইজিপশিয়ান"। আমি তাহাদের ভুল সংশোধন করিবার জন্য বলিলাম—"না, ভারতীয়"। তাঁরা ইহাতে একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, কারণ তাঁরা যে ভুল করিয়াছেন ও আমি যে তাহা সংশোধন করিয়া দিব, একথা তাঁহারা ভাবেন নাই। যাহা হউক ইহার ফলে তাঁহারা নিজেদের টেবিল আরও নিকটে আনিয়া আমাদের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ও গান্ধী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। গান্ধীজীর নাম এখানে প্রায় সকলেই জানে। মহিলাটি রবি ঠাকুরের কয়েকখানা বই পড়িয়াছেন। তিনি তাঁর কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। রবিবাবু যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন মহিলাটি নাকি তাঁহাকে নিকট হইতে দেখিয়াছিলেন। বিশেষতঃ রবিবাবুর চোখের গভীর দৃষ্টি নাকি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত তিনি সেই চোখের দৃষ্টি ভুলিতে পারেন নাই। আমাদের দেশের দুই জন মনীষীর প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিলাম। তবে এই শ্রদ্ধা কতদূর আন্তরিক বলিতে পারি না!

হঠাৎ রেস্তোরাঁতে চঞ্চলতা দেখা দিল। এক জন সুবেশা



সমুদ্রতীরস্থ প্রমোদসৌধ—অস্তিয়া

ভারি চটপটে মহিলা ভিতরে ঢুকিলেন। সকলেই ইহাতে একটু উদ্‌গ্রীব ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। আমরা একটু বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম এই মহিলাটি কে। ইটালিয়ান ভদ্রলোক বলিলেন—ইনি আমেরিকার ছায়াচিত্রের বিখ্যাত অভিনেত্রী—গ্রীষ্মে চিত্তবিনোদনের জন্য রোমে আসিয়াছেন। একটু যত্নসহকারে তাঁহার দিকে তাকাইলাম। সিনেমাতে বহুবার এই সুন্দর মুখ দেখিয়াছি বটে। প্রজাপতির মত হাল্কা এর কায়িক আন্দোলন সকল সিনেমা-দর্শকের কাছেই পরিচিত।

আমাদের পক্ষে এই ছায়াচিত্রের অভিনেত্রীর সঙ্গে পরিচয় করার আকাঙ্ক্ষা বামনের চাঁদ ধরিবার আকাঙ্ক্ষারই মত। কাজেই সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আমরা ভিনোর শেষ বিন্দু পান করিয়া রেস্তোরাঁ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

শহরের দক্ষিণে একটি পাইন-বন আছে। এই পাইন-বনে "কাস্তেল ফুজানো" নামে সুন্দর পার্ক। এই পার্কে পূর্ব্বে কোন সম্ভ্রান্ত রোমান পরিবারের বাগানবাড়ি ছিল। এখন ইহা সরকারী সম্পত্তি। সরকার হইতে ইহার দরজা সাধারণের কাছে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই পাইন-বনের দিকে চলিলাম।

সমুদ্রতীর এখন প্রায় জনশূন্য। অধিকাংশ স্নানার্থীই চলিয়া গিয়াছে অথবা কফিখানায় আশ্রয় লইয়াছে। পাইন-বনের ধারে সমুদ্রতীর আরও নির্জ্জন।

আমরা একটা বেঞ্চেতে বসিলাম। আমাদের পিছনে



সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজপথ—অস্তিয়া

পাইন-বনে অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছে ও বাতাস পাইনের ডালে ডালে শিস্ দিয়া যাইতেছে। সম্মুখে সমুদ্রের অনন্ত প্রসার ও পৃথিবীর কানে কানে তার তরঙ্গের কলগীতি। মাথার উপরে যুঁইফুলের মত একটি একটি করিয়া তারা ফুটিয়া উঠিতেছে।

"Era l'ora che volge 'l disio
A' naviganti, e 'ntenerisce il core,
Lo di' ch' han detts a' dolei amici addis :
E che lo nuovo peregrin d' amore
punge, se ode squilla di lontano
Che paia il giorno pianger che si muore."

—এ সেই সময় যখন হৃদয় কোমলতায় ভরিয়া উঠে; যখন প্রিয় বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া নাবিকেরা স্বদেশের কথা মনে করে। এ সেই সময় যখন গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি মরণোন্মুখ দিবার রোদনের মত মনে হয় ও সে ধ্বনি শুনিয়া নব পথিকের মন প্রীতিরসে ভরিয়া উঠে।

দান্তের এই লাইন কয়টি মনে পড়িল। শান্ত বিষাদে মন ভরিয়া উঠিল। গোধূলির অন্ধকারে প্রিয়জনমধুর সুদূর স্বদেশের ছবি তার নদী গিরি বনের সকল সুষমা লইয়া চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। সুকোমল চিন্তা, সুকুমার অনুভূতি ও সুমধুর স্মৃতি আমার মনে স্থান পাইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। ক্রমে শতাব্দীর সিঁড়ি ভাঙিয়া আমি সুদূর অতীতে ফিরিয়া গেলাম,—সেই সুদূর অতীতে, কণিষ্ক ও আগষ্টাসের দিনে, যখন রোমানদিগের নৌকা ভারতীয় বন্দরে আনাগোনা করিত ও মুক্তা, দুর্ম্মূল্য পাথর ও সুগন্ধি মশলায় বোঝাই হইয়া আবার রোমের বন্দরে ফিরিয়া আসিত, যখন ভারতবর্ষ রোমের রাজদরবারে দূত পাঠাইত, আমি সেই যুগে ফিরিয়া গেলাম। আর ভাবিতে লাগিলাম দুই হাজার কিংবা ততোধিক বৎসর কাল পূর্ব্বে হয়ত কোন ভারতীয় সন্তান গোধূলির মনোহর মুহূর্ত্তে আধ-অন্ধকারে রোমের সমুদ্রতীরে বসিয়া আমারই মত স্বদেশের স্বপ্ন দেখিত ও মধুর স্মৃতিতে তার মন বেদনায় বিধুর হইয়া উঠিত।*

কতকক্ষণ আমি এই চিন্তায় ডুবিয়াছিলাম জানি না। ভদ্রলোক আমাকে ঠেলা দিয়া বলিলেন, চলুন যাওয়া যাক। আমি স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রাত্রি তখন সাড়ে নয়টা।

ভদ্রলোককে তাঁর হোটেলে রাখিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলাম তখন রাত্রি গভীর হইয়াছে। গৃহকর্ত্রী দুয়ার খুলিয়া মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—signore e tardi, il cibo e freddo" (আপনার দেরি হয়েছে, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে)।

আমার কোন কৈফিয়ৎ ছিল না, কাজেই বিনা প্রতিবাদে ঠাণ্ডা খাবারই গলাধঃকরণ করিলাম।

* রোম ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্কের কথা—লাটিন-লেখক ক্লাডিয়ুস, অরেলিয়ুস ও কাসিয়ুস লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক প্রেরিত বহু রাজদূতের কথাও তাঁহাদের গ্রন্থে পাওয়া যায়

শবরী

শ্রীস্বর্ণলতা চৌধুরী

মার্কুইসের গৃহে সেদিন উৎসব। শিকারের সময় আসিয়া পড়িয়াছে, তাই এই উৎসব। সান্ধ্যভোজ শেষ হইয়া গিয়াছে, টেবিলের উপর এখন শুধু ফুল আর নানাজাতীয় ফল সাজান। টেবিলের চারিধার ঘিরিয়া অনেকগুলি মানুষ বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিলেন, তাঁহাদের ভিতর এগার জন প্রসিদ্ধ শিকারী, এক জন ঐ স্থানের ডাক্তার এবং বাকি আট জন মহিলা। মহিলাদের মধ্যে সকলেই তরুণী।

গল্পটা হইতেছিল প্রেমের বিষয়। দেখিতে দেখিতে তর্ক বাধিয়া গেল, যে, যথার্থ প্রেম জীবনে একবারই মাত্র অনুভব করা সম্ভব, না একাধিক বার। জীবনে একবার মাত্র যথার্থ ভালবাসিয়াছেন, এমন অনেক লোকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, আবার এমন অনেকের কাহিনীও শুনা গেল যাঁহারা বহুবার ভালবাসিয়াছেন, অথচ সকলবারেই সমান প্রগাঢ়ভাবে।

পুরুষ অতিথিরা সকলেই প্রায় একমত দেখা গেল। তাঁহারা বলিলেন, ভালবাসা রোগের মত, উহা এক ব্যক্তিকেই বহুবার আক্রমণ করিতে পারে। প্রেমের পথে বাধা ঘটিলে উহাতে মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়।

মহিলাদের কিন্তু মত দেখা গেল অন্য প্রকার। তাঁহাদের মত অবশ্য বেশীর ভাগ কাব্য পাঠ করিয়া গঠিত, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাহাতে খুব বেশী ছিল না। তাঁহারা বলিলেন, যথার্থ প্রেম মাত্র জীবনে একবার অনুভব করা যায়। উহা ঠিক বজ্রপাতের মত ব্যাপার, মানুষের জীবনে একবার উহা আসিয়া পড়িলে জীবনকে একেবারে দগ্ধ ও শূন্য করিয়া দিয়া যায়, উহার ভিতর আর ভালবাসার স্বপ্ন মাত্রও প্রবেশ করিতে পারে না।

মার্কুইস্ মহোদয় নিজে বহুবার প্রেমে পড়িয়াছেন, সুতরাং তিনি মহিলাদের মতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ভাবে তর্ক করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করুন, মানুষ অনেকবার ভালবাসিতে পারে এবং সমস্ত মনপ্রাণ দিয়াই পারে। আপনারা অনেক ব্যক্তির কাহিনী বলিলেন যাঁহারা হতাশ প্রণয়ে কাতর হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাহার উত্তরে আমি শুধু এই বলিতে পারি, যে, তাঁহারা ঐ ভুলটি না করিলে, ঐ প্রেমব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিতেন, এবং আবার বহুবার প্রেমে পড়িতেন। প্রেমিকের সঙ্গে মাতালের বিশেষ একটা সাদৃশ্য আছে। একবার মদ খাওয়া ধরিলে যেমন বার-বার না খাইয়া থাকিতে পারা যায় না, তেমনি একবার প্রেমে পড়া সুরু করিলে, বার-বার প্রেমে পড়া অনিবার্য্য।"

সকলে মিলিয়া তখন বৃদ্ধ ডাক্তারকে সালিশ মানিয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তার পূর্ব্বে পারিসে ব্যবসায় চালাইতেন, এখন শহর ছাড়িয়া মার্কুইসের জমিদারীতে বাস করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "এ-বিষয়ে আমার যে কোনো একটা পাকা মত আছে তা নয়। তবে আমি একটি প্রেমের ইতিহাস জানি, যাহা পঞ্চান্ন বৎসর সমানভাবে টিকিয়াছিল, এক দিনের জন্যও যাহার ভিতর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই।"

মার্কুইসের পত্নী আনন্দে করতালি দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি সুন্দর! এই ভাবে ভালবাসা পাওয়া সুখস্বপ্নের মত মনোহর। পঞ্চান্ন বৎসর ধরিয়া এইরূপ ভালবাসা যে-পুরুষ পাইয়াছে, সে বাস্তবিকই সুখী, জীবনে সে-ই যথার্থ আনন্দ পাইয়াছে।"

ডাক্তার হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি এই ভালবাসা লাভ করিয়াছিল, সে পুরুষই বটে। সে পুরুষটির নাম করিলেই আপনারা তাহাকে চিনিতে পারিবেন। সে শ্রীযুক্ত শুকে, এই স্থানের ঔষধ-বিক্রেতা। স্ত্রীলোকটিকেও চিনিতে পারিবেন। প্রতি বৎসর চেয়ার মেরামত করিতে যে স্ত্রীলোকটি আপনার বাড়ি আসিত, আমি তাহারই কথা বলিতেছি।

মহিলাদের উৎসাহ এক নিমেষেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাঁহাদের সকলের মুখেই দারুণ একটা অবজ্ঞার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, যেন ধনী এবং বনিয়াদী ঘরের মানুষ ভিন্ন আর কাহারও ভালবাসা, ভালবাসা নামেরই যোগ্য নহে।

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, "তিন মাস আগে আমাকে এই নারীটির মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সে ইহার পূর্ব্বদিনে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার একখানা ঘোড়ার গাড়ী ছিল, উহাই সে গৃহরূপেও ব্যবহার করিত; ঘোড়াটা বৃদ্ধ ও শীর্ণ, আপনারা সকলেই উহাকে দেখিয়াছেন। তাহার দুইটি কালো রঙের বড় বড় কুকুর ছিল, তাহারাই ঐ স্ত্রীলোকটির বন্ধু ও রক্ষকের কাজ করিত। আমি ভিন্ন, গ্রামের পুরোহিতও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্ত্রীলোকটি আমাদের দুই জনকে তাহার উইলের এক্জিক্যুটার নিযুক্ত করিল। তাহার অন্তিম ইচ্ছাগুলির মর্ম্ম যাহাতে আমরা ভালভাবে বুঝিতে পারি, এইজন্য সে আমাদের তাহার জীবনের ইতিহাস বলিয়া গেল। এই কাহিনীটির মত অদ্ভুত ও করুণ কাহিনী আমি আর শুনি নাই। তাহার পিতামাতা উভয়েই চেয়ার-মেরামতের কাজ করিত, গাড়ী ভিন্ন, মাটির উপর নির্ম্মিত গৃহে সে কোনো দিন বাস করে নাই। শিশুকালটা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিয়া পথে পথে ঘুরিয়াই তাহার দিন কাটিয়া গিয়াছে।

তাহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং সর্ব্বদাই গ্রামের বাহিরে আসিয়া আস্তানা গাড়িত। মাঠের বেড়ার ধারে গাড়ী থামাইয়া তাহারা ঘোড়াটিকে খুলিয়া দিত। ঘোড়াটা মাঠে ঘাস খাইত, কুকুরগুলি গাড়ীর সামনে, থাবার উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইত, এবং শিশুটি ঘাসের উপর খেলা করিত। উহার পিতামাতা গাছতলায় বসিয়া গ্রামের যত ভাঙা চেয়ার মেরামত করিত। এই ভ্রাম্যমান পরিবারটিতে কথাবার্ত্তা কহার রেওয়াজ বিশেষ ছিল না। কে গ্রামের পথে, "চেয়ার মেরামত করি গো," বলিয়া হাঁকিয়া যাইবে, ইহা স্থির করার পরই তাহারা নীরবে বেত বুনিতে আরম্ভ করিত। শিশুটি যদি খেলা করিতে করিতে বেশী দূর চলিয়া যাইত, অথবা গ্রামের কোনো ছোক্‌রার সঙ্গে ভাব করিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে উহার বাবা রুষ্টভাবে চীৎকার করিয়া উঠিত, "এদিকে আয় বল্‌ছি লক্ষ্মীছাড়ী।"

ইহা ভিন্ন আর কোনো আদরের ডাক সে কখনও কানে শোনে নাই। যখন সে কিছু বড় হইল, তখন ভাঙা চেয়ার সংগ্রহ করার জন্য তাহার বাবা ও মা তাহাকে মাঝে মাঝে গ্রামের ভিতরে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। এখন সে এক-আধ জন গ্রাম্য বালকের সঙ্গে ভাব করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু বালকগুলির পিতামাতা এই সখ্যের চেষ্টা দেখিলেই চটিয়া আগুন হইয়া যাইতেন। ছেলেদের ফিরিয়া আসিবার জন্য রূঢ়ভাবে ডাক দিয়া বলিতেন, "শীগ্‌গির চলে এস লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! যত রাজ্যের ভিখিরীর বাচ্চার সঙ্গে ভাব করতে হবে না।"

কখনও কখনও গ্রামের বালকেরা এই ছেঁড়া কাপড়-পরা বালিকাকে ঢিল ছুড়িয়া মারিত। গ্রামের গৃহিণীরা কখনও কখনও দয়া করিয়া বালিকাকে দুই-চারিটি পয়সা দিতেন। সে সেগুলি সযত্নে জমা করিয়া রাখিত।

এক দিন এই গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে বালিকা বালক শুকেকে দেখিতে পাইল। বালকের কোনো বন্ধু তাহার হইতে দুইটি পয়সা কাড়িয়া লইয়াছিল বলিয়া সে সমাধিক্ষেত্রের পিছনে দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছিল। এই দরিদ্র বালিকার মনে বালকের রোদন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করিল। ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা সর্ব্বদাই সুখী ও সন্তুষ্ট থাকে, ইহাই ছিল তাহার ধারণা। সে বালকের নিকটে আসিয়া তাহার রোদনের কারণ শুনিতে পাইল, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার হাতে নিজের এতদিনের সঞ্চয়, সাতটি পয়সা ঢালিয়া দিল। পয়সাগুলি হাতে পাইয়া বালকের কান্না তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল, সে নিজের চোখ মুছিয়া ফেলিল। বালিকা আনন্দে আত্মহারা হইয়া বালককে চুম্বন করিতে লাগিল। ছেলেটি পয়সাগুলি নিরীক্ষণ করিতে ব্যস্ত ছিল, সে কোনো বাধা দিল না। গালাগালি বা মার না খাইয়া বালিকার সাহস বাড়িয়া গেল, সে শুকেকে জড়াইয়া ধরিয়া, বারকয়েক চুম্বন করিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল।

দরিদ্র বালিকার মনে কি ভাবের ধারা বহিতে লাগিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। বালকটির প্রতি তাহার

চিত্ত কেন যে এত আকৃষ্ট হইল তাহা বুঝা যায় না। হয়ত তাহাকে নিজের অতিকষ্টসঞ্চিত অর্থ দান করার জন্যই কোনোদিন বালিকা ছেলেটিকে ভুলিতে পারিল না, অথবা তাহাকেই ভালবাসিয়া প্রথম চুম্বন করিতে পাওয়ার জন্যই ভুলিল না। বয়োবৃদ্ধ বা বালকবালিকা, সকলেরই মনে এক রহস্যময় প্রবৃত্তি কাজ করে।

অনেক মাস ধরিয়া সে শুধু এই বালকটির এবং সেই সমাধিক্ষেত্রের পিছনের জায়গাটির স্বপ্ন দেখিত। যদি তাহার সহিত আবার দেখা হয়, এই আশায় সে চুরি করিয়া পয়সা জমা করিতে লাগিল। চেয়ার-মেরামতের মজুরি হইতে কখনও কখনও সে দু-এক পয়সা সরাইয়া রাখিত, বাবা মা খাবার জিনিষ কিনিতে পাঠাইলে তাহা হইতেও এক-আধ পয়সা রাখিয়া দিত। এই গ্রামে আবার যখন সে ফিরিল, তখন সে দুই ফ্রাঁ জমা করিয়াছে, কিন্তু তাহার বালকবন্ধুটিকে সে নিকট হইতে দেখিতে পাইল না। একবার মাত্র দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইল, খুব ফিটফাট সাজিয়া সে নিজের বাবার ঔষধের দোকানের জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দুই ধারে রঙীন জলের বোতল আর রঙীন কাঁচের ফুলদানি। জিনিষ-গুলির সৌন্দর্য্যে বালিকা একেবারে মোহিত হইয়া গেল, বালকের প্রতি ভালবাসাও তাহার বাড়িয়া গেল।

বালকের চিরউজ্জ্বল স্মৃতি সে হৃদয়ের কোণে ঐশ্বর্য্যের মত সঞ্চিত করিয়া রাখিল। পরের বৎসর যখন সে তাহাকে আবার দেখিল, তখন শুকে একটু বড় হইয়াছে, স্কুলের পিছনের মাঠে সে বন্ধুদের সঙ্গে গুলি খেলিতেছিল। বালিকা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এমন আবেগের সহিত তাহাকে চুম্বন করিতে আরম্ভ করিল যে, শুকে ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার কান্না থামাইবার জন্য বালিকা নিজের এতদিনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ, দুই ফ্রাঁ, কুড়ি সেন্টিম, তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল। এত পয়সা বালক কোনো দিন একসঙ্গে হাতে পায় নাই। তাহার কান্না তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল, বালিকা যত ইচ্ছা তাহাকে আদর করিতে লাগিল, তাহাতে কোনো আপত্তি না করিয়া শুকে একদৃষ্টে বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া রহিল নিজের হাতের মুদ্রাগুলির দিকে।

ইহার পর চার বৎসর ধরিয়া যখনই বালকের সহিত ঐ বালিকার দেখা হইত, সে তাহাকে যথা ইচ্ছা চুম্বন করিতে দিত, অবশ্য বালিকার সঞ্চিত পয়সাগুলির পরিবর্ত্তে। একবার সে ত্রিশ স্যু পাইল, একবার দুই ফ্রাঁ, আর একবার বারো স্যু। এত অল্প পয়সা দেওয়ার জন্য এই তৃতীয়বার বালিকা লজ্জা ও ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিল, কিন্তু বৎসরটা বড় খারাপ যাওয়াতে কোনোমতেই সে ইহার বেশী সঞ্চয় করিতে পারে নাই। কিন্তু পরের বৎসর সে সুদে-আসলে পোষাইয়া দিল। চক্চকে বড় একটি পাঁচ ফ্রাঁ মুদ্রা বালকের হাতে দিতেই আনন্দে সে হাসিয়া উঠিল, দরিদ্রা বালিকা ধন্য হইয়া গেল।

এই বালকটিই তাহার জীবনধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বালকটিও খুব উৎসুক ভাবে তাহার আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিত, তাহাকে দেখিতে পাইলেই দৌড়িয়া তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইত। ইহাতে বালিকা একেবারে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইত।

হঠাৎ বালিকাটিকে আর গ্রামে দেখা গেল না। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বালিকা জানিতে পারিল, যে, তাহাকে এক বোর্ডিং স্কুলে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তখন হইতে সে বাবা-মায়ের পিছনে লাগিল, যাহাতে তাহারা এই গ্রামে আসার সময়টা পরিবর্ত্তন করে। স্কুল যখন ছুটি থাকে, তখন এখানে আসিলে সে বন্ধুকে দেখিতে পাইবে ইহাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। এক বৎসর চেষ্টা করার পর সে বাপ-মাকে রাজী করিতে পারিল।

দুই বৎসর পরে সে বালককে আবার দেখিতে পাইল। শুকের চেহারা ও ধরণধারণ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। সে অনেক লম্বা ও সুন্দর হইয়াছে, ঝক্ঝকে পিতলের বোতাম-দেওয়া জামাতে তাহাকে এমন চমৎকার দেখাইতেছে যে, বালিকা প্রথমে তাহাকে প্রায় চিনিতেই পারে নাই। বালক এমন ভাণ করিল যেন সে বালিকাকে দেখিতেই পায় নাই, গম্ভীরভাবে পাশ কাটাইয়া সে চলিয়া গেল। দুই দিন ধরিয়া বালিকা অবিশ্রাম অশ্রুবর্ষণ করিল। ইহার পর হইতে সে নীরবে এই বেদনা সহ্য করিতে লাগিল।

প্রত্যেক বৎসরই সে এখানে ফিরিয়া আসিত। শুকের পাশ দিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু তাহার সঙ্গে কথা কহিতে সাহস পাইত না। শুকে তাহার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিত না। এই মানুষটিকে ঐ যৌবনোন্মুখী বালিকা পাগলের মত ভালবাসিতে আরম্ভ করিল। মরিবার আগে সে আমায় বলিয়াছিল, "ডাক্তার, আমি অন্য কোন পুরুষের দিকে এ-জীবনে চাহিয়া দেখি নাই, জগতে আর কোনো পুরুষ মানুষ যে আছে, তাহাই আমার মনে হইত না।"

কিছুদিন পরে তাহার পিতামাতা উভয়েই মারা গেল। মেয়েটি তাহাদের ব্যবসা চালাইতে লাগিল। দুইটি প্রকাণ্ড বড় বড় কুকুর সংগ্রহ করিয়া রাখিল, তাহাদের ভয়ে কেহ আর উহার কাছে আসিত না।

এক বৎসর সবে সে গ্রামে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময় দেখিল একটি যুবতী তাহার প্রিয়তমের হাত ধরিয়া ঔষধের দোকান হইতে বাহির হইতেছে। যুবতী শুকের পত্নী, অল্পদিন হইল তাহাদের বিবাহ হইয়াছে।

এখানে টাউন-হলের পাশে একটি ছোট পুকুর আছে, সন্ধ্যারাত্রে ভগ্নহৃদয়া নারী তাহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কিন্তু আত্মঘাতিনী হওয়াও তাহার অদৃষ্টে ছিল না। একটা মাতাল পথে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাকে দেখিতে পাইল, এবং টানিয়া তুলিল। কয়েক জন লোক ধরাধরি করিয়া তাহাকে গ্রামের একমাত্র ঔষধালয়ে বহন করিয়া লইয়া গেল। শুকে ড্রেসিং গাউন পরিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতে নামিয়া আসিল। তাহার ভিজা কাপড় ছাড়ান হইল, গা ঘষিয়া গরম করা হইল। যেন তাহাকে চিনিতে পারে নাই, এমন মুখ করিয়া যুবক বলিল, "তুমি কি পাগল হয়েছ? এরকম বোকামী আর কখনও ক'রো না।"

এই কয়টি কথাতেই ঐ হতভাগিনীর সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা যেন জুড়াইয়া গেল। প্রিয়তম তাহার সহিত কথা বলিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া ইহারই আনন্দে সে দিশেহারা হইয়া রহিল। যুবক ডাক্তার তাহার শুশ্রূষার জন্য টাকা লইতে রাজী হইল না, যদিও নারী টাকা দিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইয়াছিল।

এই ভাবেই তাহার জীবন কাটিয়া চলিল। চেয়ার মেরামত করিতে করিতে সে শুধু নিজের প্রিয়তমের স্বপ্ন দেখিত। প্রত্যেক বৎসর গ্রামে আসিয়া সে তাহাকে দেখিয়া যাইত। অনর্থক দোকানে গিয়া, টাকা দিয়া নানা রকম ঔষধ কিনিত, যাহাতে সে তাহার কাছে যাইতে পারে, তাহার সঙ্গে কথা বলিতে পারে, এবং তাহাকে কিছু টাকা দিতে পারে।

আমি গোড়াতেই বলিয়াছি, এই বসন্তকালে ঐ নারীর মৃত্যু হইয়াছে। এই দুঃখভরা জীবনকাহিনী বলা শেষ করিয়া সে আমাকে ও পুরোহিতকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছে, যেন তাহার চিরজীবনের সঞ্চিত অর্থ আমরা তাহার ভালবাসার একমাত্র পাত্রের হাতে পৌঁছাইয়া দিই। তাহাকে দিবার জন্যই সে কেবল অর্থ সঞ্চয় করিত। কাজ করিবার তাহার আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। নিজে ভাল করিয়া আহার পর্য্যন্ত সে করিত না, পাছে তাহার সঞ্চিত অর্থ অধিক না হয়। তাহার মৃত্যুর পর কিছু টাকা হাতে পাইলে শুকে একবার অন্ততঃ তাহাকে স্মরণ করিবে, এই ছিল তাহার আশা। আমাদের হাতে সে দুই হাজার তিন শত সাতাশ ফ্রাঁ দিয়া গিয়াছিল। তাহার শেষনিশ্বাস পড়িবার পর আমি তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সাতাশ ফ্রাঁ পুরোহিতের হাতে দিয়া বাকি টাকা লইয়া চলিয়া আসিলাম।

পরদিন দুপুরবেলা আমি টাকা লইয়া শুকের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম। স্বামী-স্ত্রী সবেমাত্র তখন মাধ্যাহ্নিক আহার শেষ করিয়া দুখানি চেয়ারে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছে। দুই জনেরই বেশ গোলগাল চেহারা, টক্‌টকে রং এবং সন্তুষ্ট মুখের ভাব। ঘরখানি গন্ধদ্রব্য ও ঔষধের সৌরভে ভরপুর।

তাহারা তাড়াতাড়ি আমাকে বসিতে আসন দিল। আমি বসিয়া নিজের বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিলাম। আবেগে আমার গলা ভারি হইয়া আসিয়াছিল, আমার ধারণা ছিল, কাহিনীটি শুনিয়া তাহারা কাঁদিয়া ফেলিবে।

শুকে যেই বুঝিতে পারিল, যে, ঐ দরিদ্রা ভিখারিণীর ন্যায় স্ত্রীলোক, যে ভাঙা চেয়ার মেরামত করিয়া দিনপাত করিত, সে তাহাকে ভালবাসিতে সাহস করিয়াছিল, রাগে তাহার মাথার চুল পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। তাহার রকম দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ঐ হতভাগিনী

কোদাল নামাইয়া রাখিল, শেষকালে কাহার-না-কাহার কোপে পড়িয়া পৈতৃক প্রাণটা খোয়াইবে? শ্রীকণ্ঠ যুক্ত-[illegible] নমস্কার করিয়া বলিল, "বাগ্‌দী-জনম তোর সার্থক [illegible] গেল রে। মাকে তুই উদ্ধার করলি।"

[illegible] কোদাল রাখিয়া দিয়া সবাই হাত দিয়াই প্রতিমার চার পাশের মাটি সরাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রতিমাটি প্রায় সম্পূর্ণই বাহির হইয়া পড়িল। একেবারে নিখুঁৎ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ মূর্ত্তি, কোথাও ভাঙিয়া চুরিয়া বা টোল খাইয়া নষ্ট হয় নাই। স্ত্রীমূর্ত্তি বটে, তবে কোন্ দেবীর তাহা স[illegible]ত মজুরের দল বুঝিতে পারিল না। দুর্গা-[illegible]মা নয়, কারণ দুইখানি মাত্র হাত; কালীমূর্ত্তি নয়, কারণ বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা; সরস্বতী নয়, কারণ হাতে বীণা নাই। এক লক্ষ্মী হইলে হইতে পারে, যদিও লক্ষ্মীরও বিশেষ কোনো লক্ষণ ইহাতে বিদ্যমান নাই। শ্রীকণ্ঠ বোবাল ইহাদের মধ্যে একমাত্র পণ্ডিত, সে মনে মনে যুক্তি করিয়া ইহাই স্থির করিল। মজুরের দলকে ঠেলা দিয়া খানিকটা সরাইয়া দিয়া বলিল, "সর বেটারা সর, তোদের ছায়াও যেন মা-লক্ষ্মীর গায়ে না লাগে। খবরদার কেউ হাত দিবি না, ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ যেন স্পর্শ না করে। আমি বাবুকে খবর পাঠাচ্ছি, তাঁর কি সৌভাগ্য! ধন্য হয়ে গেলেন। এ মায়েরই কাজ রে বেটারা। না-হ'লে আমাদের বুড়ীরাণী ঠাকরুণ নব্বুই বছর বেঁচে থেকে এখনই বা মরবেন কেন, আর বাবুই বা তাঁর নামে দীঘি কাটাতে যাবেন কেন?"

মজুরের দলে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। লক্ষ্মী-ঠাকরুণ এমন নিজ মূর্ত্তিতে দেখা না দিয়া, রজত বা স্বর্ণমুদ্রা রূপে আবির্ভূতা হইলে তাহারা যথেষ্ট বেশী খুশী হইত। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ। লক্ষ্মীকে ভূগর্ভের অন্ধকারা হইতে বাহিরে টানিয়া আনিয়া তাহাদের পুণ্যলাভ হইল বটে, কিন্তু পেট ত ভরিল না?

দুই জন মজুর ঊর্দ্ধশ্বাসে কাছারী-বাড়ির দিকে ছুটিল। জমিদারবাবুকে খবর দিতে হইবে, তিনি যাহাতে পুরোহিত মহাশয়কে লইয়া আসিয়া যথাশাস্ত্র প্রতিমাটিকে মাটি হইতে উত্তোলন করেন। শ্রীকণ্ঠ গর্ত্তের পাশে পাহারায় থাকা হইয়া রহিল, মজুরের দল চারি পাশে, কিন্তু কিছু দূরে, তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিল।

খবরটা শুধু যে জমিদারবাবুই পাইলেন তাহা নহে, দুই ক্রোশের মধ্যে যে যেখানে ছিল সকলেই পাইল। ঘণ্টা-দুয়ের ভিতর মাঠটা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও শীঘ্রই আসিতেছেন বলিয়া শোনা যাইতে লাগিল। গর্ত্তটির কাছে ত তিল ফেলিবার স্থান রহিল না, এবং পিছনের লোকেরাও আগাইয়া আসিবার চেষ্টায় ক্রমাগত চারিদিক হইতে ঠেলা দিতে লাগিল। একটা তুমুল কোলাহল বাধিয়া গেল।

জমিদারবাবু স্বয়ং কুলপুরোহিত এবং আরও কয়েক জন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি জনতার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া পাইকদিগকে হুকুম দিলেন, ঠেলা দিয়া লোকজনকে একটু দূরে সরাইয়া দিতে, না হইলে তাঁহারাই যে গর্ত্তে পড়িয়া যাইবেন?

ঠেলাঠেলিতে গোলমাল আরও বাড়িয়া গেল, তবে গর্ত্তের চারি ধারের ভীড়টা একটুখানি পাতলা হইল বটে। তখন ব্রাহ্মণ কয় জন মিলিয়া কালোচিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক প্রতিমাটিকে ধরাধরি করিয়া মাটি হইতে তুলিয়া ফেলিল। সুন্দর প্রতিমা, আশ্চর্য্য তাহার গঠন-নৈপুণ্য। লম্বায় তিন ফুট প্রায় হইবে। জমিদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের তৈরি ঠাকুর? পেতল ব'লে বোধ হচ্ছে না?"

পুরোহিত বলিলেন, "উত্তমরূপে মার্জ্জন প্রয়োজন, কলঙ্ক ধরে গেছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

পিছন হইতে নিতাই-স্যাকরা উঁকি মারিতেছিল। সে উৎসাহ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "এজ্ঞে, আমায় একবার দেখতে দিলে হ'ত। আমার যেন মনে হচ্ছে পিতল নয়, এ আসল মাল।"

জমিদারবাবু বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বলিস কি রে, সোনা? দেখত ভাল ক'রে।"

স্বর্ণকারের দেবীপ্রতিমা স্পর্শ করিবার অধিকার আছে কি নাই তাহা আগ্রহাতিশয্যে সকলেই ভুলিয়া গেল। নিতাই নিকটে আসিয়া মূর্ত্তিটিকে ভাল করিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল, "এজ্ঞে, সোনাই বটে।"

চারি দিকে একেবারে হৈ হৈ বাধিয়া গেল। ভাগ্যক্রমে

ঠিক এই সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, স্থানীয় একটি ঐতিহাসিক এবং এক জন প্রত্নতাত্ত্বিককে সঙ্গে করিয়া আসিয়া জুটাতে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিতে বাধিতে থামিয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেটের মোটরটা দেখিয়াই জনতা পিছন হাটিতে আরম্ভ করিল।

আগন্তুক তিন জন সোজাসুজি অগ্রসর হইয়া গিয়া প্রতিমাটি‌কে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকে প্রায় হাতাহাতি বাধিয়া গেল মূর্ত্তিটি লক্ষ্মীর, না পদ্মিনীর, না যক্ষিণীর তাহা লইয়া। কোনো কিছুরই সঙ্গে ইহা বিশেষ মেলে না, সুন্দরী বালিকা বা কিশোরীর মূর্ত্তির মত, আলুলায়িত কুন্তলা, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার।

রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল, কিন্তু কোনো মীমাংসাই হয় না। লক্ষ্মীমূর্ত্তি বলিয়া প্রমাণ করা যায় না, সুতরাং সোজাসুজি লইয়া গিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করাও চলে না। পদ্মিনী বা যক্ষিণী যাহাই হউক, জিনিষটি সোনার। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেটিকে সহজে হাতছাড়া করিতে রাজী হইলেন না। স্থির হইল, ইহা সম্প্রতি তাঁহারই হেফাজতে থাকিবে, বিশেষজ্ঞের অভিমত লইয়া তাহার পর যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাইবে। যদি দেবীমূর্ত্তি বলিয়া স্থির হয়, তাহা হইলে জমিদারবাবু উহা লইয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, যক্ষিণী বা পদ্মিনী হইলে স্থানীয় মুজিয়ামে উহার স্থান হইবে, আর যদি কিছুই স্থির না করা যায়, তাহা হইলে উহা সরকারের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে।

মূর্ত্তিটি ভারী কম নয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞায় মজুরের দল তাহা বহন করিয়া লইয়া চলিল, তাঁহার মোটরে তুলিয়া দিবার জন্য। এখন আর তাহাদের কোনো দোষ হইল না। জনতা দুই ফাঁক হইয়া তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিল, এবং মূর্ত্তিটি নয়নগোচর হইবামাত্র সকলে সেটিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগিল। সাহেব গাড়িতে উঠিয়া বসিবামাত্র মোটর সশব্দে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং ক্ষুব্ধ জনতাকে পশ্চাতে ফেলিয়া মিনিট-দুইয়ের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল। জমিদারবাবু মনের ক্ষেদ মনেই রাখিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন। দীঘিকাটার কাজ সেদিন আর অগ্রসর হইল না।

কিছুদিন ধরিয়া মূর্ত্তিটি লইয়া ক্রমাগত তর্কাতর্কি ও আলোচনা চলিতে লাগিল। দেশ-বিদেশের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ আসিয়া জুটিলেন, কাগজে কাগজে ইহার ছবি ও বিবরণ বাহির হইল, সংবাদ-প[...]ত্রে অসংখ্য মন্ত[...] হইল, কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত কিছুই প্রমাণ হইল না। ম[...] সাহেব মদন ও মোহন বাগদীকে দশ দশ টাকা পুর[...] ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন। জ[...] নিষ্ফল ক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দেশের [...] প্রথম কিছুদিন স্বর্ণপ্রতিমার বিষয় উদয়াস্ত আলোচনা করি[...] তাহার পর নিজেদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ভাবনা[...] তাহার ভাবনা ভুলিয়া গেল। কোন্ এক সময় বাষ্পীয়পোতে চড়িয়া স্বর্ণময়ী মূর্ত্তিটি ভারতবর্ষের তটভূমি ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তাহার খোঁজও কেহ রাখিল না।

২

প্রতিমাটি দেবীমূর্ত্তি নয়। ইহার আসল বিবরণ এই।

দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে, দেশের এই অংশ গভীর অরণ্যের প্রান্তবর্ত্তী ছিল। কিন্তু দেশের মানুষের দেহে তখন ছিল অসুরের শক্তি, মনে ছিল অসীম বল। বাঘ, ভালুক, হাতীর সঙ্গে নিত্য দেখাসাক্ষাৎ করিয়াই তাহাদের দিন কাটিত। বন্দুকের চলন প্রায় ছিল না, তবু রামদা, বর্শা, কোঁচ, জাঠা প্রভৃতির সাহায্যে এই ভীষণ জন্তুদিগকে বধ করার মধ্যে লোকে তখন বিস্ময়কর কিছুই দেখিত না। স্ত্রীলোকে পর্য্যন্ত তখন অস্ত্রের ব্যবহার জানিত এবং প্রয়োজন হইলে অকুতোভয়ে চোর-ডাকাত বা ব্যাঘ্র-ভালুকের সামনে দাঁড়াইত।

ঐ অংশের জমিদার ছিলেন তখন রাজবল্লভ রায়। বীরত্ব ও চরিত্রের খ্যাতি তাঁহার এমনই ছড়াইয়া ছিল যে দেশের লোকে মিলিয়া তাঁহার নাম দিয়াছিল রাজা রাজবল্লভ।

রাজবল্লভ পারিবারিক জীবনে সুখী ছিলেন না। বনের পশুদিগের রাজ্য জোর করিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা কাড়িয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই যেন ঐ অরণ্যচারী জীবদের প্রতিহিংসাবৃত্তি তাঁহার পরিবারের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই উত্তেজিত হইয়া থাকিত। তাঁহার পিতা প্রাণ হারাইয়াছিলেন হাতী শিকার করিতে গিয়া, তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ব্যাঘ্রের মুখে

পড়িয়া মারা যান। জামাতা নৌকাডুবি হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, কেহ কেহ বা বলেন যে কুম্ভীরে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

প্রৌঢ় রাজবল্লভের পরিবার বলিতে তখন এক পুত্র দেবকীনন্দন, বিধবা কন্যা যোগমায়া, এবং পৌত্রী চন্দ্রাননা। চন্দ্রাননার মাতা অবশ্য ছিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্যহীনতার জন্য প্রায় সকল সময়ই তাঁহাকে শুইয়া থাকিতে হইত, তাই তিনি যে একটা মানুষ আছেন, তাহা সব সময় লোকের মনে থাকিত না। দেবকীনন্দনের যদি পুত্র-সন্তান না জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে রাজবল্লভের বংশের এইখানেই অবসান, এই একটা দুশ্চিন্তা সকলেরই মনে সারাক্ষণ জাগিয়া থাকিত। চন্দ্রাননার বয়স দশ-এগার বৎসর, ইহার পর আর তাহার মাতার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। দেবকীনন্দনের যে অবিলম্বে আবার বিবাহ করা উচিত, এই লইয়া ক্রমাগত কাণাঘুষা চলিত। দেবকীনন্দনের কানেও যে কথাটা না-যাইত তাহা নয়, কিন্তু বাঘ-ভালুক মারিয়া বেড়ানর দিকেই তাহার সমস্ত মন পড়িয়া থাকিত, বিবাহের ভাবনা ভাবিবার তাহার অবসর ছিল না। সেই বীরত্বের জন্য বিখ্যাত যুগেও সেরা বীর ও শিকারী বলিয়া দেবকীনন্দনের নাম রটিয়া গিয়াছিল। সংসার ও জমিদারী দেখিবার জন্য বিধবা ভগিনী এবং পিতা ছিলেন, স্ত্রীকে কেহই দেখিত না চাকর দাসী ভিন্ন, কাজেই দেবকীর পুরা ছুটি ছিল। চন্দ্রাননা সকলেরই নয়নের তারা ছিল, সুতরাং তাহার ভাবনাও তাহার পিতাকে বিন্দুমাত্র ভাবিতে হইত না।

শরৎকালটা প্রাচীন যুগ হইতে বিখ্যাত মানুষকে ঘরের বাহির করিবার জন্য। রাজারা এই সময় দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন, সওদাগর যান বাণিজ্যে, শিকারী যান মৃগয়ায়। অবিশ্রাম বর্ষণে বাধ্য হইয়া ঘরের কোণে বসিয়া বসিয়া মানুষের প্রাণ হাফাইয়া ওঠে। তাই শরৎকালের নীল আকাশ যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতে থাকে। যে যে-রকম ছুতা পায়, তাহাই ধরিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

দেবকীনন্দনও দলবল লইয়া শিকারে বাহির হইবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। এ বৎসর বনের ধারের গ্রামগুলিতে ব্যাঘ্রের উৎপাত অত্যন্ত রকম বাড়িয়া গিয়াছিল। বিশেষ করিয়া একটা নর-খাদকের অত্যাচারে ঘরে ঘরে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার বল যেমন অসাধারণ, বুদ্ধিও তেমনি অদ্ভুত। ভীত গ্রামবাসীদের চক্ষে তাহার চেহারা পর্য্যন্ত অলৌকিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আকৃতি তাহার এত বড় যে হঠাৎ দেখিলে বাঘ না মনে হইয়া বড় একটা ঘোড়া মনে হয়, পিঙ্গল চোখ দিয়া তাহার যেন নরকের আগুন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতে থাকে। সব চেয়ে অদ্ভুত এই যে তাহার দুইটার বদলে তিনটা চোখ বলিয়া ভ্রম হয়। কপালে অবিকল একটা চোখের মত ছবি। উহা যে সাধারণ ব্যাঘ্র নয়, কোনো দেবতার অবতার, এই বিশ্বাস ক্রমেই গ্রামবাসীদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তাহাতে ব্যাঘ্রপ্রবরের সুবিধা বই অসুবিধা ছিল না। সে নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিত, কুটীরেসুদ্ধ প্রবেশ করিয়া মানুষ টানিয়া লইয়া যাইত। ত্রস্ত গ্রামবাসীরা তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিবারই চেষ্টা অধিক করিত। তাহাকে যে মানুষে মারিতে পারে, এ-বিশ্বাস ক্রমেই তাহাদের চলিয়া যাইতেছিল।

ব্যাঘ্রপ্রবরের বিবরণ দেবকীনন্দনেরও কর্ণগোচর হইয়াছিল। সে হাসিয়া বলিত, "আকাশ ফরসা হ'তে দাও, তারপর তিনটে চোখের আগুনই একসঙ্গে নিবিয়ে দেব।" তাহার বয়স্যের দলও সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল করিয়া হাসিত।

বাঘ মারিবার জন্যই এবার সে তাড়াতাড়ি বাহির হইবার আয়োজন করিতেছিল। আর তিন-চার দিন পরেই যাত্রা করার কথা। যত দূর খোলা মাঠ আছে, হাতীর পিঠে যাওয়া যাইবে, তাহার পর পায়ে হাঁটিয়া স্থল-পথে, বা নৌকা করিয়া জলপথে। যতই ঘুরিতে হউক, নর-খাদকের আবাসস্থল তাহাকে আবিষ্কার করিতেই হইবে।

সারা দিনের ভিতর একবার মাত্র আহারের সময় দেবকীনন্দন অন্দর-মহলে প্রবেশ করিত। সেদিন আসনে বসিবামাত্র চন্দ্রাননা তাঁহার পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "বাবা, এবার যে বাঘটা মারবে, তার ছালটা আমি নেব।"

দেবকীনন্দন হাসিয়া বলিল, "কেন রে? তুই কি সন্ন্যিসি হবি?"

চন্দ্রাননা বলিল, "না আমার চাই, আমি আসন করব।"

যোগমায়া তাড়া দিয়া বলিল, "নাম দেখি কাঁধের উপর থেকে। মানুষকে খেতেও দেবে না।"

চন্দ্রাননা নামিয়া পড়িল। যোগমায়া ভ্রাতাকে বাতাস করিতে করিতে বলিল, "বৌ একবার তার ঘরে যেতে বলেছে।"

দেবকীনন্দন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" যোগমায়া বলিল, "ওমা, এর আবার কেন কি? দশ দিন অন্তরও ত একবার ও-মুখো হও না, তার কি একবার ইচ্ছাও হয় না দুটো কথা কইতে?"

দেবকীনন্দন সংক্ষেপে বলিল, "বেশ যাব।" তাহার পর নীরবে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া গেল।

চন্দ্রাননার মা নিভাননীর বাল্যকাল হইতেই হাঁফানির অসুখ ছিল। সকলে আশা করিয়াছিল বড় হইলে বিবাহাদির পর সারিয়া যাইবে। কিন্তু হইল অন্য রকম। রোগ বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে এমন অবস্থায় দাঁড়াইল যে নিভাননীকে পাকাপাকি রকম শয্যা-গ্রহণ করিতে হইল। গত তিন বছর সে শুইয়াই আছে, দিন রাত্রে তাহার স্বস্তি নাই, বিশ্রাম নাই। খাইতে পারে না, ঘুমাইতে পারে না, তাহার যন্ত্রণা দেখাও মানুষের পক্ষে কষ্টকর। তাই পারতপক্ষে কেহ তার ঘরে যায় না, বুড়ী দাসী তারিণী ছাড়া। চন্দ্রাননাকে সে-ই দিনে বার-দুই-তিন মায়ের কাছে ধরিয়া লইয়া যায়, মেয়ে আবার তখনই পলাইয়া আসে। যোগমায়া ভদ্রতার খাতিরে দিনে একবার কোনো মতে ভাজের কুশল প্রশ্ন করিয়া আসে, এই পর্য্যন্ত।

আজ নিতান্ত বাধ্য হইয়া দেবকীনন্দন দুপুরবেলা স্ত্রীর ঘরে একবার গিয়া প্রবেশ করিল। তারিণী বসিয়া নিভাননীর পায়ে হাত বুলাইতেছিল, দেবকীকে দেখিয়াই সে মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দেবকী স্ত্রীর কাছে একটা ভারি চৌকি টানিয়া লইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডেকেছ?"

নিভাননী কঙ্কালসার দেহ তুলিয়া সোজা হইয়া বসিল। পূর্ব্বেকার অপরূপ রূপের আর চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নাই, শুধু চোখ দুটি আগের মত আছে, তাও কোটরগত। সে বলিল, "দেখ, ঠাকুর ঝি ও বাবা—সবাই চান তোমার আর একবার বিয়ে দিতে, তুমি তাই কর।"

দেবকীনন্দন একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিল, "দিন-দুপুরে ডেকে নিয়ে এলে, এই বলবার জন্যে? এ ত পরেও বলা চলত?"

নিভাননী বলিল, "আগে বললেও ক্ষতি নেই। ঘরে তোমার এক দণ্ডও মন বসে না। তোমায় আমি দোষ দিচ্ছি না। আমার দিকে একবার তাকালে যে আর ফিরে তাকাতে কারও ইচ্ছে করে না তা আমি বুঝি। কিন্তু আমার ঘর ছেড়েছ বলে, সংসার ছেড়ে দেবে নাকি? আমি ক'দিন আর? কিন্তু তোমার মেয়ে রয়েছে, বংশের প্রতি কর্ত্তব্য রয়েছে, সব ভাবনা ভুলে পাখ্‌মারার মত বনে বনে জন্তু মেরে ঘুরলেই ত চলবে না? ও সব ছাড়, দেখে-শুনে মনের মত বউ নিয়ে এস, এসে আবার সংসার-ধর্ম্ম কর। বয়স বাড়ছে বইত কমছে না?"

দেবকী বলিল, "হঠাৎ এত মস্ত বক্তৃতা দেবার কি কারণ ঘটল? আমি নূতন বউয়ের জন্যে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, তাই বা কে তোমায় বললে?"

নিভাননী এতগুলি কথা বলিয়া হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল। সে আবার বালিশে ঠেস দিয়া এলাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, "বউয়ের জন্যে ব্যস্ত হ'লে কিছু অন্যায় হ'ত না। যে বয়সের যা ধর্ম্ম। তাতে কেউ রাগ করে না। কিন্তু এই যে চলেছ কোথাকার রাক্ষুসে বাঘ মারতে, এটা ভাল হচ্ছে? বংশের একমাত্র ভরসা ত তুমি?"

দেবকীনন্দন বলিল, "আছ ত শুয়ে পড়ে; এত কথা তোমার কানে তোলে কে? বাঘ মারতে দোষ নেই, না মারলেই দোষ। এত লোকের প্রাণ যাচ্ছে, তারা আমাদেরই প্রজা ত? তাদের রক্ষা করবার চেষ্টা করব না?"

নিভাননী বলিল, "তুমি ছাড়া আর লোক নেই? নিজের জীবনটার দাম তুমি বোঝো না।"

দেবকী বলিল, "ও হ'ল মেয়েমানুষের কথা। পুরুষ বাচ্ছার এরকম ভাবতে পারে না। জীবনের মূল্য আছে ব'লে কি খাটের তলায় লুকিয়ে থাকতে হবে? অমন জীবনে ধিক্!"

নিভাননী একেবারে শুইয়া পড়িয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিল,

"আমার কথায় কাজ হবে না, এ আমি জানতামই। কবে বা আমার কথা রেখেছ যে আজ রাখবে?"

দেবকীনন্দন উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "অসম্ভব কথা হ'লে কি ক'রে রাখব, নিভা? রাজবল্লভ রায়ের ছেলেকে তুমি কনেবৌয়ের মত ঘরে লুকিয়ে থাকতে বল, বাঘের ভয়ে। একথা কি রাখবার মত?" বলিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

মাঝের তিনটা দিন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। চতুর্থ দিনে হাতী, ঘোড়া, শিকারীর দল সাজাইয়া লইয়া দেবকীনন্দন যাত্রা করিয়া গেল। যাইবার আগে সকলের সঙ্গে দেখা করিল, বাদ গেল শুধু নিভাননী। চন্দ্রাননাকে বলিয়া গেল, "বাঘের ছাল তুই ঠিক পাবি বেটি!"

তখনকার দিনে রেলগাড়ী ছিল না, সুতরাং দূরদেশ হইতে নিত্য খবর দেওয়া-নেওয়া চলিত না। মানুষ পায়ে হাঁটিয়া যাইত আসিত, তাহাতেই যখন হয় খবর মিলিত।

দেবকীনন্দনেরও প্রথম খবর আসিল পাঁচ ছয় দিন পরে। গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া সে এবার বনের ভিতর প্রবেশের আয়োজন করিতেছে। যে কয় দিন সে গ্রামে ছিল, তাহার ভিতর সেই নরখাদক আর ওদিকে আসে নাই, ভয়েই যেন দূরে সরিয়া ছিল।

আবার কিছুদিন চুপচাপ গেল। তাহার পর এক দিন অকস্মাৎ অশনিপাতের মত নিদারুণ সংবাদ সমস্ত রাজবাটীকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। দেবকীনন্দন সেই ভীষণ ব্যাঘ্রের দ্বারা নিহত হইয়াছে। শিকারীরা উদ্ধারার্থে ছুটিয়া আসিতে-না-আসিতেই ব্যাঘ্র নিজের হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া গহন বনে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। মৃতদেহ দাহ না করিয়া গো-শকটে লইয়া আসা হইতেছে।

বিকাল পড়িতে-না-পড়িতে শিকারীর দল নিহত জমিদার-পুত্রের দেহ লইয়া আসিয়া পৌঁছিল। বিস্তৃত অঙ্গনে তাঁহাকে স্নান করাইয়া মাল্যচন্দনে ভূষিত করিয়া শোয়ান হইল। রাজবল্লভ আসিয়া মৃত পুত্রের পাশে দাঁড়াইলেন। চন্দ্রাননা আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইল, এতক্ষণ সে কাঁদিতেছিল, পিতামহের ভীষণ ভ্রুকুটি-কুটিল মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কান্নাও বন্ধ হইয়া গেল। অন্তঃপুর হইতে থাকিয়া থাকিয়া শুধু যোগমায়ার করুণ আর্ত্তনাদ শুনা যাইতে লাগিল। রাজবল্লভ বজ্রনির্ঘোষের মত স্বরে বলিলেন, "তোমরা শুনে রাখ, আমি মা ভবানীর নামে শপথ করছি। যে ঐ বাঘকে মেরে আনবে, আমার স্বজাতি হ'লে আমার একমাত্র পৌত্রী চন্দ্রাননাকে সে লাভ করবে। যদি স্বজাতি না হয়, আমার সমস্ত জমিদারী তার। একবস্ত্রে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে বারাণসী চলে যাব। যাও, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে এ সংবাদ প্রচার ক'রে দাও।"

লোকজন ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। এখন দাহের আয়োজন করিতে হইবে, আত্মীয়স্বজনেরা অগ্রসর হইয়া আসিল।

হঠাৎ অন্তঃপুরের ক্রন্দনধ্বনি উচ্চতর হইয়া উঠিল। সকলে চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, রক্তাম্বরা রত্নালঙ্কার-বিভূষিতা কঙ্কালের মত কে এক জন হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কাছে আসিয়া শ্বশুরের পায়ে প্রণাম করিয়া নিভাননী বলিল, "বাবা, আশীর্ব্বাদ করুন, পরের জন্মে যেন স্বামীকে রেখে যেতে পারি।"

রাজবল্লভ অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, "যাও মা, সতীলোক তোমার অক্ষয় হোক।" চন্দ্রাননা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যোগমায়া ও দাসীরা তাহাকে টানিয়া লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

দেবকীনন্দনের অপঘাতমৃত্যু, নিভাননীর সহমরণ ও রাজবল্লভের শপথের কথা দেশের সর্ব্বত্র দেখিতে দেখিতে ছড়াইয়া পড়িল। ত্রিনেত্র ব্যাঘ্রকে বধ করিবার চেষ্টায় দেশশুদ্ধ শিকারীর আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গেল, কিন্তু সেটার আর কোথাও খোঁজ মিলিল না। দেশের অধীশ্বরের প্রিয়তম পুত্রের প্রাণ হরণ করিয়া তাহার হিংসাবৃত্তি কিছু-কালের মত বোধ হয় চরিতার্থ হইয়া গিয়াছিল, তাই লোকালয়ে তখন আর সে মুখ দেখাইল না।

রাজবল্লভের বাড়িতে যেন চিররাত্রি বাসা বাঁধিল। দূর হইতে দেখিলে কাহারও বোধ হইত না যে এই বিরাট পাষাণস্তূপের ভিতর জীবিত মনুষ্য কোথাও কেহ আছে। চাকরদাসীরাও যেন হাঁটিতে চলিতে নিঃশ্বাসটুকু লইতেও ভয় পায়। রাজবল্লভের দিন কাটিয়া যায় ভবানীর মন্দিরেই, সন্ধ্যা-রাত্রিও সেইখানেই ধ্যানস্থ হইয়া থাকিয়া

থাকেন। বিধবা যোগমায়া একলা একঘরে অশ্রুপাত করে। আর মেঘের কোলে সৌদামিনীর মত এই অন্ধকার পুরীতে খেলিয়া বেড়ায় বিদ্যুৎরূপিণী চন্দ্রাননা।

দেখিতে দেখিতে বৎসর কাটিয়া গেল। এ বৎসর আবার ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে ব্যাঘ্রের উৎপাতের কাহিনী শুনা যাইতে লাগিল। কিন্তু ইহা সেই ব্যাঘ্র কিনা তাহা কেহ বলিতে পারিল না।

সময়ের প্রভাবে রাজবল্লভের হৃদয়ের বিষাক্ত ক্ষতের জ্বালা একটু যেন জুড়াইয়া আসিয়াছিল। তিনি এক দিন হাসিয়া পৌত্রীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "দিদি, দেশে ত পুরুষমানুষ আছে ব'লে মনে হচ্ছে না। আমাকেই না শেষে বাঘ মেরে তোকে বিয়ে করতে হয়।"

"ধেৎ, তোমার মত টাক-পড়া বুড়োকে আমি বিয়ে করলাম আর কি?" বলিয়া চন্দ্রাননা তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বড়মানুষের কথা পড়িতে পায় না। রাজবল্লভের এই স্নেহটুকুও লোকের মুখে মুখে দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। যুবক দল ক্রুদ্ধ হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিল বটে, কিন্তু ব্যাঘ্রপ্রবর তখনও নির্ভয়ে বিচরণই করিতে লাগিলেন। কি কারণে জানি না তাঁহার গ্রামে ঢুকিয়া উৎপাত করার কথা আর শোনা যাইত না, যেন কিছু সাবধানী হইয়া পড়িয়াছিল। তবে গরু চরাইতে গিয়া বা কাঠ কাটিতে গিয়া অনেক হতভাগ্যই এখনও যে এই মূর্ত্তিমান যমের সাক্ষাৎ পাইতেছে, তাহার ভয়বহ কাহিনী প্রায়ই শুনা যাইত।

এ বৎসরটাও কাটিয়া গেল। চন্দ্রাননার বয়স তের ছাড়াইয়া চলিল। আসন্নযৌবনা কিশোরীর অঙ্গে অঙ্গে যেন সৌন্দর্য্যের বান ডাকিয়া যাইতেছিল, তাহার দিকে তাকাইলে মানুষের চোখ ধাঁধিয়া যাইত।

চতুর্থ বৎসরের শরৎকাল আসিয়া পড়িল। রাজবল্লভের শরীরে ভাঙন ধরিয়াছিল। এক দিন অন্তঃপুরে আসিয়া তিনি কন্যা ও পৌত্রীকে বলিলেন, "এবার কালীপূজায় এক-শ মহিষ বলি দিতে হবে। মা যদি দয়া ক'রে এ-দেশের ভেড়ার পালে একটু শৌর্য্য দেন। নইলে ত আশা কিছু দেখছি না।"

রাজবল্লভের মানসিক ইচ্ছা দেবী মহাশক্তি বোধ হয় শুনিতে পাইলেন। এক শত মহিষ বলি হইবার আগেই বোধ হইল ভেড়ার পালের ভিতর দুই একটা বাঘের বাচ্ছাও আছে। খবর পাওয়া গেল ঝাঁকুড়িয়ার ভবানীপ্রসাদ চৌধুরী এবং কুমারপুরের নরনারায়ণ গুহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে মাস ঘুরিতে-না-ঘুরিতে তিন-চোখো বাঘের ব্যাঘ্রলীলা তাঁহারা ঘুচাইয়া দিবেন।

শুনিয়া রাজবল্লভ হাসিয়া পৌত্রীকে বলিলেন, "দিদি, তুই যে একেবারে পৌরাণিক রাজকন্যাদের দলে ভর্ত্তি হয়ে গেলি। স্বয়ম্বর-সভায় কার গলায় মালা দিস দেখা যাবে।" চন্দ্রাননা ঝম্ ঝম্ করিয়া নূপুর বাজাইয়া ছুটিয়া পলাইল।

কালীপূজা আসিল, মহা ধুমধামে সম্পন্নও হইয়া গেল। দেশ-দেশান্তর হইতে লোক আসিল বলি ও ভাসান দেখিতে। সকলেরই মনে একটা অস্পষ্ট সন্দেহ যে এই রাজবল্লভের শেষ পূজা, বংশে আর কেহ রহিল না যে তাঁহার কীর্ত্তি বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবে।

ভাসানের পরদিন সকালে রাজবল্লভ ভবানীর মন্দির হইতে ফিরিতেছেন, এমন সময় দুই জন পাইক ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে ব্যাঘ্র মারা পড়িয়াছে। গোযানে তাহাকে লইয়া আসা হইতেছে, সঙ্গে আসিতেছে শিকারীর দল এবং সাত গ্রামের লোক।

রাজবল্লভ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বিশাল বক্ষ ভেদ করিয়া তাঁহার একটু উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সেই এক অশুভ দিনের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, যখন এমনি করিয়া দেবকীনন্দনকে তাঁহার গৃহে শিকারীর দল বহন করিয়া আনিয়াছিল। আজ আসিতেছে সেই পুত্রহন্তাকে লইয়া, ইহাকেও সমুচিত ভাবে অভ্যর্থনা করা উচিত। তাহা ছাড়া একদিক দিয়া দেখিতে গেলে আজ চন্দ্রাননার স্বয়ম্বর, আজ তাঁহার অতি আনন্দের দিন।

পাইকদিগকে দেওয়ানের সন্ধানে পাঠাইয়া দিয়া তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। অন্তঃপুরে খবর পাইয়া সকলে হুলস্থূল বাধাইয়া দিল। এত দিনের গভীর শোকের আঁধার যেন এক নিমেষে কাটিয়া গেল। যোগমায়া চন্দ্রাননাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া রত্নালঙ্কারে বহুমূল্য বস্ত্রে সাজাইতে লাগিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীর দল, প্রতিবেশিনীর দল সার দিয়া দাঁড়াইয়া গেল মত্ত নরখাদককে দেখিবার জন্য। বিস্তীর্ণ অঙ্গন

জমিদার-বাড়ির দাস-দাসীরা পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। চারিধারের জনতা ভীড় করিয়া দাঁড়াইল, মাঝের জায়গাটা খালি রহিল শিকারীর দলের জন্য।

শিকারীর দলকে দূর হইতে দেখিবামাত্র জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনেকে তাহাদের আগ বাড়াইয়া আনিবার জন্য ছুটিয়া চলিল, অনেকে নিজ স্থানে দাঁড়াইয়াই উৎসুক-নেত্রে আগন্তুকদিগের দিকে চাহিয়া রহিল।

বন্যাস্রোতের মত মানুষের স্রোত আঙ্গিনার ভিতর হুড়হুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িল। গরুর গাড়ী বটে, তবে গরু তাহাতে নাই, গ্রামের লোকেই মহোৎসাহে তাহা টানিয়া আনিতেছে। গাড়ীর উপর বিপুলাকার ব্যাঘ্রের দেহ, মস্তকটা তাহার দেহ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

এত বড় বাঘ তখনকার দিনের মানুষও দেখে নাই, যদিও বাঘের সঙ্গে দেখা-শুনা তাহাদের দুই বেলা হইত বলা যায়। মৃত পশুর কপালের তৃতীয় নেত্র দেখিবার জন্য পিছনের লোক ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল।

অঙ্গনের মাঝখানে গাড়িটা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই পাশে দুই ব্যক্তি ভীড়ের ভিতর হইতে আলাদা হইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যাঘ্রের বাম দিকে যিনি তিনি খর্ব্বাকৃতি, অতি বলিষ্ঠ দেহ, কাঁধ অবধি বাবরী চুল, হাতে বর্শা, তাহার অগ্রভাগ রক্তরঞ্জিত। ইনি কুমারপুরের নরনারায়ণ গুহ। দক্ষিণ পাশে দাঁড়াইয়া ঝাঁকুড়িয়ার ভবানীপ্রসাদ চৌধুরী। ইনি নরনারায়ণ অপেক্ষা অল্পবয়স্ক, শরীর দীর্ঘ একহারা, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। মুখশ্রী অতি সুন্দর, শরীরের নানাস্থান ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত।

রাজবল্লভ অগ্রসর হইয়া আসিলেন। একদৃষ্টে মৃত পুত্রহন্তার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহারপর শিকারীদ্বয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা ভবানী তোমাদের কল্যাণ করুন, বাংলার পুরুষের তোমরা মান রক্ষা করেছ। কিন্তু ব্যাঘ্র বধ করেছে কে আমার জানা আবশ্যক। আমার পৌত্রীকে তার হাতে সম্প্রদান করতে চাই।"

অন্তঃপুরবাসিনীদের দল ভেদ করিয়া যোগমায়া বাহির হইয়া আসিলেন, চন্দ্রাননার হাত ধরিয়া। তাহার রূপ-জ্যোতিতে সমস্ত দিক যেন আলো হইয়া উঠিল। নরনারায়ণ ও ভবানীপ্রসাদ একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন।

ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "বাঘ আমরা দু-জনে বধ করেছি, নরনারায়ণ সাহায্য না করলে হয়ত একলা আমার দ্বারা একাজ সম্ভব হ'ত না। তবে আমরা আপনার বিচার মেনে নিতে রাজী আছি।"

রাজবল্লভ বড় ফাঁপরে পড়িলেন। উভয়েই তাঁহার স্বজাতি; কাহাকে রাখিয়া কাহার হাতে তিনি পৌত্রী সমর্পণ করিবেন।

কুলগুরু পশুপতি শর্ম্মার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "গুরুদেব, কি উপায় করা যায়?"

পশুপতি হাসিয়া বলিলেন, "নাতনীকে নিজে নির্ব্বাচন করতে বলুন। ব্যাপারটা ঠিক পৌরাণিক যুগের মত, ব্যবস্থাও সেই রকম হোক।"

রাজবল্লভ নাতনীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, তাহার দ্বারা এ-কাজ হইবে বলিয়া ত বোধ হয় না।

রাজবল্লভ বলিলেন, "গুরুদেব, পৌরাণিক সীতা, সাবিত্রী দময়ন্তীর মত দৃঢ় মন এখন কোন মেয়ের পাবেন? চন্দ্রাননা স্বয়ম্বরা হ'তে পারবে না। অন্য উপায় দেখুন, যাতে আমি সত্যভ্রষ্ট না হই, সকলেই যেন উপযুক্ত পুরস্কার পায়।"

পশুপতি শর্ম্মা নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "দ্বাপর যুগে কৃষ্ণমহিষী সত্যভামা একবার ব্রত ক'রে স্বামী দান করেছিলেন। দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণকে নিয়ে চলে যাবার উপক্রম করাতে, শ্রীকৃষ্ণের সকল মহিষী অতি কাতরভাবে রোদন করতে থাকেন। তাতে শেষে দেবর্ষি শ্রীকৃষ্ণের ওজনের স্বর্ণ পেলে তাঁকে মুক্তি দিতে স্বীকৃত হন। আপনিও তাই করুন। দুই জনকে কন্যাদান অসম্ভব। কন্যার স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি এক জনকে দান করুন, আর এক জনকে কন্যাদান করুন। এ ব্যবস্থা শাস্ত্রসঙ্গত।"

রাজবল্লভ বলিলেন, "তাই হোক। কিন্তু কন্যা যিনি গ্রহণ করবেন তিনি তাতেই যেন সন্তুষ্ট হন। স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করতে আমার প্রায় যথাসর্ব্বস্ব বিক্রীত হয়ে যাবে।" বলিয়া তিনি শিকারীদ্বয়ের দিকে চাহিলেন।

ভবানীপ্রসাদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া রাজবল্লভকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনার পৌত্রীকে পেলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।"

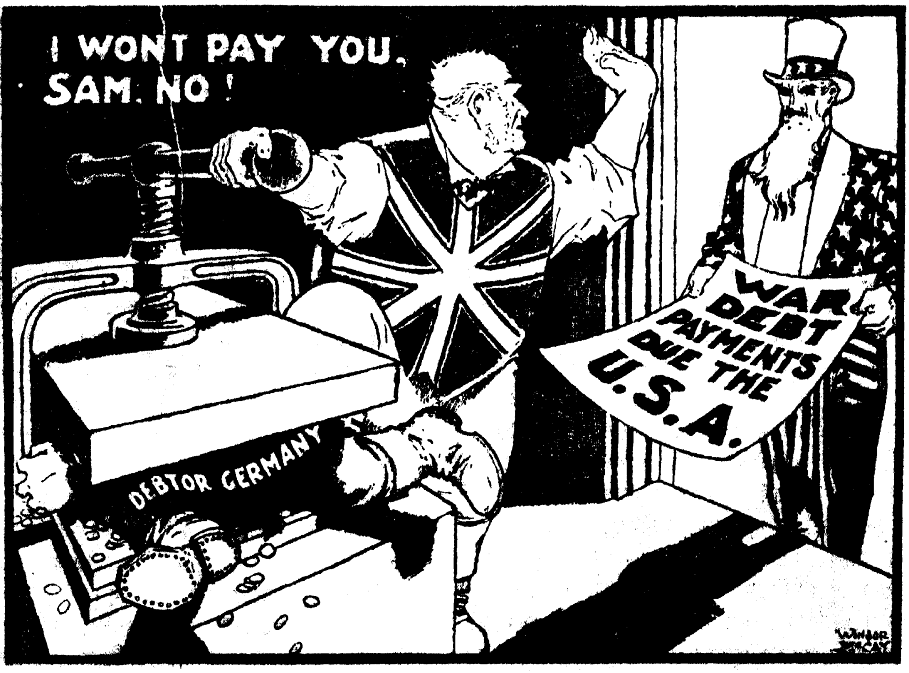
নরনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, "বয়স অল্প ভায়া তোমার।"

স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি ও চন্দ্রাননার সম্প্রদান প্রায় একই দিনে হইয়া গেল। উদ্বৃত্ত সামান্য সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া, ভবানী-পূজার ব্যবস্থা করিয়া, পৌত্রীর বিবাহান্তে রাজবল্লভ রায় দেশত্যাগ করিলেন। যোগমায়াও গেলেন তাঁর সঙ্গে। কাশীতেই তাঁহাদের দেহান্ত হয়।

ভবানীপ্রসাদের বংশ এখনও টিকিয়া আছে। নরনারায়ণের বংশ কিছুদিন পরে লুপ্ত হইয়া যায়। জমিদারী অন্যের হস্তগত হয়, কিন্তু বিখ্যাত স্বর্ণময়ী মূর্ত্তিটিকে আর দেখা গেল না। নরনারায়ণ মৃত্যুকালে কোথায় যে সেটি লুকাইয়াছিলেন, তাহাও কেহ জানিতে পারিল না।

ব্যঙ্গ-চিত্র

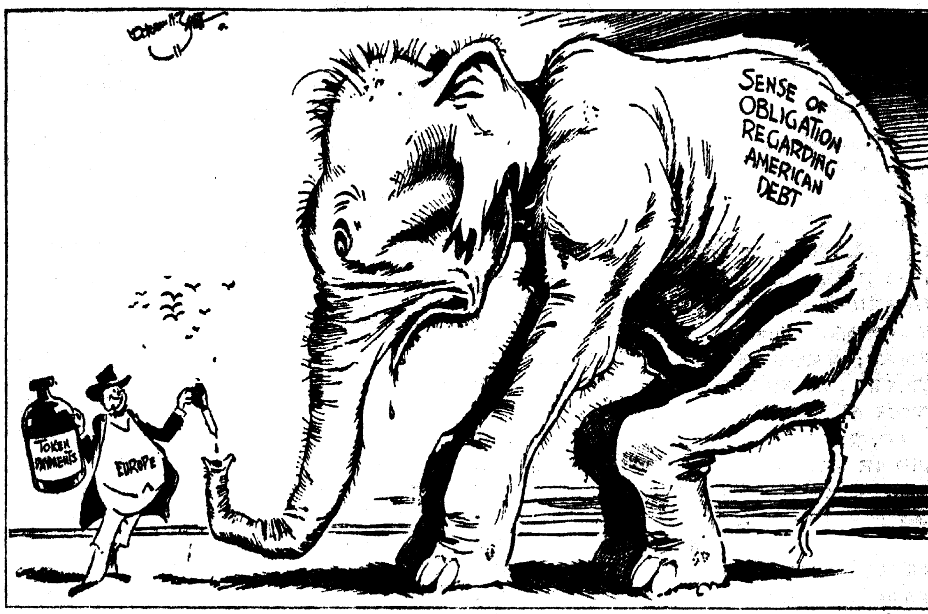
(আমেরিকার সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত)

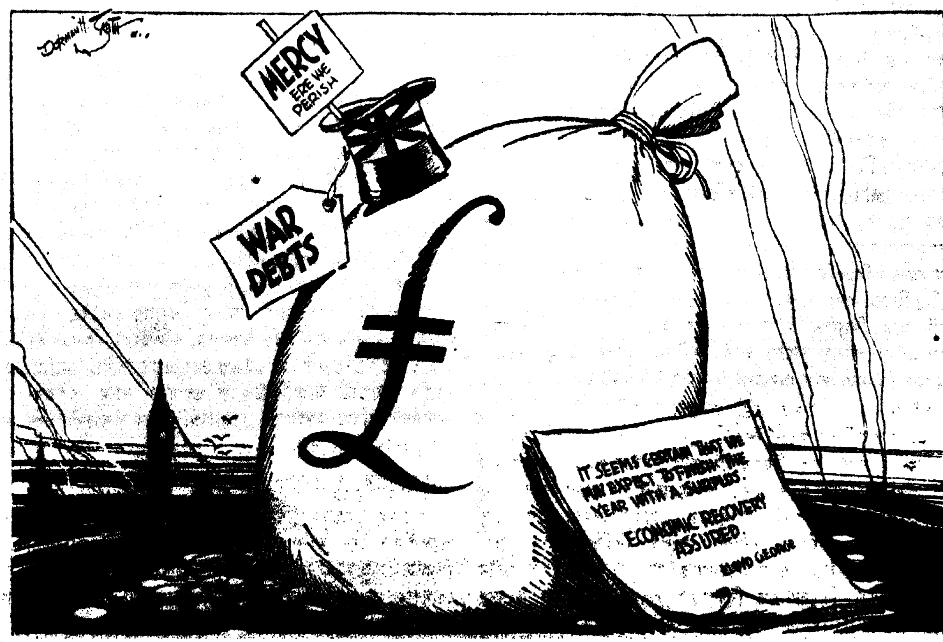


১। ইউরোপের একটি রাষ্ট্র আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট ঋণী, জার্ম্মানী আবার এই রাষ্ট্রের নিকট টাকা ধারে। রাষ্ট্রটি যুক্তরাজ্যকে বলিতেছে যে, তাহার ধার শোধ করিতে পারিবে না। অথচ ইহা জার্ম্মানীর নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্ত নানা উপায় অবলম্বন করিতে ব্যস্ত। এই রাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলিতে জার্ম্মানীর যত টাকা গচ্ছিত আছে তাহা বাজেয়াপ্ত করিবার জন্ত ব্যবস্থা-পরিষদে একটি আইন পাস করাইয়া লইয়াছে! এক ফিনল্যাণ্ড ছাড়া ইউরোপের আর সকল ঋণী রাষ্ট্রেরই এইরূপ ব্যবহার। এই চিত্রখানি হইতে ইহার মর্ম্ম বুঝা যাইবে।

২। যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট হইতে বিস্তর ঋণগ্রহণ করিয়াছিল। তখন ইহারা যুক্তরাজ্যের কতই না খোশামোদ করিয়াছে; কৃতজ্ঞতাপ্রকাশেও তখন ইহারা পঞ্চমুখ ছিল। কিন্তু এখন ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন অল্প অল্প অর্থ দিয়া বুঝাইতে চাহিতেছে, যে, ঋণশোধের চেষ্টা হইতেছে, আর ইহারাই স্বদেশে রণসজ্জায় বাড়াইবার জন্ত বিস্তর অর্থব্যয় করিতেছে। চিত্রখানিতে ইহাই সুপ্রকাশ।

৩। ইংলণ্ডের লয়েড জর্জ প্রভৃতি রাজনীতিবিশারদগণ এই বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন যে, তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা দিন দিন ভাল হইতেছে। অথচ সেই দেশেরই একদল প্রতিনিধি আমেরিকায় গিয়া যুক্তরাজ্যের সরকারকে ঋণ মকুব করিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছেন।


SENSE OF OBLIGATION REGARDING AMERICAN DEBT
TOKEN PAYMENTS
EUROPE


MERCY ERE WE PERISH
WAR DEBTS
IT SEEMS CERTAIN THAT WE
EXPECT TO FINISH THE
YEAR WITH A SURPLUS.
ECONOMIC RECOVERY ASSURED.

দেশ-বিদেশের কথা

বাংলা

নারী-শিক্ষা সমিতি—

নারী-শিক্ষা সমিতির মহিলা শিল্প-প্রদর্শনীর সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে সমিতির সম্পাদিকা মাননীয়া শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসু মহোদয়া বলেন, --

আজ এই পৃথিবীব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে, ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া দেশে দেশে গৃহশিল্পের পুনঃপ্রবর্ত্তনের যে মহতী প্রচেষ্টা চলিতেছে, আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর আয়োজন তাহারই ক্ষীণ আভাস মাত্র। সুখের বিষয়, দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী জননায়কগণ বুঝিতে পারিতেছেন, ইহা কেবলমাত্র ধনীর কল্পনা-বিলাস নহে; যদি যন্ত্রশিল্প ও কলকারখানার যুগে ব্যাপকভাবে গৃহে গৃহে কুটীর-শিল্পের প্রচার সহজতর ভাবে সাধিত হয় তাহা হইলে ইহা কেবলমাত্র এই অন্নহীন, শ্রীহীন দেশে আর্থিক কষ্ট মোচনে সহায়তা করিবে না, ইহা আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, গৃহের শুচিতা, দেহের সৌন্দর্য্য এবং পারিবারিক জীবনের সুখ ও শান্তি অনেক পরিমাণে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইবে। সুখের বিষয়, আজ এই অতীব প্রয়োজনীয় কার্য্যের পৌরোহিত্য করিতে এমন এক জন মনীষীকে আমরা পাইয়াছি যিনি কেবলমাত্র এই কলিকাতা মহানগরের মহানাগরিক হিসাবে নয়, প্রতিভাশালী অর্থনীতিবেত্তা হিসাবে, নানা-প্রকার সৎপরামর্শ প্রদান করিয়া আমাদিগের এই কার্য্যে বিশেষভাবে উৎসাহ দিতে পারিবেন।

বাণী-ভবনের সংশ্লিষ্ট মহিলা শিল্পভবনের উদ্যোগে প্রতি বৎসর এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে, মহিলা শিল্পভবন একটি অবৈতনিক শিল্প-বিদ্যালয়। এ-পর্য্যন্ত প্রায় ১৫০টি মেয়ে এই প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া নানারূপ শিল্পকার্য্যে পারদর্শী হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন এবং অনেকে এখান হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মাসিক ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ-পর্য্যন্ত এই ভবনের শিক্ষার্থিনীদের প্রস্তুত নানা প্রকার শিল্পসম্ভার প্রায় ১২০০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। দেশের দুরবস্থা এবং আমাদের অভাবের প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে এই পরিমাপ হয়ত সামান্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদের চেষ্টা ও আন্তরিকতার দিক হইতে ইহা কিছুমাত্র অগৌরবের নহে। আজ এই উৎসবক্ষেত্রে ৺প্রতিভা সেনগুপ্তার কথা স্মরণ করিতেছি। বাণী-ভবনের আরম্ভ হইতে তিনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সর্ব্বদাই ইহার উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি মাত্র কিছুদিন হইল আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, আজ এই প্রদর্শনীক্ষেত্রে সেই স্বর্গগত মহিলার স্নেহময় মুখ, প্রতিভা-ব্যঞ্জক দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে আমাদের স্মরণপথে উদিত হইতেছে।

কুটীর-শিল্প প্রবর্ত্তনের চেষ্টা কেবলমাত্র মহিলা শিল্পভবনের ও বাণী-ভবনের কতিপয় সহস্র শিক্ষার্থিনীর মধ্যেই আবদ্ধ নহে; যাহাতে সুদূর পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত গৃহশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে তাহার জন্যও সমিতি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সকল সফলতার মূলে যেমন শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা, কর্ম্মস্পৃহা ও উৎসাহের প্রয়োজন, তেমনি ব্যাপকভাবে সফলতা লাভ করিতে হইলে দেশের শিক্ষিত ও অর্থশালী ব্যক্তিগণের শুভ ইচ্ছা ও অর্থসাহায্যের প্রয়োজন। এই ভাগ্যহীন দেশে মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজের বিধবাদের অবস্থা যে কতদূর দুঃখময় তাহা আজ আপনাদিগকে বিশদ করিয়া বলিতে চাহি না। তাহাদের জীবন যাহাতে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া দেশের ও দশের মঙ্গলময় কার্য্যে লাগিতে পারে, এই মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া দশ বৎসর পূর্ব্বে দুইটি মাত্র বিধবা লইয়া বাণী-ভবনের ভিত্তি স্থাপনা হয় দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, আজ সেই শুভদিন আগত, আপনাদের শুভেচ্ছায় এবং সমবেত চেষ্টায় এই সমিতি মাথা গুঁজিবার মত একটি গৃহ পাইয়াছে। এই আশ্রমে কিঞ্চিদধিক ৬০টি বিধবা বিনা ব্যয়ে শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষয়িত্রী হইয়া পল্লীগ্রামে পল্লীগ্রামে সমিতিকে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে সহায়তা করিতেছে, নারীশিক্ষা সমিতি বালিকাদিগের জন্য ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে এবং ইহাদিগকে নিয়মিত ভাবে অর্থসাহায্য করিয়া আসিতেছে। এপর্য্যন্ত এই সমস্ত বিদ্যালয় হইতে প্রায় ৫৫০০ ছাত্রী শিক্ষালাভ করিয়াছে। তের বৎসর হইল নারীজাতিকে দেশের কল্যাণকারিণী হইবার উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে এই নারীশিক্ষা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমাদের এই পরিকল্পিত আদর্শের পথে আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহা আমরা জানি না—তাহার বিচারভার আপনাদের হস্তে। তবে এইটুকু মাত্র বলিতে পারি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সমাজ-জীবনের জড়দেহে এক অভূতপূর্ব্ব সাড়া আনিয়াছে। আজ আমরা ঋণগ্রস্ত, আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি আজ অর্থাভাবে নিশ্চল, প্রারব্ধ কার্য্যসূচী আজ উপেক্ষিত; তের বৎসর পূর্ব্বে যে ক্ষীণ দীপশিখা লইয়া পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম, বন্ধুগণ, আপনাদের সমবেত চেষ্টা এবং শুভেচ্ছা সেই ক্ষীণ দীপশিখাকে স্থির ও উজ্জ্বলতর করিয়া তুলুক—যাহার দীপ্তি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া এই তমসাচ্ছন্ন দেশকে আলোকিত করিয়া তুলুক—ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

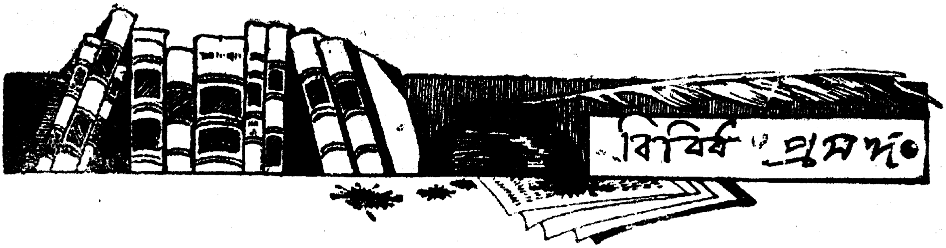
স্বদেশী ঔষধের কারখানা—

এক জন মনীষী বলিয়াছেন—'আয়ুর্বেদ অনাদি'। ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদ-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ-প্রস্তুতির আয়োজনও যথেষ্ট ছিল। প্রতীচ্যের চিকিৎসা-বিদ্যা 'এলোপ্যাথি' নামে খ্যাত। আয়ুর্বেদের ন্যায় ইহার ঔষধও গাছ-গাছড়ার নির্য্যাস হইতে প্রস্তুত হয়। ভারতের জলবায়ুর উপযোগী করিয়া ভারতীয় গাছ-গাছড়ার নির্য্যাস হইতে ঔষধ প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজন। ইহা সম্ভব হইলে স্বল্প মূল্যে রোগ-প্রতিষেধক নানা ঔষধ পাওয়া যাইতে পারে। দরিদ্রজন-অধ্যুষিত দেশে ইহার প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক।

বাংলা দেশের সৌভাগ্য যে, কিছুকাল যাবৎ এইরূপ স্বদেশী ঔষধ প্রস্তুত হওয়ায় দেশবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে। বেঙ্গল কেমিকেল, ঢাকা শক্তি ঔষধালয়, কলিকাতা রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট প্রভৃতি কতকগুলি কারখানা এইরূপ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' নামে এইরূপ একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। রোগপ্রতিষেধক স্বদেশী ঔষধ যতই প্রস্তুত হইবে ততই মঙ্গল।

এলাহাবাদে শোকসভা—

গত ৮ই সেপ্টেম্বর পূর্ণিমা-সম্মিলনীর পক্ষ হইতে এলাহাবাদে কবি অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পরলোকগমনে একটি শোকসভা হইয়া গিয়াছে। প্রায় দেড় শত স্থানীয় প্রবাসী বাঙালী মহিলা সভায় যোগদান করেন। কবি অতুলপ্রসাদের জীবনী ও কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে সভায় বক্তৃতা হইয়াছিল।



ডিক্টেটর বা স্বৈর শাসক

ইংলণ্ডে ৭১ বৎসর ধরিয়া ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্স্‌ ইয়ার্‌-বুক্‌ নামক একটি বার্ষিক নানাতথ্যপূর্ণ পুস্তক বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহার সহিত অবশ্য কলিকাতার ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌ কাগজের কোন সম্পর্ক নাই। বর্ত্তমান ১৯৩৪ সালে যেখানি বাহির হইয়াছে, তাহার ভূমিকায় সম্পাদক বলিতেছেন :—

"A statesman surveying the world at the end of the first quarter of 1934 wonld be struck by the fact that an increasing number of countries is being ruled by Dictators, and that many countries have so changed their constitution as to grant enlarged powers to the executive."

তাৎপর্য্য। "১৯৩৪ সালের প্রথম তিন মাসের শেষে কোন রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ পৃথিবী পরিবীক্ষণ করিলে এই তথ্যটি তাঁহার মনে মুদ্রিত হইবে, যে ক্রমশ: অধিকতরসংখ্যক দেশ স্বৈর শাসকদের দ্বারা শাসিত হইতেছে এবং অনেক দেশ নিজ মূল রাষ্ট্রবিধি এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, যে, তাহার দ্বারা কর্ম্মনির্ব্বাহকদিগকে বিস্তৃততর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।"

ইহা সত্য কথা। পৃথিবীর অনেক দেশের অবস্থা এইরূপ হওয়ায় একটা রব উঠিয়াছে, যে, গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর পরীক্ষায় বুঝা যাইতেছে, যে, উহা ব্যর্থ এবং অকেজো। প্রকৃত কথা কিন্তু এই, যে, গণতান্ত্রিকতার পরীক্ষা ঠিক্‌ মত হয়ই নাই। ইহার ঠিক্‌ পরীক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হওয়া আবশ্যক। কেবল বর্ণপরিচয় বা লিখনপঠনক্ষমতা এই শিক্ষা নয়। তাহার সঙ্গে হিসাব করা বা রাখা যোগ করিয়া দিলে যতটুকু শিক্ষা হয়, তাহাও যথেষ্ট নহে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে, যাহার বুদ্ধিতে ও রুচিপ্রবৃত্তি অনুসারে যতটা শিক্ষালাভের সম্ভাবনা আছে, তাহার ততটা শিক্ষা পাওয়া দরকার, এবং তদ্ভিন্ন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও রাষ্ট্রিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ আবশ্যক। এইরূপ শিক্ষার পর যদি কোন দেশের লোক রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন ও রাষ্ট্রিক কর্ত্তব্য পালনে সতত অবহিত থাকে, তাহা হইলে সে দেশে গণতন্ত্র কখনই ব্যর্থ হইবে না, সে দেশের লোকদের স্বাধীনতা বহিঃশত্রু বা অন্তঃশত্রুর দ্বারা বিলুপ্ত হইবে না।

মানুষের যেমন শ্রমশীলতা আছে, তেমনই আলস্যে কাল কাটাইবার ইচ্ছাও আছে। যখন রাষ্ট্রিক কর্ত্তব্য সাধনে মানুষ আলস্য করে বা অসমর্থ হয়, তখন দেশের বাহির হইতে আগত বা দেশের মধ্যস্থ এরূপ লোকদের অভাব হয় না যাহাদের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। ইংরেজীতে যে একটি কথা আছে, "Eternal vigilance is the price of liberty," "সদাজাগ্রত অশেষ সতর্কতা স্বাধীনতার মূল্য," তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। কয়েক বৎসর অন্তর প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সময় একবার ভোট দিয়া, তাহার পর প্রতিনিধিরা কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন কিনা, সে দিকে দৃষ্টি না রাখিলে, সামান্য মিউনিসিপালিটির কাজই ভাল করিয়া হয় না, রাষ্ট্রের কাজ ত দূরের কথা।

যে-সব ডিক্টেটর বা স্বৈর শাসকদের কথা হইতেছে তাঁহাদের ও স্বৈর নৃপতিদের মধ্যে একটি বিষয়ে প্রভেদ আছে। স্বৈর নৃপতিরা হয় উত্তরাধিকারসূত্রে রাজত্ব প্রাপ্ত হয় ও নিজের প্রভুত্ব নিজের বংশধরদিগকে দিয়া যাইতে চায়, কিংবা স্বয়ং সিংহাসন ও রাজত্ব দখল করিয়া বংশধরদিগকে তাহা দিয়া যাইতে চায়। ডিক্টেটররা গোড়ায় দেশের লোকদের ভোটের জোরেই প্রভুত্ব অধিকার করে এবং তাহার জোরে পরে দেশের লোকদের মধ্যে স্বাধীনচিত্ত বিরুদ্ধবাদী লোকদের উপর অত্যাচার করে, কিন্তু নিজের প্রভুত্ব নিজ বংশে পুরুষানুক্রমে স্থায়ী করিবার চেষ্টা সাধারণতঃ ডিক্টেটররা করে না, করিলেও সেরূপ চেষ্টা সাধারণতঃ সফল হইবার কথা নয়। কাহাকেও স্বৈর নৃপতি থাকিতে বা হইতে দেওয়া এবং কাহাকেও ডিক্টেটর হইতে ও থাকিতে দেওয়া কোন দেশের লোকদেরই উচিত নহে। কোন দেশে স্বৈর নৃপতি কিংবা স্বৈর শাসক

থাকিলে তাহার দ্বারা সে দেশের লোকদের আলস্য, অসামর্থ্য ও অযোগ্যতা সূচিত হয়।

—

ভারতবর্ষে ডিক্টেটরত্ব

ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ। ইংরেজ জাতি ইহার শাসনকর্তা। ইংরেজদের শাসন থাকিতে এ দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যেমন হইতে পারে না, স্বৈর শাসকের প্রাদুর্ভাবও সেই রূপ হইতে পারে না। তবে যদি ইংলণ্ডেই কেহ ডিক্টেটর হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ডিক্টেটরও সে কিংবা তাহার অনুগত কোন লোক হইতে পারিবে। ইংলণ্ডে যে ডিক্টেটরের আবির্ভাব হইতে পারে না, এমন নয়। গত মহাযুদ্ধের সময়, নামে না হইলেও, কার্যতঃ মিঃ লয়েড জর্জ ডিক্টেটর হইয়াছিলেন। আজকালও ইংলণ্ডে যে ফ্যাশিষ্ট দল গড়িবার চেষ্টা হইতেছে, তাহার পরিণামেও ইংলণ্ডে ডিক্টেটরত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অন্য যে-সব ইউরোপীয় দেশ এখন ডিক্টেটরের অধীন, তাহাদের ডিক্টেটররাও গোড়া হইতেই স্বৈর শাসক হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে নাই, ক্রমশঃ সব ক্ষমতা আত্মসাৎ করিয়াছে। ইতালীতে প্রথমে সমাজতন্ত্রবাদী (socialists) ও সাম্যবাদীদের (communistsদের) বিরুদ্ধে কালকোর্তা-পরিহিত ফ্যাশিষ্ট দল গঠিত হয়। তাহাদের নেতা মুসোলিনী পরে ডিক্টেটর হইয়াছেন। ইংলণ্ডে স্যর অসোআল্ড মোসলী (Sir Oswald Mosley) কালকোর্তা দল গড়িতেছেন। এখনই এই দলের কর্ম্মিষ্ঠ ও চাঁদা দাতা ১৭০০০ সভ্য হইয়াছে। ইংলণ্ডের "স্বাধীন শ্রমিক দল" যখন খুব প্রভাবশীল, তখনও ইহার দ্বিগুণের চেয়ে বেশী সভ্য তাহার ছিল না। সুতরাং অল্প সময়েই যখন ব্রিটিশ ফ্যাশিষ্ট দলের এত সভ্য জুটিয়াছে, তখন অচিরে তাহা আরও প্রভাবশালী ও পুষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার সভ্যদের অনেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবক। তাহারা আধা-জঙ্গী (অর্দ্ধসামরিক) কুচ-কাওয়াজ করে, তাহাদের কয়েকটি সাঁজোয়াযুক্ত গাড়ী (armoured cars) আছে,এবং আপাততঃ পাঁচ-ছয়টি এরোপ্লেন লইয়া তাহারা বিমানবাহিনী গঠন করিতেছে। যাহা হউক, ইংলণ্ডে কেহ ডিক্টেটর হইলেও ভারতবর্ষে ডিক্টেটর তখনি তখনি কেহ হইবে না আমরা অন্যবিধ ডিক্টেটরের কথা বলি।

অসহযোগ আন্দোলনের গোড়া হইতে, নামে না হইলেও কাজে, মহাত্মা গান্ধী ডিক্টেটর আছেন। উহা যখন জোরে চলিতেছিল এবং যখন উহার প্রতিকূল আইনের জন্য কংগ্রেস-সমিতিগুলির অধিবেশন সম্ভবপর ছিল না, তখন অসহযোগীরা অগত্যা প্রাদেশিক ও জেলার ডিক্টেটর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি ডিক্টেটর অসহযোগ আন্দোলনের সকল অবস্থাতেই গান্ধীজী ছিলেন। ইহা কতটা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, কতটা বা তিনি ইহাতে সায় দিয়াছিলেন বলিয়া ঘটিয়াছে, বলা যায় না। কিন্তু তিনি এখন ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন, এবং যে-সব কারণে তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছাড়িয়া দিবেন বলিতেছেন ইহা তাহার মধ্যে একটি। তাহাতে কংগ্রেসের ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, তাহার আলোচনা আমরা করিব না ; কিন্তু ইহা স্পষ্ট, যে, এমন অন্য কোন কংগ্রেসনেতা নাই, যাঁহার পরিচালনা গান্ধীজীর পরিচালনা যত লোক মানে, তত লোক মানিবে; সুতরাং কংগ্রেসে আরও দল বাড়িবার সম্ভাবনা ঘটিবে। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, নানা লক্ষণ দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছে, যে, আমাদের দেশে স্বরাজ স্থাপিত হইলে ডিক্টেটরত্ব স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

ভারতবর্ষে গুরুবাদ বড় প্রবল। হিন্দু সমাজের নানা সম্প্রদায়ে ত গুরু আছেনই, মুসলমানদের মধ্যেও গুরুস্থানীয় নানা পীর আছেন—আগা খাঁ ত এক জন খুব প্রভাবশালী ও বিত্তশালী গুরু। অতএব, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও এদেশে গুরুরূপী ডিক্টেটর বেশ মানানসই হইবে। ইহাতে আমরা ভীত। প্রত্যেক মানুষকে ভগবান বুদ্ধি দিয়াছেন। তাহার ব্যবহার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ধর্ম্মবিষয়েই হউক, আর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই হউক, বকলম দেওয়া বেশ আরামদায়ক বটে। কিন্তু তাহা কুফলপ্রদ।

—

যুদ্ধ ও রাষ্ট্রিক আন্দোলন

যুদ্ধের সময় নেতার হুকুম মানা দরকার। না মানিলে যুদ্ধে জয় হয় না। এই জন্য সৈনিকদের এই বাধ্যতা, এই নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রশংসা পাইয়াছে। ইংরেজদের সহিত রুশদের ক্রিমিয়ান যুদ্ধে ইংরেজদের লাইট ব্রিগেড হয়ত বুঝিয়াছিল, যে, শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিতে তাহারা যে হুকুম পাইয়াছে, তাহা ভ্রান্ত।* তথাপি ব্যাল্যাকলাভার যুদ্ধে ছয় শত যোদ্ধা অগ্রসর হয় এবং অধিকাংশ মারা পড়ে। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া টেনিসন তাঁহার 'চার্জ অব দি লাইট ব্রিগেড' কবিতা লিখিয়াছেন—লিখিয়াছেন—

'Forward the Light Brigade!'
Was there a man dismay'd?
Not though the soldier knew
Some one had blundered:
Theirs not to make reply,
Theirs not to reason why,
Theirs but to do and die:
Into the valley of Death
Rode the six hundred.

তাৎপর্য্য। 'হও আগুয়ান, লাইট ব্রিগেড!' এ হুকুমে তারা কেউ কি ভয় পেয়েছিল? না, যদিও তারা বুঝেছিল কারও ভুলে এমন হুকুম হয়েছে। জবাব দেওয়া তাদের কাজ নয়, যুক্তিতর্ক করা তাদের কাজ নয়—তাদের কর্ত্তব্য ছিল কেবল হুকুম তালিম করা ও মরা: তাই সেই ছয় শত যোদ্ধা মৃত্যুর উপত্যকায় ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এগিয়ে গেল।

যুদ্ধকালে সৈনিকদের এই যে নিয়মানুগত্য ও বাধ্যতা, ইহা ভারতীয় কোন কোন রাষ্ট্রনৈতিক নেতা রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টাতেও দেখিতে চান। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টা ঠিক্ যুদ্ধ নয়। সুতরাং যুদ্ধের সময় কোন সৈনিক যেমন হুকুম না-মানিলে সামরিক আদালতের বিচারে বা বিনা-বিচারেও তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারে, রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টায় দলের কোনও সভ্য হুকুম না মানিলে তাহার তেমন কিছু শাস্তি (অবশ্য প্রাণদণ্ড নহে!) হইতে পারে না।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে, কেহ কোন রাষ্ট্রনৈতিক দলের সভ্য হইলে সেই দলের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী তাঁহাকে মানিতে হইবে, না-মানিলে তিনি সভ্যত্ব ছাড়িয়া দিবেন, কিংবা সভ্যত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন। কিন্তু দলের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির জন চার-পাঁচ লোক একটা কিছু নির্দ্ধারণ করিলেই তাহা দলের মূল উদ্দেশ্যের ও নিয়মাবলীর অঙ্গীভূত হইয়া যায় না, তাহা না-মানিলে দলের নিয়ম ভঙ্গ হয় না। অথচ দেখিতেছি, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেল প্রভৃতি 'ডিসিপ্লিন চাই, ডিসিপ্লিন চাই' (নিয়মানুগত্য চাই, নিয়মানুগত্য চাই), বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জন চার-পাঁচ মানুষ সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা সম্বন্ধে যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাতেই ত কংগ্রেসের আদর্শের বিরোধী কাজ করা হইয়াছে। সুতরাং ডিসিপ্লিনের আবশ্যক যদি কাহারও হইয়া থাকে, ত তাহা তাঁহাদেরই। এক গণ্ডা বা দেড় গণ্ডা মানুষ যাহা স্থির করিবেন, তাহাই সকলকে মানিতে হইবে, কংগ্রেসের আদর্শ ও নিয়মাবলীর মধ্যে এমন কোথাও কিছু লেখা নাই। আমরা যদি কংগ্রেসের সভ্য হইতাম, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্ধারণ কখনই মানিতাম না।

যুদ্ধে যে অনেক সৈনিক, নেতার হুকুম ভ্রান্ত জানিয়াও, মরণান্ত বাধ্যতা দেখায়, তাহাতে তাহাদের সাহস ও বশ্যতা প্রমাণিত হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, যাহা মানুষকে নিজের বুদ্ধি ও বিবেক অগ্রাহ্য করিয়া অন্যের হুকুম মানিতে বাধ্য করে, সেরূপ জিনিষ ভাল নয়। যুদ্ধ সেইরূপ একটা জিনিষ। অতএব যুদ্ধের অবিচারিত বাধ্যতা শান্তিকালীন কোন প্রচেষ্টায় আমদানী করা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় হইবে, ইহা পাঠকেরা খবরের কাগজে দেখিয়া থাকিবেন। এবারকার অধিবেশনের জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ স্যার লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাজও কিছু দিন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদায়ভোজ উপলক্ষ্যে স্যার তেজবাহাদুর

* হুকুমটা যে ভ্রান্তিপ্রসূত তাহা ইংরেজদের দ্বারাও স্বীকৃত হইয়াছে। সেই কারণে এক জন ফরাসী সেনাপতি অশ্বারোহী লাইট ব্রিগেডের প্রচণ্ড বেগে শত্রু আক্রমণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'ইহা খুব জমকাল চমকপ্রদ ব্যাপার, কিন্তু ইহা যুদ্ধ নয় ('It is magnificent but it is not war')।

সাপ্রুর মত প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ ব্যক্তি মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের আইনজ্ঞান, স্বাধীনচিত্ততা ও নিরপেক্ষ বিচার-ক্ষমতার বর্ণনা করেন এবং বলেন, যে, তিনি এক জন 'গ্রেট জজ' (মহৎ বিচারপতি)। মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের জন্য বিচক্ষণতার সহিত দীর্ঘকাল বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ আছে।

এই সম্মেলনের নাম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হইলেও ইহাতে বাঙালীর সংস্কৃতির শিল্প বিজ্ঞান সঙ্গীত প্রভৃতিরও আলোচনা হইয়া থাকে—কেবল রাজনীতির আলোচনা হয় না, হইতে পারে না; কারণ গবন্মেণ্টের কর্ম্মচারী অনেকে ইহাতে যোগ দিয়া থাকেন।

কলিকাতায় ইহার অধিবেশন এই উদ্দেশ্যে করা হইতেছে, যে, যাহাতে বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীরা মিলিত হইতে পারেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার উদ্বোধন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে অনেক বাঙালী আছেন। তাঁহারা সম্মেলন উপলক্ষ্যে যত অধিক সংখ্যায় কলিকাতায় আগমন করিবেন, অধিবেশন তত অধিক সাফল্যলাভ করিবে। কলিকাতার অধিবেশনের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সকলকে সাদর ও সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত ভাবে বহু লক্ষ লোককে নিমন্ত্রণ করা সম্ভবপর নহে। এই জন্য সংবাদপত্রের মারফতে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

বঙ্গের সকল বাঙালীর পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা সমিতি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বঙ্গের সব বাঙালীকে বঙ্গের বাহির হইতে আগত অতিথিদিগের আদরযত্ন করিতে হইবে। আমরা বঙ্গের বাহিরে গেলে প্রবাসী বাঙালীরা যেরূপ আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন, তাহা আমাদের সাধ্যাতীত হইলেও আদর্শস্থানীয় নিশ্চয় বটে। বঙ্গের বাঙালী সমাজ মনোযোগী হইলে কিছু অতিথিসৎকার আমরা করিতে পারিব।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর লেক্‌চ্যারার নিয়োগ

খবরের কাগজে দেখিলাম, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে এক জন লেক্‌চ্যারার নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই নিয়োগ হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ শাস্ত্রী মহাশয়ের যোগ্যতা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাঁহাকে 'আশুতোষ সংস্কৃত-অধ্যাপক' নিযুক্ত করিলেই তাঁহার যোগ্যতার ঠিক আদর করা হইত। কলিকাতার দেশী প্রধান প্রধান দৈনিক এবং কোন কোন সাপ্তাহিক শাস্ত্রী মহাশয়ের যোগ্যতার বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাকে যোগ্যতম বলিয়াছিলেন। অবশ্য, যোগ্যতম লোকেরাই যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, এমন নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ললিতকলার অধ্যাপক নিয়োগের সময় দেখা গিয়াছিল, যে, যোগ্যতা অপেক্ষা তদ্বির ও মুরুব্বির জোরে বেশী ফল পাওয়া যায়।

শাস্ত্রী মহাশয় যে আর বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের প্রিন্সিপ্যাল থাকিবেন না, ইহাতে বিষাদ অনুভব করিতেছি। বিশ্বভারতীর ক্ষতি হইবে বলিয়া দুঃখিত হইতেছি। আশা করি শাস্ত্রী মহাশয় কোন-না-কোন প্রকারে বিশ্বভারতীর সেবা ভবিষ্যতেও করিতে পারিবেন।

—

বঙ্গে সন্ত্রাসনবাদ উচ্ছেদের বেসরকারী চেষ্টা

বঙ্গে সন্ত্রাসক দল যখন হইতে গঠিত হইয়াছে বলিয়া সন্ত্রাসক কার্য্য দ্বারা বুঝা গিয়াছে, তখন হইতেই খবরের কাগজের মারফতে এবং সভাসমিতির বক্তৃতা ও প্রস্তাবের দ্বারা উহার বিরুদ্ধে বেসরকারী মত প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তাহার উপর গত মাসে কলিকাতার জনসাধারণের একটি সভায় সন্ত্রাসনবাদ উচ্ছেদের জন্য একটি কার্য্য-প্রণালী ধার্য্য হইয়াছে। এই সভার ও তাহাতে নিযুক্ত কমিটির উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি

আছে। অবান্তর কোন কোন বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা অক্টোবর মাসের মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় লিখিয়াছি।

গবর্ন্মেণ্ট বরাবরই এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন যেন বেসরকারী লোকেরা এ-বিষয়ে যথেষ্ট কিছু করেন নাই। উদ্যোক্তাদের কার্য্যপ্রণালী খুব ব্যাপক। তাঁহারা কিছু করিতে পারিলে গবর্ন্মেণ্ট তাহা যথেষ্ট মনে করিবেন কিনা, আগে হইতে বলা যায় না।

কিন্তু বেসরকারী পক্ষের এই ধারণাটাও গবর্ন্মেণ্টের ভুলিয়া না-যাওয়া দরকার, যে, গবর্ন্মেণ্ট দমনাত্মক আইন ও কাজ ছাড়া এমন আর কিছু করেন নাই যাহার দ্বারা সন্ত্রাসনবাদের মূল নষ্ট হইতে পারে। উহার মূল উচ্ছেদ করিতে হইলে ভারতবর্ষকে স্বশাসনের অধিকার দেওয়া আবশ্যক, এবং সকল দিকে যুবা বয়সের লোকদের কার্য্যক্ষেত্র উন্মুক্ত করা ও রাখা আবশ্যক।

—

রামমোহন রায়ের স্মৃতি

১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর রামমোহন রায় ব্রিষ্টল নগরে পরলোকগমন করেন। প্রতিবৎসর ২৭শে সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের অনেক নগরে ও গ্রামে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য জনসাধারণের সভার অধিবেশন হয় এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের নানা দিক্‌ আলোচিত হয়। এ-বৎসরও তাহা হইয়াছে। সকল সভার উল্লেখ করা মাসিক কাগজের পক্ষে সম্ভব নহে। আমরা দুটির উল্লেখ করিব।

দার্জিলিঙের সভায় ঐতিহাসিক স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয় যাহা বলেন, তাহার প্রতিবেদন এসোসিয়েটেড্‌ প্রেস এইরূপ দিয়াছেন :—

"It will be a wrong reading of the Raja's life to consider him as a type of wild passionate youth aspiring to be a nation's leader," said Sir Jadunath Sarkar, in presiding over a public meeting held yesterday evening at the local Brahma Mandir Hall to commemorate the death of Raja Rammohun Roy. Sir Jadunath added,

"The Raja made long arduous preparations for his life's chosen task of founding a religion of concord. He went into the original sources of the chief religions of his day, by mastering Sanskrit, Arabic, English and Hebrew and probably some amount of Tibetan. Mere emotionalism could not have created for him such a commanding position in the world of thought. Emotion is like alcohol administered to a sinking patient; it can create a temporary stimulation, but if it is given as a permanent diet, it promptly kills him.

"The Raja's success had a more solid foundation than frothy rhetoric. He was truly a pioneer—like the early North American explorers, who blazed a trail across the dark unknown and dangerous primitive forests to reach the West. At Rammohun's birth the old Indian civilisation was almost dead, and Rammohun was the prophet of a new Indian civilisation, uniting the best elements of the East and the West, so that the Hindu race did not perish in the new age, as the American Indians have done.

"In Europe the Renaissance and the Reformation were two distinct movements. But in India they were united in the person of Rammohun. All modern Indians, Hindus, Muslims, Brahmos and Christians, irrespective of their special creeds, are the heirs of the rich legacy of spiritual and intellectual culture left behind by Rammohun Roy."

Concluding, the speaker said, "To contemplate his life and achievements is to ennoble our minds like glimpses of the pure, lofty, serene Himalayan heights caught amidst our low daily surroundings."

তাৎপর্য্য। জাতীয় নেতা হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাপোষক অসংযত-ভাবোন্মত্ত ধাঁচের এক জন যুবক বলিয়া রামমোহনকে মনে করিলে তাঁহার জীবন ভুল বুঝা হইবে। মিলন ও সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম স্থাপনরূপ তাঁহার জীবনের নির্ব্বাচিত কার্য্যের জন্য তিনি দীর্ঘকাল দুঃসাধ্য শ্রম দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত, আরবী, ইংরেজী, হিব্রু এবং সম্ভবতঃ কিছু তিব্বতী শিখিয়া তিনি তাঁহার সময়কার প্রধান ধর্ম্মগুলির মূল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কেবল ভাবোচ্ছ্বাসপরায়ণতা চিন্তারাজ্যে তাঁহাকে এরূপ উচ্চ স্থান দিতে পারিত না। ভাবাবেশ ম্রিয়মাণ রোগীকে প্রদত্ত সুরাসারের মত। উহা সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু উহা নিত্যগ্রহণীয় খাদ্যরূপে দিলে অচিরে তাহার মৃত্যুর কারণ হয়।

রাজার কৃতকার্য্যতার সৌধ ফেনিল বাগ্মিতা অপেক্ষা দৃঢ়তর ভিত্তির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি এক জন প্রকৃত পথনির্ম্মাতা অগ্রনায়ক ছিলেন। রামমোহনের জন্মকালে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা মৃতপ্রায় হইয়াছিল। রামমোহন নূতন এক ভারতীয় সভ্যতার প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন, যাহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ উপাদানসমূহ সম্মিলিত হইয়াছে, এবং যাহার ফলে নব যুগে হিন্দুজাতি লোপ পায় নাই।

ইউরোপের রেনেশাঁস (প্রাচীন সভ্যতার নব অভ্যুদয়) এবং রিফর্মেশ্যন (ধর্ম্মের ও সমাজের সংস্কার) দুটা আলাদা প্রচেষ্টা। কিন্তু ভারতবর্ষে এই দুটি একা রামমোহনের জীবনে মিলিত হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টিয়ান—সমুদয় আধুনিক ভারতীয়, তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মমত নির্বিশেষে, রামমোহনের আধ্যাত্মিক ও মানসিক সম্পদের উত্তরাধিকারী।

আমাদের দৈনিক জীবনের নিম্নস্তরের পরিবেষ্টনের মধ্যে হিমালয়ের উচ্চ প্রশান্ত নির্ম্মল শিখরসমূহের ঈষৎ ক্ষণিক দর্শন যেমন আমাদিগকে উন্নত করে, তাঁহার জীবন ও অবদানপরম্পরার পরিচিন্তনও আমাদিগকে সেইরূপ উন্নততর লোকে লইয়া যায়।

শান্তিনিকেতনে রামমোহন স্মৃতিসভায় অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, এম্‌-এ, বলেন,

সমগ্র হিন্দু-ভারত বৎসরের এই সময় পরলোকগত পিতৃপুরুষদিগের তর্পণ করিয়া থাকেন। এমন একটি সময়ে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

সন্তানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবার সুযোগ হওয়ায় ভালই হইয়াছে। রামমোহন রায়ের ব্যক্তিত্ব মহামানবত্বের দীপ্তিতে সমুদ্ভাসিত। তাই তিনি দেশকে একটি গৌরবময় লক্ষ্যের দিকে লইয়া গিয়াছেন।

অধ্যাপক সেন বলেন, তাঁহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে সেই নিত্যজ্ঞানময়ের চরণেই তাঁহার নশ্বর দেহ উৎসর্গীকৃত হয়। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানানুরাগের তুলনায় দেশপ্রেম ছিল আরও অধিক। তাই তিনি জগতের নিকট দেশের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। যখন তিনি সাহসের উপর ভর করিয়া নূতন যুগের সূচনাকল্পে কালের গুরু আহ্বানে একটা নূতন ভাবধারা বহন করিয়া আনিলেন, সেই ছিল তাঁহার জীবনের একটা যুগ-প্রবর্ত্তনকারী শুভ মুহূর্ত্ত। এই সময় দেশে সহসা বাহির হইতে একটা নূতন ভাবের বন্যা প্রবেশ করিয়া দেশবাসীকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকচ্ছটায় মুগ্ধ ও বিমোহিত করিল। তাহারই জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল এই মহামানবের। জাতীয় ইতিহাসের ইহা ছিল অতিশয় সঙ্কটমুহূর্ত্ত; পুরাতন যাহাকিছু ছিল, তাহার বিরুদ্ধে চলিতেছিল একটা মারাত্মক অভিযান। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে যাঁহারা আসিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। এই সময় আসিলেন রামমোহন। তিনি তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং অসামান্য বুদ্ধিবলে সুদক্ষ নাবিকের মত এই বিক্ষুব্ধ স্রোতাবর্ত্ত হইতে জাতীয় ভাবধারাকে একটা সুনিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতিগত পরাজয়ের গ্লানি হইতে ভারতকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রামমোহন প্রাচীন আদর্শকে একেবারে বর্জ্জন করেন নাই। ঐরূপ কোনও ভাব তাঁহার মনে স্থানও পায় নাই। কারণ, ভারতের বিশাল ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াই তিনি পরিপুষ্ট হইয়াছেন। তিনি ধর্ম্মের মূলসূত্রকে আধুনিক জ্ঞানালোকের সাহায্যে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন। তাহা সংস্কারবাদী ও সনাতনী উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক হইয়াছে। এইরূপ অদম্য চেষ্টাদ্বারা তিনি জীবনের একটা নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিলেন। রামমোহন রায় তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ও দূরদৃষ্টি দ্বারা ভারতের যে উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

অধ্যাপক সেন আরও বলেন, যে, জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রামমোহনের বিশেষ দান রহিয়াছে। তাঁহার দেশপ্রেমের কথা পুনরায় বলা নিষ্প্রয়োজন। জাতীয় অভাব-অভিযোগের প্রতিকারকল্পে তিনিই প্রথম ইংলণ্ডে গিয়া আন্দোলন সুরু করেন। শিক্ষাসম্পর্কে তিনি ইংলণ্ডে যে প্রস্তাব প্রেরণ করেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বাংলা গদ্যসাহিত্যেও তাঁহার দান কম নহে।

উপসংহারে অধ্যাপক সেন বর্ত্তমান ভারতের যুবকদিগকে এই মহৎ জীবনের ভাবধারা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিবার জন্য অনুরোধ করেন।—আনন্দবাজার পত্রিকা

—

স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ

স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ অনেক বৎসর ধরিয়া হাইকোর্টের জজিয়তী করিয়াছিলেন এবং তাহার মধ্যে চারিবার প্রধান বিচারপতির কাজ অস্থায়ী ভাবে করিয়াছিলেন। পঞ্জাবে স্থায়ী দেশী প্রধান বিচারপতি হইয়াছিলেন স্যর শাদীলাল। বঙ্গে যে কোন দেশী লোক স্থায়ী প্রধান বিচারপতির পদ পান নাই, তাহা যোগ্যতার অভাবে নহে। জজ হইবার পূর্ব্বে যখন স্যর চারুচন্দ্র উকীল ও পরে ব্যারিষ্টার ছিলেন, তখন রাজনীতিক্ষেত্রেও সার্ব্বজনিক হিতকর্ম্মের সহিত তাঁহার কর্ম্মময় যোগ ছিল; জজ হইবার পরেও রাষ্ট্রনৈতিক ভিন্ন অন্যবিধ অনেক দেশহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। এইরূপ আশা ছিল, যে, তিনি জজিয়তী এবং পরে বঙ্গীয় [illegible] সভ্যত্ব ছাড়িয়া দিবার পর স্বাস্থ্যলাভানন্তর আবার রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও উদারনৈতিক দলের সঙ্গে যোগ দিয়া কাজ করিবেন। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে সে আশা পূর্ণ হইল না। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ অতিক্রম করিয়াছিল।

—

কুমার মন্মথনাথ মিত্র

কুমার মন্মথনাথ মিত্র পরলোকগত রাজা দিগম্বর মিত্রের পৌত্র ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ হইয়াছিল। দেশহিতকর অনেক কাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বঙ্গবিভাগের পর যখন জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপিত হয়, তখন তিনি তাহাতে অনেক টাকা দিয়াছিলেন এবং টাকা সংগ্রহের জন্য খালি পায়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থিত সঙ্গীতসমাজের গৃহে তিনি চরখায় সুতা কাটা শিখাইবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ঝামাপুকুরে তাঁহাদের বংশের প্রাসাদে অনেক দরিদ্র ছাত্র ও অন্য দরিদ্র লোক প্রত্যহ আহার পাইত ও অনেক রোগী ঔষধপথ্য পাইত। গরিব লোকদের এই উভয়বিধ সেবার কাজ সেখানে এখনও হয়। ইহা স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। কুমার মন্মথনাথ সাহিত্যানুরাগী এবং মণিরত্ন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও সুনির্ব্বাচক ছিলেন।

—

মডার্ণ রিভিয়ু সম্বন্ধে ডক্টর সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের মত

আমেরিকার ভারতবন্ধু ধর্ম্মাচার্য্য ডক্টর সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের নাম শিক্ষিত ভারতীয়দের নিকট সুবিদিত। তাঁহার বয়স তিরানব্বই বৎসর হইয়াছে, অথচ তিনি এখনও নূতন

গ্রন্থ লিখিতেছেন এবং আমেরিকার ও ভারতবর্ষের অনেক কাগজে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। তিনি সম্প্রতি মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীর সম্পাদককে এই চিঠিখানি লিখিয়াছেন :—

Editor of "The Modern Review,"
Calcutta, India.

MY DEAR SIR:

I have long had in mind sending you some brief words expressing my high appreciation of the monthly magazine which for so many years you have edited and published. I have taken it almost from the beginning of its issue, and consider it indispensable. It is a constant wonder to me on account of the breadth and wealth of its contents, covering as it does, and with such intelligence, the wide fields of politics, history, literature, art, education, economics, industries, social reform and religious reform. I speak with care when I say, that we do not have in America, nor is there in England, any monthly review that covers so wide a field, and does it with such accuracy of scholarship and at the same time so interestingly. One might well suppose that your Review would confine itself to Indian affairs. As a matter of fact, it gives a larger amount of important Indian matters than any other periodical with which I am acquainted, while at the same time it takes the world for its field, and is surprisingly rich in information regarding everything of most importance that is going on in all countries.

It ought to have a large circulation in foreign lands, as well as in India. I know of no other periodical that so truly and adequately represents the real India, giving to the world what the world ought to know about India's civilization, her great past, the present condition of her people, the real nature and effects of British rule, and the meaning of her great struggle for freedom.

I regard *The Modern Review* as not only an invaluable asset to India; but as a messenger to the outside world, the importance of which increases with every year of its publication.

My dear Mr Chatterjee, I trust you will pardon these frank words from me, which I am sure will surprise you. But my personal debt to your able monthly is so great that I could not forgive myself if I refrained longer from expressing them.

Sincerely,
J. T. SUNDERLAND.

New York,
September 1, 1934.

ভারতবর্ষে ডক্টর সাণ্ডার্ল্যাণ্ড "ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ" নামক গ্রন্থের লেখক বলিয়াই পরিচিত। কিন্তু তিনি "দি অরিজিন্ এণ্ড্ ক্যার‍্যাক্টার অব্ দি বাইবল," "ইণ্ডিয়া ইন্ ওয়ার্ল্ড ব্রাদারহুড," "রিলিজ্যান এণ্ড্ ইভলিউশ্যন," "এমিনেণ্ট্ অ্যামেরিকান্স্ হুম্ ইণ্ডিয়া অট টু নো," প্রভৃতি আরও অনেক বই লিখিয়াছেন। এখন পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম সম্বন্ধে একখানি এবং আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মনীষী এমার্সন সম্বন্ধে একখানি বহি লিখিতেছেন।

শান্তিনিকেতনে চৈনিক অধ্যাপকদ্বয়

ইউনাইটেড্ প্রেস সংবাদ দিয়াছেন—

বিশ্বভারতীর কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক তান ইউন সান এবং অধ্যাপক চেন ইউ-সেনকে চীনে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে এক প্রীতিভোজে সম্বর্দ্ধিত করেন। উক্ত অধ্যাপকগণ চীন-ভারতীয় সংস্কৃতি-সঙ্ঘ সম্পর্কে শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী তাঁহাদিগের শুভযাত্রা কামনা করেন এবং চীন-ভারতীয় সংস্কৃতির ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন বৃদ্ধিকল্পে তাঁহারা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এই চীন বন্ধুদ্বয় সত্য সত্যই প্রভু বুদ্ধের বাণীতে অনুপ্রাণিত। প্রভু বুদ্ধ এক সময় তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে বাণী প্রচারের জন্য দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। ইঁহারাও তাহাই করিতেছেন। বক্তা আশা করেন যে, তাঁহাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইবে। তিনি আরও আশা করেন যে, সেই সময় খুব দূরবর্ত্তী নহে, যখন ইঁহাদের চেষ্টায় চীন ও ভারত জগতের শান্তি ও সুখের জন্য একযোগে কাজ করিবে।

অধ্যাপক চেন মিঃ ঠাকুর ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপকবৃন্দকে তাঁহাদের সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ দেন। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেরূপ যত্ন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে তাঁহারা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা যাহাতে কবি ও শাস্ত্রী মহাশয়ের আশীর্ব্বাদের যোগ্য পাত্র হইতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের কামনা। তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহাদের সহযোগিতা ও সদিচ্ছা পাইলে তাঁহারা শান্তিনিকেতনে একটি চীন মন্দির নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইবেন। সেখানে চীন ও ভারতীয় কৃতী ছাত্রগণ একত্র মিলিত হইয়া উভয়ের সংস্কৃতির মধ্যে একটা সঙ্ঘ স্থাপন করিবেন।

অধ্যাপক তানও অনুরূপ বক্তৃতা করেন। আপাততঃ-বিদায়-সম্ভাষণান্তে সকলে প্রস্থান করেন।

অধ্যাপকগণ কলিকাতা হইতে ২রা অক্টোবর দিনে রওনা হইবেন।

লীগ্ অব্ নেশ্যন্সে রুশিয়ার যোগদান

রুশিয়া জেনিভার মহাজাতি-সংঘের (লীগ অব্ নেশ্যন্সের) সভ্য হইয়াছেন। লীগের সভ্য আর যত রাষ্ট্র আছে, সবগুলি ধনিকপ্রভুত্বের দেশ এবং যাহারা লীগে প্রভুত্ব করে তাহারা সাম্রাজ্যবাদী ধনিকপ্রভুত্বের দেশ। রুশিয়া শ্রমিকপ্রভুত্বের রাষ্ট্র। লীগের যে অধিবেশনে রুশিয়াকে তাহার সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহাতে রুশিয়ার প্রতিনিধি লিটভিনফ বলেন,

"নিজের কোন বিশেষত্ব বর্জ্জন না করিয়া এবং নিজ ব্যক্তিত্ব অটুট রাখিয়া নূতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি স্বরূপ রুশিয়া লীগে যোগ দিয়াছে, এবং জগতে শান্তি স্থাপনার্থ মহাজাতি-সমূহের মন্ত্রণাসভায় নিজের ক্ষমতা ও প্রভাব অনুভূত করাইতে অঙ্গীকার করিতেছে।"

লীগ ছোট ছোট কোন কোন জাতির ঝগড়া মিটাইয়া দিয়া যুদ্ধ নিবারণ করিতে পারিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য; কিন্তু

পরাক্রমশালী জাতিদের (যেমন জাপানের) বেলায় কিছু করিতে পারেন নাই। তা ছাড়া, সাম্রাজ্যবাদ জিনিষটাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিবার এক প্রকার স্থায়ী অবস্থা ও ব্যবস্থা। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের গবর্মেণ্টসমূহ সাম্রাজ্যবাদ পরিত্যাগ করিয়া যদি নিজ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে স্বশাসক করিয়া দেন, তাহা হইলে জগতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। নতুবা শক্তিশালী কোন দেশ অন্য কোন দেশ জয় করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে গেলে যখনই লীগের কর্ত্তারা যুদ্ধের পরিবর্ত্তে শান্তির পক্ষে ওকালতী করিতে যাইবেন, তখনই সেই শক্তিশালী জাতি বলিবে, "তোমরা ত আগে আগে যুদ্ধ করিয়া নিজেদের সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছ, এখন আমাদের সেই প্রকার কাজে বাধা দাও কোন্ মুখে? আগে নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে স্বাধীনতা দাও, তাহার পর আমাদিগকে উপদেশ দিতে আসিও।" জাপান যে চীন সাধারণতন্ত্রের মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি বৃহৎ ভূখণ্ড কার্য্যতঃ গ্রাস করিয়াছে, কাহারও নিষেধ উপদেশ মানে নাই, তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে উক্তপ্রকার মনোভাব।

রুশিয়া লীগের সভ্য শক্তিশালী অন্য সব রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করাইতে পারিবে কি? না পারিলে শান্তি স্থাপিত হইবে না। রুশিয়া অন্যদিগকে সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করাইতে না-পারিয়া নিজেই যদি সাম্রাজ্যবাদী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার লীগপ্রবেশ সুফলপ্রদ হইবে মনে হয় না।

—

লীগের সভ্য ভারতবর্ষ ও রুশিয়া

লীগ্ অব্ নেশুন্সের একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আছে, তাহার নাম লীগ্ কৌন্সিল। ইহার সভ্যসংখ্যা পনর। এই পনরটির মধ্যে পাঁচটির আসন স্থায়ী ভাবে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মেনী ও জাপানকে দেওয়া হইয়া আছে। জাপান লীগ্ ত্যাগ করায় একটা আসন খালি হয়। তাহা রুশিয়াকে দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ লীগের সভ্য হইলেই সে স্থায়ী ভাবে লীগ কৌন্সিলেরও সভ্য হইবে, এই সর্ত্তে সে সভ্য হয়।

অন্য দিকে, ভারতবর্ষ লীগস্থাপনের তারিখ হইতেই লীগের সভ্য; কিন্তু এ-পর্য্যন্ত লীগ্ কৌন্সিলের স্থায়ী সভ্য হওয়া দূরে থাক্, এক বৎসরেরও জন্য অস্থায়ী সভ্যও তাহাকে করা হয় নাই। নিজের একটা ভোট বাড়াইবার জন্য গ্রেট ব্রিটেন ভারতবর্ষকে গোড়া হইতেই সভ্য করাইয়াছে, কিন্তু কৌন্সিলের সভ্যদের মর্য্যাদায় পরাধীন ভারতবর্ষ উন্নীত হয়, তাহা গ্রেট ব্রিটেনের ইচ্ছা নহে। নতুবা গ্রেট ব্রিটেন প্রস্তাব করিলে অন্ততঃ একবারও ভারতবর্ষ কৌন্সিলের অস্থায়ী সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিত।

রুশিয়ার স্বাধীনতা ও পরাক্রম এবং ভারতবর্ষের পরাধীনতা ও দুর্ব্বলতা লীগে রুশিয়ার ও ভারতবর্ষের মর্য্যাদার পার্থক্যের কারণ।

—

ভারত সম্বন্ধে লীগের ব্যবহার

সাতান্নটি রাষ্ট্র লীগ্ অব্ নেশুন্সের সভ্য। লীগের বার্ষিক খরচ যত হয়, তাহাকে ১০১৩টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এক একটি ভাগকে য়ুনিট বা একক বলা হয়। শক্তি, মর্য্যাদা, ধনবত্তা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া এক একটি রাষ্ট্রসভ্যকে কয়েকটি য়ুনিট চাঁদা দিতে হয়। ভারতবর্ষ দেয় ৫৬ য়ুনিট। ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী য়ুনিট দেয় আর কেবল পাঁচটি রাষ্ট্র। সুতরাং, শুধু ভারতবর্ষের বিশালতা ও লোকসংখ্যা হিসাবে নহে, তাহার প্রদত্ত চাঁদা হিসাবেও তাহার লীগ্ কৌন্সিলের সভ্য হইবার দাবি রহিয়াছে ঐ অধিকতর চাঁদাদাতা পাঁচটি মাত্র রাষ্ট্রের পরেই। কিন্তু, যেমন সংস্কৃত প্রবচনে বলে, "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী," তেমনি বলা যাইতে পারে, যে, পরাধীনতা-দোষে অন্য সব গুণ বা যোগ্যতা খণ্ডিত হইয়া যায়।

লীগ যে ভারতবর্ষের প্রতি অনেক কর্ত্তব্য করেন নাই, তাহা অনেক বার বলিয়াছি। ১৯২৬ সালে লীগের নিমন্ত্রণে জেনিভা যাইবার পর আমরাই বোধ হয় এদিকে সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। লীগের একটা অবিচারের কথা আবার বলিতেছি।

লীগের খরচের ১০১৩ য়ুনিটের মধ্যে ৫৬টা য়ুনিট অর্থাৎ শতকরা সাড়ে পাঁচ ভাগের কিছু বেশী ভারতবর্ষ দেয়। অতএব লীগের অধীন চাকরির শতকরা সাড়ে পাঁচটা

ভারতীয়দের ন্যায়তঃ পাওয়া উচিত। কিন্তু মোটামুটি ৭০০ (সাত শ)টার মধ্যে ভারতীয়েরা স্থায়ী ভাবে ছয়টাতে এবং অস্থায়ী ভাবে তিনটাতে নিযুক্ত আছে। শুধু স্থায়ী চাকরিগুলিই গণনার মধ্যে ধরা উচিত। তাহা হইলে ভারতীয়েরা শতকরা একটি চাকরিও পায় নাই। যদি অস্থায়ী তিনটিও ধরা হয়, তাহা হইলে ভারতীয়েরা শতকরা ১·৩এর চেয়েও কম চাকরি পাইয়াছে, অথচ চাঁদা দেয় শতকরা সাড়ে পাঁচ ভাগেরও বেশী। তদ্ভিন্ন, আরও একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, যে, ভারতীয়েরা লীগের কোন বিভাগ বা উপবিভাগেই উপরের কোন কাজ পায় নাই, অধস্তন চাকরিতেই নিযুক্ত আছে।

—

আফগানিস্থানের লীগ প্রবেশ

আফগানিস্থানও লীগ্ অব্ নেশ্যন্সের সভ্য হইয়াছে। লীগের যে অধিবেশনে আফগানিস্থানের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়, তাহাতে আগা খাঁ ভারত-গবর্মেণ্টের অন্যতম প্রতিনিধি-রূপে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "লীগ কেবল প্রতীচ্যের এবং একই ধর্ম্মের (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের) প্রতিনিধি হইবার আশঙ্কা থাকায় ইহার উদার ও বিশ্বজনীন হইবার পক্ষে বাধা রহিয়াছে। অতএব তাঁহার (আগা খানের) মত এক জন মুসলমানের বিবেচনায় আর একটি মুসলমান দেশের লীগের সভ্য হওয়া কম কথা নহে। আফগানিস্থানের লোকদের ধর্ম্ম যাহা, ভারতবর্ষের ৭ কোটি লোকেরও ধর্ম্ম তাই।"

ভবী ভুলবার নয়! লীগ অব নেশ্যন্সেও ধর্ম্ম অনুসারে বখরা চাই। কিন্তু সে বড় কঠিন ঠাঁই, ওয়েটেজের আশা নাই।

যাহাই হউক, ধর্ম্মের কথা যখন উঠিয়াছে, তখন বলিতে হয়, যে, ভারতবর্ষে হিন্দু আছে প্রায় ২৪ কোটি, অন্যত্রও অল্পস্বল্প আছে, এবং হুইটেকারস্ য়্যালম্যানাক অনুসারে সমগ্র পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা ২১ কোটির কিছু কম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পৃথিবীতে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য আছে কেবল নেপাল।

—

লীগ ও নেপাল

শৌর্য্যে ও লোকসংখ্যায় নেপালের চেয়ে নিম্নস্থানীয় কয়েকটি রাষ্ট্র লীগ অব নেশ্যন্সের সভ্য। সুতরাং নেপালও তাহার সভ্য হইতে পারে। তা ছাড়া, দাসদিগের মুক্তিদানরূপ লীগের একটি কর্ত্তব্য, নেপাল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিয়াছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রীই প্রকৃত শাসনকর্ত্তা। তাঁহাকে মহারাজা বলে। বর্ত্তমান মহারাজা যুদ্ধ শম্শের জং বাহাদুর রাণা ইংলণ্ডে নেপালের দৌত্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ লীগ অব নেশ্যন্সের সভ্য হইবারও চেষ্টা তিনি করিবেন।

—

মীরা বেনের আমেরিকা যাত্রা

এক জন ইংরেজ নৌসেনাপতির কন্যা কুমারী স্লেড্, মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য হন। তাঁহার ভারতীয় নাম হয় মীরা বেন্ (ভগিনী মীরা)। তিনি বিলাত গিয়া শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের কাছে গান্ধীজীর বাণী প্রচার করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের ন্যায্য দাবির কথা তাহাদিগকে জানাইয়াছেন। তিনি গড়ে প্রত্যহ একটা এবং গত ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পঁয়ষট্টিটা সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর কাছে তিনি আশ্চর্য্য রেস্পন্স্ (সাড়া) পাইয়াছেন। এই সাড়ার অকপটতা ও ক্ষমতা ফল দ্বারা অনুমেয় হইবে।

এখন মীরা বেন আমেরিকায় গিয়া চৌদ্দ দিন থাকিবেন এবং সেখানে লোকদিগকে ভারতবর্ষ ও মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে সত্য কথা শুনাইবেন। অবশ্য, সেখান হইতেও তিনি সম্ভবতঃ আশার কথা ভারতবর্ষে প্রেরণ করিবেন। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ দেশটার আয়তন তিন লক্ষ বর্গ মাইলের অধিক, ভারতবর্ষের দেড়গুণেরও বেশী। অতবড় দেশে চৌদ্দ দিনে কিছু করা বড় কঠিন। তা ছাড়া, আমেরিকাতে সকল দেশের সকল লোকের কল্যাণকামী স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ অনেক থাকিলেও, আমেরিকান্ জাতিটা ভারতবর্ষের জন্য ইংলণ্ডের উপর চাপ দিবে, এরূপ আশা করা দুরাশা। প্রসিদ্ধ লেখক ডক্টর সাণ্ডার্ল্যাণ্ড আমেরিকার রাষ্ট্রিক (সিটিজেন)। তাঁহার একটি অভিজ্ঞতা হইতে এ-বিষয়ে ভারতীয়দের চোখ খুলিতে পারে। তাহার বিষয় নীচে লিখিতেছি।

—

ভারতবর্ষ ও আমেরিকান পুস্তক-প্রকাশকগণ

সবাই জানেন, মিস্ মেয়োর ভারতবর্ষের নিন্দাপূর্ণ বহির আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে কাটতি খুব হইয়াছে। তাহার বহি প্রকাশ করিতে তাহাকে কোনই কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। তাহার অনুবাদও কয়েকটা ভাষায় হইয়াছে।

অন্য দিকে ডক্টর সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের ভারতবর্ষ-বিষয়ক বহি প্রকাশের জন্য তাঁহাকে কিরূপ বেগ পাইতে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে শুনুন। তিনি আমাদিগকে আমাদের কোন একটা জিজ্ঞাসা উপলক্ষ্যে গত ৩০শে জুলাই লেখেন :—

"I tried 14 publishers before I found one that would touch my book, with one exception:

the Putnams would issue it and handle it for 6,000 dollars, but would guarantee nothing and would not advertise it. All were afraid of Britain. Copeland was sympathetic with India, but I had to pay him 2,000 dollars down, and 1,000 dollars more later on for advertising. In all, my book cost me over 4,000 dollars," etc.

তাৎপর্য্য। "আমার বহি যে ছুঁইবে (অর্থাৎ কোন সর্ত্তে প্রকাশিত করিতে রাজী হইবে) এ রকম কোন প্রকাশক পাইবার আগে আমি চৌদ্দ জায়গায় চেষ্টা করিয়াছিলাম—একটি ব্যতিক্রমস্থল আছে। পুটনাম্‌রা বলে, যে, তাহাদিগকে প্রকাশব্যয়-স্বরূপ ছয় হাজার ডলার দিলে তাহারা উহা প্রকাশ করিবে এবং দোকানে রাখিয়া কেহ চাহিলে দিবে, কিন্তু বহিখানার বিজ্ঞাপন দিবে না এবং বিক্রীর থেকে যে খরচ কিছু উঠিবে বা কিছু লাভ হইবে, তাহার গ্যারান্টী দিবে না। সকলেই ব্রিটেনের ভয়ে ভীত। কোপ্‌ল্যাণ্ড (যে প্রকাশক বহিখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন) ভারতবর্ষের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু আমাকে তাঁহাকে আগাম দু-হাজার ডলার দিতে হইয়াছিল, এবং পরে বিজ্ঞাপনের জন্য আরও এক হাজার ডলার দিতে হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত, আমার বহিটির জন্য আমার চারি হাজার ডলারেরও উপর খরচ হইয়াছিল," ইত্যাদি।

এক ডলার মোটামুটি তিন টাকার সমান।

ডাঃ সাণ্ডার্‌ল্যাণ্ড ভারতবর্ষের জন্য যে শুধু ইহাই করিয়াছেন, তাহা নহে, বিনা পারিশ্রমিকে বহু বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের অনেক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন।

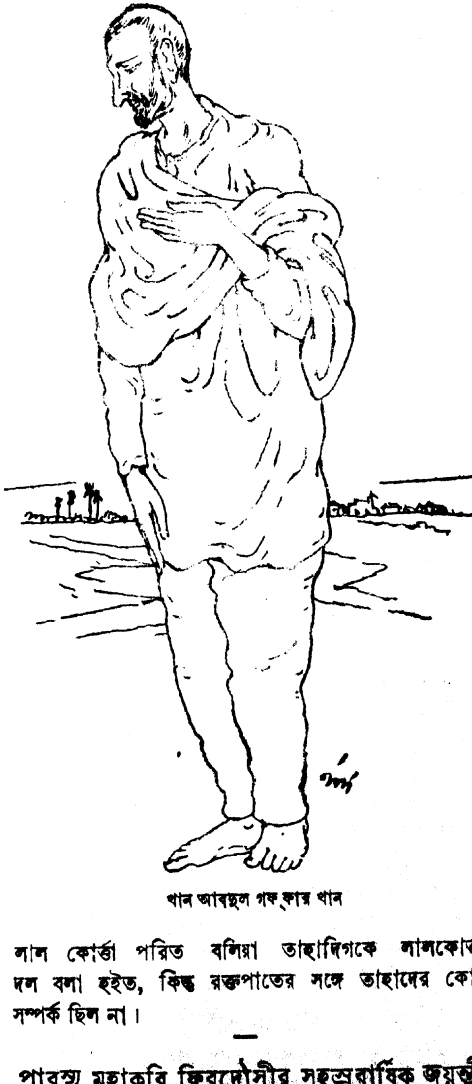
—

খান আবদুল গফ্‌ফার খান

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসনেতা খান আবদুল গফ্‌ফার খান বন্দী অবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়া শান্তিনিকেতনে তাঁহার পুত্রকে দেখিতে এবং রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য সেখানে গিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সেখানকার ছাত্র। ইহা হইতেই তাঁহার মনের ভাব বুঝা যায়। সেখানে কবির ও আশ্রমের পক্ষ হইতে তাঁহার আন্তরিক সদ্ভাব ও শ্রদ্ধাপূর্ণ অভ্যর্থনা হয়। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু তাঁহার যে উৎকৃষ্ট রেখাচিত্রটি আঁকিয়াছেন, বসু মহাশয়ের সৌজন্যে এখানে তাহার প্রতিলিপি দিতেছি।

খান সাহেব কলিকাতাতেও আসিয়াছিলেন এবং এখানেও তাঁহার অভ্যর্থনা হইয়াছিল।

যাহারা ভীরুতা বশতঃ মৃত্যুভয়ে যুদ্ধ করিতে পারে না, তাহাদের অহিংসাবাদের বিশেষ কোন মূল্য নাই। কিন্তু পাঠানরা সেরূপ জাতি নহে। যুদ্ধপ্রিয় সাহসী পাঠানদের মধ্যে অহিংসা প্রচার করিয়া খান সাহেব এক লক্ষ সভ্য লইয়া "খুদা-ই-খিদমদ্‌গার" (ঈশ্বরের সেবক) দল গড়িয়া ছিলেন। এই দলের মূলমন্ত্র ছিল অহিংসা। তাহারা



খান আবদুল গফ্‌ফার খান

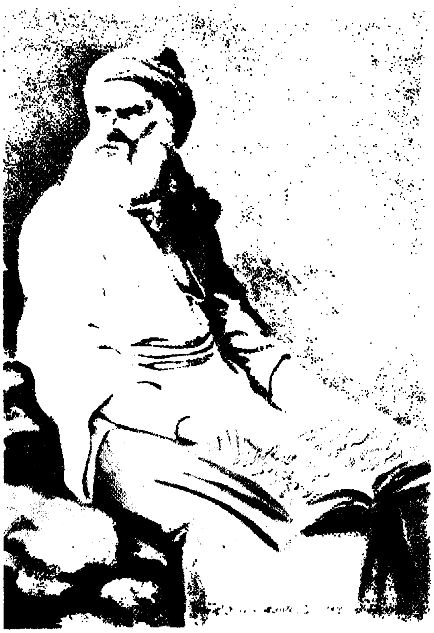
লাল কোর্ত্তা পরিত বলিয়া তাহাদিগকে লালকোর্ত্তা দল বলা হইত, কিন্তু রক্তপাতের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না।

—

পারস্য মহাকবি ফিরদৌসীর সহস্রবার্ষিক জয়ন্তী

শাহ্‌-নামা প্রণেতা মহাকবি ফিরদৌসীর জন্ম হয় প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে। পারস্যের বর্ত্তমান নৃপতি রিজাশাহ্‌ পহলবী তাঁহার সহস্রবার্ষিক জয়ন্তী করিতেছেন। শাহ্‌-নামা সম্বন্ধে আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, যে, গজনীর সুলতান মামুদ বলেন, যে, ঐ মহাকাব্যের প্রত্যেক

হাজার শ্লোকের জন্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা কবিকে দিবেন। সুলতান প্রধান মন্ত্রীকে তদনুরূপ আদেশ দেন। মন্ত্রী ফিরদৌসীকে ঈর্ষ্যা করিত। যখন মহাকাব্যটি সম্পূর্ণ করিয়া কবি তাহা সুলতানকে উপহার দিলেন, তখন মাহমুদ কবিকে ৬০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা দিতে আদেশ করিলেন।



মহাকবি ফিরদৌসী

ঈর্ষ্যান্বিত মন্ত্রী স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে মোহর-করা কতকগুলি থলিতে করিয়া রৌপ্যমুদ্রা পাঠাইয়া দিল। যখন থলিগুলি ফিরদৌসীর গৃহে পৌঁছিল তখন তিনি স্নানাগারে ছিলেন। থলি খুলিয়া রৌপ্যমুদ্রা দেখিয়াই তাঁহার মনে হইল সুলতান তাঁহাকে অপমানিত করিতে চাহিয়াছেন। অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ হাম্মামীকে (স্নানাগাররক্ষককে) ২০,০০০, শরবৎ-বিক্রেতাকে ২০,০০০ এবং যে দাস থলিগুলি আনিয়াছিল তাহাকে বাকী ২০,০০০ বখশিস দিলেন। দাসকে বলিলেন, "আমি ধনের জন্য লিখি নাই, যশের জন্য লিখিয়াছিলাম।" সমস্ত খবর সুলতানের নিকট পৌঁছিলে তিনি উজীরের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু ধূর্ত্ত উজীর বলিল, "আপনি যাহা দিবেন, তাহাই সম্মান বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। অতএব, ফিরদৌসীর অত্যন্ত বেয়াদবী হইয়াছে।" এইরূপ আরও অনেক কথা বলিয়া উজীর পরিশেষে কবির প্রতি সুলতানের মনে ক্রোধের সঞ্চার করে। ফলে কবিকে পলায়ন করিয়া নানা কষ্টভোগ করিতে হয়। কবিও সুলতানের সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপপূর্ণ কবিতা রচনা করেন।

পরিশেষে সুলতানের রাগ পড়িয়া যায় এবং তাঁহার মনে কবির প্রতি দয়ার সঞ্চার হয়। তিনি তাঁহাকে ৬০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দেন। এক দিন কবি বাজারে বেড়াইবার সময় শুনিলেন একটি বালক তাঁহার রচিত সুলতানের প্রতি প্রযুক্ত বিদ্রূপের কবিতা আবৃত্তি করিতেছে। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, এবং গৃহে নীত হইবার পর একটিও কথা না বলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। যখন তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন সুলতানের উপহার ৬০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা পৌঁছে। কবির কন্যাকে তাহা দিতে চাহিলে তিনি এই বলিয়া তাহা লইতে অস্বীকার করেন, যে, তাঁহার পিতা তাঁহার জীবিত কালে যাহা গ্রহণ করেন নাই, সেই প্রত্যাখ্যাত উপহার গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অশোভন হইবে।

আরবদিগের দ্বারা পারস্য বিজিত হইবার পূর্ব্বেকার পারস্য-নৃপতিগণের সম্বন্ধে শাহ্‌নামা মহাকাব্য রচিত। ইহা ছাড়া ফিরদৌসীর রচিত কতকগুলি কসীদা ও গজল আছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার য়ুসুফ-উ-জুলেইখা নামক কবিতাও পারসীক সাহিত্যে সুবিদিত।

—

বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বসু

কলিকাতার কয়েকটি ইংরেজী ও বাংলা দৈনিক ইউনাইটেড্ প্রেসের মারফৎ প্রাপ্ত "রিকন্সিলিয়েশ্যন" নামক বিলাতী মাসিকে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধ ৩০শে সেপ্টেম্বর ও ২রা অক্টোবর প্রকাশিত করিয়াছেন। উহা এয়ার মেলে (বিমান-ডাকে) প্রাপ্ত বলিয়া উপরে লিখিত আছে। "রিকন্সিলিয়েশ্যন" কাগজের গত এপ্রিল সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হয়। আমরাও গত সেপ্টেম্বর মাসে ঐ সংখ্যা এক খানি পাই। এপ্রিলের কাগজ সেপ্টেম্বরে কেন পাইলাম বলিতে পারি না। ইউনাইটেড্ প্রেসই বা উহা সেপ্টেম্বর মাসে বিমান-ডাকে কেন পাইলেন, জানি না। তবে, উহা যখন সম্প্রতি এদেশে প্রকাশিত হইয়াছে, তখন সে-সম্বন্ধে কিছু বলি।

ঐ প্রবন্ধটি রিকন্সিলিয়েশ্যনের এপ্রিল সংখ্যায় ১০৪-৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার পরে ১০৫-৬ পৃষ্ঠায় "আদার ইণ্ডিয়ান ভিউজ" নাম দিয়া ঐ বিলাতী কাগজের দু-জন পত্রপ্রেরকের চিঠি দুখানি ছাপা হইয়াছে। বিলাতী কাগজখানি গোপনে ভারতবর্ষে আসে নাই, গবর্মেণ্টের ডাক-

বিভাগ উহা পৌঁছাইয়া দিয়াছে। উহা সন্ত্রাসকদের বা বিপ্লববাদীদের কাগজ নহে। বিলাতে "ফেলোশিপ অব রিকন্সিলিয়েশ্যন" নামক একটি খ্রীষ্টীয় সমিতি আছে। উহা তাহার এবং অন্য কয়েকটি তৎসদৃশ খ্রীষ্টীয় সমিতির মুখপত্র। গবন্মেণ্টের গোয়েন্দা-বিভাগের ইহার অস্তিত্ব না-জানিবার কথা নহে।

প্রবন্ধটি যদিও ৬ মাস পূর্ব্বে লিখিত ও পাঁচ মাসের অধিক পূর্ব্বে বিলাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি উহা সংপ্রতি বঙ্গে প্রকাশ করা অনাবশ্যক হয় নাই। কারণ, উহাতে গবন্মেণ্টের যে-যে কর্ত্তব্য সূচিত হইয়াছে, গবন্মেণ্ট তাহা পূর্ব্বে না-করিয়া থাকিলেও, এখনও করিলে সুফল ফলিতে পারে।

সুভাষবাবু বলিয়াছেন, যখনই রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ক্ষমা করিবার কথা উঠিয়াছে, তখনই পুলিসের রাজনৈতিক শাখা তাহার বিরুদ্ধে তাহাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। রাজনৈতিক বন্দীদিগকে কখনও যথেষ্ট সংখ্যায় উদারতা ও মহাপ্রাণতার সহিত মুক্তি দেওয়া হয় নাই, এবং যাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাহাদেরও পশ্চাতে গোয়েন্দা-বিভাগের লোক সর্ব্বদা এরূপ লাগিয়া থাকে, যে, তাহাদের ঐ অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতার অবস্থা প্রায় যন্ত্রণাভোগের অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং রাজক্ষমাতে তাহাদের প্রাণ জুড়ায় না।

তিনি বলিয়াছেন, বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার নিদান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু গবন্মেণ্ট তাহা করাইতে রাজী হন নাই। মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লেফটেন্যাণ্ট-কর্ণেল বার্কলে-হিল এই ধরণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সুভাষবাবু বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ইচ্ছা ছাড়া বঙ্গে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার একটি কারণ, মেকলে যখন বাঙালী জাতির অপমানকর নিন্দা করিয়াছিল তদবধি বাঙালীদের জাতীয় হীনতা উৎপাদন চেষ্টা।

সুভাষ বাবুর তৃতীয় কথা এই, যে, যদিও মধ্যে মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের সহিত (যেমন মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু প্রভৃতির সহিত) বুঝাপড়ার চেষ্টা গবন্মেণ্ট করিয়াছেন, কিন্তু বৈপ্লবিক দলের সহিত এরূপ বুঝাপড়ার চেষ্টা করেন নাই। তিনি অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন, যে, ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর স্যর ষ্ট্যানলী জ্যাকসন স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মধ্যবর্ত্তিতায় এরূপ বুঝাপড়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এই চেষ্টা ব্যর্থ হইবার কারণ, যে রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত কথা হইতেছিল তাঁহারা চাহিয়াছিলেন গবন্মেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথাবার্ত্তা চালান, পুলিসের মধ্যবর্ত্তিতা বা মারফতে নহে, কিন্তু গবন্মেণ্ট তাহাতে রাজী হন নাই।

সুভাষ বাবু বলেন, বঙ্গের অনেকের আন্তরিক অনুভূতি এই, যে, বুঝাপড়ার প্রধান অন্তরায় পুলিসের রাজনৈতিক শাখা; তাহারা নিজেদের প্রণালী অনুসারে কাজ চালাইতে চায়, এবং অক্লান্ত ভাবে বলিয়া চলিয়াছে, বিপ্লবীরা অপরিতোষণীয় ("irreconcilable")। উত্তরে সুভাষ বাবু বলেন, কংগ্রেসও ত পূর্ণ স্বাধীনতার কমে সন্তুষ্ট হইবে না বলিয়াছে, অতএব কংগ্রেসও অপরিতোষণীয়; অথচ গবন্মেণ্ট কংগ্রেসনেতাদের সহিত বুঝাপড়ার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই শেষোক্ত কথাগুলি সুভাষ বাবু ছয় মাস পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন। তখন এগুলি যতটা সত্য ছিল, এখন ততটা নাই। এখনও কংগ্রেস-নেতারা বলিতেছেন বটে, যে, তাহাদের লক্ষ্য সেই পূর্ণস্বরাজ বা পূর্ণস্বাধীনতাই আছে; কিন্তু, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ দ্বারা আংশিক স্বরাজের আন্দোলন চালান সম্ভবপর হইলেও, পূর্ণস্বরাজ তদ্দ্বারা সাক্ষাৎভাবে পাওয়া যাইতে পারে না। সুভাষ বাবু কথাগুলি যখন লিখিয়াছিলেন, তখনও শাব্দিক ভাবে, নামতঃ, তাহা সত্য থাকিলেও, বাস্তবিক সত্য ছিল না—কারণ মহাত্মা গান্ধী তৎপূর্ব্বেই, স্বাধীনতার সারভাগ ("substance of independence") পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন, প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছিলেন। এই সারভাগের একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত ডোমীনিয়ন ষ্টেটস্। ইহা অবশ্য সত্য, যে, স্বয়ং সুভাষ বাবু, পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু এবং অন্য কোন কোন নেতা বলেন নাই, যে, তাঁহারা সারভাগে রাজী হইবেন।

যখন দুই পক্ষে বিবাদ চলে, তখন পরস্পরের শক্তি-সামর্থ্য বুঝিয়া কোন পক্ষ বা উভয় পক্ষ আপোষে নিষ্পত্তি করিতে অগ্রসর হয়। লর্ড আরুইন তাঁহার আমলে যে গান্ধীজীর সহিত একটা চুক্তি করিয়াছিলেন (যদিও সেই চা'লে কংগ্রেসের পরাজয় হইয়াছিল), তাহার কারণ, অসহযোগ-প্রচেষ্টা প্রায় জয়যুক্ত হইতে বসিয়াছিল। ইহা আমাদের কথা নহে, বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড লয়েড এই কথা বলিয়াছেন। বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা প্রায় জয়যুক্ত হইতে বসিয়াছে, এরূপ অবস্থা কখনও ঘটে নাই। গবন্মেণ্ট যে বৈপ্লবিক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কখনও বুঝাপড়ার চেষ্টা করেন নাই, ইহা তাহার একটা কারণ, আমাদের অনুমান এইরূপ। কলিকাতা পুলিস ও বঙ্গীয় পুলিসের সর্ব্বাধুনিক রিপোর্ট যিনি পড়িবেন তিনি বুঝিতে পারিবেন, সন্ত্রাসক ও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে গবন্মেণ্টের চেষ্টা ক্রমশঃ অধিকতর সফল হইতেছে।

অসহযোগ বা অহিংস আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টার সহিত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার একটি প্রভেদ আছে। প্রথমোক্ত

প্রচেষ্টা এক প্রকার সিভিল বা প্যাসিভ রিজিষ্ট্যান্স বা 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।' দক্ষিণ-আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যখন তথাকার ভারতীয়েরা প্যাসিভ রিজিষ্ট্যান্স করিয়াছিল, তখন ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিং বলিয়াছিলেন, যে, উহা এক প্রকার কন্সটিটিউশ্যন্যাল (মূলরাষ্ট্রবিধি অনুযায়ী) প্রচেষ্টা। এরূপ প্রচেষ্টা ইংলণ্ডে অনেক বার হইয়াছে। এরূপ প্রচেষ্টার নেতাদের সহিত গবন্মেণ্টের বুঝাপড়া হইতে পারে। কিন্তু সে নজীরে সন্ত্রাসন বা অন্যবিধ বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার নেতাদের সহিত কথাবার্ত্তা চলে না। অবশ্য, অনেক দেশে স্বাধীনতা-যুদ্ধে লিপ্ত লোকদের বা বিদ্রোহীদের সঙ্গে তথাকার গবন্মেণ্টের কথাবার্ত্তা অবস্থাবিশেষে চলিয়াছিল, ইতিহাসে এরূপ দেখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের সন্ত্রাসন বা বিপ্লব চেষ্টাকে স্বাধীনতার যুদ্ধ বা বিদ্রোহ নাম সাধারণ প্রচলিত অর্থে দেওয়া যায় না।

—

বঙ্গের বাণিজ্য-শুল্ক

বঙ্গের সমুদ্রপথবাহিত বাণিজ্যের ১৯৩৩-৩৪ সালের সরকারী রিপোর্টে দেখিলাম, আমদানী ও রপ্তানী পণ্য-দ্রব্যের উপর বাণিজ্য-শুল্ক ১৯৩২-৩৩ সালে আদায় হইয়াছিল নিট ১৬,৬৬,৯৩,০০০ টাকা এবং ১৯৩৩-৩৪ সালে আদায় হইয়াছিল নিট ১৪,৭৩,২৭,০০০ টাকা। আদায় কম হউক বা বেশী হউক, বাংলা-গবন্মেণ্ট এই শুল্কের টাকার একটি পয়সাও পাইতেন না; এই বৎসর হইতে পাটের শুল্কের অংশ বাবদে মাত্র অল্প কিছু পাইবেন।

এই প্রকার, রেলওয়েগুলি যাত্রী ও মাল বহন করিয়া যত টাকা অর্জ্জন করে, বাংলা দেশের শুধু হাবড়া ষ্টেশন হইতে যাহারা ও যত মাল যায় এবং ঐ ষ্টেশনে যাহারা ও যত মাল আসে তাহা হইতে প্রাপ্ত ভাড়ার মোট পরিমাণ খুব বেশী। অথচ, তাহারও কোন অংশ বাংলা-গবন্মেণ্ট পান না।

প্রদেশগুলির গবন্মেণ্ট এবং কেন্দ্রীয় ভারত-গবন্মেণ্টের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন এমন ভাবে করা হইয়াছে, যে, তদনুসারে বঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানের ও কোন কোন ফসল উৎপাদনের প্রাকৃতিক উপযোগিতার ফল বাংলা-গবন্মেণ্ট পান না। বাংলা-গবন্মেণ্টের দেনদার গবন্মেণ্ট হইবার ইহাই প্রধান কারণ।

—

সুইডেনে ব্যায়ামদক্ষ বাঙালী

ঢাকার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ররঞ্জন বিশ্বাস, বি-এ, এখন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছেন এবং দৈহিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্কটিশ কলেজ অব্ ফিজিক্যাল এডুকেশ্যনেও শিক্ষালাভ করিতেছেন। তিনি সুইডেনের মাল্মাহেড্ নামক স্থানে গত গ্রীষ্মের সময় সুইডিশ ব্যায়াম-উৎসবে (Swedish gymnastic festivalএ) যোগদান



শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ররঞ্জন বিশ্বাস

করেন। ইউরোপের নানা স্থান হইতে সমাগত জনতা বিদেশী বলিয়া তাঁহার সমাদর করেন। তিনি সুইডেন সুইডেনের পৃ[illegible] ব্যায়ামপ্রণালী শিখিবার জন্য সারা ভ্রমণ করিয়াছেন। সিড্সভেনস্কা জিমনাষ্টীক নামক প্রতিষ্ঠান (Sydsvenska Gymnastic Instituet) তাঁহাকে প্রশংসাপত্র (diploma) দিয়াছে। তিনি সুইডিশ জিম্নাষ্টীক সভা হইতে "শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামদক্ষের নিদর্শন" "(Elite gymnastic mark") লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেবল এক জন বিদেশী এই নিদর্শন পাইয়াছিলেন। তিনি বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সুইডেনের উৎকৃষ্ট ব্যায়ামপদ্ধতির অভিজ্ঞতা দেশের কাজে লাগিবে।

—

সাংবাদিকের কার্য্য শিক্ষা

কলিকাতায় যে ভারতীয় সাংবাদিক সভা (Indian Journalists' Association) আছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহা সাংবাদিকের কার্য্য শিখাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিবেন স্থির করেন। কি কি বিষয় শিখাইতে হইবে, ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। তাহার সভ্যদের মধ্যে ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যাল খুব উদ্যোগী ছিলেন। শিক্ষণীয় বিষয় প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়, এবং তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রেরিতও হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কিছু করেন নাই।

সম্প্রতি পূর্ব্বরূপ প্রস্তাব আবার হইয়াছে, এবং মন্ত্রিসাহেবদের কাছে যেমন প্রার্থীর দল যায় সেইরূপ কয়েক জন সাংবাদিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারের নিকট গিয়াছিলেন। তিনি বিবেচনা করিবেন বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু তাঁহার একটি বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক এরূপ শিক্ষাদানের নজীর এবং যৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন। আমরা এরূপ শিক্ষাদানের প্রয়োজন আছে মনে করি। অনেক স্বাধীন দেশে যেরূপ যোগ্য সাংবাদিক আছেন, এদেশে তেমন না-থাকিতে পারেন, এবং শিক্ষা দিবার লোক বিদেশের মত তত ভাল না-জুটিতে পারে। কিন্তু অন্য সব বিষয়ের শিক্ষাদান যেমন ভারতীয় অধ্যাপকদের দ্বারা চলিতেছে, সাংবাদিকের কাজ শিখানও সেইরূপ চলিতে পারিবে। যত ছাত্রছাত্রী ইহা শিখিবে, সকলেরই যে কাজ জুটিবে, এমন নয়—হয়ত অধিকাংশেরই জুটিবে না। কিন্তু তথাপি ইহা শিখিলে জ্ঞান বাড়িবে, মানসিক উন্নতি হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত আরও অনেক বিদ্যা চাকরিপ্রাপ্তি হিসাবে কাজে লাগে না। স্বাধীন রোজগারের উপায় হিসাবে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া শত শত যুবকের কোনই কাজে লাগে না, এমন কি ডাক্তারী পাস করিয়াও অনেকের অন্ন হয় না বলিলেও চলে। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয় নানা বিদ্যা ও কতকগুলি বৃত্তি শিখাইতেছেন। সাংবাদিকের কাজ বহি পড়িয়া ও ব্যাখ্যান শুনিয়া সবটা শিখা যায় না বটে, খবরের কাগজের সংস্রবে কাজ করিয়া অনেকটা শিখিতে হয়। কিন্তু উকীলের কাজ, ডাক্তারের কাজ প্রভৃতিও অনেকটা ঐ প্রকারে শিখিয়া পরে এপ্রেণ্টিসী করিয়া শিখিতে হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক-বিদ্যা শিখাইবার বন্দোবস্ত করিলে এবং কোন কোন সংবাদপত্রের সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তিদিগকে শিক্ষক নিযুক্ত করিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে মনে রাখিতে হইবে, যে, বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ঐসব সংবাদপত্রের সমুদয় মন্তব্য বা অবস্থাবিশেষে তূষ্ণীম্ভাব সাবধানতার সহিত বিবেচ্য।

অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি

বাংলা দেশ ও আসামের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতি-বিধায়িনী সমিতির ১৯৩৩-৩৪ সালের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, এই বৎসর সমিতির তত্ত্বাবধানে ৪৪৪টি বিদ্যালয় ছিল এবং তাহাতে মোট ১৮২৬৯টি ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা পাইতেছিল। সমিতির মোট ব্যয় হইয়াছিল ৬১০৪১৮/৮।। ইহার স্থায়ী ফণ্ডে ৩৬২১২।।০ টাকা জমা হইয়াছে। স্থায়ী ফণ্ডটিকে এক লক্ষ টাকা পরিমিত করিবার সঙ্কল্প আছে। তাহার সুদ হইতে সমিতির চলতি ব্যয়নির্ব্বাহের সুবিধা হইবে। নানা কারণে কয়েক বৎসর হইতে সমিতির আয় যথেষ্ট হইতেছে না। ইহা সাতিশয় দুঃখের বিষয়। নিরক্ষর লোকের সংখ্যা এদেশে অত্যন্ত অধিক। সমিতি বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা গত ২৫ বৎসর নিরক্ষরতা কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আয় যত বাড়িবে, ইহার বিদ্যালয়ের ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তত বাড়িবে, এবং [illegible] প্রদত্ত শিক্ষার উৎকর্ষসাধনও সেই পরিমাণে করা চলিবে।

ইহার ৪৪৪টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১১৮টি বালিকা-বিদ্যালয়। ছাত্রের সংখ্যা ১২৯৭৮, ছাত্রীর সংখ্যা ৫২৯১। জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকলে এই সব বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে ও পড়ে।

বিদ্যালয় ছাড়া সমিতির পাঁচটি সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য লাইব্রেরী ৫টি গ্রামে আছে, দুটি ব্রতী বালক দল দুটি গ্রামে আছে, বিপদ আপদের সময় সাহায্য করিবার জন্য ৪টি গ্রামে চারিটি সেবাসমিতি আছে, এবং স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা করিবার বন্দোবস্ত আছে।

বাংলা দেশ ও আসামে কোন বেসরকারী সমিতি ইহার মত মিতব্যয়িতার সহিত এত অধিক বিদ্যালয় এ-পর্য্যন্ত চালান নাই। সকলেরই ইহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। সাহায্য ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, এম্-এ, এম-বি, মহাশয়কে ৪০ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইলে তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করিবেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রভৃতি ইহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

—

বঙ্গে জলপ্লাবন

এ-বৎসর বঙ্গের বাহিরে জলপ্লাবন হইয়াছে, বঙ্গের অনেক জেলাতেও হইয়াছে। শ্রীহট্ট, মালদহ, রাজশাহী, পাবনা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় জলপ্লাবনে লক্ষ লক্ষ লোক বিপন্ন হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে।

তাহাদের যথেষ্ট সাহায্য হইতেছে না। অর্থের এবং কর্ম্মীরও অপ্রাচুর্য্য অনুভূত হইতেছে। এই বৎসর নানা নৈসর্গিক বিপৎপাতে বদান্য লোকেরাও আর সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। অন্যদের ত কথাই নাই। যথেষ্ট কর্ম্মী এই কার্য্যে অগ্রসর না হইবার অনেক কারণ থাকিতে পারে। বিস্তর উৎসাহী যুবক বিনা বিচারে বন্দী হইয়া আছে। মর্লী যে বলিয়াছিলেন, "It is silly to be in such hurry to root out the tares as to pluck up half your wheat at the same time," "তোমার গমের ক্ষেত্রের আগাছা উপড়াইয়া ফেলিবার অতিব্যস্ততায় অর্দ্ধেক গমও যুগপৎ উপড়াইয়া ফেলা মূঢ়তা," একথা মিথ্যা নয়। অনেক যুবক অসহযোগ আন্দোলনের বিফলতায় সকল কাজে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়া থাকিবে। দানের ও সৎকর্ম্মশীলতার প্রেরণা নূতন করিয়া আমাদের মধ্যে আসা আবশ্যক হইয়াছে।

—

পূজার বাজারে বাঙালীর তৈরি কাপড়

পূজার সময় হিন্দু বাঙালীরা ত নূতন কাপড় কিনিবেনই, যাহারা হিন্দু নহেন তাঁহারাও অনেকেই ছেলেমেয়েদিগকে নূতন কাপড় দিয়া থাকেন। সকল বাঙালীর বঙ্গে উৎপন্ন চরকার ও হাতের তাঁতের অন্য কাপড় এবং বঙ্গে স্থিত বাঙালীর কলে প্রস্তুত কাপড়ই ক্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বাংলা দেশে যে কয়টি কাপড়ের কল আছে, তাহার অনেক গুণ বেশী কল লাভের সহিত চলিতে পারে। সব বাঙালী কেবল বঙ্গে স্থিত বাঙালীর কলে তৈরি কাপড় কিনিলে ইহা সহজেই সম্ভব হয়।

—

জেলায় জেলায় আলাদা পাঠ্যপুস্তক

বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্য পুস্তক চালাইবার একটা প্রস্তাব হইয়াছে। এই সাতিশয় অনিষ্টকর প্রস্তাব অনুসারে কখনও কাজ হওয়া উচিত নয়।

—

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গে ব্যায়ামাদির দ্বারা দৈহিক উন্নতি সাধনার্থ নিজের লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন। তিনি নিজে খুব বলিষ্ঠ পুরুষ। এই সৎকার্য্য দ্বারা সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।

—

বিলাতে অবাঙালী আসামবাসীদের প্রতিনিধি প্রেরণ

আসামের অবাঙালী অধিবাসীদের কয়েক জন প্রতিনিধি বিলাত যাইতেছেন। তাঁহারা ইংরেজদিগকে ও ব্রিটিশ সরকারকে দুটি প্রার্থনা জানাইবেন: (১) আসামে উৎপন্ন পেট্রলের শুল্কের ও পাটের শুল্কের সব টাকা আসাম-গবন্মেণ্টকে দেওয়া হউক। ইহা আমরা ন্যায়সঙ্গত মনে করি। (২) শ্রীহট্টকে বঙ্গের সামিল করা হউক। যদি আসামের অন্য বাঙালীপ্রধান জেলা ও মহকুমাগুলিকেও বঙ্গের অন্তর্গত করা হয়, তাহা হইলে আমরা ইহার বিরোধিতা করিব না; নতুবা আমরা ইহার বিরোধী।

—

বিহারে বাঙালীবিদ্বেষ

বিহারে ভূমিকম্পে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ দান সব প্রদেশের লোকেই করিয়াছে, বাঙালীরাও করিয়াছে; বিপন্নের সাহায্যার্থ অবৈতনিক বাঙালী কর্ম্মীরাও খাটিয়াছে। কিন্তু বিহারের ব্যবস্থাপক সভায় মৌলবী গনি বলেন, ভূমিকম্পে বিপন্নদের সাহায্যার্থ গবন্মেণ্ট যে-সব লোক নিযুক্ত করিবেন তাহারা যেন বিহারীই হয়। বাবু নন্দকুমার ঘোষ বলেন, অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও টাকা দিয়াছে, অতএব বিহারী না হইলেও যোগ্য অন্য লোকদিগকে নিযুক্ত করা উচিত। বলা বাহুল্য, বিহার এই অন্য লোকদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাই বেশী। বিহারের অন্যতম বিহারী নেতা, অমৃত বাজার পত্রিকার পরম বন্ধু, মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ চাতুরী সহকারে বলেন, অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা দানের পরিবর্ত্তে প্রত্যুপকারের আশায় দান করে নাই, সুতরাং বিহারী ছাড়া আর কাহাকেও চাকরি দেওয়া উচিত নয়। দাতারা প্রতিদানের আশায় দান করেন নাই, ইহা সত্য; কিন্তু ইহাও সত্য, যে, যাঁহারা দান করিয়াছেন, কাজ দিবার বেলায় তাঁহাদের প্রদেশের লোকদিগকে বাদ দেওয়া হইবে, এ সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনে আসে নাই। ভূমিকম্পসম্পর্কীয় কাজে যাহাতে কেবল বিহারী যুবকেরা কাজ পায় এবং কেবল বিহারী ঠিকাদররা কণ্ট্র্যাক্ট পায়, তাহার জন্য মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ও মিঃ হাফেজ খুবই আগ্রহান্বিত। বিহারীরা বিহারে কাজ পাইবেন, ইহা খুব স্বাভাবিক; কিন্তু বিহারবাসী অবিহারীদিগকে বাদ দিলে অন্য সব প্রদেশের সাহায্য বিহারীদের আশা করা উচিত নয়, এবং অন্য সব প্রদেশে বিহারীরাও বাদ পড়িতে পারেন।

ইংরেজ জাতি নিশ্চিন্ত থাকুন—ভারতবর্ষের লোকেরা এরূপ সংকীর্ণমনা, যে, এখানে জাতিধর্ম্মভাষাপ্রদেশ-নির্ব্বিশেষে একতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সুদূরপরাহত।

ভারতরক্ষা সম্বন্ধে ডাঃ মুঞ্জের বক্তৃতা

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের য়ুনিয়ন সোসাইটি দ্বারা আহূত এক সভায় হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাঃ মুঞ্জে বলেন—

ভারতবর্ষ স্বরাজলাভের জন্য আন্দোলন করিতেছে। কিন্তু স্বরাজ পাওয়া গেলে তাহা রক্ষা করা এবং বহিঃশত্রু হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করা কি প্রকারে হইতে পারে, সে-দিকে ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞদের দৃষ্টি পড়ে নাই। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারত প্রাচীন কাল হইতে আক্রান্ত হইয়া আসিয়াছে। সীমান্ত রক্ষা সোজা কাজ নয়; স্থলে সীমান্ত ৭০০০ মাইল লম্বা; তা ছাড়া সমুদ্রোপকূল আছে। পূর্ব্ব ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের কথাও ভাবা উচিত। তাহা এখন নিরাপদ হইলেও বরাবর নিরাপদ না-থাকিতে পারে।

ভারতবর্ষের কারখানাসমূহ অল্পাধিক জার্মেনীর কারখানাসমূহের মত করিয়া গড়া উচিত। সে দেশের কারখানাগুলি শান্তির সময় নানা পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে, যুদ্ধের সময় যে-কোন কারখানা দেশরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে (অর্থাৎ তাহাতে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতে পারে)। মোটর গাড়ী ও এরোপ্লেন নির্ম্মাণের কারখানা ভারতবর্ষের নানা স্থানে স্থাপন করা উচিত। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসকলে ব্যায়ামশিক্ষা ও বন্দুক-ছোঁড়া আবশ্যিক হওয়া উচিত। প্রাথমিক যুদ্ধশিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। অনেক রাইফল-সমিতি গঠন করা আবশ্যক। যুবকদিগকে সাঁতার শিখান উচিত। স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, লাঠিহস্তে ড্রিল শিক্ষার ক্লাস স্থাপন প্রভৃতি দ্বারা যুবকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা আবশ্যক। তাহা করিতে পারিলে দশ বৎসরের মধ্যে দেশের চেহারা বদলাইয়া যাইবে, এবং তখন গবন্মেণ্ট বলিতে পারিবেন না, যে, আমরা স্বরাজের উপযুক্ত নহি। (এ-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে—প্রবাসীর সম্পাদক)

ডাক্তার মুঞ্জে যাহা বলিয়াছেন, আমরা দেখিয়াছি নাগপুরে কোন কোন দিকে সেইরূপ কাজ হইতেছে। সেখানকার যুবকদিগের লাঠি-ড্রিল দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলাম। ডাঃ মুঞ্জে নাগপুরে যে রাইফল্ সমিতি স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে অনেক যুবক বন্দুক চালাইতে শিখিয়াছে ও শিখিতেছে।

—

বঙ্গে ডাকাতী ও নারীহরণ

বাংলা-গবন্মেণ্ট সন্ত্রাসকদের হাত হইতে রক্ষার জন্য সব ইংরেজ কর্ম্মচারীর—বিশেষতঃ শাসন ও পুলিস বিভাগের কর্ম্মচারীদের—জন্য সশস্ত্র রক্ষীর বন্দোবস্ত করিয়া নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন, ঐ সকল কর্ম্মচারীর নিজেদেরও অস্ত্র আছে। কিন্তু ডাকাতদের হাত হইতে লোকদের—বিশেষতঃ গ্রামের লোকদের—রক্ষার জন্য যথেষ্ট সরকারী ব্যবস্থা নাই, এবং পশুপ্রকৃতি লোকদের হাত হইতে নারীদের রক্ষার জন্যও যথেষ্ট বন্দোবস্ত নাই।

—

অর্দ্ধচন্দ্র-মার্কা ইম্পীরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ লিমিটেড

খবরের কাগজের পাঠকেরা জানেন, "ইম্পীরিয়াল কেমিকাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড" নামক একটি কোম্পানীকে ভারত-গবন্মেণ্ট ৫০ বৎসরের জন্য পঞ্জাবের কোন কোন স্থানের খনিজ কোন কোন জিনিষ উত্তোলন ও ব্যবহারের একচেটিয়া অধিকার দিয়াছেন বলিয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। ভারতে রেজিষ্ট্রী হইয়া থাকিলেও ইহা ইংরেজদের কোম্পানী। ভারতের এক ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড রেডিং ইহার চেয়ারম্যান। ভারতীয়দের অজ্ঞাতসারে ইহা গঠিত এবং ইহাকে একচেটিয়া অধিকার প্রদত্ত হয়। ভবিষ্যতে হয়ত আরও অনেক একচেটিয়া অধিকার ইহাকে দেওয়া হইবে। সকল দেশের জাতীয় (National) গবন্মেণ্ট নিজ নিজ জাতির লোকদের (Nationalsদের) দ্বারা নিজ নিজ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। ভারতবর্ষের ন্যাশন্যাল গবন্মেণ্ট না থাকায় সেইরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। লর্ড রেডিং বড়লাট থাকা কালে দেশশাসন করিতেন, এবং অবসর সময়ে হয়ত পেন্সান লইবার পর ভারতবর্ষ হইতে আরও অর্থ সংগ্রহের জন্য কোথায় কি খনিজ সম্পত্তি আছে, তাহার খবর রাখিতেন। এখন তাহা কাজে লাগিল।

এই কোম্পানীর আয়োজন যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা জানিতাম না। ৩০শে সেপ্টেম্বরের অমৃত বাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় সমগ্রপৃষ্ঠাব্যাপী ইহার বিজ্ঞাপনে বুঝিলাম, কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লাহোর, রেঙ্গুন, কোলোম্বো, কানপুর, পাটনা, আহমদাবাদ, কোচিন, কালিকট, বিজাগাপাটাম, করাচী ও অমৃতসরে ইহার গদী স্থাপিত হইয়াছে।

ইহার ট্রেড্‌মার্ক অর্থাৎ ব্যবসার মার্কা ক্রেসেণ্ট অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্র। যথাযোগ্য বটে! ইহার প্রসাদে কত দেশী রাসায়নিক ব্যবসার অদৃষ্টে মর্ত্ত্যলোক হইতে অর্দ্ধচন্দ্র লাভ ঘটিবে, তাহা অদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

—

পূজায় পশুবলি

দুর্গাপূজা ও কালীপূজা উপলক্ষ্যে অনেক পশুবলি হইবে। আমরা বলির বিরোধী। স্বর্গীয় পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী নিষ্ঠাবান শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুর দিক হইতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে পশুবলি যে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারেও অত্যাবশ্যক নহে, তাহা দেখাইয়াছিলেন।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচন

বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন হইবে। বিহারের কংগ্রেসনেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্ব্বাচন ঠিক হইয়াছে। ইহার আগেই কোন অধিবেশনের সভাপতি তাঁহাকে করা উচিত ছিল। তিনি বিদ্বান্ ও কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি যখন ওকালতী ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন, তখন ওকালতীতে তাঁহার বেশ পসার ছিল এবং পসার ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। কালক্রমে তাঁহার হাইকোর্টের জজ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাঁহার সাংসারিক অসুবিধা খুবই হইয়াছে। তাঁহাকে কারারুদ্ধও হইতে হইয়াছিল। বিহারে ভূমিকম্পের পূর্ব্বেও তিনি জনহিতকর কাজে ব্যাপৃত থাকিতেন। ভূমিকম্পের পরে যে তিনি বিপন্নদের সহায়ক প্রধান কর্ম্মী হইয়া আছেন, ইহা সংবাদ-পত্রের পাঠকমাত্রেই জানেন। তিনি চরিত্রবান্ নম্র প্রকৃতির মানুষ।

কলিকাতায় খান আবদুল গফ্‌ফার খানের সম্বর্দ্ধনা

কলিকাতার নাগরিকগণ টাউন হলে সমবেত হইয়া খান আবদুল গফ্‌ফার খানের সম্বর্দ্ধনা দ্বারা গুণীর আদর করিয়াছেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রণদক্ষ পাঠানদের মধ্যে অহিংসাবাদ প্রচার করিয়া "সীমান্ত গান্ধী" আখ্যা পাইয়াছেন।

টাউন হলে সম্বর্দ্ধনার উত্তরে তিনি বলেন, ভারতবর্ষ হিন্দু মুসলমান সকলেরই দেশ। ভারতবর্ষে যে-কেহ স্থায়ী ভাবে বাস করে, ইহা তাহারই দেশ, ইহা সত্য কথা। কিন্তু "আমার দেশ" বলিলে কে কি বুঝে, তাহার আলোচনাও, অন্ততঃ মনে মনে, সকলের করা উচিত, এবং আত্মপরীক্ষা করা উচিত। লোহার সিন্দুক ও তাহার মধ্যস্থিত টাকাগুলি আমার, রসগোল্লার হাঁড়িটি আমার, অর্থগৃধ্নু ও পেটুক লোক এরূপ বলিলে তাহার উক্তিতে "আমার" শব্দের মানে যাহা হয়, "আমার দেশের" "আমার" শব্দের অর্থ কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ তাহা হওয়া উচিত নয়। "আমার দেশ" বলিতে প্রকৃত দেশভক্ত লোক ইহা বুঝেন না, যে, ইহার ধন রত্ন দেশের বিত্তগুলি আমার, কিন্তু ইহার জন্য দুঃখভোগ ও আত্মোৎসর্গ করিবার অধিকার বা দায় অন্যের, ইহার সেবা করিবার ভার অন্যের। বস্তুতঃ দেশের লোকদের সেবা যে করিবে, দেশের নৈসর্গিক সম্পদ দেশের লোকদের কাজে যে লাগাইবে, দেশকে সুন্দর, স্বাস্থ্যকর, কার্য্যসৌকর্য্যময় যে করিবে ও রাখিবে, দেশ তাহার। খান আবদুল গফ্‌ফার খানের এবং তাঁহার মত অন্য লোকদের ভারতবর্ষকে "আমার দেশ" বলিবার অধিকার আছে।

অল্পদিন পূর্ব্বে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সভায় একটি বিতর্ক হয়। ছাত্রেরা মুসলমান। এক জন ছাত্র এই প্রস্তাব পেশ করেন, যে, "মুসলমানদের ভারতবর্ষে থাকিবার অধিকার নাই"। ইহার সপক্ষে বক্তৃতা ছাত্রেরা করেন, বিপক্ষে বক্তৃতা বয়োবৃদ্ধ খেতাবধারী মুসলমানেরা করেন। শেষে ভোট লওয়ায় খুব বেশী ভোটের জোরে প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়। ইহার সপক্ষে যাঁহারা বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই ছিল, যে, মুসলমান নেতারা স্বার্থপর এবং নিজেদের সাংসারিক সুবিধা দেখেন; দেশকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা না-করিলে, তাহার কল্যাণ-চেষ্টা না-করিলে সে-দেশের অধিবাসী হইবার অধিকার কাহারও নাই। এই শেষোক্ত কথাটি সত্য। কিন্তু আলীগড়ের ছাত্রদের বিতর্ক-সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে ন্যায্য বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ, ভারতের সব মুসলমান-নেতা বা সব সাধারণ মুসলমান স্বার্থপর ও কেবল নিজ নিজ সাংসারিক সুবিধা দেখেন, ইহা সত্য নহে। তাঁহাদের মধ্যেও পরার্থপর ও দেশসেবক লোক আছেন। অন্য দিকে হিন্দুদের মধ্যে স্বার্থপর ও স্বসুবিধা-লোলুপ নেতা ও সাধারণ লোকের অভাব নাই। সুতরাং মুসলমানদের অনেকের স্বার্থপরতার দোষে যদি ভারতবর্ষের সাত কোটি মুসলমানের কাহারও ভারতবর্ষে থাকিবার অধিকার নাই বলা হয়, তাহা হইলে এমন অন্ততঃ সাত কোটি হিন্দু খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না যাহাদেরও ভারতবর্ষে থাকিবার অধিকার নাই।

ভারতবর্ষের হিন্দু ও অহিন্দুদের মধ্যে একটি প্রভেদ উল্লেখযোগ্য। ভারতপ্রেমিক কোন হিন্দু তাঁহার হৃদয়ে কোন দেশকে ভারতবর্ষের চেয়ে উচ্চ স্থান দেন না, কিন্তু ভারতপ্রেমিক অহিন্দু তাহা দিতে পারেন। অবশ্য হিন্দু হইয়া জন্মিয়াও যে কেহই সুবিধালাভ বা অন্য কারণে

ভারতবর্ষের চেয়ে অন্য দেশকে পছন্দ করে নাই, তাহা নহে।

খান আবদুল গফ্ফার খান হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উপর খুব জোর দিয়াছেন। তিনি মনে করেন, আমাদের পরস্পরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হওয়া উচিত। হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই তাহা হওয়া অবশ্যই উচিত। তাহাতে সদ্ভাব বাড়িতে পারে। উভয়ের শাস্ত্র ও সভ্যতার উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে হইলে, নিকৃষ্ট অংশ কিছু থাকিলে তাহা বর্জ্জন করাও আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজবিধি সম্বন্ধে ইহা করিবার বা করাইবার জন্য সমালোচনা নিরাপদ। কিন্তু মুসলমান শাস্ত্র ও সমাজবিধি সম্বন্ধে ইহা করা অনেক মুসলমান বিপৎসঙ্কুল করিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি সকলেরই নিজ নিজ শাস্ত্র, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও উপদেষ্টাদিগকে অভ্রান্ত ও নিখুঁত মনে করিবার অধিকার আছে; কিন্তু অন্য কেহ তাহার বিপরীত কথা বলিলে তাহাকে হত্যা করিবার অধিকার কাহারও নাই।

পরস্পরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হইলে পরস্পরের সদ্ভাব ও মিলন গভীর হয়। রাষ্ট্রনৈতিক মিলনও হইতে পারে। কিন্তু যত দিন কোন সম্প্রদায় নিজের জন্য, যে-কোন ওজুহাতেই হউক, বিশেষ সুবিধা ও বেশী সুবিধা চাহিবে, তত দিন এই মিলন হইবে না।

—

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

যে-ভাবে ও যেরূপ ব্যয়ে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা উহা কমাইয়া গবর্ন্মেণ্ট পাটের মূল্য বাড়াইতে চাহিতেছেন, তাহাতে সুফললাভ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। পাটচাষ এখন যে-যে জমিতে হয়, তাহার যে-অংশে পাটের চাষ করা হইবে না, লাভজনক অন্য কি ফসলের চাষ তাহাতে করা যাইতে পারে, তাহা চাষীদিগকে বুঝাইয়া তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করা আবশ্যক। শুধু সরকারী লোকদের চেষ্টায় সাফল্য লাভ করা কঠিন। সরকারী লোকদের উপর চাষীদের বিশ্বাস কতটা আছে, তাহা বিবেচনা করা দরকার। চাষীদের অসুবিধা এবং ক্ষতি করিয়াও যে-সব শ্রেণীর লোক লাভবান্ হইয়াছে ও হইতে চায়, তাহাদের ও তাহাদের প্রভাবের অধীন লোকদের পরামর্শ গ্রহণ ও সহযোগিতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয় নহে।

—

বরিশালের ব্রজমোহন ইন্সটিটিউশ্যনের জুবিলী উৎসব

স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন ইন্সটিটিউশ্যন বাংলা দেশে কেবল ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার-কল্পে সাহায্য করিয়াছে, এমন নহে, বিস্তর ছাত্রের প্রাণে ধর্ম্মভাব ও স্বদেশপ্রেম উদ্দীপিত করিয়াছে। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ইহার পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করা উপলক্ষ্যে উৎসব হইয়া গিয়াছে। তাহাতে সভাপতিরূপে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন :—

> আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার অধিক; মানুষের মধ্যে বটে, এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও বটে। পঞ্চাশবৎসরব্যাপী অস্তিত্বের গৌরব করিতে পারে, এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অঙ্গুলীতে গণনা করা যায়। ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশ্যন এই পঞ্চাশ বৎসর কাল কেবল অস্তিত্ব বজায় রাখে নাই,—ইহা মানবপ্রাণে প্রেরণা জাগাইয়াছে, বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতি ও আদর্শ প্রচার করিয়াছে। ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশ্যন কেবল ম্যাট্রিকুলেট প্রস্তুত করিবার কারখানা নহে; ইহা অশ্বিনীকুমারের আদর্শবাদের মূর্ত্ত প্রতীক। যাহাতে কিশোর ও তরুণদল উত্তরকালে জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে পারে, মনুষ্যত্বের গৌরবে সমুন্নত শিরে দাঁড়াইতে পারে, তাহাদিগকে তদ্রূপ শিক্ষাদানই ছিল অশ্বিনী-কুমারের লক্ষ্য। তিনি ছাত্রদিগকে কেবল পুঁথিগত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশ্যন স্থাপন করেন নাই। তিনি তাহাদিগকে নৈতিক শিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া আদর্শ মানুষ করিয়া তুলিতেন।

—

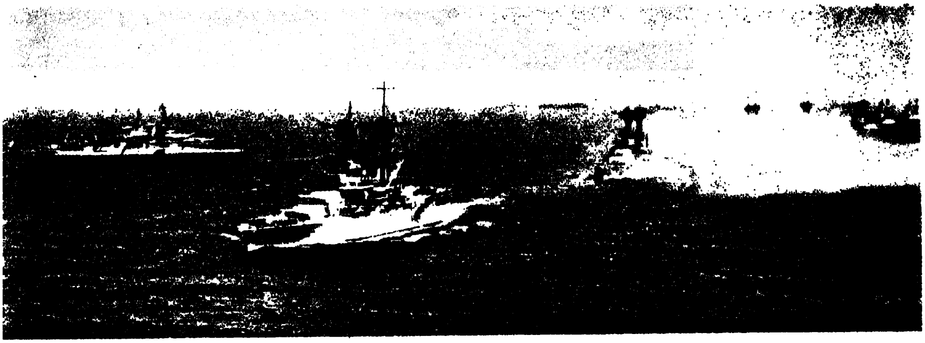
বিজ্ঞাপন

প্রবাসী-কার্য্যালয় আগামী ২৭শে আশ্বিন ১৪ই অক্টোবর হইতে ১১ই কার্ত্তিক ২৮শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে যে-সব চিঠিপত্র আসিবে, ১২ই কার্ত্তিক ২৯শে অক্টোবর হইতে সেই সকলের জবাব দেওয়া বা তদনুযায়ী অন্য কাজ করা হইবে।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,
স্বত্বাধিকারী

বহির্জগৎ

বিশ্বের রণসজ্জা



আধুনিক যুদ্ধ—জল স্থল ও আকাশ ব্যাপী

সমুদ্র-শক্তির অভাব থাকিলে কোনও সামরিক জাতির পক্ষে বিজয় লাভ সম্ভব নহে। এইজন্য জলযুদ্ধে বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধপোতের না অর্থাৎ কার্যাকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। চিত্রে যুক্তরাজ্যের একটি নৌবহরের কুচ-কাওয়াজ দেখান হইয়াছে। সম্মুখের যুদ্ধপোতগুলিই (বাট্‌লশিপ) নৌযুদ্ধে সর্বপ্রধান আক্রমণের অস্ত্র। অন্য সকল প্রকার পোতই—কি জলের উপরে, নীচে বা আকাশে—গুলির কার্য্যকারিতা রক্ষা বা নষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে এরোপ্লেন এবং সাবমেরীন প্রধান।

গত মহাযুদ্ধের সময় অনেকেই বলেছিলেন যে, এই যুদ্ধ 'যুদ্ধের নাবৃত্তিনাশের জন্য,' অর্থাৎ এই যুদ্ধই শেষ মহাযুদ্ধ! ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রম্ভের সময় রেনে ব্যাজাঁ নামে প্রসিদ্ধ ফরাসী মনীষা বলেছিলেন, এই যুদ্ধে মানবজাতির শুদ্ধি হইবে। মানুষের জীবন এখন অত্যন্ত, অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিপ্রমুখ। ঐশ্বর্য্যের পূজা, সাত্ত্বিক াবলীর প্রতি অবহেলা, ধর্ম্মকে হেয়জ্ঞান করা, এই সকল এখন মাদের জীবনের প্রধান অংশ। ইহার জন্য আমাদের অনেক দুঃখ ইতে হইবে এবং বহু অর্থনাশ ও জীবন নষ্ট হইবে, কিন্তু যখন মাদের শিরে বিজয়মুকুট আসিবে, তখন ঐ সকল মানবজীবনের পাপ বা পাপা) চিরকালের জন্য লুপ্ত হইবে।"

ঐ যুদ্ধ আজ ষোল বৎসর পূর্ব্বে শেষ হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে লাগ অব নেশন্স" ইত্যাদি শক্তি ও জাতিসংঘে অনেক চেষ্টা হয়েছে অস্ত্র সংক্ষেপ করার জন্যে, যুদ্ধ নিরোধ করার জন্যে। কিন্তু বারই কোনরকম চুক্তি বা আন্তর্জাতিক সংকল্পের ব্যবস্থা হয়েছে, ান-না-কোন জাতি স্বার্থের আঘাতের ভয়ে তাতে বাধা দিয়েছেন। মধ্যে যুদ্ধও অনেকগুলি হয়ে গিয়েছে এবং প্রত্যেকবারই যুদ্ধবহ্নির থায় সমস্ত পৃথিবী শঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

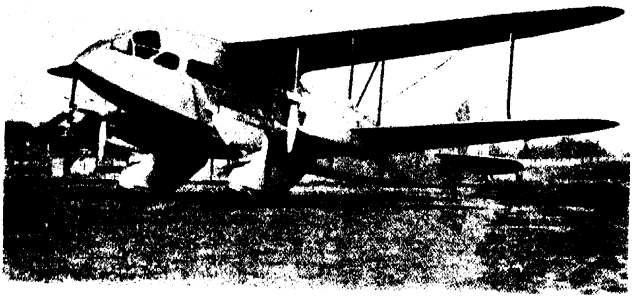
বর্ত্তমান অবস্থা কি? জার্ম্মানীতে হিটলার সামরিক ব্যয় শতকরা শ ভাগ বাড়িয়েছেন এবং সামরিক এরোপ্লেনের জন্য খরচ ন গুণ বাড়াইবেন বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতিসংঘকে নিয়েছেন যে, হয় পৃথিবীর অন্য শক্তিবর্গকে অস্ত্রত্যাগ করতে হবে, ত জার্ম্মানীকে অস্ত্রধারণের অনুমতি দিতে হবে।

বেলজিয়াম আবার তাহার "ম্যাজিনো" দেওয়াল—অর্থাৎ দুর্গমালা গঠন করতে উঠে পড়ে লেগেছে। এবার এটা হচ্ছে ফ্রান্সের সীমান্তের দিকে। স্পেনের ক্ষুদ্র যুদ্ধ-নৌবহর বাড়ান হবে, তার জন্যে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সুইস্‌জাতি সেনাবিভাগ পুনর্গঠনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আমেরিকায় পকেট যুদ্ধজাহাজ ষোলখানি ভাসান হয়ে গেছে এবং আরও তৈরি হচ্ছে। ফ্রান্স, পোলাণ্ড, জাপান, রুশ, এঁরা ত আপাদমস্তক অস্ত্রে সজ্জিত হয়েই আছেন।

অবশেষে ইংরেজও বহু বৎসর ধরে যুদ্ধ নিরোধের চেষ্টা ক'রে, হিট্‌লারাইট জার্ম্মানী জাতিসংঙ্ঘ থেকে বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে একটি "হোয়াইট পেপার" বিলি ক'রে আবার অস্ত্রসজ্জায় মন দিতে বাধা হয়েছেন। এখন ইংরেজের উদ্দেশ্য ফ্রান্সের সমান যুদ্ধশক্তি সঞ্চয় করা অর্থাৎ প্রায় ৩০০০ যুদ্ধপ্লেন এবং অন্যান্য সমরসজ্জার ব্যবস্থা করা। শিকাগোর দৈনিক পত্র 'টাইম" বলেন, ইংরেজের এই হতাশ হওয়ার অর্থ "যুদ্ধনিরোধ" চেষ্টার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া!

ওদিকে চীন-জাপান-রুশ ঝঞ্ঝাট দিনের দিন বেড়েই চলেছে। এখন ইউরোপের চেয়ে প্রশান্ত মহাসাগরকূলেই জগতের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। কয়েক মাস আগে জাপান সমস্ত পৃথিবীকে জানিয়েছিল যে, "চীনের সঙ্গে কারচুপি অন্য কাহাকেও জাপান করতে দেবে না, অর্থাৎ চীনকে যুদ্ধপ্লেন, যুদ্ধশিক্ষক বা যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহ করা, বা রাজনৈতিক ব্যাপারের জন্য টাকা ধার দেওয়া এ সকলে জাপান বাধা দিবেন।"

সমস্ত পৃথিবীকে এরকম সরাসরি হুকুম দেওয়া কোনো জাতির



শান্তিকালের বিমানপোত

ডি-হাভিল্যাণ্ড এরোপ্লেন। ইহা এখন ইংলণ্ড-ভারত-অষ্ট্রেলিয়া বিমান-পথে ব্যবহৃত হইতেছে। যুদ্ধের সময় সামরিক শক্তির দ্রুত চলাচলের জন্য এই প্রকার পোতের বিশেষ প্রয়োজন

পাক্ষেই সহজ বা নিরাপদ নয়। তবে জাপান এ রকম করল কেন? কারণ খুঁজতে হ'লে কয়েকটি বিষয় জানা দরকার।

শিকাগোর "টাইম" পত্র থেকে "ওরিয়েণ্টাল ওয়াচম্যান" কয়েকটি বিষয়ের বৃত্তান্ত দিয়েছেন:

"প্রথমতঃ জেনারেল হান্স ফন্ সিয়েক্ট, পৃথিবীর এক জন অন্যতম সেনাশক্তি গঠনকারী যোদ্ধা, চীনের সমরশক্তি অসাধারণ ভাবে আধুনিক ও দৃঢ়শক্তি করে তুলেছেন। এই সমরকৌশলী প্রৌঢ় ভদ্রলোক গত মহাযুদ্ধের পরে জার্ম্মানীর অল্পসংখ্যক রাষ্ট্র সৈন্যদলকে জগতের শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র সৈন্যদলে পরিণত করেন। ইনি হিট্‌লারের পক্ষপাতী নহেন, বরঞ্চ ১৯২৩ সালে হিট্‌লারের দেশ দখলের চেষ্টা ব্যর্থ এবং হিট্‌লারের প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন—হয়েছিল ইঁহারই হাতে। সুতরাং জার্ম্মানী হিট্‌লারের হাতে যাওয়ায় ইনি স্বদেশ ছেড়ে এখন চীনদেশে গিয়ে বসেছেন।

"দ্বিতীয়তঃ আমেরিকা যুক্তরাজ্যের দুই প্রসিদ্ধ বিমানবীর, ফ্র্যাঙ্ক হকস্ এবং জেমস্ ডুলিট্‌ল, চীনে বহু শ্রেষ্ঠ এবং আধুনিক যুদ্ধপ্লেন বিক্রয় করছেন। ইহারা গত বৎসর প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার যুদ্ধপ্লেন চীনকে বিক্রয় করেন এবং আরও অনেক বেশী বর্ত্তমান বৎসরে বিক্রয় করবেন আশা করেন। ইটালীর এক দল ফাসিষ্ট বিমানবীর ঐ দেখাদেখি বিক্রয় চেষ্টায় চীনদেশে গিয়েছেন। পৃথিবীর এরোপ্লেনের দ্রুতগতি ও ঊর্দ্ধগতির "রেকর্ড" ইহাদেরই, এবং বিমানবিহারে ইহারা একেবারে নির্ভীক। তাহার পর কর্ণেল জেম্‌স জোয়েট নামক যুক্তরাজ্যের প্রসিদ্ধ বিমানসেনা-নায়ক—এখন অবসরপ্রাপ্ত—এখন হাংচাওয়ে চীন সামরিক বিমান বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।"

"তৃতীয়তঃ টি. ভি. সুং, চীনের অর্থনৈতিক মন্ত্রী, যে ভাবে জাপানের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে চীনে বৈদেশিক অর্থবল ও রসদাদি আমদানী করছেন তাহাও একটি কারণ। জাপানের চেষ্টা ছিল যাতে বিদেশ হ'তে চীন কোনও ঋণ গ্রহণ করলে তা জাপানের সম্মতি ও সাহায্য ভিন্ন না হ'তে পারে।"

জাপানের ঐ ঘোষণার ফল কি হয়েছে? চীন উচ্চকণ্ঠে বলছে "জাপান জগতকে হেয়জ্ঞান করে এই বাহ্বাস্ফোটন করছে। এইর দম্ভপূর্ণ ঘোষণাকে কি সমস্ত জগৎ উপেক্ষা করার ভান করবে?"



শান্তিকালের বিমানপোতের অভ্যন্তর

ফ্রান্স বলছেন, "আমরা জানবার চেষ্টা করছি যে, জাপানে কি ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য, অথবা মাঞ্চুকুয়ো ব্যবস্থায় জগতের সম্মতি নেবার ইহা একটি উপলক্ষ।"

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অতি ভদ্রভাবে জাপানকে "নাইন পাওয় ট্রীটি"র কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আমেরিকা যুক্তরাজ্য বলেন, "জাপান অকারণ এইর ঘোষণা করেছেন। যুক্তরাজ্য চীনদেশে কোনও সামরিক শিক্ষক ব্যবস্থাবিশারদ পাঠান নাই। যদি কেউ অবসর-প্রাপ্তির পর গি থাকেন, তবে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গিয়েছেন।"

কেন ‘কুন্তলীন’

ব্যবহার করিব ?



কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

বলেন—কুন্তলীন তৈল আমরা দুই মাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল **কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া এক মাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে।** এই তৈল সুবাসিত এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।”

একথা হয়ত অনেকেই মনে করিতে পারেন যে “বাজারে এত রকমের সস্তার তৈল থাকিতে কেন “কুন্তলীন” ব্যবহার করিব” ? “কুন্তলীন” কেন যে নিত্য-ব্যবহার্য্য তৈল তাহার কয়েকটি কারণ নীচে দেওয়া হইল :—

১। ইহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধিত বলিয়া ইহাতে তৈলের স্বাভাবিক রজন, ক্ষার, অম্ল, মোম ও গন্ধক নাই। এই জন্যই ইহার ব্যবহারে চুলের কোনওরূপ অনিষ্ট ও চুলে আঠা হয় না।

২। ইহাতে ‘কৃত্রিম গন্ধ’ (Artificial perfume) নাই এবং সেইজন্য কোনও প্রকার সীসা, পারা বা তাপিণ তৈল নাই।

৩। ইহার ব্যবহারে চুলে জটা না হওয়ায় কেশ-বিন্যাসের সময় অযথা কেশ কমিয়া যায় না।

৪। সাধারণ কেশ-তৈলের ন্যায় ইহাতে বাজে অপরিষ্কার তৈল ব্যবহার করা হয় না। এই কারণে দুর্গন্ধ দূর করিবার জন্য কোনও প্রকার তীব্র গন্ধ ব্যবহার করার দরকার হয় না। ইহার গন্ধের মধুরতা দুর্লভ।

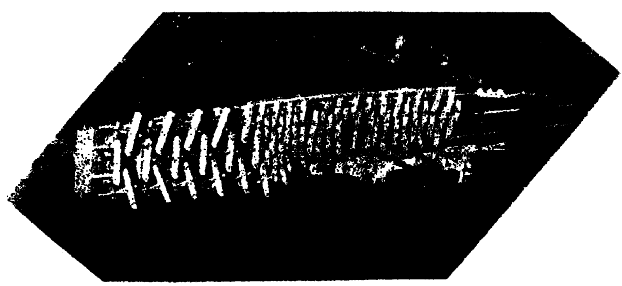
৫। মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখিবার ক্ষমতা ‘কুন্তলীনের’ বিশেষত্ব। **এইচ, বসু, কলিকাতা**

বঙ্কিমজগৎ পর পৃষ্ঠায় দেখুন



যুদ্ধে সামুদ্রিক বিমানপোতের ব্যবহার

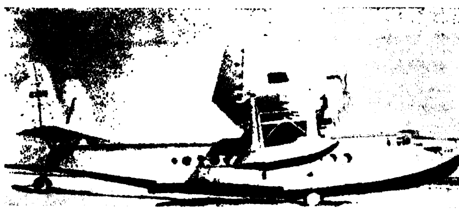
'প্লেনের নীচে বিরাট বোমা রহিয়াছে, এইরূপ একটি বোমার বিস্ফোরণে বৃহত্তম যুদ্ধপোতও অচল বা ধ্বংস হইতে পারে।



এরোপ্লেনবাহী যুদ্ধ-পোত

জাহাজের দক্ষিণ অংশে বিরাট "গুলতি" (ক্যাটাপল্ট) আছে, যাহার দ্বারা এরোপ্লেন নিমেষের মধ্যে শূন্যে ছুড়িয়া দেওয়া যায়। বিপক্ষের নৌবহরের সন্ধান ও আক্রমণের জন্য এইরূপ জাহাজ হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সেগুলির আক্রমণে বিপক্ষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে।

বহির্জগৎ পর পৃষ্ঠায় দেখুন



সামুদ্রিক এরোপ্লেন—শান্তিকালে

করটিস্—এম্ ৪২ ; ইহা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ডাক-সরবরাহে ব্যবহৃত হয়। এক টানে ১২০০ মাইল দশ ঘণ্টায় যায়। বত্রিশ জন যাত্রী, পাঁচ জন কর্ম্মচারী এবং প্রায় পনেরো মণ ডাক লইতে পারে।

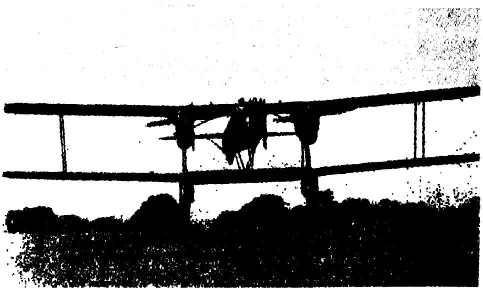
এখন জগতের প্রধান সমস্যা পূর্ব্ব-এশিয়ার এই দুটি মহাজাতি-সমষ্টিকে নিয়ে। একই পরিবারের না হ'লেও এরা যে কুটুম্ব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সভ্যতার আদিকাল থেকে এদের কৃষ্টির ধারা একই স্রোতে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, এখন কালের চক্রে একের যাহা আদর্শ তাহাতে অন্যের সর্ব্বনাশ। দুই হাজার বৎসরের সম্পর্কের এই ফল।

সমস্যা জটিল হয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যখন রুশজাতি বরফশূন্য বন্দরের সন্ধানে প্রশান্ত মহাসাগরউপকূলে মাঞ্চুরিয়ায় এসে উপস্থিত হন। তারপর ইংরেজ, আমেরিকান, জার্ম্মান ইত্যাদি সকল বণিক ও সাম্রাজ্যবাদী জাতিই একে একে এসে উপস্থিত হন—কেহ ব্যবসার চেষ্টায়, কেহ সাম্রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টায়। ইতিমধ্যে আমেরিকা জাপানের

চোখ ফুটিয়ে দেয়—অনেক অপমান অনেক আঘাত দিয়ে। জাগ্রত জাপান যেদিন দেশের সীমানার বাইরে দেখতে শিখল, সেদিন প্রথমেই তার দৃষ্টি পড়ল এই পাশ্চাত্য অর্থ ও সাম্রাজ্যলোলুপ জাতিসঙ্ঘের উপর।

তারপর নিজের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে অন্যের শক্তি বিচারও করতে আরম্ভ করল এবং নিজের ও অন্যের বলবৃদ্ধির (যার অন্য অর্থ সাম্রাজ্যবৃদ্ধি) সুযোগ ও বাধার কথাও ভাবতে লাগল। এই ভাগ্য-গণনার প্রথমেই তার দৃষ্টি পড়ল রুশের বর্ম্মকৃপাণযুক্ত প্রসারিত হস্তের উপর। রুশ তখন মাঞ্চুরিয়ার দ্বারে উপস্থিত।

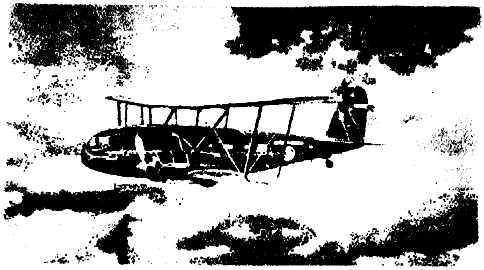
ইহারই ফলে ১৮৯৪-৯৫ সালে চীন-জাপান যুদ্ধ হয়। চীন তখনও



যুদ্ধের এরোপ্লেন

হ্যাণ্ডলি-পেজ-হেফোর্ড, বোমাক্ষেপণকারী এরোপ্লেন। ইহা ৩৫ মণ বোমা লইয়া ১৫০০০ ফুট উচ্চে উঠিয়া ৭ ঘণ্টার মধ্যে ৫০০ মাইল দূরে বোমা ফেলিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে। বোমাগুলিও এরূপ ভয়ানক যে উহা যেখানে পড়ে তাহার ১০০ গজের মধ্যে সকল স্থানই বিধ্বস্ত হয়।

অতীতের মধ্যে বসে। জাপান দ্রুতগতিতে বর্ত্তমানের সীমানায় পৌঁছেছে। যুদ্ধে জাপান জয়ী হয়েও কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের চক্রান্তে যুদ্ধজয়ের ফল থেকে বঞ্চিত হ'ল। এই যে আজকের জাপান সন্দিগ্ধচিত্তে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র দাঁড়িয়ে উঠেছে, ইহা ঐ যুদ্ধের ফললাভের নৈরাশ্যের কথা মনে করেই। তারপর আমেরিকা যুক্তরাজ্য জাপানের ''ভদ্রলোকের সন্ধি'' ভেঙে আমেরিকানরা জাপানীদের যুক্তরাজ্যে প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে ঐ উন্নত জাতির প্রাণে বিষম আঘাত লাগে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও জাপানের আধুনিকতম কলকারখানা এবং কৌশলী ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতায় অন্য সকল জাতি হটে গিয়ে জাপানী পণ্যদ্রব্যের বিরুদ্ধে বিরাট শুল্কের দেওয়াল তুলে দিয়েছে। এতে জাপানের ভবিষ্যৎ আবার অন্ধকার হয়ে আসছে।



শান্তিকালের এরোপ্লেন

কারটিস-কণ্ডর : ইহা যুক্তরাজ্যে স্থলপথে যাত্রী ও ডাক সরবরাহে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে বারো জন যাত্রী দিনে আরামে বসিয়া রাত্রে বিছানায় শুইয়া পথযাপন করিতে পারেন।

সুতরাং জাপানের সমস্যা ক্রমেই জটিল হয়ে আসছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীরও শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা বেড়ে চলেছে। জাপান কি চায় তাহা জাপানের পররাষ্ট্রসচিব কাউণ্ট ইসাই স্পষ্টই বলেছেন—

"ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, আধুনিক জাতিসঙ্ঘের পরিবারে প্রবেশ করার সময় হ'তে অদ্যাবধি জাপানের পররাষ্ট্র-নীতির প্রধান উদ্দেশ্য দুইটি মাত্র—সমকক্ষতা ও নিঃশঙ্কতা।"

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

২য় সংখ্যা

আবেদন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমের দিক্‌সীমায় দিনশেষের আলো
পাঠালো বাণী সোনার রঙে লিখা,—
"রাতের পথে পথিক তুমি, প্রদীপ তব জ্বালো,
প্রাণের শেষ শিখা।"
কাহার মুখে তাকাব আমি, আলোক কার ঘরে
রয়েছে মোর তরে,
সঙ্গে যাবে যে আলোখানি পারের ঘাটপানে
এ ধরণীর বিদায়বাণী কহিবে কানে কানে ;
মম ছায়ার সাথে
আলাপ যার হবে নিভৃত রাতে।
ভাসিবে যবে খেয়ার তরী কেহ কি উপকূলে
রচিবে ডালি নাগ-কেশর ফুলে
তুলিয়া আনি চৈত্রশেষে কুঞ্জবন হ'তে
ভাসায়ে দিবে স্রোতে ?

আমার বাঁশি করিবে সারা যা ছিল গান তার,
সে নীরবতা পূর্ণ হবে কিসে ?

তারার মতো সুদূরে-যাওয়া দৃষ্টিখানি কার
মিলিবে মোর নয়ন অনিমিষে ?
অনেক কিছু হয়েছে জমা, অনেক হ'ল খোঁজা,
আশাতৃষার বোঝা
ধূলায় যাব ফেলে।
ধূলার দাবী নাইকো যাহে সে ধন যদি মেলে,
সুখ-দুখের সব শেষের কথা,
প্রাণের মণিখনির যেথা গোপন গভীরতা
সেথায় যদি চরম দান থাকে,
কে এনে দেবে তাকে ?
যা পেয়েছিনু অসীম এই ভবে
ফেলিয়া যেতে হবে,
আকাশ-ভরা রঙের লীলাখেলা,
বাতাস-ভরা সুর,
পৃথিবীভরা কত না রূপ, কত রসের মেলা,
হৃদয়ভরা স্বপন মায়াপুর,
মূল্য শোধ করিতে পারে তার
এমন উপহার
যাবার বেলা দিতে পারো তো দিয়ো
যে আছ মোর, প্রিয়।

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

শিখদের মহাগ্রন্থ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

বেদপন্থীর যেমন বেদ, বুদ্ধপন্থীর যেমন ত্রিপিটক, খ্রীষ্টপন্থীর যেমন বাইবেল ও মহম্মদপন্থীর যেমন কোরান, নানকপন্থীর তেমনি গ্রন্থসাহেব। এই গ্রন্থসাহেব বলিতে কি বুঝায় তাহার একটা স্পষ্ট ধারণা হয়ত বাংলা দেশে অনেকের নাও থাকিতে পারে। তাই গ্রন্থসাহেবের একটু পরিচয় ও কেমন করিয়া তাহা গড়িয়া উঠিল তাহার একটু ধারা দিবার চেষ্টা করা যাইবে।

তৃতীয় গুরু অমরদাসের কন্যা ভানী বিবি বাল্যকাল হইতেই ছিলেন সরল নিস্পৃহ ও ধর্ম্মপরায়ণ। অমরদাস বাল্যকালে বৈষ্ণবভাবেই পালিত হওয়ায় তাঁহার মধ্যে ধর্ম্মের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও রসের প্রাচুর্য্য দেখা যাইত। সেই বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও নিষ্ঠা ভানী দেবীতেও প্রচুর পরিমাণে ছিল। বয়স হইলে ভানী দেবীর বিবাহ হইল পরম ধর্ম্মপরায়ণ ভক্ত জেঠার সঙ্গে। পরে এই জেঠাই হইলেন চতুর্থ গুরু রামদাস। ইঁহাদের প্রথম পুত্রের নাম পৃথীচংদ। তাঁহার জন্ম হয় ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইঁহাদের দ্বিতীয় পুত্র ভক্ত মহাদেব, তৃতীয় পুত্র গুরু অর্জ্জুন। মহাদেব ছিলেন সংসারবিরাগী। অর্জ্জুনকেই যোগ্য জানিয়া করা হইল সম্প্রদায়ের গুরু। পৃথীচংদ অসন্তুষ্ট হইয়া এক নূতন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিলেন। শিখেরা সেই সম্প্রদায়কে বলেন 'মীনা'। মীনা রাজপুতানার এক দস্যু জাতির নাম।

পৃথীচংদ গুরু নানকের নামে সব ঝুঠা পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শিখদের হইল মহা ভয়। কি উপায় করা যায়। গুরু অর্জ্জুনের প্রধান চিন্তা হইল কেমন করিয়া গুরু নানক ও অন্যান্য গুরুদের খাঁটি পদগুলি একত্র করা যায়।

গুরু নানকের পদগুলি প্রথমে লেখা হইত সংস্কৃত অক্ষরে। পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সংস্কৃত বর্ণমালায় ৪৯টি অক্ষর ছাড়া, 'ক্ষ' 'ত্র' 'জ্ঞ' এই তিনটি বর্ণ লইয়া হইল ৫২টি অক্ষর। অথচ পঞ্চনদের প্রাকৃতে ৩৫টি অক্ষরেই কাজ এক রকম চলিয়া যায়। গুরু অঙ্গদ নিজেও প্রথমে লিখিতেন সংস্কৃত অক্ষরে। পরে তিনিই কাশ্মীরের 'সারদা' অক্ষর ও পঞ্জাবের উত্তর-ভাগস্থ পর্ব্বতে প্রচলিত 'টাকরা' অক্ষর ও 'লহংডা' মিলাইয়া গুরুমুখী অক্ষরের পত্তন করিলেন। অঙ্গদের নিজেরও কিছু পদ রচনা ছিল।

নানা ভাবেই গুরু অর্জ্জুন শিখ ধর্ম্মকে একটি নিজস্ব রূপ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনিই শিখদের বিখ্যাত 'হরমন্দির' রচনায় প্রবৃত্ত হন। এখন যেখানে অমৃতসর পূর্ব্বে সেখানে এক যোগীর স্থান ছিল। সেই খানেই ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত সরোবর রচিত হয় ও তাহার মধ্যস্থলে হয় হরমন্দিরের স্থান। এই সরোবরের আরম্ভ হইয়াছিল গুরু অমরদাসের সময়ে। গুরু রামদাসও এই জন্য প্রভূত শ্রম করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, এই সরোবর-রচনা সমাপ্ত হইলে তাহার মধ্যস্থলে শিখদের পরম সুন্দর মহামন্দির হইল প্রতিষ্ঠিত।

গুরু অর্জ্জুন চেষ্টা করিতেছিলেন যাহাতে শিখদের ধর্ম্ম, আদর্শ, নীতি, আচার, দিন-কৃত্য, সব একটি সংগ্রহের মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে। কাশ্মীরের শিখরাও বলিলেন তোমাদের শাস্ত্র ধর্ম্ম ও আচার প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র ও আচারের সঙ্গে গুলাইয়া যাইতেছে। শিখদের ধর্ম্মের ও আচরণের একটি নিজস্ব সংগ্রহ সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

তৃতীয় গুরু অমরদাসের দানী ভানী নামে ছিলেন দুই কন্যা। ভানী দেবীর কথা আগেই হইয়াছে। আর মোহরী ও মোহন নামে ছিলেন দুই পুত্র। কিন্তু অমরদাস আপন জামাতা রামদাসকেই যোগ্য জানিয়া গুরুপদ দিয়া যান। মোহরী ও মোহন উপেক্ষিত হইয়া মনে মনে বিষম কষ্ট হইলেন।

চতুর্থ গুরু রামদাসের তিরোধানের পর অর্জ্জুনদেব হইলেন পঞ্চম গুরু। তিনি নানা স্থান হইতে গুরু নানকের বাণী, দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ ও তৃতীয় গুরু অমরদাস ও চতুর্থ গুরু

রামদাসের সব পদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার মাতুল-সম্পর্কীয় ভাই গুরদাস হইলেন তাঁহার পরম সহায়। গুরু অঙ্গদ প্রবর্ত্তিত গুরুমুখী অক্ষরে ভাই গুরদাস সব লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আদিগুরুর আসল একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ ছিল গোইন্দবালে অমরদাসের পুত্র মোহনের কাছে। সেই সংগ্রহখানা না পাইলে আর কাজ চলে না। অথচ তাহা পাইবার উপায় কি?

গুরু অর্জ্জুন ভাই গুরদাসের লিপিসৌন্দর্য্যে ও তাঁহার রচিত "বার" বা গুরুদের মহিমাগানের রচনায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গুরু অর্জ্জুন প্রথমে ভাই গুরদাসকে গোইন্দবালে মোহনের কাছে পাঠাইলেন। মোহন তাঁহাকে একেবারে আমলই দিলেন না। অগত্যা গুরু অর্জ্জুন নিজেই গেলেন ও নানা ভাবে চেষ্টা করিয়া মোহনকে প্রসন্ন করিলেন। সেই সংগ্রহ গুরুর হস্তগত হইল।

এখন অর্জ্জুনের ভাবনা হইল কেমন করিয়া তাঁহাদের মহাগ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ হয়। নানা স্থান হইতে গুরু সব পদ একত্র করেন ও মুখে বলিয়া যান। ভাই গুরদাস তাহা লিপিবদ্ধ করেন। এই উপলক্ষ্যে গুরু অর্জ্জুন, হিন্দু ও মুসলমান নানা সম্প্রদায়ের ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া প্রত্যেকের কাছে সেই মহাগ্রন্থ রচনার সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। এই প্রসঙ্গে ভারতের নানা স্থান হইতে নানা সম্প্রদায়ের সব নির্ব্বাচিত ভক্তজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাংলা দেশ হইতে জয়দেবের ভক্তগণ তাঁহাদের নির্ব্বাচিত লোক পাঠাইলেন। ভক্ত নামদেব, রামানন্দ, রবিদাস, কবীর ও ফরীদ প্রভৃতি সাধক-দলের প্রতিনিধিরাও আসিলেন।

ভক্ত পিলো, ভক্ত কান্থ (কৃষ্ণ), ভক্ত ছজ্জু, সাধক শাহ হুসেন প্রভৃতি বহু ভক্ত এই উপলক্ষ্যে আসেন। কিন্তু তাঁহাদের রচনা গৃহীত হয় নাই। কাশী হইতে বৃদ্ধ পণ্ডিত হরলাল ও কৃষ্ণলাল আসিয়া বলিলেন, গুরু নানকের কাছে তাঁহারা অনেক উপদেশ পাইয়াছেন। তাহা তাঁহারা এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করাইবার জন্য আসিয়াছেন। যে সব কবিরা শিখধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারাও তাঁহাদের রচিত নানা স্তবস্তুতি এই জন্য আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

পদগুলি লেখক অনুসারে ভাগ না করিয়া ভাগ করা হই[ল] রাগ অনুসারে। গ্রন্থসাহেবের মধ্যে ৩১টি রাগ দে[খা] যায়। এক একটি রাগের মধ্যে প্রথমে প্রথম গুরুর প[দ] প্রথম মহল্লা নামে, দ্বিতীয় গুরুর পদ দ্বিতীয় মহল্ল[া] নামে, তৃতীয় গুরুর পদ তৃতীয় মহল্লা নামে—এইরূ[পে] সাজান হইল। এক এক রাগে শিখ গুরুদের পদ সাজা[ন] হইলে তাহার পর জৈদেব, রামানন্দ, কবীর, রবিদা[স] প্রভৃতি ভক্তদের পদ হইল সাজান।

গ্রন্থসাহেবের পরিশিষ্টে 'রাগমালা' বলিয়া এক অংশ আছে। তাহা মুসলমান কবি আলিমের কাব্য হইতে গৃহীত। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আলিম এক কাব্য রচনা করে[ন,] তাহার নাম "মাধবনাল সঙ্গীত"। এই কাব্যের না[য়ক] মাধবনাল ও নায়িকা কামকন্দলা। এই কাব্যের ৬৩-৭[...] পদগুলিতে যে রাগ-পরিচয় আছে গ্রন্থসাহেবের পরিশি[ষ্টে] তাহাই গৃহীত হইয়াছে।

অমৃতসরের সরোবরতীরে রমণীয় স্থানে বসি[য়া] গুরু অর্জ্জুন বলিতেছেন ও ভাই গুরদাস লিখিতেছেন, এম[ন] করিয়া ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্র শুক্লাপ্রতিপদে এই গ্রন্[থ] সাহেব সংগ্রহ সমাপ্ত হয়। ইহাই আদি গ্রন্থ। ইহার প[রে] আরও দুইবার গ্রন্থসাহেবের সংগ্রহ হয়। এই আ[দি] গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে এই গ্রন্থের যোগ্য স্থান অমৃতস[র] হরমন্দিরে ইহা রক্ষিত হইয়াছিল।

পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরাত জেলার মঙ্গত গ্রামে ভা[ই] বন্নো নামে এক জন ভক্ত ছিলেন। গ্রন্থসাহেব র[চিত] হইলেই তিনি গ্রন্থখানি একবার স্বগ্রামে লইয়া গিয়া দেখি[তে] চাহিলেন। গুরু অর্জ্জুন বলিলেন, "যাও গ্রন্থখানি লইয়[া] কিন্তু তোমার গ্রামে গিয়া এক দিনের বেশী রাখিও না।" ভাই বন্নো পথে বিশ্রাম করিতে করিতে অতি ধী[রে] অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথেই তিনি গ্রন্থখানি আদ্যন্ত প্রতিলিপি করিয়া লইলেন। গ্রামে যাইয়া গ্র[ন্থ]খানি এক দিন রাখিবারও প্রয়োজন আর হইল না। প[রে] তাহাতে এমন অনেক পদ বন্নো বসাইলেন যাহা গু[রু] অর্জ্জুনের আদি গ্রন্থে বাদ গিয়াছিল। গুরু তাঁহাকে বলিলে[ন,] "তোমার সংগ্রহ তোমারই থাকুক। আমার সংগ্রহ যেম[ন] ভাবে সমাপ্ত হইয়াছে তেমনই চলুক।" কেহ কেহ বলে[ন]

লাহোরে গ্রন্থসাহেব বাধাইতে আনিয়া ভাই বন্নো প্রতিলিপি করাইয়া লন ও তাঁহার সংগ্রহ তাহাতে বসাইয়া দেন।

গুরু হরগোবিন্দের কাছে পরে বিধিচাঁদও এই আদি গ্রন্থখানির একখানি প্রতিলিপি করাইয়া লইবার অনুমতি লাভ করেন। মূল গ্রন্থখানি স্বগ্রামে লইয়া গিয়া বিধিচাঁদ অতিশয় নিষ্ঠার সহিত প্রতিলিপি করাইতে লাগিলেন। বিধিচাঁদ যখন বিলাবল রাগ পর্য্যন্ত প্রতিলিপি করাইয়াছেন অর্থাৎ অর্দ্ধেকের অধিক যখন লেখা হইয়া গিয়াছে তখন এক দিন গুরু হরগোবিন্দ বিধিচাঁদকে তাঁহার সঙ্গে সপরিবারে কিরাতপুরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সকলেই যাত্রা করিলেন কিন্তু গুরুদিত্তার পুত্র ধীরমল সঙ্গে গেলেন না। ধীরমল ভাবিলেন, "যদি আমি না যাই তবে আমি সমস্ত ধন-সম্পত্তি অধিকার করিতে পারিব, বিশেষভাবে ঐ গ্রন্থসাহেবখানা আমারই হইবে।" যাইবার সময় বিধিচাঁদ ধীরমলকে গ্রন্থসাহেবখানা আনিতে আজ্ঞা করিলেন, তখন ধীরমল বলিলেন, "চিন্তা কি, আপনি চলিয়া যান, আমি পরে পাঠাইয়া দিব।" গুরু হরগোবিন্দ ধীরমলের কাণ্ড শুনিয়া বলিলেন, "চিন্তা নাই, শিখদের ধন শিখরাই উদ্ধার করিবে।"

গুরু তেগবাহাদুরের সময় শিখেরা ধীরমলের সর্ব্বস্ব লুটিয়া আনে। অবশ্য তাহার অন্য কারণও ছিল। গুরু শিখদের উপর ইহাতে বিরক্ত হইয়া ধীরমলকে তাঁহার সর্ব্বস্ব ফিরাইয়া দেন। গ্রন্থসাহেবের প্রতিলিপিখানিও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন।

মীরা মৃত্যুকালে তাঁহার সাধনার সহচরীদের বলিয়াছিলেন, আমার এই কায়ার অবসান ঘটিলেও আমার জীবনের অবসান হইবে না, আমি তোমাদের সাধনাতেই বাঁচিয়া থাকিব। তাই মীরার দেশে প্রায় সব নারী সাধিকাই আপন আপন নাম লুপ্ত করিয়া মীরার নামেই দিয়াছেন ভণিতা। সেইরূপ সকল গুরুই দিয়া গিয়াছেন নানকের নামে ভণিতা। তবে মহল্লার সংখ্যা দিয়া কোন্ গুরুর রচনা তাহা বুঝা যায়। সকল গ্রন্থসাহেব এক গুরুময় মহাতীর্থ। তাহার এক এক মহল্লায় এক এক গুরু করিতেছেন বিরাজ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গুরু অর্জ্জুনের সংগৃহীত গ্রন্থসাহেবের পর দ্বিতীয় সংগ্রহই হইল ভাই বন্নোর। ভাই বন্নোর মূল গ্রন্থখানি এখনও গুজরাত জেলায় মঙ্গত গ্রামে রক্ষিত আছে। তাহাতে মীরা বাঈর একটি গান আছে, আদি গ্রন্থে এই গানটি নাই। সাধারণ গ্রন্থসাহেবে সারংগ রাগে সুরদাসের একটি প্রখ্যাত পদ আছে—"হরিকে সংগ বসে হরিলোক" ইত্যাদি। ভাই বন্নোর গ্রন্থসাহেবে সারংগ রাগে সুরদাসের আর একটি পূর্ণ পদ আছে— ভক্তিহীনদের সঙ্গ ত্যাগ করিবার উপদেশ প্রসঙ্গে—"ছাড়ি মন হরি বিমুখনকো সংগু।" আদি গ্রন্থসাহেবে ঐ একটি মাত্র পংক্তিই আছে। কিন্তু বন্নো তাহার সংগ্রহে পুরা পদটিই দিয়াছেন। গুরু অর্জ্জুনের সংগৃহীত মূল আদি গ্রন্থসাহেব কর্ত্তারপুরে রক্ষিত আছে। কর্ত্তারপুরের গ্রন্থসাহেবেও প্রথমে পুরা পদটি লেখা হইয়াছিল পরে কি জানি কেন ঐ একটি পংক্তি রাখিয়া বাকীটা কলম দিয়া কাটিয়া তাহার উপর আবার হরিতালের রং আগাগোড়া লেপন করিয়া লুপ্ত করিয়া ফেলা হয়।

ভাই গুরদাসের গ্রন্থসাহেবের প্রথম সংগ্রহের পর হইল ভাই বন্নার দ্বিতীয় সংগ্রহ। তাহার পর তৃতীয় সংগ্রহ হইল গুরু গোবিন্দসিংহের সহায়তায় ভাই মণিসিংহের সংগ্রহ। এই গ্রন্থকে অনেকে দশম বাদশাহের সংগ্রহ-গ্রন্থ বলেন, যদিও এই নাম গুরু গোবিন্দ বা মণিসিংহের দেওয়া নহে। এই সংগ্রহের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য গুরু গোবিন্দ-রচিত জাপজী, অকাল স্তুতি বা পরমেশ্বরের বন্দনা, বিচিত্র নাটক এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যের তিন তিনটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, জ্ঞানপ্রবোধ, চতুর্বিংশ অবতারতত্ত্ব, "হজারে দে সবদ," সবৈয়া, শস্ত্রনামমালা, স্ত্রীচরিত্র, জাফরনামা বা আওরংজেবকে লেখা গুরু গোবিন্দের পত্র, ও কয়েকটি পারসী গল্পের অর্থাৎ "হিকায়তে"র অনুবাদ; এই অনুবাদও কবিতাতেই করা হইয়াছে।

যুদ্ধ অপরিহার্য্য মনে করিয়া গুরু গোবিন্দ সেই ভাবেই শিখধর্ম্মকে চাহিলেন চালনা করিতে। তাই তাঁহার সংগ্রহগ্রন্থে শস্ত্রনামমালা, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর তিন তিনটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রভৃতি বিষয় আছে। গুরু গোবিন্দের "জাপজী"কে কেহ যেন নানকের জপজী বলিয়া ভুল না

করেন। নানকের "জপজী" হইল শিখধর্ম্মের সার ও মূলসূত্র। ইহা প্রত্যেক শিখ-ভক্তের প্রভাতে নিত্য-স্মরণীয়। গুরু গোবিন্দের "জাপজী" হইল বিধাতার সহস্র নাম। গুরু গোবিন্দ বিধাতার যে-সব বীরত্বসূচক নাম বিশেষ ভাবে চালাইয়াছেন তাহার মধ্যে কয়েকটি বেশ ভাবিয়া দেখিবার মত।—অকাল, সর্ব্বকাল, মহানূকাল, অসিধ্বজ, অসিকেতু, খড়্গকেতু, অসিপাণি, সর্ব্বলোহ (লৌহময়), মহান্‌লোহ ইত্যাদি।

গ্রন্থসাহেবে গুরু নানক, অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস, অর্জ্জুনের বাণী ছিল। কর্ত্তারপুরে যে মূল আদি গ্রন্থসাহেব আছে তাহাতে নবম গুরু তেগ বাহাদুরের কোন পদ নাই। গুরু গোবিন্দ দমদমার মঠের গ্রন্থসাহেবে তেগ বাহাদুরের পদাবলীর স্থান করিয়া দেন, গোইন্দবাল ও খাদুরের মাঝামাঝি একটি স্থানের নাম পরে হয় "দমদমা।" গুরু অমরদাস তাঁহার গুরুপদ গ্রহণের পূর্ব্বে প্রতিদিন প্রভাতে গোইন্দবাল ও খাদুরের মধ্যে যাতায়াতের মাঝে ঐখানে একটু বিশ্রাম করিতেন ও জপজী পাঠ করিতেন। "দমদমা" শব্দের অর্থই হইল একটু বিশ্রাম অর্থাৎ দম লইবার স্থান। সেইখানে পরে এক শিখমঠ প্রস্তুত হয়। গুরু গোবিন্দেরও একটি শ্লোক গ্রন্থসাহেবের মধ্যে গৃহীত হয়।

গ্রন্থসাহেবের মধ্যে শিখধর্ম্মের বাহিরের এই কয় জন ভক্তের পদ গৃহীত হইয়াছে:—জয়দেব, নামদেব, ত্রিলোচন, পরমানন্দ, সধনা, বেণী, রামানন্দ, ধন্না, পীপা, সৈন, কবীর, রবিদাস, সুরদাস, ফরীদ ও ভীখন। ফরীদ ও ভীখন এই দুই জন মুসলমান-বংশীয় ভক্ত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভাই বন্নোর সংগ্রহে মীরা বাঈরও একটি পদ আছে ও সারংগ রাগে সুরদাসের দুইটি পুরা পদ আছে। আদি গ্রন্থসাহেবে সুরদাসের একটি পুরা পদ ও একটি পংক্তি মাত্র আছে। ভাই বন্নো তাঁহার সংগ্রহে সেই পংক্তিযুক্ত পদটি পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

গুরু অর্জ্জুন নিজের মুখে আদি গ্রন্থসাহেবের পদগুলি লিখাইলেও নিজেকে ভগবানের দিক হইতে প্রত্যাদিষ্ট মনে করিয়া এই পদগুলি সংগ্রহ করাইয়াছেন। যখন সম্রাট জাহাঙ্গীর এই গ্রন্থসাহেব হইতে মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে উচ্চারিত বাণীগুলি তুলিয়া দিতে বলেন তখন গুরু অর্জ্জুন বলিলেন তাহা অসম্ভব। কারণ এই গ্রন্থ কাহারও পক্ষে বা বিপক্ষে বা কোনো উদ্দেশ্য করিয়া রচিত নহে, ইহা পরম সত্যের সহজ প্রকাশ। কাজেই ইহাতে হাত দেওয়ার অর্থ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ। গুরু অর্জ্জুনকে এই জন্য অশেষবিধ নির্যাতন সহিয়া প্রাণ দিতে হয়। তবু তিনি তাহাতে এক চুলও বিচলিত হন নাই। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ শুক্লাচতুর্থীতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। "দবীস্তান-ই-মজাহিব"-প্রণেতা মুহসিন ফানীর মতে গুরু অর্জ্জুনের প্রাণদণ্ডের অন্য কারণ ছিল। জাহাঙ্গীরের প্রতিপক্ষ খুসরুকে এক সময় সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া গুরু অর্জ্জুনকে এই দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। অথচ অর্জ্জুন খুসরুকে অতিথি ভাবেই সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহা না করাও তাঁহার পক্ষে শিখধর্ম্মের বিরুদ্ধ হইত। আদিগ্রন্থসাহেবের সংগ্রহ ও রচনা-প্রণালী সম্বন্ধে শিখদের এত দূর নিষ্ঠা যে তাঁহারা ইহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারেন না।

ভাই মণি সিংহ যখন গুরু গোবিন্দের আজ্ঞানুসারে তাঁহার গ্রন্থসাহেব সংগ্রহ করেন তখন তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে রাগ অনুসারে পদগুলির বিভাগ না হইয়া যদি গুরু অনুসারে বিভাগ হয় তবে অনেক দিকে সুবিধা হয়। সেই ভাবে তিনি করিয়াও তুলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সমস্ত শিখমণ্ডলী এমন বিরুদ্ধ হইয়া উঠিলেন যে মণি সিংহ সকলের কাছে বিনীত ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পরিশেষে সেই সব সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট করিতে বাধ্য হন।

গ্রন্থসাহেবের মধ্যে কোথাও কোন ছেদ বা বিচ্ছেদ নাই। অক্ষরের পর অক্ষর সমান ভাবে চলিয়া গিয়াছে। ইহা বদলাইয়া শব্দগুলি পদবিভাগমত বসাইলে সুবিধা হয়, কিন্তু উপায় নাই। এই সব শব্দযোজনা ঠিক মত না পড়িলে অর্থ এক হইতে আর হইয়া যায়। একবার এক শিখকে এই রূপ ভুল ভাবে পড়িতে দেখিয়া গুরু গোবিন্দ গ্রন্থের পাঠ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইবার ব্যবস্থা করেন। "গ্রন্থী" বলিয়া বিশেষ এক শ্রেণীর লোকেই গ্রন্থ পড়িতে পারেন। কিন্তু তাহাতেও যে কত ভুল হয় তাহা একটু খোঁজ করিলেই দেখা যায়। এখন কোথাও কোথাও গ্রন্থসাহেব বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া মুদ্রিত

করিবার কথা চলিয়াছে। আমার এক ছাত্র শ্রীমান্ জয়ন্তী-লাল আচার্য্য এই কাজে হাতও দিয়াছেন। তবে এখনও ইহা সমাপ্ত হইতে বিস্তর বিলম্ব আছে।

গুরু গোবিন্দের আদেশে ভাই মণি সিংহ এই গ্রন্থ সংগ্রহ আরম্ভ করিলেও ইহা সমাপ্ত হয় গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর চব্বিশ বৎসর পরে। গুরু গোবিন্দ এক ধর্ম্মান্ধ পাঠানের হস্তে নিহত হন। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের কার্ত্তিক শুক্লাপঞ্চমী বৃহস্পতিবারে তিনি পরলোকগমন করেন। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাই মণি সিংহের সংগ্রহ-গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। সেই গ্রন্থ এখন পাতিয়ালার অন্তর্গত তলবণ্ডী গ্রামের মঠে রক্ষিত। এই মঠকে শিখরা দমদমার মঠ বলেন। দমদমা মঠের কথা আগেও বলা হইয়াছে।

গুরু গোবিন্দের সংগ্রহে অনেক শিখের কিছু কিছু আপত্তি ছিল। উহাতে 'স্ত্রী চরিত্র' ও পারস্য ভাষায় 'হিকায়ত' বা মনোরঞ্জক গল্প প্রভৃতি যাহা আছে তাহা তাঁহাদের মতে ঐ সংগ্রহে না থাকিয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে থাকা উচিত। যখন এইরূপ তর্ক চলিয়াছে তখন বিকানের হইতে মিরান-কাটবাসী মহতাব সিংহ নামে এক শিখ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শপথ করিয়াছিলেন মস্সা রংঘর নামে এক মুসলমান রাজপুরুষের প্রাণ লইবেন। মস্সা নাকি অমৃতসরের গুরুমন্দির করায়ত্ত করিয়া সেই ধর্ম্মমন্দিরের অপমান করিবার জন্য সেখানে নর্ত্তকীর নাচ চালাইতেছিল। মহতাব সিংহ কহিলেন যদি আমি আমার শপথ পূর্ণ করিয়া এখানে ফিরিয়া আসি তবে গুরু গোবিন্দের গ্রন্থ ঠিক এমন ভাবেই রাখিতে হইবে, আর যদি এই চেষ্টায় আমার প্রাণ যায় তবে তোমরা তোমাদের ইচ্ছানুসারে গুরু গোবিন্দের গ্রন্থসাহেবকে খণ্ডিত করিতে পার। মহতাব সিংহ শপথ পূর্ণ করিয়া দমদমায় ফিরিলেন, কাজেই ঐ গ্রন্থ ঠিক তেমন ভাবেই রহিয়া গেল।*

* শিখধর্ম্ম সম্বন্ধে এম্, এ, মেকলিফ সাহেব ইংরেজীতে যে ছয় খণ্ড পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে গুরুমুখী না জানিয়াও শিখধর্ম্মের অনেক খবর পাওয়া যায়। তিনি কয়েক জন শিখ গ্রন্থীর সহায়তায় মূল বাণীগুলির অনুবাদ করেন। তবু সেই সব অনুবাদে বিস্তর ভুলভ্রান্তি ঘটিয়াছে। মেকলিফ সাহেব শিখধর্ম্মের জন্য যে প্রভূত শ্রম করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, তবু তাঁহার পক্ষে মুস্কিল হইয়াছে তিনি ভারতীয় অন্যান্য ধর্ম্মের কোনো পরিচয় না লইয়াই শিখধর্ম্মকে ভারতীয় সাধনার জগতে একটি বিচ্ছিন্ন ব্যাপার মনে করিয়া তাঁহার কাজে হাত দিয়াছেন। বরং তাঁহার গ্রন্থে ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা দেখা যায় যে ভারতের অন্যান্য সাধনার সঙ্গে শিখধর্ম্মের কোন যোগ থাকা স্বাভাবিক নয়। ইহার মূলে কি উদ্দেশ্য আছে জানি না, তবে এই বিষয়ে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। শিখধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি নিজে এখনও বিশেষভাবে কিছু কাজ প্রকাশ করি নাই; তাহার কারণ তাঁহাদের বিস্তর শিক্ষিত ভক্ত আছেন। আমি এখন প্রধানতঃ এমন সব পন্থ লইয়া কাজ করিতেছি যাহাদের বিষয় এখনই কিছু না করা হইলে তাঁহাদের বহু অমূল্য রত্ন নষ্ট হইবে। শিখধর্ম্মের সে বিপদ নাই। আমার কয়েক জন প্রীতিভাজন কর্ম্মসহচর এই কাজে হাত দিয়াছেন। আশা করি তাঁহাদের দ্বারা এই বিষয়ে অনেকে অনেক ভিতরের কথা জানিতে পারিবেন। আমার সেই সব প্রীতিভাজন সহকর্ম্মীর প্রয়োচনায় এই শিখধর্ম্মের আলোচনাতেও আমাকে ভবিষ্যতে কিছু কিছু কাজ সম্ভবতঃ করিতে হইবে।



'বৃহৎ-সংহিতা'য় নারী

শ্রী ভ্রমর ঘোষ, এম-এ

বরাহমিহিরকৃত বৃহৎ-সংহিতা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে স্বতঃই একটি কথা মনে প্রতিফলিত হয় যে এ-যাবৎ "স্ত্রী-বৃত্তান্ত" সংগ্রহণের নিমিত্ত যে-সমস্ত শাস্ত্রকারের সহিত তাঁহাদের গ্রন্থের মধ্য দিয়া পরিচয় হইয়াছে, তন্মধ্যে বৃহৎ-সংহিতাকার বরাহমিহিরের ন্যায় নির্ভীক ও স্পষ্টবক্তা অতি বিরল।

ঋগ্বেদে নারী সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলা হয় নাই, কারণ ইহা কতকগুলি ঋক্ বা স্তুতির সমষ্টি মাত্র। তবে ইহার বিষয়বস্তু হইতে অনুসন্ধান দ্বারা আমরা নারীসম্বন্ধীয় তথ্য কতকটা বাহির করিয়া লইতে পারি। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি বিংশতি সংহিতাকারগণের শাস্ত্রে এবং অন্যান্য পরবর্ত্তী শাস্ত্রে আমরা স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় বিশেষ সারগর্ভ বিবরণ প্রাপ্ত হই। উক্ত-সংহিতাগুলির কতকগুলি অধ্যায়ে সম্পূর্ণভাবে এবং কতকগুলি অধ্যায়ে আংশিকরূপে নারীবিষয়ক আলোচনা আছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার অধিকাংশ স্থল পাঠ করিলেই একটা ভাব সকলের মনে জাগে যে, নারী সর্ব্ববিষয়েই পুরুষ হইতে হীনতরা ও কুটস্বভাবা। এক-একটি সংহিতায় অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে স্ত্রীলোকগণের নিকট হইতে আত্মরক্ষা ও তাহাদের দুষ্টসংসর্গ-দোষ হইতে মুক্তির উপায় ও সংস্কার বিবৃত রহিয়াছে। সমাজে এতাদৃশ বিরুদ্ধ ভাব স্ত্রী-সমাজের পক্ষে বিশেষ সম্মানসূচক নহে। কি কি কারণে সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান অবনতির স্তরে ধাবিত হইল, ইতিহাস-পাঠে তাহা জানা যায়। বৈদেশিক আক্রমণ ভারতের গৌরবময় ইতিহাসে কলঙ্কলেপন করিয়াছে ও খুব সম্ভব বৈদেশিক সংসর্গেই ভারতীয় জাতীয়তায় তখন অবনতি আনয়ন করিয়াছিল।

সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে যখন বিজাতীয় ভাব প্রবেশ করিল, তখন ভারতের ন্যায় সুসভ্য দেশ পৃথিবীতে বিরল। অপরাপর দেশ ভারতীয় সভ্যতার তুলনায় এক রূপ অসভ্য ছিল বলিয়াই ধরা হয়। এই সকল অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির অনুন্নত চিন্তাধারা ধীরে ধীরে ভারতের কৃষ্টিতে প্রবেশ করিল; সমাজে অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। বৈদেশিকগণের লোলুপ দৃষ্টি হইতে রক্ষার নিমিত্ত সমাজে অবরোধপ্রথার সৃষ্টি ও তৎসঙ্গে অল্পবিস্তর স্ত্রীলোকগণকে সন্দেহের চক্ষে দেখা যাইতে লাগিল। এই সন্দেহের বিষময় ফল এককালে স্ত্রীজাতির গৌরব অল্প অল্পে হরণ করিল। সমাজসংস্কারকগণও তাঁহাদের স্ববুদ্ধিপ্রণোদিত শাস্ত্রাদির সাহায্যে স্ব স্ব মতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন।

ঋগ্বেদের কালে যে সময়ে আমরা স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার দেখিতে পাই, সে সময়েও স্ত্রীলোককে পুরুষ হইতে হীন করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে ঋষিকৃত ঋকেও আমরা দেখিতে পাই যে স্ত্রীলোকগণের স্বভাব নাকি "হিংস্র বৃকের তুল্য" ("সালাবৃকাণাং হৃদয়াণ্যেতা" ঋং ১০। ৯৫। ১৫); তাঁহাদের হৃদয় স্নেহ ও প্রেমবর্জ্জিত ("ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি") এবং তাঁহাদের মন শাসনের অযোগ্য ("স্ত্রিয়া অশাস্যং মনঃ" ঋং ৮। ৩৩। ১৭)। ঋগ্বেদে স্ত্রীঋষি কর্ত্তৃক রচিত (অর্থাৎ 'দৃষ্ট' —'ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ') কতকগুলি ঋক্ আমরা দেখিতে পাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহাদের রচিত ঋকে কোনস্থানেই তো পুরুষের নিন্দা নাই। মানুষ হিসাবে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই কতকগুলি দোষ ও গুণ বর্ত্তমান আছে যাহা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই সকল দোষ-গুণ-সমন্বয়ে গঠিত মানব যে হঠাৎ শ্রেণীভেদে কেহ কাহারও অপেক্ষা উচ্চতর অথবা নিম্নতর হইতে পারে ইহা বুঝি না। শাস্ত্রকৃৎগণ প্রায় সকলেই পুরুষ ছিলেন, সুতরাং শাস্ত্রসমূহ যে পক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট এ-কথা অস্বীকার করিবার কোনই কারণ নাই। এ-যাবৎ সমাজের বুকে এবংবিধ অন্যায় ও পক্ষপাতিত্ব-দুষ্ট শাস্ত্রের নীতি অবলম্বন করিয়া নারীগণের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে। বরাহমিহিরই

একমাত্র ঋষি—যিনি অতি নির্ভীকভাবে ও স্পষ্ট ভাষায় এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত বৃহৎ-সংহিতায় পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন—

প্রকৃত সত্যং কতরোঽঙ্গনানাং দোষোঽস্তি যো নাচরিতো মনুষ্যৈঃ

অর্থাৎ, যথার্থ বল দেখি, স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইয়ের মধ্যে অঙ্গনাগণের এমন কি দোষ আছে যাহা পুরুষ কর্তৃক আচরিত হয় নাই?

পুরুষের যে সকল গুণ রহিয়াছে স্ত্রীগণের তদপেক্ষা অধিক গুণাবলি বিদ্যমান। স্ত্রীলোকগণ বরাহমিহিরের মতে পুরুষ হইতে অধিক-গুণ-সম্পন্না—"গুণাধিকাস্তাঃ"। তবে কেবলমাত্র পুরুষের ধৃষ্টতা নিমিত্তই স্ত্রীগণকে সকল অধিকারচ্যুত করা হইয়াছে।

ধার্ষ্ট্যেন পুম্ভিঃ প্রমদা নিরস্তা

বরাহমিহিরের হৃদয়ে স্ত্রীজাতির আসন অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি বলেন, ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট সমুদয় পদার্থের মধ্যে সার সৃষ্টি 'নারী'—

শ্রুতং দৃষ্টং নরং স্পৃষ্টং স্মৃতমপি নৃণাং হ্লাদজননং
ন রত্নং স্ত্রীভ্যোঽন্যৎ কচিদপি কৃতং লোকপতিনা।

তিনি স্ত্রীজাতিকে কেবলমাত্র অবলার আসনে আসীনা দেখেন নাই। তিনি যথার্থ স্নেহ, ভক্তি ও ন্যায়ধর্ম্মের দ্বারা স্ত্রীজাতিকে বিচার করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায়-চক্ষুর সম্মুখে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই দোষগুণ বর্ত্তমান। তিনি একদিকে যেরূপ স্ত্রীলোকের আগন্তুক 'চপলতা'র প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত করিয়াছেন, সেইরূপ আবার নারীর প্রকৃতি-সিদ্ধ সরলতার নিকট পুরুষের স্বভাবসুলভ কপটতার অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন। নৈসর্গিক সরলতা হেতু স্ত্রীলোক যেরূপ প্রতি পদে ব্যথা পায় ও অনুপকৃত হয় তাহা বরাহমিহিরের ন্যায় ঋষির জ্ঞান-চক্ষুর অবিষয়ীভূত ছিল না। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোক সংসারে প্রতারিত হইয়াও সুকৃতজ্ঞতাহেতু মৃতপতিকে অঙ্কে গোপিত করিয়া সপ্তজিহ্ব অনলে অবলীলাক্রমে প্রবেশ করিয়া থাকেন।"—

পুরুষশ্চটুলানি কামিনীনাং কুরুতে যানি রহো ন তানি পশ্চাৎ।
সুকৃতজ্ঞতয়াঙ্গনা গতাসূনবগুহ্য প্রবিশন্তি সপ্তজিহ্বম্।

বরাহমিহিরের মতে যাঁহারা স্ত্রীলোকের কেবলমাত্র দোষই দেখিয়া থাকেন তাঁহারা দুর্জ্জন। তাঁহার মতে পুরুষজাতি কৃতঘ্ন। যে স্ত্রীজাতি পুরুষের জননী, জায়া, ভগিনী ও কন্যা রূপে শোকে, দুঃখে ও আনন্দে শান্তি আনয়ন করেন, সেই নারী-জাতির নিন্দা করা কি অকৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা নহে?

তাঁহার মতে 'সংযম' বিষয়েও স্ত্রীলোকের ন্যায় অসাধারণ ক্ষমতা পুরুষের বিন্দুমাত্রও নাই। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মই 'শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম' এবং গৃহেতেই ধর্ম্ম, অর্থ ও সুতসুখ ও বিষয়-সুখ ঘটিয়া থাকে এবং এই গৃহের স্ত্রী-জাতিই লক্ষ্মীস্বরূপা। সুতরাং মানধন পুরুষগণ কর্ত্তৃক সতত তাঁহাদের রক্ষা করাই কর্ত্তব্য কার্য্য।

অন্যান্য ঋষিগণের ন্যায় তিনিও স্ত্রীজাতির 'পবিত্রতা' সম্বন্ধে একমত। স্ত্রীলোক সর্ব্বদা শুচি ও তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র। তাঁহারা কোনকালেও দূষিতা হন না— "নৈতা দুষ্যন্তি···কর্হিচিৎ"। মনু ও অন্যান্য সংহিতাকার এবং বরাহমিহিরের মতে চন্দ্র স্ত্রীজাতিকে 'শৌচ,' গন্ধর্ব্বগণ 'সুনৃত বাক্য' এবং অগ্নি তাঁহাদের 'সর্ব্ব-মেধ্যত্ব' প্রদান করিয়াছেন। এই নিমিত্তই লোকসমাজে তাঁহারা স্বর্ণনির্ম্মিত কণ্ঠাভরণ স্বরূপ।

সোমস্তাসামদাচ্ছৌচং গন্ধর্ব্বাঃ শিক্ষিতাং গিরম্।
অগ্নিশ্চ সর্ব্বমেধ্যত্বং তস্মান্নিষ্কসমাঃ স্ত্রিয়ঃ॥

স্ত্রীজাতির চপলতার কথাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু এই তরলতাকে তিনি নারীর 'আগন্তুক' বা কাদাচিৎক ধর্ম্ম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই তিনি 'অন্তঃপুর চিন্তা' নামক অধ্যায়ে কোন্ নারী অনুরক্তা বা বিরক্তা এই বিষয়ে অগ্রে পরীক্ষা করিয়া লইবার নানাবিধ উপায় বলিয়াছেন। বিদূরথ রাজার মহিষী বেণীমধ্যে অস্ত্র লুক্কায়িত রাখিয়া স্বামীকে নিহত করিয়াছিলেন এবং কাশিরাজের বিরক্তা স্ত্রী বিষ-প্রদিগ্ধ নূপুর দ্বারা পতির বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন—এই সমস্ত ইতিবৃত্তও তাঁহার (বরাহমিহিরের) অবিদিত ছিল না এবং তিনি তাঁহার গ্রন্থমধ্যে তাহার উল্লেখও করিয়াছেন। বরাহমিহির স্ত্রীলোকের শারীরিক সুলক্ষণ-সমূহও বর্ণনা করিয়াছেন। বরাহমিহির পুরুষগণকে সুলক্ষণা পত্নী গ্রহণে আদেশও করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণগণের পাদযুগল পবিত্র, গোজাতির পৃষ্ঠ পবিত্র, কিন্তু স্ত্রীজাতির সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র"—এ-কথা তিনি পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বরাহমিহির বলেন, "নারী পুরুষ অপেক্ষা অনেক গুণেই উচ্চতরা এবং

নারীচরিত্রের দোষকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং সেইজন্য নারী নিজ চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পাত করিয়া থাকেন, কিন্তু পুরুষ নিজ চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিবার কোনই চেষ্টা করেন না এবং নিজ চরিত্রজনিত দোষকে ঘৃণার চক্ষেও দেখেন না।

> দম্পত্যোর্ব্যুৎক্রমে দোষঃ সমঃ শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতঃ।
> নরা ন তমবেক্ষন্তে তেনাত্র বরমঙ্গনাঃ॥

মহাভারতে আমরা নারীজাতির সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। যদিও মহাভারতে দুষ্টা নারী হইতে সাবধান থাকিবার কথা বলা হইয়াছে, তথাপি স্ত্রীজাতিকে সাধারণতঃ স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি ও সম্মান, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত দেখা হইত। নারী হইলেই দুশ্চরিত্রা হইবে, কপটা বা মায়াবিনী হইবে, এরূপ ভাব তখন ছিল না, পক্ষান্তরে ভার্য্যা কন্যা বা ভাগিনীকে স্নেহ ও বিশ্বাসের চক্ষেই দেখা হইত। মহাভারতে এইজন্যই ভার্য্যাকে দুঃখ-রোগের মহৌষধ ও প্রকৃষ্ট বন্ধু বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

> নাস্তি ভার্য্যাসমং কিঞ্চিৎ নরস্যার্ত্তস্য ভেষজম্।
> নাস্তি ভার্য্যাসমো বন্ধুর্নাস্তি ভার্য্যাসমা গতিঃ।
> নাস্তি ভার্য্যাসমো লোকে সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে॥
> (শান্তি, ১৪৪।১৬)

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পৌরাণিক যুগে—অন্ততঃ পুরাণসমূহে নারী মাত্রকেই দুশ্চরিত্রা বলা হইয়াছে। নারী কখনও পবিত্রা নন—সচ্চরিত্রা হইতেই পারেন না—তা সে কুলরমণীই হউক আর অন্য স্ত্রীলোকই হউক—

> নদ্যশ্চ নার্য্যশ্চ সমস্বভাবাঃ
> স্বতন্ত্রভাবে গমনাদিকঞ্চ।
> তোয়ৈশ্চ দোষৈশ্চ নিপাতয়ন্তি
> নদ্যো হি কূলানি কুলানি নার্য্যঃ॥

আবার—

> নদী পাতয়তে কূলং, নারী পাতয়তে কুলম্।
> নারীণাঞ্চ নদীনাঞ্চ স্বচ্ছন্দা ললিতা গতিঃ॥

স্ত্রীলোক নাকি সর্ব্বসময়েই বিষম ও তাহাদের নাকি দান ও সম্মান দ্বারা তুষ্ট করা যায় না, এমন কি সরল ব্যবহার ও সেবা দ্বারাও নাকি বাধ্য করা যায় না—

> ন দানেন ন মানেন নার্জ্জবেন ন সেবয়া।
> ন শাস্ত্রেণ ন শস্ত্রেণ সর্ব্বথা বিষমাঃ স্ত্রিয়ঃ॥

আবার পুরাণান্তরে বলিতেছেন, নারী নাকি নিখিল পাপের উৎস এবং নারী হইতে অধিকতর পাপশীল নাকি আর কেহই নাই।

> ন স্ত্রীভ্যঃ কিঞ্চিদন্যদ্ বৈ পাপীয়স্তরমস্তি বৈ।
> স্ত্রিয়ো মূলং হি পাপানাং তথা ত্বমপি বেত্থ হ॥

নারী নাকি সৎকুলসম্ভবা হইলেও এবং নাথবতী হইলেও সর্ব্বদা মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া থাকেন।

> কুলীনা নাথবত্যশ্চ রূপবত্যশ্চ যোষিতঃ।
> মর্য্যাদাস্থ ন তিষ্ঠন্তি স দোষঃ স্ত্রীষু নারদ!॥

এই নারীজাতি যে পুরুষের সহধর্ম্মিণী হইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মে সহায়ভূতা হন, পুরাণবিশেষ তাহাও অস্বীকার করিতেছেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহর্ষিগণ যাঁহারা ভার্য্যাকে সহধর্ম্মিণী আখ্যা দিয়াছেন (যথা, মহাভারতে "সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে") তাঁহাদিগকেও বিদ্রূপ-বাণে জর্জ্জরিত করিয়াছেন। যথা—"যদিদং 'সহধর্মে'তি পূর্ব্বমুক্তং মহর্ষিভিঃ। সন্দেহঃ সুমহানেষ বিরুদ্ধ ইতি মে গতিঃ।" এই শ্রেণীর পুরাণশাস্ত্রকারগণ কি কখনও কুলস্ত্রীকে পতির জন্য হাস্যমুখে মৃত্যু বরণ করিতে দেখেন নাই অথবা শ্রবণও করেন নাই যে কুলস্ত্রীগণ—

> জীবতি জীবতি নাথে মৃতে মৃতা যা মুদা যুতা মুদিতে।
> সহজ-স্নেহ-সরলা কুলবনিতা কেন তুল্যা স্যাৎ॥

এই শাস্ত্রকারগণের উক্তি যে অযথার্থদোষে দুষ্ট তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এই সমস্ত শাস্ত্রকারকে লক্ষ্য করিয়াই বরাহমিহির বলিয়াছেন—

> অহো ধার্ষ্ট্যমসাধূনাং নিন্দতামনঘাঃ স্ত্রিয়ঃ।
> মুষ্ণতামিব চৌরাণাং তিষ্ঠ চৌরেতি জল্পতাম্॥

অর্থাৎ, চোর যেমন নিজে চুরি করিয়া অপরকে "চোর! চোর!" বলিয়া ধরাইয়া দিতে যায়, ইহাদের প্রচেষ্টাও অনেকটা সেইরূপ।

জননী জায়া ও ভগিনীর জাতিকে পুরুষে যে কি করিয়া এরূপ নিন্দা করেন তাহা সত্যই বুঝিতে পারি না। সত্যই বরাহমিহির পরিস্ফুট ভাবে তথ্যকথা বলিয়াছেন—

> জায়া বা স্যাজ্জনিত্রী বা সম্ভবঃ স্ত্রীকৃতো নৃণাম্।
> হে কৃতঘ্নাস্তয়োর্নিন্দাং কুর্ব্বতাং বঃ কুতঃ শুভম্॥

স্ত্রীলোকের জন্যই ধর্ম্ম অর্থ সমস্ত প্রাপ্য লাভ করিয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বরাহমিহির সেই জন্য বিশদরূপে মনে করাইয়া দিতেছেন—

> ধর্মার্থকামা ... ধ্যানি ... ।
> গৃহে লক্ষ্মী মাতা সত্ত্বসম্মানবিভবৈঃ॥

মনুও বলিয়াছেন—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

বরাহমিহিরের এতাদৃশ যথার্থোক্তি-সকল সত্যই মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ইনিই একমাত্র ঋষি যিনি স্ত্রী-পুরুষকে ন্যায়ের তুলাদণ্ডে স্থাপিত করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়াছেন। এরূপ মনীষীর উদ্দেশে হৃদয় স্বতঃই শ্রদ্ধায় পরিপূরিত হইয়া উঠে। এরূপ মহানুভব ও ন্যায়দর্শী ব্যক্তি সত্যই বিরল। ইনি প্রকৃতই ঋষি। সমস্ত স্ত্রীসমাজ ইঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম পরিচ্ছেদ

৩

পথ হাঁটি, একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা। সন্ধ্যার কিছু আগে একটা বড় পাকুড়গাছের তলায় পথের ধারে-জনকয়েক লোক দেখে সেখানে গেলাম। চার জন পুরুষ মানুষ ও একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্ত্রীলোক—তারা গাছতলায় উনুন জ্বেলে রাঁধবার উদ্যোগ করছে।

এক জন বললে—কোন থেকে আস্ছেন বাবু?

—খাগড়াঘাট থেকে। তোমরা আস্চ কোথা থেকে?

—আমরা আস্তেছি তো বড় দূর থেকে। যাব কেঁদুলীর মেলায়।

এক জন তামাক সেজে নিয়ে এসে বললে—তামাক ইচ্ছে করুন বাবু। ও ঝুড়ন, বাবুকে বসবার কিছু দে—

—আমি তামাক খাই নে, তোমরা খাও। তোমরা দেশ থেকে বেরিয়েচ কতদিন?

ঝুড়ন বৈরাগী এগিয়ে এসে সঙ্গীর হাত থেকে হুঁকোটা নিলে। বললে—বাবু বড় কষ্ট, আর পূন্নিমেতে বাড়ির বার হওয়া হয়েছে। রাস্তায় কি অনাবিষ্টি, কি অনাবিষ্টি! তিন দিন ধরে আর থামে না, জিনিষপত্তর ভিজে একসা, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ক্রোশ এখান থেকে—নওদা চেনেন? সেই নওদার সন্নিকটে আমাদের বাড়ি, হাতীবাঁধা গ্রাম, যশোর জেলা।

গল্পগুজবে আধঘণ্টা কাটলো। ঝুড়ন বললে—দাদাঠাকুরের খাওয়া-দাওয়ার কি হবে? এক কাজ করুন দাদাঠাকুর, আমাদের সঙ্গে সবই আছে, রসুই করুন, আমরা পেরসাদ পাব এখন। ব্রাহ্মণের পাতের অন্ন কতকাল খাই নি। ও কাপাসীর মা, পুকুর থেকে জলডা নিয়ে এস, আর রাত কোরো না।

আমি বিশেষ কোন আপত্তি করলাম না। এদের সঙ্গ আমার বড় ভাল লাগ্ছিল, এই রাত্রে তা ছাড়া যাবই বা কোথায়? রান্না চড়িয়ে দিলাম। কাপাসীর মা আলু বেগুন ছাড়াতে বস্লো। ওদের মধ্যে এক জনের নাম বাবুরাম—সে পুকুরে চাল ধুতে গেল। ঝুড়ন শুকনো কাঠকুটো কুড়িয়ে আন্তে গেল।

পথের ধারে এই দরিদ্র, সরল মানুষগুলির সঙ্গে গাছতলায় রাত্রিযাপন, জীবনের এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। রাতটিও বেশ, কি রকম সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে! নির্জ্জন মাঠে জ্যোৎস্নায় অনেক দূর দেখা যাচ্ছে।

এই জ্যোৎস্নারাতে আমার কেবলই মনে হয় আমি আর সে-সব জিনিষ দেখি নে। কতদিন দেখি নি। যখন চিন্তে শিখি নি, তখন রোগ ভেবে যাকে ভয় করেছি কত, এখন তা হারিয়ে বুঝেছি কি অমূল্য সম্পদ ছিল তা জীবনের। বোধ হয় মাঠের ধারের এই সবুজ দূর্ব্বা ঘাসের শয্যায় শুয়ে চোক বুজে ভাব্লে আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাই—এই সব বিজন মাঠে শেষপ্রহরের জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে মুখ উঁচু ক'রে চেয়ে থাকলে অনন্ত পথের যাত্রীদের

দেখা যায়···ওপর আকাশের জ্যোৎস্নামাখা বায়ুস্তর তাদের গমন পথে পথে দেহগন্ধে সুরভি হয়—পরের দুঃখে কোনো দয়ালু আত্মা যে চোখের জল ফেলে, নদী-সমুদ্রে ঝিনুকের মধ্যে পড়লে তা থেকে মুক্তা হয়, জিরাঁওড়ের পদ্মফুলে পড়লে পদ্মমধুর সৃষ্টি করে···আমার নিবে-যাওয়া দৃষ্টি-প্রদীপে আলো জ্বেলে দিতে যদি কেউ পারে তো সে ওরাই পারবে।

সীতার কথা মনে হয়। আচ্ছা, এই রাত্রে এতক্ষণ সে কি করছে? যে-জীবনের মধ্যে সে আছে, সে-জীবনের জন্যে সে তৈরি হয় নি। হয়ত রান্নাঘরে বসে এতক্ষণে এইরকম রাঁধচে, ও অত বই পড়তে ভালবাসে, তাদের ঘরে একখানাও বই নেই, বই পড়া হয়ত সেখানে ঘোর অপরাধ, যেমন ছিল জ্যাঠাইমার কাছে। জীবনের যে-কোন আনন্দভরা অভিজ্ঞতার সময়েই সীতার ব্যর্থ জীবনের কথা আমার না মনে এসে পারে না।

সবাই মিলে খেতে বসলাম। রান্না হ'ল বড়ির ঝোল, আলুভাতে, পটলভাজা। কাপাসীর মা অবিশ্যি দেখিয়ে দিলে। কাল ঠিক এই সময়ে খাগড়াঘাটের পথে বটতলায় চৌধুরী-ঠাকুর ভজন গাইচে। কি খারাপ লোকটা! টাকার দরকার ছিল, আমায় বললে তো আমি দিতামই। চুরি ক'রে কি হ'ল!

জুড়ন বৈরাগী খাওয়া-দাওয়ার পরে গল্প করতে লাগল। বললে—শুনুন দাদাঠাকুর, এই যে কাপাসীর মা দেখ্‌ছেন, এর বাবা অনেক টাকা জমিয়ে মারা গিয়েছিল। খেতো না, শুধু টাকা জমাতো। মরবার সময় ভাইকে বলল, অমুক জায়গায় মাল্‌সায় টাকা পোঁতা আছে, নিয়ে এসে আমায় দেখা। তা এই পান্‌চালার কোণে ভাঙা উনুনের মধ্যি মাল্‌সা পোঁতা ছিল—কেউ জানতো না। মরবার সময় ভাই টাকার মাল্‌সা সাম্‌নে নিয়ে খোলে। টাকা দেখ্‌তি দেখ্‌তি মরে গেল।

—সে টাকা কে পেলে তার পর?

—তারপর বুড়ো তো মরে গেল। তার ভাই রটালে মাল্‌সাশুদ্ধ টাকা সেই রাত্তি গোলমালে চুরি হয়েছে। এমন কি টাকার অভাবে বুড়োর ছেরাদ্দটাও হ'ল না। পেটের ওপর বাণিজ্যি ক'রে টাকা জমিয়ে গেল, নিজের ভোগে ত লাগলোই না—একটিমাত্তর মেয়ে এই কাপাসীর মা, তার ভোগে ত হ'ল না। টাকার মাল্‌সা রাতারাতি কে যে কোথায় সরিয়ে ফেললে—

কাপাসীর মা ঝাঁঝের সঙ্গে ব'লে উঠল—হ্যাগো হ্যা। সরিয়ে ফেল্‌তে এসেছিল পাড়ার লোক। যে নেবার সে নিয়েছে। আমি কি আর কিছু জানি নে না বুঝি নে? ধম্ম আছেন মাথার ওপর—তিনি দেখবেন। ছ-মাসের মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়ে লোকের দোর-দোর ঘুরিচি দুটো ভাতের জন্যি—আমায় যিনি বাপের ধনে—

বাবুরাম বললে—আর শাপমন্যি কোরো না বাপু। তোমার অদেষ্টে থাক্‌ত, পেতে। বাদ দেও ওসব কথা। উনুনে আগুন আছে কিনা দেখো তো, আর একবার কল্‌কেটা ধরাই।

ওদের মধ্যে আর এক জন বললে—ও জুড়নখুড়ো, স্বরূপগঞ্জের বাজারে কাল দুপুরের আগে পৌঁছনো যাবে না?

—দুটোর কম হবে না। ছ'ডী কোশ, তার আগেই খাওয়া-দাওয়া ক'রে নেওয়া যাবে।

বাবুরাম বললে—এবার কেঁদুলির মেলায় লোক যাচ্ছে কই তেমন জুড়নখুড়ো?···সে বছর দেখেছিলে তো? পথে সারারাতই লোক হাঁটতো।

অদ্ভুত লাগছিল এ রাতটি আমার কাছে। এত কথাও মনে এনে দেয়! ঘুম আর আসে না। ভাবছিলাম মানুষ এত অল্পেও সুখী হয়! আর সুখ জিনিবটা কি অনির্দ্দেশ্য রহস্যময় ব্যাপার—এই নির্জ্জন রাত্রে মুক্ত অপরিচিত প্রান্তরের মধ্যে তারাখচিত আকাশের নীচে শুয়ে সবাই সুখের স্বপ্ন দেখ্‌ছে—কিন্তু এক জনের সুখের ধারণার সঙ্গে অন্য আর এক জনের ধারণার কি বিষম পার্থক্য! সকালে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পশ্চিম মুখেই হাঁটি। রাঢ় দেশের বড় বড় মাঠের ওপর দিয়ে পথ। রাঙা বালি, দিগন্তে তালবনের সারি। হয়ত মাঠের মধ্যে প্রাচীন কালের প্রকাণ্ড দীঘি, তালবনে ঘেরা। কি ফাঁকা জায়গা এ-সব! মনে হ'ত যেন সীমাহারা বিস্তৃতিতে ভেলা ভাসিয়ে চলেছি, কোন্ অজ্ঞাত দিগন্তের বনানীর উপকূলে গিয়ে ভিড়বো, কোনখানে অজানা বনভূমি শ্যামায়মান, সেখানে [illegible] অন্ধকার বীথিপথ ঘেরে

অভিসারিকারা চিরদিন পা টিপে টিপে হাটে; বৃন্দাবনের দিন ফুরিয়ে গেল, মহাভারতের যুগ কেটে গেল, যমুনার তটে কেলিকদম্বের ছায়া কালের অন্ধকারে লুকিয়েছে, তবুও ওদেরও যাওয়ার শেষ হবে না, আমারও না।

৪

মাঠের পথের প্রথমটায় কেঁদুলি মেলার লোকজনের সঙ্গে দেখা হ'ত। পরে আর পথে তেমন লোক দেখি নি, এত বড় মাঠের মধ্যে অনেক সময় আমি একাই পথিক। এই ধু ধু সীমাহীন প্রান্তরে সূর্য্যাস্তের কি মূর্ত্তি! আমাদের অঞ্চলে কোনোদিন তা দেখি নি। অন্ধকার হ'লে মাঠের মধ্যেই কতদিন রাত কাটিয়েছি। ছেলেবেলায় চা-বাগানে কাটিয়ে এই শিক্ষা পেয়েছিলাম, রাত্রিতে যে কোথাও আশ্রয় নিতে হবে, একথা মনেই ওঠে না। শীতের দেশ নয়, ঘন হিমারণ্যের হিংস্র শ্বাপদ নেই এখানে—নিতান্ত নিরীহ, নিরাপদ দেশ—এখানে নক্ষত্রভরা মুক্ত আকাশের চাঁদোয়ার তলায় মাটির ওপর যা-হয় একটা কিছু পেতে রাত কাটানোর মত আনন্দ খাট-পালঙ্কে শুয়ে পাই নি।

একদিন এই অবস্থায় একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হ'ল। একটা অপূর্ব্ব নাম-না-জানা অনুভূতির অভিজ্ঞতা। মুখে সে-কথা বলা যায় না, বোঝানো যায় না, শুধু সে-ই বোঝে, যার এ রকম হয়েছে।

সকালে বামুনহাটি ব'লে একটা গ্রামে এক গ্রাম্য হাতুড়ে কবিরাজের অতিথি হয়েছিলুম সেদিন। তাঁর স্ত্রী একটি রণচণ্ডী—যতক্ষণ সেখানে ছিলাম, তার গালবাদ্যের বিরাম ছিল না। আমি গিয়ে সবে বসেছি, তিনি দোরের আড়াল থেকে স্বামীর উদ্দেশে আরম্ভ করলেন—ও অলপ্পেয়ে মিনসে, আমার সঙ্গে তোমার এত শত্রুতা কিসের বল দিকি? রান্নাঘরের রোয়াকে চালা তুলতে তোমায় বলেছে কে? গরমে একে ঘরের মধ্যে টেঁকা যায় না উনুন জ্বললে, যাও বা একটু হাওয়া আসতো, চালা তুললে হাওয়া আসবে তো ও ড্যাক্রা? ওই অগ্নিকুণ্ডুর মধ্যে তোমার জন্যে পিণ্ডি রাঁধবো যেও।

স্ত্রী চলে গেলে কবিরাজ-মশায় বললেন—আর বলেন কেন মশাই, হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল। তবুও তো দাঁতের ব্যাধি—ওই রকম সদাসর্ব্বদা চলছে। আর ঘোর শুচিবাই, দুনিয়ার জিনিষ সব অশুদ্ধ। দিনের মধ্যে সাতবার নাইছে, নিমুনিয়া হয়ে যদি না মরে তবে কি বলেছি। আজ এক বছর ধরে ওই গোয়ালের একপাশে তক্তপোষ পেতে শোয় আলাদা—ঘরের জিনিষ সব অশুদ্ধ যে, সেখানে কি শোয়া যায়? ওরকম ছিল না মশায়, ছেলেটা মরে গিয়ে অবধি ওই রকম—

তারপর যে কথা বলছিলাম। বামুনহাটি থেকে বিকেলে বার হয়ে ক্রোশ-তিনেক যেতে-না-যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে একটা ছোট নদী, রাস্তা থেকে একটু দূরে। নদী এত ছোট যে তাকে আমাদের দেশ হ'লে বলতো খাল। দু-পাড়ে রাঙা কাঁকর বিছানো, ধারে ধারে কাঁটা-ঝোপ আর তালগাছ। সেখানে রাত্রি যাপন করবো ব'লে মাটির ওপর ছোট সতরঞ্চিখানা পেতে তার ওপরে বসলাম। কোনদিকে জনপ্রাণী নেই।

খালের ওপারে একটা তালগাছের মাথায় শুকনো পাতা হাওয়ায় খড় খড় শব্দ করছে—এই অন্ধকার প্রদোষে তালগাছের মাথার ওপরকার আকাশে নিঃসঙ্গ একটি তারা—আমি একবার তারাটির দিকে চাইছি, একবার চারিদিকের নিস্তব্ধ, পাতলা অন্ধকারের দিকে চাইছি। হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা আনন্দ হ'ল। সে আনন্দ এত অদ্ভুত যে বেদনা থেকে তা বেশী পৃথক নয়, সে পুলক চোখে জল এনে দিলে, মনে কেমন একটা অনির্দ্দেশ্য অভাবের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে যেন।

কিছুক্ষণ আগেও যে-জগতে ছিলাম, এ যেন সে-জগৎ নয়।

এ জগৎ যুগযুগের তুচ্ছ জনকোলাহল কত গভীর মাটির স্তরের নীচে চাপা পড়ে যাওয়ার জগৎ। ফুল ফুটে নির্জ্জনে ঝরে পড়ার জগৎ...অজানা কত বন্য প্রান্তরে কত অশ্রুভরা আনন্দতীর্থের জগৎ...কত স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া... কত আশার বাতি নিভিয়ে যাওয়া...

শুধু নির্জ্জন, চূতবীথির, [illegible] মাথার ওপর [illegible] পাড়টানা, সীমাহীন নীল শূন্যে বহুদূরের কোন [illegible], নক্ষত্রের সঙ্গে এ জগৎ এক-শতাব্দীতে [illegible] আনন্দ, আশা, [illegible]

ক্ষমতার বাহাদুরী কোথায় মুছিয়ে নিয়ে ফেলে দেয়, ক্ষীণ দুর্ব্বল হাত প্রিয়কে নির্ম্মম জীবনের গ্রাস থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, না বুঝে হাসে, খুশী হয়, আশার স্বপ্নজাল বোনে···

অন্ধকারে কোন্ খনিগর্ভে চুনাপাথর হয়ে যায় তাদের হাড়...

আবার নবীন বুকে নবীন বুকে নবীন আনন্দ জেগে ওঠে। আবার হাসি, আবার খুশী হওয়া, আবার আশার স্বপ্নজাল বোনা··· অথচ সব সময় তাদের মাথার ওপর দিয়ে অনন্ত কালের প্রবাহ ছুটে চলে, পুরনো পাতা ঝরে পড়ে, নতুন গান পুরোনো হ'য়ে যায়। গ্রহে গ্রহে নক্ষত্রে নক্ষত্রে কত দূরে, অদৃশ্য লোকে, কত অজানা জীব জগতেও এরকম বেদনা, দীনতা দুঃখ। দূরের সে-সব অজানা লোকে ক্ষুদ্র গ্রাম্যনদী দীর্ঘ বনগাছের ছায়ায় বয়ে যায়, তাদের শান্ত বন-বীথির মূলে প্রিয়জনেরা বহুদিন-হারা প্রিয়জনের কথা ভাবে—নদীর স্রোতে শেওলা-দাম-ভাসা জলে অনন্তের স্বপ্ন দেখে···যে অনন্ত তার চার ধার ঘিরে আছে সব সময়, তার নিঃশ্বাসে, তার বুকের অদম্য প্রাণস্রোতে, তার মনের খুশীতে, নাক্ষত্রিক শূন্যপারের মিট্‌মিটে তারার আলোয়। দূরের ওই দিগ্বলয় যেখানে চুপি চুপি পৃথিবীর পানে মুখ নামিয়ে কথা কইছে, শূন্যপথে অদৃশ্য চরণে দেবদেবীরা যেন এই সন্ধ্যায় ওখানে নেমে আসেন। যখন নদীজল শেষরৌদ্রে চিক্ চিক্ করে, কুল কুল অন্ধকার ফিরে আসে, পানকলস শেওলার ফুল কালো জলে সন্ধ্যার ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়—তখনই। আমার মনে সব ওলট-পালট হয়ে গেল, এমন এক দেবতার ছায়া মনে নামে—যেন জ্যাঠামশায়দের শালগ্রামশিলার চেয়ে বড়। আটঘরার বটতলার সেই পাথরের প্রাচীন মূর্ত্তিটার চেয়ে বড়, মহাপুরুষ খ্রীষ্টের চেয়েও বড়—চক্রবালরেখায় দূরের স্বপ্ন রূপে সেই দেবতারই ছায়া, এই বিশাল প্রান্তরে ম্লান সন্ধ্যার রূপে, মাথার ওপর উড়ে-যাওয়া বালিহাঁসের সাঁই সাঁই পাখার ডাকে।···সেই দেবতা আমায় পথ দেখিয়ে দিন। আমি যা হারিয়েছি তা আর চাই নে, আমিতাই আজকার সন্ধ্যার মত আনন্দ, এবং যে নতুন দৃষ্টিতে এই এক মুহূর্ত্তের জন্যে জগতটাকে দেখেছি সে দৃষ্টি হারিয়ে যাবে জানি, সে আনন্দ জীবনে অক্ষয় হয় না জানি—কিন্তু আর একবারও যেন অন্ততঃ তারা আসে আমার জীবনে।

নবম পরিচ্ছেদ

১

পরদিন দুপুরে সন্ধান নিলাম ক্রোশ-চারেক দূরে দ্বারবাসিনী গ্রামে একটি প্রসিদ্ধ আখড়াবাড়ি আছে, সেখানে মাঝে মাঝে ভাল ভাল বৈষ্ণব সাধু আসেন। গাঁয়ের বাইরে আখড়া-বাড়ি, সেখানে থাকবার জায়গাও মেলে।

সন্ধ্যার সামান্য আগে দ্বারবাসিনীর আখড়াবাড়িতে পৌঁছলাম। গ্রামের প্রান্তে একটা পুকুরের ধারে অনেক-গুলো গাছপালা—ছায়াশূন্য, কাঁকরভরা, উষর ধূ ধূ মাঠের মধ্যে এক জায়গায় টলটলে স্বচ্ছ জলে ভরা পুকুর। পুকুর-পাড়ে বকুল, বেল, অশোক, তমাল, নিম গাছের ছায়াভরা, ঘনকুঞ্জে দু-চারটে পাখীর সান্ধ্য কাকলি—মরুর বুকে শ্যামল মরুদ্বীপের মত মনে হ'ল। এ-অঞ্চলে এর নাম লোচনদাসের আখড়া। আমি যেতেই এক জন প্রৌঢ় বৈষ্ণব, গলায় তুলসীর মালা, পরণে মোটা তসরের বহির্ব্বাস, উঠে এসে জিগ্যেস করলে, কোত্থেকে আসা হচ্ছে বাবুর? তার পর তালপাতার ছোট চেটাই পেতে দিলে বসতে, হাত-মুখ ধোয়ার জল নিজেই এনে দিলে। গোলমত উঠোনের চারিধারে রাঙা মাটির দেওয়াল-তোলা ঘর, সব ঘরের দাওয়াতেই দুটি-তিনটি বৈষ্ণব, খুব সম্ভবতঃ আমার মতই পথিক, রাত্রের জন্যে আশ্রয় নিয়েছে।

সন্ধ্যার পরে আমি তালপাতার চেটাইয়ে বসে একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণবের একতারা বাজনা ও গান শুনছি—এমন সময় একটি মেয়ে আমার সামনে উঠোনে এসে জিজ্ঞেস করলে—আপনি রাত্তিরে কি খাবেন?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—আমায় বলচেন?

মেয়েটি শান্ত সুরে বললে—হ্যাঁ। রাত্তিরে কি ভাত খান?

আমি থতমত খেয়ে বললাম—যা হয়, তাতেই খাবো। আপনাদের যাতে সুবিধে।

মেয়েটি বললে—আমাদের সুবিধে নিয়ে না—এখানে

আপনার যা ইচ্ছে হবে খেতে তাই বল্‌বেন। চা খান্‌ কি আপনি?

এ-পর্য্যন্ত কোন জায়গায় এমন কথা শুনি নি, কোন মন্দিরে বা বৈষ্ণবের আখড়াতেই নয়। ডেকে কেউ জিগ্যেস করে নি আমি কি খেতে চাই। বললাম—চা খাওয়া অভ্যেস আছে, তবে সুবিধে না হ'লে—

মেয়েটি আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই চলে গেল এবং মিনিট কুড়ি পরে এক পেয়ালা চা নিয়ে এসে নিঃসঙ্কোচে আমার হাতেই দিলে। বললে—চিনি ঠিক হয়েছে কিনা দেখুন।

আবার তাকে দেখলাম রাত্রে খাবার সময়ে। লম্বা দাওয়ায় সারি দিয়ে সাত-আট জন লোক খেতে বসেছে, মেয়েটি নিজের হাতে সবাইকে পরিবেশন করলে। প্রকাণ্ড বড় ভাতের ডেকচী নিজে দু-হাতে ধরে নিয়ে এসে আমাদের সাম্‌নে রাখলে—তা থেকে থালা ক'রে ভাত নিয়ে সকলকে দিতে লাগল। আমার পাশের লোকটিকে বললে—ও কি শ্যামা কাকা, লাউয়ের ঘণ্ট দিয়ে আর দুটো খান্‌। ওবেলা ত খাওয়াই হয় নি?

সে সসম্ভ্রমে বললে—না দিদিঠাকরুণ, আমাকে বল্‌তে হবে না আপনার। পেটে জায়গা নেই। তেঁতুল মেখে বরং দুটো খাবো—

—হ্যাঁ কাসছেন, তেঁতুল না খেলে চল্‌বে কেন? দুধ দিচ্চি—তারপর আমার সাম্‌নে এসে বললে—আপনার বোধ হয় ওবেলা খাওয়াই হয় নি, আপনাকেও দুধ দিচ্ছি।

এতগুলো লোক খেতে বসেছে, দুধ দেওয়া হ'ল মোটে তিন জনকে—কিন্তু সে ব্যক্তিগত প্রয়োজনবিশেষে এবং তার বিচারকর্ত্রী ওই মেয়েটিই। আমার কৌতুক হ'ল ভারি।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম চমৎকার মেয়েটি ত! দেখতে সুশ্রী বটে, তবে খুব সুন্দরী নয়। কিন্তু আমি এরকম মুখের গড়ন কখনও দেখি নি, প্রথমে সন্ধ্যাবেলায় তাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল একথা। বার-বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়—সে ওর সুন্দর ডাগর চোখ দুটির জন্যে, আর ওর মুখের একটি নির্দ্দিষ্ট ধরণের লাবণ্যময় গড়নের জন্যে, রাত্রে তা আর ভুলতে পারি নি। মেয়েটি কে? নিতান্ত ছেলেমানুষ তো নয়—সারাদেহে যৌবনশ্রী ফুটে উঠেছে পরিপূর্ণ ভাবেই—এখানে ওভাবে থাকে কেন? আখড়ার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? নানা প্রশ্ন মনে উঠে ঘুম আর আসে না।

পরদিন সকালে মেয়েটির সঙ্গে অনেকবার দেখা হ'ল। অতিথিদের কারও অযত্ন অসুবিধে না হয় সেদিকে দেখ্‌লাম ওর বেশ দৃষ্টি আছে। এ-অঞ্চলে চালে কাঁকর ব'লে সে নিজে সকালে কুলো নিয়ে বসে প্রায় আধ মণ চাল ঝাড়লে। বেলা নটার সময় হঠাৎ এসে আমায় বললে—আপনার ময়লা জামা-কাপড় যদি পুঁটুলিতে থাকে ত দিন্‌ কেচে দেবো। আপনার গায়ের জামাটাও ময়লা হয়ে গিয়েছে খুলে দিন্‌। খুব রোদ, দুপুরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

আমি প্রথমটা একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলাম। তার পর দেখলাম সে সকলকেই জিগ্যেস্‌ করছে কারও ময়লা কাপড়-চোপড় কিছু আছে কিনা। এক জন বৃদ্ধ বাউলের গেরুয়া আলখেল্লা ময়লা হয়েছিল ব'লে খুলিয়ে নিয়ে গেল। পরে শুনলাম মেয়েটি ওরকম প্রায়ই করে, আখ্‌ড়াতে ময়লা জামা-কাপড়ে থাকবার যো নেই।

এখানে দিন দুই কাটবার পরে আর একটা জিনিষ আমার বিশেষ ক'রে চোখে পড়ল যে মেয়েটির মধ্যে কোন মিথ্যে সঙ্কোচ নেই। সহজ সিধে ব্যবহার, কি কাজে, কি কথাবার্ত্তায়। সজীব ও দীপ্তিময়ী, যেন সঞ্চারিণী দীপশিখা যদি শ্যামাঙ্গী মেয়েকে দীপশিখার সঙ্গে তুলনা করা যায়। তৃতীয় দিন বিকেলে এসে বললে—পুকুরপাড়ের বাগান দেখেছেন? আসুন দেখিয়ে নিয়ে আসি। এই কথাটা আমার বড় ভাল লাগল—এ পর্য্যন্ত আমি কোন মেয়ে দেখি নি যে বাগান ভালবাসে, দেখাবার জিনিষ ব'লে মনে করে।

ওর সঙ্গে গেলাম। অনেক গাছ আমাকে সে চিনিয়ে দিলে। কাঞ্চন ফুলের গাছ এই প্রথম চিন্‌লাম। এক কোণে একটা বড় তমালগাছের তলায় ইটের একটা তুলসীমঞ্চ ও বেদী দেখিয়ে বললে—বাবা এখানে বসে জপ করতেন।

জিগ্যেস্‌ করলাম—আপনার বাবা এখন কোথায়?

মেয়েটি কেমন যেন একটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার

দিকে চেয়ে বললে—বাবা ত নেই, এই চার বছর হ'ল মারা গিয়েছেন। এই যে পুকুরটা, বাবা কাটিয়েছিলেন, আর ওই বকুলগাছের ওপাশে বিষ্ণুমন্দির তুলছিলেন, শেষ ক'রে যেতে পারেন নি।

এই কথায় সূত্র খুঁজে পেলাম ওর সম্পূর্ণ পরিচয় জিগ্যেস করবার। এ দু-দিন কাউকে ওর সম্বন্ধে কোন কথা বলি নি, পাছে কেউ কিছু মনে করে। কৌতূহলের সঙ্গে বললাম—আপনার বাবার নামেই বুঝি এই আখড়া?

—কি লোচনদাসের আখড়া? তা নয়, আমরা ব্রাহ্মণ, আমার বাবার নাম ছিল কাশীশ্বর মুখুয্যে। লোচনদাস এই আখড়া বসান, কিন্তু মরবার সময়ে বাবার হাতে এর ভার দিয়ে যান। তারপর বাবা আট-ন বছর আখড়া চালান। আখড়ার নামে যত ধানের জমি, সব বাবার। আসুন, বিষ্ণুমন্দির দেখবেন না?

মনে ভাবি বিষ্ণুমন্দির তুচ্ছ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত আমি সঙ্গে যেতে রাজী আছি। পুকুর-পাড়ের একটা বকুলগাছের পাশে একটা আধ-তৈরি ইটের ঘর। মেয়েটি বললে—গাঁথা শেষ হয় নি ত, হঠাৎ বাবা—তাইতে আদ্ধেক হয়ে আছে। কাঁচা গাঁথুনি, আর-বছরের বর্ষায় ওদিকের দেওয়ালের খানিকটা আবার ভেঙে পড়ে গিয়েছে।

বকুলগাছে কি লতা উঠেছে, দেখিয়ে বললাম—বেশ ফুল ফুটেছে ত? কি লতা এটা?

ও বললে—মালতী লতা।

একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে বললে—জানেন? আমার-নাম—

ওর কথার ভঙ্গিতে মনে হ'ল এ এখনও ছেলেমানুষ। বললাম—আপনার নাম মালতীলতা? ও! কাল উদ্ধবদাস বাবাজী রুনি ব'লে ডাকছিলেন আপনাকে, তাই ভাবলাম বোধ হয়—

ও সলজ্জ মুখে বললে—লতা নয়, মালতী।

দু-জনেই আখড়াবাড়ির নাটমন্দিরে ফিরে এলাম। তার পর মালতীকে আর দেখতে পেলাম না, সেই যে সে রান্নাঘরে কি কাজ নিয়ে ঢুকল রাত্তির দশটা পর্য্যন্ত আর সেখান থেকে বেরুল না।

সকালে ঘুম ভেঙে উঠে মনে কেমন এক ধরণের মধুর অনুভূতি। মালতীকে যেন স্বপ্নে দেখেছি—ওর প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থিব অস্তিত্ব যেন নেই। স্বপ্ন ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তার কথা মনে পড়ল, বকুলতলায় তার সঙ্গে দাঁড়িয়েছি, সে হাসিমুখে নিজের নাম বলেছে, তার চোখমুখের সেই সচেতন নারীত্বের সলজ্জতা অথচ বালিকার প্রগল্‌ভ কৌতুকপ্রিয়তা—তার সারা দেহের সুঠাম লাবণ্য, এ-সব যেন অবাস্তব স্বপ্নজগৎ থেকে সংগ্রহ করা স্মৃতি। কিন্তু মনে সে বেদনা অনুভব করলাম না, যা আসে এই কথা ভেবে যে স্বপ্নে যা দেখেচি ওসব মিথ্যে, ছায়া, মায়া—ও আর পাব না, ও ছায়ালোকের রচা স্বর্গ, ওর চন্দ্রালোকিত নির্জ্জন পর্ব্বতশিখরও মিথ্যে, ওর দিব্যাঙ্গনারাও মিথ্যে। মালতী এইখানেই আছে, কাছে কাছেই আছে, তাকে আরও কতবার দেখবো। মালতী আস্‌বে ত?

মালতী সকালে একরাশ তুলো পিঁজতে বসল। বেলা এগারটা পর্য্যন্ত সে আর কোন কাজে গেল না। প্রথম এখানে এসে যে প্রৌঢ় বৈষ্ণবটিকে দেখেছিলাম, তার নাম উদ্ধবদাস—সেই লোকটি মালতীর অভিভাবক, কার্য্যতঃ কিন্তু মালতীর খেয়ালে তাকে চলতে হয়। সেও মালতীর কাছে বসে তুলো পিঁজতে ব্যস্ত আছে, মালতীর কথা ঠেলবার সাধ্য তার নেই।

২

মালতীর ইতিহাস উদ্ধবদাসের মুখে একদিন ইতিমধ্যে শুনলুম। উদ্ধব বাবাজীকে একদিন আখড়ার বাইরের মাঠে নিয়ে গিয়ে কৌশলে ঘুরিয়ে মালতীর কথা জিগ্যেস করতেই ও বললে—ওর বাবা আমার পাঠশালার পোড়ো বন্ধু। ওরা ব্রাহ্মণ, এ-দেশের সমাজে কুলীন। মালতীর ঠাকুরদাদা শ্রীধর মুখুটি বেশ নাম-করা কীর্ত্তন-গাইয়ে ছিলেন। নিজের দল ছিল। দু-পয়সা হাতে করেছিলেনও। একদিন রাত্তিরে বাইরে বেরুচ্ছেন, দরজার চৌকাঠের কাছে বাড়ির বেড়ালটা যেন কিসের সঙ্গে খেলা করছে। ফুটফুট করছে অনন্তচতুর্দ্দশীর রাত, ভাদ্র মাস, যেমন বাইরে পা দিয়েছে অমনি সাপে ছোবল দিয়েছে পায়ে। সাপ ছিল চৌকাঠের বাইরে, আলো-আঁধারিতে দেখে বুড়ো তা টের

পায় নি। ঘরে তখন ছেলের বৌ মালতীর মা, মালতীর বাবা বাড়ি নেই। চেঁচিয়ে বললেন—বৌমা, শীগগির আলো আলো, আমায় এক গাছা দড়ি দাও শীগগির। দড়ি নিয়ে বাঁধন দিয়ে উঠোনে গিয়ে বস্‌লো। বললে—আমায় আর ঘরে যেতে হবে না বৌমা, তলব পড়েছে। লোকজন এল, ঝাড়ানো হ'ল—কিছুতেই কিছু হ'ল না, ভোর রাত্রে মারা গেল।

মালতীর বাবা পৈতৃক কিছু হাতে পেয়ে একটা নবণ-কলায়ের দোকান করলে। তার মত অতিথসেবার বাতিক আমি কখনও কারও দেখি নি। দোকান ত ছাই, বাড়ি হয়ে উঠল একটা মস্ত অতিথশালা। যত লোকই বাড়িতে আসুক, ফিরতো না। একবার রাত দুপুরের সময় পঁচিশ জন সাধু এসে হাজির, গঙ্গাসাগর যাচ্ছে, অনেক দূর থেকে শুনে এসেছে এখানে জায়গা পাবে। দোকানের জিনিষপত্র ভাঙিয়ে পঁচিশমূর্ত্তি সাধুর সেবা হ'ল। সকালে তারা বললে, আমাদের জনপিছু দু-টাকা প্রণামী দাও। অত টাকা নগদ কোথায় পাবে? সাধুরা বললে—না দাও তো অভিসম্পাত দেবো। আমি বললাম—মিতে, অভিসম্পাত দেয় দিক, টাকা দিও না ওদের। ওরা লোক ভাল না। সে বললে—অভিসম্পাতের ভয় করি নে, তবে আমার কাছে চেয়েছে, আমি যেখান থেকে পাই, নিয়ে এসে দেবোই। মালতীর মায়ের নাকের মাকড়ী আর কাঁদি নথ শ্রীমন্তপুরের বাজারে বিক্রী ক'রে টাকা নিয়ে এল। তাতেও কুলোয় না, আমি বাকী সাতটা টাকা দিলাম—তবে সাধুরা বিদেয় হয়।

মালতী তখন ছোট, একদিন হঠাৎ স্ত্রীকে এসে বললে—দ্যাখ আর সংসারে থাকবো না। স্ত্রী বললে—আমায় সঙ্গে নাও। স্ত্রীকে বললে—বাঁশবাগানের ওই হাড়িটা পড়ে আছে, নিয়ে এসে ধুয়ে ওতে ভাত রাঁধো। খেয়ে চলো। নবণ-কলায়ের দোকান বিলিয়ে দিলে। ডোমপাড়া থেকে সবাইকে ডেকে নিয়ে এসে বললে—যার যা খুশী নিয়ে যাও। দশ মিনিটের মধ্যে দোকান সাফ্। সবাই বললে—পাগল হয়ে গিয়েছে। তার পর বৌ আর মেয়ের হাত ধরে কোথায় চলে গেল। বছর দুই পরে এসে ওই মোচন্দদাস বাবাজীর আখড়ায় উঠলো। বাবাজী তখন বুড়ো হয়েছেন, বড় ভালবাসতেন, তিনি বললেন—বাবা, মহাপ্রভু তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমার আখড়ার ভার তোমায় নিতে হবে, আমি আর বেশী দিন নয়। পরের বছর বাবাজী দেহ রাখলেন, ওই পুকুরপাড়ের তমালতলায় তাঁকে সমাজ দেওয়া হ'ল। ক্রমে মালতীর বাবার নাম দেশময় ছড়িয়ে পড়ল।

গোঁসাইজী বল্‌তো সবাই। গোঁসাইজীকে দেবতা ব'লে জান্‌তো এ-দেশের লোক। অমন নির্লোভ, অমন অমায়িক লোক কেউ কখনও দেখে নি। শরীরে অহঙ্কার ব'লে পদার্থ ছিল না। আর অমন মুক্ত মানুষ হয় না—কোন বাঁধন, কোন নিয়ম গণ্ডীর ধার ধারত না। আমাদের বোষ্টমের সমাজেও অনেক আইন-কানুন আছে, মেনে না-চললে সমাজে নিন্দে হয়, বড় বড় মচ্ছবের সময় নেমন্তন্ন পাওয়া যায় না। সে গ্রাহ্যও করতো না, একেবারে আপনভোলা, সদানন্দ, মুক্ত পুরুষ ছিল। দ্বারবাসিনীর কামারদের গাড়ীর কাজ আছে কল্‌কাতায়, একবার তাদের বাড়ি কাঙালীভোজন হচ্ছে, বেশ বড়লোক তারা। কামারদের মেজকর্ত্তা রতন বাবু দাঁড়িয়ে তদারক করছেন—এমন সময় দেখেন গোঁসাইজী কাঙালীদের সারিতে পাতা পেতে বসে খাচ্ছেন। পাছে কেউ টের পায় ব'লে থামের আড়ালে বসেছেন। হৈ হৈ কাণ্ড, বাড়িসুদ্ধ এসে হাতজোড় ক'রে দাঁড়ালো। এ কি কাণ্ড গোঁসাইজী, আমাদের অকল্যাণ হবে যে! লোকটা এত সরল—কোনো লম্বা চওড়া কথা নয়, কোনো উপদেশ নয়, অবাক হয়ে বললে, তাতে দোষ কি? আমি শুনলাম কাঙালীভোজন হবে, ভাল-মন্দ খেতে পাওয়া যাবে, তাই এসেছি, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে জাত মানতো না, সমাজ মানতো না, আপন-পর বুঝ্‌তো না, নিয়ম-কানুনের ধার ধারতো না। কতলোক মন্ত্র নিতে আস্‌তো। বল্‌তো—মন্ত্র কি দেবো? আপনাকে ভাববে সবাইয়ের চাকর, বাস, এই মন্ত্র। মালতীর মা আগেই মারা গিয়েছিল। গোঁসাইজীর নিজের মরণও হ'ল স্ত্রীর মৃত্যুর তিন বছর পরে। একদিন কোথা থেকে বৃষ্টিমাথায় ভিজে আখ্‌ড়ায় এলেন। তার পরদিন সকালে আমায় বললেন—উদ্ধব, কাল আমার বড় ঠাণ্ডা লেগেছে, একটু যেন জ্বর মত হয়েছে। আজ আর ভাত খাব না কি বলো? দু-দিন পরে জ্বর

নিমোনিয়ায় দাঁড়ালো। বুঝ্‌তে পেরেছিলেন নিজে বাঁচবেন না, মেয়েকে মরণের আগের দিন ডেকে ব'লে গেলেন—মালতী মা, তোর বিয়ে দিয়ে যেতে পারলাম না, তা আমার বলা রইল যাকে তোর মন চায়, তাকেই বিয়ে করিস্‌। তিনি তো চলে গেলেন, মালতীকে একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় ফেলে রেখে। হাতে পয়সা রাখতে জানতেন না। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতেন না—সেটা আমি গুণ বলি নে, দোষই বলি—বিশেষ ক'রে অতবড় মেয়ে—আর ওর কেউ নেই ত্রিসংসারে। বাপ নেই, মা নেই, পয়সা নেই, বাড়ি নেই, ঘরবাড়ি এই আখ্‌ড়া। মালতীও যে দেখছেন—ও মেয়েও পাগল, ও বাপের ধারায় গিয়েছে। লোকজনকে খাওয়াচ্ছে, সেবাযত্ন করছে—ওই নিয়েই থাকে। কিছু মানে না, ভয় করে না। অন্য মেয়ে হ'লে এই সব পাড়াগাঁয়ে কত বদনাম রট্‌তো—গোঁসাইজীর মেয়ে ব'লে সবাই মানে, তাই কেউ কিছু বলে না।

৩)

দিন-পনের কেটে গেল।

মালতীর বাবার ইতিহাস শুনে বুঝেছি আমি এখানে ছ-মাস থাকলেও এরা আমায় চলে যেতে বলবে না—বিশেষ ক'রে মালতী তো বল্‌বেই না। কিন্তু আমার পক্ষে থাকাও যেমন অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ছে, চলে যাওয়া তার চেয়েও অসম্ভব যে! মালতীকে নূতন চোখে দেখতে শিখেছি ওর বাবার পরিচয় শুনে পর্য্যন্ত। মালতীর বাবার মত লোকের সন্ধানে কত ঘুরেছি, এতদিন পরে সন্ধান মিলেছে, কিন্তু চাক্ষুষ দেখা হ'ল না। জগতের সকল নিঃস্বার্থ, নির্মৎসর লোক পরস্পরের সগোত্র—তা সে লোক গঙ্গাতীরে নবদ্বীপের আকাশেই প্রথম দিনের আলো দেখুন, কিংবা দেখুন কপিলাবাস্তু বা প্যালেষ্টাইন বা আসিসির ওপরকার ইটালীর ইন্দ্রনীল আকাশের তলে।

মালতী:ক কত কথা বলবার আছে ভাবি, কিন্তু ওর সঙ্গে আর আমার তেমন নির্জ্জনে দেখা হয় না। আমি দেখি মালতীর আশাতেই আমি সারাদিন বসে থাকি—ও কখন আসবে। ও থাকে সারাদিন নিজের কাজে ব্যস্ত—হয়ত দেখলাম ঘর থেকে ও বার হ'ল, ভাবি আমার কাছেই আসছে বুঝি—কিন্তু তা না এসে থালা-হাতে কাকে ভাত দিতে গেল। নয়ত আল্‌নাতে কাপড় টাঙাতে ব্যস্ত আছে। হয়ত একবার থাকতে না পেরে ডেকে বলি—ও মালতী।

মালতী বললে—আসছি।

আমি বসেই আছি, বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। ও এল কই?

দিনগুলো প্রায়ই এই রকম। তা ছাড়া আমার ওপর ওর কোন বিশেষ পক্ষপাত আছে ব'লে আমার মনে হয় না। প্রথম দিনকতক যে সে রকম ধারণা না হয়েছিল এমন নয়। কিন্তু এখন সে ভুল ভেঙেছে। ও সকলকে যেমন যত্ন করে, আমাকেও তেমনি করে।

একদিন ব'সে উদ্ধবদাসের একতারা মেরামত করছি—মালতী দেখতে পেয়ে উঠনের ওকোণ থেকে চঞ্চলপদে এসে সামনে দাঁড়াল। সকৌতুক সুরে বললে—ও! কাকার সেই একতারাটা? আপনি সারাচ্ছেন নাকি? কি জানেন আপনি একতারা সারানোর?

আমি অপ্রতিভ না হয়ে বললাম—জানাজানির কি আছে এতে? খানিকটা তার হাতে এসেছিল—তাই পরিয়ে দিচ্ছি। কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে চোখ তুলে চাইতেই ওর সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল। সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ আমার মনে হ'ল মালতীকে এখানে একা নিঃসহায়, নির্ব্বান্ধব, রিক্ত অবস্থায় ফেলে আমি কোথাও যেতে পারব না। ওর এখানে কে আছে? একপাল অনাত্মীয়, অশিক্ষিত গেঁয়ো বৈষ্ণবের মেলার মধ্যে ওকে ফেলে রেখে যাব কি ক'রে? তারা ওর কেউ নয়। তারা ওকে বুঝবে না। তার চেয়ে আমার মনের দেশে ও আমার অনেক আপন, আমার নিকটতম প্রতিবেশী।

ভাবলাম মালতীকে সব কথা বলি। বলি, মালতী, সংসারে তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই। তুমি সাধু বাপের সতী মেয়ে, তোমার সংসার-বিরাগী আপন-ভোলা বাপের আশীর্ব্বাদ আর শ্যামসুন্দর অনাদিকাল ছায়ার মত তোমাকে ঘিরে রেখেছে জানি, কিন্তু আমিও যে-সন্ধানে বেরিয়েছি, সে-সন্ধান সফল হবে না তুমি যদি পাশে এসে না দাঁড়াও।

কিন্তু তার বদলে বললাম—ভাল কথা মালতী, তোমাকে অনেক দিন থেকে বলব ভাবচি। উদ্ধব বাবাজীকে ব'লে আমায় এখানে একটা পাঠশালা করার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পার? আমার কিছু হয় তা থেকে।

মালতী এসে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসল। ওর মুখের পাশটা দেখা যাচ্ছে, একটা সুকুমার লাবণ্য যেন ওর মুখের চারিপাশে ঘিরে আছে—এক ধরণের সুন্দর মুখ আছে মনে হয় যেন তাদের মুখের চারিপাশে একটা অদৃশ্য সৌন্দর্য্য-জ্যোতির বেষ্টনী রয়েছে, যখন কথা না বলে চুপ ক'রে থাকে, তখন তাদের মুখের এই ভাবটা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে—মালতীর মুখ সেই ধরণের। আমার কথায় ওর মুখচোখ চিন্তাকুল হয়ে উঠল, যেন কি একটা বিষম সমস্যা তার ঘাড়ে আমি চাপিয়ে দিয়েছি। বললে—কিন্তু এখানে যা ভেবে করবেন, তার কিছু হবে না। এখানে মাইনে দেবে না কেউ। এখানে ভদ্রলোক নেই। দ্বারবাসিনীতে কামারেরা আছে, ওদের কলকাতায় গাড়ীর কারখানা, সেইখানেই থাকে। সরকারেরা তিন বছর পরে এসেছিল পুজোর সময় দেশে। তারপর হেসে ছেলেমানুষের মত ঘাড় দুলিয়ে বললে—ধান নিয়ে ছেলে পড়াতে পারবেন? এদেশে মাইনের বদলে ধান দেয়। নাঃ, সে-সব আপনার কাজ নয়। তা আপনি ত এখানে জলে পড়ে নেই? হাতে কিছু নেই, একদিন হবেই। যতদিন না হয়, এখানে থাকুন। আপনাকে এ অবস্থায় কোথাও যেতে দেব না। এখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়, না? সত্যি কথা বলুন।

—সত্যি কথা কি সব সময় বলা যায় মালতী?

—কেন, বলুন না কি কথা বলবেন?

—এখন থাক্, আমার কাজ আছে। শোন, উদ্ধবদাসের একতারাটা এখানে রইল, ব'লো ওকে। তোমার জন্যে সারানো হ'ল না।

মালতী অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললে—কোথায় যাবেন? ভাদুল। বা রে, অদ্ভুত মানুষ কিন্তু আপনি?

বাইরের মাঠে এসে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল আকাশ-বাতাসের রূপ ও রং যেন এই এক মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেছে আমার চোখে। মালতী ও-কথা বললে কেন যে, আপনাকে এ অবস্থায় কোথাও যেতে দিতে পারব না? এই

সেই মাঠ, সেই নীলাকাশ, মাঠের মধ্যে দ্বারবাসিনীর কামারদের কাটানো বড় দীঘিটা, সবই সেই আছে—কিন্তু মালতীর মুখের একটি কথায় সব এত সুন্দর, এত অপরূপ, এত মধুময় হয়ে উঠল কেন?

ঠিক সেই অদ্ভুত রাত্রিটির মত—মাঠের মধ্যে নির্জ্জন নদীর ধারে শুয়ে যেমন হয়েছিল সেদিন। অনুভূতি-হিসেবে দুই-ই এক। কোন প্রভেদ নেই দেখলুম। কোথায় সেই বিরাট দেবতা, আর কোথায় এই মালতী!

তারপর দিন-কতক ধরে মালতীর সঙ্গে কি জানি কেন আমার প্রায়ই দেখা হয় সময়ে-অসময়ে, কারণে-অকারণে ও আমার সামনে যখনই এসে পড়ে কিংবা কাছ দিয়ে যায়, দাঁড়িয়ে দু-টো কথা না ব'লে যায় না। হয়ত অতি তুচ্ছ কথা—বসে আছি, সামনে দিয়ে যাবার সময় ব'লে গেল—বসে আছেন? এ-কথা বলবার কোন প্রয়োজনই নেই—কিন্তু সারাদিনের এই টুক্‌রো টুক্‌রো অকারণ কথা, একটুখানি হাসি, কৃত্রিম শ্লেষ, কখন-বা শুধু চাহনি—এর মধ্যে দিয়ে ওর কাছে আমি অনেকটা এগিয়ে যাই—ও আমার কাছে এগিয়ে আসে। এতে ক'রে বুঝি ও আমার অস্তিত্বকে উপেক্ষা ক'রে চলতে পারে না—ও আমার সঙ্গে কথা ব'লে আনন্দ পায়।

বিকেলে যখন ওর সঙ্গে এক-এক দিন গল্প করি, তখন দেখি ওর মনের চমৎকার একটা সজীবতা আছে। নিজে বেশী কথা বলতে ভালবাসে না—কিন্তু শ্রোতা-হিসাবে সে একেবারে প্রথম শ্রেণীর। যে-কোন বিষয়ে ওর কৌতূহল জাগানো যায়—মনের দিক থেকে সেটা বড় একটা গুণ। এমন ভাবে সকৌতূহলে ডাগর চোখ দুটি তুলে একমনে সে শুনবে—তাতে যে বলছে তার মনে আরও নতুন নতুন কথা জোগায়, ওকে আরও বিস্মিত করবার ইচ্ছে হয়।

মালতী বড় চাপা মেয়ে কিন্তু—এতদিন পরে হঠাৎ সেদিন উদ্ধবের মুখে শুনলাম যে ও বেশ সংস্কৃত জানে। ওর বাবার এক বন্ধু ত্রিগুণাচরণ কাব্যতীর্থ নাকি শেষ বয়সে এই আমকড়ায় ছিলেন, এখানেই মারা যান। তাঁর কেউ ছিল না—মালতীর বাবা তখন বেঁচে—তিনিই এখানে তাঁকে আশ্রয় দেন। ত্রিগুণা-পণ্ডিতেরই কাছে

মালতী তিন-চার বছর সংস্কৃত পড়েছিল। মালতীকে জিগ্যেস করতেই মালতী বললে—এখন আর আমার ওসব চর্চ্চা নেই, ভুলে গিয়েছি। সামান্য একটা ধাতুর রূপও মনে নেই। তবে রঘুর শ্লোক অনেক মুখস্থ আছে, যা যা ভাল লেগেছিল তাই কিছু কিছু মুখস্থ করেছিলাম, সেইগুলো ভুলি নি। তবে সহজ ভাষা যদি হয়, পড়লে মানেটা খানিকটা বুঝতে পারি। সে এমন কিছু হাতী-ঘোড়া নয়। উদ্ধব-জ্যাঠা আবার তাই আপনাকে গিয়েছে বলতে—উদ্ধব-জ্যাঠার যা কাণ্ড!

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে বটে, কিন্তু ও নিজে যেন কিছুই মানে না—এই ভাবের। কখনও কোন পূজা-অর্চ্চনা ওকে করতে দেখি নি, এক ওর বাবার বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখানো ছাড়া। আখড়ায় প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের পূজার জোগাড় করে উদ্ধব নিজে, মালতীকে সেদিকে বড়-একটা ঘেঁসতে দেখি নি। তা ব'লে ওর মন ওর বাপের মত সংস্কারমুক্তও নয়। ছোটখাটো বাচ-বিচার এত মানে যে, আখড়ার লোকে অতিষ্ঠ। সন্ধ্যাবেলা ঝিঙে তুলেছিল ব'লে একটি বাবাজীকে মালতীর কাছে কড়া কথা শুনতে হয়েছিল। ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই বড়-একটা নেই—মুচির ছেলেকেও ঘরের দাওয়ার বসিয়ে খাওয়াচ্ছে, কাওরা পাড়ায় অসুখ হ'লে সাবু ক'রে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে আসতে দেখেছি।

একদিন বিকেলে আখড়ার সামনের মাঠে পাঠশালা করছি, মালতী এসে বললে—দিন আজ ওদের ছুটি। আসুন একটা জিনিষ দেখিয়ে আনি।

আখড়ার পাশে ছোট একটা মাঠ পেরিয়ে একটা রাঙা মাটির টিলা। তার ওপর শালপলাশের বন—টিলার নীচে ঘন বনসিদ্ধির জঙ্গল। টিলার ওপারে পলাশবনের আড়ালে একটি ছোট মন্দির। মালতী বললে—এইদেখাতে আনলাম আপনাকে। নন্দিকেশ্বর শিবের মন্দির—বড় জাগ্রত ঠাকুর—খৃষ্টান মানুষ হ'লেও মাথাটা নোয়ান—দোষ হবে না।

মন্দিরের পূজারী দুখানা বাতাসা দিয়ে আমাদের জল দিলে। সে উড়িয়্যাবাসী ব্রাহ্মণ, উপাধি মহান্তি, বহুকাল এদেশে আছে, বাংলা জানে ভাল। মালতীকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে।

তারপর আমরা তিন জনেই মন্দিরের পশ্চিম দিকের রোয়াকে বসলুম। মালতী বললে—মহান্তি-কাকা, বলুন ত এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার কথাটা এঁকে? ইনি আবার খৃষ্টান কিনা, ওসব মানেন না—

আমি বললুম—আঃ, কেন বাজে বকছ, মালতী? কি মানি না-মানি—মানে প্রত্যেক মানুষের—মালতী আমার কথাটা শেষ করতে দিলে না। বললে—আপনার বক্তৃতা রাখুন। শুনুন, এটা খুব আশ্চর্য্য কথা—বলুন তো মহান্তি-কাকা?

মহান্তি বললে—এইখানে আগে গোয়ালাদের বাথান ছিল, বছর-পঞ্চাশ আগেকার কথা। রোজ তাদের দুধ চুরি যেত। দু-তিনটে গরু সকালে একদম দুধ দিত না। একদিন তারা রাত জেগে রইল। গভীর নিশুতি রাতে দেখে টিলার নীচের ওই বনসিদ্ধির জঙ্গল থেকে কে এক ছোকরা বার হয়ে এসে গরুর বাটে মুখ দিয়ে দুধ খাচ্ছে। যে-সব গরু বাছুর ভিন্ন পানায় না, তারাও বেশ দুধ দিচ্ছে। ছোকরার রূপ দেখে ওরা কি জানি কি বুঝলে, কোন গোলমাল করলে না; ছোকরাও দুধ খেয়ে ওই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পরের দিন সকালে বনে খোঁজ ক'রে দেখে কিছুই না। খুঁজতে খুজতে এক শিবলিঙ্গ পাওয়া গেল। ওই যে শিবলিঙ্গ দেখছেন মন্দিরের মধ্যে। মাঘমাসে মেলা হয়—ভারি জাগ্রত ঠাকুর।

মালতী গর্ব্বের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে—শুনলেন পাদ্রি-মশাই? মানেন না যে বড় কিছু?

আমি বললাম—আমি বেড়াতে বেড়াতে অনেক জায়গায় এরকম দেখেছি। কত গাঁয়ে প্রাচীন বটতলার নুড়ি, ষষ্ঠীদেবী, ওলাবিবি, কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার মূলে এই ধরণের প্রবাদ আছে। লোকে কত দূর থেকে এসে পূজো দেয়, তাদের মধ্যে সত্যিকার ভক্তি দেখেছি। এক পাড়াগাঁয়ের বো'ষ্টমের আখড়ায় একখানা পাথর দেখেছিলাম—যার ওপরে পায়ের চিহ্ন খোদাই করা, আখড়ার অধিকারী পয়সার লোভে যাত্রীদের বলতো ওটা খোদ শ্রীকৃষ্ণের পায়ের দাগ, সে বৃন্দাবন থেকে সংগ্রহ ক'রে এনেছে পাথরখানা। আমি দেখেছি একটি তরুণী কুলবতী পল্লীবধূকে চোখের জলে আকুল হয়ে পাথরটা গঙ্গাজলে ধুয়ে নিজের মাথায়

লম্বা চুল দিয়ে মুছিয়ে দিতে। কি জানি কোথায় পৌছালো ওর প্রণাম? কোন্ ঊর্দ্ধমুল অবাকপথে দেবতা ওর সেবা গ্রহণ করতে সেদিন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বহুপল্লবিত বাহু?

কি অপূর্ব্ব সূর্য্যাস্ত হচ্ছে বিশাল পশ্চিম দিগন্তে! দূরের তালগাছের মাথাগুলো যেন বাঁধাকপির মত ছোট দেখাচ্ছে, গুঁড়িগুলো দেখাচ্ছে যেন সরু সরু নলখাগড়ার ডাঁটা—আর তার ওপরকার নীলাকাশে রঙীন মেঘলোকে পিঙ্গল বর্ণের পাহাড়, সমুদ্র, কোন্ স্বপ্নসাগরের অজানা বেলাভূমি। ...পায়ের নীচের মাটি সারাদিন রোদে পুড়েছে—বাতাসে তারই সুগন্ধ।

মালতী বললে—বিষ্ণুমন্দিরে সাঁজ জ্বলে নি এখনও। প্রদীপ দিইগে চলুন—

সেখানে ওর বাবার মন্দিরে প্রদীপ দেওয়া হয়ে গেল। আমি পুকুরপাড়ের তেঁতুলগাছের মোটা শেকড়ে বসলুম, ও দাঁড়িয়ে রইল। বললাম—আমায় তুমি যে খৃষ্টান খৃষ্টান কর, তুমি আমার কথা কিছু জান না। তার পর ওকে আমার বাল্যজীবন, মিসনরী মেয়েদের কথা, আমাদের দারিদ্র্য, মা, সীতা ও দাদার কথা সব বললাম। বিশেষ ক'রে উল্লেখ করলাম আমার সেই দৃষ্টিশক্তির কথাটা—যা এখন হারিয়েছি। ছেলেবেলার ঘটনা আমার এখন আর তেমন মনে নেই—তবুও বললাম যা মনে ছিল—যেমন চা-বাগানের দু-একটা ঘটনা, বাল্যে পানীর মৃত্যুদিনের ব্যাপার, হীরু রায়ের মৃত্যুর কথা, মেজবাবুর পুত্রসন্তান হওয়া সংক্রান্ত ব্যাপার।

বললাম—যীশুখৃষ্টকে ভক্তি করি ব'লে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছি জীবনে। কিন্তু সে আমার দোষ নয়, ছেলেবেলার শিক্ষা। ওই আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছিলাম। আমি এখনও তাঁর ভক্ত। তুমি তাঁর কথা কিছু জান না—বুদ্ধ চৈতন্য যেমনি মহাপুরুষ, তিনিও তেমনি। মহাপুরুষদের কি জাত আছে মালতী? কর আদায় করতো লেভি, ইহুদী-সমাজে সে ছিল নীচ, পতিত, সমাজের ঘৃণ্য। সবাই তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। যীশু তাকে বললেন—লেভি, তুমি নীচ কে বলে? তুমি ভগবানের সন্তান। লেভি আমাকে খেতে ডেকেছেন। সমাজের যত হেয় লোককে তিনি কোল দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বেশ্যা ছিল, জালজীবী ছিল, কুষ্ঠী ছিল। তাঁকে সবাই বলত পাগল, ধর্ম্মহীন, আচারভ্রষ্ট। তাঁর বাপ, মা, ভাই আপনার জনও তাঁকে বলতো পাগল—তারা জানত না ঈশ্বরকে যে জেনেছে, তার বাইরের আচারের প্রয়োজন নেই। তাঁর ধর্ম্ম সেবার ধর্ম্ম।

তার পর আমি ওকে সেদিনকার অভিজ্ঞতার কথা বললাম। পুকুরের ওপারে দূরবিসর্পিত আকাশের দিকে চোখ রেখে আমার মনে এল যে রাঢ়দেশের এই সীমাহীন রাঙামাটির মাঠের মধ্যে সেদিন আমি অন্য এক দেবতার স্বপ্ন দেখেছি। সে কি বিরাট রূপ! ওই রাঙা গোধূলির মেঘে, বর্ণে, আকাশে তাঁর ছবি। তাঁর আসন সর্ব্বত্র—তালের সারিতে, তমালনিকুঞ্জে, পুকুরে-ফোটা মৃণালদলে, দুঃখে, শোকে, মানুষের মুখের লাবণ্যে, শিশুর হাসিতে—সে এক অদ্ভুত দেবতা। কিন্তু কতটুকুই বা সে অনুভূতি হ'ল! যেমন আসা অমনি মিলিয়ে যাওয়া!...

মালতী, আগেই বলেছি, অদ্ভুত শ্রোতা। সে কি অদ্ভুত মনোযোগের সঙ্গে শুনলে যখন আমি বকে গেলুম। চুপ ক'রে রইল অনেকক্ষণ, যেন কি ভাবছে।

তার পর হঠাৎ বললে—আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা বলি। প্রেম ও সেবার ধর্ম্ম কি শুধু যীশুখৃষ্টের দেওয়া? আমাদের দেশে ওসব বুঝি বলে নি? আমাদের আখড়ায় লোচনদাস বাবাজী ছিলেন, ঠ্যাং-ভাঙা কুকুর পথ থেকে বুকে ক'রে তুলে আনতেন। একবার একটা ষাঁড়ের শিং ভেঙে গিয়েছিল, ঘায়ে পোকা থুক্ থুক্ করছে, গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। লোচন-জ্যাঠা তাকে জোর ক'রে পেড়ে ফেলে ঘা থেকে লম্বা লম্বা পোকা বার ক'রে ফিনাইল দিয়ে দিতেন ন্যাকড়া ক'রে। তাতেই এক মাস পরে ঘা সারলো।

—এ-সব কথা বলবার দরকার করে না, মালতী। আমি তোমাকে বলেছি তো ধর্ম্মের দেশকাল নেই, মহাপুরুষদের জাত নেই। যখন শুনি তোমার বাবা গরিব প্রতিবেশীদের মেয়ের বিয়েতে নিজের বাড়ি থেকে দান-সামগ্রীর বাসন বার ক'রে দিতেন—দিতে দিতে বাসনের পৈতৃক আমলের বড় সিন্দুক খালি ক'রে ফেলেছিলেন—তখনই আমি বুঝেছি ভগবান সব দেশেই অমৃতালোক থেকে তাঁর বাণী প্রচার

করছেন, কোন বিশেষ দেশ বা জাতের ওপর তাঁর পক্ষপাত নেই। মানুষের বুকের মধ্যে বসে তিনি কথা কন, যার কান আছে, সে শুনতে পায়।

ওর বাবার কথায় ওর চোখ জলে ভরে এল। অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। কখন দেখেছি মালতী শুষ্কচোখে ওর বাপের কথা শুন্‌তে পারে না। সন্ধ্যা হয়েছে। উঠ্‌ছি এমন সময় তমালছায়ায় বিষ্ণুমন্দিরের দিকে আর একবার চোখ পড়তেই আমাদের গ্রামের পুকুরপাড়ের বটতলার সেই হাতভাঙা পরিত্যক্ত সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা আমার কেমন ক'রে মনে এল। মনে এল ছেলেবেলায় সীতা আর আমি কত ফুলের মালা গেঁথে মূর্ত্তির গলায় পরিয়েছি—তার পর আর কতদিন সেদিকে যাই নি, কি জানি মূর্ত্তিটার আজকাল কি দশা হয়েছে, সেখানে আছে কি-না? কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম যেন, মালতী কি-একটা কথা বললে তা আমার কানেই গেল না ভাল ক'রে। বারে, পুকুরপাড়ের সে ভাঙা দেবমূর্ত্তির সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক?

বিষ্ণুমন্দির থেকে দু-জনে যখন ফিরেছি, আখড়ায় তখন আরতি আরম্ভ হয়েছে। দিগন্তপ্রসারী মাঠের প্রান্তে গাছপালার অন্তরালবর্ত্তী এই নিভৃত ছোট দেবালয়টির সন্ধ্যারতি প্রতিদিনই আমায় কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাবে অনুপ্রাণিত করত—আজ কিন্তু আমার আনন্দ যেন হাজার গুণে বেড়ে গেল তার ওপর আজ এক জন পথিক বৈষ্ণব জীবগোস্বামীর সংস্কৃত পদাবলী একতারায় অতি সুস্বরে গাইলে—আমার মানসবৃন্দাবনের বংশীবটমূলে কিশোর হরি চিরকাল বাঁশী বাজান, আমার প্রাণের গোষ্ঠে তাঁর ধেনুদল চরে; সেখানে তাঁর খেলাধুলো চলে রাখাল-বালকদের নিয়ে দীর্ঘ সারাদিন, দীর্ঘ সারারাত।

কেন এত আনন্দ আমার মনে এল কে বলবে? আমি যেন অন্য জন্ম গ্রহণ করেছি। ঘুম আর আসে না—সে গভীর রাত্রে তমালশাখার আড়ালে চাঁদ অস্ত গেলে আমি আখড়ার সামনের মাঠে গাছের তলায় এসে বসলুম। আকাশের অন্ধকার দূর করেছে শুধু জ্বলজ্বলে শুক্রতারার আলোয়।

কে জানে হয়ত ওই শুক্রতারার দেশের নদীতীরে, জ্যোৎস্নমাখা বনপ্রান্তরে, উপবনে মৃত্যুহীন, জরাহীন দেবকন্যারা মন্দারবীথির ঘন ছায়ায় প্রণয়ীদের সঙ্গে গোপন মিলনে সারারাত্রি কাটায়...তৃপ্তিহীন অমর প্রেম তাদের চোখের জ্যোৎস্নায় জেগে থাকে, লজ্জাভরা হাসিতে ধরা দেয়। পীত সূর্য্যাস্তের আলোয় করুণ সুর বহু দূরের শূন্য বেয়ে সেখানে ভেসে এসে সান্ধ্য আকাশকে আরও মধুর ক'রে তোলে—কোথা থেকে সে সুর আসে কেউ জানে না...কেউ বলে বহু দূরের কোন নক্ষত্রলোকে এক বিরহী দেবতা বসে বসে এমনি তাঁর বীণা বাজান, সেই সুর ভেসে আসে প্রতি সন্ধ্যায়...ঠিক কেউ বলতে পারে না...কেবল আধ-আলো আধ-ছায়ায় পুষ্পবীথিতে লুকিয়ে বসে সুখী প্রেমিক প্রেমিকা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে...তাদের চোখে অকারণে জল এসে পড়ে...অবাক হয়ে তারা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ আমার সামনে অস্পষ্ট অন্ধকারে এক জন তরুণ যুবক হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়ে বললে—এস আমার সঙ্গে—

তার গেরুয়া উত্তরীয় আমার গায়ে এসে পড়ছে উড়ে। আমি বলি—কোথায় যাব? কে আপনি?

নবীন বৈষ্ণব বললে—আমি জীবগোস্বামী—আমারই পদাবলী তুমি সন্দেবেলা শুনেছ যে। এত শীগ্‌গির ভুলে যাও কেন হে ছোকরা? এস আমি বৃন্দাবনে যাব। শ্রীকৃষ্ণকে আমার পাওয়াই চাই। আমি সংসার ছেড়েছি, সব ছেড়েছি, তাঁর জন্যে দেখছ না পাগলের মত পথে পথে বেড়াচ্ছি

—আপনি ত মারা গিয়েছেন আজ তিন-শো বছরের ওপর। আপনি আবার কোথায়?

—পাগল! কে বললে আমি মরেছি। আর মলেই কি আমার যাওয়া ফুরিয়েছে নাকি? এসো...এসো...আমি সংসার ছেড়েছি, সব ছেড়েছি, তাঁর জন্যে। দেখছ না পাগল হয়ে পথে পথে বেড়াচ্ছি?

এমন ভাবে কথাগুলো সে বললে আমি যেন শিউরে উঠলুম। বললাম—তা তো দেখ্‌তে পাচ্ছি, পাগলের আর বাকী কি? আপনি যান, আমি যীশুখৃষ্টের ভক্ত, আমি বৃন্দাবনে যাব না। তা ছাড়া মালতীকে ছাড়া এক পাও এখান থেকে নড়ছি নে আমি।

তরুণ বাউল হেসে একতারা বাজাতে বাজাতে চলে গেল—পথের মাঝে নাচ্‌তে নাচ্‌তে গাইতে গাইতে যেতে

যেতে দূরের অন্ধকারে মিশিয়ে গেল···অন্ধকারের মধ্যে থেকে তার গলার মিষ্টি সুর তখনও যেন ভেসে আস্‌ছে···

মধু রিপুরূপ মুদারম্

মধু রিপুরূপ মুদারম্

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে শেষ রাতের ঠাণ্ডায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কে জানে—শিশিরে কাপড়-চোপড় ভিজে গিয়েছে। ফরসা হবার আর দেরি নেই। (ক্রমশঃ)

দু-দিন পরে

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

তোমার যাওয়ার পরে
হ'ল দিন দুই।
দুপুরের তাতে
রিম্‌ঝিম্ আকাশে বাতাসে।
চারিদিক চুপ।
গাছগুলি স্তব্ধ যেন নিরোধি' নিশ্বাস।
মাঝে মাঝে ডাকে ঘুঘু,
বাগানে বিবশ বেলি।
কাঠবিড়াল নেমে আসে শিমুলের শাখা হ'তে,
ছোট দুটি পায়ে ভর করি'
উঠিয়া দাঁড়ায়,
সচকিতে চাহি চাহি
মাটি হ'তে কি যে লয় খুঁটে
চ'লে যায় ফিরে আসে,
আবার পালায়।
দূর মাঠে এখানে ওখানে
এলোমেলো
পালে পালে গরু চরে।
তালের ছায়ায়
রাখাল রয়েছে শুয়ে।
দিগন্তের বাঁকা রাঙা পথে
গরুর গাড়ীটি চলে ধীরে।
লক্ষ্যহীন আঁখির সমুখে
জলের ঢেউয়ের মত
ভেসে যায় ছবি।

কোথাও লাগে না ভাল।
এ-ঘরে ও-ঘরে ফিরি—
অবশেষে দেখি
কোনক্ষণে উপনীত
তোমারি সে ছেড়ে-যাওয়া
ছোট কক্ষটিতে!
বেদনা-পাণ্ডুর দৃষ্টি
চিরাভ্যাসে খোঁজে হারাধন।
জানি তুমি চলে গেছ,
তবু থাকি থাকি
ভাবি অতি ব্যগ্র কৌতূহলে—
ঐ যেন এলে ঘরে
আসিতে আসিতে যেন
থেমে ঐ রহিলে দাঁড়ায়ে
দুয়ার গোড়ায়।
আঁচল অসম্বৃত
লুটায়ে পড়িল মেঝে,
তুলি' বাম হাত
কপাটের পাট আছ ধ'রে।
তারই গায়ে মাথা কাৎ করা,
মুখ সমুজ্জ্বল।
হাসির দোলায়
তুলতুলে পুরু রাঙা ঠোঁটে
উথলি' গড়ায়ে পড়ে
চেপেরাখা শঙ্কিত
সকৌতুক পলকের [illegible]।

সুচতুর আঁখি দুটি
চঞ্চলিয়া
শুধায় আঁখিরে মম
"দেখে নি তো কেউ ?—
আর যদি দেখেই-বা,
কি বা আসে যায় !"
খাটের তলার থেকে
শুনি উস্‌খুস্‌।—
চেয়ে দেখি,
ল্যাজ মুড়ে
মুখ গুঁজে
আছে শুয়ে
পোষা তব আদরের মেনি।
জানালার ঋতুলতাগুলি
উঁকি মেরে যায় বারেবারে
বাতাসের দোলে।
তাদের ফুলের গন্ধে
মনে পড়ে,—
বলিব, কি মনে পড়ে ?
—তোমারি সে চুলবাধা।
ঐ যে দেরাজ 'পরে
ল্যাভেণ্ডার আধশিশি,
ক্রীম আছে,
কৌটার ঢাকাটি খোলা।
হাত-আয়না দাঁড়করা একধারে।
আটপৌরে ফিকে নীল শাড়ী,
প্রায়ই যাহা পরিতে অমনি
তা-ও আছে আলনাতে ছাড়া।
খাটে বিছানার গদি।
শিয়রের কাছে
খোঁপার স্খলিত শুষ্ক
মালতীর মালা।
বাজে কাগজের টুকরো
মেঝেতে ছড়ানো,
তার সাথে কপোলের স্বেদ-মোছা
রুমালখানিও।

আর আছে সেই খাতা !—
—গতবার জন্মদিনে
গুঁজে দিয়ে হাতে
বলেছিলে—"কিছু লিখে দাও।"
আজি সে টেবিলে ফেলা
ধুলায় মলিন
তুলে নিয়ে পড়ে দেখি—
লেখা তার প্রথম পাতায়,—
'মনে যে রাখার নয়,
—তাই মনে ক'রে দিতে
রাখিনু স্বাক্ষর।"
সেদিন কি জানি,
আমারই হাতের বাণ
সন্ধানি ফিরিছে শেষে
আমারই ললাট
বিধাতার পরিহাস এতই নির্ম্মম !

তুমি তো ভুলিয়া গেছ
মনে যা লেগেছে বোঝা।
ঘরদোর খাতাপত্র
আসবাব যত—
মূক এরা, এরা জড়—
জানায় নি কোনো প্রতিবাদ,
করেও নি করুণ মিনতি,
অথবা চাহে নি ফিরে
অশেষ ক্ষণিক চাওয়া।
কিন্তু মানুষের প্রাণ !—
সে কেমনে রয় স্থির ?
শাস্তি থাক্,
প্রাণ ছাড়া কোথায় সান্ত্বনা তার
তাও ভাবিলে না,
গেলে চলি !
এতদিন প্রতি ভোরে
পেয়েছি প্রথম দেখা
সকলের আগে !

দেখা ফিরে দিনশেষে—
দিনটি সার্থক হ'ত,
বুঝিতাম,—বেঁচে আছি,
মানিতাম,—ধরণী মধুর :
—অপূর্ব্ব সুন্দর এই মানবজীবন
কামনার ধন বটে !

এমন আমার তুমি
তুমি চলে গেলে !
—তা-ও যদি জানাতে আভাসে
কিছু আগে !

ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালী

অধ্যাপক শ্রীদেবব্রত চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ

গত ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর বিবরণ হইতে জানা যায়, ব্রহ্মদেশে প্রায় চারি লক্ষ বাঙালী অর্থাৎ বঙ্গভাষা-ভাষী লোক আছেন। ঐ বিবরণেরই অপর এক স্থলে দেখান হইয়াছে, যে, সমগ্র ব্রহ্মদেশে ৪৮৬৮২ জন বাঙালী এবং ১৬৩৯১২ জন চট্টগ্রামবাসী আছেন। আবার অন্য এক স্থলে দেওয়া হইয়াছে, সমগ্র ব্রহ্মদেশে প্রায় ১৮০০০ বাঙালী হিন্দু, প্রায় ২৯০০০ বাঙালী মুসলমান, প্রায় ১৫৮০০০ চট্টগ্রামবাসী মুসলমান এবং প্রায় ৪৯০০ চট্টগ্রাম-বাসী হিন্দু আছেন। এই ভাবে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন ভাবে বাঙালী ও চট্টগ্রামবাসী ভেদে বঙ্গদেশের অধিবাসী-দিগের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা খুব সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ মুসলমানদের সংখ্যায় ভুল হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তাহা হইলেও উপরিউক্ত সংখ্যাগুলি হইতে মোটামুটি ইহা বেশ বুঝা যায় যে চারি লক্ষাধিক বাঙালী সুদূর ব্রহ্মদেশে নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। ইহাদের মধ্যে আরাকানেই বাঙালীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। চট্টগ্রাম হইতে স্থলপথেও আরাকান গমন করা কষ্টসাধ্য নহে। তজ্জন্যই প্রধানতঃ চট্টগ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জিলাগুলি হইতে বহু বাঙালী আরাকানে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী এবং অন্যান্য স্থানের ন্যায় তাঁহাদের অনেকেই ঐ স্থানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছেন।

ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে অনেকে ব্রহ্মদেশীয়া নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া স্থায়ী ভাবে ঐ দেশে বাস করিয়া আসিতেছেন। ঐ শ্রেণীর লোক হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের মধ্যেই খুব বেশী। কিন্তু একটি গুরুতর বিষয়ে প্রভেদ বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। মুসলমানেরা বিবাহ করিবার পূর্ব্বে ঐ নারীকে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ধর্ম্মান্তরকরণ ঠিক যথাযথ ভাবে সম্পন্ন না হইলেও, ঐ ব্রহ্মনারীর গর্ভজাত সন্তানেরা সকলেই মুসলমানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, এবং অন্যান্য মুসলমানদের সহিত সামাজিক মিলামিশা এবং বিবাহ প্রভৃতিদ্বারা সম্বন্ধ স্থাপনে কোনও বাধা হয় না। এই ভাবে ব্রহ্মদেশে একটি খুব বড় সঙ্কর জাতির উদ্ভব হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে 'জেরবাদী' নামে যে বর্ণসঙ্কর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা মূলতঃ ভারতীয় এবং প্রধানতঃ বাঙালী মুসলমান এবং ব্রহ্মদেশীয়া নারীর মিলনোৎপন্ন সন্তানগণ দ্বারা গঠিত। এই সকল বাঙালী মুসলমানেরা অনেক সময়ে নিজ নিজ ব্রহ্মদেশীয় পত্নীকে স্বদেশেও লইয়া আসেন। কিন্তু অধিকাংশ ঐ দেশেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছেন।

কিন্তু বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মদেশীয়া নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানগণের ভবিষ্যৎ নানারূপ সমস্যাসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ ধর্ম্মান্তরিত করিয়া ব্রহ্মদেশীয়া বৌদ্ধ নারীকে হিন্দু করিয়া লইবার

কোনও সামাজিক উপায় না থাকাতে, ঐরূপ বাঙালীদের সন্তানগণ প্রায়ই ব্রহ্মদেশীয় লোকদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ফিরিঙ্গি সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। যে-সকল বাঙালী হিন্দু ব্রহ্মদেশীয়া নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া বরাবর তাহাকে পত্নীর মর্য্যাদা প্রদান করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই ইচ্ছা ছিল, যে, তাঁহাদের সন্তানগণ যেন বাঙালী হিন্দু সমাজে স্থান পায়। তজ্জন্য তাঁহারা অনেক সময়ে নিজ নিজ সন্তানদিগকে কলিকাতা, কাশী প্রভৃতি স্থানে রাখিয়া শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, এবং বাঙালীভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের সন্তানেরা প্রায়ই বাঙালী সমাজে আশ্রয় পায় নাই। দুই একটি স্থল ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্রই এই সকল ভদ্রলোকের উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত সন্তানেরা ব্রহ্মদেশীয় নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ দেশের লোকেরই সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থলে এরূপও দেখা গিয়াছে, যে, বাঙালী পিতামাতার সন্তান ব্রহ্মদেশীয় নাম গ্রহণ ও ব্রহ্মদেশীয় আচারব্যবহার অবলম্বন পূর্ব্বক 'বর্ম্মা' বনিয়া গিয়াছেন। নিম্নব্রহ্মের কোন স্থানের এক প্রতিষ্ঠাপন্ন বাঙালী ব্যবহারজীবীর পুত্র 'বর্ম্মা সিবিল সার্ভিস' পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মদেশীয় নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত আছেন।

ব্রহ্মদেশবাসী বাঙালীদের মধ্যে অনেকে পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্মনারীর গর্ভজাত সন্তানদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহ দিবার প্রয়াস পান। কিন্তু দু-একটি স্থল ভিন্ন প্রায়ই এ-বিষয়ে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বাঙালী ভিন্ন অন্য প্রদেশবাসী হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে ব্রহ্মদেশীয় পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি আর্য্য সমাজের পক্ষ হইতে ঐ সকল দম্পতির সন্তানগণের মধ্যে পরস্পর বিবাহ প্রদানের চেষ্টা হইতেছে। আশা করা যায় এতদ্দারা ব্রহ্মদেশবাসী ভারতীয়েরা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

আন্দামান-দ্বীপে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের পশ্চিম ভাগে আরাকানের উপকূলে এবং নিম্নব্রহ্মের কোন কোন স্থানে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাসিত করা হইত। ঐরূপ নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে ঐ স্থানেই পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক স্থায়ী ভাবে ঐ দেশেই বসবাস করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার বাঙালীদের বংশধরগণ অনেকে মৌলমেন, সাণ্ডোয়ে প্রভৃতি স্থানে এখনও বাস করিতেছেন। অনেকে আবার পুরাপুরি বর্ম্মা অথবা ফিরিঙ্গ বনিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে আর এক সম্প্রদায়ের লোক বাস করেন যাঁহারা ঠিক বাংলা দেশের অধিবাসী না হইলেও ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচার ব্যবহারাদির সাদৃশ্য হেতু বাঙালী হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তাঁহারা ব্রহ্মদেশে পৌনা নামে পরিচিত। এই পৌনারা মণিপুরের অধিবাসী এবং বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। ব্রহ্মদেশের সহিত আসাম ও মণিপুরের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্বন্ধ বহুকাল হইতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই পৌনা নামে পরিচিত মণিপুরবাসীরা ব্রহ্ম-রাজসভায় বিশেষ সমাদৃত হইতেন এবং রাজকীয় ব্যাপারে তাঁহাদের বিশেষ প্রভাবও ছিল। মান্দালয় নগরীতে এখনও বহু পৌনা বাস করেন। ব্রহ্মদেশের শেষ স্বাধীন নরপতি থিব'র প্রধান রাজ-জ্যোতিষী এক জন পৌনা ছিলেন। এখনও ব্রহ্মবাসীদের সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মাদিতে পৌনা-দিগকে আহ্বান করা হয় এবং তাঁহাদিগকে পুরোহিতের যোগ্য সমাদর প্রদর্শন করা হয়।

আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে ব্রহ্মদেশে চাকুরীজীবী বাঙালীদের ভবিষ্যৎ খুবই সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। চাকুরী পাওয়া ত দুর্লভ হইয়াছেই, অধিকন্তু ঐ দেশীয় ভাষা এক্ষণে বিদ্যালয়ে অবশ্যশিক্ষণীয় হওয়াতে ব্রহ্মদেশের স্কুলকলেজসমূহে শিক্ষালাভ করা ভারতীয় মাত্রেরই অতি কঠিন হইয়া উঠিতেছে। অনেক স্থলে, অপর কোন বাধা না থাকিলেও শুধু ভারতীয় বলিয়াই বিদ্যালয়াদিতে ছাত্রদিগকে গ্রহণ করা হয় না। এই সকল কারণেই ব্রহ্মদেশবাসী বহুসংখ্যক ভারতবাসীদের অবস্থা দেশ হিতাকাঙ্ক্ষীদিগের গভীর চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে শ্রেয়োবোধ ও আনন্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু—

তোমার "রবিদীপিতা" বইখানিতে আমার গর্ব্ব করবার যথেষ্ট বিষয় আছে—কিন্তু আমার কাছে ওর মূল্য কেবল সে জন্যে নয়। নিজের কবিতার মধ্যে নিজের অন্তরতম যে পরিচয় স্বত উদ্ভাবিত হয়, নানা ভাববৈচিত্র্যের মধ্য থেকে তার ঐক্যটিকে আবিষ্কার করা কবির পক্ষে, এমন কি অধিকাংশ পাঠকের পক্ষেই, অসাধ্য। যে চিত্তদর্পণে নিজের স্বরূপ প্রতিফলিত হ'লে নিজেকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া সম্ভবপর হয়, সেই স্বচ্ছ দর্পণ দুর্লভ। তোমার বইখানি পড়তে পড়তে তোমার উপলব্ধির মধ্যে আমার কবি-প্রকৃতিকে অনুভব ক'রে আনন্দ পেয়েছি। ইতিপূর্ব্বে কোন কোন গ্রন্থে আমার কাব্যের ব্যাখ্যা দেখেছি, কিন্তু সে যেন শরীরতত্ত্বগত দেহের বিশ্লেষণ, তাতে মর্ম্মগত প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তুমি সেই প্রাণ-রহস্য উদ্ঘাটিত করেছ ব'লে মনে করি। তাতে অনেক জায়গায় আমার নিজেকে ভাবতে হয়েছে।

তার একটা দৃষ্টান্ত, যথা, তুমি লিখেছ আমার কাব্যে শ্রেয়োবোধের প্রাধান্য নেই। যদিও তার কোন কোন ব্যতিক্রম পাওয়া যায়, তবু আমার মনে হ'ল মোটের উপরে তোমার কথাটা সত্য। আমার বোধ হয় এ-কথাটা সাধারণতঃ ভারতবর্ষের প্রকৃতি সম্বন্ধে খাটে। য়ুরোপীয় খৃষ্টান ধর্ম্মে ভাল মন্দ পাপ পুণ্য ঘটিত দ্বন্দ্বের সংঘাত সবচেয়ে প্রবলরূপে দেখা যায়। এই জন্যে সে ধর্ম্ম শ্রেয়োবুদ্ধিপ্রধান। ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম আধ্যাত্মিক, সে ধর্ম্ম দ্বন্দ্বাতীত পরিপূর্ণতার জন্য প্রয়াসী। কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণা নিঃসন্দেহ আমার নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সম্ভবত তার আদর্শ য়ুরোপীয় শিক্ষা থেকেই আমার মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। এই আদর্শ দুঃসাধ্য প্রয়াসে আমাকে কঠোর ভাবেই প্রবর্ত্তিত করেছে। কিন্তু আমার কাব্যের মধ্যে আমার চিত্তের যে গূঢ় লক্ষ্য দেখা যায়, সে কর্ত্তব্যসিদ্ধির অভিমুখে নয়। তাতে দেখতে পাই কর্ম্মকে অতিক্রম করে যে অমৃতময় অবকাশ দেবভোগ্য, তারই জন্য আমার যথার্থ উৎকণ্ঠা। এই নৈষ্কর্ম্য অক্রিয় নয়। এর গভীরতার মধ্যে যে-ক্রিয়া আছে তা স্বাভাবিকী, তা সৃষ্টিসংকল্পের সহজ আনন্দে বেগবতী। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এই জন্যই শিশুকাল থেকে আমাকে এমন নিবিড় আনন্দ দিয়েছে। সে আনন্দ ইস্কুল-পালানে ছেলের ছুটির আনন্দ আমার কাব্যে আমার ছুটি, আমার ছবি আঁকাতেও তাই। আমি শান্তিনিকেতনে যে আশ্রম রচনা করতে নামলেম, তার প্রবর্ত্তনা তপোবনের আদর্শে। আনন্দের দ্বারা সৌন্দর্য্যের দ্বারা শিক্ষার সাধনাকে অবকাশের মধ্যে ফলবতী ক'রে তুলব, এই কল্পনার আনন্দই একদা আমাকে এই কাজে আকর্ষণ করেছে—যে-অসীম অবকাশের মধ্যে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারকার নিরন্তর উদ্দাম দীপালি উৎসবের মত প্রকাশ পেয়েছে, যে-অবকাশের মধ্যে ফুল ফুটছে, ফল ফলচে, শস্য উঠচে পেকে, তাদের প্রাণের চেষ্টাকে নেপথ্যগত ক'রে তাদের প্রাণের প্রকাশ বিশ্বের কাছে উৎসৃষ্ট হচ্চে—সেই অন্তর্গূঢ় প্রাণপূর্ণ অবকাশকেই আমার কর্ম্মের মধ্যে কামনা করেছি। এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে জাতীয় অনুষ্ঠান নানা স্বভাবের নানা লোককে নিয়ে সম্পন্ন করতে হয়, সেখানে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" মন্ত্রটি চাপা পড়ে, সেখানে প্রকাশ হ'তে থাকে "স তপস্তপ্ত্বা সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।" অর্থাৎ সেখানে শ্রেয়োবুদ্ধিই দ্বন্দ্বের সমাধানে সর্ব্বদাই উদ্যত হয়ে থাকে। এই নিরন্তর সংগ্রামের মাহাত্ম্যবোধ আমরা য়ুরোপের কাছে পেয়েছি। সুতরাং এই সংগ্রামে নানা ক্ষেত্রেই আমাদের নামতে হয়েছে। তবুও কর্ম্মের মধ্যে তার প্রয়াসটাই যদি প্রধান হয়ে ওঠে তবে আমার মন বলতে থাকে বিপুল ক্ষুধাশালী গরুড় যে জন্মেছিল সে কেবল খাদ্য ও আশ্রয়

খুঁজে বেড়াবার জন্যে নয়, বিষ্ণুকে বহন করবার জন্যেই। গরুড় যখন গৌণ হ'ল তখনই সে সার্থক হ'ল। আমার মধ্যে যে কবি সে কর্ম্মের ঊর্দ্ধে এই দীপ্তিমান দিব্য অবকাশকেই চেয়েছে, পেয়েছে কি না সে-কথা এই চিঠিতে আলোচনা করবার নয়। ভারতবর্ষের দেবতা বাজিয়েছেন বাঁশি, ভারতবর্ষের দেবতা নেচেছেন নাচ, সে-কথা শাস্ত্রে মানেন এমন ধীমান্ বিদ্বানের অভাব নেই। তাঁরা হয়ত ভাবেন না, সেই গানে সেই নাচেই সৃষ্টির কাজ আপিসের কাজ হয়ে ওঠে নি—দেবতারা যে-চাপল্যে কুণ্ঠিত হন নি আমি সেই মনোরঞ্জনী চপলতাকে আমার কর্ম্মঅনুষ্ঠানে আহ্বান করেছি, আমার সৃষ্টিকর্ম্মে আমি বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তার অনুসরণ করতে চেয়েছি। তোমার বইখানি পড়ে এই কথাটি বিশেষ ক'রে আজ আমার মনে হ'ল। আমার অনেক পণ্ডিতবন্ধু এ সমস্তকে শ্রেয় নয় ব'লে থাকেন। কিন্তু আমি কবি, শ্রেয়ের ঊর্দ্ধে তাঁকে মানি আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি।

যাই হোক, তোমার বইখানি এই জন্যই আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছে যেহেতু তোমার কাব্য-আলোচনা কেবল মাত্র বৈশ্লেষিক নয়। তুমি যাকে বলেছ "সাংঘটিক," এ তাই। এতে তুমি সমগ্রভাবে কাব্যের প্রকৃতি নির্ণয় করেছ, এই জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সময় অল্প, শরীর অপটু, তবু চিঠিখানা বড় হয়ে গেল, সে কেবল মনের আবেগে। ইতি

১২ অক্টোবর, ১৯৩৪

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লিখিত।

সুখের কল্পনা

শ্রীরুক্মিণীমোহন কর

একদা ধীবর এক পৌষের নিশিতে,
মৎস্য ধরি ফিরে ঘরে কম্পমান শীতে।
ছেঁড়া কাঁথা গায়ে, বসি আগুনের পাশে,
মনের আবেগে তার প্রিয়ারে জিজ্ঞাসে—
"রাজারাণী বুঝি আজি এ দারুণ শীতে,
উনুনের ধারে বসি থাকে দুইটিতে;
কাঁথা-গায়ে, তাড়ি দিয়ে তাজা মুড়ি খায়।"
প্রিয়া কহে, "কত সুখী তারা তবে, হায়!"

শুধু একটুখানি নুন—

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

বার বার তিনবার।—

এবারও যম উমেশের ঝুঁটি ধরিয়া টানাটানি করিয়া অবশেষে শূন্য মুঠিতেই ফিরিয়া গেল। সে যেন ধস্তাধস্তি করিয়াই রহিয়া গেল।

এক, দুই…

তিন, চার…

এমন করিয়া গণিলে দূর হইতে পরমা নিশ্চিন্তমনে তার দুই পাঁজরের হাড় কয়েকখানা গণিয়া লওয়া যায়—ভুল করিবার কোনও আশঙ্কা থাকে না।

যাহা হউক, ক্রমশঃ সে দুই পায়ে ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু মেরুদণ্ড সোজা করিয়া কোনও কাজ-কর্ম্মে নামিতে পারিল না।

মট্‌কার বাঁধন ছিঁড়িয়া ঘরের চাল দুইখানা একেবারে উপুড় হইয়া চাপিয়া পড়িয়াছে। উঠানের একপাশে ছায়ায় বসিয়া উমেশ ভাবে আর ঝিমায়—যেন পরম বৃদ্ধ একটা খোঁড়া দাঁড়কাক। এত খড় মাঠে লুটপাট হইয়া গেল, সে এক আটিও আনিতে পারিল না। বৈশাখ মাস সন্নিকট, ঝড় উঠিবে, তখন উপায় হইবে কি? ডাগর মেয়ে ও কচি ছেলেটাকে লইয়া দাঁড়াইবে কোথায়?

'বাবা! হীরুটা গেল কোথায়? আর ত ব'সে থাকা যায় না—বেলা শেষ হয়ে এল যে!'

'কি জানি মা, তার কি সে খেয়াল আছে? হয়ত কোনও পুকুরে খোলামকুচি দিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, নয়ত মেঠো বকের পিছু পিছু ফিরছে তাড়া ক'রে—একেবারে পাগল মা, পাগল! ওর জন্য ব'সে ব'সে আর বেলা না ডুবিয়ে তুই খেগে যা!'

"খাব কি!…সকালে সেই যে দুটি খানেক পান্তাভাত মুখে দিতে-না-দিতেই, 'খাবো না, খাবো না, মিছে কথা' ব'লে উঠে নাচতে নাচতে বের হ'ল আর দেখা নেই। কত ডাক্‌লাম, ভাইটি লক্ষ্মী আমার শোনো, শোনো—তা কে আর কার কথা কানে তোলে!"

'তুই কি ব'লছিলি যে অমন ক'রে বেরিয়ে গেল?'

'ব'লেছিলাম, খেয়ে দেখ্—ভাতের সঙ্গে মেখে দিয়েছি।'

'কি, ব্যন্নন্ বুঝি?'

এইবার ঈষৎ নিম্নস্বরে লক্ষ্মী জবাব দিল, 'না বাবা—নুন!'

'নুন!' উমেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। 'কাল মুখুজ্যেদের বাগান থেকে দুখানা নারকেলের ডেগো আন্‌লেও ত পারতিস চেয়ে। তাই পুড়িয়ে নিলেই হ'ত।'

'আমি ত বাবা, গিয়েছিলাম আনতে কিন্তু—'

'দিলে না তারা? তা দেবে কেন? আমাদের যে কিচ্ছু নেই! থাকত জমিটা—মা, পারত বন্ধক রেখে গ্রাস করতে তবে দিত, নিশ্চয় দিত।'

উমেশ আবার নীরব হইল। ভাঙা ঘরের চাল হইতে কতকগুলি পচা ও আল্‌গা খড় বাতাসে উড়িয়া তার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল।

লক্ষ্মী দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে শুধাইল, 'বাবা! এনে দেব বার্লিটুকু—খাবে এখন?' দ্বিধা করিবার কারণ যথেষ্ট আছে। একে উমেশ বার্লি খাইতে নিতান্তই অনিচ্ছুক, আর কত দিনই-বা ভাল লাগে, তাহা ছাড়া আজ আবার ঘরে চিনি—মিছরি ত দূরের কথা সামান্য একটু নুনও বাড়ন্ত। তার পিতা অতখানি বার্লি মিষ্টি কিংবা নুন ছাড়া কি করিয়া শুধু শুধু গলাধঃকরণ করিবে? সেও ত মানুষ—হয়ত সকাল-বেলার মত বলিয়া বসিবে,—ক্ষুধা নাই।

উমেশ মুখ না-তুলিয়াই বলিল, 'এনে দে।' আজ আর কেন জানি আপত্তি করিল না।

লক্ষ্মী চলিয়া গেল এবং একবাটি বার্লি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিল কিছুক্ষণ বাদে। 'এখানে এস, এই

খুঁটিটার কাছে।' লক্ষ্মী দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া বলিল, 'একখানা পিঁড়ি এনে দিচ্ছি' বলিয়া, সে ভাঙা ঘরের জীর্ণ ঘুন-ধরা খুঁটিটা নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

উমেশ উঠিয়া গেল, কিন্তু ঐ থকথকে ঘন বার্লিগুলির প্রতি নজর পড়িতেই তার অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করিয়া বসিল। স্বাদ নাই, গন্ধ নাই—তাহাতে আবার আলুনি! না, না, ইহা সে খাইবে না, খাইতে পারে না। সে নিতান্ত বালকের মতই যেন অভিমানে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

'ও-কি বাবা,—ব'সে থেকো না, খাও।'

'না মা, আমার বড্ড গা-বমি করছে—খাবো না।'

লক্ষ্মী শুধু দেখিতেই বড় হয় নাই, দুঃখ-দৈন্যের সহিত অবিরত সংগ্রাম করিয়া সে এই বয়সেই অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল। সকলই সে বোঝে। পিতার নিকটে আসিয়া তাঁর কপালের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া দিয়া সস্নেহে বলিল, 'ছিঃ বাবা, অমন করে কি? খাও।' তার পর মমতা-মেদুর চাহনি দুইটি রুগ্ন বাপের মুখের উপর তুলিয়া ধরিল।

'কি ক'রে খাই, তুই-ই বল্ না লক্ষ্মী! একটুখানি নুনও যদি না জোটে—' অত্যধিক উত্তেজনায় তার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

উপায়ান্তর না দেখিয়া লক্ষ্মী পিতার মনোভাব লঘু করিবার আশায় ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, 'খাবে আর কি ক'রে—চট্ ক'রে চুমুক্ দিয়ে। তাড়াতাড়ি ভাল হ'য়ে ওঠ, আবার সব জুটবে, সব হবে।'

মেয়ের কথায় উমেশের মনোভাব হাল্কা হইল বটে, কিন্তু বার্লি খাইবার স্পৃহা জন্মিল না মোটেই।

উঠানের উপরের মরা কুলগাছ হইতে কতকগুলি রোদে-পোড়া ক্ষুধার্ত্ত কাক তারস্বরে কা-কা করিয়া উঠিল। পিতা ও কন্যা একসঙ্গে চাহিয়া দেখিল যে, শ্রীমান্ হীরু ঢিল ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে আসিতেছে। সে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, নুন এনেছ?'

'না।'

'তবে আমি খাবো না, চললাম।'

আবার চলিয়া যায় দেখিয়া লক্ষ্মী অগ্রসর হইয়া তার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল।—'কি বোকা ছেলে, কিছুর খপর রাখে না!'

হীরু থতমত খাইয়া ভগ্নীর মুখের উপর সপ্রশ্ন দৃষ্টি স্থাপন করিল।

'আজ জানিস্ তুই, মুখুজ্যে-মশাই খাজনা চাইতে এসে কি ব'লে গেছেন?'

'না ত দিদি?'

'তা জানবে কেন? আজ ওর নামও ক'র্তে নেই?'

'কিসের?'

'কিসের আবার, ওই যে—শুধু কি তাই, খেতেও নেই।'

এইবার হীরু বুঝিল। উমেশ রহিল অবাক্ হইয়া কান পাতিয়া। লক্ষ্মী বলে কি!

হীরু জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন রে দিদি?'

'তুই ত কিছু জান্‌বিও না, বললেও শুন্‌বি না।'

'শুনব দিদি, শুনব বল্।'

'আজ নুন-সাগরের পুজো—তাই আলুনি খেতে হয়, নুনের নাম ক'র্‌লেও দোষ হয়।'

'বা রে! তবে তুই ক'র্‌লি যে?'

'আমি করলাম, আমি, আমি,···আমি ক'র্‌লে দোষ হয় না!' লক্ষ্মীর বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। এইবার বুঝি সব ধরা পড়িয়া যায়!

'দোষ হয় না! কেন রে দিদি?'

'আমি যে মেয়েমানুষ। বেটাছেলেদের ওর নাম ক'র্‌তেও নেই, খেতেও নেই। ওই দেখ্, বাবাও আলুনি খায়।'

'আচ্ছা দিদি আজ আলুনি খেলে কি হয়?'

'খুব পুণ্যি হয়—তার আর নুনের অনাটন হয় না কখ্খনো। বস্তা বস্তা নুন রোজগার করতে পারে, খুব বড়লোক হয়।'

'দুর!'

'হ্যা, হ্যা—দুর না, সত্যি।'

হীরুর যেন প্রত্যয় জন্মিতে চায় না। অবিশ্বাসে পিতার নিকট প্রশ্ন করিল, 'বাবা! সত্যি না কি?'

উমেশও কলের পুতুলের মত জবাব দিল, 'হুঁ'।'

'তবে চল্ চল্ দিদি,—এক্ষুনি আমায় ভাত দিবি। আমি আলুনি খাব, আলুনি খাব রে।' হীরু নৃত্য সুরু করিয়া দিল।

অবোধ মা-মরা ভাইয়ের এ আনন্দে লক্ষ্মীর দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। নিজেকে কেমন জানি অপরাধী বলিয়া বোধ হইল। সে বলিল, 'চল্ দাদা।'

হীরু যাইতে যাইতে হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'দিদি, তবে বাবা যে খেলে না এখনও ?'

হীরু আবার না বেঁকিয়া দাঁড়ায়! ত্রস্তে উমেশ বাটির বাটিটা মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

উমেশ আর আপত্তি করিল না।

আপত্তি করিবার কোনও হেতুই ত নাই।

তার চোখের জলেই ত আলুনি বার্লি চমৎকার লোনা হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আর্থিক জগতে যে দুর্দ্দৈব দেখা দিয়াছে তাহা কাটিবার কোন লক্ষণই বিশেষ দেখা যাইতেছে না। কোথা হইতে কি করিয়া এই বিশ্বব্যাপী অনর্থের সূত্রপাত হইল তাহা কেহই বড় ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না ; কিন্তু অসীম ধৈর্য্যের সহিত আশা করিয়া আছেন, স্বর্গের কিংবা মর্ত্ত্যের অধিপতিরা শীঘ্রই ইহার একটা প্রতিকার করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, মর্ত্ত্যের দেবতারাও হালে পানি পাইতেছেন না, স্বর্গের দেবতাও বিমুখ। বিকল যন্ত্রটাকে লইয়া নানারূপ কারসাজি চলিয়াছে, মাঝে মাঝে যন্ত্রটা একটু নড়িয়া-চড়িয়াও উঠিতেছে, কিন্তু তার প্রাণের স্পন্দন বেশী ক্ষণ স্থায়ী হইতেছে না। মানুষের দুঃখ যখন দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে তখন তাহা লইয়া নিজেদের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেও সাময়িক আত্মবিস্মৃতি ঘটিতে পারে।

রোগের কারণ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত হইলেও একথা ঠিক যে পূর্ব্বকালে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে খাদ্যশস্য ধ্বংস হইয়া যে অভাব-অনটন বা দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইত, ইহা তাহা নহে। প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব হইতে এই সঙ্কটের উদ্ভব হয় নাই। মানুষের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা বা সংগঠনশক্তি যে অপূর্ব্ব শিল্পসম্ভারের জন্মদান করিয়াছে, তাহার অভাব হইতেও এই সমস্যার সৃষ্টি হয় নাই। এ সঙ্কট বস্তুজগতে প্রাচুর্য্যের সঙ্কট—অভাবের সঙ্কট নহে। তবে কি বুঝিতে হইবে সমগ্র পৃথিবীর অভাব আজ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ? মানব মাত্রেরই কোন পার্থিব আকাঙ্ক্ষা আজ আর অপূর্ণ নাই— ভোগ তাহার আজ আকণ্ঠ হইয়াছে ? তাহাও ত সত্য নহে। প্রকৃতির দানে কার্পণ্য ঘটে নাই, মানুষের সৃষ্টি তেমনি অবিরাম চলিয়াছে ইহা যেমন সত্য, সকল রকমে বঞ্চিত নিঃস্বের অসদ্ভাবও পৃথিবীতে কিছু মাত্র ঘটে নাই, ইহাও তেমনই সত্য। বিশ্ব-অধিবাসীর এক পঞ্চমাংশ ভারতীয়দের দিকে তাকাইলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এক জন ইংরেজ পণ্ডিত বলিয়াছেন—"Human demand is illimitable and will be until the last Hottentot lives like a millionaire." "মানুষের চাহিদা অসীম, এবং যতদিন পর্য্যন্ত না শেষ হটেণ্টট ক্রোড়পতির মত চা'লে জীবন যাপন করে, ততদিন অসীম থাকিবে।"

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, মানুষের অভাব পূর্ণ হয় নাই এবং অকস্মাৎ স্বর্গরাজ্যের আবির্ভাব না হইলে, সে অভাব পূরণ হইতে এখনও সম্ভবতঃ বহু যুগের আবশ্যক। অথচ অন্য দিকে পণ্যসম্ভার আজ শিল্পী ও বণিকের [illegible]

ভূতের বোঝা হইয়া চাপিয়া বসিয়াছে—মানুষের ভোগে তাহা আসিতে পারিতেছে না। ভোজ্যও প্রচুর, বুভুক্ষুও সংখ্যাতীত। বুঝিতে পারা যাইতেছে কোন কারণে দুইয়ের যোগসূত্রের বিচ্ছেদেই এই প্রাণান্তকর নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে। যে ব্যবস্থা ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি ও স্বার্থ মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উভয়ের যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহার ভিতরে কোন ছিদ্রপথে আজ ঘুণ ধরিয়াছে।

সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হইতে পারে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু হিসাব লইলে দেখা যাইবে ১৯২৯ সালের পর এই দুর্দ্দিনের সুরু হইতে, পণ্য ও শিল্পের উৎপাদন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। উহাদের মূল্যও অত্যধিক হ্রাস পাইয়াছে: অথচ পৃথিবীর লোকসংখ্যা ও বিবিধ জিনিষের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়াছে ছাড়া হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন পণ্যের আধিক্য হেতু এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, আমাদের এই অনুমান ঠিক নহে বুঝিতে হইবে।

কাঁচা মাল বা তৈরি জিনিষ, কাহারও আজ আর যথেষ্ট চাহিদা নাই, ইহাই হইল বর্ত্তমান দুর্গতির গোড়ার কথা। ইহার মূলে রহিয়াছে, যে-মূল্যে ক্রেতাগণ ক্রয় করিতে সমর্থ এবং যে-মূল্যে বিক্রেতা ক্ষতি স্বীকার না করিয়া বিক্রয় করিতে সমর্থ এই দুই ক্ষমতার তারতম্য। কোন জিনিষের প্রয়োজন থাকা ও বাজারে তাহার চাহিদা থাকা এক জিনিষ নহে। প্রয়োজন বা সখ আমাদের বহু জিনিষেরই আছে, কিন্তু তাই বলিয়া সব প্রয়োজন বা সখ মিটাইবার শক্তি আমাদের সকলের আছে কি? প্রয়োজন তখনই চাহিদায় পরিণত হয় যখন মূল্যদ্বারা প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করিবার শক্তি আমরা অর্জ্জন করি। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জিনিষের চাহিদা নির্ভর করে দুইটি জিনিষের উপর—প্রথমতঃ, তাহার প্রয়োজনীয়তা; দ্বিতীয়তঃ, তাহার মূল্য। মানুষের প্রয়োজন ও পছন্দ সম্বন্ধে কারখানার মালিক যদি ঠিক অনুমান করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পণ্যদ্রব্য লইয়া যেমন গুরুতর অবস্থায় পড়িতে হইবে, অর্থনীতির মারপ্যাঁচে জিনিষের মূল্যহ্রাস ঘটিলেও তাঁহাকে তেমনি বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। অর্থনীতির সহিত মূল্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে এখানে আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাক। অর্থের পরিমাণ বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নানা কারণে কমিতেছে বাড়িতেছে। কোন দেশে চলতি অর্থের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ অর্থসমষ্টির সঙ্কোচন (deflation) ঘটিলে, জোগান ও চাহিদার সাধারণ নিয়মানুযায়ী অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে; অর্থাৎ জিনিষের মূল্য হ্রাস পাইবে। পক্ষান্তরে, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (inflation) হইলে অর্থের মূল্য কমিবে অর্থাৎ জিনিষের মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

অনেকে মনে করেন পণ্যবিনিময়ের বা বেচাকেনার ক্ষেত্রে মুদ্রার আবির্ভাব এবং একাধিপত্য এই গুরুতর সমস্যার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। সেই জন্য এক দল নূতন পন্থী পণ্যের হাট হইতে এই খামখেয়ালি মধ্যবর্ত্তী প্রভুটিকে বাদ দিয়া পণ্যের সহিত পণ্যের সাক্ষাৎ বিনিময় পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়া আদিকালের ব্যবস্থাকে ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। বিভিন্ন দেশের মুদ্রানীতি বর্ত্তমান সমস্যাকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করিতেছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা অন্যান্য কারণগুলির অনুসন্ধান করিতে চাই।

দেহরক্ষা ও প্রাণধারণের উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়টি জিনিষ বাদ দিলে সুখস্বচ্ছন্দতা বা আরামের জন্য আজ মানুষের যে অসংখ্য প্রকার বিলাস-সামগ্রীর প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তির দ্রুত উন্নতির ফলে একই শ্রেণীর জিনিষ নিত্য:নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্রেতাদিগকে বিভ্রান্ত ও বহুবিভক্ত করিয়া তুলিয়াছে মানুষের পছন্দ বা সখের আজ আর অন্ত নাই। হালফ্যাশনরূপে আজ যাহা সাগ্রহে গৃহীত হইতেছে, কাল তাহা পুরাতন ও সেকেলে হিসাবে পরিত্যক্ত হইতেছে। অস্থিরমতি ক্রেতার এই দৌরাত্ম্য বর্ত্তমান যুগের কারখানার মালিকগণের পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে কারিকরের সংখ্যা ছিল বহু ও বিস্তৃত এবং শক্তি ছিল কম। বাজারের অবস্থা বুঝিয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা তাহারা সহজেই সময়োপযোগী করিয়া লইতে পারিত। এক্ষণে এক একটি জিনিষ প্রস্তুতের জন্য

এক একটি বিশাল যৌথকারবারের সৃষ্টি হইয়াছে ; তাহার বিরাট আয়োজন। একই ছাঁদে একই জিনিষ তাহার উদর হইতে বাহির হইতেছে শতে শতে বা সহস্রে সহস্রে। নূতন ফ্যাশন, নূতন গড়ন একটি চলতি জিনিষকে বাতিল করিয়া দিলে, নূতন অবস্থার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়ান এই সব বৃহৎ পাকা ইমারত ও ঢালাই লৌহ-ইস্পাতের পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় সহজসাধ্য হয় না। ব্যবসাক্ষেত্রে এমনি একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহাতে একটা বড় কারখানার অবস্থা কাহিল হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া বহু দূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। বাংলার চাষীর অবস্থা হীন হওয়ায় তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে পারিতেছে না এবং ফলে বিলাতি ও দেশী কাপড়ের কলের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। এখানেই শেষ নহে—কলওয়ালাদের তুলার প্রয়োজন পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় ভারতের ও আমেরিকার তুলার ব্যবসায়ীর অবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বল হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কাপড়ের কলের কারিকর ও মজুরদের অবস্থা হীন হওয়ায় খরচ সম্বন্ধে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে হাত গুটাইতে হইয়াছে। ফলে যে-সব ব্যবসায়ী তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া লাভবান হইতেছিল তাহাদের ব্যবসায় ভাটা পড়িতে সুরু করিল। একমাত্র পাটের মূল্য হ্রাস হইতে যে অবস্থার প্রথম সুরু হইয়াছিল তাহার শেষ পরিণতি কোথায় তাহা বলা কঠিন। এক স্থানের জের আজ সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। কারণ দেশকালের ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়া সারা দুনিয়া আজ এক হাটে মিলিয়াছে। ব্যবসা-জগতে একের অন্যকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া চলিবার উপায় আর নাই।

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটকে অনেকেই ট্রেড সাইকেল (trade cycle)-এরই একটা সাধারণ পর্য্যায় মাত্র মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে ধারণা এতদিনে ঘুচিয়াছে। অবশ্য একথা কেহ অস্বীকার করেন না যে, ব্যবসাজগতেরও একটা ভাগ্যচক্র আছে এবং তাহা পর্য্যায়ক্রমে উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে। উন্নতির পর অবনতি এখানকারও স্বাভাবিক নিয়ম। কোন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি ও অর্থাগম আরম্ভ হইলেই ব্যবসায়িগণ অধিক লাভের আশায় অতিরিক্ত মাল প্রস্তুত করিয়া বাজারে ছাড়িতে সুরু করেন। ফলে মূল্যহ্রাস ও লাভের ঘরে শূন্য পড়িতে থাকে এবং নূতন ব্যবসা-বাণিজ্য পত্তন ও অর্থব্যয়ের সব পথ রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। এইরূপ অবস্থা আসিলে অবিক্রীত মাল যে-কোন মূল্যে ছাড়িয়া দেওয়া ভিন্ন উপায় থাকে না। তখন আবার জিনিষের চাহিদা স্বল্পমূল্যতার দরুন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া ব্যবসাজগতে নূতন প্রাণ সঞ্চারের সৃষ্টি করে। ইহারই নাম ট্রেড সাইকেল। কতকগুলি লোকের দূরদর্শিতার অভাব, উৎপন্ন পণ্যের আধিক্য, ইত্যাদি সাধারণ কারণে মাঝে মাঝে এরূপ অবসাদ ব্যবসা-জগতে আসিয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান অবসাদের গুরুত্ব ও বিস্তৃতি যেমন অননুভূতপূর্ব্ব, ইহার বৈশিষ্ট্যও তেমনই অসাধারণ ; কারণ পণ্যের অভাবনীয়রূপ মূল্যহ্রাস সত্ত্বেও বিশ্বের হাটে মালের চাহিদা তেমন বাড়িতে পারিতেছে না।

অনেকে মনে করেন অর্থনৈতিক ও বিগত যুদ্ধঘটিত কারণ ব্যতিরেকেও কৃষিজাত পণ্যের মূল্য ও কৃষকের অবস্থার অধোগতি অনিবার্য্য ছিল। শিল্পজাত পণ্যের প্রয়োজনীয়তার শেষ নাই সত্য ; কিন্তু কৃষিজাত পণ্য সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য নহে। মানুষের হজমশক্তির একটা সীমা আছে, ভোজনের রকমারি বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক জিনিষের পরিমাণ কমিয়াছে। যানবাহন ও চাষাবাদের জন্য গরু ও ঘোড়ার স্থান মোটর অধিকার করায় গরু ঘোড়ার জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক হইত তাহারও আর প্রয়োজন হইতেছে না। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞানের কল্যাণে ভাল সার ও উন্নত প্রণালীতে চাষ-আবাদ হইয়া প্রতি একরে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব কারণে অনেকে মনে করেন সর্ব্বক্ষেত্রে আজ যে অবসাদ দেখা যাইতেছে তাহার গোড়ায় রহিয়াছে কৃষি ও কৃষকের দুরবস্থা। সেখান হইতেই বর্ত্তমান দুর্গতির সূত্রপাত।

তার উপর বিগত লড়াই চারিদিকে বাধানিষেধের সৃষ্টি করিয়া মাল-সরবরাহের সাধারণ ব্যবস্থাকে একেবারে ওলট-পালট করিয়া দেয়। যুদ্ধে নিরত দেশসমূহ বিভিন্ন দেশে খাদ্যশস্য বা সেই সময়কার প্রয়োজনীয় সকল জিনিষের রপ্তানি

বন্ধ করিয়া দেয়। অন্য দিকে অবরোধ (blookade) নীতিও চলিতে থাকে। রুশিয়ার গম বাহিরে যাইতে না পারায় আমেরিকা তাহার গমের চাষ এই সুযোগে খুব বৃদ্ধি করিয়া ফেলে। যুদ্ধের অবসানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে দেখা যায়, পৃথিবীর প্রয়োজন অপেক্ষা গমের সরবরাহ অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ এবং জাপান লড়াইয়ের সময়ে তাহাদের কাপড়ের কল যথাসাধ্য বাড়াইয়া ফেলিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের বাজার অধিকার করিয়া ফেলিল। লড়াই অন্তে ল্যাঙ্কাশায়ারের কল যখন পুনঃ পুরা দমে চলিতে সুরু করিল তখন সকল কলওয়ালারই হইল ফ্যাসাদ। যুদ্ধের সময় জিনিষের আমদানি বা রপ্তানি কষ্টসাধ্য হওয়ায় প্রত্যেক দেশই নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরি ও সরবরাহের ব্যবস্থা নিজ দেশের মধ্যেই করিয়া লইতে বাধ্য হয়। কাজেই যুদ্ধশেষে আমদানি রপ্তানি পুনরায় আরম্ভ হইলে জিনিষের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইতে থাকে। আয়োজনের সহিত প্রয়োজনের, কৃষির সহিত শিল্পের এই আকস্মিক বৈষম্য বিগত যুদ্ধেরই অপর পরিণাম এবং ব্যবসা-বাণিজ্যকে পঙ্গু করিবার অন্যতম কারণ।

এই ত গেল পণ্যের যোগান ও চাহিদা সম্পর্কীয় সমস্যা—একের অদূরদর্শিতা ও অব্যবস্থা; অপরের খামখেয়ালি। যোগান ও চাহিদার মধ্যে যে জিনিষটি সার পদার্থ, মধ্যস্থ হইয়া যিনি উভয়ের সংযোগ সংঘটন করেন, সেই সকল অনর্থের গোড়া অর্থ সম্বন্ধে এক্ষণে আমরা আর একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব। আমাকে স্থিরচিত্তে কাজ করিতে হইলে আমার পূর্ব্বাহ্নে জানা দরকার, যে-মধ্যস্থ মাপকাঠির সাহায্যে আমার পণ্যের দর নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহার মাপ বা মূল্য ঠিক আছে এবং ভবিষ্যতেও ঠিক থাকিবে। ষোল গিরার মাপে গজ হিসাব করিয়া পাইকারী দরে কলিকাতা হইতে কাপড় কিনিয়া আনিলাম পল্লীর হাটে খুচরা বিক্রয় করিয়া লাভবান হইব। কিন্তু মাল পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে গজের মাপ যদি ষোল গিরার স্থলে বত্রিশ গিরা নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে লাভের ঘরে আমাকে নিশ্চয়ই সর্ষেফুল দেখিতে হয়। যে অর্থকে মধ্যস্থ রাখিয়া আমরা বেচাকেনার কাজ করি, লাভ ক্ষতি নির্ণয় করি, তাহার মূল্যই যদি পরিবর্ত্তনশীল হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বলিতে হয়, "বল্ মা তারা, দাঁড়াই কোথা ?" অর্থ বলিতে আধুনিক যুগে আমরা শুধু রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা বুঝিব না; কারেন্সি নোট, চেক, ড্রাফ্‌ট্, বিল, মায় ধার করিবার মর্য্যাদা (যাহাকে ইংরেজীতে ক্রেডিট বলা হয়) এই সবই আজ অর্থপর্য্যায়ভুক্ত। আমার হাতে টাকা নাই, কিন্তু বাজারে মর্য্যাদা (Credit) আছে। আমি লক্ষ টাকার মাল ধারে ক্রয় করিতে পারি। এখানে অর্থের প্রয়োজন আমি নিজ প্রতিপত্তির দ্বারা মিটাইয়া লইতে সমর্থ হইতেছি। লক্ষ টাকা পুঁজি লইয়া দু-চার লক্ষ টাকার কারবার হরদম্ চলিয়াছে বর্ত্তমান দুনিয়ায়। তাই অর্থশাস্ত্রে ক্রেডিটও আজ টাকার মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। এই ক্রেডিটের পরিমাপ করা চলে না। এই সব কারণে দেশবিশেষের বা দুনিয়ার অর্থের পরিমাণ একেবারেই স্থির রাখিতে পারা যাইতেছে না। শুধু ধাতব মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্ট-প্রচলিত নোট ভিন্ন অর্থের প্রয়োজন অন্য কোন ভাবে মিটাইবার উপায় না থাকিলে এবং বহির্জ্জগতের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যাদি সকলপ্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারিলে, কোন দেশের অর্থের পরিমাণ হয়ত অনেকটা স্থির রাখিতে পারা যাইত। কিন্তু বিশ্বের হাট আজ ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের কাছে তাহার দিবার ও নিবার আহ্বান আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার মূল্য যেমন পাইতেছি তেমনি দিতেছি। এই সব আন্তর্জ্জাতিক লেনাদেনার ভিতর দিয়া দেশের অর্থভাণ্ডার অবিরত বাড়িতেছে কমিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের মূল্যও স্থির থাকিতেছে না। আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। ধরা যাক্, বাজারে পাঁচটি রোহিত মৎস্য আসিয়াছে; এবং সমবেত ক্রেতাদের পকেটে মোট পঁচিশটি টাকা আছে। এ অবস্থায় একটি মাছের দর ৫৲ টাকার বেশী হইবার উপায় নাই। মৎস্য-ব্যবসায়ীকে অগত্যা এই মূল্যেই তাহার মাছ বিক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু ২৫৲ টাকার স্থলে যদি হাটের ক্রেতাদের নিকট ৩০৲ টাকা থাকিত তাহা হইলে ৬৲ টাকা দরেও মাছগুলি বিক্রয় হইতে পারিত। পক্ষান্তরে ক্রেতাদের নিকট ২০৲ টাকার বেশী না থাকিলে বিক্রেতাকে ৪৲ টাকা মূল্যেই মাছগুলি বাধ্য

হইয়া বিক্রয় করিতে হইত। টাকার পরিমাণের উপর জিনিষের দর কি ভাবে নির্ভর করে ইহা হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারিব।

অর্থনীতির মারপ্যাচ ব্যতিরেকেও জিনিষের মূল্য যে হ্রাসবৃদ্ধি পাইতে পারে এখানে সে কথাটাও আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধির সহিত অবশ্য বর্ত্তমান সমস্যার কোনরূপ যোগাযোগ নাই এবং ইহা অন্যায় রকমে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতিও করে না। শিল্পীর চেষ্টা ও বিবেচনার ফলে কোন পণ্য প্রস্তুত করিবার ব্যয় হ্রাস পাইতে পারে; কোন নূতন আবিষ্কারের কল্যাণে শ্রমের লাঘব হইয়াও খরচের সাশ্রয় হইতে পারে। এইরূপ যোগ্যতার দরুন মূল্য-হ্রাস ব্যবসাবাণিজ্যের পক্ষে অনিষ্টকর ত নহেই, বরঞ্চ স্বাস্থ্যকর—কারণ, অর্থের মূল্য বা ক্রয়শক্তির নড়চড় না হইয়া জিনিষের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে স্বাভাবিক নিয়মে তাহার চাহিদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। শিল্পোন্নতির ইহাই সত্যকার পরীক্ষা। এ-ভাবে মূল্য-হ্রাস জিনিষ-বিশেষের ক্ষেত্রেই ঘটিতে পারে—সকল জিনিষের ক্ষেত্রে কখনও একসঙ্গে এভাবে মূল্য-হ্রাস সম্ভবপর নহে। কিন্তু বর্ত্তমান সমস্যার মূলে জিনিষমাত্রেরই অসম্ভব রকমের মূল্য-হ্রাস আমরা দেখিতে পাই। ইহা উল্লিখিত যোগ্যতার স্বাভাবিক পুরস্কার নহে, অর্থনৈতিক কারণের অস্বাভাবিক পরিণাম। ইহার মূলে রহিয়াছে পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কোচন বা Currency deflation। এখানে ইহাও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ভূয়োদর্শিতা ও যোগ্যতা দ্বারা জিনিষের তৈরি-খরচ কমাইয়া কোনই লাভ নাই—যদি মুদ্রা-মূল্য আমরা স্থির রাখিতে না পারি। কারণ মুদ্রা-মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে জিনিষের দর আপনিই চড়িয়া যাইবে এবং কারিকর তাহার যোগ্যতার ন্যায্য পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হইবে।

লড়াইয়ের জীবন-মরণ সমস্যার সময় অর্থের প্রয়োজন হইল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। স্বর্ণমুদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সকলে নিজ নিজ দেশে অত্যধিক পরিমাণে কাগজের নোট চালাইতে সুরু করিলেন। তারপর লক্ষ লক্ষ টাকার কাজকর্ম্ম নিজেদের মধ্যে ধারে চলিতে লাগিল। এইরূপে পৃথিবীর অর্থতহবিলকে অস্বাভাবিকরূপে জোর করিয়া অত্যন্ত ফাঁপাইয়া তোলা হইল। ফলে লড়াইয়ের সময় জিনিষের দর কল্পনাতীত বৃদ্ধি পাইয়া গেল। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে সকল দেশই যখন স্বর্ণমান পুনঃ প্রচলন করিতে উদ্যত হইলেন তখন সকল জিনিষের মূল্যের উপরই হঠাৎ একটা গুরুতর চাপ পড়িল। ঘোর দুর্দ্দিনে যে 'মেকি' মুদ্রা ও মর্য্যাদাকে একপ্রকার জোর করিয়া চালান হইয়াছিল তাহা বাতিল হইয়া গেল এবং মুদ্রাতহবিলের স্ফীতি অকস্মাৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হইল—সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের দরও চারিদিকে একেবারে পড়িয়া গেল। বর্ত্তমান ব্যবসামন্দার মূলে মুদ্রানীতির অদৃশ্য হস্ত যে অনেকখানি দায়ী তৎসম্বন্ধে আর ভুল নাই। নরমেধ-যজ্ঞের উদ্‌যাপন সফল করিবার জন্য যাঁহারা ভুয়া অর্থ সৃষ্টি করিয়া মানুষের অর্থ-লালসাকে অসম্ভব রকম বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন, যুদ্ধের শেষে এক কলমের খোঁচায় তাঁহারা সেই 'মেকি' অর্থের অন্তর্দ্ধান ঘটাইলেন বটে, কিন্তু মানুষের দুরাশাকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। কারিকর, মজুর হইতে সুরু করিয়া উপরওয়ালা সকলেই লড়াইয়ের সময়কার মজুরী দাবি করিতে ছাড়িলেন না; কিন্তু সেই দাবি মিটাইবার জন্য তহবিলে আর তখন অর্থ নাই। জিনিষের তৈরি খরচ কমিতে চাহিল না, অথচ ক্রেতার ক্রয়শক্তি হ্রাস পাইয়া গেল। উভয়ের মধ্যে বৈষম্যের ইহাও অন্যতম প্রধান কারণ।

অর্থশাস্ত্রের সঙ্কোচন বা প্রসারণ নীতির ফলে মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইলে আর্থিক জগতে তাহার অপর কি পরিণাম হইতে পারে তৎসম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে। রামের নিকট আমি যখন টাকা ধার করি তখন টাকার যে মূল্য বা ক্রয়শক্তি ছিল এক্ষণে তাহা যদি কমিয়া অর্দ্ধেক হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে আমার দেনা আপনা হইতে অর্দ্ধেক হ্রাস পাইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। কি প্রকারে, বলিতেছি। ধরা যাক্—আমি যখন টাকা ধার করিয়াছিলাম, তখন এক মণ চালের দর ছিল ৫৲ টাকা। এক্ষণে টাকার ক্রয়শক্তি অর্দ্ধেক হ্রাস পাইয়া সকল জিনিষের মূল্যই দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এক মণ চালের মূল্য ১০৲ টাকা এবং আধ মণ চালের মূল্য ৫৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। যে ৫৲ টাকা ধার করিয়া আমি

এক মণ চাল কিনিয়াছিলাম, সেই ৫৲ টাকা যখন বন্ধুকে আমি ফিরাইয়া দিলাম তখন তিনি তাহা দ্বারা আধ মণের বেশী চাল আর খরিদ করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে তাঁহার অর্দ্ধেক টাকা হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া তাঁহার দেনদারের পকেটে আশ্রয় লইয়াছে। মানুষের টাকার প্রয়োজন টাকার জন্য নহে, তাহার সাহায্যে তাহার অন্য প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। কর্ম্মক্ষেত্রে বা ব্যবসাক্ষেত্রে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক দেনা-পাওনা লইয়া। অপরের নিকট আমার যেমন টাকা প্রাপ্য আছে তেমনই আবার অপরেও আমার নিকট টাকা পাইবে। কিন্তু মুদ্রা-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে এই দেনা-পাওনা স্থির থাকে না এবং নিতান্ত অকারণে একজনের পাওনা বাড়িয়া দেনা কমিয়া যায় কিংবা দেনা বাড়িয়া পাওনা কমিয়া যায়। এইরূপে অর্থ যখন অন্যায় রকমে হাত বদলায় তখন নূতন ধনী নূতন পছন্দ ও নূতন দাবি লইয়া বাজারে উপস্থিত হয় এবং দোকানদার তাহার পুরাতন অভিজ্ঞতা ও আয়োজন লইয়া একেবারে বোকা বনিয়া যায়। ইহাও ব্যবসাজগতে বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ মনে করা যাইতে পারে।

একটি দুর্গতি অপর দুর্গতিকে আহ্বান করিয়া আনে; দেহের একটি অংশ বিকল হইলে তাহার অপর অংশও ধীরে ধীরে আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। জিনিষের কাট্‌তি পড়িয়া গিয়া ব্যবসা-মন্দার সৃষ্টি হইতেই মানুষের মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। দোকানে বা গুদামে মাল পড়িয়া আছে, কিন্তু হাতে অর্থ নাই। কাজেই মহাজন তাহার পাওনার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং ধারে কাজ করিতে কেহই আর ভরসা পাইতেছে না। চারিদিকে কেমন একটা অবিশ্বাস বা অনাস্থা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যাঁহার কিছু টাকা আছে তিনি সে টাকা আর হাতছাড়া করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহাতে নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হইয়া বেকার-সমস্যার গুরুত্ব যেমন বাড়িতেছে, কেনাবেচা আরও কমিয়া গিয়া চলতি ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। অন্য সবকিছুতে আস্থা হারাইয়া লোকে শুধু নগদ টাকা পুঁজি করিতে ব্যস্ত হইয়াছে এবং এই মনোবৃত্তি ব্যক্তিবিশেষকে ছাড়াইয়া প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্টের মধ্যে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়াছে। ফলে প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টই বিদেশে মাল চালান করিয়া নিজ দেশে অর্থাগমের জন্য যেমন এক দিকে ব্যস্ত, অন্য দিকে বিদেশ হইতে মাল আমদানি হইয়া দেশের অর্থ যাহাতে বাহিরে চলিয়া যাইতে না-পারে তাহার জন্যও তেমনই উৎকণ্ঠিত। আপাতদৃষ্টিতে ইহা ভালই মনে হইতে পারে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের যুগে প্রত্যেক দেশই যদি এই পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসাই বা চলিবে কিরূপে? আর যে উদ্দেশ্যে এই পথ অবলম্বন করা তাহাই বা সিদ্ধ হইবে কেমন করিয়া? যেখানে সব সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, সেখানে এ-পথ যে আত্মরক্ষার পথ নহে, এ-পথে পরের যাত্রা ভঙ্গ হইলেও নিজের নাককানও যে আস্ত থাকিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

অপরের ব্যবসা নষ্ট করিয়া নিজের ব্যবসা প্রসারের এই ব্যর্থ চেষ্টা চলে দুই উপায়ে। প্রথমতঃ, বিদেশী জিনিষের উপর উচ্চ শুল্ক বসাইয়া উহার প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা; দ্বিতীয়তঃ, স্বদেশের কারখানাকে অর্থসাহায্য করিয়া অর্থাৎ subsidy দিয়া নিজেদের অক্ষম প্রচেষ্টাকে বিদেশী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা। ফলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক প্রগতি ব্যাহত হইতেছে। উচ্চ শুল্ক-প্রাচীরের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য যদি আজ অচল হইয়া থাকে তবে তাহার জন্য বিধাতাপুরুষকে দোষ দিলে তিনি তাহার জবাব দিবেন না সত্য; কিন্তু এ অবস্থা হইতে মুক্তিও আমাদের মিলিবে না।

বর্ত্তমান অবস্থার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী এবং বিগত লড়াইয়ের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট দুইটি কারণ এখনও আমাদের উল্লেখ করা হয় নাই। তাহা হইতেছে—সমর-ঋণ ও বিজিত দেশসমূহের উপর ক্ষতিপূরণের দাবি। এই দুই দাবি একত্র করিলে এক শত কোটি টাকার উপর প্রতি বৎসরে অধমর্ণদের দেয়। এই টাকাটার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আমেরিকার এবং অবশিষ্ট ফ্রান্সের প্রাপ্য। বিশ্বের হাট হইতে প্রতি বৎসর এতগুলি স্বর্ণমুদ্রা অপহৃত হইয়া দুইটি দেশের অর্থভাণ্ডারে সঞ্চিত হইতে থাকিলে

এবং তজ্জন্য অধমর্ণ দেশসমূহ এতগুলি অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইলে, তাহার পরিণাম ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে কিরূপ ক্ষতিকর হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। এতগুলি টাকা ঋণপরিশোধের জন্য ব্যয় হওয়ার অর্থ ঐ পরিমাণ মূল্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের হানি হওয়া। যাঁহাদের ভাণ্ডারে টাকা যাইতেছে তাঁহারা যদি উহা সঞ্চয় না করিয়া উদার ভাবে ব্যয় করিতেন, তাহা হইলেও এতটা ক্ষতি হইত না। কিন্তু তাঁহারা উহা ব্যয় না করিয়া উহা দ্বারা নিজ নিজ স্বর্ণ-তহবিল স্ফীত করিয়া চলিয়াছেন। নগদ মুদ্রা না লইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা যদি অধমর্ণদিগের নিকট হইতে ঐ মূল্যের প্রয়োজনীয় পণ্য গ্রহণ করিতেও স্বীকৃত হইতেন তাহা হইলেও হতভাগ্য অধমর্ণদের বাঁচিবার উপায় হইত। কিন্তু তাহা ত হইবার উপায় নাই; অধিকন্তু অধমর্ণ ও অন্যান্য দেশ হইতে পণ্যের আমদানি বন্ধ করিবার সব ব্যবস্থাই বিধিমত ঠিক আছে। নিরুপায় হইয়া দেনদার দেশসমূহ দেশের টাকা যথাসম্ভব বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে বিদেশী মালের আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং ঋণপরিশোধের জন্য যে-কোন মূল্যে বিদেশে মাল বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, পুনরায় স্বর্ণমান পরিহার করিয়া নিজ নিজ দেশের মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করতঃ বিদেশে নিজ মাল সস্তায় চালাইবার প্রতিযোগিতা চলিয়াছে।* ফলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য অধিকতর বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, জিনিষের চাহিদা ও মূল্য আরও হ্রাস পাইয়াছে। মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দেনদারের দেনার পরিমাণও আপনা হইতে বাড়িয়া চলিয়াছে। এতগুলি দেশকে পঙ্গু করিয়া শুধু একা সুখী ও লাভবান্ হওয়া বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের যুগে সম্ভবপর নহে। তাই আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশও বড় সুখে নাই।

এই যে নিজ হাতে তৈরি গোলকধাঁধার মধ্যে সভ্যতাভিমানী মানবজাতি চোখে ঠুলিবাঁধা জন্তুবিশেষের মত ঘুরিয়া মরিতেছে, এই অবস্থার প্রতিকার কি? বিচার-বুদ্ধির দ্বারা ইহার একটা মীমাংসা হয়ত তেমন কঠিন নহে; কিন্তু মীমাংসাকে কার্য্যে পরিণত করাই দুরূহ। পরস্পর-সংশ্লিষ্ট এই আন্তর্জ্জাতিক ব্যাধির প্রতিকার করিতে হইলে প্রথমেই উগ্র জাতীয়তাবাদের মূলোচ্ছেদ করা আবশ্যক। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্ষমতা যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার মনুষ্যত্ব, মানবপ্রীতি ও ধর্ম্মভাব সে হারে বৃদ্ধি পায় নাই। মনীষা দ্বারা যে অদ্ভুত সৃষ্টি সে নিজ হাতে গড়িয়া তুলিয়াছে, হৃদয়ের উদারতার অভাবে আজ সে তাহা রক্ষা করিতে পারিতেছে না। সমগ্র মানবজাতিকে সে নিজেই আহ্বান করিয়া একত্র মিলিত করিয়াছিল; আজ এই মিলনকে আবার সে নিজেই ক্ষুদ্র লোভ ও স্বার্থ-বুদ্ধির অধীন হইয়া পণ্ড করিতে বসিয়াছে। মানুষের উন্নতিকে অব্যাহত রাখিয়া ভাল ভাবে বাঁচিতে হইলে আমাদিগকে একসাথে বাঁচিতে হইবে—অন্য জাতির শ্বাস রোধ করিয়া যদি বাঁচিতে চাই তাহা হইলে বিধির অমোঘ বিধান অদ্ভুত উপায়ে তাহার শোধ লইবে এবং আখেরে কাহারও মঙ্গল হইবে না। ভারত-রূপ কামধেনুর বাঁট আজ একেবারে শুষ্ক হইয়া পড়ায় ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সকল দেশেরই ক্ষতি ও চিন্তার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। পণ্য-বিক্রয়ের সুবিধার জন্যই রাজ্য ও রাজত্বের আয়োজন, সেই জন্যই এত রেষারেষি, এত যুদ্ধবিগ্রহ। কিন্তু সেই পণ্য অর্থ-সামর্থ্য না থাকিলে কে কিনিবে? গোটা দুনিয়ার মাল চালাইবার এতবড় হাট এই ভারতবর্ষ। এই হাটে যদি তাহাদের মাল বিক্রয় বন্ধ হয় তবে এ-সব দোকানদারের জাত কি করিয়া বাঁচিবে? যে ব্যবসা-বাণিজ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর "অবারিত দ্বার" (Free Trade) নীতির অনুকূল হাওয়ায় অব্যাহত গতিতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রবেশলাভ করিয়াছিল, আজ তাহাকে অস্পৃশ্য-জ্ঞানে নানা কলকৌশলে বিদূরিত করিতে চাহিলে তাহা রক্ষা পাইবে কিরূপে? আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যকে বাঁচিতে হইলে আন্তর্জ্জাতিক মনোবৃত্তির আবশ্যক—ইউরোপের স্বার্থকলুষিত তীব্র জাতীয়তার হাওয়া তাহার পক্ষে মারাত্মক।

অবশ্য আর একটি পন্থা আছে—বিদেশীর সহিত সমগ্র ব্যবসা-সম্পর্ক তুলিয়া দিয়া আত্মনির্ভর হইয়া বাঁচা। প্রত্যেক দেশের অভাব ও প্রয়োজন নিজ দেশ হইতে মিটাইবার আয়োজন ও ব্যবস্থা করা এবং দেশের শিল্প ও

---

* বিগত বর্ষের প্রবাসীর আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত "স্বর্ণমান" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বাণিজ্যকে শুধু নিজ দেশের প্রয়োজনেই নিয়োজিত করা। আমেরিকা, চীন, ভারতবর্ষ, রুশিয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদে ধনী প্রকাণ্ড দেশসমূহের পক্ষে এ-পথে চলা তেমন অসাধ্য নহে। কিন্তু ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে এ-পথ বিনাশের পথ। প্রথম কথা, বৎসরে ছ-মাসের খোরাকও ইংলণ্ডের নিজ দেশে উৎপন্ন হয় না। বিদেশের সহিত তাহার বাণিজ্য বন্ধ হইলে ইংলণ্ড অনাহারেই মারা যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের যে-সব পণ্য পৃথিবীর হাট-বন্দর ছাইয়া ফেলিয়াছে, সে-সব তৈরির কাঁচামাল আসে সব বিদেশ হইতে। তাহারই বা কি উপায় হইবে? অন্য দিকে, উল্লিখিত বৃহৎ দেশগুলি ঐশ্বর্য্যের খনি হইলেও শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহারা অনেকে নূতন ব্রতী ও অনভিজ্ঞ। বিদেশ হইতে আধুনিক কলকজ্জা ও অন্যান্য নানাবিধ সাজ-সরঞ্জাম আমদানি করিতে না পারিলে তাহাদের চলিবে না। সকলের চাইতে বড় কথা এই যে বিশ্বের সম্পদ ও জ্ঞানভাণ্ডার আজ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের নিকট সকলের প্রয়োজনে উন্মুক্ত হইয়াছে। আমরা কি চীনাপ্রাচীর খাড়া করিয়া দিয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়া গিয়া আবার কূপমণ্ডুক হইয়া বসিব? ইহাতে কি জগতের প্রগতিকে শত সহস্র বৎসর পিছাইয়া দেওয়া হইবে না? আমরা নিজ দেশের মধ্যে আত্মসর্ব্বস্ব ও পূর্ণমনস্কাম হইয়া থাকিতে পারিব না; অথচ আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ ও বাণিজ্যকেও স্বাভাবিক পথে চলিতে পদে পদে বাধা দিব—আমাদের বর্ত্তমান বিপত্তির গোড়ায় গলদই এই পরস্পর-বিরোধী নীতির অনুসরণ। সুতরাং মানবজাতির স্বাভাবিক বিবর্ত্তন ধারাকে যদি আমরা ঠিক রাখিতে চাই, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে ভাবের ও বস্তুর আদান-প্রদান যদি আমরা অব্যাহত রাখিতে চাই, তাহা হইলে পরস্পরকে অন্যায় রকমে আঘাত করিবার যত উপায় তাহা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। শুল্ক-প্রাচীর (Tariff Wall) ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। তেলো মাথায় তেল দেওয়া (subsidy) বন্ধ করিতে হইবে। শিল্প-অনুষ্ঠানে নূতন ব্রতী কোন কোন দেশের পক্ষে ও ক্ষেত্রবিশেষে প্রবলের প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য এরূপ প্রাচীরের ও সাবসিডির সাময়িক প্রয়োজন থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার প্রয়োগ আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল ও অনুন্নত জাতির জন্য যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক এবং তদনুকূল জাতিসঙ্ঘের (League of Nationsএর) অনুমোদন থাকা সঙ্গত। অবশ্য সেই সঙ্ঘকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে।

সমস্ত গোলমালের মূলোচ্ছেদ করিবার আর একটি দুঃসাহসিক পন্থা আছে। কিন্তু তাহা যেমনই নূতন তেমনই ধনতান্ত্রিকদের পক্ষে মারাত্মক। পণ্য-বিনিময়ের সময় যে অর্থরূপ দালালটি মধ্যস্থ হইয়া কাজ করেন তিনি সমস্ত অনর্থের মূল; কারণ তিনি বহুরূপী, তাঁহার রূপের বা মূল্যের কিছুই ঠিক নাই। এই দালালটিকে একেবারে বাদ দিয়া পণ্যের সহিত পণ্যের সাক্ষাৎ বিনিময় করিতে পারিলে সব গোলমাল চুকিয়া যায়। মানুষের ভোগের জন্যই শিল্প ও পণ্যসম্ভারের প্রয়োজন—অর্থ পণ্যসম্ভারকে মানুষের নিকট প্রয়োজন ও সুবিধামত পৌঁছাইয়া দিবার একটি সহজ উপায় মাত্র। ইহা ভিন্ন অর্থের অন্য কোন সার্থকতা নাই। তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে, এই খামখেয়ালি দালালটিকে মাঝে রাখিবার দরকার কি? এই প্রস্তাবে শ্রমিক বা সাধারণ সম্প্রদায়ের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই সত্য, কিন্তু ইহাতে ধনিক সম্প্রদায়ের সমূহ ক্ষতির কারণ রহিয়াছে। সেইজন্যই এরূপ প্রস্তাবে তাঁহারা একেবারে আঁৎকাইয়া উঠিয়াছেন এবং এই পথের পথিক রুশিয়াকে সকলে মিলিয়া কোণঠাসা করিবার চেষ্টায় আছেন। ধনী অর্থ চায় শুধু ভোগের সামগ্রী সংগ্রহের জন্য নহে, ব্যাঙ্কের খাতায় হিসাবের অঙ্কটাকে যথাসম্ভব বড় করিয়া দেখিবার জন্য। ইহা প্রয়োজনের দাবি নহে,—ইহা নিছক লোভ ও যুগযুগান্তের সংস্কার। সাধ মিটাইয়া ভোগ করিবার বিলাস-সামগ্রী ইহাদিগকে দিলেও ইহারা অর্থের মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। অথচ ইহাদের এই লোভের ফলে দুনিয়ার ধন আসিয়া কতিপয় ব্যক্তির হাতে জড় হইতেছে, কিন্তু ব্যবহারে লাগিতেছে না। কারণ মানুষের ভোগবিলাসিতার সীমা আছে। অন্য দিকে নানাবিধ পণ্যসম্ভার পড়িয়া আছে, অর্থাভাবে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ তাহার নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইতে পারিতেছে না। বিনিময়ের জন্য তৈরি না হইয়া

পণ্যদ্রব্য যদি মানুষের ব্যবহার ও ভোগের জন্য তৈরি হইত এবং দেশের শাসনতন্ত্র যদি তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্যকুশলতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিতরণ করিবার ভার গ্রহণ করিতেন (যেমন আজ রুশিয়ায় চলিয়াছে), তাহা হইলে ধনীসম্প্রদায়ের ঘরে বসিয়া টাকায় তা দেওয়া বন্ধ হইত বটে, কিন্তু দুনিয়ার বঞ্চিতেরা কিঞ্চিৎ খাইয়া-পরিয়া বাঁচিতে পারিত। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ধনে কাহারও অধিকার থাকিবে না। দেশের কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্য গণতন্ত্রের প্রতিনিধিগণের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হইবে—তাহার ফলভাগী হইবে দেশের সকলে সমভাবে যোগ্যতানুসারে অর্থ থাকিবে না বটে, কিন্তু অভাবও থাকিবে না; কারণ সকলের সকল রকম অভাব মিটান হইবে সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে। ব্যক্তিগত ধনাধিকার কিংবা কর্ম্মক্ষেত্রের স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচার এ-ব্যবস্থায় স্থান পাইতে পারে না; কিন্তু আমাদের নিজেদের গভর্ণমেণ্ট যদি আমাদিগকে খাটাইয়া লইয়া পরম যত্ন ও বিশেষ বিবেচনা সহকারে আমাদের দৈহিক মানসিক সর্ব্ববিধ অভাব পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক মানবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ মঙ্গল হইবে না কি? যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারাইবার ভয় আমরা করিতেছি, বর্ত্তমান অবস্থায় মানবজাতির সে অধিকার কি পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইতেছে না?

এই নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া রুশিয়া আজ আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছে। সেখানে বেকার-সমস্যা নাই, জিনিষ সেখানে পড়িয়া থাকিতে পায় না। দেশবাসী সকলের সকল অভাব মিটাইয়া যে জিনিষ উদ্বৃত্ত হয় যে-কোন মূল্যে বিক্রয়ের জন্য তাহারা তাহা বিদেশে চালান করিয়া দেয়। ব্যক্তিগত লাভের জন্য জিনিষ তাহারা তৈরি করে নাই, লাভক্ষতি বিচার করিয়া বিদেশে জিনিষ বিক্রয় করিবার তাহাদের তেমন প্রয়োজন হয় না। জিনিষের বিনিময়ে তাহারা বিদেশ হইতে যাহা পায় তাহাই তাহাদের লাভ। ১৯২৯ সালের পর ইউরোপ আমেরিকা সর্ব্বত্র বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি পাইয়াছে ও জিনিষের উৎপাদন হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। একমাত্র রুশিয়ার উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-মন্দার পরেও বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া একদল লোক সমাজ হইতে অর্থের একাধিপত্যকে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিতেছেন এবং রুশিয়া-প্রবর্ত্তিত সমাজ ও অর্থনীতির অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের মধ্যে ইঁহারা ব্যক্তিগত ধনবাদের চিরসমাধির স্বপ্ন দেখিতেছেন।

ধন ও ধনী-সম্প্রদায়কে রক্ষা করিয়া যদি এ অবস্থার প্রতিকার করিতে হয় তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমেই ধন বা অর্থের খামখেয়াল ও স্বেচ্ছাচারকে বন্ধ করিতে হইবে। অন্যথা বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার আর অন্য পন্থা নাই। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রা, বিভিন্ন মুদ্রার বিভিন্ন মূল্য, পরস্পরের মূল্যমধ্যে আবার অনিশ্চয়তা, পৃথিবীর মুদ্রাসমষ্টির হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি কি করিয়া মানুষের সকল হিসাবকে পণ্ড করিয়া দিয়া ব্যবসাবাণিজ্যকে খর্ব্ব করে তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ দিয়াছি।* অর্থের এই সর্ব্বনেশে খেলা বন্ধ করিতে হইলে প্রথমেই আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার একান্ত আবশ্যক। সেইজন্যই লড়াইয়ের পর জেনেভা কন্‌ফারেন্সে স্বর্ণমান পুনর্গ্রহণের প্রস্তাব তাড়াতাড়ি গৃহীত হয়। ইহার ফলে স্বর্ণমান পরিহারের দরুন বিভিন্ন দেশের মুদ্রামধ্যে বাট্টা বা বিনিময়ের হার লইয়া যে অনিশ্চয়তার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা বিদূরিত হইল বটে, কিন্তু সকল মুদ্রার সমষ্টিগত মূল্যের স্থিরতা লাভ করা গেল না। কারণ বিভিন্ন মুদ্রামধ্যে পরস্পরের আপেক্ষিক মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেলেও পৃথিবীর মুদ্রা বা অর্থের মোট পরিমাণ স্থির রাখিতে না পারায় মুদ্রামূল্যও স্থির রহিল না। সমগ্র পৃথিবীর মোট মুদ্রার পরিমাণ একটি সংখ্যাদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইলে সকল দেশের গভর্ণমেণ্ট ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের একমত হইয়া একযোগে কাজ করিতে হইবে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের মনোবৃত্তি বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ ঘোরতর পরস্পরবিরোধী ও ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সেই সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত।

বিভিন্ন দেশ ও তাহাদের ব্যাঙ্কসমূহ একমত হইলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ

* বিগত বর্ষের প্রবাসীর কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত "ভারতে মুদ্রানীতি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আরও একটি কারণে একপ্রকার অসম্ভব। আধুনিক জগতে বাজার-মর্য্যাদা বা credit কিরূপে অর্থের স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্যেক দেশের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিতে যদিবা সমর্থ হন, কিন্তু এই নিরাকার credit পদার্থটিকে আয়ত্তাধীনে আনিবেন কি প্রকারে? কোন্ দেশে কোন্ ব্যক্তির কি পরিমাণ ধার পাওয়া উচিত, তাহাকে কি পরিমাণে ধারে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার মর্য্যাদা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য বলিলেই হয় অর্থের পরিমাণকে স্থির রাখিয়া তাহার মূল্য স্থির রাখিবার পথে ইহা একটি গুরুতর অন্তরায়। কিন্তু পন্থা দুরূহ হইলেও সকল দেশের সমবেত চেষ্টায় এই প্রতিবন্ধকতা দূর করিতে না পারিলেও চলিতেছে না। সেইজন্যই সমগ্র পৃথিবীর অর্থ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টের হাত হইতে তুলিয়া লইয়া একটি কেন্দ্রীয় শক্তির উপর দিবার কথা উঠিয়াছে। পরস্পর বিবদমান জাতিসমূহের মধ্যে এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা কতদূর সম্ভব তাহা অবশ্য ভাবিবার বিষয়।

বর্ত্তমান অবস্থার আশুপ্রতিকার করিতে হইলে অধমর্ণ জাতিসমূহের স্কন্ধ হইতে সমরঋণ ও ক্ষতিপূরণের গুরুভার অবিলম্বে তুলিয়া লইতে হইবে। সকলের সম্মিলিত পাপের বিরাট বোঝা শুধু পরাজিত জাতিসমূহের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়ায় ইহারা আজ মরিতে বসিয়াছে। পৃথিবীর এতখানি ক্রয়শক্তিকে এভাবে নিষ্পেষিত করিয়া রাখিলে ব্যবসা-বাণিজ্য কোন প্রকারেই পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইতে পারে না। কেবল সমরঋণ ও ক্ষতিপূরণের দাবি বাতিল করিলেও চলিবে না—পৃথিবীর যেখানে যত জাতি নিষ্ফল ঋণের চাপে মুষড়িয়া পড়িয়াছে তাহাদিগকেও রেহাই দিতে হইবে। নতুবা পৃথিবীর ক্রয়শক্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে না। ইউরোপের বহু মনীষীও এ-কথা আজ স্বীকার করিতেছেন। ভারতের বিরাট পূর্ব্ব ঋণের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিগত লড়াইয়ের সময় বিনা স্বার্থে ও বিনা কারণে শুধু আমাদের বিধিনির্দ্দিষ্ট অভিভাবকের উপকারের কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকারার্থ আমাদিগকে নূতন করিয়া বিরাট ঋণভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই সব ঋণের চাপ না কমিলে আমাদের আর্থিক উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত। কৃষিজাত পণ্যের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হ্রাস পাওয়ায় কৃষিপ্রধান দেশসমূহের ঋণমুক্তি অধিকতর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান অবসাদ দূর করিতে হইলে যাঁহারা টাকা লইয়া গ্যাঁট হইয়া বসিয়া আছেন তাঁহাদিগকেও হাতের টাকা ছাড়িতে হইবে। খয়রাৎ করিবার কথা কেহ অবশ্য তাঁহাদিগকে বলিতেছেন না একটা অনন্যসাধারণ কুণ্ঠা ও অবিশ্বাস হইতে তাঁহারা যে-সকল ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে হাত গুটাইয়া বসিয়া আছেন, ইহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। তবেই নূতন ব্যবসার পত্তন হইবে, বাজারে অর্থ নূতন করিয়া চলিতে সুরু করিবে, মানুষের জড়তা ও অবসাদ কাটিয়া গিয়া ব্যবসা-জগতে নূতন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে। বনের বাঘ অপেক্ষা মনের বাঘ আমাদিগকে অধিক কাবু করিয়া ফেলিয়াছে; এবং ফলে দুনিয়ার সকল অর্থ বাজার হইতে মানুষের ঘরে আশ্রয় লইয়াছে। এই অর্থ পুনরায় ঘরের বাহির না হইলে মৃতপ্রায় ব্যবসা-বাণিজ্য আর টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। এই সম্পর্কে আরও একটি ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ত্তমান অনাস্থা ও অবিশ্বাসের ফলে ধারে কার্য্য করিবার সুযোগও একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মানুষকে এই সুযোগ ফিরাইয়া দিতে হইবে; তাহার কর্ম্ম-ক্ষমতার উপর আবার বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। কারণ মানুষের এই মর্য্যাদা (credit) অর্থের প্রয়োজন যে কতখানি মিটাইতে পারে তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মানুষকে তাহার কর্ম্মকুশলতা অনুযায়ী খানিকটা বিশ্বাস না করিলে কেবল নগদ অর্থ দিয়া সকল সময় কাজ করা কঠিন। তাই অর্থের সঙ্কোচন দূর করিতে হইলে অকাতরে অর্থব্যয় করা যেমন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তেমনই মানুষকে তাহার প্রাপ্য মর্য্যাদা বা credit দান করারও প্রয়োজন হইয়াছে। অর্থব্যয়-সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট ও ধনীসম্প্রদায়ের দায়িত্বই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; কারণ শক্তি ও সুযোগ তাঁহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পূর্ব্বে শুধু লড়াই বাধিলে গভর্ণমেণ্ট অজস্র অর্থব্যয় করিতেন। তদ্ভিন্ন সাধারণ অবস্থায় তাঁহাদের ব্যয়ের ধারা একটা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু

বর্ত্তমান কালে দেশের নানাবিধ বিরাট জনহিতকর অনুষ্ঠানের (public utility concernএর) সহিত তাঁহারা সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। রুশিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্যান্য দেশেও আজকাল গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে, পাব্লিক্ ট্রান্সপোর্ট, সেচ, খাল-খনন, বৈদ্যুতিকশক্তি সরবরাহ, জাহাজনির্ম্মাণ, সাধারণের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি নানা বিভাগের কর্ত্তৃত্বভার নিজহাতে গ্রহণ করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ প্রয়োজনীয় ও লাভবান কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধনীসম্প্রদায়কেও এই সব অনুষ্ঠানে অর্থনিয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে তাঁহারাও লাভবান হইবেন, দেশের বেকারের সংখ্যাও অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। ক্রেডিট প্রতিষ্ঠা ও অর্থব্যয় করিয়া বাজারের ঘাট্‌তি টাকা পূরণ না করিলে এই অসচ্ছল অবস্থা যে কিছুতেই দূর হইবে না, তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই।

কেহ কেহ মনে করেন শিল্পজগতে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার বর্ত্তমান অবস্থার জন্য অংশতঃ দায়ী। নিত্য-নূতন সৃষ্টির ফলে অপ্রয়োজনে যে অর্থব্যয় হইতেছে, প্রকৃত প্রয়োজনে তাহা ব্যয় হইলে জনসাধারণকে এতটা ভুগিতে হইত না। ধনী ক্রেতার অপব্যয় বাঁচিয়া যাইত; এবং বিক্রেতাকেও নিত্য-নূতন জিনিষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া হয়রান ও নাকাল হইতে হইত না। তাই আজ এমন কথাও উঠিয়াছে যে, কিছুকালের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক!

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রতিকারের পথ থাকিলেও তাহা অনুসরণের উপায় নাই। বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে বাঁচিতে হইলে যে দুর্জ্জয় সাহস, উদার বিশ্বাস ও একান্ত সহযোগিতার আবশ্যক তাহা আজ কোথায়? পরস্পরের প্রতি বিভিন্ন জাতির মনোভাব দেখিলে আমাদের একটি পুরাতন গল্পের কথা মনে পড়িয়া যায়। দুইটি ভদ্রলোক এক ট্রেনে যাইতেছিলেন। উঁহাদের মধ্যে একপাটি চটি বদল হইয়া যায়। এই ভুল ধরা পড়ে একজনার ষ্টেশনে নামিবার পর। ততক্ষণে ট্রেন চলিতে সুরু করিয়াছে। প্ল্যাটফর্ম্মের যাত্রীটি গাড়ীর যাত্রীকে তাঁহার পাদুকাটি প্ল্যাটফর্ম্মে ফেলিয়া দিবার জন্য চীৎকার করিতে করিতে ছুটিতে থাকেন, এবং গাড়ীর যাত্রীটিও তাঁহার পাদুকাখানি গাড়ীর ভিতর ছুঁড়িয়া দিবার জন্য বলিতে থাকেন। কেহই কিন্তু ভরসা করিয়া অপরের জুতাটি আগে হাতছাড়া করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে গাড়ীটি প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। প্ল্যাটফর্ম্মের যাত্রীটি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসিয়া পড়িলেন, গাড়ীর যাত্রীটি জানালা দিয়া ব্যাকুলনয়নে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরিণামে একপাটি চটি লইয়া উভয়কে ঘরে ফিরিতে হইল!

গোঁড়জাতি

শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে যে-সব পার্ব্বত্য জাতি আছে তাহাদের মধ্যে গোঁড়জাতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহারা সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়, প্রায় ত্রিশ লক্ষের অধিক হইবে। বনভূমিশোভিত সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণীর সর্ব্বত্র, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত সুদূর চিন্দ্‌বারা প্রদেশের জায়গীরগুলি, বেতুলের নদীসমূহর তীরভূমি, সিয়োনীর মনোরম পাহাড়গুলি—এই জাতির বাসস্থান। চন্দা, ওয়ারধা, নরসিংপুর এবং আসাম প্রদেশেও ইহারা বাস করিয়া থাকে।

গোঁড়েরা দ্রাবিড়ী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে, চলতি কথায় তাহাদিগকে রাবণবংশী বলা হয়। সম্ভবতঃ তাহারা দাক্ষিণাত্য হইতে মধ্যপ্রদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। আদি বাসস্থান সম্বন্ধে সঠিক কিছু তাহারা বলিতে পারে না। তাহাদের ভাষায় 'ভুলে যাওয়া' শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু 'মনে রাখা' শব্দের উল্লেখ নাই। তাহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত প্রবাদ এবং পৌরাণিক উপাখ্যান খুব অল্পই পাওয়া যায়। বেতুলে তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে:—

প্রাচীন সমুদ্রে সিঙ্গমালী পাখীর ডিম হইতে ইহাদের আদি পিতামাতার উৎপত্তি। সাগরমাতা বনভূমিকেই যেন তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহারা নীলকণ্ঠ পাখীর পালক ও ময়ূরপুচ্ছসংযোগে তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছিল। খ্রীষ্টানদের আদিমাতা ঈভ যেরূপ নিষিদ্ধ ফলভক্ষণে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, গোঁড়দের আদিমাতাও সেরূপ হইয়াছিল বলিয়াই তাহাদের উদ্ভব এবং এই বিশ্বজোড়া দুঃখের হা-হুতাশ। শেষে অন্ধতমসাচ্ছন্ন পৌরাণিক উপাখ্যানের ভিতর বনের রাজা ও বীর রাইলিঙ্গের অত্যুৎকৃষ্ট কাহিনী আসিয়া পড়িল। যে-রাইলিঙ্গ রাজা আর্থার, যে-রাইলিঙ্গ ফরাসী দেশের লুই, সেই মানবদেহধারী রাণীর শিরস্ত্রাণ হইতে উদ্ভূত একটি অবতারস্বরূপ। কিন্তু তাহার জন্ম সম্বন্ধে রাণী সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ইহা তাঁহার পক্ষে একটি মস্তবড় অভিশাপ; তাই তিনি শিশুটিকে জীবন্তে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবার জন্য দুইটি বালিকাকে আদেশ দিলেন। কিন্তু বালিকারা শিশুটির দিকে তাকাইতেই সে তাহাদিগকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল; ঐ প্রীতিভরা হাসিতে মুগ্ধ হইয়া বালিকারা তাহাকে পুঁতিয়া ফেলার বদলে একটা বট-গাছের মূলে লুকাইয়া রাখিল। এমন সময় এক শকুন-রাণী তাহার পর্ব্বতস্থিত বাসা হইতে আহার অন্বেষণে বাহির হইল এবং রাইলিঙ্গকে তুলিয়া লইয়া তাহার বাসায় চলিয়া গেল। বালক রাইলিঙ্গও সেখানে মনের সুখে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে তীর ধনুক লইয়া শিকার অন্বেষণে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার নিজ জন্মভূমিতে তাহার মাতার কাছে আসিয়া পড়িল। অন্য ছয় জন বড়ভাই থাকা সত্ত্বেও মাতা রাইলিঙ্গকেই রাজাসন দিল, কিন্তু ভাইয়েরা ইহাতে ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া তাহাকে বধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহাতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাহারা রাইলিঙ্গকে তাহাদিগের স্ত্রীদের নিকট রাখিয়া দিয়া বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইল। তাহাদিগের কাছে তাহার নিষ্কলুষ চরিত্র প্রতি রাত্রে ব্যাহত হইতে লাগিল, কিন্তু সে কিছুতেই তাহাদের কামনা পূর্ণ করিতে চাহিল না, অবশেষে হতাশ হইয়া তাহারা পারাবত শিকারের জন্য রাইলিঙ্গকে বনমধ্যে লইয়া গিয়া তাহার বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দিল, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুমাত্র লজ্জার ভাব প্রকাশ পাইল না। অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রীগণ একটি বিড়ালকে ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া রাগাইয়া দিল এবং ঐ ক্রুদ্ধ বিড়ালের আঁচড়-কামড়ে তাহারা পীড়িত হইল। তাহাদের স্বামীরা ফিরিয়া আসিলে তাহারা জানাইয়া দিল যে, রাইলিঙ্গ তাহাদিগের উপর অতিশয় অত্যাচার করিয়াছে। তখন ভাইয়েরা মিলিয়া রাইলিঙ্গকে প্রাণে মারিবার জন্য তাহাকে উত্তপ্ত লোহার কড়ায় ফেলিয়া

দিল। কিন্তু তিন দিন পরে যখন ভাইয়েরা তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিতে গেল তখন দেখিল যে সে জীবিত। তখন তাহারা বুঝিল যে, পুণ্যাত্মার নিকট যমরাজের অপ্রতিহত শক্তি খর্ব্ব হইয়াছে। ভাইয়েরা তাহাদের স্ত্রীগণের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া রাইলিঙ্গকে অতিশয় সম্মানের সহিত মুক্ত করিল। রাইলিঙ্গের কোনরূপ প্রতিবাদ না শুনিয়া তাহারা স্ত্রীদের পায়ে বেড়ি পরাইয়া দিল এবং তাহাতে বলদ জুতিয়া দিয়া তাহাদের চরম দশা উপস্থিত না-হওয়া পর্য্যন্ত গ্রামের চারিদিকে ঘুরাইতে লাগিল। পরে রাইলিঙ্গ অগ্নির অনুসন্ধানে বাহির হইয়া বনে গিয়া তাহার ভ্রাতাদের জন্য নূতন রাণী ও অগ্নি সংগ্রহ করিল এবং সে নিজে বিবাহ করিতে অসম্মতি জানাইল। সে বলিল, "তোমরা তোমাদের রাজধর্ম্ম ও সাংসারিক ধর্ম্ম পালন কর—আমার সংসারী হইবার প্রবৃত্তি নাই।" তারপর সে তাহাদের সকলকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তর্হিত হইল এবং অমরধামে প্রস্থান করিল।

এই উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রচলিত।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পরে বেতুল, চিন্দ্‌বারা, মাণ্ড্‌লা ও চন্দায় গোঁড়জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তাহাদের কোন মূল ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। উহাদের আধিপত্য প্রায় দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া স্থায়ী ছিল, সেজন্য দেশও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। তখন ভারতের অতীত গৌরবপ্রচারের পক্ষাশ্রয়ী পৃষ্ঠপোষক ছিল না বলিলেই হয়, তবুও "মধ্যপ্রদেশের সরকারের অনুমত্যনুসারে প্রকাশিত" একখানি গ্রন্থে আছে :—

"গোঁড় শাসনকর্ত্তাদের নিরুপদ্রব ও শান্তিপূর্ণ শাসনে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, গোমেষাদি পশুর সংখ্যাধিক্য এবং রাজকোষ ধন-রত্নে পূর্ণ ছিল ...গোঁড় রাজাদের এরূপ একটি সুন্দর নিয়ম ছিল, যে কোন লোক পুষ্করিণী খনন করাইতে সম্মত হইলে রাজারা সেই পুষ্করিণীর জমি তাহাকে নিষ্করভাবে দান করিতেন।"

চন্দার জরীপ-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী গোঁড়শাসন-কর্ত্তাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"তাহাদের রাজত্বকালে দেশ সুশাসিত ও শান্তিপূর্ণ ছিল। অট্টালিকাশোভিত সুন্দর নগরগুলি স্থপতিবিদ্যার নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তাহা ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। যাহারা এক সময় রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিল আজ তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিলে এই সকল ঘটনা স্বতঃই আমাদের স্মরণ হয়।"

যে-সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণী এক সময় মনোহর দৃশ্যের লীলাভূমি ছিল, আজ তাহার উপর অশেষ দুঃখের যবনিকাপাত হইয়াছে। যদি কেহ এখানে আসে তাহা হইলে সে এখানকার পীড়িত মানবতার বিষাদমাখা



গোঁড়জাতির গ্রাম্য মোড়ল

কাতরধ্বনি শুনিতে পাইবে। গোঁড়েরা এখন জগতের আপদগ্রস্ত জাতির মধ্যে গণ্য। বর্ত্তমানে তাহারা প্রত্যেক আগন্তুকের কাছে চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা এখন দারিদ্র্যের চরমসীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে; তাহাদের গড়পড়তা দৈনিক আয় এক আনা মাত্র; তাহাদের সন্তানকে পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই খাটিয়া খাইতে হয়; আহার্য্য তাহাদের অতি সাদাসিধা, কেবলমাত্র ফেনসমেত ভাত; পরিচ্ছদের দৈন্য এরূপ যে

যথেষ্ট হইয়াছে। যেন কোথা হইতে এক ঝঞ্ঝা আসিয়া গ্রীষ্মের আতপ-তপ্ত পক্ক শস্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও চিতা এখন তাহাদের মেষপাল গ্রাস করে; রাত্রিকালে কখনও কখনও ইহারা তাহাদের কুটীরে প্রবেশ করিয়া তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে ও অন্ধকারে চোখের উজ্জ্বলতায় তাহাদের ঘুমন্ত শিশুসন্তানগুলিকে দুঃস্বপ্নের মত জাগাইয়া দেয়। ব্যাঘ্রের অপেক্ষাও ভীতিউৎপাদক ও রক্তপিপাসু মহাজন তাহাদের বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় টাকা লগ্নী করিবার জন্য তাহাদিগকে নানারূপ স্তোকবাক্য প্রয়োগ করে। এই সকল মহাজনের শোষণের পর তাহাদের যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা সভ্যসমাজে আদৃত ও রাজসরকারের পৃষ্ঠপোষিত আফিং ও মদ্যে নিঃশেষিত হইয়া যায়। নিম্নপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরাও তাহাদের এই অপব্যয়ের অংশ পাইয়া থাকে। সকলদিকে উপায়বিহীন, একেবারে অজ্ঞ ও নিঃসহায় হইয়া এই জাতি সহজেই নানারূপ পীড়ায় আক্রান্ত হয়। তাহাদের সাহায্যের জন্য কোন সাধারণ তহবিল নাই। সুতরাং বংশানুক্রমে তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ম্যালেরিয়া তাহাদিগকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে, তাহাদের চিকিৎসাদির কোনরূপ



ঝড়ের পরে গোঁড়স্ত্রীলোকেরা শস্য সংগ্রহ করিতেছে

শীতকালে পার্ব্বত্যপ্রদেশের আত্যন্তিক শীত কোনরূপেই রক্ষা হয় না। তাহাদের পোষাক সম্বন্ধে একজন কবি বলিয়াছেন—

আভরণের টান পড়েছে
করছে তাদের ছন্নছাড়া,
কৌপীনেতে অর্দ্ধঅঙ্গ
লজ্জা ঢাকে সর্ব্বহারা।

তথাপি অর্দ্ধভুক্ত, অবজ্ঞাত, ধ্বংসোন্মুখ এই জাতি মদ্যবিক্রেতা, কুসীদজীবী ও তহশীলদারের হাতে প্রতিনিয়ত উৎপীড়িত। এই জাতিকে ভূমির, কৃষিযন্ত্রাদির, গবাদি পশুর এবং ভোজন-পত্রের উপর, এমন কি, গৃহাদি সংস্কার ও পরিষ্কার করিবার জন্য যে মৃত্তিকার প্রয়োজন তাহার উপরও করভার বহন করিতে হয়। আগেকার মত প্রাণিবধ করিয়া তাহারা আর খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না, কারণ এখন ধনীলোকের মৃগয়ার সাধ মিটাইবার জন্য বনের জীবজন্তু সুসংরক্ষিত। তাহাদের উপর উৎপীড়ন ও অত্যাচার



গোঁড়-সেবামণ্ডলের প্রধান গৃহ (করঞ্জিয়া)

ব্যবস্থা নাই। খাদ্যাভাবে তাহাদের সন্তানগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। তাহাদের রাজপদ বা রাজসম্মান আজ স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে!

কিন্তু কি সাহস ও উদ্যমের সহিত এই অদ্ভুত জাতি তাহাদের দুঃখের সম্মুখীন হইয়াছে! ইহাদের অপেক্ষা



গৌড়-শিশুরা মণ্টেসরী শিক্ষাপ্রণালীর যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতেছে

কৌতুকপ্রিয়, সদানন্দ, কমনীয় জাতি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের মর্য্যাদাবোধ স্মরণাতীত হইলেও রক্তের সহিত প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত। এখনও তাহাদের আচরণ রাজোচিত, তাহাদের বংশ অতি প্রাচীন।

তাহাদের এই শক্তির মূল উৎস কোথায় যে নিহিত আছে তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে, তবে তাহাদের নৃত্যের তালে ইহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। অনুপ্রেরণাহীন মানব-মনও বনভূমির নিগূঢ় তত্ত্ব কিছু কিছু অনুভব করিতে পারে বলিয়া মনে হয়। তাই শ্রীযুক্ত এম. ডি. পাতিয়াল গোঁড়-সেবামণ্ডলে কিছু দিন কাজ করিয়া বনভূমির প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এই জাতির অন্তরাত্মা স্বাচ্ছন্দ্যপ্রয়াসী হইয়া পৃথিবীর নগ্নবক্ষ দীর্ঘনিঃশ্বাসে পরিপূর্ণ করিতেছে। বনের পত্ররাজির মর্ম্মরধ্বনির সহিত ইহার দীর্ঘশ্বাস নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দূরবর্ত্তী পশু-পক্ষীর সুমধুর সঙ্গীতধ্বনিতে আত্মার এই কাতর ক্রন্দনের সমবেদনা মুখরিত হয়; অদৃশ্য পতঙ্গের অবিরাম সঙ্গীতপ্রবাহ উহার আকুলতাকে প্লাবিত করে। তাহাদের অন্তর হইতে মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক উদ্বেগ অন্তর্হিত হয়; তাহাদের হৃদয়ের এই ভাব একটি স্বর্গীয় বস্তু। বাহ্য প্রকৃতির এই প্রভাব কখনও কখনও অতি অল্প সময়ের জন্যও পানাহার এবং পরিচ্ছদের চিন্তা তাহাদের মন হইতে বিদূরিত করে; তাহাদের দুঃখে প্রপীড়িত আত্মা ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া যেন একটা বিমল আনন্দের রাজ্যে প্রবেশলাভ করে এবং তাহা তাহাদের আনন্দদায়ক পার্ব্বত্য জীবনের ক্ষণিক স্বপ্ন উপভোগ করে। তাহাদের স্বাধীনতা যেন ফিরিয়া আসে, দারিদ্র্য-দুঃখে যেন ত্যাগের আনন্দে পরিণত হয়। তাহাদের এই বন্য জীবন মানবাত্মার একঘেয়ে-একটানা ভাব হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখে। এই বনভূমির মধ্যে তাহাদের আভিজাত্যে-ভরা হৃদয় স্পন্দিত হয় এবং মধ্যে মধ্যে শান্তিনিলয় এই বনদেবীর বক্ষে তাহারা ক্ষণিক আনন্দে বিভোর হইয়া পড়ে। এই ইন্দ্রজালই গোঁড়দিগকে অবিরত বনভূমির দিকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া লইয়া যায়। যে-প্রকৃতিদেবী তাঁহার স্নেহসিক্ত মঙ্গলময় হস্ত দ্বারা তাহাদিগকে লালনপালন ও সান্ত্বনা প্রদান করেন, তাঁহারই সহানুভূতি ও ভালবাসার গৌরবময় রহস্য তাহারা এই বনভূমিতেই উপলব্ধি করে। এস্থানে লীলাময়ের হৃদয়-কন্দরে তাঁহারই প্রেমের গান প্রকৃতিদেবীর শত সহস্র সুরে ধ্বনিত হয়। এই বনভূমির বক্ষে তাহারা দুর্ভাগ্যপীড়িত অসহায় শিশুর ন্যায় তাহাদের মর্ম্মোচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করে। ভগবানের এই সমস্ত লীলা-বৈচিত্র্য তাহারা সামান্য অনুভব করে মাত্র; অথবা ইহারই ভিতর দিয়া অসীমে পৌঁছিবার পথের সন্ধান পায়। ইহা কল্পনা নয়, স্বপ্নও নয়; ইহা কেবলমাত্র ক্ষণিক দীপ্তিতে প্রকাশিত হয় এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই বিস্মৃতি-গর্ভে লীন হইয়া যায়।

মুহূর্ত্তের এই আত্মবিস্মৃতিই গোঁড়জাতির জীবন-প্রবাহের উৎস। ধর্ম্ম, শিল্পকলা, যাদুবিদ্যা এবং সঙ্গীত—সমস্তই এই বন্যজাতির নিজস্ব। অন্য স্থানে এবং অন্য সময়েও তাহারা সতত এই সমস্ত বাস্তবের সান্নিধ্যে থাকিবার জন্য ও সেই সচ্চিদানন্দ অজ্ঞাতের রহস্য ভেদ করিবার জন্য তাহাদের ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধনাভিলাষে এই অনির্ব্বচনীয় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। যে বিধাতা তাহাদিগকে এই বিশ্রাম ও সুষুপ্তির গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন জীবনসংগ্রামে তাঁহারই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব সমগ্র জীব-জগতের ন্যায় তাহাদের জীবন কল্পনা ও উচ্চ আদর্শের ভিত্তিতে স্থাপিত। এই সকল কল্পনা আবার সেই পরমাত্মার হৃদয়নিঃসৃত মহৌষধের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তিপ্রসূত।"

পাতিয়াল সাহেব গোঁড়দের সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে থাকিয়া গোঁড় বনিয়া গিয়াছিলেন এবং তাহাদের আচার-ব্যবহার সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সভ্য সমাজের ধারণা ছিল যে, অসভ্য জাতির মধ্যে কেবল ভূতের ভয় ছাড়া কোন ধর্ম্ম নাই; কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত বিবরণী সে ধারণা দূরীভূত করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

গোঁড়জাতির জীবনযাপনপ্রণালী ও আচার-ব্যবহার এত অল্প পরিসরের মধ্যে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। রাসেল সাহেবের রচিত মধ্যপ্রদেশের বর্ণ ও জাতি-সমূহ (Tribes and Castes of the Central Provinces) নামক পুস্তকে উহা সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। এই ধরণের পুস্তকে বাহ্যিক বর্ণনাটা যেমন বেশী থাকে ইহাতেও সেইরূপ আছে। এই সকল পুস্তকে যে যে স্থলে ভারতবাসীর আচার-ব্যবহারের



গৌড়-সেবামণ্ডলের দাতব্য চিকিৎসালয়

প্রশংসা করা হইয়াছে সেই সেই স্থান নির্ভুল বলিয়া বোধ হয়। আর যে যে অংশে ভারতীয় আচার-ব্যবহারের নিন্দা করা হইয়াছে সেই সেই অংশ ঠিক নহে। গৌড়-জাতির বন্ধুত্বপ্রথা সম্বন্ধে পাতিয়াল সাহেব যেভাবে বিবৃত করিয়াছেন আর কোনও পুস্তকে সেরূপ নাই। তাহাদের বন্ধুত্বের আদর্শ উচ্চ। বন্ধুত্বপ্রথাকে তাহারা একটা কলাবিদ্যায় পরিণত করিয়াছে বলিলেও চলে। এই বন্ধুত্ব স্ত্রী-পুরুষের সংস্পর্শজাত নয়। কেন-না, তাহাদের বন্ধুত্ব স্ব স্ব জাতির মধ্যে আবদ্ধ। পরস্পরের প্রতি ভালবাসার গভীরতা অনুসারে তাহাদের বন্ধুত্ব পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। যথা—[illegible], সখী, জওরা, মহাপ্রসাদ ও গঙ্গাজল।* এই পাঁচটির মধ্যে ভালবাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ভাবে বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টিতে অধিকতর এবং দ্বিতীয়টি অপেক্ষা তৃতীয়টিতে আরও বেশী ভালবাসা দৃষ্ট হয়।

গৌড়জাতির জীবনযাপনপ্রণালী কিরূপ সুন্দর ও মাধুর্য্যময় তাহা আংশিক বলা হইল। এইবার তাহাদের কি কি জিনিষের অভাব আছে সে-সম্বন্ধে সন্ধান লওয়া যাক। সভ্য মানবসমাজ তাহাদিগকে বহু শতাব্দী ধরিয়া অবহেলা করিয়া আসিয়াছে। আজ তাহাদিগকে কি কি সুযোগ দেওয়া উচিত? সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন,—তাহাদিগকে শিক্ষা দান করা। এই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হওয়া চাই, যে-সে শিক্ষা নহে। বর্ত্তমানে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড যে শিক্ষা দান করে তাহা কোন প্রয়োজনেই লাগে না। এই শিক্ষা তাহাদিগকে কিছু সভ্য করিয়া তোলে বটে, কিন্তু উহা তাহাদের মানসিক শক্তি দমিত করিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ দাসত্বের দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মাকে মুক্ত বা স্বাধীন করা। অতএব যে-শিক্ষা আত্মাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া তাহার চিত্তবৃত্তির সম্যক পরিস্ফুরণের অবসর দেয় সেই শিক্ষাই তাহাদের দরকার। ভূগোল এবং বিজ্ঞান চর্চ্চা করাও প্রয়োজন। তাহাদিগকে রাজারাজড়া বা যুদ্ধের ইতিহাস না শিখাইয়া সেই সাধু-সন্ন্যাসীর ইতিহাস শিখাইতে হইবে, যাঁহারা জগতে মহৎ কার্য্য করিয়া মহত্বলাভ করিয়াছেন। স্বাস্থ্য-নীতি এবং সঙ্গীতবিদ্যা তাহাদিগকে শেখান উচিত। বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিবার জন্য পুষ্পশোভিত গৃহসকল নির্ম্মাণ, উদ্যানরক্ষা, উৎকৃষ্ট বস্ত্রের জন্য বয়ন এবং উৎকৃষ্ট গৃহনির্ম্মাণের জন্য সূত্রধরের কার্য্যও তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, চিকিৎসাবিদ্যা তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কেননা, ভারতের অধিকাংশ বালক-বালিকাই রুগ্ন, অনাহারক্লিষ্ট ও কঙ্কালসার। যতদিন না ভারতে বহুলপরিমাণে হাসপাতাল ও ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন কেহই ভারতবাসীর স্বাস্থ্য দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না।

কর, বিশেষতঃ গোমহিষাদি গৃহপালিত জন্তুর উপর কর, উঠাইয়া দিতে হইবে। উত্তমর্ণের কবল হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে এবং যে-সকল আইন-ব্যবসায়ী দরিদ্রের কলহ হইতে নিজেরা বেশ দু-পয়সা উপায় করে তাহাদের হাত হইতেও ইহাদিগকে রক্ষা

* আমাদের সভ্য বাঙালী জাতির মধ্যেও সখী, মহাপ্রসাদ এবং গঙ্গাজল—এই তিনটি প্রচলিত আছে।

করিতে হইবে। দূরবর্ত্তী স্থানগুলির শাসনকর্ত্তাদের উপর উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাও উচিত। বনে শিকার করিবার অধিকার তাহাদিগকে দিতে হইবে। গরিব লোকেরা ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্যই শিকার করে, আর ধনীরা করেন আমোদ উপভোগের জন্য। গরিব লোকদিগকে শিকারের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া ধনীদের সেই অধিকার দিলে তাহা অপেক্ষা অধিকতর পক্ষপাতিত্ব আর কি হইতে পারে? প্রাণিবধ করাই অন্যায়। অনাহারক্লিষ্ট লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রাণী বধ করিতে হয় তাহা বরং মার্জ্জনীয়, কিন্তু মানুষ যে কেবলমাত্র তাহার আনন্দ উপভোগ ও ধর্ম্মের নামে পশুহত্যা করিবে ইহা নিতান্ত গর্হিত।

আমরা সমাজের উন্নতি করিব, গ্রামের উন্নতি করিব বলিয়া বৃথা চীৎকার করি। আমাদের এই সব বিষয় আলোচনা করিবার কোনই অধিকার নাই। চোর যেমন গৃহস্বামীর নৈতিক উন্নতির বিষয় আলোচনা করিতে পারে না, আমরাও সেইরূপ গ্রামবাসীদের উন্নতির বিষয় আলোচনা করিতে পারি না। বনবাসীদের উন্নতির বিষয় আমাদের চিন্তা করিতে যাওয়া আরও উপহাসের বিষয়। কেননা, তাহাদের বংশ আমাদের অপেক্ষাও প্রাচীন এবং তাহারা যে-সব গূঢ় তথ্য অবগত আছে তাহা আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত। যে শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করিয়া আমরা এক মাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হই সেই শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্যে তৃপ্ত থাকিয়া তাহারা সারাদিন কাজ করিয়া যাইতেছে এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় নৃত্যাদি আনন্দে কাটাইতেছে। তাহারা যে ধৈর্য্য ও আনন্দের সহিত তাহাদের এই দারুণ দুঃখময় জীবন পরমানন্দে উপভোগ করিতেছে তাহার অর্দ্ধেক পাইলেও আমরা কৃতার্থ হই।

তবে কেন আমরা তাহাদিগকে বর্ব্বর বলিয়া নিন্দা করি? শ্বেতবর্ণের উত্তরীয়বিশিষ্ট, মস্তকে শোলার টুপী-ধারী, রাজস্ব কার্য্যালয়ের বাবুর নিকট হইতে সেলাম-প্রাপ্ত নাগরিকের পার্শ্বে বন্য বৈগা অথবা কোর্কু কুৎসিত বা কদাকার বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, কে বা কাহারা প্রকৃত বর্ব্বর—বিশ্বশিল্পী-নির্ম্মিত পদযুগলকে গায়ের জোরে চর্ম্মপিঞ্জরে প্রবেশ



গৌড়জাতির শস্যোৎসব

করান এবং বিদেশী বস্ত্রের কুৎসিত গোলাকার মোজার ভিতর পা দুইটিকে রক্ষা করা এবং গাধার গলদেশের রজ্জুর ন্যায় গলবন্ধদ্বারা গলদেশ বন্ধন করা, না হস্তপদকে উন্মুক্ত রাখিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে বনানীর মধ্যে পরিভ্রমণ করা? ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত 'জঙ্‌লী'?

শ্রীযুক্তা রোনড়া আধুনিক সভ্য বালিকার যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এবং রবীন্দ্রনাথ সাঁওতাল ললনার যে রূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাহাও নিম্নে দেওয়া গেল। দুইটিই পাশাপাশি রাখিয়া পাঠক বিচার করুন কোন্‌টি বর্ব্বর নামে অভিহিত হইবার যোগ্য :—

"এ-যুগের সভ্য ললনাগণ শরীরটিকে একটি ছবি বা প্রতিমা বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহাদের ঠোঁটে রঙ, গলায় হার, কানে দুল, চুল কোঁকড়ান, বঙ্কিম ভ্রূ—এসব তাঁহাদের সহজ স্বাভাবিক ভাব দূর করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে কৃত্রিম ভাব ধারণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ সাঁওতাল রমণীদের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :—

সাঁওতাল রমণীরা সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তাহাদের শরীর স্বাস্থ্যপূর্ণ, গতিবিধি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল; কার্য্যকুশলতায় তাহাদের

সজীবতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সর্ব্বদা ধূলি-সংস্পর্শে থাকিলেও তাহাদের সুগোল, স্বাস্থ্যব্যঞ্জক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি মলিন বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমানে সভ্য নারী সাবান, এসেন্স, হেজলীন, পমেটম ইত্যাদি কৃত্রিম সৌন্দর্য্যসৃষ্টির উপকরণ সাহায্যে পরিচ্ছন্নতা রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহাদের স্বাস্থ্যব্যঞ্জক স্বভাব-সৌন্দর্য্যের নিকট সে চাকচিক্য কোনরূপে তুলনা করা চলে না।"

এই বন্য ভ্রাতা ভগিনীদিগকে ভালবাসার চোখে দেখা প্রত্যেক ভারতবাসীরই একান্ত কর্ত্তব্য। এখন এই এক কোটি আশী লক্ষ লোকের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও অর্থসাহায্য করা আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত। যদি প্রয়োজন হয় প্রাণ দিয়াও তাহাদের উপকার করা বাঞ্ছনীয়। যদিও তাহারা তাহাদের অভ্যুদয়ের জন্য কোনও লোকের মুখাপেক্ষী নহে, তথাপি যদি কেহ তাহাদের নিকট বন্ধুরূপে তাহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে। ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু প্রতিদানের আশা যেন তাহারা না করে।

নব্য ভারতবাসীর ধমনীতে বনভূমির আদিম অধিবাসিগণের শোণিত প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন। এই শোণিত তাহাদিগকে নববলে বলীয়ান করিবে। অরণ্যই ভারতের হৃদয়স্বরূপ। অরণ্যই একদিন মুনিঋষিদিগের আশ্রম ও আবাসস্থল ছিল। অরণ্যেই একসময় ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য ও দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছিল। সুতরাং অরণ্য ও অরণ্যবাসীকে ভারতবাসী অশ্রদ্ধা করিতে পারে না।*

* ১৯৩৩ সালের নবেম্বর মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত ভেরিয়ার এলউইন্ সাহেবের ইংরেজী প্রবন্ধ অবলম্বনে।

গোপন কথা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

[প্রাচীন পারসীক হইতে]

গোপন কথাটি সখি আমার তুমি রে!
মনে যাহা জানা যায়, নাহি যায় বলা,
ছায়া সম আভাসিয়া বেহাগের মীড়ে
বাসনারে করে যাহা বেদনা-বিহ্বলা।

যে-কথাটি প্রভাতের প্রথম কমল,
প্রদোষের প্রতীক্ষিত গোধূলির তারা,
ঘুমভাঙা মধ্যরাতে অশ্রু-উতরোল
রজনীগন্ধার তুমি আকুল ইসারা।

তুমি মোর সেই কথা, বাহিরে আনিলে
আলোকে ঝরিয়া যায়, এত সুকুমার!
আপনি দেখি না যারে, পাছে পরশিলে
বিরহের তপ্তশ্বাসে খসে দল তার।

তুমি মোর সেই কথা স্মরণের পারে
নিজেরে বঞ্চিত করি রাখিয়াছি যারে!

ক্ষণিকের মায়া

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

পাত্রের বয়স বছর ষোল এবং পাত্রীর বয়স নয় কিংবা দশ। পাত্র আমি স্বয়ং এবং পাত্রী হইতেছে আমার মামার মনিব পল্লীবাসী কোন এক ছোট-খাট জমিদারের তৃতীয় বা চতুর্থ কন্যা। অতএব এখানে মাতুলই ঘটক বলা বাহুল্য। তিনি মায়ের কাছে কন্যার বিবরণ দাখিল করিলেন, "মেয়ের বয়েস তো এখন তেমন কিছু হয়নি। তবে বলতে পারি রং বেশ পরিষ্কার, মুখ-চোখ-নাকও মোটের ওপর ভালই। মেয়ের গড়ন খারাপ এ-কথা কাউকে বলতে শুনিনি। বয়েসকালে দেখে নিয়ো এ-মেয়ে কেমন সুন্দরী হ'য়ে দাঁড়ায়।" তাঁহার বক্তব্যের সরলার্থ হইতেছে যে, এই আম্র-মুকুলের অনতিসৌরভের মধ্যেই তাহার ভাবী মিষ্টত্ব-সম্ভাবনার প্রাচুর্য্য সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্ত।

মা মামার সহোদরা, তদুপরি একাধারে নারী ও মাতা। সুতরাং কন্যার এবম্বিধ রূপবর্ণনায় তাঁহার মনটা ভিজিয়া কাদার মত নরম হইয়া ওঠাই স্বাভাবিক। তত্রাচ মামা রূপের সঙ্গে গুণেরও একটা আন্দাজ দিলেন এবং সে গুণাবলী রীতিমত কাঁচা, অতএব গড়িয়া-পিটিয়া মনোমত ধরণে পাকা করিয়া লওয়া চলে,—ইহা জানাইতেও ত্রুটি রাখিলেন না। তারপর পরিশিষ্টরূপে যোগ করিলেন, "বলেছে দেবে-থোবে মন্দ নয়। ওঁদেরও হাত খুব আছে।"

ইহার পর যে-কেহ অসংশয়ে বলিতে পারে, আমার মায়ের মানসচক্ষুর সামনে ভাবীকালের কতকগুলি সুদর্শন ছবি ভীড় করিয়া আসিয়া হাজির হইয়াছে, অনেকটা চলচ্চিত্রের চঞ্চল চিত্রলেখার মত। আমি তাহার দৃষ্টান্তও দিতে পারি, যথা,—ছোট্ট একটি ফরসা রঙের মেয়ে, ডুরে-শাড়ী পরা, মা'র সঙ্গে সঙ্গে ফাই-ফরমাস খাটিয়া ঘুরিতেছে ফিরিতেছে; ছুটির আবেদন বেচারীর মুখে-চোখে ফুটিয়া উঠিতেই মা হাসিমুখে দরখাস্ত মঞ্জুর করিতেছেন, "যাও মা, এখন একটু খেলা ক'রো গে।" কিংবা, ছেলে-বৌ'য় তাদের বিবাদ-বিসম্বাদে তাঁহাকেই সালিসি মানিয়াছে, এবং তিনি বিচারের তুলাদণ্ড হাতে লইয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিতেছেন, "তোদের জ্বালায় আমি আর পারি না বাপু।" এমনি করিয়া ছবির পর ছবি ইচ্ছামত আঁকিয়া যাওয়া চলে কিন্তু ছবিগুলোকে সত্যকারের করিয়া তোলা নির্ভর করে ইহার আবেদনটুকু যোগ্যস্থানে সার্থকভাবে পৌছাইয়া দেওয়ার উপর। সে যোগ্যস্থান এই ক্ষুদ্র সংসারচক্রের মূলাধারে; সেখানে বসিয়া আছেন একটি কর্ত্তা, নিষ্ক্রিয় পুরুষ মানুষ,—স্বল্পভাষী এবং নির্ব্বিরোধী ব্যক্তি; দশে-পাঁচে থাকেন না,—তবুও তাঁহার গাম্ভীর্য্যের ছায়া কিংবা স্মিতহাসির ছিটাফোঁটা চক্রের গতিনির্দ্দেশ নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়।

অতঃপর সময় বুঝিয়া কথাটা বাবার কানে উঠিল। বাবা বলিলেন, "ছেলে যে অত্যন্ত ছেলেমানুষ।"

মাও সায় দিলেন, "ছেলেমানুষ তো বটেই। তাই ব'লে কি তোমার ছেলের আর বিয়ে হবে না?"

মাতুলও সেখানে উপস্থিত। তিনি সুর দিলেন, "তোমার ঘরও নেহাৎ খারাপ নয়। ওঁদের অবস্থা বেশ ভালই। কুটুম্বিতায় কিপ্‌টেমি করতে কখনও দেখি নি। অন্য মেয়েদের বিয়ে তো আমার চোখের সামনেই হয়েছে, খরচ-পত্তর সবই আমার হাত দিয়েই হয়েছে।"

বাবা মন দিয়া শুনিলেন, তারপর অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "বড় ছোটঘর।"

উত্তর সংক্ষিপ্ত কিন্তু তার তাৎপর্য্য অস্পষ্ট নয়। মামা যুক্তি খাড়া করিলেন, "ওঁদের সব কাজই কুলীনের ঘরে হয়েছে। সেদিক থেকে আজকালকার যুগে ওঁদের কুলীন বলা চলে—জান?"

বাবা হাসিয়া উঠিয়া মামার পিঠ চাপড়াইলেন, "শালার বুদ্ধি কি!"

ইহার পরই আমার মায়ের দু-চোখে অশ্রুর বান ডাকিয়া ওঠা উচিত ছিল এবং তাহার সঙ্গে দুর্জ্জয় অভিমান, কারণ তাঁহার ভাইকে বাবা অহেতুক গালি দিয়াছেন। বোধ করি কিছু হইয়াও থাকিতে পারে, কিন্তু সে নাটকীয় দৃশ্য আমার চোখে পড়ে নাই। এইটুকু মাত্র শুনিয়াছিলাম, মামা বলিতেছেন, "ছেলে ওঁদের চোখে ধরেছে বলেই এত খরচ-পত্তর করতে ওঁরা পেছপাও হচ্ছেন না।"

অর্থাৎ এই পাত্র কন্যাপক্ষের দেখা এবং খুব জানা। কারণ ইস্কুলের ছোট-বড় নানা ছুটি উপলক্ষে এই পাত্র যখন মাতুলালয়ে যাইত, তখন তাহার দিন কাটিত ঐ কন্যাপক্ষের বাড়িতেই। মধ্যাহ্ন-আহার কালে কন্যার পিতা আমায় ডাকিতেন, "এস, বাবাজীবন, পাতা হয়েছে।" 'বাবাজীবন' ডাক জামাতাবাবাজীউ করার অভিলাষে পরিণত,—এরূপ সন্দেহ করা চলে।

এই ভূমিকার পর কন্যাপক্ষের দিক হইতে আর কোন সাড়াশব্দ আসিল না। বাবা নিশ্চিন্ত। শুধু মা ছোটখাট দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, "বেশ ভালই হয়েছে। মেয়ের বাপের বড় গুমোর।" মাঝখান হইতে আমার মাতুলালয়ে যাতায়াত কঠিন নিষেধে বন্ধ হইয়া গেল।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে বিবাহ হইল না। শুধু তাই নয়, আমার বাবার সেকেলে দূরদর্শিতায় নিষিদ্ধ প্রেমের কোন জটিল কাণ্ডও জন্মিল না। ঘটনাটা বহু পুরাতন, কিন্তু মনের মধ্যে সহসা এই বিগত দিবসের সুরটা আজই বা কেন বাজিয়া উঠিল ভাবিতেছি।

যাই বলি না কেন অতীত বস্তুটা মন্দ নয়। অতীতের স্মৃতি মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত মোহ রচনা করিতে পারে। তাহা না হইলে এই পৃথিবীশুদ্ধ নর-নারী অমন করিয়া ঐ অতীতের পানে চাহিয়া থাকিবেই বা কেন! তাই আমি এত বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া আসিয়াও আজ বসিয়া গিয়াছি পুরাতন দিবসের ঝাপ্সা পাতা উল্টাইতে।...হায় রে সেকাল! কোথায় গেল বা আমার সেই মামার বাড়ি, মামা-মামীর আদরযত্ন, মায়ের ভালবাসা, আর বাপের স্নেহনীড়! মায়ের ভীরু বুকের তলায় একটি ঘোমটা-ঢাকা ছোট্ট বৌ লইয়া ঘর করার যে-সব সাধ লুকাইয়া রহিয়াছিল, কালের কোলে তার কোন চিহ্নরেখা আজ নাই। স্মৃতির এই রেশটুকু না থাকিলেও চলিত, কোন ক্ষতিই হইত না; তবে এই নিভৃত আঁধারে একেলা বসিয়া এমনি করিয়া মনের সঙ্গে রঙ্গ-বিলাস রসিয়া রসিয়া উপভোগ করা হইত না।

এইখানে একটু ভুল বুঝিবার আশঙ্কা আছে বলিয়াই বলিতেছি, আমার এই কৌমার্য্য বা ভবঘুরে জীবনযাত্রার সঙ্গে উক্ত ঘটনার এতটুকুও সম্বন্ধ নাই। এমন কি, বর্ণনামতই যে ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল তাহাও নিশ্চিত করিয়া জানি বলিতে পারি না। বর্ণনাটা আমার অনুমান মাত্র। আর আমারও নিশ্চল-নীড় রচিত হইতে বিলম্ব নাই। মাসখানেক হইল শ্রীমতী নিভাননীর সঙ্গে আমার আলাপ জমিয়াছে এবং সময়ের অল্পতা সত্ত্বেও আমরা পরস্পরকে বেশী করিয়া বুঝিয়া ফেলিয়াছি। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে একটি নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে তিনি আমার আকাশে ধ্রুবতারার মত উদিত হইতে সলজ্জে স্বীকৃত হইয়াছেন। সংবাদটা ঘটা করিয়া বন্ধুমহলে প্রচার করার আবশ্যক বোধে আমরা দু-জনে পরামর্শ করিয়া নিমন্ত্রণপত্র আজই ছাপিতে দিয়া আসিয়াছি।

ইহার পর এই স্মৃতি-সুরের গুঞ্জনকে ব্যর্থ প্রেমের হতাশ প্রণয়ীর হতাশোচ্ছ্বাস বলা চলে না। উপস্থিত বলা চলে, আমার মনের বর্ত্তমান অবস্থা অনেকটা অত্যন্ত আহ্লাদে কাঁদিয়া ফেলার মত। তাই এই রঙীন স্বপ্ন নিজেকে নিরালা আঁধারে পাইয়া বিস্মৃত স্মৃতির পটে হঠাৎ জমকালো রং চড়াইতে সুরু করিতেছে এবং বোধ করি তাহার সঙ্গে বাপের সেকেলে মতি-গতিকে সংগোপনে স্তুতি করিতেছে।

তবুও এমন করিয়া রং চড়ানোর পর্য্যাপ্ত হেতু ইহা নয়। এখন মনে পড়িতেছে, ইহার হেতু রহিয়াছে, মাস-কয়েকের পূর্ব্বের একটি ঘটনায়। সেই কথাটা বলি।

দেশমাতার সেবা উপলক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা দিয়া ঘুরিয়া বেড়াই, বলিতে গেলে আমার পেশাই এই। তাই এক সুদূর পল্লী হইতে ডাক পড়িয়াছিল, বক্তৃতায় যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া গাঁয়ে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া দিয়া আসার জন্য। বড় বক্তা নই, তবে এই কপালে আঁকা ছিল

কারাবাসের রাজটীকা, তাই বড় বড় নেতাদের মত বিপুল ভিড়ের হর্ষধ্বনি অদৃষ্টে না জুটিলেও, আদর-অভ্যর্থনার ত্রুটি হইত না।

ষ্টেশন হইতে গ্রাম দূরে। গরুর গাড়ী ছাড়া অন্য প্রকারের যানবাহন এখানে দুর্লভ। তাই স্থির করিলাম, গল্প করিতে করিতে পায়ে হাঁটিয়া চলাই হইবে যুক্তিযুক্ত।

"আপনার যে কষ্ট হবে—"

"চল তো বাবু। হেঁটে কে হারে আর কে জেতে আমি দেখে নেব।"

গ্রামের সীমানার মধ্যে পৌঁছাইতেই মনে হইল, এ গ্রাম আমার খুবই পরিচিত।

ঐ আঁকাবাঁকা উঁচুনীচু পথ, গাছের পাতায় সূর্য্যের কিরণ, বা পাশের বাঁশের ঝাড় আর পাতার খস্ খস্ শব্দ, ঐ পুকুর পাড়ের তাল-নারিকেল গাছের সারি, পূব দিকের পর্ণকুটীর,—এরা সবাই যেন আমাকে অতি পরিচিতের সুরে সাদরে আহ্বান করিতেছে। সুতরাং সন্দেহের অবকাশ ছিল না; তবুও সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইবার জন্যই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কোন্ রহমতপুর হে?"

সঙ্গীরা আমার প্রশ্নের অর্থ ঠিক বুঝিল না। আর বুঝিবেই বা কি করিয়া? একজন গ্রামের ইতিকথা দিয়া পরিচয় দিতে চাহিল, "বাদশাহী আমলে…"

আমি তাহার বক্তব্যে বাধা দিয়া জানিতে চাহিলাম যে, আমার মাতুলের নাম তাহাদের কাছে পরিচিত কি না। কিন্তু প্রশ্নটা উহারা অন্য অর্থে লইল, কেন-না তাহাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সেই বলিল, "আপনার থাকবার জাগা করা হয়েছে হরবিলাসবাবুর বৈঠকখানায়। আপনার কোনো অসুবিধেই হবে না। হরবিলাসবাবু চমৎকার লোক।"

হরবিলাসবাবু! তারপর পথের ছোটখাট নির্দ্দেশের জন্য আর আমাকে সঙ্গীদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইল না। নিত্য-নূতনের চাপে পুরাতন চাপা পড়িলেও একেবারে অতলে তলাইয়া যায় না।

গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌঁছাইতেই একটি বৃদ্ধ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন, "এই যে, আসুন, আসুন। বড় কষ্ট হ'ল আপনার—"

চিনিতে কষ্ট হইল না। পদধূলি লইয়া আমি কৌলিক পরিচয় দিলাম। বৃদ্ধের মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল,—"তুমি আমাদের সেই জীবন, এতবড় হয়েছ,—আমি তো চিন্‌তে পারি নি। কতকাল আগে দেখেছি, তখন তুমি ছেলে মানুষ।…এস বাবা এস। তুমি তো ঘরেরই ছেলে—"

সন্ধ্যার পর অন্দর মহলে আমার ডাক পড়িল। মামাবাড়ির সম্পর্কে আমি হরবিলাসবাবুর স্ত্রীকে মামীমা বলিয়া ডাকিতে অভ্যস্ত। সাক্ষাৎ হওতেই তিনি আমার মামা-মামীর অকাল বিয়োগের জন্য কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তুমি যে কোন কালে আসবে, একথা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি। ভাগ্যে স্বদেশীর হুজুগ উঠেছিল তাই তোমার দেখা পাওয়া গেল।"

তারপর আমার পারিবারিক খুঁটিনাটি সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে সুরু করিয়া দিলেন। দেখিলাম, আমার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের অল্প-বিস্তর সংবাদ তিনি রাখেন। বলিলেন, "তোমরা আমাদের ভুলে যেতে পার, আমরা তো আর পারি না। লোকজন পেলেই খবর নি', আমাদের জীবন কেমন আছে, ভাল আছে তো? যেথানেই থাক না, বাবা, সুখে থাক, এই কামনা করি।"

কথাটা সত্য। যাঁহাদের স্নেহছায়ায় এককালে দিন কাটাইয়াছি, তাঁহাদের এমনি করিয়া ভুলিয়া যাওয়া যথার্থই অমার্জ্জনীয়। তাই এ অভিযোগের বিরুদ্ধে আমার বলিবার কিছুই ছিল না।

ঘরের মধ্যে সহসা একটি মেয়ের আবির্ভাব হইল। মেয়ের চেয়ে যুবতী নারী বলাই ভাল। মনে হইল, ইহাকে দ্বিপ্রহরে মলিন বাসে ও অনাবৃত রুক্ষ কেশে আমার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি। খুব সম্ভব এই বাড়িরই কোন বিধবা দাসী, তবে তাহার গতিবিধির সঙ্গে দাসীত্বের কোন সঙ্গতি ছিল না বলিয়াই মনটা তখন অকারণে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

মেয়েটি আমার সামনে আসিয়া নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "আপনি বিয়ে করেন নি?"

প্রশ্নটা সম্পূর্ণ অহেতুক এবং অত্যন্ত বিরক্তিকর। ঘরে

প্রদীপের আলো, কাছের লোকের মুখ তেমন স্পষ্ট করিয়া দেখা যায় না। আর আমার ইচ্ছাও হইল না।

সে পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "আপনার বুঝি বল্‌তে লজ্জা করছে ?"

"না, আমি এখনও বিয়ে করি নি।"

"কেন ?"

"ফুরসুৎ হয় নি ব'লে।"

"ওমা, কি রকম মানুষ গো, স্বদেশী করলে কি মানুষের বিয়ে করার একটু সময়ও জোটে না,"—হাসিয়া উঠিয়া সে কোন জিনিষ লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি অত্যন্ত বিস্ময়ে মামীমার মুখের দিকে তাকাইতেই তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কি তুমি চিন্‌তে পারলে না ? ও যে অনু।"

ইহার পরও চিনিতে না পারা উচিত হয় না, কিন্তু নামের সূত্র ধরিয়া মনের পুরানো পাতা উল্‌টাইয়া দেখা গেল পরিচয়ের কোন ঠিকানাই মিলে না। অথচ লজ্জায় আর স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করাও চলে না! মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিলাম। মামীমা বলিতে থাকিলেন, "অনু দূর থেকেই তোমাকে চিন্‌তে পেরেছিল। ওই তো গিয়ে খবর দিলে—মা, যে এসেছে সে দেখতে ঠিক জীবন-দাদার মত, বাবাও জীবন জীবন বলছেন।"

এখন অনুকে অন্দাজ করা কঠিন নয়। ভাগ্য ভাল যে দাসী স্থির করিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তরে কিছু কটূক্তি করিয়া বসি নাই।

মামীমা অনুর দুর্ভাগ্যের ইতিহাস বর্ণনা করিলেন। বিবাহ হইয়াছিল কুলীনের ঘরেই। অবস্থা ভাল, মোটা ভাত কাপড়ের অভাব না হইবারই কথা। অবশ্য বর দোজ-পক্ষের, তবে বয়সও যে খুব বেশী তা নয়। কিন্তু মেয়ের পোড়া কপাল, সহিল না; দু-বছর না ঘুরিতেই হাতের নোয়া খসাইয়া, সিঁদুর মুছিয়া হতচ্ছাড়ী আবার বাপের বুকে আসিয়া বসিয়াছে। সঙ্গে আনিয়াছে সতীনের একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। সে মেয়েরও কি আশ্চর্য্য বাড়ন্ত গড়ন, পার করিতে আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। মামীমা বলেন আর আঁচল দিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করেন।

আমি সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলাম, "কি করবেন বলুন, অদৃষ্টের উপর তো আর কারুর হাত নেই।"

"হাঁ বাবা, অদৃষ্ট, অদৃষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর বলিলেন, "অনুকে তোমাদের ঘরেই দেবার ইচ্ছা ছিল। সদাশিব ঠাকুরপোকে দিয়ে আমরা একবার তোমার বাবার কাছে কথাও পেড়েছিলুম। আমরা তোমাদের চেয়ে নীচু ঘর ব'লে তোমার বাবা রাজী হ'লেন না। হ'লে যে কত সুখের হ'ত! হতভাগী কি অদৃষ্ট নিয়েই এসেছে,—নিজে পুড়েছে, আমাদেরও পুড়িয়ে মারছে।"

বুঝিতেছি, বেচারী অনুর অকাল বৈধব্য মামীমার বুকে বড়ই লাগিয়াছে। ঐ সব কটু বিশেষণ প্রয়োগে অনুর অদৃষ্ট-দেবতা সুপ্রসন্ন হইবে না,—মা'র মন ইহা বোঝে না। তিনি এইভাবে দুঃখের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি করিয়াই চলিলেন।

অনুই আসিয়া আমাকে এই অস্বস্তিকর অবস্থা হইতে মুক্তি দিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমায় চিন্‌তে পারেন নি ?"

আমি খুব সাহস করিয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া উত্তর দিলাম, "পারব না কেন ? খুব পেরেছি।"

"আপনার চিন্‌তে পারার বুঝি এই নমুনা ?

উত্তর না দেওয়াই শোভন।

মামীমা বলিলেন, "তোর কি-যে কথা অনু, সেই কত ছেলেবেলায় দেখেছিল, তারপর কত বদ্‌লে গেছে, চেনা কি সহজ ?"

অনু মা'র কথা গায়ে মাখিল না। সে বলিল, "তবু এখনও ঘরে বৌ আসে নি। স্বদেশী করতে এসে বোনকে দেখে যদিও বা একটু মনে পড়ে, বিয়ে করলে সেটুকুও মনে থাকবে না।—তাই না জীবন-দা ?"

"বিয়ে করার সময়ই জুটুক—"

"তার মানে ? সন্ন্যাসি হয়েছেন না কি ?"

ভারি গোছের উত্তর দিয়া মুখ বন্ধ করিব ভাবিতে-ছিলাম, কিন্তু সৎ-মেয়ের ডাকে অনু চলিয়া গেল, সুতরাং আমার উত্তর শোনান হইল না।

অনুর কথার সূত্র ধরিয়া মামীমা বলিতে সুরু করিলেন, "হাঁ বাবা, এ রকম ছন্নছাড়া দিন কাটান একটুও ভাল দেখায় না। বিয়ে কর, সংসারী হও, ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর সংসার কর। আমরা দেখে শুনে মরি।"

সুখ-দুঃখের প্রসঙ্গ সাঙ্গ করিয়া, ক্লান্ত দেহ-মন লইয়া আসিলাম শুইতে। কিন্তু ঘুম যেন আসিয়াও আসে না। প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোয় অনুর মুখখানা সম্পূর্ণ করিয়া দেখিতে পাই নাই, তবুও যেটুকু দেখিয়াছিলাম তাহাতেই মনে হইয়াছিল, বৈধব্যের কঠিন কৃচ্ছ্রতায় ওর বর্ণের ঔজ্জ্বল্য হইয়া উঠিয়াছে ম্লান ও রুক্ষ,—ছাই-চাপা স্তিমিত আগুনের মতই। ওর হাসি-খুশী, ওর গতিচাঞ্চল্য সর্ব্বক্ষণই যেন চাপা, উথলাইলেও কখনও দু-কূল ছাপাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে না। মনে মনে অনুশোচনা হইতে লাগিল, ওকে দাসী-পর্য্যায়ে ফেলা আমার সঙ্গত হয় নাই, আর ওর স্বাভাবিক প্রশ্নে অতটা বিরক্তিবোধের কোন সঙ্গত হেতুও ছিল না।

কাঠের জানালা খুলিয়া দিতেই তারাভরা নিশীথ আকাশখানির নিঃশব্দ সঞ্চরণ অনুভব করিলাম। দেখিলাম, এই সমাহিত নিস্তব্ধতার জনশূন্য মহারণ্যে আমিই একা জাগিয়া বসিয়া রহিয়াছি।

এই শান্ত নীরবতার প্রতিবেশের অবসরে হঠাৎ আমার এই মনটা বন্ধন-ছিন্ন পাগ্‌লা ঘোড়ার মত দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া দিল ছুট্। তারপর রামায়ণ-যুগের মুখপোড়া হনুমানের মত বিশাল বিস্মৃত অতীতের সাগর ডিঙাইয়া সেই ষোল বছরের বয়সটায় গিয়া হাজির হইল।

মানুষের মন শুধু অদ্ভুতই নয়, তার নির্লজ্জতারও তুলনা নাই। কারণ সে দেখা সুরু করিয়াছে, আমার মা প্রচুর চোখের জল খরচ করিতেছেন, "ঐ মেয়ের সঙ্গেই—।" বাবা গত্যন্তর নাই দেখিয়া রাজী হইলেন। এবং আমার কানে ঐ নয়-দশ বছরের মেয়ে অনু,—এক হাতে এক মুঠা লবণ এবং কোঁচড় ভরিয়া কাঁচা কুল লইয়া সঙ্গিনীদের ডাক দিতেছে, "আয় না ভাই, আমগাছতলায় বসে কুল খাই গে—"

কিংবা ধরা যাক্, আমার কানে আমার হাত ধরিয়া টানাটানি সুরু করিয়াছে, "জীবন-দা ভাই, দুটো কাঁচা আম পেড়ে দাও না ভাই।"

মন্দ নয়। ঘোমটা টানিয়া এই অনু আমায় ইসারায় ডাকিবে,—মন্দ কি ?

এই ছোট্ট অনুর মনোরঞ্জনের ভাবনায় আমার মাথায় দেশোদ্ধারের স্বপ্ন স্থান পাইত না। ছোট খাট শান্তি-অশান্তির জ্বালায় মন সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকিলে এই মুক্তি কামনার প্রচণ্ড স্বপ্ন-ক্ষুধার হাত এড়ান যাইত।

মনকে শাসাইতে লাগিলাম, এ বড় অন্যায়। দেশ-মায়ের অশ্রুসিক্ত মুখ, শৃঙ্খলের নিদারুণ বেদনা—এ ছাড়া আর কিছু ভাবার তোমার অধিকার নাই।

যে কাজের জন্য আমি আহূত, সে কাজ সাফল্যমণ্ডিত বলা যায়। ছেলেরা কাজের জন্য এক টুক্‌রা জমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া অর্থসংগ্রহও মন্দ হয় নাই। তাই ছেলেদের ঐকান্তিক ইচ্ছা, আমি তাহাদের সঙ্ঘের কর্ণধার হইয়া বসি। আমার ভবঘুরে জীবন, কোন স্থানে স্থায়ী হইয়া বসিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অদৃষ্টে লেখা নাই। কিন্তু হইলে ভালই হইত। পল্লীমাতার স্নেহচ্ছায়ায় বসিয়া কাজ করা দেশ-দেশান্তরে শুধু বক্তৃতাবাজি করিয়া বেড়ানোর চেয়ে ঢের ভাল। এতে তবু ঘরের মায়ার কিছু আস্বাদ পাওয়া যায়।

তাই বিদায়-দিবসে অনুভব করিতেছি, আমার উৎসাহ যেন নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে, একটা অলস ক্লান্তিতে আমার সর্ব্ব দেহমন যেন আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। দেখিতেছি, এই অপরাহ্নের অবসন্ন রৌদ্র ও ছায়ার লীলার প্রতিবেশে মানুষ ও মাটির মধ্যে একটা অতি অদ্ভুত মায়ার স্নেহনীড় গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার বাঁধন কাটানো কম কঠিন নয়। তাই বোধ করি, পল্লীমায়ের ছেলে বৃহত্তর জীবনের সন্ধানে বাহির হইতে গেলেই দেখে মায়ের জলভরা চোখের নীরব হাতছানি, আর শ্যামল তরুলতার পিছুটানে তাহার গতি হয় বারে বারে প্রতিহত।

এই কদিনই মামীমা যে-কথাটার প্রতি অস্পষ্ট আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আজ তাহা হইল একটু স্পষ্ট। জানাইলেন, অনুর সৎ-মেয়ে পাত্রী হিসাবে মন্দ নয়, বয়স অল্প হইলেও খুব বাড়ন্ত গড়নের মেয়ে এবং তার ওপর

বিয়ের জল পড়িলেই ঝাড়িয়া বাড়িয়া উঠবে, সুতরাং যখন ঘর-গোত্রে আটকায় না তখন কোন দিক হইতেই বেমানান হইবে না। আমি হাসিয়া উঠিলাম। এই রকম উচ্চ হাসির প্রত্যুত্তর দেওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। অনু কথাটাকে অন্য রকম আকার দিতে চাহিল, "মা বলছেন, আপনার সঙ্গে অনেক ছেলের আলাপ, আপনার মত স্বদেশী ক'রে বেড়ায়, তাদের মধ্য থেকে একটা সুপাত্তর আমার মেয়ের জন্য যোগাড় ক'রে দিতে পারেন তো।"

ব্যাপার মন্দ রহস্যের নয়। যে-অনুর একদিন বৌ হইয়া তর্জ্জনী হেলাইয়া শাসন করার সম্ভাবনা ছিল, সেই অনুই দু-দিন বাদে সৎ-শাশুড়ী হইয়া বলিবে, "ও-টুকু দুধ ফেলে উঠো না বাবা,—"

হাসি চাপিয়া রাখা খুবই কঠিন। কিন্তু অনুর মনোভাব স্পষ্ট বুঝিলাম না, এবং আমার মত পুরুষের বোঝাও সাধ্য নয়।

যাত্রার সময় আসিয়াছে। আমি প্রণাম করিলাম। হরবিলাসবাবু আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বড় হও, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।"

মামীমা আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বেঁচে থাক বাবা, সংসারী হ'য়ে সুখে ঘরকন্না কর।" তার পর অনুরোধ করিলেন, "আবার সময় পেলে এসো বাবা। এমনি ক'রে এসে তোমার মামা-মামীদের একটু খোঁজ নিয়ো বাবা।"

এখানে কিছু পুরাতনের আবির্ভাব স্বাভাবিক এবং ইহার ফলে এই মুহূর্ত্তের বাতাস একটু করুণ রসে আর্দ্র হইয়া উঠে।

অনু বুঝি কাছেই ছিল। সে ইহার মধ্যে একটা লঘুতার ছন্দ আনিয়া দিয়া এই বিদায় ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া দিল। একটু হাসিয়া বলিল, "আপনার বিয়ের সময় কিন্তু আমাদের নিয়ে যাবেন, ফাঁকি দেবেন না।"

হাসিয়া কহিলাম, "যদি করি তো নিশ্চই নিয়ে যাব।"

"আবার যদি—" শাসনের এই চপল ভঙ্গী আমার স্বচ্ছন্দতায় জড়তা ছড়াইয়া দিল।

গরুর গাড়ী করিয়া যাত্রা। গরু দুটিকে আমার জন্য এতটা কষ্ট দিতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না, কিন্তু সকলেরই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ,—মনঃক্ষুন্ন হইবেন। তাই তাড়াতাড়ি অন্দর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছি, অনু বাধা দিয়া বলিল, "একটু দাঁড়ান, তাড়াতাড়িতে ছাতাটা ফেলে যাবেন না।"

বলিয়া ছাতাটা আমার হাতে তুলিয়া দিল; তার পর নতজানু হইয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া আমাকে একটি প্রণাম করিল উঠিয়া দাঁড়াইয়া অনুচ্চ কণ্ঠে অনুরোধ জানাইল, "আবার আসবেন কিন্তু—"

বইয়ে পড়িয়াছি সময়-বিশেষে মানুষের কণ্ঠস্বরও কাপড়-জামার মত ভিজা হয়। আমার কানে অনুর কণ্ঠস্বর ঐ রকম ভিজা-ভিজাই ঠেকিল। শুধু তাই নয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই অনুর মুখখানি সুস্পষ্ট দেখিলাম। দীর্ঘ আয়ত চক্ষু, ঘন পত্র-পক্ষ্ম, এবং তাহারই তলে কৃষ্ণ আঁখি-তারা। গভীর কালো দৃষ্টি সেই দীর্ঘ পক্ষ্মের ছায়ায় চরম ক্লান্তিতে যেন কোন্ সুদূরে হারাইয়া গিয়াছে। একটি উদ্দেশ্য-বিহীন প্রতীক্ষা ওই তন্বী ঋজু তনু বেষ্টন করিয়া কোন্ পরম বেদনার উগ্র তপস্যা করিতেছে।

পুরুষের কঠিন মন কখন কি করিয়া লতিকাটির মত দুর্ব্বল হইয়া উঠে, মেয়েদের মতই ভাবাবেগের ভারে নুইয়া পড়ে,—বলা ভারি কঠিন। তখন সে যাহা দেখে, যাহা শোনে, সবই ভুল, আগাগোড়া মিথ্যা। তাই আমিও দেখিয়াছিলাম, ঐ নারীটির চোখের কোলে জলের স্বচ্ছ কাজল-রেখা। তার চেয়েও কিছু বেশী দেখিয়াছিলাম, কোন জানালার অন্তরালে দাঁড়াইয়া এখনও সেই জলভরা চোখ দুটি এই অস্তমিতপ্রায় রবির রক্তরশ্মিতে গরুর গাড়ীর মন্থর গতি নিরীক্ষণ করিতেছে।

মনকে এই বলিয়া ক্ষমা করিলাম, এই ক্ষণস্থায়ী ক্ষণের মায়ালীলায় তাহার অদ্ভুত-কিছু দেখা মার্জ্জনার যোগ্য।

ব্যাপারটা শ্রীমতী নিভাননীকে বলা আমার উচিত হয় নাই। কিন্তু প্রেমে-পড়া মানুষ শুধু ভেড়াই হয় না, নারীর অধমও হয়, অর্থাৎ তাহার পেটে কোন কথাই লুকান থাকে না। নিভাননী বলিল, "হরবিলাসবাবুকে নেমন্তন্ন চিঠি পাঠানো অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।"

আমি বলিলাম, "তুমি ভুল করছ। হরবিলাসবাবু,

মামীমা, অনু,—এঁরা এতে খুব খুশী হবেন। অনুর ঐ ব্যাপারটা ভুল বুঝো না। ওটা আমার নিছক কল্পনা। অনু আমার মনের মধ্যে ওরকম কল্পনা জাগিয়ে দিয়েছিল বলেই আমি তোমাকে দেখবা মাত্রই এত ভালবেসে ফেলেছি।"

"অর্থাৎ তুমি বলতে চাও আমরা—এই মেয়েজাতটা তোমাদের খেলার পুতুল?"

"এ তো বড় মুস্কিলের কথা। ওসব ছেড়ে দিয়ে এস একটু মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে ভালবাসার স্বপ্ন দেখি।"

উত্তর আসিল, "আমার এখন ভাল লাগছে না। তুমি এখন যাও, আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও।"

তারপর শ্রীমতী ভাবিতে বসিল।

স্তিমিতায়মান

শ্রীজীবনময় রায়

তোমার গভীর চিত্তে যার ধ্যানে তুমি অবহিত,
সে ত আমি নহি;
আনন্দের পাত্র মোর ছিল রিক্ত, সুধায় বঞ্চিত;
আনিয়াছ বহি।
তোমার মঞ্জুল কণ্ঠে মধুরস-বিহ্বল সঙ্গীত—
নির্ঝর উচ্ছল;
আমার সাগরতীর্থে তারই মন্দাকিনী তরঙ্গিত
লীলায় চঞ্চল।

দীর্ঘ দিন জীর্ণ তরী বাহিয়া এসেছি চলি আজ
দিনান্তের তীরে,
ব্যর্থ বুভুক্ষিত চিত্তে, অন্তরে বহিয়া দৈন্য লাজ
ঘুরিয়াছি ফিরে;
বারম্বার যার পরে সঁপিয়াছি চিত্ত দুরাশায়,
অসীম নির্ভরে,
দুরন্ত দুর্দিনে মোরে ত্যজিয়া গিয়াছে নিরুপায়;—
অবহেলা ভরে।

আজি সেই ভগ্নতরী প্রতীক্ষিয়া স্নিগ্ধ অবসান
নিঃসঙ্গ অতলে,
চলিছে মন্থর গতি বন্ধুর তরঙ্গ-খরসান
মৃত্যু-রসাতলে।
দিগন্তে ঘনায় মেঘ বিচ্ছুরিছে প্রলয় ইঙ্গিত;
মরণের কোল
আমারে দিয়েছে ডাক;—ধ্বনিতেছে ধ্বংসের সঙ্গীত
সিন্ধু উতরোল।

এই নিঃস্ব দুঃসময়ে কোথা হ'তে করিছ আহ্বান,
কারে ডাকা মিছে!
মোর কোথা অবসর শুনিবারে জীবনের গান!
মৃত্যু নিঃশ্বসিছে
আমার শিয়রে বসি। স্তিমিত এ নয়নের আলো
অবসন্ন প্রাণ;
সম্মুখে প্রলয়-সিন্ধু সুগভীর স্নিগ্ধতায় কালো
পূর্ণ মহাত্রাণ।

নয়নে নিবিছে দীপ্তি; জলস্থল আকাশ অকূল
সাগরসঙ্গমে;
পথহারা বিহঙ্গমা ফুকারিয়া ডাকিছে আকুল
নীড়-বিহঙ্গমে।
সন্ধ্যাতারা অশ্রুআঁখি; দিগন্তে তিমির-অজাগর
ঘেরিল জলধি;
ডাকিছে সঘন রাত্রি, ডাকে ঐ আঁধার সাগর,
শূন্য-নিরবধি।

ফিরিবার নাহি পথ; সম্মুখে অনন্ত মৃত্যু-রাশি
হানে উর্মিদল;
ছিন্নপাল ভগ্নতরী ঝঞ্ঝা উঠে গগন-বিলাসী
নিষ্ঠুর চঞ্চল।
পশ্চাতের স্মৃতি আজ অস্ত গেছে অতীত পাথারে,
বিদায়ের গানে;
মরণের যাত্রী, তারে মিছে ডাকা জীবনের পারে,
সন্ধ্যা অবসানে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাংলার পল্লী-চিত্র

শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্র-প্রতিভা সোনার কাঠি। যা ছুঁয়েছে তাই সোনা হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য মণি-ভাণ্ডার। সে-ভাণ্ডারে অগণ্য অপরূপ মণি-মুক্তা ছড়ানো আছে বললে কম বলা হয়, বলা উচিত, মণি-মুক্তা দিয়ে তা ঠাসা, বোঝাই। আমার স্থির বিশ্বাস যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোন একটা দিক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সব চেয়ে সুন্দর হয় খালি রবীন্দ্রনাথের সেই সম্বন্ধীয় কথাগুলি তুলে দেওয়া এবং নিজে কিছুই না বলা এবং হয়ত শেষ পর্য্যন্ত এক্ষেত্রে হবেও তাই, তবু নেহাৎ 'আলোচনা' কথাটার জাতিরক্ষার জন্যেও বা রবীন্দ্রনাথের নয় এমন কথা গোটাকয়েক অন্ততঃ বলতেই হবে, এই কথা মনে রেখে ভূমিকা শেষ করা যেতে পারে।

শৈশবে রবীন্দ্রনাথের শাসন ছিল ভৃত্য-তন্ত্র। ছেলেদের খবরদারি করবার একটা অতিশয় সহজ এবং সরল উপায় তারা বের ক'রে ফেলেছিল—তাদের একেবারে বাড়ির বাইরে যেতে-না-দেওয়া। সুতরাং বাড়ির বাহিরটা রবীন্দ্রনাথের শিশু-মনে বহুদিন ধরে একটা দুষ্প্রাপ্য আনন্দের উৎস ছিল। সে-আনন্দের প্রায় সবটাই নিজের মনের মধ্যে গড়ে নিতে হ'ত অতি সামান্য মূলধন থেকে—চাকরদের হাত থেকে হঠাৎ পালিয়ে পাওয়া কোন গ্রীষ্ম-দুপুরে চুরি-করা অবকাশে, ছাদের আলিসার ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, কিংবা তেতলার জানলার গরাদে দিয়ে বাড়ির পেছনের বাগান নামধারী যে ছোট রাজ্যটুকু দেখা যেত তারই চীনেবট, নারিকেল-সারি, ঘাটবাঁধানো পুকুর আর ওপরের টুকরো টুকরো মেঘ-ওড়া নীল আকাশের মধ্যে চিলের তীক্ষ্ণ ডাক থেকে। এইটিকে যে সামান্য মূলধন বললাম, এ আমার বলবার ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ তখনকার সেই বন্দী শিশুর কাছে এই ছিল এক প্রকাণ্ড অনাবিষ্কৃত বিস্ময়ের রাজ্য। রবীন্দ্রনাথের মনের যে গুণ তাঁকে আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ব'লে প্রতিভাত করেছে তাই ছিল ঐ ছেলেবেলাকার বাড়ির পেছনের বাগানের বট-নারিকেলঘেরা পুকুরঘাটে পরী-রাজ্য খোঁজায়। যাক, যে কথা বলছিলাম। এই হ'ল রবীন্দ্রনাথের পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গে প্রথম পরিচয়। যদিও জায়গাটা ছিল জোড়াসাঁকো, তাহলেও তখনকার কলকাতার ভেতরে ফাঁকে ফাঁকে এমন অনেক ছোট টুকরো ছিল যার সঙ্গে পল্লী বলতে যা বোঝায় তার কোন ভেদ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাই বলি, 'তখন সহর আর পল্লী অল্প-বয়সের ভাইবোনের মত অনেকটা একরকম চেহারা নিয়ে প্রকাশ পেত।' এই পরিচয়টি কেমন ছিল তা পাই রবীন্দ্রনাথের একান্ন বছর বয়সের লেখা 'জীবনস্মৃতি'তে

"জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্ব্ব ধারের প্রাচীরের গায়ে একটা প্রকাণ্ড চীনা-বট—দক্ষিণধারে নারিকেল-শ্রেণী।"

এই বটটির সঙ্গে তাঁর বড়ই সখ্য, কিন্তু তার ঘন পাতার আবছায়ায় ঝুরি-নামা আধ-অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে তলার মাটিতে অনির্দ্দেশ্যের সঙ্গে একটু যে ভয়ের আমেজ আনত না তা বলা যায় না। এই বটকে লক্ষ্য করেই লেখা—

> নিশি দিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় ল'য়ে জট,
> ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে ওগো প্রাচীন বট?
> মনে কি নেই সারাটি দিন বসিয়ে বাতায়নে,
> তোমার পানে রইত চেয়ে অবাক দুনয়নে?
> মনে হ'ত তোমার ছায়ে কতই কি যে আছে—
> কাদের যেন ঘুম পাড়াতে ঘুঘু ডাকত গাছে।
> মনে হ'ত তোমার মাঝে কাদের যেন ঘর,
> আমি যদি তাদের হ'তেম, কেন হ'লেম পর? —পুরাণো বট
> (কড়ি ও কোমল)

"গণ্ডীবন্ধনের বন্দী আমি প্রায় সমস্ত দিন জানালার খড়খড়ি খুলিয়া সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতন দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহবা দুই কাণে আঙুল দিয়া ঝুপঝুপ করিয়া দ্রুতবেগে কয়েকটা ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহবা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিত; কেহবা জলের উপরিভাগের মলিনতা কাটাইবার জন্য বার-বার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ এক সময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত; কেহবা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া আত্মসমর্পণ করিত; কেহবা জলের মধ্যে নামিতে

নামিতে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলা শ্লোক আওড়াইয়া লইত; কেহবা ব্যস্ত, কোনো মতে স্নান সারিয়া গৃহে ফিরিবার জন্য উৎসুক, কাহারো বা ব্যস্ততার লেশমাত্র নাই, ধীরে সুস্থে স্নান সারিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই তিন বার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছুবা ফুল তুলিয়া, মৃদুমন্দ দোদুলগতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে গৃহের দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায়, এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।" (জীবনস্মৃতি, ১৩ পৃ.)

এই হ'ল পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অতি-প্রথম পরিচয়। আমরা একেবারে পল্লী-প্রকৃতিই বলব। এর কিছু দিন পরে ডেঙ্গুজ্বরের কল্যাণে উঁহারা সপরিবারে গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানে কিছু দিনের জন্য চলে যান। সেইখানে উন্মুক্ত বিস্তৃত পরিসরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আলাপ। সামনেই গঙ্গার জোয়ার ভাটা, নৌকার চলাচল, মেঘবৃষ্টিতে সমস্ত ঝাপসা হয়ে যাওয়া, এদিকে পেছনের দিকে খিড়কীর পুকুরের প্রাচীরঘেরা ছায়া-ঢাকা সঙ্কুচিত একটুখানি ঘোমটা-পরা সৌন্দর্য্য—যেন ঘরের বধূ। এইগুলি তাঁর নূতন-পাওয়া স্বাধীনতাকে সুধাপূর্ণ ক'রে তুলত। বাড়ির বন্দীশালার ইট কাঠ দরজার গণ্ডী ছাড়িয়ে পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গে ত জানাশোনার আরম্ভ হ'ল, কিন্তু পল্লী-জীবনের ত কিছুই জানা হ'ল না। আসল যে পাড়াগাঁ তার চণ্ডীমণ্ডপ, রাস্তাঘাট, হাটমাঠ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা—এর ভেতরে প্রবেশ করবার জন্যেও বালক রবীন্দ্রনাথের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। ঐ ত খিড়কীর বাগানের পরেই গাঁয়ের পথ, ঐ পথে বেরিয়ে পড়লেই ত সব জানা হয়ে যায়, কিন্তু একলা বেরিয়ে পড়বার সাহস তখনও জোগায় নাই। একদিন সকালে বাড়ির দু-জন বড়লোকের পেছনে পেছনে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়েওছিলেন, কিন্তু হঠাৎ ধরা পড়ে বাড়ি ফিরে যেতে হ'ল। তাঁর কথায়—

"একদিন আমার অভিভাবকের মধ্যে দুই জন পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আমি কৌতূহলের আবেগ সামলাইতে না পারিয়া তাঁহাদের অগোচরে পিছনে পিছনে কিছুদূর গিয়াছিলাম। গ্রামের গলিতে ঘন বনের ছায়ায় সেওড়ার বেড়াদেওয়া পানাপুকুরের ধার দিয়া চলিতে চলিতে বড় আনন্দে এই ছবি আমি মনের মধ্যে আঁকিয়া আঁকিয়া লইতেছিলাম। একজন লোক অত বেলায় পুকুরের ধারে খোলা গায়ে দাঁতন করিতেছিল তাহা আজও আমার মনে রহিয়া গেছে। এমন সময় আমার অগ্রবর্ত্তিরা হঠাৎ টের পাইলেন আমি পিছনে আছি। তখনি ভৎ'সনা করিয়া উঠিলেন—যাও, যাও, এখনি ফিরে যাও।"

ফিরে আসতে হ'ল। এই যে পল্লীজীবনের সঙ্গে পরিচয়ে বাধা, এ বাধা সম্পূর্ণরূপে কবিজীবনে কখনই ঘুচল না। জন্ম ও পারিপার্শ্বিকতার জন্য এই জীবনের সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া কখনই সম্ভব ছিল না, কিন্তু কুতূহলী দর্শক হিসাবে যে পরিচয়ের সম্ভাবনাটুকু ছিল তাও তাঁর জীবনে বেশ দেরিতে এসেছিল। এর ফল তাঁর সাহিত্যে কি দাঁড়িয়েছে সে কথার প্রসঙ্গ আসবে পরে।

পেনেটির পর আমরা আবার পল্লী-আবেষ্টনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে পাই এর বেশ কিছুদিন পরে যখন তাঁর বয়স কুড়ি। ইতিমধ্যে মহর্ষির সঙ্গে হিমালয়-ভ্রমণ, বাড়ি-ফিরে ইস্কুলে পড়বার বৃথা চেষ্টা, প্রথমবার মেজদাদার সঙ্গে বিলাত-যাত্রা, ফিরে আসবার পর ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্যে আবার বিলাতযাত্রার চেষ্টার অর্দ্ধেক পথে পরিসমাপ্তি—এত কাণ্ড হয়ে গেছে। কেবল পিতৃদেব ছাড়া আর সকলে তাঁর এই ছন্নছাড়া ভাবে একটু হতাশ, একটু দুঃখিত। তাঁর নিজের, পরিপূর্ণ অবসর ভোগ করা ছাড়া আর কোন কাজ নাই। এই অবস্থায় আবার রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরে গঙ্গার তীরে ফিরে এলেন।

"আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্ব্বচনীয় বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধশ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনি করুণ দিন রাত্রি!...আমার পক্ষে,—বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতই আবশ্যক ছিল।"

কুড়ি থেকে প্রায় চব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত কবির জীবন ভরাট আনন্দ ও নির্ভাবনার মধ্যে চ'লছিল। এরই মধ্যে তাঁর ভাবজীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনাটি আসে—যেদিন সদর ষ্ট্রীটের বাড়িতে এক মধুর সকালে হঠাৎ তাঁর চোখে পৃথিবীর সবকিছু সাধারণ জিনিষ, আশপাশের যা-কিছু, সব এক নূতন এক সহজ আনন্দের প্রতীক ব'লে প্রতিভাত হয়ে উঠল।

এদিকে লেখার ক্ষেত্রে ষোল বছর বয়সের 'কবি-কাহিনী' থেকে আরম্ভ ক'রে 'বনফুল,' 'ভগ্নহৃদয়,' 'রুদ্রচণ্ড' (নাটিকা), সন্ধ্যা-সঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত, বিবিধ প্রসঙ্গ, বৌঠাকুরাণীর হাট, ছবি ও গান, প্রকৃতির পরিশোধ, ভানুসিংহের পদাবলি, প্রভৃতির ভিতর দিয়ে কড়ি ও

কোমলে এসে পৌছেছি। কবিযশঃপ্রার্থী তরুণ রবীন্দ্রনাথের এরই মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের আসরে সম্মানের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু এই লেখাগুলির মধ্যে বাংলার পল্লীর আন্তর ত নয়ই—বহিঃপ্রকৃতিরও বিশেষ জায়গা হয় নাই। প্রথম কারণ সাক্ষাৎ-পরিচয়ের অভাব, দ্বিতীয় কারণ গ্রন্থ-সমালোচনা, গান, কাব্য, নাটক ইত্যাদিতে প্রথম বয়সের আবেগ ও উচ্ছ্বাস যথেষ্ট অবসর পাচ্ছিল। আমাদের পক্ষে এটা ভালই হয়েছিল, কারণ এর পর যখন রবীন্দ্রনাথ পল্লী-চিত্রের মুখোমুখি আসবার সুযোগ পেলেন তখন মনের ভিতরে, এবং বাহিরে প্রকাশ-ভঙ্গিতে যথেষ্ট পরিণতি এসে গেছে, সুতরাং সেই চিত্রগুলি হয়েছে যেমন মধুর তেমনি সাবলীল।

১৮৮৪ সালের মে মাসে, অর্থাৎ বাইশ-তেইশ বছর বয়সে, কর্ত্তাবাবু, দাদা ও বৌদি সমভিব্যাহারে নিজেদের 'সরোজিনী' জাহাজে চ'ড়ে গঙ্গা বেয়ে লম্বা পাড়ি দেবার ব্যবস্থা হয়। সেই যাত্রায় গঙ্গার দুই তীর তাঁর চোখে যেমন ঠেকেছিল তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লেখা হয়, এবং আমার মনে হয় এইখানেই আমরা প্রথম যখনকার-দেখা তখন-কার-লেখা বাংলার নিভৃত দৃশ্যের বর্ণনা পাই। আমি আগেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের লেখার সবচেয়ে বড় স্তুতি হবে সেই লেখাটি অবিকল উদ্ধৃত করা, সুতরাং এখানেও তাই করি—

"বসিয়া বসিয়া গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে! গাছপালা ছায়া কুটীর নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুই ধারে বরাবর চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্য্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে—জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে। কতকগুলি সূর্য্যকিরণ সেই ছায়ার মাঝে ঝিকমিক করিতেছে, আর বাকী কতকগুলি, গাছপালার কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার উপরে চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিতেছে। একটা বা নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে। সে সেই ছায়ার নীচে, অবিশ্রাম জলের কুলুকুলু শব্দে, মৃদু মৃদু দোল খাইয়া বড় আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর এক পাশে বড় বড় গাছের ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা ভাঙা বাঁকা একটি পদচিহ্নের পথ জল পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে জল লইতে নামিতেছে, ছেলেরা কাদার উপর পড়িয়া, জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে।

প্রাচীন ভাঙাঘাটগুলির কি শোভা! মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা একরকম ভুলিয়া যাইতে হয়; এও যেন গাছপালার মত গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড় বড় ফাটলের মধ্য দিয়া অশথগাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে। বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপর শেয়ালা পড়িয়াছে, এবং তাহার রঙ চারিদিকের শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গেছে। মানুষের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তুলি ধরিয়া এখানে ওখানে নিজের রঙ লাগাইয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত কঠিন সগর্ব্ব ধবধবে পারিপাট্য নষ্ট করিয়া ভাঙাচোরা বিশৃঙ্খল মাধুর্য্য স্থাপন করিয়াছেন। * * * গঙ্গাতীরের ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কি মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজূটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মত অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এক এক জায়গায় লোকালয়—সেখানে জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে; তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতেছে। কুঁড়ে ঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি—কোনো কোনোটা বাঁকাচোরা বেড়া দেওয়া—দুই চারিটি গরু চরিতেছে; গ্রামের দুই একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্ম্মার মত গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; একটা উলঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া বেগুন ক্ষেতের সামনে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে। হাঁড়ি ভাসাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোট ছোট জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়ি মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে।

আবার আর একদিকে চড়ার উপরে বহুদূর ধরিয়া কাশবন—শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে। সূর্য্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না! ... (সরোজিনী প্রয়াণ—ভারতী)

এতখানি পড়ে যেতে একবারও কোথাও আটকায় না, এবং মনেই পড়ে না যে আমরা একটা দৃশ্য-বর্ণনা পড়ছি। একেই যথার্থ বলা যেতে পারে চিত্র। এর কিছু দিন পরে—কবির বয়স তখন ছাব্বিশ—জীবনে যা-কিছু কাম্য তার অপ্রমিত প্রাচুর্য্য অবাধ আনন্দ এবং পাশাপাশি প্রিয়বিয়োগের গভীরতম দুঃখ, দুই মিলে যখন তাঁর মনের পরিণতির প্রায় আর কিছু বাকী রাখে নি, তখন একদিন গরুর গাড়ী চড়ে পেশোয়ার অভিযানের বদলে তলব এল বোটে ক'রে জমিদারী পর্য্যবেক্ষণের। পেশোয়ার অভিযানটা হ'লেও একটা অদ্ভুত রকমের সুন্দর কিছু আমরা পেতাম নিশ্চয়ই, কিন্তু তার বদলে শিলাইদা, সাজাদপুর অভিযানের ফলই আমাদের আজকের আলোচনার সবচেয়ে বড় পর্ব্ব। এখন থেকে সাত-আট বৎসরের মধ্যেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের চরম স্ফূর্ত্তি। এই কয়েক বৎসর রবীন্দ্রনাথ বাংলায় পল্লী-প্রকৃতির

একেবারে মুখোমুখি কাটিয়েছেন এবং তার ফলে কবিতায়, প্রবন্ধে, ছোটগল্পে, সবার উপরে বিভিন্ন জনকে লেখা পত্রধারাতে এমন অপূর্ব্ব সুন্দর পল্লী-চিত্রের সৃষ্টি হয়েছে যার তুলনা আর কোন সাহিত্যে আছে ব'লে আমার জানা নাই।

আগেই বলেছি এই সময়ের ঠিক পূর্ব্বেই জীবনের যা-কিছু জানবার তা প্রায় কবির জানা হয়ে গেছে। এখন নিজের মধ্যে নিজে ডুবে থাকা এবং রঙ্গক্ষেত্রের নির্লিপ্ত দর্শকের মত দূর থেকে জীবনটাকে সহানুভূতিপূর্ণ করুণার চোখে দেখা, এ ছুটোই তাঁর পক্ষে খুব সহজ হয়ে এসেছে। চারি পাশের জগৎ তাঁর চোখের ও কানের ভিতর দিয়ে মনে আনন্দের সাড়া তুলছে, কিন্তু সে আনন্দের মধ্যে উচ্ছ্বাস একেবারেই নাই, আছে একটি অপার দাক্ষিণ্যের ভাব। ঠিক এই কারণেই তাঁর পক্ষে ক্রমাগত সাত-আট বৎসরের বেশীর ভাগ সময় হয় পদ্মার উপর বোটের মধ্যে, নয় জমিদারীর কাছারি-বাড়িতে, প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন কাটানো মোটেই কষ্টকর হয় নাই বরং অনাবিল আনন্দপূর্ণ ছিল; এবং আমার মনে হয় এই জীবনের বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। আমার মতে এই সময়টিই কবির জীবনে পূর্ণ ফসলের সময়। সাধনার যুগ (১২৯৮, অগ্রহায়ণ থেকে ১৩০২, কার্ত্তিক) সমস্তটাই এর মধ্যে পড়ে। 'সাধনা'র প্রায় সমস্তটাই চালানো ছাড়া ঠিক এই সময়ের রচনা—রাজা ও রাণী, বিসর্জ্জন, মানসী, চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ, ছোট-গল্প, সোনার তরী, বিদায় অভিশাপ, বিচিত্র গল্প (১ম ও ২য় খণ্ড), কথা-চতুষ্টয়, চিত্রা, গল্প-দশক, ইত্যাদি, ছিন্ন-পত্রে যেগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি এবং আরও অনেক পত্র, চৈতালি, বৈকুণ্ঠের খাতা, পঞ্চভূত, কণিকা, কথা, কাহিনী এবং ঠিক এর পরেই ক্ষণিকা। পল্লী-চিত্র বলতে এই লেখাগুলিতেই সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়, এবং স্বদেশ, সমাজ, লোক-সাহিত্য প্রভৃতিতেও কিছু কিছু পাওয়া যায়, যদিও এগুলি অনেক পরের। এই সময়টিকে আমরা মোটামুটি শিলাইদহের যুগ বলতে পারি।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা আলোচ্য বিষয়টিকে দুই ভাগে ভাগ করব। প্রথম, পল্লী-প্রকৃতির বাহিরের চিত্র; দ্বিতীয়, পল্লী-জীবনের চিত্র। পদ্মাবক্ষ, এপারের ছোট ছোট গ্রাম, বাঁধাঘাট, খেয়া-পারাপার, ওপারের বালি ধূ ধূ করা চর, মাত্র এই পটভূমিকার উপর সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর, রাত্রি, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ এর ফিরে ফিরে আসা—এইগুলিকে কেন্দ্র ক'রে যে একটা পুরা সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে এ ধারণা করা শক্ত হ'য়ে উঠত যদি-না রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিক তাই ক'রে যেতেন। চিত্র-হিসাবে এগুলির বোধ হয় তুলনা নাই। সেই একই আবেষ্টনী, কিন্তু প্রত্যেকটি চিত্র সমানভাবে উপভোগ্য। সেই পদ্মার উন্মুক্ত প্রশস্তি, অতিদূরাবস্থিত দুই পার, সকালের সোনালি আলো, সন্ধ্যার শান্ত ছায়া, গ্রামের বধূদের ঘাটে ঘাটে আনাগোনা—ফিরে ফিরে এরাই আসে, কিন্তু কোন চিত্রটিকেই অনাদর করার কথা কারও মনে আসতেই পারে না। এর প্রথম এবং প্রধান কারণ—রবীন্দ্রনাথের মনে এর প্রত্যেকটি যে গভীর এবং অনাবিল আনন্দ নিয়ে আসত, তা যেন আমাদেরও মনে অবশ্যম্ভাবী রূপে সঞ্চারিত হ'য়ে পড়ে, যেমন—

আজি মেঘমুক্ত দিন, প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মত; সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে। ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্দ্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে; ভাঙা উচ্চ তীর;
ঘনছায়াপূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটীর;
বক্রশীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হ'তে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষ্ণার্ত্ত জিহ্বার মত; গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠ মগন
করিছে কৌতুকালাপ; উচ্চ মিষ্ট হাসি
জল কলস্বরে মিশি পশিতেছে আসি
কর্ণে মোর; বসি এক বাঁধা নৌকা পরি
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নত শির করি
রৌদ্রে পিঠ দিয়া, উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্যে; ধৈর্য্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহ-জ্বালাতন।
… … আতপ্ত পবনে
তীর উপবন হ'তে কভু আসে বহি
আম্রমুকুলের গন্ধ; কভু রহি রহি
বিহঙ্গের শ্রান্ত স্বর
আজি বহিতেছে

প্রাণে মোর শান্তিধারা, মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল— (সুখ—চিত্রা)

একটির পর একটি যতই চিত্র উল্টে যাই, মন ক্লান্ত বা বিমুখ হয় না, আরও নূতনতর চিত্রের জন্য উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। এ-পারের সন্ধ্যা-বর্ণনায়—

হের ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়াছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না ; শূন্য মাঠ জনহীন ;
ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুইতিন
কুটীর অঙ্গনে বাঁধা ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য্য হ'ল সমাপন—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।

ও-পারের সন্ধ্যা আরও চমৎকার—

সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া প'ড়েচে—একটি কোমল বিষাদ—ঠিক অশ্রুজল নয়—একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পল্লবের নীচে গভীর ছলছলে ভাবের মত। এমন মনে করা যেতে পারে—মা পৃথিবী লোকালয়ের মধ্যে আপন ছেলেপুলে, কোলাহল এবং ঘরকরনার কাজ নিয়ে থাকে, যেখানে একটু ফাঁকা, একটু নিস্তব্ধতা, একটু খোলা আকাশ, সেইখানেই তার বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য এবং বিষাদ ফুটে ওঠে, সেইখানেই তার গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা যায়। (ছিন্নপত্র—৪৬ পৃ.)

কোন জিনিষ যথার্থ উপভোগ করতে গেলে তার চার দিকে অবসরের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে হয়। কখনও শিলাইদহে, কখনও কালিগ্রামে, কখনও সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথের দিনগুলি প্রায় পরিপূর্ণ অবসরের মধ্যে কাটছিল, সুতরাং শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ একে একে আসত আর প্রত্যেকটিকেই তিনি পূর্ণ আনন্দের সঙ্গে ডেকে নিতেন। শীতের মধ্যাহ্নের একটি চিত্র পাই কালিগ্রাম—৫ই মাঘ, ১৮৯১এর চিঠিতে—

বেশ কুড়েমি করবার মতো বেলাটি। কেউ তাড়া দেবার লোক নেই, যেন পৃথিবীতে অত্যাবশ্যক কাজ বলে কিছু নেই। এখানকার চতুর্দ্দিকের ভাবগতিকও সেই রকম। একটা ছোট নদী আছে বটে, কিন্তু তাতে কাণাকড়ির স্রোত নেই, সে যেন আপন শৈবালদামের মধ্যে জড়াভূত হ'য়ে অঙ্গ বিস্তার ক'রে দিয়ে প'ড়ে পড়ে ভাবচে যে যদি না চললেও চলে তবে আর চলবার দরকার কি? জলের মাঝে মাঝে যে জলজ ঘাস আর উদ্ভিদ জন্মেছে, জেলেরা জাল ফেলতে না এলে সেগুলো সমস্ত দিনের মধ্যে একটু নাড়া পায় না।…বারো ঘণ্টা প'ড়ে প'ড়ে কেবল রোদ পোহায়, এবং অবশিষ্ট বারো ঘণ্টা খুব গম্ভীর অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা দেয়।

ঋতুর মধ্যে বর্ষা কবির চিত্তকে যেমন নাড়া দিয়েছে এমন আর কোনটি নয়। কখনও পদ্মা, কখনও ইছামতী কিংবা গোরাই নদীর ওপর বাসকালে বর্ষার যে অন্তরঙ্গ মূর্ত্তি কবি দেখেছিলেন তার প্রচুর বর্ণনা রয়েছে, খরস্রোতা পদ্মার উপর চারিদিকে যত দূর দৃষ্টি যায় অথৈ জলের নৃত্য, ঝুপঝাপ বৃষ্টির শব্দ, পাছপালা নদী সব ঝাপসা একাকার, কোথাও বা গাছের মাথা-জাগা দু-একটা গ্রাম ; ছোট নদীগুলির ভরাযৌবনে তীরের কেতকী কদম্ব গাছের তলা-ছোঁয়া জলের ছলছলানি, গৃহস্থ বধূদের জলে ভিজে ভিজে কাজ করা, এই সমস্ত চিত্র অজস্র পাই। সোনার তরীর—

পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়া মসী-মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাত বেলা

'ভরা ভাদরে'র

কদম্ব গাছের সার
চিকণ পল্লবে তার
গন্ধে ভরা অন্ধকার
হয়েছে ঘোরালো

ইত্যাদি মাত্র দু-একটি দৃষ্টান্ত।

বর্ষার পরে আসে মেঘমুক্ত সুন্দর শরৎ, সোনালি আলো গাঢ় সবুজ আর নির্ম্মল নীলে ভরা। তখন প্রাচুর্য্যে প্রকৃতির শোভা ধরে না—

মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক' আর
পারে না বহিতে নদী জলধার…

হয়ত

ধানের ক্ষেত থর থর ক'রে কাঁপচে—আকাশে সাদা সাদা মেঘের স্তূপ—তারি উপর আম এবং নারিকেল গাছের মাথা উঠেচে—নারকেল গাছের পাতা বাতাসে ঝুর ঝুর করচে—চরের উপর দুটো একটা ক'রে কাশ ফুটে ওঠবার উপক্রম ক'রেচে। ঘরে ঘরে মিলনের আগ্রহ, এবং শরৎকালের এই আকাশ, এই পৃথিবী, সকাল বেলাকার এই ঝিরঝিরে বাতাস, এবং গাছপালা তৃণগুল্ম নদীর তরঙ্গ সকলের ভিতরকার একটি অবিশ্রাম সঘন কম্পন—

সমস্ত মিলিয়ে কবির চিত্তকে অপূর্ব্ব ভাবে অভিভূত এবং কাণায় কাণায় পূর্ণ ক'রে ফেলত।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রথম ভাগ অর্থাৎ নিছক পল্লীদৃশ্যের চিত্র সম্বন্ধে আলোচনার এইখানেই শেষ। কারণ শিলাইদহ-যুগের পরে আর কোন লেখায় এ-রকম চিত্র পাই না। এর পরের সমস্ত লেখায় যেখানে প্রকৃতিকে আঁকতে হয়েছে সেখানে এই যুগের প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সাহায্য ক্রমশই গৌণ হয়ে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ

বলা যায়—অনেক পরের লেখা 'ঋতুরঙ্গে' (১৯২৭) যখন বৈশাখের কথা পাই, তখন বৈশাখ আর

নিম্ব-বৃক্ষ ঘন-শাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা
আম্রবন তাম্র ফলময়—

কিংবা

ঝাউগাছ ছায়াহীন নিঃশ্বসিছে উদাসীন
শূন্যে চাহি আপনার মনে···
(কুহুধ্বনি—মানসী)

দুরান্ত প্রান্তর শুধু তপনে করিছে ধূ ধূ
বাঁকা পথ শুষ্ক তপ্ত কায়—

এরূপে আসচে না,—তখন শুনি—

বৈশাখ হে, মৌনী তাপস, কোন্ অতলের বাণী এমন
কোথায় খুঁজে পেলে?
তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢাকি মন্থর মেঘখানি এল'
গভীর ছায়া ফেলে?

কিন্তু এগুলিকে পল্লীচিত্রের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না, এবং এর সঙ্গে পূর্ব্বের যুগের নিছক চিত্রগুলির যোগ নেহাৎ কম। 'ক্ষণিকা'র কয়েকটি কবিতাতে কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শিলাইদার ছবি তখনও তাঁর মনে খুব জাগরূক, কিন্তু সেই ছবিকে বাহন ক'রে, এবং তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে, তার সঙ্গে আর কিছু যোগ ক'রে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির চেষ্টা হচ্চে। যেমন, 'আমরা দু-জন একটি গাঁয়ে থাকি' কবিতাটিতে—

দুইটি পাড়ায় বড়ই কাছাকাছি
মাঝে শুধু একটি মাঠের ফাঁক,
তাদের বনের অনেক মধু-মাছি
মোদের বনে বাঁধে মধুর চাক।

তাদের ঘাটে পূজার জবামালা
ভেসে আসে মোদের বাঁধা ঘাটে,
তাদের পাড়ার কুসুম ফুলের ডালা
বেচতে আসে মোদের পাড়ার হাটে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম ত' জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

কিংবা 'দুই তীরে' কবিতাটিতে—

তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী।
দুই তটের একই গান সে
শোনায় নিরবধি।

আমি শুনি, শুয়ে
বিজন বালু ভুঁয়ে,
তুমি শোন কাঁখের কলস
ঘাটের পরে থুয়ে।

তুমি তাহার গানে
বোঝ একটা মানে
আমার কূলে আরেক অর্থ
ঠেকে আমার কানে।

এখন আমরা আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ ক'রতে পারি অর্থাৎ পল্লীজীবনের কথা। পাড়াগাঁয়ের ধনী, গরিব, মধ্যবিত্ত, ভাল মন্দ, চাষী-বাসীদের ঘরের কথা, তাদের আপন আপন সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার কাহিনী; বেশীর ভাগ সেই সময়কার লেখা ছোটগল্পগুলিতেই পাওয়া যায় এবং কিছু কিছু 'পঞ্চভূত,' 'লোক-সাহিত্য,' 'গ্রাম্য-সাহিত্য,' 'স্বদেশী সমাজ,' 'স্বদেশ' প্রভৃতি আলোচনায় পাওয়া যায়।

শিলাইদা-যুগটা ছোটগল্পরচনার পক্ষে ভারী উপযোগী হ'য়ে উঠেছিল। চারিদিকের প্রভাব টুকরো টুকরো ভাব প্রকাশের একান্ত অনুকূল ছিল। মনকে বেশী না খাটিয়ে, আস্তে আস্তে বহিঃপ্রকৃতির তালে তালে তাকে বলগা ছেড়ে দিয়ে, ছন্দোমিলের জন্যে যতটা চেষ্টা করা দরকার তারও মধ্যে না গিয়ে, ছোট ছোট গল্প রচনাই ছিল সেই সময়ের প্রধান আনন্দ। গল্পের চরিত্রগুলিও সেই জন্যে হয়েচে আশপাশের গাঁয়ের মানুষ, যাদের রোজ দেখতেন—হয় জমিদারীর দরবারে প্রজা হিসেবে, নয়ত বোটের ওপর থেকে উৎসুক দর্শক হিসেবে। তাদের মনের কথা, তাদের ঘরের কথা, প্রায় সম্পূর্ণই সৃষ্টি, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেরই আরম্ভ, এবং প্রায় সবগুলিরই পটভূমিকা, কোন-না-কোন একটি দৃশ্য—যা কোন-না-কোন সময়ে তাঁর চোকে পড়েছে। অবশ্য প্রকৃতি এই আরম্ভ মাত্রই যোগাত, বাকিটা আসত নিজের মন থেকে, কিন্তু গল্পগুলি পড়বার সময় সে-কথা প্রায় মনেই হয় না—এমনই তরতরে তাদের গতি। ঠিক এই কথাটির উল্লেখ পাই—সাজাদপুর—৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪এর একটি চিঠিতে (ছিন্নপত্র, ২৯০-৯১ পৃ.)—

বাইরের জগতের একটা সজীব প্রভাব ঘরে অবাধে প্রবেশ করে—আলোতে, আকাশে, বাতাসে, শব্দে, গন্ধে, সবুজ হিল্লোলে এবং আমার মনের নেশায় মিশিয়ে কত গল্পের ছাঁচ তৈরী হয়ে ওঠে।···

আমার এই সাজাদপুরের দুপুর বেলা গল্পের দুপুর বেলা। দুপুরের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জ্জনতা, পাখীদের, বিশেষতঃ কাকের, ডাক এবং সুন্দর সুদীর্ঘ অবসর—সবশুদ্ধ আমাকে উদাস ক'রে দেয়। এই সময়ে এই টেবিলে ব'সে আপনার মনে ভোর হ'য়ে 'পোষ্ট-মাষ্টার' গল্পটি লিখছিলুম। আমিও লিখছিলুম এবং আমার চারিদিকের আলো বাতাস ও তরু-শাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ ক'রে দিচ্ছিল।

পোষ্ট-মাষ্টার ব'লে একটি লোক ছিল বটে, তাঁকে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গল্প করতে দেখা যেত বটে, কিন্তু গল্পের পোষ্ট-মাষ্টারের সঙ্গে তার যোগমাত্র ঐটুকু। তার মধ্যে 'রতন' মেয়েটি এবং মোটের উপর গল্পের করুণ ভাবটি—কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব। এই ধরণের গল্পগুলির মধ্যে আখ্যান বলতে প্রায় কিছুই নেই, আছে শুধু চিত্র এবং সে চিত্রের মধ্যে পল্লী-দৃশ্য না মানুষগুলি—কোন্‌টি যে বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করবে তা সব সময় ঠিক ক'রে ওঠা যায় না। যেমন—'ঘাটের কথা' গল্পটিতে নদীর ধার, পুরনো ঘাট, না 'কুসুম'—কোন্‌টি যে চিত্রের আসল বস্তুভাগ তা ঠিক করা যায় না এবং তার জন্যে আনন্দের কিছু ত্রুটিও হয় না।

'ছুটি' গল্পের করুণ বেদনার চিত্রটি অপূর্ব্ব, কিন্তু এটিরও গোড়ায় রয়েছে একদিনকার চোখে-দেখা ছেলেদের খেলাধূলার চিত্র। গল্পটির আরম্ভে দেখি বালক-সর্দ্দার ফটিক তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে নদীর ধারে প'ড়ে-থাকা মস্ত একটা মাস্তুল গড়ানোর খেলায় মগ্ন। খেলায় বাধা উপস্থিত করল ছোটভাই মাখন—সে গিয়ে মাস্তুলটার উপর চড়ে বসল। খেলায় বাধা পাওয়াতে ফটিক চটে গেল খুব, এবং মাখন কিছুতে নামতে রাজী না হওয়ার ফলে তাকে সুদ্ধ গড়িয়ে দিয়ে খেলার আমোদ বে'ল আনা থেকে আঠারো আনায় পৌছান হ'ল। ঠিক এই রকমের একটি দৃশ্য এর আগে রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছে (ছিন্নপত্র, ৭৯ পৃ.) এবং এই সামান্য বাস্তব ভূমিকা থেকে সুরু ক'রে বোটে বসে আপন অবসর মিলিয়ে যে গল্পটির সৃষ্টি হয়েছে তা অপূর্ব্ব। 'সুভা' গল্পটিতেও দেখি তাই—চণ্ডীপুরের গৃহস্থঘরের মেয়েটির মত ছোট নদীটিই সত্য হয়ত প্রকৃতির মেয়ে বোবা সুভার মত কেউ নজরে প'ড়ে থাকবে, হয় ত বা নয়। সাজাদপুরে একদিন ঘাটে অনেক মেয়েছেলের জটলা হয়েছে, কে যেন কোথায় যাবে। তাদের মধ্যে একটি মেয়ের প্রতি কবির মনোযোগ বিশেষ ক'রে আকৃষ্ট হ'ল। মেয়েটির বয়স বছর বারো-তেরো, কিন্তু স্বাস্থ্যের গুণে একটু বড়ই দেখাচ্ছে। দেখবার বিষয় হচ্ছে তার ছেলেদের মত ক'রে চুল-ছাঁটা, এবং বুদ্ধিমান্‌, সপ্রতিভ, সহজ ও সরল, আধা-ছেলে আধা-মেয়ের মত ভাব। পরে এই মেয়েটিই 'সমাপ্তি' গল্পের 'মৃণ্ময়ী'-রূপে প্রকাশ পেয়েছে, এবং গল্পের খাতিরে আর যেক'টি চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছে তার মধ্যে বি-এ পাস গ্রাম্য যুবক অপূর্ব্ব রায়ও অন্য সকলের মতই এক জন। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটিতে শশীভূষণ ও গিরিবালা অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে বটে, কিন্তু সেই যে সেদিন "আকাশে মেঘ ও রৌদ্র পরস্পরকে শিকার করিয়া ফিরিতেছিল"—এই চিত্রটি গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের মনে গাঁথা থেকে যায়।

এই রকমের উদাহরণ দিতে গেলে একটার পর একটা খালি বেড়েই চলে। এদের মধ্যে দিয়ে আমার বলবার কথা হচ্ছে যে, এই গল্পগুলিতেও আমরা যে চিত্র পাই তা সেই মানুষগুলির চেয়ে সেইখানের এবং সেই সময়ের বহিঃপ্রকৃতির সমস্ত ছায়া, আলোক, বর্ণ ধ্বনিকেই যেন বেশী ক'রে ফুটিয়ে তুলছে। যে-সব দৃশ্য, লোক, ঘটনা কল্পনা করা হয়েছে তাদের চারিদিকে সেই একই নদীস্রোত, রৌদ্রবৃষ্টি, নদীতীরের শরবন, সেই বর্ষার আকাশ, ছায়া-বেষ্টিত গ্রাম, জলধারা প্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত, সেই মেঘমুক্ত বর্ষার স্নিগ্ধ রৌদ্র রঞ্জিত ছোট নদী গাছের ছায়া এবং গ্রামের অগাধ শান্তি সৌন্দর্য্যে ও সজীবতায় মিশে ফুটে উঠেছে।

নিছক গ্রাম্য-জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যা-কিছু অভিজ্ঞতা তা দূর থেকেই, কারণ তিনি থাকতেন গ্রাম থেকে দূরে—নদীর ওপর, কিংবা কাছারিবাড়ির দেউড়ির ভিতর 'জমিদার বাহাদুর' রূপে। তবু সেখান থেকেই এই জীবনের যা চিত্র এঁকেছেন তা এক তিনি বলেই সম্ভব হয়েছে। পাড়াগাঁয়ের ব্যস্ততাহীন মন্থর জীবন-যাত্রার কথা ব'লতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন—

এখানকার জীবন দ্রুত এঞ্জিনের মত হাঁস-ফাঁস করিয়া কিম্বা গুরুভারাক্রান্ত গরুর গাড়ীর চাকার মত আর্ত্তনাদ করিতে করিতে চলিতেছে না। গাছের তলা দিয়া একটুখানি শীতল নির্ঝর যেমন ছায়ায় ছায়ায় কুল কুল করিয়া যায়, জীবন তেমনি করিয়া যাইতেছে।

'লোক-সাহিত্যে' ও 'গ্রাম্য-সাহিত্যে' সংগৃহীত ছড়াগুলির

থেকেও আমরা সেই সময়ের এবং তার আগেকার কালের গ্রাম্যজীবনের চমৎকার চিত্র পাই। বাংলা দেশের গৃহস্থদের মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো ব'লে যে একটি কঠিন অন্তর্বেদনা আছে, তার চমৎকার চিত্র রয়েছে এই ছড়াটিতে —'বাপ কাঁদেন, মা কাঁদেন'···ইত্যাদি। বাপ মা ত কাঁদবেনই কিন্তু—

> বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধ'রে
> সেই যে বোন গাল দিয়েছেন ভাতারখাকী ব'লে।

এই ছড়াগুলি কতকালের কে জানে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কেমন ক'রে এইগুলি এবং 'হর-গৌরী' 'কৃষ্ণ-রাধা' বিষয়ক আরও অনেক ছড়ার ভিতর দিয়ে বাংলার চিরন্তন আনন্দ-বেদনাগুলি রূপ পেয়ে এসেছে। এ ছাড়া 'স্বদেশ', 'স্বদেশী সমাজ' 'সমাজ' 'শিক্ষা' ইত্যাদি পরের লেখাগুলিতেও আমরা সংস্কারকের চোখে তৎকালীন পল্লীজীবনের চিত্র কিছু কিছু পাই।

আগেই বলা হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের লেখা গাঁয়ের জীবনের কথা নিয়ে বিচার ক'রতে গেলে বরাবর মনে রাখতে হবে তিনি কখনই গাঁয়ের এক জন ছিলেন না, মাত্র কিছুদিনের জন্য গাঁয়ের বাইরের এক জন ছিলেন। সুতরাং এ চিত্রগুলিকে চিত্র-ছাড়া ফটোগ্রাফির বিচার দিয়ে দেখতে গেলে এগুলির উপর অন্যায় করা হবে। এ-কথা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-কথা বেশ ভাল ক'রে জানতেন। তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার যখন 'ফুলজানি' উপন্যাসখানি লিখলেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন—

> বাংলার অন্তর্দেশবাসী নিতান্ত বাঙালীদের সুখ-দুঃখের কথা এ পর্য্যন্ত কেহই বলেন নি।···আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্য্যশীল, স্বজনবৎসল বাস্তুভিটাবলম্বী প্রচণ্ডকর্ম্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী কেউ ভালো ক'রে বলে নি।··· আপনার লেখার মধ্যে সেই বাংলার সন্ধান পাওয়া যায়। আপনার লেখার মধ্যে বাংলার ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন গৃহের মধ্যে যে রকম কথা কয় ও যে রকম কাজ করে তাই দেখতে পাওয়া যায়। অন্য কারও অথবা ক্ষুদ্র আমার লেখায় সেইটি হবার যো নেই।" (ছিন্নপত্র—১১-১৩ পৃ.)

এর মধ্যে বিনয় অনেকখানি থাকলেও খানিকটা অন্তত সত্য ছিল।

পল্লীজীবন বলতে শুধু চাষাভূষো কিংবা মধ্যবিত্ত গ্রাম্য গৃহস্থদের কথাই সব নয়, পল্লীর মধ্যে প্রবলপ্রতাপ জমিদারও থাকেন এবং অতি সহজ কারণে রবীন্দ্রনাথ যেখানে এই রকম কোন চিত্র এঁকেছেন সে চিত্র সাধারণ গ্রাম্য জীবনের চিত্রের চেয়ে বেশী বাস্তব হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে, 'ঠাকুর্দা' গল্পের নয়ানজোড়ের বাবুরা তাঁদের গায়ে লাগবে ব'লে তাঁরা ঢাকাই মসলিনের কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরতেন, বিড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ ক'রতেন, রাত্রে দিনের আলো করবার জন্যে আতসবাজির ওপর আকাশ থেকে সাঁচ্চা রূপোর জরি ছড়িয়ে ফেলতেন। 'যোগাযোগে'র মুকুন্দলালের বর্ণনা একবার পড়লে আমার কথার সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রতীয়মান হবে—

> পুরাতন কালের প্রথামত মুকুন্দলালের জীবন দুই মহলা। এক মহলে গার্হস্থ্য, আর এক মহলে ইয়ার্কি। অর্থাৎ এক মহলে দশকর্ম্ম, আর এক মহলে একাদশ অকর্ম্ম। ঘরে আছেন ইষ্টদেবতা আর ঘরের গৃহিণী। সেখানে পূজা-অর্চ্চনা, অতিথি সেবা, পাল-পার্ব্বণ, ব্রত-উপবাস, কাঙালী-বিদায়, ব্রাহ্মণ-ভোজন, পাড়া-পড়শী, গুরু-পুরোহিত। ইয়ার-মহল গৃহ-সীমার বাইরেই, সেখানে নবাবী আমল, মজলিসি সমারোহে সরগরম ইত্যাদি।

আমরা আমাদের আলোচনা প্রায় শেষ ক'রে এনেছি। এ-কথা মনে হ'তে পারে যে, আলোচনার ক্ষেত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের মাত্র একদেশ ভাগে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। তা বটে, কিন্তু সেটা অবশ্যম্ভাবী, কারণ উপরিউক্ত সময়ের মধ্যেই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়। এর পরই বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের কর্ম্ম বা ব্রতজীবন আরম্ভ হ'ল (শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপিত হয় ১৯০১এর ২২শে ডিসেম্বর তারিখে) এবং বাংলার এক পল্লী-আবেষ্টনী থেকে আর এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের পল্লী-আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র স্থানান্তরিত হ'লেও জীবন ও ভাবধারা নূতন পথে চলতে আরম্ভ ক'রল। সমস্ত অবসর দিয়ে শুধু বাংলার পল্লীচিত্র দেখা ও আঁকা, এর আর সময় রইল না। বহু পরে রচিত 'ঋতু উৎসবে'র পালাগুলিতে শুধু ছয় ঋতুর যে রূপগুলি ধরা দিয়েছে, সেগুলিকেও 'পল্লীচিত্রে'র পর্য্যায়ে ফেললে ভুল করা হবে।*

---

* 'রবীন্দ্র-পদক' পুরস্কার প্রাপ্ত।

লেজাঁ—সুইজারল্যাণ্ড

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সিংহ, বি-এস্‌সি, এম-বি

অনুপম নৈসর্গিক শোভা সুইজারল্যাণ্ডের বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই পৃথিবীতে এই দেশটার এত খ্যাতি, এ-কথা আমরা শৈশবকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আদর্শ ধরা হয় এই সুইজারল্যাণ্ডকে। কাশ্মীরকে আমরা ভূস্বর্গ বলিয়া থাকি। আবার ভারতবর্ষের "সুইজারল্যাণ্ড" এই আখ্যাও দেওয়া হইয়া থাকে। কাশ্মীরের বিবরণ পুঁথি-পুস্তকে যতটা অবগত হইয়াছি তাহাতে এই দুইটির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে বলিয়াই মনে হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনায় সুইজারল্যাণ্ডকে দেখিয়াছি নিছক সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার রূপে। সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইল এবার সুইজারল্যাণ্ডে আসায়। দেখিলাম কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের কোন পার্থক্য নাই, বরং বাস্তব হয়ত কল্পনাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে! সুইজারল্যাণ্ডের সৌন্দর্য্য সত্যই মন মুগ্ধ করে এবং ইহার বিচিত্র সৌন্দর্য্য প্রাণে অভূতপূর্ব্ব তৃপ্তির সঞ্চার করে; এই পাহাড়ময় দেশটার যে এত সৌন্দর্য্য তা চোখে না-দেখা পর্য্যন্ত সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। আমাদের চোখে এ সৌন্দর্য্য আরও বিচিত্র লাগে, যখনই দেখি মানুষ তার প্রয়োজন ও অভিরুচি অনুসারে কত পরিবর্দ্ধন করিয়াছে এবং করিতেছে। প্রকৃতি আর মানুষ এই দুইয়ের সমবেত চেষ্টায় সমস্ত দেশটা একটা ছবির মত গড়িয়া উঠিয়াছে। সমস্ত দেশটা জুড়িয়া পাহাড়, ছোট ছোট নদী আর হ্রদ। অবশ্য আমাদের দেশের মত বড় বড় নদী এদেশে নাই। পাহাড়গুলি প্রধানতঃ বড় বড় পাইন গাছে ঢাকা, আর যে পাহাড়গুলি গাছশূন্য সেগুলি বরফে ঢাকা। মাঝে মাঝে অল্পবিস্তর সমতল ভূমি। গ্রাম, শহর সবই প্রায় পাহাড়ের গায়ে গায়ে অবস্থিত— স্থানে স্থানে সমভূমির উপর। পাহাড়ের বুকে বড় বড় পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে গ্রাম ও শহরগুলি এত চমৎকার দেখায়—বর্ণনা করা চলে না, চোখে দেখিয়া উপভোগ করিতে হয়। লোজান, জেনেভা প্রভৃতি বড় শহরগুলি প্রায়ই হ্রদের তীরে প্রতিষ্ঠিত। হ্রদের তীর হইলেও একেবারে সমভূমি নহে। অধিকাংশ স্থলেই পাহাড় ক্রমশঃ ঢালু হইয়া হ্রদে গিয়া নামিয়াছে। সাধারণতঃ এইরূপ জমির উপর বড় বড় শহরগুলি অবস্থিত পার্ব্বত্যদেশ হইলেও জমি খুব উর্ব্বর। এ যাবৎ যত দূর দেখিয়াছি তাহাতে বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলি বাদ দিলে অনুর্ব্বর রুক্ষ ভূমি চোখে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সমভূমির ত কথাই নাই, এমন কি ঢালু পাহাড়ের গায়ে পাথর দিয়া বাঁধিয়া স্তরে স্তরে কৃষিক্ষেত্র করা হইয়াছে। শস্যজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধানতঃ দ্রাক্ষা ফলমূল, শাকসব্জী, আলু, অন্যান্য তরকারী, গ... প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বসন্তকালে সমস্ত দেশটা ভরিয়া যায় নানা রকমের নানা রঙের ফুলে—সমস্ত দেশটা যেন মস্ত একটা ফুলের বাগান। প্রকৃতির এমনি বিচিত্র লীলা—শীতকালে সব সাদা হইয়া যায়। পাহাড় নদী, হ্রদ, গাছ, বাড়ি, মাঠ সব সাদা। তখনকার চেহারা দেখিয়া কল্পনায়ও আসে না যে বরফ পড়া বন্ধ হইলে এই দেশটাই আবার সবুজ হইয়া যাইবে! ভ্রমণকারীর দল দেশ-দেশান্তর হইতে ছুটিয়া আসে সুইজারল্যাণ্ডে এ... বোধ হয় সেই জন্য দেশটা ভরিয়া সুন্দর প্রশস্ত রাস্তা হ্রদের পাশ দিয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে শহর ও গ্রামের ভিতর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। ভ্রমণকারী দল কেহ বা পায়ে হাঁটিয়া, কেহ বা রেলে, কেহ বা মোটরে সমস্ত দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কেহ বা উঠিতেছে সমস্ত বিপদ বাধা তুচ্ছ করিয়া পর্ব্বতের চূড়ায়। যে... সকলের ভিতর একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া গিয়াছে—কে সবচেয়ে বেশী আনন্দ লুটিয়া লইবে এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার হইতে। বিদেশীদের ত কথাই না... এই দেশবাসীদেরও অদ্ভুত ভ্রমণ-লিপ্সা। ছুটির দি...



লেজাঁর পশ্চিম পাশের দৃশ্য

যখন গতানুগতিক কাজের চাপ থাকে না, দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ সব বাহির হইয়া পড়ে সমস্ত দিনটা কোথাও পাহাড়ে, জঙ্গলে বা হ্রদে কাটাইয়া দিবে বলিয়া। এদের এ লিপ্সায় বয়সের কোন বাধা নাই। সকলেরই সমান উৎসাহ। প্রায় সকলের পৃষ্ঠেই একটা করিয়া থলি—তাহাতে আছে খাবার ও পানীয়। অনেকে অতি-প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের আগেই বাহির হইয়া পড়ে—আবার সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়া আসে। প্রত্যেকের হাতে থাকে ফুলের গোছা; যেখানে গিয়াছে সেখান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। এ-রীতির ব্যতিক্রম দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের আকাঙ্ক্ষা, যত দিন বাঁচিবে তত দিন জীবনটাকে যতদূরসম্ভব আনন্দময় করিয়া রাখিবে।

সুইজারল্যাণ্ডের আবহাওয়া অতি উপাদেয়। সেই জন্য স্বাস্থ্যান্বেষীর দল চিরকাল এখানে আসে ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবার আশায়। দেশ-দেশান্তর হইতে লোকের আসার বিরাম নাই। সেই জন্যই সমস্ত দেশটায় হোটেল, স্বাস্থ্যনিবাসের অভাব নাই। হোটেল এবং স্বাস্থ্যনিবাস পরিচালনা এ-দেশের একটা প্রধান ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রভূত অর্থাগমও হইয়া থাকে। এদেশের আবহাওয়া এবং সূর্য্যকিরণের অসাধারণ সঞ্জীবনী শক্তির গুণে যক্ষ্মা-রোগীদের সহজে এবং অল্প সময়ে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হয়। চিকিৎসকরা যাহাদের নিরাশ করিয়া দিয়াছেন—মৃত্যু যাহাদের সময়সাপেক্ষ, তাহারা আসে তাহাদের দুর্ব্বল কঙ্কালসার দেহ লইয়া এই সুইজারল্যাণ্ডের কোলে। হয়ত আবার প্রাণে জীবনীশক্তির সঞ্চার হইবে—হয়ত মৃত্যুকে এড়ান যাইবে। আবার হয়ত সুস্থ সবল দেহ ফিরিয়া পাইবে—আবার হয়ত কর্ম্মকোলাহলময় সংসারে ফিরিয়া যাইবে। সুখে দুঃখে জড়ান এই পৃথিবীর মায়া কাটান বড় কঠিন—এ পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে কেহ বড় একটা চায় না—সুস্থ কর্ম্মঠ দেহ লইয়া লোকে বাঁচিতে চায়। দারিদ্র্যের নির্ম্মম পেষণও লোকে সহ্য করিতে পারে যদি তার সুস্থ কর্ম্মক্ষম দেহ থাকে। সুইজারল্যাণ্ডও ইহাদের প্রতি সদয়। এদেশের আবহাওয়ার গুণে, এদেশের

অনাবিল নিষ্কলঙ্ক সূর্য্যরশ্মি সেবনে মৃতপ্রায় রোগীদের জীবনীশক্তি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসে, আবার তাহারা সুস্থ সবল মানুষ হইয়া উঠে। এই ভাবে এই সুন্দর দেশটার বুকের অমৃতধারায় আজ কত শত যক্ষ্মারোগী বাঁচিয়া উঠিতেছে!



পর্ব্বতগাত্রে ক্ষুদ্র গ্রাম

স্যানাটোরিয়ামগুলিতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শুধু যক্ষ্মা-রোগীদের চিকিৎসাই হইত। অবশ্য সুইজারল্যাণ্ডের বাহিরে অন্যান্য দেশেও স্যানাটোরিয়াম আছে। কিন্তু আবহাওয়া ও সূর্য্যরশ্মি দ্বারা অস্ত্রোপচারে টিউবারকুলেসিস্ রোগের (Surgical tuberculosis) চিকিৎসা এই সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত লেজাঁ নামক স্থান ছাড়া অন্য কোথাও হয় না। গত ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার অগাষ্টা রোলিয়া নামে এদেশের একজন চিকিৎসক নূতন পদ্ধতিতে এই রোগের চিকিৎসা লেজাঁতে আরম্ভ করেন। ইহার পূর্ব্বে এ চিকিৎসার প্রচলন ছিল না। ডাক্তার রোলিয়া এবং তাঁহার নূতন প্রণালীগত চিকিৎসার খ্যাতি আজ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—শুধু পৌঁছে নাই আমাদের ভারতবর্ষে। এখানকার সাধারণ লোকের কথা ছাড়িয়া দিলে চিকিৎসকদের ভিতর খুব অল্প সংখ্যকই এ সংবাদ অবগত আছেন বলিলে অন্যায় হইবে না। এই চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আমাদের দেশের জনসাধারণ, বিশেষতঃ চিকিৎসকগণের গোচরীভূত করার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেজাঁর একটু বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে যাঁহার অধ্যবসায়-গুণে লেজাঁ আজ জগদ্বিখ্যাত সেই সূর্য্য-উপাসক ডাক্তার রোলিয়া প্রধানতঃ কি সূত্র হইতে সূর্য্য-চিকিৎসক হইয়া পড়িলেন সে-সম্বন্ধে সামান্য দুই-একটি কথা বলিতে চাই।

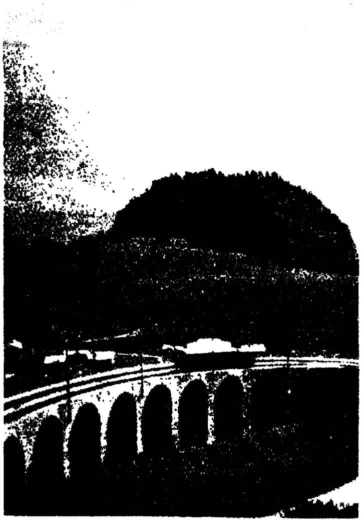
অগাষ্টা রোলিয়ার নিবাস সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত লোজানের (Lausanne) নিকটবর্ত্তী নোশাতেল নামক স্থানে। তাঁহার পিতা এক জন অধ্যাপক ছিলেন। অগাষ্টা স্কুলে অধ্যয়নকালে তাঁহার সহপাঠীদের ও নিজের গায়ের রঙের পার্থক্য লক্ষ্য করেন।



লেজাঁর অপর দৃশ্য

তাঁহার চামড়ার রং ফ্যাকাশে আর কৃষকদের ছেলেদের রোদে পোড়া। শারীরিক শক্তিতে কৃষকদের ছেলেরা তাঁহার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। এই সব ছেলেদের নিশ্চয়ই ভাল আহার-বিহারের ব্যবস্থা ছিল না। তবে তাহাদের শক্তি তাঁহার চেয়ে বেশী কেন? তিনি চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন রোদ লাগিয়া উহাদের শরীরের

চামড়ার রংও বদলাইয়াছে এবং দৈহিক শক্তিও বাড়িয়াছে। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের শরীরেও রোদ লাগাইতে সুরু করেন। ইহাই তাঁহার সূর্য্যোপসনার ভিত্তি। আর একটা (সাধারণের দৃষ্টিতে সামান্য) ঘটনায় সূর্য্যরশ্মির উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা



ইলেকট্রিক ট্রেন যাইতেছে

দৃঢ়তর হয়। তাঁহার কুকুরের পিঠে একটা গুল্ম (tumour) হয়। তাঁহার ছাত্রাবস্থা হইতেই অস্ত্রবিদ্যার প্রতি আস্থা ছিল। কাজেই কুকুরের পিঠে ছুরি চালাইলেন এবং অস্ত্রোপচারের পর যত্নসহকারে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাণ্ডেজ বাধিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার রোগীটি কিছুতেই ডাক্তারের বা ডাক্তারের ব্যাণ্ডেজের মর্য্যাদা রাখিল না। সে বিনা দ্বিধায় বিনা সঙ্কোচে দাঁত এবং নখের সাহায্যে ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়িয়া নিশ্চিন্ত হইল। ডাক্তারও ছাড়িবার পাত্র নহেন। পুনরায় রোগীর পিঠে ব্যাণ্ডেজ চাপিল। রোগীও কম বেহায়া নয়। এমন সুন্দর ব্যাণ্ডেজ অল্পক্ষণের ভিতরেই টুকরা টুকরা হইয়া ধূলিবিলুণ্ঠিত হইল। প্রত্যহই এই ব্যাপার চলিতে লাগিল। তার পর এক দিন রোলিয়া হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, রোগী নির্ব্বিকারচিত্তে তাহার পিঠে রোদ লাগাইতেছে—ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ অনাবৃত। এই ভাবে রোদ লাগাইয়া কয়েক দিনের ভিতরেই কুকুরের ক্ষত সম্পূর্ণ শুকাইয়া গেল!

বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক কোচার (Kocher) ছিলেন ডাক্তার রোলিয়ার গুরু। এই কোচারই সর্ব্বপ্রথম অস্ত্রোপচার দ্বারা আংশিকভাবে থাইরয়েড্ গ্লাণ্ডের অপসারণ করেন। ইঁহার হাতযশ অদ্ভুত এবং অসীম ছিল। কিন্তু গুরুর শিষ্যত্বকালেই রোলিয়া উপলব্ধি করিলেন যে কোচারের ছুরি ব্যাধি-মুক্ত করে বটে, কিন্তু পঙ্গুত্ব নিবারণ করিতে পারে না, এমন কি অস্ত্রোপচারের ফলে মৃত্যুও ঘটিতে পারে। এই উপলব্ধি তাঁহার মনে প্রবল



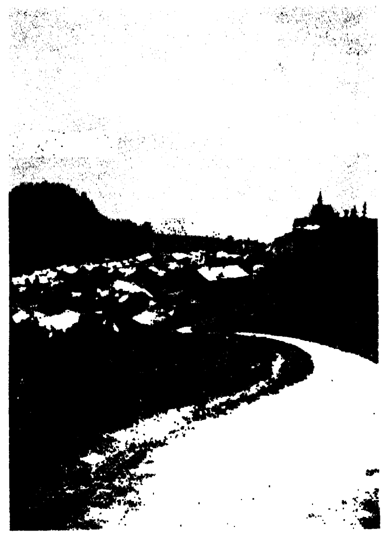
ডেয়ারী—লেজ্যাঁ

আঘাত করে। পঙ্গুত্ব আর মৃত্যু রোধ করিতে পারে না এই অস্ত্রোপচার—তবে? অগাষ্টের এক বন্ধু সিঁড়ির উপর পড়িয়া গিয়া আঘাত পাওয়ার ফলে কটিদেশে টিউবার-কুলেসিস্ হয়। রোগী মনে করিলেন, বিশ্রাম লইলে আরোগ্যলাভ করিবেন। কিন্তু কোন ফল না হওয়ায় কোচারের নিকট গমন করেন—সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী বেয়ার্ন নগরে। কোচার ছুরি চালাইয়া অতি সন্তর্পণে বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত অংশসমূহ সম্পূর্ণরূপে



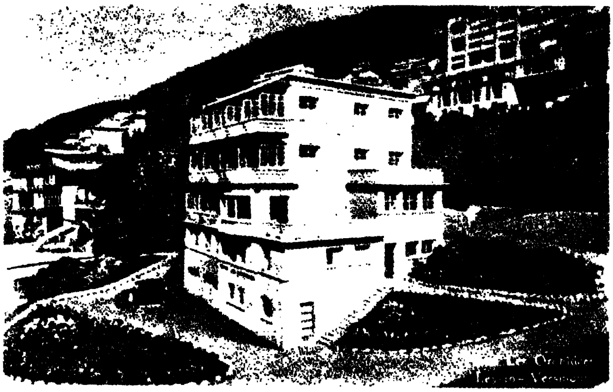
ডাক্তার অগাষ্ট রোলিয়া

নির্ম্মূল করিয়া অপসারিত করেন। ফলে রোগীর পা দৈর্ঘ্যে একটু ছোট হইয়া গেল। রোগী মনে করিলেন, ইহাতে কিছু ক্ষতি হইবে না বরং পরম আনন্দের বিষয় এই যে, চিরদিনের জন্য এই দুরন্ত ব্যাধির হাত হইতে মুক্ত হওয়া গেল। রোগী আবার স্বকাজে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার সে আনন্দ বেশীদিন স্থায়ী হইল না। হাঁটুতে রোগের আক্রমণের লক্ষণ পুনরায় ফুটিয়া উঠিল। কোচার আবার ছুরি চালাইলেন। কিন্তু রোগ তবুও ছাড়িল না। ক্রমে ক্রমে পায়ের এক অংশ ও একটি আঙুলেও ছুরি চলিল। তবুও রোগের শেষ নাই। অবশেষে হতভাগ্য রোগীর স্কন্ধ আক্রান্ত হয়। কোচার সেখানেও অস্ত্র চালাইলেন। কিন্তু সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। রোগী ডাক্তারকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় লইয়া ঘরে ফিরিলেন। কিন্তু আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না; রোগী আত্মহত্যা দ্বারা জীবনের অবসান করিল। রোলিয়ার মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। এই ভাবে চারি বৎসর কাটিল; রোলিয়ার মন আলোড়িত হইতে লাগিল। তাই ত কোচারের অস্ত্রোপচারের পরও শতকরা ৫০ জন রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়! ইহার প্রতীকার কি? ক্রমশঃ এই মৃত্যু-বিভীষিকা হইতে রোলিয়ার মনে এক তথ্য জাগিয়া উঠিল। যক্ষ্মা-বীজাণু দেহের সর্ব্বত্র ছড়ান থাকে—যদিও আক্রমণ স্থানবিশেষে নিবদ্ধ থাকিতে পারে। সুতরাং অস্ত্রোপচার দ্বারা আক্রান্ত অংশ কাটিয়া বাদ দেওয়া যাইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাতে রোগ শরীর হইতে দূর



লেজার আংশিক দৃশ্য

হয় না। সুতরাং এমন চিকিৎসা চাই যাহাতে রোগ সর্ব্বশরীর হইতে বিদূরিত হয়। রোলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে আর একটি ঘটনা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গেল একেবারে লেজাঁতে। যাঁহাকে জীবনসঙ্গিনী করিবেন স্থির করিয়াছেন দুরন্ত যক্ষ্মারোগে তিনি মরণাপন্ন। তাঁহাকে লেজাঁতে স্থানান্তরিত করা হয়। এদিকে রোলিয়া তখন বিচক্ষণ অস্ত্রচিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি লাভ করিতেছিলেন;—তাঁহার পসার-প্রতিপত্তিও কম নহে। কিন্তু তিনি তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থ—এ-সকলের মায়া কাটাইয়া চলিয়া আসেন প্রেয়সীর সঙ্গে লেজাঁতেই এবং এই ক্ষুদ্র প্রান্তেই



'লেজোঁশিদ' হোটেল

ছেলেবেলার খেলার সাথীদের ছবি—তাহারা সব ছিল রোদে-পোড়া, কোনদিন অসুখ করে নাই। ভাসিয়া উঠিল সেই কুকুরের সূর্য্যচিকিৎসার দৃশ্য, আর সেই আত্মঘাতী হতভাগ্য বন্ধুর ছবি কোচারের মত যশস্বী অস্ত্রচিকিৎসকও তাঁহাকে নীরোগ করিতে পারিলেন না—তাঁহাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না! তবে অস্ত্রোপচারের উপর কিরূপে ভরসা করা যায়? আবার অন্যদিকে চোখের সমনে লেজ্যাঁর রোগীদের

চিকিৎসা-ব্যবসা সুরু করেন। ইহাই ভবিতব্য। ক্ষুদ্র গ্রাম লেজ্যাঁ চিকিৎসা-জগতে অনন্ত খ্যাতি লাভ করিবে ইহাই নিশ্চয় বিশ্বনিয়ন্তার বিধান ছিল, নতুবা ঘটনা-পরম্পরায় রোলিয়ার এই ক্ষুদ্র গ্রামে সাধারণ গ্রাম্য চিকিৎসকরূপে চিকিৎসা আরম্ভ করার কোন হেতুই ছিল না। তিনি এই সামান্য গ্রামে আড়ম্বরশূন্য চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। সামান্য গ্রাম, তাঁর নিজের যন্ত্রাদিও সামান্য এবং উপযুক্ত ঔষধপত্র এবং অন্যান্য উপকরণেরও যথেষ্ট অভাব। তবুও চিকিৎসা চলিল—অস্ত্রোপচার, ধাত্রী-বিদ্যাবিষয়ক (Obstetrician), প্রসূতিবিদ্যাবিষয়ক (Gynaecologist) সকল প্রকার চিকিৎসাই তাঁহাকে করিতে হইত। কিন্তু শহরের সংস্কার তখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই; তাই তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, এত অপরিচ্ছন্নতার ভিতরেও রোগীরা বেশ সহজেই আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। অস্ত্রোপচারে ক্ষত বেশ শুকাইতে লাগিল, প্রসূতিরাও সহজেই সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অথচ শহরের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখিয়াছেন সর্ব্বপ্রকার সাবধানতা সত্ত্বেও সর্ব্বত্র পচনক্রিয়া (sepsis) প্রতিরোধ করা যায় না। কেন এমন হয়,—রোলিয়া দিনরাত ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে এই মনীষীর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল

দৃশ্য। কি এ অদ্ভুত শক্তি যাহার প্রভাবে এত দারুণ অপরিচ্ছন্নতার ভিতরও এত সহজে রোগীরা নিরাময় হইয়া উঠে? ভাবিতে লাগিলেন আর ক্রমশঃ যেন সব পরিষ্কার হইতে লাগিল। এদিকে তাঁর প্রেয়সীও ক্রমশঃ লেজ্যাঁর আবহাওয়া ও সূর্যারশ্মির গুণে সুস্থ সবল হইয়া উঠিলেন। এই মহিলাকে এখন দেখিয়া কেহ বলিতে পারিবে না ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। রোলিয়ার মনে কোন দ্বিধা রহিল না, বুঝিলেন সূর্য্যরশ্মির অদ্ভুত এবং অনন্ত ক্ষমতা, তাই তিনি এই শক্তিকে মানুষের হিতার্থ নিয়োজিত করিতে ব্রতী হইলেন। আজ ত্রিশ বৎসরের উপর হইল রোলিয়া তাঁহার এই ব্রতে ব্রতী আছেন। এই সুদীর্ঘ কালের ভিতর কত মৃতপ্রায় রোগীকে এই সঞ্জীবনী শক্তিদ্বারা পুনর্জীবিত করিয়াছেন, কত রোগীকে পঙ্গুত্ব হইতে রক্ষা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। মানব-সমাজ এই মহাপুরুষের কাছে চিরঋণী থাকিবে। রোলিয়ার প্রশস্ত বক্ষ, সুদীর্ঘ শক্তিমান দেহ দেখিয়া কেহ ধারণাও করিতে পারিবে না ইঁহার বয়স আটষট্টি বৎসর। চলনভঙ্গী দেখিলে মনে হয় শক্তিশালী যুবক। শরীরের চামড়া রোদে পুড়িয়া অনেকটা আমাদের চামড়ার রং ধারণ করিয়াছে। রোদের সময় তিনি ছাতা বা টুপী ব্যবহার করেন না। সদাপ্রফুল্ল মুখ, মিষ্ট ছাড়া কখনও কটু কথা বল



'লে শালে' ক্লিনিক

ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়া দেখিতে হয়। রোগী দেখা ছাড়া তিনি নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেছেন। লোজান বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রদের লেক্‌চার দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক কাজ ইঁহাকে করিতে হয়। আর একটা বড় কাজ—পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে পত্রব্যবহার। লেজাঁর চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে ডাক্তাররা আসেন এবং সাধারণ লোকও এখানকার ক্লিনিকগুলি দেখিবার জন্য আসিয়া থাকেন। এই আগন্তুকদের সব দেখান-বুঝান এও একটা বড় কাজ। নানা দেশের ভাষা রোলিয়াকে শিখিতে হইয়াছে। এসব ছাড়া নিজের পুস্তক ইত্যাদি লেখা আছে। যতই এই লোকটিকে দেখিতেছি ততই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছি। পৃথিবীজোড়া তাঁহার নাম, অথচ কোন আস্ফালন নাই, আড়ম্বর নাই, নাম জাহির করার আগ্রহ নাই, নীরবে কাজ করিয়া যাইতেছেন। আলস্য, অবহেলা, বিরক্তি তাঁহার ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না। নিজের সাধনায় ডুবিয়া আছেন—অথচ বহির্জগতের সঙ্গেও যথেষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। শুধু অবাক হইয়া দেখি কত মহান্ এই সরল সদাপ্রফুল্ল মানুষটি! মাথা আপনিই ভক্তিতে নত হইয়া আসে—ইঁহারাই জগদ্বরেণ্য, ইঁহারাই সত্যিকার মানুষ।

সামান্য মাত্র বিরক্তিব্যঞ্জক কথা তাঁহার মুখে শুনি নাই। আজ চার মাসের উপর হইল প্রতিনিয়ত তাঁহার সঙ্গে ক্লিনিকে ক্লিনিকে ঘুরিয়া কত রোগী দেখিয়াছি এবং দেখিতেছি, কিন্তু মনে হয় না কোন দিন তাঁহার মুখে হাসি ছাড়া বিরক্তির কোন চিহ্ন দেখিয়াছি। বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন মেজাজের রোগী—প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন সব হাসিমুখে! এ যে কত বড় সংযম তাহা কল্পনা করা যায় না। এরূপ সংযম দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইঁহাকে দেখিলে রোগীদের যে কিরূপ আনন্দ হয় তাহা লক্ষ্য করিবার মত। চিকিৎসক এমনই হওয়া দরকার। রোগীরা জানে রোলিয়া তাহাদের আরোগ্য করিবেন, তাঁহার উপর রোগীদের অগাধ বিশ্বাস। এ বিবৃতি কণামাত্রও অতিরঞ্জিত নহে। এরূপ অভিজ্ঞতা, ডাক্তার ও রোগীর এমন মধুর সম্পর্ক—এই প্রথম দেখিলাম। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিতেছি বলিয়া গৌরব বোধ করি। এ বয়সেও তিনি এত পরিশ্রম করেন দেখিলে অবাক হইতে হয়। ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিয়া যাইতেছেন—ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, কাজের ভিতর কোথাও কোন ত্রুটি নাই, বিশৃঙ্খলা নাই। তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রায় চল্লিশটি ক্লিনিক। সবগুলি

আলপ্‌স্ পর্ব্বতমালার ভডোয়া অংশে অবস্থিত একটি গ্রাম লেজাঁ। গ্রামটি অতি প্রাচীন। এই গ্রামটির উল্লেখ ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। এত প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও লেজাঁকে ছোটখাট গ্রামরূপেই পাই; তবে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য ইহার খ্যাতি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। লেজাঁ এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য

বহুকাল ধরিয়া ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করিতেছে। কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধা ও বাসোপযুক্ত গৃহের অভাবের দরুন ভ্রমণকারীর সংখ্যা খুব কম ছিল। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও চিকিৎসকগণ তাঁহাদের কোন কোন রোগীকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে পাঠাইতেন। যে-সব রোগী লেজ্ঁাতে আসিত তাহাদের স্বাস্থ্যের অতি দ্রুত ও আশ্চর্য্যজনক উন্নতি দেখা যাইত। বোধ হয় এই কারণেই দু-একটি করিয়া যক্ষ্মারোগীও লেজ্ঁাতে আসিতে থাকে। লেজ্ঁায় অবস্থানকালে এই রোগীদের স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি লক্ষিত হওয়ায় ক্রমশঃ এই গ্রামটির দিকে চিকিৎসক ও অপরাপর লোকের দৃষ্টি পড়ে। ইহার আবহাওয়ায় অদ্ভুত জীবনীশক্তি আছে—এই ধারণায় এখানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আরম্ভ হয়, এবং পরীক্ষা দ্বারা ইহার আবহাওয়া সম্বন্ধে আশ্চর্য্য রকম তথ্য জানা যায়। যক্ষ্মা-রোগীরা এই আবহাওয়ায় থাকিয়া রোগ-বীজাণুর আক্রমণ সহজে প্রতিরোধ করিতে পারিবে এই ধারণায় রোগীদের বাসের জন্য স্যানাটোরিয়াম নির্ম্মাণের সূচনা হইল। এতদুদ্দেশ্যে "লা সোসিয়েট ক্লিমাটেরিক দা লেজ্ঁা" (La Sociate Climaterique de Leysin") নামক প্রতিষ্ঠানটি সংগঠিত হয়। এই সোসাইটির চেষ্টায় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে "গ্র্যাণ্ড হোটেল স্যানাটোরিয়াম" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্যানাটোরিয়াম প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে লেজ্ঁাতে এত অধিক-সংখ্যক ক্ষয়রোগী আসিতে থাকে যে আর একটি স্যানা-টোরিয়ামের প্রয়োজনীয়তা কর্ত্তৃপক্ষ অনুভব করিতে থাকেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মঁ ব্ল্ঁা (Mont Blanc) নামে আর একটি বৃহৎ স্যানাটোরিয়াম স্থাপিত হয়। ইহার পর হইতে লেজ্ঁার সৌভাগ্যরবি অতি দ্রুত উদিত হইতে থাকে। লোকসমাগমের সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াতের অসুবিধা দূর করা অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এখানে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ইলেকট্রিক ট্রেনের প্রচলন হয়। ফলে যাতায়াতের অসুবিধা দূর হইয়াছে। লেজ্ঁা হইতে প্রায় চার হাজার ফুট নীচে এগ্‌ল্ (Aigle) পর্য্যন্ত এই গাড়ী চলে। এগ্‌ল্ সুইস্ ফেডেরেল রেলওয়ের একটি ষ্টেশন। এগ্‌ল্ হইতে ট্রেনে লেজ্ঁা পর্য্যন্ত আসিতে মাত্র ৪৫ মিনিট সময় লাগে। পূর্ব্বাহ্লে রেল-কোম্পানীকে জানাইলে রোগীদের জন্য বিশেষ গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য এজন্য কিছু অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয়। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন—সুইজারল্যাণ্ডের সমস্ত রেলগাড়ী বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে।



লেজ্ঁার সাধারণ দৃশ্য

ট্রেনের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যপ্রকার উন্নতিও পরি-লক্ষিত হয়। বহু গৃহ নিশ্মিত হইতে লাগিল, দোকানপাট বসিল, স্যানাটোরিয়ামের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল। ক্রমশঃ দু-একটি করিয়া হোটেল গড়িয়া উঠিতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠানের চেষ্টাতেই গোড়াতে গ্রামটির উন্নতি হইতে থাকে। প্রথম দিকে এই সোসাইটিই অধিকাংশ গৃহ নির্ম্মাণ এবং পূর্ব্ব হইতে যে-সব গৃহ বর্ত্তমান ছিল তাহার কতক কতক প্রয়োজনানুযায়ী ক্রয় করে। ক্রমশঃ আরও স্যানাটোরিয়াম নির্ম্মিত হয়।

টুর দ' আই (Tour d' Ai) নামক পাহাড়ের ক্রমশঃ ঢালু দক্ষিণ অংশে লেজ্ঁা গ্রামটি অবস্থিত। ইহার উচ্চতা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট। স্থানটি দুই ভাগে বিভক্ত। উপরের অংশের নাম ফেডে (Feydey) এবং নিম্নভাগ লেজ্ঁা গ্রাম

বলিয়া অভিহিত। অবস্থানহেতু স্থানটির আবহাওয়া অতীব উপভোগ্য। পাহাড়ের দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া উত্তরের অতিশয় ঠাণ্ডা হাওয়া লেজ্‌ঁার উপর বহিতে পারে না। যে পাহাড়ের গায়ে লেজ্‌ঁা অবস্থিত সেই পাহাড়ই উন্নত প্রাচীরের ন্যায় উত্তরের হাওয়ার সামনে দণ্ডায়মান। এই প্রাচীরে লাগিয়া উত্তরের ঠাণ্ডা কন্‌কনে ঝড়ো হাওয়া প্রতিহত হয়। লেজ্‌ঁাতে প্রায় সর্ব্বদাই অতি মৃদু হাওয়া বহিতেছে। কদাচিৎ ঝড়ো হাওয়া বা প্রবল হাওয়ার উদ্রেক হয়। এই মৃদু হাওয়ার জন্যই সূর্য্যরশ্মি-চিকিৎসার পক্ষে স্থানটি এত বাঞ্ছনীয়। যেখানে জোর হাওয়া চলে সেখানে রোগীরা এমন ভাবে অনাবৃত দেহে সূর্য্যরশ্মি লাগাইতে পারে না, বিশেষতঃ শীতকালে রোদ লাগান অসম্ভব হইয়া পড়ে। এখানে সাধারণতঃ নবেম্বর মাসে তুষারপাত আরম্ভ হয়। ডিসেম্বরের শেষভাগে প্রবল তুষারপাত হয়, কিন্তু প্রবলতা দিন-কয়েকের বেশী স্থায়ী হয় না। তুষারপাতের পরই আবার আকাশ পরিষ্কার হইয়া উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে ভরিয়া যায় এবং রোগীরা সকাল ৯টা হইতে সন্ধ্যা ৪টা পর্য্যন্ত অনাবিল সূর্য্যালোক উপভোগ করিতে পারে। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে লেজ্‌ঁার আবহাওয়ার একটা নমুনা পাওয়া যাইবে :—

গ্রীষ্মকাল—দৈনিক উত্তাপ (গড়ে)		
		১২·৭ ডিগ্রী (সেন্টিগ্রেড)
শীতকাল	...	০·৫০ ” ”
গড়ে জলীয় কণা		৬৫·৮০%
বাৎসরিক প্রেসিপিটেশ্যন্		১২১৯ মিলিমিটর
গ্রীষ্মে—দিবাভাগের পরিমাণ (গড়ে)		
”	” (জুন)	১৯৪ ঘণ্টা
”	” (জুলাই)	২১৯ ”
শীতকালে	” (ডিসেম্বর)	৯৬ ”
”	” (জানুয়ারি)	১১০ ”
”	” (ফেব্রুয়ারি)	১৩৩ ”

লেজ্‌ঁার দক্ষিণে ও পশ্চিমে সুবিস্তীর্ণ রোন্ উপত্যকা এবং তাহার পর ডেণ্ট ডু মিডি (Dent du midi), মঁ ব্লাঁ প্রভৃতি পর্ব্বতমালা বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই উপত্যক ভিতর দিয়া রোন্ নদী প্রবাহিত হইতেছে। লেজ হইতে প্রায় চার হাজার ফুট নীচে এই উপত্যকা। এথ হইতে এই উপত্যকার শোভা পরম মনোরম দেখায় মুসৌরী হইতে ডুন ভেলীর দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছে তাঁহারা এই দৃশ্য সহজে কল্পনা করিতে পারিবেন। রা যখন উপত্যকার বিভিন্ন গ্রাম এবং শহরগুলিতে বৈদ্যুতি আলো জ্বলিয়া উঠে, তখন মনে হয় অগণিত উজ্জ্বল নক্ষ এই উপত্যকার বুকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে দৃশ্য ক সুন্দর, কল্পনায় উপলব্ধি করা অসম্ভব। স্যানাটোরিয় এবং ক্লিনিকগুলি এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে সম্মুখে তুষারাবৃত পর্ব্বত ও রোন্ উপত্যকা চোখে পড়ে লেজ্‌ঁার আশপাশে বহু বিস্তৃত মাঠ—তাহার কতকগু গোচারণভূমি। বসন্তকালে এই সব মাঠ ফুলে ভরিয়া যায় এরূপ ফুলের মাঠ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া ম হয় না। শীতকালে বরফে সব সাদা হইয়া যায় এবং শীতে সঙ্গে সঙ্গে বরফ লুপ্ত হইয়া যায়। এপ্রিল মাসের প্র সপ্তাহে এখানে আসিয়া দু-এক স্থান ছাড়া বরফ দেখা য না। অবশ্য কতক কতক পাহাড়ে সারা এপ্রিল মাসে বর থাকে। আবার কতক কতক পাহাড় চিরতুষারাবৃত পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ এমন খোলা যে সমস্ত দিন লেজ উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত থাকে। মাত্র ৫০ বছ পূর্ব্বেও লেজ্‌ঁা সাধারণ গ্রাম মাত্র ছিল। তখন লোক সংখ্যা ছিল মাত্র চারি শত। আর এই ৫০ বছরের ভিতর ইহা শহরে পরিণত হইয়াছে—যদিও গ্রামই বলা হ এবং লোকসংখ্যা পাঁচ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। উন্নতি পরিমাণ ইহা হইতে ধারণা করা যায়। আজ সম পৃথিবী লেজ্‌ঁার খোঁজ রাখে। পাঁচ-ছয়-সাত তালা প্রকা প্রকাণ্ড বাড়ি—কোনটা স্যানাটোরিয়াম, কোনটা ক্লিনিক ছোটবড় নানা প্রকার হোটেল, রকমারী দোকান—সম মিলিয়া ৫০ বছর পূর্ব্বের ক্ষুদ্র লেজ্‌ঁাকে আজ শহরে পরিণত করিয়াছে। বৈদ্যুতিক আলো, জলের কল, মোট গাড়ী, সিনেমা, রেডিও কোন কিছুরই অভাব নাই সুন্দর প্রশস্ত রাস্তা লেজ্‌ঁার আশপাশে এবং দূরে—দূরে গিয়াছে। এমন কি, ইটালী, ফ্রান্স, প্রভৃতি বিভি

বহির্জ্জগৎ

শ্যামরাজ্যের ভবিষ্যৎ

গত কয়েক বৎসর যাবৎ শ্যামরাজ্যে কয়েকটি বিপ্লব হওয়ায় হা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। নানা দেশে নানা পত্রে খনও এই রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। সম্প্রতি একটি সংবাদে কাশ, শ্যামের রাজা প্রজাধিপক সিংহাসন ত্যাগ করিবার চ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কারণ, রাজার বিনা অনুমতিতে পরাধীকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড দেওয়া যাইবে—থাকার ব্যবস্থা-পরিষদ এইরূপ একটি আইন পাস করিয়াছেন। আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইলে রাজার সম্মতি প্রয়োজন। রাজা প্রজাধিপক এই আইনটিতে সম্মতি না দিয়া উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। পরে একটি সংবাদে জানা গিয়াছে, শ্যামের ব্যবস্থা-পরিষদের কয়েক জন প্রতিনিধি আইনটির মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া রাজাকে তাঁহার বর্ত্তমান সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বিলাতযাত্রা করিয়াছেন। রাজা প্রজাধিপক চক্ষু-চিকিৎসার জন্য এখন বিলাতের সারে নগরে অবস্থিতি করিতেছেন।

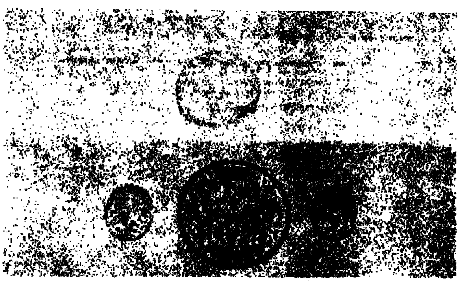


শ্যামরাজ্যের স্থাপত্যের একটি নিদর্শন

ভারতবাসীমাত্রেই আর একটি কারণে শ্যামরাজ্য সম্বন্ধে গৌরব অনুভব করিয়া থাকে। শ্যাম ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতি-সংমিশ্রণে ভারতবর্ষের আত্মজ। শ্যামের অধিবাসীদের শতকরা আটানব্বই জন বৌদ্ধ। সম্রাট অশোকের সময়ে শ্যাম বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ইহার পূর্ব্বেকার ইতিহাস এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই—এই উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান সুরু হইয়াছে মাত্র। তবে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে শ্যামরাজ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মও যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ









আছে। রাম, সীতা, বিষ্ণু, গণেশ ও অন্যান্য দেবতার মূর্ত্তি ও রামায়ণ-মহাভারতের চিত্রাবলী শ্যামরাজ্যের মঠ ও মন্দির অলঙ্কৃত করিয়া আছে। অযোধ্যা, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, বিষ্ণুলোক ইত্যাদি জায়গার নাম—লোকের নামও ভারতীয় নামের অনুরূপ। এমন কি 'শ্যাম' নামটিও ভারতীয়। বিশেষজ্ঞদের মতে শ্যামজাতিরা আর্য্য ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত।



ব্যাঙ্কক রাজ প্রাসাদের মধ্যস্থিত 'ভাট ফ্রা কেও' মন্দির। এই মন্দিরে প্রসিদ্ধ মরকতমণি নির্ম্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তি অবস্থিত। বাহিরে সিংহ ও দানবের মূর্ত্তি

শ্যাম দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র। তাহার আভ্যন্তরিক বিপ্লবের কথা শুনিলে এশিয়াবাসীর ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক আশঙ্কা, বুঝি-বা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াখণ্ডের একমাত্র হিন্দু (ব্যাপক

চিত্র—বামপার্শ্বে উপর হইতে

রাজা প্রজাধিপক গণতন্ত্রমূলক শাসনপত্রে স্বাক্ষর করিতেছেন।

শাসনপত্র রাজা প্রজাধিপকের নিকট এই ভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে।

শাসনপত্রে রাজার স্বাক্ষর ও সিলমোহর।

রাজার স্বাক্ষরের পর শাসনপত্র হস্তে জন-পরিষদের সভাপতি কায়া বিজয়নতি। এক জন রাজ কর্ম্মচারী ইহা পাঠ করিতেছেন।

অর্থে) স্বাধীন রাষ্ট্র থাকায় বিপ্লবের ফলে পরপদলাঞ্ছিত হইতে থাকিবে। কিন্তু এরূপ আশঙ্কার যে কারণ নাই গত দুই বৎসরের ঘটনাবলী তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

নানা উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়া শ্যাম ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান চক্রী-রাজবংশের অধীনে আসে। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রা বুদ্ধ যোদ ফা চুলালক। ইনি শ্যামের রাজধানী আয়ুধিয়া (অযোধ্যা ?) নগরী হইতে ব্যাঙ্ককে লইয়া আসেন। আজিও ব্যাঙ্ককই শ্যামের রাজধানী। প্রজাধিপক এই বংশের সপ্তম রাজা। প্রথম ছয় জন রাজা সরকারী ভাবে প্রথম রাম, দ্বিতীয় রাম ইত্যাদি নামে অভিহিত হইতেন।

রাজা পঞ্চম রাম চুলালঙ্করণের রাজত্বকালে (১৮৬৮---১৯১০) শ্যামদেশে নানা বিষয়ে উন্নতি হইতে থাকে। এই সময়ে শ্যামের সর্ব্বত্রই রাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রীতদাস-প্রথা লোপ, বিচার-বিভাগ সংস্কার, রেল প্রচলন, জল ও স্থলবাহিনী পুনর্গঠন প্রভৃতি কার্য্যের



দক্ষিণ পার্শ্বে—
বুদ্ধদেবের জীবনের একটি চিত্র: রাজকুমার সিদ্ধার্থ রাত্রিকালে অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চিরতরে কপিলাবস্তু ত্যাগ করিতেছেন। উত্তর শ্যামের ফিৎসানুলকস্থ মন্দিরে ইহা অবস্থিত।



দ্বারা পঞ্চম রাম চক্রী-রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ষষ্ঠ রামের আমলে (১৯১০--১৯২৫) শ্যাম সর্ব্বত্র স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। দক্ষিণ-এশিয়ার বহু দেশ ইউরোপীয় শক্তিসমূহ পুরাপুরি গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে; শ্যাম স্বাধীনতা অটুট রাখিলেও সন্ধি-পত্র বা চুক্তি-পত্রের ছলে তাহাদের প্রভাবে পড়িয়াছিল। শ্যামরাজ ষষ্ঠ রাম বিদেশী শক্তিবৃন্দের প্রভাব বিমুক্ত হইতে চেষ্টা করেন এবং কতকাংশে সফলকাম হন। শ্যামের বাট্টানীতি এই সময়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির নানা আয়োজনও চলিতে থাকে। এই সময় প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামবাসীরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করে।

শ্যামের বর্ত্তমান অধিপতি রাজা প্রজাধিপক ১৯২৫ সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বামপার্শ্বে—
রামায়ণের একটি চিত্র। শ্যামরাজ্যে নর্ত্তকরা এইরূপ অভিনয় করে।

তাঁহার রাজত্ব কাল কয়েকটি কারণে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

পঞ্চম রামের সময় হইতে শ্যামের বিভিন্ন দিকে উন্নতি হইতে থাকিলেও কোন রাজাই গণতন্ত্রমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হন নাই। রাজা চিরাচরিত প্রথায় সর্ব্বময় কর্ত্তারূপেই বিরাজ করিতেন। সরকারী সর্ব্বোচ্চ হইতে সর্ব্বনিম্ন পদটি পর্য্যন্ত শ্যাম রাজ-পরিবারের বা রাজ-পরিবারের সহিত সংবদ্ধ লোকই নিযুক্ত হইতেন। ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতারও অবধি ছিল না। শ্যামবাসী জননেতাদের ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন, বিদেশের বিভিন্ন শাসন-প্রথার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে পরিচিত হইয়াছেন; রাজপদ অব্যাহত রাখিয়া কিরূপে গণতন্ত্রমূলক শাসন-নীতি প্রচলিত হইতে পারে এখন তাহারই উপায়-চিন্তা করিতে লাগিলেন। কোথাও সাড়া-শব্দ নাই, ১৯৩২ সনের ২৪এ এপ্রিল শ্যামরাজ্যে অভিনব ধরণের বিপ্লব দেখা দিল। জননেতারা নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনীর সাহায্যে রাজ-পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রাসাদে আটক করিলেন। রাজধানী ব্যাঙ্কক ও সমগ্র শ্যামরাজ্যের জনগণের মধ্যে যাহাতে কোনরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না-হয় পূর্ব্ব হইতেই তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। বাহির হইতে কেহই বুঝিতে পারিল না যে, শ্যামরাজ্যের শাসনতন্ত্রের ওলট-পালট হইয়া যাইতেছে। রাজা ও রাণী এই সময় হুয়া হিন নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একটি নৌবাহিনী তাঁহাকে রাজধানীতে আনিবার জন্য প্রেরিত হইল। ইতিমধ্যে তারযোগেই নেতারা শাসন-তন্ত্র পরিবর্ত্তনে রাজার সম্মতি পাইয়াছিলেন। রাজা-রাণীর প্রত্যাগমনে ব্যাঙ্কক নগরীতে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্যাঙ্ককের নর-নারী বিবিধ আয়োজন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে জননেতারা গণতন্ত্রমূলক একটি শাসন-তন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। ইহা অল্পাধিক ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অনুরূপ। ইহা দ্বারা রাজার নিকট আনুগত্য স্বীকার করিয়া জনপ্রতিনিধিরা সরকারী সর্ব্ববিধ কার্য্যই সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছেন। রাজা প্রজাধিপকের প্রারম্ভিক অনুমতিক্রমে ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচনা হইবার পর একটি চরম নিয়মপত্র গঠিত হইল। ১৯৩২ সনের ১০ই ডিসেম্বর রাজা ইহাতে স্বাক্ষর করিলেন। ইহার পর ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সনের প্রারম্ভেও শাসনব্যাপারে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু বিদেশে প্রকাশ পাইল—শ্যামে বিপ্লব উপস্থিত! সে যাহা হউক, শ্যামের এই 'বিপ্লব' সম্পূর্ণ রক্তপাতবিহীন ভাবেই হইয়াছে। ইহাতে জগতের দৃষ্টি আরও বেশী করিয়া শ্যামের দিক আকৃষ্ট হইয়াছে।



রাজ প্রাসাদের নর্ত্তক-নর্ত্তকী। প্রাচীনকালের ভারতবর্ষীয় দেবমন্দিরের নর্ত্তক-নর্ত্তকীদের আদর্শে ইহারা শৈশব হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে।

এবারে রাজা প্রজাধিপক কেন সিংহাসন ত্যাগ করি সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা প্রারম্ভেই বলিয়াছি। শ্যামের ব্যব পরিষদ যতটা পরিবর্ত্তন সাধন করিতে চান তিনি ততটা না। তিনি আরও বলিয়াছেন, শ্যামের ব্যবস্থা-পরিষদ তে জনপ্রতিনিধিমূলক নহে। কাজেই এরূপ আইন পরিবর্ত্তন ব্যাপ জনগণের ভোট লওয়া প্রয়োজন। শ্যামরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এ নানা জল্পনা কল্পনা চলিতেছে

শ্যামের কথা বলিতে গেলে আর একটি দিকে আমাদের স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। শ্যামের মঠ-মন্দির সর্ব্বদেশে প্রশংসিত। রা প্রাসাদের মরকতমণি নির্ম্মিত বৌদ্ধমূর্ত্তি কারুকার্য্যে ও গঠন-রীতি অতুলনীয়। অযোধ্যা, ব্যাঙ্কক প্রভৃতি নগরীতেই যে সুন্দর মন্দির আছে তাহা নহে। সুদূর পল্লীপ্রান্তেও অনুরূপ কারুকা খচিত মন্দির বিরাজ করিতেছে। মন্দিরের মূর্ত্তি ও চিত্রাবলী হই মনে হয় শ্যামরাজ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। কারণ ই দুইটি প্রধান অঙ্গ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের নৈসর্গিক মিলনে গরীয়ান!



বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অভ্যর্থনায় শোভাযাত্রার দৃশ্য

...কংগ্রেসের এই অধিবেশনকে, "দর্শনযোগ্যতার দিক্ দিয়া কেবল অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত বলিয়াই বর্ণনা করা যায়।" ষাট হাজার লোক বসিবার মত জায়গা করা হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবক ও দেশসেবিকা নামধারিণী স্বেচ্ছাসেবিকাদের দ্বারা বিশাল জনতার গতিবিধি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। দেশসেবিকাদের নেত্রী ছিলেন কুমারী সোফিয়া সোমজী। মধ্যে মধ্যে গোলমাল যে হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু মোটের উপর সুশৃঙ্খল ভাবেই কাজ চলিয়াছিল। উচ্চ ও বিস্তৃত একটা বেদীতে সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতারা এবং সমধিক অর্থদাতা অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যেরা বসিয়াছিলেন। বক্তাদের জন্য একটি উচ্চতর মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ধ্বনির উচ্চতাবিধায়ক যন্ত্রের (loud-spekerএর) সুবন্দোবস্ত থাকায় প্রত্যেক বক্তার ও সভাপতির কথা সুবিস্তৃত সভাস্থলের দূরতম স্থান হইতেও স্পষ্ট শোনা গিয়াছিল। যখনই কোন বক্তা মঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিতেন, অমনি চারিদিক হইতে তাঁহার উপর বৈদ্যুতিক আলোক নিক্ষিপ্ত হইত এবং এই প্রকারে দূরতম স্থানের লোকেরাও তাঁহাকে দেখিতে পাইত। সভাপতি মহাশয়ের উপরও মধ্যে মধ্যে এইরূপ আলোক নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহাকেও সকলে দেখিতে পাইত।

কংগ্রেস ও প্রদর্শনীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠ ওর্লী (Worli) নামক শহরতলীতে। অভ্যর্থনা-সমিতি বোম্বাই শহর হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প দূরে ও উৎকৃষ্টতর প্রশস্ত স্থানে কংগ্রেস ও প্রদর্শনী করিতে চাহিয়াছিলেন। গবর্মেণ্ট সেই স্থান না-দেওয়ায় ওর্লীতে ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার দুটি অসুবিধা ছিল। প্রথম, বোম্বাই হইতে ইহার দূরত্ব; দ্বিতীয়, বোম্বাইয়ের সমুদয় নর্দ্দামা ইহার অনতিদূরে সমুদ্রে পড়ায় মধ্যে মধ্যে দুর্গন্ধ বিস্তার। এই কারণে, অভ্যর্থনা-সমিতির প্রদত্ত কংগ্রেস-পুরীর নাম আবদুল গফ্ফর নগরের পরিবর্ত্তে বিদ্রূপকারীরা উহাকে গাটার (gutter অর্থাৎ নর্দ্দামা) নগর বলিত।

কাজের মধ্যে মধ্যে বেদীর উপর আসীন নেতাদের পরস্পরের সহিত পরামর্শ এবং গল্পগুজবও চলিত। বেদীতে কিছুক্ষণ থাকায় ইহা আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমি অবশ্য সাংবাদিক বলিয়া প্রথমে প্রায় সাত আট শত



বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ (কনু দেশাই অঙ্কিত)

সাংবাদিকের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট ছিলাম। পরে অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পাটিল আমাকে বেদীতে লইয়া যাওয়ায় মহাত্মা গান্ধী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দার বল্লভভাই পাটেল, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মিঃ নারিমান বক্তৃতা করিতেছিলেন। মহাত্মাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেমন আছেন এবং কত দিন আগে তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় তখন বেদীতে শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তাঁহার বক্তৃতা খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

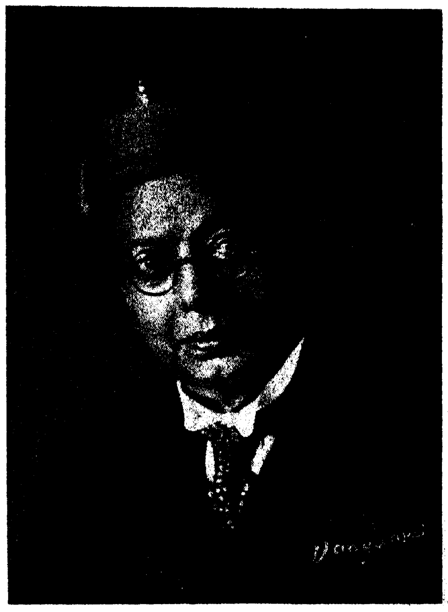
কংগ্রেসের অধিবেশন সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হইত। করাচীতে উহার গত অধিবেশন যেমন আকাশের নীচে অনাবৃত স্থানে হইয়াছিল, বোম্বাইয়ের গত অধিবেশনও সেইরূপ হইয়াছিল, মণ্ডপে বা চন্দ্রাতপের নীচে হয় নাই।

বিশেষ ঘটা সহকারে কংগ্রেসের অধিবেশন বোধ হয় এই শেষ বার হইল। কারণ, অতঃপর উহার প্রতিনিধির সংখ্যা দুই হাজারের বেশী হইতে পারিবে না।

—

নিখিলভারতীয় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিরোধী সম্মেলন

বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনের একদিন আগে ২৫শে অক্টোবর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাবিরোধী সমগ্রভারতীয় সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ২৬শে তাহা শেষ হয়। প্রবাসীর সম্পাদককে তাহার সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব-সচিব য়্যাডভোকেট



নিখিলভারতীয় সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা বিরোধী সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি স্যর গোবিন্দরাও বলবন্ত প্রধান

স্যর গোবিন্দরাও বলবন্ত প্রধান ইহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মনোনীত হন।

এই সম্মেলনে প্রতিনিধি ও শ্রোতাদের সংখ্যা যে



বোম্বাই রেলওয়ে ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অভ্যর্থনা



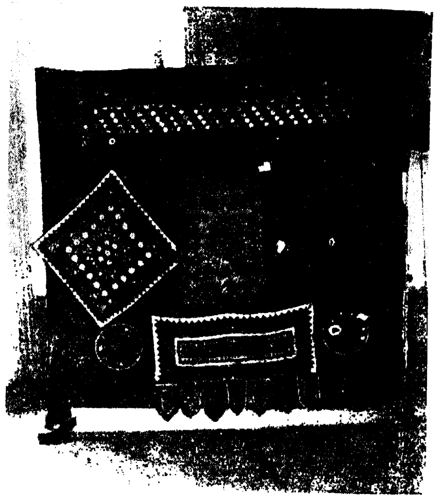
নিখিলভারতীয় সাম্প্রদায়িক ভাগ বাটোয়ারা বিরোধী সম্মেলনে স্যর গোবিন্দরাও প্রধান, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি

কংগ্রেসের মত হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা হইবার কথাও নহে। কারণ এরূপ সম্মেলন এই প্রথম হইল, ইহার পশ্চাতে কংগ্রেসের মত কৃতিত্বপূর্ণ ইতিহাস ছিল না এবং ইহা কেবল একটিমাত্র জিনিষের বিরোধিতা করিবার জন্য আহূত হয়। তবে, কংগ্রেসওয়ালাদের কোন কোন কাগজে ইহার প্রতিনিধি ও শ্রোতার সংখ্যা যেরূপ কম বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক্ নহে। প্রতিনিধি ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ইহার উদ্বোধন করেন। তাঁহার বক্তৃতা বেশ হইয়াছিল। তাহার পর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি স্যর গোবিন্দরাও প্রধান তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি প্রয়োগ করেন। অতঃপর সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ পড়েন। ইহাতে, সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা-সম্পর্কে যে-যে বিষয়ের ও যুক্তির আলোচনা আবশ্যক, তাহা করা হইয়াছে বলিয়া ইহা দীর্ঘ। ইহা নবেম্বর মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে। সম্মেলনের বিরোধী কোন কাগজ ইহার কোন উক্তির বা অংশের প্রতিবাদ বা ভ্রমপ্রদর্শন করিতে পারেন নাই, ইহার কোন যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই।

সভাপতির বক্তৃতার পর প্রথম দিনে একটি—ও তাহার পরদিন তিনটি—প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্যর গোবিন্দরাও প্রধান, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহতা, শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আনে, শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ সাভারকর প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

—



কচ্ছদেশের সূচীকর্ম্মের নিদর্শন



ভাস্কর্য্য—'দীপাবলী'। শিল্পী শ্রীমতী যমুনা রাওতে

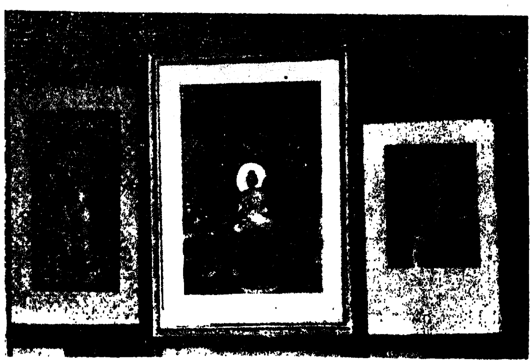
বোম্বাইয়ে মহিলাদের ললিতকলা ও শিল্প প্রদর্শনী

কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় বোম্বাইয়ের টাউন হলে মহিলাদের ললিতকলা ও কারুকার্য্যের একটি প্রদর্শনী হয়। "গুজরাটী স্ত্রীসহকারী মণ্ডল" ইহার উদ্যোগ করেন। যে কমিটির দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে প্রদর্শনীর আয়োজন সম্পন্ন হয়, শ্রীমতী হংসা মেহতা তাহার নেত্রী এবং সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশ মহিলা। ইঁহাদের আহ্বানে একদিন প্রদর্শনী



বোম্বাই টাউন হলে মহিলাদের শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে স্যর চুনীলাল মেহতা ও সভ্যবৃন্দ

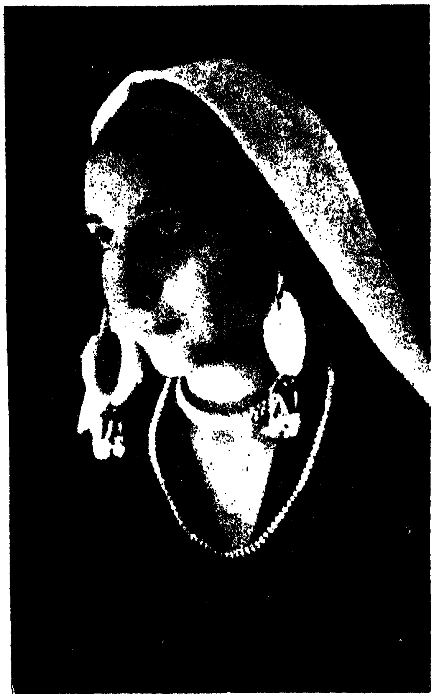
দেখিতে গিয়াছিলাম। এক জন কর্ম্মকর্ত্রী সৌজন্য সহকারে সমুদয় জিনিষ তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইলেন। প্রদর্শনীটি চারিটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত। (১) তৈলচিত্র ও অন্যবিধ চিত্র, (২) ললিতকলানুকারী ফোটো-গ্রাফ, (৩) মূর্ত্তিশিল্প, এবং (৪) সূচির কাজ ও অন্যান্য কারুকার্য্য। সকল বিভাগেই নানাবিধ কাজের নমুনা দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। কতকগুলির ক্ষুদ্র ফোটোগ্রাফ দিলাম।



দবামদিক হইতে :—(১) বিরহিণী—শিল্পী কুমারী শিরোদিয়া, (২) বুদ্ধ—শিল্পী কুমারী চৌহান, (৩) নর্ত্তকা—শিল্পী কুমারী সুমন দিভেচা

প্রদর্শিত দ্রব্যগুলির তালিকার পুস্তিকার ভূমিকায় শ্রীমতী হংসা মেহতা লিখিয়াছেন :—

Women are by nature artists and good craftsmen. So far they have flirted with art and taken only amateurish interest in them. It is time women realized



আলোকচিত্র—'কাশ্মীরী বালিকা'। শিল্পী কুমারী মনোরমা দেশাই

that arts and crafts can also be a good means of earning their livelihood, more especially so when life economically is becoming more and more complex and more women are driven to earn their own living or to supplement their small family income.

It was with the object of helping those women who have made arts and crafts their occupation in life, by securing a market for their work, and to show the possibilities of making arts and crafts a means of a new career for women that the Gujarati Stree Sahakari Mandal have organized this Exhibition.

তাৎপর্য্য। নারীরা স্বভাবতঃই রূপকার এবং উৎকৃষ্ট কারুশিল্পী। এ পর্য্যন্ত তাহারা সৌখীন ভাবে ললিতকলায় কিছু মন দিয়া আসিয়াছে। ললিতকলা ও কারুকার্য্য যে জীবিকা উপার্জ্জনেরও একটা ভাল উপায় হইতে পারে, তাহা উপলব্ধি করিবার এখন সময় আসিয়াছে—বিশেষতঃ যখন জীবন-যাত্রা আর্থিক দিক্ দিয়া ক্রমশঃ অধিকতর জটিল হইয়া উঠিতেছে এবং নারীরা অধিকতর সংখ্যায় নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিতে বা সামান্য পারিবারিক আয়ের পূরণ করিতে বাধ্য হইতেছে।

যে-সকল নারী ললিতকলা ও শিল্পকে তাঁহাদের জীবনোপায় করিয়াছেন তাঁহাদের তৈরি জিনিষ বিক্রীর ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে এবং ললিতকলা ও কারুকার্য্যকে মেয়েদের একটা কার্য্যক্ষেত্র করিবার সম্ভাবনা দেখাইবার নিমিত্ত, "গুজরাটী স্ত্রী-সহকারী মণ্ডল" এই প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন।



কাঠের উপর চিত্রাঙ্কণ—শিল্পী 'ভগিনী সমাজে'র সভ্যবৃন্দ

কলিকাতায় নারীশিক্ষা-সমিতিও এইরূপ উদ্দেশ্যে এই প্রকার প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত কয়েক বৎসর হইতে করিয়া আসিতেছেন।

—

রোমে ভারতীয় ছাত্রীর দল

কুড়িটি ভারতীয় ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী ইউরোপের নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষালাভার্থ কয়েক মাস পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের নানা অভিজ্ঞতায় আহ্লাদিত হইয়াছেন। তাঁহারা যে-সব দেশ দেখেন, ইটালী তাহার মধ্যে একটি। সেখানে তাঁহারা ১৪ দিন ধরিয়া নানা প্রাচীন কীর্ত্তি এবং চিত্র, মূর্ত্তি, গির্জ্জা ও প্রাসাদ দেখিয়া মুগ্ধ হন। রোমে ইটালীর একচ্ছত্র শাসক মুসোলিনির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার ঘটে। মহিলারা বলিয়াছেন :—



মুসোলিনী কর্ত্তৃক অভিনন্দিত ভারতীয় ছাত্রীবৃন্দ

"মুসোলিনি আমাদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলেন—খুব দ্রুত নহে কিন্তু খুব সৌজন্যের সহিত। তিনি বলেন,—তিনি ভারতের মহান্ অতীত যুগ, তাহার দর্শন ও চিন্তা এবং তাহার আশ্চর্য্য সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু অধ্যয়ন করিয়াছেন। এখন তিনি ঘনিষ্ঠ অভিনিবেশ সহকারে ভারতবর্ষের প্রগতির ও উচ্চ আশার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন। গত খ্রীষ্টমাসের সময় তিনি প্রাচ্য ছাত্রদের কন্‌ফারেন্সে ভারতীয় ছাত্রদের সহিত দেখা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এখন তিনি কতকগুলি ভারতীয় মহিলাকে নিজের দেশে আনন্দের সহিত 'স্বাগত' করিতেছেন।"

ইহার উত্তরে ভারতীয়ারা কিছু বলেন। ইতিমধ্যে ফোটোগ্রাফার তাঁহার ক্যামেরা ফোকাস্ করিয়া প্রস্তুত হন। তাহা লক্ষ্য করিয়া মুসোলিনি সুধান, "আমার সঙ্গে একটা ফোটোগ্রাফ তোলান কি আপনাদের ইচ্ছা?" সকলে "হাঁ" এবং "নিশ্চয়" বলায় তিনি খুব হাসেন। ছাত্রীদের পরস্পরকে ঠেলিয়া তাঁহার পাশাপাশি দাঁড়াইবার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে খুব উপভোগ্য হইয়াছিল।

এই ফোটোগ্রাফের একটি প্রতিলিপি রোম হইতে প্রকাশিত "ইয়ং এশিয়া" ("তরুণ এশিয়া") নামক সাময়িক পত্র হইতে আমরা মুদ্রিত করিলাম।

—

বিমান-চালনার প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি লণ্ডন হইতে অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন পর্য্যন্ত বিমান-যোগে আকাশপথে যাইবার এক প্রতিযোগিতা হয়। তাহাতে ইংলণ্ডের একটি বিমান জয়ী হইয়াছে। তাহাতে রথী ছিলেন ইংরেজ বৈমানিক স্কট ও ব্ল্যাক। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিন ২১শে অক্টোবর আমি এলাহাবাদে ছিলাম। তাহার নিকটবর্ত্তী বামরাওলীতে একটি প্রধান বিমান-আড্ডা আছে। সেখানে গিয়াছিলাম।

মিঃ ও মিসেস্ মলিসনের বিমান সকলের আগে আসিতেছিল কিন্তু তাঁহাদের আকাশযানটি করাচীর কাছাকাছি বিগড়াইয়া যাওয়ায় তাঁহারা পিছাইয়া থাকিতে বাধ্য হন। স্কট এবং ব্ল্যাক সর্ব্বপ্রথম বামরাওলী পৌছেন। তাঁহাদের বিমানখানি লাল রঙের বলিয়া আকাশে খুব উচ্চে থাকার সময়ও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। স্কট দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ। চিত্রে তাঁহাকে লম্বা কোট ও নাইটক্যাপ-পরিহিত দেখা যাইতেছে। বামরাওলীতে সে-দিন যেন একটা পর্ব্ব পড়িয়া গিয়াছিল। বাঙালী ভদ্রলোকেরা অনেকে মাঠে তাঁবু ফেলিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সেখানে গিয়াছিলেন, এবং গল্পগুজব জলযোগ আদি চলিতেছিল। অবশ্য তাহা অপেক্ষাও অধিক সংখ্যায় হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকেরা গিয়াছিলেন।



বামরাওলী ষ্টেশনে মিঃ স্কট (লম্বা কোট পরিহিত)। ইনি লণ্ডন—মেলবোর্ন বিমান-চালনা প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়াছেন

আমরা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম—"দিন আগত ঐ, ভারত তবু কৈ !"

—

বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকের দান

অধ্যাপক ডক্টর শান্তিস্বরূপ ভটনাগর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নীবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক। তিনি বহু রাসায়নিক গবেষণা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। পঞ্জাবে খনিজ তৈলের ব্যবসায়ী একটি ইংরেজ কোম্পানীর অনুরোধে তিনি ঐ তৈলের সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করায় কোম্পানী তাঁহাকে দক্ষিণাস্বরূপ দেড় লক্ষ টাকা দিতে চান। তিনি ঐ টাকা নিজে না লইয়া পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসায়নিক গবেষণার জন্য পাঁচটি বৃত্তি দিবার নিমিত্ত ঐ টাকা দান করিয়াছেন। তিনি ধনী লোক নহেন—অধ্যাপকেরা সাধারণতঃ ধনী নহেন। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ প্রশংসনীয় দান এদেশে বিরল। বঙ্গে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই প্রকার দান করিয়াছেন। ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ও এইরূপ দান করিয়াছেন। ডক্টর ভটনাগর ডক্টর মেঘনাদ সাহাকে একটি চিঠিতে



ডক্টর শান্তিস্বরূপ ভটনাগর

করিয়াছেন যে, আচার্য্য রায়ের দৃষ্টান্তই তাঁহাকে এইরূপ দান করিতে অনুপ্রাণিত করে।

এই ব্যাপারটিতে অধ্যাপক মহাশয়ের দানশীলতা ও বিজ্ঞানানুরাগ প্রশংসনীয় এবং বিদেশী কোম্পানীর কৃতজ্ঞ ব্যবহারও প্রীতিপ্রদ। কোম্পানীটি বিদেশী না হইয়া স্বদেশী হইলেই ব্যাপারটি অবিমিশ্র আনন্দের কারণ হইত।

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৭শে, ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন হইবে। আগেকার এগারটি অধিবেশন বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানে হইয়া গিয়াছে। এবার বঙ্গের রাজধানীতে ইহার অধিবেশন হইবে বলিয়া বঙ্গের বাহির হইতে প্রতিনিধি অন্যান্য বার অপেক্ষা সংখ্যায় অধিকতর হইবে। সেই জন্য উপযুক্ত আয়োজনও অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইবে। বঙ্গের বাহিরের বাঙালী ভ্রাতাভগিনীরা এবার আমাদের অতিথি হইবেন। তাঁহাদের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই জন্য সকলের আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য প্রার্থনীয়।

কলিকাতার অধিবেশনে সাধারণ সভাপতি হইবেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ও অস্থায়ী প্রধান জজ স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়। তদ্ভিন্ন যে-যে শাখার সভাপতি এ পর্য্যন্ত মনোনীত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম নীচে দেওয়া হইল।

সাহিত্য—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক।

বিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত ডক্টর বিমানবিহারী দে, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নী-বিদ্যার অধ্যাপক।

ইতিহাস—শ্রীযুক্ত ডক্টর বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়, মীরাট কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক।

ধনবিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত ডক্টর ভানুভূষণ দাসগুপ্ত, সিংহলের কোলোম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার এবং তথাকার ব্যাংকিং কমিশনের সদস্য।

ললিতকলা ও শিল্প—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, মান্দ্রাজ স্কুল অব্ আর্টসের প্রিন্সিপ্যাল, এবং চিত্রকর ও মূর্ত্তিকার।

শিক্ষাবিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত ডক্টর সুবিমলচন্দ্র সরকার, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও পাটনার ট্রেনিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল।

মহিলা-বিভাগের সভানেত্রী হইবেন দিল্লীর শ্রীযুক্তা শৈলবালা দেবী। ইনি কবি ও দিল্লীর বাঙালী মহিলাদের অন্যতম নেত্রী। ইঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকান্ত সেন দিল্লীর প্রথিতনামা ডাক্তার এবং পুত্রকন্যাগণ সকলেই কৃতবিদ্য।

—

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের উপর আক্রমণ

গত ২০শে কার্ত্তিক পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় নাগপুরে বক্তৃতা করিতেছিলেন। কতকগুলা লোক তাঁহার উপর ইট-পাটকেল ছুড়িয়াছিল। সভা ভাঙিবার পর তিনি ও ডাক্তার মুঞ্জে এক গাড়িতে চড়িয়া সভা হইতে যাইতেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত লোকেরা তাঁহাদের গাড়ীও আক্রমণ করে। ইহা অসহযোগ বটে, কিন্তু অহিংস কিনা, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। গত বার-তের বৎসর ভারতবর্ষে এক দলের ভারতীয়দের দ্বারা অন্য দলের ভারতীয়দের উপর এইরূপ আক্রমণ বাড়িয়াছে। কয়েক বৎসর ত এরূপ হইয়াছিল, যে, কংগ্রেসওয়ালা ভিন্ন বা কংগ্রেসের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন প্রকাশ্য সভায় অন্য কাহারও বক্তৃতা করিবারই জো ছিল না।

—

মান্দ্রাজে ও বিশাখপত্তনে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা

মান্দ্রাজবাসীদিগের নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ মান্দ্রাজ গিয়াছিলেন, সঙ্গে বিশ্বভারতীর কতকগুলি ছাত্রছাত্রী ও শিল্পীরা ছিলেন। সেখানে নাগরিকদিগের পক্ষ হইতে বিপুল জনতা রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করে। পরে পৌরজনের প্রতিনিধিরূপে মেয়র মিঃ ডব্‌লিউ লাডেন তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করেন। ছাত্রসমাজ ও অন্য কোন কোন সমিতিকর্ত্তৃকও তিনি সম্বর্দ্ধিত হন। কয়েকটি বিষয়ে বক্তৃতা ছাড়া মান্দ্রাজে বিশ্বভারতীর শিল্প-প্রদর্শনীও হয়, এবং "শাপমোচন" নামক নৃত্যগীতবহুল নাটিকার অভিনয় হয়। বিজয়নগরের মহারাণীর আমন্ত্রণে

তিনি বিশাখপত্তন গমন করেন। সেখানেও শাপমোচনের অভিনয় এবং কোন কোন বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

—

বিলাতে ভারতীয় তুলার ব্যবহার

১৯৩২ সালের প্রথম নয় মাসে যত ভারতীয় তুলা ইংলণ্ডের মিলওয়ালারা কিনিয়াছিল, বর্ত্তমান ১৯৩৪ সালের প্রথম নয় মাসে তাহার তিন গুণ ভারতীয় তুলা তাহারা লইয়াছে, পার্লেমেণ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষের লোকেরা যাহাতে বেশী পরিমাণে ল্যাঙ্কেশায়েরে প্রস্তুত কাপড় কেনে, তাহার জন্ত তথাকার বস্ত্রনির্মাতারা ভারতীয় তুলার প্রতি সদয় হইয়াছেন। ইহা মন্দের ভাল। অবিমিশ্র বাঞ্ছনীয় অবস্থা হইবে তখন, যখন ভারতবর্ষের যত তুলার কাপড়ের প্রয়োজন সমস্তই ভারতীয় তুলা হইতে ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইবে। তাহার জন্ত যত তুলা আবশ্যক, তার চেয়ে বেশী তুলা ভারতবর্ষে তখন উৎপন্ন হইলে তাহা সেই সব দেশে রপ্তানি হইতে পারিবে, যে-সব দেশে তুলা জন্মে না।

—

বঙ্গে আরও কাপড়ের কল চাই

ইহা গেল সমগ্র ভারতবর্ষের কথা। ভারতবর্ষের প্রদেশ-গুলির মধ্যে বঙ্গের লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী। এখানে কাপড়ের কাট্‌তিও বেশী। বঙ্গে বিক্রীত কাপড়ের অধিক অংশ বাহির হইতে আসে। বঙ্গের কাপড়ের কলে বঙ্গের অভাব মোচন অল্পই হয়। বঙ্গে আরও অনেক কাপড়ের কল চলিতে পারে। তাহাতে বাঙালীর মূলধন খাটিলে এবং বাঙালীরা তাহাতে শ্রমিকের ও অন্ত রকমের কাজ পাইলে বঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। বাঙালীদের কয়লার খনির কয়লার কাট্‌তিও তাহাতে বাড়িতে পারে।

বঙ্গের নানা স্থানে উৎকৃষ্ট কাপাস জন্মিতে পারে। বঙ্গীয় সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবৃতি প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। এইদিকে কৃষি-মন্ত্রীর দৃষ্টি পড়িলে ভাল হয়।

—

ফিরদৌসীর সহস্রবার্ষিক জন্মোৎসব

ইরানের মহাকবি ফিরদৌসীর সহস্রবার্ষিক জন্মোৎসব ইরান (পারস্ত) দেশে তথাকার নৃপতি রিজা শাহ্ পহ্লেবী ও জনসাধারণের উদ্যোগে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ফিরদৌসী সম্বন্ধে গত মাসের 'প্রবাসী'তে আমরা কিছু লিখিয়াছিলাম। ইনি যে "শাহ্‌নামা" নামক মহাকাব্যের রচয়িতা বলিয়া বিখ্যাত, তাহাতে যে-সকল ইরান-নৃপতির অবদান-পরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা মোহম্মদীয়ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না। ঐ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই কারণে, তাঁহাদের সম্বন্ধে কাব্য রচনা করায় ফিরদৌসীর জীবিত কালে গোঁড়া মুসলমানদের পক্ষ হইতে, তিনি যাহাতে সম্মান না পান, সে চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সফল হয় নাই।

ভারতবর্ষের মুসলমানেরা "রঘুবংশ" রচয়িতা কালিদাসের জয়ন্তী, কিংবা তাঁহার মত অন্ত কোন মহাকবির জয়ন্তী যদি করেন বা তাহাতে উৎসাহের সহিত যোগ দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই কাজ কতকটা পারসীকদিগের অনুষ্ঠিত ফিরদৌসী-জয়ন্তীর অনুরূপ হইবে।

—

বিঠলভাই পটেলের উইল

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি পরলোকগত বিঠলভাই পটেল তাঁহার উইলে ভারতের উন্নতিকর কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্ত ১,১৫,০০০ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি উইলে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যে, শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুর দ্বারা বা তাঁহার নির্দ্দেশমত তাঁহার মনোনীত কোন যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা বিদেশে ভারতের পক্ষে কল্যাণকর প্রচারকার্য্যে ঐ টাকা ব্যয়িত হইলে ভাল হয়। সুভাষ বাবু অন্ত কোন ভারতহিতকর কাজেও উহা লাগাইতে পারিবেন।

ইউরোপে পটেল মহাশয়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে সুভাষ বাবুই তাঁহার সেবাশুশ্রূষার জন্ত বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, অন্ত কোন ভারতীয় রোগশয্যায় তাঁহার নিকটে ছিলেন না। পটেল মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার শব ভারতবর্ষে প্রেরণের ব্যবস্থাও সুভাষ বাবু করিয়াছিলেন।

—

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীবিদ্বেষ

ভারতের এক একটা প্রদেশ কেবল সেই সেই প্রদেশের লোকদের জন্য হওয়া উচিত, বাংলা দেশ কেবল বাঙালীদের জন্য হওয়া উচিত, এই প্রকার রব বাঙালীরা আগে তুলে নাই। বাংলা দেশে অবাঙালী কাহারও ব্যবসা-বাণিজ্য, শ্রমিকের কাজ, বা চাকরি করায় বাঙালীরা প্রথম প্রথম আপত্তি করে নাই। বরং বাঙালীরাই প্রথমে সমগ্রভারতীয় মহাজাতি গঠনের কল্পনা ও তদনুরূপ বক্তৃতাদি করিয়াছিল। "বিহার কেবল বিহারবাসীদের জন্য" ইত্যাদি রব বহু বৎসর ধরিয়া চলিবার পর এত দিন পরে, যখন বাঙালীরা বঙ্গেও সকল কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত ও বেদখল হইতে বসিয়াছে, যখন বঙ্গে অন্য প্রত্যেক প্রদেশের যত লোক উপার্জ্জন করে বঙ্গের তাহা অপেক্ষা অনেক কম লোক সেই সেই প্রদেশে উপার্জ্জন করে, কেবল তখনই বাঙালীদিগকে বলিতে হইতেছে, যে, বঙ্গের সব কার্য্যক্ষেত্রে বাঙালীরই অধিকার সর্ব্বাগ্রে। অথচ অন্য প্রদেশবাসীরা বাঙালীদিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাদেশিকসঙ্কীর্ণতাগ্রস্ত বলে! কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিতে-পাই, সিমলার বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তাহারা বেদখল হইয়াছে, দিল্লীর বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়েও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে।

—

কংগ্রেসের নূতন ওয়ার্কিং কমিটি

নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া কংগ্রেসের নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইয়াছে।

সভাপতি—বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

সাধারণ সম্পাদক—পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু, ডাঃ সৈয়দ মামুদ ও আচার্য্য কৃপালনী।

কোষাধ্যক্ষ—শেঠ যমুনালাল বজাজ।

সদস্যগণ—সর্দার বল্লভভাই পটেল, খান আবদুল গফ্ফর খান, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, সর্দার শার্দ্দুল সিং কবীশর, ডাক্তার আনসারী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারি, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধররাও দেশপাণ্ডে, ডাক্তার পট্টভি সীতারামায়া, এবং শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম॥

কংগ্রেস সাক্ষাৎ ভাবে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতকে ২১টি দেশে ভাগ করিয়াছেন। সেই জন্য আমরা আগে আগে লিখিয়াছিলাম, যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সাধারণ সদস্যসংখ্যা ন্যূনকল্পে একুশ হওয়া উচিত; তাহা হইলে কোন প্রদেশই ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রতিনিধিশূন্য হয় না। নূতন ওয়ার্কিং কমিটিতে সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল প্রদেশগুলির মধ্যে বাংলা দেশের প্রতিনিধিষ্ট কেহ নাই। কোন কোন তরফ হইতে বলা হইতেছে বটে, যে, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বঙ্গের প্রতিনিধি। কিন্তু তাহা স্বীকার করা যায় না। কেন না, মৌলানা সাহেব উর্দ্দুতে কথা-বার্ত্তা চালান, তাহা বাঙালীরা বুঝিতে পারে না। তিনি বাংলা জানেন বুঝেন বলেন কিনা জানি না। মৌলানা আকরম খান বা মৌলবী মুজীবর রহমানের মত বাঙালী কেহ কংগ্রেস কর্ত্তৃক ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত হইলে বলা চলিত যে এক জন বাঙালী বঙ্গের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

ওয়ার্কিং কমিটিতে বঙ্গের কোন প্রতিনিধি না-থাকায় বঙ্গের নানা কাগজে—এমন কি ফরওয়ার্ডেও—অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। বাংলাকে বাদ দিবার এই একটা কারণ দেখান হইয়াছে, যে, এখানে কংগ্রেসের দুই দলে খুব দলাদলি; কোন এক দলের লোক লইলে অন্য দলের লোক অসন্তুষ্ট হইবে। কিন্তু তাহার জন্য উভয় দলকেই কি অসন্তুষ্ট করা উচিত? দলাদলি অন্য কোন কোন প্রদেশেও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে দলাদলি-প্রযুক্ত মারামারি ও মানহানির মোকদ্দমা পর্য্যন্ত হইয়াছে। ঐ প্রদেশের কংগ্রেসের প্রত্যেক দলের একটা করিয়া দৈনিক ত নাই-ই, কংগ্রেসের কোন দৈনিকই সেখানে নাই—সুতরাং প্রত্যেক দলের কথাকাটাকাটি এবং কটূক্তি খবরের কাগজে স্থান পায় না। বঙ্গে প্রত্যেক দলের কাগজ থাকায় অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে।

ওয়ার্কিং কমিটিতে সভাপতি প্রভৃতিকে লইয়া যে পনর জন লোক আছেন, তাহার মধ্যে দু-জন বিহারের, দু-জন সিন্ধুদেশের, এক জন মধ্যপ্রদেশের, অন্ততঃ দু-জন বোম্বাইয়ের, এক জন দিল্লীর, এক জন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের, এক জন পঞ্জাবের, এক জন অন্ধ্র দেশের, এক জন তামিল

দেশের। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আদি নিবাস কোথায় জানি না।

—

বোম্বাই কংগ্রেসের প্রধান প্রধান কাজ

বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের গত অধিবেশনে সকলের চেয়ে বেশী সময় গিয়াছে সাবেক ওয়র্কিং কমিটির সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা না-গ্রহণ না-বর্জ্জন সিদ্ধান্ত কায়েম রাখিতে। দু-দিন ৯।১০ ঘণ্টা ধরিয়া কেবল ঐ বিষয়েই বাদ-প্রতিবাদ হয়। গোঁড়া কংগ্রেসওয়ালারা এখনও বলিতেছেন, "হোয়াইট পেপার আমরা গ্রহণ করিব না, উহা বাতিল হইলেই উহার অন্তর্গত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাও বাতিল হইবে; কিন্তু আমরা এখন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা গ্রহণ করিতেছি বলিব না, বর্জ্জন করিতেছিও বলিব না।" এবম্বিধ অদ্ভুত কথার আলোচনা আগে ইংরেজীতে ও বাংলায় অনেক করিয়াছি। নূতন করিয়া আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করে না। তবু বলি, ব্যাপারটা এইরূপ—

একটা হাঁড়িতে চাল ডাল পেঁয়াজ ও আলু দিয়া খিচুড়ী রাঁধা হইয়াছে। কংগ্রেস বলিতেছেন, "আমরা ঐ খিচুড়ী গ্রহণ করিব না, বর্জ্জন করিব; কিন্তু তাহার অন্তর্গত ডাল গ্রহণও করিব না, বর্জ্জনও করিব না!" আমরা বলি, "যখন বলিতেছেন, খিচুড়ী লইব না, তখনই ত বলা হইয়া গেল, যে, তাহার উপাদানীভূত চাল ডাল পেঁয়াজ আলু সবই বর্জ্জনীয়। নানা উপাদানে প্রস্তুত একটা সমগ্র জিনিষ অগ্রাহ্য করিলে, তাহা বর্জ্জিত হইলে, প্রত্যেকটি উপাদানও ত অগ্রাহ্য করা হইল ও বর্জ্জিত হইল, সহজ বুদ্ধিতে ত ইহাই বুঝায়।"

এবারকার কংগ্রেসের অন্য প্রধান কার্য্য, কংগ্রেসের মূল নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন এবং ভারতীয় পল্লীশিল্পসংঘ স্থাপন। এই দুটির কোনটির দ্বারাই সাক্ষাৎ ভাবে রাজনৈতিক কোন কাজ হইবে না, যদিও পরোক্ষ ভাবে দ্বিতীয়টির দ্বারা ভারতীয় মহাজাতি রাজনৈতিক প্রচেষ্টার জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে। বস্তুতঃ অহিংস অসহযোগ এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন স্থগিত রাখার পর কংগ্রেস তাহার জায়গায় নূতন কোন রাজনৈতিক কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ কংগ্রেসের কতকগুলি লোক করিবেন বটে, কিন্তু উহা পুরাতন প্রণালী।

কংগ্রেসের মূল নিয়মাবলীর যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার দ্বারা জাতীয় এই প্রতিষ্ঠান অধিকতর কার্য্যক্ষম হইবে।

—

ভারতীয় পল্লীশিল্পসংঘ

কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নিখিলভারতীয় পল্লীশিল্পসংঘ স্থাপনের প্রস্তাবে সায় দিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবের মূলীভূত তাৎপর্য্য সংক্ষেপে এই, যে, পল্লীগ্রামসকলের উন্নতিসাধনের এবং পল্লীসংগঠনের জন্য বিলুপ্ত ও ধ্বংসোন্মুখ গ্রাম্যশিল্পসকলের পুনরুজ্জীবন আবশ্যক; কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সহিত সম্পর্ক বর্জ্জিত হইলেই এই পুনরুজ্জীবনের কাজ ভাল করিয়া হইতে পারে। মহাত্মাজীর পরামর্শ অনুসারে শ্রীযুক্ত জে সি কুমারাপ্পা "নিখিল-ভারতীয় পল্লীশিল্পসংঘ" নাম দিয়া একটি সমিতি গঠন করিবেন। ইহা পল্লীগ্রাম অঞ্চলের বিলুপ্ত শিল্পসকল পুনরুজ্জীবিত করিবে, ধ্বংসোন্মুখ শিল্পগুলিকে উৎসাহ দিবে, এবং গ্রামবাসীদিগের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করিবে; এই উদ্দেশ্যে সংঘ নিজের গঠনবিধি রচনা করিয়া অর্থসংগ্রহ ও অন্যান্য কাজ করিবে; এবং কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সময় "নিখিলভারতীয় সুতাকাটুনী সংঘের (All India Spinners' Associationএর) সহযোগে শিল্পপ্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করিয়া পল্লীবাসীদের আমোদের সহিত শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে।

এই সংঘের কাজ সুপরিচালিত হইলে ইহার দ্বারা দেশের খুব উপকার হইবে। হরিজনসেবা এবং এই সংঘ পরিচালন—এই উভয়বিধ প্রচেষ্টা মহাত্মা গান্ধীকে সম্ভবতঃ প্রভূত শক্তিশালী করিবে। কিন্তু তিনি, কংগ্রেসের কতক লোকের উপর প্রভাব হারাইয়াছেন বলিয়া এই ভাবে শক্তি পুনর্লাভের চেষ্টা করিতেছেন, সিন্ধুদেশের অন্যতম কংগ্রেসনেতা স্বামী গোবিন্দানন্দের তাঁহার উপর এই উদ্দেশ্যারোপ মানিয়া লওয়া যায় না।

মহাত্মা গান্ধীর বিস্তর লোকের উপর প্রভাব আছে।

তাহার মধ্যে অনেকে অর্থশালী। টাকা তিনি অনেক পাইতে পারেন। তাঁহার সুশৃঙ্খল কর্ম্মপদ্ধতি রচনা ও তদনুসারে কাজ করাইবার ক্ষমতাও আছে। এই সব কারণে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা।

—

রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-পুনরুজ্জীবন-চেষ্টা

এস্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, যে, গান্ধীজী এখন যে কাজ করিতে যাইতেছেন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক বৎসর ধরিয়া বিশ্বভারতীর একটি শাখার দ্বারা সেই কাজ করাইতেছেন, এবং তাঁহার আগেও এইরূপ গ্রামোন্নতির কাজ তাঁহাদের বাড়ির জমিদারীর কোন কোন অঞ্চলে করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রভেদ এই, যে, রবীন্দ্রনাথ সমগ্রভারতীয় কোন পরিকল্পনা ও সমিতি রচনা করেন নাই, প্রথমে কেবলমাত্র একটি জেলার একটি অংশে কার্য্যতঃ কিছু করা সমীচীন ও শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন—যদিও তাঁহার এই কাজের কেন্দ্র সুরুলে স্থিত শ্রীনিকেতন হইতে বঙ্গের বাহিরের কোন কোন অবাঙালী ছাত্রও তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁহার এই কাজটিতে স্বদেশবাসীদের নিকট হইতে উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্য পান নাই। তাহার একটি কারণ বোধ হয় তাঁহার ধনশালিতার অপবাদ।

—

মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস হইতে অবসরগ্রহণ

মহাত্মা গান্ধী দস্তুর-অনুযায়ী পদত্যাগপত্র প্রেরণ দ্বারা কংগ্রেসের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। গত ২৩শে অক্টোবর কংগ্রেসের বিষয়নির্ব্বাচন সমিতিতে তিনি এ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছিলেন। তাহার তাৎপর্য্য এই প্রকার—

"আমি যদিও অনেক আগেই আমার মন স্থির করিয়াছিলাম, তথাপি নূতন পথ অবলম্বনের পূর্ব্বে আপনাদের আশীর্ব্বাদ চাহিবার জন্য এখানে আসা আমি কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলাম। আমি আপনাদিগকে নিশ্চিত বলিতেছি, যে, আমি রুষ্ট হইয়া কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতেছি না; কংগ্রেস যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে, তজ্জন্যই আমি প্রসন্নচিত্তে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতে চাই। কিছু দিন হইতে আমার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে, যে, কংগ্রেসে থাকিয়া আমি কংগ্রেসকে দাবাইয়া রাখিতেছি, কংগ্রেস তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইতেছিল না, কংগ্রেস একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

"পণ্ডিত জবাহরলালের নিকট হইতে পত্র পাইবার পর আমার কংগ্রেস ত্যাগের এই অত্যুগ্র ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু সেরূপ ধারণা আপনারা মনে স্থান দিবেন না। ঐ পত্রের সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। আমার এই মনোভাব আমি পূর্ব্বেই বাংলার বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম। দিনের পর দিন আমার এই মনোভাব ক্রমেই প্রবল হইতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত আমি আর উহা দমন করিতে সমর্থ হই নাই। ইহাই আমার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কারণ।

"কর্ত্তব্য ত্যাগের বা কংগ্রেসের কার্য পরিত্যাগ করিবার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা আমার নাই। কংগ্রেসকে বিশুদ্ধ করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি যাহাতে আমার আদর্শের পথে অগ্রসর হইতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে কংগ্রেসকে তাহার আদর্শ অনুসরণের সুযোগ দান করিতে পারি, তাহার জন্যই আমি অবসরগ্রহণের সংকল্প করিয়াছি। অকৃত্রিম অহিংসার অন্তর্নিহিত শক্তির উন্নতিসাধনের জন্যই আমি কংগ্রেস হইতে অবসরগ্রহণ করিতেছি।

"আইন-লঙ্ঘন আন্দোলন ব্যতীত যে পূর্ণস্বরাজ লাভ হইতে পারে না, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের অবলম্বিত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ কায়মনোবাক্যে অহিংস হয় নাই। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই, যে, আইনলঙ্ঘন যোগ দিয়া দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কোন জাতি স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া ইতিহাসে আমি কোন প্রমাণ পাই নাই. জগতের সমস্ত জাতির ইতিহাসই আমার জ্ঞান আছে বলিয়া আমি দাবি করিতেছি না। তবে আমার যতটুকু জানা আছে, তাহাতে আমি বলিতে পারি যে, কোন জাতি কেবল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বারা প্রণষ্ট স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিতে পারে নাই। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। আমরা এত দিন যাহা করিয়াছি তাহা শুধু খেলা, প্রকৃত জিনিষ লইয়া কিছু করি নাই। সেই হেতু আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যে, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের মূলনীতি সত্য ও অহিংসাকে যেখানে উহার সদস্যগণ প্রথম স্থান দান করেন নাই, সেখানে কংগ্রেসকে পরিচালিত করিতে আমি বিফলপ্রয়াস হইব। আমরা যদি কায়মনোবাক্যে অহিংস হইতে পারিতাম, তবে এই অর্ডিন্যান্সের শাসন সম্ভব হইত না।

"আমি আপনাদের নিকট খোলাখুলিভাবে আমার মনোভাব বর্ণনা করিলাম। ভিন্নরূপ বিশ্বাস সত্ত্বেও আমার কংগ্রেসে থাকা উচিত, এইরূপ অনুরোধ না করিয়া এক্ষণে আপনাদের আশীর্ব্বাদসহ আমাকে যাইতে দেওয়াই আপনাদের উচিত। আমি আপনাদের নিকট হইতে কিছুই চাহি না। আমি দয়রুবাক্যবির মনোভাব লইয়া এখানে আসি নাই। আমাকে অবসর গ্রহণ করিতে দিন। ভবিষ্যতে যদি কোন দিন দেখি যে কংগ্রেস চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে প্রকৃতই অহিংস রহিয়াছে, তখন আহ্বান মাত্রই আমি কংগ্রেসের সেবায় প্রবৃত্ত হইব, এবিষয়ে আমি আপনাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি। আমি গৌরীশৃঙ্গে বা ভূগর্ভে যেখানেই থাকি না কেন, যদি আপনাদের অহিংস মনোবৃত্তি দেখিতে পাই, তবে পুনরায় আপনাদিগকে পরিচালনের ভার গ্রহণ করিব।"

পরিশেষে গান্ধীজী বলেন—

"আমি দৌড়িয়া পলাইতেছি না। আমি একজন সিপাহী। আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। আমি অন্ধের ন্যায় আলোক চাহিতেছি। আমি আজ কংগ্রেসের পক্ষে অনাবশ্যক। আমাকে আপনাদের আশীর্ব্বাদসহ যাইতে দিন।"

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এবং মহাত্মাজীর নিজের অনুরক্ত অনেক সহকর্মী তাঁহাকে তাঁহার সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অটল ভাবে নিজের সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন।

কংগ্রেসওয়ালারা সত্যাচারী এবং কায়মনোবাক্যে অহিংস হন, তিনি ইহা চান। কিন্তু তাঁহার কংগ্রেস-ত্যাগের পরেও দেখিতেছি, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনির্ব্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেসের দুই পক্ষেরই প্রার্থীদের অনেক সমর্থক অসত্যের আশ্রয় লইয়াছেন—মহাত্মাজীর উপদেশ, দৃষ্টান্ত এবং সবিষাদ কংগ্রেসত্যাগ তাঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে নাই। অহিংসতার অবস্থাও ঐরূপ।

মহাত্মাজী আবশ্যক মত কংগ্রেসনেতাদিগকে পরামর্শ দিবেন, ইহা আশার কথা। কিন্তু তাঁহারা যেন নিতান্ত সঙ্কট অবস্থা ভিন্ন অন্য সময়েও মহাত্মাজীর পরামর্শ না-চান। যখন-তখন পরামর্শ চাহিলে তাঁহারা আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবেন না, নেতৃত্বের যোগ্যতা তাঁহাদের জন্মিবে না। যদি মহাত্মাজীর অবসরগ্রহণের ফলে অন্য কোন কোন সত্যাচারী অহিংস নেতা দেশকে চালাইবার যোগ্য হইয়া উঠেন, তাহা হইলে মহাত্মাজীর কংগ্রেসের সম্পর্কত্যাগ সার্থক হইবে।

—

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধী সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধী সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ দীর্ঘ হইয়াছিল। উহার বাংলা অনুবাদ ছোট অক্ষরে ছাপিলেও প্রবাসীর ত্রিশ পৃষ্ঠা হইবে। একটি বক্তৃতার জন্য প্রবাসীতে এত জায়গা দেওয়া যায় না। এই জন্য আমরা কেবল সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মর্ম্মানুবাদ নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

১। "যেহেতু গবর্ন্মেণ্টের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের বিরোধী, কোন সুনির্দ্দিষ্ট মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, বৈদেশিক প্রভুত্ব স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্র পরস্পর-বিরোধী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করে, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করে, দায়িত্বপূর্ণ গবর্ন্মেণ্টের ভিত্তি নষ্ট করে, ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন সম্প্রদায়কে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে কোন সম্প্রদায়কে করে না, অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষতি করিয়া কোন কোন সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব প্রদান করে, হিন্দুর সংখ্যা-গরিষ্ঠতা বিধিব সংখ্যালঘিষ্ঠতায় পরিণত করে, এই জন্য এই সম্মেলন ঐ সিদ্ধান্তে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং ঘোষণা করিতেছে যে, উহা সর্ব্বাং গ্রহণের অযোগ্য।

"কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি কার্য্যতঃ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যে-জাতীয়তা কংগ্রেসের ভিত্তি, যাহার জন্য কংগ্রেস সর্ব্বশ্রেণীর সমং লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কার্য্যকরী সমিতি নির্দ্ধারণ রদ করিয়া দিবার জন্য সম্মেলন কংগ্রেসকে অনুরো করিতেছে।"

২। "এই সম্মেলনের অভিমত এই যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদ সমস্যার সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের (লীগ অব্ নেশুন্সের প্রবর্ত্তিত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা-পদ্ধতির মূলনী অনুসরণ করা। ঐ পদ্ধতি বর্ত্তমানকালে ইউরোপে এবং পৃথিবী অন্যান্য স্থানে রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হইয়াছে। উক্ত সঙ্ঘের কার্য্যক সমিতির সভাপতি নিজেই এ কথা ঘোষণা করিয়াছেন।"

৩। "এই সম্মেলনের অভিমত এই যে, জাতি, বর্ণ, স্ত্রী পুরুষ ধর্ম্ম-বিশ্বাস নির্ব্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক সম্মিলিত নির্ব্বাচকমণ্ডলী এ সমান নির্ব্বাচনাধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোনর প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন প্রণালী গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং এই সর্ত্ত পালিত হওয়া আবশ্যক, যে, কোনও সম্প্রদায়কে ন্যায্য স্বার্থ ত্য করিতে বাধ্য করা হইবে না।"

(৪) "সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত রদ না-হওয়া পর্য্যন্ত উহার বিরুদ্ধ ক্রমাগত আন্দোলন চালাইবার উদ্দেশ্যে একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হইল।

"রাজনৈতিক দলনির্ব্বিশেষে সাম্প্রদায়িক-সিদ্ধান্ত-বিরোধী কোন ভারতবাসী এই সঙ্ঘের সভ্য হইতে পারিবেন। সভ্যদের চাঁদ পরিমাণ চারি আনা।"

—

লক্ষ্ণৌয়ে বাঙালী

পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে সে দিন লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলাম অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরবাড়ি অন্য নানা ব্যবস্থা বহু অর্থব্যয়ে করা হইয়াছে। এখান অনেক বাঙালী অধ্যাপক আছেন। তাঁহারা কয়েক বিভাগে অধ্যাপনা ব্যতীত গবেষণার কাজও করিতেছেন এখানকার আর্ট ও কারুকার্য্যের বিদ্যালয়ে অন্যা শিক্ষাদাতাদের মধ্যে চারি জন বাঙালী অধ্যাপক আছেন তাঁহারা নিজ নিজ কাজ দক্ষতার সহিত করিতেছেন।

বঙ্গের বাহিরে কোথাও গেলে প্রথমেই জানিতে ইচ্ছ হয়, সেখানকার বালকবালিকারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানলাভ করিতেছে কি না। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদে শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধেই জানিবার ইচ্ছা বেশী হয়; কার বালিকাদের মধ্যে বালিকাদের শিক্ষাতেই অবহেলা অধিকতর লক্ষ্ণৌয়ে বাঙালী মেয়েদের একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে ইহার নাম হরিমতি বালিকা-বিদ্যালয়। তথাকার

সঙ্গতিপন্ন সান্ন্যাল-পরিবারের শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্ন্যালের পিতামহীর নাম অনুসারে উহার ঐ নাম হইয়াছে। উহার নিজের বাড়ি নাই। শুনিলাম, সান্ন্যাল মহাশয়েরা ইচ্ছা করিলে নিজেই বাড়ি করিয়া দিতে পারেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু যেরূপ কর্ম্মক্ষম লোক তাহাতে, সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থে যদি না করেন, অন্ততঃ নিজেদের চেষ্টা ও অর্থে করিতে পারেন বলিয়া মনে হয়।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত-সম্মেলন

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত-সম্মেলন প্রতি বৎসর হইয়া থাকে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ইহার আরম্ভ হয়। প্রধানতঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্যের চেষ্টায় ইহা স্থাপিত হয় ও পরিচালিত হইতেছে—এই জন্য গত বৎসরের অধিবেশনের সভাপতি মেজর ডাঃ দেশরাজ রণজিৎ সিং এবং বর্ত্তমান বৎসরের সভাপতি বিহারী নেতা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন। এ বৎসর আগ্রা-অযোধ্যার শিক্ষামন্ত্রী স্যর জ্বালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব ও স্বরাষ্ট্র সদস্য (Home Member) কুমার জগদীশপ্রসাদও তাঁহার প্রশংসা করেন। পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষে কুমার জগদীশপ্রসাদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত ফ্যাকাল্টি না-থাকা আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে সঙ্গীতের সম্যক উন্নতির পক্ষে একটি বাধা।

এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ও দেশী রাজ্য হইতে ওস্তাদেরা আসিয়া নিজ নিজ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তদ্ভিন্ন, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গীত ও নৃত্যে পারদর্শিতার পরীক্ষা হয় এবং তাহাদের মধ্যে সুদক্ষেরা পুরস্কৃত হয়। এ বৎসর ৫৫টি পুরস্কারের মধ্যে ২৪টি প্রবাসী বাঙালী ছেলেমেয়েরা পাইয়াছে। তাহাদের নাম ও দক্ষতার বিষয়—

কণ্ঠসঙ্গীতে অন্নপূর্ণা বিশ্বাস, শান্তিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী মিত্র, সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য; নৃত্যে সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য; হার্মোনিয়মে মিনতি ঘোষ; এস্রাজে মিনতি ঘোষ; তবলায় সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য। এই বালিকাগুলির বয়স নয় বৎসরের কম। নয় বৎসরের কম বয়সের বালকদের মধ্যে পুরস্কার পাইয়াছে—কণ্ঠসঙ্গীতে নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বেহালায় সমীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তবলায় নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, পাখোয়াজে মদনমোহন মুখোপাধ্যায়, নৃত্যে নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতে শৈলেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তবলায় শচীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং হার্মোনিয়মে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কার পাইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে এলাহাবাদে বাঙালী কোন ছাত্রী নাই, কিংবা পরীক্ষা দেয় নাই, বা পুরস্কার পায় নাই। অষ্টম শ্রেণীতে নয় বৎসরের কম বয়সের বালিকাদের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতে মণিকা সাহা, এবং চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের বালিকাদের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতে গৌরীরাণী ঘোষ, বরুণারাণী ঘোষ, বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় ও উষা মিত্র এবং হার্মোনিয়মে বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় পুরস্কার পাইয়াছে; ১৭ বৎসরের কম বয়সের বালকদের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতের জন্য দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য পুরস্কৃত হইয়াছে। সংগীত-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও ভট্টাচার্য্য-পরিবার প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে।

শান্তিনিকেতনে সুইডিশ্ শয়-শিক্ষয়িত্রী

হাতের দ্বারা নানা রকম শিল্পের কাজ, কারুকার্য্য, সুইডেনে "স্লয়েড" নামক পদ্ধতি অনুসারে শিখান হয়। স্লয়েডের জন্য সুইডেন বিখ্যাত। শান্তিনিকেতনের শয়-শিক্ষক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ সুইডেনে ইহা শিখিয়াছিলেন। তিনি পুনর্ব্বার সেখানে গিয়াছেন। তিনি গত ১৮ই সেপ্টেম্বরের চিঠিতে আমাদিগকে সুইডেন হইতে লিখিয়াছিলেন, "শান্তিনিকেতনে হাতের কাজ শিখাইবার নানা জিনিষ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছি। টাকা সংগ্রহ করিয়া মেয়েদিগকে স্লয়েডের কাজ শিখাইবার জন্য এক জন শিক্ষয়িত্রী পাঠান হইয়াছে। আশা করি এবার সেখানে ভাল কাজের ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিবে।" কাগজে দেখিলাম, এই শিক্ষয়িত্রী মিস্ জে জীন্সন শান্তিনিকেতন পৌঁছিয়াছেন এবং সদাশয় সুইডদের প্রদত্ত হাতের তাঁত ও অন্যান্য স্লয়েড শিখাইবার যন্ত্র আনিয়াছেন। শিক্ষয়িত্রীর সমস্ত ব্যয়ও সুইডেনের কতকগুলি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দিবেন। কাউণ্টেস্ হ্যামিল্টন তন্মধ্যে প্রধান। ইঁহারা সকলে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। লক্ষ্মীশ্বর বাবু যে ধন্যবাদার্হ, তাহা বলাই বাহুল্য—তাঁহার চেষ্টাতেই এই সব হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে লিখিয়াছেন, "[আমি] নিজে দেশের অন্যত্র কাজের চেষ্টায় আছি।" এরূপ যোগ্য ও উৎসাহী শিক্ষককে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কাজে লাগান উচিত। বাংলা দেশকে তাঁহার নৈপুণ্য হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে।

পাটের পরিবর্ত্তে অন্য ফসল

বঙ্গে পাটচাষ আবশ্যক মত কমাইয়া তাহার জায়গায় অন্য ফসল প্রবর্ত্তনের চেষ্টা সরকারপক্ষ হইতে করা হইতেছে। এ-বিষয়ে "সঞ্জীবনী" লিখিয়াছেন—

সর্ব্বত্র বহুল পরিমাণে রবিশস্য বপনের জন্য বলা হইয়াছে। পাটের বদলে চীনাবাদাম, তামাক, তিসি, পিঁয়াজ, রশুন, বিলাতী তরি-তরকারী, আলু ও আখের চাষ করা যাইতে পারে। কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর যে সকল জেলায় রবিশস্যের বীজ পাওয়া দুষ্কর সেই সকল জিলার কালেক্টরদের মারফৎ রবিশস্যের বীজ সরবরাহ করিতেছেন।

এই ইস্তাহার পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। পাট যে ভূমিতে জন্মে, তাহা নিম্ন। তাহা জলে ডুবিয়া যায়। সেখানে তামাক, তিসি, পিঁয়াজ, রশুন, তরি-তরকারী বা চীনাবাদামের চাষ করা যাইতে পারে না।

জেনার‍্যাল স্মাট্‌স্ ভারতে স্বরাজ চান

স্কটল্যাণ্ডের ড্যাণ্ডী শহরে এক বক্তৃতায় দক্ষিণ-আফ্রিকার বিখ্যাত বুয়র নেতা জেনার‍্যাল স্মাট্‌স্ বলিয়াছেন,

সব ব্রিটিশ রাজনৈতিক দল মিলিয়া ভারতবর্ষকে স্বরাজ দেওয়া উচিত; ব্রিটেনের দক্ষিণ-আফ্রিকাকে স্বরাজ দানের নজীর ভারতবর্ষে অনুসৃত হওয়া উচিত। উচিত বটে, কিন্তু হইবার সম্ভাবনা কোথায়? দক্ষিণ-আফ্রিকাকে ব্রিটেন স্বশাসন-অধিকার দিয়াছিল এই জন্য, যে, বুঅররা একতার, শক্তির, ও স্বাধীনতাকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর মনে করিবার প্রমাণ দিয়াছিল এবং শ্বেতকায় খ্রীষ্টিয়ানদের অধিকৃত দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষের মত প্রভূত অর্থাগমের সম্ভাবনাও ছিল না।

—

বহু সিনেমা-চিত্রের অপকারিতা

সিনেমায় চিত্র দেখাইয়া দর্শকদের জ্ঞান বাড়ান যায়, তাহাদিগকে বিশুদ্ধ আমোদ ও শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু শুনিয়াছি, সিনেমার অনেক ফিল্ম অনিষ্টকর, তাহাতে মানুষের নানারূপ পাপপ্রবণতা বাড়ে। বঙ্গের বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী খান্ বাহাদুর আজিজুল হকও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। জননায়কগণের ও গবর্ন্মেণ্টের এক-যোগে সিনেমায় অনিষ্টকর চিত্রপ্রদর্শন বন্ধ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

—

মিঃ ফজলুল হকের একটি বক্তৃতা

বঙ্গীয় মুসলমান যুবকদের কন্ফারেন্সে মিঃ ফজলুল হক বঙ্গের সর্ব্বত্র মুসলমান ছাত্রদের জন্য আরও অধিক-সংখ্যক ছাত্রাবাস চাহিয়াছেন। ছাত্রাবাসে থাকিবার যত ছাত্র জুটিবে তদনুসারে গৃহনির্ম্মাণ অবশ্যই হওয়া চাই। কিন্তু বঙ্গের আধুনিক সরকারী পঞ্চবার্ষিক শিক্ষারিপোর্টে (৮৩ পৃষ্ঠায়) দেখিতেছি, যে, কেবল রাজশাহী মাদ্রাসা ছাড়া অন্য সব মুসলমান ছাত্রাবাসে রিপোর্টাধীন পাঁচ বৎসর বিস্তর জায়গা ছাত্র অভাবে খালি ছিল এবং কয়েকটি ছাত্রাবাস ছাত্রাভাবে একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল। এ অবস্থায় ফজলুল হক সাহেব আরও ঘরবাড়ি কেন চান?

তিনি মুসলমান যুবকদিগকে আত্মোৎসর্গপরায়ণ হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার দৃষ্টান্তের জন্য গিয়াছিলেন সার্ভেণ্টীসের যুগের স্পেনে! অমুসলমানরা ভারতবর্ষে যদি আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত নাই দেখাইয়া থাকে, ভারতবর্ষের মুসলমানরা সহস্রাধিক বৎসরেও তাঁহার দৃষ্টিতে এরূপ কোন দৃষ্টান্ত দেখায় নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। যদি দেখাইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি তাহার সন্ধানে স্পেনে গেলেন কেন?

—

খান আবদুল গফ্ফর খান ও বঙ্গদেশ

গত ৫ই অক্টোবর খান আবদুল খানকে কলিকাতায় যে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে মানপত্র দেওয়া হয়, তাহার উত্তর প্রদান উপলক্ষ্যে তিনি বলেন, "গবর্ন্মেণ্ট যদি আমাকে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যাইতে না-দেন, তাহা হইলে আমি শৌর্য্যসম্পন্ন বঙ্গদেশে বাস করিব এবং এখানে গ্রামসেবায় আত্মনিয়োগ করিব।"

—

বঙ্গে ফলের চাষ

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে ফলের চাষের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য চেষ্টা হইতেছে। বঙ্গেও সামান্য পরিমাণে হইতেছে। ফলভক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা চিকিৎসকেরা কিছুদিন হইতে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সকলের ব্যবহারের পক্ষে সস্তাদামে যথেষ্ট ফল এখনও পাওয়া যায় না। বাংলা দেশের সর্ব্বত্র নানা রকম ফলের চাষ হইতে পারে। অনেক বৎসর হইল, স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতা মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, দার্জ্জিলিং জেলায় হিমালয়ের গাত্রে ইউরোপের অনেক ভাল ফলের চাষ হইতে পারে, বাঙালীদের এই কাজে লাগা উচিত।

—

চীনে লোকশিক্ষা

নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য চীনে লোকশিক্ষার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। অনেক জায়গায় প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষক না পাওয়ায় লিখনপঠনক্ষম বালকদের দ্বারা এই কাজ করান হইতেছে। তাহারা দিনের বেলায় নিজে পড়ে, সন্ধ্যার পর অন্য লোকদিগকে পড়ায়। মহিলাদের মধ্যে শিশু শিক্ষকরা খুব কার্য্যক্ষমত্ব দেখাইয়াছে। একটি পরিবারে একটি ছয় বৎসরের নাতী তাহার ষাট বৎসরের ঠাকুরমাকে অল্প সময়ের মধ্যে পড়িতে শিখাইয়াছে।

বঙ্গে এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। তা ছাড়া, এত শিক্ষিত যুবক ও শিক্ষিতা যুবতী এখানে বেকার আছেন, যে, অল্প ব্যয়েই তাঁহাদের দ্বারা বাংলা দেশ হইতে নিরক্ষরতা বহু পরিমাণে দূর হইতে পারে। রাষ্ট্রশক্তি আমাদের হাতে থাকিলে আমরা, যথেষ্ট সরকারী ঋণ করিয়াও, এই কাজ করিতাম।

—

অধ্যাপক সুরেন্দ্রকুমার সেন

দিল্লীর হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সুরেন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের ৪৪ বৎসর বয়সে হঠাৎ মৃত্যুতে, শুধু দিল্লী নহে, সমগ্র ভারতবর্ষ এক জন কৃতী শিক্ষক হারাইয়াছে। তিনি অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ছিলেন এবং ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্বিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু দৈহিক কারণে নিযুক্ত হন নাই। তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের প্রধান, এবং অন্তর্জ্জাতিক ঐতিহাসিক সভার সভ্য ছিলেন। বাঙালীদের কৃষ্টিসম্পর্কীয় সব কাজে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। অন্য সব সমাজেও তিনি লোকপ্রিয় ছিলেন।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড — পৌষ, ১৩৪১ — ৩য় সংখ্যা

অচিন মানুষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুমি অচিন মানুষ ছিলে গোপন আপন গহন তলে
কেন এলে চেনার সাজে ?
তোমায় সাঁজ সকালে পথে ঘাটে দেখি কতই ছলে
আমার প্রতিদিনের মাঝে।
তোমায় মিলিয়ে কবে নিলেম আপন আনাগোনার হাটে
নানান্ পান্থদলের সাথে,
তোমায় কখনো বা দেখি আমার তপ্ত ধূলার বাটে
কভু বাদল-ঝরা রাতে।
তোমার ছবি আঁকা পড়ল আমার মনের সীমানাতে
আমার আপন ছন্দে ছাঁদা,
আমার সরু মোটা নানা তুলির নানান্ রেখাপাতে
তোমার স্বরূপ পড়ল বাঁধা।
তাই আজি আমার ক্লান্ত নয়ন, মনের চোখে দেখা
হ'ল চোখের দেখায় হারা,
দোঁহার পরিচয়ের তরীখানা বালুর চরে ঠেকা
সে আর পায় না স্রোতের ধারা ॥

ও যে অচিন মানুষ, মন উহারে জানতে যদি চাহো
জেনো মায়ার রং-মহলে,
প্রাণে জাগুক্ তবে সেই মিলনের উৎসব উৎসাহ
যাহে বিরহ-দীপ জ্বলে।
যখন চোখের সামনে বসতে দেবে তখন সে আসনে
রেখো ধ্যানের আসন পেতে,
যখন কইবে কথা সেই ভাষাতে তখন মনে মনে
দিয়ো অশ্রুত সুর গেঁথে।
তোমার জানা ভুবনখানা হ'তে সুদূরে তার বাসা
তোমার দিগন্তে তার খেলা।
সেথায় ধরা-ছোঁওয়ার অতীত মেঘে নানা রঙের ভাষা
সেথায় আলো-ছায়ার মেলা।
তোমার প্রথম জাগরণের চোখে উষার শুকতারা
যদি তাহার স্মৃতি আনে
তবে যেন সে পায় ভাবের মূর্ত্তি রূপের বাঁধনহারা
তোমার সুরবাহারের গানে॥

শান্তিনিকেতন
৩০ কার্ত্তিক, ১৩৪১

শব্দপ্রসঙ্গ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

নিম্নলিখিত শব্দ কয়টির মূল অনুসন্ধেয়। বাঙ্‌লায় ইহাদের প্রয়োগ আছে; তিব্বতী ভাষায় ইহাদের অনুরূপ শব্দ আছে। মনে হয়, ইহারা অথবা ইহাদের কয়েকটি তিব্বতী হইতে বাঙ্‌লায়, অথবা বাঙ্‌লা-প্রভৃতির সম্বন্ধে তিব্বতীতে গিয়াছে।

ভু রা

'নিকৃষ্ট চিনি' অর্থে ভু রা শব্দ বাঙ্‌লায় পাওয়া যায়; যেমন,

> আট পণে আনিয়াছি আধ সের চিনি।
> অন্য লোকে ভু রা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি ॥
>
> —ভারতচন্দ্র।

তিব্বতীতে সাধারণত 'চিনি' বুঝাইতে বু্‌. র ম* এই শব্দটির প্রয়োগ আছে। 'আক' বা 'ইক্ষু'কে তিব্বতীতে বলে বু র. শি ঙ। শিঙ শব্দের অর্থ 'গাছ'। বু র. শি ঙ আক্ষরিক অর্থ 'চিনির গাছ।' এখানে বু. র ম না বলিয়া কেবল বু র বলা গিয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে†। অতএব বু র ও বু. র ম বস্তুত একই। মূল তিব্বতী ভাষায় ভ-ধ্বনি নাই। তিব্বতী হইতে শব্দটি বাঙ্‌লায় আসিলে বলিতে হইবে তিব্বতীর অল্পপ্রাণ ব বাঙ্‌লায় মহাপ্রাণ ভ হইয়াছে।

বো রা

'ছালা' বা 'চটের বড় থলিয়া' অর্থে হিন্দী-প্রভৃতি ও বাঙ্‌লায় আছে বো রা। কোথা হইতে ইহা আসিল? তিব্বতীতে ঐ একই অর্থে আছে বো র. র।

চো না

'গোমূত্র' বুঝাইতে আমরা চো না শব্দ প্রয়োগ করি। ইহার মূল কি? মনে হয় তিব্বতী। ঐ অর্থেই তিব্বতীতে আছে গ চি ন (=গ চি ন. প)। ব্যঞ্জনের পূর্ব্ববর্ত্তী গকারের উচ্চারণ হয় না। তাই গ চি ন উচ্চারিত হইয়া থাকে চি ন।

পে ছা

বর্দ্ধমান, বীরভূম, ও মুর্শিদাবাদ জেলায় 'টুকরী' বা 'ঝুরি' অর্থে পে ছা শব্দ আছে। নিশ্চয়ই ইহা কোনো সংস্কৃত শব্দ হইতে আসে নাই। জল-প্রভৃতি বহনের জন্য 'চামড়ার থলিয়া' বা 'মশক' বুঝাইতে তিব্বতীতে প. চে (চ.=ts, দন্ততালব্য চ) শব্দ আছে। আর একটি শব্দ আছে ফ. ছে (ছ=tsh, দন্ততালব্য ছ)। ইহা সাধারণত 'ছালা' 'বোরা' বা 'থলিয়া' অর্থে প্রযুক্ত হয়। মনে হয় এই তিব্বতী শব্দযুগলের সহিত পে ছা শব্দের যোগ রহিয়াছে। দ্রষ্টব্য—F. W. Thomas: *Some Notes on the Kharosthi Documents* in the *Acta Orientalia*, Vol. xiii. Pars. I, pp. 54-56.

ঠি ক, ঠি ক-ঠি ক

'সত্য', 'উপযুক্ত', 'সমান-সমান' ইত্যাদি অর্থে বাঙ্‌লায় ও হিন্দী-প্রভৃতিতে ঠি ক শব্দের প্রয়োগ আছে। হিন্দীতে উচ্চারণ ঠী ক। তিব্বতীতে 'উপযুক্ত' ও 'সমান-সমান' ('কমও নহে, বেশীও নহে') থ্রি গ. থ্রি গ শব্দ আছে। উচ্চারণে থ্র=ঠ। অতএব থ্রি গ. থ্রি গ উচ্চারণে ঠি গ. ঠি গ। ঘোষ গ অঘোষ হইলে ক হয়। তদনুসারে ঠি গ. ঠি গ হইতে ঠি ক ঠি ক হইতে পারে।

ফে র, ফি রা

'আবার' অর্থে ফে র শব্দ বাঙ্‌লায় আছে। যেমন, সা র দা ম ঙ্গ লে "ফে র একি আলো এল।" এই অর্থে হিন্দী শব্দ ফি র। বাঙ্‌লায় আরো আছে ফি রে; যেমন

---

* তিব্বতী শব্দসমূহের শেষের ব্যঞ্জনটি হসন্ত বুঝিতে হইবে; যেমন, র ম উচ্চারিত হয় র ম্‌।

† দ্রষ্টব্য Laufer: *T'oung Pao*, Vol. xvii, 1916, pp. 404 ff: No, 46; বর্ত্তমান লেখকের *Loan words in Tibetan* in *Archiv Orientalini*, Vol. 6 (1934), No. 2, p. 354, No: 38.

শি বা য় নে "ফি রে অন্ন রাখে উমা দেখে গিরিরাণী।" 'পশ্চাৎ' অর্থেও আমরা ফি রে অথবা ফি রি য়া বলিয়া থাকি। ইহাদের মূল কি? তিব্বতীতে 'আবার' ও 'পশ্চাৎ' এই উভয় অর্থেই ফ্যি র শব্দ আছে। ফ্যি র্‌ং ও ঙং ব ইহার অর্থ 'ফিরিয়া আসা'। 'ভ্রমণ' অর্থেও বাঙ্‌লাতে ফি রা শব্দের প্রয়োগ আছে; যেমন, সে ফিরিতেছে। তিব্বতীতে ফ্যি র এই শব্দের অপর অর্থ 'বাহির'; যেমন, ফ্যি র্‌ং ল 'বাহিরে'। এই 'বাহির' হইতে 'বাহিরে যাওয়া' ও তাহা হইতে 'ভ্রমণ' অর্থ হইয়া থাকিবে।

এখানে একটা কথা লক্ষ্য করিবার আছে। তিব্বতীতে অনেক প্রদেশে ফ্য উচ্চারিত হয় ছ। আমাদের তিব্বতী শিক্ষক মহাশয় বলেন সুশিক্ষিত লামারা এই পরিবর্ত্তিত উচ্চারণ করেন না। ইহা হইলে তিব্বতী ফ্যি র হইতে আলোচ্য বাঙ্‌লা শব্দটির আসিতে বাধা থাকে না। অথবা বাঙালী প্রভৃতিই ঐ তিব্বতী শব্দটিকে নিজেদের মত উচ্চারণ করিয়া লইয়াছেন।

বো ল

বাঙ্‌লা প্রভৃতিতে 'শব্দ' অথবা 'বলা' অর্থে কোনো-না-কোন আকারে বো ল শব্দ আছে; যেমন হ রি বো ল ইত্যাদিতে। হেমচন্দ্রের দে শী না ম মা লা য় (৬.৯০) ইহাকে দেশী শব্দ বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে, এবং বহু প্রাকৃত গ্রন্থে ইহার প্রয়োগ আছে। হেমচন্দ্র নিজের প্রাকৃত ব্যাকরণের ধাতু-আদেশ প্রকরণে √ব দ্‌ ধাতুর স্থানে বো ল আদেশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা মনে করিতে হইবে না যে, √ব দ্‌ ধাতু বো ল আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার প্রমাণ নাই। তবে বো ল শব্দ কোথা হইতে আসিল? তিব্বতীতে 'আহ্বান' অর্থে বো ল-পো শব্দ আছে। (এখানে পো ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।) ইহাই কি বাঙ্‌লা-প্রভৃতিতে আসে নাই?

একাদশী

শ্রীসীতা দেবী

প্রৌঢ়বয়সে বিধবা হইয়া নবদুর্গা যেন একেবারে অথই জলে পড়িয়া গেলেন। স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তিনি, সতীনপো, সতীনঝিতে বাড়ি ভর্ত্তি। তথাপি আদরের স্ত্রী বলিয়া, এই ত্রিশ বৎসরের বিবাহিত জীবন তাঁহার আনন্দে না কাটুক, উগ্ররকম স্বাধীন ভাবে কাটিয়াছিল। তিনি কোন দিন কাহারও মুখ চাহিয়া থাকেন নাই, পরিবার-পরিজন সকলেই তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকিত। সংসারের উপর তাঁহার ছিল অপ্রতিহত ক্ষমতা, স্বামীসুদ্ধ কখনও তাঁহার কথার উপর কথা বলিতে সাহস করিতেন না। যুবতী পত্নীকে তিনি সুখী করিতে পারেন নাই, তাহা বৃদ্ধ খুব হাড়ে হাড়ে বুঝিতেন, সুতরাং যাহা লইয়া সে ভুলিয়া থাকে থাক বলিয়া নবদুর্গার অন্যায়রকম প্রভুত্বপরায়ণতায়ও কখনও বাধা দিতেন না।

প্রথম পক্ষের মেয়েরা বিবাহ হইয়া যাইবার পর পারতপক্ষে আর বাপের বাড়ির ছায়া মাড়াইত না। সতীনপুত্রদের বিবাহ করিয়া আরও যেন জ্বালা বাড়িয়া গিয়াছিল। এক কানে সৎমায়ের গালাগালি শুনিত, আর এক কানে স্ত্রীদের নালিশ শুনিত। উত্তরে তাহাদের কিছু বলিবার ছিল না। বাপের খায় তাহারা, বাপের গৃহিণীর মুখের উপর কথা বলিবে কি করিয়া? দাঁতে দাঁত ঘষিয়া চুপ করিয়া যাইত। একমাত্র তাহাদের আশার বিষয় ছিল এই যে, নবদুর্গার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। বৃদ্ধ পিতা আর কয়দিন? তাহার পর তাহারাও দেখিয়া লইবে। এক ভয় বাপ পাছে উইল করিয়া সৎমায়ের বিশেষ কিছু সুবিধা করিয়া যান।

সেই ইচ্ছাই বাপেরও ছিল। পৈতৃক সম্পত্তি তাঁহার যাহা ছিল, তাহা অবশ্য পুত্রদেরই প্রাপ্য, তাহা তিনি বেহাত করিতে পারেন না। কিন্তু নগদ কিছু টাকা জমাইয়াছিলেন এবং কলিকাতায় মাঝারিগোছের একখানি বাড়ি করিয়াছিলেন। এইগুলি নবদুর্গাকে উইল করিয়া

দিয়া যাইবার কথা ছিল। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত বৈধব্য আসিয়া নবদুর্গার ললাটে আগুন ধরাইয়া দিয়া গেল। কর্ত্তা সন্ন্যাসরোগে মারা গেলেন।

সতীনপুত্রদের উল্লসিত মুখের দিকে চাহিয়া নবদুর্গার বুকের ভিতর দুরদুর করিতে লাগিল। পিতৃবিয়োগের শোকও তাহাদের এই নিষ্ঠুর আনন্দকে দমাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। নবদুর্গা এই মহা সর্ব্বনাশের মধ্যেও নিজের কাছে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলেন না যে, তাহাদের এরকম অস্বাভাবিক ব্যবহার করিবার হেতু তিনিই জুটাইয়া দিয়াছেন। তিনি যদি অত পরিপূর্ণরূপে সৎমা-গিরি না ফলাইতেন, তাহা হইলে ইহারাও হয়ত এমন দানবের মূর্ত্তি ধরিত না।

কিন্তু সব দোষ কি তাঁহারই? প্রথম যৌবনের সমস্ত আশা, সব রঙীন নেশা তাঁহার এমন করিয়া ভাঙিয়া দিলেন কেন? পনের-ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইল। বিধবা মাতার কন্যা তিনি, আত্মীয়স্বজনে কোনমতে বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিল। শুভদৃষ্টিতে ক'নের চোখে যে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা ত কেহ দেখিল না? ফুলশয্যার রাত্রে দারুণ অসুস্থতার ভান করিয়া সে যে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল, তাহাও কেহ জানিল না।

আশাভঙ্গের, আনন্দহীন জীবনের যে দারুণ জ্বালায় নবদুর্গার অস্তিত্ব ভরিয়া উঠিয়াছিল তাহার সব ধাক্কাই পোহাইতে হইয়াছিল তাহার স্বামীর প্রথম পক্ষের সন্তানগুলিকে। দোষী তাহারা অবশ্য নয়, কিন্তু জগতে দোষী-নির্দ্দোষীর বিচার অত চুল চিরিয়া ত হয় না? এক জনের দোষে আর এক জন ভুগিতেছে, এ ত সদাসর্ব্বদাই দেখা যায়।

অশৌচের দিন ক'টা কোনমতে কাটিয়া গেল। তিনি একলা আপনার ঘরে মৃত্তিকাশয্যায় পড়িয়া থাকেন, একবার খান কি না-খান, তাহারও খোঁজ কেহ করে না। বাড়িতে হবিষ্যাকারীদের জন্য গাওয়া ঘি, দুধ, ফলমূল, মিষ্টান্ন, ভারে ভারে আসে; তাঁহার নিকট পর্য্যন্ত সেগুলির এক কণাও পৌছায় না। নামে অশৌচ, কিন্তু সকলের ব্যবহারে ও মুখের ভাবে মনে হয়, বাড়িতে মহা একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি কোন প্রকারে চুকিয়া গেল। কর্ত্তা গ্রামের ভিতর মানী ব্যক্তি ছিলেন, তাহার উপযুক্ত ভাবেই তাঁহার কার্য্য হইয়া গেল।

পরদিন সকাল হইতেই বড় পুত্রবধূ তাঁহার ঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ছোটমা, উঠেছ নাকি গো?"

ইতিপূর্ব্বে ছেলেরা যাহাই বলুক, বধূরা তাঁহাকে মা বলিয়াই ডাকিত। এখন তাহাদেরও ডাক বদলাইয়াছে। যাক্, তাহাতে নবদুর্গার কিছু আসিয়া যায় না। পাতান মা হইবার জন্য তাঁহার কোন ব্যস্ততা নাই। বলিলেন, "উঠেছি, বাছা।"

বধূ বলিলেন, "তোমার ছেলে বল্‌ছিলেন কি, দিন-কতক শাঁখরাইল ঘুরে এস। শরীর মনটা ভাল হোক। আমাদেরও একবার হাওয়া বদলাতে যাবার কথা হচ্ছে।"

শাঁখরাইলে, অর্থাৎ নবদুর্গার মামার বাড়িতে, দুই মামাতো ভাইয়ের সংসার। সেখানে যে তাঁহার খুব সাদর অভ্যর্থনা হইবে, তাহা মনে করিবার কোন হেতু ছিল না। তবু তাঁহাকে মান রাখিবার জন্য বলিতে হইল, "হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা আমি করেছি, কালই যাব। তোমাদের আর তা মনে করিয়ে দিতে হবে না।"

ঠাকরুণ ভাঙেন তবু মচকান না। বড়বৌ মুখখানা বিকৃত করিয়া সরিয়া গেল।

বলিয়াছেন যখন তখন নবদুর্গাকে যাইতেই হইবে। গাড়ীর ব্যবস্থা করিতে লোক পাঠাইয়া, তিনি জিনিষপত্র গুছাইতে বসিয়া গেলেন। এ-গৃহে আর তাঁহার স্থান হইবে কি না তাহা কেই বা জানে? যতদূর সম্ভব নিজের যাহা কিছু আছে তাহা লইয়া যাওয়াই ভাল। যাহা লইয়া যাইতে পারিবেন না নিতান্তই, তাহা পাড়াপ্রতিবেশীর ঘরে রাখিয়া যাওয়া ভাল, কারণ এ বাড়িতে রাখিয়া গেলে তাহা আর ফিরিয়া পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু কি যে তাঁহার নিজের জিনিষ তাহা ত ভাবিয়া পাওয়াও ভার। নিঃসন্তান বিধবা তিনি, তাঁহার কিসেই বা অধিকার আছে? পরনের কাপড়-চোপড় এবং গহনা-গাঁটি ভিন্ন হিন্দুসংসারে স্ত্রীলোকের কিছুই আপনার বলিতে থাকে না। কাপড়-চোপড় নবদুর্গার ঢের ছিল,

কর্ত্তা সেদিকে কোন কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু সেগুলি এখন কোন্ কাজে লাগিবে? নিজের মেয়ে নাই যে পরিবে, ছেলেও নাই যে ঘরে একটি বউ লইয়া আসিবে। তিনি বরং ঐ হাজার-বারো-শ টাকার কাপড় জ্বালাইয়া দিবেন, তবু ঐ উনানমুখী সতীনপো-বৌদের দিয়া যাইতে পারিবেন না। থাক্ তাঁহার সঙ্গেই এ-সব, যে-বাড়িতে আশ্রয় পাইবেন, সে-বাড়ির বৌ-ঝিদের দিলে বরং তাহাদের মন পাওয়া যাইবে। গহনা এতদিন গায়ে পরিয়াছেন ত যথেষ্ট, কিন্তু সেগুলির উপর তাঁহার অধিকার আছে কি? কর্ত্তা ছিলেন হিসাবী মানুষ, বড়গিন্নীর সিন্ধুক ভর্ত্তি গহনা ছিল, তাহার ভিতর হইতেই বেশ গা-সাজান অনেকগুলি গহনা তিনি ছোটগিন্নীকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। অনর্থক স্যাক্‌রাকে একরাশ টাকা বানি দিয়া হইবে কি? ছেলের বউরা স্বর্গগতা শাশুড়ীর গহনা সৎ-শাশুড়ীর অঙ্গে দেখিয়া রাগে জ্বলিয়া যাইত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার উপায় ছিল না। স্বামীদের কাছে নালিশ করিলে তাহারা বলিত, "তোমরাও ত অনেক পেয়েছ বাপু, তা অত হিংসে কেন? ওটা যমের বাড়ি যাক্, তারপর সবই তোমাদের হবে।"

ছোটগিন্নী যমের বাড়ি ত গেলেন না, কিন্তু পাছে গহনা লইয়া বাপের বাড়ি পলায়ন করেন, সেই ভাবনায় তিন বৌ অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বড়বৌ একবার সৎ-শাশুড়ীর দরজা ঘুরিয়া আসিয়াছে, সে আর যাইতে রাজী হইল না। বলিল, "লাভ হ'লে সকলের হবে, আমি একলা নিমিত্তের ভাগী হব কেন?"

অগত্যা মেজবৌ এবার চলিল। সাহস সঞ্চয় করিয়া সোজাসুজি নবদুর্গার ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া বলিল, "জিনিষ-পত্তর গোছান হয়ে গেল নাকি?"

নবদুর্গা রাগ দমন করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, "একলা হাতে যতদূর হবার তা হয়েছে।"

আজ আর তাঁহার রাগকে কেই বা গ্রাহ্য করে? মেজবৌ বলিল, "তোমার ছেলে বলছিলেন কি, গহনা-গাটিগুলো যেন নিতে গিয়ে পথে বিপদ বাধিও না। রাস্তা-ঘাট ভাল না, তার উপর একলা যাচ্ছ।"

এই ভয়ই এতক্ষণ নবদুর্গা করিতেছিলেন। সতীন-পুত্ররা তাঁহাকে শূন্য হাতেই বাড়ির বাহির করিয়া দিতে চায়। বাপের বাড়ি হইতে তিনি সোনার মাকড়ী আর মাথার ফুল কাঁটা ভিন্ন কোন সোনার গহনাই পান নাই। বুড়া বরকে অমন লক্ষ্মীরূপিণী মেয়ে ধরিয়া দেওয়া হইল, আবার সোনার গহনাও দিবে? অত আর না। নবদুর্গার সারা অঙ্গে যে পঞ্চাশ-বাট ভরির সোনার গহনা ঝক্ ঝক্ করিত, সবই এ-বাড়ির দেওয়া। কর্ত্তা যদি গড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলে কোন ছোটলোকের বেটীকে আর কথা বলিতে হইত না। কিন্তু এ যে সতীনের গহনা, তাঁহার দাবি কোথায় এগুলির উপরে? জোর করিয়া কিছু বলিতে গেলে শেষে অপমানিত হইয়া বিদায় হইতে হইবে। কাজ কি বাপু?

গহনার বাক্সটা বড় ট্রাঙ্ক হইতে বাহির করিয়া তিনি ঠক্ করিয়া মেঝের উপর বসাইয়া দিলেন। তাহার ভিতর হইতে ফুল কাঁটা ও মাকড়িগুলি বাছিয়া লইতে লইতে বলিলেন, "নিয়ে যাও গো, তোমাদের গহনাতে আমার কাজ নেই, বুকে ক'রে আগলে রাখ। হাতের নোয়াই যখন ঘুচল, তখন ও-সব ছাইভস্মে আমার কাজ কি?"

মেজবৌ আনন্দে আটখানা হইয়া গহনার বাক্সটি উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। এগুলি উদ্ধারের আশা তাঁহারা ভরসা করিয়া এতদিন করিতে পারেন নাই। তিন বউয়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ছেলেরাও আসিয়া যোগ দিলেন। গোলমালের মধ্যে নবদুর্গা বিদায় হইয়া গেলেন। গহনা পাওয়ায় সকলে তখন এত খুশী যে সৎ-মা ঘটিবাটি লইয়া পলায়ন করিতেছে কিনা তাহা আর কেহ দেখিতে আসিল না।

বহু বৎসর পরে নবদুর্গা মামার বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। স্বামী বিবাহের পর সেই যে লইয়া গিয়াছিলেন, আর ফিরিয়া পাঠানোর নাম করেন নাই। বাড়ির গৃহিণীর অত বড় সংসার ফেলিয়া সারাক্ষণ হটর্ হটর্ করিয়া মামার বাড়ি যাওয়া পোষায় না, তা আবার বাপের বাড়িও না। তাঁহার একটা মানসম্ভ্রম ছিল ত? নবদুর্গার মা এ সংসারে আশ্রিতা বিধবা ভগিনী ছিলেন, তাঁহার আর কিইবা প্রতিপত্তি? অনেক ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া বড় মামাতো

ভাইয়ের বিবাহে নবদুর্গা একবার আসিয়াছিলেন, আর আসা তাঁহার ঘটিয়া ওঠে নাই। সেবারে তাঁহার গহনা কাপড়ের ঘটা দেখিয়া মামী এবং মামাতো বোনরা কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিতাই হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল।

যাহা হউক, তখন মা বাঁচিয়াছিলেন, দিদিমাও বাঁচিয়াছিলেন। এখন তিনি একেবারেই পরের সংসারে আসিতেছেন। মামাতো ভাইয়ের বৌদের মধ্যে বড়টিকে সেই বিবাহের কনে-বৌ রূপে দেখিয়া গিয়াছেন, ছোটটিকে একেবারেই দেখেন নাই। তাহাদের মধ্যে এক জন সাত ছেলের মা, এক জন পাঁচ ছেলের মা। কি ভাবে সকলে তাঁহাকে গ্রহণ করিবে কেইবা জানে? এত দিন নবদুর্গার মনে বড়ই বেদনা ছিল তিনি বন্ধ্যা বলিয়া, আজ এক-একবার মনে হইতে লাগিল ভগবান ভালই করিয়াছেন। এই কপাল লইয়া তিনি ছেলেমেয়ে মানুষ করিতেন কিরূপে? আবার মনে হইতে লাগিল, পেটের এক-আধটা থাকিলে তাঁহাকে এমন ভাবে বিদায় করিয়া দিতেই বা কাহার সাহস হইত?

যাহা হউক, মামার বাড়িতে পা দিবামাত্রই কোন অঘটন ঘটিল না। ভাইবৌরা যথোচিত আর্ত্তনাদ সহকারেই তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। পাড়ার যত মহিলা আসিয়াও কান্নাকাটিতে যোগ দিলেন। একদল ছেলেমেয়ে গোল হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের ঘিরিয়া রহিল। ঘণ্টাখানেক ত এই ভাবেই কাটিয়া গেল।

তাহার পর প্রতিবেশিনীরা যে যাহার কাজে চলিয়া গেল, ছেলেমেয়ের দলও খেলা এবং খাওয়ার সন্ধানে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। নবদুর্গার বাক্স বিছানা ভাঁড়ার ঘরে উঠিল, তিনিও তখনকার মত সেইখানেই গিয়া বসিলেন। আশা করিয়া আসিয়াছিলেন যে তাঁহাকে অন্ততঃ একখানা আলাদা ঘর দেওয়া হইবে, কিন্তু দেখিলেন তাহা হইবার নয়। তাঁহার মাও চিরকাল ভাঁড়ার-ঘরেই দিন কাটাইয়াছেন। তবে দিদিমা তখন বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহার ঘরটা কার্য্যতঃ নবদুর্গাদের দখলেই ছিল, কাজেই তাঁহাদের কোন অসুবিধা ঘটিত না। ভাঁড়ার-ঘরখানি বেশ বড়, এক কোণে তক্তাপোষও পাতা আছে। অন্য ঘরের চেয়ে বরং এ-ঘরে হাওয়া আলো বেশী। তবু মানে ত আঘাত লাগে? নবদুর্গার মনের ভিতরটা খচ্‌খচ্‌ করিতে লাগিল। বড়-বৌকে তিনি সোনার তাবিজ দিয়া মুখ দেখিয়াছিলেন, ছোটবৌয়ের বিবাহের সময় আসিতে পারেন নাই, কিন্তু এক-শ টাকা নগদ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাকে কিছু গহনা গড়াইয়া দিবার জন্য। দিদিমার শ্রাদ্ধে পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহারা কি আর ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে আর একটু সমাদর করিতে পারিত না? কিন্তু বৃদ্ধ সিংহের মুখে ব্যাঙও লাথি মারিয়া যায়। তাঁহার আজ কপাল ভাঙিয়াছে, কাহাকে আর কি তিনি বলিবেন?

দুপুরের খাওয়া তিনি খাইয়াই আসিয়াছিলেন, কাজেই সেদিনের মত নিশ্চিন্ত। বিকালে একটু দুগ্ধ ও ফল খাইয়া শুইয়া পড়িলেন। দুশ্চিন্তার গুরুভার তবু ঘুমের আড়ালে খানিকক্ষণের মত তাঁহার বুকের উপর হইতে নামিয়া গেল।

পরদিন সকাল হইতেই তাঁহার সব দুঃখ দুর্ভাবনা আবার ভীড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। এতটা কাল ঝি চাকর এবং পুত্রবধূদের হুকুম করিয়াই তাঁহার কাটিয়াছে, কোন দিন কুটাটি ভাঙিয়া দুইখানা করেন নাই। আজ বুঝিলেন নিজের সকল কাজ ত তাঁহাকে করিতেই হইবে, উপরি সংসারের কাজও কিছু তিনি করিবেন, ইহাই সকলে প্রত্যাশা করিবে। হিন্দুর বিধবার কাজ একলার হইলেও নিতান্ত সামান্য নয়। জল বহিয়া আনিতেই তাঁহার প্রাণান্ত হইবার জোগাড় হইল। পুকুরটা নিতান্ত কাছেও নয়। ভাঁড়ার-ঘরটা ধুইয়া মুছিতে গিয়া তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসিয়া পড়িলেন। বড়বৌ বাহির হইতে উঁকি মারিয়া বলিলেন, "ঠাকুরঝি দেখি কাজের বার হয়ে গেছ একেবারে। তা দিন-কয়েক করতে করতেই সয়ে যাবে।"

দিন-কতক কাজ করিয়া সহিয়া যাইবার আগেই তিনি না মরিয়া যান, এই ভাবনাই নবদুর্গার হইতে লাগিল। জল টানিয়া, ঘর মুছিয়া এবং বাসন মাজিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে এমন ব্যথা হইল যে প্রায় নড়াচড়া বন্ধ হইবার জোগাড়। কলিকাতায় তাঁহার এক মাসীর বাড়ি। তিনি বিধবা হইলেও নিজের সংসারের কর্ত্রী, যদি দিন-কয়েক হতভাগিনী

বোনঝিকে লইয়া যান ত নবদুর্গা একটু বিশ্রাম করিয়া বাঁচেন। মাসীর কাছে কান্নাকাটি করিয়া একখানা চিঠিই লিখিয়া ফেলিলেন তিনি।

মাসীমা চলিয়া আসিতে লিখিলেন। যাইবার খরচ অবশ্য পাঠাইলেন না। বড়মানুষের গৃহিণী বলিয়া আত্মীয়মহলে নবদুর্গার এত নামডাক ছিল, তাঁহাকেও যে আবার পথ-খরচা পাঠাইতে হইবে তাহা কেহ ভাবিতেও পারিত না। নবদুর্গা সামান্য কিছু টাকা মাত্র লইয়া আসিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইতেই কিছু ভাঙিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। বড় মামাতো ভাইয়ের একটি শ্যালক, প্রায় বারো মাসই দিদির বাড়িতে অতিথি থাকিত, সে বিনা-খরচায় কলিকাতা বেড়াইয়া আসিবার লোভে তাঁহাকে লইয়া যাইতে রাজী হইল।

ভাজ দু-জন বলিলেন, "তা ঠাকুরঝি ঘুরে এস দিন-কতক। এখন এক জায়গায় মন বসতে দেরি লাগবে।"

নবদুর্গা থার্ড ক্লাসে চড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। মাসীর একটি ঘরজামাই ছিল, সে খাইত-দাইত, এবং স্ত্রী দু-কথা শুনাইয়া দিলে শাশুড়ীর কাছে গিয়া নালিশ করিত। শাশুড়ীরও তাহার উপর বিশেষ স্নেহ ছিল। এই জামাতাটিকেই তিনি নবদুর্গাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

নবদুর্গা নামিতেই ছেলেটি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিল। বলিল, "আমি আপনাকে সেকেণ্ড ক্লাসে খুঁজে খুঁজে হয়রান, আপনি যে থার্ড ক্লাসে আসবেন তা জানব কি ক'রে?"

ছেলেটির বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া নবদুর্গা বলিলেন, "আর কি সেকেণ্ড ক্লাসে চড়বার দিন আছে ভাই?"

মাসীর ঘরজামাই আবার বুদ্ধির পরিচয় দিয়া বলিল, "তা হ'লে ঘোড়ার গাড়ীই একখানা ডাকি?"

নবদুর্গা বলিলেন, "তাই ডাক।"

কলিকাতায় বহু দিন পূর্ব্বে একবার আসিয়াছিলেন, তার পর এই। শহরটা আশ্চর্য্য, একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, কিছুই আর চিনিবার উপায় নাই। বিরাট রাজধানীর বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি নিজে দুর্ভাগ্যের ভাবনাসুদ্ধ ভুলিয়া গেলেন।

মাসী তাঁহাকে আদর করিয়াই গ্রহণ করিলেন তাঁহার বৈধব্যের শোকে বেশী যে কান্নাকাটি করিলেন না তাহাতে তিনি একটু বাঁচিয়াই গেলেন। এখানকার ঘর দুয়ার ভাল, কলের জল আছে, তরি-তরকারি, দুধ-ঘি, ফল মিষ্টান্ন অনেক রকম পাওয়া যায়, তাঁহার ক্লিষ্ট দেহ-মন এক যেন প্রফুল্লই বোধ হইতে লাগিল। স্নান করিয়া, নিজে কাপড় কাচা ছাড়া আর বেশী কিছু করিতে হইল না। মাসী বেশ শক্ত আছেন, রান্নাবান্না নিজেই করিতে পারেন বাড়িতে আর এক জন আত্মীয়া বিধবা আছেন, তিনি করেন। নবদুর্গা খাইয়া-দাইয়া সুস্থির হইয়া বেশ এ ঘুম দিয়া উঠিলেন। সন্ধ্যায়ও এখানে জলখাবারের এলা রকম আয়োজন। ক্ষীর, লুচি, রসগোল্লা কত কি।

দু-একটা দিন ভালই কাটিল। নবদুর্গা কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, পরেশনাথের মন্দির সব বেড়াই আসিলেন।

মাসীর মেয়ে রাজলক্ষ্মী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসি "দিদি ক-দিন আছ এখানে?"

নবদুর্গা বলিলেন, "দেখি ভাই, কত দিন থাকতে পারি।"

রাজলক্ষ্মী কি যেন বলিতে গিয়া থামিয়া গেল নবদুর্গা চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। এখনই এ প্রশ্ন কেন মাসীমা কিছু বলিয়াছেন নাকি? সারারাত ভাবিয় সকালে উঠিয়াই নিজের বাক্স হইতে খুব সুন্দর একখান জরির চৌখুপি শাড়ী বাহির করিয়া রাজলক্ষ্মীর ঘরে গিয় হাজির হইলেন।

রাজলক্ষ্মী তখন সবে উঠিয়া বসিয়া কোলের ছেলেটাকে পিটাইতেছে। তাহার ছেলে একটি, মেয়ে একটি। মে ত মায়ের ধারেও ঘেঁষে না, দিদিমার কাছেই থাকে ছেলেটার নিতান্ত এখনও খাদ্যের জন্য মায়ের উপর নির্ভ করিতে হয়, কাজেই তাহার রাজলক্ষ্মীর কাছে থাক ছাড়া উপায় নাই। তা হতভাগা ছেলের জ্বালায় রাতে কি দু-দণ্ড ঘুমাইবার উপায় আছে? চ্যাঁ, চ্যাঁ, চ্যাঁ, চিলে মত চীৎকার তাহার মুখে লাগিয়াই আছে।

নবদুর্গার হাতের শাড়ীখানা দেখিয়া রাজলক্ষ্মী হঠাৎ মার থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওমা, এ শাড়ীখানা কার গা বড়দি? ভারি জেল্লা ত কাপড়খানার।"

নবদুর্গা বলিলেন, "এই আমারই কাপড় ভাই। একবারমাত্র পরেছি, তারপর তোলাই ছিল। কাল ভাবলাম কাপড়খানা তোকে মানাবে ভাল, তা পরা কাপড়—"

রাজলক্ষ্মী তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "ওমা তাতে কি হয়েছে? তুমি আমার নিজের মায়ের পেটের বোনের মত, তোমার পরা কাপড় পরব, তাতে আবার কথা কি?" বলিতে বলিতে ছোঁ মারিয়া কাপড়খানা তুলিয়া লইল। নবদুর্গা তাহার ছেলের সহিত ভাব জমাইবার একটু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকালে উঠিয়া চড় খাইয়াই তাহার মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছিল, সে প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। রাজলক্ষ্মী বলিল, "ও হতভাগাকে ছুঁয়ো না, ও একেবারে মানুষ না। তোমার অনেক কাপড়-চোপড় আছে না বড়দি?"

নবদুর্গা বলিলেন, "পাড়াগেঁয়ে মানুষ ভাই আমরা, আমাদের কতই বা থাকবে? তবু দু-চারখান আছে।"

রাজলক্ষ্মী বলিল, "খাওয়া-দাওয়া চুকে যাক, তার পর গিয়ে তোমার কাপড় দেখব এখন। আমি বাপু ভাল শাড়ীর বেজায় ভক্ত। তা যেমন কপাল, দেয় কে? খেতে যে পাচ্ছি তাই ঢের। সেই বিয়ের সময় মা যা দু-দশখানা দিয়েছিল, তাই নেড়েচেড়ে দিন কাটছে।"

নিজের বাক্স ডেক্স লোকের সামনে খুলিতে নবদুর্গার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। নিজের দৈন্য সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া লাভ কি? তাহারা সকলে ভাবে তিনি প্রচুর ধনরত্নের অধিকারিণী, ভুল করিয়াও ভাবুক না কিছুদিন।

দুপুরবেলা ঠিক রাজলক্ষ্মী তাঁহার কাছে আসিয়া হাজির। হতভাগা ছেলে সবেমাত্র ঘুমাইয়াছে, এখন খানিকক্ষণ তাহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। নবদুর্গা শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। রাজলক্ষ্মী বলিল, "আহা, উঠছ কেন? চাবিটা আমায় দাও না বড়দি, আমিই বাক্স খুলে দেখি।"

বড়দির তাহাতে আরও অমত। তিনি উঠিয়া বসিয়া বাক্স খুলিয়া এক একখানা করিয়া সব শাড়ী জামা বাহির করিতে লাগিলেন। বন্ধ্যা নারীর জিনিষ, অতি পরিপাটি করিয়া যত্নে রাখা, কিছুই নষ্ট হয় নাই। এক একখানা করিয়া তিনি বাহির করিতে লাগিলেন, বেনারসী, আনারসী, ঢাকাই, বালুচরী, বিষ্ণুপুরী গরদ, শান্তিপুরের কাপড়, ফরাশডাঙ্গার কাপড়, টাঙ্গাইলের কাপড়। লোভে রাজলক্ষ্মীর চোখ দুইটা জ্বল্‌জ্বল্ করিতে লাগিল।

বলিয়া বসিল, "এত সব কাকে দিয়ে যাবে বড়দি? সতীনপো বৌদের? নিজের ত কিছু একটা আপনার বলতে নেই?"

নবদুর্গা বলিলেন, "ও মুখপুড়ীদের দিতে গেলাম কেন? ওরা আমার কে? যারা দুঃখের দিনে আমায় দেখলে না তারা যদি আপন ত পর কে?"

শাড়ীগুলি বৌরা পাইবে না তাহা ত বুঝা গেল, কিন্তু কাহারা যে পাইবে তাহা ত কিছুই বুঝা গেল না। রাজলক্ষ্মী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "গহনার বাক্সটা কোথায় রেখে এসেছ বড়দি? ছিদাম-দাদার বিয়েতে তোমার সেই যে সাতনহর আর চূড়জোড়া দেখেছিলাম, তা এখনও আমার চোখে ভাসছে। এমন গড়ন আজকাল আর বড় দেখা যায় না।"

নবদুর্গা ইচ্ছা করিলেই একটা মিথ্যা কথা বলিতে পারিতেন। কিন্তু কে যেন মনের মধ্যে তাঁহার ধিক্কার দিয়া উঠিল। ছিঃ, কি হইবে মিথ্যা কথায় লোক ভুলাইয়া? তিনি দরিদ্র, দরিদ্র বলিয়াই তাঁহাকে লোকে জানুক। বলিলেন, "গহনার বাক্স আর কি আছে ভাই আমার? যাদের জিনিষ তাদের কাছেই আছে।"

রাজলক্ষ্মীর চোখ দুইটা প্রায় স্বস্থান ছাড়িয়া কপালের মাঝামাঝি উঠিয়া গেল। গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, কোথায় যাব। গায়ের গহনা ক-খানাও খুলে নিয়েছে গা?"

নবদুর্গার ইচ্ছা করিতে লাগিল উঠিয়া ছুটিয়া পালান। এ-সব কথা যেন তাঁহার কানে ছুঁচ ফুটাইতে থাকিত। কিন্তু কিছু না বলিয়াই বা উপায় কি? বলিলেন, "সে সবই বড়গিন্নীর গহনা যে, তার ছেলে-বৌয়ে ছাড়বে কেন?"

রাজলক্ষ্মী বলিল, "ওমা, তাহলে তোমার কি ব্যবস্থা ক'রে গেল বুড়ো? একেবারে পথে বসিয়ে গেছে নাকি?"

মাসী এবং তাঁহার সেই আশ্রিতা বিধবাটিও ইতিমধ্যে

আসিয়া জুটিয়াছিলেন। নবদুর্গার প্রতি প্রশ্নটা মাসী শুনিতে পাইয়াছিলেন, তিনিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তোকে কিছুই দিয়ে যায় নি নাকি? ওমা কি হবে গো। যার জন্তে অমন সোনার পিরত্তিমে বুড়ো ঘাটের মড়ার হাতে দেওয়া হ'ল, সেই আশাতেই শেষে ছাই পড়ল? ওমা, তুই তবে দাঁড়াবি কোথায় গা?"

নবদুর্গা মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এমন সময় চীৎকারপরায়ণ শিশুপুত্রকে কোলে করিয়া রাজলক্ষ্মীর স্বামী আসিয়া ঘরে ঢুকিল, বলিল, "দিব্যি আড্ডা মারছ, ছেলেটা যে গলা শুকিয়ে মরল?"

রাজলক্ষ্মী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "বেশ করছি আড্ডা দিচ্ছি, কারুর খেয়ে ত আড্ডা দিই নি? তুমি না-বইতে পার ফেলে দিয়ে এস ঘরে।"

তাহার স্বামী আহত ভাবে শাশুড়ীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "দেখলে মা, একে ভাল বললে মন্দ হয়।"

শাশুড়ীরও মেজাজ ভাল নাই দেখা গেল। তিনি বলিলেন, "তা বাছা, সবে দু-দণ্ড একটু চুপ ক'রে বসেছে, এমন সময় ও চিলকে আবার নিয়ে আসা কেন? মানুষের হাড়ে কতই সয়?" বলিয়া তিনি অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। রাজলক্ষ্মীও উঠিয়া পড়িয়া বকবক করিতে করিতে স্বামীর পিছন পিছন চলিয়া গেল।

একলা হইবামাত্র সব শাড়ীগুলিকে নির্দ্দয়ভাবে তালগোল পাকাইয়া নবদুর্গা ট্রাঙ্কের ভিতর ঠাসিয়া দিলেন। সে-গুলির প্রতি তাঁহার আর বিন্দুমাত্রও মমতা ছিল না। কি কুক্ষণেই তিনি রাজলক্ষ্মীকে কাপড় দিতে গিয়াছিলেন।

রাত্রে আজ শুধু ফল ও মিষ্টি জুটিল। লুচি বা ক্ষীরের চিহ্নও দেখা গেল না।

পরদিন সকালে উঠিতেই মাসীমা বলিলেন, "আজ তারার শরীরটা ভাল নেই। চান ক'রে এসে রান্নার জোগাড়টা কর না একটু?"

নবদুর্গা গম্ভীর মুখে স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। রান্না বেশ ভাল করিয়াই করিলেন, তবে খাওয়াতে তাঁহার রুচি চলিয়া গেল। মাসী-মা বলিলেন, "খেলি না কেন কিছু? পোড়া অদৃষ্টে একবারের বেশী ত জুটবেনা?"

নবদুর্গা বলিলেন, "হোক্ গে মাসীমা, শরীর ভাল নেই।"

মাসীমা বলিলেন, "বিধবা মানুষের আর ভাল থাকা থাকি কি? তবে যে-কটা দিন জগতে আছি, পেটে দুটো না দিলে ত চলবে না? তোর আবার কাজকর্ম্ম মোটে অভ্যেস নেই, জামাই দিয়েও যায় নি কিছু, কি ক'রে যে দিন কাটাবি তাই ভাবছি।"

নবদুর্গা একটু থামিয়া বলিলেন, "বেঁচে থাকলে দিন কেটেই যাবে। খেটে খাব, কত লোকে ত খাচ্ছে?"

মাসীমা উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "তা বইকি বাছা, কত লোকেই ত খাচ্ছে? এই দেখ না তারাকে? আমার সব কাজ ক'রে দেয়, দিব্যি খেতে-পরতে পায়।"

রাত্রে শুইয়া শুইয়া নবদুর্গা ভাবিতে লাগিলেন, বসিয়া খাওয়াকে এত কাম্য তিনি মনে করিয়াছিলেন কেন? এই রকম সাত-দুয়ারে ঝাঁটা খাইয়া ফিরিয়া হইবে কি? কিন্তু কি কাজই বা তিনি করিতে জানেন? বসিয়া কর্ত্তৃত্ব করা ভিন্ন আর কিছু ত শেখেন নাই? রাঁধুনীগিরি করিতে কি মন উঠিবে? কাশী চলিয়া যাইবেন কি? সেখানেও কত নিঃস্ব বিধবার ব্যবস্থা হইতেছে। মাকড়ী, ফুল কাঁটাগুলি বেচিলে স্বচ্ছন্দে যাইতে পারেন। রাজলক্ষ্মীর স্বামীকে বলিলে সে নিশ্চয়ই লইয়া যাইবে।

সকালে উঠিতেই আবার কাজের ফরমাশ আসিয়া জুটিল। মাসী বলিলেন, "ঠাকুরঘরের কাজটা তুই নে না? তারা একলা পেরে ওঠে না?"

নবদুর্গা হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, "দু-দিনের জন্তে ভার নিয়েই বা কি হবে? আমি ত আর চিরকাল থাকছি নে?"

মাসী অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, "তা থাকলেই বা? কোথাও এক জায়গায় ত থাকবি? আমার ঘরে থাকায় অপমান নেই কিছু।"

নবদুর্গা বলিলেন, "কাশী গেলে কেমন হয়?"

মাসীমা বলিলেন, "কাশীতে ভারি সুখ তা মনে কোরো না। দশ জনের মধ্যে থাকা আর কচকচি শোনা সে এক জ্বালাতন। বুড়ীগুলো জ্বালিয়ে মারে। তার চেয়ে দাসীবৃত্তিও ভাল।"

ঠাকুরঘরে গিয়া নবদুর্গা করজোড়ে ভিক্ষা করিতে

লাগিলেন, "হে ঠাকুর, আমার গতি তুমিই করো। দুনিয়ায় ঠাঁই না হয়, বিদায় ক'রে দাও।"

পাথরের ঠাকুর নীরব হইয়াই রহিলেন। নবদুর্গা পূজার আয়োজনাদি করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

একাদশীর দিন এ বাড়িতে নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা। মাসীমা ও তারা ঠাকরুণ মেঝের উপর গড়াগড়ি দিতেছেন। নবদুর্গাও অগত্যা তাহাই করিতেছেন। তৃষ্ণায় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে। মাসীমা তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "তুই না-হয় এক ঢোক গঙ্গা জল মুখে দে, মরবি কি শেষকালে?"

নবদুর্গা বলিলেন, "তোমরা সবাই জল খাও ত পারি।"

মাসীমা পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিলেন, "না বাছা, ওতে যে তার অমঙ্গল হবে।"

নবদুর্গার হঠাৎ হাসি পাইল। কোথায় কাহার অমঙ্গল হইবে? তাঁহাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের কথাও কেহ ভাবিল না, যদিও রক্তমাংসের দেহ লইয়া তাঁহারা যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন।

দিন কাটিতে লাগিল। দুঃখ-দুর্গতিই বাড়িতে লাগিল, সুখ বাড়িল না। তারার আজ অসুখ, কাল পিসীর বাড়ি নিমন্ত্রণ লাগিয়াই আছে। মামার বাড়ি হইতে নবদুর্গার কাছে চিঠি আসিয়াছে, ভাজ বাপের বাড়ি যাইবেন, আর এক জনের শরীর অতি অসুস্থ। সংসার চালায় কে? নবদুর্গা যেন অতি শীঘ্র চলিয়া আসেন।

রাজলক্ষ্মীর কাপড়ের বাহানা লাগিয়াই আছে। একখানির পর একখানি ভাল শাড়ী সে ক্রমাগত হস্তগত করিয়া চলিয়াছে। মাসীমাকে বাতে ধরিয়াছে, তাঁহার হাত-পা টেপার উৎপাত অহোরাত্র লাগিয়াই আছে।

আবার একাদশী। মাসীমা ঘরে শুইয়া কাৎরাইতেছেন। তারা-ঠাকরুণ কল-ঘরে গিয়াছেন। হঠাৎ হন্তদন্ত হইয়া তিনি ছুটিয়া ঘরে ঢুকিলেন, "ওগো তোমার গুণের বোনঝির কাণ্ড দেখ গে।"

মাসীমা চকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কি করেছে সে?"

তারা বলিলেন, "আঁশ হেঁসেলে ব'সে ছ্যাঁচড়া দিয়ে পিণ্ডি গিলছে।"

"ওমা, সে কি গো।" বলিয়া মাসীমা বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া পড়িলেন। ছুটিয়া গিয়া নবদুর্গার পিঠে এক লাথি মারিয়া বলিলেন, "এ কি হচ্ছে লা শতেক খোয়ারী, মুখপুড়ী? সকলের নাম ডোবালি?"

নবদুর্গা ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "আমার ভাবনা যখন কেউ ভাবলে না মাসি, আমিই বা তাদের ভাবনা অত কেন করতে যাই?"

মাসী বলিলেন, "নিজের পথ দেখ বাছা। এ-বাড়িতে ও-সব অনাচার সইবে না।"

নবদুর্গা ধীরে সুস্থে খাওয়া শেষ করিয়া বলিলেন, "তা ত দেখবই গো। খেটেই যখন খাব, তখন খাটুনি আর খাওয়া-দুটোই যাতে ভালমতে হয়, তা ত দেখতে হবে। বসে থাকার ব্যবস্থা যদি কেউ ক'রে যেত তাহ'লে তার জন্যে শুকিয়ে বসে থাকতাম।" বলিয়া উঠিয়া গিয়া নিজের পোঁটলা-পুটলি বাঁধিতে বসিয়া গেলেন।



চীনের কৃষি ও কৃষক-পরিবার

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

ভারতবর্ষের মত চীনও কৃষি-প্রধান দেশ। ইহার লোক-সংখ্যা মোটামুটি চল্লিশ কোটি; তন্মধ্যে শতকরা আশী জন লোক চাষ-বাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। প্রকৃতপক্ষে চীন দেশের কথা ভাবিতে গেলে ইহার ক্ষমতাশালী সম্রাটদের কথা, জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের কথা, রাজনীতিবিশারদদিগের কথা কিংবা যুদ্ধবিদ্যা-অভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কথা মনে আসে না; প্রথমেই মনে আসে সেই দেশের অসীম পরিশ্রমশীল ও অদ্ভুত মিতব্যয়ী বিপুল কৃষকশ্রেণীর কথা।

আমাদের দেশের কৃষকদিগের মত চীন দেশের কৃষকদিগেরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত, তাহাদের কৃষি-পদ্ধতিও ভারতের কৃষি-পদ্ধতির মতই অতি পুরাতন, কৃষি-যন্ত্রাদিও সাবেক ধরণের ও নিতান্ত সাধারণ রকমের। গৰ্দ্দভ-চালিত ডলনা, কাঠের লাঙ্গল, ১৩ ইঞ্চি প্রশস্ত কোদালীই তাহাদের প্রধান কৃষি-যন্ত্র; তাহারা বিদেশী রাসায়নিক সারের ধার ধারে না; নিজেদের প্রস্তুত সারই তাহাদের প্রচুর শস্য উৎপাদনে সাহায্য করে।

বাস্তবিক চীন দেশের কৃষকেরা নিজেদের অসীম পরিশ্রমের ও অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের দ্বারা কি উপায়ে তাহাদের বিপুল জনসংখ্যার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করে, তাহার বিবরণ পড়িলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে অ্যান্ ব্রিজ্ বেতারের সাহায্যে চীন দেশের কৃষক ও কৃষক পরিবারের একটি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ বিবরণ দিয়াছেন।

অধ্যাপক টনি চীন দেশের কৃষকদিগের ভীষণ গোঁড়ামি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন যে, চীনের কৃষকেরা তাহাদের কৃষি-পদ্ধতিতে নূতন কোন উন্নত প্রণালী প্রচলন করিতে একেবারেই নারাজ। কিন্তু অ্যান্ ব্রিজ্ বলেন যে, উহাদের এইরূপ গোঁড়ামি ও নূতন কোন কৃষি-প্রণালীর প্রবর্ত্তনের অনিচ্ছার যথেষ্ট কারণ আছে; তিনি বলেন, আমরা তাহাদিগকে কি শিখাইতে পারি? তাহারা চার হাজার বৎসর ধরিয়া তাহাদের পুরুষানুক্রমিক পরীক্ষিত কৃষি-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিশেষ সফলতার সহিত চাষবাস করিয়া আসিতেছে। সংবাদপত্রের ভাষায় বলা হয়, "চীন দেশের অতি বিপুল জনসংখ্যা" (China's teeming millions)! চীনের কৃষকেরা কিরূপে এই বিপুল জনসংখ্যার আহার যোগায় তাহার মোটামুটি আভাস জানিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

উত্তর-চীনের অন্তর্গত সাণ্টুং প্রদেশের ৭॥ বিঘা আয়তনের একটি কৃষিক্ষেত্র হইতে সেই দেশের একটি পরিবারের বার জন লোক, একটি গরু, একটি গাধা এবং দুইটি শূকরের খাদ্যের সংস্থান হইয়া থাকে। এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, সেখানকার ১২০ বিঘা জমি ১৯২ জন লোকের আহার যোগাইতে পারে, অর্থাৎ কর্ষিত জমির প্রতি বর্গ-মাইলের দ্বারা ৫০৭২ জন লোক প্রতিপালিত হয়। অপর একটি কৃষিক্ষেত্র, যাহার আয়তন ৫ বিঘা মাত্র, তাহা দ্বারা একটি পরিবারের দশ জন লোকের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয়; এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, কর্ষিত জমির প্রতি বর্গ-মাইলে ৩৮৪০ জন লোক প্রতিপালিত হয়। চীন দেশে এইরূপ হাজার হাজার ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র আছে; এই ছোট ছোট কৃষি-ক্ষেত্রগুলিই তাহাদের মালিকদিগকে খাওয়া-পরার অভাব হইতে এত দিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার "মরুভূমিতে সোনা ফলন" প্রবন্ধে চীন দেশের কৃষকদিগের আয়ের যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহারা বৎসরে এক একর জমি হইতে ১৬০ হইতে ২০০ ডলার পর্য্যন্ত উপায় করে; এক ডলারের মূল্য তখন প্রায় ৩৲ টাকা ছিল, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে এক বিঘা

জমি হইতে চীনের কৃষকেরা অন্ততঃ ১৬০৲ টাকা আয় করে।

চীন দেশের কৃষকেরা কৃষি-কার্য্যের জন্য কিরূপ অদ্ভুত পরিশ্রম করে তাহা উত্তর-চীনের অন্তর্গত চিহ্লি ও সান্টুং প্রদেশের কৃষকগণের দুই-একটি কার্য্যের বিবরণ হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কৃষি-কার্য্যের পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া অতি প্রয়োজনীয়; এই সম্বন্ধে উত্তর-চীনের কৃষকগণকে সৌভাগ্যবান বলা যাইতে পারে। প্রবল ঝড়-ঝাপটার প্রাদুর্ভাব সেখানে নাই; সেখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম, মাত্র ২৪ ইঞ্চি; ইহার মধ্যে বৎসরের চারি মাসের মধ্যেই (জুন, জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর) অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। এই চারি মাসের বৃষ্টিপাতের গড় ১৭ ইঞ্চি। এই অঞ্চলের আবহাওয়া ঘড়ির কাঁটার মত সুনির্দ্দিষ্ট ও সঠিক। কখন কিরূপ আবহাওয়া হইবে তাহা সেখানকার কৃষকেরা পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে। অসময়ে অতি-বৃষ্টির জন্য তাহাদের ফসল নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না; কিংবা শীতকালে জমি অতিরিক্ত ভিজা থাকার জন্য লাঙ্গল দেওয়ারও অসুবিধা ঘটে না। ভুট্টা ও মিলেট্-জাতীয় শস্য এইরূপ আবহাওয়ার উপযুক্ত বলিয়া তাহারা এই দুইটিকে প্রধান খাদ্য-শস্য হিসাবে উৎপন্ন করে; ইহা ছাড়া ইহারা নাস্পাতি, খুবানী ও বিলাতী গাব্-জাতীয় এক প্রকার ফলের চাষ করে। গম, চীনাবাদাম ও মিঠা আলু সাহায্যকারী ফসল হিসাবে জন্মায়।

চীনের কৃষকেরা বিদেশী রাসায়নিক সার ব্যবহার না করিয়াও একই জমি হইতে চারি হাজার বৎসর ধরিয়া যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতেছে। কিন্তু আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে একই জমি এক শত বৎসর চাষ করিবার পরেই প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিয়া সেই হইতে শস্য উৎপাদন করা আবশ্যক হইয়াছিল। চীন দেশের কৃষকেরা কৃষি-কার্য্যের প্রধান প্রধান নিয়মগুলি বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিয়াছে। তন্মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে শস্য-উৎপাদন ও শস্য-মিশ্রণ, জমিতে সবুজ সার প্রয়োগ এবং সকল প্রকার আবর্জ্জনা হইতে সার প্রস্তুত বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য; তাহারা অতি দক্ষতার সহিত একই জমিতে অনেক প্রকার শস্য জন্মায়। শীতকালে ২৮ ইঞ্চি অন্তর সারি করিয়া গম জন্মাইয়া থাকে; বসন্তকালে সেই গমের মাঝে মাঝে মিলেট্-জাতীয় শস্য বপন করে; গম উঠাইয়া শিম-জাতীয় শস্যের আবাদ করে; আবার মিলেট্-জাতীয় শস্য কাটার পর শিম-জাতীয় শস্য থাকে। এইরূপ ভাবে একই ক্ষেত্রে সারি করিয়া নানাবিধ শস্যের আবাদ করিলে, সকল প্রকার শস্যেরই সুন্দর রূপে যত্ন ও পরিচর্য্যা করা সহজ হয়। ইহার ফলে জমি বেশ আল্‌গা থাকে এবং তাহার জন্য জমিতে রসও সঞ্চিত থাকে। শস্যক্ষেত্রগুলি রাজা-মহারাজার সুন্দর সুন্দর ফুলবাগানের মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখায়। শহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে অন্যান্য শস্যের সহিত তরি-তরকারীর বাগানও থাকে। পিঁয়াজ, আলু, বাঁধা-কপি, মূলা, সালাদ্ প্রভৃতি ফসল একটির পর একটি অতি নিপুণতার সহিত আবাদ করে।

চীনের কৃষকেরা বিশেষ ভাবে জানে যে কোন্ প্রকার শস্য রোপণ করিলে জমি হইতে ঐ শস্য যে-সকল খাদ্য গ্রহণ করে, সেই সকল খাদ্য পুনরায় জমিতে সরবরাহ করা একান্ত আবশ্যক। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বহু গবেষণার পর প্রকাশ করিলেন যে, শুঁটিপ্রদ শস্য (যেমন, ধঞ্চে, মটর, শিম ইত্যাদি) আবাদ করিলে মাটিতে যবক্ষারজানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু চীন দেশের কৃষকগণ ইহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি জানিত এবং তদনুসারে অতি পরিশ্রমের সহিত এই পদ্ধতিটি তাহারা পালন করিয়া আসিতেছে। তাহারা কাঁচা অবস্থায় শুঁটিপ্রদ শস্য কাটিয়া আনিয়া গর্ত্তের ভিতরে স্তরে স্তরে সাজাইয়া, খাল বিলের কাদা মাটি কিংবা ক্ষেত্রের নিম্ন স্তরের ভিজা মাটি দিয়া স্তরগুলিকে ঢাকিয়া দেয়। পরে কিছুদিন অন্তর-অন্তর স্তরগুলিকে বার-বার ওলট-পালট করিয়া দেয়। ইহার ফলে স্তরের সকল অংশের কাঁচা গাছগুলি সমান ভাবে পচিয়া মূল্যবান সারে পরিণত হয়। ইহা ছাড়া তাহারা সকল প্রকার আবর্জ্জনা ছোট ছোট গর্ত্তে ফেলিয়া উহার সহিত মাটি ও ছাই মিশাইয়া দেয়। এই আবর্জ্জনাও কিছু দিন পরে সম্পূর্ণভাবে পচিয়া উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়। জীবজন্তুর মলমূত্রাদি

যাবতীয় অপবিত্র পদার্থের কোনটিই অপচয় করে না, সমস্তই মূল্যবান সারে পরিণত করিয়া কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করে। তাহারা কি ভাবে জীবজন্তুর মলমূত্র সংরক্ষণ করে তাহা জানিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। দুইটি গ্রামের মধ্যে যে অপ্রশস্ত স্থান থাকে, তাহার মাঝে মাঝে মাটি চাঁচিয়া লইয়া ইহারা এক-একটি অগভীর খাত প্রস্তুত করে। সেই খাতের দুই ধারে সাধারণ ঘাস-জঙ্গল জন্মাইয়া বেড়া দেয়। পথিকেরা যখন উহার নিকটবর্ত্তী পথ দিয়া উট গাধা প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ার লইয়া যায়, তখন ঐ সকল খাতের মধ্যে জন্তু-জানোয়ারগুলিকে ছাড়িয়া দেয়। তখন ঐ পশুগুলি ঐ খাতে মলমূত্র ত্যাগ করে। পরে ঐ মল-মূত্রমিশ্রিত মাটি খাত হইতে উঠাইয়া সাররূপে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, দেশের সর্ব্বসাধারণেই দেশের কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য পরস্পর সহায়তা করে। কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য তাহাদের চেষ্টার কথা বাস্তবিকই অদ্ভুত! চীনের কৃষকদের ঘরের মেঝে কাঁচা, সেই জন্য মেঝের মাটিতে যবক্ষারজান সঞ্চিত হয়। মাঝে মাঝে তাহারা মেঝের তিন ইঞ্চি পরিমাণ মাটি চাঁচিয়া সাররূপে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। কি অদ্ভুত জাতি! কি ভাবে নিজেদের পরিশ্রম ও বুদ্ধির দ্বারা জমির উর্ব্বরতা-শক্তি রক্ষা করিয়া আসিতেছে!

চীন দেশের কৃষি-কার্য্যের প্রধান গোপন কথা এই যে, চীনের কৃষকেরা কৃষি-কার্য্যের দ্বারা কি ভাবে তাহাদের এই জনবহুল দেশের অন্নসংস্থান করিতে পারে, তাহা অতি কঠোর ভাবে শিখিয়াছে। সেই শিক্ষা আর কিছুই নহে, প্রত্যেকটি জিনিষ যাহা খাদ্যে, জ্বালানি কাষ্ঠে অথবা সাররূপে পরিণত করিতে পারা যায় তাহার অপচয় না করিয়া কাজে লাগাইবার জন্য অসীম পরিশ্রম করিতে কখনই নারাজ হয় না।

কৃষি-কার্য্যের জন্য কৃষকদিগকে যেমন অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, ঘর-সংসারের কাজ করিবার জন্যও তাহাদিগকে সেইরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। উত্তর-চীনে বড় বড় গাছপালা নাই বলিলেই চলে। সেই জন্য তাহাদের জ্বালানি কাঠের অভাব খুব বেশী। কয়লা কিংবা কাঠ-কয়লা কিনিয়া ব্যবহার করা তাহাদের ক্ষমতায় কুলায় না। অতি পরিশ্রমের সহিত তাহাদিগকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করিতে হয়। তাহারা দেওধান-জাতীয় গাছের শক্ত সাত আট ফুট লম্বা কাণ্ডগুলি বেড়ার জন্য এবং ঘরের চালের ছাউনীর জন্য ব্যবহার করে। আবার এই সকল গাছের শিকড় ও ফলের খোসাগুলি শুকাইয়া রান্নার কাজে লাগায়। তাহারা ভুট্টাগাছের কাণ্ড ও পাতা ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া গরুকে খাওয়ায়।

চীনের কৃষকেরা শয়ন-গৃহ গরম রাখিবার জন্য ঘরের মধ্যে কাঁচা উনান প্রস্তুত করে। ঐ উনানের চিমনীর ইটও কাঁচা। এই চিমনীগুলি সাধারণতঃ চারি বৎসর পরে ফাটিয়া যায়। সেই সময় ঝুলসমেত চিমনীর ইটগুলি গুঁড়া করিয়া ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। উনানের ছাইও সার-হিসাবে জমিতে দেয়। ভুট্টা ও মটর গাছের কাণ্ড ও শিকড় ইত্যাদি জ্বালানি রূপে এই উনানে পোড়ান হয়। সেই জন্য তাহারা এই সকল শস্য কাটিয়া আনে না, শিকড়সমেত টানিয়া তুলিয়া আনে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, চীনের কৃষকেরা কোন জিনিষ অপচয় করে না। জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের জন্য কৃষকদের স্ত্রীলোকেরা ও বালক বালিকাগণ পুরুষদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করে। তাহারা নীল রঙের সুন্দর সুন্দর ঢিলা পোষাক পরিয়া অতি আনন্দের সহিত পাহাড়-পর্ব্বত ও রাস্তাঘাট হইতে ভুট্টা ও মটর গাছের শিকড় কাণ্ড ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনে।

চীন দেশের কৃষকদের খাদ্য প্রধানতঃ নিরামিষ। তাহারা মাংস অতি অল্প পরিমাণে খায়; দুধ মোটেই খায় না; গম ও ভুট্টা হইতে প্রস্তুত ময়দা বা পিঠাই তাহাদের প্রধান খাদ্য। ইহার সঙ্গে মিলেট্‌-জাতীয় শস্য সিদ্ধ করিয়া ভাতের মত খায়। এই খাদ্যের সহিত সব্‌জী চাটনী ইত্যাদি ব্যবহার করে, কিন্তু লবণ খায় না। এই সাদাসিধে-ধরণের খাদ্য খাইয়াও তাহাদের স্বাস্থ্য অতুলনীয়। স্ত্রীলোকগণ সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী, বালক-বালিকাগণ পুষ্টকায়, লাবণ্যময় এবং সর্ব্বদাই ক্রীড়াসক্ত।

চীন দেশের কৃষকদিগের মত তাহাদের স্ত্রীলোকেরাও কষ্টসহিষ্ণু। স্ত্রীলোকেরা বাজারে গিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি ও গৃহস্থালীর অন্যান্য জিনিষ কিনিয়া আনে। তাহারা হাসি-মুখে খাল ও নদীতে কাপড়-চোপড় কাচে, যাঁতা চালাইয়া

ময়দা প্রস্তত করে, গ্রামের কূপ হইতে কাঁধে বহিয়া সকাল-সন্ধ্যায় জল আনে, ক্ষেতের কাজে পুরুষদিগকে সাহায্য করে এবং ফলের বাগান হইতে নানাবিধ ফল তুলিয়া আনে।

চীন দেশের স্ত্রীলোকেরা সেলাইয়ের কাজেও বিশেষ পটু। যতদিন পর্য্যন্ত সম্ভব ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা পোষাক-পরিচ্ছদগুলি পুনঃ পুনঃ সেলাই করিয়া ব্যবহার করে এবং যখন ঐগুলি একেবারে ছিঁড়িয়া যায় ও সেলাই করিয়া ব্যবহার করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে, তখন উহাদিগকে জ্বালানি হিসাবে কাজে লাগায়। পরিশেষে উহা হইতে যে ছাই পাওয়া যায় তাহাও নষ্ট না করিয়া জমিতে প্রয়োগ করে।

কন্‌কনে শীতেও চীনেরা তাহাদের ঘরদোর গরম রাখিবার জন্য সদাসর্ব্বদা আগুন জ্বালে না। তাহাদের শীতকালে ব্যবহারের উপযুক্ত পোষাক আছে বটে, কিন্তু উহা খুবই সাদাসিধে। উহারা মোটা ওভার-কোট ব্যবহার করে না ; উহার পরিবর্ত্তে সুতীর পোষাকের নীচে তুলার জামা ব্যবহার করে। এই জন্য সকল সময়ই তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ সুন্দর ও হালকা দেখায়। ভারী পোষাক না থাকাতে সকল কাজ অনায়াসে করিতে পারে।

যদিও চীনের কৃষক-পরিবারকে জীবনধারণের জন্য অতি কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, তথাপি উহারা সন্তান-সন্ততিগণকে যত্নের সহিত পালন করে। ছেলেমেয়েদের প্রতি উহাদের ব্যবহার অতি মধুর। প্রত্যেক গ্রামেই হৃষ্ট-পুষ্ট, পরিশ্রমী ও প্রফুল্ল বালক-বালিকাদিগের দল দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট মেয়েরা রঙীন ফিতায় চুল বাঁধিয়া এবং গালে লালচে রং মাখিয়া রাস্তাঘাটে ছুটা-ছুটি করিয়া বেড়ায়। খাবারওয়ালা দেখিলেই তাহারা আনন্দে নাচিতে থাকে এবং ছুটিয়া গিয়া দুই এক পয়সার খাবার কেনে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার প্রতিও চীনের কৃষকেরা অমনোযোগী নহে। প্রায় সকল গ্রামেই স্কুল আছে। স্কুলের বাড়ি জমকালো নয়, সাদাসিধে ধরণের, কিন্তু দেখিতে সুন্দর। গ্রীষ্মকালে সকাল ছয়টার সময় ছেলেমেয়েরা দল বাঁধিয়া গ্রাম্য সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে স্কুলে যায়। স্কুলে বসিবার জন্য বেঞ্চ বা টুল নাই ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছাগলের চামড়ার আসনে বসিয়া লেখা পড়া করিতে হয়।

চীন দেশের অল্পসংখ্যক কৃষকই লিখিতে ও পড়িতে পারে। তাহাদের প্রধান আমোদ প্রাণভরা হাসি, আমেরিকার সিগারেট এবং লোকের মুখে মুখে সকল খবর জানা। মাটিই চীনের কৃষকদের প্রধান সঙ্গী ও শিক্ষক। মাঝে মাঝে যুদ্ধ-সম্পর্কিত দুঃখ-দুর্দ্দশা ছাড়া রাজনীতি যে কি জিনিষ তাহারা জানে না। তাহারা যে দেশের খবর বিশেষ রাখে না, তাহা একটি কথা বলিলেই বুঝা যাইবে। চীন দেশে প্রজাতন্ত্র প্রচলিত হইবার পনের বৎসর পরেও পিকিং শহর হইতে ২০০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের কৃষকগণ চীনের সম্রাটের খবর জানিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিত। সকল অবস্থাতেই তাহাদের মনের তৃপ্তি দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহাদের মধ্যে দুঃখ-দারিদ্র্য যে নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাহার মধ্যে কিছুমাত্র মলিনতা ও অবসাদ নাই। নৈতিক ত্রুটির জন্যই মলিনতা আসে এবং হতাশা, দুঃখ-বিপদে হাল ছাড়িয়া দেওয়া ও যা হয় হউক এই ভাব উপস্থিত হয়। চীনের কৃষকদিগের মধ্যে এই সকল নৈতিক ত্রুটির কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা কোন বিষয়েই হাল ছাড়িয়া দেয় না, কোন কাজকেই মন্দ হইতে মন্দতর অবস্থায় পৌছিতে দেয় না, প্রাণপণে উহাকে সফল করিতে চেষ্টা করে। কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিয়া তাহারা এই কঠোর সত্য ও শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং এই শিক্ষা সমস্ত জাতির মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। কোন জিনিষের অপচয় তাহাদিগকে অত্যন্ত আঘাত দেয়। অদম্য পরিশ্রম, অসীম উৎসাহ, প্রকৃতির সহিত সারা জীবন যুদ্ধ এই প্রাচীন জাতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে।

চীনের কৃষক-পরিবারের উপরোক্ত বিবরণ হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, কৃষিকার্য্যে আধুনিক পাশ্চাত্য প্রণালী অবলম্বন না-করিয়াও তাহারা কেবল মাত্র কঠোর পরিশ্রম ও তাহাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারাই ঐ দেশের চল্লিশ কোটি লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে। আমাদের দেশের কৃষকদের মত তাহারা অদৃষ্টবাদী ও উৎসাহহীন নহে। সকল কাজই তাহারা

সম্পূর্ণ আশা ও আনন্দের সহিত সম্পন্ন করে। এ-বিষয়ে মনের তৃপ্তিই তাহাদের প্রধান সহায়। তাহারা যে ভারতবর্ষের কৃষকদিগের মত পুরাতন কৃষি-পদ্ধতি অনুসারে অল্প পরিমাণ জমি চাষবাস করিয়া যে যে কারণে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থায় আছে, তাহা ভারতের কৃষকদিগের অনুকরণের যোগ্য।

মুক্তি

শ্রী আশালতা দেবী

২৮

ঘরের মধ্যে ক্ষীণ দীপের আলো। বিছানার পায়ের কাছে একফালি জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রকান্ত শয্যায় শুইয়া ছিলেন। তাঁহার শরীর পূর্ব্বের চেয়েও ক্ষীণ। মুখ পাণ্ডুর। নির্ম্মলা শিয়রের কাছে বসিয়া তাঁহার মাথার চুলে হাত বুলাইতেছিল। তাহার চোখের কোণে কালিমার রেখা, মুখের ভাবে ধীর গভীরতা। আগেকার নির্ম্মলার সহিত এখনকার নির্ম্মলার অনেক তফাৎ। তখন তাহাকে দেখিলে মনে হইত, সে যেন অনাঘ্রাত পুষ্পের মত কুসুমসুকুমার। তখন তাহার ঘনপল্লব চক্ষুর মধ্যে ছিল কেবল স্বচ্ছ অতলতা। এখন সেই কালো চোখে বেদনার নিবিড় সজলতা এবং করুণার স্নিগ্ধতা আসিয়া নামিয়াছে। সব জড়াইয়া আগেকার নির্ম্মলায় যেটুকু অপূর্ণতা ছিল এখন আর তাহা নাই। তাই তাহার মুখের কান্তি নানা দুশ্চিন্তায়, রোগীর সেবায়, রাত্রিজাগরণে ম্লান হইলেও রূপের প্রভা আরও পরিপূর্ণ, পরিস্ফুট হইয়াছে। চন্দ্রকান্তের অসুখ যে সারিবার নয়, এখন সে কথাটা তাঁহার পরিবারের সকলের কাছেই দিনের আলোর মত স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া কয়েক দিন হইতে তাঁহার শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছে। কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিয়া তিনি ডাকিলেন, 'নির্ম্মল!'

'কি বলছ বাবা?'

'আমি বেশ বুঝতে পেরেছি আমি আর বেশী দিন বাঁচব না। কিন্তু শান্ত হয়েই আমি যেতুম, কেবল শান্ত হ'তে পারছি নে তোমার কথা ভেবে। সেই এতটুকুটির থেকে আর কাউকে তোমার কাছে আসতে দিই নি। নিজেই তোমাকে ঘিরে ছিলুম। আজ আমার ভুলটা যে হয়েছে কোন্‌খানে, তা বেশ স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পেরেছি।'

নির্ম্মলা চোখের জল সংবরণ করিয়া লইয়া স্থিরকণ্ঠে কহিল, 'তোমার আবার ভুল হয়েছে কোন্‌খানে বাবা? যদি আমার জীবনে কোথাও গোল বেধে থাকে সে আমারই দোষ। কিংবা আমার ভাগ্যের দোষ।'

'না না, তা নয়। তোমার মত ভাল কারও ভাগ্য নয় মা। আমার ভুলের কথাটা কেন আজকাল প্রায়ই আমার মনে হয় জান, আমি নিজের জীবনের সমস্তটাই আগাগোড়া এখন দূর থেকে দর্শকের মত দেখতে পাই। আগে এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখতে পেতুম না। তাই অনেক কথার অর্থই অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু মৃত্যু যত এগিয়ে আসছে, ততই এখন আমার কষ্টের সঙ্গে আমার যেন বিচ্ছেদ হয়ে আসছে। কোন জিনিষের মধ্যে জড়িয়ে থাকলে তার ভালমন্দ তেমন বোঝা যায় না। কিন্তু অনেকটা দূর থেকে দেখলে তার ভুলভ্রান্তি বাঁকাচোরা সবই চোখে পড়ে, আমার অবস্থা হয়েছে এখন সেই রকম।'

'বাবা, আজকাল তুমি এত বেশী কথা বল কেন?'

'আর কারও সঙ্গে ত বলিনে মা। তোমার সঙ্গেই বলি। আমার ভুলের কথা তোমার কাছে স্বীকার করে না গিয়ে, তার সংশোধনের উপায় ঠিক না ক'রে আমি ত মনে শান্তি পাব না।'

'আজ তুমি ক্রমাগত ঐ একই কথা বলছ।'

'হাঁ, আজ ওই কথাটাই মনে বেশী বাজছে। আসলে কি হয়েছে জান নির্ম্মলা? আমার জীবন একদিক থেকে ব্যর্থ। প্রথম যৌবনে সংসারে নানাদিক থেকে নানা আঘাত পেয়েছি। সে আঘাতে সবারই দিক থেকে মনকে গুটিয়ে নিয়ে এসে নিজের নিঃসঙ্গতার মাঝে আপন মনে ছিলুম। তার পরে পেলুম তোমাকে। বঞ্চিত, ক্ষুধিত চিত্তের সমস্ত ব্যগ্রতা নিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরলুম। তুমি যে কেবল আমার বাৎসল্যের ক্ষুধা মিটিয়েছ তা ত নয়, তুমি আমার ব্যর্থ জীবনকে আশ্রয় দিয়েছ। আমি আমার সমস্ত অসাফল্য এবং একাকীত্ব নিয়ে তোমাকে আবেষ্টন করেছিলুম।'

'তাতে কি হয়েছে বাবা? তুমি যদি আমার কাছে কিছু পেয়ে থাক, আমি কি তোমার কাছে তার চেয়েও কিছু বেশী পাই নি?'

'তার উত্তর ত আমি দিতে পারব না মা। কিন্তু আমি আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে তোমাকে এমন করে না জড়ালে হয়ত তোমার মনের বিকাশ এত অসম্পূর্ণ হয়ে থাকত না। তুমি সংসারকে, সবাইকে চিনতে শিখতে। আমি তোমাকে যতই ভালবাসি, এ-কথাটা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারব না নির্ম্মলা, যে, জীবনের পথে একটা বাঁকের কাছে গিয়ে তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি করতেই হবে। শুধু বাইরের ছাড়াছাড়ি নয়, জীবন-মরণের যেখানে যত গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বাঁধন পড়েছে সে সমস্তই আলগা করতে হবে। তা নইলে যে তুমি তোমার জীবনের পরম কল্যাণকে খুঁজে পাবে না। আর তোমাকে তোমার আনন্দিত সংসারের শিখরদেশে প্রতিষ্ঠিত না-দেখতে পেয়ে আমিও মনে মনে শান্তি পাব না। শকুন্তলাকে তার নবজীবনের পথে ঋষি কণ্ব খানিকটা দূর অবধি আগিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার পরে আর ত তাঁর অগ্রসর হওয়া চলে নি। তারপর থেকে সেই তাপসকন্যার জীবনের বিচিত্র জটিলতা, অপমান, বেদনা, সাধনার পালা—সে সমস্তই যে তাঁর একলার সামগ্রী ছিল। এই কথাটাই কতদিন থেকে আমি ভাবছি মা।'

'তুমি যা বলতে চাইছ তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার এই দুর্ব্বল অবস্থায় বেশী কথা ব'লো না বাবা।'

'বেশী কথা কম কথায় আমার আর কি ক্ষতিবৃদ্ধি করতে পারে, নির্ম্মলা? কিন্তু এ-ও আমি ভাবছি যে আমার বেশী দেরি নেই। এবারে আমি তোমাকে মুক্তি দিয়ে যাব। কিন্তু সে মুক্তি যেন নিষ্ফল না হয়। এবারে যেন তুমি নিজের মাঝে নিজেকে খুঁজে পাও।'

'অমন করে ব'লো না বাবা। আমার বড় কষ্ট হয়।'

মুরলী ঘরে ঢুকিয়া কহিল, 'নিখিলবাবুর সঙ্গে জামাইবাবু এসেছেন।'

'কে? যামিনী এসেছে!' চন্দ্রকান্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। 'তাকে এই ঘরেই একেবারে সোজা নিয়ে এস না।'

ডাক্তার বলিয়া গিয়াছিলেন রোগীর ঘরে যথাসম্ভব কম লোক যেন আসে, আর তাঁহাকে কোন কারণেই যেন উত্তেজিত না-করা হয়। তাই মুরলী একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল। এমন সময়ে গেটের কাছে একটা মোটরের হর্ণ শোনা গেল। নির্ম্মলা জানালার কাছে মুখ বাড়াইয়া কহিল, 'ছোটদা, ডাক্তারবাবু এসেছেন, সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস।'

'ডাক্তার চলে গেলেই ওদের এঘরে নিয়ে আসছি।' বলিয়া মুরলী বাইরে চলিয়া গেল।

চন্দ্রকান্ত অত্যন্ত অস্থির হইয়া কহিলেন, 'নির্ম্মলা মা, তুমি একবার ওঘরে যাও।'

'এখনই যাব বাবা। ডাক্তার বাবুকে একবার কেবল তোমার টেম্পারেচারের চার্টটা বুঝিয়ে দিয়ে যাব। আর কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

'না না, তুমি এখনই যাও।'

নির্ম্মলা শান্ত চরণে বাহিরে চলিয়া গেল।

দুয়ারের কাছে নির্ম্মলার শাড়ীর চওড়া পাড়টা দেখিয়া নিখিল তাড়াতাড়ি একটা অছিলা করিয়া ছাদে চলিয়া গেল। নির্ম্মলা আসিয়া স্বামীর পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম করিল। বলিল, 'তুমি একটু ব'সো। ওঘরে ডাক্তার এসেছে। আমি এখনই আসছি। চায়ের জল চড়িয়েছে, কিছু না-খেয়ে যেও না যেন।'

তাহার মুখে ম্লান সজল শান্তি। তাহার কথায়, তাহার ভাবভঙ্গীতে মনে হইতেছে এত দিন যে যামিনীর সঙ্গে তাহার

দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই, এত দিন যে এত স্রোত বহিয়া গেল, সে-সমস্ত যেন তাহার জীবনে কোন চাঞ্চল্যই আনে নাই। যামিনী মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিল। তাহার সমস্ত মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরে, দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অনুতাপের বিগলিত অশ্রুতে তাহাকে ভাসাইয়া দেয়। কিন্তু সেই শান্ত বিষাদপ্রতিমার দিকে চাহিলে সমস্ত উচ্ছ্বাস আপনা-আপনি শান্ত হইয়া আসে। মনে হয় যেন তাহার কাছে যাইবার উপায় নাই। নিজের চারিদিকে সে কোন্ এক সুদূরতার বেষ্টন দিয়া আপনাকে সকলের কাছ হইতে সরাইয়া রাখিয়াছে।

যামিনী তখনও তাহার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। নির্ম্মলা আবার কহিল, 'তুমি একটু ব'সো। আমি এখনই আসছি।'

সে চলিয়া গেল। নিখিল কিছুক্ষণ পরে ছাদ হইতে আসিয়া যামিনীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, 'তুমি তাহ'লে রাত্রিটা এখানেই থাকবে ত? আমি একবার চন্দ্রকান্তবাবুর খবর নিয়ে বাড়ি যাই।'

'থাকব।' যামিনী তন্ময় হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল। চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, 'থাকব? না না, আজ থাক্, নিখিল। আজ আমার কেমন যেন ভয় করছে।'

'ভয় কিসের? পাগলের মত কি যা-তা বলছ? আসবে আর চলে যাবে? নিজের তুচ্ছ খেয়ালের জন্যে তুমি অনর্থক কত লোকের মনে কষ্ট দাও!'

'না না, খেয়াল নয়। আজ আমি কিছুতেই থাকতে পারব, না নিখিল।' তাহার কণ্ঠস্বরে অত্যন্ত ব্যাকুলতা, ছেলেমানুষের মত একটা অবুঝ ভাব। নিখিল অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিল।

যামিনী তাহার একটা হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, 'চল।'

'দাঁড়াও। অন্ততঃ খবর নিয়ে আসি চন্দ্রকান্তবাবু কেমন আছেন। ডাক্তারে কি ব'লে গেল।'

'তবে তুমি যাও। ভালই আছেন নিশ্চয়। আমি ততক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি।···নিখিল, তোমার পকেটে এলাচ আছে? ছোট এলাচ?'

'এলাচ!'

'হ্যাঁ, এলাচ। তুমি বুঝতে পারছ না, আজও যে আমি সন্ধ্যেয়···এখনও যে আমার মনে হচ্ছে মুখে গন্ধ রয়েছে। এ অবস্থায় ওর সামনে। না না, আজ নয় আজ নয়। অন্য দিন।' যামিনী অত্যন্ত দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নীচে চলিয়া গেল।

বিমূঢ়ের মত ক্ষণকাল সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া নিখিল একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

নির্ম্মলা বাবার বুকে মালিশ করিতেছিল। চন্দ্রকান্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, 'নির্ম্মল মা, এবারে তুমি ওবরে যাও মা। রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, এখনই যাব বাবা।'

মুরলী তাঁহার ঘরের ঘড়ীতে দম দিতে আসিয়াছিল। চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কটা বাজ্‌লো? যামিনীর খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ত? আজ তাকে এঘরে আসতে বারণ ক'রো। রাত অনেক হয়েছে। সে নিশ্চয় ক্লান্ত।'

মুরলী কহিল, 'কে, জামাইবাবু? তিনি ত তখনই চলে গেছেন। সে যে অনেক ক্ষণ হ'ল। চা ক'রে নিয়ে গিয়ে তাঁকে কত ডাকাডাকি করলুম। নিখিলবাবু বললেন, 'তাঁর বিশেষ জরুরি কি কাজ ছিল। আর এক মিনিটও বসবার সময় নেই। আবার কাল আসবেন।'

চন্দ্রকান্ত কিছুক্ষণ অসাড়ের মত পড়িয়া থাকিয়া তাহার পর বলিলেন, 'নির্ম্মলা! এবারে তুমি যাও। আর আমাকে মালিশ করবার দরকার নাই।' নির্ম্মলার কোনরূপ ভাবান্তর দেখা গেল না। সে সযত্নে ধীরে ধীরে তাঁহার বুকের বোতাম বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল, 'বাবা, তুমি কিছু ভাবনা ক'রো না। সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে।'

'সত্যি বলছ? হ্যাঁ, ঠিক হয়ে যাবে। আমি জানি ঠিক হবে। তার আর বড় বেশী দেরিও নেই। আমি যেদিন তোমায় মুক্তি দিয়ে যাব সেদিন থেকেই সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে।' অর্দ্ধেক তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বিজড়িত স্বরে তিনি একই কথা বারংবার বলিতে লাগিলেন।

নির্ম্মলা তাঁহাকে আর বেশী উত্তেজিত করিবার ভয়ে আস্তে-আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় আলোটা কমাইয়া দিয়া গেল।

২৯

'মা, তুমি বুঝতে পারছ না এই রিট্রেঞ্চমেণ্টের (চাকরি ছাঁটার) ধুমে আমার যদি চাকরি যায় তবে সংসার চলবে কি ক'রে ?'—রান্নাঘরের দাওয়ায় সুশীলা বসিয়াছিলেন। মুরলী ভাত খাইতে বসিয়াছিল। মিট্‌মিটে একটি কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছে। ঘরে দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া দুই জনে বসিয়া আছেন। কাছাকাছি আর কেহ নাই। নির্ম্মলা সদরে চন্দ্রকান্তের ঘরে আছে।

মুরলীর কথার উত্তরে সুশীলা বলিলেন, 'আমি বুঝতে পারছি সব। কিন্তু কি করব বল ? অত টাকা আমি কোথায় পাব ? আমাদের আসল অবস্থাটা যে কি, সে ত তুমি নিজেও জান। তোমার দাদাদের ব'লে দেখেছ ?'

'তাদের ওখানে হাঁটাহাঁটি ক'রে যে উত্তর পেয়েছি সে উত্তর তোমাকে বলতে প্রবৃত্তি হয় না।'

'তবে ?'

মুরলী নিঃশ্বাস ফেলিল।

আসলে ব্যাপারটা হইয়াছিল রিট্রেঞ্চমেণ্টের জন্য মুরলীদের আপিসে কর্ম্মচারী ছাঁটিবার আয়োজন হইতেছিল। যাহার উপর বিবেচনা করিয়া দেখিবার ভার ছিল তিনি আকার-ইঙ্গিতে এমন ভাব দেখাইয়াছিলেন যে, হাজার-খানেক টাকা ঘুস পাইলে তিনি মুরলীর নামটা অনাবশ্যকের লিষ্টে ফেলিবেন না। মুরলীর কর্ম্মতৎপরতায় তাহাদের ফার্ম্মের যে বিভাগে সে কাজ করিত সেই বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। গত মাসে তাহার মাহিনাও বাড়িয়া ষাট টাকা হইয়াছিল। কিন্তু সে মনে মনে জানিত তাহার এত দ্রুত উন্নতিতে আপিসের অনেক উপরওয়ালা কর্ম্মচারী সন্তুষ্ট ন'ন। যিনি টাকা চাহিয়াছিলেন তিনিও সেই দলের। এদিকে সে সবেমাত্র আই-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াই চাকরিতে বছরখানেক হইল ঢুকিয়াছে। এখন চাকরি গেলে সে কি করিবে, আবার কোথা দিয়া জীবন সুরু করিবে, এই ইকনমিক ডিপ্রেশনের দিনে, এই [illegible] মন্দার দিনে, আবার কোথায় দ্বারে দ্বারে চাকরির জন্য উমেদারী করিয়া ফিরিবে, এই সকল চিন্তায় আকুল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারই উপর আপিসের আয়ব্যয় এবং তহবিল মিলাইবার ভার ছিল। সে আপিসের তহবিল হইতেই মরিয়া হইয়া টাকাটা লইয়াছিল। মনে করিয়াছিল মাসখানেক পরে যখন হিসাব মিলাইয়া দিবার সময় হইবে তখন আর কোথাও টাকা না পাক, মায়ের গহনাগুলা আছে। এমন ব্যাপার শুনিলে তিনি সেই গুলোই বাহির করিয়া দিবেন।

সে-প্রসঙ্গ তুলিতে সুশীলা কহিলেন, 'আমার গহনা হাতে এই দু-গাছি বালা ছাড়া আর তা কিছুই নেই।'

'কেন মা, তোমার যে সর্ব্বরকমে প্রায় তিন-চার হাজার টাকার গহনা ছিল। তা'ছাড়া এখন সোনার দাম খুব চড়া··· অত ভাবছ কেন ? আমি যদি এই চাকরিটা বজায় রেখে চলতে পারি খুব শীগ্‌গির উন্নতি হবে। তখন আবার কত গহনা···'

সুশীলা ক্ষীণ হাসিয়া কহিলেন, 'ওরে বাবা, এই বুড়ো মাগীকে কি আবার গহনার লোভ দেখাতে হবে রে ! কিন্তু এই তিন-চার বছর আমি সংসার চালিয়েছি কি ক'রে বল্ ত ? এই যে আর বছরেই যোগেনের আইনের বই আর পরীক্ষার ফীতে কত টাকা লেগে গেল। সে-সব এল কোথা থেকে ?'

মুরলী বিবর্ণ মুখে কহিল, 'সে কথা জানতুম না মা। মনে করেছিলুম নির্ম্মলার বিয়েতে যখন তোমার একখানা গয়নাও খরচ হয় নি, তখন সেগুলো বুঝি আছে।'

'তোমাদের জানতে পারার কথা নয়। সে-সব অতি গোপনে বিক্রী করেছি, পাছে কর্ত্তার কানে যায়। তিনি মনে দুঃখ পাবেন। কিন্তু তুই অত ভাবিস নে বাবা। চাকরির জন্যে অত ভাবনা কেন ? ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে থাক, তিনি সব ঠিক ক'রে দেবেন।"

'না আর ভাবব না।' মুরলীর মুখে একটু হাসির মত ফুটিয়া উঠিল। সে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। কেবল তাহার ভাবনার কথা আর প্রকাশ করিয়া বলিল না। এখন ভাবনাটা দাঁড়াইয়াছে কেবল চাকরির জন্য নয়। ইহা তাহার চেয়েও গুরুতর। নানা চিন্তায় দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া অবশেষে সে শেষদিনে আপিসের তহবিল হইতেই টাকা সংগ্রহ করিয়া উপরওয়ালাকে ঘুস দিয়াছে। মাস-কাবারের আর পনেরটি দিন বাকী আছে। ইহারই মধ্যে তাহাকে টাকাটা সংগ্রহ করিয়া তহবিল মিলাইয়া রাখিতে হইবে।

মুরলী সেখান হইতে উঠিয়া নির্ম্মলার ঘরের দিকে গেল।

ঘরে আলো নাই। অন্ধকার ঘরে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না আসিয়া পড়ায় একটুখানি আলোকিত হইয়াছে। খাটের উপর নির্ম্মলা চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

মুরলীর মনে আঘাত লাগিল। এ-বাড়িতে চন্দ্রকান্তের পরেই সে নির্ম্মলাকে স্নেহ করিত। অবশ্য দুই ভাই-বোনে সমস্ত দিনের মধ্যে কথাবার্ত্তা প্রায় হইতই না। কিন্তু দূর হইতে নিঃশব্দে এই স্বল্পভাষিণী ছোট বোনটিকে মুরলী মনে মনে খুব ভালবাসিত। অন্ধকারের মধ্যে তাহাকে অমন করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল নিজের মনের সঙ্গে তাহার বোঝাপড়া চলিতেছে।

নির্ম্মলাকে সে বুঝিতে পারিত না, তাহার জীবনকেও সে বুঝিত না। বড়লোকের বাড়িতে বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের মন জোগাইয়া, স্বামীকে কখন-বা তোষামোদ কখনও শাসন করিয়া হাতের মুঠার মধ্যে রাখিবে। সাধারণ মেয়েদের মত এক-গা গহনা, দিব্য কাপড়-জামা পরিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবে। তা নয়, সব থাকিতেও কেমন উদাসীনের মত ভাব। সত্যি কথা বলিতে নির্ম্মলাকে সে আদৌ বুঝিত না। তাহার সাদাসিধা সাধারণ মনের সাহায্যে মানুষের মনের গভীর, সূক্ষ্ম, বিচিত্র জটিলতাময় অনেক দুঃখই সে বুঝিত না। তাহা ছাড়া অভাবগ্রস্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে দিন কাটাইতে হইলে শরীর-মনের যতটা সঙ্কোচন হয়, মুরলীরও তাহা হইয়াছিল। না-বুঝুক, কিন্তু নির্ম্মলার প্রতি তাহার এক প্রকারের স্নেহ ছিল। তাই আজ সন্ধ্যাবেলাকার ঘটনাগুলা মনে আলোচনা করিয়া দেখিল, জামাইবাবু হঠাৎ এত দিন পরে আসিয়াই চলিয়া গেলেন। ভিতরে ভিতরে কিছু একটা ঘটিয়াছে। বেচারার মন খারাপ। আজ থাক। টাকার কথাটা আর দু-এক দিন পরেই তাহাকে না-হয় বলিবে। বিশেষ করিয়া জামাই বাবুর কাছ হইতেই যখন টাকাটা জোগাড় করিতে হইবে তখন···। ···না এখনও সময় আছে। মুরলী ভারাক্রান্ত মনে সে ঘরে আর না-ঢুকিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

৩০

ইহারই দিন দুই তিন পরে নিখিল চন্দ্রকান্ত বাবুর খবর লইতে আসিয়াছিল। যামিনী আসে নাই। এ-বাড়িতে এখন মুরলী সবচেয়ে অধীর চিত্তে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। নিখিলের সহিত তাহাকে না-আসিতে দেখিয়া সে জামাইবাবুর সংবাদ জানিবার জন্য নিখিলের কাছে আসিয়া বসিল, এবং মনের ব্যগ্রতায় এ-কথা সে-কথার পর আসল কথাটাই বলিয়া ফেলিল। সমস্ত ব্যাপারটা শুনিবার পরে নিখিল কিছুকাল ভাবিয়া কহিল, 'এ আর শক্ত কি? যামিনী ইচ্ছে করলে দু-মিনিটেই তোমাকে হাজার টাকা বার ক'রে দিতে পারে। আচ্ছা, এক কাজ কর না, তোমার বোনকে সঙ্গে নিয়ে আজকালের মধ্যে তার বাড়ি একবার যাও।'

এই কয়েক দিন টাকার ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া মুরলী পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছে। সে ভাবনা একেবারে তাহার একার ভাবনা। আর কাহাকেও বলিবার যো নাই যে, দিন-দশের মধ্যে টাকাটা না-পাইলে তাহাকে জেলে যাইতে হইবে। এমন কথা কাহার কাছে বলিবে যে, সে তহবিল ভাঙিয়াছে, চুরি করিয়াছে! নিখিলকেও ভিতরের কথা কিছু বলে নাই। কেবল বলিয়াছিল, বিশেষ কোন কারণে তাহার হাজারখানেক টাকার দরকার।

এখন নিখিলের কথায়—মজ্জমান লোকে যেমন যাহা পায় তাহাকেই আঁকড়িয়া ধরে তেমনি করিয়া—অসহায় সুরে কহিল, 'সত্যি নিখিলবাবু? যা বলছেন তা হ'তে পারে?'

'হবে না কেন? আপনি যাবেন অবশ্য আপনার বোনকে নিয়ে।'

নিখিলের মনে ছিল এই উপলক্ষ্যে যদি নির্ম্মলা তাহার নিজের বাড়িতে গিয়া সে-বাড়ির শাসনভার আপন হাতে তুলিয়া লয় এবং আর একটি মানুষকেও তাহার শাসন-পাশে বাঁধিয়া আসে, তবে চাই কি যামিনীর জীবনের গতিটাও বদলাইয়া যাইতে পারে।

ধর্ম্মতলার যামিনীর বাড়ির ঠিকানাটা দিয়া নিখিল উঠিল।

রাত তখন আটটা বাজে। মুরলী একটা ট্যাক্সি আনিয়া নির্ম্মলাকে কহিল, 'আমার বন্ধু সতীশ কিছুক্ষণ বাবার কাছে বসুক। তুমি একবার চল আমার সঙ্গে, কাজ আছে।'

'কি কাজ দাদা ?'

'এস। পথে যেতে যেতে বলব।'

মুরলী কহিল, 'আমার কয়েক দিনের মধ্যে এক হাজার টাকার দরকার। টাকাটা তুমিই চেয়ে দাও। তোমাকে তোমার নিজের বাড়িতেই নিয়ে যাচ্ছি।'

নির্ম্মলা কিছুক্ষণ ভাবিয়া ব্যাপারটা বুঝিল। সে আর সমস্তই ভুলিয়াছিল, ভুলিতে প্রস্তুত। কিন্তু সেই তুচ্ছ ঘটনার প্রসঙ্গ লইয়া পিতার অপমান ভোলে নাই। বিশেষতঃ বাবা এখন মৃত্যুশয্যায়। বলিল, 'ছোটদা, ওঁদের কাছে কিছু চাইতে আমার আত্মসম্মানে বাধে।'

মুরলী কহিল, 'কিন্তু আমার সে টাকাটার এত প্রয়োজন যে, তোমার আত্মসম্মানে বাধলেও আমি চাইতে অনুরোধ করব। এর চেয়ে বেশী আর কিছু ব'লতে পারব না। এর থেকেই তুমি বুঝতে পারবে আমি কত অসহায়।'

'আচ্ছা চল।'

তাহারা যখন ধর্ম্মতলার বাড়িতে পৌছিল তখন সে-বাড়ির আর সমস্ত ঘর অন্ধকার। কেবল যামিনীর শয়ন-কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। সেইমাত্র একটু আগে দেবীপ্রসাদ আসিয়া খবর দিয়া গিয়াছে শেয়ার-মার্কেটে তাহার অনেক টাকা লোকসান পড়িয়াছে। তাহার উপর সেই যে দুই-তিন দিন আগে মুহূর্ত্তের জন্য নির্ম্মলাকে দেখিয়াছিল সেই হইতে যামিনীর মন অশান্ত, চঞ্চল। প্রতি নিমেষে তাহার মন হইতেছে সেখানে ছুটিয়া যায়, তাহাকে আর একবার দেখে। কিন্তু প্রত্যেকবারেই একটা ভয়ের মত হইতেছে। যদি সে সমস্ত জানিতে পারে, যদি সে ঘৃণা করে। তাই তাহার মনে সাহসও নাই, শান্তিও নাই।

যামিনীর অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তাহার মহদ্দোষ সে অতিরিক্ত দুর্ব্বল। তাহার মত ধরণের মানুষরা যদি জীবনের সফলতার সোপানে একবার উঠিতে আরম্ভ করে তবে আর কোন দিকে তাকায় না, কিছু ভাবে না; প্রফুল্ল মনে উৎসাহে ভর করিয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু যদি কোন কারণে একটুখানি স্খলন হইয়া পড়ে, অমনি অন্ধকারে তাহাদের সারা চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া যায়। অবিরত ভাবিতে থাকে, 'আমার সব গেল, আমার সব গেল।'

যামিনীও উজ্জ্বল আলোকিত শূন্য ঘরে একা বসিয়া গ্লাসে কি একটা পদার্থের সহিত সোডা মিশাইতে মিশাইতে তাহাই ভাবিতেছিল। এই ভাবনার অন্ধকারে সে অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী মদ খাইয়া ফেলিয়াছিল। দুয়ারের কাছে মুরলীর সঙ্গে যখন নির্ম্মলা আসিয়া দাঁড়াইল তখন হাতের গ্লাসটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আপন মনে কি বিড়বিড় করিয়া বকিতেছিল। গ্লাসের পানীয় মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া তীব্র য়্যাল্‌কোহলের গন্ধে সমস্ত ঘর এবং বাহিরের হাওয়াকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। পায়ের আওয়াজ পাইয়া মুদিত চক্ষেই কহিল, 'কি বাবা দেবীপ্রসাদ, আবার এসেছ ? এবারে কি খবর মাইরি বলছি সত্যি ক'রে বল দেখি।"

নির্ম্মলা সেই অন্ধকার বারান্দাতে দাঁড়াইয়াই অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, 'ছোটদা, ও যে মাতাল ! আমি ঘরে যাব না।'

ব্যাপার দেখিয়া মুরলী নিজেও অবাক কম হয় নাই। তথাপি কহিল, 'ভয় কি ? তুমি ঘরে যাও। ওঁকে শুশ্রূষা ক'রে সুস্থ করাও ত দরকার। না-হয় আজ আমরা রাত্তিরটা এখানেই থাকব। তা'হলে আমি একবার কেবল বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে আসি। আর সতীশকে ব'লে আসি, সে রাত্রিবেলায় বাবার কাছে থাকবে।'

নির্ম্মলা মুরলীর পাঞ্জাবির খুঁট চাপিয়া ধরিল। ভীত আর্ত্ত কণ্ঠে কহিল, 'ছোটদা আমার ভারি ভয় করছে। আমার হাত-পা কাঁপছে। তুমি আমাকে এ-বাড়িতে একা ফেলে কোথাও যেও না। আমি···না না, মাতালে কি করে ছোটদা ? ও কি আমায় মারবে ?'

মুরলী ক্ষণকালের জন্য নিজের চিন্তা বিস্মৃত হইয়া নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিল। তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'আচ্ছা, বাড়ি ফিরে চল, কিন্তু আমি কেবল ভাবছি বোন, নিজের স্বামীকে দেখে তোমার এত ভয়। এর পরে দুর্ভর দিন-রাত্রি তোমার কাটবে কি করে ?'

৩১

নিখিলের মুখে খবর পাইয়া যামিনী অপরাধীর মত চন্দ্রকান্তের শোকার্ত্ত বাড়ির দ্বারপ্রান্তে আসিয়া আবার দাঁড়াইল। পূর্ব্বদিন রাত্রিতে মুরলী বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। কাহাকেও কোন কারণ বলিয়া যায় নাই।

কেবল কাগজে স্বহস্তে লিখিয়া দিয়া গিয়াছে, সে স্বেচ্ছায় সানন্দে সজ্ঞানে এই কাজ করিয়াছে। পাশের ঘর হইতে লুণ্ঠিত মাতার অবরুদ্ধ ক্রন্দনধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। ঘরে আপাদমস্তক গায়ের কাপড়ে ঢাকিয়া চন্দ্রকান্ত মৃতের মত নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছেন। মাথার কাছে বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া নির্ম্মলা বসিয়া আছে। বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া যামিনী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পা টিপিয়া সেই আলো-অন্ধকারময় ঘরে ঢুকিল। তথাপি যেটুকু শব্দ হইল, তাহাতেই চন্দ্রকান্ত চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, 'কে কে? সে আবার এল নাকি।'

নির্ম্মলা মুখ তুলিল। তাহার দুই চোখের নীচে নিকষ-কৃষ্ণ পাথরের মত কালিমা। সে বলিল, 'না না, সে ত নেই। সে ত মরে গেছে।' যামিনী তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'নির্ম্মলা, আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষমা কর। আমাকে দয়া কর।'

সেই ক্ষীণ আলোয় তাহার চক্ষু দিয়া অজস্র জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। যামিনী নিজের অজ্ঞাতসারে সেই রোদন প্লাবিত বিবশ মস্তক দুই হাতে নিজের কাছে টানিয়া আনিল। চন্দ্রকান্ত ক্ষণকালের জন্য চক্ষু মেলিয়া থামিয়া থামিয়া অনেক কষ্টে কহিলেন, 'তোমাদের এই মিলন স্থায়ী হোক, সত্য হোক। আর যেন না তোমাদের বিচ্ছেদ হয়। নির্ম্মলা, আমি তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেলুম। আমার সংসারকে মুক্তি দিয়ে গেলুম। আমার বঞ্চিত, ব্যর্থ, অভিশপ্ত জীবনের ছায়ায় আর যেন না তোমাকে বিড়ম্বিত হ'তে হয়। এই মুক্তি তোমার জীবনে সার্থক হোক মা।'

নির্ম্মলা তাহার বুকের উপর মাথা রাখিল। চন্দ্রকান্তের নিঃশ্বাস যেন আরও ক্ষীণ হইয়া আসিল।

যামিনী সস্নেহে নির্ম্মলার রুক্ষ চুলের রাশির উপর হাত রাখিয়া কহিল, 'নির্ম্মলা, কেঁদ না। ওঠ। এখনও যে উনি বেঁচে আছেন। তুমি যে আমাকে ক্ষমা করলে, আমি যে তোমাকে পেলুম, তা ওঁকে ভাল ক'রে দেখে যেতে দাও।'

(সমাপ্ত)

কনে-বউ

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

নরম নরম, নীলাম্বরীটি
ময়ূরকণ্ঠী পাড়
কে জানে কে ওকে কিনে দিয়েছিল—
কি যে আনন্দ তার!
সারাদিনটাই প'রে থাকে আর
উঠানে বেড়ায় ঘুরে,
দুটি পায়ে ওর রুপার ঝাঁঝর
বাজে মনটানা সুরে।
বোনটি আমার, ভাইটি আমার
থাকে ওর কাছে কাছে;
আমি শুধু ভাবি, 'যাব কি যাব না,
যেতে আছে কি না আছে'
লজ্জা-সরম বুঝি কি তখনও—?
তবু লজ্জাই হবে,
কোন দিন আমি যেতে পারি নাই
সঙ্গীর গৌরবে।
মনটা কেবলই পিপাসিত হয়ে
ঈর্ষা জাগাত মনে,
আমি শুধু ওর খেলার সঙ্গী
হই নাই কি কারণে!
চালাঘর থেকে জানালার ফাঁকে
আড়চোখে চোখে দেখে
ওর কথা, ওর হাসি, ওর সব
নিয়েছিনু গায়ে মেখে,—
তবুও দেখার পিপাসা মেটে নি,
নিরজনে পেলে কাছে,
আদরে সোহাগে দিয়েছি আমার
যাকিছু দেবার আছে।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Alfred Place W.
South Kensington.
London, S. W.

কল্যাণীয়েষু,

এবারকার মডার্ণ রিভিয়ুতে একটা ভুল খবর বেরিয়েছে। যিনি আমাকে দেখলেই পায়ের ধূলা নিয়ে প্রণাম করেন তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ছিলেন না। তিনি কি, ও কে, আমি বলব না, তাহলে তোমরা কাগজে বের ক'রে দেবে। রোটেন্‌ষ্টাইন ঠিক জানতেন না তাই আমাকে ভুল বলেছিলেন। অতএব সেটা যেন সংশোধন করা হয়। ও সংবাদটা পড়ে আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হ'ল। ওটা কি প্রকাশ করবার যোগ্য? আমি এ পৃথিবীতে প্রণাম বাঁচিয়ে চলতে চাই; যদি পাই তবে সেটা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করি নে—কেননা, ওটা কিছুতেই আমার পাওনা নয়। পৃথিবীতে কবির দাবির উচ্চ সীমা কোলাকুলি পর্য্যন্ত—প্রণামের দ্বারা তার জাত যায়—আমি কবি ছাড়া যে আর কিছু নই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহমাত্র নেই। আমি তোমাদের হৃদয়ের সমভূমিতেই দাঁড়াতে চাই—সেইখানেই আমার যথার্থ স্থান—উচ্চভূমিতে আমি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আমি তোমাদের বার-বার বলেছি আবার বলছি—আমাকে ভুল আসনে তোমরা বসিয়ো না—সেটা হয়ত সম্মানের জায়গা হতেও পারে কিন্তু তেমন অসুখের জায়গা আর কিছু নেই—যে পাগড়ি মাথায় হয় না সেই পাগড়ি পরার মত—সর্ব্বদা মনে হয় পড়ে যাবে এবং মাথা ধরে ওঠে। আমি তোমাদের বন্ধু, কিছু দেব, কিছু নেব। যদি আমার ভাগ্যক্রমে দেওয়া-বিষয়ে আমার জিত হয় তবু সে বন্ধুত্বেরই দান, সুতরাং তার জন্যে ফিরে আমি কিছু দাবি করব না। গুরুর পদ আমার নয়, নয়, নয়। আমি নিজে কিছু শিখি নি এবং কাউকে শেখাতেও পারব না; আমি পৃথিবীতে সব জিনিষ যেমন ক'রে পেয়েছি তেমনি করেই দিয়েছি অর্থাৎ নিতান্ত পড়ে-পাওয়া ভাবে—তার যদি কিছু দাম থাকে সে দামের পাওনা আমার নয়।

বার্গসোঁ সম্বন্ধে একটি চটি বই তোমাকে শীঘ্র পাঠাব। সেটা ভারি চমৎকার, সহজে ওঁর মতটা ব্যাখ্যা ক'রে দিয়েছে। উনি যে দিকটা দেখিয়েছেন সেটা খুব চমৎকার—কিন্তু অন্য দিকটাকে একেবারে অস্বীকার করবার কোনো মানেই নেই। গতি-তত্ত্বও যেমন সত্য, স্থিতি-তত্ত্বও তেমনি সত্য—এবং সেইজন্যেই গতিকেও আমরা স্থিতিরূপে ছাড়া বুঝতেই পারি নে—সেটা কেবল মাত্র আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির মায়া নয়—সেটা সত্য ব'লেই তার হাত আমরা এড়াতে পারি নে।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

আজ এখানকার একটি পাড়াগাঁয়ে কিছুদিনের জন্যে যাচ্ছি। সেখানে গেলে বোধ হয় একটু সময় পাওয়া যাবে। এখানে কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না। আজ তাড়াতাড়ি তোমাদের চিঠি লিখে দিচ্ছি।

তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলুম। তোমার সেই তর্জ্জমার কথা পূর্ব্বেই লিখেছি। তুমি আমার সেই কবিতা তর্জ্জমার কথা জিজ্ঞাসা করেছ। সেগুলো এদের সকলের বিশেষ ভাল লেগেছে সে সংবাদ এত দিনে শুনে থাকবে। তোমরা যে-ক'টা দেখেছিলে তার পরে জাহাজে অনেকগুলো লিখেছি, এখানে এসেও কম লেখা হয় নি। সবসুদ্ধ বোধ হয় একশোটা পেরিয়ে গেছে। সেই লেখাগুলো নিয়ে ইয়েট্‌স নর্ম্মাণ্ডি গেছেন। সেখানে বসে তিনি তার একটা introduction লিখবেন—তার পরে ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে সেটা ছাপা হবে। সেদিন ষ্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক্‌সের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমার লেখাগুলি manuscriptএ

পড়েছেন। এঁদের যে এইগুলো এত ভাল লাগতে পারবে সে কথা আমি স্বপ্নেও মনে করি নি। এঁরা মনে করছেন আমার এই লেখাগুলি এঁদের পক্ষে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী, শুনে আমার মনে খুব আনন্দ হ'ল। যখন বোলপুরে বসে দিনের পর দিন এই গানগুলি একটি একটি ক'রে লিখছিলুম তখন কল্পনাও করতে পারতুম না এগুলো সমুদ্রপারে কারও কোন প্রয়োজনে লাগবে। এমন কি আমি নিজে কত বার মনে করেছি এবং তোমাদেরও বলেছি বাংলা ভাষাতেও এগুলো ঠিক সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য নয়—এ কেবলমাত্র আমার নিজের মনের কথা, আমারই প্রয়োজনে লেখা—নিতান্তই নিরলঙ্কার। এখন মনে হচ্ছে কেবলমাত্র নিজের জন্যে লিখলেই সেটা যথার্থ সকলের জন্যে লেখা হয়—এবং অলঙ্কারটা বাদ দিলেই মূল্যটা বেড়ে ওঠে। কিন্তু এ-কথা নিয়ে তোমাদের আমি বেশী কিছু বলতে ইচ্ছে করি নে—পাছে তাতে এর মধ্যে কিছু বিকৃতি এসে পড়ে। সেই কারণেই এখানে সকলে আমাকে যে আদর জানিয়েছেন তার বিষয়ে তোমাদের বিস্তারিত ক'রে লিখতে পারি নি। এই সম্মানে তোমাদের সকলের আন্তরিক আনন্দ হবে এবং সেইটেই আমার সকলের চেয়ে আনন্দের বিষয়—কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই ব্যাপারটাকে আমি নিজের আলোচনার ক্ষেত্র থেকে এক পাশে সরিয়ে রেখেছি।

আমার 'ডাকঘর'-টা এখানকার একটি বাঙালী ছাত্র তর্জ্জমা করেছেন। তার ভাষাটা অত্যন্ত বেশী আড়ম্বর-বিশিষ্ট হয়েছিল—আমাকে আবার সেটা অনেক পরিমাণে নরম ক'রে আনতে হয়েছে—তবুও মনের মত হয় নি। রোটেনষ্টাইন এইটে পড়ে আনন্দিত হয়েছেন। তিনি বলছেন অক্টোবরে এটা তিনি ষ্টেজ সোসাইটিকে দিয়ে অভিনয় করাবার ব্যবস্থা করবেন।

আমার শান্তিনিকেতন থেকে কতকগুলি [illegible] মত বেছে নিয়ে আমি তর্জ্জমা করবার চেষ্টায় আছি। আমি যতদূর বুঝতে পারছি তাতে বোধ হচ্ছে এগুলো এঁদের বিশেষ কাজে লাগতে পারে। তুমি তোমার অবকাশ মত কিছু কিছু তর্জ্জমা পাঠিয়ে দিলে এঁদের হাতে দেওয়া যেতে পারবে।

এখানকার একজন নাট্যকার—তাঁর নাম Calderon, আমার দালিয়া গল্পটা থেকে একটি ছোট্ট নাটিকা লিখেছেন। সেটা সেদিন অভিনয় হয়ে গেছে। দর্শকদের ভাল লেগেছিল। পড়তে বোধ হয় আমাদের বিশেষ মনোহর হবে না। কারণ, তার মধ্যে যথেষ্ট বিলিতি গন্ধ আছে। তাতে আমি একটি ছোট্ট গান লিখে দিয়েছিলুম, সুরও আমার। এই প্রথম কবিতায় লেখবার চেষ্টা।

কিন্তু আজ আমার আর সময় হবে না। সকালেই ট্রেন ছাড়বে—এখনও জিনিষপত্র গোছানো হয় নি।

ছেলেদের সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। তাদের কথা আমার সর্ব্বদাই মনে হয় এবং মনে হলেই শরীরটা-সুদ্ধ তদভিমুখে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই ঠিকানায় চিঠি দিও
21, Cromwell Road
South Kensington
London, S. W.
২৬শে ভাদ্র, ১৩১৯

কল্যাণীয়েষু,

অজিত, এবারকার মেলে তোমাদের জন্যে কিছু লিখে পাঠাতে সময় পেলুম না। কুমারস্বামীর ইংরেজ স্ত্রী কতকগুলি ভারতবর্ষীয় গান লিখেছেন, সেগুলি নোটেশন ক'রে ছাপাচ্ছেন, কুমারস্বামী তার লম্বা ভূমিকা লিখেছেন; আমাকে তার একটি ছোট মুখবন্ধ ক'রে দেবার জন্যে ধরেছেন; সেইটে আমাকে লিখতে হ'ল। কুমারস্বামীর স্ত্রীর গান একদিন শুনতে গিয়েছিলুম। তিনি তানপুরা কোলে নিয়ে এমনি দিশি ধরণে তাল মান লয়ে গান করলেন আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম্। কানাড়া প্রভৃতি খুব ভারি সুরে রীতিমত মীড় দিয়ে গাইলেন—সে আমাদের ওস্তাদের চেয়ে ভাল বই খারাপ নয়। আমাদের বিদ্যালয়ে আজকাল গানের চর্চ্চাটা বোধ হয় কমে এসেছে; সেটা ঠিক হবে না। ওটাকে জাগিয়ে রেখো। আমাদের বিদ্যালয়ের সাধনার নিঃসন্দেহ ওটা একটা প্রধান অঙ্গ। শান্তিনিকেতনে বাইরের প্রান্তরশ্রী যেমন অগোচরে ছেলেদের মনকে তৈরি

স্পর্শ করিবার অধিকার পর্য্যন্ত তাঁহার ছিল না। কর্ত্তাকে লুকাইয়া ব্রজদাসী মাঝে মাঝে ছেলেকে তাঁহার কোলে বসাইয়া দিত, কিন্তু কর্ত্তা একথা জানিতে পারিলে কি অনর্থ ঘটিবে সেই আশঙ্কাতেই তিনি এত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন যে, ছেলেকে আদর করিতে ভরসা পাইতেন না, এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াই ব্রজদাসীর কাছে ফিরাইয়া দিতেন।

সেই পৌত্র আজ বড় হইয়াছে। ভৈরব রায় পৌত্রের নাম দিয়াছিলেন কীর্ত্তিনারায়ণ। বাহির মহলে কাছারী-বাড়ির দক্ষিণে যে বৈঠকখানা দালানে ভৈরব রায় থাকিতেন তাহার সম্মুখে ছিল এক প্রশস্ত, বাঁধানো আঙ্গিনা। বৈঠকখানা দালানের রকের উপরে যেখানে দুই ঝাড় জুঁই ফুলে শাদা হইয়া চারিদিকে সুগন্ধ ছড়াইত ও বড় বড় পদ্মকরবীর গাছ দুইটিতে গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ফুল ফুটিয়া থাকিত সেখানে একখানা শ্বেত পাথরের জলচৌকির উপর বসিয়া ভৈরব রায় পৌত্রের শিক্ষাবিধান করিতেন।

প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে একমাত্র এই বৈঠকখানার দালানটিই অক্ষত দেহে দাঁড়াইয়াছিল। অন্দরমহলের মাত্র কয়েকটি কোঠা ব্যবহারযোগ্য ছিল, বাকী সব পরিত্যক্ত বিশাল ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। ছোট-বড় নানা আকারের অশ্বত্থগাছ ভগ্নস্তূপের মধ্যে মাথা খাড়া করিয়াছিল, সেই সকল গাছ বাহিয়া উঠিয়াছিল নানা জাতির কণ্টকলতা। অন্দরের সীমানার মধ্যে ছিল কালীদহ নামে পুকুরটি—চারিদিক ভগ্নস্তূপে পরিবৃত যেন একখানি স্বচ্ছ কাচখণ্ড। সান-বাঁধানো ঘাট ও উচ্চ পাড়ের নীচে স্ফটিকের মত জল টল টল করিত। কালীদহের চারিটি পাড় জঙ্গলে ঢাকিয়া গিয়াছিল, শুধু সানবাঁধানো ঘাটগুলি সেই জঙ্গলের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। উত্তর দিকের ঘাটের ডানপাশে একটা অদ্ভুত গম্বুজাকৃতি কোঠা, চূড়ায় একখানি লোহার ত্রিশূল দেখিয়া বোঝা যায় যে এককালে শিবমন্দির ছিল। কালীদহের জল কাকচক্ষুবৎ পরিষ্কার হইলেও সে জলে কেহ স্নান করিত না, একমাত্র পরিচারিকা ব্রজদাসী ছাড়া। তাহার এই বিশেষ অধিকারে কেহ কোনও প্রশ্ন করিত না।

অন্দরের সঙ্গে ভৈরব রায়ের কোন সম্পর্ক ছিল না, তাঁহার হাতীর দাঁতের খড়মের শব্দ অন্দরের সীমানার মধ্যে কখনও প্রতিধ্বনিত হইত না। তাঁহার স্নান, ভোজন, শয়ন বহির্ব্বাটীতে সম্পন্ন হইত, সন্ধ্যাহ্নিকও বহির্ব্বাটীর মধ্যে অবস্থিত ভগ্নপ্রায় মন্দিরের একাংশে চলিত। বৈঠকখানা দালানে বাহিরের লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ইহার একদিকে পাশাপাশি রক্ষিত দুইটি পালঙ্কে পৌত্র ও পিতামহ শয়ন করিতেন। পালঙ্কের শিয়রে দেয়ালের গায়ে সারি সারি নানা আকারের তরবারি ও ছোরা সজ্জিত ছিল, কোনখানির বাঁট সোনার, কোনটি রৌপ্যের। পায়ার দিকে বহুসংখ্যক বল্লম হুক দিয়া দেয়ালের গায়ে আবদ্ধ ছিল, ইহাদের কোনটির মাথা দুইদিকে করাতের দাঁতের মত, কোনটির মাথা টাঙ্গির মত, কোনটি দু-ফলা, কোনটি এক ফলা। ঘরের অন্যদিকে গোলাকার একটি শ্বেত পাথরের প্রকাণ্ড টেবিল, তাহার দুই দিকে দুইটি প্রকাণ্ড আলমারী। একটির মধ্যে নানা আকারের সেকালের তৈয়ারী বন্দুক—কয়েকটি তাহাদের দৈর্ঘ্যের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন হইত যে, এত লম্বা ও এত ভারী বন্দুক সাধারণ মানুষ কোনকালে ব্যবহার করিত। অপর আলমারীতে ছিল ছোটবড় নানা আকারের খানকয়েক খাপখোলা তরবারি ও ছোরা, মরিচা পড়িয়া একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে, আর গুটি তিনেক অদ্ভুত চেহারার বেঁটে বন্দুক—রিভলভারের মত কতকটা। লোকে বলিত এইগুলির প্রত্যেকটি নররক্তরঞ্জিত, এজন্য আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছিল। দুইটি আলমারীর পাশে অনেকগুলি চামড়া-বাঁধানো ঢাল দেওয়ালে আবদ্ধ। শ্বেতপাথরের টেবিলের উপরে গম্বুজাকৃতি কাঁচের আবরণে ঢাকা কয়েকটি বড় বড় সেকেলে ঘড়ি, একটি বাদে বাকী সব-গুলি বন্ধ। যে ঘড়িটি চলিতেছিল সেটি একটু অদ্ভুত রকমের। একটি পরীমূর্ত্তি হাতে একটি ছোট হাতুড়ী লইয়া দাঁড়াইয়া। বাজিবার সময় হইলে পরীটি হাত তুলিয়া সম্মুখের একটি কাঁসীর মত বস্তুতে আঘাত করিত আর জলতরঙ্গের বাজনা বাজিয়া উঠিত, সঙ্গে সঙ্গে নারী-কণ্ঠের গান শোনা যাইত। টেবিলের এক পাশে ছোট

একটি দামামা, পিতলের দেহ, কতকটা বড় বাটীর আকারের। তাহার একধারে দুইটি পিতলের ডাণ্ডা, মাথা গোল বলের মত। এই অদ্ভুত দামামা সম্বন্ধে নানারকম কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল।

এই সকল কিংবদন্তীর মধ্যে কিছু সত্য ছিল কিনা বলিতে পারি না। লোকে বলিত মাঝে মাঝে দ্বিপ্রহর রাত্রে পৃথিবী যখন নিবিড় সূচীভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইত, হঠাৎ গুমগুম শব্দ করিয়া দামামা বাজিয়া উঠিত, কেমন একটা অস্বাভাবিক, অশুভ ধ্বনি অন্ধকারের বুক চিরিয়া পল্লীবাসীদের কানে আঘাত করিত—আর এক অজানা আতঙ্কে তাহারা শিহরিয়া উঠিত। এই দামামা বাজিয়া উঠিলেই নাকি এক জন বিশালকায় বৃদ্ধ কুস্তিগীরের মত ল্যাঙটপরা, বার্দ্ধক্যের ভারে কুব্জদেহ, প্রকাণ্ড শাদা গোঁফে মুখের অর্দ্ধেক আবৃত ও লম্বা শাদা দাড়ির অগ্রভাগটি দুইদিকে টানিয়া দুই কানের সঙ্গে বাঁধা, বাঁ-কোমরে একখানি বাঁকানো তরবারি, পিঠের দিকে একখানি ছোরা, ডান হাতে একগাছা সুতীক্ষ্ণ বল্লম লইয়া—ছায়ামূর্ত্তির মত ধীরে ধীরে বৈঠকখানার রকের উপর আসিয়া দাঁড়াইত। দাঁড়াইয়া লোহা-বাঁধানো বল্লমের গোড়ার দিকটা রকের উপর তিনবার ঠুকিত, সঙ্গে সঙ্গে দামামার চীৎকার হঠাৎ থামিয়া যাইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই বিশালকায় বৃদ্ধটি রকের উপর উঠিয়া শব্দ করিবার পর যে-মুহূর্ত্তে দামামার শব্দ থামিয়া যাইত তার ঠিক পরমুহূর্ত্তে একটা চাপা কান্নার শব্দ শোনা যাইত। লোকে বলিত যে, রকের নীচে আঙ্গিনার প্রান্তে পশ্চিমদেশীয়া স্ত্রীলোকের পোষাকে একটি স্ত্রীলোক মুখটি সুদীর্ঘ ঘোমটায় আবৃত করিয়া বৃদ্ধের পিছনে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইত, এবং তাহারই সুদীর্ঘ ঘোমটার মধ্য হইতে চাপা কান্নার শব্দ আসিত।

এই স্ত্রীলোকটি কয়েক বৎসর আগে মারা গিয়াছে। সে ছিল বিশালকায় বৃদ্ধটির স্ত্রী আর বৃদ্ধটি ছিল ভৈরব রায়ের দেহরক্ষী ও লাঠিয়ালবাহিনীর সর্দ্দার লালা সিং। অনেক কাল এই দম্পতি সুখে ঘরকন্না করিয়াছিল। তার পর হঠাৎ কি এক কাণ্ড হইয়া গেল—তাহাদের একমাত্র সন্তান বয়স্থা মেয়েটি গেল মারা। কি অপরূপ সুন্দরীই সে ছিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী রায়-পরিবারের বংশপ্রদীপ, বৃদ্ধ ভৈরব রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্রটিও হঠাৎ মারা গেলেন। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার কাহিনী আজিও এক রহস্যজালে আবৃত রহিয়াছে, সে রহস্যজাল লোকে কোন কালে ভেদ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। কন্যাকে হারাইয়া লালা সিংহের স্ত্রী দীর্ঘকাল জীবিত ছিল না। কিন্তু এতদিন পরেও যখনই গুম-গুম শব্দ করিয়া দামামা গভীর রাত্রে, সূচীভেদ্য অন্ধকারের বুক চিরিয়া বাজিয়া উঠিত তখনই তাহার ক্রন্দনরত ছায়ামূর্ত্তি স্বামীর পিছনে পিছনে কি যেন অকথিত অভিযোগ লইয়া ভৈরব রায়ের বৈঠকখানার রকের নীচে আসিয়া উপস্থিত হইত।

দামামার শব্দ থামিয়া গেলে ভৈরব রায় বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেন। ঋজু, দীর্ঘ, মেদবর্জ্জিত দেহ,—উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দাড়িগোঁফ পরিষ্কার করিয়া কামানো, শুক্লকেশ ও ঘন যুগ্মভ্রূ, গলায় যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ বাহুতে সোনার তাগা, বামহস্তের মণিবন্ধে একটি অষ্টধাতুর সরু বালা, পায়ে হাতীর দাঁতের খড়ম। দেখিলে মনে হয় যে বয়স অনেক হইয়াছে, কিন্তু দাঁড়াইবার ও চলিবার কঠিন দৃপ্ত ভঙ্গী ও শুক্লবর্ণের বিশাল যুগ্মভ্রূর দ্বারা অর্দ্ধ আচ্ছাদিত দুই চোখের উজ্জ্বল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেখিয়া বয়সের পরিমাণ অনুমান করা সহজ হইত না। কণ্ঠস্বরের সতেজ গাম্ভীর্য্যও মধ্যবয়স্ক শক্তিশালী পুরুষের মত।

হাতীর দাঁতের খড়মের ঠকঠক শব্দ করিয়া ভৈরব রায় রকের উপর আসিলে কি যেন মন্ত্রবলে সেই কুব্জদেহ বৃদ্ধ হঠাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইত, দাঁড়াইয়া বিদ্যুৎগতিতে কোমরের বাঁকানো তরবারি খাপ হইতে খুলিয়া সামরিক কায়দায় অভিবাদন করিত। সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিনার স্ত্রীমূর্ত্তিটিও মাটিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিত।

তার পর ভৈরব রায় নিম্নকণ্ঠে কি যেন আদেশ করিতেন, প্রভুভক্ত বৃদ্ধ নির্ব্বাক ভাবে শুনিত। প্রভুর বক্তব্য শেষ হইলে আবার অভিবাদন করিয়া বল্লমের দ্বারা রকে ঠক্ করিয়া একবার শব্দ করিত। সঙ্গে সঙ্গে যেন উহার প্রত্যুত্তরেই গুম করিয়া দামামার একবার গম্ভীর প্রতিধ্বনি হইত। রক হইতে নামিয়া কুব্জদেহ বৃদ্ধ ধীরে ধীরে আঙ্গিনা পার হইয়া যাইত, পিছনে পিছনে

চলিত সুদীর্ঘ ঘোমটায় আবৃতা ক্রন্দনরতা স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তি।

লালা সিং আঙ্গিনা পার হইয়া অন্তর্হিত হইলে ভৈরব রায় রকের উপর পায়চারি করিতে আরম্ভ করিতেন—ঠক্‌ঠক্ ঠক্‌ঠক্ করিয়া হাতীর দাঁতের খড়মের শব্দ হইতে থাকিত।

বৈঠকখানা দালানের সেই রকের উপরে যেখানে দুই ঝাড় জুঁই অজস্র ফুল ফুটিয়া শাদা হইয়া থাকিত ও বড় বড় পদ্মকরবীর গাছ দুইটিতে গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ফুল ফুটিয়া থাকিত সেইখানে একখানি শ্বেতপাথরের জলচৌকির উপর বসিয়া ভৈরব রায় পৌত্র কীর্ত্তিনারায়ণের শিক্ষাবিধান করিতেন। ক্ষুদ্র বালক মাথায় প্রকাণ্ড এক পাগড়ী বাঁধিয়া বাঁ-হাতে ছোট একখানি ঢাল ও ডান হাতে তরবারি লইয়া কুব্জদেহ বৃদ্ধ লালা সিংহের সঙ্গে তরবারি খেলিত—কখনও বা কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্মুখে রাখিয়া একাই খেলিত বা কল্পিত পলায়মান আততায়ীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বর্শা ছুঁড়িত। লালা সিংহের শিক্ষার গুণে ক্ষুদ্র বালক ইতিমধ্যেই ওস্তাদ লাঠিয়াল হইয়া উঠিয়াছিল। মালকোঁচা দিয়া কাপড় পরিয়া ছোট লাঠিখানা হাতে লইয়া ডাক ছাড়িয়া লাফাইয়া লাফাইয়া সে যখন লাঠি ঘুরাইত, বন-বন শব্দ করিয়া বিদ্যুতের মত তাহার হাতে লাঠি ঘুরিতে থাকিত, দেখিয়া ভৈরব রায়ের দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

পৌত্রকে অশ্বারোহণ-বিদ্যা শিক্ষা দিতেন ভৈরব রায় স্বয়ং। একটি দোআঁশলা তেজী শাদা রঙের ঘোড়ায় জিন কসিয়া মুসলমান সহিস আঙ্গিনার একপ্রান্তে তাহার লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। প্রভুপুত্র কাছে আসিলে সে লাগাম ছাড়িয়া দিয়া হেঁট হইত, তাহার আনত পিঠের উপর পা রাখিয়া লাফাইয়া বালককে ঘোড়ায় চড়িতে হইত। পিঠে সোয়ার চাপিলেই ঘোড়াটি পাগলের মত পিছনের দুই পা শূন্যে ছুঁড়িতে আরম্ভ করিত, দেহ বাঁকাইয়া আন্দোলিত করিয়া আরোহীকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিত।

প্রথম দিন ঘোড়ায় চড়িয়া বালক ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু অদূরে দণ্ডায়মান পিতামহের চোখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে নামাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিতে সাহস পায় নাই। ঘোড়ার কাঁধের উপর হেঁট হইয়া প্রাণপণে তাহার কেশর আঁকড়াইয়া সে পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় দিনে ঘোড়া লাফাইতে সুরু করিলে সে লাগাম টানিয়া সিধা বসিয়া রহিল। দশ মিনিট কাল লাফালাফি করিবার পর ক্ষুদ্র সোয়ারটিকে লইয়া সদর ফটক পার হইয়া ঘোড়াটি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। ছুটিতে ছুটিতে সে কেবল চেষ্টা করিতে লাগিল কোন্ ফাঁকে পথ ছাড়িয়া পথিপার্শ্বের আগাছার জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। কখনও বা এমন ভাবে বড় বড় গাছ ঘেঁষিয়া ছুটিতে লাগিল যে প্রতিমুহূর্ত্তে বালকের পা গাছের কাণ্ডে বাধিয়া ছড়িয়া যাইবার, উল্টাইয়া তাহার ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হইল। বালক লাগাম দাঁতে কামড়াইয়া ধরিয়া চাবুকের উল্টা দিক দিয়া দুই হাতে তাহার ঘাড়ে ও পাশে আঘাত করিয়া তাহাকে পথে চালাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কয়েক দিন এইভাবে চলিবার পর ঘোড়া বুঝিতে পারিল যে তাহার সোয়ারটি ক্ষুদ্র হইলেও ভয় পাইবার পাত্র নহে। ক্রমে সে ঠাণ্ডা হইয়া আসিল।

এইভাবে কীর্ত্তিনারায়ণের পদোপযোগী শিক্ষাদীক্ষা চলিতে লাগিল।

কীর্ত্তিনারায়ণের বয়স যখন আঠারো বছর পুরিল তখন এক দিন পিতামহ তাহাকে কাছে ডাকিলেন, নতমস্তকে পিতামহের সম্মুখে দাঁড়াইলে তিনি আদেশ করিলেন কালীদহে স্নান করিয়া পূজার কাপড় পরিয়া তাঁহার নিকটে আসিতে হইবে। কালীদহে স্নান করিবার আদেশ পাইয়া কীর্ত্তিনারায়ণ একবার বিস্মিত ভাবে চোখ তুলিলেন, পরক্ষণেই নতমস্তকে অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। পৌত্রকে স্নান করিবার আদেশ দিয়া ভৈরব রায় রকে পায়চারি করিতে লাগিলেন—ঠক্‌ঠক্ ঠক্‌ঠক্ করিয়া হাতীর দাঁতের খড়মের শব্দ হইতে লাগিল। ঘন ঘন সে শব্দ শুনিয়া মনে হইল বৃদ্ধ ভৈরব রায় আজ যেন একটু উত্তেজিত ও অন্যমনস্ক।

কীর্ত্তিনারায়ণ কালীদহে স্নান করিতে নামিলেন। কালীদহের কাকচক্ষুবৎ স্বচ্ছ, স্থির জলে নামিয়া ডুব দিতেই তাঁহার মনে হইল কত বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গমালা একটির

পর একটি করিয়া অবিশ্রামে যেন তাঁহার মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িতেছে; দুই কানের কাছে ঝম ঝম করিয়া কিসের যেন শব্দ হইতে লাগিল, তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ হইবার মত হইল। মনে হইল তাঁহার মাথার উপরে কালীদহের ক্ষুদ্র বুকে যেন প্রলয়ের তাণ্ডব আরম্ভ হইয়াছে, গাছপালা উপড়াইয়া বায়ুবেগে তৃণখণ্ডের মত ছুটিতেছে, দালান কোঠা ভাঙিয়া-চুরিয়া সশব্দে কালীদহের জলে পড়িতেছে, প্রবল ভূকম্পনে কালীদহের অথৈ জলরাশি বিষম বেগে তাঁহাকে লইয়া শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে—

প্রাণভয়ে কীর্ত্তিনারায়ণ জল হইতে মাথা তুলিলেন, চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম, কালীদহের জলরাশি আগেকার মতই কাকচক্ষুবৎ স্বচ্ছ, স্থির। প্রেততাড়িত ব্যক্তির ন্যায় কীর্ত্তিনারায়ণ জল হইতে উঠিয়া পড়িলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। তার পর তিনি কি করিলেন, কি কি ঘটনা ঘটিল সে সকলের কোন পরিষ্কার স্মৃতি তাঁহার নাই। মনে হইল যেন বিশ্বের ঘুম তাঁহার দুই চক্ষুতে ভর করিয়াছে, চেতনা আচ্ছন্ন করিয়াছে। সেই অর্দ্ধঘুমঘোরে অতি অদ্ভুত, বিচিত্র ঘটনাবলী তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পিতামহ তাঁহার হাত ধরিয়া এক অন্ধকার, অজ্ঞাত পুরীতে লইয়া গেলেন—বায়ুহীন, স্যাঁৎসেতে, দুর্গন্ধ বাষ্পপূর্ণ পথ সেই পুরীতে যাইবার। সেখানে একটি বেদীর সম্মুখে স্তিমিত প্রদীপালোকে তাঁহাকে নতজানু হইয়া বসিতে হইল, পিতামহ হাতে সরু চুড়ির মত কি একটা পরাইয়া দিলেন। তার পর কোথা হইতে অজস্র আলো ঝরিয়া পড়িল, তিনি দেখিলেন এক জন শ্বেতবস্ত্রভূষিতা স্ত্রীলোক আঁচলের চাবি দিয়া একটা রুদ্ধ কক্ষের দ্বার খুলিয়া ফেলিল। পিতামহের সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা অনেকগুলি লোহার সিন্দুক। পিতামহের ইঙ্গিতে সেই স্ত্রীলোকটি সিন্দুকগুলি একে একে খুলিতে লাগিল, ভিতরের বিপুল ধনরাশি দেখিয়া তাঁহার দুই চোক ঝলসিয়া গেল; ধীরে ধীরে তাঁহার চেতনা লুপ্ত হইতে লাগিল। চেতনা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সেই স্ত্রীলোকটির মুখ তিনি দেখিতে পাইলেন—সে পিতামহের পরিচারিকা ব্রজদাসী!

তার পরের কোনও ঘটনা কীর্ত্তিনারায়ণের আর স্মরণ নাই। ভৌতিক ঘটনা বলিয়া ব্যাপারটিকে তিনি উড়াইয়া দিতেন, কিন্তু হাতের সেই অষ্ট ধাতুর বালা স্মরণ করাই দিল যে-অভিজ্ঞতা তাঁহার লাভ হইয়াছে তাহা অদ্ভু আশ্চর্য্য, ভীতিজনক হইলেও মিথ্যা নয়। সেই বিপু অগণিত ধনরাশি যাহা তিনি দেখিয়াছিলেন তাহা ত পিতামহের, তাঁহার নিজেরই পৈতৃক সম্পদ। সেই গু ধনরাশির কথা মনে পড়িয়া, উহা এক দিন তাঁহারই হই মনে করিয়া কীর্ত্তিনারায়ণের দুই চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্ব হইয়া উঠিল। হঠাৎ একটা কথা মনে উদিত হইতে তিনি চমকিয়া উঠিলেন—এই বিপুল অগণিত ধনরা যেখানে আবদ্ধ রহিয়াছে তাহার চাবি ব্রজদাসীর হাতে!

এত লোক থাকিতে ব্রজদাসীর হাতে কেন চাবিগু দিয়াছেন? কে সে? কেন তাহার উপর এতখানি বিশ্বাস? সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে? ব্রজদাসী পরিবারের পরিচারিকা হইয়াও কেন সকলের উপরে কর্ত্তৃ করে? গুজব পিতামহের সঙ্গে তাহার গুপ্ত, অবৈধ সম্পর্ক আছে। থাকুক গুপ্ত, অবৈধ সম্পর্ক, তাই বলিয় এক জন ইতরজাতীয়া স্ত্রীলোককে এত বিশ্বাস! এ-সকল কথা ভাবিতে-ভাবিতে তাঁহার মনে বিজাতী জিঘাংসা-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। কীর্ত্তিনারায়ণের মনে পড়িল না কি অসমসাহসের সঙ্গে ব্রজদাসী পিতামহের রোষবহ্নি হইতে অন্তঃপুরিকাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে, কি ভাবে বৃদ্ধ পিতামহের সমস্ত সেবাশুশ্রূষার ভার কেবল ব্রজদাসী বহন করে, কি অগাধ স্নেহে কোলে পিঠে করিয়া তাঁহাকে সে মানুষ করিয়াছে, সকল আব্দার-অত্যাচার সহিয়াছে।

পাঁচ বৎসর বয়সের পর হইতে ভোজনের সময় ছাড়া কীর্ত্তিনারায়ণের অন্দরে যাইবার হুকুম ছিল না। পিতামহের সঙ্গে যে সময়টা তাঁহাকে থাকিতে হইত না সে সময়—দিবসের অধিকাংশ সময়—কাটাইবার জন্য তাঁহার তিনটি সঙ্গী ছিল ব্রজদাসী, বৃদ্ধ লালা সিং ও লালা সিংহের স্ত্রী। রায়-বাটীর সংলগ্ন বৃহৎ উদ্যানের এক পার্শ্বে দুইটি কুটীরে বৃদ্ধ লালা সিং ও তাহার স্ত্রী বাস করিত। পরিষ্কার করিয়া নিকানো প্রাঙ্গণটি তকতক করিত। প্রাঙ্গণের একদিকে বাঁশের আড়ায় একটি পিতলের খাঁচা ঝুলিত,—

খাঁচায় ছিল একটি সুন্দর ময়না। সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বেই ময়নাটি পরিষ্কার মানুষের কণ্ঠে ডাকিত "জয় সীতাপতি," "জয় সীতাপতি"। তার পরেই সে চেঁচাইত—"বুড়ীমা, ও বুড়ীমা, ওঠ্, ওঠ্।" বৃদ্ধ লালা সিং "জয় সীতাপতি" "জয় সীতাপতি" বলিতে বলিতে কুটীরের বাহিরে আসিত, আসিয়া ময়নাটিকে একটু আদর করিত। তার পর মুখহাত ধুইয়া প্রাঙ্গণের অপর দিকে অবস্থিত ছোট বাগানটুকুর তদ্বির করিত। চারি দিকে বাখারির বেড়া-দেওয়া সুন্দর ছবিখানির মত বাগানটি, বেড়া জড়াইয়া উঠিয়াছে তরুলতা, ছোট ছোট লাল ফুলে অপরূপ তাহার শোভা। একদিকে একটি নাতিবৃহৎ স্থলপদ্ম গাছ, ফিকে গোলাপী রঙের বড় বড় ফুলে গাছ ভরিয়া থাকিত। অপর কোণে একটি শিউলী গাছ, শরৎকাল আসিবার বহুপূর্ব্বেই গাছের তলা শিউলী ফুলের আস্তরণে ঢাকিয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলা শিউলীর মৃদুগন্ধে ছোট কুটীরখানি আমোদিত হইত। তার পরেই খানিকটা জায়গায়—বড় বড় ভুট্টার গাছ, সারি সারি লঙ্কা ও বেগুনের চারা লাগানো, গাছগুলির অজস্র ফলন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হইত।

বালক কীর্ত্তিনারায়ণ তক্‌তকে প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি ছোট বেতের মোড়ায় বসিয়া খেলা করিত। "বুড়ীমা, ও বুড়ীমা, ওঠ্ ওঠ্" ময়নাকে এ বুলি সে-ই শিখাইয়াছিল। ভুট্টা পাকিলে লালা সিংহের স্ত্রী আগুনের মালসায় সেঁকিয়া দিত আর বেতের মোড়ায় বসিয়া বালক কীর্ত্তি মহা আহ্লাদের সহিত তাহা খাইত। মাঝে মাঝে ব্রজদাসী আসিয়া লালা সিংহের স্ত্রীকে বকিয়া-ঝকিয়া অর্দ্ধভক্ষিত ভুট্টা বালকের হাত হইতে কাড়িয়া লইত। ক্রুদ্ধ বালক কিল-চড় মারিয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ব্রজদাসীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিত; যত ক্ষণ বৃদ্ধা ঘর হইতে একটি সরের নাড়ু আনিয়া হাতে না-দিত তত ক্ষণ তাহার রাগ পড়িত না। নাড়ু হাতে লইয়া ব্রজদাসীর কোলে চড়িয়া "বুড়ী মা যাই" বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে চলিয়া যাইত।

সেই কীর্ত্তিনারায়ণ আজ বড় হইয়াছে। বৃদ্ধ লালা সিং দেখা হইলেই তাহাকে নমস্কার করে। শুধু ব্রজদাসীর ব্যবহারে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। যুবক কীর্ত্তিকে বকাঝকা করিতে সে আজও কিছুমাত্র ভয় পাইত না।

যুবক কীর্ত্তিনারায়ণ আগেকার মতই কসরৎ করিতেন, ঘোড়ায় চড়িতেন, বন্দুক লইয়া দলবল সঙ্গে শিকারে যাইতেন। তাঁহার গতিবিধিতে অনেকখানি স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল,—অন্দরে গিয়া ইচ্ছামত সময় কাটাইতে আর কোন নিষেধ ছিল না। কিন্তু তাঁহার মনের নিভৃত কোণে অহরহ এই চিন্তা জাগিয়া থাকিত যে রায়-পরিবারের বিপুল ধনরাশি একটি ইতরজাতীয়া স্ত্রীলোকের হাতে রহিয়াছে।

ব্রজদাসীর সংসারে কেহ ছিল না। সাত বছর বয়সের সময় দূর গ্রামের স্বজাতীয় নয় বৎসরের একটি বালকের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। এক বৎসরের মধ্যে সে বিধবা হইল। তাহার বৃদ্ধা মায়ের মৃত্যু হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে পনের বছর বয়সের সময় সে রায়-পরিবারে চাকুরী করিতে আসে; সদ্যবিপত্নীক ভৈরব রায়ের বয়স তখন ত্রিশ। ক্রমে ক্রমে সে বৃহৎ রায়-পরিবারের প্রকৃত গৃহিণী হইয়া উঠিল। স্বল্পভাষিণী, শান্ত, মৃদুস্বভাবা ব্রজদাসীকে দেখিলে কেহ ঝি বলিয়া মনে করিতে পারিত না—করিতও না। কর্ত্তার সঙ্গে সম্বন্ধ ধরিয়া সকলে তাহাকে ডাকিত, ব্যবহারও সেইরূপ করিত। দুই পুরুষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশের পল্লী-অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ঘরে এই ব্যাপার নিত্যনৈমিত্তিক ছিল, কাহারও চোখে ইহা বিসদৃশ ঠেকিত না, ইহা লইয়া পরিবারের কাহারও গাত্রদাহ হইত না। নামে পরিচারিকা হইলেও এই শ্রেণীর পরিচারিকারা পরিবারের আত্মীয়া বলিয়া গণ্য হইত, পারিবারিক সকল বিষয়ে তাহারাও মতামত প্রকাশ করিত। যেমন অকৃত্রিম স্নেহ তাহারা সকলকে বিলাইত তেমনই স্নেহ নিজেরাও পাইত। বুদ্ধি-বিবেচনা, স্বভাব ও কার্য্যদক্ষতার গুণে কেহ কেহ যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারিণীও হইত। ব্রজদাসী ছিল এই শ্রেণীর স্ত্রীলোক। ব্যবহারগুণে সকলকেই সে বশীভূত রাখিয়াছিল। কর্ত্তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান যেমন তাহাকে না-হইলে চলিত না, কর্ত্তার পিতৃহীন পৌত্রকে মানুষ করিবার কাজেও সেইরূপ তাহাকে না-হইলে চলিত না।

কীর্ত্তিনারায়ণ এই ব্রজদাসীর কোলে-পিঠে চড়িয়া মানুষ হইয়াছিল, নিজের মায়ের সঙ্গে তাহার বিশেষ সম্পর্ক

ছিল না। প্রৌঢ়া ব্রজদাসীকে সে ডাকিত দাদী বলিয়া, নিজের পৌত্রের মতই তাহার অনুগতও ছিল।

কিন্তু কালীদহে স্নান করিয়া সেদিনকার সেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পর হইতে কেমন করিয়া যেন তাঁহার চিত্তের ধারা বদলাইয়া গেল। কি এক অদম্য ঘৃণা ও ভয়ের বশে ব্রজদাসীর প্রতি সকল ভালবাসা মুছিয়া গিয়া ক্রুদ্ধ, ব্যর্থ আক্রোশে তাঁহার চিত্ত আলোড়িত হইতে লাগিল। নিজের মনের এই অদ্ভুত অবস্থান্তর অনুভব করিয়া তিনি ভীত হইয়া উঠিতেন। আত্মসংযম করিবার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইতে দেখিয়া অসহায়ভাবে বিলাপ করিতেন। ক্রমে রায়-পরিবারের হিংস্র রক্ত তাঁহার ধমনীতে ধমনীতে কি যেন এক ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত বহিয়া চঞ্চল হইয়া ছুটিতে লাগিল।

বৃদ্ধ ভৈরব রায় সন্ধ্যা-বন্দনা সারিয়া বৈঠকখানার দালানের রকে বসিয়া আছেন,—দুই ঝাড় জুঁই গাছ ফুলে শাদা হইয়া গিয়াছে, গন্ধে চারিদিক আমোদিত। সেই গন্ধের প্রভাবে তাঁহার চিত্ত আজ নির্ম্মল, উদার, প্রশান্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র চারি দিকে অজস্র রূপালী আলো ছড়াইয়া দিয়াছে, সুদূর অতীতে লুম্বিনী উদ্যানে এমনই দিনে এক মানবশিশু শোকতাপ-ব্যাধিক্লিষ্ট ধরণীর সান্ত্বনার জন্য শান্তিবার্তা বহিয়া জননী-জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আত্মসমাহিত ভাবে কতক্ষণ তিনি বসিয়াছিলেন খেয়াল নাই। হঠাৎ একটা দূরাগত, অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ শুনিয়া তিনি সচকিত হইয়া উঠিলেন।

শব্দ শুনিয়া সচকিত হইয়া ভৈরব রায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এক অজানা আতঙ্কে তাঁহার দীর্ঘ দেহ শিহরিয়া উঠিল। উত্তেজিত ভাবে তিনি রকে পায়চারী করিতে লাগিলেন, হাতীর দাঁতের খড়ম ঠক্‌ঠক্ ঠক্‌ঠক্ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল। কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেলে হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন জ্যোৎস্নাধৌত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ পার হইয়া একটি ছায়ামূর্ত্তি দুলিতে দুলিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, কে? ছায়ামূর্ত্তি আরও অগ্রসর হইল, আরও নিকটে আসিল, তার পর রকের সিঁড়ির নীচে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ভৈরব রায় দেখিলেন ব্রজদাসী। ব্রজদাসী মাটিতে না দাঁড়াইয়া একটু উপরে স্থির হইয়া আছে, ব্রজদাসীর মাথা বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ব্রজদাসীর অঙ্গে অসংখ্য আঘাত-চিহ্ন, তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়া সর্ব্বাঙ্গে কে যেন খোঁচাইয়াছে, দেহ বাহিয়া রক্তধারা নীচে পড়িতেছে।

ভৈরব রায়ের সকল অঙ্গ হিম হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, দুই চক্ষু ফাটিয়া প্রাণ যেন বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল। তার পর চমক ভাঙিল।

হঠাৎ পল্লীবাসী সকলে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল গুম-গুম, গুম-গুম শব্দ করিয়া ভৈরব রায়ের দামামা কর্কশ কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল। পূর্ণচন্দ্র ঘনকৃষ্ণ মেঘের অন্তরালে লুকাইল, ছাই-রঙের অসংখ্য মেঘখণ্ড মাথার উপরে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎরেখা সমস্ত নভস্তল চিরিয়া ফেলিতে লাগিল। তখনও গুম-গুম করিয়া কর্কশ কণ্ঠে ভৈরব রায়ের পাগলা দামামা বাজিতেছে।

কুব্জদেহ বৃদ্ধ লালা সিং কখন তাহার বাঁকানো তরবারি কোমরে বাঁধিয়া রকের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রভুর আদেশ বহন করিয়া কখন সে চলিয়া গেল, ভৈরব রায়ের হাতীর দাঁতের খড়মের ঠক্‌ঠক্ ঠক্‌ঠক্ শব্দের তখনও বিরাম নাই।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাকাশ লাল হইয়া উঠিল, মনে হইল কালীদহের পাড়ে যেন আগুন লাগিয়াছে। লক্ লক্ করিয়া সে অগ্নির লোলশিখা আকাশে যেন ধাইয়া উঠিল। মনে হইল শত শত শিবা অশুভ চীৎকার করিয়া উঠিল। মনে হইল বহু কণ্ঠের করুণ ক্রন্দনের রোলে চরাচর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শুভ্র বস্ত্রে সর্ব্বদেহ আচ্ছাদিত করিয়া স্বল্পভাষিণী, শান্ত, মৃদুস্বভাবা ব্রজদাসী আর ফিরিল না, স্বপ্নোপম উজ্জ্বল রূপ লইয়া রায়-বংশের শেষপুরুষ যুবক কীর্ত্তিনারায়ণ আর ফিরিলেন না, বাঁকানো তরবারি কোমরে বাঁধিয়া নিমকহালাল কুব্জদেহ বৃদ্ধ ভৃত্য লালা সিং আর ফিরিল না।

পাগলা দামামা নিস্তব্ধ হইয়াছিল, কালীদহের পাড়ে

বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র শান্তোজ্জ্বল হাসি হাসিতেছিল। কিন্তু বৈঠকখানা-দালানের রকের কঠিন বক্ষে যেখানে দুইটি ঝাড়ের শাদা জুঁই ফুলের গন্ধে ও গুচ্ছ গুচ্ছ পদ্মকরবীর শোভায় চারিদিক আমোদিত ও উজ্জ্বল হইয়াছিল, ভৈরব রায়ের হাতীর দাঁতের খড়মের শব্দ তখনও সেখানে নিস্তব্ধ হয় নাই।

সাহসিক কোন পল্লীবাসী বৈশাখী পূর্ণিমায় রায়-বাড়ির ভগ্নস্তূপের সন্নিকটে দাঁড়াইলে এখনও দেখিত যে কালীদহের পাড়ে আকাশের গায়ে পূর্ণচন্দ্র বিরাট ভগ্নস্তূপের উপর ম্লান ছায়া বিস্তার করিয়াছে, আর শুনিতে পাইত, সেই ভগ্নস্তূপের অন্তর হইতে আসিতেছে কঠিন রকের বুকে হাতীর দাঁতের খড়মের শব্দ—ঠক্‌ঠক্ ঠক্‌ঠক্।

পদ্মাবতের কবি

শ্রীঅমৃতলাল শীল

পদ্মাবতের কবির নাম মলিক মহম্মদ জায়সী (জায়স নগর নিবাসী)। আজকাল যে স্থানে "নবাব" শব্দ ব্যবহৃত হয়, তুগলক ও খিলজী-বংশীয় সম্রাটদের সময়ে সেই স্থানে মলিক [বাঙ্গলা মল্লিক] শব্দ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু কবি মহম্মদ স্বয়ং এই উপাধি অর্জ্জন করেন নাই, বা কোন মলিকের বংশে তাঁহার জন্ম হয় নাই। তিনি স্বয়ং আপনার নামের সহিত এই মলিক শব্দ জুড়িয়া দিয়াছিলেন অথবা তাঁহার সঙ্গী বন্ধুরা তাঁহাকে মলিক বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল ঠিক জানা নাই; তবে তিনি আপনার এক হিন্দু বন্ধুকে মলিক উপাধি ধারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ও তাহার বংশে এখন পর্য্যন্ত মলিক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

মহম্মদ দরিদ্র পিতামাতার সন্তান ছিলেন। জন্মের অল্প পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, মাতা গৃহস্থদের বাটীতে শরীর খাটাইয়া অতিকষ্টে পুত্রকে পালন করিতে লাগিলেন। শৈশবেই মহম্মদ বসন্তরোগে একটি চক্ষু ও একটি কর্ণ হারাইয়াছিলেন। তাঁহার মুখখানি এমনই বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে লোকে দেখিলে না-হাসিয়া থাকিতে পারিত না। আট নয় বৎসর বয়সে মহম্মদের মাতারও মৃত্যু হইল, তখন বালক একেবারে নিরাশ্রয় হইল। লোকে তাহার বিকৃত মুখ দেখিয়া হাসিত কিন্তু এই হাসি বালকের হৃদয়ে শেলের মত বিঁধিত, সেইজন্য বালক সমস্ত দিন গ্রামের উপকণ্ঠে বনে বনে নির্জ্জনে ঘুরিয়া বেড়াইত, গ্রামে প্রবেশ করিত না। বনে যদি ফলমূল কিছু পাইত তবে তাহাই খাইত কিংবা ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইলে রাত্রে অন্ধকারে গ্রামে আসিয়া ভিক্ষা করিত, অথবা বন হইতে কাষ্ঠ কুড়াইয়া কিছু অর্জ্জন করিত। বালক এক দিন দেখিল বনে একদল হিন্দু সন্ন্যাসী রাত্রি-বাস করিবার উদ্যোগ করিতেছে ও পাক আরম্ভ করিয়াছে। ক্ষুধার তাড়নায় বালক তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলে সন্ন্যাসীদের দলপতি তাহার করুণ কাহিনী শুনিয়া তাহাকে আদর করিয়া খাওয়াইলেন ও বলিলেন—এরূপ কষ্ট করিয়া কয় দিন কাটাইবে, আমাদের সঙ্গে চল, আমরা পরিব্রাজক, এক স্থানে দু-এক দিনের বেশী থাকি না, তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াই, ভগবান আমাদের অন্ন জুটাইয়া দেন। আমাদের সহিত থাকিলে তোমাকে আমাদের ক্ষমতা-মত ভাল শিক্ষা দিব, ভবিষ্যতে তুমি এক জন ভাল সাধু হইতে পারিবে। মহম্মদ তাঁহাদের সহিত জন্মভূমি ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা নগরের বা গ্রামের বাহিরে আসন করিয়া নগরে ভিক্ষা করিতে যাইতেন, কিন্তু মহম্মদ কখনও গ্রামে প্রবেশ করিতেন না। তাঁহাদের শিক্ষাতে মহম্মদ হিন্দুদের পুরাণের অনেক কথা শিখিয়াছিলেন ও কালে ভাল যোগী হইয়াছিলেন। কিছুকাল তাঁহাদের সহিত সমস্ত ভারতের তীর্থ পর্য্যটনের পর মহম্মদ হিন্দু সন্ন্যাসীদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এক মুসলমান সুফী সাধুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও মুসলমান মতে যোগ সাধন করেন। এইরূপে তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় মতে যোগে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি কয়েকটি শিষ্য সংগ্রহ করিয়া পরিব্রাজক-রূপে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ পরিব্রাজক যোগী সম্প্রদায়ে তোতাপক্ষী-রূপী আত্মার নানা রূপক গল্প প্রচলিত আছে, তিনি ঐগুলি শিখিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতাতে যোগ-সম্বন্ধে হিন্দী ও আরবী উভয় ভাষার পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যায়। মহম্মদের হাতের লেখা পাওয়া যায় নাই, বোধ হয় লিখিতে পারিতেন না, অথবা লিখিতে শিখিয়াছিলেন কিন্তু পরিব্রাজক গুরুর সহিত ঘুরিয়া হাত পাকাইবার অবসর পান নাই, কিন্তু কবিতা-রচনায় তাঁহার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিল। তিনি ছোট ছোট সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন ও তাঁহার শিষ্যেরা গ্রামে গ্রামে সেই গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। এক দিন তাহারা জায়স গ্রামে তাঁহার রচিত এক বারমাসা গাহিতেছিল। এই জায়স গ্রাম মোগলসরাই হইতে ১৩২ মাইল দূরে লখনউর পথে প্রতাপগড় ও রায়বেরেলীর মধ্যে রেলের ধারে অবস্থিত। গ্রামের জমিদার বা রাজা ঐ গীতে আকৃষ্ট হইয়া বালকদের সম্পূর্ণ বারমাসা গাহিতে বলিলেন ও গীত কাহার রচিত জিজ্ঞাসা করিলেন। বালকরা বলিল, এ গীত আমাদের গুরুর রচনা, তিনি আমাদের সঙ্গেই আছেন কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী, কখনও কোন গ্রামে প্রবেশ করেন না। এই কথা শুনিয়া রাজার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল, তিনি স্বয়ং গ্রামের বাহিরে গিয়া মহম্মদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও অনুনয় করিয়া আপনার এক বড় বাগানে আসিয়া তাঁহাকে বাস করিতে বলিলেন। মহম্মদ উদ্যান-বাটীতে বাস করিতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন তাঁহার জন্য বাগানের এক নির্জ্জন অংশে এক খড়ের কুটীর বাঁধা হইল, সেই কুটীরেই তিনি জীবনের শেষ অংশ কাটাইয়াছিলেন। জায়সের রাজার বাটীর কাছেই তাঁহার গোর এখনও সম্মানিত বা পূজিত হইতেছে।

এই রাজার অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু একটিও বাঁচে নাই। মহম্মদের আসিবার পর (তাঁহার আশীর্ব্বাদের ফলে) এক পুত্র হইয়া দীর্ঘজীবী হইয়াছিল বলিয়া রাজা, রাজবংশ ও অনেক গ্রামবাসী তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িলেন। ঐ বাগানে বাসকালে মহম্মদ পদ্মাবৎ রচনা করেন। যোগী-সম্প্রদায়ে আত্মার পাখীর সহিত তুলনা অন্য দেশেও প্রচলিত আছে। ইরানের প্রসিদ্ধ সুফী সাধু ও কবি ফরীদ-উদ্দীন অত্তারের আত্মা সম্বন্ধে "মনৎক্‌-উল-ত্যার" [পাখীর কথা] নামক পুস্তক ফার্সী সুফী-সাহিত্যে একখানি অতি উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ। ইংরেজ কবি ফিট্‌স্‌জিরাল্‌ড এই পুস্তকের কয়েকটি কবিতার ভাব লইয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার "ওমর খৈয়াম" নামক কবিতা-পুস্তকে আছে। ভারতের যোগী-সম্প্রদায়েও তোতার গল্প নানা আকারে প্রচলিত আছে, মহম্মদ সেই রূপক বর্ণনা পদ্মাবতে করিয়াছেন, ক্রমে লোকে তাঁহার রূপককে ইতিহাস ভাবিয়াছে। এরূপ ভ্রম অন্য স্থানেও হইয়াছে, শুনিয়াছি অনেকে বর্দ্ধমানের রাজবাটীর নিকট মালিনীর মালঞ্চ ও সুন্দরের খনিত সুড়ঙ্গের স্থান নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন। মহম্মদ বোধ হয় রত্নসিংহ ইত্যাদির নাম শুনিয়াছিলেন, সেই নামগুলি আপনার কবিতাতে ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র, চিতোর-অবরোধের সময়ে অলাও-উদ্দীন কি কি করিয়াছিলেন তাহার সবিস্তার বর্ণনা মহম্মদ জানিতেন না। সেকালে ইতিহাস কেবল ফার্সী ভাষাতে ছিল, মহম্মদ সে ভাষা জানিতেন না, তাঁহার সঙ্গীরাও ভিখারী সাধু-সন্ন্যাসী বা বৈরাগীর দল ছিলেন, কেহ ফার্সী ভাষার ধার ধারিতেন না। তবে অন্য কোন লোকের মুখে ১৪০ বৎসর পূর্ব্বের যুদ্ধের গল্প শোনা সম্ভব বটে, কিন্তু সে শোনা-গল্পও অত্যুক্তিপূর্ণ হওয়া সম্ভব। সেকালের হাতে লেখা পুস্তকও দুষ্প্রাপ্য ছিল, নানা দিক্ দিয়া চিন্তা করিলে মহম্মদের মত লোকের বিশ্বাস্য ইতিহাস না-জানাই সম্ভব বোধ হয়। ইহা ছাড়া কবির উদ্দেশ্যও ইতিহাস লেখা নহে, গল্পে যেমন এক রাজা ও তাঁহার দুয়ো সুয়ো রাণীর কথা বলা হয় সেইরূপ গল্প বলিয়াছেন, কেবল রাজা-রাণীর একটা নাম দিয়াছেন মাত্র। চার শত বৎসর পরে তাঁহার রাজা ও রাণীর যে জীবনের খোঁজ করা হইবে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, ওরূপ ভাবিলে তিনি হয়ত রাজা-রাণীর নাম দিতেন না।

আজকাল পদ্মাবৎ গল্প বা কবিতা দেবনাগর অক্ষরে ও উর্দ্দু অক্ষরে লিখিত দুই প্রকার পাওয়া যায়, তাহাদের পাঠে

নেক প্রভেদ আছে। দেবনাগর অক্ষরে লেখা পুস্তক হিন্দী ষায় বিদ্বানদের হাতে ছিল ও উর্দু অক্ষরে লেখা পুস্তক-নি মুসলমানদের হাতে ছিল। মহম্মদ অশিক্ষিত ছিলেন, হার কবিতাতে ব্যাকরণ ও ছন্দের অনেক ভুল ছিল, হিন্দী ণ্ডিতরা অনেক ভুল সংশোধন করিয়াছেন, অতএব উভয়ের ধ্যে অনেক প্রভেদ হইয়া গিয়াছে। উর্দু অক্ষরে লেখা স্তকখানি মহম্মদের আসল অবিকৃত রচনা বোধ হয়, সলমানরা সংশোধন চেষ্টা করেন নাই।

জায়সী সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে তাঁহার বিকৃত মুখ খিয়া হাসিলে তিনি মনে বড় আঘাত পাইতেন, সেইজন্য তিনি সকলের সম্মুখে বাহির হইতেন না। জায়সের রাজার এক বন্ধু জমীদার তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া রাজার অতিথি হইয়াছিলেন, পরে কবিকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহম্মদ বিরক্ত ও ব্যথিত হইয়া কঠোর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে দেখিয়া হাসিতেছ? হাঁড়ি দেখিয়া হাসিতেছ, না কুমোরের প্রতি বিদ্রূপ করিতেছ? অর্থাৎ আমার মুখ দেখিয়া হাসিতেছ, না আমাকে যে কুম্ভকার এইরূপ কদাকার গড়িয়াছে তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছ? জমীদারটি বড় লজ্জিত হইলেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

রঙ্গিলা নায়ের মাঝি *

শ্রীবিমল মিত্র

ন্ধ্যাবেলা বউ-ডুবির-চরে নৌকা বাঁধা হইল। আশার আর নন্দের সীমা নাই। যতদূর চাও কেবল জল—ছল-ছল ল-কল শব্দ করিয়া নৌকার গায়ে আসিয়া ঢেউগুলি াছাড় খাইতেছে। পাশের বউ-ডুবির-চরে ঘন জঙ্গল। নেক দিনের পুরাতন চর; জঙ্গলও অনেক দিনের। বালুর র ঢালু হইয়া জলের উপর নামিয়া আসিয়াছে। দেখিতে খিতে আশা একেবারে আত্মহারা হইয়া গেল।

মাঝিরা দুই জন নৌকা বাঁধিয়া তামাক সাজিতে সিয়াছে। চরে নামিয়া হাত-পা ধুইয়াছে। সঙ্গে চিঁড়া ড়ি আছে—তাহা দিয়া তাহারা শেষবারের মত আহার মাধা করিবে। বিকালবেলা সূর্য্যাস্তের সময় এবং তাহার াগেও তাহারা গান করিয়াছে। হু-হু-করা বাতাসের ঙ্গে তাহাদের গান চমৎকার লাগিয়াছিল। বনমালী ার আশা সারা বিকাল ধরিয়া একমনে তাহাই শুনিয়াছিল। মৎকার গলা; গানটি কাহার রচনা কে জানে—কিন্তু বড় রুণ। পাড়াগেঁয়ে গান; গানের তাৎপর্য্য: মাঝিকে ডাকিয়া কান্ বিরহী বলিতেছে, নাইয়া তুমি তো কত দেশ ঘোর, ত দরিয়া পাড়ি দাও, তুমি কি আমার বঁধুর খবর রাখ?... যদি কখনও তার দেখা পাও, তাকে বলিও আমি তাহার পথের দিকে চাহিয়া এখনও বসিয়া আছি,...

ছইয়ের এধারে গলুই-এর কাছে বসিয়া আশা পা দিয়া জল ছিটাইতেছিল। নূতন বউ—বিয়ে হইয়াছে সেদিন — বছরখানেকও হয় নাই—কিন্তু এমন চঞ্চল! বনমালী যদি হুকুম দেয় তো আশা এখনই চরে গিয়া বেড়াইয়া আসিতে পারে—তাহার এতটুকু ভয় করিবে না —

বনমালী মানা করিল—উঁহু—পা দিও না জলে—দিও না বলছি—বধূ শুনিবে না। জলের ওপর পা দিলে যে কি দোষ হয় তাহা তাহার বোধগম্য হইতেছিল না। বনমালীর কথা না-শুনিয়া আশা তেমনই পা দিয়া জল নাড়াইতে লাগিল। বনমালী বলিল—দিও না বলছি পা, ও আশা, পা দিও না—তবু যদি কথা শুনবে—যে-কথাটি বলব, সেইটি—জলে কত কুমীর-হাঙোর আছে—সাপ-খোপ আছে—

আশা হাসিয়া ফেলিল—হ্যাঁ, জলে নাকি আবার সাপ থাকে!

বনমালী এবার রাগ দেখাইল—থাকে না তো থাকে না বেশ—সাপ থাকে না, কুমীর থাকে না, কিছু থাকে না—এই সন্ধ্যেবেলা জলের ওপর পা ঝুলিয়ে ব'সে থাক—শেষকালে সুষমার মত তোমাকেও কামড়ে দিক—আমি কিছ্ছুটি বলব না—

আশা তবু পা তুলিল না—কিন্তু বনমালীর মুখের ওপর চোখ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সুষমা কে?…কে সুষমা?

—কে আবার! নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে বনমালী ওধারে চাহিয়া উত্তর দিল—সুষমার নাম শোন নি? মার কাছে কোনদিন শোন নি? সুষমা—সুষমা—তিন অক্ষরের সেই অতিপ্রিয় নামটি বনমালী স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিল দুই দুই বার?

—ওঃ দিদির কথা বলছ?…

এবার আশা বুঝিতে পারিয়াছে। বনমালীর আগের পক্ষের বউয়ের নাম সুষমা!

আশা বলিল—দিদিকে ত সাপে কামড়েছিল, না?

বনমালী চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া ছিল। কি কথা বলিতে বলিতে কি কথা উঠিয়া গেল! কোথা দিয়া কি হইল—আজ এতদিন পরে হঠাৎ কথায় কথায় তার কথা কেন মনে পড়িয়া গেল! আগে আগে সুষমার কথা ভাবিতে গেলে বনমালী ভারী অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত—কাঁদিয়া ফেলিত এক এক সময়; সুষমার একটা ফটোও বাঁধাইয়া রাখিয়াছিল ঠিক বিছানার উপর দিকের দেওয়ালের গায়, কিন্তু এই আশা আসিবার পর সেটা বনমালী ভাঙিয়া ফেলিয়াছে! কি হইবে রাখিয়া? সারা জীবন মন খারাপ রাখিলে বাঁচিবে কেমন করিয়া? কিন্তু এতদিন পরে সেই কথাটি আবার কেন মনে পড়িল! বনমালীর মনে হইল, মনে না-পড়িলেই বুঝি ভাল হইত। যাহারা চলিয়া যায় তাহাদের কেন মনে রাখা! কেন তাহাদের আশায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা! সুষমাকে আর মনে রাখিবার দরকার নাই। সুষমাকে এবার হইতে বনমালী একেবারে ভুলিয়া যাইবে। সেই বিপুল জলরাশির দিকে চোখ রাখিয়া বনমালী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাই ভাল তাই ভাল—সুষমাকে সে একেবারে ভুলিবে।

আশা বলিল—আচ্ছা, আমায় যদি সাপে কামড়ায় তুমি কি কর?

বনমালী রাগিয়া উঠিল—কি সব তোমার অলুক্ষুণে কথা—আর কোনও কথা নেই তোমার মুখে—তোমার কি হ'ল বল ত…?

আশা তাহার প্রথম প্রশ্নের জের টানিয়া বলিল—দিদির মতন যদি আমি মরে যাই—তুমি আবার বিয়ে করবে ত?…বল না—ওগো—চুপ ক'রে রইলে কেন—বল—উত্তর দাও—

বনমালী এবার ভীষণ রাগ করিল। বলিল—কখ্খনো বলব না—বলব না ত—কেন, মরা ছাড়া বুঝি তোমার আর কোনও কথা নেই মুখে—মরা মরা—মরতে তোমার বড় সাধ—আর আমি যদি মরে যাই? …

টপ করিয়া আশা বনমালীর মুখে হাত চাপা দিল। বলিল—ওগো, আর কখ্খনো বলব না—কখ্খনও না—আমার ঘাট হয়েছে—হ'ল ত এবার? মা গো—তোমার মুখে কিছু আট্‌কায় না—তুমি সব পার—

এই ঘটনায় বনমালীর আর একটি দিনের কথা মনে পড়িল। সেদিনও সুষমা ঠিক এমনি করিয়া তাহার মুখ চাপা দিয়াছিল। একটা কথাও বলিতে দেয় নাই। তার পর দেশে গিয়া বনমালীর নাম করিয়া চণ্ড-ভৈরবের মন্দিরে পূজা দিয়া আসিয়াছিল। ইহারা সবাই এক রকম। সেদিনকার সুষমার সঙ্গে আজিকার আশার এতটুকু তফাৎ নাই। এই আশা তাহাকে যেমন ভালবাসে সুষমাও ঠিক তাহাকে তেমনই করিয়া ভালবাসিত। তবে তাহাকে বনমালী এমন করিয়া ভুলিয়া গেল কেন? চোখের আড়ালে যে চলিয়া যায়—মনের আড়ালেও সে যে চলিয়া যায় না সে কথা কে বলিল। মিথ্যা কথা—চিরকাল কেহ কখনও কাহাকে মনে রাখিতে পারে?…সে-ও যে সুষমাকে ভুলিয়া গিয়াছে তাহাতে তাহার কি দোষ!

ক্রমে চারিদিকে আরও অন্ধকার হইয়া আসিল।

অস্পষ্ট কুয়াশার মত চারিদিকের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। কেবল অন্ধকার—সামান্য একটু চাঁদের আলো পড়িয়া জায়গায় জায়গায় চিক্ চিক্ করিয়া উঠিতেছে; চরের জঙ্গলে একসঙ্গে অসংখ্য ঝিল্লী

কলরব জুড়িয়া দিয়াছে—ইহাদের মধ্যে বসিয়া বনমালী আর আশা সীমাহীন কাল হইতে খসিয়া পড়া এক একটি মুহূর্ত্ত কুড়াইয়া সঞ্চয় করিতে লাগিল।

জোয়ার আসিবে রাত্রি দুটায়—সেই জোয়ারে নৌকা ছাড়া হইবে। মাথাভাঙার উত্তর দিকে খালের ভিতর দিয়া বড় নদীতে পড়িবে—সেখান দিয়া গিয়া বাবুইঘাটার জেটিতে ষ্টীমার ধরিতে হইবে। চিঁড়া মুড়ি বাহির করিয়া মাঝিরা খাওয়া শেষ করিয়াছে—বনমালীও সঙ্গে করিয়া খাবার আনিয়াছিল, দু-জনে মিলিয়া শেষ করিল। খাওয়ার শেষে এক জন মাঝি সুর করিয়া গান ধরিয়াছে—

…কোন্ বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া কে যেন বলিতেছে—তোমার লাগিয়া আমার চক্ষের পানি আর বক্ষের ব্যথা বাধা মানে না—তোমার আশায় সারা জীবন আমি পথের পাশে বসিয়া আছি—তুমি বারেক আসিয়া আমার দরদ জুড়াও…

সুরে কথায় গানটি বনমালীর ভারী চমৎকার লাগিল। আশাও তন্ময় হইয়া গিয়াছে। এই পরিপূর্ণ উন্মুক্ত আবহাওয়ায় আর মনের এই অতি-পরিচিত প্রতিবেশে গানটি বনমালীকে অবশ করিয়া দিল।

আশা পাশে বসিয়াছিল। আরও পাশে আসিয়া বলিল—তুমি তো বাঁশী বাজাতে এককালে, না?

বনমালী বলিল—কে বললে তোমায়?

—কে আবার বলবে! সবাই ত জানে। পাড়ার সবাই বলে—সেদিন ভঞ্জদের বড়বৌ বলছিল—যাত্রায় নাকি তুমি কেষ্ট সেজে বাঁশী বাজাতে, মা'র কাছে শুনিছি—এই-টুকুন্ বেলা থেকে বাঁশীর সখ ছিল তোমার—একবার বাঁশী কেড়ে নিয়েছিল ব'লে কি কান্না তোমার—ভাত খাও নি কিছু না—আচ্ছা অত সখ, এখন আর বাজাও না কেন?

বনমালী কথা কহিল না।

—হ্যাঁ গো সে বাঁশীটা গেল কোথায়?…আমার বিয়ের পরে ত দেখতে পাই নি—তুমি নাকি বাঁশী বাজালে পাখীরা ডেকে উঠত—সত্যি সত্যি এক দিন শুনিও আমাকে, বাঁশী শুনতে আমি ভারী ভালবাসি—সে বাঁশী রেখেছ কোথায় বল ত?

বনমালী বলিল—এই গাঙের জলে ভাসিয়ে দিয়েছি—

আশার বিশ্বাস হয় না। বলিল—আহা, সব কথাতেই তোমার ঠাট্টা, সাধের বাঁশীটা জলে ফেলে দিলে?…কার ওপর রাগ করেছিলে, শুনি?

—তোমার দিদির ওপর—

আশা বুঝিতে পারে নাই। বলিল—দিদি কে?

—সুষমা—

কথাটা বলিয়াই বনমালী বুঝিল মিথ্যা কথাটা বলা তাহার উচিত হয় নাই। সত্য সত্যই সুষমার উপর রাগ ত সে করে নাই। রাগ হইয়াছিল বাঁশীর ওপর—সেই রাগেই সে বাঁশী বাজান ছাড়িয়া দিয়াছে। নিশীথ রাত্রে এক-এক দিন বনমালীর যখন ঘুম আসে না—বন-তুলসীর গন্ধে বাতাস উন্মত্ত হইয়া ওঠে—তখন সেই সময়ে ছাদে উঠিয়া বাঁশী বাজাইতে তাহার ইচ্ছা করে। ইচ্ছ করে—বাঁশীর ফুটা দিয়া প্রাণের সমস্ত গোপন কথা আকাশে এবং আকাশের তারকালোকে ছড়াইয়া দেয়। যেখানে মর্ত্ত্য-লোকের বাণী পৌঁছায় না, সেই গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে তাহার বাঁশী কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাথা কুটিয়া মরুক!…

আশা বলিল—চুপ ক'রে রইলে যে বড়—বললে না ত?

—কি বলব?

আশা বলিল—কেন দিদির ওপর রাগ করেছিলে…

—সে অনেক কথা—

আশা বলিল—হোক অনেক কথা, বলতেই হবে—'না' বললে শুনছিনে…আমাকে বলতে তোমার কি হয়েছে—আমি ত তোমার পর নই—

সে আজ চার বছর আগের কথা। গ্রীষ্মকাল। জমিদারীর কাজে বনমালীকে শহরে আসিতে হইবে! অনেক বুঝাইয়া-সুজাইয়া সুষমাকে বনমালী শান্ত করিয়াছিল। বাহিরে গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল—পোঁটলা-পুঁটুলি লইয়া বনমালী উঠিতে যাইবে এমন সময় বলা-নাই কওয়া-নাই এক গলা ঘোমটা দিয়া সুষমা সরাসরি গাড়ীতে আসিয়া বসিল।

তখন আর কেইবা বোঝে—আর কেইবা বোঝায় সে সময় নাই তখন।

বনমালী শুধু বলিয়াছিল—কোথায় যাবে তুমি?

কি জানি কেন—বোধ হয় অকারণেই—সুষমা বলিয়াছিল—"চুলো"—

বনমালীও রসিকতা করিয়া বলিয়াছিল—চল সেখানেই তোমায় নিয়ে যাচ্ছি—

শহরের তিন মাইল দূরে সুষমার বাপের বাড়ি। সেখানেই যাওয়া আপাততঃ স্থির হইল। নৌকায় পথে দু-দিন কাটাইতে হয়। ঢেউয়ের দোলায় দুলিতে দুলিতে একটা গোটা দিন বেশ কাটিয়া গেল। চাঁদের আলোয়—আর অবাধ খোলা হাওয়ায় সুষমার কি স্ফূর্ত্তি—কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া শুইয়া আকাশ দেখা—মাঝির গান শোনা; রাত্রিবেলা দূরে অন্ধকারের মাঝে টিম্ টিম্ করিয়া দুই একটি আলো জ্বলে—কোন নৌকার আলো হয়ত। এই তীর—এই একেবারে অকূল পাথার। পৃথিবীর কোনও ভাবনা নাই—দুঃখ-দৈন্যময় পৃথিবীকে এড়াইয়া যেন তাহারা অমর্ত্ত্যলোকে আসিয়াছে।...

দ্বিতীয় দিন ভোর বেলা মাঝিরা একটা চরে নৌকা বাঁধিল। চারি দিক তখনও বেশ অন্ধকার—সকাল ভাল করিয়া হয় নাই। রাত্রে বনমালীর ভাল ঘুম হয় নাই তাই আর মিছামিছি ঘুমাইবার চেষ্টা না করিয়া বাঁশীটা লইয়া বাহিরে আসিয়া বসিল—

সামনে কেবল জঙ্গল। চরের উপর কতদিনকার গাছপালা নদীর জল পাইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে ঠিকানা নাই। কত ভয়ানক জীবজন্তু উহার ভিতর আছে কে জানে। ঘনসন্নিবিষ্ট ডালপালায় দৃষ্টি যায় না। এক-একবার হাওয়া আসে, সারা বনস্থলীতে একটা থম্ থম্ আলোড়ন হয়।

বনমালী বাঁশী লইয়া বাজাইতে লাগিল।

সুরে আরম্ভ হইয়া উঠিতে পড়িতে কোমল রেখাব কোমল গান্ধার ছুঁইয়া ছুঁইয়া ভৈরবী উপরে চড়িতে লাগিল। কোমল ধৈবতে দাঁড়াইয়া হেলিতে দুলিতে কোমল নিখাদ ছুঁইল—তার পর কত পথে সুর চলিল। অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী একটি পাহাড়ী মেয়ে কোমরে কলসী লইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া পাহাড়ী পথে ঘুরিতে ফিরিতে সোজা ও নীচু হইয়া গ্রামে চলিয়াছে। তাহারই চলিয়া যাওয়ার ছন্দ—তাহারই বিরহবিধুর অন্তরের দ্বন্দ্ব—তাহার গতিভঙ্গীর সরস ব্যঞ্জনা লইয়া বাঁশীর গান বাজিয়া চলিল। সুরের শরজালে আকাশের আবহাওয়া আচ্ছন্ন হইয়া চলিল। নিবিড় অনুভূতি লইয়া বাতাস চুপ করিয়া কান পাতিয়া আছে—জলের তরঙ্গ যেন নিশ্চল হইয়া গিয়াছে—আকাশ মাটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

নৌকার ভিতর সুষমা ঘুমাইতেছিল—কখন বাঁশীর শব্দে জাগিয়া উঠিয়া পাশে আসিয়া বসিয়াছে। মাঝিরাও ঘুম হইতে উঠিয়া বসিয়াছে। পৃথিবীর জড় জীব সমস্ত যেন সুরের মন্ত্রে অবশ হইয়া আছে। জলের মৃদু-স্রোতের উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে সুর চলিল। সেই ভোর-বেলা সমস্ত বনস্থলী যেন সুরের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, সুরের ঢেউ ভাসিতে ভাসিতে দূরে অনেক দূরে কোন গ্রামান্তের কোন তীরে, কোন গৃহকোণে কোন বিরহীর বক্ষে কাঁদিয়া কুটিকুটি হইতে লাগিল। সীমা নাই—শ্রান্তি নাই—নূতন নূতন বেদনা-সম্ভার লইয়া সেই ভরা-বুক নদীর দুই কিনার ভাসাইয়া দুই কূল ছাপিয়া সুরের জোয়ার ছুটিল। এ সুরে যেন নেশা আছে—এ যেন মানুষকে বড় দুর্ব্বল করিয়া দেয়। তখন সব ভুলিতে হয়—এই পৃথিবীর শ্রান্তি ক্লান্তি ব্যর্থতা নীচতা দৈন্য—সব সেই বাঁশীর সুরে মিলাইয়া যায়, সুরের মোহিনী মায়ায় অতিবড় দুর্দ্ধর্ষ জন্তুও কেমন নিজের অজ্ঞাতে মাথা নীচু করে, এ বাঁশীর কাছে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে জীবন ধন্য হয়। সেদিন সেই নদীপারের চরের উপর বাঁশী এক অপূর্ব্ব কান্না কাঁদিতে লাগিল...

সকলেই চুপ,—হঠাৎ সুষমার কি হইল কে বলিবে—একটা পা নৌকা হইতে জলের উপর ঝুলাইয়া দিল।... আরাম করিয়া বসিবার জন্য হয়ত।...

কিন্তু পা ঝুলাইবার সঙ্গে সঙ্গে সুষমা 'মা গো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে।

বাঁশী ফেলিয়া রাখিয়া বনমালী সুষমাকে ধরিতে গেল—সুষমাকে ধরিল—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই দেখা গেল একটা সাপ কিল্‌বিল করিতে করিতে চরের উপর দিকে চলিয়া গেল।

অভাবনীয় কাণ্ড!

বেদনায় চীৎকার করিতে করিতে সুষমা নৌকার উপর

ছটফট্ করিতে লাগিল। খুব বিষাক্ত সাপ নিশ্চয়ই—অন্ধকারে যতটা দেখা যায় সাপের চেহারা দেখিয়াই বনমালী তাহা বুঝিতে পারিয়াছে!

ক্ষতস্থানের ঠিক উপরেই বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল—কিন্তু হইলে কি হয়—সারা শরীর ক্রমে নীল হইয়া আসিতে লাগিল। চোখের দৃষ্টি ঘোলা হইতেছে; সে কী যন্ত্রণা-কাতর চীৎকার—অত যে লাজুক মেয়ে সে-ও গলা ছাড়িয়া আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া চেঁচাইতেছে। দেখিতে দেখিতে ক্রমে এক ঘণ্টার মধ্যেই সব যেন ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে লাগিল—বনমালীর চোখের সামনে তাহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া সুষমা মরিতে চলিল…

তার পর সেই নৌকা করিয়াই যত শীঘ্র পারা যায় কাছাকাছি কোন গ্রামে তাহাকে আনা হইল—বাঁচাইবার চেষ্টা যথাসাধ্য হইল—কোথায় ডাক্তার কোথায় বদ্যি—ওই যে অনেক দূরে একটা কালো জঙ্গল মতন দেখিতেছ,—ওইখানে শ্মশানে তাহাকে পোড়াইয়া বনমালী একলা নৌকা করিয়া ফিরিয়াছিল…

গল্প শেষ করিয়া বনমালী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আশা এতক্ষণ তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। বনমালী থামিতেই বলিল—তার পর?…বাঁশী বাজান সেই দিন থেকেই ছেড়ে দিলে?

—সেদিন থেকে নয়—তার পরদিন থেকে—সুষমা মারা যাবার পর একদিন শুধু বাজিয়েছিলাম, তার পরদিন সন্ধ্যেবেলা—

আশা ছেলেমানুষের মত কাছে ঘেঁষিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন—সেদিন কি ছিল?…

—তবে শোন—

সব কাজ শেষ হইয়াছে—ভোরবেলা শ্মশান হইতে ফিরিয়া বনমালী বাড়ি ফিরিয়া যাইবে। সমস্ত ঠিক বন্দোবস্ত হইয়া আছে। এমন সময় মাঝি আসিয়া বনমালীকে তাহার বাঁশীটি ফিরাইয়া দিয়া গেল। বনমালী ভুলিয়া আগের দিন নৌকার উপরেই ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। যাক্, বাঁশীটি হাতে আসিতেই বনমালী ঠিক করিল আবার একবার সেই চরে যাইতে হইবে।

দু-জন মাঝি ছাড়া আরও দু-জন লোক চলিল লাঠি-শড়কি লইয়া। বিকালবেলা আবার সেই চরে গিয়া তাহারা পৌঁছিয়াছে। আগের দিনের মত ঠিক সেই জায়গায় নৌকা বাঁধা হইল। সন্ধ্যা আরম্ভ হইয়াছে কি হয় নাই—এমন সময়ে সেই দুটি লোককে লইয়া বনমালী চরে নামিল।

একটু ঝোপ-জঙ্গলময় অথচ ফাঁকা জায়গা বাছিয়া লইয়া বনমালী বাঁশী-হাতে সেখানে বসিল। দুটি লোক, তাহারাও বনমালীর দু-পাশে দু-জন বসিয়াছে! বাঁশীর সুরে সেই সাপকে ডাকিয়া আনিয়া লাঠি দিয়া ঠেঙাইয়া হত্যা করা হইবে! যে সাপ সুষমাকে কামড়াইয়াছে তাহাকে আর পৃথিবীতে বাঁচিতে দেওয়া উচিত নয়। তাহার নিকাশ করিয়া তবে বনমালীর অন্য কাজ। আবার বাঁশী বাজিতে লাগিল।

তেমনি সুরের মূর্চ্ছনায় মীড়ে তানে অপরূপ হইয়া বনস্থলী সচকিত হইয়া উঠিল। বনমালীর বুকে যত বেদনা যত কান্না আছে সব বাঁশীর ফুটাতে নিঃশেষে ঢালিয়া দিল। হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত কে যেন বড় নিষ্করুণ ভাবে মোচড় দিতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার যেন ধরণীর মাঝপথে আসিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। কেহ আসিতেছে না। তাহার পাশের দুটি লোক দু-জোড়া সন্ধানী চক্ষু দিয়া আশে পাশে নজর দিতে লাগিল—কেহ ত আসিতেছে না। অন্ধকার তখনও তরল। সুর বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে। বনমালী মরীয়া হইয়া উঠিল—তাহার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া একমনে বাঁশী বাজাইয়া চলিল। বাঁশী বাজিতেছে—এখনই বুঝি আকাশ গলিয়া পড়িবে—নদীর জল সমস্ত বুঝি এখনই চর ভাসাইয়া লইয়া যাইবে—আরও—আরও করুণ করিয়া বনমালীর বাঁশী কাঁদিয়া চলিল—

তিন জনেই দেখিল—ফল ফলিয়াছে…

সাপ আসিতেছে; বনমালীর মনে হইল যেন ঠিক সেই সাপটাই! আসিতেছে—আসিতেছে—আসিয়া পড়িল—; কিছু দূরে আসিয়া সাপ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। স্থির নিশ্চল মূর্ত্তির মত—কেবল সুরের তালে তালে যেন একটু মাথা দোলাইতেছে; উহার চোখে ঘোর লাগিয়াছে—সুরের নেশা উহাকে পাগল করিয়াছে…

লোক দুটি ইঙ্গিতে পরস্পরে একসঙ্গে তৈরি হইতেছিল। আর এমন সুযোগ নষ্ট করা উচিত নয়, লাঠি হাতে লইয়া ঠিক হইতে যাইবে—এমন সময় বনমালী দেখিল সাপ একটি

নয় দুটি। একজোড়া! দম্পতি উহারা! পাশাপাশি এ উহার গায়ে হেলান দিয়া রহিয়াছে। লোক দুটিও দেখিল—একটি সাপ নয় দুটি! মারিতে হইলে দুটিকে একসঙ্গেই শেষ করিতে হইবে! লোক দুটি পুনর্ব্বার প্রস্তুত হইয়া উঠিতে উদ্যত হইয়াছে···

হঠাৎ বনমালী তাহাদের ইঙ্গিতে বসিতে বলিল।

বনমালী বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে আস্তে আস্তে পিছনে হটিতে লাগিল। লোকদুটিও সঙ্গে সঙ্গে পিছাইয়া আসিতে লাগিল। তার পর নৌকার কাছে আসিতেই বনমালী নৌকার উপর লাফাইয়া উঠিয়াছে; লোকদুটিও উঠিল। নৌকাতে উঠিয়া দেখা গেল—বহুদূরে সাপদুটি বনের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।···নৌকা ছাড়িয়া দিল।···

নৌকায় উঠিয়া বনমালী একটাও কথা বলে নাই। চুপ করিয়া গলুইয়ের কাছে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল!···

লোক দুটি বনমালীর অসঙ্গত আচরণ বুঝিতে পারে নাই। কাছে আসিয়া বলিল—কি হ'ল বাবু—মারলেন না যে?

বনমালী বলিল—ওদের কি মারতে আছে? এক জোড়া এসেছিল—ওরা যে স্বামী-স্ত্রী—

সত্য-সত্যই প্রাণ গেলেও উহাদের বনমালী কখনও মারিতে পারিত না! একটা যদি আসিত তবে হয়ত মারা সহজ ছিল। কিন্তু এক জোড়া—স্বামী-স্ত্রী উহারা—জন্তু হউক আর যাহাই হউক—উহাদের মারা বড় নিষ্ঠুর কাজ! কবে এক ব্যাধ কোন এক পক্ষী-মিথুন মারিয়া ঋষির শাপে ত সারা জীবন ভবঘুরে হইয়া বেড়াইল—ঘর পরিবার নীড় রচিবার অধিকার তাহার জীবনে হইল না—: শেষে কি বনমালীও তেমনই অভিশাপ কুড়াইবে! উহারা দু-জনে সুখে থাকুক—মনুষ্য-বিবর্জ্জিত দেশে উহারা স্বাধীন চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াক—মানুষ কেন উহাদের দেশে আসিয়া অনধিকারপ্রবেশ করিবে! মানুষেরই অন্যায়—

গল্প শেষ করিয়া বনমালী চুপ করিল।

আশা বলিল—তার পর?

—তার পর বাঁশীটা নিয়ে অনেক দূর নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম; সেই থেকে বাঁশী আর ছুঁই নে—ও সর্ব্বনেশে বাঁশী আর বাজাই নে!···

ইহার পর আশা আর বনমালী দু-জনেই খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে। জলের স্রোত প্রায় স্থির হইয়া আসে-আসে। আর ঘণ্টা-দুই পরেই জোয়ার আসিবে। আকাশের গায়ে শুক্লা-একাদশী চাঁদ সারা নদীটিকে রূপালী পাতে মুড়িয়া দিয়াছে; থমথমে আবহাওয়া; মাঝিরা গল্প করিতেছে আস্তে আস্তে। এধারে আশার একান্ত কাছাকাছি বসিয়া আছে বনমালী! কাছাকাছি বসিয়া আছে বটে, কিন্তু মন তাহার চার বছরের উজান ঠেলিয়া বহুদূর পশ্চাতে চলিয়া আসিয়াছে!··· লোকান্তরের প্রান্তসীমায় একটি চঞ্চলা প্রীতিমতী মুখ স্মরণ করিয়া বনমালীর বুকখানা ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। তবু আজ সে সুষমাকে ভুলিতে বসিয়াছে—আশা আসিবার পর হইতে সুষমাকে তাহার খুব কমই মনে পড়ে···

আশা হঠাৎ কথা বলিল—আচ্ছা, দিদি তোমাকে খুব ভালবাসত, না?

বনমালী কি উত্তর দিত কে জানে!

হঠাৎ ওধার হইতে এক জন মাঝি সুর করিয়া গান ধরিল। আগেকার সেই গানটি! কোন্ বিরহী যেন বলিতেছে—ও গো রঙ্গিলা নায়ের মাঝি, তুমি ত কত দরিয়া পাড়ি দাও—তুমি কি আমার বন্ধুর খবর রাখ? যদি তাহার দেখা পাও ত বলিও—আমি তাহার পথের দিকে চাহিয়া এখনও বসিয়া আছি—তাহাকে আমি ভুলিতে পারি নাই—আর বলিও, তাহার জন্য আমি সারা জীবন এমনই বসিয়া থাকিব।···

গান শুনিতে শুনিতে হঠাৎ বনমালী মনে মনে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; মিথ্যা কথা! সমস্ত মিথ্যা! কেহ কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না!···কেহ কাহাকে চিরকাল মনে রাখে না! সবাই ভুলিয়া যায়।...ভুলিয়া যায় সবাই—চোখের আড়াল হইলেই সব ভালবাসা সব প্রেম ধূলিসাৎ হইয়া যায়। সুষমা যাইবার পর আশা আসিয়াছে—আশা চলিয়া গেলে আর এক জন আসিবে! বিরহ মিথ্যা—প্রেম মিথ্যা—সব মিথ্যা—কেহ কাহারও নয়—সবাই একক—

অননুভূত এক বিচ্ছেদ-বেদনা আসিয়া কখন অজ্ঞাতসারে বনমালীর মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

ভারতের লিপিসমস্যা

অধ্যাপক শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী, এম-এ

ভারতবর্ষের নানা সমস্যার মধ্যে ভাষা ও লিপিসমস্যা একটি প্রধান, কেননা, আমাদের দেশে জাতি ও ধর্ম্মের বৈচিত্র্য যেমন, ভাষা ও লিপির বিভিন্নতা তা থেকে কিছু কম নয়। কাশ্মীর থেকে কুমারিকা এক কৃষ্টির অন্তর্গত হ'লেও এই ভূমিখণ্ডে প্রায় ১৬০টি মূলভাষা ও ৬০০টি উপভাষা বা dialects আছে। লিপিসম্বন্ধেও এই বৈচিত্র্য কতকটা পাওয়া যায়, যদিও প্রধানতঃ লিপির দুটি ধারা এখন প্রচলিত—একটি, দেশীয়, দেবনাগরী, ও অন্যটি বিদেশীয়, আরবীসম্ভূত ফার্সীলিপি। ভাষার ইতিহাসে যেমন, আমাদের দেশীয় লিপিমালার ইতিহাসেও তেমনি দেখা যায় যে এক মূল লিপি থেকে ক্রমাগত পরবর্ত্তিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের লিপির উদ্ভব হয়েছে, যথা, দেবনাগরী থেকে উদ্ভূত হয়েছে হিন্দী, মারাঠি, গুজরাতী, গুরুমুখী, কায়েথী, মৈথিল, বাংলা, উড়িয়া ইত্যাদি, এবং দেবনাগরী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে তামিল, তেলুগু, সিংহলী প্রভৃতি লিপি। কিন্তু এই সকল লিপিপ্রণালী মূলতঃ এক পরিবারের হ'লেও এই পরিবর্ত্তনের ফলে তারা পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত হয়ে পড়েছে। এই ভাবে ভাষা-বৈচিত্র্যের ন্যায় লিপি-বৈচিত্র্যও ভারতবর্ষে এক মহা সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং নানা ভাবে ভারতের জাতীয়তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

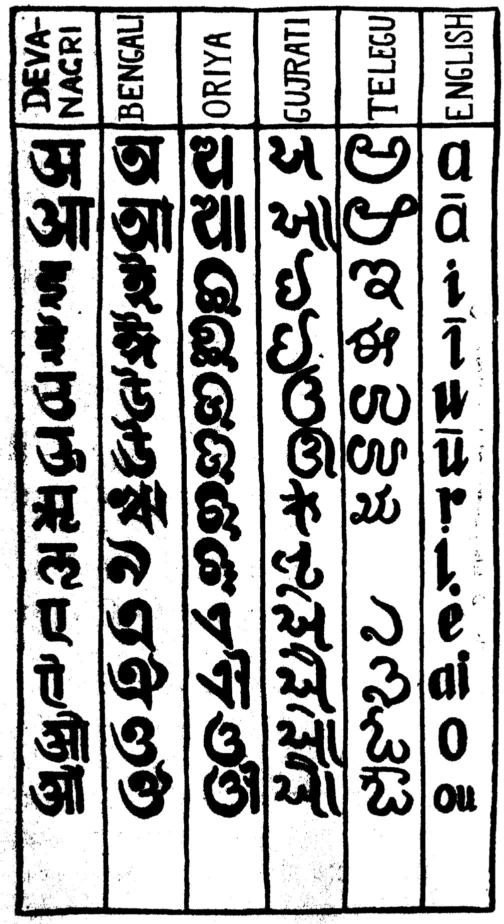
লিপিপ্রণালীগুলির নানা পরিবর্ত্তন সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে একটি কথা সুস্পষ্ট হয় যে ভাষা ও লিপির পরস্পরের সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠ বা স্বাভাবিক যোগ নেই। একই ভাষা নানা লিপিতে লেখা যেতে পারে, তাতে মূল বস্তুর ভাব বা চিন্তার কোন পরিবর্ত্তন বা বিকৃতি ঘটে না, কারণ ভাষার প্রাণ "ধ্বনি," অক্ষর বা লিপি নয়। এক একটি ধ্বনিসমষ্টি বা "শব্দে"র (word) সঙ্গে আমাদের চিন্তা বা ভাব গ্রথিত, কিন্তু লিপির সঙ্গে ভাব বা চিন্তার কোনও অচ্ছেদ্য যোগ নেই, কেননা, লিপি ধ্বনির প্রতীক (symbol) মাত্র, তার নিজের কোন বৈশিষ্ট্য নেই, কেবল "ধ্বনি"কে দৃশ্যতঃ প্রকাশ করাই তার কাজ। এইজন্য একই ভাষা নানা লিপিতে স্বচ্ছন্দে লেখা যেতে পারে এবং লেখা হয়েও থাকে।

সকল দেশের লিপিপ্রণালী সম্বন্ধেই এ-কথা খাটে, যদিও সকল লিপিপ্রণালীর প্রকৃতি কিছু এক নয়। এক-এক প্রণালীর এক-একটি বিশেষত্ব আছে, কেননা, সরলরেখা, বক্ররেখা ও বিন্দুর নানা সমাবেশ ও আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের উপর লিপির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। এই সকলের আধিক্যে কোন অক্ষরমালা নিতান্ত জটিল ও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, আবার এদের সংযত ব্যবহারে কোনটি বা সরল ও সহজ হয়েছে। নানা দেশের লিপিমালা তুলনা ক'রে দেখলেই লিপি বা অক্ষরের সাধারণ প্রকৃতি, বিভিন্ন প্রকার লিপিমালার গুণাগুণ বা সুবিধা-অসুবিধা সহজেই বিচার করা যায়, এদের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ ও কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট, কিংবা লিখন ও মুদ্রণ বিষয়ে কোন্‌টি আদর্শস্থানীয় তা নির্ণয় করা যায়। অবশ্য পক্ষপাতশূন্য হয়ে বিচার করা প্রয়োজন, নইলে নিজের নিজের লিপিমালাই প্রত্যেকের কাছে ভাল, সহজ ও সুবিধাজনক ব'লে মনে হবে।

কিন্তু আদর্শলিপির (ideal script) লক্ষণ কি কি? প্রথমেই বলা যেতে পারে যে, এই লিপির প্রত্যেকটি অক্ষরের রেখাচয় যথাসম্ভব আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনবর্জ্জিত হবে অর্থাৎ অক্ষরগুলি স্পষ্ট ও জটিলতাহীন হবে, যাতে সহজে তাদের পরিচয় পাওয়া যায় ও সহজে লেখা যায়। এই গুণটি লিপি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান। ধ্বনিকে প্রকাশ করাই যখন অক্ষরের কাজ, তখন অক্ষর ইচ্ছামত সহজ বা জটিল করা যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে অক্ষরকে অনর্থক জটিল করাতে কোন গৌরব বা কৃতিত্ব নেই। দ্বিতীয় কথা, আদর্শ লিপির অক্ষরগুলি অগ্রগতিশীল হবে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি অক্ষরের অন্ত্যরেখাপাত বা শেষ-

রেখার গতি সম্মুখগামী হওয়া উচিত, কেননা, তাহ'লে লেখনী একটি অক্ষর থেকে অন্য অক্ষরে সহজে অগ্রসর হ'তে পারে। যদি অক্ষরগুলির শেষ-রেখার গতি সম্মুখের দিকে না হয়ে পশ্চাতে, নীচে বা উপরে হয়, তবে প্রতি

লিপিচিত্র



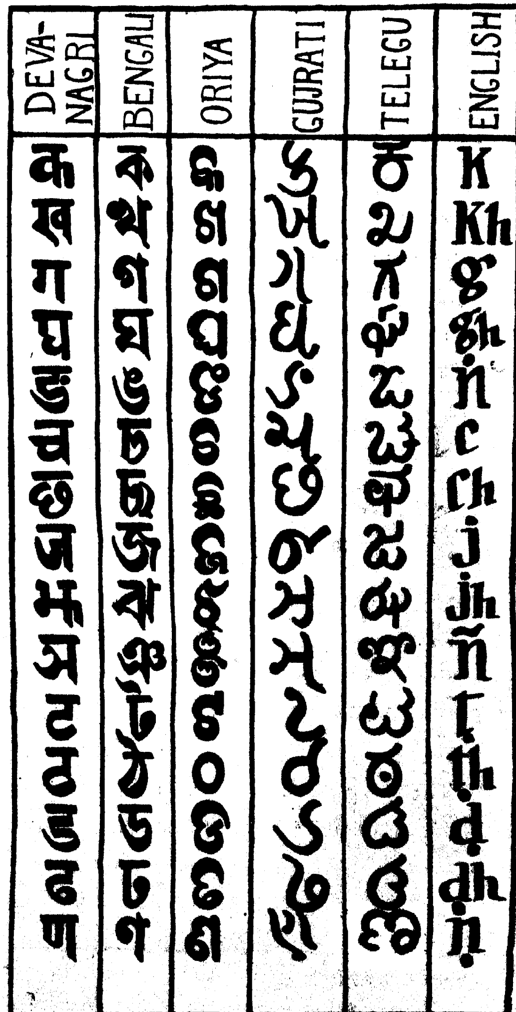
দেবনাগরী বাংলা উড়িয়া গুজরাতী তেলুগু ইংরেজী

পদে লেখা বাধা পাবে এবং যত সামান্য ভাবেই হোক না কেন লেখার অগ্রগতি ক্ষুণ্ন হবে। তৃতীয়তঃ, আদর্শলিপির অক্ষরগুলি এমন ভাবে গঠিত হবে যে, প্রত্যেক অক্ষরের শেষরেখা পরের অক্ষরের প্রথম রেখাপাতের সঙ্গে সহজে ও বিনা জটিলতায় যুক্ত হ'তে পারবে, অর্থাৎ লেখার ক্রমের অবাধ গতি থাকবে অথচ পাঠে কোন বিঘ্ন হবে না। এ গুণ না থাকলে লেখনী দ্রুত অগ্রসর হতে পারে না এবং এক অক্ষর থেকে অন্য অক্ষরে সহজে যাওয়া যায় না। চতুর্থ কথা, আদর্শলিপিতে এক-একটি অক্ষর লিখতে লেখনী বার-বার উঠাতে হবে না, অথবা এক-একটি ধ্বনিসমষ্টি বা wordএর মাঝখানে লেখনী তুলিবার প্রয়োজন হবে না। লেখনী বার-বার উঠান দরকার হয়ে পড়লে অলক্ষ্যে হাতের বৃথা পরিশ্রম বাড়ে, কেননা, যতবার আমাদের লেখনী উঠাবার প্রয়োজন হয় ততবারই হাতের কিছু কিছু ক'রে পরিশ্রম হয় এবং লেখনী বাধা পায়। প্রথমে ব্যাপারটি সামান্য মনে হ'তে পারে, কিন্তু লেখার সময়ে মনোযোগ করলে এ-কথার যাথার্থ্য সহজে উপলব্ধি করা যায়। শেষ কথা, প্রত্যেকটি অক্ষর অল্প পরিসরে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। মুদ্রাযন্ত্র-ব্যবসায়ীরা জানেন যে সকল ভাষার অক্ষর সমান ছোট মাপের হয় না; কোন কোন লিপির অক্ষর খুব ছোট মাপের ব্যবহার করা যায়, কিন্তু অন্যগুলির অক্ষর অত ছোট মাপের ব্যবহার করা চলে না, কেননা, অক্ষরগুলি স্পষ্ট হয় না এবং পাঠে অসুবিধা হয়। এই সকল গুণ যে-লিপিতে পাওয়া যাবে তাকে আদর্শলিপি বলা যেতে পারে।

এখন আদর্শলিপির লক্ষণানুসারে দেবনাগরী ও তদ্‌সম্ভূত লিপিগুলির বিচার সাধারণ ভাবে করা যাক। এই প্রবন্ধের লিপি-চিত্রখানিতে দেবনাগরীসম্ভূত কয়েকটি লিপিমালার গঠন তুলনার জন্য দেওয়া গেল এবং এ-থেকেই বক্তব্য বিষয়ের দৃষ্টান্ত সহজেই পাওয়া যাবে; অন্যান্য দৃষ্টান্ত আমরা বাংলা লিপি থেকেই গ্রহণ করিব। প্রথমতঃ অসংযুক্ত অক্ষর—দেবনাগরী ও তার বংশজাত লিপিগুলির অসংযুক্ত অক্ষরগুলিকে জটিলতাহীন একেবারেই বলা যেতে পারে না; অনেক স্থলেই সরল ও বক্ররেখার প্রাচুর্য্যে এবং আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনে অক্ষরগুলি জটিল হয়ে পড়েছে এবং তার জন্যে সহজপাঠ্য না হয়ে এদের বর্ণপরিচয়-চেষ্টাও সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়েছে। মনে হয়, দেবনাগরী থেকে লিপিপ্রণালী যত দূরে গিয়েছে অক্ষরগুলি ক্রমশঃ তত বেশী জটিল হয়ে উঠেছে, যেমন, উড়িয়া,

তামিল, তেলুগু ইত্যাদি ; কোন কোন অক্ষর ত খুবই জটিল, যেমন, দেবনাগরী, বাংলা, উড়িয়া প্রভৃতির ঈ, ঔ, ছ, ঞ, ইত্যাদি। লিপি-চিত্রখানি মনোযোগ দিয়ে দেখলেই একথা কতটা সত্য তা বুঝতে পারা যাবে। তার পর এ অক্ষরগুলি অগ্রগতিশীল বা সম্মুখগামী নয়, কেননা, এক-একটি অক্ষর নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলেই বুঝা যাবে যে, এক-একটি বর্ণ লিখতে কতবার লেখনী তুলতে হয় এবং তার শেষ রেখাপাত কখনও ঊর্দ্ধে, কখনও অধোতে, কখনও বা পশ্চাতে চলেছে ; এই কারণে লেখার গতি পদে পদে বাধা পায়। আবার অনেক অক্ষরের রেখা-পরম্পরায় ক্রমগতি নেই, প্রত্যেকটি অক্ষর যেন ব্যক্তিত্বপ্রধান, কেহই প্রায় অন্যটির সঙ্গে সহজে মিলিত হ'তে চায় না এবং মিলিত করবার চেষ্টা করলেই পড়া অনেক সময়ে কঠিন হয়ে পড়ে। এ-বিষয়ে মনে হয় আমাদের দেশীয় বর্ণমালাগুলি জাতির বিশেষত্বব্যঞ্জক, কেননা, আমাদের অক্ষরগুলি প্রধানতঃ পার্থক্যপ্রধান ; আমরা যেমন কেহ কারও সঙ্গে মিলতে পারি না, মিলে কোন কাজ করতে পারি না, তেমনি আমাদের অক্ষরগুলিও কেহ কাহারও সঙ্গে সহজভাবে যুক্ত হ'তে পারে না। এই ত্রুটির ফলে লেখনী বার-বার উঠাতে হয় ; এমন কি কোন কোন অক্ষর আছে যা এক ধারায় বা "টানে" লেখা যায় না এবং সেই জন্যে অনর্থক অধিক পরিশ্রম হয়। আমাদের বাংলা কথাগুলি লিখতে আমরা কতবার লেখনী উঠাতে বাধ্য হই যদি পরীক্ষা করে দেখা যায় তবে এই অসুবিধার বিষয়ে কোন মত-দ্বৈধ হ'তে পারে না। একখানি চিঠিতে "শ্রদ্ধাস্পদাসু" লিখতে ছয় বার এবং আর একখানিতে "অনুগ্রহপূর্ব্বক" লিখতে তের বার লেখনী উঠাবার প্রয়োজন হয়েছে দেখা গিয়েছে। যদি একটানে এ কথাগুলি লেখা যায় তা হ'লে যে লিখন অনেক সহজ হয়ে যায় সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। শেষ কথা, আমাদের অক্ষরগুলি অপেক্ষাকৃত জটিল হওয়ায় অল্প পরিসরে লিখন বা মুদ্রণ কঠিন হয়ে পড়ে ; প্রকৃতপক্ষে তা সম্ভব হয় না।

এই ত গেল অসংযুক্ত অক্ষরের কথা। সংযুক্ত অক্ষরগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, অসংযুক্ত অক্ষরের যে-সব দোষ বা ত্রুটি উল্লেখ করা হয়েছে সেই সমস্ত অগুণ আরও নিবিড় ভাবে সংযুক্ত অক্ষরগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। এগুলি আরও অধিক জটিল, অগ্রগতি-হীন, পার্থক্যপ্রধান, লেখনীর বাধা উৎপাদক। উপরন্তু



দেবনাগরী বাংলা উড়িয়া গুজরাটী তেলুগু ইংরেজী

দুটি, তিনটি এবং সময়ে সময়ে চারটি অক্ষর যুক্ত হয়ে একে অন্যের স্কন্ধে আরোহণ করে এবং যত রকমে পারে

লেখনীকে বাধা দান করে। কেবল তাই নয়, এক-এক সময়ে অক্ষরগুলি হঠাৎ বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হয়ে এমন ভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায় যে তাদের আর পৃথক ভাবে চেনা যায় না। রসায়নে যেমন "হাইড্রোজেন" এবং "অক্সিজেন" মিলিয়ে দিলে 'জল' উৎপন্ন হয়, কিন্তু চর্ম্মচক্ষে ঐ উপাদানগুলিকে আর দেখা যায় না, তেমনি আমাদের বর্ণমালায় কোন এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় দুটি বা তিনটি অক্ষর মিলে এমন একটি নূতন অক্ষর উৎপন্ন হয় যে তাতে মূল অক্ষরগুলির পরিচয় আর চর্ম্মচক্ষে পাওয়া যায় না। বাংলা লিপিতে তার অনেক উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে, যেমন, ক+ত=ক্ত; ক+র=ক্র; জ+ঞ=জ্ঞ; হ+ম=হ্ম; ক+ষ=ক্ষ; ন+ত+উ=ন্তু। আবার একই অক্ষর অন্য অন্য অক্ষরের সঙ্গে মিলিত হয়ে নানা রূপ ধারণ করে, যেমন, ষ+ণ=ষ্ণ; হ+ণ=হ্ণ। কোন কোন স্বরবর্ণের সময় অবস্থাটা আরও বিস্ময়কর হয়ে দাঁড়ায়, দৃষ্টান্তস্থলে "উ" যখন অন্য অক্ষরের সঙ্গে মিলিত হয় তখন চারটি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে—কু, রু, শু, হু। এই রূপান্তরের আবার নির্দিষ্ট কোন নিয়ম পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে দেখা যায় যে এক বাংলা লিপিতেই প্রায় ৫৫০টি পৃথক পৃথক অক্ষর সম্ভব এবং মুদ্রণে অতগুলি অক্ষর বা টাইপের প্রয়োজন হয়। এই অক্ষরবিভ্রাটে মুদ্রণ যে কত কঠিন ও জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তা ১৩৩৯ সনের পৌষ-মাঘ ও চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে "বাঙ্গালা টাইপ ও কেস" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়লেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হবে। এই অক্ষরবাহুল্যের বিড়ম্বনা যে কেবল বাংলা লিপিতেই আছে তা নয়, দেবনাগরীসম্ভূত সমস্ত লিপিতেই এটা পাওয়া যায় এবং যদি এই অনুপাতে অক্ষরের সংখ্যা নির্ণয় করা হয় তবে দেখা যাবে যে কেবল দেবনাগরীসম্ভূত ভাষাগুলিতেই প্রায় চার বা পাঁচ হাজার অক্ষর (type) লেখায় এবং মুদ্রণে ব্যবহৃত হয়।

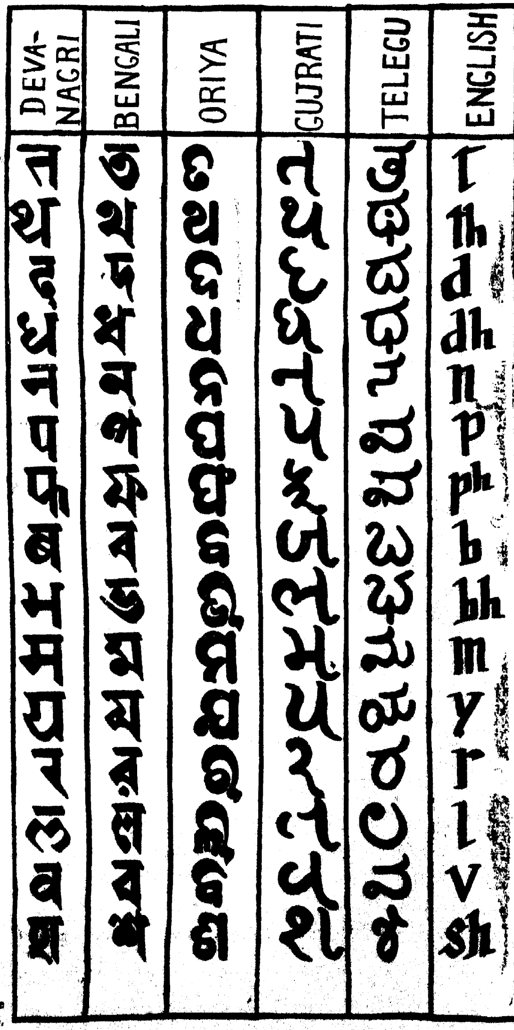
সহজেই এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'তে পারি যে দেবনাগরী বা দেবনাগরীসম্ভূত কোনও লিপিই আদর্শলিপি বলে গ্রাহ্য হ'তে পারে না, কেননা, আদর্শ-লিপির যে-সকল লক্ষণ বা গুণ থাকা উচিত এগুলিতে তা নেই। এ-কথা যদি সত্য হয়, তবে যদি কোন আদর্শলিপি পাওয়া যায় আমরা তা গ্রহণ করব না কেন, এবং সেটা গ্রহণ করা যদি উচিত মনে করি তবে ভারতের সকল ভাষা ও উপভাষা এই আদর্শলিপি গ্রহণ করবে না কেন?

এ-পর্য্যন্ত যা বলা হয়েছে তাতে এ দেশের লিপির অক্ষর-পরিচয় কত কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়; আমাদের দেশের প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে অন্ততঃ পক্ষে এই প্রায় ৫৫০টি অক্ষর পৃথক পৃথক ক'রে শিখিতে হয় এবং বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় স্তরের জটিল ও বহুরূপী বর্ণমালার ভীষণ অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তা ছাড়া এই লিপি-বিভ্রাটের আর একটি দিক ভাববার আছে। ভারতের প্রত্যেক ভাষা ও উপভাষার লিপিপ্রণালী ক্রমশঃ এত পৃথক হয়ে পড়েছে যে ভাষার সাদৃশ্য সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রদেশের লোক পরস্পরের নিকট অপরিচিত ও বিদেশী ব'লে গণ্য হচ্ছে। এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের লিখিত ভাষা শিক্ষা করতে গেলেই তাকে এই অসংযুক্ত এবং সংযুক্তাক্ষরের বিরাট বাহিনীর সম্মুখীন হ'তে হয়; একে জয় না-করতে পারলে তার পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। কাজেই নিতান্ত দায়ে না পড়লে কেহ অন্য প্রদেশের ভাষা বা সাহিত্যের সহিত পরিচিত হ'তে প্রবৃত্ত হয় না। এই কারণে নানা প্রকারের "অক্ষর" ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও জাতির মধ্যে একটা প্রাচীর বা কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। বিশেষতঃ উত্তর-ভারতে আমরা সকলেই মূলতঃ একই ভাষা বলি, অনেক সময়ে পরস্পরের কথিত ভাষা বুঝতে পারি, কিন্তু সেই কথাগুলিই লিখিত হ'লে আর বুঝতে পারি না। এক প্রদেশের সাহিত্য বা সংবাদপত্র বা পত্রিকা অন্য প্রদেশ বুঝতে পারে না, ভাবের বা আদর্শের আদান-প্রদান হয় না, জ্ঞানপ্রসারে বাধা হয়। ফলে যদিও আমরা সকলে নিজেদের ভারতীয় বলি তবু আমরা নিজেদের এক জাতি ব'লে অনুভব করতে পারি না, সকল বিষয়ে নিজেদের পৃথক ব'লে মনে করি, অথচ অধিকাংশ সময়ে পরস্পরের কথিত ভাষা বুঝতে পারি। একই বিষয়, একই বিদ্যা, একই জ্ঞান আমাদের প্রত্যেক পৃথক লিপিতে

পুনরাবৃত্তি করা না হ'লে সকল প্রদেশের লোকের তা জানবার উপায় নেই। এই মহা বিভ্রাটের মূলে প্রধানতঃ লিপিগত পার্থক্য এবং এই পার্থক্য আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে কত হানিকর তা বিশদ ভাবে বুঝাবার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এই নানা লিপিবিভ্রাটের পরিবর্ত্তে যদি আমরা একটি আদর্শলিপিকে সাধারণ লিপি বা Common Script ব'লে গ্রহণ করি তবে দেশের যে কত কল্যাণ হয় তা বলা যায় না। এই সাধারণ লিপিমালা বিশেষ ক'রে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করবে, সহজে পরস্পরকে বুঝবার সুবিধা হবে, বিভিন্ন প্রদেশের ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান, পরস্পরের জ্ঞান ও সকল প্রকারের অভিজ্ঞতা সহজে বিনিময় করা সম্ভব হবে। ইহার ফলে সকল প্রকার সাহিত্যের পুষ্টিলাভ ও চিন্তার প্রসার আশা করা যায়। আবার এক সাধারণ লিপিমালা প্রচলিত হ'লে সকলেরই নিজ নিজ প্রদেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে যাওয়ার চেষ্টা স্বভাবতই হবে, কেননা, লেখকেরা স্বতঃই বুঝতে পারবেন যে তাঁরা কেবল তাদের নিজেদের প্রদেশের জন্তই লিখছেন না, বরং তাঁরা সমস্ত ভারতের জন্তে লিখছেন এবং তাঁদের পাঠক-সম্প্রদায় অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। ভাবের ও আদর্শের ক্ষুদ্রতা দূরে যাবে, এক সাহিত্য থেকে অন্ত সাহিত্যে নূতন আদর্শ বা পরিকল্পনা সহজে প্রসার লাভ করবে। সকল প্রদেশের জীবনে ও আদর্শে এক মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হবে, কেন-না পরস্পরকে বুঝবার ও বুঝাবার চেষ্টা থাকলে সাহিত্যের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সকল প্রদেশের সাহিত্যের ভাষা সহজ ও সরল হবে এবং যে-যে বিষয়ে মিলন ও সাদৃশ্য আছে বা মিলন সম্ভব ক্রমশঃ সে সকলের উৎকর্ষ সাধিত হবে। সুতরাং সকল দিক দিয়ে বিবেচনা করলে একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'তে হয় যে যদি কোন আদর্শ-লিপি পাওয়া যায় তবে এই সকল কারণেও অবিলম্বে আমাদের তাহা ভারতের সাধারণ লিপি ব'লে গ্রহণ করা উচিত।

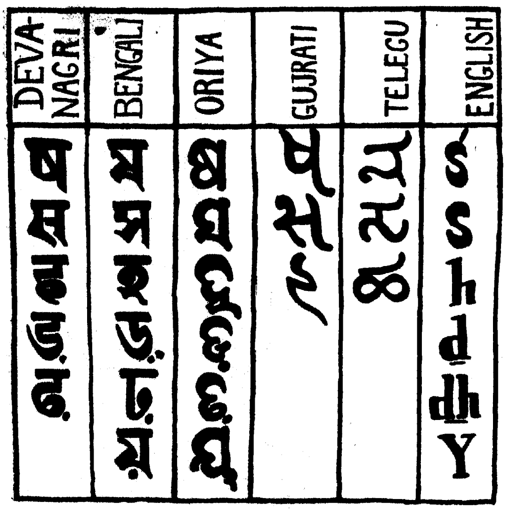
পৃথিবীতে যত প্রকার লিপিপ্রণালী প্রচলিত আছে তার মধ্যে মনে হয় একমাত্র রোম্যান বর্ণমালাকেই—Roman Script—যাকে এদেশে আমরা "ইংরেজী অক্ষর" বলি, আদর্শলিপি বা Ideal Script বলা যায়, কেননা, বিচার ক'রে দেখলে খুব সহজেই প্রমাণিত হবে



দেবনাগরী বাংলা উড়িয়া গুজরাটী তেলুগু ইংরেজী

যে রোম্যান বর্ণমালায় আদর্শলিপির অধিকাংশ লক্ষণই পাওয়া যায়। এই অক্ষরমালা সহজ, স্পষ্ট ও জটিলতাহীন, পরিচয়ে ব্যাঘাত হওয়ার কিছু নেই এবং রেখাপাতের আবর্তন-বিবর্তন যথাসম্ভব কম। অক্ষরগুলির [illegible]

গতি অধিকাংশ সময় সম্মুখগামী, পশ্চাদ্‌মুখীন বা নানাদিগ-প্রসারিত নয়, অর্থাৎ অক্ষরগুলি অগ্রগতিশীল। প্রায় প্রত্যেকটি অক্ষর এক ধারা বা "টানে" লেখা যায় এবং প্রত্যেকটি অক্ষরের অন্ত্যরেখাপাত পরের অক্ষরের প্রথম রেখাপাতের সঙ্গে সহজে মিলিত হয়, সুতরাং অক্ষরগুলি ক্রমগতিশীল, বার-বার লেখনী তুলিতে হয় না, বস্তুতঃ রোম্যান বর্ণমালার আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তটাই এক ধারায় লেখা যায়। পুনশ্চ এতে যুক্তাক্ষরের উৎপাত নেই অথচ যুক্তধ্বনি সহজেই প্রকাশ করা যায়; স্বরবর্ণের "কার" বা ব্যঞ্জনবর্ণের "ফলা"-র উপদ্রব নেই, কেননা, এতে স্বর বা ব্যঞ্জন কোন বর্ণই রূপান্তর গ্রহণ করে না। এই সকল কারণে ছেলেমেয়েরা অনেক সহজে এই বর্ণমালা



দেবনাগরী বাংলা উড়িয়া গুজরাটী তেলুগু ইংরেজী

শিখে ফেলে এবং ইংরেজী কথা অল্প আয়াসে ও অল্প সময়ের মধ্যেই পড়তে ও শিখতে পারে। অনেক অল্প-সংখ্যক টাইপ (type) এতে প্রয়োজন হয়, কেননা, ভারতীয় এক-একটি ভাষার সাড়ে পাঁচ-শ ছ-শ টাইপের পরিবর্ত্তে পঞ্চাশ-বাটটি টাইপে ভারতের সমস্ত ভাষার কাজ সুচারুরূপে চলতে পারে। এক-একটি টাইপ অল্প স্থান অধিকার করে এবং অক্ষরগুলি স্পষ্ট ও জটিলতাবর্জ্জিত ব'লে টাইপ অনেক ছোট পর্য্যন্ত ব্যবহার করা যায়। উপরন্তু চলতি টাইপরাইটারের সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন ক'রে নিলেই তাকে দেশী ভাষায় ব্যবহারোপযোগী ক'রে নেওয়া যেতে পারে। অতএব যে দিক দিয়েই দেখা যাক না কেন রোম্যান বর্ণমালা যে আদর্শলিপির অতি নিকট তাহা অস্বীকার করার উপায় নেই, সুতরাং ভারতবর্ষের সকল লিপিমালার পরিবর্ত্তে এই লিপিই আমাদের গ্রহণ করা বিধেয় ব'লে মনে হয়। ভারতের সব লিপিই যে রোম্যানে প্রকাশিত হ'তে পারে লিপিচিত্রখানিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এ ভিন্ন আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে রোম্যান লিপি ব্যবহারের উপযোগিতা দেখে স্বতঃই মনে হয় যে, এই লিপিই আমাদের গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ। সকলেই জানেন যে বিদেশী লোকদের হিন্দী, উর্দ্দু ইত্যাদি দেশী ভাষা শেখাবার জন্যে অনেক স্থলেই আজকাল রোম্যান অক্ষরমালা ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ভারতের অনেক লিপিহীন পার্ব্বত্য ও অসভ্য জাতিকে তাদের নিজেদের ভাষা রোম্যান বর্ণমালার সাহায্যে শেখান হচ্ছে। আবার সকলে হয়ত জানেন না যে, ভারতীয় সামরিক-বিভাগের সকলেই "হিন্দুস্থানী" ভাষা এবং ঐ ভাষা রোম্যান অক্ষরমালায় পড়া ও লেখা শিখতে বাধ্য। এ আর একটা প্রমাণ যে রোম্যান অক্ষর-মালা আমাদের দেশে বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সহজেই এটা চলতে পারে। আবার এই রোম্যান অক্ষর ভারতীয় সকল জাতি গ্রহণ করলে নাগরী ও আরবী অক্ষরের যে উৎকট দ্বন্দ্ব সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে তার বিবাদভঞ্জন অতি সহজেই হয়ে যায়, কেননা, এ অক্ষরে কাহারও জাতি বা ধর্ম্মজনিত বিদ্বেষগত কোন আপত্তি হওয়ার কথা নয়। উপস্থিত হিন্দুরা বিশুদ্ধ হিন্দীভাষা ও নাগরী বর্ণমালা প্রচার করতে যেমন ব্যগ্র, মুসলমানেরা উর্দ্দু ভাষা ও ফার্সী বর্ণমালা এদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে ততোধিক ব্যস্ত, ফলে কেবল বিবাদ-বিসম্বাদই বেড়ে যাচ্ছে, অথচ দেবনাগরী ও তদ্‌সম্ভূত লিপিগুলিতে যে ত্রুটি-গুলির আলোচনা পূর্ব্বে করা হয়েছে ফার্সীলিপিতে সেই সকল ত্রুটি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, উপরন্তু লেখনী একধারায় প্রায় এক পদও চলিতে পারে না। কিন্তু হিন্দু

ও মুসলমান যদি সকল সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা ক'রে নিজের নিজের সঙ্কীর্ণতা ছেড়ে "হিন্দুস্থানী" ভাষা ও রোম্যান অক্ষরমালা একযোগে গ্রহণ করেন তবেই এই বিশাল দেশের ভাষা ও লিপিসমস্যার একটি সহজ সমাধান হয়।

কি ভাবে ও কি উপায়ে তবে আমরা রোম্যান বর্ণমালা গ্রহণ করতে পারি? এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ প্রস্তাব কিছু নূতন নয়, কেননা, এখনও অনেক ক্ষেত্রে এ-বর্ণমালা ব্যবহার করা হচ্ছে; তাছাড়া অনেক দিন থেকেই প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে রোম্যান বর্ণমালায় এদেশের ভাষা, বিশেষতঃ সংস্কৃত ও পালি, লিখবার প্রণালী প্রচলিত আছে। এই প্রণালীর তাঁরা নাম দিয়াছেন Transliteration, যার পরিভাষা করা যেতে পারে "প্রতিলিখন"। প্রাচ্যবিদ্যা সুগম করার উদ্দেশ্যে পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের বর্ণমালা অবলম্বন ক'রে প্রত্যেকটি স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের ধ্বনি এক বা ততোধিক রোম্যান অক্ষরের সাহায্যে স্থির ক'রে নিয়ে সেই প্রণালীতে সংস্কৃত ও পালিতে লিখিত দর্শন সাহিত্য ইতিহাস ইত্যাদি অনেক পুঁথি ও পুস্তকের প্রতিলিপি রোম্যান অক্ষরে ক'রে নিয়েছেন। এতে যে কত সুবিধা হয়েছে বলা যায় না, কেননা, সভ্যজগতের সমস্ত পণ্ডিতই এখন বিনাক্লেশে ভারতের মূল শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছেন। চলিত প্রতিলিখন তাঁরা যেভাবে স্থির করেছেন তাহা লিপি-চিত্রে দ্রষ্টব্য। এই লিপি-চিত্র থেকে বুঝতে পারা যাবে যে দেবনাগরী বর্ণমালার ক্রম, উচ্চারণ বা ধ্বনি, কোনটারই এখানে ব্যতিক্রম করা হয় নি, আমাদের প্রথাগত জিনিষগুলি সমস্তই রক্ষা করা হয়েছে, কেবল অক্ষরের রূপ পরিবর্তিত করা হয়েছে মাত্র। তবে এ ব্যবস্থাকে একেবারে নিখুঁত বলা হয়ত যাবে না এবং ব্যাপকভাবে রোম্যান বর্ণমালা গ্রহণ করা স্থির হ'লে প্রয়োজনমত কিছু পরিবর্তন ক'রে নিতে হবে।

আর একটি কথা এই সঙ্গে আসে। রোম্যান বর্ণমালায় "বড়" ও "ছোট", অর্থাৎ Capital ও Small অক্ষর ব্যবহারের রীতি আছে, কিন্তু কোন ভারতীয় বর্ণমালায় তা নেই, সুতরাং যদি আমরা রোম্যান বর্ণমালা গ্রহণ করি তবে ঐ "বড়" ও "ছোট" অক্ষর ব্যবহারের রীতিও গ্রহণ করিব কি না বিবেচ্য। যদি তা না ক'রে কেবল ছোট অক্ষর ব্যবহার করি তবে অনুমান পঞ্চাশ-ষাট অক্ষরেই আমাদের কাজ হয়ে যায়, নতুবা তার দ্বিগুণ অক্ষর লাগবে। অবশ্য লিপির এ পরিবর্তন যদি আমরা স্বীকার করে নিই তবে "অঙ্ক"ও (numerals) আমাদের রোম্যান, অর্থাৎ ইংরেজী, গ্রহণ করতেই হবে। রোম্যান যতিচিহ্ন (punctuation) ত আমরা অনেকটা গ্রহণ করেছিই।

আমাদের লিপিবিড়ম্বনা ও অক্ষর-বাহুল্যের অসুবিধা অনেকেই অনুভব করেছেন এবং সেজন্যে অনেকে অনেক রকম উপায় এ-পর্য্যন্ত উপস্থিত করেছেন। কেহবা দেবনাগরীর সঙ্গে যথাসাধ্য যোগ রেখে লিপি সংস্কার করতে চেয়েছেন, কেহবা মুদ্রণের জন্য অক্ষরসংখ্যা কমাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এ-সকল চেষ্টায় বিশেষ কিছু লাভ আছে ব'লে মনে হয় না, কেননা, আমাদের লিপির প্রকৃতিগত যে-সব ত্রুটি ও অসুবিধার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সে ত্রুটি থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কেহ এ-পর্য্যন্ত বলতে পারেন নি। অতএব রোম্যান বর্ণমালা গ্রহণই একমাত্র পথ ব'লে মনে হয়।

এখন সংক্ষেপে বিষয়টি এইভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে :—

১। ভাষার প্রাণ ধ্বনি; লিপি ধ্বনির প্রতীক বা আকার মাত্র; ভাষার সঙ্গে লিপির কোন ঘনিষ্ঠ বা স্বাভাবিক যোগ নেই।

২। আমরা যে লিপি ব্যবহার করি তাহা বহু পরিবর্তনের পর বর্তমান আকার ধারণ করেছে; তাতে মূল ভাষার ভাব বা চিন্তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি।

৩। আমাদের লিপি জটিল এবং লিপির আদর্শ যা হওয়া উচিত তার তুলনায় এর নানা ত্রুটি আছে।

৪। রোম্যান অক্ষরমালা আমাদের লিপির চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ, জটিলতাহীন এবং আদর্শলিপির নিকটবর্তী।

৫। সুতরাং আমাদের এই রোম্যান বর্ণমালা গ্রহণ করা উচিত; গ্রহণের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক কোন আপত্তি নেই, বরং এর সপক্ষে বলবার অনেক কিছু আছে।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, কোন বর্ণমালাই ত্রুটিহীন হ'তে পারে না, কিন্তু তুলনায় যেটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুবিধাজনক মনে হয় সেইটিই আমাদের গ্রহণ করতে হবে, বৃথা কোন কারণে ভয় পেলে হবে না। যদিও এই পরিবর্ত্তন প্রথমে বিপ্লবজনক মনে হ'তে পারে, তবু এটা কঠিন বা অসম্ভব একেবারেই নয়। অনেক দেশেই এখন এ-বিষয়ে চেষ্টা দেখা যাচ্ছে এবং অনেকেই রোম্যান অক্ষর গ্রহণ করছে। তুর্কীতে কেমাল পাশা সম্প্রতি আরবী বর্ণমালা দূর ক'রে দিয়ে রোম্যান বর্ণমালা প্রচলন করেছেন, সকলেই জানেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এটা করতে সমর্থ হয়েছেন, কেন না, তিনি এখন তুর্কীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসনকর্ত্তা। তিনি আদেশ করা মাত্র পুরাতন বর্ণমালা দূর হয়ে গেল, বিদ্যালয়ে ত কথাই নেই, পথে ঘাটে নূতন বর্ণমালার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পট স্থাপন ক'রে আবালবৃদ্ধ সকলকে শেখান আরম্ভ হয়ে গেল এবং অল্পদিনের মধ্যেই তুর্কীরা তাদের স্বীয় তুর্কীভাষা অক্ষুন্ন রেখে নূতন বর্ণমালা গ্রহণ করিল। জার্ম্মানীতে বহুকাল থেকে "গথিক" বর্ণমালার ব্যবহার চলে আসছে এবং এখনও চলছে, কিন্তু রোম্যান বর্ণমালার নানা সুবিধার জন্য জার্ম্মানরাও ক্রমশঃ "গথিক" ছেড়ে দিয়ে রোম্যান বর্ণমালা গ্রহণ করছে। এতেই মনে হয় যে সকল প্রগতিশীল জাতিই ক্রমে ক্রমে রোম্যান বর্ণমালা গ্রহণ করবে এবং আমাদেরও উচিত মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করে এই বর্ণমালা অবিলম্বে গ্রহণ করা। এ উদ্দেশ্য সাধনে ভারতীয় প্রধান ভাষাগুলির প্রতিনিধিদ্বারা গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সমিতিতে ভারতবর্ষের সকল প্রচলিত বর্ণমালার বিশদ পর্য্যালোচনা ক'রে সমস্ত ভারতের জন্য রোম্যান বর্ণমালানুযায়ী একটি সাধারণ বর্ণমালা—Common Script—প্রস্তুত করাই প্রশস্ত।

এই নূতন পথ অবলম্বন করতে হ'লে ভারতের কোন একটি প্রদেশকে সাহস ক'রে অগ্রসর হ'তে হবে, তাহলেই আশা করা যায় অন্যান্য প্রদেশগুলি ক্রমশঃ এর সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এখন অনেক স্থলেই আদৃত, সুতরাং বাংলা দেশ যদি এ-বিষয়ে অগ্রসর হয় ও রোম্যান লিপিতে পুস্তক ও পত্রিকা মুদ্রিত করতে আরম্ভ করে, তবে লেখক বা প্রকাশক কাহারও কোন ক্ষতি হওয়ার ভয় ত নেই-ই, বরং লাভ হওয়ার কথা, কেননা, এরূপ করলে ঐ সকল পুস্তক ও পত্রিকার পাঠক-সম্প্রদায় অনেক বিস্তৃত হয়ে যাবে এবং অন্যান্য প্রদেশের লোক, যাঁরা বাংলা ভাষা বুঝতে পারেন অথচ পড়তে পারেন না, তাঁরা আগ্রহ ক'রে বাংলা বই ও পত্রিকাদি পড়বেন। এ-কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলা ভাষা বুঝতে পারেন অথচ পড়তে পারেন না, এ-রকম লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ খুবই বেড়ে যাচ্ছে। রোম্যান অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক বা পত্রিকায় আপাততঃ কিছুকাল দেবনাগরী বর্ণমালা অনুসারে প্রতিলিখনের একটি লিপিপত্র প্রকাশ করা প্রয়োজন হবে। "প্রবাসী," "ভারতবর্ষ", "বিচিত্রা" ইত্যাদি পত্রিকায় এর পরীক্ষা ক'রে দেখলে সুফল পাওয়া যাবে, আশা করা যায়।

দিদির দুঃখ

শ্রীপ্রমীলা দেবী

শাল-কাঁঠালের শাখায় শাখায় বনলতার শ্যামসমারোহে পাহাড়ের কুশ্রী রুক্ষ মূর্ত্তি আর দেখা যায় না। তারই পাদদেশে ছোট বাড়ি, মনে হয় খেলাঘর। অদূরে ব্রহ্মপুত্রের ধূসর বেষ্টনী। নীলাকাশতলে বনানীর শ্যামলতার সহিত গৈরিক বালুচরের মিলন-লীলায় মুগ্ধ অনিলের সেই ছোট বাড়িতে থাকিয়াও মনে হয় এ তার কানন-স্বর্গ, আর শচী তার বনলক্ষ্মী।

শচীর মন কিন্তু ভোলে না—এর চেয়ে মনোহর তাদের সেই আমতলার বাড়ি। নাইবা রইল সেখানে নদী, পাহাড়, তবু কেমন ছায়াশীতল—ঘন বৃক্ষছায়ায়। হোক-না ভাঙাচোরা তবুও শচীর জগতে তার চেয়ে মনোরম স্থান আর নাই। পাশেই সেনেদের পরিত্যক্ত বাড়ি। পাড়ার ছেলেমেয়েদের খেলার আড্ডা সেখানে। শূন্য ভিটাগুলি তাহাদের কুমীরকে এড়াইবার উপযুক্ত ডাঙা, খেলার কুমীরের কাল্পনিক নদীটিও অতি বৃহৎ। শৈশবের যত মাধুর্য্য সেখানেই ত সঞ্চিত! ফুল তুলিতেও শচীরা সেখানে জুটিত। অযত্নবর্দ্ধিত অপরাজিতার লতাটিও ফুলে নীল হইয়া থাকে, শিশুমন মুগ্ধ করিতে ক্ষীণকায়া কুণ্ডলতায় লাল ফুল ফোটে। বাগানের শেষ প্রান্তে ঠিক পুকুরের ধারটিতে জলে ডুবিয়া-মরা সেনেদের ছোট্ট মেয়েটিকে যে বেদীতলে রাখা হইয়াছে—শচীরা নিত্য সেখানে ঘুরিয়া আসিত একবার। রেলিঙে-ঘেরা স্থানটিতে ছোট মেয়েটিকে স্নেহ দিতে ঘিরিয়া আছে শুধু দু-চারিটি ফুলগাছ। আহা যাত্রাকালে অসহায়া কন্যাকে স্মরণ করিয়া মেয়েটির মা'র কি কান্না! মনে করিলে এখনও শচীর চোখে জল আসে। সেই একাকিনী বালিকার জন্যই অপরাহ্ণে অজস্র সন্ধ্যা-মালতী জাগে। শচীরা কাহাকেও সে ফুল ছুঁইতে দিত না। রাত্রে সেই ফুলের দলে ডুরে-শাড়ীপরা খুকুরাণী ঘুরিয়া বেড়াইবে হয়ত। তাই ক্ষুদ্র দ্রোণফুলে-ছাওয়া ছোট গাছগুলি হইতে ধৈর্য্য ধরিয়া শচীরা খুঁটিয়া ফুলগুলি তুলিত। ঐ ফুলের দুগ্ধফেন শুভ্রতায়ই ত মহাদেব খুশী। শুধু মধুলোভে চঞ্চল ছোট ভাই-বোনদের ভয়ে কাঠি-দিয়া-জোড়া বটপাতায় সঞ্চিত ফুলগুলিকে সযত্নে লুকাইতে হয়, এই যা মুস্কিল। নিঃসঙ্গ প্রবাসে মধুভরা সেই দিনগুলি শচীর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। নিঃসঙ্গ বইকি! অনিলের সারাদিন কাজ, মধ্যাহ্নে একবার খাইতে আসে শুধু। সন্ধ্যার অবসরটুকুও তার পাশার আড্ডায় কাটে। দেহের ক্লান্তি ঘুচাইতে সেই তার একমাত্র স্থান। বাড়ি ফিরিয়া খাইতেও তার তর সয় না। সারা দিনে শচীর তাই প্রচুর অবসর। সামান্য কাজ—ছোট বাড়ি, দুখানি মাত্র ঘর শচীর নিপুণ করস্পর্শে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার। কাজশেষে পাহাড়ের দিকে রান্নার একচালার পাথরের সিঁড়িটিতে দাঁড়াইয়া শচী পাহাড়ের দৃশ্য দেখে। পাহাড়ের গায়ে আরও সব বাড়ি। শচীদের বাড়ির মাথার সব চেয়ে কাছে লতাপাতা-ঘেরা যে বাড়িটি, শচীর মনে হয় হাত বাড়াইলেই ছুঁইতে পারিবে যেন সেটিকে। যে ফিরিঙ্গি-পরিবার সে-বাড়িতে আছে তাদের গৃহিণীর চাল-চলন শচীর কাছে কৌতূহলজনক দৃশ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এদিকে তার বেশীক্ষণ থাকিবার হুকুম নাই। ফিরিঙ্গিদের উপর কেনই যে অনিলের এত অশ্রদ্ধা শচী তাহা ভাবিয়া পায় না। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় ওদেরই হাসি-গান আর নাম-না-জানা কোন বাজনার টুং টাং শব্দ শচীর নিস্তব্ধ গৃহে সঙ্গী হইয়া দাঁড়ায়। নির্জ্জন মধ্যাহ্নেও নিজেকে তার বড়ই একাকিনী মনে হয়, শোবার ঘর হইতে রান্নাঘরের মাঝখানের একফালি আঙিনায় ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এক কোণে তার স্নানের ঘর। একখানি কালো পাথর অবলীলায় কেমন সমতল মসৃণ হইয়াছে। তাহারই চারি-দিকে বেড়া-দেওয়া, বেড়ার উপরে শচীও বুনো লতা তুলিয়া দিবে। তাহা হইলে কলিকাতায় বড়দির বাড়ির আলোকোজ্জ্বল তৈল-মসৃণ বাথরুমের চেয়ে শচীর স্নানঘর মন্দ হইবে না। নাঃ

দেশটা একেবারে মন্দ নয়, শচীর বিয়ের সময়ে কেনই যে সকলে এত ভয় পাইয়াছিলেন! আসাম দেশটা নাকি জঙ্গল আর বাঘ-ভাল্লুকে ভরা। একটিবার চোখে দেখিলে তাঁহাদের ভুল ভাঙিত। তবু শচী ঐ ফিরিঙ্গি মেমটার মত সমস্ত রাস্তা, পাহাড় ঘুরিতে পায় না। ঘোমটার আড়াল হইতে যতটুকু সে দেখে তাহাতেই শচীকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। বাড়ির সামনের দিকে বারান্দা হইতে নামিলেই পথ, আর তার পাশেই খাড়া বালুচরের নীচে নদী; রাস্তার ঐ দিকটায় ফণি-মনসার ঝোপ আর মাঝে মাঝে আগাছার জঙ্গল ছাড়া নদীকে আড়াল করিতে আর কিছু নাই। এই দিকের জানালা উন্মুক্ত করিয়া শচী সেখানে বসিয়া সারা দ্বিপ্রহর কাটায়, এই পথে যখন ষ্টীমার যায় শচীর মনও সেই সঙ্গে চলিতে থাকে। ডেকে আরাম-মগ্ন নরনারী ও কর্ম্মব্যস্ত খালাসী হইতে চটের পর্দ্দা-ঘেরা কামরায় বিছানা তোরঙ্গ হাঁড়ি কুড়ির মধ্যবর্ত্তিনী কিশোরী বঙ্গবধূই তাহাকে অধিক আকর্ষণ করিতে থাকে। ঘোমটায় ঢাকা কচি মুখ দেখিলে তাহার মনে কেমন সমবেদনা জাগে। শচীরই মত ঐ বৌটি ভাই-বোনদের ছাড়িয়া আরও দূরে যাইতেছে হয়ত! কতদূরে যাইবে এরা? গৌহাটী না আরও দূরে? জলপথে তাই কয়েক দিনের জন্য কেমন সংসার পাতিয়াছে।

ষ্টীমার ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়, শচীর মন তবু চলিতে থাকে, দেশ-দেশান্তর ছাড়াইয়া ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় কোন্ পল্লীতে সে উপস্থিত হয়—বহু অশান্তির মাঝে শচীর লক্ষ্মীস্বরূপিণী মা যেখানে সহিষ্ণু স্নেহে সন্তানের মঙ্গল কামনায় রত। পর পর তিন মেয়ের বিবাহে জীর্ণ-শীর্ণ শচীর পিতা সন্তানগুলির উপর তিক্ত রুক্ষ বাক্যবাণ অহর্নিশি বর্ষণ করিয়া যান, শচীর মাকেই তাহা দুই হাতে আবরিয়া চলিতে হয়। ক্ষমতাও তাঁহার অধিক নয়। শচীর দাদাই সংসারের কর্ত্তা, অল্প আয়ে সংসারের স্বচ্ছলতা যতই দুর্লভ হইতে থাকে সেজন্য বোনগুলিকে দায়ী করিয়া দাদার বিরক্তি ততই বাড়িয়া চলে। অভাবের গঞ্জনা যেন বোনদেরই প্রাপ্য। ভ্রাতৃজায়ার মুখনিঃসৃত হলাহলের আস্বাদও তাহারা পায় সেই সঙ্গে। সর্ব্বস্ব মেয়েদের ঢালিয়া দিয়া এখন রাবণের গোষ্ঠীর উদর চলে কিসে,—সে চিন্তায় তাহারও ঘুম হয় না। ভ্রাতৃজায়াকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না; ষোল বছর হইতে সুরু করিয়া এই বাইশ বছর বয়সে সে পাঁচটি সন্তানের জননী হইয়া শরীরের সঙ্গে বচনের লালিত্য একেবারে হারাইয়াছে। উদয়াস্ত তাহার ছেলেগুলিকে শান্ত রাখিবার চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকিতে হয়। এখনও বিয়ে দিতে একটা বোন বাকী। দাদা বলে ভিটেটুকু যাবে তার পর। একথা ভাবিতেও শচীর বুক শুকায়। ছোট ছোট আরও তিনটি ভাইকে কে যে মানুষ করে! শচী যদি একটি ভাইকে কাছে আনিয়া রাখিতে পারিত! তা কি অসম্ভব! স্বামীকে বলিয়া দেখিবে একবার! বোন বলিয়া ভাইদের দুঃখে উদাসীন সে থাকে কি করিয়া? নিঃসঙ্গ দিনযাপন না করিয়া একটি ভাইকে শচী নিশ্চয় মানুষ করিতে আনিবে!

অনিলকে কথাটা বলিতে বিলম্ব হয় না। শচীর একক জীবনের কষ্ট অনিলও বোঝে।—কিন্তু অর্থমনর্থম্। সেই চিরদিনের অপূর্ণ অভিলাষের বিধাতা শচীর ইচ্ছা পূরণে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। মাসান্তে চল্লিশটি টাকা আয় যার—একটি লোককে কুড়ি টাকা খরচ করিয়া আনিবার চেষ্টায়ও তাহাকে বহু সঙ্কটে পড়িতে হয়। তবু অনিল সহৃদয়, টাকাটা কোনরূপে জোগাড় করিতে পারিলেই শচীর সাধ সে পূর্ণ করিবে।

সব চেয়ে ছোট ভাইটিকেই শচীর আনিতে সাধ। মায়ের আদর নিঃশেষে ভোগ করিতে পায় বলিয়া স্বভাবটি তার মিষ্টি। অন্য ভাইদের মত রুক্ষ মেজাজ তার নয়! দিদিরা শ্বশুরবাড়ি গেলে সে-ই শুধু তাহাদের খুঁজিয়া বেড়ায়। আবার মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলে, "আমি বড় হয়ে ওদের নিয়ে আসবো দেখো।" শচীর আসার সময়ে এবার সে তার নিজের খেলার কড়িগুলি দিদির আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া অশ্রুঢাকা সলজ্জ হাসিতে কেমন বলিয়াছিল, 'আমার কড়িগুলি তোমায় খেলতে দিলুম সেজদি,—একলাটি থাকবে কি না। আমার গোলোকধামখানা যে ছিঁড়ে গেছে ভাই, নইলে তাও দিতুম।'

শচীর সে কড়ি লইতে ইচ্ছা ছিল না, শুধু মা'র অনুরোধেই কড়িগুলি সে বাক্সে তুলিয়াছিল। এখন বাক্সের ডালা তুলিলেই কড়িগুলির সঙ্গে কালো ঝাঁকড়া

চুলের মাঝখানে নিটোল সুন্দর মুখের বড় বড় দুটি চোখের দৃষ্টি শচীর মনে পড়িয়া যায়। মুখখানাই তার অমন, নইলে শরীরে তার কিছু নেই। জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া অস্থিসার চেহারা, বুকের হাড় ক'খানি বুঝি গুণিয়া বলা যায়। কড়িগুলি ফিরাইয়া দিলে তার বড়ই দুঃখ হইত, সনিশ্বাসে শচী মনে ভাবে।

শচীর অদৃষ্ট প্রসন্ন। উপরের সেই ফিরিঙ্গি বদলি হইয়া গেল। এবার যারা আসিয়াছে তারা বাঙ্গালী। শচীদের মতই স্বামী-স্ত্রী দু-জন শুধু। কিন্তু তাদের জীবনধারা নীচের বাড়ির মত নিঃশব্দে বহিয়া যায় না। দাস-দাসীর কোলাহলে সে বাড়ি প্রাণময়। নিত্যই উৎসব চলিয়াছে যেন! উহাদের দেখিতে শচীর কৌতূহল হয় কিন্তু সাহস হয় না, সমপদস্থ না-হইলে নাকি আলাপ করে না কেউ,—অনিল বলিয়াছে! তবু অজ্ঞাতে চোখ কেমন করিয়া উপরের দিকে যায়। এইরূপে একদিন বাতায়ন-পথে এক কিশোরীর সুন্দর মুখের আভাস পাইয়া চোখ নীচু করিতেই শুনিতে পাইল, "চেয়ে দেখই না ভাই, তোমার চেয়ে এতই কি বিচ্ছিরি দেখতে?" শচী সপুলকে হাসিয়া বলে, কি যে বলেন! ইহার পরে উপরের জানালায় পাতার আড়ালের উজ্জ্বল গোলাপটির মত সে কিশোরীর মুখ অহরহই ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু চেঁচাইয়া কতক্ষণ কথা বলা যায়? বাধাহীন আলাপের জন্য উপরের বৌটি ছুটিয়া আসিত! অনেকটা পথ,—দুখানা বাড়ি যেদিকে, রাস্তা সেদিকে নয়। পাহাড়ের অন্যদিকে ছায়াচ্ছন্ন ঢালুপথে নামিয়া অনেকটা পথ ঘুরিয়া তবে তাহাকে আসিতে হয়। আলাপেও সে-ই পটু। অপ্রতিভ শচীকে লজ্জা দিতে সেই বলে,—বসতে দেবে না ভাই? আপনি, আজ্ঞে, বলা আমার চলবে না—আগেই বলে রাখছি কিন্তু। তোমার নামটি কি ভাই?

বৌটির অসঙ্কোচ আলাপে পরিতুষ্ট শচী হাসিয়া বলে, আগে নিজের নামটি বলতে হবে যে। অপরা তখন চৌকী টানিয়া স্বচ্ছন্দ হইয়া বসিয়াছে। শচীর কুণ্ঠার ভাব তাহার মিষ্টি লাগে, চোখে মুখে হাসির মধু বর্ষণ করিয়া সে বলে,—দাঁতভাঙা নাম শুনতেই হবে?—বলে তাহলে চেষ্টা ক'রে—ইন্দ্রাণী—। সার্থক নাম! চেহারায় স্বভাবে মিলাইয়া কে এমন নাম রাখিয়াছিল? নিজের নাম যেন শচীর উপহাস বলিয়াই মনে হয়। শৈশবে তার মুখে কি বৈশিষ্ট্য দেখিয়াই যে মা নাম রাখিয়াছিলেন, শচীরাণী। সে নামে শচীর দিন-দিন কুণ্ঠা বাড়িয়া চলিয়াছে! রাণী হইয়াও বিয়ের বেলায় তার বাপ-মাকে বিন্দুমাত্র কম লাঞ্ছনা দেয় নাই! তবু সেই নামই শচীকে বলিতে হয়।—শচী, ওমা, কি আশ্চর্য্য মিল, ছাখো তুমি আমি একই লোক তাহলে। ইন্দ্রাণীর আনন্দ ধরে না, বলে, এতদিনে এক হলুম আবার। তুমি ভাই নাম করতে পাবে না আমার; নিজের নাম বলে কি কেউ? এস মিলন পাতাই আমরা,—কি বল? হ'লবা পুরনো তবু কেমন মিষ্টি,—শচী খুশী হইয়াই পাতানো ডাকটি মানিয়া লয়। এতটা তার সাহসই হইত না! তারপর চলে অজস্র গল্প। যাওয়ার বেলায় আবার দেখা হওয়ার অনুরোধ। ইন্দ্রাণী বলে,—একটিবার তুমিও আসবে ভাই; নইলে ক্যাংলা ব'লে আমায় বড্ডই ঠাট্টা করবে যে!

ইন্দ্রাণী চলিয়া যায়, কিন্তু তার সস্নেহ হৃদয়ের মধু-সৌরভ শচীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। কি মিষ্টি তার কথাগুলি, নিংড়াইয়া সুধা ছানিয়া লয় শচী। সখীত্বের বন্ধন ক্রমেই নিবিড় হইয়া আসে—স্তব্ধ মধ্যাহ্ন আর শচীকে নদীর দিকে চাহিয়া কাটাইতে হয় না। সখীর হাসি কথা তাহাকে ঘিরিয়া থাকে এখন। ইন্দ্রাণীর স্নেহময় স্বভাব শচীর জীবনে ইন্দ্রলোক আনিয়া দিয়াছে যেন।

হাসাইতেও ইন্দ্রাণী ওস্তাদ। কখনও স্বামীর চালচলন তার বর্ণনার বিষয় হইয়া পড়ে! অশোকের সামান্য ত্রুটি লইয়া এত সে রং ফলায়!—হাসিয়া ক্লান্ত শচী বাধ্য হইয়া বলে—থামো ভাই, স্বামীকে অত বিদ্রূপ করতে নেই।—

—হুঁ, হেসে নিলে কেমন! আবার বাড়ি গিয়ে তোর কথাও বর্ণনা করব।—সেকি ভাই? সত্রাসে শচী বলে,—আমি আবার কি অপরাধ করলাম?

—আহা তোমারই যেন কোন খুঁৎ নেই! এই কেমন মিনমিনে ভাব—তিনবার ডেকে তবে সাড়া পাওয়া যায়।

কথাটা ঠিক, ইন্দ্রাণীর তুলনায় শচী যেন জীবনহীন। সখীর দুরন্তপনা তার ধাতেই আসে না। বাড়ির পাশে এত সুন্দর জায়গা থাকিতে ইন্দ্রাণীর যখন বালুচরে পিকনিক করিতে সাধ যায়, তখন শচী বাধা না-দিয়া পারে না। কিন্তু ইন্দ্রাণীর অসীম উৎসাহ। জ্যোৎস্নালোকে জলে-ভেজা কালো বালুচরের পাশে রূপালি নদী ঝলমল করিতে থাকে, উতলা পবন কচিৎ বনফুলের মৃদু মধুর সৌরভ বহিয়া আনে। তবু সযত্নপরিষ্কৃত তরকারিপাতিতে যখন বালি কিচ্ কিচ্ করিতে থাকে, তখন শচীর বিরক্তি ইন্দ্রাণীর কলহাস্যের ঝঙ্কারকে ছাপাইয়া ওঠে। ইন্দ্রাণী সে-সব গ্রাহ্য করে না। শচীকে একপাশে সরাইয়া সে নিজে হাতে সব করে। স্বামীরাও সেখানে নিমন্ত্রিত! রান্নার ভার ইন্দ্রাণীর। আনাড়ি হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইবে বলিয়াই না এত আয়োজন! কিন্তু শচীকে একদণ্ড বসিতেও দেয় না সে। কখনও ডাকে—দ্যাখ্ না ভাই, গেল বুঝি খিচুড়িটা ধরে, হাতা চালা না একটিবার। নদীর দিকে উপবিষ্ট অশোক হয়ত চেঁচাইয়া বলে,—রান্নাটা না-হয় ওঁর হাতেই ছেড়ে দাও। দিনরাত যত খুশী উপদ্রব সয়েই থাকি—রসনার উপর অত্যাচারটা না হয়—

ইন্দ্রাণী ঝাঁঝিয়া উঠে; শচীকে বলে,—চুপ্ নে ত ভাই, দেখা যাবে পাতে কিছু প'ড়ে থাকে কি না। শচী হাসিয়া সরিয়া যায়। পরমুহূর্ত্তে আবার ডাক পড়ে, 'চাটনীতে কি-ফোড়ন দিতে হয় ভুলে গেলুম যে, ব'লে দেনা ভাই।' হাসি কথায় ইন্দ্রাণী সবাইকে অস্থির করিয়া তোলে। বেচারা অশোককেও তাহার কাছে হার মানিয়া চুপ করিতে হয়। তবু ইন্দ্রাণীর ব্যবহারে লেশমাত্র তিক্ততা শচী খুঁজিয়া পায় না। পৃথিবীর মালিন্য তাহার সখীর অন্তরে কোথাও যেন ঠাঁই পায় নাই। ঘন বর্ষণশেষে নির্মেঘ চন্দ্রালোকের মতই তাহা সকলের মনকে ছুঁইয়া যায়। বাড়ি ফিরিয়াও শচী তাই সখীর তুচ্ছতম হাসি কথাটুকু বার-বার অনিলের নিকট বর্ণনা করে। অনিল যখন বলে, তোমার সই ছাড়া জগতে আর কিছু আছে? তখন লজ্জিত হইয়া শচী চুপ করে। নিরুপায়! শচীর জীবনে সখীপ্রেমের ভাগীরথীধারায় এ যে তটপ্লাবন। দে-সুধারস তাহার হৃদয়ের কানায় কানায় উপচাইয়া পড়িতেছে—শচীর সাধ্য নাই তাহাকে গোপন করিয়া রাখে।

এত সুখের মধ্যেও ভাইকে আনিবার কথা শচী ভোলে নাই। অনিলও চেষ্টায় ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই নটু আসিয়া পড়িল। সে সবচেয়ে ছোটটি নয়। কোলের ছেলেকে মা ছাড়িতে পারেন নাই। তাই সেজো ভাই নটু আসিয়াছে। বছর-চৌদ্দ তার বয়স, কিন্তু মুখে অত পাকামী না থাকিলে চেহারায় বা শিক্ষায় তাহার বয়স আন্দাজ করা যাইত না। যা হোক শচীর উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে এবার। লেখা-পড়া সে বয়স-অনুপাতে কিছুই জানে না। পাঠশালায় যাইত কি না জিজ্ঞাসা করিয়া শচী উত্তর পাইল—পরনে যাদের বস্তোর জোটে না তার আবার ন্যাকাপড়া। তবু শচীর খুশীর অন্ত নাই। মা'র কথা ভাইবোনদের কথা সে খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করে। গুলু আসিতে পায় নাই বলিয়া মা'র উপর অভিমানে কেমন মুখ ভার করিয়াছিল তাহা বার-বার শুনিয়াও তার তৃপ্তি হয় না।

কথাবার্ত্তার অন্তরালে নটুর লেখাপড়ার কথা শচীর মনে সজাগ হইয়া আছে। অনিলের সঙ্গে স্কুলে দেওয়ার পরামর্শ চলিতেছে। তার আগে একটু ঘসিয়া-মাজিয়া দিতে হইবে। নটুর কিন্তু লেখা-পড়ার দিকটা পছন্দ নয়। তার চেয়ে জামাই বাবুর সৌখীন জিনিষগুলি পছন্দ হয় বেশী। শচী সকরুণ চিত্তে ভাবে, আহা কখনও কিছু পায় নি ত। নটুর পড়ায় অনিচ্ছায় তাহাকে মনে মনে পীড়িত করিয়া তোলে। লেখা-পড়ায় একটু মন যদি ওদের থাকিত! মেজ ভাইটি নাকি পড়ার সংস্রব একেবারেই ছাড়িয়াছে। নটুই বলে মেজদার কিছু হবে না—এর মধ্যেই সে মাকে জিজ্ঞেস না-ক'রে কোথায় যে চলে যায়, মা শুধু কাঁদেন। মেজদা বলে, পরের বই নিয়ে কেউ আবার পড়তে পারে, লেখাপড়া শেখে—সব উপকথার গল্প। ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া শচীর ক্ষোভ-দুঃখের সহিত বিস্ময়েরও সীমা থাকে না। তারাও অনেক কটি ভাইবোন শৈশবে মার দুঃখের অন্ন বাঁটিয়া খাইত। কিন্তু এমনি ধারা কথাবার্ত্তা তারা শেখে নাই। মারই দুঃখ, নইলে ছেলেরা এমনিধারা হয়? শচী যেন মনে মনে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। নটুকে লেখাপড়া শিখাইবেই সে! কিন্তু সমস্যার শেষ নাই। নটুর কাপড়-চোপড় একেবারেই নাই যে। দেশে শতচ্ছিন্ন বস্ত্রে গ্রন্থি দিয়া পরা চলিত—বিদেশে তাহাতে মাথা হেঁট হয়। স্বামীকে বেশী বলিতে লজ্জা বোধ হয়। নটুর আসার খরচ অনিল কষ্ট করিয়াই জোগাড় করিয়াছে। তবু সে নিজেই নটুকে একজোড়া ধুতি কিনিয়া দিয়াছে। এখন দুটি জামা তৈরি করাইতে পারিলেই হয়। শচী অনিলকে এখন আর কিছু বলিবে না। কোন রকমে জামার কাপড় কিনিবে সে। সেলাই শচী জানে না, কিন্তু ইন্দ্রাণী জানে। ভাইফোঁটার সময় নিজ হাতে ভাইদের সে জামা তৈরি করিয়া পাঠায়। ইন্দ্রাণীর পাশে বসিয়া শচী কতদিন তার ছাঁট-কাট দেখে—সেলাইয়ের কলের শব্দের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর মুখও চলে। কত গল্প করে ইন্দ্রাণী—স্বামীর জন্মদিনে তসরের পাঞ্জাবী সেলাই করিয়া দিয়া চরকা-ব্রোচ উপহার পাইয়াছিল—শচীর এসব অজানা থাকে না। শুনিতে শুনিতে হঠাৎ তার কেন মনে হয়—গরিবদের যেন কিছুই শিখিতে নাই। সেলাই জানিলে যে গরিবেরই কাজে লাগে বেশী। নটুর জামার জন্য তবু তার চিন্তা লাঘব হয় কতকটা। নিজের অক্ষমতা সে সখীর নিকট পূরাইয়া লইবে। এখন কাপড়-কেনার টাকা হইলেই হয়। প্রত্যহ আনাজপাতি কেনার কিছু পয়সা অনিল তার কাছে রাখে। সে-পয়সা বাঁচাইয়া কাপড় কিনিতে গেলে অনেক দেরি। শচীর মনে পড়িয়া যায়—শ্বশুরবাড়ি আসার সময় মা সিন্দুরকৌটায় একটি টাকা রাখিয়া শচীর আঁচলে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। মা'র কষ্টসঞ্চিত স্নেহের দান শচী প্রাণ ভরিয়া সে টাকা খরচ করিতে পারে নাই। এখন তার মনে হয় এর চেয়ে কি আর ভাল কাজে লাগিবে এ টাকা! ভাবিয়া শচী উৎফুল্ল হইয়া উঠে। সেদিনই মূল্যবান রত্নের মত যত্ন করিয়া রাখা টাকায় নটুর জামার কাপড় কেনা হয়।—ইন্দ্রাণীর সেলাই করিয়া দিতে যা দেরি।

ইন্দ্রাণী উৎসাহ করিয়াই সেলাই করার ভার লইয়াছে। কিন্তু শচীকে কাছে থাকিয়া শিখিতে হইবে, এই তার সর্ত্ত। কঠিন সেলাই সে নিজে করিয়া দিবে। আর সব শচীকে করিতে হইবে। পরদিন শচী তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়া সখীর বাড়ি ছুটিল। এখন যাওয়ার সাথীর অভাব নাই, নটু আছে। দুই সখীর হাসি-গল্পের মধ্যে জামা যখন শেষ হইল শচী একেবারে মুগ্ধ। কে বলিবে দর্জ্জি করে নাই? শচীর অপটু হাত কোথাও ধরা যায় না। ইন্দ্রাণীর নিপুণ হাতের গুণেই অবশ্য ইহা সম্ভব হইল। বাড়ি গিয়া বোতাম কটি বসাইয়া লইলেই নটু জামা গায়ে দিতে পারিবে।

বেলা পড়িয়া গিয়াছিল। শচী যখন পাহাড়ের নীচে নামিল তখন পথে জনতার চাঞ্চল্য পরিস্ফুট। সখীকে বিদায় দিয়া ইন্দ্রাণীও ব্যস্ত হাতে কাজে মন দিল। অশোকের আসার সময় হইয়াছে। অশোকের জলখাবার নিজে তৈরি করে সে। আজ তাহা হয় নাই। শেষ করিবার আগেই অশোক আসিয়া পড়িল। পত্নীর অপরিচ্ছন্ন বেশ তার চোখে পড়িতেই সে সহাস্য মুখে বলিল—সখী-সমাগম হয়েছিল বুঝি!

অশোকের পরিচর্য্যা শেষ করিয়া ইন্দ্রাণী নিজের দিকে একটু মন দিবার চেষ্টা করিতেছিল, অশোক ডাকিয়া বলিল—ঘড়িটা কোথায়? আজ নিয়ে যেতে মনে ছিল না। কোথায় তুলে রেখেছ বল ত? ইন্দ্রাণী উঠিল না, চুলে চিরুণী চালাইতে চালাইতে বলিল—ত্থাখো না ঐ দেরাজের কাছটিতেই তুমি যেখানে রাখ সেখানেই আছে ত!

—না-না নেই, সরিয়ে রেখে দুষ্টুমি করা হচ্ছে।—ইন্দ্রাণী তথাপি নড়িল না, এ শুধু তাকে কাছে লওয়ার ফন্দী। ঘড়ি সে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পানের ডিবা আনিতে গিয়া দেখিয়াছে! কিন্তু অশোকের ব্যস্ততায় চুলবাঁধা ফেলিয়া উঠিতে হইল শেষ পর্য্যন্ত। বাপের বাড়ি হইতে আনা, পুরাতন দাসী যুথীও বলিতেছে, জামাই বাবু খুঁজে হায়রান হলেন, তুমি একবার দেখছ না দিদিমণি!

তার পর সকলের মিলিত তল্লাসেও প্রার্থিত দ্রব্যটি কাহারও নয়নগোচর হইল না।

অশোক রাগিয়াছিল। কেউ নিয়েছে ঘড়ি, ডাক চাকর-বাকর সবাইকে। ইন্দ্রাণীও শঙ্কিত হইয়াছিল। কে নিতে পারে? জল যে দেয় সে ত ঘরেই আসে না। ঠাকুর রান্না করিয়াই ক্রমণে যায়, সন্ধ্যায় ফেরে। শুধু ঐ নূতন চাকর 'আপ্পা'।—উদ্দাম ক্রোধে অশোক তাহাকে

জেরা করিতে লাগিল। তরুণ ভৃত্য বালক বলিলেও চলে। ভয়ে সে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। জবাব দিতে কথা জড়াইয়া যাইতেছে। অপরাধীর কুণ্ঠিত ভাব। নিশ্চিত সন্দেহে অশোক তাহাকে দুই চড় বসাইয়া দিতেই ইন্দ্রাণী ছুটিয়া আসিল,—আহা দোষী কিনা তার ঠিক নেই,—আগে থেকে মার-ধোর ক'রো না।'

ইন্দ্রাণীর মনে অন্য সন্দেহ জাগিতেছিল।

অশোক ভৃত্যকে ছাড়িল বটে, কিন্তু রাগ কমে নাই তখনও। বলিল, ঘড়ি আমি আজই বার করতে চাই। অত দামী ঘড়ি-চোরকে আমি পালাতে সুবিধা দিচ্ছি না। বাড়ির লোকজনের সামনে ঘড়ি উড়ে গেল? ঠাকুর কোথায়?

ইন্দ্রাণী কুণ্ঠিত মুখে উত্তর দিল, সে আসে নি ত। তার যাবার পরেও ঘড়ি দেখেছি আমি। বলিয়া ইন্দ্রাণী আলনা হইতে স্বামীর গায়ের চাদরখানি টানিয়া পাশের দরজা দিয়া হঠাৎ কোথায় বাহির হইয়া গেল।

শচীর কাজেও সেদিন বিশৃঙ্খলা লাগিয়াছে। অনিল ফিরিয়া আসিল, রান্না তখন মোটে সুরু হইয়াছে। অনিল বার-বার তাড়া দিয়া রান্নাঘরের পাশেই ঘুরিতেছিল। শচী ঝোল নামাইয়া ভাত চড়াইয়াছে, এমন সময় তাহাদের বিস্মিত করিয়া ইন্দ্রাণী আসিয়া দাঁড়াইল। অনভ্যস্ত বেশে চাদর জড়াইয়া সে আসিয়াছে—সঙ্গে চাকরও নাই। উভয়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেই ইন্দ্রাণী বলিল—অনিল বাবু, আপনি একটু বাইরে যান, শচীর কাছে আমার দরকার।" অনিল বাহিরে গেলে সে শচীকে জিজ্ঞাসা করিল, নটু কোথায় ভাই? তাকেই আমার বড্ড দরকার। শচী বলিল, সে ত এসেই বেড়াতে গেছে। একটি দিনও বাড়ি থাকে না, আর এর মধ্যে কি ক'রে যে দলবল জুটিয়েছে। কি কাজ ভাই, বল না আমায়।

ইন্দ্রাণী বারেক ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, ও'র সোনার ঘড়িটা সেই থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। জানত ভাই কি সৌখীন লোক, ঘড়ি ছাড়া এক দণ্ড থাকেন না। সেই নটু যেখানে ছবি দেখছিল সেইখানে ঘড়িটা ছিল কি না। কিছু মনে ক'রো না ভাই,—ছেলেমানুষ ভুলে যদি হাতে নিয়েই থাকে। শচী থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। সে শুষ্ক কণ্ঠে কোন মতে শুধু বলিল—নটু?

—হ্যাঁ ভাই,—নটু ছাড়া আর কেউ সে ঘরে যায়নি। একবার ঘড়িটা তাকে নাড়তে দেখেছিলাম। ঘড়িটা যদি এনেই থাকে চুপি চুপি আমায় ফিরিয়ে দিও ভাই, কেউ জান্‌তে পাবে না। ইন্দ্রাণী যেমন আসিয়াছিল তেমনি দ্রুতপদে ফিরিল।

অনিল শোবার ঘরে দাঁড়াইয়া ছিল। গর্হিত জানিয়াও সে আড়াল হইতে ইন্দ্রাণীর কথা শুনিয়াছে! ইন্দ্রাণী চলিয়া যাইতেই সে শচীকে দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পথে বাহির হইয়া গেল। তার চোখে মুখে জ্বালা ধরিয়াছে যেন। শরীরও কাঁপিতেছে। যদি মিথ্যা হয়—ভদ্রতার মুখোসকে চিনিয়া রাখিল এবার।

ঘণ্টা দুই পরে অনিল ফিরিল। নটুর হাত তাহার বজ্রমুষ্টিতে আবদ্ধ। চক্ষের পলকে শচী ব্যাপারটা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিল। ভাত দুটি নামাইয়া সেই যে কখন শচী ভুঁয়ে বসিয়াছে আর উঠে নাই। জল দিতে আসে যে লোকটি সে-ই শচীকে অপ্রকৃতিস্থ বুঝিয়া করুণায় একটি আলো জ্বালাইয়া গিয়াছে।

অনিলের মুখ যেন ফাটিয়া পড়িতে বাকী। গরিব সে, কিন্তু সততার সম্মান যে তার জীবনের সম্পদের ভিত্তি। এই জন্যই না সে সকলের প্রিয়পাত্র। কিন্তু সে বিশ্বাস দূরে থাক্‌, লোকে বলিবে চোর পরিবার। এই জায়গায় কেমন করিয়া সে আর থাকিবে, মুখ দেখাইবে?

শচী নিঃসাড় হইয়া বসিয়া ছিল। অনিল তাহাকে শুনাইল কি করিয়া নটু ঘড়িটাকে পাথরে ঠুকিয়া চুরমার করিয়াছে। ভাবিয়াছিল কেহ চিনিতে পারিবে না কিন্তু নামের অক্ষরগুলি যে ডালার পিছনে খোদা তা আর বুদ্ধিমানের নজরে পড়ে নাই। ভাঙা ঘড়ি বলিয়া কর্ম্মকারকে বিক্রি করিয়া বন্ধুবর্গ লইয়া মেঠাই খাওয়া হইতেছিল। ভাগ্যে অনিল সে সময় যায় নইলে কুড়ি টাকার মধ্যে পোনের টাকা ফিরিয়া পাওয়া যাইত না। কত কষ্টে কর্ম্মকারকে ভয় দেখাইয়া ঘড়ি আদায় করিয়াছে। এত লাঞ্ছনাও অনিলের পাওনা ছিল! অশোকের বাড়িতে তাহার অবশিষ্ট-টুকু পূর্ণ হইয়াছে। যদিও অশোক তাহার চিরাচরিত

ভদ্রতায় ভাঙা ঘড়িটি গ্রহণ করিয়া নটুর শাসনের ভার তাহার হাতেই দিয়াছে তবু তাহাদের দাসীর কণ্ঠ ভিতর হইতেই তাহাকে শুনাইয়া বলিয়াছে, তখুনি বলেছিলুম—নিদ্দুসীর হয়রান শুধু, ওদের পেটে পেটে এত। ঐটুকুন ছেলে, কে জানে ওদের শিক্ষা কেমন? নিজে থেকে কি আর অত কাণ্ড মাথায় আসে।

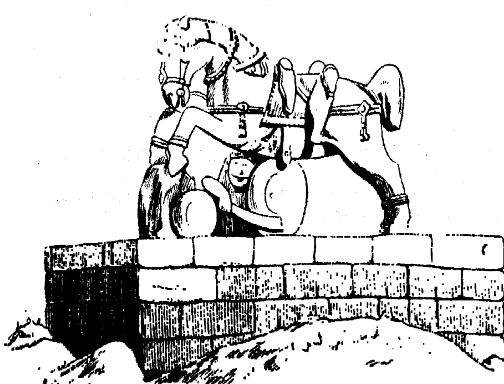
কেন যে অনিল স্ত্রীকে খুশী করিতে নটুকে আনিয়াছিল! নির্ব্বোধ, নইলে অজানা একটা ছেলের ভার লইতে যায়? কম্পিত কণ্ঠে বলিতে বলিতে সে নটুকে দুই-চার ঘা প্রহার দিতে লাগিল। এ অপমানের জ্বালা তাহাকে চিরদিন বহিতে হইবে। শচী সমস্ত শুনিল—শরীর মন তাহার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। নটুর আর্ত্ত রোদনেও সে নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। নটু কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানেই ঘুমাইলে অনেক রাত্রে অনিলকে দুটি খাইতে দিয়া শচী হাঁড়িতে জল ঢালিয়া দিল।

যেমন আনিয়াছিল সেইরূপ অনুনয়ে শচী আবার নটুকে পাঠাইল দেশে। এবার যাওয়ার খরচ দিতে তার কানের মাকড়ীজোড়া শচী বিক্রী করিয়াছে।

আবার সেই নিঃসঙ্গ দিনযাপন। ভাইকে মানুষ করা দূরে থাক্ শচীর জীবনে ঘুণ ধরিয়াছে যেন! কোন কাজে উৎসাহ নাই, দিনব্যাপী অবসাদ শুধু তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সে আর উঠানে দাঁড়ায় না। ইন্দ্রাণীর দিকে চোখ পড়িলে তখনি চোখ ফিরাইয়া নেয়। ইন্দ্রাণীর চোখেও ইহা এড়ায় না। সনিশ্বাসে সে ভাবে কিছু ত বলি নি আমি। সখীর ভাব দেখিয়া তারও কেমন সঙ্কোচ আসে।

শচীর কাজ এমনই অগোছাল হইয়াছে, কে বলিবে আগেকার সেই শচী। নানাবিধ রন্ধনে সে আর অনিলকে তৃপ্ত করে না। কুমড়ালতায় ফুল ধরিয়া আপনিই শুকায়, তিল পিঠালি মুড়িয়া ভাজিতে শচী ভুলিয়া গিয়াছে। অনিলের খাওয়া শেষ হইলে আর নড়িবার লক্ষণ দেখা যায় না। তবে পুরাতন সাথী সেই ব্রহ্মপুত্র, তাহার দিকে চোখ রাখিয়া কি যে ভাবে শচী! গত দিনগুলির সুখের চিত্র কল্পনায় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে কখনও, মনে জাগে মমতাময়ী ইন্দ্রাণীর করুণাসহাস হাসি। সেইখানে বসিয়াই বেলা শেষ হইয়া যায়। অনিল তাহার ম্লান মুখ দেখিয়া কাজের ত্রুটিগুলি মার্জ্জনা করিয়াই চলে। সন্ধ্যার অন্ধকার না ছাইলে শচীর উঠিবার তাড়া দেখা যায় না আর। শচীর ভাই যদি মরিয়া যায়। শচী ভাবে যারা খেতে পায় না মরণ নাকি তাদের সহজ, ওরা যেন মরে যায় ঠাকুর! ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞাতে কখন শচীর চোখে জল ঝরিতে থাকে—পাহাড়ের অন্য দিকে নরসিংহ-বাড়ির আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, শচীর তখন হুঁস হয়। অশ্রুসিক্ত আঁখি অঞ্চলপ্রান্তে বার-বার মুছিয়া করজোড়ে সে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলে—আমায় ক্ষমা কর ঠাকুর, ক্ষমা কর।

ভাইদের অকল্যাণ-কামনার গ্লানিতে অনুতপ্ত চিত্তে সেখানে বার-বার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া পুনরায় বলে—তাদের সুমতি দিও ঠাকুর, সুমতি দিও শুধু।



ভারতে মনঃসমীক্ষা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

মনঃসমীক্ষার ইংরেজী প্রতিশব্দ Psycho-analysis। এই নববিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা, স্রষ্টা, এবং প্রচারক ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়ড। তিনি নিজে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মনঃসমীক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস (On the History of Psycho-analytical Movement) নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, "মনঃসমীক্ষা আমার সৃষ্টি" ("psycho-analysis is my creation")। মনঃসমীক্ষার সৃষ্টিতে প্রকারান্তরে অনেকে সাহায্য করেছেন। ডাঃ ব্রয়র (Brewer), ডাঃ সারকো (Charcot) ও ডাঃ শ্রোবাক (Chrobak)-এর সাহায্যে ডাঃ ফ্রয়ড যখন মানসিক রোগের আলোচনা ও পরীক্ষা করছিলেন তখন থেকেই তিনি মনঃসমীক্ষার ইঙ্গিত পান। কিন্তু যখন মনঃসমীক্ষা বিজ্ঞান হয়ে জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের সামনে এসে হাজির হ'ল, তখন যে নিন্দা ও অশ্রদ্ধা এই নবমুকুলিত বিজ্ঞানকে উদ্দেশ ক'রে এর স্রষ্টার ওপর বর্ষিত হ'তে লাগল, ফ্রয়ডই হলেন তার একমাত্র লক্ষ্য।

মনঃসমীক্ষার জন্ম হয়েছে মানসিক রোগের ধারা ও নিরাময়তার উপায় অনুসন্ধান করার ফলে। ১৮৮০-৮২ সালে ব্রয়র সাহেবের কাছে শিক্ষানবীশীকালে ফ্রয়ড যখন এক হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগিণীকে আরোগ্য করবার চেষ্টা করছিলেন তখন তিনি মনঃসমীক্ষার পথ খুঁজে পান। রোগিণী নিজের গত জীবনের ঘটনাবলী সহানুভূতি-সম্পন্ন চিকিৎসকের কাছে নিঃসঙ্কোচে ব'লে যান। এই ব'লে যাওয়ার ফলে তাঁর মানসিক অবস্থা ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। যে-ব্যক্তি কোষ্ঠবদ্ধতায় কষ্ট পাচ্ছেন, কায়িক চিকিৎসকেরা তাঁর শারীরিক উন্নতির জন্য জোলাপের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। জোলাপের সাহায্যে দেহে আবদ্ধ মল নিষ্ক্রমণের পথ পায় এবং এই নিষ্কৃতি দৈহিক অবস্থাকে সহজ ক'রে দেয়। ফ্রয়ড মনের নিরুদ্ধ আবেগকে বাইরে আনবার জন্য ঐরূপ উপায়ের সাহায্য নিয়েছেন এবং এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন Cathersis বা বিরেচন।

এই বিদ্যার উদ্ভাবন ও প্রচলনের আগেও মনের রোগের কারণ নির্ণয় ও আরোগ্যের চেষ্টা চিকিৎসকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। সাইকিয়েট্রী (Psychiatry) নাম নিয়ে যে-বিদ্যা পিনেল (Pinel)-এর সময় থেকে চলে আসছিল, তারও একটা উদ্দেশ্য মানসিক রোগের আলোচনা। ফ্রয়ডের সময় ডাঃ সারকো এই দলের নেতা। ফ্রয়ড তাঁর কাছে ছাত্র-হিসাবে যান। সাইকিয়েট্রীর যুগে মনের রোগ সারাবার ব্যবস্থা হ'ত রোগীকে সংবেশিত (hypnotize) ক'রে। সংবেশনের (hypnosis) সাহায্যে রোগীর স্বাভাবিক মনের বাধাকে নিষ্ক্রিয় ক'রে চিকিৎসক তার ওপর অভিভাবের (suggestion) প্রয়োগ করতেন। তার ফলে রোগের মাত্রার কিছু উপশম হলেও রোগী সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক হ'ত না। পূর্ব্বতন মন-চিকিৎসকগণ (Psychiatrists) রোগীর মনের বিকাশ ও প্রকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। উক্ত উপায়ে চিকিৎসা করার পর রোগীর সেই মানসিক ব্যাধি থেকে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যেত। আরও দেখা গেল, অনেক ব্যাধিগ্রস্তকে সংবেশিত করা সম্ভবপর নয়।

ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়ডই প্রথম রোগীর মানসিক রোগের উৎপত্তির ইতিহাস ও ধারা অবলম্বন ক'রে তার মনের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা করলেন। তাঁর প্রথানুযায়ী মনের বিকার লক্ষ্য ক'রে মনের স্বাভাবিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও ধারণা করা যায়। কি ক'রে তিনি এই বিদ্যার ভিত্তি বিজ্ঞানের সংজ্ঞার ওপর প্রতিষ্ঠিত করলেন সে-সব কথার বিশদ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। ফ্রয়ড নিজে তিনটি প্রবন্ধে তার আলোচনা করেছেন—প্রথম ১৯১০ সালে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাকালে *The Origin and Development of Psycho-analysis* শীর্ষক প্রবন্ধে,

.৯১৪ সালে *On the History of Psycho-analytical Movement* এবং তার পর *The Problem of Lay-analysis* পুস্তকে নিজের স্মৃতিকথার মধ্যে মনঃসমীক্ষার ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া তাঁর বহু কৃতী ছাত্র এবং সহকর্ম্মী উক্ত বিষয়ে বহুস্থানে যথেষ্ট বিচার করেছেন। এখানে ফ্রয়ডীয় তত্ত্বের মূলকথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক।

ফ্রয়ডীয় তত্ত্ব মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের সুস্থ করার উদ্দেশ্যে আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু যখন এই বিদ্যা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়ে মনঃসমীক্ষা বিজ্ঞানে পরিণত হ'ল তখন তার প্রযোজ্যতা ও প্রয়োগের পরিধি অনেক বেড়ে গেল। আমাদের মানসিক বিকারকে সুস্থ অবস্থায় এনে জীবনযাত্রাকে সহজ করবার প্রয়াস মনঃসমীক্ষার যেমন আছে, তেমনই স্বাভাবিক মানুষের মন ও ব্যবহার সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান বিতরণে সে বিজ্ঞান সমর্থ। মন ও বস্তুকে নিয়ে সমস্ত পৃথিবী গঠিত। বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে, সেগুলির ব্যবহারিক ও জ্ঞানবিষয়ক দুই গুণ আছে। মনঃসমীক্ষার বিষয়বস্তু মন হলেও এই বিজ্ঞান সেই প্রকার গুণাত্মক। কিন্তু প্রত্যেকে আমরা নিজ মনের ও তৎসম্বন্ধীয় গর্ব্বের অধিকারী ব'লে মন-সম্বন্ধে জ্ঞানকে আমরা অপরের কাছ থেকে গ্রহণে পরাঙ্মুখ। যদিবা সে বিদ্যার জ্ঞান-বিষয়ক গুণকে আমরা স্বীকার করি, তার ব্যবহারিক উপকারিতাকে নানা কারণে উপেক্ষা করি। এই উপেক্ষার মধ্য দিয়ে মনোবিদ্যাকে বাঁচতে হয়েছে ও হচ্ছে। তাই এর প্রচার তত বহুল নয়। চার্ল্‌স্‌ মায়ার (Meyer) ১৯২৯ সালের মে মাসের 'রিয়ালিষ্ট' (*Realist*) পত্রিকায় 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল সাইকলজি' নামক প্রবন্ধে সে-সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। মনঃসমীক্ষাকে উপেক্ষা করার কারণ আরও গুরুতর। মনঃসমীক্ষা নির্জ্ঞান মন নিয়ে আলোচনা করে, তাই তার সূত্রগুলি সাধারণের কাছে প্রীতিকর নয় বরং পরিহার্য্য, এবং নিরুদ্ধ ইচ্ছার স্থিতি নির্জ্ঞান মনে ব'লে তার জ্ঞান আমাদের কাছে স্বীকারযোগ্য নয়। কামজ প্রবৃত্তির সঙ্গে মনঃসমীক্ষা জড়িত ব'লে এবং কামজ প্রবৃত্তি আলোচনার সম্পূর্ণ অযোগ্য ব'লে ধারণা সাধারণের মনে দৃঢ় থাকায় মনঃসমীক্ষা উপেক্ষার কারণ হয়েছে।

মনের যে-অংশটুকুকে এতদিন মানুষ মন ব'লে যে অস্পষ্ট কল্পনা ক'রে এসেছে সেই সংজ্ঞান (conscious) মনের সঙ্গে নির্জ্ঞান মনের সম্বন্ধ আলোচনা করে মনঃসমীক্ষা। লেখার ভুল, বলার ভুল, ভুলে যাওয়া প্রভৃতি নির্জ্ঞান মনের প্রকাশকে তুচ্ছবোধে সভ্যতা এতদিন আলোচনার বাইরে রেখে এসেছিল। কিন্তু মনঃসমীক্ষা এই তুচ্ছ ব্যাপারকে অবলম্বন ক'রে নির্জ্ঞান মনের পরিচয় পায়। সাধারণতঃ যে-সব অভিজ্ঞতা আমাদের রূঢ় আঘাত দেয় এবং জীবনযাত্রার পথে বাধা হয়ে পড়ে, সেগুলিকে আমরা অস্বীকার করবার চেষ্টা করি, সম্ভব হ'লে ভুলে যাই। কিন্তু সেগুলি সংজ্ঞান মনে স্থান না-পেলেও নির্জ্ঞান মনে বাসা ক'রে সংজ্ঞান মনে আসতে চায়, কিন্তু প্রতি পদেই বাধা পায়, তাই তাকে চাতুরী ও ছলনার সাহায্য নিয়ে অতর্কিত ভাবে সংজ্ঞান মনে উপস্থিত হ'তে হয়। নিরুদ্ধ ইচ্ছার এই অতর্কিত আক্রমণ হ'তে চেতনা বাঁচতে গিয়ে সেগুলিকে ভুল বিবেচনা ক'রে তার কারণ অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকে। প্রত্যেক কাজের একটা কারণ আছে, কিন্তু সব সময়ই আমরা যে কারণকে উপলক্ষ্য ক'রে কাজের অনুসরণ ক'রে থাকি, তা নয়। অনেক কাজ ক'রে ফেলে পরে সুবিধানুযায়ী তার একটা কারণ গড়ে নিই। সেই কারণ যদিবা সম্ভাব্য হয় তবু বাস্তব নয়। সভ্যতার গুণে মানুষ নিজেকে ছোট ভাবতে চায় না এবং পারে না, তাই নিজের ব্যক্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে তার অনুযায়ী একটা কারণ সৃষ্টি ক'রে নেয়। দৈনন্দিন ব্যাপারে নির্জ্ঞানের প্রভাব (Psycho-pathology of Everyday Life)এ ফ্রয়ড তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেদিন পর্য্যন্ত স্বপ্ন আমাদের কাছে সমস্যার এবং বিস্ময়ের বস্তু ছিল। মনঃসমীক্ষা স্বপ্নতত্ত্বের আলোচনা করে। আমাদের মনের নিরুদ্ধ ইচ্ছাগুলি আমাদের সংজ্ঞান মনের অগোচরে ছদ্মবেশ নিয়ে স্বপ্নে এসে হাজির হয়ে কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হয়। স্বপ্নকে বিশ্লেষণ ক'রে মনঃসমীক্ষক আমাদের নির্জ্ঞান মনের কার্য্যকলাপ বুঝতে পারেন। ভাষায় যেমন আমরা বহুলোকের মনের ভাব একই রকম প্রতীকের (symbol)

সহায়তায় প্রকাশ ক'রে থাকি, স্বপ্নেও তেমনই যে-সব প্রতীক ব্যবহৃত হয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি সমঅর্থবোধক। এই সব প্রতীকের ব্যাখ্যা ক'রে স্বপ্নের অর্থ আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। মনঃসমীক্ষাকে যৌনতত্ত্ব ব'লে অনেকে অপবাদ দিয়েছেন। মনঃসমীক্ষকের কামজ বৃত্তির ধারণা সাধারণের যৌনমতের মত নিকৃষ্ট এবং হেয় নয়। তা ছাড়া মানসিক ব্যাধির আলোচনা ক'রে দেখা গেছে, কামজ বৃত্তি আমাদের জীবনের এবং কার্য্যাবলীর অনেকখানি অধিকার ক'রে আছে। যৌন প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছার তৃপ্তির পথে সভ্যতা অনতিক্রমণীয় বাধার সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। কাজেই সমাজে বাস করতে গিয়ে মানুষকে যৌনসংক্রান্ত অনেক ইচ্ছা দমন করতে হয়। পরে সেই সব ইচ্ছা নিরুদ্ধ হয়ে মানসিক ব্যাধির কারণ হয়ে পড়ে।

এদেশে পুরাকালে মন-সম্বন্ধে বহু আলোচনা হ'ত। কিন্তু সে-সব আলোচনা দর্শনের প্রকৃতি ত্যাগ ক'রে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে আসে নি ব'লে মনে হয়। যদিও একথা স্বীকার করতে হবে যে, প্রাচীন ঋষি এবং যোগীরা মনের ওপর অধিকার স্থাপনে এবং মনের গতিকে সংযত ও সুসংবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তবুও একথা বলা চলে না যে একালের মনঃসমীক্ষা সে-যুগের জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি বা নবসংস্করণ।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে মনঃসমীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা ব্যক্তিগত ভাবে কয়েক জনের মধ্যে আরম্ভ হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রাবস্থায় ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রথম এদেশে মনঃসমীক্ষার চর্চ্চা সুরু করলেন। ইউরোপে ফ্রয়েডের মত, এদেশে বসু-মহাশয় মনঃসমীক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠাবান প্রচারক।

১৯১০ সালে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু কায়-চিকিৎসার (Medical) শিক্ষা শেষ করেন এবং তখন থেকেই তিনি মানসিক ব্যাধির কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত। ফ্রয়ডের মতই তিনি গোড়াতে সংবেশনের সাহায্যে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তিনি দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসাও করতেন। তারও অনেক পরে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় এম-এ পরীক্ষায় পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যা (Experimental Pychology) পড়বার ব্যবস্থা করলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ঐ বিষয়ে এম-এ পাস করলেন। ঐ বিষয়ের ছাত্র-হিসাবে গিরীন্দ্রবাবু তাঁর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামন্দিরে এসেছেন। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-বিষয়ে মনঃসমীক্ষার স্থান স্পষ্টতঃ ছিল না এবং উক্ত বিষয়ে শিক্ষার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। পরে মনঃসমীক্ষা পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যার মধ্যে ন্যায্য স্থান অধিকার ক'রে নেয়। মনঃসমীক্ষাকে মনোবিদ্যার অন্তর্গত ক'রে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় মনোবিদ্যার সঙ্গে মনঃসমীক্ষার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্বীকার ক'রে নেন। একমাত্র ভারতবর্ষেই প্রায় প্রথম থেকে মনোবিদ্যার সঙ্গে মনঃসমীক্ষা যোগ্য আসন পেয়ে এসেছে। পৃথিবীর অন্য দেশে মনঃসমীক্ষাকে অন্য ক্ষেত্রে বর্দ্ধিত হ'তে হয়েছে, পরে সেই বিকশিত বিজ্ঞান মনোবিদ্যার অন্তর্গত স্বীকৃত হয়েছে। যখন এদেশের মনঃসমীক্ষার নেতা প্রথম উক্ত বিষয়ে জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞানার্জ্জন করছিলেন তখন তাঁর অসুবিধা ছিল—উপযুক্ত বইয়ের অভাব। আমরা এদেশে ইংরেজীর সাহায্যে বিদ্যালাভ এবং পৃথিবীর অন্য দেশের ভাবধারা বুঝে থাকি। ১৯০৯-১৯১০ সালে অষ্ট্রীয়াতে মনঃসমীক্ষার চর্চ্চা হ'ত এবং তার বাহন ছিল জার্ম্মান ভাষা। সেই সব চর্চ্চার বিবরণ ইংরেজী ভাষাতে প্রায় অনূদিতই হ'ত না, ইংলণ্ডে তখন মনঃসমীক্ষা প্রকট হয়ে ওঠে নি ব'লে। ১৯২১ সালে প্রকাশিত অবদমনতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় 'কনসেপ্ট অফ্ রিপ্রেশন' (*Concept of Repression*) পুস্তকের ভূমিকায় গিরীন্দ্রশেখর সে বাধার উল্লেখ করেছেন। এই অনতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হয়ে তিনি নিজের প্রতিভার অনুসন্ধিৎসাকে প্রকাশ করতেন নিজে রোগের পরীক্ষা এবং আলোচনা ক'রে। ইউরোপের মনঃসমীক্ষার নেতার সঙ্গে এদেশের মনঃসমীক্ষার নেতার সেদিক থেকে মিল আছে। আজ মনঃসমীক্ষা-শিক্ষার বিধিমতে নিজের মনকে সমীক্ষিত হ'তে দিতে হয়। কিন্তু এঁদের আগে স্ব-স্ব দেশে মনঃসমীক্ষক ছিল না ব'লে, নিজেদের মনকে নিজেরাই সমীক্ষিত করেছেন স্বপ্ন প্রভৃতি বিশ্লেষণ ক'রে। সে সময়ের অনেক পরে ডাঃ সরসীলাল সরকার এবং শ্রীযুক্ত রবীন্ হালদার মনঃসমীক্ষার আলোচনা করেছেন বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখে, কিন্তু এঁদের দু-জনকে যথার্থ সমীক্ষক

বলা যায় কিনা সন্দেহ। ১৯১৯ সালে ডাঃ বার্কলে হিল রাঁচির পাগলাগারদের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে এদেশে আসেন। তিনি মনঃসমীক্ষার চর্চ্চা করেছেন এবং নিজে সমীক্ষক। তিনি বিলাতে সমীক্ষিত হয়েছিলেন। ১৯২১ সালে মনঃসমীক্ষা সম্বন্ধে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ইংরেজী ভাষায় এবং ইউরোপীয় পত্রিকায়। ১৯২২ সালে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অপমনোবিদ্যার (Abnormal Psychology) শিক্ষক নযুক্ত হন। তিনি মনঃসমীক্ষার শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। অপমনোবিদ্যার শিক্ষক হিসাবে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং তার পরে শ্রীযুক্ত হরিপদ মাইতির নাম উল্লেখযোগ্য। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ মনোচিকিৎসক (Psychiatrist), কিন্তু সমীক্ষক নন।

মনঃসমীক্ষার কেন্দ্রীভূত আলোচনার সুবিধার জন্য ১৯২২ সালে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু তাঁর কয়েক জন বন্ধু এবং সহকর্ম্মীর সাহায্যে একটি পরিষৎ গড়ে তোলেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য মনঃসমীক্ষা অনুশীলন, শিক্ষা ও প্রচার। ১৯২২ সালে মনঃসমীক্ষা-পরিষৎ (Indian Psycho-analytical Society) স্থাপিত হয়ে আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা - সমবায়ের (International Psycho-analytical Association) সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ডাঃ বসু তার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং তাঁর বাড়িতে পরিষদের কার্য্যালয় এবং সভা হ'ত। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, গোবিন্দচন্দ্র বোরা, হরিপদ মাইতি, সুহৃৎ চন্দ্র মিত্র ও গোপেশ্বর পাল—ভারতীয় মনঃসমীক্ষা-পরিষদের প্রথম সভ্যের দল। তখন পৃথিবীর মধ্যে আটটি আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা-সমবায়ের মাত্র আটটি শাখা-পরিষদ ছিল। আমেরিকায় দুইটি, ইংলণ্ডে একটি, জার্ম্মানীতে একটি, এবং হলাণ্ড, সুইটজারল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী এবং অষ্ট্রীয়া প্রত্যেক দেশে একটি ক'রে শাখা-পরিষদ ছিল। এশিয়ায় একটিও ছিল না। জাপানে ভারতবর্ষের পরে শাখা হয়েছে। ঐ সমবায়ের মুখপত্র ভাবে জার্ম্মান ভাষায় একটি এবং ইংরেজীতে একটি পত্রিকা আছে। ১৯২২ সালে ভারতের মনঃসমীক্ষার নেতা আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা-সমবায়ের ইংরেজী মুখপত্র ইনটারন্যাশানাল জার্নাল অফ্ সাইকোএনালিসিস্-এর সাহায্যকারী-সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে গণ্য হন। এর অনেক আগে থাকতে তিনি বিলাতী কাগজে মনঃসমীক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতেন।

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা-পরিষদের একটি পুস্তকাগার আছে। মনঃসমীক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকই সেখানে থাকে এবং উৎসুক ছাত্রগণের মধ্যে মনঃসমীক্ষা-শিক্ষার জন্য একটি কেন্দ্র আছে। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সেখানে উক্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারেন। ভারতের নানা জায়গা থেকে এখানে ছাত্র আসে। ভারতীয় মনঃসমীক্ষা-পরিষদের সভ্যতালিকায় অনেক ইউরোপীয় এবং সৈন্য-বিভাগের চিকিৎসকেরা আছেন। যাঁরা চিকিৎসা-ব্যাপারে সম্যকভাবে মনঃসমীক্ষা প্রয়োগ করতে পারেন এমন বিশেষজ্ঞদের একটি তালিকা উক্ত পরিষদ তৈরি করেছেন। ঐ তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণই পরিষদকর্ত্তৃক সমীক্ষক ব'লে গণ্য এবং আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা-সমবায় দ্বারা অনুমোদিত। যাঁরা শিক্ষার্থী হয়ে আসেন তাঁদের মানসিক ব্যাধি না-থাকলেও সমীক্ষার নিয়ম অনুযায়ী নিজের মন অপর সমীক্ষকের কাছে সম্পূর্ণভাবে সমীক্ষিত হ'তে দিতে হয়। প্রায় তিন বছর শিক্ষালাভের পর তিনি সমীক্ষণ কাজে অধিকারী ব'লে গণ্য হন। এই সম্পর্কে বলা দরকার, এক ভারতবর্ষেই প্রথম থেকে মনঃসমীক্ষা কায়-চিকিৎসক ব্যতীত অপরের মধ্যে আলোচিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যাঁরা কায়-চিকিৎসক নন অথচ সমীক্ষা ক'রে থাকেন তাঁদের সাধারণতঃ 'লে-এনালিষ্ট' (Lay-analyst) বলা হয়। এঁদের মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার অধিকার নিয়ে ইউরোপে বিতর্ক উঠেছিল এবং তাঁদের অধিকার স্বীকার ক'রে ফ্রয়ড নিজে প্রবন্ধ লিখেছেন। তবু তাঁদের সম্পর্কে 'লে-এনালিষ্ট' ব'লে তাঁদের সঙ্গে এক হ'তে বাধা আছে, প্রমাণ করা হয়েছে। ভারতবর্ষে সে ভাব সাধারণ কিংবা সমীক্ষকদের মনে আসে নি।

১৯২২ সালে ভারতীয় মনোবিদ্যা সমিতি (Indian Psychologicial Association) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২৫ সাল থেকে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে একটি ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ্ সাইকলজী

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালেই মনঃসমীক্ষা-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ—'মনঃসমীক্ষায় অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি' (*Free Association Method in Psycho-analysis*— G. Bose) প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তখন থেকেই মনঃসমীক্ষা সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ উক্ত পত্রিকায় বেরিয়েছে ও মনঃসমীক্ষার আলোচনার ক্ষেত্রাভাবে ভারতে মনঃসমীক্ষা আন্দোলনকে পত্রিকাখানি যথেষ্ট সাহায্য ক'রে এসেছে।

ভারতের দেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র বাংলা ভাষাতেই মনঃসমীক্ষার প্রবন্ধ বেরিয়েছে। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙীন হালদার লিখিত 'মনের রোগ', ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'কারণতত্ত্ব' (Causality) এবং সেই সালের পৌষ সংখ্যায় ডাঃ সরসীলাল সরকারের 'মনের ঘাতপ্রতিঘাত' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর পরে 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় মনঃসমীক্ষা সম্বন্ধে অনেক বাংলা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তা ছাড়া বাংলা ভাষায় ঐ বিষয়ে দুখানি বই আছে। ডাঃ সরসীলাল সরকারের 'মনের কথা' ১৩৩২ সালে এবং ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'স্বপ্ন' ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। সরসীবাবুর 'মনের কথা' বাংলা ভাষায় প্রথম মনঃসমীক্ষা-বিষয়ক বই। ১৯২৪ সালে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সভা (Indian Science Congress) মনোবিদ্যাকে পৃথক বিজ্ঞান বিবেচনা ক'রে সর্ব্বপ্রথম আলোচনার সুযোগ দিলেন এবং সেই বৎসর গিরীন্দ্রবাবু ইচ্ছা-দ্বন্দ্ব তত্ত্ব (*The Theory of Opposite Wish*) নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেখানে মনোবিদ্যা-শাখার অধিবেশনে মনঃসমীক্ষার আলোচনা হয়ে থাকে। ১৯৩৩ সালে মনোবিদ্যা-শাখার সভাপতির অভিভাষণে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু 'মনোব্যাপারের নূতন ব্যাখ্যা' (*A New Theory of Mental Life*) পড়ে মনঃসমীক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মত এবং মনঃসমীক্ষার সাহায্যে মানুষের মন সম্বন্ধে তিনি যে জ্ঞান লাভ করেছেন, তা ব্যক্ত করেন।

১৯৩১ সাল থেকে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের বাৎসরিক স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীতে মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Hygiene) শাখা খোলা হয়ে আসছে। সেখানে মনঃসমীক্ষার জ্ঞান মনোবিদ্যার পাশাপাশি ছবি ও বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সর্ব্বসাধারণের মাঝে প্রচার করা হচ্ছে। মানসিক ব্যাধির কারণ-নির্ণয়ে এবং আরোগ্যলাভে মনঃসমীক্ষা সাহায্য করতে পারে,—প্রতি বৎসর ডাঃ বসু তাঁর সহকর্ম্মী এবং ছাত্রগণের সহায়তায় ছবি, বিজ্ঞাপন, ও বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে এ-কথা বুঝিয়ে থাকেন। মনঃসমীক্ষার জ্ঞান মানসিক উন্নতি ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে এটা বোঝাবার জন্যে দুইখানি পুস্তিকা বিনামূল্যে প্রদর্শনীর দর্শকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা এবং শিক্ষাদান কল্পে যে মানসিক স্বাস্থ্য সমিতি (Indian Asociation for Mental Hygiene) আছে তার ভারতীয় শাখার অধিবেশনে সমবেত ইউরোপীয় ও ভারতীয় নরনারীদের মধ্যে ডাঃ গিরীন্দ্রশের বসু, ডাঃ বার্কলে হিল, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ পণ্ডিতগণের দ্বারা বক্তৃতার অনুষ্ঠান হয়। প্রতি মাসে এক দিন ক'রে ঐ অধিবেশন হয়। যে-কোন ব্যক্তি উক্ত সভার অধিবেশনে উপস্থিত হ'তে পারেন এবং বক্তৃতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করতে পারেন। এ-সমিতি প্রথমে ইউরোপীয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত হরিপদ মাইতি এর বর্ত্তমান সম্পাদক।

মানসিক ব্যাধি ব্যাপারে যাতে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া সর্ব্বসাধারণের কাছে সুসাধ্য হয় সেই জন্য ১৯৩৩ সালের ১লা মে থেকে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে একটি মানসিক চিকিৎসাগার (Psychological Clinic) খোলা হয়। ডাঃ বসু এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা এবং তিনি নিজে উপস্থিত থেকে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতি বার সকালে আটটা থেকে দশটার মধ্যে নিয়মিত ভাবে বিনামূল্যে চিকিৎসা ক'রে থাকেন। প্রয়োজন বিবেচনা করলে এবং রোগীর সামর্থ্য হ'লে মনঃসমীক্ষার সাহায্য দেওয়া হয়। অন্যান্য চিকিৎসা-বিধির মত সমীক্ষণ কিন্তু 'আউট ডোর'-এ ব্যবহৃত হ'তে পারে না, তবু সমীক্ষণের জ্ঞানের সাহায্যে তাদের রোগের কারণ বার করা হয় এবং যত দূর সম্ভব তার সাহায্য দেওয়া হয়।

এই মানসিক চিকিৎসাগার খোলবার আগে ১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাস থেকে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের

মনোবিজ্ঞান-বিভাগের কর্তৃত্বে মানসিক রোগীদের পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। শ্রীযুক্ত হরিপদ মাইতি ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ ভাবে উক্ত কার্য্যে সাহায্য করেছেন। আজ পর্য্যন্ত অনেক রোগী এই 'ক্লিনিক'-এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। বাংলা-সরকার তরুণ অপরাধীদের অপরাধনির্ণয়ে এবং তাদের স্বাভাবিক মানুষে পরিণত করবার জন্যে এই চিকিৎসাগারের সাহায্য নিয়ে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজ্যতাকে স্বীকার করেছেন। যদিও এই রোগীদের প্রতি সমীক্ষণের যথার্থ রীতি প্রয়োগ করা হয় নি, তবুও বলা যায় মনঃসমীক্ষার জ্ঞানের সাহায্যে রোগকে বিচার করবার চেষ্টা হয়েছে।

মনঃসমীক্ষার প্রচারের জন্য ভারতের মনঃসমীক্ষকগণ সাধারণ সভাসমিতিতে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। ডাঃ বার্কলে হিল, ডাঃ বসু, মন্মথ বাবু ও ডাঃ সুহৃৎ চন্দ্র মিত্রের নাম সেই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষে মনঃসমীক্ষার ওপর নিন্দা বা কটূক্তি বর্ষিত হয় নি, এমন কি মনঃসমীক্ষার নেতাকে বিদ্রূপ পর্য্যন্ত সইতে হয় নি। মনঃসমীক্ষার বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকায় লেখা হয় নি। তাই ব'লে বলা যায় না, এদেশে মনঃসমীক্ষা যথেষ্ট আদৃত হয়েছে। ভারতবর্ষে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তার মধ্যে মাত্র কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষায় মনঃসমীক্ষা অপমনোবিদ্যার অধীনে অধীত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশ থেকে এখানে শিক্ষার্থী আসছে এবং আশা করা যায় কিছু দিনের মধ্যে এই বিজ্ঞান সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষার পাঠ্যবস্তুগুলির মধ্যে স্থান পাবে। বাংলা-সাহিত্যে অনেক সময় মনঃসমীক্ষার জ্ঞানকে ভুল বুঝে ব্যবহার করতে দেখা যায়। আগেই বলেছি, নিজে সমীক্ষক না-হ'লে সমীক্ষার জ্ঞান সম্যকরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অনেক সময় দেখা গেছে কোন কোন লেখক ফ্রয়েডের মতকে বোঝবার চেষ্টা না-ক'রে বিরুদ্ধমতপোষক কোন ইংরেজ লেখকের বই পড়ে মনঃসমীক্ষার প্রতি অযথা বক্রদৃষ্টি দিয়েছেন। কোন কোন উপন্যাস পড়ে মনে হয়, লেখক নায়ক-নায়িকার চরিত্র-অঙ্কনে মনঃসমীক্ষাকে ভ্রান্তভাবে ব্যবহার করেছেন। বিজ্ঞানের ধারা হচ্ছে, কতকগুলি বিশেষ শব্দ ব্যবহার ক'রে সংজ্ঞা তৈয়ার করা। মনঃ-সমীক্ষার সেরূপ সংজ্ঞাপূর্ণ শব্দ আছে। তাহাদের ব্যবহার এবং অর্থ বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী, তাই বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্য লেখকের সেগুলি প্রয়োগ করবার সময়ে যথেষ্ট সতর্ক হওয়া উচিত।

আগেই বলেছি, ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর সঙ্গে ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের কিছু পার্থক্য আছে। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর ভারতে মনঃসমীক্ষা-আন্দোলনের নেতা, এই কারণে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের কিছু আভাস দেওয়া দরকার। ফ্রয়েডের মতে সমাজ, যশ, আচার, ধর্ম্মের রীতিনীতি, ভয়, ঘৃণা, ইত্যাদি মানসিক বৃত্তির অনুশাসন আমাদের মনের ইচ্ছার প্রকাশে বাধা দেয়। বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমাদের রুদ্ধ ইচ্ছা নির্জ্ঞান মনে স্থিতি লাভ করে। ডাঃ বসুর মতে ভয়, ঘৃণা ইত্যাদি ইচ্ছানিরোধের ফল,—কারণ নয়। এই ইচ্ছানিরোধ (Repression) সম্বন্ধে ডাঃ বসু বলেন, যতক্ষণ-না দুইটি ইচ্ছা বিপরীতগামী হয়, ততক্ষণ তাদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা নেই। পদার্থবিজ্ঞানে শুনে থাকি দুইটি গতি একই ক্ষেত্রে অবস্থিত হ'লে এবং তাদের গতিদিগ্‌রেখা (Line of Force) সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী না-হ'লে সম্পূর্ণ বিরোধ অসম্ভব। ইচ্ছার ব্যাপারে সেই সত্য আছে। ধরুন, আমার মনে ইচ্ছা আছে, আমি রামকে মারতে চাই। এ ক্ষেত্রে, (১) আমি শ্যামকে মারতে চাই। (২) শ্যাম রামকে মারতে চায়। (৩) শ্যাম আমাকে মারতে চায়। (৪) রাম শ্যামকে মারতে চায়—এর একটিও 'আমি রামকে মারতে চাই' ইচ্ছার বিপরীতমুখী হ'ল না। এদের যে-কোন একটি এবং প্রাথমিক ইচ্ছাটি একসঙ্গে মনে বিনা-বিরোধে থাকতে পারে। এমন কি, 'আমি রামকে মারতে চাই না' প্রাথমিক ইচ্ছার বিপরীত হ'ল না, মাত্র এক্ষেত্রে ইচ্ছার বিরোধ অজানা রইল। কিন্তু মনে যদি ইচ্ছা থাকে আমি রামের দ্বারা প্রহৃত হ'তে চাই তবেই বিরোধের সৃষ্টি হ'ল এবং এক্ষেত্রে যথার্থ নিরোধ সম্ভব। ডাঃ বসুর মতে এই ধরণের যুগ্ম ইচ্ছা আমাদের মনে দেখা দিচ্ছে। শিশুর ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কি উপায়ে তার মন তৈরি হয়। মনঃসমীক্ষা-সম্বন্ধে ডাঃ বসু ফ্রয়েড প্রভৃতির চেয়ে কিছু পৃথক্। তিনি রোগীর কথাবলার ওপর ঝোঁক দে-

এবং চিন্তা লিখতে উপদেশ দেন। এখন মনঃসমীক্ষার উপায় সম্বন্ধে কিছু বলব।

সমীক্ষাকাঙ্ক্ষী এবং সমীক্ষক কোন নির্জ্জন স্বল্পালোকিত ঘরে বসেন। সমীক্ষকের দিকে মাথা ক'রে সমীক্ষার্থী সোজা এবং সহজভাবে শুয়ে চোখ বন্ধ ক'রে যা মনে আসে সব ব'লে যেতে থাকেন। এখানে সমীক্ষার্থীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ক'রে নিতে হয় যে অযৌক্তিক, রহস্যজনক, বা অসংবদ্ধ যে-কোন ভাব বা চিন্তাকে তিনি নিঃসঙ্কোচে ব'লে যাবেন। সমীক্ষক একখানি খাতায় সেগুলি যথাসম্ভব সমীক্ষার্থীর কথায় টুকে যাবেন। সমীক্ষার্থীর ভাব-ভঙ্গী ও অন্য ব্যবহার তিনি লক্ষ্য ক'রে যাবেন, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত চিন্তা এবং এগুলির ভেতর দিয়ে সমীক্ষক নির্জ্ঞান মনের যে খবর পেলেন সমীক্ষার্থীকে সব বুঝিয়ে যাবেন। দিনের পর দিন এই রকম ভাবে দু-জনে বসতে হবে যতদিন-না রোগ সারে। বিনা-পারিশ্রমিকে এই কার্য্য সম্ভবপর এবং ফলদায়ী নয়। দায়িত্বহীন ব্যাপার নির্জ্ঞানের কাছে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে গৃহীত হয়। শিক্ষার্থীর পক্ষে ৫০০ শত অধিবেশন প্রয়োজন। মানসিক ব্যাধি উপশমের জন্য ২৫০ এর কম অধিবেশন আশা করা যায় না। সময়ানুবর্ত্তিতা অতি কঠোর ভাবে সমীক্ষার্থীর কাছ থেকে আশা করা হয়। সমীক্ষা-কার্য্যে নিজ গত জীবনের গোপনীয় ব্যাপার প্রকাশ করতে স্বাভাবিক অনিচ্ছা ব্যতীত নির্জ্ঞান থেকে গুরুতর বাধা এসে সমীক্ষণের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বাধা ধীরে ধীরে অপসারিত ক'রে রোগীকে সহজ ক'রে নিয়ে আসতে হয়। সমীক্ষণ খুব সাবধানে এবং বিবেচনার সঙ্গে করতে হয়। সমীক্ষণ আরম্ভের কিছুদিন পরে সময় সময় রোগীদের কাছ থেকে অত্যন্ত কঠোর নিন্দাসূচক বাক্য শুনতে হয়, সমীক্ষক এসব অবিচলিত ভাবে সহ্য ক'রে যাবেন, পরে দেখা গেছে এ-সব রোগী নিরাময় হয়ে সমীক্ষককে দেবতার মত ভাবেন।

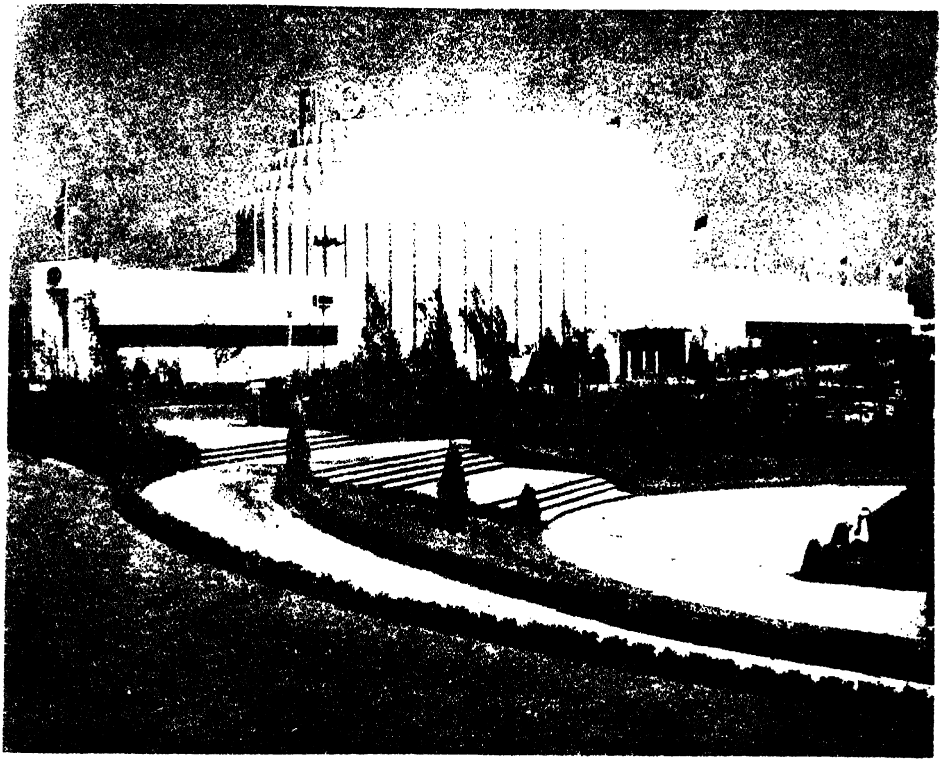
ভারতবর্ষে মনঃসমীক্ষার কথা বলতে গিয়ে বাংলা এবং বাঙালীর কথা বলতে হয়েছে। অন্য দেশের কথা বলতে পারলে সুখী হতাম। তবে উপসংহারে একটা কথা মনে পড়ছে, সেটা আমাদের মাঝে সমীক্ষিণীর অভাব। শিশুদের মধ্যে মানসিক ব্যাধি দেখা যায় এবং এদের স্বভাববিকৃত শিশু (Problem Child) বলা হয়। বিকৃত (neurotic) শিশুদের মনঃসমীক্ষা সমীক্ষিণীদের দ্বারা ভাল হয়। ইউরোপে আনা ফ্রয়ড, মিলেইনে ক্লাইন, হেলেন ডয়েস প্রভৃতি সমীক্ষিণীরা শিশুদের সমীক্ষণ ক'রে থাকেন। বাংলায় এবং ভারতবর্ষের অন্যত্র স্বভাববিকৃত শিশুর অভাব নেই।

শিকাগো বিশ্ব-প্রদর্শনী

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল, এম-এ

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শিকাগোয় নিখিল-বিশ্ব-প্রদর্শনীর প্রথম অধিবেশন হয়। তদবধি ইহা সভ্যতা ও সময়ের সহিত সমভাবে পদবিক্ষেপ করিয়া দ্রুত ও অধিকতর উন্নতির পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এই স্থানেই একদিন আমাদের বিবেকানন্দ বজ্রনির্ঘোষে হিন্দু ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমত্ব বিশ্ববাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াও মানব কিরূপে এক অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃত্বের মহান বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে, তাহা আলোচনা করিবার জন্য এই প্রদর্শনীতে পূর্ব্বের ন্যায় গত বৎসরও পৃথিবীর সমগ্র ধর্ম্মাবলম্বীদের এক মহাসম্মেলন হইয়া গিয়াছে।

গত বৎসরের বিশ্ব-প্রদর্শনী দেখিয়া দর্শকগণের স্পৃহা আরও বাড়িয়া গিয়াছে; গত অধিবেশন যেন খণ্ডিত ও অপর্য্যাপ্ত ছিল, সেইজন্য বর্ত্তমান বৎসরে অধিবেশনের অধিকতর সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। গমনাগমন ও অন্যান্য নানা বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুবন্দোবস্ত হওয়ায় প্রদর্শনী আরও জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। গত বৎসর

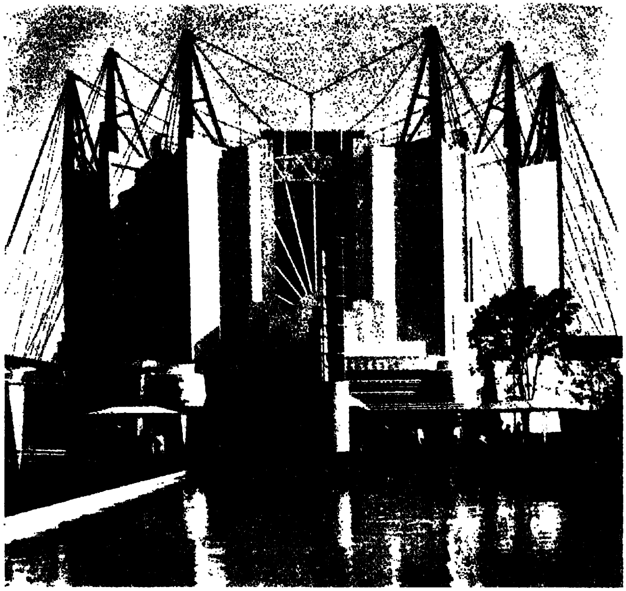


ফোর্ড মোটর কোম্পানীর প্রদর্শনী-গৃহ। ইহার নির্ম্মাণকল্পে ২০০০,০০০ ডলার ব্যয়িত হইয়াছে

২৩,০০,০০০ খানা অগ্রিম প্রবেশ-পত্র বিক্রয় হইয়াছিল; এ-বৎসর অগ্রিম বিক্রয় হইয়াছিল ৪০,০০,০০০ খানা। গত গ্রীষ্মকালে অধিবেশন আরম্ভ হয়: আমেরিকাবাসী দর্শকের দল গ্রীষ্মাবকাশে অন্যত্র ভ্রমণ করিতে না গিয়া গৃহবাসী হইয়াছিলেন। এই কারণেই বর্ত্তমান বৎসরে এত জনসমাগম হইয়াছে। এ-বৎসরের অধিবেশন গত বৎসরের অনুবৃত্তি মাত্র। সেইজন্য এখানে গত বৎসরের প্রদর্শনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৯৩৩ সালের অধিবেশন ১৭০ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষের ৪৭,৮৩,৮৩৯ ডলার ব্যয় হইয়াছে। স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্মিলিত ব্যয়ের সমষ্টি ১,০০,০০,০০০ ডলার। গত বৎসরে প্রদর্শনীতে ২২,৫৬৫,৮৫৯ জন লোকের সমাগম হইয়াছিল। আমেরিকার কোনও প্রদর্শনীতে পূর্ব্বে কখনও এত লোকের সমাগম হয় নাই। প্রবেশ-পত্র কিনিতে দর্শকগণের যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহার সমষ্টিগত পরিমাণ হইবে ৩,৭২,৭০,০০০ ডলার। প্রত্যেক প্রবেশ-পত্রের মূল্য ছিল প্রায় সওয়া-এক ডলার (১ ডলার ১৭ সেণ্ট)। চুক্তিপত্রে সই করিয়া পরিচালকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার পরিমাণ ১,০০,০০,০০০ ডলার। ১৯৩৩ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে তাঁহারা ঋণের অর্দ্ধেক পরিশোধ করিয়াছেন। অন্যান্য ঋণ প্রভৃতি পরিশোধ করিবার পরও

পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ১২,০০,০০০ ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। রেলযোগে ৪০,০০,০০০ জন, মোটরযান যোগে আরও এক লক্ষ এবং অন্যান্য যান-বাহনাদিতে ৪০,০০,০০০ লোক গত অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত সমস্ত রাজপথ বিচিত্র আলোকমালায় বিভূষিত হইয়াছিল; পত্রপুষ্প-সুশোভিত সুবৃহৎ তোরণদ্বারে জাতীয় পতাকা বায়ুভরে তরঙ্গায়িত হইল; সমগ্র রাজপথ ও পান্থশালা যানবাহনাদি ও বিচিত্র-বর্ণের নানা [illegible] বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন-সমাগমে বিকীর্ণ হইয়া উঠিল। জলরেখা-পরিবেষ্টিত নগরী দীপমালায় শোভিত হইয়া এক অপরূপ শ্রী ধারণ করে। বিভিন্ন জাতির উপস্থিতি এই বৈচিত্র্যকে আরও বিচিত্রিত করিয়া তোলে!



যান-বাহনাদির প্রদর্শনী গৃহ। উপরের ছাদকে রক্ষা করিবার জন্য কোনও স্তম্ভ নাই

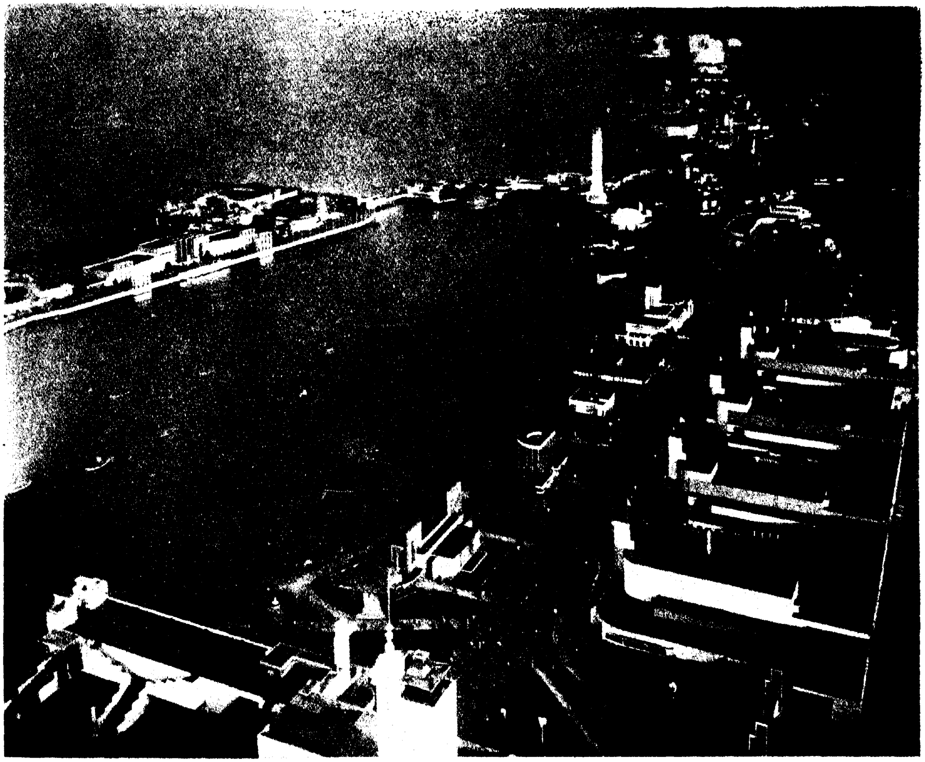
গত প্রদর্শনীর দুইটি বিশেষ অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল; একটি নিখিল বিশ্বের ধর্ম্ম-সম্মেলন, অপরটি বিশ্বের স্ত্রীমহামণ্ডলের অধিবেশন।

বিচিত্র বর্ণের জনসমাগমে দীপান্বিতা নগরী মুখরিত হইয়া উঠিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট, শিখ, জৈন, মুসলমান, সিণ্টে, কনফুসিয়ানী, য়িহুদী, আশান্তি, নিগ্রো ও পারসীকের বিচিত্র শোভা দর্শকের হৃদয়ে এক অননুভূত কৌতূহলের উদ্রেক করে। 'মহামানবের [illegible] দণ্ডায়মান হইয়া এই মহাদৃশ্য দর্শন করিলে চিত্ত আপনা-আপনি উদ্বেলিত ও জাগরিত হইয়া উঠে।

মরিসন পান্থশালায় এই বিশ্বজাতির মহা-সম্মেলন বসিয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে বিদ্যাবিভূষণ পণ্ডিত ডক্টর শ্যামশঙ্কর (হিন্দু), ডক্টর ভগৎ সিং (শিখ) ডক্টর মানেক এঞ্জেল সারিয়া (পার্শী), শ্রীযুক্ত চম্পৎ রায় (জৈন), পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ (আর্য্যসমাজ), সুফী মুতিহর রহ্‌মান (আহমদিয়া), ডক্টর মুলবাগলা (শঙ্করপন্থী) প্রমুখ ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত প্রাচ্যের বহু সুপণ্ডিত ও বক্তা সভায় উপস্থিত ছিলেন। বরোদার মহারাজা গায়কোয়াড় সভার উদ্বোধন-প্রসঙ্গে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাশগুপ্ত বেদাদি হইতে এক স্তোত্র পাঠ করিয়া সভায় মঙ্গলাচরণ করেন। নেপালের রাজা জয়পৃথ্বী বাহাদুর সিংও সভায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, স্যর অলিভার লজ, বিশ্বনিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের সভাপতি মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন ও মঁসিয়ে রোমাঁ রোঁলা সভার সাফল্য কামনা করিয়া তার করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত মনীষী তাঁহার প্রেরিত বার্ত্তায় বলিয়াছেন…

The sublime cry of Vivekanand, "My God, the suffering people'—is a fitting appeal to our energies. He who loves God let him defend Him among the millions of those who are oppressed by injustice and social inequality.

অর্থাৎ, "জরা-জর্জ্জরিত মানবের দুঃখকষ্ট স্মরণ করিয়া তাহাদেরই



দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে প্রদর্শনীর সাধারণ দৃশ্য

কল্যাণকল্পে শ্রীবিবেকানন্দ বিশ্বনিয়ন্তার কাছে যে করুণ কামনা জানাইয়াছিলেন, আজ আমাদেরও মর্ত্ত-প্রদেশে তাঁহারই আবেদন ধ্বনিত হউক। যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসেন তাঁহারা অসমতা ও অবিচারের ভারে প্রপীড়িত অসংখ্য আর্ত্তের মাঝে তাঁহাকে রক্ষা করুন।"

প্রথম দিনের সভায় মিঃ চার্লস ফ্রেডরিক ওয়েলার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে অসংখ্য জয়ধ্বনির মাঝে বরোদার গায়কোয়াড় বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীতে ধর্ম্মের স্থান।' বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কুহেলিকার কালো মেঘ বিদূরিত করিয়া অদূর ভবিষ্যতে এক জ্যোতিষ্মান জগতের উদ্ভব হইবে বলিয়া তিনি সভাস্থ সকলকে আশ্বস্ত করেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় সমগ্র ধর্ম্মের উপযোগী এক প্রার্থনা রচনা করেন। প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'শান্তি'।

এই বিশ্বধর্ম্ম সভার অবৈতনিক সভাপতি শ্রীযুক্তা জেন য়্যাডামস্ উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"I am sure the soul of this complex age of ours must be discovered through the bringing together of many people from various parts of the earth ."

"বহু দূরবর্ত্তী দেশ-বিদেশ হইতে আগত বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি-গণের একত্র সংমিশ্রণের ফলে বর্ত্তমান কালের নিগূঢ় অন্তরাত্মার পরিচয় পাওয়া যাইবে ; এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

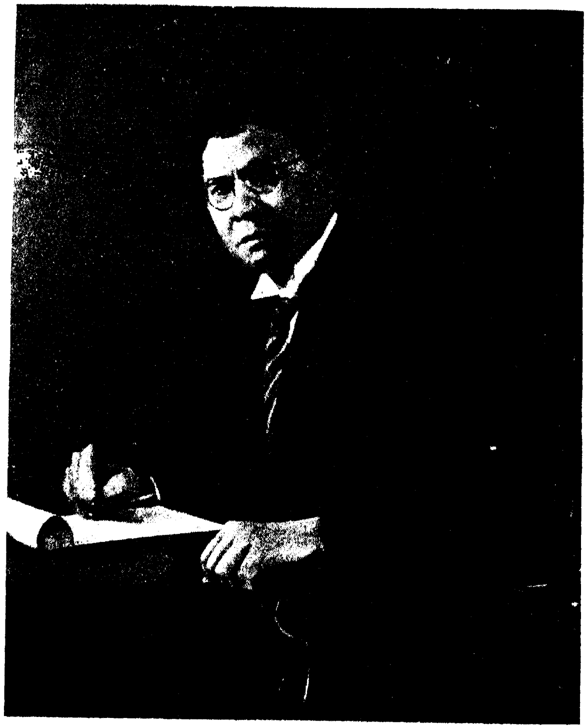
এ-কথা সত্য—বহু দূরদেশ হইতে বহু জাতির প্রতিনিধি এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ধর্ম্মানুসরণ করিয়াও কিরূপে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে

উপনীত হওয়া যায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কখনও মিলিত হইবে না, কবি কিপ্‌লিঙের এই অভিজাতসুলভ সদম্ভ উক্তি এখানে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। ফরাসী দেশের এক মহা মনীষী ভিক্টর হুগো বলিয়াছেন—

There is one thing grander than the sea; that is the sky. There is one thing grander than the sky; that is the human soul.

অর্থাৎ, "সাগরের চেয়ে মহান একটা পদার্থ আছে, তাহা নীলাকাশ। নীলাকাশের চেয়েও মহামহিমময় এক বস্তু আছে, তাহা মানবের অন্তরাত্মা।"

সেই মানবের অন্তরাত্মার অন্বেষণের জন্য জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এই মিলনভূমির আয়োজন হইয়াছে। সকলেই নির্ব্বিবাদে স্ব-স্ব সম্প্রদায়গত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমতী রুক্মিণী অরুণডেল ভারতীয় ব্রহ্মবাদের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "অতীতে ও বর্ত্তমানে বিশ্বের উন্নতিকল্পে ভারতের দান।" স্বনামখ্যাত কুমারী মুরিয়েল লেষ্টার নানা তথ্যের পর সবরমতীর ঋষির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করেন।



রাজা জয়পৃথ্বী

পরিশেষে, সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক মিঃ ম্যান্‌লে হল বলেন,—

"ব্রহ্ম, জিহোবা, আল্লা, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ প্রভৃতির মধ্যে এক বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়া থাকি বলিয়া আমরা প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসী আখ্যা পাইতে পারি না; তাঁহারা কেহই পৃথক নহেন—সেই একই পরমেশ্বরের বিভিন্ন দেশ ও ভাষানুগত মানবীয় পরিকল্পনামাত্র। এই কারণেই আমাদের মধ্যে এত দ্বেষ-হিংসার সৃষ্টি।"

এই কারণেই আমরা আমাদের মধ্যে ভেদাভেদের এক সঙ্কীর্ণ সীমারেখা প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের চারিপাশের দিগন্তবিস্তৃত বসুধার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। মিঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড যথার্থই বলিয়াছেন—

To think the world is to be superior to the world. To know the stars is to be greater than the stars.

শিকাগোর পামার হাউসে মহিলা-মহামণ্ডলের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সম্মেলন পাঁচ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। বত্রিশটি দেশ তাঁহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। সভায় আলোচনার বিষয় ছিল "শান্তি ও সভ্যতা"। শ্রীযুক্তা লেনা ম্যাডেসিন ফিলিপস্‌এর নেতৃত্বে সভার কার্য্য সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। সভায় বৈচিত্র্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ হয়। বিচিত্র বেশ-পরিহিতা এক চৈনিক মহিলার পার্শ্বে এক জন আমেরিকান মহিলা উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে বিচিত্র-বেশা এক তুরস্ক যুবতী, তৎপার্শ্বে প্যারিসের রুচিমার্জ্জিত বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত রোমানিয়ার এক মহিলা অধ্যাপক; তৎপরে আমেরিকার



বিশ্ব-প্রদর্শনীর পতাকা-শোভিত তোরণ-দ্বার

পোষাকে বিভূষিতা এক অনিন্দ্যসুন্দরী ইতালীয় রূপসী ; তাঁহারই পার্শ্বে হলাণ্ডের স্বাস্থ্যবতী এক মহিলা, অবশেষে আর্জ্জেন্টিনার এক নমিতাঙ্গী তন্বী তরুণী, অদূরে ভারতের মহিমময় নারী-প্রগতির উদ্বোধনবাণী বহন করিয়া শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী উপবিষ্ট ছিলেন।

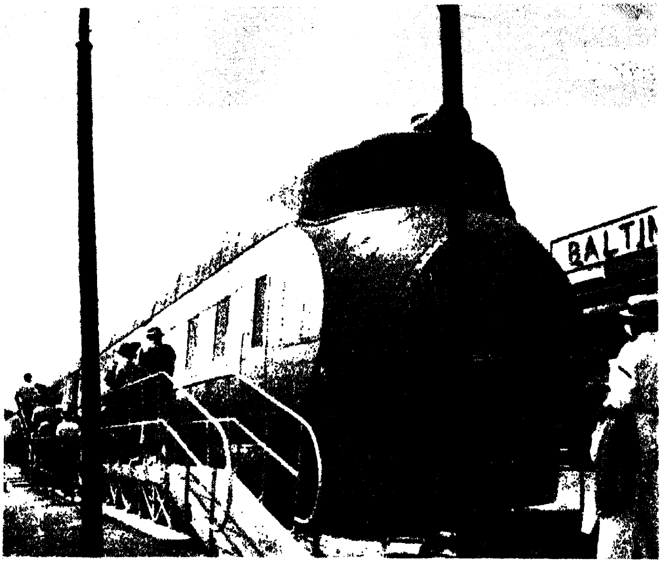
বিশ্বের নারী-প্রগতির যাবতীয় বিষয় সভায় পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে আলোচিত হইয়াছিল, শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত ও কবিতা রচনা বিষয়েও মহিলাগণের দানের প্রসঙ্গ সভায় আলোচিত হয়। তাঁহাদের বিজ্ঞপ্তির এক স্থানে লিখিত আছে—

Hence it is against social systems, not men, that we launch our second women movement.

"সমাজতন্ত্র সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমরা আমাদের দ্বিতীয় নারী আন্দোলন চালিত করিব—পুরুষদের বিরুদ্ধে নহে।"

বর্ত্তমান বৎসরের অধিবেশন আরও বৃহত্তর, জনপ্রিয় ও সুন্দরতর হইয়া উঠিয়াছে। গগনস্পর্শী অট্টালিকা, সাজসজ্জার পারিপাট্য, প্রদর্শিত দ্রব্যের বৈচিত্র্য অনেকাংশে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা মনকে আকৃষ্ট করে প্রদর্শনীর অগণিত সৌধশ্রেণী। ইহারা নানা বর্ণের ও নানা কারুকার্য্য-সম্বলিত স্থপতিবিদ্যা ও ভাস্কর্য্য শিল্পের নিদর্শন-স্বরূপ সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রদর্শিত দ্রব্য অপেক্ষা ইহারা অধিকতর মনোহারী। গত দুই সহস্র বর্ষ ধরিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসিগণ স্থাপত্য-শিল্পে প্রাচীন গ্রীসের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। ঈজিপ্ট ও ব্যাবিলোনিয়ার মর্ম্মর-সৌধ তাঁহাদিগকে কম আকৃষ্ট করে নাই, কিন্তু বর্ত্তমানে লৌহ প্রভৃতি ধাতু ও গৃহনির্ম্মাণের অন্যান্য দ্রব্য পূর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হওয়ায় এখানে সেই প্রাচীনতম রীতির আর অন্ধ অনুকরণ করা হয় নাই। তজ্জন্য প্রাচীন রীতির কোনও স্পর্শ বা লক্ষণ ইহাতে দৃষ্ট হয় না বলিয়া অনেকে প্রদর্শনীর



সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত 'ইউনিয়ন প্যাসিফিক' লাইনের ট্রেন। ইহা প্রদর্শনীর একটি বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। ঘণ্টায় ইহা ১১০ মাইল যায়

আলোকসম্পাতে এখানে এক স্বপ্নপুরীর পরিকল্পনা হইয়াছে। ইহা এক বিস্ময়কর ঘটনা। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা কতদূর সফল হইয়াছে ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্ট ক্লিভল্যাণ্ড ওয়াশিংটনে একটি বোতাম টিপিয়া দূরবর্ত্তী কলম্বিয়া-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এ-বৎসরও বহু বহু কোটী মাইল দূরবর্ত্তী আর্কটুরস (Arcturus) নামক অতি জ্যোতিষ্মান নক্ষত্রমালার সম্পাতে প্রদর্শনী আলোকিত করা হইয়াছে। প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,২৮৪ মাইল বেগে ধাবিত হইলে এই নক্ষত্রের আলোক রশ্মিকে আমাদের পৃথিবীতে আসিতে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর লাগে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে আলোকরশ্মি এই নক্ষত্র হইতে বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত ক্ষীণরূপে উইসকনাসন নামক স্থানে অবস্থিত ইয়র্কস মানমন্দিরের সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ-যন্ত্রে প্রতিফলিত হয়; সেখান হইতে ফোটোইলেক্‌ট্রিক সেলের সাহায্যে এই অতিক্ষীণ আলোক-রেখাকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিবর্ত্তিত ও রেডিয়োর সাহায্যে পরিবর্দ্ধিত করিয়া শিকাগোর পথে ধাবিত করা হইয়াছে। ইহাই প্রদর্শনীকে আলোকিত করিতেছে। বহু দূরাগত নীহারিকার এই আলোকধারায় স্নান করিয়া বিশ্ব-নগরী ধন্য হইয়াছে!

ভবন-শিল্প সুন্দর হয় নাই বলিয়া মন্তব্য করেন। গৃহস্থালীর নানা দ্রব্য-সম্ভারে সুশোভিত ও আলোকমালায় বিভূষিত আদর্শ গৃহ (Model Homes), বিজ্ঞান-সৌধ (Hall of Science), শাসন পরিষৎ-মন্দির (Administration Building) প্রভৃতি সম্পূর্ণ আধুনিক প্রণালী ও রুচি সম্মত।

সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকদের মনোহরণ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ সবিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। একদিকে বিজ্ঞানপ্রসূত দ্রব্যাদি, অন্যদিকে আমোদ প্রমোদ, দূরে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত দ্রব্যের প্রদর্শনী, অদূরে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিদর্শন, তৎপরে বিচিত্র চারুকলার সমারোহ! তাহার পার্শ্বে, অদূরে শিশুদের মনোহরণের জন্য মায়া-দ্বীপ। একদিন ৫০০,০০০ শিশু প্রদর্শনীতে এই কারণেই আগমন করিয়াছিল। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ভবন-শিল্পী মিশিগান হ্রদের উপর এই মায়া-কাননের রূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন।

সমগ্র প্রদর্শনী ব্যাপিয়া অতি অভিনব ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে আলোকের বর্ণ-বৈচিত্র্য রচনা করা হইয়াছে। সতত পরিবর্ত্তনশীল বিচিত্র বর্ণের

বিজ্ঞান-সৌধে (Hall of Science) এক শত বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের কি-কি উপকার সাধিত হইয়াছে তাহারই নিদর্শন রক্ষিত হইয়াছে। স্থানীয় কলেজের বিশিষ্ট ছাত্রগণ দর্শকবৃন্দকে সমস্ত বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেছেন। অঙ্কশাস্ত্রের যাবতীয় নিগূঢ়তত্ত্ব এক দিকে, পদার্থবিদ্যার নিদর্শন অন্য দিকে রহিয়াছে। ছিলিয়ম

গ্যাস ও পারার সাহায্যে এক অভিনব গ্যাস থার্মোমিটার রচিত হইয়াছে। শব্দ, আলোক ও বিদ্যুতের পরাকাষ্ঠাও এই সৌধে প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপরে এক পার্শ্বে শত বৎসরের মধ্যে রসায়ন-শাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ও ভূবিদ্যার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান-সৌধের অতি সন্নিকটে 'সমাজ-বিজ্ঞান-সৌধ' (Hall of Social Sciences)। তোরণদ্বারে হিন্দু পুরাণ হইতে নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তি খচিত হইয়াছে। তাঁহারা আলো, অন্ধকার, ঝটিকা ও অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। লিয়ো ক্রিডল্যাণ্ডার নামক সুবিখ্যাত ভাস্কর এই শোভন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রাচীন সভ্যতার প্রথম নিদর্শন ফরাসী দেশের ম্যাগনন-গুহার চিত্র দেওয়ালে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানগণের তিন যুগের কৃষ্টির পরিচায়ক স্তূপাকৃতি গৃহ, বৃহৎ বানর ও আদিম মানবের মাথার খুলি ও অন্যান্য নানাবিধ তত্ত্বের কাহিনী এই অট্টালিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

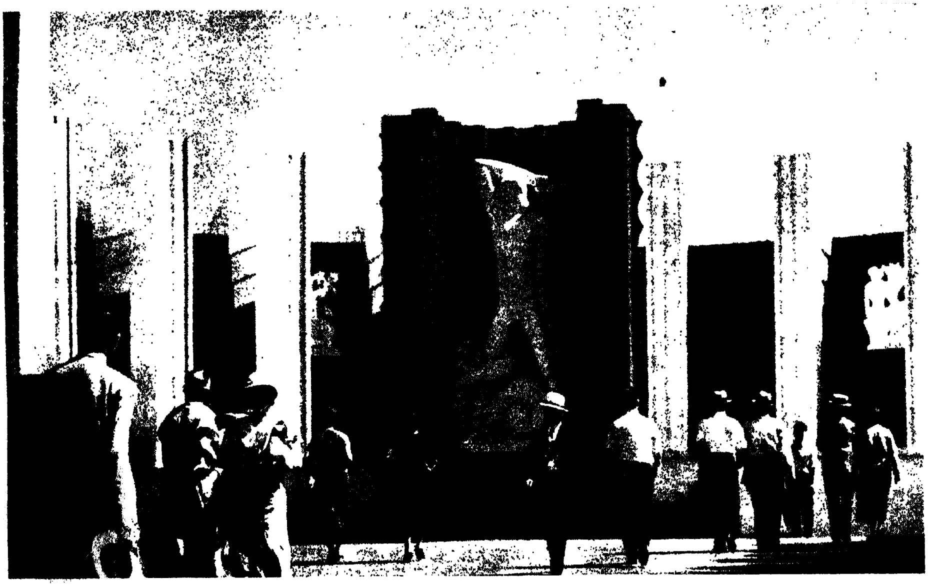


প্রদর্শনীসংলগ্ন উদ্যান-বাটিকা—বিভিন্ন লতা ও বৃক্ষের সমারোহ

"সাধারণ প্রদর্শনী-গৃহে" ১৪৩৮ সালে স্থাপিত জার্ম্মানীর যোহ্বনেস গুটেনবুর্গের প্রথম ছাপাখানা প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎকালোচিত হ্যাণ্ড মেশিন এবং গুটেনবুর্গ টাইপও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গুটেনবুর্গ প্রকাশিত প্রথম বাইবেলের প্রথম পৃষ্ঠাও প্রদর্শনীর সম্পদ অনেক বৃদ্ধি করিয়াছে।

অন্য একটি গৃহে নানাবিধ মূল্যবান ও অধুনা-দুষ্প্রাপ্য মণি-মুক্তার সমারোহ বসিয়াছে। মেক্সিকোর সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের একটি প্রকাণ্ড নীল হীরকখণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকার বহু মণি-মুক্তা ও হীরকখণ্ড, হীরকপ্রসূ কীম্বার্লির ত্রিশ টন ওজনের নীল মৃত্তিকা প্রভৃতি এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অন্য এক কক্ষে চারি শত মহিলার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্বারা অতীত কাল হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির নারীগণের পোষাক-পরিচ্ছদের পরিচয় পাওয়া যায়। শিকাগো-বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্তা মিনা. এম. স্মিমট ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের পদ্মিনী, মীরা বাঈ, মুমতাজ, ঝাঁসীর রাণী এবং তরু দত্তের মূর্ত্তি এই কক্ষে স্থান পাইয়াছে।



'বিজ্ঞান-সৌধ'র উত্তর প্রবেশ-পথে স্থাপিত বীরের মর্ম্মর মূর্ত্তি,—অজ্ঞতার অজগরকে পদদলিত করিয়া জয়োল্লাসে দাঁড়াইয়া আছে

মধ্যস্থলে হ্যাভেলিন থার্ম্মোমিটার প্রতিষ্ঠিত; উচ্চতায় ইহা ২২৭ ফুট। পৃথিবীর মধ্যে ইহা সর্ব্বোচ্চ ও অদ্বিতীয়। রাত্রিকালেও ইহাতে টেম্পারেচার দেখা যায়।

ফোর্ড, ক্রিসলার প্রভৃতি মোটর বিক্রেতাদের সুবৃহৎ অট্টালিকাও এখানে নির্ম্মিত হইয়াছে। অদূরে একটি বৃহৎ ঝরণা আছে; প্রতি মিনিটে ইহা হইতে ৬৮,০০০ টন জল নিঃসৃত হয়। শাদা, নীল, সবুজ ও লাল রঙের আলোক ইহার উপর প্রতিফলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা করে। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রও নিজেদের কার্য্যাবলীর প্রচারকল্পে এক বৃহৎ প্রদর্শনীগৃহ এখানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

টুয়েলভথ্ ষ্ট্রীটের গোড়া হইতে বিজ্ঞান-সৌধ পর্য্যন্ত প্রায় তিন মাইল ব্যাপী রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বর্ণের পতাকা বায়ুভরে তরঙ্গায়িত হইয়া এক বিচিত্র দৃশ্যের উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। ফরাসী, গ্রীস, আলাস্কা, সুইডেন, চেকোস্লোভাকিয়া, ইতালী ও অন্যান্য বহু দেশের সরকার এখানে তাঁহাদের শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। চীন দেশও নানা দ্রব্যের পসরা বসাইয়াছে। প্রদর্শনীতে স্থানাভাব বশতঃ যদি কোনও দেশের দ্রব্যাদি প্রদর্শিত না হয় তবে প্রদর্শনীর মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থানে সেই দেশের আদর্শে ছোট-ছোট গ্রাম বিরচিত হইয়াছে। এখানে সেই-সেই দেশের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি প্রভৃতির অনুশীলন হইতেছে। ইহাদের মধ্যে লামা-মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা জিহোলের স্বর্ণ-শিবির নামে খ্যাত। নিকটে যান-বাহনাদির উন্নতি-বিষয়ক নিদর্শন এক প্রকাণ্ড সৌধে রক্ষিত আছে। এই স্থানে ট্রাম, মোটর, বাস, রেল প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য ও উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শিকাগোর আর্ট ইন্‌ষ্টিটিউটের ভবনে চারুশিল্পের প্রদর্শনী বসিয়াছিল; গৃহে সর্ব্বসমেত ৪৩টি গ্যালারী আছে; তাহাতে ৭৪৪খানি চিত্র ও ১৩১টি ভাস্কর্য্যশিল্প প্রদর্শিত হয়। দুই ভাবে চিত্রগুলি সজ্জিত হইয়াছে। প্রথম অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আমেরিকার চিত্রকর-

গণের অঙ্কিত চিত্র ; দ্বিতীয় ইউরোপীয় চিত্রাবলী। নিম্নে কয়েকটি বিশিষ্ট চিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত হইল :—

(১) হুইস্‌টলারের 'মাদার'—ইহা ১,০০০,০০০ ডলারে বীমা করা হইয়াছে।

(২) 'হোয়াইট গার্ল'—অনেকে বলেন ইহা প্রথমটির অপেক্ষা ভাল হইয়াছে।

(৩) এলগ্রেকোর—'ভার্জিন'। ইহা বিখ্যাত স্পেনীয় শিল্পীর পরিকল্পিত।

(৪) এতদ্ব্যতীত সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পাঁচটি চিত্র ক্রয় করা হয়। তাহাও এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে :—

রেম্ব্রাণ্টের 'জোশেফ এণ্ড পটিফারস ওয়াইফ,' টারবর্কের 'মিউজিক লেসন,' ওয়াটিউ-এর 'লে মেজ্জেটিন,' ফন্ গগের 'লে কাফে দা নুইট', সেজেনের 'ম্যাডাম সেজেন ইন দি কনজারভেটরী।'

(৫) জুলেস ব্রেটনের 'দি সঙ অব দি লার্ক' অতি সুন্দর হইয়াছে।

(৬) ফ্রা এঞ্জেলিকোর 'গ্রেবিয়েল' ও 'ভার্জিন'ও এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রাচ্যকলারও বহু নিদর্শন এখানে আছে। তন্মধ্যে প্রথম খ্রীষ্টাব্দের রচিত গান্ধার-শিল্পের নিদর্শন-স্বরূপ এক খণ্ড প্রস্তর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্যাম্বোডিয়া এবং পারস্যের শিল্প-প্রতিভার নিদর্শনও এখানে আছে।

এতদ্ব্যতীত আমোদ-প্রমোদের বহুবিধ ব্যবস্থা হইয়াছিল। নৃত্য-গীতাদির সমারোহ প্রত্যেক রাস্তায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশের অনুকরণে পরিকল্পিত যে ক্ষুদ্র গ্রামের প্রতিষ্ঠা এখানে হইয়াছে সেখানেও সেই-সেই দেশের প্রচলিত নৃত্যগীতাদিরও আয়োজন হইয়াছিল। ইহা ছাড়া শিশুদর্শকগণের মনোহরণের জন্য শিশুসুলভ নৃত্যগীত এবং আমোদ-প্রমোদেরও অনুষ্ঠান যথোচিতরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। এক কথায়, প্রদর্শনীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ পৃথিবীর সর্ব্বদেশের বিশেষ ও কৌতূহলোদ্দীপক দৃশ্য, সাজসজ্জা, নৃত্য-গীত ও বস্তুনিচয়ের একত্র সমাবেশ করিয়াছিলেন।

বাণীবন বালিকা-বিদ্যালয়

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, বি-এ, বি-টি

গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা চলিতেছে। সহ-শিক্ষার প্রবর্ত্তনের দ্বারা ইহা আরও প্রসারলাভ করিয়াছে। কিন্তু এ-সমস্ত উদ্যোগই শহরবাসীদের চেষ্টায় ও তাহাদের জন্য। গ্রামের দরিদ্র বালিকাদের জন্য এ-পর্য্যন্ত খুব কম আয়োজনই হইয়াছে। অথচ আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকই গ্রামবাসী ও দরিদ্র। গ্রামে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান আজকাল কাজ করিতেছে তাহাদের অধিকাংশই শহরে সংঘটিত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের সাহায্যে উহাদের কার্য্য সাধারণে সুপরিচিত। আজ একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের বিবরণ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি যাহা একটি নগণ্য গ্রামের অধিবাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াও গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে।

'বাণীবন' হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া মহকুমার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। উহা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের উলুবেড়িয়া ষ্টেশন হইতে এক মাইল উত্তর অবস্থিত। উলুবেড়িয়া কলিকাতা হইতে বিশ মাইল মাত্র দূরে। বাণীবন গ্রামটি ঐ বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্যই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কয়েক জন ব্রাহ্ম কার্য্য উপলক্ষে এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের জন্য নিজেদের

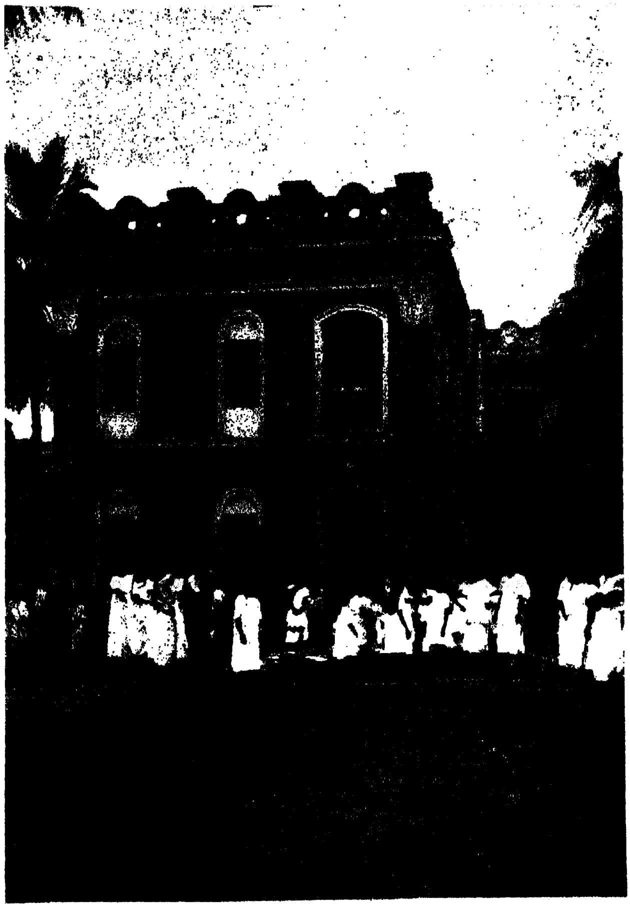


বাণীবন বালিকা-বিদ্যালয়ের বালিকাগণ চরকায় সুতা কাটিতেছে



বাণীবন বালিকা-বিদ্যালয়ের বালিকাগণ কৃষি-শিক্ষা করিতেছে

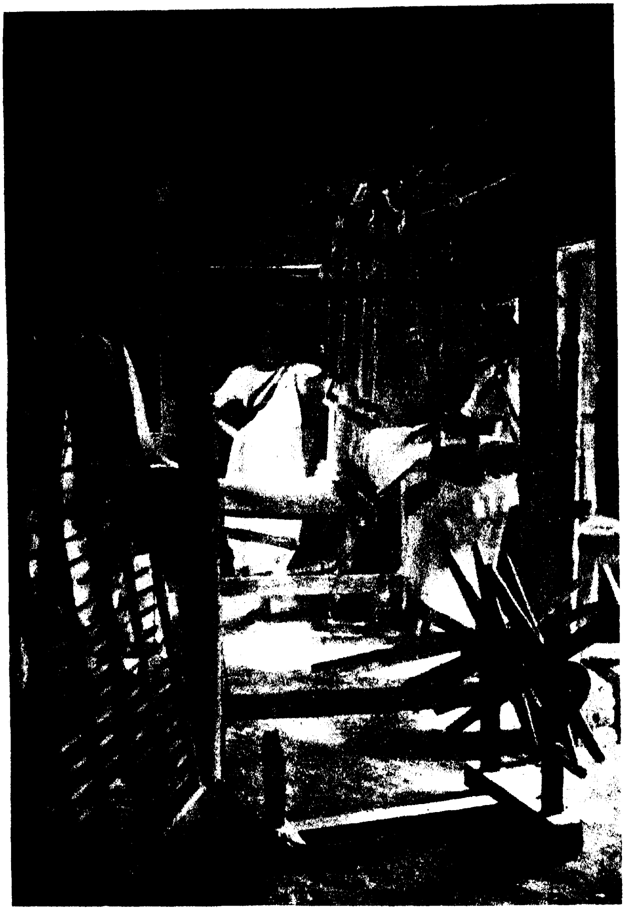
বাড়িতেই প্রথমে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ক্রমে পল্লীতে ব্রাহ্মের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। তখন শুধু নিজেদের নয় গ্রামের অন্য বালক-বালিকারাও যাহাতে শিক্ষার সুযোগ লাভ করে সেই জন্য তাঁহারা একটি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্থানটি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইলেও শিক্ষায় অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। সেই জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ব্রাহ্ম ব্যতীত স্থানীয় অন্যান্য বালিকাদিগের নিকট হইতে কোন বেতন লইতেন না এবং এখনও তাহারা বিনা বেতনেই পড়িতেছে।



বাণীবন বালিকা-বিদ্যালয়ের বালিকাগণ খেলিতেছে

ক্রমে বিদ্যালয়টির উন্নতি হইতে থাকে এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। সতের বৎসর হইল বিদ্যালয়-সংলগ্ন একটি ছাত্রীনিবাস খোলা হইয়াছে। ঐ ছাত্রীনিবাসে বঙ্গদেশের বিভিন্ন দশ-বারোটি জেলার, এমন কি সুদূর আসাম ও মান্দ্রাজ হইতেও বালিকারা আসিয়া বাস করিতেছে। ছাত্রীনিবাসে কুমারী ও বিবাহিতা অল্পবয়স্কা বিধবাকে লওয়া হয়। অল্প-আয়-বিশিষ্ট গরিব ভদ্রলোকদের সুবিধার জন্য বেতন যথাসম্ভব কম করা হইয়াছে। বোর্ডিং ও স্কুলের বেতন একত্রে মাসিক সাত টাকা মাত্র। বেতন এত কম করাতে বহু দরিদ্র বালিকা ও বালবিধবা আজ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আত্মনির্ভরশীল হইয়াছে।

সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত এখানে সেলাই, অঙ্কন, মডেলিং, চরকা ও তাঁত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বালিকাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতি যাহাতে হয় সেই চেষ্টাই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণ ও কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন। ছাত্রীনিবাসে বালিকাগণ বিলাসিতা-বর্জ্জিত অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপন করিতে শিক্ষা লাভ করে। গৃহের ন্যায় এখানেও তাহাদের কিছু কিছু গৃহস্থালীর কাজ করিতে হয় এবং তাহারা যাহাতে সাংসারিক কর্ম্মে নিপুণা হইতে পারে সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। প্রতিদিন বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া বালিকাগণ খেলাধূলা করে এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে নানা স্থানে বেড়াইতে লইয়া



বাণীবন বালিকা-বিদ্যালয়—তাঁতের ঘর

দ্বারাই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। তাহারা সুশিক্ষা ও চরিত্র গুণে সর্ব্বত্রই সমাদর লাভ করিতেছে অনেকেই উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষয়িত্রীর ও নানা প্রকার সমাজসেবার কাজে ব্যাপৃত আছে। প্রসিদ্ধ নৃত্যকুশলা অমলা নন্দী ও অনুপমা রায় এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী। গত বৎসর এই বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী মধ্য-ইংরেজী বৃত্তি পরীক্ষায় বৰ্দ্ধমান-বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ে অবনত শ্রেণী, বিশেষতঃ নমঃশূদ্র জাতি, বিশেষ সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়া আসিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি নমঃশূদ্র বিবাহিত বালিকা বৃত্তি-পরীক্ষায় বৰ্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী উভয় বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মধ্য-ইংরেজী বৃত্তি পাইয়াছে। আরও দুইটি নমঃশূদ্র বিবাহিতা বালিকা মধ্য-বাংলা বৃত্তি পাইয়াছে।

এক হিসাবে দেখিতে গেলে এই বিদ্যালয়টি বাংলা দেশে একক। কারণ একমাত্র এই মধ্য-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়েরই সংলগ্ন ছাত্রী-

যাওয়া হয়। ঘেরা-পুষ্করিণীর মধ্যে বালিকাগণ সাঁতার শিক্ষা করে। তাহারা ইচ্ছানুযায়ী সঙ্গীত ও নানা-প্রকার বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা করিতে পারে। লিখিবার ও বলিবার শক্তি বিকাশের জন্য ছাত্রীদিগের দ্বারা পরিচালিত একটি 'জ্ঞানদায়িনী সভা' আছে এবং একটি সুন্দর হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা আছে। ইহা ছাড়া ছাত্রীদের নৈতিক জীবনের উন্নতির জন্য একটি 'নীতিবিদ্যালয়' আছে।

এই বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি ছাত্রীনিবাসের ছাত্রীদের

নিবাস আছে, অন্যত্র কোথাও তাহা নাই। এই-সব নানা কারণেই এক জন ডিষ্ট্রীক্ট ইন্‌স্‌পেক্টর ইহাকে 'ইউনীক ইনসটিটিউশ্যন" (unique institution) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বহু কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট, স্কুল-ইনসপেক্টর ও ইনসপেক্ট্রেস এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভাপতি অকুণ্ঠিত চিত্তে এই বিদ্যালয়ের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন এবং যথাসাধ্য সাহায্যও করিয়াছেন।

এই বিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব দ্বিতল সুন্দর অট্টালিকা

পুস্তক পরিচয়

(১) প্রাচীন আসামী হইতে (২) বিদ্যাসুন্দর—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। রঞ্জন প্রকাশালয়, কলিকাতা, ১৩৪১। প্রাপ্তিস্থান, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য প্রত্যেকটি ৸৹।

কবি প্রমথনাথ বিশী বয়সে তরুণ হইলেও, তাঁহার রচনা যে আধুনিক তারুণ্য-ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে, তাহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। কারণ, তাঁহার পূর্ব্বরচিত 'বসন্তসেনা'য় এবং আলোচ্য কাব্য দুইটিতে যে শক্তির পরিচয় আছে, তাহার আর অপচয়ের সম্ভাবনা বা দুর্ভাবনা রহিল না। আধুনিক কবি হইলেও, প্রমথনাথ প্রাচীনপন্থী। কিন্তু প্রাচীনপন্থী বলিয়া তিনি গতানুগতিক নহেন। যে প্রাচীন পন্থা কাব্যের চিরন্তন পন্থা, তিনি তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন; এবং ইহার ফলে তিনি যেটুকু সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা এই কবিত্ববর্জ্জিত কিন্তু বহুকবি-সমাকুল যুগে আশা ও আশ্বাসের বিষয়। যে কাব্য-বোধ ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রেরণা যুগ-পরম্পরায় কবি-মানসের উপজীব্য, তাহাই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রস-পিপাসাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে; এবং তাহাকেই তিনি কাব্য-সাধনার দৃঢ়ভিত্তি স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যিক স্বেচ্ছাচার ও আত্মশৈথিল্যের যুগে তাঁহার দুইটি রচনা সুস্থ-সবল গঠন-সৌষ্ঠবে ও প্রকাশভঙ্গীতে নিজস্ব রসরূপ লাভ করিতে পারিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার সনাতন স্বরূপটিকে আয়ত্ত করিবার জন্য যে-সাধনার নিদর্শন এই দুইটি রচনায় রহিয়াছে, তাহা আধুনিক ভাষা-বিকৃতির যুগে দুর্লভ বলিয়াই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেইজন্য, কবির ভাব ও চিন্তার বৈশিষ্ট্য, স্বচ্ছন্দ শব্দনির্ব্বাচনে ও সতর্ক গ্রন্থন-রীতির সহজ ভঙ্গীতে, আপনিই আপনার রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

প্রমথনাথ প্রাচীনপন্থী বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে তাঁহার নব 'বিদ্যাসুন্দর' ভারতচন্দ্রের ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীর চর্ব্বিত-চর্ব্বণ মাত্র। প্রাচীন বিদ্যাসুন্দরের কল্পনা ও কামনার রসে অভিষিক্ত করিয়া, ব্রহ্মপুত্রের বালুচরে ধানশ্রী নদীর তীরে অভিনীত কোনও আধুনিক বরেন্দ্রপুত্র সুন্দরের ভাব-জীবনের চিত্র, কবি বাস্তব সুখ-দুঃখের গাঢ়তায় ও বৈচিত্র্যে অঙ্কিত করিয়াছেন। 'প্রাচীন আসামী হইতে' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিলেও, ধানশ্রীতীরনিবাসিনী সুন্দরী অসমীয়ার উদ্দেশে রচিত কবিতাগুলি, ব্রহ্মপুত্রতীরনিবাসী আধুনিক কবিরই প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি। বর্ত্তমান যুগের ভাব-জীবন, যে সত্য ও স্বপ্নের, যে বাস্তব সুখ ও অসুখের দ্বারা আন্দোলিত ও উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহাই এই প্রেমিক কবির গভীরতম চেতনা ও অন্তরতম অনুভূতির মধ্যে অপূর্ব্ব রস-পরিণতি লাভ করিয়াছে। ভাবপ্রবণ হইলেও কবি দেহ-বাদী; কিন্তু দেহ-তান্ত্রিক নহেন। জীবন তাঁহার নিকট সত্য, সেইজন্য দেহ ও মন উভয়ই তাঁহার নিকট সত্য। কিন্তু জীবন সত্য বলিয়া যে-সত্য জীবনাতীত তাহাকেও তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই। প্রমথনাথের কবিতা ভাবাবেশময়ী, কবিত্ব-স্বপ্নময়ী, কিন্তু এই ভাব ও স্বপ্ন ছায়া-শরীরী নহে, সুকুমার কবি-হৃদয়ের বাস্তব অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বপ্নের ইন্দ্রজাল তাঁহার কবি-দৃষ্টিকে যথেষ্ট প্রলুব্ধ করিয়াছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি কেবল স্বপ্নরাজ্যে বাস করেন নাই, ধরণীর মৃত্তিকার উপরই কাম্য শ্রেয়সের সন্ধান করিয়াছেন। সেইজন্য, এই নবীন কবির প্রবীণ রচনা, বাস্তবদায়িত্বহীন আন্তরিকতাবর্জ্জিত অক্ষম লেখকের শিথিল-গ্রন্থি বাক্যপরম্পরায় পর্য্যবসিত হয় নাই। ইহা অসুস্থ চিত্তের অপুষ্ট কাকলী নহে, সহজ অনুভূতির সবল উক্তি। সুতরাং আশা করা যায় যে, এই দুইখানি কাব্য বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে, স্বল্প হইলেও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

শ্রীসুশীলকুমার দে

যে শাখে ফুল ফোটে না—শ্রীতারাপদ রাহা প্রণীত। পি. সি. সরকার এণ্ড কোং, ২ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

ইহা একখানি উপন্যাস, প্রেমের উপাখ্যান। অল্প বয়সে বিধবা 'বিভা' গোপনে ভালবাসিত, কিন্তু তাহার প্রেম ছিল নিম্নস্তরের। সদ্যবিবাহিতা 'নমিতা'ও দূরসম্পর্কীয় দেবর 'প্রভাত'কে ভালবাসিয়াছিল। লেখক বলিয়াছেন যে তাহাদিগের প্রেম পরস্পরের সাহচর্য্যেও নিষ্কলুষ রহিয়াছিল। আখ্যায়িকার স্থানে স্থানে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে বলিয়া মনে হয়। ভাষার দিক দিয়া পুস্তকখানি ক্লেশপাঠ্য নহে, ভাষা সতেজ ও সরল। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ—সবই সুন্দর।

চলতি পথের বাঁশী—শ্রীনবগোপাল দাস প্রণীত। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

ইহা একখানি উপন্যাস। আখ্যায়িকা-ভাগে নূতনত্ব আছে। নায়ক 'অসিত' এক জন ভাবপ্রবণ কর্ম্মপাগল যুবক, কর্ম্মের উন্মাদনা ভিন্ন তাহার অন্য দিকে লক্ষ্য ছিল না। কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে সে পিতৃবন্ধুর কন্যা 'মীরা'র হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। সে ভগিনীর মত তাহাকে দেখিয়াছিল, সুতরাং অন্য ভাবে সে তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিল না, বিশেষতঃ তাহার কর্ম্মের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া। গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। ভাষাও সহজ ও সুবোধ্য। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ—সকলই ভাল।

ফরাসী-বিপ্লব—রেজাউল করীম, বি-এ। বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস, ২০৯ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৩৩। এক টাকা।

লেখক চারিপর্ব্বে বাঙালী পাঠককে ফরাসী-বিপ্লবের কথা জানাইয়াছেন। ইউরোপ যাহা কিছু করে তাহাই দেখিবার জন্য আমাদের চক্ষু একান্ত উৎসুক, কিন্তু এই অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও আমাদের ইতিহাসের স্পষ্ট জ্ঞানের অত্যন্ত অভাব। রেজাউল করীম সাহেব এই পুস্তকে ফরাসী-বিপ্লবের মূল কথাগুলি গুছাইয়া বলিয়াছেন, ইতিহাসের শিক্ষা পাঠক যাতে ভুল করিয়া না বসে সেজন্য তিনি বার-বার তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। পুস্তকে কিন্তু বহু মুদ্রাকরপ্রমাদ রহিয়াছে; অনেক ইংরাজী কথা আছে তাহাদের

বাংলা দেওয়া হয় নাই ; দুই জায়গায় মডার্ণ রিভিউয়ের প্রসঙ্গকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু কোন্ বৎসরের কোন্ সংখ্যা তাহা কিছু বলা হয় নাই। আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে লেখক এই সকল বিষয়ে অবহিত হইবেন।

শান্তি-সোপান বা পান্থ প্রদীপ—অনুবাদক ও প্রকাশক খান বাহাদুর মৌলবী চৌধুরী কাজেমুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকা, জমিদার, বলিয়াদী (ঢাকা)। প্রাপ্তিস্থান—প্রকাশক, ঢাকা, অথবা ইসলামিয়া লাইব্রেরী, পাটুয়াটুলী, ঢাকা। মূল্য ২।০।

শান্তি-সোপান, হজরত এমাম গাজ্জালী প্রণীত মেন্ হাজোল আবেদিন ও ছেরাজোছ্ ছালেকিন নামক গ্রন্থের অনুবাদ। পুস্তকের উদ্দেশ্য তরুণ ইসলাম সমাজকে প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা দান করিয়া তাহাকে তথাকথিত নেতা ও ছদ্মবেশী মৌলানাদিগের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে শিখান। পুস্তকখানি সর্ব্বৈব আক্ষরিক অনুবাদ নহে, ইহার আলোচনা সরস করিবার চেষ্টাও হইয়াছে। ধর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত, সাধন-ভজনের সংসারাদি বিঘ্ন, অন্ন-চিন্তাদি প্রতিবন্ধক, সাধন-ভজনের নিমিত্ত কারণ, অকপটতা, ভগবানের স্তব-আরাধনা প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচনা পাঠক ইহাতে পাইবেন। ইহার উপদেশাবলী ধর্ম্ম-জীবনের পক্ষে সহায়তা করিবে ; গ্রন্থের ভিত্তি সংযমের উপর কিরূপ প্রতিষ্ঠিত তাহা দুইটি উপদেশ হইতে বুঝা যাইবে। (১) "অনাত্মীয়া সুন্দরী যুবতী রমণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা শয়তানের বিষ-নিষেবিত একটি তীক্ষ্ণ শরবিশেষ।" (২) "সর্ব্ব কাজে ও সর্ব্বপ্রকার সর্ব্ববিষয়ে তুমি তোমার নিজের জন্য যাহা পছন্দ কর ও ভালবাস, অন্যের জন্যও তাহাই পছন্দ করিও, ও ভালবাসিও, এবং নিজের পক্ষে যাহা বাঞ্ছনীয় মনে কর না, বা পছন্দ কর না, অন্যের পক্ষেও তাহা বাঞ্ছনীয় মনে করিও না বা পছন্দ করিও না।" যে-সমাজের হিতসাধনের জন্য খান-বাহাদুর বৃদ্ধ বয়সেও "অক্লান্তভাবে মোট চারি শত পঞ্চান্ন ঘণ্টা" পরিশ্রম করিয়া এই পুস্তক অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা পাঠে সেই সমাজের উন্নতি অবধারিত। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও সুন্দর, এবং ইহাতে ব্যবহৃত আরবী পারসী শব্দের অর্থ পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং অন্য সমাজের ধর্ম্মশীল পাঠকদেরও বোধ-সৌকর্য্য হইবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

আকাশ-পাতাল—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশক শ্রীসলিলকুমার মিত্র, ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১৪ ; মূল্য ৳০।

কৈশোরের প্রথম দিকে ছেলেরা রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়িতে ভালবাসে। দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষায় এরূপ কাহিনীর সংখ্যা বিরল। গ্রন্থকার সেই অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। আকাশে, পাতালে, খনিগর্ভে ও সমুদ্রের তলদেশে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া মানুষ যে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছে তাহাই অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার এই কাহিনীচতুষ্টয় রচনা করিয়াছেন। বাংলা দেশের ছেলেদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য লেখক চারিটি বাঙালী ছেলেকে এই গল্পগুলির নায়করূপে কল্পনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান গ্রন্থে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। চেষ্টাসত্ত্বেও তাঁহার কাহিনীগুলি একান্ত অবাস্তব ও কষ্টকল্পিত হইয়াছে। এজন্য বিষয়বস্তুর উপর দোষ দেওয়া চলে না। গ্রন্থকার ইংরেজী ভাষার অনুরূপ গ্রন্থ পড়িয়া দেখিতে পারেন, সেখানে কেমন করিয়া অতি সহজে রোমাঞ্চকর ও বাস্তবের মিলনসাধন করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া গ্রন্থের ভাষা অসংযত ও গুরুচণ্ডালী দোষদুষ্ট। "উত্তরীয়" ও "মগডাল" একসঙ্গে চলে না।

শিশু-পরিচর্য্যা—শ্রীসুন্দরীমোহন দাস, এম্. বি. প্রণীত। পৃঃ ৩২, মূল্য ।০। প্রাপ্তিস্থান—৫৭।১।১এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যে বাংলা দেশে বাৎসরিক ৩॥ লক্ষ শিশুর মধ্যে এক বৎসরের মধ্যেই শুধু "পেটের অসুখেই" অন্ততঃ পনরটি শিশু মায়ের কোল শূন্য করে, সে-দেশে শিশুপালনের যে বিষম ত্রুটি আছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধবৎ মনে হয়, এবং এই শিশুমেধ দেখিয়া প্রবীণ চিকিৎসক শ্রদ্ধেয় ডাক্তার দাস যে চঞ্চল হইবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি ? তাঁহার মত শিশু ও প্রসূতি কল্যাণে একনিষ্ঠব্রতী অর্দ্ধ শতাব্দীর ভূয়োদর্শনের ফল যে-ভাবে উক্ত পুস্তিকায় সহজ ভাষায়, সুন্দর ভঙ্গীতে, বিভিন্ন "অধিকারে" (হেডিং-এ) সাজাইয়া প্রকাশিত করিয়াছেন, তজ্জন্য বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। পুস্তকখানি ক্ষুদ্রকলেবর হইলেও অমূল্য। আশা করি, ঘরে ঘরে মায়েরা এক খণ্ড রাখিয়া অনেক বিপদ বালাইয়ের হস্ত হইতে নিজ নিজ শিশুদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

নারীজীবন ও প্রসূতি-পরিচর্য্যা—ডাক্তার শ্রীঅভয়কুমার সরকার, এম-বি, ডি-পি-এইচ প্রণীত। ৩২৫ পৃষ্ঠা। প্রাপ্তিস্থান, দাসগুপ্ত কোম্পানী, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট। মূল্য ২৲।

গ্রন্থকার ফরিদপুরের হেল্‌থ্ অফিসার। আলোচিত বিষয় ৩২টি ; বিষয় বুঝাইবার জন্য স্থানে স্থানে কতিপয় চিত্র আছে। বিবাহ ও 'দম্পতি জীবন' সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাংলা দেশে বাল-বিধবার সংখ্যা উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন প্রায় ৭ লক্ষ বালিকা ১৯২১ সালে সমাজের গলগ্রহস্বরূপ ছিল। তন্মধ্যে ১ বৎসরের কম বয়স্কের সংখ্যা ছিল ২৮৩।

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

বিংশ শতাব্দীর সেরা সাহিত্যিক—শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক—শ্রীদীনেশচন্দ্র বর্ম্মণ, আর্য্য পাবলিশিং কোং ২৬ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

যে-সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশ্বসাহিত্যিক বিগত ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত বিশ্ববিখ্যাত 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবন-কথা ও সাহিত্যসৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। বিশ্বের বিশাল সাহিত্য-ভাণ্ডার বাঙালীর নিকট এখনও একরূপ অনুদ্মুক্ত রহিয়াছে। আশা করা যায়, এই জাতীয় আলোচনা-গ্রন্থ ক্রমে বাঙালীর চিত্তে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক নিদর্শনের সহিত পরিচয় লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিবে। স্থানে স্থানে ভাষার জড়তা ও বর্ণাশুদ্ধি এই পুস্তিকাকে কথঞ্চিত কলঙ্কিত করিয়াছে সত্য, তবে ইহার মধ্যে নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ হওয়ায় আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি এবং আশা করি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে ইহা সম্পূর্ণ কলঙ্কমুক্ত হইবে।

প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া, এম্-এ, ডি-লিট লিখিত ভূমিকাসহ। শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়া প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীমৎ ভিক্ষু উত্তম, মহাবোধি সোসাইটি, ৪।১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

এই গ্রন্থে তক্ষশিলা, নালন্দা, পাটলিপুত্র ও বিক্রমশিলা এই কয়টি বিদ্যাপীঠের যথাসম্ভব বিস্তৃত বিবরণ এবং ত্রৈকুট বিহার, পণ্ডিত বিহার, কনকস্তূপ বিহার ও জগদ্দল বিহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অন্তিম পরিচ্ছেদে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বৌদ্ধ যুগে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে জ্ঞাতব্য তথ্য থাকিলেও এই গ্রন্থে তাহা ঠিক প্রাসঙ্গিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠক অনেক নূতন খবর জানিতে পারিবেন এবং উপকৃত ও পরিতৃপ্ত হইবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

পথ বিজন—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঘটনার বৈচিত্র্য আর সেই বৈচিত্র্যের সংঘাতে মানব-মনের নূতন নূতন ভাবে সাড়া দেওয়া, নূতন আলোকে এবং নবতর বিস্ময়ে ফুটিয়া ওঠা—যা লইয়া সৌরীন্দ্রবাবুর যশ—বইখানিতে তা যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায়। এক শুধু ফাঁকা-দাম্ভিক লাটুবাবুর চরিত্রটা একটু অতিরঞ্জিত ঠেকিল, তা ভিন্ন সব চরিত্রগুলিই বেশ সুডৌল হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রধান নারী-চরিত্রগুলিতে সুসংযত আধুনিকতার 'টাচ্' বড় মিষ্ট লাগিল।

বইখানিতে চরিত্রগুলির মুখে বড় বেশীরকম 'নভেল,' 'উপন্যাস,' 'রোম্যান্স'-এর দোহাই দেওয়া হইয়াছে। যেমন—'এ রোমান্সের পাতায়ই সাজে,' 'এ ভালবাসার পরিণতি উপন্যাস নাটকে যেমন হয়...' ইত্যাদি চরিত্র বা ঘটনাগুলিতে বাস্তবিকতার ছাপ দিবার জন্য উপন্যাসের পাতায় এ-ধরণের মন্তব্য এক-আধ বার চলে; কিন্তু বাড়াবাড়ি হইলেই বেখাপ্পা শোনায়, তাই সামান্য হইলেও এই ত্রুটিটুকুর কথা উল্লেখ করিলাম।

ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সবই ভাল। মূল্য দুই টাকা।

মাসীমা—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

একটি ছোট গল্পের প্লটকে লেখক উপন্যাসে লাগাইয়াছেন, ফলে অনেক অবান্তর কথা ঢুকিয়া পড়িয়া বইখানিকে ফিকা করিয়া দিয়াছে।

বইয়ের প্রথমাংশে ভাষার প্রয়োগে কিছু কিছু ভুল আছে, শেষের দিকে সেটা কাটিয়া গিয়াছে এবং এই লেখকেরই লেখা 'পথের ধূলি'র ভাষা বেশ উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, এটা একটা আশার কথা। ছাপার অল্পস্বল্প দোষ আছে। বহিরাবরণ ভালই।

পথের ধূলি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য ৮০।

ছোট গল্পের বই, কিন্তু প্লটের অভাবে প্রথম দিকের কয়েকটি গল্প গল্পই হয় নাই। আর একটি বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব—বইটিতে অসুখে পড়ার বড় বাড়াবাড়ি। বইখানি আগাগোড়াই করুণরসাত্মক তাহাতে অসুখে-অসুখে যেন আরও নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে। গল্পের মোড় ফিরাইতে হইলেই পাত্রপাত্রীদের ধাঁ করিয়া অসুখে ফেলা বাংলা লেখকদের একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইতেছে, সেইজন্য কথাটার উল্লেখ করিলাম। ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি সবই "মাসীমা"র মত।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্মসূত্রম্—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত সরল সটীক ভাষ্যসমেতম্। ৫ নং উড ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

গ্রন্থকার পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। তিনি 'স্বাধীন ভাবে' অর্থাৎ কোন বিশেষ আচার্য্যের অনুসরণ না করিয়া ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন আচার্য্যের মতানুসরণে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহার ফলে সমগ্র গ্রন্থের তাৎপর্য্যের ঐক্য সংরক্ষিত হয় নাই।

পূর্ব্ব ও উত্তর পক্ষ অবলম্বনে তিনি সরল বাংলা ভাষায় স্বীয় ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ঐ ভাষ্য তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইলেও তাহা দ্বারা সূত্রের মর্ম্মার্থ সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট হয় নাই—সূত্রের শব্দার্থও সর্ব্বত্র সঙ্গত হয় নাই, বরং স্থানে স্থানে তাহা গ্রন্থকারের অনবধানতারই পরিচায়ক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ২।৩।৪৩ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বাভাসও স্থানে স্থানে ভ্রমপূর্ণ। গ্রন্থে গুরুতর ভাষাগত দোষ ও মুদ্রাকর-প্রমাদ বর্ত্তমান। দ্বিতীয় সংস্করণে দোষমুক্ত হইলে গ্রন্থখানি সকলের আদরণীয় হইবে আশা করা যায়।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

পত্রলেখা—শ্রীকনকলতা ঘোষ। প্রকাশক শ্রীসলিলচন্দ্র ঘোষ, ৪৪ বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৬৫ পৃঃ, মূল্য ।৵০।

অশ্রুসিক্ত হৃদয়ের মর্ম্মবেদনা পত্রাকারে এই গ্রন্থে প্রকাশলাভ করিয়াছে। দরদী হৃদয়ের সহানুভূতি লেখিকা পাইবেন। বইখানির ভাষাও ভাল।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতোপনিষদ্, দ্বাদশ অধ্যায়—শ্রীক্ষীরোদনারায়ণ ভূঁয়া, এম্-এ, বি-এল, এড্‌ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট, প্রণীত। "অষ্টাবিংশতি কলিযুগে ৫০৩৪ মনুষ্যাব্দে" প্রকাশিত। প্রকাশক বোধ হয় গ্রন্থকার নিজেই, কেননা তাঁহার কোন উল্লেখ নাই।

নামেই গ্রন্থখানার পরিচয় রহিয়াছে। বাংলা টীকাটি সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিদ্রোহী বালক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত, ১০ ইন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানি শিশুপাঠ্য উপন্যাস। ইহার প্লট বিলাতী, কয়েকটি চরিত্রও খাঁটি বিলাতী। সেজন্য এ-দেশের আবহাওয়ায় তাহারা নিতান্ত বেমানান, এমন কি অদ্ভুত। তবে গল্পটি প্রথম দিকে জমিয়াছে বেশ; কিন্তু মাঝ হইতে শেষ অবধি সেরূপ নয়।

ছাপা ও কাগজ ভাল। প্রচ্ছদপটখানি বর্জ্জন করিলে ভাল হইত।

লক্ষ্যহারা—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—গোলাপ পাবলিশিং হাউস, ১২ হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

একখানি উপন্যাস। দেশের দুঃখ-দারিদ্র্যে লেখকের গভীর বেদনাবোধ ইহাতে জাগ্রত; আর, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া গ্রন্থখানি

রচিত হইয়াছে। এ-শ্রেণীর উপন্যাস আমাদের সাহিত্যে অতি অল্প। লেখকের উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। ছাপা ও কাগজ ভাল।

স্বপ্নসুন্দরী—শ্রীগদাধরসিংহ রায় প্রণীত। গুরুদাস লাইব্রেরী। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।০।

ত্র্যাঙ্ক নাটিকা।

রাজা গণেশ—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক—বিজয়া সাহিত্য-মন্দির, কাশীধাম ও রাজসাহী। দাম এক টাকা।

নাটক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

উনপঞ্চাশৎ—শ্রীগোপালদাস চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, ৩২ বীডন রো, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১২৮, মূল্য বারো আনা।

গ্রন্থে উনপঞ্চাশটি গান স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার জমিদার, তাঁহার বন্ধু সঙ্গীতরত্ন শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"গোপালদাস বাবুর এই সঙ্গীতগুলিতে প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে।" দুঃখের বিষয়, আমরা তাঁহার এই মন্তব্য সমর্থন করিতে পারিলাম না। গানগুলি মোটামুটি ভাল, এতদধিক প্রশংসার দাবি এই গানগুলি করিতে পারে না। শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র নন্দী গানগুলির সুর-যোজনা ও স্বরলিপি করিয়াছেন। তাঁহার স্বরলিপি-প্রণালী অতি সুন্দর ও সহজে বোধগম্য। পুস্তকখানা সঙ্গীতশিক্ষার্থীর অনেক উপকারে আসিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালার পল্লীসংস্কার ও বেকারের উপায়—শ্রীসারদাপ্রসাদ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবনবিহারী চৌধুরী, ৭৮।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৩৮। মূল্য দুই আনা।

লেখক নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া পল্লীসংস্কারকামীদের বিশেষ উপকারসাধন করিয়াছেন। বেকার-সমস্যা বাংলার একটি কঠিন সমস্যা। ইহার সমাধানকল্পে যতই আলোচনা হয় ততই ভাল। পুস্তকখানিতে এ-বিষয়ে চিন্তার খোরাক যথেষ্ট মিলিবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বাস্কারভিল-কুক্কুর—শ্রীকুলদারঞ্জন রায়। এম-সি,-সরকার এণ্ড সন্স লিঃ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹।

এই বইটি প্রসিদ্ধ লেখক কনান-ডয়েলের ইংরেজী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের অনুবাদ। কুলদা বাবুর অনুবাদে মূল বইয়ের চিত্তাকর্ষণশক্তি প্রায় সমস্তই বজায় আছে। ছেলে-বুড়া সকলের কাছেই এইরূপ বইয়ের সমান আদর পাইবার কথা। মূল বই পাশ্চাত্য জগতে বিখ্যাত, এতদিনে এদেশেও তাহার খ্যাতি বিস্তার হইবে বলিয়া মনে হয়। কুলদা বাবুর বিশেষত্ব এই যে তিনি নির্দ্দোষভাবে লিখিত রোমাঞ্চকর বিবরণী বাংলা পাঠকের কাছে অনেকবার দিয়াছেন। আলোচ্য বইটিও সেই পর্য্যায়ে পড়িবে।

ক. চ.

দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ—শ্রীসারদাপ্রসন্ন দাস। ২৫।১ জাষ্টিস্ চন্দ্রমাধব রোড হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত। ইহাতে মাদ্রাজ প্রদেশ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মহিশূরের ন্যূনাধিক দেড় শত তীর্থস্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকটি তীর্থের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বাংলা পুস্তকে ও মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতের একটি বিশুদ্ধ মানচিত্র এই পুস্তকে সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত রেলপথ ও প্রধান প্রধান তীর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তিনটি পরিশিষ্ট সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, প্রথমটিতে ভৌগোলিক বিবরণ, দ্বিতীয়টিতে প্রধান প্রধান তীর্থসমূহে ভ্রমণের ক্রম, এবং তৃতীয়টিতে দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত চারিটি ভাষার প্রয়োজনায় অনেক শব্দ ও তাহাদের বাংলা প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করিলে পরবর্ত্তী ভ্রমণকারীর অনেক সুবিধা হইবে। কেবল ভ্রমণকাহিনী হিসাবে এই গ্রন্থের উপযোগিতা নহে, যাহাতে এই পুস্তক পাঠ করিয়া পাঠক বর্ণিত তীর্থসকলের মহিমা উপলব্ধি করিতে এবং তাহাদের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারে তাহার দিকে লেখক মহাশয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। তিনি তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে করিতে বহু ভক্তি-ভাবোদ্দীপক কবিতা গান ও সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার রচনায় একটা বিশেষ মাধুর্য্য ও হৃদয়গ্রাহিতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই তীর্থপ্রসঙ্গ পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যেন কোন ভাবুক ভক্ত তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। গ্রন্থের ভাষা বেশ সরল এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত-বর্ণনার একান্ত উপযোগী। উপসংহারে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও ভারতের চারি জন প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত সন্নিবিষ্ট হওয়ায় এই গ্রন্থের উপযোগিতা আরও বেশী হইয়াছে। বাংলা ভাষায় এইরূপ গ্রন্থ অতি বিরল এবং ইহার সমধিক প্রচার বিশেষ বাঞ্ছনীয়। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

অভিনব মেঘদূত এবং কালিদাসের অবমাননা*

শ্রীবীরেশ্বর সেন

মেঘদূত কালিদাসের এক চমৎকার সৃষ্টি। ইহার কবিত্ব যেমন অসাধারণ, ভাষার গৌরবও তেমনই, বরং ইহার কবিত্ব অপেক্ষা ইহার ভাষার গৌরবই অধিকতর চিত্তাকর্ষক। কালিদাস যেমন কবি ছিলেন তেমনই ভাষার উপরও তাঁহার অসাধারণ আধিপত্য ছিল, কিন্তু তিনি যে মেঘদূতের রচনায় অনবদ্যভাবে শব্দ-নির্ব্বাচন করিয়াছেন সেই বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত। এ-পর্যান্ত কোন পণ্ডিতম্মন্য লোকই এমন কথা বলেন নাই যে মেঘদূতের ভাষায় দোষ আছে এবং তাহার সংশোধন হইতে পারে, তবে ভিন্ন ভিন্ন হস্তলিখিত পুস্তকে মেঘদূতের কয়েকটা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দেখিয়া মনে হইতে পারে যে কালিদাসের ভাষার সেই সেই স্থানে সুষ্ঠু ছিল না বলিয়া অন্য লোকে ইচ্ছা করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই সকল পাঠ-ভেদের অন্য কারণও থাকিতে পারে। এক জনের হস্তাক্ষর আর এক জন কোন কোন স্থানে পড়িতে না পারিয়া সেই সেই স্থানে নূতন পাঠ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। অধিকতর সম্ভাবনা এই যে মেঘদূত রচিত হইলে গুণগ্রাহিগণ তাহার প্রতিলিপি লইবার পর কালিদাস নিজেই তাহার সংস্কার করিয়া কোন কোন স্থলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এইরূপ হইয়া থাকিলে মেঘদূতের যত পাঠ-ভেদ দেখা যায়—সেগুলি সমস্তই কালিদাসের নিজের এবং সেই সকল পাঠ-ভেদের যেগুলি উৎকৃষ্ট তাহাই কালিদাসের শেষ সংস্করণের ফল। কোন্ কোন্ পাঠ উৎকৃষ্ট তাহা মল্লিনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য বহু পণ্ডিত ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

তাঁহাদের নির্দ্ধারিত পাঠই বহুকাল হইতে বিশুদ্ধ পাঠ বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারা কেহই নূতন পাঠ প্রস্তুত করেন নাই। এ-পর্য্যন্ত কেহই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া এমন কথা বলেন নাই যে প্রচলিত মেঘদূতের অমুক অমুক স্থানে উক্ত মহোদয়গণের পাঠ-নির্ব্বাচন দোষ-স্পৃষ্ট হইয়াছে এবং কেহই নূতন পাঠ প্রস্তুত করিয়া মেঘদূত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি এক জন বাঙালী এই কার্য্য করিয়াছেন। তিনি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। তিনি মেঘদূতের এক শতেরও অধিক স্থানে ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া মেঘদূতের এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বীয় ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "এই পুস্তকে বঙ্গদেশে প্রচলিত পাঠকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা হয় নাই। আধুনিক বিচারের আলোকে পাঠ-সংস্কারের একটা চেষ্টা করা হইয়াছে। সেই দায়িত্ব আমারই। এই সংস্কার-কার্য্যে প্রধানতঃ বল্লভদেবের ও জিনসেনের ধৃত পাঠের উপরই নির্ভর করিয়াছি। যে-যে স্থানে আমাদের পাঠ বাংলায় প্রচলিত মল্লিনাথের পাঠ হইতে পৃথক হইয়াছে তাহা গ্রন্থের শেষে 'মেঘদূত প্রসঙ্গে' উল্লেখ করিয়াছি. বল্লভদেবের পাঠ যে মল্লিনাথের পাঠের চেয়ে অধিকতর সঙ্গত তাও দেখান হইয়াছে। প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন না করিয়া মল্লিনাথ-ধৃত বহু প্রচলিত সমস্ত শ্লোকগুলিই রাখা হইল, তবে মল্লিনাথ নিজে যে-গুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন সেইগুলি সবই পরিত্যক্ত হইয়াছে।......যে-সব জায়গায় বাংলা দেশের অভ্যস্ত পাঠ গ্রহণ করিলে কাব্যে ভাবগত কোন অসঙ্গতি ঘটে না সে-সব স্থানে পাঠ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। যে-সব স্থানে ঐ অসঙ্গতি-দোষ ঘটে কেবল সে-সব স্থানেই পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে ও 'মেঘদূত-প্রসঙ্গে' তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে পাঠ-সংস্কার করিয়া বাঙ্‌লা দেশে মেঘদূতের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার বিশেষ প্রয়োজন এখনও রহিল।"

কিন্তু প্রবোধ বাবু শতাধিক স্থানে পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া মাত্র সাতটা পরিবর্ত্তনের কথা স্বীয় "মেঘদূত-প্রসঙ্গে" স্বীকার করিয়াছেন। তাহারও কোন্‌টা বল্লভদেবের, কোন্‌টাই বা জিনসেনের তাহার উল্লেখ করেন নাই। এই সকল পরিবর্ত্তনের যে হেতুবাদ বা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহা *ipsc dixit* ভিন্ন কিছুমাত্র অধিক নয়। তাঁহার প্রত্যেক কৈফিয়তেরই মর্ম্ম এই যে তাঁহার বিবেচনায় তাঁহার ধৃত পাঠই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। তাঁহার স্বীকৃত সাতটা পরিবর্ত্তন ব্যতীত তিনি আরও যে শতাধিক পরিবর্ত্তন গোপনে 'বেমালুম'ভাবে করিয়াছেন তাহা কোন স্থানেই উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার পরিবর্ত্তনে কিরূপ অপকর্ষ সাধিত হইয়াছে তাহা সংস্কৃত কাব্যের মর্ম্মজ্ঞ পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন।

প্রথমে প্রবোধ বাবুর স্বীকৃত সাতটা পরিবর্ত্তনের আলোচনা করিয়া পরে তাঁহার গোপনে কৃত পরিবর্ত্তনগুলি বিবৃত করিব।

প্রবোধ বাবুর স্বীকৃত পরিবর্ত্তন—(১) পূর্ব্বমেঘের দ্বিতীয় শ্লোকে 'কৌতুকাধান হেতু' ছিল: প্রবোধবাবু সে স্থানে 'কেতকাধান হেতু' করিয়া দিয়া লিখিয়াছেন যে তাঁহার পাঠই "অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। বর্ষাকালে কেতকা বা কেয়াফুল ফোটে।" প্রবোধ বাবু ভাবিলেন না যে বর্ষাকালে কেবল কেতকী বা কেয়া ফোটে না। নীপ, ককুট, কুটজ প্রভৃতি বহু ফুলের নাম মেঘদূতেই আছে। এইগুলির মধ্য হইতে কালিদাস মেঘকে কেবল কেয়া ফুলের আধান হেতু বলিবেন কেন? অন্য পক্ষে নববর্ষের আগমনে যে-কোন লোকের মনে অনন্ত কৌতুক বা কৌতূহল বা বিস্ময় উৎপাদন করে ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

(২) নবম শ্লোকে যক্ষ মেঘকে বলিতেছেন—'চাতক স্তে স্বগন্ধ' অর্থাৎ চাতক তোমার নিজেরই লোক। এরূপ বলায় কবিত্ব আছে, কিন্তু প্রবোধবাবু এই পাঠস্থলে পাঠ দিয়াছেন 'চাতক স্তোয় গৃধ্নুঃ'। এই পাঠে কবিত্বের লেশমাত্রও নাই! প্রবোধ বাবু ভাবিয়াছেন 'তোয় গৃধ্নুঃ'ই পাঠ ছিল, লিপিকর-প্রমাদে 'তে স্বগন্ধঃ' হইয়া গিয়াছে। তিনি ভাবিয়াছেন ইহা অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ আর কি হইতে পারে। শকুন্তলায় দুষ্যন্ত বলিতেছেন যে হরিণগুলা শকুন্তলার স্বগন্ধ এইজন্য শকুন্তলা হরিণ ভালবাসেন।

(৩) বত্রিশ শ্লোকে প্রবোধবাবু 'ধূপ' স্থানে 'ধূম' পাঠ দিয়াছেন। কালিদাস যে এখানে ধূপ শব্দ দ্বারা লক্ষণা নামক অলঙ্কার-প্রয়োগ করিয়াছিলেন প্রবোধবাবু তাহা ভাবিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে আমরা তামাক খাওয়ার কথা বলি কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে লোকে তামাকের ধূমই সেবন করে।

(৪) এই শ্লোকের 'লক্ষ্মীং পশ্যন্' স্থলে প্রবোধ বাবু 'নীত্বা রাত্রিং' পাঠ

---

* শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত কৃত বাংলা "মেঘদূত" সহিত মুদ্রিত শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত সংস্কৃত ভাগের সমালোচনা।

বানাইয়া দিয়া এই বলিয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, "লক্ষ্মীং পশ্যন্ পাঠের কোন সঙ্গত অর্থই হয় না। অধ্যাপক কে. বি. পাঠকও মল্লিনাথের এই পাঠ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।" 'লক্ষ্মী' শব্দের অর্থ যে 'শোভা' হয় তাহা প্রবোধ বাবু অভিধান দেখিলেই জানিতে পারিতেন। হর্ম্ম্য অর্থাৎ প্রাসাদের শোভা দেখিতে বলায় অসঙ্গতিটা কোথায় হইয়াছে? অধ্যাপক কে. বি. পাঠকও কি 'লক্ষ্মীং পশ্যন্' পাঠ কাটিয়া দিয়া নূতন পাঠ সংযোজন করিয়া মেঘদূত ছাপাইয়াছেন? যদি তাহা করিয়া থাকেন তাহা হইলে পাঠক-মহাশয়ও কম ধনুর্দ্ধর নহেন। সমস্ত চরণটি এই 'লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিত বনিতা পাদরাগাঙ্কিতেষু।' ইহার অর্থ এই যে সুন্দরী নারীদিগের পদচিহ্নযুক্ত বাড়ীর শোভা দেখিয়া। এখানে লক্ষ্মী শব্দের পর ললিত শব্দ থাকায় অল্প একটু অনুপ্রাস হইয়াছে। মেঘদূতের প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অল্পাধিক অনুপ্রাস আছে ও প্রবোধ বাবুর পাঠে এই অনুপ্রাস নষ্ট হইয়াছে। 'রাগাঙ্কিতেষু' শব্দটা যে পূর্ব্ব চরণের 'হর্ম্ম্যেষু' শব্দের বিশেষণ প্রবোধ বাবু এবং পাঠক-মহাশয় তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

(৫) একান্ন শ্লোকে 'পশ্চার্দ্ধলম্বী' স্থলে প্রবোধ বাবু 'পূর্ব্বার্দ্ধলম্বী' করিয়া দিয়া লিখিয়াছেন, "এই পাঠ সুস্পষ্ট কারণবশতঃ পশ্চার্দ্ধলম্বী পাঠের চেয়ে অধিকতর সুন্দর।" কেন, তাহা লেখা প্রবোধ বাবু উচিত মনে করেন নাই।

(৬) একষট্টি শ্লোকে 'বলয়কুলিশোদ্ঘট্টনোদগীর্ণতোয়ং' কাটিয়া দিয়া প্রবোধ বাবু পাঠ দিয়াছেন 'জনিতসলিলোদ্গার মন্তঃপ্রবেশান্।' এই পাঠ সম্বন্ধে বলিতেছেন যে প্রচলিত পাঠাপেক্ষা ইহা "অনেক স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।" তিনি আরও লিখিয়াছেন, "হিমালয়ের নানা স্থানে মেঘ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বৃষ্টিপাত করে তাহাতে ঐ গৃহ সত্য-সত্যই যন্ত্রধারা গৃহত্ব প্রাপ্ত হয়।" পাঠ-পরিবর্ত্তনের চমৎকার যুক্তি!

(৭) উত্তর মেঘের একাদশ শ্লোকের 'স্তন পরিসরচ্ছিন্ন সূত্রৈশ্চ হারৈঃ' কালিদাসের এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'মুক্তালগ্নস্তন পরিমলৈশ্ছিন্ন সূত্রৈশ্চ হারৈঃ,' করিয়া দিয়া প্রবোধবাবু লিখিয়াছেন যে তাঁহার কল্পিত পাঠ "অধিকতর সঙ্গত ও স্বাভাবিক। পরিমল মানে চন্দনপঙ্ক প্রভৃতি মর্দ্দনজাত সুগন্ধ অনুলেপন। মেয়েরা স্তনেও পরিমল লেপন করিত। গতিকম্পনে সূতা ছিঁড়িয়া যাওয়ায় পথে হারের মুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে, এবং ঐ মুক্তায় স্তনের পরিমল লাগিয়া রহিয়াছে।"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে উল্লিখিত সাতটা পরিবর্ত্তন যাহা প্রবোধ বাবু প্রকাশ্যভাবে করিয়াছেন তাহার একটাও বল্লভদেবের অথবা জিনসেনের ধৃত পাঠ নহে, কেন-না পূর্ব্বকালীন আচার্য্যগণ মোটেই কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিলেন না। অতিদাম্ভিকতাবশতঃই প্রবোধ বাবু কালিদাসের উপর কলম চালাইয়া এই সকল অপপাঠ সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রবোধ বাবু যে-সকল পরিবর্ত্তন গোপন ভাবে করিয়াছেন অর্থাৎ এমনভাবে করিয়াছেন যে যাহারা প্রথমবার মেঘদূত পড়িতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সংস্করণ পড়িবে তাহারা ভাবিবে যে তাহারা কালিদাসের সুপ্রচলিত রচনাই পড়িতেছে এবং সন্দেহ মাত্র করিবে না যে তন্মধ্যে অন্যেরও কৃতিত্ব আছে। এখন আমি সেই সকল পরিবর্ত্তনের কথাই বলিব। এই সকল পরিবর্ত্তনের সংখ্যা এক শতেরও অধিক হইবে। এইরূপে কোন বিখ্যাত গ্রন্থকারের ভাষা কাটিয়া দিয়া তৎস্থানে কুৎসিত পাঠ দিয়া পূর্ণ করিয়া পুস্তক ছাপাইয়া বিক্রয় করিলে ক্রেতাগণকে প্রতারণা করা হয় কিনা তাহা পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

পূর্ব্বমেঘে গোপনে কৃত পরিবর্ত্তন

১। দশম শ্লোকে 'সদ্যঃপাতি' স্থলে প্রবোধ বাবু 'সদ্যঃপাত' পাঠ দিয়াছেন।

২। ষোড়শ শ্লোকের 'ব্রজলঘুগতিঃ' স্থানে প্রবোধ বাবু 'প্রবলয়গতিম' এই জঘন্য পাঠ দিয়াছেন।

৩। বিশ শ্লোকে 'জম্বুকুঞ্জ' স্থানে প্রবোধবাবুর পাঠ 'জম্বুখণ্ড'।

৪। একুশ শ্লোকে 'নবজল' স্থলে 'জললব' এই দেওয়া হইয়াছে।

৫। তেইশ শ্লোকে 'পরিণত ফল' স্থলে 'ফল পরিণতি' পাঠ দেওয়া হইয়াছে।

উপরি উক্ত পাঁচটি পরিবর্ত্তন প্রবোধ বাবু কিরূপ বিচারালোকের সাহায্যে সম্পন্ন করিয়াছেন জানিতে ইচ্ছা হয়। কালিদাসের যে পাঠ ছিল তাহাতে প্রবোধ বাবু কি দোষ দেখিয়াছিলেন যে সেই পাঠ কাটিয়া নূতন পাঠ বানাইয়া দিয়াছেন?

৬। ছাব্বিশ শ্লোকে 'নগনদী' স্থানে প্রবোধ বাবুর পাঠ 'বননদী'। পার্ব্বতী নামে একটা নদীকেই যে কালিদাস নগনদী নামে অভিহিত করিয়াছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

৭। বত্রিশ শ্লোকে 'খেদং নয়েথাঃ' কালিদাসের এই পাঠ কাটিয়া দিয়া 'খিন্নান্তরাত্মা' পাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

এই শ্লোকে অপর দুইটি পরিবর্ত্তনের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

৮। তেত্রিশ শ্লোকে কালিদাসের 'বীক্ষ্যমান' স্থলে 'দৃশ্যমান' পাঠ দিয়াছেন। দৃশ্যমান বলিলে 'সাধারণভাবে দেখা' বুঝায়, 'বীক্ষ্যমান' বলিলে 'মনোযোগের সহিত দেখা' বুঝায়।

৯। সাঁইত্রিশ শ্লোকে 'তোয়োৎসর্গাৎ' স্থলে 'তোয়োৎসর্গ'। ইহাতে অর্থের অপকর্ষ হয় নাই বটে, কিন্তু উৎকর্ষও কিছুমাত্র হয় নাই।

১০। একচল্লিশ শ্লোকে 'বিবৃত' স্থলে 'পুলিন' পাঠ দেওয়া হইয়াছে।

১১। বিয়াল্লিশ শ্লোকে কালিদাসের 'ধ্বনিত' স্থানে প্রবোধ বাবু 'স্তনিত' পাঠ দিয়াছেন।

১২। পঁয়তাল্লিশ শ্লোকে কালিদাসের 'সর বন ভব' স্থলে প্রবোধ বাবু 'সরবন ভুব' পাঠ দিয়াছেন। স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয়ের জন্ম সরবনে হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে সরবনভব বলে। কিন্তু প্রবোধ বাবু নিশ্চয়ই এই ভাবিয়াছেন যে সরবনটা স্কন্দের জমিদারী ছিল। এরূপ না ভাবিলে তিনি 'সরবন ভুব' পাঠ প্রস্তুত করিলেন কেন?

১৩। সাতচল্লিশ শ্লোকে কালিদাসের 'কৃষ্ণাশার' স্থলে প্রবোধ বাবু 'কৃষ্ণসার' পাঠ দিয়াছেন। 'শ' ই যে ঠিক সে-বিষয়ে মল্লিনাথের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। এখানে কৃষ্ণসার মৃগের কোন প্রসঙ্গ নাই।

১৪। আটচল্লিশ শ্লোকে 'অভ্যবর্ষৎ' পাঠ কাটিয়া প্রবোধ বাবু 'অভ্যসিঞ্চৎ' পাঠ বসাইয়া দিয়াছেন। জলধারা বর্ষণ এবং অস্ত্রধারা বর্ষণ লোকে বলিয়া থাকে। কিন্তু অস্ত্রধারা সিঞ্চন কখনও হইতে পারে না।

১৫। উনপঞ্চাশ শ্লোকে চতুর্থ চরণে 'শুদ্ধ' কাটিয়া 'স্বচ্ছ' পাঠ বসাইয়া দিয়াছেন।

১৬। একান্ন শ্লোকে কালিদাসের 'অসৌ' পাঠ কাটিয়া দিয়া প্রবোধ বাবু 'সা' পাঠ দিয়াছেন। যদি 'সা' থাকিত তাহা হইলে প্রবোধ বাবু নিশ্চয়ই অসৌ করিয়া দিতেন!

১৭। বাহান্ন শ্লোকে 'শুভ্র' কাটিয়া দিয়া প্রবোধবাবু 'রম্যাং' পাঠ বসাইয়া দিয়াছেন।

১৮–২১। চুয়ান্ন শ্লোকের প্রথম দুই চরণ ছিল :—

যে সংরম্ভোৎ পতন রভসা স্বাঙ্গ ভঙ্গায় তস্মিন্
মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্।

প্রবোধ বাবু তৎস্থলে করিয়াছেন—

যে ত্বাং মুক্ত ধ্বানমসহনাঃ কায়ভঙ্গায় তস্মিন্
দর্পোৎসেকাদুপরি শরভা লঙ্ঘয়িষ্যন্ত্য লজ্ঘ্যম্।

আবার তৃতীয় চরণে 'পাদ' শব্দ স্থানে 'হাস' করিয়া দিয়াছেন। কালিদাস মেঘদূতেরই অন্যত্র শ্বেতবর্ণ ফেনের সহিত হাস্তের তুলনা করিয়াছেন। প্রবোধ বাবু বৃষ্টির সহিত হাস্তের তুলনা করিয়াছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, মুক্তাধ্বান কাহাকে বলে? কালিদাস বিধিলিঙের প্রয়োগ করিয়া একটা সম্ভাবনা বা চেষ্টার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু প্রবোধচন্দ্র লৃঙ্ প্রয়োগ করিয়া যাহা লজ্ঘন করা যায় না তাহাকেই লজ্ঘন করাইয়াছেন।

২৮–২৯। পঞ্চান্ন শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে 'উপচিত' স্থলে 'উপহৃত' করা হইয়াছে; চতুর্থ চরণে 'সংকল্পস্তে' স্থলে 'কল্পন্তেঽস্য' পাঠ দেওয়া হইয়াছে।

৩০–৩১। ছাপ্পান্ন শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে 'সংসক্ত' স্থানে 'সংরক্ত' করায় কেবল যে অনুপ্রাস নষ্ট হইয়াছে তাহা নহে অর্থেরও কিছু পার্থক্য হইয়াছে। তৃতীয় চরণে 'নির্হ্রাদ' স্থলে 'নির্হ্রাদি' এবং 'কন্দরেষু' স্থলে 'কন্দরাসু' এবং চতুর্থ চরণে 'সমগ্র' স্থলে 'সমস্তঃ' এই পাঠ দেওয়া হইয়াছে।

৩৪। সাতান্ন শ্লোকের তৃতীয় চরণে 'অনুসরেঃ' পাঠ ছিল, প্রবোধ বাবু সেখানে অভিসরেঃ পাঠ দিয়াছেন। অতএব মেঘের যাত্রাটাকে প্রবোধ বাবুর মতে অভিসার বলা যাইতে পারে।

৩৫। উনষাট শ্লোকের তৃতীয় চরণে কালিদাসের লিখিত 'শোভা' শব্দ কাটিয়া তৎস্থলে 'লীলা' শব্দ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩৬–৩৯। ষাট শ্লোকের প্রথম চরণে 'তস্মিন্' শব্দ কাটিয়া 'নীলং', দ্বিতীয় চরণে 'বিচরেৎ' কাটিয়া 'বিহরেৎ', তৃতীয় চরণে 'জলৌঘঃ' কাটিয়া 'জলোঽস্তাঃ' এবং চতুর্থ চরণে 'পদসুখ' স্থানে 'সুখপদ' করা হইয়াছে।

৪০–৪৩। একষট্টি শ্লোক ছিল,

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘট্টলোদ্গীর্ণতোয়ং

প্রবোধ বাবু করিয়া দিয়াছেন—

তত্রাবশ্যং জনিতসলিলোদ্গারমন্তঃ প্রবেশান্।

৪৪–৫৪। বাষট্টি শ্লোকে দ্বিতীয় চরণে 'কামং' ছিল তাহার অর্থ সদৃচ্ছাক্রমে। প্রবোধ বাবু করিয়া দিয়াছেন 'কামাৎ' যাহার অর্থ কামভাব হইতে। তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ এইরূপ ছিল,

ধুন্বন্ কল্পদ্রুম কিসলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ
র্নানা চেষ্টৈর্জলদ ললিতৈঃ নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্॥

প্রবোধ বাবুর পরিবর্তন এইরূপ,

ধুন্বন্ বাতৈঃ সজল পৃষতৈঃ কল্পবৃক্ষাংশুকানি
ছায়াভিন্নঃ স্ফটিক-বিশদং নির্ব্বিশেঃ পর্ব্বতম ত্বম্॥

সুতরাং এক পূর্ব্বমেঘেই তিনি চুয়ান্নটা পরিবর্তন করিয়াছেন অথচ এই পরিবর্ত্তনের কথা তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকের কোনও স্থানে উল্লেখ করেন নাই।

অতঃপর উত্তরমেঘে তিনি যে-সকল পরিবর্তন না বলিয়া অর্থাৎ গোপনভাবে করিয়াছেন তাহা বিবৃত করিতেছি।

উত্তরমেঘে গোপনে কৃত পরিবর্ত্তন

১–২। দ্বিতীয় শ্লোকের 'অলকে' স্থলে 'অলকং' এবং 'আননে' স্থলে 'আনন'। প্রবোধ বাবু নিশ্চয়ই ভাবিয়াছেন যে 'অণুবিদ্ধ' শব্দটা বিশেষণ এবং নির্বোধ কালিদাস ভুল করিয়া বিশেষ্যরূপে প্রয়োগ করিয়াছেন।

এই দুইটা পরিবর্তনে শ্লোকে যে ক্রমভঙ্গ দোষ হয় তাহা প্রবোধ বাবুর বুদ্ধিগম্য হয় নাই। হস্তে, অলকে, আননে, চূড়াপাশে, কর্ণে এবং সীমন্তে এই ছয়টা শব্দেই কালিদাস সপ্তমী বিভক্তি দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দুইটায় প্রবোধ বাবু আধুনিক বিচারালোকের সাহায্যে সপ্তমী বিভক্তির লোপ করিয়াছেন। ইহাতে যে কেবল ক্রমভঙ্গ হইয়াছে তাহা নহে, ভাষাগত ভুলও হইয়াছে।

৩–৭। সপ্তম শ্লোকে 'উচ্ছ্বসিত' স্থানে 'উচ্ছ্বসন', 'বিম্বাধরাণাং' স্থলে 'যক্ষাঙ্গনানাং', 'ক্ষৌমং' স্থানে 'বাসঃ', 'রাগাৎ' স্থানে 'কামাৎ', 'প্রেরণা' স্থলে 'প্রেরণৈঃ'।

কালিদাস যে 'উচ্ছ্বসিত' লিখিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই যে আমরা এখন যতস্থানে অন্ভাগান্ত শব্দ ব্যবহার করি কালিদাস সে-সমস্ত স্থলেই ইত ভাগান্ত পদ ব্যবহার করিতেন, ইহার বোধ হয় প্রায় এক শত দৃষ্টান্ত মেঘদূত হইতেই সংগৃহীত হইতে পারে। কয়েকটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি—গর্জ্জিত, স্খলিত, কূজিত, প্রভৃতি স্থলে আমরা গর্জ্জন, স্খলন, কূজন প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করি।

৮–১০। অষ্টম শ্লোকের তৃতীয় চরণ 'জালমার্গৈঃ' কাটিয়া দিয়া 'যন্ত্রজালৈঃ' এবং চতুর্থ চরণে 'নিপুণাঃ' স্থলে 'নিপুণং' করা হইয়াছে।

১১–১৩। নবম শ্লোকে প্রথম পংক্তিতে 'আলিঙ্গিত' স্থানে 'আলিঙ্গন' এবং তৃতীয় চরণে 'চন্দ্রপাদৈঃনিশীথে' স্থানে 'চাতিতাশ্চন্দ্রপাদৈঃ' করা হইয়াছে।

১৪–১৬। এগার শ্লোকে কালিদাসের 'পত্রচ্ছেদৈঃ' কাটিয়া দিয়া প্রবোধ বাবু 'স্বর্ণচ্ছেদৈঃ' এবং 'মুক্তাজালস্তনপরিসর' কাটিয়া দিয়া 'মুক্তালগ্নস্তনপরিমলৈঃ' করিয়া দিয়াছেন।

১৭। ত্রয়োদশ শ্লোকে 'কিসলয়ান্' স্থলে 'কিসলয়ৈঃ' করা হইয়াছে।

১৮–১৯। একবিংশ শ্লোকে 'হরিণী' স্থলে 'হরিণ' এবং 'প্রেক্ষণা' স্থলে 'প্রেক্ষণীঃ'।

২০। দ্বাবিংশ শ্লোকে 'জানাথাঃ' স্থলে 'জানীয়াঃ'।

২১–২২। ত্রয়বিংশ শ্লোকে 'প্রিয়ায়া' স্থলে 'বহুনাং' এবং 'অনুসরণ' স্থানে 'উপসরণ'।

২৩। পঞ্চবিংশ শ্লোকে 'তন্ত্রীমাদ্রাং' স্থলে 'তন্ত্রীমাদ্রা'।

২৪–২৬। 'বিহারদিবস' স্থলে 'ভ্রমনদিবস', 'স্থাপিত' স্থানে 'প্রস্তুত' এবং 'মৎসঙ্গম' স্থলে 'সংযোগং'।

২৭–২৯। সপ্তবিংশ শ্লোকে 'পীড়য়েৎ' স্থলে 'খেদয়েৎ', 'অলং' স্থলে 'অতঃ' এবং 'সৌধ' স্থলে 'আসন্ন'।

৩০। উনত্রিশ শ্লোকে 'ছাদয়ন্তীং' স্থলে 'ছাদয়ন্তাং'—এটি ছাপার ভুলও হইতে পারে

৩১–৩২। ত্রিশ শ্লোকে 'অপিভবেৎ' স্থলে 'উপনমেৎ'।

৩৩। একত্রিশ শ্লোকে 'উদ্বেষ্টনীয়া' স্থলে 'উন্মোচনীয়া'।

৩৪। বত্রিশ শ্লোকে 'পেশল' স্থলে 'পেলব',

৩৫–৩৬। চৌত্রিশ শ্লোকে 'ক্ষোভাৎচল' স্থলে 'ক্ষোভাকুল'

৩৭–৩৮। ছত্রিশ শ্লোকে 'যদিসা' স্থানে দয়িতা, 'সুখা' স্থানে যদি।

৩৯–৪১। সাঁইত্রিশ শ্লোকে বিদ্যুৎগর্ভ স্থলে বিদ্যুৎগর্ভে, স্তিমিত স্থলে নিহিত, ধীরং স্থলে ধীরঃ।

৪২–৪৪। আটত্রিশ শ্লোকে সন্দেশৈঃ স্থলে সন্দেশাৎ, হৃদয় স্থলে মনসি, নিহিতৈঃ স্থলে নিহিতাৎ। এই শ্লোকের পাঠ-পরিবর্ত্তনটা মন্দ হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কালিদাসের পাঠাপেক্ষা কিছুতেই উত্তম নহে।

৪৫। চল্লিশ শ্লোকে অঙ্গনঃ স্থলে আত্মনা।

৪৬। একচল্লিশ শ্লোকে প্রতনু স্থলে তন্বুচ। এই চ এখানে মোটেই হইতে পারে না, কেননা তাহাতে ভাষায় এবং ব্যাকরণে দোষ হয়।

৪৭ বিয়াল্লিশ শ্লোকে অদৃষ্ট স্থলে অগম্য।

৪৮। তেতাল্লিশ শ্লোকে চণ্ডি স্থলে ভীরু।

যক্ষ স্বীয় প্রণয় কুপিতাৎ পত্নীর কথা ভাবিতেছিলেন তাহা পরবর্ত্তী শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায়। সেইজন্ত চণ্ডি বলিয়া সম্বোধন উপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু প্রবোধ বাবু ঔৎসুক্য বশতঃ সে কথা ভাবিবার অবকাশ পান নাই।

৪৯। ছেচল্লিশ শ্লোকে পূর্ব্বং স্থলে পূর্ব্ব।

৫০। আটচল্লিশ শ্লোকে নিতরাং স্থলে সুতরাং।

৫১। উনপঞ্চাশ শ্লোকে শেষাণ্ মাসান্ স্থলে মাসানন্যান্।

৫২। একান্ন শ্লোকে ধ্বসিনঃ স্থলে হ্রাসিনঃ।

৫৩–৫৪। বাহান্ন শ্লোকে বিরহাৎ স্থলে বিরহ, উগ্রশোকাঃ স্থলে উদগ্রশোকাঃ। তুলনীয়—ছিল কঠিন, গুরুমহাশয় কোট করিলেন সুকঠিন।

উপসংহার

সুতরাং উত্তরমেঘে কালিদাস যে চুয়ান্নটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন প্রবোধ বাবু তাহার চুয়ান্ন স্থানে ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। ইহা সাধারণ বাহাদুরী নহে। পূর্ব্বমেঘেও প্রবোধ বাবু চুয়ান্ন স্থানের ভাষা গোপনভাবে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন উভয় মেঘে প্রকাশ্য ভাবে তিনি সাতটা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, সুতরাং প্রবোধ বাবু কৃত পরিবর্ত্তনের সংখ্যা এক শত পনের। আরও দুই-চারিটা পরিবর্ত্তন হয়ত আমার দৃষ্টিতে পড়ে নাই। এতগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া বই ছাপাইয়াও প্রবোধ বাবুর তৃপ্তি হয় নাই। কেননা তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, যে "সম্পূর্ণরূপে পাঠ সংস্কার করিয়া বাঙ্‌লা দেশে মেঘদূতের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার বিশেষ প্রয়োজন এখনও রহিল।"

ইহাতে বোধ হয় যে প্রবোধবাবু কালিদাসকে নিতান্ত গর্দ্দভ ছাত্র ভাবিয়া তাঁহার রচনা কাটিয়া কুটিয়া দিয়াছেন। কালিদাসকে যখন প্রবোধ বাবু এমন নির্ব্বোধ গর্দ্দভই মনে করেন, তখন কষ্ট করিয়া তাঁহার রচনা প্রবোধ বাবুর প্রকাশ করাই একটা আশ্চর্য্যের বিষয়। যদি করিলেনই তাহা হইলে মোটে সাতটা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়া অবশিষ্ট এক শত আটটা পরিবর্ত্তনের কথা গোপন করিলেন কেন?

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দশম পরিচ্ছেদ

১

দেখতে দেখতে এখানে ছ-সাত মাস হয়ে গেল। এখানে সময় কাটে কোথা দিয়ে বুঝতে পারি নে। সকালে আখড়ার কাজ করি, বিকেলে গোটাকতক ছেলে নিয়ে ছোট একটা পাঠশালা করি, তাতে যা পাই উদ্ধব বাবাজীর হাতে তুলে দিই। এক দিন মালতী আমায় বললে—ছেলে পড়িয়ে যা পান, তা আপনি উদ্ধব-জ্যাঠার হাতে দেন কেন? থাকা-খাওয়ার দরুন টাকা নেওয়া ত এখানে নিয়ম নেই, ও-টাকা আপনি নিজে রেখে দেবেন, আপনারও ত নিজের টাকার দরকার আছে। আমি বললাম—তা কি ক'রে হয় মালতী, আমি এমনি খেতে পারি নে। আর আমি ত খাওয়া থাকা ব'লে টাকা দিই নে, বিগ্রহের সেবার জন্তে দিই। এতে দোষ কি?

সেদিন মালতী আর কিছু বললে না। দিন-চারেক পরে আবার এক দিন ওই কথাই তুললে। টাকা আমি কেন দিই? আখড়া ত হোটেলখানা নয় যে এখানে টাকা দিয়ে খেতে হবে? ওতে তার মনে বাধে। তা ছাড়া আমার ত টাকার দরকার আছে। আমি তাকে বুঝিয়ে বলি, টাকা না-দিতে দিলে আমার এখানে থাকা হবে না। চলে যেতে হবে। সেদিন থেকে মালতী এ-নিয়ে আর কিছু বলে নি।

পাড়াগাঁয়ের দিনগুলো অদ্ভুত কাটে। দীঘির পাড়ে রাঙামাটির উঁচু বাঁধে এ-সময়ে একরকম ফুল ফোটে, ছায়া প'ড়ে এলে মাঝে মাঝে একা গিয়ে বসি। বাগদীদের মেয়েরা হাঁটুপর্য্যন্ত কাপড় তুলে মাছ ধরে, আখড়ার গোয়াল থেকে সাঁজালের ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে ওড়ে—তালের দীর্ঘ সারির ফাঁক দিয়ে এই সন্ধ্যায় কতদূর দেখতে পাই—দাদার দোকান,

দাদার বাতাসার কারখানা, সীতার শ্বশুর-বাড়ি, তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা, নিমচাঁদের বৌ শৈলদি।...

মালতীর স্বভাব কি মধুর! কি খাটুনিটা খাটে আখড়ায়—এক দিন উঁচু কথা শুনি নি ওর মুখে—কারও ওপর রাগ দেখি নি—বাপের মেয়ে বটে!

আখড়ায় ছোট একটা অশ্বত্থ-চারা আছে, উদ্ধব দাস রোজ স্নান ক'রে এসে গাছটা প্রদক্ষিণ করে, গাছটাতে জল দেয়। এ তার রোজ করাই চাই। এক দিন মালতীকে ডেকে বলি—তোমার উদ্ধব-জ্যাঠা পাগল নাকি? ও-গাছটার চারি পাশে ঘোরার মানে কি? মালতী বললে—কেন ঘুরবে না; সবাই ত আর আপনার মত নাস্তিক না। অশ্বত্থগাছ নারায়ণ—ওর সেবা করলে নারায়ণের সেবা করা হয়—জানেন কিছু? আমি বললুম—তাহ'লে তুমিও সেবাটা সুরু ক'রে পুণ্যি কিছু ক'রে নাও না সময় থাকতে? মালতী শাসনের সুরে বললে—আচ্ছা, আচ্ছা থাক্। আপনি ও-রকম পরের জিনিষ নিয়ে টিটকিরী দেন কেন? ওদের ওই ভাল লাগে, করে। আপনার ভাল লাগে না, করবেন না। তা নয়, সারাদিন কেবল এর খুঁৎ ওঁর খুঁৎ—ছি, আপনার এ-স্বভাব সারবে কবে?

বললাম—তোমার মত উপদেশ দেওয়ার মানুষের দেখা পেতাম যদি তাহ'লে এত দিন কি আর স্বভাব সারে না? তা সবই অদৃষ্ট!

কথা শেষ ক'রে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেই মালতী রাগ ক'রে আমার সাম্‌নে থেকে উঠে গেল।

বিকেলে কিন্তু ওকে আমার কাছেই আসতে হ'ল আবার। নিকটে নকাশিপাড়া, গাঁয়ে একটা যাত্রার দল ছিল, তাদের অধিকারী এসে উদ্ধব দাসকে বলে—বাবাজী, তিন মাস ব'সে আছি, বায়না-পত্তর একদম বন্ধ। দল ত আর চলে না। কালনা থেকে ঢোল বাজিয়ে এনেছিলাম—ঢোলকে যখন হাত দেবে, আঃ যেন মেঘ ডাকচে, বাবাজী। তা আপনাদের আখড়ায় এক দিন শ্যামসুন্দরজীউকে শুনিয়ে দিই। কিছু খরচ দিতে হবে না, তেল তামাক আর কিছু জলখাবার—

—জলখাবার-টাবার হবে না পাল-মশায়। তা ছাড়া আসর খাটানো ওসব কে করে? এখন থাক্। মালতী আমায় এসে বললে—উদ্ধব-জ্যাঠাকে বলুন, যাতে যাত্রাটা হয়। আমি জলখাবার দেব, জ্যাঠাকে সেজন্যে ভাবতে হবে না। আপনাকে কিন্তু আসরের ভার নিতে হবে। আমি বললাম—আমার দ্বারা ওসব হবে না। আমি পারব না।

মালতী মিনতির সুরে বললে—লক্ষ্মীটি, নিতেই হবে। যাত্রা যে আমি কতকাল শুনি নি! দেশের দলটা উৎসাহ না-পেলে নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি আসরের ভার নিলেই আমি ওদের ব'লে পাঠাই।

—না, আমি পারবো না, সোজা কথা। তুমি ওবেলা ও-রকম রাগ ক'রে চলে গেলে কেন?

—তাই রাগ হয়েছে বুঝি? কথায় কথায় রাগ।

—রাগ জিনিষটা তোমার একচেটে যে! আর কারও কি রাগ হ'তে আছে?

—আচ্ছা, আমি আর কখনও ও-রকম করব না। আপনি বলুন ওদের—কেমন ত?

যাত্রা হয়ে গেল—মালতী ওদের ছানা খাওয়ালে পেট ভ'রে। বললে—বাবা রাস্তা থেকে লোক ডেকে এনে খাওয়াতেন আর আমরা মুখ ফুটে যারা খেতে চাইছে, তাদের খাওয়াব না? বলে ছোট ছোট ছেলেরা আছে, তারা রাত জেগে চেঁচিয়ে শুধু-মুখে ফিরে যাবে, এ কখনও হয়?

মালতী অনেক বৈষ্ণব-গ্রন্থ পড়েছে। সময় পেলেই বিকেলে আমার কাছে বই নিয়ে আসে, দু-জনে পুকুর-পাড়ে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। আমার হয়েছে কি, সব সময় ওকে পেতে ইচ্ছে করে, নানা কথাবার্ত্তায় ছল-ছুতোয় ওকে বেশীক্ষণ কাছে রাখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বিকেলের দিকে ছাড়া সারাদিন ওর দেখা পাওয়া ভার। ওর কাছে বুদ্ধের কথা বলি, সেণ্ট্ ফ্রান্সিসের কথা বলি। ও আমাকে শ্রীচৈতন্যের কথা, শ্রীকৃষ্ণের কথা শোনায়।

এক দিন হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল মালতী বই লেখে। কি কাজে পুকুরের ঘাটে গিয়েছি দুপুরের পরে, দেখি বাঁধানো-সিঁড়ির উপর জামগাছের ছায়ায় একখানা খাতা প'ড়ে আছে—পাশেই দোয়াত কলম—খাতাখানা উল্টে দেখি মালতীর হাতের লেখা। এখানে ব'সে লিখতে লিখতে হঠাৎ উঠে গিয়েছে। অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল—না-জেনে

পারলাম না, প্রথমেই ওর গোটা গোটা মুক্তার ছাঁদে একটা সংস্কৃত শ্লোক লেখা :—

অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণায়বতীর্ণঃ কলৌ
• • •
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ

তার পরে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনা, বৃন্দাবনের প্রকৃতি বর্ণনা মাঝে মাঝে। খাতার ওপরে লেখা আছে—"পাষণ্ডদলন গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত।"

দেখছি, এমন সময় মালতী কোথা থেকে ফিরে এসে আমার হাতে খাতা দেখে মহাব্যস্ত হয়ে বললে—ও কি? ও দেখছেন কেন? দিন আমার খাতা—

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম—এইখানে পড়ে ছিল, তাই দেখছিলাম কার খাতা—

—না দিন ও দেখবার যো নাই।

—যখন দেখে ফেলেছি তখন তার চারা নেই। কে জানতো তুমি কবি! এ শ্লোকটা কিসের? মালতী সলজ্জ সুরে বললে—চৈতন্যচরিতামৃতের। কেন দেখছেন দিন—

—শোনো মালতী—লিখছ এ বেশ ভাল কথাই। কিন্তু তোমার এ লেখা সেকেলে ধরণের। পাষণ্ডদলনের অনুকরণের বই লিখলে একালে কে পড়বে? তুমি আজকালকার কবিতার বই কিছু পড় নি বোধ হয়?

মালতী আগ্রহের সুরে বললে—কোথায় পাওয়া যায়, আমায় দেবেন আনিয়ে? আমি ত জানি নে আজকালকার কবিতার কি বই আছে—আনিয়ে দেবেন? আমি দাম দেবো।

দাম দেওয়ার কথা বলাতে আমার মনে ঘা লাগল। মালতী কাছে থেকেও যেন দূরে। বড় অদ্ভুত ধরণের মেয়ে, ও একালেরও নয়, সেকালেরও নয়। এই পাড়াগাঁয়ে মানুষ হয়েছে, যেখানে কোন আধুনিকতার ঢেউ এসে পৌছয় নি, কিন্তু বুদ্ধিমতী এমন, যে, আধুনিকতাকে বুঝতে ওর দেরি হয় না। এমন সুন্দর চা করে, শ্রীরামপুরে শৈলদিরা অমন চা করতে পারত না। নিজে মাছমাংস খায় না, কিন্তু আমার জন্যে এক দিন মাংস রাঁধলে রান্নাঘরের উনুনেই। আমায় প্রায়ই বলে—আপনি যখন যা খেতে ইচ্ছে হবে বলবেন। আপনি ত আর বৈষ্ণব হন নি যে মাছমাংস খাবেন না! আমায় বলবেন, আমি রেঁধে দেবো এখন।

২

মালতী উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী বটে, কিন্তু বেশ সুশ্রী। ওর টান-ক'রে বাঁধা চুল ও ছেলেমানুষের মত মুখশ্রীর একটা নবীন, সতেজ সুকুমার লাবণ্য—বিশেষ ক'রে যখন মুখে ওর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়, কিংবা একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে ও মুখ উঁচু ক'রে হাসে—তখন সে বিজয়িনী, তখন সে পুরুষের সমস্ত দেহ, আত্মাকে সুন্দরী মৎস্যনারীর মত মুগ্ধ ক'রে কূলের কাছের অগভীর জল থেকে টেনে বহুদূরের অথৈ জলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওর সে-রূপ যখন-তখন দেখা যায় না। কালেভদ্রে দৈবাৎ হয়ত একবার চোখে পড়তে পারে। আমি একবার মাত্র দেখেছিলুম।

সেদিন সন্ধ্যার পরে সারাদিন খররৌদ্র ও গুমটের পরে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে মেঘ উঠে সারা আকাশ জুড়ে ফেললে এবং হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠল। আখড়ার বাইরের মাঠে কাঠ, ধান, ছোলা, তুলো সব রোদে দেওয়া ছিল। কেউ তোলে নি, আখড়ায় আবার ঠিক সেই সন্ধ্যার সময়টাতে লোকজন কেউ নাই। আমিও ছিলাম না। মাঠের মধ্যে বেড়াচ্ছিলাম—ঝড় উঠতেই ছুটে আখড়ায় এসে দেখি মালতী একা মহাব্যস্ত অবস্থায় জিনিষপত্র তুলছে। আমায় দেখে বললে—দৌড়ে আলোটা জেলে আনুন, অন্ধকারে কিছু কি ছাই টের পাচ্ছি—সব উড়ে গেল—

সঙ্গে সঙ্গে এল বৃষ্টি···

ওকে দেখলাম নতুন চোখে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে সে একবার এখানে একবার ওখানে বিদ্যুতের বেগে ছুটোছুটি করতে লাগল—অদ্ভুত কাজ করবার শক্তি—দেখতে দেখতে সেই ঘোর অন্ধকার আর ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ক্ষিপ্রনিপুণতার সঙ্গে অর্দ্ধেক জিনিষ তুলে দাওয়ায় নিয়ে এসে ফেললে। এদিকে আমি অন্ধকারে দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি নে দেখে ছুটে এসে বললে—কোথায় দেশলাই রেখেছিলেন মনে আছে? কোথা থেকে হাতড়ে দেশলাই বার করলে—তার পর সেই ঝড়ের ঝাপটার মধ্যে আলো জ্বালা—সে এক কাণ্ড! অন্ধকারে দু-জনে মিলে অনেক চেষ্টার পরে শেষে ওরই ক্ষিপ্রতা ও কৌশলে আলো জ্বলল।

আলো জ্বেলে আমার হাতে দেশলাই দিয়ে আমার মুখের অসহায় ভঙ্গীর দিকে চেয়ে গলা কেমন এক ধরণে উঁচু ক'রে হেসে উঠল—ছুটোছুটির ফলে কানের পাশের চুল আলুথালু হয়ে মুখের দু-পাশে পড়েছে, ফুল্ল শ্রমোজ্জল গণ্ডদেশে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখে উজ্জ্বল কৌতুকের হাসি—দু-জনে মিলে আলো ধরাচ্ছি, ওর মুখ আমার মুখের অত্যন্ত কাছে—সেই মুহূর্তে আমি ওর দিকে চাইলাম—আমার মনে হ'ল মালতীকে এতদিন ঠিক দেখি নি, আমি ওকে নতুন রূপে দেখলাম, ওর বিজয়িনী নারী রূপে। মনে হ'ল মালতী সত্যিই সুন্দরী, অপূর্ব্ব সুন্দরী।—কিন্তু বেশীক্ষণ দেখার অবকাশ পেলাম না ওর সে রূপ, আলো জ্বেলেই ও আবার ছুটল এবং আমার আনাড়ি-সাহায্যের অপেক্ষা না ক'রেই বাকী জিনিষ আধ-ভেজা, আধ-শুকনো অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে দাওয়ায় এনে জড়ো করলে।...

এক দিন পুকুরে সকালের দিকে ঘড়া বুকে দিয়ে সাঁতার দিতে দিতে মালতী গিয়ে পড়েছে গভীর জলে। সেই সময় আমিও জলে নেমেছি। আমি জানতাম না যে ও এ-সময়ে নাইতে এসেছে, কারণ সাধারণতঃ ও স্নান করে অনেক বেলায়, আখড়ার কাজকর্ম্ম মিটিয়ে। নাইতে নাইতে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে চেয়ে দেখি মালতী নেই, তার ঘড়াও নেই। আমি প্রথমে ভাবলাম মালতী মাঝপুকুরে ইচ্ছে ক'রে ডুব দিয়েছে বোধ হয়। বিশেষতঃ সে সাঁতার জানে—কিন্তু খানিক পরে যখন ও উঠল না, তখন আমার ভয় হ'ল, আমি তাড়াতাড়ি সেখানটাতে সাঁতার দিয়ে গেলাম, হাতড়ে দেখি মালতী নেই, ডুব দিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে ওকে পেলাম—চুলে কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে কেমন বেকায়দায়, অতিকষ্টে তাকে ভাসিয়ে নিজে ডুবে জল খেতে খেতে ডাঙার কাছে নিয়ে এলুম। মালতী তখন অর্দ্ধ-অচৈতন্য, আমার ডাক শুনে আখড়া থেকে সবাই ছুটে এল—মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ওর শরীর সুস্থ হ'ল। উদ্ধব বাবাজী বকলে, আমি বকলাম, সবাই বকলে।

এই দিনটা থেকে ওর ওপর আমার একটা কি যে মায়া পড়ে গেল! সেদিন সন্ধ্যাবেলা কেবলই মনে হ'চ্ছে পাগল ও এখানে নিঃসহায়, একেবারে একা। ও সবার জন্যে খেটে মরে। ওর বাপের ধানের জমির উপস্বত্ব আখড়া-সুদ্ধ বৈষ্ণব বাবাজীরা ভোগ করছে, কিন্তু ওর মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই? ও সকলের ময়লা জামা-কাপড় কেচে বেড়াবে, ভাত রেঁধে খাওয়াবে—সর্ব্বরকমে সেবা করবে, ওকে ছেলেমানুষ পেয়ে সবাই ওকে মুখের মিষ্টি তোষামোদে নাচিয়ে নিজেদের স্বার্থ ষোল আনার ওপর সতের আনা বজায় রাখছে, কিন্তু ওর সুখ-দুঃখ কেউ দেখ্ছে? এই যে আজ পুকুরের ঘাটে ডুবে মরে যাচ্ছিল আর একটু হ'লে আমি যদি না থাকৃতাম!

ভগবান আমাকে এ কিসের মধ্যে এনে ফেললেন, এ কি জালে দিন-দিন জড়িয়ে পড়ছি আমি! এদের আখড়াতে যে বিগ্রহ আছেন, তাঁকে এরা মানুষের মত সেবা করে। সকালবেলা তাঁকে বাল্যভোগ দেওয়া হয়, দুপুরের ভোগ ত আছেই। ভোগের পর দুপুরে বিগ্রহকে খাটে শুইয়ে মশারি টাঙিয়ে দেওয়া হয়। বৈকালে বৈকালিক ভোগ দেওয়া হয়—ফল, মিষ্টান্ন। রাত্রে আবার খাটে শুইয়ে মশারি টাঙিয়ে দেয়—শীতের রাত্রে বিগ্রহের গায়ে লেপ, আশপাশে বালিশ। উদ্ধব দাস বাবাজী সেদিন লাল শালু কাপড়ের ভাল লেপ ক'রে এনেচে বিগ্রহের ব্যবহারের জন্যে—আগের লেপটা অব্যবহার্য্য হয়ে গিয়েছিল।

এ-সব পুতুল-খেলা দেখলে আমার হাসি পায়, সেদিন সন্ধ্যার সময় একা পেয়ে মালতীকে বললাম—তোমাদের এতদিন হুঁস্ ছিল না মালতী? ছেঁড়া লেপটা এই শীতে কি ব'লে দিতে ঠাকুরকে? যদি অসুখ-বিসুখ হ'ত, এই তেপান্তরের মাঠে না ডাক্তার, না কবিরাজ, দেখত কে তখন? ছিঃ ছিঃ, কি কাণ্ড তোমাদের?

মালতী রাগে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। ও এ-সব কথা আর কাউকে ব'লে দেয় না ভাগ্যে, নইলে উদ্ধব দাস আখড়া থেকে আমায় বিদেয় ক'রে দিতে এক বেলাও দেরি করত না। অনেক কথা আমি বলি ওদের আখড়া সম্বন্ধে, উদ্ধব দাস সম্বন্ধে—যা অপরের কানে উঠলে আমায় অপমানিত হয়ে বিদেয় হ'তে হ'ত, কিন্তু মালতী কোন কথা প্রকাশ করে নি কোনদিন। আজকাল মালতী আমার দিকে একটু টেনে চলে ব'লে আখড়ার অনেকের কাছে সেটা চক্ষুশূলের ব্যাপার হয়ে উঠেছে—আমি তা বুঝি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

১

শ্রাবণ মাসের প্রথমে আমার পাঠশালা গেল উঠে। আর আমার এখানে শুধুহাতে থাকা অসম্ভব। মালতীকে এক দিন বললাম—শোন, আমি চলে যাচ্ছি মালতী—

সে অবাক হয়ে বললে—কেন চলে যাবেন ?

—কতদিন এসেছি ভাবো ত এখানে ? প্রায় দশ মাস হ'ল—

মালতী চুপ ক'রে থেকে বললে—ঘুরে আবার আসবেন কবে ?

—ভগবান জানেন। নাও আসতে পারি।

মালতীর মুখের স্বাভাবিক হাসি-হাসি ভাবটা যেন হঠাৎ নিবে গেল। বললে—কেন আসবেন না ? আখড়ার কত কাজ বাকী আছে মনে নেই ? ওর মুখ দেখে আমার আবার মনে হ'ল ওর কেউ নেই, এখানে ও একেবারে একা। ওকে বুঝবার মানুষ এই গ্রাম্য অশিক্ষিত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের মধ্যে কে আছে ? আমার কাছেই ওর যা-কিছু অভিমান আবদার খাটে—ওর মধ্যে যে লীলাময়ী কিশোরী আছে, সে তার নারীত্বের দর্প, গর্ব্ব ও অভিমান প্রকাশ ক'রে সুখ পায় একমাত্র আমার কাছে—আমি তা জানি। তা ছাড়া, ও এখনও বালিকা, ওর ওপর আমার মনে কি যে একটা অনুকম্পা জাগে···ওকে সকল দুঃখ, বিপদ থেকে আড়াল ক'রে রাখি ইচ্ছা হয়। শ্রাবণ মাসে নীল মেঘের রাশি দ্বারবাসিনীর চারি ধারের দিগন্তবিস্তৃত তালীবনশোভী মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে যায় রোজ রোজ...আমি দীঘির ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, দেখে দেখে মনে কত কি অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা জাগে—মনে হয় ছোট্ট কোন কলস্বনা গ্রাম্য নদীতীরে খড়ের ঘরে মালতীকে নিয়ে ছোট্ট সংসার পাতবো···আমরা দু-জনে এমনি সব বর্ষা-মেদুর শ্রাবণ-দিনে ব'সে-ব'সে কত কথা বলব, কত আলোচনা করব, ওকে রাঁধতে দেব না, কাজ করতে দেব না, আমার কাছ থেকে উঠতে দেব না—কত বিশ্বাসের কথা, ভক্তির কথা, জ্ঞানের কথা, ভগবানের কথা, সাধু-মোহন্তদের কথা, আকাশের তারাদের কথা—ও আমায় বুঝবে, আমি ওকে বুঝবো। কিন্তু তা হবার না। মালতী ওর বাপের আখড়া ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না—আমি অনেকবার ঘুরিয়ে প্রশ্ন ক'রে ওর মনের ইচ্ছা বুঝেছি। আমি ওকে চাই একান্ত আমার নিজস্ব-ভাবে—এখানে থাকলে ও দিনে রাতে কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে ওকে সে-ভাবে পাওয়া অসম্ভব। এই আখড়াই হয়েছে ওর আর আমার মধ্যে ব্যবধান। আমি এখান থেকে ওকে নিয়ে যেতে চাই। আমিও এখানে থাকতে পারব না চিরকাল। মালতীকে ভালবাসি, কিন্তু ওকে বিবাহ ক'রে এই রাঢ়-অঞ্চলের এক গ্রাম্য আখড়ায় চিরকাল কি ক'রে কাটাবো বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী সেজে ? আমি ওকে নিয়ে যাব এখান থেকে।

এক দিনের একটা ব্যাপারে মালতীকে আরও ভাল ক'রে চিনলুম। দ্বারবাসিনী গ্রামের বৃদ্ধ শম্ভু বাঁড়ুয্যে চার-পাঁচ দিনের জ্বরে মারা গেলেন। তিনি এখানকার সমাজে একঘরে ছিলেন—এটা আমি আগেই জানতাম। তাঁর একমাত্র বিধবা কন্যাকে নিয়ে কি-সব কথা নাকি উঠেছিল—তাই থেকেই গ্রামে শম্ভু বাঁড়ুয্যে একঘরে হন। শম্ভু বাঁড়ুয্যে কোথাও যেতেন না, কারও সঙ্গে মিশতেন না, তাঁর হাতেও দু-পয়সা ছিল—সবাই বলত টাকার গুমর।

বেলা পাঁচটার সময় মালতী এসে বললে—শুনেছেন ব্যাপার ? শম্ভু বাঁড়ুয্যেকে এখনও বের করা হয় নি—আমি এতক্ষণ ছিলাম সেখানে। সেই দুপুর থেকে এক জন লোকও ওদের বাড়ির উঠোন মাড়ায় নি। মড়া-কোলে মেয়েটা দুপুর থেকে ব'সে আছে—ওর মা ত বাতে পঙ্গু, উঠতে পারে না। আপনি আসুন, দু-জনে মড়া ত দোতলা থেকে নামাই—তার পর উদ্ধব-জ্যাঠাকে বলেছি আখড়ার লোকজন নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে—ব্রাহ্মণের মড়া অপর জাতে ছুঁলে ওদের মনে কষ্ট হবে—তাই চলুন আপনি আর আমি আগে নামাই—তার পর আমাদেরই নিয়ে যেতে হবে অজয়ের ধারে—পারবেন ত ? তিন জনে ধরাধরি ক'রে সেই ঘোরানো ও সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে মড়া নামানো—ওঃ সে এক কাণ্ড আর কি! মালতী আর শম্ভু বাঁড়ুয্যের মেয়ে নীরদা এক দিকে—আমি অন্য দিকে। নীরদা দেখলুম খুব শক্ত মেয়ে—বয়সে মালতীর চেয়ে বড়—বছর বাইশ হবে ওর বয়েস, মালতীর মত মেয়েলী-গড়নের মেয়ে নয়, শক্ত, জোরালো হাত-পা, একটু পুরুষ-ধরণের

মালতী খুব ছুটোছুটি করতে পারে বটে, কিন্তু ওর গায়ে তেমন শক্তি নেই। নীরদার সাহায্য না পেলে সেদিন শুধু মালতীকে নিয়ে মড়া নামানো সম্ভব হ'ত ব'লে মনে হয় না। শেষপর্য্যন্ত গাঁয়ের লোক এল এবং তারাই মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। আমিও সঙ্গে গেলুম, মেয়েদের যেতে হ'ল না, মালতী রইল নীরদার কাছে। নীরদা আমায় বললে—দাদা, শ্রাদ্ধের সময় কিন্তু আপনাকে সব ভার নিতে হবে। আর কারও হাতে দিয়ে আমার বিশ্বাস হবে না। রুণি ত আছেই, আপনাকে অন্য কিছু খাটাবো না, ভাঁড়ারের ভার আপনাকে হাতে নিতে হবে, নইলে এ-সব পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার আপনি জানেন না।

বেশ ঘটা ক'রেই শ্রাদ্ধ হ'ল। মালতী বুক দিয়ে পড়ে কি খাটুনিটাই খাটলে! মালতী তুমি আমার চোখ খুলে দিলে। ঘুম নেই, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, বসা নেই—কিসে কাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে, কেউ নিন্দে করবে না ওদের, কোন জিনিষ অপচয় না হয় ওদের, সে-ই একমাত্র লক্ষ্য। পরের কাজে এমনি ক'রে নিজেকে ঢেলে দিতে তুমি পার তোমার বাবার রক্ত তোমার গায়ে বইছে বলে।

নীরদাকেও চিনলুম সেদিন।

রাত দশটা। রান্নাঘরের দরজার কাছে শূন্য ডালের গামলা, লুচির ধামা, ডালনার বালতির মধ্যে নীরদা দাঁড়িয়ে আছে। সারাদিন কি খাটুনি খেটেছে সে! চরকীর পাক ঘুরেছে মালতীর সঙ্গে সমানে সেই সকাল থেকে—এর মধ্যে আবার পীড়িতা মায়ের দেখাশুনা করেছে ওপরে গিয়ে। ঘামে ও শ্রমে মুখ রাঙা, (নীরদার রং বেশ ফর্সা) চুল আলুথালু হয়ে মুখের পাশে কপালে পড়েছে।

আমি বাইরের ক-জন লোককে খাওয়াব ব'লে কি আছে না-আছে দেখতে রান্নাঘরে ঢুকেছি। নীরদা বললে—দাদা, কিছু নেই আর। ক-জন লোক? আচ্ছা দাঁড়ান, ময়দা মাখ্‌ছি, দিচ্ছি ভেজে।

আমি বললুম—আর তুমি আগুনের তাতে যেও না নীরদা। তোমার চেহারা যা হয়েছে! আচ্ছা দাঁড়াও—মালতীকে বলি একটু মিছরির সরবৎ তোমায় বরং দিয়ে—

নীরদা বললে—দাঁড়ান, দাঁড়ান দাদা। রুণি কতবার খাওয়াতে এসেছিল—সে কি চুপ ক'রে থাকবার মেয়ে? তার পর হেসে বললে—আজ যে একাদশী, দাদা।

আমার চোখে জল এল। আর কিছু বললাম না। মেয়েমানুষের মত সহ্য করতে পারে কোন্ জাত? অনেক শিখলাম এদের কাছে এই ক-মাসে।

মাকে দেখেছি, বৌদিদিকে দেখেছি, সীতাকে দেখেছি, শৈলদিকে দেখেছি, এদেরও দেখলাম। অথচ এই নীরদাকে ভেবেছিলুম অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে, ওর কথাবার্ত্তায় রাঢ় দেশের টান বড় বেশী ব'লে।

মালতী আখড়ায় ফিরে এসে আমায় বললে—অনেকগুলো সন্দেশ এনেছি, খান—নীরদা-দিদি জোর ক'রে দিলে। ভাল সন্দেশ, দ্বারবাসিনীতে এ-রকম করতে পারে না, শিউড়ি থেকে আনানো।

তার পর কেমন এক ধরণের ভঙ্গি ক'রে হাসতে হাসতে বললে—বসুন, ঠাঁই ক'রে দিই আপনাকে। ওবেলার লুচি আছে, দই আছে,—নীরদা-দিদি এক রাশ খাবার দিয়েছে বেঁধে—

ওকে এত ছেলেমানুষ মনে হয় এই-সব সময়ে!

ঘরে কেউ নেই, নিঃসঙ্কোচে আমার কাছে ব'সে ও আমায় খাওয়ালে—খেতে খেতে একবার ওর মুখের দিকে চাইলাম। কি অপূর্ব্ব স্নেহ-মমতামাখা দৃষ্টি ওর চোখে! মালতীর কাছে এত ঘনিষ্ঠ যত্ন এই কিন্তু প্রথম। বললে—আমি কি আর দেখি নি যে আজ সারাদিন আপনি শুধু খেটেছেন আর পরিবেশন করেছেন, খাওয়া যা হয়েছিল ওবেলা আপনার, তার আমি সন্ধান রাখি নি ভেবেছেন? খান,—না—ও লুচি ক-খানা খেতেই হবে।

খাবো কি, লুচি গলায় আটকে যেতে লাগল—সে কি অপূর্ব্ব উল্লাস, আমার সারাদেহে কিসের যেন শিহরণ। আজ সারাদিনের ভূতগত খাটুনির মধ্যেও মালতী দৃষ্টি রেখেছিল আমি কি খেয়েছি না-খেয়েছি তার ওপর।

২

ঘন বর্ষা নামল। সারা মাঠ আঁধার ক'রে মেঘ ঝুপসি হয়ে উপুড় হয়ে আছে। এই-সব দিনে মালতীকে সর্ব্বদা পেতে ইচ্ছা করে—ইচ্ছে করে ঘরের কোণে বসে ওর সঙ্গে সারা দিনমান বাজে বকি। কিন্তু ও আসে না, এমনই সব বর্ষার দিনে আখড়ার যত সব খুচ্‌রো কাজে ও ব্যস্ত থাকে।

দু-একবার যখন দেখা হয় তখন বলি—মালতী, এস না কেন ?

মালতী বলে সে আসবে। তার পর এক ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা কেটে যায়, ও আসে না। আমার রাগ হয়, অভিমান হয়। ও যদি আমার জন্যে একটুও ভাবত, তাহ'লে কি আর না-এসে পারত। ওর কাছে কাজই বড়, আমি কেউ নই। কিন্তু হয়ত অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ মালতী এসে পড়ে। প্রায়ই আসে বিকেলের দিকে এমন কি সন্ধ্যার সময়। চুলটি টান-টান ক'রে বেঁধে, পান খেয়ে ফুল্ল ওষ্ঠাধর রাঙা ক'রে হাসিমুখে আমার দাওয়ার সামনে এসে বলে—কি করছেন ?

—এস মালতী, সারাদিন দেখি নি যে ?

—আপনার কেবল—সারাদিন দেখি নি, আর এই তখন ডাকলুম এলে না কেন, আর কেন আস না—এই-সব বাজে কথা। আসি কখন ? দেখ্‌ছেন ত। খেয়ে উঠেছি এই ত ঘণ্টাখানেক আগে। কাজ ছিল।

—কি কাজ ছিল আমি আর জানি নে মালতী ? উদ্ধব-বাবাজীর কোণের ঘরে মেজেতে চেটাই পেতে ব'সে তোমার সেই কবিতার বই লিখছিলে—আমি দেখি নি বুঝি ?

—বেশ দেখেছেন ত দেখেছেন। আসুন বিষ্ণুমন্দিরে সন্ধ্যা দেখিয়ে আসি—একা ভয় করে।

বাস্তবিকই আমি ওকে একমনে বই লিখতে দেখেছিলাম। প্রায়ই দেখি। মালতী ঠিক পাগল, আচ্ছা, পাষণ্ডদলনের অনুকরণে লেখা ওর বই কে পড়বে যে রাত নেই দিন নেই বই লিখ্‌ছে! ওর মুখ দেখলে আমার কষ্ট হয়। ওই এক খেয়াল ওর। মালতীর সঙ্গে বিষ্ণুমন্দিরে গেলাম। মালতীর এই এক গুণ, ও যখন মেশে, তখন মেশে নিঃসংকোচে, উদার ভাবে। সে-সম্বন্ধে কোনো বাধা বা সংস্কার ও মানে না। কেন এই সন্ধ্যাতে আমার সঙ্গে একা যাবে পুকুরপাড়ের বিষ্ণুমন্দিরে—এ-সব সঙ্কোচ নেই ওর। মন্দিরের পথে যেতে যেতে মনে হ'ল মালতীকে পেয়ে আমার এই বর্ষাসন্ধ্যাটি সার্থক হ'ল। ওকে ছেড়ে আর কিছু চাই নে। কাঞ্চনফুলতলায় গিয়ে বললাম—সে গানটা গাও না, সেদিন গাইছিলে গুণগুণ করে!

মালতী ছেলেমানুষের মত ভঙ্গিতে বললে—উদ্ধব-জ্যাঠা যে শুনতে পাবেন ?

—তা পাবেন, পাবেন।

—তবে আসুন পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসি।

মালতীর মুখে গানটা বেশ লাগে—দু-তিন বার শুনলাম।

আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়নতারা হৃদয়ে মোর রাধা-প্যারী
আমার বুকের কোমল ছায়ায় লুকিয়ে খেলে বনবিহারী

গান শেষ হ'লে বললাম—শোন একটা কথা বলি মালতী, তুমি এস না কেন ? তোমাকে না-দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। আজ সারাদিন বসেছিলুম ঘরের দাওয়ায়, এমন বর্ষা গেল—তুমি চৌষট্টিবার আমার ঘরের সামনে দিয়ে যাও, একবার ত এলে পারতে ? তোমার সে-সব নেই। শুধু কাজ আর কাজ। এই যে তোমাকে পেয়েছি, আর আমার যেন সব ভুল হয়ে গিয়েছে—সত্যি বলছি মালতী।

মালতী মুখ নীচু ক'রে হাসি-হাসি মুখে চুপ ক'রে রইল।

আমি বললাম—হাসলে চলবে না মালতী। কথার আমার উত্তর দাও। তুমি কি ভাবো আমি তোমার এখানে পড়ে আছি খেতে পাই নে ব'লে তাই ? তা নয়।

—কে বলেছে আপনাকে যে না-খেতে পেয়ে এখানে আছেন ? বলেছি আমি আপনাকে নাকি ?

—যাক ওসব বাজে কথা। আমার কথার উত্তর দাও।

মালতী আবার ছেলেমানুষী আরম্ভ করলে। মুখ নীচু ক'রে হাঁটুর কাছে ঠেকিয়ে মৃদু মৃদু হাসিমুখে হাত দিয়ে সানের ওপর কি আঁকজোক কাটতে লাগল, কখনই ওর কাছে আমার কথার সোজা জবাব পেলাম না।

এক দিন বেড়াতে গিয়ে বাঁধের ওপর ব'সে আমার অবস্থাটা ভেবে দেখলুম। আমি এমন জড়িয়ে পড়েছি যে নড়বার সাধ্য নেই এতটুকু। ও আমার জীবনের সব-কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে—কি উদ্দেশ্যে এই দু-বছর পথে পথে ঘুরেছি সে উদ্দেশ্য এখন হয়ে পড়েছে গৌণ। এখন মালতীই সব, মালতীই আমার বিশ্বের কেন্দ্র, ও যখন আসে তখন জীবনে আর কিছু চাইবার থাকে না, ও যেদিন আসে, যেদিন হেসে কথা বলে—আমার মত সুখী লোক সেদিন জগতে আর কেউ থাকে না, মাঠের ওপর সূর্য্যাস্ত সেদিন নতুন রঙে রঙীন হয়, বিচালি-বোঝাই গাড়ীগুলো আর-

সিনীর হাটের দিকে যায়, তাদের চাকার শব্দও ভাল লাগে, াখড়ার বাবাজীরা নিমগাছে উঠে নিমপাতা পাড়ে—সই যেন এক নতুন দৃশ্য। মালতী যেদিন আসে না, ক ভাল ক'রে কথা বলে না, সারাদিন আমার মনে শান্তি াকে না, ওরই কথা ভাবি সারাক্ষণ—কতক্ষণে দেখা হবে, তক্ষণে কথা বলবো। মালতী আমায় এমন জালেও ড়িয়ে ফেলেছে।

হয়ত আমি এখান থেকে যেতাম না—হয়ত শেষ-র্যান্ত থেকেই যেতে হ'ত—কিন্তু যেদিন মালতী আমার ছে ব'সে পুকুরঘাটে গান গাইলে পরদিনই দুপুরের রে উদ্ধব-বাবাজী আমায় ডেকে বললে—একটা কথা লি আপনাকে—কিছু মনে করবেন না। আপনার খানে অনেক দিন হয়ে গেল, আমাদের আখড়ার নিয়ম নুসারে তিন দিন মাত্র এখানে অতিথ্-বোষ্টমের াথবার কথা। আপনার প্রায় এগারো মাস হ'ল—ামি চুপ ক'রে রইলাম, কারণ ওর মুখ দেখেই আমার নে হ'ল এটা কথার ভূমিকা—আসল কথাটা এখনও লে নি। ঘটলও তাই। একটু ইতস্ততঃ ক'রে উদ্ধব লেল—তাতেও কিছু না—কি জানেন, আপনার রুণির ঙ্গে এই মেলামশাটা ভাল দেখাচ্ছে না। আপনার াছে ব'সে পুকুরঘাটে বিকেলে গান গেয়েছিল—একথা নিয়ে সবাই—বুঝলেন না, মেয়েমানুষের নামে দুর্নাম টতে দেরি লাগে না। আমি ওর অভিভাবক—এসব াতে না হয় আমার দেখা উচিত ব'লেই আপনাকে জানাচ্ছি এ-কথা। রুণি-মা সেরকম মেয়ে নয়। আমি সেটা খুবই জানি, কিন্তু লোকে ত— রাগ করবেন না, ভেবে দেখুন। লোকে যদি ওর নামে পাঁচটা কথা ওঠায় বা বলে সেটা আমার উচিত, হতে না-দেওয়া—নয় কি?

আমি বললাম—সেটা আমার অন্যায় হয়েছে স্বীকার করি। কিন্তু আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। আপনি ত বলেছিলেন, মালতীর যদি ইচ্ছে হয়—ওর বাবার ওর ওপর আদেশ আছে—

—কিন্তু ওর বাবা কণ্ঠিধারী বৈষ্ণব ছিলেন—আপনি ব্রাহ্মণ বটে, বৈষ্ণব নন, তার ওপর আপনি খৃষ্টানী মতের লোক, আপনার সঙ্গে কি ক'রে ওর বিয়ে হ'তে পারে?... ও বৈষ্ণবের মেয়ে, বৈষ্ণবের সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে। তবে মালতীর এতে কি ইচ্ছে জানুন, সে যদি বলে আমার আপত্তি নেই। ওর বাবা ওরই ওপর সে ভার দিয়েছিলেন।

সেদিনই সন্ধ্যার সময় ওকে নির্জ্জনে পেলাম। ওকে বললাম—একটা কথা বলব মালতী? তুমি অভয় দেবে?

মালতী কৌতুকের সুরে বললে—উঃ মাগো—যাত্রার দলের মত কথা শুনে আর বাঁচি নে। কি বলবেন বলুন না?

—তুমি কি চিরকাল এই ভাবে জীবন কাটাবে? না হাসিখুশী না, দরকারী কথা। সব তাতেই হাস কেন—ভেবে দেখ আমি কি বলছি—

—কেন এ জায়গা কি খারাপ? এমন চমৎকার মাঠ, দীঘি—আপনি সেদিন কি কবিতাটা বলছিলেন সেই—

মালতী কথা শেষ না-ক'রেই ছেলেমানুষী হাসি সুরু করলে। আমি বললাম—না, মালতী লক্ষ্মীটি, ওভাবে কথা উড়িয়ে দিও না। আমি তোমায় চাই। তোমায় বিয়ে ক'রে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই। কি বল তুমি?

মালতীর মুখের হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল—সে কেমন বিস্ময়-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে—তার পরেই তার মুখে-চোখে ঘনিয়ে এল লজ্জা। ওর এ-ধরণের লজ্জা আমি কখনও দেখি নি। বেশ খানিক ক্ষণ কেটে গেল। মালতীর মুখে উত্তর নেই। বললাম—ভেবে উত্তর দিও। এখুনি চাই নে তোমার উত্তর। তাড়াতাড়ি কিছু না-বলাই ভাল।

মালতী এতক্ষণ মুখ নীচু ক'রে ছিল—এইবার মুখ তুলে কিন্তু অন্য দিকে চেয়ে বললে—কিন্তু এ-জায়গা ছেড়ে যেতে হবে কেন?

ছেড়ে যেতে হবে এই জন্যে মালতী যে, আমি ত তোমাকে এখানে আখড়ায় থাকতে দিতে পারব না। আমিও এখানে চিরদিন কাটাতে পারি নে। মালতীর মুখের ভাবে আমার মনে হ'ল আমার মুখে এ-কথা যেন ওর পক্ষে অপ্রত্যাশিত। ও কি ভেবেছে আমিও চিরকাল এই আখড়াতেই থেকে যাব? ওর মুখ দেখে মনে হ'ল আমার এ-কথায় ও মনে বেদনা পেয়েছে। আমার মন মমতায় ভরে উঠল। আমি কথাটা যতদূর সম্ভব নরম করতে পারা যায় ক'রে বললাম—তুমি এখনও ছেলেমানুষ। নিজের সম্বন্ধে বিচার ক'রে দেখতে পারার ক্ষমতা এখনও

হয় নি। তুমি একা এখানে কি করবে বল? উদ্ধব-বাবাজীও চিরকাল থাকবেন না। এই মাঠের মধ্যে আখড়ায় চিরজীবন কাটাবে একা একা?

মালতী মুখ নীচু ক'রেই আস্তে আস্তে নরম সুরে বললে—বাবা মরণকালে এর ভার সঁপে দিয়েছিলেন উদ্ধব-জ্যাঠার ওপর নয়, আমারই ওপর। বাবার বিষ্ণুমন্দির আমায় শেষ ক'রে তুলতে হবে। উদ্ধব-বাবাজী চিরদিন থাকবেন না বলেই ত আমার এখানে আরও থাকা দরকার। বাবার ধানের জমি পাঁচ জনে লুটেপুটে খাবে অথচ আখড়ার দোর থেকে অতিথ্-বোষ্টম গরিব লোকে ফিরে যাবে খেতে না পেয়ে, এ আমি বেঁচে থেকে দেখতে পারব না। তাতে কোথাও গিয়ে আমার শান্তি হবে?

মালতীর মুখে এ-ধরণের গম্ভীর কথা—বিশেষ ক'রে ওর নিজের জীবন নিয়ে—এই প্রথম শুনলাম। সব জিনিষ নিয়ে ও হালকা হাসি-ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেয়, এই ওর স্বভাব। ও এ-ধরণের কথা বলতে পারে তা আমি ভাবি নি। বললাম—মালতী, এটা কি তোমার মনের কথা? জীবনটা এই ক'রে কাটাবে? এতেই শান্তি পাবে? আমি যে প্রস্তাব করেছি, তাতে তুমি তাহ'লে রাজি নও? কারণ আমি এখানে থাকতে পারব না চিরকাল এটা নিশ্চয়।

শেষ কথাটা বলতে আমার বুক বেদনায় টনটন ক'রে উঠল, তবুও বলতে হ'ল।

মালতী অনেক ক্ষণ বিমুখী হয়ে ব'সে রইল। কাপড়ের একটা আঁচল পাকিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে ছেলেমানুষের মত সেটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করলে অনেক ক্ষণ। আমার মনে হ'ল ও হয়ত কাঁদছে, নয়ত কান্না চেপে রাখবার চেষ্টা করছে

তার পরে আমার দিকে একবার চেয়েই আবার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—কি করব বলুন, আমার অদৃষ্টে ভগবান এই লিখেছেন, এই আমায় করতে হবে।

আমার কেমন একটা অভিমান হ'ল, বললাম—এই তাহ'লে তোমার শেষ কথা? বেশ মালতী। মালতী কথার উত্তর না-দিয়ে চুপ ক'রে রইল মুখ নীচু ক'রে। আবার আমার মনে হ'ল ও কাঁদছে, কিংবা কান্না চেপে রাখবার চেষ্টা করছে—একবার মনে হ'ল ওর ডাগর চোখ দুটি জলে ভ'রে এসেছে—কিন্তু অভিমানের আবেগে আমি সেদিকে ফিরেও চাইলাম না।

রাত্রে বাইরে ব'সে ভাবলুম। সারারাত্রিই ভাবলুম মালতীকে ছেড়েই যেতে হ'ল শেষ-পর্য্যন্ত?

ও না এক দিন আমায় বলেছিল···আখড়ার কত কাজ বাকী আছে মনে নেই?

আমার ওপর কিসের দাবিতে একথা বলেছিল ও?

সে-দাবি অগ্রাহ্য ক'রে নিষ্ঠুর ভাবে যাব চলে?

যদি না যাই—তবে এখানে আখড়ার মোহান্ত সেজে চিরকাল থাকতে হবে। এই গ্রাম্য বৈষ্ণবদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ও আচার-সংস্কারের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হবে।

নিস্তব্ধ তারাভরা রাত্রি। দীঘির পার থেকে হু-হু হাওয়া বইছে।

নীল আকাশের দেবতা, যাঁর ছবি এই বিশাল মাঠের মধ্যে সন্ধ্যার মেঘে, কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়ায়, এই রকম তারাভরা অন্ধকার আকাশের তলে কতবার আমার মনে এসেছে তাঁকে পাওয়া আমার হঠাৎ ফুরিয়ে না যায়···যে-দেবতা সকল ধর্ম্মের অতীত, দেশ কালের অতীত···যাঁর বেদী যেমন এই পৃথিবীতে মানুষের বুকে, তেমনি ওই শাশ্বত নীলাকাশে, অনন্ত নক্ষত্রদলের মধ্যে···মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য তাঁর সৃষ্টি-বীণার দুই তার···আমার মনে হোমের আগুন তিনি প্রজ্বলিত রাখুন সুদীর্ঘ যুগসমূহের মধ্যে···শাশ্বত সময় ব্যেপে। আমার যা-কিছু মনের শক্তি, যা-কিছু বড়, তাই দিয়ে তাঁকে বুঝতে চাই। গণ্ডীর মধ্যে তিনি থাকেন না।

পরদিন খুব ভোরে—আখড়ার কেউ তখনও বিছানা থেকে উঠে নি—কাউকে কিছু না-জানিয়ে আমি দ্বারবাসিনীর আখড়া থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কিসের সন্ধানে বেরিয়েছি তা আমি জানি নে—আমার সে সন্ধানের আশা আলেয়ার মত হয়ত আমাকে পথভ্রান্ত ক'রে পথ থেকে বিপথে নিয়ে গিয়ে ফেলবে—শুধু আমি এইটুকু বুঝি যে, যে-কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকলে আমার চোখের অস্বচ্ছ দৃষ্টির সামনে তার প্রবৃদ্ধমান রূপ ক্ষীণ হয়ে আসবে—আমার কাছে সেই সন্ধানই সত্য—আর সব মিথ্যে, সব ছায়া।

(ক্রমশঃ)

নৃত্যধর্ম্ম

শ্রীরাজেন্দ্র শঙ্কর

হৃদয়ে আবেগের যে উত্তাল তরঙ্গ উঠে, ঘটনা-পরম্পরায় যে অভিজ্ঞতা জন্মে, প্রকৃতি যে সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রত করে, অভিনয়ে, পদ-সঞ্চালনে, অঙ্গ-ভঙ্গীতে ও প্রচলিত মুদ্রান্যাসে তাহার অভিব্যক্তিই নৃত্য।

ভারতবর্ষে দেবগণ হইতে এই নৃত্যের প্রথম প্রচলন। ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও শুভ পর্ব্ব পুণ্যাহে যে তাণ্ডব নৃত্য প্রচলিত, তাহা আজও 'তণ্ডু'র নামই বহন করিতেছে। মহাদেবের অনুচর নন্দীই তণ্ডু নামে পরিচিত।

কলানুভূতি সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। হয়ত সে উপভোগ হয় সৌন্দর্য্যের অন্তর্নিহিত ভাবের উপলব্ধিতে, হয়ত বা বাহিরে মূর্ত্ত বিকাশে, হয়ত বা উভয়ের একত্র-সমাবেশে। যুগে-যুগে এই সৌন্দর্য্যানুভূতি সম্পর্কে মানুষের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জগতের চিন্তানায়কগণের মতবাদ আলোচনা করিলে ইহার রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে।

ফরাসী লেখক ভেরোঁ বলেন যে, প্লেটোর যুগ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত রসকলা প্রকৃষ্ট কল্পনা ও মানবজ্ঞানাতীত রহস্যের অপূর্ব্ব মৃত্যুমিশ্রণ! এই খেয়াল ও রহস্যেই সৌন্দর্য্যের কল্পনা; এই সৌন্দর্য্য স্বর্গীয়, বাস্তব পদার্থের আদর্শ!

রোজার ফ্রাই বলেন, রসকলা ইন্দ্রিয়ভোগ-সুখ-পরায়ণতা হইতেই অঙ্কুরিত। কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি, দর্শন ও ধর্ম্ম দ্বারা ইহার উৎকর্ষসাধন বা বিশুদ্ধিতেই ইহার মূল্য। প্রতীচ্য দেশের ন্যায় ভারতীয় ইন্দ্রিয়সুখভোগ-পরায়ণতা অনুধ্যান দ্বারা রূপান্তরিত হয় না, ইহা একাধারে ধর্ম্মভাবপ্রবণ এবং প্রধানতঃ প্রেমমূলক।

বমগারটেন বলেন যে, কামনা উদ্দীপ্ত ও তৃপ্ত করাই সৌন্দর্য্যের লক্ষ্য, প্রকৃতিতেই সৌন্দর্য্য পরিদৃশ্যমান, প্রকৃতি অনুকরণ করাই রসকলার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। পক্ষান্তরে বিন্ কেলম্যানের মত এই যে, সকল কলারই লক্ষ্য ও নীতি একমাত্র সৌন্দর্য্য—মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্য, ভাবে সৌন্দর্য্য, বিকাশে সৌন্দর্য্য। তিনি ইহাও বলেন যে, বিকাশে সৌন্দর্য্যই রসকলার শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং প্রাচীন কালেই ইহা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, আধুনিক শিল্পিগণ প্রাচীন কলার অনুসরণ করিলেই ভাল হয়। কুমারস্বামী বলেন যে, জীবনযাপনে যেমন বিবেকবুদ্ধি প্রকাশ পায়, বিতর্কে যেমন চিন্তার গভীরতা প্রকাশ পায়, ঠিক তেমনি প্রমাণও বিধি বা নিয়মে ও লক্ষণে প্রকাশ পায়। যে-কলা এইরূপ শাস্ত্রমান অনুসারে পরিকল্পিত তাহাই প্রকৃতপক্ষে মনোহর, কমনীয়—অপরগুলি কিছুই নহে।

সেফ্‌টেস্‌বারী বলেন যে, যাহা সুন্দর তাহা সৌষ্ঠবসম্পন্ন, সামঞ্জস্যবিশিষ্ট, সুতরাং সত্য। যাহা সুন্দর ও সত্য তাহাই প্রীতিপ্রদ, উত্তম ও সুমঙ্গলজনক।

লর্ড কামেস্ বলেন, যে, সংকীর্ণতম আয়তনে ভাবের ঐশ্বর্য্য, পূর্ণতা, বলিষ্ঠতা ও বৈচিত্র্যের চরম সমাবেশই রসকলা।

শিবনৃত্য অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, আদি ছন্দোবদ্ধ ওজোভাব প্রকাশ করাই ইহার উদ্দেশ্য। হিন্দু-প্রতিমা-বিজ্ঞানে শিব লুসিয়ানের এরস্ প্রটোগোনাসের সহিত তুলনীয়। তিনি বলেন যে, সর্ব্ব পদার্থের আদিতে নৃত্যের সৃষ্টি। এরসের সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রকাশ, কারণ নক্ষত্রপুঞ্জের ঐকানৃত্যে, গ্রহতারার নিয়মাবদ্ধ স্থান-বিনিময়ে আমরা এই আদি নৃত্যের বিকাশ দেখিতে পাই।

গোপীনাথ বলেন যে, যাঁহারা প্রথম প্রাক্-আর্য্য পর্ব্বত-দেবতার পূজার জন্য প্রচণ্ড হয়ত বা প্রমত্ত ওজোবশতঃ নৃত্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা শিবনৃত্যের এই অতিগভীর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এই পর্ব্বত-দেবতাই পরবর্ত্তী যুগে শিবে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মে বা রসকলায় 'মোটিফ্' ও সঙ্কেত-কালে সার্ব্বজনীন হইয়া পড়ে, লোকে হৃদয়ে যে ভাবৈশ্বর্য্য

পোষণ করে, ইহাতেও তাহার বিকাশ দেখিতে পায়। শিবনৃত্য-সম্পর্কে এরূপ কথিত হইয়াছে যে, আমাদের পাপ দূরীকরণার্থ আত্মায় পূর্ণজ্ঞান নৃত্য করে। ইহাতেই মায়ার অন্ধকার কাটিয়া যায়, কর্ম্মমালার সূত্র ভস্ম হয়, ভগবৎকৃপা বর্ষিত হয়, এবং আত্মা আনন্দসাগরে অবগাহন করে। এই নিগূঢ় রহস্যাবৃত নৃত্য দর্শনের সামর্থলাভে আত্মার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

ফিক্‌টের মতে প্রকৃতি দ্বৈতভাবের বিকাশ—এক দিকে ইহা আমাদের অক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে, অপর দিকে চিন্তাধারা ও কর্ম্মক্ষমতার অসীমতা ও স্বাধীনতা প্রদান করে। সুতরাং সুন্দরের অনুভূতি আমাদের মনোবৃত্তির উপরেই নির্ভর করে। এই সুন্দরের প্রদর্শনই রসকলার উদ্দেশ্য; সমগ্র মানবকে জ্ঞানদানই ইহার অভিপ্রায়। শিল্পীতে সুন্দর আত্মার অবস্থিতিতেই—বাহিরের কিছুতেই নহে—সৌন্দর্য্য-ধর্ম্ম নিহিত।

হাচিনসন মনে করেন যে সৌন্দর্য্যপ্রকাশই রসকলার উদ্দেশ্য; সাম্য ও বৈষম্যের অনুভূতি জাগ্রত করাই ইহার মূলমন্ত্র। বার্ক বলেন যে, আত্মরক্ষা ও সমাজের নির্দ্দেশেই মহান্ ও সুন্দরের কল্পনা জাগে এবং ইহার প্রদর্শনই রসকলার লক্ষ্য।

ইংরেজদের মত ফরাসীগণও মনে করেন যে, সৌন্দর্য্য-জ্ঞান রুচির উপরই নির্ভর করে—এই রুচি স্বেচ্ছাচারী, কোন বিধিনিষেধ মানিয়া চলে না। পেরী আঁদ্রে সৌন্দর্য্যের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন—স্বর্গীয়, প্রাকৃতিক, কৃত্রিম। বেত্তু বলেন যে, উপভোগই রসকলার উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতি-অনুকরণই উপভোগ।

ইটালীর মনোবৃত্তি অনুরূপ। স্পালেটি বলেন যে, আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে যে আত্মানুরাগপ্রদর্শী অনুভূতি জন্মে তাহাই রসকলা। বার্কও প্রায় অনুরূপ মত পোষণ করেন।

ওলন্দাজ-লেখক হেম্‌স্‌টার লুইস্ বলেন যে, যাহা সুখদান করে তাহাই রসকলা, সংকীর্ণতম কালে বহুলপরিমাণে যাহা অনুভূতি জাগ্রত করিতে পারে তাহাই সুখদানে সমর্থ।

কাণ্টের মতে মানুষ নিজের বাহিরে প্রকৃতির জ্ঞান ও প্রকৃতিতে আত্মজ্ঞান লাভ করে। বহিঃপ্রকৃতিতে সে খোঁজে সত্য, আপনাতে সে চায় মঙ্গল। এই বাস্তব যুক্তি ব্যতীতও একটা বিচার-ক্ষমতা আছে, ইহা যুক্তির অপেক্ষা রাখে না, ইহা প্রবৃত্তি ব্যতীতও সুখদান করে। কাণ্ট ইহাকেই সৌন্দর্য্যানুভূতি বলিতে চাহেন। বাস্তব সুবিধা বা যুক্তিতর্ক ব্যতীত সুখদান আত্মোপলব্ধিলব্ধ বা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য। কিন্তু কোন বস্তুর ব্যবহারিকতা অথবা হিতকারিতার ধারণা ব্যতীত তাহার যোগ্যতার রূপদানই বাস্তব সৌন্দর্য্য। বোধ হয় কাণ্টের অনুসরণ করিয়াই শিলার বলেন যে, বাস্তব সুবিধা ব্যতীত সুখের স্রষ্টা সৌন্দর্য্যই রসকলার লক্ষ্য। শিলারের মতে নৃত্য ক্রীড়ামাত্র, অবশ্য এই ক্রীড়া লঘু কার্য্য নহে, শুধু রূপ-বিকাশের জন্যই অপর উদ্দেশ্য ব্যতীত জীবনের সৌন্দর্য্য-প্রদর্শন। হেগেল বলেন যে, ভগবান আপনাকে সুন্দরের রূপে প্রকৃতিতে ও শিল্পে বিকাশ করিয়াছেন। ভারতবাসীর মনের কথাই যেন এই বৈদেশিক পণ্ডিতের রসনায় ভাষা পাইয়াছে।

টলষ্টয়ের মতে আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে সৌন্দর্য্য এক বিশেষ শ্রেণীর সুখ দান করে, কিন্তু বাস্তব অনুভূতিতে পদার্থের পূর্ণাঙ্গতার ধারণা জন্মে। এই ধারণাতেও একটা সুখের উপলব্ধি হয়। এক কথায় উভয় অনুভূতিতেই একই প্রকার সৌন্দর্য্যের ধারণা জাগে—কিন্তু কামনা জাগে না। অনেকের নিকট ইহা ভাববিহ্বলতা এবং ফলে তাঁহারা রসকলার একমাত্র ও চরম আদর্শরূপে সৌন্দর্য্যকে গ্রহণ করিতে পারেন না।

বর্ত্তমান যুগের শিল্পীর—তিনি যতই ধর্ম্মভীরু হউন না কেন—সম্মুখে অনতিক্রম্য বাধাবিপত্তি। যে-শিল্পী প্রাচীন হিন্দু-নৃত্যের পুনরুজ্জীবন-প্রয়াসী তাঁহার পক্ষে প্রাচীন পুস্তকে নির্দ্দিষ্ট সুগঠিত সমাজের ও দর্শকমণ্ডলীর অভাবে এবং অজ্ঞতা ও মতবাদের অনৈক্য ইত্যাদির প্রাচুর্য্যে—এই উভয়-সঙ্কটে বিধিনিষেধ ভঙ্গ করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। প্রাচীন পুস্তকাদিতে যে বিধান আছে, সে মতে বর্ত্তমান যুগে কোন নৃত্য প্রচলিত নাই। সুতরাং প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। পুস্তকাদিদ্বারা কি জ্ঞান লাভ সম্ভব? ভরতের নাট্যশাস্ত্র এ-সম্পর্কে আদর্শ পুস্তক; নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয় সম্পর্কে অতি বিশদ বিবরণ ইহাতে

আছে, কিন্তু পূর্ণভাবে ইহার অনুবাদ করিতে কেহই সমর্থ হন নাই। ইহার যে-সকল অনুবাদ প্রচলিত আছে, তর্কের খাতিরে তাহা নির্ভুল ধরিয়া লইলেও, প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, ইহার সাহায্যে কেহ উচ্চ শ্রেণীর নর্ত্তক, গায়ক বা অভিনেতা হইতে পারে কি? প্রথমে নৃত্যে অঙ্গ-ভঙ্গীর কথাই ধরা যাক। পুস্তকে বহু প্রকরণের উল্লেখ আছে—কিন্তু বিশদ বিবরণের একান্ত অভাব। ইহা যেন দুরূহ শব্দাদির অর্থসংগ্রহ। মুদ্রাপ্রকরণে আদর্শের নাম এবং হস্ত-বিন্যাসের প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে, কিন্তু শিল্পীকে অনেক জিনিষই কল্পনা করিয়া লইতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অঙ্গুলিবিন্যাসের নির্দ্দেশ থাকিলেও অপরাপর অঙ্গুলি-সম্পর্কে কোনই উল্লেখ নাই। একই মুদ্রা বহু ভাবের দ্যোতক। তখন অঙ্গুলি-বিন্যাসের নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ। অঙ্গুলিসমূহ পরস্পর সংলগ্ন করিয়া প্রসারিত করতল পতাক-হস্ত। এই পতাক-হস্ত নিম্নলিখিত ভাব প্রকাশ করে বলিয়া উল্লেখ আছে—ক্রোধ, প্ররোচনা, উল্লাস, গর্ব্ব, আত্মম্ভরিতা, অগ্নি, পুষ্পবৃষ্টি, অভিশাপ, অনুমতি, উপঢৌকন, ঘাস, ভূমিতে ছড়ানো জিনিষপত্র, লুক্কায়িত বস্তু, গুচ্ছ, আত্মগোপন, ঝড়, ঢেউ, উৎসাহ, মহৎ ব্যক্তি, তরবারির আঘাত, পক্ষসঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস, ধৌত করা, পরিষ্কৃত করা, নমনীয় করা, চূর্ণ করা, পর্ব্বত উত্তোলন, উন্মোচন। কখন কিরূপ ভঙ্গীতে এই পতাক-হস্ত রক্ষা করিতে হইবে, তাহার কোনই উল্লেখ নাই। অপর দিকে একই ভাব প্রকাশার্থ বহু প্রকার মুদ্রার বিধান আছে। সঙ্গীতরত্নাকর, নাট্যশাস্ত্র, চিলাপ্পতিকরম, হস্তলক্ষণপ্রদীপিকা, অভিনয়দর্পণ প্রভৃতি পাঠ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সর্ব্ববাদিসম্মত কোন সঙ্কেত নাই। মালাবারে কটু্, কথাকলি, উত্তম তুল্লাল প্রভৃতি নৃত্য প্রাচীন পদ্ধতির অনেকটা অনুরূপ, কিন্তু ইহাদের মধ্যেও বৈষম্য অনেক। ত্রিবন্দ্রামে কথাকলিতে এক ভঙ্গী যে ভাব প্রকাশ করে হয়ত ইহা কোচিনরাজ্যে কেরল কলমণ্ডলমে ভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। নীরব অভিনয়ে আখ্যানবস্তু হয়ত এক, অন্তর্নিহিত গূঢ় ভাব কিংবা অভিপ্রায় একই, কিন্তু প্রদর্শনে অনৈক্য জাজ্বল্যমান। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে কোন এক বিষয়ে দুই জনে একমত না হইতেও পারে; সামাজিক রীতিনীতি, যুগ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, একই ভাবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দান করে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, একই ভিত্তি হইতে গতি আরম্ভ হইলেও এবং একই ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও কাল, রাষ্ট্রশাসন এবং ধর্ম্মোৎসাহে ইহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ঘটিয়াছে। সুতরাং প্রাচীন নৃত্যের নিষ্কলঙ্ক স্বরূপ সম্ভবপর হইলেও পুনঃপ্রবর্ত্তন সমীচীন নহে। কারণ কালধর্ম্মে আমাদের রুচির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস আমরা আর অবনতশিরে স্বীকার করি না। স্মরণাতীত যুগের প্রভাবান্বিত পদ্ধতি এখন আর আমাদিগের সন্তোষবিধান করিতে পারে না। প্রাচীন যুগে যেমন, বর্ত্তমানে আর তেমন ভাবে নৃত্যের সম্ভ্রম নাই। এখন নৃত্যে চিত্তরঞ্জনেরই প্রয়াস, রসকলার বাণী দ্বারা লোকের মনোবৃত্তির উন্মেষসাধন নহে।

রসকলা প্রগতিশীল, ইহা সৃজনক্ষম। প্রকৃতির সীমাহীন আয়তন ইহার সাম্রাজ্য, কল্পনার গতিতে ইহার অনুভূতি, অনুধাবন-ক্ষমতায় ইহার সাধনা, মানবদেহ ইহার কর্ম্মক্ষেত্র, অঙ্গসঞ্চালনে ইহার বিকাশ। প্রাচীন কাহিনী ও উপকথা এবং ভাবপ্রকাশের বিধিবদ্ধ প্রণালী আমাদের যাত্রাস্থান, প্রগতির বিস্তৃত বীথিকা আমাদের সীমাবদ্ধ পথ, আদর্শের পরিপূর্ণতা আমাদের লক্ষ্য।

বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ইহাকে পুনরায় গঠন করিতে এবং বর্ত্তমান যুগের সৌন্দর্য্যজ্ঞান দ্বারাই ইহার বিচার করিতে হইবে। এই জন্য চাই আমাদের যাবতীয় নৈপুণ্য ও সৌকর্য্যের প্রয়োগ। আমরা চাই মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চার; যুগধর্ম্মানুযায়ী প্রেম ও শক্তি বলেই তাহা সম্ভবপর

মহিলা-সংবাদ

কর্নাটকের শ্রীমতী কমলা জামখণ্ডী শিক্ষা-বিভাগে কার্য্য করিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও ডব্‌লিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা-বিষয়ে গবেষণা করিয়া তিনি উচ্চতম উপাধি লাভ করেন।



শ্রীমতী কমলা জামখণ্ডী

তিনি বিজাপুরের মহিলা-স্বাস্থ্যবিধায়িনী সমিতির অবৈতনিক সম্পাদিকা এবং কর্নাটক শিক্ষক-সঙ্ঘের ও নিখিল ভারতীয় শিক্ষক সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য।

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ শহরে অযোধ্যা নারী-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। শেরকোটের রাণী ফুলকুমারী সভানেত্রীর কার্য্য করেন।



রাণী ফুলকুমারী



শ্রীমতী এ. লতিফি

শ্রীমতী এ. লতিফি পঞ্জাব স্ত্রী-শিক্ষাবিধায়ক সম্মেলনের সভানেত্রী হইয়াছিলেন।



বিদেশ

ভিয়েনা শহরে দীপালী উৎসব—

ভিয়েনা-প্রবাসী ভারতীয়েরা গত ৬ই নবেম্বর দীপালী উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর অধিনায়কত্বে একটি ভোজ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সুভাষবাবু এই ভোজসভায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ভিয়েনায় ভারতীয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। এই জন্য এই সামাজিক উৎসবের অনুষ্ঠান প্রতি বৎসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাহাতে ভারতীয়গণ পরস্পর মেলা-মেশা করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান একাডেমিক্যাল য়্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। বসু মহাশয় সমবেত সকলকে সময় ও অর্থ দিয়া এই সমিতিকে সাহায্য করিতে অনুরোধ জানান। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সুভাষবাবু ছাড়া শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ খৈতান, মেজর মিশ্র, ডক্টর শর্ম্মা, ডক্টর পাল, ডক্টর দেশাই, ডক্টর চোকসি, শ্রীযুত হীরালাল ও ডক্টর শ্রীমতী মহান্তের নাম উল্লেখযোগ্য।



ভিয়েনা শহরে দীপালী উৎসব উপলক্ষে ভোজ

জার্ম্মানীতে ভারতীয় ছাত্র—

জার্ম্মানীর অন্তর্গত ম্যুনিকের ডয়ট্শে একাডেমি প্রতি বৎসর

কয়েকটি ভারতীয় ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া থাকেন। এই বৃত্তির সাহায্যে তাঁহারা জার্ম্মানীর বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে নানা বিদ্যা আয়ত্ত করিবার সুযোগ লাভ করেন। গত ২৭এ অক্টোবর ডয়ট্শে একাডেমির বৃত্তিভোগী ছাত্রগণ ম্যুনিকে সমাগত হইয়া গত যুদ্ধে যে-সব সৈনিক জীবন দিয়াছেন তাঁহাদের স্মৃতিফলকে মাল্য প্রদান করেন। এই উৎসবে ম্যুনিকের মেয়রের প্রতিনিধি, ম্যুনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার, জার্ম্মানীস্থিত বিলাতের সহকারী রাজদূত ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।



গত যুদ্ধে মৃত জার্ম্মান সৈনিকদের স্মৃতি-ফলকে ম্যুনিকে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্রগণ কর্তৃক মাল্য প্রদান

ভারতীয় ছাত্রগণ প্রধানতঃ বিবিধ বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য জার্ম্মানীতে গেলেও যাহাতে তাঁহারা জার্ম্মানগণের সঙ্গে সামাজিক মেলা-মেশা হইতে বঞ্চিত না হন, ম্যুনিকের ডয়ট্শে একাডেমি সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা মাঝে মাঝে অন্তর্জাতিক ভোজের আয়োজন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এইরূপ দুইটি ভোজে আধুনিক জার্ম্মানীর উপর ভারতীয় দর্শন ও ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব আলোচিত হয়।

গত বৎসর ডয়ট্শে একাডেমির বৃত্তিভোগী সাত জন ভারতীয় ছাত্র সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম ও উপাধির বিবরণ এইরূপ—

সি আর বরাট (কলিকাতা), ডক্টর ইং (টেক্‌নিক্যাল ইউনিভার্সিটি, ম্যুনিক); এস্ কে মজুমদার (কলিকাতা), ডক্টর ফিল্ (ইউনিভার্সিটি, ম্যুনিক); জে এন্ মুখুজ্যে (কলিকাতা), ডক্টর ইং (টেক্‌নিক্যাল ইউনিভার্সিটি, ষ্টুটগার্ট); আর কে এন্ আয়াঙ্গার (মহীশূর), ডক্টর ইং (টেক্‌নিক্যাল ইউনিভার্সিটি, হ্যানোভার); আর কে দত্তরায় (ময়মনসিংহ), ডক্টর ইং (টেক্‌নিকাল ইউনিভার্সিটি, হ্যানোভার); জে মিশ্র (পাটনা), ডক্টর ফিল্ (ইউনিভার্সিটি, কনিগ্‌স্‌বের্গ); বি পিলানি (লাহোর), ডক্টর ওয়েক (কমার্শ্যাল ইউনিভার্সিটি, ন্যুর্নবের্গ)।

বিদেশে বাঙালীর সম্মান—

যে-সব বাঙালী বিদেশে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ডক্টর তারকনাথ দাস এক জন। তিনি গ্রন্থকার ও সাময়িক পত্রের লেখক বলিয়াও প্রসিদ্ধ। ডক্টর দাস ভারতবর্ষের বাহিরে থাকিয়াও



ডক্টর তারকনাথ দাস
[অধ্যাপনা-গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণকালে গৃহীত চিত্র]

স্বদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নানা সমস্যার কথা আলোচনা করিয়া থাকেন। তিনি সম্প্রতি আমেরিকার ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি-বিভাগে 'প্রাচ্য রাজনীতি'র লেক্‌চারার নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্বাস্থ্যলাভের উপায়—

ডাঃ শৈলেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, এল-এম্-এফ্ লিখিতেছেন—

পৃথিবীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানতঃ তিনটি অমূল্য সম্পদ আমাদের জীবনধারণে সাহায্য করিয়া থাকে—প্রথমতঃ পিতামাতা, দ্বিতীয়তঃ স্বাস্থ্য, তৃতীয়তঃ প্রকৃতির দানসমূহ। একের অভাবে অন্যটি সম্যক কার্য্যকরী হয় না। প্রতিনিয়ত এই তিনটির কার্য্যের সামঞ্জস্য থাকে বলিয়া দেহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সবল সুস্থ জনসমষ্টি জাতির মেরুদণ্ড।



ডাভস্ শহরের একটি দৃশ্য—তুষার-ক্রীড়া

বর্ত্তমান ভারতে যে জাতীয়, নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও শারীরিক পুনর্গঠনের একটি অদম্য উৎসাহ সকলের প্রাণে জাগিয়াছে তাহা দেশের মঙ্গলের সাঙ্কেতিক চিহ্ন বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে; স্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস করিবার ইচ্ছা লোকের দিন-দিন বাড়িতেছে। চেকোশ্লোভেকিয়ার সোকল (Sokol) প্রতিষ্ঠান, ইটালীর জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা, জার্ম্মানির যুব-সঙ্ঘ, জাপানের স্বাস্থ্যনীতি, সুইজারল্যাণ্ডের চিকিৎসা-প্রণালী ও নানা সভ্য দেশের বিবিধ প্রচেষ্টার আদর্শে আমাদের দেশেও কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শহরে ও গ্রামে স্বাস্থ্যরক্ষার ও উৎকর্ষের চেষ্টাই ইহার নিদর্শন। শুধু গৃহস্থালীই নহে, লাঠিখেলা, ছোরা-খেলা ও নৃত্যচর্চ্চা দ্বারা বালিকাদের মধ্যেও শরীর-গঠনের চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। এ-সকল আয়োজন সত্বেও শ্বাসরোগে মৃত্যু বা শিশুমৃত্যুর সংখ্যা তেমন হ্রাস পায় নাই। অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান না থাকায় বা রোগের প্রথমাবস্থায় সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না করায় অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিশেষতঃ বাংলা দেশে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব-বশতঃ অনেক কার্য্যক্ষম নর-নারী যৌবনেই অকাল মৃত্যুতে, অথবা রুগ্ন অবস্থায় কার্য্যে অক্ষম হইয়া আমরণ শয্যাশায়ী থাকিয়া সাংসারিক ক্ষতি ও দারিদ্র্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করিতেছে। পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশসমূহ এক একটি জীবনকে অমূল্য সম্পদ জ্ঞান করে। জাতির ও দেশের পক্ষে এরূপ মূল্যবান্ সম্পদ রক্ষার উপায়সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কেবলমাত্র তাহাই নহে, বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার পদ্ধতি হইতে আমরা স্বদেশে থাকিয়াও অনেক মূল্যবান্ তথ্য আহরণ করিতে পারি।

উপরের চিত্রখানি সুইজারল্যাণ্ডের ডাভস্ (Davos) নামক একটি মনোরম স্থানের। বৎসরের মধ্যে পাঁচ মাস স্থানটি তুষারাবৃত থাকে। গাছ, মাঠ, পথ প্রভৃতি সকলই বরফে ঢাকা। এখানকার আবহাওয়া শুষ্ক, অথচ কুয়াশার নামগন্ধ নাই। বরফের মধ্যে সূর্য্য-কিরণেরও কিছুমাত্র অভাব নাই। ডাভস্ পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৎসরের সব সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে যক্ষ্মা, হাঁপানি, সর্দ্দিকাশি প্রভৃতি রোগের চিকিৎসার জন্ত বহু লোক আসিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকে। যক্ষ্মা ও ক্ষয় রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্ত এখানে একটি রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট আছে।

ডাভস্ একটি ক্ষুদ্র স্থান হইলেও এখানকার অধিবাসীদের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্ত বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। সরকারকর্ত্তৃক দুধ সরবরাহ, আবর্জ্জনা পরিষ্কার, পাহাড় হইতে শহরের মধ্যে ঝরণার জল সর্ব্বক্ষণ আনয়ন করা হইতেছে। রোগীদের জন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুন্দর হাসপাতাল রহিয়াছে। ধনী দরিদ্র সকলের উপযোগী হোটেল, স্বাস্থ্যাবাস বা আবাসস্থল এখানে আছে। সাধারণতঃ লণ্ডন হইতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সমতল ও পার্ব্বত্য রেল যোগে ডাভস্ পল্লী ও ডাভস্ শহরে পৌঁছান যায়।

স্বাস্থ্যকামী রোগীরা আরোগ্যলাভের সময়ে বিবিধ প্রকারের ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই সব খেলা বা ইহাদের অনুরূপ কিছুই আমাদের দেশে এখনও প্রচলিত হয় নাই। অবশ্য আইস্ রিঙ্ক্‌স্, বব্-স্লে,

টোবোগান্ রান্, বা স্কি জাম্প প্রভৃতি আমাদের দেশে সম্ভবপর না হইতে পারে। এখানকার জনসাধারণ ক্রীড়াকৌতুক দ্বারাও স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এমন অনেক স্বাস্থ্যকামী নরনারী দেখিয়াছি যাঁহারা অনেক অর্থব্যয় করিয়া কোন পার্ব্বত্য অঞ্চলে গিয়াও মোটেই পাহাড়ে উঠেন নাই; পাদদেশ হইতেই গিরির উচ্চ শিখর দর্শনে আনন্দলাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন।

প্রত্যেক মানুষের সবল সুস্থ অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিবার একটি ইচ্ছা আছে, এমন কি মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আরও কিছুদিন বাঁচিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে অনেক রোগীকে দেখিয়াছি। উপরিউক্ত সুইজারল্যাণ্ড দেশের ডাভস্ যক্ষ্মা স্বাস্থ্যনিবাস পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধ বলিয়া বহু যক্ষ্মা ও অন্যান্য শ্বাসরোগাক্রান্ত রোগী চিকিৎসার জন্য আসিয়া থাকে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ ঐ সকল চিকিৎসা-আবাসে বিখ্যাত সিরোলিন রচি ইত্যাদি নিরাপদ ও কার্য্যকরী ঔষধ ব্যবহার ও অন্য প্রকার চিকিৎসা—যথা, অস্ত্রপ্রয়োগ—করিয়া থাকেন। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীদের প্রভূত উপকার হইবে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, হুপিংকাফ্, সর্দ্দি কাশি প্রভৃতি রোগেও ইহার ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে।

—

বাংলা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ হইতে পদক ও পুরস্কার ঘোষণা—

নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রবন্ধ-রচনার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে :—

পদক	প্রবন্ধের বিষয়
১। হরপ্রসাদ সুবর্ণপদক—	হিন্দু-রাজত্বে রাঢ়।
২। অক্ষয়কুমার বড়াল সুবর্ণপদক—	অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ও আলোচনা।
৩। কালীকৃষ্ণ সুবর্ণপদক—	আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের গতি।
৪। হেমচন্দ্র সুবর্ণপদক—	বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্রের স্থান।
৫। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক—	অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে করুণ রস।
৬। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্যপদক—	মাসিক-সাহিত্য সমালোচনার ধারা।
৭। বিপিনচন্দ্র পাল রৌপ্যপদক—	বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিপিনচন্দ্রের দান।



পরলোকগত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়ের শব লইয়া কেওড়াতলা শ্মশানঘাটের অভিমুখে যাত্রা



শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্র রায়ের আরতি-নৃত্য



শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্র রায়ের আরতি-নৃত্য

পুরস্কার

১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲)—বৈদিক যুগে আর্য্য ও অনার্য্য।

প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচার-শক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। ৪র্থ বিষয় ছাত্রগণের জন্য এবং ৫ম বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। বর্ত্তমান বর্ষের চৈত্র-সংক্রান্তির মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকের নামে ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

—

ভারতবর্ষ

পরলোকে প্রবাসী বাঙালী—

মণ্টগোমারির সিবিল সার্জ্জন পঞ্জাব-প্রবাসী ক্যাপ্‌টেন কৃপাসুন্দর বসু মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। কর্ম্মসূত্রে নানা স্থানে গমন করিয়া তিনি ধর্ম্মপ্রাণ সত্যপ্রিয় ও সেবাপরায়ণ ব্যক্তি বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। তিনি বঙ্গের বাহিরের বাঙালীর মর্য্যাদা বাড়াইতে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

বসু মহাশয় ১৮৮০ সনে ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কার্য্যোপলক্ষে ঢাকা—বিক্রমপুর হইতে ভাগলপুরে আসেন ও তথায় স্থায়িভাবে বসবাস করেন। কৃপাসুন্দর ভাগলপুর হইতে



ক্যাপ্‌টেন কৃপাসুন্দর বসু

এফ্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৮ সনে লাহোর মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। ১৯০৩ সনে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর পরে এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনরূপে পঞ্জাব-সরকারের মেডিক্যাল সার্ভিসে প্রবেশ করেন। বিগত মহাযুদ্ধে তিনি বস্‌রায় ডাক্তার হইয়া যান ও চারি বৎসর পরে আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি ১৯২১ সনে সিবিল সার্জ্জনের পদে উন্নীত হন। এই পদে থাকা কালীন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

রাঁচি বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন ও শিল্প-প্রদর্শনী—

গত ৭, ৮, ৯, ও ১০ই নভেম্বর রাঁচির হিন্দু ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাব



বাম দিক হইতে (দণ্ডায়মান) শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কালীশরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সেন (সম্মিলনীর সম্পাদক)।
(উপবিষ্ট) শ্রীযুক্ত নীরদকুমার রায়, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চৌধুরী।

সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগে বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব, সূচীশিল্প ও চিত্রশিল্পের একটি প্রদর্শনীও হইয়াছিল। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিৎ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, ডি-লিট্ মহাশয়। সুনীতি বাবু তাঁহার অভিভাষণে বাংলা-সাহিত্য ও বাঙালী জাতির উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি সম্বন্ধ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিৎ রায়-বাহাদুর শরৎ চন্দ্র রায়, এম্-এ, এম-এল্-সি মহাশয়। সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে সাদরে অভ্যর্থিত ও অভিনন্দিত করিয়া তিনি নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি উচ্চাঙ্গের অভিভাষণ পাঠ করেন। সুনীতি বাবু তাঁহার অভিভাষণ ছাড়া সম্মিলনীতে ছায়াচিত্রসহযোগে আরও দুইটি বিষয়ে বক্তৃতা করেন, বিষয় যথাক্রমে—'ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৃহত্তর ভারত' এবং 'গ্রীক ভাস্কর্য্য'। স্থানীয় বহু সাহিত্যিক এই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া সভার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

প্রবাসী বঙ্গীয় সঙ্গীত-সম্মেলন, পাটনা—

বিগত অক্টোবর মাসে মহালয়ার ছুটিতে পাটনায় এই সম্মেলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অপরিসীম যত্নে ইহা সম্ভব হইয়াছে। পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর কোর্টনী টেরেল মহোদয় এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে সঙ্গীত সম্বন্ধ বক্তৃতা ও বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছিল। পরে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় যে-সব ছাত্রছাত্রী যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা গুণানুসারে নিম্নোক্তরূপ রৌপ্য-পদক লাভ করিয়াছেন—

ছাত্রী

ধ্রুপদ—প্রথম—শ্রীমতী মণি দেবী, ভাগলপুর।
দ্বিতীয়—শ্রীমতী আরতিদাস বর্ম্মা, পাটনা।
খেয়াল—প্রথম—শ্রীমতী সুপ্রভা সেন, পাটনা
দ্বিতীয়—শ্রীমতী প্রভারাণী গুহ, বরিশাল।
তৃতীয়—শ্রীমতী বিজলী জয়শোয়াল, পাটনা।
ঠুংরী ও টপ্পা—প্রথম—শ্রীমতী সুপ্রভা সেন পাটনা।
ভারতীয় নৃত্য—প্রথম—শ্রীমতী আরতি ঘোষ, পাটনা।
দ্বিতীয়—শ্রীমতী নিবেদিতা বসু, পাটনা।
আধুনিক বাংলা সঙ্গীত—প্রথম—শ্রীমতী আরতি ঘোষ, পাটনা।
দ্বিতীয়—শ্রীমতী রেণু সেন, পাটনা।
তৃতীয়—শ্রীমতী অরুণা মিত্র।
কীর্ত্তন ও বাউল—প্রথম—শ্রীমতী দুলালী চক্রবর্ত্তী, ঢাকা।

ছাত্র

ধ্রুপদ—প্রথম—শ্রীমান্ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, পাটনা।
দ্বিতীয়—শ্রীমান্ গিরিশকুমার সিংহ, পাটনা।
খেয়াল—উচ্চপ্রশংসিত—শ্রীমান্ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, পাটনা।
বাঁশের বাঁশী—প্রথম—শ্রীমান্ মণ্টু, পাটনা।

এই সম্মেলনে একটি স্থায়ী সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির নাম "দি মিউজিক্যাল সোসাইটী অব বিহার এণ্ড ওড়িষ্যা, পাটনা।" পাটনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন।

এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি সঙ্গীত-সম্মেলন—

গত নবেম্বর মাসে এলাহাবাদে ইউনিভার্সিটি সঙ্গীত-সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এ-বৎসরেও প্রধানতঃ ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্যের চেষ্টা-যত্নে ইহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। আগ্রা-অযোধ্যার শিক্ষা-সচিব শ্রীযুত জে পি শ্রীবাস্তব সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সভাপতি হইয়াছিলেন পাটনার শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ সিংহ মহাশয়। সকলেই একবাক্যে ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্যের কর্ম্মকুশলতার প্রশংসা করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্রকন্যারা সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী। গত বৎসরের ন্যায় এবারেও তাঁহারা সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। যাঁহারা নৃত্য, বাদ্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রশংসিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এই কয় জনের নাম উল্লেখযোগ্য :

কণ্ঠসঙ্গীতে—শ্রীমতী শান্তিলতা বাঁড়ুজ্যে, শ্রীমতী প্রভাবতী মিত্র, শ্রীমতী সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য, শ্রীমান্ সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী চম্পক লক্ষ্মী, শ্রীযুত এন্ আর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত চন্দ্রশেখর পন্ত, শ্রীমতী গৌরীরাণী ঘোষ, শ্রীমতী সুষমা দে, শ্রীমান্ দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ চাটুজ্যে, শ্রীযুত কে সি মজুমদার, শ্রীযুত ডি জে জোশী। নৃত্যে—শ্রীমতী সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী শোভা ভট্টাচার্য্য। সেতারে—শ্রীমতী উষাদেবী গোভিল, শ্রীমতী রেণুকা সাহা, শ্রীযুত এন্ আর ভট্টাচার্য্য। বেহালা—শ্রীমান্ সমীরকুমার বাঁড়ুজ্যে। হারমনিয়ম—শ্রীমান্

জোশী, শ্রীমান্ জগদীশ, শ্রীমতী বাণাপাণি মুখুজ্যে, শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী রায়; তবলা—শ্রীমান্ ফুলু মুখুজ্যে, শ্রীমান্ হেমচন্দ্র জোশী, শ্রীমান্ নিশিতেশ বাড়ুজ্যে, শ্রীযুত সুষ্যকুমার পাল, শ্রীযুত এম্ আর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত অনাথনাথ মুখুজ্যে, শ্রীযুত জ্ঞানদানাথ মজুমদার; সারেঙ্গ—শ্রীযুত রাধিকামোহন মৈত্র; পাখোয়াজ—শ্রীযুত প্রতাপনারায়ণ মৈত্র।

এলাহাবাদে অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে—

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এলাহাবাদে যে পঞ্চম সঙ্গীত-সম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে কলিকাতার খ্যাতনামা অন্ধ-গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে গত ৭ই ও ৮ই নবেম্বর গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রী নবাব সার মহম্মদ ইউসুফ, সরকারী উকীল মিঃ মজিদ প্রমুখ প্রদত্ত বহু স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৯ই পার্ক রোড ক্লাবে ও ১০ই নরেন্সগঞ্জেও তাঁহার গান হইয়াছিল। কৃষ্ণবাবু ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন—তের বৎসর বয়সে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নষ্ট হইয়া যায়। তদবধি তিনি সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেছেন। তাঁহার এই সাফল্যে বাঙালীমাত্রেই গৌরব অনুভব করিবে।

রেঙ্গুনে বেঙ্গল একাডেমীর উৎসব—

গত ১১ই অগ্রহায়ণ রেঙ্গুনের বেঙ্গল একাডেমির পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ণ হয়। এতদুপলক্ষ্যে একটি উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। কলিকাতার মুষ্টিযোদ্ধা ও তরুণ ব্যায়াম-শিক্ষক শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার লোক-নৃত্য ও অন্যান্য নৃত্যাদি শিক্ষা দিবার জন্য সেখানে নিমন্ত্রিত হন এবং তাঁহার কার্য্যের দক্ষতার পরিচয় দিয়া বহু প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার লাভ করেন।



রেঙ্গুনস্থ বেঙ্গল একাডেমি—সিলভার জুবিলী উৎসব

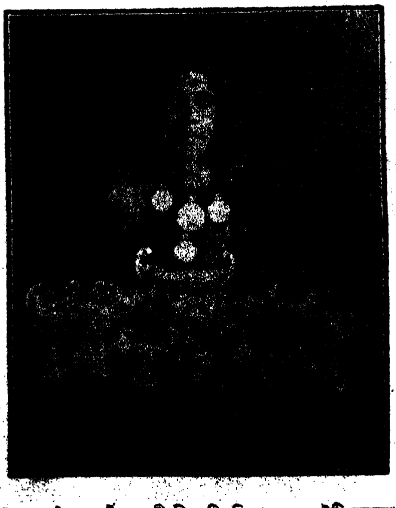
মাননীয় প্রধান বিচারপতি মিঃ পেজ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতির বক্তৃতা শেষ হইলে উৎসব আরম্ভ হয়। ছাত্রদের মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, রোমান-রিং ও ছাত্রদের ভারত-বরণ, বর্গামঙ্গল, অস্ত্রভঙ্গ প্রভৃতি নৃত্য আমোদ-প্রমোদের প্রধান অঙ্গ ছিল। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় প্রবর্ত্তিত পল্লীনৃত্য রেঙ্গুনের প্রবাসী বাঙালী ও অন্যান্য অধিবাসিগণকে শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম দেখাইলেন। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান্ সুবোধ চৌধুরী রোমান-রিং দেখাইয়া শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে একটি স্বর্ণ-গর্ভ রৌপ্যপদক



রেঙ্গুনস্থ বেঙ্গল একাডেমি—সিলভার জুবিলী উৎসব



রেঙ্গুনস্থ বেঙ্গল একাডেমি—সিলভার জুবিলী উৎসব



শ্রীযুত ননী চক্রবর্ত্তী—কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ইনি সঙ্গীতে ১৯৩৪ সনে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন

লাভ করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যায়াম-শিক্ষক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার সুযোগ্য ছাত্র শ্রীমান্ জ্যোতিষ খাস্তগীরের জাপানী যুযুৎসুও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য হইয়াছিল বালিকাদের নৃত্য; ছোটদের নমস্কার 'হে সূর্য্যিমামা' এবং কিশোরীদের 'বর্ষামঙ্গল' নৃত্যটি সকলের ভাল লাগিয়াছিল। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সান্ন্যালের 'স্বপ্নভঙ্গ' নৃত্যটি সকলের মনে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময় উৎপাদন করে।

পরে পুরস্কার বিতরণ ও শ্রদ্ধেয় যতীশরঞ্জন দাসেরপ্রতিকৃতি প্রভৃতি উন্মোচন করা হয়।

অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ

জয়েণ্ট-পার্লামেণ্টরী রিপোর্ট ও ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক—

ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হইলে আশঙ্কা আছে যে, (ক) ভারতে ব্রিটিনীয় বাণিজ্য-স্বার্থের বিরোধিতার এবং (খ) ইংলণ্ড হইতে ভারতে আমদানী সম্পর্কে আইনগত ও শাসনগত বৈষম্যের সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং জয়েণ্ট-পার্লামেণ্টরী কমিটি ভারতে ইংলণ্ডীয় বাণিজ্য-স্বার্থ রক্ষার জন্য কতিপয় সুপারিশ করিয়াছেন—

(১) যুক্তরাজ্য (ইংলণ্ড, ওয়েলস্, স্কটল্যাণ্ড ও উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড) হইতে ভারতে যে সকল পণ্যদ্রব্য আমদানী হইবে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত কিংবা শাসনগত বিধান নিরোধ করিবার ক্ষমতা গবর্ণর-জেনারেলের থাকিবে।

ভারতীয় কোন আইন পরিষদ কিংবা কোন সরকারের অধিকার থর্ব্ব করিবার জন্য এই বিশেষ ক্ষমতা দানের প্রস্তাব নহে। যদি এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, কোন আইনের উদ্দেশ্য ভারতের স্বার্থ বৃদ্ধি বা রক্ষা নহে, যুক্তরাজ্যের স্বার্থহানি, তবেই এই বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ করা হইবে।

(২) যুক্তরাজ্যের অধিবাসী কোন "ব্রিটিশ" প্রজার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার অধিকার থর্ব্ব করিয়া কোন আইন পাটিবে না। তবে কোন অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তিকে বহিষ্কার করিবার অধিকার ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের থাকিবে।

(৩) বাসস্থল, স্বদেশ, বাসকাল, ভাষা, জাতি, ধর্ম্ম বা জন্মভূমি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া কোন সর্ত্ত বা নিষেধমূলক কোন আইন যুক্তরাজ্যবাসী কোন ব্রিটিশ প্রজার উপর ট্যাক্স, ভ্রমণ, বাস, বিত্তরক্ষা, চাকুরী, ব্যবসা বা বৃত্তি সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) যুক্তরাজ্যে যে সকল যৌথমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে বা হইবে, সেগুলি ভারতে যদি ব্যবসা কার্য্যে রত হয় তবে ডাইরেক্টর, অংশীদার, এজেণ্ট ও কর্ম্মচারীদের বাসস্থল, ভাষা, জাতি, ধর্ম্ম, জন্মস্থান কিংবা মণ্ডলীর গঠনস্থান সম্পর্কে ভারতীয় আইন মান্য করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) ভারতে যে সকল যৌথমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে বা হইবে, যুক্তরাজ্যবাসী ব্রিটিশ-প্রজা যদি তাহাদের ডাইরেক্টর, অংশীদার, এজেণ্ট বা কর্ম্মচারী হয় তবে ঐ সকল সম্পর্কে ভারতীয় আইনে নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তগুলি পূরণ করা হইয়াছে ধরিতে হইবে।

দি নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড—

গত ৩১শে মার্চ্চ ১৯৩৪ এই কোম্পানীর পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ হইল। এই বৎসরের জন্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। "অগ্নি"-শাখায় আলোচ্য বর্ষে নিট প্রিমিয়ামের পরিমাণ মোট ৩৪,৭৯,৪১৩৵৴০ আনা, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৯,৫৯,০৫৮॥৵৪ পাই কম। ব্যয়ভার পূর্ব্ব বৎসরের প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৪২·৯ ভাগ হইতে বাড়িয়া ৪৫·১ ভাগ হইয়াছে। কিন্তু এই বিভাগের সর্ব্বপ্রকার রিজার্ভ ফাণ্ড নিট প্রিমিয়ামের পূর্ব্ব বৎসরের শতকরা ৭৯·৮ হইতে বাড়িয়া ৯৮·৫ হইয়াছে। "সমুদ্র"-বিভাগে নিট প্রিমিয়াম পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা ১,৩৫,৩০৮।৴১১ পাই কমিয়া ১৯,৩৬,০২৬৶৭ পাই দাঁড়াইয়াছে। ব্যয়ভার প্রিমিয়াম-আয়ের ১৬·১ ভাগ হইতে বাড়িয়া ১৭·৭ ভাগে উঠিয়াছে। মোট তহবিল পূর্ব্ব বৎসর ছিল প্রিমিয়াম-আয়ের শতকরা ১১৩·৫ ভাগ, আলোচ্য বর্ষে ১২৮·১ ভাগ। "দুর্ঘটনা"-বিভাগে নিট প্রিমিয়াম পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২৩,৪৪৭৶৴০ বাড়িয়া ৫,৪১,৯৪৪॥২ পাই দাঁড়াইয়াছে। ব্যয় প্রিমিয়াম-আয়ের শতকরা ৩৭·৮ হইতে ৪১·৪ উঠিয়াছে। ইহার রিজার্ভ পূর্ব্ব বৎসরে ছিল প্রিমিয়াম-আয়ের শতকরা ৮৮·২, এবার শতকরা ৯৫·৩। "জীবন"-বিভাগে আলোচ্যবর্ষে ১,৪২,৯৯,৫৫০ টাকার পরিমাণে ৬,৬১৪ প্রস্তাব আসিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের বকেয়া প্রস্তাব ও এ-বৎসরের প্রস্তাব হইতে মোট ৫,৩৯০ "পলিসি" হইয়াছে, টাকার পরিমাণ ১,১১,৬৬,৪০০ মাত্র। এতদ্ব্যতীত ২৫,০০০ টাকার দুটি এনুয়িটি বণ্ড ও ২,০০,০০০ টাকার একটি "শীজহোল্ড রিডেম্পশন পলিসি" হইয়াছে। ১১,৮০৮ সংখ্যক সাধারণ পলিসি আলোচ্যবর্ষে বলবৎ, দাবির পরিমাণ ২,৮৪,২৫,৮৩৪।০ মাত্র। কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার মোট তহবিলের পরিমাণ ১,৬৫,৯৪,৯৫৭৵৪ পাই মাত্র। আলোচ্যবর্ষের কার্য্যদ্বারা তহবিলের পরিমাণ ৯,০৩,৯৬৪৶৵৯ পাই বাড়িয়াছে।

ভারতীয় বীমা মণ্ডলীর মধ্যে নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

বহির্জ্জগৎ

সারের ভবিষ্যৎ—

ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর সীমান্তে, সার নদীর উপকূলে, যে ক্ষুদ্র উপত্যকা আছে কিছুকাল যাবৎ জগতের দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ হয়েছে। এই সার (Saar) প্রদেশ বাংলার অনেক জেলার অপেক্ষা ছোট এবং যদিও জায়গাটি জনবহুল, এর লোকসংখ্যা আট লক্ষের বেশী হবে না। কিন্তু বর্ত্তমান বছরে য়ুরোপের অন্য কোন প্রদেশ সার উপত্যকার অর্দ্ধেক প্রসিদ্ধি লাভ করে নি। এই অসাধারণ খ্যাতির কারণ— আগামী ১৩ই জানুয়ারী সারের অধিবাসীবৃন্দের ভোটের দ্বারা নির্দ্ধারিত হবে তাদের দেশ জার্ম্মান রাইশের সঙ্গে সংযুক্ত হবে, না ফ্রান্সের সঙ্গে সংযুক্ত হবে, অথবা যে ভাবে আছে সেই ভাবেই থাকবে।

১৯১৯ সনের ভার্সাইয়ের সন্ধিতে এই ক্ষুদ্র প্রদেশটিকে জার্ম্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র শাসনাধীনে আনা হয়।

সার কয়লার খনিতে ভরা। যুদ্ধের আগে এই কয়লার খনিগুলি প্রধানতঃ প্রুশিয়া ও বাভেরিয়া গভর্ণমেণ্টের হাতে ছিল। এই সব কয়লার খনিতে ষাট হাজার লোক খাটত এবং ১৯১২-১৩ সনে বছরে এক কোটি ত্রিশ লক্ষেরও বেশী কয়লা উৎপন্ন হত। প্রভূত অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে জার্ম্মানীর বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় দেড় লক্ষ লোক এখানে এসে নূতন করে বসবাস স্থাপন করেছে।

যুদ্ধের পর ফ্রান্স জার্ম্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ কয়লার খনিগুলি দাবি করে। ফলে, কয়লার খনিগুলি, বিদ্যুৎ সরবরাহের কেন্দ্র, রেলপথ, স্কুল, ঘর-বাড়ি, হাসপাতাল ইত্যাদি ফ্রান্সের সম্পত্তি হয়ে যায়। এই সবের মূল্য জার্ম্মানীর নিকট প্রাপ্য ফ্রান্সের ক্ষতিপূরণের টাকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

মার্কিনের প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসনের ইচ্ছানুসারে ইহার শাসনভার বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের হাতে ন্যস্ত হয়। তিনি প্যালেস্টাইন কিংবা সিরিয়ার ন্যায় সারকে কোন বিশেষ রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে রাখতে চান নি, কারণ সার স্বায়ত্ত-শাসনের অযোগ্য এ কথা বলা ভুল। পক্ষান্তরে, ডানসিগ শহরের শাসনপদ্ধতি বেশী স্বাতন্ত্র্যমূলক মনে হওয়ায়, অন্য ব্যবস্থা করা তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। অতএব, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের ওপর এই দেশের শাসনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ থেকে একটি শাসন-পরিষদ (Governing Commission) সারের গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করেন। এই পরিষদের পাঁচ জন সদস্য—এক জন ফরাসী, এক জন সারবাসী, এক জন ফিন্ (ফিন্ল্যাণ্ডের লোক), এক জন যুগোস্লাভ ও এক জন আইরিশম্যান। আইরিশম্যান জেওফ্রে জর্জ নক্স্ শাসন-পরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি। তিনি এই কাজে দু-বছরের বেশী নিযুক্ত আছেন। এই পরিষদ সকল কর্ম্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারেন এবং যে-কোন প্রয়োজনীয় শাসন-ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। সার সম্বন্ধে ভার্সাইয়ে-সন্ধির নির্দ্দেশের ব্যাখ্যা ভোটাধিক্যে নিরূপণ করার ক্ষমতাও তাঁর আছে। অবশ্য মনে রাখা দরকার, সর্ব্বোচ্চ কর্তৃত্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘের হাতে। সারের আইন ও তার পরিচালনা-ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ আছে, শুধু কয়েক জন আন্তর্জ্জাতিক আইনজীবী নিয়ে একটি উচ্চতম আদালত নূতন করে স্থাপন করা হয়েছে।

জার্ম্মানী এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বরাবরই আন্দোলন করে এসেছে। হিটলারের শাসনভার নেবার পর থেকে এই আন্দোলন বিশেষভাবে



সারা ওয়ামবাগ। এই মার্কিন মহিলা সারের ভোটগণনা পদ্ধতির নির্দ্দেশ দিবেন



সারের শাসন-পরিষদের সভাপতি নক্স

বেড়ে উঠেছে। যে জায়গার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা মাত্র দু-জন ফরাসী সেই জায়গা জার্ম্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যুক্তিহীন, কিন্তু জার্ম্মানরা ১৮৭০-৭১ সনের ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান যুদ্ধের পর যেমন আলসেস্-লোরেঁ নিজেরা দখল করে বসেছিল ফরাসীদেরও গত মহাযুদ্ধের পর সেইরকম কিছু করবার ইচ্ছা যে ছিল না, তা বলা যায় না। কিন্তু যুদ্ধের ফলে ফ্রান্স যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জার্ম্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে সে ক্ষতির অর্দ্ধেকও পূরণ হয়নি। সে যা হোক, ভার্সাইয়ে-সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১৯২০ সনের ১০ই জানুয়ারী থেকে পনের বছর অতীত হবার পর যত শীঘ্র সম্ভব সারবাসী কার শাসনাধীনে থাকতে চায় ভোট নিয়ে তা জানতে এবং সেই নির্দ্দেশমত ব্যবস্থা করতে বাধ্য।

গত ১লা জুন ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মধ্যে ঠিক হয়েছে যে আগামী ১৩ই জানুয়ারী এই ভোট নেওয়া হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মন্ত্রণা-সভা এটা মেনে নিয়েছেন এবং ভোট নেবার ব্যবস্থা করার জন্য কতকগুলি ট্রাইবিউন্যাল, কমিটি, কমিশন, ইত্যাদি নিযুক্ত করেছেন।

এই ভোট গণনা সাধারণ নির্ব্বাচন নয়। জার্ম্মানীর বিপক্ষে ফ্রান্স ও অন্যান্য "মিত্র" শক্তি এই প্রদেশ বর্ত্তমান শাসনে রাখতে চান। যদিও সারবাসী ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাই-ই হবে, তথাপি সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ কিন্তু কেহ আশা করেন না। জার্ম্মানীও নিজের জায়গা ফিরে পেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জার্ম্মানী সার প্রদেশ ফিরে পেতে কতটা উদ্গ্রীব তা বোঝা যায় হের হিটলারের কথা থেকে। তিনি বলেছেন, একমাত্র সার ছাড়া



সারের অধিবাসিদের মনে দেশাত্মবোধ উদ্বোধনকল্পে ডক্টর গোয়েবলস্ একটি সার বালিকার নিকট হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করিতেছেন

আর কোন প্রদেশ নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্ম্মানীর বিবাদ নেই। তিনি একথাও বলেছেন যে, যদি কোন গোলমাল না হয়ে এই সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়—অর্থাৎ, জার্ম্মানী যদি সার ফিরে পায়, তাহলে দুই দেশের মধ্যে ঝগড়া করার কিছু থাকবে না। অতএব নির্ব্বিবাদে সার-সমস্যার মীমাংসার ওপর বর্ত্তমানে য়ুরোপের শান্তি অনেকটা নির্ভর করছে এবং এইজন্য সার এত প্রাধান্য লাভ করেছে। ফ্রান্সের প্রতি হের হিটলারের এইরূপ অনুরোধের কারণ, সারবাসী কোন্‌দিকে ভোট দেবে সে-বিষয়ে জার্ম্মানীর যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। যদিও সারবাসীরা বেশীর ভাগই জার্ম্মান, তাদের মধ্যে অনেকে জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত হ'তে নারাজ। এর প্রধান কারণ, বর্ত্তমান জার্ম্মানীতে নাৎসিদের আধিপত্য। গত দু-বছরের মধ্যে অনেক কমিউনিষ্ট ইহুদী ও অন্যান্য রাজনৈতিক পলাতক সারে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মুখ থেকে নাৎসিদের কীর্ত্তি-কাহিনী অনেকেই শুনেছে এবং তাদের মধ্যে সেখানকার রাইশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি একটা প্রবল বীতস্পৃহা জেগে উঠেছে। বিশেষতঃ ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী, ইহুদী, সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেণীর লোক কোন মতেই নাৎসিদের হাতে পড়তে নারাজ! প্রতিকূল ভোটের ভয়ে কিন্তু নাৎসিদের উদ্যম আরও বেড়ে গেছে। সারের মধ্যে একটি নাৎসি দল ও তাদের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। হের হিটলার ও তাঁর দল সর্ব্বপ্রকারে সারেস্থিত তাঁদের পক্ষপাতী দলকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছেন। দুই দিকেই সভা, সমিতি ও আন্দোলন খুব প্রবলভাবে চলেছে। নাৎসি গভর্ণমেণ্ট সারের আন্দোলন চালাবার জন্যে গত বছর ভাইস্-চ্যান্‌সলার হের ফন্ পাপেনকে নিযুক্ত করেন, এ বছর পাপেন মন্ত্রিমণ্ডল ত্যাগ করবার পর পালাটিনেটের নেতা হের জোসেফ বুয়েৰ্কেলকে সেই পদে নিযুক্ত করেছেন। নাৎসি গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের মন্ত্রী ডাক্তার জোসেফ গোয়েবেলস্ এই কাজে বিশেষ অগ্রণী। তাঁর কাজ বেতার ও সংবাদপত্রের সাহায্য সারবাসীদের পিতৃভূমির প্রতি দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা। বড় বড় সভা ক'রে সারের নাৎসিদের জন্যে অর্থ জুগিয়ে, সারের বেকার যুবকদের জার্ম্মানীর শ্রমিক-আড্ডায় এনে তাদের ভরণ-পোষণ ক'রে সারবাসীদের গত দেড় বছরে জানানো হয়েছে সার জার্ম্মানীর কত প্রিয়।* কিন্তু এতেও সারবাসীর ভোটের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে না পেরে নাৎসিরা ভোটের দিনে বিপক্ষদলকে বাহুবলে হারাতে মনস্থ ক'রে ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করেছে। সারের প্রেসিডেণ্ট নক্‌স্ নাৎসি দলের এই সব অন্যায় আচরণের পক্ষপাতী নন্, তাই তিনি এই ষড়যন্ত্র দমন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু সারের পুলিস ও অন্যান্য সরকারী বিভাগের বেশীর ভাগ লোকই নাৎসিদলভুক্ত, তাই শান্তি রক্ষা ক্রমশঃই কঠিন হয়ে উঠেছে। ১৩ই জানুয়ারী যতই এগিয়ে আসছে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা ততই বাড়ছে। কিছুকাল আগে নক্‌স্ সাহেব রাষ্ট্র-সঙ্ঘকে জানান যে, ভোট গ্রহণ করার দিন তিনি বাইরের বিনা সাহায্যে শান্তিরক্ষা করতে সমর্থ হবেন না। যদিও একথা সত্য যে, অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থায় তিনি ফরাসী-সৈন্যের সাহায্য নিতে পারেন, তথাপি জার্ম্মানীর এতে প্রবল আপত্তি থাকাতে এই পন্থা কেহ যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। অতএব ঠিক হয়েছে, বৃটেন, ইটালী, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশের সৈন্য সারের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের দিন শান্তি রক্ষা করতে সাহায্য করবে।

যদিও সারে জার্ম্মানদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়েছে, শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে এবং ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর পররাষ্ট্র সচিব এম্ লাভাল ও হের ফন্ নয়রাথ উভয় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অঙ্গীকার করেছেন যে, কোন প্রকারে কোন পক্ষ হইতে অন্যায় চেষ্টা হবে না, তবুও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন হওয়া কঠিন। প্রথমতঃ, জার্ম্মানীর কথার তেমন মূল্য নেই। ভোট যদি তার বিরুদ্ধে যায় তা হলে তার ক্রোধ ও অসন্তোষ দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠবে। অষ্ট্রীয়াতে নাৎসিদের আচরণে প্রমাণিত হয়েছে যে, নাৎসিরা যেখানে আইনতঃ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না সেখানে পাশবিক শক্তি নিয়োগ করতে তাদের দ্বিধা নেই।

দ্বিতীয়তঃ, ভোট গণনার দ্বারা সারবাসীর কি নির্দ্দেশ বোঝা যাবে? সারবাসীর সামনে এখন তিনটি পথ রয়েছে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন যদি জার্ম্মানীর পক্ষে ছ-জন, সার স্বতন্ত্র থাকবার পক্ষে চার জন ও ফ্রান্সের পক্ষে তিন জন—এই অনুপাতে সারবাসীরা ভোট দেয় তাহলে কি সিদ্ধান্ত হবে? জার্ম্মানীর পক্ষে সবচেয়ে বেশী ভোট, অতএব জার্ম্মানী দাবি করবে সার তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, কিন্তু যেহেতু তার বিরুদ্ধে মিলিত ভোট-সংখ্যা বেশী, সেইজন্য দ্বিতীয়বার ভোট নেওয়া দরকার হবে এবং এই দ্বিতীয় বারে যদি সারের পক্ষে এবং জার্ম্মানীর বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা অধিক হয়, তখনও আর একবার ভোট নিয়ে দেখতে হবে যে যখন ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর সঙ্গে মিলিত হওয়াই দুটি মাত্র উপায় তখন সারের জনমত কোন্ দিকে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ কিন্তু এ কথা বলেছেন যে, সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে সারের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মত নিয়ে ঠিক হবে সেই সেই অংশ ভবিষ্যতে কোন্ শাসনাধীনে থাকতে চায়। জার্ম্মানী যে এতে আপত্তি করবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভোট দেবার দিন অনেকে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ভোট দিতে সাহস করবে কি-না, কারণ নাৎসিরা অনেক দিন ধরেই তাদের বিপক্ষদলকে শাসিয়ে আসছে এই বলে যে

* প্যারীর বিখ্যাত সংবাদপত্র ল্য মাতাঁ (Lo Matin) বলেছেন, এই প্রীতি কিন্তু যুদ্ধের আগে ছিল না, এবং সার ফিরে পাবার পর থাকবে কি-না সন্দেহ।

"সার একবার আমাদের হাতে আসুক, তারপর তোমাদের দেখে নেব।" নাৎসিরা যে অনেককে ভয় দেখিয়ে ভোট আদায়ের চেষ্টা করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এইরূপ আতঙ্ক-সৃষ্টির ফলে যদি বেশীসংখ্যক ভোট জার্ম্মানীর পক্ষে যায় তাহলে প্লেবিসাইট ট্রাইবিউনাল তা নাকচ করে দিতে পারেন।

এক জন সাংবাদিক রোম থেকে খবর দিচ্ছেন যে, সিনর মুসোলিনী সারবাসীদের একটি স্বাধীন শাসনতন্ত্র উপহার দিতে মনস্থ করেছেন! এই খবর সত্য কি মিথ্যা এখনও জানা যায় নি, তবে এটা নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে ১৩ই জানুয়ারীর ভোটের ওপর সব নির্ভর করবে। একজন বিচক্ষণ সংবাদদাতা বলছেন ৩০এ জুন জার্ম্মানীতে যে হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে তাই দেখে অনেকে "পিতৃভূমির" প্রতি বিমুখ হয়েছে এবং আগে এই ভোট-যুদ্ধে জার্ম্মানীর জয় হবার যে সম্ভাবনা ছিল তা এখন বিলীন হয়েছে। সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র মতাবলম্বীরা ও ক্যাথলিক পাদরীরা তাদের মতভেদ ভুলে গিয়ে আশ্চর্য্যরূপে মিলিত হয়েছে। এখন সাধারণ ক্যাথলিকদের ওপর সারের ভাগ্য নির্ভর করছে। অনেকে আশা করেন, ক্যাথলিক ধর্ম্মগুরু পোপ এই বিষয়ে সারের ক্যাথলিকদের জার্ম্মানীতে ফিরে যাবার বিরুদ্ধে ভোট দিতে আজ্ঞা দিতে পারেন, কারণ গত বছর হিটলারের সঙ্গে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় সেই চুক্তি হিটলার ভঙ্গ করেছেন। কিন্তু পোপের ইচ্ছা থাকলেও এইরূপ কোন নির্দেশ দিতে বোধ হয় সাহস করবেন না কারণ, তাহলে জার্ম্মানীতে লক্ষ লক্ষ ক্যাথলিকদের ওপর আরও অত্যাচার হতে পারে।

নাৎসিদের পথে যতই বাধাবিঘ্ন থাকুক তারা কিন্তু চুপ করে বসে নেই। জার্ম্মানী সকল জায়গায়, এমনকি সুদূর কানাডায় পর্য্যন্ত, যে সকল লোকের সার প্রদেশে ভোটাধিকার আছে তাদের খুঁজে বের করছে। জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট তাদের যাতায়াতের খরচ বহন করবেন। এই উৎসাহ দেখে মনে হয়, শেষ পর্য্যন্ত হিটলারই জয়ী হবেন। কিন্তু তাঁর এই আশা যদি সফল না হয় তাহলে সার য়ুরোপে আর একটি মহাযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফ্রান্স, বৃটেন, ইটালী—যারা ১৯১৪ সনে নিপীড়িত বেলজিয়ানদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, আজ বিপদগ্রস্ত নাৎসি-বিরোধী সারবাসীদের পিছনে দাঁড়িয়েছে। ফলাফল কি হয় দেখতে জগতের লোক উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে।

মার্সাইয়ে হত্যার জের—

মার্সাইয়েতে অক্টোবর মাসের প্রথমে যে হত্যাকাণ্ড ঘটে তার ফলে হাঙ্গেরী ও য়ুগোস্লাভিয়ার মধ্যে বিরোধ আরও প্রকটাকার ধারণ করেছে।

য়ুগোস্লাভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-সচিব এম্ বার্থু য়ুগোস্লাভিয়ার অন্তর্বর্ত্তী ক্রোট প্রদেশের বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। এই ঘটনার পর আততায়ী কালেমানের যে-সকল সহকারী ধৃত হয়েছে তাদের স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ, তারা এই কার্য্য করার জন্য হাঙ্গেরীতে বিশেষ ভাবে তৈরী হয়েছিল। হত্যাকারী কালেমান ও তার সহচরবৃন্দ সকলেই ইতিপূর্ব্বে নানা দোষে দণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু দণ্ড গ্রহণের পূর্ব্বেই তারা পালিয়ে গিয়ে হাঙ্গেরীতে আশ্রয় নেয়। গত মাসে য়ুগোস্লাভিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব এম্ য়েভ্‌টিচ্ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে হাঙ্গেরীর ওপর দোষারোপ ক'রে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে যে লিপি পেশ করেছেন কয়েক দিন হ'ল এর কাউন্সিলে তার আলোচনা হয়ে গেছে। হাঙ্গেরীর প্রতিনিধি হের একহার্ড্‌ট্ এম্ য়েভ্‌টিচের দোষারোপে বিশেষ ক্রোধ প্রকাশ করেন। এই আলোচনার সময় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।



ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিব বার্থু



য়ুগোস্লাভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার ও রাণী মারি

এম্ য়েভ্‌টিচ্ রাষ্ট্রসঙ্ঘে এই মর্ম্মে অভিযোগ করেন যে, য়ুগোস্লাভিয়া থেকে বিপ্লবী পলাতকেরা হাঙ্গেরীতে সর্ব্বদাই আশ্রয় পেয়ে থাকে। গত ছ-বছরের মধ্যে হাঙ্গেরীর সীমান্তের নিকটবর্ত্তী য়ুগোস্লাভিয়ার স্থানবিশেষে বহু হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদ-মূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই অপকর্ম্মকারীরা সকলেই হাঙ্গেরী থেকে ওখানে গুপ্তভাবে এসে থাকে। ইহারা হাঙ্গেরীতে থেকে বিপ্লব ঘটাবার জন্যে যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করেছে। এই সকল অভিযোগ দলিল-দস্তাবেজ ও আলোকচিত্রের সাহায্যে সমর্থিত হয়েছে। যে ষড়যন্ত্রের ফলে মার্সাইয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তাতেও হাঙ্গেরীর অনেক রাজ-কর্ম্মচারী সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

হাঙ্গেরীর প্রতিনিধি বলেন, এই অভিযোগ তাদের বিপক্ষ ক্ষুদ্র মিত্রশক্তিবর্গের* (Little Entente) রাজনৈতিক চাল, কিন্তু পরিশেষে রাষ্ট্রসজ্ঞের সদস্যদের মিলিত অনুরোধে হাঙ্গেরিয়ান্ ও পলাতক ক্রোটিয়ানদের দোষ তদন্ত করতে এবং তার পর অপরাধীদের শাস্তি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে মধ্য য়ুরোপীয় শক্তিবর্গ একটা আসন্ন বিপদের হাত হতে মুক্ত হয়েছেন।

১৯১৪ সনে সার্বিয়ায় অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর যুবরাজ ফার্ডিন্যাণ্ডের হত্যার ফলে মহাসমরের আগুন জ্বলে ওঠে। এবার হাঙ্গেরী ও য়ুগোশ্লাভিয়ার বিরোধ বিশ্বরাষ্ট্রসজ্ঞ আপোষে নিষ্পত্তি করেছেন; বিশ্বরাষ্ট্রসজ্ঞ না থাক্‌লে এর ফল যে কি ভয়াবহ হত তা সহজেই অনুমেয়।

লণ্ডন নৌ-শক্তি সম্মেলন—

বিগত মহাযুদ্ধের পর জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্ত্রসম্ভার এত দ্রুত গতিতে বেড়ে উঠেছে যে, কোন প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা ইহা নিরোধ বা হ্রাস করার পন্থা অবলম্বন করতে সকল রাষ্ট্রই এখন উৎসুক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজনৈতিক কারণে সকলের আর্থিক অবস্থা নিরতিশয় শোচনীয় হওয়া সত্ত্বেও শক্তিবর্গের অস্ত্রসম্ভার ক্রমশঃই বেড়ে উঠ্‌ছে।



এ্যাড্‌মিরাল ষ্ট্যাণ্ডলি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের প্রধান উপদেষ্টারূপে লণ্ডনের নৌ-সম্মেলনে যোগদান করেন

১৯৩২ সনের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে জেনিভায় নিরস্ত্রীকরণ সভার আলোচনা চলে আসছে কিন্তু তার ফলে আজ পর্য্যন্ত জগতের এই ভয়াবহ অস্ত্র-সমস্যার কোনও মীমাংসা হয় নি। সম্প্রতি মার্কিনের রাষ্ট্রসচিব মিঃ কর্ডেল্‌হাল্ ও বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডনাল্ড্ যেরূপ মতামত প্রকাশ করেছেন তাতে মনে হয় নিরস্ত্রীকরণ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু গত জুন মাসে জেনেভায় শেষ চেষ্টা করে এসে বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপান পুনর্ব্বার কথাবার্ত্তা আরম্ভ করেন। গত জুলাই থেকে অক্টোবার পর্য্যন্ত তাঁদের নৌ-বহর সীমার মধ্যে রাখার কথাবার্ত্তা বন্ধ ছিল। গত নবেম্বর মাসে লণ্ডনে এই আলোচনা আবার আরম্ভ হয়।†

ওয়াশিংটনে ১৯২২ সনে বৃটিশ সাম্রাজ্য, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও ইটালী—এই পাঁচটী শক্তি তাঁদের তখনকার নৌ-শক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকের নৌবহর এক একটী বিশিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে স্বীকৃত হন। পরস্পরের নৌ-শক্তি রেষারেষি করে না বাড়িয়ে আপোষে এই সমস্যার মীমাংসা করার এই প্রথম চেষ্টা—এবং ইহা



জাপানের প্রধান মন্ত্রী এ্যাডমিরাল ওকাডা

আংশিক ভাবে সফল হয়। বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজগুলির সংখ্যা ও মিলিত 'টনেজ' এই সম্মেলনে নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু সকল শ্রেণীর রণপোতের সংখ্যা ও টনেজ সীমাবদ্ধ না হওয়ায় ১৯২৭ সনে যখন জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের প্রারম্ভিক আলোচনা চলছিল তখন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কুলিজের আহ্বানে একটি নৌ-বৈঠক বসে। কিন্তু এই বৈঠক সম্পূর্ণ বিফল হয়। পরে, ১৯৩০ সনে লণ্ডনে আর একটি নৌ-বৈঠক বসে। তাহাতে ১৯২৭ সনে জেনেভায় উপস্থাপিত সমস্যা-গুলির সমাধান হয় ও ক্রুজার, ডেস্‌ট্রয়ার ও সাবমেরিন সম্পর্কে এক চুক্তি হয়। শুধু প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধজাহাজ সম্পর্কেই পাঁচটি শক্তি নিজেদের মধ্যে একপ্রকার ব্যবস্থা অনুমোদন করেন।

লণ্ডন-চুক্তির নির্দ্দেশ মত ১৯৩৫ সনে আবার মিলিত হয়ে এই পাঁচটি প্রধান নৌ-শক্তির আগেকার দুই চুক্তিই আলোচনা করবার কথা। এই সভায় যদি কোন নূতন চুক্তি খাড়া না করা যায় তাহলে ১৯৩৬ সনের শেষ দিনে লণ্ডন নৌ-চুক্তির মেয়াদ স্বতঃই শেষ হবে। যদি একটি কিংবা একাধিক শক্তি তাঁর বা তাঁদের ইচ্ছা ১৯৩৪ সন শেষ হবার আগে জ্ঞাপন করেন তাহলে ওয়াশিংটন নৌ-চুক্তি এই সঙ্গে রদ হবে। ১৯৩৩ সনের মে মাসে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে জাপান অন্যান্য স্বাক্ষরকারীদের জানায় যে, সে অন্যদের তুলনায় নিজের জন্য বৃহত্তর নৌবহরের দাবি করবে। জলপথে আমেরিকা ও বৃটেন তার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। এরা এই দাবি মেনে নিতে অস্বীকৃত হয়েছে। অতএব আশা করা যায় যে, জাপান যথাসময়ে ওয়াশিংটন-চুক্তি নাকচের বিষয় বিজ্ঞাপিত করবে; এমন কি, এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী ফরাসী ও ইটালীকে সে এই কার্য্যে যোগ দান করতে আহ্বান করেছে, কিন্তু এই দুই শক্তিই এই বিষয়ে জাপানের সঙ্গে একমত হতে পারে নি।

আগেই বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন শক্তিবর্গের মধ্যে অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কে প্রতিযোগিতার মূলে রাজনৈতিক কারণ বর্ত্তমান। অতএব

* রুমানিয়া, য়ুগোশ্লাভিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া।

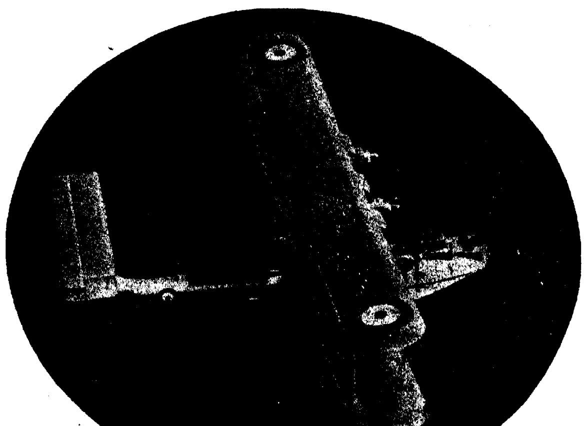
† লণ্ডন হইতে প্রেরিত গত ১২ই ডিসেম্বরের রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, এই আলোচনা আবার অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। প্রবাসীর সম্পাদক।

জাপানের দাবির পেছনে কোন অভিসন্ধি নিহিত আছে কি-না জানা প্রয়োজন।

১৯২২ সনে ওয়াশিংটনে যে-সকল চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় নব-শক্তি-চুক্তি (Nine Power Treaty) ও চতুঃশক্তি-প্রশান্ত-মহাসাগরিক-চুক্তি (Four Power Pacific Treaty) তাদের অন্যতম। এইগুলিকে ভিত্তি করেই ওয়াশিংটন নৌ-চুক্তি রচনা হয়। প্রথম দুটি চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরাধীন চীনকে তার পুরোপুরি স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে সাহায্য করা। শক্তিবর্গ গত মহাযুদ্ধে ওতপ্রোতভাবে লিপ্ত থাকায় জাপান মাঞ্চুরিয়ায় তার আধিপত্য বিস্তার করে এবং একুশটি দাবি ক'রে চীনের কাছ থেকে নানা রকম সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়। স্যান্টাঙের জার্ম্মান উপনিবেশও সে দখল করে। ১৯২১-২২ সনে ওয়াশিংটনে এইজন্য জাপানী সাম্রাজ্যবাদেরই বেশী সমালোচনা হয়। পরিশেষে, নব-শক্তি-চুক্তিতে চীনদেশে "খোলা দরজা"র ("open door"-এর) নীতি বিশেষভাবে বর্ণিত হয় এবং স্বাক্ষরকারী নয়টী শক্তি—বৃটিশ সাম্রাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স, ইটালী, চীন, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও পর্টুগাল—প্রতিশ্রুত হন যে, তাঁরা প্রান্তিক প্রাচীতে (Far East) শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করবেন, চীনের স্বার্থ ও দাবি মেনে নেবেন এবং চীন ও অন্যান্য শক্তির ভেতর সমভাবে মেলামেশার পথ স্থাপন করবেন।



'হুড' রণপোতে যুদ্ধনীতি শিক্ষা



ব্রিটিশ আকাশ-বাহিনীর জন্য নবনির্ম্মিত তিনটি রোলস্-রয়েস্ যন্ত্রবিশিষ্ট সামুদ্রিক বিমানপোত। সম্মুখভাগে গোলাবর্ষণ করিবার স্থান আছে

কিন্তু জাপান তার এই অঙ্গীকার রক্ষা করে নি। তার সাম্রাজ্য-লালসা তাকে যে-সকল অন্যায় কাজে প্রলুব্ধ করেছে সেই-গুলিই আজ প্রশান্ত মহাসাগরে এক প্রকাণ্ড সমস্যার সৃষ্টি করেছে! 'জাপানী বয়কট' প্রভৃতি আন্দোলনে চীনের অন্যায় আচরণ হয়েছে, এই অজুহাতে জাপান চীন আক্রমণ ক'রে তার মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ ও জেহোল দখল করে বসেছে। এর ফলে অন্যান্য শক্তির স্বার্থের হানি হয়েছে এবং সকলেই আপত্তি করেছে।

এর আগে অন্যান্য সকলেই সুবিধামত পরের দেশ অধিকার করেছে; জাপানও ১৯৩১ সনে মাঞ্চুরিয়ায় ঠিক তাই করেছে। বিদেশী শক্তিবর্গের মধ্যে আমেরিকাই জাপানের এই অন্যায় অধিকারের সবচেয়ে বেশী আপত্তি করেছে। এবং মার্কিন যে তার নৌ-বাহিনী বাড়াবার সঙ্কল্প করেছে তার মূলে যে প্রধান কারণ বর্ত্তমান তা এই—জাপানকে সে চীনে ও প্রশান্ত মহাসাগরে ইচ্ছানুসারে রাজ্যবিস্তার করতে দিতে চায় না। জাপানের মাঞ্চুরিয়া-অধিকারে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সের সেই পুরাতন সমস্যার (কি ভাবে জাপানের সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করা যায়) আবার উদয় হয়েছে। এই ব্যাপারে জাপান যে নব-শক্তি-চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্য আজ পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ছাড়া

জগতের অন্য কোনও রাষ্ট্র জাপানের প্রতিষ্ঠিত 'মাঞ্চুকুয়ো'কে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে নি।

ওয়াশিংটনের চতুঃশক্তি-প্রশান্তমহাসাগরিক-চুক্তি কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জাপান ও ফ্রান্স প্রশান্তমহাসাগরে পরস্পরের স্বার্থের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে চলবে স্থির হয়, এবং এই নূতন চুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ১৯০২ সন থেকে যে ইঙ্গ-জাপান মিত্রতা চলে আসছিল তা রদ করা হয়। আমেরিকা এই চুক্তির ফলে আগের চেয়ে নিরাপদ হয় বটে, কিন্তু বৃটেন এই নূতন ব্যবস্থায় প্রশান্তমহাসাগরে তার শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং বৈঠকের দু-বছর পরেই সিঙ্গাপুরে তার নৌবাহিনীর নূতন ঘাঁটি নির্ম্মাণ আরম্ভ করে। এই ঘাঁটি প্রধানতঃ ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়াকে রক্ষা করবার জন্য তৈরী হয়েছে। চীনদেশে জাপানের কার্য্যাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, বৃটেনের এই ভয় বা অবিশ্বাস অমূলক নয়। পক্ষান্তরে, জাপান কিন্তু এই নূতন ঘাঁটি রচনাকে সুনজরে দেখতে পারে নি। এই আয়োজন যে তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের সরঞ্জাম, একথা নিয়ে জাপানী সাংবাদিকেরা

কোন শক্তির না থাকে তাহলে যতই কেন না আপোষ বা চুক্তি হোক কোনটিতেই কোন ফল হবে না। সাংঘাইতে যখন বিনা দোষে হাজার হাজার চীনের জীবন জাপানী গোলা-বারুদে শেষ হল এবং তারপর যখন জাপান চীনরাষ্ট্রের দুর্ব্বলতার সুবিধা নিয়ে তার এক বিশাল ভূখণ্ড দখল করল তখন বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের চুক্তি, নব-শক্তি-সন্ধি ও কেলগ-ব্রিয়াঁ প্যাক্ট সকলই উবিয়ে গেল। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের লিটন্ কমিটির নির্দ্দেশ ও অন্যান্য রাষ্ট্রের চীনের পক্ষ সমর্থন তার পছন্দ না হওয়ায় সে এই সঙ্ঘ ত্যাগ করল।

যদি বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দ্দেশ বা কেলগ-ব্রিয়াঁ প্যাক্টেরই এই পরিণতি হয় তাহলে লণ্ডন নৌ-চুক্তিরই বা কতটুকু সার্থকতা থাকতে পারে ?

আরও মনে রাখতে হবে যে, যদি বা বড় বড় রণতরীর কামান ও টনেজ নির্দ্ধারিত ও সীমাবদ্ধ করা সম্ভবপর হয় তথাপি ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ভয়ঙ্করতা বা তার আশঙ্কা কিছুমাত্র কমবে না। কারণ যুদ্ধের উপকরণ শুধু এইগুলিই নয়। এরোপ্লেন ও বিষাক্ত গ্যাসের ক্ষমতা এদের চেয়ে অনেক বেশী। সাধারণ এরোপ্লেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধের উপযোগী করিয়া লওয়া যায়। বিষাক্ত গ্যাস



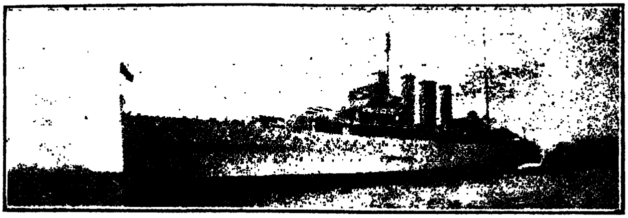
আধুনিক সামুদ্রিক বিমানপোত। ইহার বিস্তারিত পক্ষদ্বয় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

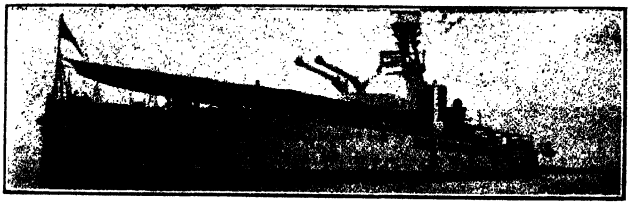
তাঁদের দেশে প্রভূত আন্দোলন করেছেন। বর্ত্তমানে জাপান ওয়াশিংটন ও লণ্ডন চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা ও বৃটেনের নৌবাহিনীর মাত্র তিনপঞ্চমাংশ রাখতে পারে। জাপানের নৌবিজ্ঞান-বিশারদগণ কয়েক বছর আগে বলেছিলেন তাঁদের দেশের শক্তি আর একটু বর্দ্ধিত করলেই তা বহিরাক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হবে। এখন কিন্তু জাপান দাবি করছে—বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে তার সমতা চাই! জাপানের এই নূতন দাবির অন্তর্নিহিত কারণ, জাপান মার্কিনকে যেমন এতদিন ভবিষ্যতের শত্রু ব'লে মনে করে এসেছে, বৃটেনকেও বর্ত্তমানে সেইরূপ একটি শত্রু মনে করে। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও জাপানের শক্তি ওয়াশিংটন চুক্তি মতে ৫:৫:৩ এই অনুপাতে ধার্য্য হয়েছে, মধ্যপ্রশান্তমহাসাগর কেন্দ্রে এদের শক্তি ৪:২:৩ অঙ্কে ফেলা যায়। অধিকন্তু জাপান আমেরিকা ও সিঙ্গাপুর থেকে প্রায় তিন হাজার মাইল দূরে এবং এতদূর থেকে তাকে আক্রমণ করা সহজ নয়। তা ছাড়া বৃটেন ও আমেরিকার স্বার্থ জগদ্ব্যাপী এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের বৃহত্তর নৌবাহিনী প্রয়োজন। অতএব ইহা নিশ্চয় বলা যেতে পারে যে, জাপানের দাবি মেনে নিতে বৃটেন কিংবা আমেরিকা কেহই রাজি হবে না।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, শান্তিরক্ষার সাধু ইচ্ছা যদি

মেয়েদের জন্য সুগন্ধি দ্রব্যাদি, মোটরের তেল অথবা রোগীদের জন্য ওষুধ তৈরীর কারখানায় প্রস্তুত ক'রে অনায়াসে লুকিয়ে রাখা যায়। তারপর এ কথাও ঠিক যে, সন্ধিসর্ত্তগুলি লঙ্ঘন না করেও প্রভূত অর্থব্যয়ে যে-রকম যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণ করা যায় তা এই প্রকার সন্ধির মূলে কুঠারাঘাত করে। জার্ম্মানীর পকেট রণতরীগুলি এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভার্সাইয়ে সন্ধির যুদ্ধসম্পর্কীয় ধারাগুলি কঠোরতর ক'রে মিত্রশক্তিবর্গের দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল যে, জার্ম্মানীর যুদ্ধ করবার ক্ষমতা একেবারে বিনষ্ট হল। কিন্তু ইদানীং জার্ম্মানী গবেষণা ও অর্থব্যয় ক'রে যে যুদ্ধসম্ভার রচনা করেছে তার ভয়ে জার্ম্মানীর প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি আজ উদ্বিগ্ন।

এইসব কারণে আগামী বছরের নৌ-সম্মেলনের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু আগামী বছরের নৌ-বৈঠক বসবে কি-না সেই বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে! জাপান যে তার নৌবহরে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সঙ্গে সমতার দাবি করেছে জগতের শান্তির ওপর তার ফলাফল উপেক্ষা করা যায় না। একথা মনে রাখা দরকার যে, একমাত্র জার্ম্মানীর অসম্মতিতে কিছুকাল আগে নিরস্ত্রীকরণ-সম্মেলন যে সমস্যায় পড়েছেন সে সমস্যার আজও সমাধান হয় নি।


সিঙ্গাপুর নৌ-বহরের ব্রিটিশ ক্রুজার 'কেণ্ট'


সিঙ্গাপুরের তীর প্রদেশ রক্ষাকল্পে নিয়োজিত ব্রিটিশ রণপোত—'টেরর'


সিঙ্গাপুরে বিমানপোতবাহী রণতরী 'ঈগল্'


সিঙ্গাপুর হইতে নৌঘাটিতে যাইবার পথ


সিঙ্গাপুরের ভিক্টোরিয়া উদ্যানের দৃশ্য


সিঙ্গাপুর বন্দরের দৃশ্য

জাপানের বর্ত্তমান দাবির পেছনে কঠোর দৃঢ়তা রহিয়াছে। নৌবহর-সমস্যা জাপানের জাতীয় সমস্যা। দু-বছর আগে প্রধান মন্ত্রী ইনুকায়ী যে আততায়ীর হস্তে নিহত হন তার উদ্দেশ্য ছিল এই কার্য্যদ্বারা জাপানের নৌ-শক্তি ও সামরিক শক্তির স্বল্পতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। গত জুলাই মাসে জাপানের একটি সুবৃহৎ নৌবাহিনী গঠনের পক্ষপাতী নৌবহরের ষাট জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাঁদের সম্রাটের কাছে নৌবহরসম্পর্কিত সন্ধিগুলি ছিঁড়ে ফেলবার ও আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সমান নৌ-শক্তি দাবি করবার জন্য যে লিপি পেশ করেন তারই ফলে য়্যাড্‌মিরাল ভাইকাউণ্ট সাইটোর মন্ত্রিমণ্ডলের পতন হয়। বর্ত্তমানমন্ত্রিমণ্ডলের প্রধান কাজ সেই দাবি কার্য্যে পরিণত করা। অতএব জাপান যে সর্ব্বপ্রকার আপোষের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করবে, তা আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যে অর্থবলের দ্বারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৌ-বাহিনী রচনা করতে সক্ষম সেই অর্থবলের কাছে একে হার স্বীকার করতে হবে।

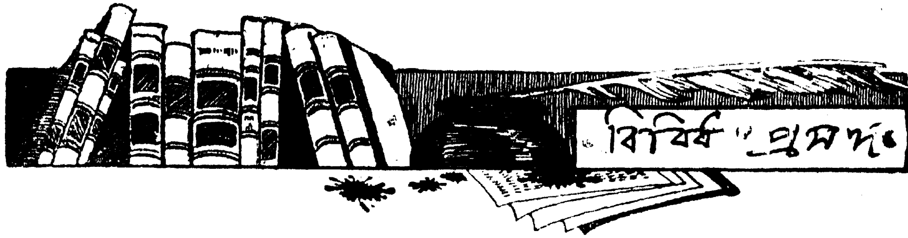
শ্রীকরুণা মিত্র

শ্যামরাজ্যের সমস্যা—



শ্যামরাজ্যের রাজা প্রজাধিপক ও রাজ্ঞী রমাবাঈ

আমরা গতমাসে শ্যামরাজ্যের কথা আলোচনা করিয়াছি। শ্যামরাজ্যের রাজা প্রজাধিপক বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে অবস্থান করিতে-ছেন। স্বরাজ্যে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কয়েকজন প্রতিনিধি তথায় গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, প্রতিনিধিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও কিছু স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই।



ডোমীনিয়নত্বের অভিমুখে, না উল্টা দিকে ?

ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতবর্ষের সম্রাট কালক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্য ডোমীনিয়নগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের স্থানপ্রাপ্তির আশা দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড আরুইন ও লর্ড উইলিংডন এবং প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাকডোন্যাল্ডও এইরূপ আশা দিয়াছিলেন। আরও যে যে রাজপুরুষ এই রকম লোভ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের উল্লেখ অনাবশ্যক। যাঁহারা আশা দিয়াছিলেন, তাঁহারা দায়িত্ববিহীন লোক নহেন, অনধিকারচর্চ্চা করেন নাই। তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিবার অধিকার তাঁহাদের ছিল। তাঁহারা কেবল যে ভারতবর্ষের প্রতি দয়া করিয়া এরূপ কথা বলিয়াছিলেন তাহা নহে, ব্রিটেনেরও কল্যাণ-উদ্দেশ্যে ইহা বলিয়াছিলেন। এই জন্য ভারতবর্ষের অনেক লোক ভাবিয়াছিলেন, (আমরা তাঁহাদের মধ্যে কখনও ছিলাম না), শীঘ্র না-হউক বিলম্বেও ভারতবর্ষের ডোমীনিয়নত্ব লাভ ঘটিবে—এক লাফে না-হউক, ভারতবর্ষ ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে উচ্চতর রাজনৈতিক মর্য্যাদা লাভ করিবে। সুতরাং তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, এবার জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটি ভারতবর্ষের জন্য যে শাসন-পদ্ধতির প্রস্তাব করিবেন, তাহা খুব কম পরিমাণে হইলেও ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়নত্বের দিকে কিছু অগ্রসর করিয়া দিবে—কিছু চূড়ান্ত ক্ষমতা ভারতবর্ষকে দিবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ঐ কমিটির রিপোর্টে যাহা প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়নত্বের বিপরীত দিকে লইয়া যাইবে। হোয়াইট পেপার ডোমীনিয়নত্বের বিপরীত দিকে ভারতকে যতটা লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, উক্ত কমিটির রিপোর্ট তার চেয়ে আরও অনেকটা বেশী উল্টা দিকে লইয়া যাইতে চায়।

ইহাতে আমরা বিস্মিত, নিরাশ বা দুঃখিত হই নাই। কিন্তু এ-কথাটা নিশ্চয়ই আমাদের মনে হইয়াছে, পার্লেমেণ্টের বড় বড় সভ্য (তাদের মধ্যে ভারতবর্ষের বড়লাট মেজলাট ছোটলাট কয়েক জনও আছেন) লইয়া গঠিত কমিটি নিজেদের দেশের রাজার কথার, প্রধান মন্ত্রীর কথার, রাজপ্রতিনিধিদের কথার মান কেমন রাখিয়াছেন! রাজা বলিলেন, ভারতবর্ষ কালক্রমে ডোমীনিয়ন হইবে; ঐ কমিটি ডোমীনিয়ন কথাটি পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রকাণ্ড রিপোর্টে কোথাও একবার ব্যবহার করিলেন না এবং প্রস্তাবগুলি এমন করিয়াছেন যাহা ডোমীনিয়নত্বের ঠিক্ উল্টা!

এখন ভারতবর্ষের বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটেরা এবং সিবিলিয়ান ও পুলিস যেরূপ ক্ষমতাশালী, হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবাবলীতে তাঁহাদিগকে তার চেয়েও নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী করিতে চাহিয়াছিল। জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট তাঁহাদিগকে আরও বেশী ক্ষমতা দিতে বলিয়াছে এবং ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে ও মন্ত্রীদিগকে চূড়ান্ত ক্ষমতা সামান্য কোন বিষয়েও দিতে বলে নাই।

—

ভারতবর্ষের ঐক্য উৎপাদন ও বিনাশ

ভারতবর্ষ কি কি কারণে পরপদানত হইয়াছে, দুই-এক কথায় তাহা বলা যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষে অনেক রকম অনৈক্য থাকা যে একটা কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে প্রদেশভেদ, ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ, ভাষাভেদ প্রভৃতি আছে। তাহার উপর আঠার রকম নির্ব্বাচক-মণ্ডলীতে দেশের লোককে ভাগ করিয়া হোয়াইট পেপারের অঙ্গীভূত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ছাড়াছাড়ির ভেদবুদ্ধির আর একটা প্রবল কারণ জুটাইয়াছে।

জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্টে আছে—"We have spoken of unity as perhaps the greatest gift which British rule has conferred

on India." "আমরা বলিয়াছি, যে, বোধ হয় একত্ব ব্রিটিশ শাসনের ভারতবর্ষকে প্রদত্ত সকলের চেয়ে বড় দান।" তাহার পর কমিটি বলিতেছেন, "but, in transferring so many of the powers of government to the provinces, and in encouraging them to develop a vigorous and independent life of their own, we have been running the inevitable risk of weakening or even destroying that unity." "কিন্তু গবর্ন্মেণ্টের এতগুলি ক্ষমতা প্রদেশগুলিকে হস্তান্তর করিয়া এবং তাহাদের এক-একটা সতেজ ও স্বাধীন জীবন বিকাশ করিতে তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়া আমরা [পূর্ব্বোক্ত] একত্বকে ক্ষীণ করিবার অথবা এমন কি তাহাকে বিনষ্ট করিবার বিপদের মধ্যে যাইতেছি।"

এই কথাগুলি বিশেষ চিন্তার বিষয়।

ভারতীয় অনেক রাজনৈতিক নেতা প্রভিন্স্যাল অটনমি বা প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের নামে যেন দিশাহারা হইয়া পড়েন। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না, যে, অতীত কালে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল বা ভূভাগ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ছিল বলিয়াই, আক্রমণকারীদের পক্ষে ভারতবর্ষ জয় করা সহজ হইয়াছিল। বহুপূর্ব্বেই অনেক ইংরেজ বুঝিয়াছিল, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের পার্থক্য রক্ষা করা এবং তাহাদের আন্দোলনের কারণীভূত কোন অভিযোগ এক হইতে না-দেওয়া আবশ্যক। ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ লোকদের উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য পার্লেমেণ্টের যে কমিটি নিযুক্ত হয় তাহার সমক্ষে ১৩ই জুলাই মেজর উইন্‌গেট সাক্ষ্য দেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও তাহার উত্তর কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহাতে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝা যাইবে। মেজর উইন্‌গেটকে জিজ্ঞাসা করা হইল :—"You speak of the dangers that arise from a central government and you say that it leads to a community of aims and feelings that might be dangerous?" "আপনি কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট হইতে যে-সব বিপদের উৎপত্তি হয় তাহার কথা বলিতেছেন? এবং আপনি বলিতেছেন, যে, তাহা হইতে প্রজাদের মধ্যে যে উদ্দেশ্য ও ভাবের সাধারণত্ব বা একত্ব জন্মে তাহা বিপজ্জনক হইতে পারে?"

মেজর উইন্‌গেট উত্তর করিলেন, "Yes. I think that if there be any one subject in which the whole population of India would be interested, that is more likely to be dangerous to the foreign authority, than if a question were simply agitated in one division of the empire; if a question were agitated throughout the length and breadth of the empire, it would surely be much more dangerous to the foreign authority than a question which interested one Presidency only." "হাঁ। আমি মনে করি, যদি একটা কোন বিষয়ে ভারতবর্ষের সব লোকের লাভালাভ মঙ্গলামঙ্গল সুবিধাঅসুবিধা জড়িত থাকে, তাহা হইলে তাহা বিদেশী [ব্রিটিশ] কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে যত বেশী বিপজ্জনক হইবার সম্ভাবনা, একটা প্রশ্ন ভারত-সাম্রাজ্যের একটা কোন অংশে আন্দোলিত হইলে তত বিপজ্জনক হইবে না; একটা প্রশ্নে যদি কেবল একটা প্রেসিডেন্সীর লোকদের স্বার্থ জড়িত বা মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা তত বিপজ্জনক হইবে না, যত বিপজ্জনক উহা বিদেশী [ব্রিটিশ] কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে নিশ্চয়ই হইবে যদি বিষয়টা লইয়া দেশের সর্ব্বত্র আন্দোলন হয়।"

এই প্রশ্নোত্তরের পর ১৮৫৮ সালের ঐ পার্লেমেণ্টারী কমিটির অন্যতম সভ্য মিঃ ড্যানবী সীমুর মেজর উইন্‌গেটকে প্রশ্ন করিলেন, "Is what you mean this, that all the people of India might be excited about the same thing at the same time?" "আপনি যাহা বলিতেছেন তাহার মানে কি এই, যে, ভারতবর্ষের সমস্ত লোক একই বিষয় সম্বন্ধে একই সময়ে উত্তেজিত হইতে পারে?" তাহার উত্তরে মেজর উইন্‌গেট বলিলেন, "হাঁ।"

প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব হইলে অধিকাংশ বিষয়ে আইন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রকমে হইবে।

তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের জীবনের গতি ও আদর্শ, দুঃখ অভিযোগ, আন্দোলন আলাদা আলাদা রকমের হইবে। সুতরাং একটা কোন বিষয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের লোকেরা উত্তেজিত হইয়া একসঙ্গে আন্দোলন করিলে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে যতটা উদ্বিগ্ন বা বিপন্ন হইতে হয়, তাহা হইতে হইবে না। তা ছাড়া, প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব হইলে যে-যে প্রদেশের যে-যে বিষয়ে গবর্মেণ্টের প্রতি অসন্তোষ নাই, তাহারা সেই-সেই বিষয়ে অসন্তুষ্ট অন্য প্রদেশগুলির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে না। তাহার প্রমাণ এখনই পাওয়া যাইতেছে। এখন প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তথাপি, বাংলা দেশের জন্য যে-যে রকম কড়া আইন হইয়াছে, অন্যান্য প্রদেশের জন্য তাহা হয় নাই। সেই জন্য, অন্য কোন প্রদেশের নেতারা এবং তথাকথিত সমগ্রভারতীয় নেতারা বঙ্গের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন নহেন—যদিও প্রত্যেক প্রদেশের লোকদেরই বঙ্গের দুঃখে দুঃখী হওয়া উচিত, কারণ প্রত্যেক প্রদেশের লোক বাংলা হইতে যত ধন উপার্জ্জন করেন, বাঙালীরা কোন প্রদেশ হইতেই তত টাকা রোজগার করে না।

জয়েণ্ট পার্লে‌মেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট হইতে আমরা এই নিবন্ধিকাটির গোড়ায় যে কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টই ইহা বুঝা যায়, যে, ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষের একত্ব সম্পাদন করিয়াছেন বা করিতেছিলেন ইহা তাঁহারা জানেন, এবং ইহাও তাঁহারা জানেন, যে, প্রদেশগুলির শাসনব্যবস্থার প্রস্তাব তাঁহারা এ প্রকার করিতেছেন যাহাতে ভারতীয় ঐ ঐক্য অতি ক্ষীণ, এমন কি বিনষ্টও হইতে পারে।

এই কুফল নিবারণ করিতে হইলে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় অর্থাৎ সমগ্রভারতীয় গবর্মেণ্টকে এমন করা চাই, যাহাতে প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্বের দরুন যাহারা স্ব-স্ব পথে পরস্পর হইতে দূরে যাইতে পারে তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ রাখা যায়। জড় জগৎ বিনাশ হইতে রক্ষা পাইয়া আসিতেছে এবং সক্রিয় আছে দুটি বিপরীত শক্তির প্রভাবে। একটি কেন্দ্র-বিমুখ বল (Centrifugal force), অন্যটি কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি (Centripetal force)। ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্বে প্রথম শক্তিটি কার্য্য করিবে। প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্বের প্রভাবে প্রদেশগুলি পরস্পর হইতে দূরে যাইবে ও সম্পর্কশূন্য হইবে। যদি ভারতবর্ষের এই সমুদয় অংশকে লইয়া একটি ফেডারেশ্যন বা রাষ্ট্রসংঘ স্থাপিত হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি কার্য্য করিবে এবং যাহারা পরস্পর হইতে দূরে যাইতেছিল, তাহাদিগকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ও পরস্পরের সহিত মিলিত করিয়া রাখিবে। কিন্তু জয়েণ্ট পার্লে‌মেণ্টারী কমিটির রিপোর্টের প্রস্তাবে প্রদেশ-গুলিকে অবিলম্বে আলাদা করিয়া দিবার তাগিদ আছে, ফেডারেশ্যন কখন হইবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই—কখনও না-ও হইতে পারে। অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের বলেই হউক, বা অন্য যে-যে কারণেই হউক, ভারতবর্ষের যে একত্ব আগে হইতেই ছিল, বা ইংরেজ রাজত্বে জন্মিয়াছিল, বা জন্মিতেছিল, কমিটি তাহা জানিয়া শুনিয়া কমাইবার, এমন কি বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু যাহা করিলে ঐ একত্ব ক্ষীণ বা বিনষ্ট হইত না, সেই ফেডারেশ্যন জিনিষটিকে প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিবার ও অবশ্যম্ভাবী করিবার প্রস্তাব ও ব্যবস্থা তাঁহারা করেন নাই।

কমিটির প্রস্তাবিত প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্বের স্বরূপ

সকল প্রদেশকে লইয়া একটি ফেডারেশ্যন বা রাষ্ট্রসংঘ গঠিত না হইলে যে শুধু প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্বের দ্বারা ভারতবর্ষের মহা অনিষ্ট হইবে, তাহা আগে লিখিয়াছি। সে কথা ছাড়িয়া দিয়া, জয়েণ্ট পার্লে‌মেণ্টারী কমিটি যে-প্রকার প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে, তাহাতে প্রাদেশিক গবর্ণরদের এবং তাঁহার অধীনস্থ সিবিলিয়ানদের ও পুলিসের আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে বটে, কিন্তু প্রদেশের, প্রাদেশিক জনগণের, ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের প্রতিনিধিদের কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকিবে না। নানা সেফ্‌গার্ড বা "রক্ষাকবচ" দ্বারা এবং গবর্ণরের বহুবিধ বিশেষ দায়িত্ব দ্বারা তাঁহাকে প্রভূত নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী করা হইয়াছে। তাহার উপর তিনি ইচ্ছা করিলেই অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারিবেন,

ব্যবস্থাপক সভার সহযোগ ব্যতিরেকে, এমন কি আপত্তি সত্ত্বেও, "গবর্ণরের আইন" নামক নানা স্থায়ী আইন বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন, ব্যবস্থাপক সভায় পাস-করা আইন নামঞ্জুর করিতে পারিবেন, যে-কোন বিভাগের কোন মন্ত্রীর বা সকল বিভাগের সব মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত বিষয় সকলের ভার নিজে লইতে পারিবেন, এবং মূল শাসনবিধি (constitution) একেবারে রদ করিয়া যত দিন আবশ্যক মনে করিবেন নিজ ইচ্ছা অনুসারে দেশ শাসন করিতে পারিবেন। সিবিলিয়ানদের ও পুলিস সাহেবদের নিয়োগ, বেতন, পেন্সান, পদের উন্নতি অবনতি প্রভৃতি সম্বন্ধে মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। মন্ত্রীরা গবর্ণরকে রাজী না করিয়া পুলিস আইন কানুনের (Police Acts ও Regulationsএর) কোন প্রকার রদ বদল বা তাহার প্রস্তাব করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান দ্বৈরাজ্য বা ডায়ার্কি বিলুপ্ত হইবে বলা হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহা কেবল মাত্র নামে। এখন রিজার্ভ্ড্ ("সংরক্ষিত") বিষয়গুলিতে মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতা নাই, ট্রান্সফার্ড বা হস্তান্তরিত বিষয়গুলিতে আছে, এইরূপ বলা হয়; কমিটির প্রস্তাব অনুসারে সকল বিষয়েই মন্ত্রীদের হাত থাকিবে বলা হইয়াছে; কিন্তু আমরা উপরে বলিয়াছি, বস্তুতঃ কোন বিষয়েই মন্ত্রীদের চূড়ান্ত কোন ক্ষমতা থাকিবে না। এখন প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে সংরক্ষিত বিষয়গুলির জন্য যথেষ্ট টাকা আগে রাখিয়া লইয়া বাকী অযথেষ্ট টাকা মন্ত্রীদের হাতে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের জন্য রাখেন। কমিটির প্রস্তাবিত ব্যবস্থাতেও অন্য নাম দিয়া ঠিক্ এই প্রকার বরাদ্দ হইবে—গবর্ণর তাঁহার "বিশেষ দায়িত্ব"-সমূহ অনুযায়ী কাজ করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট টাকা প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে লইবেন, তাহাতে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার মত থাক্ বা না-থাক্।

জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির সভ্যেরা তাঁহাদের রিপোর্টে এইপ্রকার 'বোকা বুঝাইবার' চেষ্টা করিয়াছেন, যে, গবর্ণরদিগকে যে-সব ক্ষমতা ও বিশেষ দায়িত্ব দিয়া স্বৈরাচারী শাসনকর্ত্তা করা হইয়াছে, সেইরূপ ক্ষমতা প্রভৃতি ইংলণ্ডে রাজার আছে, আমেরিকার নির্ব্বাচিত দেশপতির (প্রেসিডেণ্টের) আছে, ইত্যাদি। ভারতবর্ষের এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজওয়ালারাও এইরূপ বলিতেছে। ঠিক কি কি ক্ষমতা আদি তাঁহাদের আছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনার স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই। মানিয়া লওয়া যাক্, যে, ইংলণ্ডের রাজার এবং আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের ঐরূপ সব ক্ষমতা আছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, তাঁহারা তাঁহাদের দেশের লোকদের সম্মতি ক্রমে ঐ সকল ক্ষমতা ভোগ করেন, অন্য দিকে আমাদের বিদেশী গবর্ণরদিগকে যে-সব ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষের লোকদের সম্মতি নাই; ইংলণ্ড ও আমেরিকার কল্যাণের জন্য ঐ সব ক্ষমতা তথাকার স্বদেশী রাজা ও প্রেসিডেণ্ট ভোগ করেন, কিন্তু আমাদের বিদেশী গবর্ণরদিগকে যে-সব ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে, তাহা ইংলণ্ডের প্রভুত্ব ও স্বার্থ রক্ষার জন্য, ভারতের কল্যাণের জন্য তৎসমুদয়ের প্রয়োজন নাই; ইংলণ্ডের রাজা বহুকাল ঐ সব ক্ষমতার ব্যবহার করেন নাই, করিলে ইংলণ্ড সাধারণতন্ত্র হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে সঙ্কট অবস্থায় কচিৎ ব্যবহার্য্য বলিয়া শাসকদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়, তৎসমুদয়ের ব্যবহার সাধারণত প্রায়ই হয় এবং যে গবর্ণর বা গবর্ণর-জেনার্যাল তাহা করেন তিনি অপসারিত হন না বা তজ্জন্য ভারতবর্ষের সাধারণতন্ত্র হইয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই; আমেরিকার কোন প্রেসিডেণ্ট ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া জবরদস্ত হইলে তাঁহার পুনর্নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা থাকে না, অন্য দিকে ভারতবর্ষের জবরদস্ত গবর্ণর ও গবর্ণর-জেনার্যালদের খ্যাতি তাঁহাদের স্বদেশে খুব বাড়ে, এবং আমাদের সমালোচনায় তাঁহাদের কিছুই আসে যায় না।

পাটের চাষ কমাইবার চেষ্টা

পাট বাংলা দেশের প্রধান বাণিজ্যিক ফসল। ইহা চাষীরা সামান্যই নিজেদের কাজে লাগায়, প্রায় সমস্তই বিক্রী করে। যে বৎসর চাহিদা যেরূপ হয়, তার চেয়ে বেশী পাট উৎপন্ন হইয়া থাকিলে, চাষীরা ভাল রকম দাম পায় না। এই যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া মোটামুটি মনে করা হইয়া থাকে, যে, যদি পাটের চাষ কমাইয়া উৎপন্ন ফসল কমাইতে পারা যায়, তাহা হইলে চাষীরা তাহাদের

াল চড়া দরে বিক্রী করিতে পারিবে। কিন্তু অন্য দিকে ইহা বলিতে পারা যায়, যে, চাহিদা যত হইবে মনে করা যায় উৎপন্ন ফসল তার চেয়ে খুব কম হইলে চাষীরা দর চড়া পাইতে পারে বটে, কিন্তু যথেষ্ট মাল তাহারা দিতে না-পারায়, যথেষ্ট দিতে পারিলে তাহারা পাট বিক্রী করিয়া মোট যত টাকা পাইতে পারিত তত পাইবে না। এই জন্য চাহিদা যত হইবে তদনুযায়ী মাল তাহারা যদি উৎপন্ন করিতে পারে এবং নিজেদের নির্দ্দিষ্ট লাভজনক দরে তাহা বিক্রী করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহাদের সুবিধা হয়। সুতরাং কোন্ বৎসর চাহিদা কত হইবে, তাহা স্থির করা একান্ত আবশ্যক। চাহিদা স্থির করিতে হইলে কাঁচা মাল এদেশে কত মজুদ আছে ও ভারতবর্ষের বাহিরে কোথায় কত মজুদ আছে এবং ভারতবর্ষের পাটকলগুলি ও বাহিরের পাটকলসমূহ কত কাঁচামাল ব্যবহার করিবে, জানা আবশ্যক। নিরপেক্ষভাবে এবং যথাসম্ভব নির্ভুল ভাবে এই সকল সংখ্যা সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে কি না জানি না।

পাটের চাষ ও ব্যবসা সম্বন্ধে আমাদের কোন ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি, যে, পাট কোন বৎসর কম উৎপন্ন হইলেই যে দর বাড়ে বা বেশী উৎপন্ন হইলেই যে তাহা কমে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নীচে কতকগুলি সংখ্যা দিতেছি। কোন্ বৎসর কত হাজার একর জমীতে পাটের চাষ হইয়াছিল, ৪০০ পৌণ্ডের এক এক গাঁটের কত হাজার গাঁট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল এবং কলিকাতায় এক এক গাঁটের দাম কত টাকা হইয়াছিল, তাহা নীচের তালিকায় লিখিত হইল।

বৎসর।	হাজার একর।	হাজার গাঁট।	গাঁটের দাম।
১৯২২	১৮০০	৫৪০৮	৮৭৸/৫
১৯২৩	২৭৮৮	৮৪০১	৬৮৷/১০
১৯২৪	২৭৭০	৮০৬২	৭৫৸/৫
১৯২৫	৩১১৫	৮৯৪০	১১৯৷৷/৯
১৯২৬	৩৮৪৭	১২১২৩	৯৮৷৷৶৬
১৯২৭	৩৩৭৪	১০১৮৮	৭৬৷৵৬
১৯২৮	৩ ৪৪	৯৯০৬	৭৫৲১১
১৯২৯	৩৪১৫	১০৩৩৫	৭১৷০
১৯৩০	৩৪৯২	১১২০৫	৫০৷৯
১৯৩১	১৮৫৯	৫৫৩৫	৩৭৷৷৶১০

পাটের কল আগে কেবল ভারতবর্ষে (কলিকাতার আশেপাশে) এবং বিলাতের ডাণ্ডী শহরে ছিল। এখন জাপানে এবং মধ্য-ইউরোপ ও দক্ষিণপূর্ব্ব-ইউরোপেও অনেক হইয়াছে। তাহাদের যন্ত্রপাতি এদেশের কলগুলার যন্ত্রপাতির চেয়ে আধুনিক ও উৎকৃষ্ট। সেই জন্য তাহারা এখানকার চেয়ে কম ব্যয়ে চট ও থলি প্রস্তুত করিতে ও কম দামে বিক্রী করিতে পারে। এই বিদেশী অব্রিটিশ চটকলওয়ালারা যাহাতে পাটের কাঁচা মাল না-পায়, সেই উদ্দেশ্যে এখানকার চটকলওয়ালারা ও ডাণ্ডীর চটকলওয়ালারা একযোগে চায়, যে, যাহাতে তাহাদের নিজেদের দরকারের চেয়ে বেশী পাট ভারতবর্ষে না-জন্মে। ভারতের প্রায় সব চটকলওয়ালা এবং ডাণ্ডীর চটকলওয়ালারা এক জাতি—ব্রিটিশ। জাপান এবং মধ্য ও দক্ষিণপূর্ব্ব ইউরোপের চটকলওয়ালাদিগকে জব্দ করিবার জন্য ভারতের ও ডাণ্ডীর এই ব্রিটিশ চটকলওয়ালারা গবর্ন্মেণ্টকে আর একটা উপায় অবলম্বন করাইতে চায়। বিলাতী ফিনান্স্যাল টাইম্‌স্ এই বৎসর জুলাই মাসে লিখিয়াছিল :—

"Dundee traders have an important scheme, for which they are seeking Calcutta's co-operation, believing that, in the face of foreign competition, the producers of both centres should combine in persuading the British and the Indian Governments to impose an additional export duty on raw jute from India in parts not within the British Empire.

"As jute is produced within the Empire, it is contended that Empire manufacturers should have preference over foreign competitors. The unsatisfactory condition of trade both in Dundee and Calcutta has influenced manufacturers in these centres towards co-operation.

তাৎপর্য্য। ডাণ্ডীর পাট ব্যবসায়ীদের একটা বড় রকমের ফন্দী আছে, যাতে তারা কলিকাতার ব্যবসাদারদের সহযোগিতা চায়। ডাণ্ডীওয়ালাদের বিশ্বাস, যে, যখন কলিকাতার ও ডাণ্ডীর ব্যবসাদারদিগকে বিদেশীদের (অর্থাৎ জাপানী ও অব্রিটিশ ইউরোপীয়দের) প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তখন উভয় কেন্দ্রের ব্রিটিশ চট-উৎপাদকদের উচিত ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ও ভারত-গবন্মেণ্টকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে রপ্তানী পাটের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসাইতে প্রবৃত্ত করা।

যেহেতু পাটের চাষ কেবল সাম্রাজ্যের মধ্যে হয়, সেই জন্য এই তর্ক করা হয়, যে, সাম্রাজ্যের চট-উৎপাদকদের সাম্রাজ্যের বাহিরের চট-উৎপাদকদের চেয়ে অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া উচিত। ডাণ্ডী ও কলিকাতা উভয়ত্র ব্যবসায় অসন্তোষকর অবস্থা উভয় কেন্দ্রের কল-ওয়ালাদিগকে পরস্পরের সহযোগিতা করিতে প্রভাবিত করিয়াছে।

গত ২৯শে এপ্রিলের ষ্টেট্‌স্‌ম্যানেও পাট সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ এই বলিয়া শেষ করা হইয়াছে,

"...in practice the manufaturer is often not averse to a situation the immediate result of which is that he gets his raw material cheap. In so far, therefore, as he does nothing to promote a crop restriction scheme, he may be said to be the aider and abetter of his foreign competitor, who fights him with all his looms and not with a percentage only."

তাৎপর্য্য। অনিয়ন্ত্রিত পাটচাষজনিত যে অবস্থায় বঙ্গের চটকল-ওয়ালারা সস্তায় তাহাদের কাঁচা মাল পায়, তাহার প্রতি কার্য্যতঃ তাহারা বিরূপ নহে। [কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত ভাবে পাটচাষ হইলে ভারতবর্ষের ও বিলাতের বাহিরের অব্রিটিশ চটকলওয়ালারাও সস্তায় কাঁচা মাল পায়, এবং তাহাদের যন্ত্রপাতি আধুনিক ও উৎকৃষ্ট হওয়ায় তাহারা চট অপেক্ষাকৃত সস্তায় উৎপাদন করিতে ও বেচিতে পারে।] অতএব, বঙ্গের চটকলওয়ালারা পাট-নিয়ন্ত্রণপদ্ধতির প্রবর্ত্তন ও বিস্তৃতির জন্য কিছু না-করিলে অব্রিটিশ বিদেশী চটকলওয়ালাদের সাহায্যকারীই হয়। এই বিদেশী চটকলওয়ালারা ভারতের ও ডাণ্ডীর ব্রিটিশ চটকলওয়ালাদের সহিত প্রতিযোগিতা করে তাহাদের সমুদয় তাঁতের দ্বারা—শতকরা কেবল কয়েকটি দ্বারা নহে। [বঙ্গের ব্রিটিশ চটকলওয়ালারা নিজেদের চটের দাম বাড়াইবার জন্য সব তাঁত না চালাইয়া কিছু চালায় ও উৎপন্ন চটের পরিমাণ কমাইয়া তাহার দাম বাড়াইবার চেষ্টা করে।]

পাটের চাষ কমাইয়া কাঁচা মাল কম উৎপাদন করিলে পাটের দর বাড়িতে পারে না, আমরা এরূপ মনে করি না। কিন্তু ইহাও মনে করি না, যে, কাঁচা মাল কম উৎপন্ন হইলেই তাহার দর চড়িবে, বা বেশী উৎপন্ন হইলেই দর নামিবে। পাটচাষী ও চটকলওয়ালাদের মধ্যবর্ত্তী ব্যাপারীরা ও স্পেকুলেটাররা নিজেদের সুবিধার জন্য কৌশল অবলম্বন করিয়া পাটের দর কম করিতে ও রাখিতে পারে। তদ্ভিন্ন, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান ও বিলাতী ফিনান্স্যাল টাইম্‌সে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা পড়িয়া এরূপ ধারণা জন্মে না, যে, কেবল পাটচাষীদেরই হিতের জন্য পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হইতেছে। ভারতীয় ও অভারতীয় ব্রিটিশ চটকলওয়ালারা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার সহায়। তাহাদের প্রাণ পাটচাষীদের জন্য বরাবর কাঁদিয়াছে বলিয়া সমসাময়িক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।

পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিস্তারিত মন্তব্য ডিসেম্বরের মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় আছে।

—

পাটের বদলে অন্য ফসল

পাটের চাষ না করিয়া পাটের কতক জমিতে অন্য ফসল উৎপাদনের জন্য সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। কৃষি সম্বন্ধে আমাদের পুঁথিগত বা কার্য্যজাত জ্ঞান না-থাকায় এই সব পরামর্শ সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত কোন মত প্রকাশ করিতেছি না। তবে, যে-রকম জমিতে চীনে বাদাম হইতে দেখিয়াছি, পাটের জমি সেইরূপ কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে। পাটের জন্য যে জমি ভাল, তামাকের জন্যও কি তাহা সমান ভাল? পাটের বদলে রবিশস্যের ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু শুনিয়াছি, পাট উৎপাদন ও কর্ত্তন করিয়া, তাহার পরও সেই জমিতে অনেক চাষী রবিশস্য দেয়; অর্থাৎ একই জমিতে একই বৎসর পাট ও রবিশস্য পরে পরে উৎপাদিত হয়। ইহা ঠিক্ হইলে, যেখানে দুটা ফসল হইত সেখানে কেবল একটা ফসল উৎপাদন করিবার পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। অন্য যে-সব ফসল পাটের পরিবর্ত্তে আর্জ্জাইবার উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহা উৎপাদন করিয়া কিরূপ লাভ হইবে, তাহাও বিবেচ্য।

—

সুভাষচন্দ্র বসুর স্বদেশ আগমন

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর পিতা অত্যন্ত পীড়িত থাকায় তাঁহার মাতা তাঁহাকে বাড়ি আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করেন এবং গবর্ন্মেণ্টকে অনুরোধ করেন, যে, তাঁহাকে যেন আসিতে দেওয়া হয়। খবরের কাগজে এইরূপ সংবাদ বাহির হয়, যে, গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে আসিবার অনুমতি দেন নাই। সুভাষচন্দ্র নিজেও বহুবৎসর কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছেন এবং অস্ত্রোপচারের জন্য ভিয়েনায় বাস করিতেছিলেন। এরূপ ব্যক্তিকে কেবল পিতাকে দেখিতে আসিবার অনুমতি না-দিবার অতি-প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে আমরা অসমর্থ—বিশেষতঃ যখন দেখিতেছি কর্ত্তৃপক্ষীয় উচ্চতম ব্যক্তিদের দ্বারা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কৌন্সিলের সদস্য ছিলেন। আগ্রা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পর তিনি ১৯২৭ হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত দুই বার আগ্রার ফ্যাকাল্টি অব্ আর্টসের ডীন নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩১ সালে এডিনবরায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়-সকলের যে কংগ্রেস হয় তিনি আগ্রা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। রাজপুতানা ও মধ্যভারতের উচ্চ বিদ্যালয় ও ইণ্টারমীডিয়েট শিক্ষা-বোর্ডের তিনি ১৯৩২ সাল হইতে সভাপতি আছেন। ইন্দোরে হোলকার সিবিল সার্ভিস্ পরীক্ষা বোর্ডের সভাপতিত্বও তিনি ১৯৩২ সাল হইতে করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান বৎসরে তিনি আগ্রা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার বয়স ৪৪ বৎসর। ইংরেজীতে তিনি "Indo-Aryan Polity," "Economic Development of India," "Principles of Economics," ও "Economic Condition of the Middle Class People in Calcutta" লিখিয়াছেন। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক নাট্যকার মোলিয়ার প্রণীত একখানি নাটক অবলম্বন করিয়া তিনি বাংলায় "কৃপণ" নামক একখানি নাটক লিখিয়াছেন ও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা প্রশংসিত হইয়াছে।

ডক্টর বসু কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনে "বৃহত্তর বঙ্গ" শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।



শ্রীযুক্ত স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি।

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে আমরা কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনের কতকগুলি সংবাদ দিয়াছি। এই অধিবেশন সম্বন্ধে যে-কোন সংবাদ জানিতে হইলে ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়কে ৪৪।১, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় চিঠি লিখিতে হইবে।

যাঁহারা প্রতিনিধি হইয়া আসিবেন তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রবেশিকা পাঁচ টাকা করিয়া লাগিবে, প্রবাসী ছাত্র প্রতিনিধিদের তিন টাকা। প্রবাসী মহিলা প্রতিনিধিদিগকে কোন প্রকার চাঁদা দিতে হইবে না। অভ্যর্থনা-সমিতি সমুদয় প্রতিনিধির বাসস্থান ও আহারের বন্দোবস্ত করিবেন। ২৬শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর এই পাঁচ দিনের ব্যবস্থা করা হইবে। কে কবে কোন্ ট্রেনে আসিবেন, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন। প্রতিনিধিরা দয়া করিয়া বিছানা লেপ কম্বল ও মশারি আনিবেন।

বঙ্গদেশের সাহিত্যিকদিগের দুই টাকা প্রবেশিকা ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যবৃন্দের অন্যূন পাঁচ টাকা চাঁদা দিবার নিয়ম করা হইয়াছে।

দর্শকদিগকে প্রথম দিনের জন্য এক টাকা প্রবেশিকা দিতে হইবে। অন্যান্য দিনে তাঁহাদিগকে কিছু দিতে হইবে না, আপাততঃ এই রূপ স্থির আছে; কিন্তু স্থানাভাবের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলে কিছু প্রবেশিকা লইবার বন্দোবস্ত হইতে পারে।



শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি।

২৮শে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবেন। ইহার পর আর চারি দিন সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশন ও শাখা সভার অধিবেশনগুলি কলিকাতার টাউন হলের দ্বিতলে হইবে।

প্রতিনিধিদিগের অভ্যর্থনার জন্য কয়েকটি প্রীতি-সম্মিলনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাঁহারা ইহার ভার লইয়াছেন, অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। একটি প্রীতি-সম্মিলনীর ভার লইয়াছেন কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার। আর একটির ভার লইয়াছেন ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা তাঁহার আগরপাড়াস্থিত বাগান-বাড়ি ও চিড়িয়াখানায়। তিনি সেখানে প্রতিনিধিদিগকে তাঁহার পোষা পাখী সব দেখাইবেন এবং পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিবেন। তৃতীয় সম্মিলনীটি হইবে ষ্টীমারে। কলিকাতার মিলনী ক্লাব ইহার ভার লইয়াছেন। চতুর্থ প্রীতি-সম্মিলনী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে পরিষদের উদ্যোগে ও কর্ত্তৃত্বে হইবে। কেবল মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য ডাঃ স্যর নীলরতন সরকারের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা লেডী নির্ম্মলা সরকার প্রীতি-সম্মিলনীর



শ্রীযুক্তা শৈলবালা দেবী
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মহিলা-বিভাগের সভানেত্রী।

ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের "তপতী" নাটকের অভিনয়েরও ব্যবস্থা হইতেছে।

এই দ্বাদশ অধিবেশনের উদ্বোধন করিবেন কবি-সার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ১১ই পৌষ ২৭শে ডিসেম্বর। প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যানুরাগীদিগের সহিত বঙ্গের মনীষীদিগের সাক্ষাৎ পরিচয় জন্য এই সাধারণ উদ্বোধন এবং প্রত্যেক শাখার উদ্বোধনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এইরূপ স্থির হইয়াছে, যে, বিজ্ঞানশাখার উদ্বোধন করিবেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু; মহিলা-বিভাগের উদ্বোধন করিবেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী লেডী শ্রীমতী অবলা বসু; সাহিত্য-শাখার উদ্বোধক হইবেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী; ইতিহাস-শাখার শ্রীযুক্ত স্যর যদুনাথ সরকার; শিক্ষাবিজ্ঞান-শাখার শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী; ধনবিজ্ঞান-শাখার



শ্রীযুক্ত ডক্টর ভানুভূষণ দাশগুপ্ত
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ধনবিজ্ঞান-শাখার সভাপতি

শ্রীযুক্ত ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ললিতকলা ও শিল্প-শাখার শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ; বৃহত্তর বঙ্গ-শাখার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ; এবং দর্শন-শাখার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী সঙ্গীত-শাখার উদ্বোধন করিবেন।

কোন্ দিন কোন্ অধিবেশন বা অন্য অনুষ্ঠান হইবে, তাহার তালিকা নীচে দেওয়া হইল। আবশ্যক হইলে ইহার অল্পাধিক পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। সমুদয় অনুষ্ঠানের তালিকা ও ক্রম শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে।

১০ই পৌষ ২৬শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রদর্শনীর উদ্বোধন ; সন্ধ্যায় রেডিও দ্বারা সঙ্গীতাদি ; তৎপরে পরিচালক সমিতির অধিবেশন।

১১ই পৌষ ২৭শে ডিসেম্বর কবিসার্ব্বভৌম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সমগ্র সম্মেলনের উদ্বোধন, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির বক্তৃতা, সভাপতি শ্রীযুক্ত স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ, ইত্যাদি। এই দিন গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণপাঠও হইবে। সাহিত্য-শাখার উদ্বোধন এবং তাহার সভাপতির অভিভাষণ-পাঠও এই দিন হইবে। অপরাহ্ণে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন



শ্রীযুক্ত ডক্টর সুবিমলচন্দ্র সরকার
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের শিক্ষাবিজ্ঞান-শাখার সভাপতি

সরকারের প্রীতি-সম্মিলনী। সন্ধ্যার পর সম্মেলনের বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন।

১২ই পৌষ ২৮শে ডিসেম্বর দর্শন-শাখার উদ্বোধন ও তাহার সভাপতির অভিভাষণ, এবং প্রবন্ধপাঠ। সাহিত্য-শাখার প্রবন্ধপাঠ। "বৃহত্তর বঙ্গ" শাখার উদ্বোধন ও তাহার সভাপতির অভিভাষণ, এবং প্রবন্ধপাঠ। ইতিহাস-শাখার উদ্বোধন, তাহার সভাপতির অভিভাষণ, এবং প্রবন্ধপাঠ। ষ্টীমারে মিলনী ক্লাবে প্রীতি-সম্মিলনী। সন্ধ্যার পর সঙ্গীত ও অভিনয়।

১৩ই পৌষ ২৯শে ডিসেম্বর ললিতকলা ও শিল্প-বিভাগের উদ্বোধন, সভাপতির অভিভাষণ ও প্রবন্ধপাঠ। যামিনীরঞ্জন রায়ের চিত্রাগার দর্শন। শিক্ষাবিজ্ঞান-শাখার উদ্বোধন, তাহার সভাপতির অভিভাষণপাঠ, ও প্রবন্ধপাঠ। বিজ্ঞান-

শাখার উদ্বোধন, তাহার সভাপতির অভিভাষণ ও প্রবন্ধপাঠ। ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহার উদ্যান ও পক্ষিনিবাসে প্রীতি-সম্মিলনী ও পক্ষিতত্ত্বের আলোচনা। মহিলা-সভার উদ্বোধন, তাহার সভানেত্রীর অভিভাষণ, প্রবন্ধপাঠ এবং



শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ললিতকলা ও শিল্প-শাখার সভাপতি

শ্রীযুক্তা লেডী নির্ম্মলা সরকারের মহিলাদের জন্য প্রীতিসম্মিলনী। বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন।

১৪ই পৌষ ৩০শে ডিসেম্বর শেষ দিবস ধনবিজ্ঞান-শাখার উদ্বোধন, তাহার সভাপতির অভিভাষণ, ও প্রবন্ধ পাঠ। সঙ্গীত-শাখার উদ্বোধন, তাহার সভাপতির অভিভাষণ ও প্রবন্ধপাঠ। মূলসভার অধিবেশনে প্রস্তাবাদির অলোচনা ও গ্রহণ, এবং ধন্যবাদ প্রদান। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে প্রীতিসম্মিলনী।

"তপতী" অভিনয়। শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিদায়-বাসর। বিদায়-ভোজ।

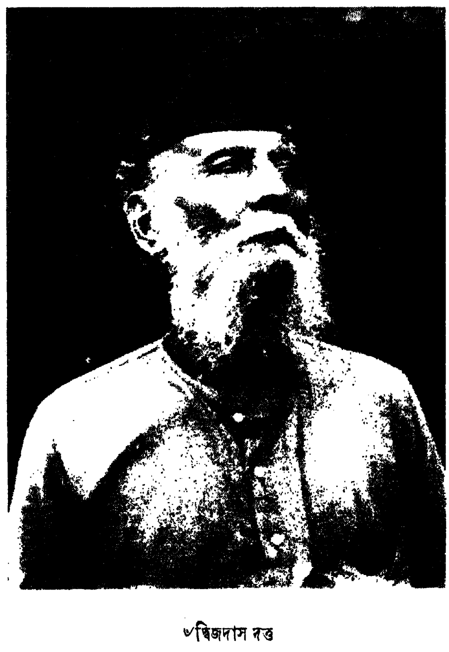
একই দিনে কতকটা একই সময়ে দুই শাখার অধিবেশন যে-যে স্থলে হইবে, তাহা টাউন হলের দ্বিতলের ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে হইবে।

বাংলা-সাহিত্যের ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির অনুরাগী বাংলা দেশের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালী সুধীবৃন্দকে এই সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি সাদর ও সানুনয় আহ্বান করিতেছেন।

—

অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত

কুমিল্লার অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত ৮২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার



৺দ্বিজদাস দত্ত

পর তিনি কৃষিবিদ্যা শিখিবার জন্য সরকারী বৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডে যান। ফিরিয়া আসিয়া তিনি ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হন। পরে তিনি শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপক হন। তিনি চাষীদের পরম হিতৈষী ছিলেন,

এবং তাহারাই জমীর মালিক হয়, তাঁহার এই মত নানা প্রকারে প্রচার করিতেন। কৃষিবিদ্যায় তাঁহার অধ্যয়নলব্ধ ও কার্য্যগত অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞান ছিল। তিনি 'প্রবাসী'তে বহুবৎসর পূর্ব্বে ইহা দেখাইয়াছিলেন, যে, পাটের চাষ করিয়া চাষীদের বাস্তবিক লাভ হয় না। যখন "লাভ" হয়, তখন যাহাকে লাভ বলা হয়, তাহা মজুরী মাত্র; এবং অনেক বৎসর সেই পারিশ্রমিক এবং চাষের গোরু রাখিবার খরচও পোষায় না। তাঁহার লিখিত "পাট বা নালিতা" শীর্ষক ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার অনেক পুস্তক আছে।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনসাধনের জন্য পরিশ্রম করিতেছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি বৈদিক ধর্ম্মোপদেশ ও কোরানের ধর্ম্মোপদেশের ঐক্য বিস্তারিতরূপে পাণ্ডিত্যের সহিত দেখাইতেছিলেন।

তিনি নির্ম্মল চরিত্র ও স্বাধীনচিত্ততার জন্য পরিচিত ছিলেন।

—

সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতার পরীক্ষিতব্য বিষয়

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় যে-সকল বিষয়ের পরীক্ষা হয়, তাহা হইতে দেশী ভাষা, দর্শনশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব বাদ দিবার প্রস্তাব বিবেচিত হইতেছে শুনা যায়। পাস-করা সিভিলিয়ানরা যে-দেশের শাসন ও বিচার কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, সেই দেশের কোন ভাষায় তাঁহাদের ব্যুৎপত্তি না-থাকা খুবই উচিত! শাসক ও বিচারকদের পক্ষে মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকাও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক! সুতরাং দর্শনশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত অকেজো জিনিষ!

কোন দেশে জন্মিলেই বা বাস করিলেই যে সেই দেশের ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানী হওয়া যায়, ইহা সত্য নহে। সত্য হইলে ইংরেজদের ছেলেরা স্কুল কলেজে ইংরেজী পড়িত না।

যে-কয়টি বিষয় বাদ দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, সে-কয়টি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিখান হয়; অন্য কোন-কোন বিশ্ববিদ্যালয়েও হয়, কিন্তু কলিকাতাতেই বেশী করিয়া ও বিশেষ ভাবে হয়। এই বিষয়গুলি বাদ দিয়া বাঙালী প্রতিযোগীদিগকে অসুবিধায় ফেলা উচিত নয়—যদিও সেরূপ উদ্দেশ্য না-থাকিতে পারে।

—

প্রাচীন ভারতীয় পুথির পরিচয় ও সূচী

অনেক বৎসর খাটিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভারতবর্ষের সংস্কৃত পালি প্রভৃতি ভাষার বিস্তর প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এগুলি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে এযাবৎ রক্ষিত ছিল। বহু বৎসরের চেষ্টায় কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় এইগুলি ঋণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নিরাপদে রক্ষণাবেক্ষণপূর্ব্বক তৎসমুদয়ের পরিচয় ও সূচী প্রস্তুত করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা এই কাজটি সুনির্ব্বাহিত হইলে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টির আলোচনা অপেক্ষাকৃত সুগম হইবে।

—

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বাজাতিক সভ্য

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার নূতন করিয়া যে সদস্য নির্ব্বাচন হইয়া গেল, তাহার ফলে দুই প্রকারের কংগ্রেসওয়ালা ও অন্য স্বাজাতিক সভ্য কত জন নির্ব্বাচিত হইলেন, তাহার সংখ্যা এখন ঠিক্ করিয়া বলা যায় না। কংগ্রেসওয়ালারা বলিতেছেন, তাঁহারা স্বয়ং ও অন্য স্বাজাতিকেরা মোট সভ্যসংখ্যার অর্দ্ধেকের কিছু অধিক হইবেন, ব্যবস্থাপক সভায় জয়েন্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্টের প্রতিকূল সমালোচনা করিবার লোক পঁচাত্তর জন পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ সমালোচনা দ্বারা সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাটা বিনষ্ট হইবে না—তাহার জন্য প্রবল, ব্যাপক ও দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টা করিতে হইবে। এই বাটোয়ারা স্থায়ী হইলে তাহার

সকলের চেয়ে কুফল এই হইবে, যে, তাহা সমুদয় ভারতীয় লোককে উচ্চতর রাষ্ট্রীয় অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করিতে বাধা দিবে। সুতরাং এখন যে মুসলমান ও "অবনত" হিন্দুরা উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারা জানিয়া রাখুন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যত দিন আছে, তত দিন তাঁহারা, অমুসলমান ও অনবনত হিন্দুদেরই মত দাস-জাতিরই অঙ্গীভূত থাকিবেন, স্বাধীন জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন না, এবং স্বাধীনতাসুলভ জ্ঞানবত্তা, পৌরুষ ও বাণিজ্যাদি-সম্ভূত ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারিবেন না—প্রভুর উচ্ছিষ্ট একটু বেশী করিয়া হয়ত পাইবেন।

—

সমগ্রভারতের জন্য একীকৃত শাসনব্যবস্থা কি অসম্ভব ?

ভারতবর্ষকে একত্ব দান ব্রিটিশ-শাসনের মহত্তম দান, এই দাবি জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটি করিয়াছেন। অথচ এই কমিটিই তাঁহাদের রিপোর্টে অন্যত্র বলিতেছেন—

"A completely united Indian polity cannot, it is true, be established either now or, so far as human foresight can extend, at any time."

"ইহা সত্য, যে, বর্ত্তমান সময়ে অথবা, যত দূর পর্য্যন্ত মানবীয় ভবিষ্যদ্দৃষ্টি যাইতে পারে, কোন সময়েই সম্পূর্ণরূপে একীকৃত শাসননীতি বা শাসনব্যবস্থা ভারতবর্ষের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।"

ইহা কি সত্য? ভারতবর্ষকে সত্য সত্যই যদি ব্রিটিশ-শাসন একত্ব দিয়াছে, তাহা হইলে এক শাসননীতি ও শাসনব্যবস্থা, বর্ত্তমানে না-হউক, ভবিষ্যৎ কোন সময়েও কেন কল্পনাতীত?

—

মোগল-সাম্রাজ্যের জাঁকজমক ও প্রজাদের দারিদ্র্য

জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্টে মোগল-সাম্রাজ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যে, "The imperial splendour became the measure of the people's poverty," "সাম্রাজ্যিক জাঁকজমক প্রজাদের দারিদ্র্যের মাপকাঠি হইয়াছিল।" অর্থাৎ সম্রাটদের জাঁকজমক যত বাড়িতেছিল, প্রজাদের দারিদ্র্যও সেই পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছিল।

এইরূপ মন্তব্য অতীত ও বর্ত্তমান সমুদয় সাম্রাজ্যের পক্ষে সত্য কিনা বলিতে হইলে সব সাম্রাজ্যের অধীন প্রজাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হয়। তাহা আমরা করি নাই। সুতরাং এমন কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারি না যাহা সকল সাম্রাজ্য প্রযোজ্য। তবে, ইহা দেখিতেছি বটে, যে, ভারত-সাম্রাজ্যে শাসকদিগের জাঁকজমকের অভাব নাই। সাম্রাজ্যিক দরবার খুব ঘটার সহিত দিল্লীতে আগে হইয়া গিয়াছে। সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজত্বকাল পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে আগামী বৎসর যে দরবার হইবে, তাহাতে জাঁকজমকের অভাব হইবে না। ভারতবর্ষের লোকদের অবস্থা সম্বন্ধে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে লিখিত হইয়াছিল, যে, "The immense mass of the people are poor, ignorant, and helpless far beyond the standard of Europe," "ভারতবর্ষের বিশাল জনপুঞ্জ এরূপ দরিদ্র, অজ্ঞ ও অসহায় যে ইউরোপে তাহার তুলনা মিলে না।" আবার বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় অব্দের গত নবেম্বর মাসে প্রকাশিত জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্টে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, যে, "The average standard of living is low and can scarcely be compared even with that of the more backward countries of Europe," "গড়ে এদেশের লোকদের বাসগৃহ, গ্রাসাচ্ছাদন ও চালচলন এমন গরিবানা রকমের, যে, তাহার সহিত ইউরোপের অধিকতর অনুন্নত দেশগুলার লোকদের সেই সমুদয়েরও তুলনা করা যায় না।"

অথচ জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির এই রিপোর্টেই অন্যত্র বলা হইয়াছে,

"... it can be claimed with certainty that in the period which has elapsed since 1858, when the Crown assumed supremacy over all the territories of the East India Company, the educational and material progress of India has been greater than it ever was within her power to achieve during any other period of her long and chequered history."

তাৎপর্য্য। "ভারতবর্ষের দীর্ঘ ও দশাবিপর্য্যয়পূর্ণ

ইতিহাসের কোন যুগে এদেশের যেরূপ আর্থিক ও শৈক্ষিক প্রগতি করিবার ক্ষমতা ছিল না, তার চেয়ে ইহার অধিকতর প্রগতি ১৮৫৮ সালে কোম্পানীর হাত হইতে রাজত্ব ব্রিটিশ রাজশক্তির অধীনস্থ হওয়ার পর হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া দাবি করা হয়।"

ভারতবর্ষ অতীত কোন কালেই তত ধনী ও জ্ঞানী ছিল না যত ধনী ও জ্ঞানী ইহা ১৮৫৮ হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত ৭৬ বৎসরে হইয়াছে, ইহা সত্য কিনা বলিতে হইলে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের কয়েক হাজার বৎসরের এরূপ নিশ্চিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক যাহা আমাদের নাই—এবং বেয়াদবী মাপ করিলে বলিতে চাই, যে, জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির সভ্যগণেরও এবং কোন সভ্যেরই নাই। তাহার একটা কারণ এই, যে, ভারতবর্ষের পুরাকালের ইতিহাস এখনও তেমন করিয়া, আধুনিক রীতি অনুসারে, লিখিত হয় নাই, যেরূপ লিখিত হইলে সেই ইতিহাস পড়িয়া এত বড় একটা দাবি করা যায় বা তাহা খণ্ডন করা যায়। তবে একটা প্রশ্ন আমাদের মনে অবশ্যই উদিত হইতেছে, যে, প্রাচীন কাল হইতে যে নানা দেশের লোকেরা এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল তাহা কি তবে বাণিজ্য নহে? তাহা কি বাণিজ্যব্যপদেশে মরুভূমিতে স্বর্ণ-বৃষ্টির নামান্তর ছিল? না, বাণিজ্যব্যপদেশে বুভুক্ষিত অতি নিঃস্ব অতি অসভ্য দেশে অন্নসত্র খুলিবার জন্য আগমন ছিল?

যাহাই হউক, দাবিটা খাঁটি সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও, ভারতবর্ষের লোকদের ধনশালিতা সম্বন্ধে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট ও জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট হইতে যে-দুটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাকে ভিত্তি করিয়া কোন সাহঙ্কার দাবি করা চলে কি?

কোন্ দেশের লোক গড়ে কত বৎসর বাঁচে বা বাঁচিবার আশা করিতে পারে, তাহা সেদেশের লোকদের ধনশালিতার একটা প্রমাণ। ১৯৩১ সালের ভারতবর্ষীয় সেন্সস্ রিপোর্টের প্রথম ভল্যুমের প্রথম ভাগের ১৭১-৭২ পৃষ্ঠায় একটি তালিকা দেওয়া আছে, তাহাতে লেখা আছে, জন্মকালে গড়ে শিশুরা কোন্ দেশে কত বৎসর বাঁচিবার আশা করিতে পারে। বৎসরের সংখ্যাগুলি বালিকা-শিশু ও বালক-শিশুদের আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে স্ত্রীজাতীয় শিশু ও পুরুষজাতীয় শিশু সকলের চেয়ে বেশী বৎসর বাঁচিবার আশা করিতে পারে অষ্ট্রেলিয়ায়—যথাক্রমে ৫৮.৮৪ ও ৫৫.২০ বৎসর, এবং সকলের চেয়ে কম বাঁচিবার আশা করিতে পারে জাপানে—যথাক্রমে ৪৪.৮৫ ও ৪৩.৯৭ বৎসর। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহারা বাঁচিবার আশা করিতে পারে—যথাক্রমে ২৩.৩১ ও ২২.৫৯ বৎসর!

ভারতবর্ষের এই ধনশালিতা কি গর্ব্ব করিবার বিষয়?

—

ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রগতি

কোন্ দেশে শিক্ষার প্রগতি কিরূপ হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে হইলে জন-কয়েক ডি-এস্‌সি, পিএইচ-ডি, এম্-এ, বি-এ কে গণিলে চলিবে না, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কত দূর হইয়াছে, তাহাই স্থির করিতে হইবে। ভারতবর্ষে শতকরা ৯২ জন মানুষ নিরক্ষর। পৃথিবীর অন্য কোন সভ্যদেশের শতকরা এত জন লোক নিরক্ষর নহে। ইহা কি অহঙ্কারের বিষয়? এবং ইহাও সত্য নহে, যে, ব্রিটিশ-শাসনকালের পূর্ব্বে নিরক্ষরতার পরিমাণ বরাবর ইহা অপেক্ষা বেশী ছিল। নিরক্ষরতা যে ইহা অপেক্ষা কম ছিল তাহার প্রমাণ আমরা আগে আগে অনেকবার ইংরেজদের লেখা হইতেই উদ্ধৃত করিয়াছি।

—

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

মেদিনীপুরের বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয় যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী থাকা সত্ত্বেও অনেক বেশী ভোট পাইয়া ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নির্ব্বাচন যখন জানা গেল, তখন এই সংবাদও পাওয়া গেল, যে, তিনি সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত। তাহার ছয় দিন পরে অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহা অতি শোকাবহ ঘটনা।

তিনি তেজস্বী, সাহসী ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি অনেক স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন

ও অনেক দুঃখ সহিয়াছিলেন। তিনি অনেক গরিব লোকের পক্ষে বিনা পারিশ্রমিকে ব্যারিষ্টরী করিতেন।

—

জানকীনাথ বসু

কটকের ভূতপূর্ব্ব গবর্ন্মেণ্ট উকীল শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার অন্য সকল সন্তান নিকটে ছিলেন, কেবল শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভিয়েনা হইতে এরোপ্লেনে আসিয়াও ঠিক সময়ে পৌঁছিতে পারেন নাই। বাল্যকালেই জানকীনাথের পিতৃবিয়োগ ঘটে। কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ না হইয়া জ্ঞানলাভে ব্যাপৃত থাকেন। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার শিক্ষার অনেক সাহায্য করেন। বি-এ পাস করিবার পর জানকীনাথ জেনারাল এসেম্ব্লীজ্ ইনষ্টিটিউশ্যনে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইহা এক্ষণে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ নামে পরিচিত। অতঃপর তিনি বি-এল পাস করিয়া কটকে ওকালতী আরম্ভ করেন। তাহাতে তাঁহার খুব পসার ও প্রভূত অর্থাগম হয়। গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে সরকারী উকিল নিযুক্ত করেন ও পরে রায় বাহাদুর উপাধি দেন। অসহযোগ-আন্দোলনের সময় তিনি ঐ উপাধি পরিত্যাগ করেন। তিনি কয়েক বৎসর হইতে হৃদ্‌রোগে ভুগিতে-ছিলেন। গত বৎসর যখন আমরা রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কটক গিয়াছিলাম, তখন তিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও সেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্রেরা সকলেই কৃতী। তাহার মধ্যে রাজ-নৈতিক কর্ম্মিষ্ঠতার জন্য শরৎ চন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র সমধিক বিখ্যাত।

—

রাখালচন্দ্র সেন

আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেনের অকালে নিউমোনিয়া রোগে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বিদ্বান্ ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। কবি শ্রীমতী কামিনী রায়ের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার গ্রন্থাবলীর সুন্দর সমালোচনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের নূতন বাংলা বহি "জীবনবাণী"র যে ইংরেজী সমালোচনা তিনি করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গুণগ্রাহিতা ও নানা বিদ্যায় পারদর্শিতার পরিচায়ক।

—

হাউস অব্ কমন্সে রক্ষণশীলদের জয়

এখন ইংলণ্ডে যে গবর্ন্মেণ্ট চলিতেছে, তাহাকে ন্যাশন্যাল গবর্ন্মেণ্ট অর্থাৎ সমগ্রজাতীয় গবর্ন্মেণ্ট বলা হয়, কারণ তাহাতে রক্ষণশীল, উদারনৈতিক ও শ্রমিক তিন দলেরই কিছু কিছু লোক আছে এই দাবি করা হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা রক্ষণশীল দলেরই গবর্ন্মেণ্ট, ঐ দলের সভ্যই হাউস অব কমন্সে খুব বেশী। উদারনৈতিক দলের এক-আধ জন মন্ত্রীসভায় থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের খুব বড় এক জন রাজনীতিজ্ঞ মিঃ লয়েড জর্জ্জ এই গবর্ন্মেণ্টের বিরোধী। প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাকডোন্যাল্ড নামে শ্রমিকদলের, কিন্তু বাস্তবিক তিনি নিজের পদটি বজায় রাখিবার জন্য বহুরূপী।

হাউস অব্ কমন্সে ভারত-সচিব স্যর সামুয়েল হোর এই মর্ম্মের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যে, জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট অনুমোদিত হউক এবং ভারত-শাসন আইনের তদনুযায়ী একটি পাণ্ডুলিপি পার্লেমেণ্টে পেশ করা হউক। শ্রমিকদলের সভ্যেরা ইহার বিরোধিতা করিয়া অনাস্থাসূচক একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সবাই জানিত, আমরাও জানিতাম, শ্রমিকদল পরাজিত হইবেন। তাঁহাদের প্রস্তাবের পক্ষে ৪৯ এবং বিরুদ্ধে ৪৯১ জন পার্লেমেণ্ট-সভ্য ভোট দেন। স্যর সামুয়েল হোরের মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার পক্ষে ৪১০ ও বিরুদ্ধে ১২৭ জন ভোট দেন।

তিন দিন ধরিয়া এই যে সাড়ম্বর তর্কবিতর্কের অভিনয় হইল, এ-বিষয়ে আমাদের বিশেষ কোন কৌতূহল না-থাকায় রয়টার বক্তৃতাগুলির যে চুম্বক টেলিগ্রাফ-যোগে পাঠাইয়াছেন, আমরা তাহা এ-পর্য্যন্ত পড়ি নাই। পারি ত অবসরমত পড়িব। হাউস্ অব লর্ডসের তর্কবিতর্কাভিনয়ের পরি-সমাপ্তির খবর অদ্য ২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখের প্রাতঃকালীন খবরের কাগজে পাওয়া যায় নাই।

—

রাজবন্দী মানবেন্দ্রনাথ রায়

রাজবন্দী মানবেন্দ্রনাথ রায় বরেলী জেলে কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছেন। তাঁহার রোগের সেখানে উপশম হইতেছে না। এই জন্য ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে তাঁহার মুক্তির দাবি করা হইতেছে। বঙ্গের অনেক সংবাদপত্রে এবং কোন কোন জনগণ-সভাতেও তাঁহার মুক্তির প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে চাই, যে, কয়েক দিন আগে কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এতদর্থে যে সভা হয়, তাহার বিজ্ঞাপনে বক্তাদের মধ্যে 'প্রবাসী'র সম্পাদকের নাম ছিল। কখন কখন আমাকে না-জানাইয়া কোন কোন সভার বিজ্ঞাপনে বক্তাদের মধ্যে আমার নাম দেওয়া হয়। ইহা অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই সভাটির বিজ্ঞাপনে আমার নাম দেওয়া আরও অন্যায় হইয়াছিল এই জন্য, যে, আমাকে টেলিফোনে একজন উদ্যোক্তা জিজ্ঞাসা করায় আমি তাঁহাকে আমার নাম দিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কারণ, ঐ সভার নির্দ্ধারিত সময়ের কিছু পরেই ভবানীপুরে অন্য একটি সভায় আমার বক্তৃতা করিবার প্রতিশ্রুতি ছিল, এবং আমি অসুস্থও ছিলাম। সেই জন্য আমি নাম দিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, যদিও শরীর ভাল থাকিলে অল্পসময়ের জন্য হয়ত শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যাইতাম।

শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়কে মুক্তি দিয়া এখন তাঁহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগকে তাঁহাদের সাধ্যমত তাঁহার উৎকৃষ্টতম চিকিৎসা করাইবার সুযোগ দেওয়া উচিত। তাঁহাকে ছয় বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। এই সময়ের অধিকাংশ তিনি ইতিমধ্যেই কারাগারে যাপন করিয়াছেন। সুতরাং কিছুকাল পরে তাঁহাকে ত মুক্তি দিতেই হইবে, এখন মুক্তি দেওয়ায় ক্ষতি কি? এক দিকে তাঁহার যেমন কারাবাসের কিছু বাকী আছে, তেমনি অন্য দিকে তার চেয়েও বেশী দুঃখকর রোগভোগ তাঁহার হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং যদি এখনই তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলেও হয়েদরে ছয় বৎসর কারাবাসের চেয়ে কম শাস্তিভোগ তাঁহার হইবে না। বিচারক যখন তাঁহাকে ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ড দেন, তখন শুধু কারাদণ্ড দিয়াছিলেন, রোগভোগের দণ্ড দেন নাই। অবশ্য জেলের কর্তৃপক্ষ তাঁহার রোগ জন্মাইয়াছেন এরূপ বলিতেছি না, তিনি রোগভোগ করিবেন, বিচারকের ইহা অনুমান বা অভিপ্রায় ছিল না ইহাই বলিতেছি। বিচারে যখন তাঁহার ছয় বৎসর কারাবাসদণ্ড হইয়াছিল, প্রাণদণ্ড হয় নাই, তখন তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, বিচারকের মতে তিনি এমন কোন অপরাধ করেন নাই যাহাতে আইনতঃ তাঁহার মৃত্যু হওয়া আবশ্যক। অতএব জেলে তাঁহার মৃত্যু আইনের ও বিচারকের অভিপ্রেত নহে। সুতরাং যদি তাঁহার রোগ এরূপ যে জেলে তাঁহার যথোচিত চিকিৎসার ও রোগমুক্তির অন্যান্য অবস্থার সমাবেশ ঘটিতে না-পারে, তাহা হইলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গবর্ন্মেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহার রোগের প্রকৃতি ও অবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য বেসরকারী ও সরকারী বড় কয়েক জন ডাক্তারের একটি বোর্ড গঠন করিয়া তাহার দ্বারা তাঁহার পরীক্ষা গবর্ন্মেণ্টের অন্ততঃ নিশ্চয়ই করান উচিত। এরূপ বোর্ড দ্বারা এরকম পরীক্ষা গবর্ন্মেণ্ট অন্য কোন কোন রোগী রাজবন্দীর করাইয়াছেন।

—

সাবিত্রী শিক্ষালয়

কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলের সাবিত্রী শিক্ষালয় একটি বালিকা-বিদ্যালয়। প্রাচীনপন্থী হিন্দুরাই প্রধানতঃ এই অঞ্চলের বাসিন্দা। বিদ্যালয়টিতে এখন প্রায় তিন শত ছাত্রী পড়ে। আজকাল, কতকটা মত-পরিবর্ত্তন-বশতঃ, কতকটা অন্যান্য কারণে, হিন্দু বালিকাদের আগেকার মত অল্প বয়সে বিবাহ হয় না। তাহাদিগকে অশিক্ষিত অবস্থায় বাড়িতে বসাইয়া রাখা উচিত নয়। এই জন্য কলিকাতায় বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে, নূতন পাড়াগুলিতে ত বাড়িতেছেই, পুরাতন পল্লীগুলিতেও বাড়িতেছে। সাবিত্রী শিক্ষালয়ে এরূপ বয়সের অনেক হিন্দু ছাত্রী দেখিয়া প্রীত হইলাম, আগেকার কালে যাহাদের নিশ্চয়ই বিবাহ হইয়া যাইত ও যাহারা নিরক্ষর থাকিত। ইহা বলিবার অর্থ এ নহে, যে, আমরা বিবাহের বিরোধী। বিবাহের আমরা বিরোধী ত নই-ই, বরং সুশিক্ষার পর উপযুক্ত ও অনধিক বয়সে বিবাহ হওয়াই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয় মনে করি।

সাবিত্রী শিক্ষালয়ের অধ্যাপনা কাশিমবাজারের মহারাজার শিল্পবিদ্যালয়ের বাড়ি দুটিতে প্রাতঃকালে হয় বলিয়া এবং সেই জন্ত ইহার অধিকাংশ শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষক নামমাত্র বেতনে কাজ করিতে পারেন বলিয়া ইহা চলিতেছে। ক্রমশঃ ইহাকে নিজস্ব বাড়ি ও ক্রীড়াক্ষেত্রের অধিকারী হইতে হইবে। তখন সকল সময়ে সেই বাড়িতে ইহার নানাবিধ কাজ চলিবে, এবং শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষকদিগকে যথোচিত বেতনও দিতে হইবে। কিন্তু যত দিন সে অবস্থা না ঘটে, তত দিন যে এই ভাবে ইহা চলিতে পারিবে, ইহা সন্তোষের বিষয়। দেশের সর্ব্বত্র, যেখানে যেখানে ছেলেদের বিদ্যালয় আছে ও তাহার বাড়ি আছে, সেইখানেই মেয়েদের বিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র বাড়ি নির্ম্মাণ করিবার বা ভাড়া লইবার এবং পূর্ণ বেতনে শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষক নিযুক্ত করিবার টাকা না-থাকিলে, সাবিত্রী শিক্ষালয়ের মত বন্দোবস্তে প্রাতঃকালে ছেলেদের বিদ্যালয়ের গৃহে মেয়েদের বিদ্যালয় চালান উচিত। এই প্রকারের নানা উপায় অবলম্বিত না হইলে আমাদের দরিদ্র দেশে বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হইতে বহু বিলম্ব ঘটিবে।

—

"বিশ্বকোষ"

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "বিশ্বকোষের" দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতেছে। ইহার প্রথম ভাগের ত্রয়োদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত আগে বাহির হইয়াছিল। তাহার পরিচয় আগে 'প্রবাসী'র কোন কোন সংখ্যায় দিয়াছি। সম্প্রতি চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ সংখ্যা পাইয়াছি। এই দুই সংখ্যায় ৪১৭ হইতে ৪৮৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আছে। এই দুই সংখ্যাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যার মত নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। আবশ্যক-মত চিত্রও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ হইলে বাংলা ভাষার একটি বিশিষ্ট সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

—

ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশ পৃথক্-করণ

জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্টে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে আলাদা করিয়া ফেলিবার প্রস্তাব আছে। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবেন। ব্রহ্মদেশীয়দের অধিকাংশ রাজনৈতিকজ্ঞানবিশিষ্ট লোক এই বিচ্ছেদের বিরোধী, কতক লোক ইহার সপক্ষে। ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়েরাও ইহার বিরোধী। যদি কেবল তাঁহারাই ইহার বিরোধী হইতেন, তাহা হইলে মনে করা যাইতে পারিত, যে, তাঁহারা কেবল নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি হইতে বিরোধিতা করিতেছেন। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয় বহু শিক্ষিত লোকও ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান মিলিত অবস্থার পক্ষপাতী হওয়ায় বুঝা যাইতেছে, যে, এই মিলনে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্ম উভয়েরই লাভ আছে। এই দুই ভূখণ্ডকে আলাদা করিয়া দিলে ইংরেজদের তাহা শোষণ করিবার সুবিধা বাড়িবে।

বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়েরা একটি কন্‌ফারেন্সে ব্রহ্ম-বিচ্ছেদের কুফল আলোচনা ও তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলনের বন্দোবস্ত করিবেন।

—

ভিক্ষু উত্তমকে হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্ব্বাচন প্রস্তাব

ভিক্ষু উত্তমকে হিন্দু মহাসভার আগামী অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। হিন্দু মহাসভার সংজ্ঞা অনুসারে, যে-কেহ ভারতবর্ষজাত কোন ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তিনিই হিন্দু। এই সংজ্ঞা অনুসারে ভিক্ষু উত্তমকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে বাধা নাই। তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ভারতবর্ষীয় কোন কোন ভাষাও জানেন—তাঁহাকে বাংলা বলিতে শুনিয়াছি। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে কৃষ্টিমূলক মিলনের তিনি পক্ষপাতী। বহু দুঃখভোগ ও স্বার্থত্যাগ তাঁহার মনুষ্যত্ব প্রমাণিত করিয়াছে।

—

সিংহলের শিল্পবিভাগে বাঙালী নিয়োগ

বঙ্গীয় শিল্পবিভাগের শ্রীযুক্ত করুণাদাস গুহ সিংহল-গবর্ন্মেণ্টের শিল্প-বিভাগে বার্ষিক ৮,৪০০ টাকা বেতনে পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বঙ্গে, মহীশূরে ও ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করেন। জার্ম্মেনীতেও তিনি অনেক

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। রাসায়নিক নানা শিল্পকার্য্যে তিনি গবেষণা করিয়াছেন এবং অন্যবিধ সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাও তাঁহার আছে।

—

মাৎগুড় প্রয়োগে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের বিজ্ঞান-পরিষদের সম্প্রতি যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর নীলরতন ধর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে বলেন, যে, মাৎগুড় বা ঝোলা গুড়ের প্রয়োগে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ চিনির কারখানায় এই জিনিষটি পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। অধ্যাপক ধরের এই গবেষণাটি কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে বিশেষ সুফলপ্রদ হইবার কথা।

—

"বঙ্গীয় মহাকোষ"

প্রধান সম্পাদক রূপে অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বহু বিদ্বান্ সহকারী সম্পাদক এবং বিভাগীয় সংঘের সম্পাদকের সাহায্যে "বঙ্গীয় মহাকোষ" নাম দিয়া একটি বৃহৎ বাংলা এনসাইক্লোপীডিয়া বাহির করিতে সংকল্প করিয়াছেন। ইহার নমুনা-সংখ্যাটি দেখিয়া আশান্বিত হইয়াছি। নমুনা-সংখ্যাটির কাগজ ও ছাপা ভাল, ত্রিবর্ণ ও একবর্ণ চিত্রগুলিও উৎকৃষ্ট। লিখিত বিষয় যতটুকু পড়িলাম, তাহা সুলিখিত ও প্রামাণিক মনে হইল। মহাকোষখানি এই নমুনার মত হইলে ইহা সাহিত্যানুরাগী ও জ্ঞানপিপাসু লোকদের অতি আদরণীয় এবং অধ্যয়নকালে নিত্যসহচর হইবে।

—

উইলিয়ম কেরীর শতবার্ষিক স্মৃতিসভা

১৮৩৪ সালে বিখ্যাত খ্রীষ্টীয় মিশনরী উইলিয়ম কেরীর মৃত্যু হয়। গত মাসে কলিকাতায় 'প্রবাসী'র সম্পাদকের সভাপতিত্বে তাঁহার শতবার্ষিক স্মৃতিসভা হয়। তাহাতে প্রিন্সিপ্যাল জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের সম্পাদক মিঃ আর্থার মূর, স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর আর্কাট, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, এগ্রি-হর্টকাল্‌চারাল সোসাইটির মিঃ পার্সি-ল্যাঙ্কেষ্টার, স্যর হাসান সুহ্রাওয়ার্দ্দি, শ্রীরামপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ এঙ্গাস্, কেরী সাহেবের প্রপৌত্র উইলিয়ম কেরী, এবং সভাপতি তাঁহার জীবন ও চরিত্রের নানা দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আর্কাটসাহেব তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সম্বন্ধে কেরী সাহেবের নিম্নলিখিত মত উদ্ধৃত করেন :—

> "Its structure is such that it abundantly uses words requiring much care for their right formation, and which yet yield it its peculiar perspicuity and elegance Convinced as I am that Bengali is intrinsically superior to all other spoken Indian languages, and second in utility to none, I cannot consent to what degrades it in the College."

—

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল কমিটি

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল কমিটি ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঠিক্ ঠিক্ তথ্য প্রকাশ করিয়া তাহার উন্নতির চেষ্টা করা যে কত আবশ্যক তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন। গত ১৯৩৩ সালের রিপোর্টে দেখিতেছি, পরীক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৬২ জনের স্বাস্থ্য অসন্তোষজনক ছিল, পূর্ব্ব বৎসর শতকরা ৫৯.৫ জনের স্বাস্থ্য অসন্তোষজনক ছিল। ছাত্রদের স্বাস্থ্য কি ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে?

—

এলাহাবাদে বাংলার চর্চ্চা

এলাহাবাদ পাব্লিক লাইব্রেরীর ১৯৩৩-৩৪ সালের রিপোর্টে দেখিতেছি, ঐ বৎসর পাঠকেরা প্রাচ্যভাষাসমূহের নিম্নলিখিতসংখ্যক বহি পড়িবার জন্য বাড়ি লইয়া গিয়াছিলঃ- সংস্কৃত ১৭১, হিন্দী ১৩৮৮, আরবী-ফারসী ৩২১, উর্দু ৭০৪, বাংলা ৭৫৫। এলাহাবাদে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যা অনেক বেশী এবং উহা হিন্দুর একটি প্রধান তীর্থ। তাহা সত্ত্বেও সেখানে সংস্কৃত অপেক্ষা আরবী-ফারসী বহি লাইব্রেরী হইতে বেশী গৃহীত হইয়াছিল। হিন্দী-

উর্দ্দুভাষীদের তুলনায় বাঙালীর সংখ্যা সেখানে খুবই কম। বাংলা বই লাইব্রেরীতে আছেও খুব কম। তথাপি ৭৫৫ খানা বাংলা বহি গৃহীত হওয়া মন্দ নহে।

—

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর ব্যবস্থাপক সভায় পুনঃপ্রবেশ চেষ্টা

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী দীর্ঘকাল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। তিনি পুনর্ব্বার, বর্দ্ধমান-বিভাগ হইতে, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদপ্রার্থী হইয়াছেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভার কাজ বিশেষ যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার যোগ্যতা এত অধিক, যে, যখন স্যর (তৎকালে মিঃ) যণ্মুখম্ চেটি ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, তখন তিনি বিদেশে না-থাকিলে তিনিই নির্ব্বাচিত হইতেন, দিল্লীতে এই মত খুবই প্রচলিত। নানা প্রয়োজনীয় তথ্যের জ্ঞান, ধীরতা এবং তর্কবিতর্ক-শক্তি তাঁহার খুব আছে। মেদিনীপুর জেলায় যে তদন্তকমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পর সরকারী আদেশে তাহা নিষিদ্ধপুস্তকতালিকাভুক্ত ও বাজেয়াপ্ত হয়, ক্ষিতীশ বাবু সেই কমিটির সভ্যরূপে ঘটনাস্থলে গিয়া সব বৃত্তান্ত সাক্ষাৎ ভাবে জানিয়া আসেন। হাকিমের আদেশে পুলিস তাঁহাকে ও কমিটির অন্য কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে। তিনি অত্যাচরিতদের কথা নির্ভীকভাবে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। সকলের তাঁহাকেই ভোট দেওয়া উচিত।

—

পুণ্যবতী সাধ্বী রোকেয়া খানম্

পুণ্যবতী সাধ্বী রোকেয়া খানম্ মুসলমান-সমাজে মিসেস্ সাখাওৎ হোসেন নামে পরিচিত। তিনি অল্প বয়সে বিধবা হন। স্বামীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সাখাওৎ হোসেন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিসভায় মৌলবী সাদেত আলি আখন্দ বলেন—

"উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত জমিদার-বংশে রোকেয়া খানমের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম জহীর-উদ্দীন মোহম্মদ আবু আলি। বংশের প্রাচীনত্ব ও শরীফত্বই ছিল বেগম রোকেয়া খানমের জীবনের সবচেয়ে বড় অভিসম্পাত। তাঁহার পিতা মোহম্মদ আবু আলি সাহেব স্ত্রীশিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। যে-বয়সে সাধারণ বালিকারা প্রথম স্কুলে যাইতে আরম্ভ করে, সেই বয়স হইতেই রোকেয়া খানমকে পর্দ্দার আড়ালে অন্ধকারের ভিতর লুকাইয়া ফেলা হইয়াছিল। কিশোরী রোকেয়া খানম্ বাংলার শত সহস্র মুস্‌লিম্ কিশোরীর মত এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করেন নাই। তিনি পিতার সমস্ত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া গোপনে জ্যেষ্ঠ সহোদর আবুল আসাদ ইব্রাহীম সাহেবের নিকটে সামান্য বাংলা ও ইংরেজী প্রথম ভাগ শেষ করিয়া ফেলেন। কিশোরী রোকেয়ার এই বিদ্রোহী জীবনের ইতিহাস বাংলার মুসলিম-নারী-মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়। তিনি কৈশোরের প্রারম্ভ হইতে জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পর্দ্দা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া গিয়াছেন।

প্রায় ষোল বৎসর বয়সে ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সৈয়দ সাখাওৎ হোসেনের সহিত বেগম রোকেয়া খানমের বিবাহ হয়। উচ্চশিক্ষিত হৃদয়বান স্বামীর সাহচর্য্যে তিনি ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিতা হইয়া উঠেন।

রোকেয়া খানমের বিবাহিত জীবন দাম্পত্যপ্রেমময় এক অত্যুজ্জ্বল কাহিনী, স্বামীর অকাল মৃত্যুতেই তাহার পরিসমাপ্তি হয় নাই, অন্তরের সমস্ত গ্লানি-যন্ত্রণা নীরবে অন্তরে বহিয়া এই গরীয়সী নারী জীবনের সমস্ত দিবস ব্যাপিয়া সেবার যে উদাহরণ দেখাইয়াছেন তাহা বাংলার সেবার ইতিহাসে অতুলনীয়—শুধু প্রেমময়ী পত্নীরূপেই নহে, স্নেহময়ী সমাজ-সেবিকারূপেই তাঁহার জীবনের সাধনা কল্যাণশ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।"

১২০।২, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৪১

৪র্থ সংখ্যা

প্রশ্ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেহের মধ্যে বন্দী প্রাণের ব্যাকুল চঞ্চলতা
দেহের দেহলীতে জাগায় দেহের অতীত কথা।
খাঁচার পাখী যে বাণী কয়
সে তো কেবল খাঁচারি নয়,
তারি মধ্যে করুণ ভাষায় সুদূর অগোচর
বিস্মরণের ছায়ায় আনে অরণ্য মর্ম্মর॥

চোখের দেখা নয় তো কেবল দেখারি জাল-বোনা,
কোন্ অলক্ষ্যে ছাড়িয়ে সে যায় সকল দেখাশোনা।
শীতের রৌদ্রে মাঠের শেষে
দেশ-হারানো কোন্ সে দেশে
বসুন্ধরা তাকিয়ে থাকে নিমেষ-হারা চোখে
দিগ্বলয়ের ইঙ্গিত-লীন উধাও কল্পলোকে॥

ভালোমন্দে বিকীর্ণ এই দীর্ঘ পথের বুকে
রাত্র-দিনের যাত্রা চলে কত দুঃখে সুখে।
পথের লক্ষ্য পথ-চলাতেই
শেষ হবে কি ? আর কিছু নেই ?
দিগন্তে যার স্বর্ণলিখন, সঙ্গীতের আহ্বান,
নিরর্থকের গহ্বরে তার হঠাৎ অবসান ?

নানা ঋতুর ডাক পড়ে যেই মাটির গহন তলে
চৈত্রতাপে, মাঘের হিমে, শ্রাবণ বৃষ্টিজলে,
স্বপ্ন দেখে বীজ সেখানে
অভাবিতের গভীর টানে,
অন্ধকারে এই যে ধেয়ান স্বপ্নে কি তার শেষ ?
ঊষার আলোয় ফুলের প্রকাশ, নাই কি সে উদ্দেশ ?

১৫ নবেম্বর
১৯৩৪

ছোটনাগপুরে সাহিত্য-সেবার উপাদান

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়

ছোটনাগপুরে সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চার অপরিণত ও অপরিপক্ক উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। পরিতাপের বিষয়, সে-সব উপাদান অস্পৃশ্য হরিজনদের মত বহু যুগ হইতে অনাদৃত, অনাহৃত ও অস্পৃষ্ট অবস্থায় পড়িয়া আছে।

ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা, প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির অনুশীলনের পক্ষে ছোটনাগপুর একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র। কিন্তু যদিও এই ক্ষেত্রে 'আবাদ করিলে সোনা ফলিতে' পারিত, দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত 'চাষের মতন চাষ করার' লোকের অভাবে এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পতিত বা অকর্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে। কেবল গত শতাব্দীর দুই-চারি জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ সরকারী কর্ম্মচারী এই ক্ষেত্রে উপর-উপর আঁচড় দিয়াছেন মাত্র। কিন্তু যদিও তাঁহারা এই ক্ষেত্র গভীর ভাবে কর্ষণ করিবার অবকাশ বা সুযোগ পান নাই, তবুও সম্যক কর্ষণে কিরূপ সোনার ফসল লাভ হইতে পারে তাহার আভাস দিয়া তাঁহাদের পরবর্ত্তী কৃষকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে বল্ (V. Ball), ব্লাণ্ডফোর্ড (W. T. Blandford) ও কর্ণেল টিকেল (Col. Tickell) প্রমুখ কয়েক জন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী এবং নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে ছোটনাগপুরের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার কর্ণেল ডাল্টন (Col. Dalton) এবং মানভূমের ভূতপূর্ব্ব সহকারী কমিশনার এবং পরে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের হোম মেম্বার স্যর হারবার্ট রিজ্‌লি (Sir Herbert Risley) পথ-প্রদর্শকের কাজ করিয়া আমাদিগকে চিরঋণী করিয়াছেন। অবশ্য ইঁহারা দেশীয় সহকারী ও পত্রপ্রেরকদের সহায়তায় তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেরই নাম অজ্ঞাত।

১। প্রাগৈতিহাসিক যুগ

প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে ছোটনাগপুরে এখনও সবিশেষ অনুসন্ধান হয় নাই। কাপ্তেন বীচীং (Captain Beeching), বল্ (V. Ball), কর্ণেল টিকেল এবং আরও দুই-এক জন অনুসন্ধিৎসু ইংরেজ কর্ম্মচারী অন্য তত্ত্বের অনুসন্ধান উপলক্ষে দৈবক্রমে দুই-চারিটি প্রস্তর-যুগের কুঠারফলক প্রাপ্ত হন এবং আনুষঙ্গিক ভাবে সেগুলির পরিচয় দেন।

ছোটনাগপুরের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধেও ভূতপূর্ব্ব ইংরেজ সিবিলিয়ান সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিৎ স্যর জর্জ্জ গ্রীয়ারসন (Sir George Grierson) এবং দুই-চারিটি ইউরোপীয় পাদ্রীর (Father Hoffmann, Rev. Dr. Noltrott, Rev. Hahn, ও Father Grignard-এর) নিকট আমরা ঋণী। এই সব বিদেশীয় পণ্ডিত যে-জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন আমরা এখানে তাহার সম্মুখে থাকিয়াও এত দিন সেই উন্মুক্ত দ্বারের আহ্বান অবহেলা করিয়া আসিতেছি।

সম্প্রতি ভারতে রাজনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও কলকারখানা দ্বারা উৎপাদন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যেরূপ স্বাবলম্বনের স্পৃহা জাগ্রত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধেও স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডক্টর মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিজ্ঞানাচার্য্যেরা সেইরূপ আত্মনির্ভরতার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন এবং সাহিত্য ও ইতিহাসাদি সেবায় ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্যর যদুনাথ সরকার, অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন, ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণও সেইরূপ আত্মনির্ভরের পরিচয় দিতেছেন। এখন আর গত শতাব্দীর অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতবাসীর ন্যায় আমরা ভারতের অমূল্য প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন, শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটনের ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারের জন্য এবং আধুনিক সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বিদেশীয় পণ্ডিতদের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী নহি। যদিও পূর্ব্বগামী বিশেষজ্ঞ কতকগুলি বিদেশীয় পণ্ডিতের ও তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিতের


জুয়াঙ্গ যুবক (১)


জুয়াঙ্গ যুবকের (২) পার্শ্বভাগ


জুয়াঙ্গ যুবক (২)


জুয়াঙ্গ যুবকের (১) পার্শ্বভাগ

নিকট ভারতবাসী চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডারের উদ্ধার ও সম্যক অর্থবোধ ও ব্যাখ্যান এবং নূতন বা অনাহৃত তথ্যের আবিষ্কার বা আহরণ দেশীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর দ্বারা যেরূপ সন্তোষজনক ভাবে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা, বিদেশীয় পণ্ডিতদের নিকট হইতে সেরূপ প্রত্যাশা করা যায় না।

যে নব্য বিদ্বৎগোষ্ঠী বাংলা দেশে সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতির গবেষণার নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি আজ এই 'পাণ্ডববর্জ্জিত' ছোটনাগপুরের দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় স্থানীয় সাহিত্যসেবীদের মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছে। তাই আশা করি, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণার কিরূপ উপকরণ ছোটনাগপুরে পাওয়া যাইতে পারে—এই প্রসঙ্গ এই অভিভাষণের অনুপযোগী হইবে না। তবে ভাষার দারিদ্র্যের জন্য ও যথাযথ ব্যাখ্যানের শক্তির অভাবে আমার এই অভিভাষণ হয়ত শ্রোতাদের ক্লেশদায়ক হইয়া পড়িবে।

ছোটনাগপুরের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে সরকারী ভূতত্ত্ব-বিভাগের অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, ছোটনাগপুর ভারতের মধ্যে একটি সর্ব্বপুরাতন প্রদেশ। যখন পৃথিবীর অধিকাংশ বর্ত্তমান স্থলভাগ সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল তখনই ছোটনাগপুরের ভূপঞ্জর গঠিত হইয়াছে। যে-যুগে পৃথিবীতে জীবনের উন্মেষ হয় নাই, সেই জীবহীন (Archaean বা Azoic) যুগে Gneiss, Granite, Quartzite ও Epidiorite প্রভৃতি প্রস্তরে ছোটনাগপুর, বিশেষতঃ রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলা, পরিপূর্ণ। আর কেবল কোন কোন অংশে পুরাতন জীব-যুগের (Lower Paleozoic) ধারোয়ার ও গোণ্ডোয়ানা শ্রেণীর প্রস্তর বর্ত্তমান। সুতরাং ভারতের এই একটি প্রাচীনতম প্রদেশে ভূবিদ্যার আলোচনা ও গবেষণার প্রচুর উপাদান পাওয়া যাইতে পারে।

আর এখানে লৌহ-অভ্র-কয়লা-চূণ প্রভৃতির অনেক খনি থাকাতে খনিজ-বিদ্যা সম্বন্ধেও গবেষণার সুযোগ আছে। উদ্ভিদ-বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধেও অরণ্যবহুল ছোটনাগপুরে অনুসন্ধান ও গবেষণার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র বর্ত্তমান। তারপর প্রাগৈতিহাসিক গবেষণার জন্য ছোটনাগপুরে যেরূপ প্রচুর উপকরণ আছে, উত্তর-ভারতে সিন্ধু-নদের উপত্যকা ছাড়া সম্ভবতঃ আর কোথাও সেরূপ নাই। যে-প্রদেশের ভূস্তর-সংগঠন (land formation) ভারতের বা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতমের একটি সেই স্থান যুগযুগান্তর হইতে মানবের আবাস-ভূমি হইয়া আসিতেছে, এ তথ্য কেবল অনুমানসাপেক্ষ নয়। পুরাতন প্রস্তর-যুগ, মধ্য-প্রস্তরযুগ, নূতন প্রস্তর-যুগ, প্রস্তর ও তাম্রের মিশ্রযুগ, তাম্র-যুগ ও পুরাতন লৌহ-যুগ—ইহার নিদর্শন ছোটনাগ-পুরের মালভূমিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ত্তমান। কেবল অনুসন্ধানকারীর কোদালীর অপেক্ষা করিতেছে।

আপনারা সকলেই জানেন যে আদিমানবের বিশেষ

কোন অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না। আদিমানব স্বাভাবিক অস্ত্র ব্যবহার করিত, অর্থাৎ নিজের হাত পা নখ এবং গাছের ডাল বা পাথরের টুকরাই তাহার একমাত্র অস্ত্র ছিল। হয়ত জলস্রোতে ঘষিয়া কিংবা নৈসর্গিক কোনরূপ চাপে ছুঁচালো বা তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত দুই-চারখানা পাথর দেখিয়া কোন আদিম মানবের মনে প্রস্তরখণ্ডকে কৌশলে ভাঙিয়া বা ঘষিয়া ধারাল করিবার কল্পনা প্রথমে উদিত হয়। এই প্রথম মানব-হস্তনির্ম্মিত শিলা-অস্ত্রগুলির ঊষা-শিলা (Eolith) নাম দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে মানব-সভ্যতার বিকাশ আরম্ভ হইল। ক্রমে এক-একখানা প্রস্তরখণ্ড অন্য প্রস্তরের দ্বারা বিশেষ আকারে ভাঙিয়া লইয়া কিনারা-গুলি সেইরূপে ছিলিয়া (chipping) ও ধার-যুক্ত করিয়া বিশেষ আদর্শ (pattern) অনুযায়ী আদিম মানবেরা কুঠারফলক প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। এ রকম ফলকযুক্ত ছিলা (chipped) বা অসমান (rough) প্রস্তরাস্ত্র বহু সহস্র বৎসর যাবৎ ব্যবহৃত হইত। ঐ যুগকে পুরাতন প্রস্তর-যুগ (Rough Stone Age বা Palæolithic Age) বলা হয়। তার পর ক্রমান্বয়ে গঠন-প্রণালীর ও নমুনার উন্নতি ও কার্য্যোপযোগিতা ও সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ অনুসারে মধ্য-প্রস্তরযুগ (Mesolithic Age) ও নূতন প্রস্তর-যুগ (Neolithic Age)-এর উদ্ভব হইল। এই যুগে পাথরের ধার অন্য পাথরে ঘষিয়া করা হইত;—ছিলিয়া নয়। এইরূপে আবার কত সহস্র বৎসর কাটিল; সভ্যতার স্ফুরণ মন্দ গতিতে চলিতে থাকিল। তার পর মাত্র কয়েক সহস্র বৎসর হইল তাম্রের এবং পরে ব্রোঞ্জের (টিনমিশ্রিত তামার) আবিষ্কার হইল। আর পাথরের অস্ত্রের অনুকরণে তামার অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে সুরু হইল। প্রথম প্রথম কিছুকাল প্রস্তরাস্ত্র ও তাম্র-অস্ত্র দুই-ই ব্যবহার হইতে লাগিল। ঐ যুগকে তাম্র-প্রস্তর-যুগ (Chalcolithic Age) নাম দেওয়া হইয়াছে। পরে, ভারতের বিমিশ্র তাম্র-যুগ ও ইউরোপের ব্রোঞ্জ-যুগ। যখন আর্য্যেরা ভারতে প্রথম আগমন করেন তখনও হয়ত ভারতে তাম্র-যুগ শেষ হয় নাই; সম্ভবতঃ তখন তাম্র ও লৌহ যুগের সন্ধিকাল। কারণ, ঋগ্বেদে যে 'অয়সে'র উল্লেখ আছে তাহাকে কোন কোন পণ্ডিত তামা অর্থে গ্রহণ করেন।

সর্ব্বশেষে লোহার ব্যবহার আরম্ভ হইল। এই লৌহ-যুগকেও দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়; প্রথম বিভাগ পুরাতন লৌহ-যুগ (Early Iron Age) ও অপরটি নূতন লৌহ-যুগ (Later Iron Age) নামে অভিহিত হয়। এখন আমরা এই নূতন লৌহ-যুগে আছি।



একটি জুয়াঙ্গ গ্রাম

২। নৃতত্ত্ব

এই প্রসঙ্গে আর্য্যদের আগে ভারতে পর-পর কোন্ কোন্ জাতি আসিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলা বোধ হয় অসমীচীন হইবে না। নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের অনেকেই অনুমান করেন যে, সর্ব্বপ্রথমে কালো, বেঁটে বর্ত্তমান আন্দামানবাসী কিংবা মেলেনেসিয়াবাসী নেগ্রিটোদের মত এক বা বহু জাতি ভারতের অধিবাসী ছিল। তাহারাই ভারতের পুরাতন প্রস্তর-যুগের অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহারা মৃগয়ালব্ধ পশুপক্ষী বা বন্য ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিত। এখন ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে যে কাডার (Kadar), উরালি (Urali) প্রভৃতি জাতি আছে, তাহারাই ভারতের সেই সর্ব্বপ্রথম অধিবাসীদের, অমিশ্র না হইলেও বিমিশ্র (remnants) বংশধর। তার পর বর্ত্তমান মুণ্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা ভারতে আসে। কোথা হইতে এবং কোন পথে আসে সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতের অমিল আছে। আগেকার নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মনে করিতেন এবং এখনও কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, তাহারা ভারতের উত্তর পূর্ব্ব দিক্ হইতে ব্রহ্মদেশ ও আসাম হইয়া এ-দেশে

আসিয়াছিল; কিন্তু ইদানীন্তন অনেক পণ্ডিতের মতে উহারা উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। উহাদের উত্তর-পূর্ব্ব পথে আগমনের সপক্ষে বলা যায় যে, প্রথমতঃ ভারতের পূর্ব্বস্থ মলয়-দ্বীপের সাকেই (Sakei) ও সেমাং (Semang) জাতিদের ভাষা ব্রহ্মদেশের ওয়া (Wa), পালৌঙ্গ (Palaung) প্রভৃতি ভাষা, পেগুর মন্স (Mons) বা তেলাইঙ্গ (Telaing) ভাষা ও আসামের খাসি ভাষার সহিত ভারতের মুণ্ডা-গোষ্ঠীর ভাষাগুলির গঠনে ও কিছু কিছু বিশেষ প্রয়োজনীয় শব্দাবলীতে সাদৃশ্য দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মদেশে নূতন প্রস্তর-যুগের যে স্কন্ধযুক্ত কুঠারফলক পাওয়া যায়, ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল



জুয়াঙ্গ রমণী

পরগণাতেও সেইরূপ প্রস্তরাস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। আর আসামেও তদনুরূপ স্কন্ধযুক্ত লোহার অস্ত্র ও খানিকটা তদনুরূপ প্রস্তরের অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয়তঃ, কোন কোন মুণ্ডাজাতির মধ্যে মোঙ্গোলিয়ানদের মত ক্ষুদ্র চক্ষু ও বাঁকা চক্ষু কিংবা অপর কোনও অস্পষ্ট বা অনির্দ্দিষ্ট মোঙ্গোলিয়ান লক্ষণ কখনও কখনও দেখা যায়।

এই মতের সপক্ষে আরও দুই-একটি তথ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উড়িষ্যায় জুয়াঙ্গ ও পাহাড়ী ভুঁইয়া রমণীদের জাতিতত্ত্ব অনুসন্ধানকালীন জুয়াঙ্গ ও পাহাড়ী ভুঁইয়াদের গলায় থাকে-থাকে যে লাল অনেকগুলি করিয়া কাঁচ-বর্ত্তুলের মালা দেখিয়াছি তাহা নাগা প্রভৃতি মোঙ্গোলীয় রমণীদের গলার ঐরূপ পুঞ্জীকৃত মালার কথা মনে করাইয়া দেয়। আর কোন কোন জুয়াঙ্গ ও পাহাড়ী ভুঁইয়া যে শূকর ও ছাগলাদি রাখিবার জন্য ছোট ছোট মাচার উপর ঘর নির্ম্মাণ করে, সেগুলিও আসামের নাগাদের আবাসগৃহ বা "চাঙ্গ" ঘরের স্মারক।

অপর পক্ষে, অনেক নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মুণ্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদিগকে যে উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে ভারতে আগত ককেসীয় জাতির একটি নিম্নস্তরের কৃষ্ণ-ত্বচশাখা (low form of Caucasian Melanochroi) বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। এই মতের সপক্ষে প্রমাণ-স্বরূপ প্রদর্শিত হয় যে, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে টার্ণভিল পীটার (Turnville Petre) গ্যালিলি প্রদেশের 'রবার্স কেভ' নামক গিরিগুহায় যে-ধরণের (Neanderthaloid) নরকঙ্কাল প্রাপ্ত হন এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারি (W. E. Barrey) দক্ষিণ-আফ্রিকার রোডেসিয়া প্রদেশের 'ব্রোকেন্ হিল্' পাহাড়ের গুহায় রোডেসিয়ান্ মানুষের যে কঙ্কাল প্রাপ্ত হন তাহার গঠন অষ্ট্রেলিয়ানদের দৈহিক গঠনের অনুরূপ, এবং মুণ্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সুদূর সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। যদিও অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতিদের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক কালের নিয়াণ্ডারথাল্-মানবের কোনো সম্পর্ক থাকার কথা আধুনিক নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেকেই অস্বীকার করেন, তবুও সম্প্রতি আমেরিকার বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিৎ হার্ডলিস্কা (Hardlicka) এবং ভারতীয় প্রাণিতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর কর্নেল সিউয়েল ঐ পুরাতন মতের পুনরুত্থাপন ও সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু গ্যালিলিতে প্রাপ্ত নিয়াণ্ডারথাল-মানবের করোটি ব্যতীত প্যালেসটাইনের মাউণ্ট কার্মেলের য়্যাথলিট (Athlit) গুহা এবং শুখা (Shukhah) গুহাতে যে নরকঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি পরবর্ত্তী যুগের Neanthropic বা নূতন মানুষের। অষ্ট্রেলিয়ায় যে দুইটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের কঙ্কালাবশেষ (Talgai skull ও Cohuna skull) এ-পর্য্যন্ত পাওয়া

গিয়াছে তাহা উভয়েই সমজাতীয় এবং অনেকাংশে নিয়াণ্ডারথাল আদিম মানবের (Homo Primigenius-এর) অনুরূপ। স্যর আর্থার কীথের মতে :—

"Both skulls represent the proto-Australian type out of which the modern aboriginal type has been evolved."—*New Discoveries relating to the Antiquities of a Man*, p. 308.

দ্বিতীয়তঃ, মুণ্ডাজাতির মধ্যে যেটুকু মোঙ্গোলিয়ান সংমিশ্রণের আভাস পাওয়া যায় তাহা, সম্ভবতঃ সমুদ্রযোগে, দক্ষিণ-মোঙ্গোলীয় (Pareœan) জাতির লোকেরা এখানে আনিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মুণ্ডা-গোষ্ঠীর agglutinative ভাষাগুলির সহিত সুমেরু-দেশীয় ভাষার সম্বন্ধ আছে এরূপ মনে করেন।

সে যাহাই হউক, মুণ্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদের পূর্ব্বপুরুষেরা সম্ভবতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী নেগ্রিটো জাতিদের আংশিক উচ্ছেদসাধন করে এবং অবশিষ্ট অংশের কতক প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবক্রমে লয়প্রাপ্ত হইল, কতক বা মুণ্ডা-গোষ্ঠীয়দের সংমিশ্রণে পৃথক অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিল। কেবল তাহাদের কিছু কিছু অংশ দক্ষিণ-ভারতের উরুলা, কাড়ার, চেঞ্চু প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে সম্ভবতঃ রহিয়া গিয়াছিল। মুণ্ডা-গোষ্ঠীয়দের কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, এক সময় তাহারা—অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে প্রধান জাতিগুলি—শোণ, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদনদীর উপত্যকায় বাস করিত এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা কিয়ৎ-পরিমাণ সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিত। ইহারাই সম্ভবতঃ ভারতে প্রথম কৃষিকার্য্য করে। উত্তর-ভারতের পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া ইহাদেরই শাখা-প্রশাখা ব্রহ্মদেশ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব-মহাসাগরের মলয়-উপদ্বীপ হইয়া আরও দূরে যায়। দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপের বেদ্দারাও (Vedda) ইহাদেরই একটি প্রশাখা এইরূপ অনুমান হয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা আসাম ও ব্রহ্মদেশ হইয়া আরও পূর্ব্বে চলিয়া যায়, তাহাদের এক দল মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে ইণ্ডো-নেসিয়ান জাতিতে পরিণত হইল। ইহার অনেক পরে আবার সেই ইণ্ডোনেসিয়ানদের মধ্যে কতক আসামে গিয়াছিল এবং দক্ষিণ-ভারতের উপকূলেও তাহাদের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

যখন মুণ্ডাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা সমগ্র ভারতে



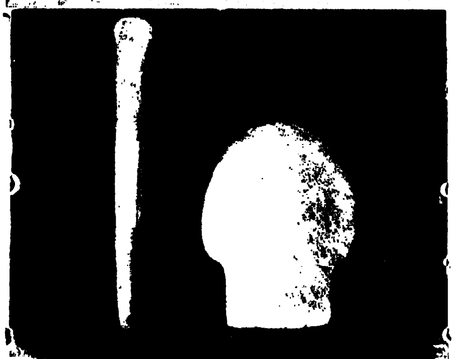
জুয়াঙ্গদের ছাগল শূকর প্রভৃতি রাখিবার ঘর। ইহা নাগা (মোঙ্গোলিয়ান) জাতির মাচার উপরে নির্ম্মিত 'চাঙ্গ' গৃহের অনুরূপ

পরিব্যাপ্ত ছিল এমন সময়ে এদেশে আর একটি নূতন জাতির আবির্ভাব হয়। ইহাদের পূর্ব্ববাসস্থান এবং কৃষ্টিগত উদ্ভবস্থল (area of characterization) ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমি বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে। এই জন্য ইহাদিগকে অসুর জাতি (Mediterranean race বা Proto-Mediterranean race) বলা হয়। ইহারা দলে দলে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে সম্ভবতঃ বেলুচিস্থান হইয়া ভারতে প্রবেশ-করে। বেলুচিস্থান ও ভারতের সীমান্ত-প্রদেশে যে ব্রাহুই (Brahui) জাতি আছে তাহাদের ভাষা ইহাদেরই ভাষার সমজাতীয়। হয়ত পরে জলপথেও এই অসুর জাতির কোন কোন দল ভারতে আগমন করিয়াছিল।

এই নবাগত অসুর জাতির কোন কোন দল উত্তর-ভারতে মুণ্ডাগোষ্ঠীর জাতিদের প্রভাব দেখিয়া দক্ষিণ-ভারতের দিকে অগ্রসর হইল এবং সেখানকার অপেক্ষাকৃত হীনবল নেগ্রিটো জাতিদের বিধ্বস্ত করিয়া ক্রমে সমস্ত দক্ষিণ-ভারত অধিকার ও দ্রাবিড়-সভ্যতার পত্তন করিল। দক্ষিণ-ভারতে মুণ্ডাগোষ্ঠীর যে-সব জাতি ছিল তাহারা ক্রমে নবাগত অসুর জাতিদের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। আর অসুর জাতির মধ্যে যাহারা উত্তর-ভারতে বসবাস করিল তাহাদের এক দল সিন্ধু-উপত্যকায় ক্রমে আধিপত্য স্থাপন করিয়া ভারতের বাহিরের অন্যান্য জাতির











সংস্পর্শে ও সম্ভবতঃ আংশিক সংমিশ্রণে সভ্যতার সাতিশয় উৎকর্ষসাধন করিয়াছিল, মহেঞ্জোদাড়ো ও হারাপ্পার ধ্বংসাবশেষ হইতে এরূপ অনুমান হয়। ভারতের আরও পূর্ব্বে অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা, তাপ্তী, নর্ম্মদা প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় যে মেডিটারেনিয়ন জাতির দলেরা বসবাস করিয়াছিল তাহাদের সংঘর্ষে অপেক্ষাকৃত অসভ্য বর্ব্বর মুণ্ডা-জাতিগুলি (জুয়াঙ্গ, বিরহোড় প্রভৃতি) পাহাড়-পর্ব্বতে আশ্রয় লইল; কেবল মুণ্ডা, শবর, সাঁওতাল প্রভৃতি কয়েকটি অপেক্ষাকৃত শক্তিমান মুণ্ডা-গোষ্ঠীয় 'কোলজাতি' শোণ, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদনদীর উপত্যকায় স্থানে স্থানে নিজেদের প্রভাব কোনঃ রকমে বজায় রাখিতে সমর্থ হইল এবং কালে আশপাশের অসুর জাতিদের সঙ্গে তাহাদের কতক কতক সংমিশ্রণও হইল।

মুণ্ডাগোষ্ঠীয় জাতির ভারতে আগমনের বহু কাল পরে এবং সম্ভবতঃ দ্রাবিড়-ভাষীদের আগমনের কিছু পরে ককেসীয় জাতির আরও একটি শাখা ভারতে আসিয়াছিল এরূপ অনুমান হয়। ইহারাই বাঙালী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি জাতির পূর্ব্বপুরুষ। পুরুষ-পরম্পরা আল্পস্ পর্ব্বত-শ্রেণীর মালভূমিতে সুদীর্ঘকাল অবস্থিতি করায় ইহাদের গোলাকৃতি মস্তক এবং দৈহিক গঠনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য জন্মে; সেই জন্য ইহারা এবং ইহাদের জ্ঞাতি-জাতিরা আলপাইন জাতি নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ উত্তর-ভারতে অসুর ও মুণ্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদের প্রাচুর্ভাব ও প্রাধান্য দেখিয়া ভারতে আগত এই আলপাইন জাতির এক

চিত্র-পরিচয়

(উপর হইতে)

১। ছোটনাগপুরের প্রাগৈতিহাসিক "অসুর"-ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃষ।

২। ছোটনাগপুরে প্রাপ্ত নব-প্রস্তর-যুগের কুঠার-ফলক। (বাম হইতে দ্বিতীয়টি 'স্কন্ধ'-যুক্ত)

৩। ছোটনাগপুরে প্রাপ্ত তাম্র-অস্ত্র।

৪। ছোটনাগপুরে প্রাপ্ত পুরাতন-প্রস্তর-যুগের অস্ত্র।

৫। ছোটনাগপুরের "অসুর"-ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত দগ্ধ মৃত্তিকায় (terra cotta) দ্রব্যাদি। দ্বিতীয়টি লিঙ্গের প্রতীক।

দল গুজরাটে অবস্থান করে; এক দল আরব-উপসাগরের উপকূল দিয়া দক্ষিণ দিকে মহীশূর, কুর্গ প্রভৃতি প্রদেশে যায় ও আর এক দল মধ্যভারত ও বিহারের পূর্ব্ব প্রান্ত হইয়া বাংলা দেশে যায়। ইহারাই গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী ও বাঙালী জাতির পূর্ব্বপুরুষ। 'ঘোষ' 'মিত্র' 'নাগ' 'পাল' প্রভৃতি কয়েকটি পদবী বাঙালী কায়স্থদের মধ্যে এবং গুজরাটী নগর-ব্রাহ্মণদের মধ্যেও দেখা যায়। ইহা হইতে এরূপ অনুমান হয়ত অসঙ্গত হইবে না যে আর্য্যদের সঙ্গে সংমিশ্রণের পূর্ব্বে বাংলা দেশের কায়স্থগণ বাঙালী সমাজে এবং গুজরাটের নগর-ব্রাহ্মণেরা গুজরাটী সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিত; সম্ভবতঃ বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও জাতিভেদ সংস্থাপিত হইবার পর তখনকার সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর বাঙালীদের মধ্যে যাঁহারা যজন-যাজন করিতেন তাঁহারা ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত হইলেন, আর ঐ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন তাঁহারা কায়স্থ পদবাচ্য হইলেন। বর্ত্তমান কায়স্থ জাতির পূর্ব্বপুরুষদের এক দল জ্ঞাতি বা স্বশ্রেণী ছাড়াও কান্যকুব্জ প্রভৃতি হইতে আগত কতিপয় আর্য্য ব্রাহ্মণ-বংশ ও এই উভয়ের সংমিশ্রণ-সম্ভূত বংশগুলি মিলিয়া বাঙালী ব্রাহ্মণের উদ্ভব হয়। ভারতের নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে সরকারী তদন্তে রিজ্‌লি সাহেবের Anthropometrical measurements-এর মাপ হইতে জানা গিয়াছে যে, পূর্ব্ববঙ্গের ও পশ্চিম-বঙ্গের ব্রাহ্মণদের Average Cephalic index গড়পড়তা ৭৮·২ এবং বাংলা দেশের কায়স্থদের মাথারও ঠিক ঐ মাপ (৭৮·২), কেবল নাসিকার মাপ বাঙালী কায়স্থ এবং পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ দুয়েরই গড়পড়তা ৭০·৩ অর্থাৎ লম্বা ও সরু; কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের ব্রাহ্মণদের গড়পড়তা ৭১·৯ অর্থাৎ ঈষৎ বেশী মোটা নাক। পরে কোন কোন নৃতত্ত্ববিৎ যে মাপ করিয়াছেন তাহাতে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সে যাহা হউক, বঙ্গদেশের কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের মধ্যে দৈহিক গঠনে বা সহজ মানসিক ক্ষমতায় বা সংস্কৃতিতে বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না।

অষ্ট্রিক ভাষাভাষী মুণ্ডাগোষ্ঠীয় জাতি, মেডিটারেনিয়ন-গোষ্ঠীয় দ্রাবিড়ভাষী অসুর জাতি ও আল্‌পাইন-গোষ্ঠীয় জাতিগুলি ছাড়া ভারতে আর একটি প্রধান জাতি মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর। ঐতিহাসিক যুগেই ইহাদের অধিকাংশ উত্তর-পূর্ব্ব অভিমুখ হইতে আসামে এবং সামান্য কতক হিমালয়ের উত্তর দিক হইতে হিমালয়ের দক্ষিণ-পাদমূলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। উত্তর-পূর্ব্ব হইতে মোঙ্গোলীয়দের আগমন এখনও একেবারে ক্ষান্ত হয় নাই। আসামের অধিকাংশ অধিবাসী ইহাদের বংশসম্ভূত; উত্তর-বঙ্গের কোচ জাতি এবং উত্তর-বিহারের থাড়ু জাতির মধ্যে মোঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণ দেখা যায়। রিজ্‌লি-প্রমুখ সাবেক নৃতত্ত্ববিদেরা বাঙালী জাতির যে মোঙ্গোলিয়ান ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে উৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া আধুনিক নৃতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন।

পরিশেষে সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় কি তৃতীয় সহস্রকে, হয়ত বা তৎপূর্ব্বেই, আর্য্যজাতি উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ভারতে আগমন করেন। প্রথমে পঞ্চনদতীরে আর্য্যদের সঙ্গে ভারতের অসুর (Mediterranean) জাতির সংঘর্ষ হইল। সুর-দেবতার উপাসক আর্য্যেরা উত্তর-ভারতের এই আর্য্যদেবদ্বেষী মেডিটারেনিয়ন্ জাতিদের 'অসুর' নামে অভিহিত করেন। সিন্ধু-উপত্যকায় মহেঞ্জোদাড়ো ও হারাপ্পা প্রভৃতি স্থানের অসুরেরা কোন অজ্ঞাত কারণে তৎপূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়াছিল এরূপ অনুমিত হয়। মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি মুণ্ডাগোষ্ঠীর মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতিরা শোণ-নদ ও গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় তখন বাস করিত তাহারাও আর্য্যদের তাড়নায় ক্রমে পূর্ব্বে ও দক্ষিণে সরিয়া যাইতে লাগিল। উত্তর-ভারতের পঞ্জাব হইতে মগধ পর্য্যন্ত মেডিটেরেনিয়ন-গোষ্ঠীর যে-সব অসুর আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বে আধিপত্য করিত তাহারা ক্রমে ক্রমে আর্য্যদের নিকট পরাভূত ও কতক বশীভূত হইয়া কালে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিল। অনুমান হয় যে, তাহাদের মধ্যে উচ্চবংশীয় কতকগুলি পরিবার আর্য্যদের সঙ্গে সংমিশ্রিত হইয়াছিল; কতক বা পূর্ব্ববর্ত্তী আল্‌পাইন জাতিদের মধ্যে মিশিয়া গেল। আর নিম্নস্তরের অসুরেরা মুণ্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদের মধ্যে লীন হইয়া গেল।

সম্ভবতঃ এই অসুর জাতিরই একটি প্রশাখা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশে অধিষ্ঠিত

হইয়া বহুকাল হইতে নির্ব্বিবাদে বাস করিত। ছোটনাগপুরের মুণ্ডাদের কিংবদন্তী এইরূপ যে পুরাকালে ছোটনাগপুরের মালভূমিতে 'অসুর'দের একটি সুদূর বিচ্ছিন্ন দলের বাস ছিল; যখন মুণ্ডারা গঙ্গার—পরে শোণ-নদের—উপত্যকা হইতে ক্রমে ক্রমে বিতাড়িত হইয়া ছোটনাগপুরের মালভূমিতে প্রবেশ করে তখনও এই অসুরদের এখানে পূর্ণ প্রভাব। ছোটনাগপুরের ধাতব দ্রব্যের নির্ম্মাণ ও প্রচলন এই অসুরদের দ্বারাই হয়, কিংবদন্তী এইরূপ। তাম্র-যুগের এবং পুরাতন লৌহ-যুগের যে-সব নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়, জনশ্রুতি এই যে সেগুলি এই অসুরদের নির্ম্মিত। এই জন্যই তাহাদের পরবর্ত্তী কালের যে মুণ্ডাভাষাভাষী অসভ্য জাতি এখানে এখনও আছে এবং আকরজাত ধাতু (ore) হইতে লোহা-গলানো পেশা অবলম্বন করিয়াছে তাহাদিগকে 'অসুর' নামে অভিহিত করা হয়; বস্তুতঃ, তাহাদের সঙ্গে ছোটনাগপুরের তাম্র-যুগের অসুরদের কোন জাতিগত সম্বন্ধ আছে এরূপ মনে হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋগ্বেদে অসুর জাতির সঙ্গে আর্য্য জাতির দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। ছোটনাগপুরের তাম্র-যুগের অসুরেরা সম্ভবতঃ তাহাদেরই সুদূরবিক্ষিপ্ত একটি বিচ্ছিন্ন শাখা। ঋগ্বেদে অসুরদিগকে 'শিশ্ন দেবাঃ' বলা হইয়াছে; সাধারণতঃ পণ্ডিতেরা 'শিশ্ন দেবাঃ' শব্দের অর্থ করেন 'লিঙ্গ-উপাসক'। ছোটনাগপুরের অসুরদের ধ্বংসাবশেষগুলিতে প্রস্তর-লিঙ্গ ও অনেক পোড়ামাটির লিঙ্গ-প্রতীক পাওয়া যায়।

সে যাহা হউক, সম্ভবতঃ নব প্রস্তর-যুগ হইতে লৌহ-যুগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এখানে এই তথাকথিত অসুর জাতির প্রভাব ছিল; মুণ্ডাদের কিংবদন্তী এইরূপ সাক্ষ্য দেয় এবং তাহার বস্তুগত প্রমাণও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। আবার ঐ যুগে প্রাপ্ত প্রস্তরাস্ত্র প্রভৃতির দুই-একটিতে মৌর্য্য-যুগের ধ্বজস্তম্ভ বা 'লাট' এবং মৌর্য্য প্রস্তর-মূর্ত্তির পালিশের অনুরূপ মসৃণ ও চিক্কণ পালিশ দৃষ্ট হয়। ঐ পালিশ যদি প্রস্তরবিশেষের স্বাভাবিক পালিশ না হয় তাহা হইলে মৌর্য্য-যুগের ঐ শিল্প-বৈশিষ্ট্য পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তর-তাম্র-যুগের দান বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

অবসর-মত ছোটনাগপুরের প্রাগৈতিহাসিক কালের সমাধিস্থানগুলি ও আবাসস্থানের ধ্বংসাবশেষগুলি খনন ও অন্বেষণ করিয়া পুরাতন ও নূতন প্রস্তর-যুগের, মিশ্র প্রস্তর ও তাম্র-যুগের ও অবিমিশ্র তাম্র-যুগের অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার ও তৈজসপত্রাদির কিছু কিছু নিদর্শন পাইয়াছি; তাহার অধিকাংশই পাটনার সরকারী যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাম্র ও টিনের সংমিশ্রণে যে ব্রোঞ্জ ধাতু প্রস্তুত হয় ইউরোপে বিমিশ্র তাম্র-অস্ত্রের পরিবর্ত্তে সেই ব্রোঞ্জের অস্ত্রাদিই বেশী পাওয়া যায়। টিনের খনি ভারতে তেমন বেশী নাই। সেই জন্য সম্ভবতঃ ভারতে ব্রোঞ্জ-যুগের পরিবর্ত্তে তাম্র-যুগ প্রচলিত ছিল। তবে ছোটনাগপুরের এবং ভারতের অন্য কোন কোন স্থানে ব্রোঞ্জে নির্ম্মিত তৈজসপত্র কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে। ছোটনাগপুরে এমন কি একটি ব্রোঞ্জের কুঠার-ফলকও পাইয়াছি। ইহা বর্ত্তমান পাটনার সরকারী যাদুঘরে আছে। ভারতের আর কোথাও ব্রোঞ্জের অস্ত্র আবিষ্কারের কথা আমার জানা নাই। যদি এগুলি সেকালে ভারতের বাহির হইতে আমদানী হইয়া থাকিত, তাহা হইলে ছোটনাগপুরের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বহির্জগতের যোগ ছিল বুঝিতে হইবে। যদিও পাণ্ডবদের দিগ্বিজয়-যাত্রার পথে ছোটনাগপুর সম্ভবতঃ বাদ পড়িয়াছিল, তথাপি বাহিরের সঙ্গে ছোটনাগপুরের যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এরূপ মনে হয় না।*

---

* বিগত ২২শে কার্ত্তিক (রাঁচি) হিন্দু ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাব সাহিত্য-সম্মিলনার বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

একাদশ পরিচ্ছেদ

২

লোচনদাসের আখড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। কোন্ দিকে যাব তার কিছুই ঠিক নেই। বর্ষাকাল কেটে গিয়েছে, আকাশ নির্ম্মল, শরতের শাদা লঘু মেঘখণ্ড নীল আকাশ বেয়ে উড়ে চলেছে, মণিহারী ঘাটের কাছে গঙ্গা পার হবার সময় দেখলুম গঙ্গার চরের কাশ-বনে কি অজস্র কাশফুলের মেলা! খানিকটা রেলে খানিকটা পায়ে হেঁটে এলাম কহলগাঁয়ে। গঙ্গার ধারে নির্জ্জন স্থানটি বড় ভাল লাগল। ষ্টেশনের কাছেই পাহাড়, সামনে যে পাহাড়টা, তার ওপরে ডাক-বাংলা—এখানে একটা রাত কাটালাম। ডাক-বাংলার কাছে কি চমৎকার এক প্রকার বন্যফুল ফুটেছে, জ্যোৎস্না রাত্রে তার সুগন্ধে ডাক-বাংলার বারান্দা আমোদ ক'রে রেখেছে।

এক দিন কহলগাঁয়ের খেয়াঘাটে শুনলাম ক্রোশখানেক দূরে গঙ্গার ধারে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে এক জন সাধু থাকেন। একখানা নৌকা ভাড়া ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। বটেশ্বরনাথ পাহাড় দূর থেকে দেখেই আমার মনে হ'ল এমন সুন্দর জায়গা আমি কমই দেখেছি, এখানে শান্তি ও আনন্দ পাব। গঙ্গার ধারে অনুচ্চ ছোট পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় জঙ্গল, নানা ধরণের বুনো গাছ, এক ধরণের হলদে পাপড়ি বড় বড় ফুল ফুটেছে পেয়ারাগাছের মত গাছে, নাম জানি নে। একটা বড় গুহা আছে পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের ঢালুতে জঙ্গলের মধ্যে। গুহার মুখের কাছে প্রাচীন একটা বটগাছ, বড় বড় ঝুরি নেমেছে, ঘন ছায়া, পাকা বটফল তলায় প'ড়ে আছে রাশি রাশি। সাধুটির সঙ্গে আলাপ হ'ল, বাড়ি ছিল তাঁর মাদ্রাজে, কিন্তু কথাবার্ত্তায় চেহারায় হিন্দুস্থানী। সাধুটা খুব ভাল লোক, লম্বাচওড়া কথা নেই মুখে, বাঙালী বাবু দেখে খুব খাতির করলেন। নিজে কাঠ কুড়িয়ে এনে চা ক'রে খাওয়ালেন, আমার সম্বন্ধে দু-একটা কথা জিগ্যেস করলেন। বললেন, আপনি এখানে যত দিন ইচ্ছে থাকুন, এখানে খরচ খুব কম। আমি এর আগে মুঙ্গেরে কষ্টহারিণীর ঘাটে ছিলাম, শহরবাজার জায়গা, এত খরচ পড়ত যে টিকতে পারলাম না। তাও বটে, আর দেখুন বাবুজী, সাধুরা চিড়িয়ার জাত, আজ এখানে, কাল ওখানে—এক জায়গায় কি ভাল লাগে বেশী দিন?

লোকজন বিশেষ নেই, স্থানটি অতিশয় নির্জ্জন, কথা বলবার লোক নেই, তার প্রয়োজনও বোধ করি নে বর্ত্তমানে—সারা দিনের মধ্যে সন্ধ্যার সময় সাধুজীর সঙ্গে ব'সে একটু আলাপ করি। এত দিন কোথাও যে-শান্তি পাই নি, এখানে তার দেখা মিলেছে, এক দিন পাহাড়ের ওপরে বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলের মধ্যে একটা সুঁড়ি-পথ পেলাম। পাহাড়ের গা কেটে পথটা করা হয়েছে, ডাইনে উঁচু পাহাড়ের দেওয়ালটা, বাঁয়ে অনেক নীচে গঙ্গা, ঢালুটাতে চামেলীর বন, একটা প্রাচীন পুষ্পিত বকাইন গাছ পথের ধারে। কিছু দূর গিয়ে দেখি, পাহাড়ের গায়ে খোদাই-করা কতকগুলো বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি—গবর্ণমেণ্টের নোটিশ টাঙানো আছে এই মূর্ত্তিগুলো কেউ নষ্ট করতে পারবে না ইত্যাদি। আমি জানতাম না এদের অস্তিত্ব। জায়গাটা অতি চমৎকার, সূর্য্যাস্তের সময় সেদিন পীরপৈঁতির অনুচ্চ শৈলমালার ওপরের আকাশটা লাল হয়ে উঠল, গঙ্গার বুকে আকাশজোড়া রঙীন মেঘমালার ছায়া, খোদাই-করা দেবদেবীর মূর্ত্তি গোধূলির চাপা আলোয় কেমন একটা অনির্দ্দেশ্য শ্রী ধারণ করেছে—সে শ্রী বড় অদ্ভুত, কোন মূর্ত্তির নাক ভাঙা, কোনটার হাত নেই, বেশীর ভাগ মূর্ত্তিরই মুখ খসে গিয়েছে—কিন্তু গোধুলি রক্ত-পিঙ্গল আকাশের ছায়ায় যক্ষিণী যেন জীবন্ত হয়ে উঠল; পাথরে কাটা পীন স্তনযুগল যেন রক্তমাংসের ব'লে মনে হ'ল, লুম্বিনী উদ্যানের ছায়াতরুমূলে শায়িতা আসন্ন-প্রসবা মায়াদেবীর চোখের পলক যেন পড়ে পড়ে···তার পর চামেলীর বন কালো

হয়ে গেল, গঙ্গার বুকে নোঙর-করা বড় বড় কিস্তীর মাঝিরা হনুমানজীর ভজন গাইতে সুরু ক'রে দিলে, পাহাড়ের পুব দিকে ছোট কেওলিন খনিটাতে মজুরদের ছুটির ঘণ্টা পড়ল—আমি তখনও অবাক হয়ে দাঁড়িয়েই আছি।...রাঢ় দেশের মাঠে সেই খালের ধারের তালবনে সেদিন যে অদ্ভুত ধরণের শান্তি ও আনন্দ পেয়েছিলুম, সেটা আবার পাবার আশায় কত ক্ষণ অপেক্ষা করলুম—কিন্তু পেলাম কই? তার বদলে একটা ছবি মনে এল।

আমি জানি এ-সব কথা ব'লে কি কিছু বোঝানো যায়? যায় না হয়েছে, সে কি ঘরের লেখা পড়ে কিছু বুঝতে পারবে, না আমিই বোঝাতে পারবো? মনে হ'ল কোথায় যেন এক জন পথিক আছেন ঐ নীল আকাশ, ঐ রঙীন মেঘমালা, এই কলরবপূর্ণ জীবনধারার পেছনে তিনি চলেছেন...চলেছেন...কোথায় চলেছেন নিজেই হয়ত জানেন না। তাঁর কোন সঙ্গী নেই, তাঁকে কেউ বোঝে না, তাঁকে কেউ ভালবাসে না। অনাদি অনন্তকাল ধরে তিনি একা একা পথ চলেছেন। এই দৃশ্যমান বিশ্ব, এদের সমস্ত সৌন্দর্য্য—তিনি আছেন বলেই আছে।

আমি তাঁকে ছোট ক'রে দেখতে চাইনে। তাঁকে নিয়ে পুতুলখেলার বিরুদ্ধে ছোটবেলা থেকে আমি বিদ্রোহ ক'রে আসছি। তিনি বিরাট, মানুষে দশ হাজার বছর তাঁকে যত বুঝে এসেছে আগামী দশ হাজার বছরে তাঁকে আরও ভাল ক'রে বুঝবে। এক-আধ জন মানুষে কি করবে? সমগ্র মানব জাতি যুগে যুগে তাঁকে উপলব্ধির পথে চলেছে। আমি তাঁকে হঠাৎ বুঝে শেষ করতে চাই নে—কোটী যোজন দূরের তারার আলো যেমন লক্ষ বৎসর ধরে পৃথিবীতে আসছে...আসছে...তেমনি তাঁর আলোও আমার প্রাণে আসছে...হয়ত সিকি পথও এখনও এসে পৌঁছয় নি—কত যুগ, কত শতাব্দী, এখনও দেরি আছে পৌঁছবার। এই ত আমার মনের আসল য়্যাডভেনচার (adventure), এ যেন আমার হঠাৎ ফুরিয়ে না যায়। আমি খুঁজে বেড়াবো...এই খোঁজাই আমার প্রাণ, বুদ্ধি, হৃদয়কে সঞ্জীবিত রাখবে, আমার দৃষ্টিকে চিরনবীন রাখবে।

আমি হয়ত এজন্মে তাঁকে বুঝবো না, হয়ত বহু জন্মেও বুঝবো না—এতেই আনন্দ পাব আমি, যদি তিনি আমার মনের বেদীতে হোমের আগুন কখনও নিবে যেতে না-দেন, শাশ্বত যুগসমূহের মধ্যে, সুদীর্ঘ অনাগত কাল ব্যেপে। আমি চাই ওই নীল আকাশ, ওই সবুজ চর, কলনাদিনী গঙ্গা, দূরের নীহারিকা পুঞ্জ, মানুষের মনোরাজ্য, ওই হলদে-ডানা প্রজাপতি, এই শোভা, এই আনন্দের মধ্যে দিয়ে তাঁকে পেতে।

লোচনদাসের আখ্‌ড়াতে সবাই বললে, আমি নাস্তিক, কারণ আমি বলতাম নাম-জপ করা কেন? ঈশ্বরের নাম দিতে পেরেছে কে? শেষ-পর্য্যন্ত উদ্ধব বাবাজী আমাকে আখ্‌ড়া ছাড়িয়ে দিল এই জন্যে বোধ হয়।

এক দিন বৈকালে গঙ্গায় নাইতে নেমেছি—কাটারিয়ার ওপারের বহুদূর দিকচক্রবালের প্রান্ত থেকে কালো মেঘ ক'রে ঝড় এল, গঙ্গার বুকে বড় বড় ঢেউ উঠল, আমার মুখে কপালে মাথায় বুকে ঢেউ ভেঙে পড়ছে, ওপারের চরের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, জলের সুঘ্রাণ পাচ্ছি—এরকম কত ঝটিকাময় অপরাহ্ণ ও কত নীরন্ধ্র অন্ধকারময়ী রাত্রির কথা মনে এল—আমারই জীবনের কত সুখদুঃখময় মুহূর্ত্তের কথা মনে এল—

মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হ'ল, তাকে আনন্দও বলতে পারি, প্রেমও বলতে পারি, ভক্তিও বলতে পারি। তার মধ্যে ও তিনটেই আছে। বটেশ্বরনাথের পাহাড়টার ঠিক ধূসর স্তূপের দিকে চেয়ে, দূর, দূর, দিগন্তের দিকে চেয়ে যেখানে বাংলা দেশ, যেখানে মালতী আছে, যেখানে এমন কত সুন্দর বর্ষার সন্ধ্যা মধুর আনন্দে কাটিয়েছি, কত জ্যোৎস্নারাত্রে শুক্‌নো মকাই-ঝোলানো চালাঘরের দাওয়ার তলায় ব'সে দু-জনে কত গল্প করেছি, তার মুখে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে...কতবার অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে সে এসেছে—আবার কতবার ডাকলেও আসে নি, কতবার চোখোচোখি হলেই হেসে ফেলেছে—এ কথা মনে হয়ে আমার মনে কেমন একটা উন্মাদনা, আনন্দ, প্রেম, ভক্তি আরও কত কি ভাবের উদয় হ'ল একটা বড় ভাবের মধ্য দিয়ে। ওই একটার মধ্যে সবটা ছিল। তাদের আলাদা আলাদা করা যায় না—কিন্তু তারই প্রেরণায় আমার আঙুল আপনা-আপনি বেঁকে গেল, গঙ্গার জলে

মা, বাবা, হীরু-জ্যাঠার নামে তর্পণ করলুম, ভগবানের নামে সমস্ত দেহ-মন নুয়ে এল, জলের ওপরই মাথা নত ক'রে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করলুম। সীতার জন্য করুণ সহানুভূতিতে চোখে জল এল। হঠাৎ ঘোর বৈষয়িকতার জন্য জ্যাঠামশায়ের প্রতি অনুকম্পা হ'ল—আবার সেই সৃষ্টিছাড়া অপরূপ মুহূর্ত্তেই দেখলুম মালতীকে কি ভালই বাসি, মালতীর সহায়হীন, সম্পদহীন, ছন্নছাড়া মুর্ত্তি মনে ক'রে একটা মধুর স্নেহে, তাকে সংসারের দুঃখকষ্ট থেকে বাঁচাবার আগ্রহে তাকে রক্ষা করবার, আশ্রয় দেবার, ভালবাস্‌বার, ভাল করবার, তার মনে আনন্দ দেবার, তার সঙ্গে কথা বলবার আকুল আগ্রহে সমস্ত মন ভরে উঠ্‌ল—কি জানি সে মুহূর্ত্ত কি ক'রে এল সেই মেঘান্ধকার বর্ষণমুখর সন্ধ্যাটিতে, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন সেই মহামুহূর্ত্তে আমার মধ্য দিয়ে তার সমস্ত পুলকের, গৌরবের, অনুভূতির সঞ্চয়হীন বিপুল দানে আত্মপ্রকাশ করলে। সেদিন দেখ্‌লুম ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকার ভক্তির প্রকৃতি মালতীর প্রতি আমার ভালবাসার চেয়ে পৃথক নয়। ও একই ধরণের, একই জাতীয়। যেখানে হৃদয়ের অনুভূতি নেই, ভালবাসা নেই, সেখানে ঈশ্বরও নেই। ভগবানের প্রতি সেদিন যে ভক্তি আমার এল—তা এল একটা অপূর্ব্ব আনন্দের রূপে—সত্যিকার ভক্তি একটা Joy of life···আত্মা, দেহ, মন সেখানে আনন্দে, মাধুর্য্যে আপ্লুত হয়ে যায়।

ঠিক মালতী আমাকে ভালবেসেছে বা আমি মালতীকে ভালবেসেছি এই ভেবে যেমন হয় তেমনি। কোন পার্থক্য নেই। একই অনুভূতি—দুটো আলাদা আলাদা নাম মাত্র। এতেও মন অবশ হয়ে যায় আনন্দে—ওতেও।

উপলব্ধি ক'রে বুঝলুম যদি কেউ আমাকে আগে এ-সব কথা বল্‌ত, আমার কখনই বিশ্বাস হ'ত না। হওয়া সম্ভবও নয়।

সাধুজী সন্ধ্যাবেলা রোজ ধর্ম্মকথা পড়েন। আমি মনে মনে বলি সাধুজী আপনি জীবন দেখেন নি। ভালবেসেছেন কখনও জীবনে? প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছেন? যে কখনও নরুণ হাতে নিতে সাহস করে নি, সে যাবে তলোয়ার খেলতে? শুকনো বেদান্তের কথার মধ্যে ঈশ্বর নেই—যেখানে ভাব নেই, ভালবাসা নেই, হৃদয়ের দেওয়া-নেওয়া নেই, আপনাকে হারিয়ে ফেলা, বিলিয়ে দেওয়া নেই—সেখানে ভগবান নেই, নেই, নেই। হৃদয়ের খেলা যে আস্বাদ করেছে, ও রস কি জিনিষ যে বোঝে—ভগবানকে ভালবাসার প্রথম সোপানে সে উঠেছে।

আমি মালতীর কথা এত ভাবি কেন? সে আমাকে এত অভিভূত ক'রে রেখেছে কেন দিন, রাত, সকাল, সন্ধ্যা?···এই বিক্রমশিলা বিহারের পাহাড়মালা, বনশ্রেণী, পাদমূলে প্রবাহিতা পুণ্যস্রোতা নদী, সন্ধ্যার পটে রাঙা সূর্য্যাস্ত, বনচামেলীর উগ্র উদাস গন্ধ—এ-সবের মধ্যে সে আছে, তার হাসি নিয়ে, তার মুখভঙ্গি নিয়ে, তার গলার সুর নিয়ে, তার শতসহস্র টুক্‌রো কথা নিয়ে, তার ছেলেমানুষী ভঙ্গি নিয়ে। কেন তাকে ভুলি নি, কেন তার জন্যে আমার মন সর্ব্বদাই উদাস, উন্মুখ, ব্যাকুল, বেদনায় ভরা, স্মৃতির মাধুর্য্যে আপ্লুত, নিরাশার যন্ত্রণাময়—হঠাৎ তাকে এত ভালবাস্‌লুম কেন? তার কথা মনে যখন আসে, তখন কেওলিন খনির উপরকার পাহাড়চূড়াটায় একটা বকাইন গাছের গুঁড়ি চেস্ দিয়ে সারাদিন তার কথা ভাবি—খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকে না, ভালও লাগে না—তার মুখের হাসির স্মৃতিতেই যেন আমার শান্তিময়, নিভৃত, গৃহকোণ, তার কথার সুর দূরের ব্যবধান ঘুচিয়ে, মাঠ নদী বন পাহাড় পার হয়ে ভেসে এসে আমায় প্রদীপ-জ্বালানো, শান্ত আঙিনায় ছোট্ট খড়ের রান্নাঘরের এক পাশে উপবিষ্ট নিরীহ গৃহস্থ সাজায়—জীবনে তাই যেন চেয়ে এসেছি, সব দুরাশা, সব-কিছু ভুলিয়ে দেয়, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে যায়···এদিকে রোদ চড়ে ওঠে কিংবা সূর্য্য ঢলে পড়ে, বটেশ্বরনাথের পাহাড় রঙে রঙে রাঙা হয়, পাখীর গান হঠাৎ যায় থেমে—সাধুজীর চেলা বর্ম্মানারায়ণ আমাকে খুঁজ্‌তে আসে চা খাবার জন্যে···তখন অনিচ্ছা সত্বে উঠতে হয়···গাঁজার ধোঁয়ায় অন্ধকার সাধু-বাবাজীর গুহার সাম্‌নে ব'সে দুধবিহীন কড়া চা খেতে খেতে হনুমানচরিত শুনতে হয়।

সাধুজী আমাকে ভালবাসে। এই জন্যেই ওর এখানে আছি। এখানে পয়সার খরচ নেই বললেই হয়। বাবোটা

টাকা এনেছিলুম, সাধুজীর হাতে তুলে দিয়েছি—নিতে চান্ নি—আমি পীড়াপীড়ি ক'রে দিয়েছি। একবেলা খাই মকাইয়ের ছাতু, একবেলা রুটি আর ঢেঁড়সের তরকারী। অন্য কিছু এখানে মেলে না। কেওলিন খনির ম্যানেজার মাঝে মাঝে কহলগাঁও থেকে মাছ আনায়, সেদিন ওর বাংলোতে আমায় খেতে বলে—কারণ সাধুর এখানে ওসব কারবার হবার যো নেই।

মালতীর সঙ্গে আবার দেখা হবে না? কিন্তু কি ক'রে হবে তা ত বুঝি নে। আমি আবার সেখানে কোন্ ছুতোয় যাবো? উদ্ধবদাস বাবাজী আমায় ভাল চোখে দেখতো না। দু-একবার অসন্তোষ প্রকাশও করেছিল, মালতীর সঙ্গে যখন বড় মিশছি—তখন। দু-একবার আমায় এমন আভাসও দিয়েছিল যে এখানে বেশী দিন আর থাক্‌লে ভাল হবে না। ও সবে আমি ভয় করি নে। সপ্তসিন্ধুপারের দেশ থেকে, মালতীকে আমি ছিনিয়ে আন্‌তে পারি, যদি আমি জান্‌তাম যে মালতীও আমায় চায়। কিন্তু তাতে আমার সন্দেহ আছে। সেই সন্দেহের জন্যেই ত বেদনা, যা-কিছু যন্ত্রণা। কি জানি, বুঝতে পারি নে সবখানি। রহস্যময়ী মালতীর মনের খবর পুরো এক বছরেও পাই নি। এক-একবার কিন্তু মনে কোন সন্দেহ থাকে না। মনে হয় তা নয়, আমি তাকে পেয়েছিলাম। আমার মনের গভীর গোপন তল থেকে কে বলে, অত সন্দেহ কেন তোমার মনে? তোমার চোখ ছিল কোথায়? মালতীকে বোঝ নি এক বছরেও?

মালতী—কি মাধুর্য্যের রূপ ধরেই সে মনে আসে! তার কথা যখনই ভাবি, অস্ত-আকাশের অপরূপ শোভায়, পাহাড়ের ধূসর ছায়ায়, গঙ্গার কলতানের মধ্যে, ওপারের খাসমহলের চরে কলাইওয়ালীরা মাথায় কলায়ের বোঝা নিয়ে ঘরে যখন ফেরে, যখন শাদা পাল তুলে বড় বড় কিস্তি কহলগাঁয়ের ঘাট থেকে বাংলা দেশের দিকে যায়···কিংবা যখন গঙ্গার জলে রঙীন মেঘের ছায়া পড়ে, খেয়ার মাঝিরা নিজেদের নৌকাতে বসে বিকট চীৎকার ক'রে ঠেট্ হিন্দীতে ভজন গায়—সমস্ত পৃথিবী, আকাশ পাহাড় একটা নতুন রঙে রঙীন হয়ে ওঠে আমার মনে—ওই দূর বাংলা দেশের এক নিভৃত গ্রামের কোণে মালতী আছে, যখন আবার বর্ষা নামে, খুব ঝড় ওঠে, কিংবা পুকুরের ঘাটে একা গা ধুতে যায়, কি বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখায় সন্ধ্যায়—আমার কথা তার মনে পড়ে না? আমার ত পড়ে—সব সময়ই পড়ে, তার কি পড়ে না?

মালতীকে নিয়ে মনে কত ভাঙা-গড়া করি, কত অবস্থায় দু-জনকে ফেলি মনে মনে, কত বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করি, আমার অসুখ হয়, সে আমার পাশে ব'সে না ঘুমিয়ে সারারাত কাটায়—কত অর্থকষ্টের মধ্যে দিয়ে দু-জনে সংসার করি—সে বলে—ভেবো না লক্ষ্মীটি, মদনমোহন আবার সব ঠিক ক'রে দেবেন! তার ছোটখাটো সুখদুঃখ, আখড়ার বিগ্রহের ওপর গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস, তার সেবা—আমার ভাল লাগে। মনে হয় কত মেয়ে দেখেছি, সবারই খুঁৎ আছে, মালতীর খুঁৎ নেই। আবার মেয়েরা যেখানে বেশী রূপসী, সেখানে মনে হয়েছে এত রূপ কি ভাল? মালতীর স্নিগ্ধ শ্যামল সুকুমার মুখের তুলনায় এদের এত নিখুঁৎ রূপ কি উগ্র ঠেকে! মোটের ওপর যেদিক দিয়েই যাই—সেই মালতী।

এক-এক বার মনকে বোঝাই মালতীর জন্যে অত ব্যস্ত হওয়া দুঃখ বাড়ানো ছাড়া আর কি? তাকে আর দেখতেই পাব না। তাদের আখড়াতে আর যাওয়া ঘটবে না। স্বপ্নকে আঁকড়ে থাকি কেন? কিন্তু মন যদি অত সহজে বুঝতো!

মালতী একটা মধুর স্বপ্নের মত, বেদনার মত, কত দিন কানে-শোনা গানের সুরের মত মনে উদয় হয়। তখন সবই সুন্দর হয়ে যায়, সবাইকে ভালবাস্‌তে ইচ্ছে করে, সাধুর বকুনি, পাণ্ডা-ঠাকুরর জ্ঞাতি-বিরোধের কাহিনী—অর্থাৎ কি ক'রে ওর জ্যাঠতুতো ভাই ওকে ঠকিয়ে এতদিন বটেশ্বর শিবের পাণ্ডাগিরি থেকে ওকে বঞ্চিত রেখেছিল তার সুদীর্ঘ ইতিহাস—সব ভাল লাগে। কিন্তু কোন কথা বলতে ইচ্ছে করে না তখন, ইচ্ছে হয় শুধু বসে ভাবি, ভাবি—সারা দীর্ঘ দিনমান ওরই কথা ভাবি।

৩

বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের দিনগুলো মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে। রূপে, বেদনায়, স্মৃতিতে, অনুভূতিতে কানায় কানায়

ভরা কি সে-সব অপূর্ব্ব দিন! অনেক দিন হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রেমের অমর মধু মুহূর্ত্তগুলির ছায়াপাতে তাদের স্মৃতি আমার কাছে চিরশ্যামল। শরতের দুপুরে নিভৃত পিয়ালতলায়, নিভৃত বননিবিড় অধিত্যকায় চুপ ক'রে ঝরা পাহাড়ী কুড়চি ফুলের শয্যায় ব'সে ‧ চারি দিকে রৌদ্রদীপ্ত পাহাড়শ্রেণীর রূপ ও শরতের আকাশের শাদা শাদা মেঘখণ্ডের দিকে চেয়ে চেয়ে মালতীরই ভাবনাতে সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। তিনটাঙার মাঠে বটগাছের সবুজ মগডালে শাদা শাদা বকের সারি ব'সে আছে, যেন শাদা শাদা অজস্র ফুল ফুটে আছে—কত কি রং, প্রথমে মাটির ধূসর রং, তার পর কালো সবুজ গাছপালা, তার ওপরের পর্দায় নীলকৃষ্ণ পাহাড়, তার ওপরে সুনীল আকাশ ও শাদা মেঘস্তূপ, সকলের নীচে কূলে কূলে ভরা গৈরিক জলরাশি। কিসে যেন পড়েছিলুম ছেলেবেলায় মনে পড়ে—

অলসে বহে তটিনী নীর,
বুঝি দূরে—অতি দূরে সাগর,
তাই গতি মন্থর,
শ্রান্ত, শান্ত, পদসঞ্চার ধীর:

আগে প্রেম কা'কে বলে জানতাম না, জীবনে তা কি দিতে পারে, তা ভাবিও নি কোনদিন। এখন মনে হয় প্রেমই জীবনের সবটুকু। স্বর্গ কবির কল্পনা নয়—স্বর্গ এই পিয়ালতলায়, স্বর্গ তার স্মৃতিতে। নয় ত কি এত রূপ হয় এই শিলাস্তৃত অধিত্যকার, ওই উচ্চ মেঘপদবীর, ওই পুণ্যসলিলা নদীর, ওই বননীল দিগন্তরেখার!

দিনে রাতে মালতী আমায় ছাড়ে কখন? সব সময় সে আমার মনে আছে। এই দুপুর, এখন সে আখড়ার দাওয়ায় পরিবেশন করছে। এই বিকেল, এখন সে কাপড় সেলাই করছে নয় ত মুগকলাই ঝাড়ছে। এই সন্ধ্যা, এখন সে টান-টান ক'রে তার অভ্যস্ত ধরণে চুলটি বেঁধে, ফুল্লাধরে মৃদু হেসে বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখাতে চলেছে। আজ মঙ্গলবার, সারাদিন সে উপোস ক'রে আছে, আরতির পরে দুধ ও ফল খাবে। সেই নিঃসঙ্কোচে পুকুরের ঘাটে বসে বসে আমাকে গান-শোনান, আমার সঙ্গে শিবের মন্দিরে যাওয়া—খাতা পড়ে শোনান—সকলের ওপরে তার হাসি, তার মুখের সে অপূর্ব্ব হাসি! কত কথাই মনে এসে নির্জ্জনে যাপিত প্রতি প্রহরটি আনন্দবেদনায় অলস ক'রে দিত।

দূরের গিরি-সানুর গায়ে ক্রীড়ারত শুভ্র মেঘরাজির মধ্যে এমন কি কোন দয়ালু মেঘ নেই যে এই কুটজ কুসুমাস্তীর্ণ নিভৃত অধিত্যকার ওপর দিয়ে যেতে যেতে পিয়ালতলার এই নির্ব্বাসিত যক্ষের বিরহবার্ত্তাটি শুনে জেনে নিয়ে বাংলা দেশের প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী অলকাপুরীতে পৌঁছে দেয় তার কানে?

কতবার মনে অনুশোচনা হয়েছে এই ভেবে যে কেন চলে আসতে গিয়েছিলেম অমন চুপি চুপি? তখন কি বুঝেছিলুম মালতী আমায় এত ভাবাবে! কি বুঝে আখড়া ছেড়ে এলাম পাগলের মত! এমনধারা খামখেয়ালী স্বভাব আমার কেন যে চিরকাল, তাই ভাবি। আমার মাথার ঠিক নেই সবাই যে বলে, সত্যিই বলে। এখন বুঝেছি কি ভুলই করেছি মালতীকে ছেড়ে এসে! ওকে বাদ দিয়ে জীবন কল্পনা করতে পারছি নে—এও যেমন ঠিক, আবার এও তেমনি ঠিক যে আর সেখানে আমার ফেরা হবে না।

না—মালতী, আর ফিরে যাব না। কাছে পেয়ে তুমি যদি অনাদর কর? তা সইতে পারব না। তোমার খামখেয়ালী স্বভাবকে আমার ভয় হয়। তার চেয়ে এই ভাল। আমার জীবনে তুমি পুকুরের ঘাটের কত জ্যোৎস্না-রাত্রি অক্ষয় ক'রে দিয়েছ, সেই সব জ্যোৎস্না-রাত্রির স্মৃতি, তোমার বাবার বিষ্ণুমন্দিরে কত সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়ার স্মৃতি—তোমার সে সব আদরের স্মৃতি মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে থাক।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১

এক বছর কেটে গেল, আবার শ্রাবণ মাস।

হঠাৎ দাদার শালার একখানা চিঠি পেলেম কলকাতা থেকে। দাদার বড় অসুখ, চিকিৎসার জন্যে তাকে আনা হয়েছে ক্যাম্বেল হাসপাতালে।

পত্র পেয়ে প্রাণ উড়ে গেল। সাধুজীর কাছে বিদায় নিয়ে কলকাতায় এলাম। হাসপাতালে দাদার সঙ্গে

দেখা করলাম। সামান্ত ব্রণ থেকে দাদার মুখে হয়েছে ইরিসিপ্লাস, আজ সকালে অস্ত্রও করা হয়ে গিয়েছে। দাদা আমায় দেখে শরীরে যেন নতুন বল পেলে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাসপাতালে বসে রইলাম দাদার কাছে। দাদা বললে, এখানে বেশ খেতে দেয় জিতু। রোজ প্রতিবেলায় একখানা বড় পাঁউরুটি আর আধ সের ক'রে দুধ দিয়ে যায়। দেখিস এখন, এখুনি আনবে। খাবি রুটি একখানা ?

পরদিন সকালে আবার গেলাম হাসপাতালে। আঙুর কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম, বৌবাজারের মোড় থেকে, দাদাকে ব'সে ব'সে খাওয়ালাম। দুপুরের আগে চলে আসছি, দোর পর্য্যন্ত এসেছি, দাদা পেছু ডাকলে—জিতু, শোন্।

দাদা বিছানার ওপর উঠে বসেছে—তার চোখ দুটিতে যেন গভীর হতাশা ও বিষাদ মাখানো। বললে—জিতু, তোর বৌদিদি একেবারে নিপাট ভালমানুষ, সংসারের কিছু বোঝে না। ওকে দেখিস—

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম—ও কি কথা দাদা! তুমি সেরে ওঠ, তোমায় বাড়ি নিয়ে যাব, তোমার সংসার তুমিই দেখবে।

দাদা চুপ ক'রে রইল।

বিকেলে দাদার ওয়ার্ডে ঢুকবার আগে মনে হল' দাদা ত বিছানাতে বসে নেই! গিয়ে দেখি দাদা আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মাথার কাছে চার্টে দেখি জ্বর উঠেছে ১০৪ ডিগ্রির ঘরে। পাশের বিছানার রোগী বললে—আপনি চলে যাবার পরে খুব জ্বর এসেছে। কোন কথা বল্‌তে পারেন নি, আপনি আস্‌বার আগে ডেকেছিলাম, সাড়া পাই নি।

সেদিন সারাদিন তেম্‌নি ভাবে কেটে গেল। পরদিনও তাই, দাদার জ্ঞান আর ফিরে এল না—জ্বরও কম্‌ল না, পরদিন রাত্রে আমি রোগীর কাছে রইলাম।

ওঃ, কি বর্ষা সে রাত্রে! ঘনকৃষ্ণ শ্রাবণের মেঘপুঞ্জে আকাশ ছেয়ে গিয়েছে, নির্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে কোথাও একটা তারা চোখে পড়ে না। একখানা বই পড়ছিলাম দাদার বিছানার ধারে ব'সে। রাত বারোটায় একবার নার্স এল। আমি তাকে বললাম—রোগীর অবস্থা খারাপ—একবার রেসিডেণ্ট মেডিকেল অফিসারকে ডাকাও। ডাক্তার এল, চলেও গেল। রাত তখন দেড়টা। বাইরে কি ভীষণ মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। আকাশ ভেঙে পড়বে বুঝি পৃথিবীর ওপরে—সৃষ্টি বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

একজন ছাত্র এসে রোগী দেখে বললে—ইন্‌জেক্‌শন্ দিতে হবে।

আমি বললাম—বেশ দিন—

তার পর আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। ঘন মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার। হাসপাতালের বারান্দাতে কুলিরা ঘুমুচ্ছে। টিটেনাস্ ওয়ার্ড থেকে অনেক ক্ষণ থেকে আর্ত্ত পশুর মত চীৎকার শোনা যাচ্ছে—একবার সেটা থাম্‌ছে, আবার জোরে জোরে হচ্ছে। ডিউক-অফ্‌-কনট্ ওয়ার্ডে মেম নার্সটা ঘুরে বেড়াচ্ছে বারান্দাতে।

বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে হুড্ লাইট জ্বালিয়ে একখানা মোটর এসে ওয়ার্ডের সাম্‌নে দাঁড়াল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তদারক করতে এসেছেন। দাদাকে তিনি দেখ্‌লেন। নার্সকে কি বললেন। ছাত্রটিকে ডেকে কি জিগ্যেস করলেন। ছাত্রটি আর একটা ইন্‌জেক্‌শন দিলে।

রাত আড়াইটা। বৃষ্টি আবার সুরু হয়েছে। হাসপাতালের বারান্দায় ওদিকের আলোগুলো নিবিয়ে দিয়েছে—অনেকটা অন্ধকার।

দাদার সঙ্গে অনেক কথা বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল। ছেলেবেলাকার কথা, দার্জ্জিলিঙের কথা। সেই আমরা কার্ট রোড ধ'রে উম্‌ল্লাং-এর মিশন-হাউস্ পর্য্যন্ত বেড়াতে যেতুম, মনে আছে দাদা? একদিন থাপা তোমাকে আমাকে কাদার পুতুল গড়িয়ে দিয়েছিল! মুরগীর ঘরে লুকিয়ে তুমি আর আমি মিছরী চুরি ক'রে সরবৎ খেতুম? তুমি দোকান করলে আটঘরাতে বাবা মারা যাওয়ার পরে পাঁচ সের নুন, আড়াই সের আটা, পাঁচ পোয়া চিনি নিয়ে—সবাই ধার নিয়ে দোকান উঠিয়ে দিলে! বৌদিদিকে কি বলব দাদা?

এবার এসে দাদার খাটের পাশে বসে রইলাম। একটানা বৃষ্টিপতনের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। মাঝে মাঝে কেবল টিটেনাস্ ওয়ার্ড থেকে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়েও

সেই আর্ত্ত চীৎকারটা শোনা যাচ্ছে। একটা ছোট ছেলের টন্‌সিল কাটা হয়েছিল—সে একবার ঘুম ভেঙে উঠে খাবার জল চাইলে। কুলিটা উঠে তাকে জল দিলে।

এই কুলিগুলো, ওই বুড়ো মেথরটা, নার্সেরা—এরা ঘুমোয় কখন? সারারাত জেগে জেগে রোগীদের ফাইফরমাজ্ খাটছে। দাদার অবস্থা খারাপ ব'লে সবাই এসে একবার ক'রে দেখে যাচ্ছে। নার্স যে কতবার এল! সবাই তটস্থ...দাদাকে বাঁচাবার জন্য সবারই যেন প্রাণপণ চেষ্টা। বাঁচলে সবাই খুশী হয়। নার্স একবার আমায় বললে—তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও বাবু। সারারাত জেগে ব'সে থাকলে অসুখ করবে তোমারও।

হাসপাতালটিকে আমার মনে হ'ল স্বর্গ। আর্ত্তের সেবা যেখানকার মানুষে মনপ্রাণ দিয়ে করে, সে স্বর্গই। ওই বুড়ো মেথরটা এখানকার দেবদূত। যেদিন কয়েক শতাব্দী আগে শ্রীচৈতন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন, কিংবা শঙ্করাচার্য্য সংসারের অসারত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন—তাঁদের স্বপ্নে এই স্বর্গের কল্পনা ছিল। চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্ত্তনের দলে নবদ্বীপের গঙ্গার তীরে এই বুড়ো মেথরটা যোগদান করতে পারত, তিনি ওকে কোল দিতেন, ঝাড়খণ্ডের পথে শ্রীক্ষেত্র রওনা হবার সময়ে ওকে পার্শ্বচর ক'রে নিতেন। রাত সাড়ে তিনটে। রাত আজ কি পোয়াবে না? বৃষ্টি একটু থেমেছে। আকাশ কিন্তু মেঘে মেঘে কালো।

এই সময়ে দাদার নাভিশ্বাস উপস্থিত হ'ল! কলের ঘোলা জল দাদার মুখে দিলাম। কানের কাছে গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করলাম। এই বিপদের সময় কি জানি কেন মালতীর কথা মনে পড়ল। মালতী যদি এখানে থাকত! আটঘরার অশ্বত্থতলার সেই বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা মনে পড়ল—হে দেব, দাদার যাওয়ার পথ আপনি সুগম ক'রে দিন। আপনার আশীর্ব্বাদে তার জীবনের সকল ত্রুটি, সকল গ্লানি ধুয়ে মুছে পবিত্র হোক্; যে সমুদ্র আপনার অনন্ত শয্যা, যে লোকালোক পর্ব্বত আপনার মেখলা—সে-সব পার হয়েও বহুদূরের যে পথে দাদার আজ যাত্রা, আপনার কৃপায় সে পথ তার বাধাশূন্য হোক, নির্ভয় হোক্, মঙ্গলময় হোক্।

পাশের বিছানার রোগী বললে—একবার মেডিকেল অফিসারকে ডাকান না?

আমি বললাম—আর মিথ্যে কেন?

তার পর আরও ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। আমার ঘুম এসেছে, ভয়ানক ঘুম, কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখ্‌তে পারি নে। এর মধ্যে নার্স দু-বার এল, আমি তা ঘুমের ঘোরেই জানি—আমায় জাগালে না। পা টিপে টিপে এল, পা টিপে টিপেই চলে গেল।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হবার দেরি নেই, হাসপাতালের আলো নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে—কিন্তু ঘন কালো মেঘে আকাশ ঢাকা দিনের আলো যদিও একটু থাকে, বোঝা যাচ্ছে না। দাদার খাটের দিকে চেয়ে আমি বিস্ময়ে কেমন হয়ে গেলাম। এখনও ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি নাকি? দাদার খাটের চারি পাশে অনেক লোক দাঁড়িয়ে। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ওরা দাদার খাটটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। শিয়রের কাছে মা, ডানদিকে বাবা, বাবার পাশেই আটঘরার সেই হীরু রায়—স্যালাইনের টিনটা যেখানে ঝোলানো, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের চা-বাগানের নেপালী চাকর থাপা, ছেলেবেলায় দাদাকে সে কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছিল। তার পরই আমার চোখ পড়ল খাটের বাঁ-দিকে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোটকাকীমার মেয়ে পানী। এদের মূর্ত্তি এত সুস্পষ্ট ও বাস্তব যে একবার আমার মনে হ'ল ওদের সকলেই দেখছে বোধ হয়। পাশের খাটের রোগীর দিকে চেয়ে দেখলুম, সে যদিও জেগে আছে এবং মাঝে মাঝে দাদার খাটের দিকে চাইছে—কিন্তু তার মুখ চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল মুমূর্ষু দাদাকে ছাড়া সে আর কিছু দেখছে না। অথচ কেন দেখতে পাচ্ছে না, এত স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, সজীব মানুষগুলোকে কেন যে ওরা দেখে না—এ ভেবে ছেলেবেলা থেকে আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই।

আমি জানি এসব কথা লোককে বিশ্বাস করানো শক্ত। মানুষ চোখে যা দেখে না, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যা পারে না—তা বিশ্বাস করতে সহজে রাজি হয় না। এই জন্য হাসপাতালের এই রাত্রিটির কথা আমি একটি প্রাণীকেও বলি নি কোনদিন।

দু-তিন মিনিট কেটে গেল। ওরা এখনও রয়েছে।

আমি চোখ মুছলাম, এদিক-ওদিক চাইলাম—চোখে জল দিলাম উঠে। এখনও ওরা রয়েছে। ওদের সবারই চোখ দাদার খাটের দিকে। আমি ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে পানীর কাছে দাঁড়ালাম। ওরা সবাই হাসিমুখে আমার দিকে চাইলে। কত কথা বলব ভাবলাম মাকে, বাবাকে, পানীকে—থাপা কবে মরে গিয়েছে জানি নে—সে এখনও তাহ'লে আমাদের ভোলে নি?...তাকেও কি বলব ভাবলাম—কিন্তু মুখ দিয়ে আমার কথা বেরুল না। এই সময়ে নার্স এল। আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছি নার্স কি এদের দেখতে পাবে না? এই ত সবাই এরা এখানে দাঁড়িয়ে। নার্স কিন্তু এমন ভাবে এল যেন আমি ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই। দাদার মুখের দিকে চেয়ে বললে—এ ত হয়ে গিয়েছে—এ কুলি, কুলি—

কুলি খাটটাকে ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে দিতে এল।

তখনও ওরা রয়েছে।...

তার পর আমার একটা অবসন্ন ভাব হ'ল—আমার সেই সুপরিচিত অবসন্ন ভাবটা। যখনই এরকম আগে দেখতাম, তখনই এরকম হ'ত। মনে পড়ল কত দিন পরে আবার দেখলাম আজ—বহুকাল পরে এই জিনিষটা পেয়েছি—হারিয়ে গিয়েছিল, সন্ধান পাই নি অনেক দিন, ভেবেছিলুম আর বোধ হয় পাব না—আজ দাদার শেষশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তা ফিরে পেয়েছি। আমার গা যেন ঘুরে উঠল—পাশের চেয়ারে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লাম।

নার্স আমার দিকে চেয়ে বললে—পুওর বয়!

২

জীবনে নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন কাজ একেবারে করি নি তা নয়, কিন্তু বৌদিদিকে দাদার মৃত্যু-সংবাদটা দেওয়ার মত নিষ্ঠুর কাজ আর যে কখনও করি নি, একথা শপথ ক'রে বলতে পারি। বেলা দুটোর সময় দাদার বাড়ি গিয়ে পৌছলাম। পথে দাদার শ্বশুর-বাড়ির এক সরিকের সঙ্গে দেখা। আমার মুখের খবর শুনেই সে গিয়ে নিজের বাড়িতে অবিলম্বে খবরটি জানালে। বোধ হয় যেন বৌদিদির ওপর আড়ি করেই ওদের বাড়ির মেয়েরা—যারা দাদার অসুখের সময় কখনও চোখের দেখাও দেখতে আসে নি—চীৎকার ক'রে কান্না জুড়ে দিলে। বৌদিদি তখন অত বেলায় দুটো রেঁধে ছেলেমেয়েকে খাইয়ে আঁচিয়ে দিচ্ছে। নিজে তখনও খায় নি। পাশের বাড়িতে কান্নার রোল শুনে বৌদিদি বিস্ময়ের সুরে জিগ্যেস করছে—হ্যাঁ রে বিনু, ওরা কাঁদছে কেন রে? কি খবর এল ওদের? কারও কি অসুখ-বিসুখ?

এমন সময়ে আমি বাড়ি ঢুকলাম। আমায় দেখে বৌদিদির মুখ শুকিয়ে গেল। বললে—ঠাকুরপো! তোমার দাদা কোথায়?

আমি বললাম—দাদা নেই, কাল মারা গিয়েছে।

বৌদিদি কাঁদলে না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আমার মুখের দিকে চেয়ে।

পাশের বাড়িতে তখন ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা ছন্দে ও সুরে শোকপ্রকাশের ঘটা কি! পাড়ার অনেক মেয়ে এলেন সান্ত্বনা দিতে বৌদিদিকে। কিন্তু একটু পরে যখন বৌদিদি পুকুরের ঘাটে নাইতে গেল সঙ্গে এক জন যাওয়া দরকার নিয়মমত—তখন একটা অজুহাতে যে যার বাড়িতে গেল চলে। আমি বিস্মিত হ'লাম এই ভেবে যে এরা তো বৌদিদির বাপের বাড়িরই লোক! তার একটু পরে বৌদিদি খানিকটা কাঁদলে। হঠাৎ কান্না থামিয়ে বললে, শেষকালে জ্ঞান ছিল ঠাকুরপো? আমি বললাম, বৌদিদি তুমি ভেবো না, এখানে যে-রকম গতিক দেখছি তাতে এখানে থাকলে দাদার চিকিৎসাই হ'ত না। এখানে কেউ তোমায় তো দেখে না দেখছি। হাসপাতালের লোকে যথেষ্ট করেছে। বাড়িতে সে রকম হয় না। আমাদের অবস্থার লোকের পক্ষে হাসপাতালই ভাল।

বৌদিদির বাবা মা কেউ নেই—মা আগেই মারা গিয়েছিলেন—বাবা মারা গিয়েছেন আর-বছর। একথা কলকাতাতেই বৌদিদির ভাইয়ের মুখে শুনেছিলুম। বৌদিদির সে ভাইটিকে দেখে আমার মনে হয়েছিল এ নিতান্ত অপদার্থ—তার ওপর নিতান্ত গরিব, বর্ত্তমানে কপর্দ্দকহীন বেকার—তার কিছু করবার ক্ষমতা নেই। বয়েসও অল্প, সে কলকাতা ছেড়ে আসে নি, সেখানে চাকুরীর চেষ্টা করছে।

ভেবে দেখলাম এদের সংসারের ভার এখন আমিই

না-নিলে এতগুলি প্রাণী না খেয়ে মরবে। দাদা এদের একেবারে পথে বসিয়ে রেখে গেছে। কাল কি করে চলবে সে সংস্থানও নেই এদের। তার ওপর দাদার অসুখের সময় কিছু দেনাও হয়েছে।

৩

এদের ছেড়ে কোথাও নড়তে পারলুম না শেষ পর্য্যন্ত। কালীগঞ্জেই থাকতে হ'ল। এখান থেকে দাদার সংসার অন্য স্থানে নিয়ে গেলাম না, কারণ আটঘরা ত এদের নিয়ে যাবার যো নেই, অন্য জায়গায় আমার নিজের রোজগারের সুবিধা না-হওয়া পর্য্যন্ত বাড়িভাড়া দিই কি ক'রে?

এ সময়ে সাহায্য সত্যি সত্যিই পেলুম দাদার সেই মাসীমার কাছ থেকে—সেই যে বাতাসার কারখানার মালিক কুণ্ডু-মশায়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী—সেবার যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছিলেন। এই বিপদের সময় আমাদের কোন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর কাছ থেকে সে-রকম সাহায্য আসে নি।

ক্রমে মাসের পর মাস যেতে লাগল।

সংসার কখনও করি নি, করবো না ভেবেছিলুম। কিন্তু যখন এ-ভাবে দাদার ভার আমার ওপর পড়ল, তখন দেখলাম এ এক শিক্ষা—মানুষের দৈনন্দিন অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়ে, ছোটখাটো ত্যাগস্বীকারের মধ্যে দিয়ে, পরের জন্যে খাটুনি ও ভাবনার মধ্যে দিয়ে, তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দিয়ে এই যে এতগুলি প্রাণীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনযাত্রার গুরুভার নিজের ওপর নিয়ে সংসার-পথের চলার দুঃখ—এই দুঃখের একটা সার্থকতা আছে। আমার জীবন এর আগে চলেছিল শুধু নিজেকে কেন্দ্র ক'রে—পরকে সুখী ক'রে নিজেকে পরিপূর্ণ করার শিক্ষা আমায় দিয়েছে—মালতী। পথে বেরিয়ে অনেক শিক্ষার মধ্যে এটিই আমার জীবনে সব চেয়ে বড় শিক্ষা।

কত জায়গায় চাকরি খুঁজলাম। আমি যে লেখাপড়া জানি বাজারে তার দাম কাণাকড়িও না। হাতের কোন কাজও জানি নে, সব তাতেই আনাড়ি। কুণ্ডু-মশায়ের স্ত্রীর সুপারিশ ধরে বাতাসার কারখানাতেই খাতা লেখার কাজ জোগাড় করলাম—এ কাজটা জানতাম, কলকাতায় চাকরির সময় মেজবাবুদের জমিদারী সেরেস্তায় শিখেছিলাম তাই রক্ষে। কিন্তু তাতে ক'টা টাকা আসে? বৌদিদির মত গৃহিণী তাই ওই সামান্য টাকার মধ্যে সংসার চালানো সম্ভব হয়েছে।

ফাল্গুন মাস পড়ে গেল। গাংনাপুরের হাটে আমি কাজে বেরিয়েছি গরুর গাড়ি ক'রে। মাইল-বারো দূর হবে, বেগুন-পটলের বাজরার ওপরে চটের থলে পেতে নিয়ে আমি আর তনু চৌধুরী ব'সে। তনু চৌধুরীর বাড়ি নদীয়া মেহেরপুরে, এখানকার বাজারের সাহাদের পাটের গদির গোমস্তা, গাংনাপুরে খরিদ্দারের কাছে মাল দেখাতে যাচ্ছে।

গল্প করতে করতে তনু চৌধুরী ঘুমিয়ে পড়ল বাজরার ওপরেই। আমি চুপ ক'রে ব'সে আছি। পথের ধারে গাছে গাছে কচি পাতা গজিয়েছে, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পথের পাশে মাঠের মধ্যে সর্ব্বত্র।

শেষরাত্রে বেরিয়েছিলুম, ভোর হবার দেরি নেই, কি সুন্দর ঝিরঝিরে ভোরের হাওয়া, পুব আকাশে জলজ্বলে বৃশ্চিক রাশির নক্ষত্রগুলো বাঁশবনের মাথায় ঝুঁকে পড়েছে—যেন ওই দ্যুতিমান তারার মণ্ডলী পৃথিবীর সকল সুখদুঃখের বাস্তবতার বন্ধনের সঙ্গে ঊর্দ্ধ আকাশের সীমাহীন উদার মুক্তির একটা যোগ-সেতু নির্ম্মাণ করেছে—যেন আমাদের জীবনের ভারক্লিষ্ট যাত্রাপথের সংকীর্ণ পরিসরের প্রতি নক্ষত্রজগৎ দয়াপরবশ হয়ে জ্যোতির দূত পাঠিয়েছে আমাদের আশার বাণী শোনাতে—যে কেউ উঁচু দিয়ে চেয়ে দেখবে, চলতে চলতে সেই দেখতে পাবে তার শাশ্বত মৃত্যুহীন রূপ। যে চিনবে, যে বলবে আমার সঙ্গে তোমার আধ্যাত্মিক যোগ আছে—আমি জানি আমি বিশ্বের সকল সম্পদের, সকল সৌন্দর্য্যের, সকল কল্যাণের উত্তরাধিকারী—তার কাছেই ওর বাণী সার্থকতা লাভ করবে।

এই প্রস্ফুট বন-কুসুম-গন্ধ আমার মনে মাঝে মাঝে কেমন একটা বেদনা জাগায়, যেন কি পেয়েছিলুম, হারিয়ে ফেলেছি। এই উদীয়মান সূর্য্যের অরুণ রাগ অতীত দিনের কত কথা মনে এনে দেয়। সব সময় আমি সে-সব কথা মনে স্থান দিতে রাজি হই নে, অতীতকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকা আমার রীতি নয়। তাতে দুঃখ বাড়ে বই কমে না। হঠাৎ দেখি

অন্যমনস্ক হয়ে কখন ভাবছি, হরবাসিনীর আখড়া থেকে সেই ভোরে যে আমি চুপি চুপি পালিয়ে এসেছিলাম—কাউকে না জানিয়ে, মালতীকে ত একবার জানালে পারতাম—মালতীর ওপর এতটা নিষ্ঠুর আমি হয়েছিলুম কেমন ক'রে!

ওকথা চেপে যাই—মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করি। আগে যতটা কষ্ট হ'ত এসব চিন্তায় এখন আর ততটা হয় না, এটা বেশ বুঝতে পারি। মালতীকে ভুলে থাকি—কিছুদিন পরে আরও যাব। এক সময় যে অত কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সে আজ সপ্তসিন্ধুপারের দেশের রাজকন্যার মত অবাস্তব হয়ে আসছে। হয়ত এক দিন একেবারেই ভুলে যাব। জীবন চলে নিজের পথে নিজের মর্জ্জিমত—কারও জন্যে সে অপেক্ষা করে না। মাঝে মাঝে মনে আনন্দ আসে—যখন ভাবি বহুদিন আগে রাঢ়ের বননীল দিগ্বলয়ে ঘেরা মাঠের মধ্যে যে-দেবতার স্বপ্ন দেখেছিলুম তিনি আমায় ভুলে যান নি। তাঁরই সন্ধানে বেরিয়েছিলাম, তিনি পথও দেখিয়েছেন। এই অনুদার রুদ্ধগতি জীবনেও তিনি আমার মনে আনন্দের বাণী পাঠিয়েছেন।

এতেও ঠিক বলা হ'ল না। সে আনন্দ যখন আসে তখন আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি, তখন কি করি, কি বলি কিছু জ্ঞান থাকে না—সে এক অন্য ব্যাপার। আজও তাই ঠিক হ'ল। আমি হঠাৎ পথের ধারে একটা ঝোপের ছায়ায় নেমে পড়লুম গাড়ী থেকে। তনু চৌধুরী বললে—ও কি, উঠে এস। তনু চৌধুরী জানে না আমার কি হয় মনের মধ্যে এ-সব সময়ে, কারও সাহচর্য্য এসব সময়ে আমার অসহ্য হয়, কারও কথায় কান দিতে পারি নে—আমার সকল ইন্দ্রিয় একটা অনুভূতির কেন্দ্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে—একবার চাই শালিখের ছানাগুলো খাদ্যকণা খুঁটে খাচ্ছে যেদিকে, তাদের অসহায় পক্ষভঙ্গিতে কি যেন লেখা আছে—একবার চাই তিসির ফুলের রঙের আকাশের পানে—ঝলমল প্রভাতের সূর্য্যকিরণের পানে, শস্যশ্যামল পৃথিবীর পানে—কি রূপ! এই আনন্দের মধ্যে দিয়ে আমার দ্বিজত্ব, এক গৌরবসমৃদ্ধ, পবিত্র নবজন্ম।

মনে মনে বলি, আপনি আমায় এ-রকম করে দেবেন না, আমায় সংসার করতে দিন ঠাকুর। দাদার ছেলেমেয়েরা, বৌদিদি আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে ওদের অন্নের জন্যে, ওদের আমি ত ফেলে দিতে পারব না! এখন আমায় এ-রকম নাচাবেন না।

বৈকালের দিকে পায়ে হেঁটে গাংনাপুরের হাটে পৌছলাম। তনু চৌধুরী আগে থেকেই ঠিক করেছে আমার মাথা খারাপ। রাস্তার মধ্যে নেমে পড়লাম কেন ওরকম?

ফিরবার পথে সন্ধ্যার রাঙা মেঘের দিকে চেয়ে কেবলই মনে হ'ল ভগবানের পথ ওই পিঙ্গল ও পাটল বর্ণের মেঘ-পর্ব্বতের ওপারে কোনো অজানা নক্ষত্রপুরীর দিকে নয়, তাঁর পথ আমি যেখান দিয়ে হাঁটছি, ওই কালু-গাড়োয়ান যে পথ দিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এ পথেও। আমার এই পথে আমার সঙ্গে পা ফেলে তিনি চলছেন এই মুহূর্ত্তে—আমি আছি তাই তিনিও আছেন। যেখানে আমার অসাফল্য, সেখানে তাঁরও অসাফল্য, আমার যেখানে জয়, সেখানে তাঁরও জয়। আমি যখন সুন্দরের স্বপ্ন দেখি, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আদর করি, পরের জন্যে খাটি—তখন বুঝি ভগবানের বিরাট শক্তির সপক্ষে আমি দাঁড়িয়েছি—বিপক্ষে নয়। এই নীল আকাশ, অগ্নিকেতন উল্কাপুঞ্জ, বিদ্যুৎ আমায় সাহায্য করবে। বিশ্ব যেন সব সময় প্রাণপণে চেষ্টা করছে শিব ও সুন্দরের মধ্যে নিজের সার্থকতাকে খুঁজতে, কিন্তু পদে পদে সে বাধা পাচ্ছে কি ভীষণ! বিশ্বের দেবতা তবুও হাল ছাড়েন নি—তিনি অনন্ত ধৈর্য্যে পথ চেয়ে আছেন। নীরব সেবারত সূর্য্য ও চন্দ্র আশায় আশায় আছে, সমগ্র অদৃশ্যলোক চেয়ে আছে—আমিও ওদের পক্ষে থাকব। বিশ্বের দেবতার মনে দুঃখ দিতে পারব না। জীবনে মানুষ তত ক্ষণ ঠিক শেখে না অনেক জিনিষই, যত ক্ষণ সে দুঃখের সম্মুখীন না-হয়। আগে স্রোতের শেওলার মত ভেসে ভেসে কত বেড়িয়েছি জীবন-নদীর ঘাটে ঘাটে—তটপ্রান্তবর্ত্তী যে মহীরুহটি শত স্মৃতিতে তিলে তিলে বর্দ্ধিত হয়ে স্নানার্থিনীদের ছায়াশীতল আশ্রয় দান করেছে—সে হয়ত বৈচিত্র্য চায় নি তার জীবনে—কিন্তু একটি পরিপূর্ণ শতাব্দীর সূর্য্য তার মাথায় কিরণ বর্ষণ করেছে, তার শাখা-প্রশাখায় ঋতুতে ঋতুতে বনবিহঙ্গদের কৌতুক বিলাস কলকাকলী নিজের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে—

তার মৃদু ও ধীর, পরার্থমুখী গম্ভীর জীবন-ধারা নীল আকাশের অদৃশ্য আশীর্ব্বাদতলে এই একটি শতাব্দী ধরে বয়ে এসেছে—বৈচিত্র্য যেখানে হয়ত আসে নি—গভীরতায় সেখানে করেছে বৈচিত্র্যের ক্ষতিপূরণ। প্রতিদিনের সূর্য্য শুক্রতারার আলোকোজ্জ্বল রাজপথে রাঙা ধূলি উড়িয়ে রজনীর অন্ধকারে অদৃশ্য হন—প্রতিদিনই সেই সন্ধ্যায় আমার মনে কেমন এক প্রকার আনন্দ আসে—দেখি যে পুকুরের ধারে বর্ষার ব্যাঙের ছাতা সূর্য্যের অমৃত কিরণে বড় হয়ে পুষ্ট হয়ে উঠছে—দেখি উইয়ের ঢিবিতে নতুন শাখা ওঠা উইয়ের দল অজানা বায়ুলোক ভেদ ক'রে হয়েছে মরণের যাত্রী, শরতের কাশবন জীবন-সৃষ্টির বীজ দূরে দূরে, দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়ে রিক্ততার মধ্যেই পরম কাম্য সার্থকতাকে লাভ করেছে—দারিদ্র্য বা কষ্ট তুচ্ছ, পৃথিবীর সমস্ত বিলাস-লালসাও তুচ্ছ, আমি কিছুই গ্রাহ্য করি নে যদি এই জাগ্রত চেতনাকে কখনও না হারাই—যদি হে বিশ্বদেবতা, বাল্যে তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যেমন সকালবেলা ক'রে সূর্য্যের আলোয় সোনার রঙে রঞ্জিত হ'তে দেখতুম—তেমনি যদি আপনি আপনার ভালবাসার রঙে আমার প্রাণ রাঙিয়ে তোলেন—আমিও আপনাকে ভালবাসি যদি—তবে সকল সংকীর্ণতাকে, দুঃখকে জয় ক'রে আমি আমার বিরাট চেতনার রথচক্র চালিয়ে দিই শতাব্দী থেকে শতাব্দীর পথে, জন্মকে অতিক্রম ক'রে মৃত্যুর পানে, মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে আবার কোন আনন্দ-ভরা নবজন্মের অজানা রহস্যের আশায়।

(ক্রমশঃ)

শের শাহের সিংহাসনারোহণ বৎসর

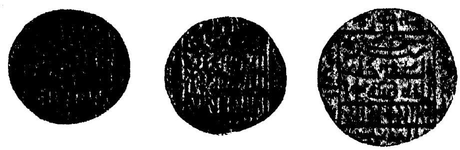
শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ, পিএইচ-ডি

হুমায়ুন-বিজয়ী পুরুষসিংহ শের শাহের সিংহাসনারোহণ বৎসর লইয়া গোলযোগ বিদ্যমান। এই ক্ষেত্রে ডক্টর কানুনগো মহাশয়ের অশেষ পরিশ্রমের ফল "শের শাহ" নামক পুস্তকই প্রামাণ্য। কিন্তু কানুনগো মহাশয় শের শাহের সিংহাসন আরোহণের যে বৎসর অনেক বিচার-বিতর্ক করিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, নূতন আবিষ্কারের ফলে দেখা যাইতেছে যে তাহা এক বৎসর পিছাইয়া দিতে হইবে। কানুনগো মহাশয়ের নির্দ্ধারিত বৎসর ৯৪৬ হিজরি,—এই হিজরি বৎসর ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে তারিখে আরব্ধ।

এখন, নূতন আবিষ্কার কি হইল, বলা দরকার। গত বৎসর ঢাকার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক এবং হাকিম শ্রীযুক্ত হবিবর রহমন খাঁ তাঁহার নিজস্ব সংগ্রহের কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা ঢাকা মিউজিয়মে উপহার প্রদান করেন। এই সংগ্রহে শের শাহের মোট ৫৯টি মুদ্রা আছে, উহাদের কতকগুলিতে সাতগাঁ, শরিফাবাদ (বর্দ্ধমান), ফথাবাদ (ফতেহাবাদ—ফরিদপুর) ইত্যাদি টাকশালের নাম আছে, কতকগুলিতে আবার কোন টাকশালের নাম নাই। একটি ছাড়া বাকী সমস্ত মুদ্রারই তারিখ ৯৪৬ হিঃ হইতে ৯৫২ হিঃ পর্য্যন্ত। কিন্তু উক্ত একটি মুদ্রাই ঐতিহাসিক হিসাবে অমূল্য গণিত হইবে, কারণ উহার সনাঙ্ক স্পষ্ট ৯৪৫ হিজরা। নিম্নে মুদ্রাটির বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে। মুদ্রাটির তারিখযুক্ত দ্বিতীয় পৃষ্ঠের ছবি দেওয়া গেল, পারস্য ভাষায় অভিজ্ঞ পাঠক ছবির সহিত বর্ণনা মিলাইয়া লইতে পারিবেন।

মুদ্রাটির কিনারায় বৃত্তরেখা বা অন্য কোন অলঙ্করণ-রেখা নাই। প্রথম পৃষ্ঠে একটি সমচতুষ্কোণের অভ্যন্তরে মুসলমান-ধর্ম্মের মূলসূত্র কলিমা অর্থাৎ "লাইল্লাহ্ ইল্লিল্লাহ্ মুহম্মদ রসুল আল্লাহ্" লিখিত আছে। ইহার পরে একটি সরল রেখা টানিয়া চতুষ্কোণকে দুই ভাগ করিয়া নীচের ভাগে সোপাধি

সম্রাটের নাম আরব্ধ হইয়াছে—"আল্ সুলতান্ আল্ আদিল্।" মুদ্রার কিনারা এবং চতুষ্কোণের চারি বাহুর মধ্যে যে চারিটি কক্ষ আছে, তাহাতে মুহম্মদের চার-ইয়ারের নাম, যথা "আবু বকর, ওমর, ওস্মান, আলি" লিখিত আছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠেও লেখার বিন্যাস প্রথম পৃষ্ঠেরই মত।



''তাইফুর'' ''বন্ধু'' ''হাকিম''

কিনারার চারিটি কক্ষে সুলতানের নামাংশ উৎকীর্ণ, যথা—"ফরিদ। আল দুনিয়া। ও আলদিন্। আবু আল্ মুজঃফর।" পড়িবার কালে ইহার উচ্চারণ হয়—"আস্সুলতান আলাদিল্ ফরিদুদ্দুনিয়াউদ্দিন আবুল্ মুজঃফর।" পরে চতুষ্কোণের অভ্যন্তরে রাজার আসল নাম, তাঁহার রাজত্বে স্থায়িত্বের জন্য প্রার্থনা এবং সনাঙ্ক আছে, যথা—"শের শাহ আস্-সুলতান্ খলদুল্লাহ্ মুল্কহ্ ৯৪৫।" ইহার পরে আবার দেবনাগর অক্ষরে সম্রাটের নাম আছে—"শ্রী শের শাহী।" মুসলমান-অধিকারের আদিযুগে মুসলমান সুলতানগণ মুদ্রায় পারসীর সঙ্গে সঙ্গে দেবনাগর অক্ষরেও নিজেদের নাম লিখিতেন। বহুকাল অবধি এই প্রথা লুপ্ত ছিল। শের শাহ আবার এই প্রথার প্রবর্ত্তন করেন এবং শের শাহ-বংশীয় প্রত্যেক সুলতানই এই হিন্দুর মনোরঞ্জক প্রথা মানিয়া চলিয়াছিলেন। মোগল-বংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা আবার অদৃশ্য হয়।

শের শাহের এই মুদ্রাটি ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে কত বড় পরিবর্ত্তনের সূচক, তাহা মুদ্রাতত্ত্ববিৎ মাত্রেই জানেন। মুদ্রাটি প্রায় নিখুঁৎ গোলাকার,—উপাদান বিশুদ্ধ রৌপ্য,—অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন এবং সর্ব্বরকমেই ইহা মুদ্রানির্ম্মাণ-শিল্পের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাংলায় সুলতানগণের মুদ্রা লইয়া যাঁহারা নাড়াচাড়া করিয়াছেন এবং উহাদের পাঠোদ্ধার করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই মুদ্রাটি অপ্রত্যাশিত সম্পদের মত। গঠন-নৈপুণ্যে এবং পরিচ্ছন্নতায় বাংলায় সুলতানগণের মধ্যে একমাত্র ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের মুদ্রা শের শাহের মুদ্রার সহিত উপমিত হইতে পারে। পরবর্ত্তী সুলতানগণের কাহারও মুদ্রাই বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। শের শাহের পূর্ব্ববর্ত্তী হুসেনী সুলতানগণের অধিকাংশ মুদ্রাই গঠন-পারিপাট্যহীন। তাহার উপরে আবার এক বিষম বিপদ জুটিয়াছিল। এই সুলতানী আমলে মুদ্রা জাল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল,—জালিয়াৎগণ ভিতরে তামা ভরিয়া উপরে কৌশলে পাতলা রূপার পাত দিয়া মুদ্রা তৈয়ার করিয়া তাহা খাঁটি রৌপ্য-মুদ্রা বলিয়া চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাই টাকা ভাঙাইবার সময় পোদ্দারগণ ছেনি দিয়া পাঁচ সাত স্থানে না-কাটিয়া আর কোন টাকা ভাঙাইয়া দিত না। ফলে মুদ্রাগুলির এমন দুর্দ্দশা হইত যে উহাদের সন, তারিখ, টাকশালের নাম ত পড়া যাইতই না, কোন্ রাজার মুদ্রা তাহা ঠিক করিতেই গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হইত! এই ত গেল বাংলার সুলতানগণের মুদ্রার অবস্থা।

দিল্লীর সুলতানগণ মিশ্র ধাতুর মুদ্রার (Billion Coins) প্রচলন করিয়াছিলেন—সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে ঐ মুদ্রারই প্রচলন বেশী ছিল। এই মুদ্রাগুলিতে কতখানি সোনা আছে বা কতখানি রূপা আছে, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা স্থির করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কাজেই ওজনে সমান হইলেও কোন্ মুদ্রার মূল্য কি, পোদ্দারগণই তাহার নির্দ্ধারক ছিল। ইহাতে জনসাধারণের যে কি পরিমাণ অসুবিধা হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। শের শাহ বিশুদ্ধ স্বর্ণে, বিশুদ্ধ রৌপ্যে এবং বিশুদ্ধ তাম্রে মুদ্রা প্রচলিত করিয়া নিমেষে এই সমস্ত গলদ দূর করিয়া দিলেন। আর শের শাহের মুদ্রাকে জনসাধারণ এবং পোদ্দারগণও কি পরিমাণ সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিত তাহার প্রমাণ এই যে আমি শের শাহের শত শত মুদ্রা পরীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু পোদ্দারের ছেনি-কাটার দাগ উহাদের প্রায় কোনটিতেই এযাবৎ দেখি নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডক্টর কানুনগো তাঁহার 'শের শাহ' নামক পুস্তকে (পৃ. ২০৬ এবং পরবর্ত্তী) ৯৪৬ হিজরা সনকে শের শাহের সিংহাসন-আরোহণের বৎসর বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এই মুদ্রার সনাঙ্ক হইতে

দেখা যায় যে, উহা এক বছর পিছাইয়া দিতে হইবে। যদি মাত্র একটি মুদ্রাতেই এই তারিখ পাওয়া যাইত তবে সন্দেহ করা চলিত, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অনুরূপ আরও দুইটি মুদ্রা এ-যাবৎ পাওয়া গিয়াছে। হাকিম সাহেব তাঁহার মুদ্রা-সংগ্রহ ঢাকা মিউজিয়মে উপহার দিবার অব্যবহিত পরেই আবার আর একটি মুদ্রা-সংগ্রহ ঢাকা মিউজিয়মে উপহার প্রদত্ত হয়। এই দ্বিতীয় উপহারদাতার নাম শ্রীযুক্ত সৈয়দ এ-এস-এম্ তাইফুর। ইনি ঢাকার একটি প্রাচীন এবং সম্মানিত জমীদার-বংশসম্ভূত। হাকিম সাহেব তাঁহার সংগ্রহ-গঠনে তাইফুর-সাহেবের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন এবং উভয় সংগ্রহে মুদ্রাবলি প্রায় একই রকমের। তাইফুর-সাহেবের উপহৃত মুদ্রার মোট সংখ্যা ২০৯। এই মুদ্রাগুলির মধ্যেও শের শাহের ৯৪৫ হিজরার একটি মুদ্রা আছে। তাইফুর-সাহেবের সংগ্রহে আরও একটি ৯৪৫ হিজরার মুদ্রা ছিল, কিন্তু এই মুদ্রাটি তিনি এক বন্ধুকে উপহার দিয়াছেন। হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে তিনি আমাকে এই মুদ্রাটির একটি ফটো রাখিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অনুমতি অনুসারেই সেই ফটোগ্রাফ এখানে মুদ্রিত হইল। এই মুদ্রা তিনটি যথাক্রমে "হাকিম" "তাইফুর" এবং "বন্ধু" বলিয়া বিশেষিত হইল।

মুদ্রা তিনটি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে 'হাকিম' এবং 'বন্ধু'-চিহ্নিত মুদ্রা দুইটি একই ছাঁচের, কিন্তু 'তাইফুর' চিহ্নিত মুদ্রাটি ভিন্ন ছাঁচের। এই দুই ছাঁচের মুদ্রার লিপি যদিও অবিকল একই, কিন্তু অক্ষরগুলির সংস্থান এক নহে। ৯৪৫ সনাঙ্কটি প্রথম ছাঁচে লিপির শেষ ছত্রের সহিত একই লাইনে লিখিত, দ্বিতীয় ছাঁচে উহা ভিন্ন আর এক লাইনে লিখিত। ৫ অঙ্কটির আকৃতিও উভয়ত্র এক রকম নহে। যাহা হউক, বিচার্য্য এই যে, ৯৪৫ হিজরার মুদ্রা ছাপিতে যখন একাধিক ছাঁচের প্রয়োজন হইয়াছিল তখন বুঝিতে হইবে যে মুদ্রিত মুদ্রার সংখ্যা নিতান্ত অল্প না-হওয়ারই সম্ভাবনা,—যদিও মাত্র এই প্রকারের তিনটি মুদ্রা আমরা এ-যাবৎ পাইয়াছি। ঢাকা জেলায় নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত রাইপাড়া গ্রামে কয়েক বৎসর আগে শের শাহ—ইসলাম শাহের এবং তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলার হোসেনী সুলতানগণের বহু মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। এই মুদ্রাপ্রাপ্তির' সম্পূর্ণ বিবরণ শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন সাহেব বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ১৯২৮ সনের মুদ্রাবিষয়ক ক্রোড়পত্রে দিয়াছিলেন। এই সকল মুদ্রার কতক অংশ মাটি কাটিতে নিযুক্ত কুলিদের হস্তগত হইয়াছিল, এবং ক্রমে ক্রমে সেগুলি ঢাকার বাজারে পোদ্দারগণের হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই ৯৪৫ হিজরার মুদ্রা তিনটি তাই মূলতঃ রাইপাড়ায় পাওয়া মুদ্রা বলিয়াই মনে হয় এবং তাই এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে যে মুদ্রা তিনটি সম্ভবতঃ বাংলা দেশেই মুদ্রিত মুদ্রা, যদিও উহাদের গায়ে কোন টাকশালের নাম লিখিত নাই।

৯৪৫ হিজরার কোন্ মাসে এই মুদ্রাগুলি মুদ্রিত হওয়া সম্ভব, এইবার তাহার একটু বিচার করা যাউক। ডক্টর কানুনগোর 'শের শাহ' হইতে এই যুগের ঘটনাবলি নিম্নে সঙ্কলিত হইল। নূতন সম্রাটেরা নিজ নিজ নামে মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়া এবং মসজিদে প্রার্থনা করাইয়া নিজেদের রাজ্য-প্রাপ্তি বিঘোষিত করাইতেন। প্রথমটির নাম সিক্কা, দ্বিতীয়টির নাম খুত্‌বা। কাজেই সিক্কা যখন প্রচারিত হইয়াছিল, শের শাহ সিংহাসনেও সেই সময়ই আরোহণ করিয়াছিলেন,—এই সিদ্ধান্তই করিতে হইবে।

জানুয়ারী—১৫৩৬। শের খাঁর বঙ্গাভিযান। (১১৮ পৃঃ)

মার্চ্চ—১৫৩৬। শের খাঁ গৌড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহ বহু অর্থ উপহার দিয়া তাঁহাকে ফিরাইলেন।

ডিসেম্বর—১৫৩৬। হুমায়ুনের গুজরাট-অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন (১৩২ পৃঃ)।

অক্টোবর—১৫৩৭। শের খাঁর দ্বিতীয় বার বঙ্গাভিযান।

ডিসেম্বর—১৫৩৭। হুমায়ুন আগ্রা হইতে শের খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। (১৩৯ পৃঃ)

জানুয়ারী—১৫৩৮। হুমায়ুন চুণার পৌঁছিলেন। (১৪২ পৃঃ)

আনুমানিক মার্চ্চ—১৫৩৮। শের খাঁর রোহ্‌তাশ-দুর্গ অধিকার। (১৫২ পৃঃ)

৬ই জুলকাদা, ৯৪৪ হিঃ। ⎫ গৌড়ের পতন এবং বাংলার সুলতান
৬ই এপ্রিল, ১৫৩৮। ⎭ মাহমুদ শাহের পলায়ন। (১৫৪ পৃঃ)

মে—১৫৩৮। চুণার-দুর্গের পতন। (পৃঃ ১৫৮, পাদটীকা)

জুন—১৫৩৮। হুমায়ুন বঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। (৯৪৫ হিজরা ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে আরম্ভ হইয়া ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে শেষ হইয়াছিল)

জুনের শেষ, ১৫৩৮। নৌকাযোগে শের খাঁ গৌড়ে পৌঁছিলেন। (পৃঃ ১৬৯)

জুলাই মধ্যভাগ—১৫৩৮। শের খাঁ গৌড় পরিত্যাগ করিলেন এবং অব্যবহিত পরেই হুমায়ুন গৌড়ে প্রবেশ করিলেন।

মার্চ্চ—১৫৩৯। হুমায়ুন গৌড়ে এক দল সৈন্য রাখিয়া আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন। (১৮১ পৃঃ)

জুন ২৭, ১৫৩৯। চৌসার ক্ষেত্রে শেরের হস্তে হুমায়ুনের সম্পূর্ণ পরাজয়।

শের শাহের সিংহাসনারোহণ-প্রসঙ্গে ডক্টর কানুনগো মন্তব্য করিয়াছেন যে, শের শাহের রাজত্বকালের বিবরণ-লেখক আব্বাস শারওয়ানী, কখন এবং কোথায় শের শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন তাহা পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। এই কথা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। আব্বাস শারওয়ানীর পুস্তক এলিয়ট (Elliot) এবং ডাউসন (Dowson) সাহেবদ্বয়ের সম্পাদিত *History of India by its own Historians* নামক অষ্টখণ্ডাত্মক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে অনূদিত আছে। শারওয়ানী-প্রদত্ত শের শাহের সিংহাসনারোহণের বর্ণনা উহার ৩৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায় প্রাপ্তব্য। তাহাতে দেখা যায়, শারওয়ানীর মতে এই ঘটনা ৯৪৬ হিজরায় চৌসার যুদ্ধের (১০ই সফর, ৯৪৬ হিজরা—২৭শে জুন, ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) অব্যবহিত পরে সম্ভবতঃ যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটেই কোথাও ঘটিয়াছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে, শারওয়ানী স্থান এবং কাল দুই-ই দিয়াছেন বা তাহার বর্ণনা হইতে ধরিয়া লওয়া যায়,—এবং এই বিষয়ে আব্বাস শারওয়ানী বিশ্বাসযোগ্য নহেন। তারিখ-ই-দাউদী মতেও (শের শাহ্—২০৭ পৃঃ) চৌসার যুদ্ধের পরেই সিংহাসনারোহণ এবং সিক্কা-প্রচার ও খুত্‌বা-প্রচলন সম্পাদিত হইয়াছিল—কাজেই তারিখ-ই-দাউদীর গ্রন্থকারও আব্বাস শারওয়ানীর মতই ভুল খবর লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু শের শাহ যে বাংলা দেশে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন, অনেক গ্রন্থেই তাহার সমর্থন আছে। ডক্টর কানুনগো বলেন, তাঁহার নিকটে 'মখজান্-ই-আফ্‌খানা' নামক ইতিহাসখানির যে হাতে-লেখা পুঁথি আছে, তাহাতে দেখা যায়, শের শাহ বাংলা দেশে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, নিজামুদ্দিন-প্রণীত তবকাৎ-ই-আকবরী, ফেরিস্তা-প্রণীত ইতিহাস এবং বদাওনী-প্রণীত মুন্তাখাব-উৎ-তওয়ারিখ মতে শের শাহের সিংহাসনে আরোহণ বাংলা দেশেই সম্পাদিত হইয়াছিল। এ-যাবৎ সারা উত্তর-ভারতময় শের শাহের বহু সহস্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু অন্য কোথাও আর ৯৪৫ হিজরার মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। এখন বাংলা দেশ হইতেই ৯৪৫ হিজরার তিনটি মুদ্রা বাহির হইল দেখিয়া বাংলা দেশেই প্রথম শের শাহের মুদ্রা প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা যুক্তিসঙ্গত; কাজেই বাংলা দেশেই অর্থাৎ গৌড়েই শের শাহ সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন, ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে কোন্ মাসের কোন্ তারিখ হইতে কোন্ তারিখের মধ্যে শের শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া সহজেই বলা যায়। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ৯৪৫ হিঃ, ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে আরব্ধ হইয়া ১৫৩৯-এর ১৮ই মে শেষ হইয়াছিল। পূর্ব্বসঙ্কলিত ঘটনা-পঞ্জী হইতে দেখা যাইবে, এই দুই তারিখের মধ্যবর্ত্তী অধিকাংশ সময়েই শের শাহ সৈন্য লইয়া অথবা অন্য উদ্দেশ্যে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গৌড়ের পতন হইলেও তিনি তৎক্ষণেই গৌড়ে যাইতে পারেন নাই। জুন—১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চুণারের পতনের পর হুমায়ুন যখন বাংলা দেশের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন তেলিয়াঘরি-সঙ্কটে তাঁহাকে বাধা দিয়া আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া শের দ্রুতগামী নৌকাযোগে গৌড় পৌঁছিলেন। জুনের শেষে শের গৌড়ে পৌঁছিলেন এবং জুলাইয়ের মাঝামাঝি তিনি গৌড় পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। এই এক পক্ষকাল সময়ের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৫৩৮-এর জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যেই, তিনি গৌড়ে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া ৯৪৫ হিজরায় মুদ্রাবলি প্রচারিত করিয়া থাকিবেন। এই সময় ৯৪৫ হিজরির দ্বিতীয় মাস সফর চলিতেছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে, ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগে এবং ৯৪৫ হিজরির সফর মাসের মধ্যভাগে শের শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

অভিযান

শ্রীতারাপদ মজুমদার

প্রক্সির ব্যবস্থা করিয়া কলেজ-পলায়ন করিলে ফাঁসির হুকুম হয় না;—কিরীটি সটান্ হোষ্টেলে আসিয়া উপস্থিত।

ঐ একঘেয়েমি কি প্রত্যেক দিন ভাল লাগে? সংস্কৃতের ক্লাস্‌টায় বরং একটু রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। শাস্ত্রী-মহাশয় যখন মৃদুস্বরে সুরু করেন,—'কাক্ষত্যন্যো বদন-মদিরাং—', নাঃ, এই সমস্ত ভাবিয়া এই বাদ্‌লার দিনে হা-হুতাশ না বাড়াইলেও চলিবে। কালিদাস নিশ্চয়ই কেরানী ছিলেন এবং মুখরা গৃহিণীর মুখনাড়ার চোটে, অধিকন্তু বড়বাবুর তাড়াহুড়ো খাইয়া দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। তার পর বিক্রমাদিত্যের বদান্যতায় ভূরিভোজনে ভুঁড়ি পাকাইয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন এই সমস্ত আদিরস।

...ঐ দিক্‌কার ছাদে সেই মেয়েটি প্রত্যহ চুল শুকাইতে আসে। দুরদৃষ্ট! সে-ও আজ আসে নাই। কি বোকামি! আজ এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে চুলগুলি ভিজাইতে আসিবে না কি? কিন্তু ঐ জানালাটির পাশে আসিয়া না-দাঁড়াইবার জন্য কে তাহাকে মাথার দিব্য দিয়াছিল? বহু পূর্ব্বে একদিন, মাত্র একদিন তাহাকে ঐ বাতায়ন-পার্শ্বে উপবিষ্টা দেখা গিয়াছিল; মুখখানি সেদিন তাহার এই বর্ষার মেঘের মতই ছিল অন্ধকার। সুন্দর মুখে অভিমানও মানায় বেশ। সেদিন নিশ্চয়ই বাড়িতে কাহারও সহিত ঝগড়া করিয়া সে...কিন্তু আজ কি একবার ঝগড়াও করিতে নাই? বাড়ির লোকগুলি কি তাহার কোন কাজে কোনও ত্রুটি দেখিতে পাইয়া একটা ধমক দিতেও জানে না?—খালি খালি রাগাইয়া দিতেও জানে না?

...দেশে গেলে, বৌদিদি হাসি-ঠাট্টা করিতে খুবই মজবুত, কিন্তু কই একটি বিবাহের ব্যবস্থা ত তাঁহার মস্তিষ্কে আসে না? ক্ষমতা নাই এক তিল, কেবলই মুখ-ভাগবত! বেশ, একবার রাগিয়া চটিয়া একটা গলায় ঝুলাইয়া দিন দেখি! তবে জানা যাইবে তাঁহার যোগ্যতা, হাঁ...!

—বাবু রইছেন না কি?—ভেজানো দরজা ঈষৎ ঠেলিয়া ভৃত্যটি দশন-পংক্তি বিকশিত করিল।

কিরীটি ভেঙাইয়া উঠিল,—রইছেন কি রইছেন না, দেখ্‌তে পাইছন্ না?...কি হুকুম শুনি? একটু যদি ঘুমবার চেষ্টা করব, তাও আস্‌বে বাবা বাগ্‌ড়া দিতে!

ভৃত্যটি নিতান্তই ভৃত্য, নচেৎ মেসের ঘর ঝাঁট দিতে আসিবে কেন? চিলেকোঠায় বসিয়া বুকে বই রাখিয়া কাব্যি করিতেও ত পারিত! অর্দ্ধশায়িত ভাবে জানালার বাহিরে 'হাঁ' করিয়া চাহিয়া থাকিয়া কিরূপে নিদ্রার চেষ্টা করা যায়, ভৃত্যটির তাহা বোধগম্য হইল না; বলিল—চিঠির বাক্সে এই পুষ্টকাড্‌খানা ছিল, কার দেকুন দিকি?

কিরীটি হাত বাড়াইয়া কার্ডখানি লইল; তাহারই রুম্-মেট্ অশ্বিনীর চিঠি। একেবারে বাজে! অশ্বিনীর তক্তপোষের উদ্দেশে চিঠিখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে গিয়া, কেন বলা যায় না, চিঠিখানা একবার সে না পড়িয়া পারিল না। পড়িতে পড়িতে তাহার ললাট সঙ্কুচিত হইল, চক্ষুর্দ্বয় অপেক্ষাকৃত বড় হইল; অস্ফুট উচ্চারিল,—হুঁ। লাকী চাপ্ এই অশ্বিনীটা। দুই মাসও হয় নাই, সুন্দরী পত্নী লাভ করিয়াছে, আর ইহারই মধ্যে বার-দুই অন্ততঃ সেই শ্রীধামে পাড়ি দিয়াছে। এবার আবার কোন্ এক দিদি-শাশুড়ীর নিমন্ত্রণ। বিবাহের সময় তাঁহারা পশ্চিমে ছিলেন, নবজামাতাকে দেখিতে পান নাই, তাই এই আবাহন। আবার লিখিয়াছেন, শ্বশুরবাড়ির পরিবর্ত্তে দিদি-শাশুড়ির বাড়ি গেলেও অশ্বিনীর লাভ বই লোকসান হইবে না। তার পর কি লিখিয়াছেন, কাটিয়া দিয়াছেন, পড়া যায় না।...লাভ ত ষোল আনা! দুধের তেষ্টা ঘোলে? ফুঃ! অশ্বিনী যদি নিরেট্ হয়, তবেই গরদের পাঞ্জাবী গায় চড়াইবে।...কিন্তু...আচ্ছা, এক কাজ করিলে হয় না? ইঁহারা কেহই ত অশ্বিনীকে চেনেন না! ...অল্ রাইট্!...

কার্ডখানি পকেটে ফেলিয়া কিরীটি স্মিতমুখে উঠিয়া পড়িল।

—কি রে থিয়েটারে না কি? একবারে যে জামাই-বাবুটি সেজে!

কেমন একরকম হাসিতে হাসিতে কিরীটি জবাব দিল,—আর বলিস্ কেন ভাই, বাবার হুকুম, বাড়ি যেতে হবে একবার।

—হুর্ রে, বলিয়া অশ্বিনী লাফাইয়া উঠিল,—আমার বাতাস গায়ে লাগ্‌ল না কি? তা আগে থেকে বলিস্ নি কেন ভাই? একেবারে পাকা দেখা না কি? যাই হোক্, যথাসময়ে ইতর জনদের যেন স্মরণ রাখিস্?

—নিশ্চয়ই। এখন পাকাপাকি হয়ে গেলেই মঙ্গল। না আঁচালে ত বিশ্বাস নেই। যে আমার ভাঙা কপাল! আয়রন্ সেফ ভর্ত্তি করতে না পেলে কোন কথাই কইবেন না বাবা।

হাসিতে হাসিতে অশ্বিনী উত্তর দিল—মুষ্‌ড়ে যেয়ো না ভায়া, এখন থেকেই মুষ্‌ড়ে যেয়ো না। আচ্ছা, এখন এস, উলু-উউ…

বুক দুরু দুরু করে। তবু ইহার মধ্যে আছে রোম্যান্স, নিছক জালিয়াতি। অশ্বিনীর গৃহলক্ষ্মীটি ওখানে থাকিলেই বিপদ। বন্ধু-পত্নীর উপর শ্যেনদৃষ্টি আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। তা ছাড়া চিনিয়া ফেলিবে যে! তখন ত লজ্জার পরিসীমা থাকিবেই না, উপরন্তু পৃষ্ঠদেশটিও অক্ষত লইয়া ফিরিতে হইবে না। এই ত বেশ! দুই-তিন দিন দিদিমার সহিত হাস্য-পরিহাস করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা যাইবে। কেহই ধরিয়া-ছুঁইয়া পাইবে না। লাভ হইবে তাহার দিনকয়েক জামাই-আদরে ভোজন; চাই কি, শ্যালিকা-রত্ন থাকিলে একটু আধটু খুনসুটি! মন্দ কি?

…ষ্টেশন হইতে গ্রামের দিকে চলিতে চলিতে কিরীটি গুনগুন্ করিয়া সুর ভাঁজিতে লাগিল,—'অতিথি এসেছে দ্বারে…'

পাঁচহাতি ধুতি-পরা একটি ব্রাহ্মণ একগাছা দড়ি-হাতে আসিতেছিলেন। কিরীটি হাঁকিল,—ও মশাই, শুন্‌ছেন?

—ঐ রাগিণী আবার কে শুন্‌তে পাবে না মশাই বলুন?

—কৈলাস বাবুর বাড়িটি কোন দিকে?

—কোন্ কৈলেস্? নায়েব-কৈলেস, না হাবা কৈলেস, না…

কৈলাসের ধূলপরিমাণ! কিরীটি হাসিয়া ফেলিল,—ক'টা কৈলেস আছে মশাই এখেনে? আপনি কি কৈলেস? দড়ি কৈলে…

—যান্ যান্ মশাই, দেখে নিন্ গে, আমি জানি নে।… আমার ছাগলটাকে যেতে দেখেছেন ইদিকে? বলিয়া ব্রাহ্মণটি হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ভদ্রলোকটিকে রাগাইয়া দেওয়া ভাল হয় নাই। কিন্তু কৈলাসের নামের তালিকাখানিরও তারিফ্ করিতে হয়। বাপ্! গড়গড় করিয়া যেন গুরুমহাশয়ের সম্মুখে পড়া দিতেছে!

অদূরে একটি ছেলে গরু চরাইতেছিল, তাহার সমীপস্থ হইয়া কিরীটি জিজ্ঞাসা করিল,—বাপধন, কৈলাস বাবুর বাড়ি চেন?

একগাল হাসিয়া বাপধন উত্তর দিল,—তা আর চিনি না! আমি যে তেনাদেরই কিষেণ গো। আপনি কুন্ গাঁ থেকে আসছ?…হাতের পাঁচন গাছটি উঁচাইয়া ধরিয়া বলিল,—উই যে টিনের আটচালা খানা দেক্‌চেন, উরই পাশে; চলে যাও নাকের সোজা।

নাকের সোজা গিয়া কিরীটি একটি দাওয়ায় একটি ভদ্রলোককে উপবিষ্ট দেখিল।

—মশাই, কৈলাস বাবুর বাড়িটা…

—ওই যে গেটওলা ওই বাড়িখানা।…ওরে সুরো, চাবুকগাছটা আন্ ত?

চাবুক! কিরীটি চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। তবু ভাল। ভদ্রলোকটির বিশাল বপুর অন্তরালে দুইটি বালক পাঠাভ্যাস করিতেছে; সম্ভবতঃ তাহাদেরই কাহারও পৃষ্ঠদেশের সহনশীলতা পরীক্ষার জন্য বেত্রপ্রার্থনা!

গলা শুকাইয়া আসিতেছে। প্রথম-দর্শনটা ভগবানের

ইচ্ছায় নির্ব্বিঘ্নে কাটাইতে পারিলেই···কিরীটি দরজায় করাঘাত করিল।

প্রশ্ন আসিল,—কে ?

—আজ্ঞে আমি এই···

দরজা খুলিয়া একটি সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ কিরীটিকে দেখিয়া যেন একটু হক্‌চকাইয়া গেলেন।

কিরীটি কি বলিয়া পরিচয় সুরু করিবে, মনে মনে তাহারই মুসাবিদা করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার দুর্নিবার দুশ্চিন্তাও!—কি দাদু সাহেব, চিনিয়া ফেলিলে না কি? দোহাই বাবা, তোমার নাৎজামায়ের দিব্য, চিনিতে পারিও না যেন। তাহা হইলে আমাতে আর আমি থাকিব না। বৃদ্ধ তুমি, কেন এই সব চেনাচেনির ঝঞ্চাটে যাইতে চাও? দু-দিন ভালটা-মন্দটা, একটু-আধটু হাসি-তামাশা, এর বেশী আশা ত আমার নাই। প্রকাশ্যে হাসিয়া বলিল—আমায় চিন্‌তে···হেঁং, আমি অশ্···

দাদাসাহেব লাফাইয়া উঠিলেন—আরে এস ভায়া এস। দোষ নিয়ো না ভায়া। আমি ত তোমায় দেখি নি আগে।

যাক্, বাঁচা গেল। মৃদু হাসিতে হাসিতে কিরীটি বলিল,—না দেখলে কি কেউ কারুকে চিন্‌তে পারে? আমিও ত চিন্‌তাম না। হাজার জায়গায় জিজ্ঞেস্ করতে করতে···

কিরীটি সাদরে অভ্যর্থিত হইল। সন্দেশ রসগোল্লা, ক্ষীর, পায়েস, পরমান্ন কিছুর অভাব হইল না।

পায়ে খড়ম, হাতে হুঁকা,—কৈলাস চাটুজ্জে তদীয় গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইলেন; হ্যাঁ গা?

—কি গা?

—নাৎজামায়ের ত খুবই খাতির সুরু করলে, কোল্‌কাতার সব ছোঁড়াগুলোই তোমার নাৎজামাই নাকি?

—তার মানে?

—মানে অতি সহজ। আমরা কেউই ত অশ্বিনীকে চিনি নে। এখন এই শালাই যে জোচ্চুরি ক'রে আসে নি তাই বা কে বললে? ললিতা তোমায় লিখেছিল না, 'সত্যি দিদিমণি, কপালের উপর কাটা দাগটুকু না থাকলে তোমার কথামতই মেনে নিতাম তোমার নাৎজামাইটি ময়ূর-ছাড়া কার্ত্তিক?'

বিস্ময়ে মাথা তুলিয়া কৈলাস-গৃহিণী কহিলেন,—হ্যাঁ তা ত লিখেছিল?

—কিন্তু এ-শালার কপাল একেবারে সমতল। কোথাও কাটাকুটি নেই, তবে লাঠালাঠি আছে কিনা কে জানে?

—তাই নাকি গা?

—তাই ত মনে হচ্ছে। তবে অশ্বিনীর বিশেষ বন্ধুটন্ধু কেউ হবে বোধ হয়। যাক্ তুমি যেন এখন থেকে ওর বেখাতির কিছু ক'রো-টরো না। আগে ভাল ক'রে দেখি।

বৃদ্ধের কর্ম্মভোগ!—অর্দ্ধ মাইল দূরে ষ্টেশনে গিয়া 'তার' করিলেন :—

"অশ্বিনী মুখার্জ্জি, স্প্রিং হোষ্টেল, রাজাবাজার, কলিকাতা, ললিতা বিপন্না, শীঘ্র এস।—কৈলাস, রাজগাঁও।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বেচারা অশ্বিনী শুষ্কমুখে রাজগাঁও ষ্টেশনে অবতরণ করিল।

ক্ষুদ্র ষ্টেশন্। মাত্র চারি-পাঁচটি যাত্রী ট্রেন হইতে নামিল। তাহাদের মধ্যে অশ্বিনীকেই কেবল ভদ্রবেশ-পরিহিত দেখিয়া দাদামহাশয় অগ্রসর হইলেন। অশ্বিনীর দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া দাদামহাশয় বুঝিলেন, তাঁহার সংশয় অমূলক নহে। মনে মনে বলিলেন,—বহুৎ আচ্ছা, তুমি আসিতেছ বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে; আর এদিকে এক জন আমার বাড়িতে বসিয়া লুচি চিবাইতেছে!

অশ্বিনীর বুকের মধ্যে তখন তুফান চলিতেছে। ঐ যে বৃদ্ধটি আগাইয়া আসিতেছেন, নিশ্চয়ই কোন আত্মীয়। 'বিপন্না'! কি বিপদ্? অসুখ? তবে কি ললিতা একেবারে···যাঁ! তাই পূর্ব্বাহ্নেই একটু সান্ত্বনা দিতে ইনি···তাহা হইলে সে কিন্তু এক পাও ষ্টেশন হইতে নড়িবে না। ললিতা, কিসের জন্য এই জংলা দেশে আসিয়া বিঘোরে প্রাণটা খোয়াইলে? অশ্বিনীর অজ্ঞাতসারে দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া পড়িল।

দাদামহাশয় অপ্রস্তুত! গাছে না-উঠিতেই এক কাঁদি! শালার চক্ষে একেবারে বান ডাকিয়া গেল। এদিকে যখন ললিতাসখী ঘণ্টাখানেক পরে সদলবলে

হাজির হইবেন, তখন? তখন শালার চক্ষু দুইটি শুকাইয়া আমচুর হইয়া যাইবে যে! সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, আপনি—তুমিই অশ্বিনী বাবু?

—আজ্ঞে হাঁ, আপনি··· ?

—অধীন তোমার ললিতের খাসমহলের খিদ্‌মদ্‌গার, নাম কৈলাস চাটুজ্জে।

অশ্বিনী নত হইয়া বৃদ্ধের পদধূলি লইল। এক ফোঁটা অশ্রু বৃদ্ধের পদচুম্বন করিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন—এটাকে আমি বিরহাশ্রু বলেই মেনে নিলাম, কারণ শ্রীমতী ললিতে বহাল-তবিয়তে আছেন এবং আর কিছুক্ষণ পরেই হুজুরে হাজির হবেন।

অশ্বিনী 'থ'!—অর্থাৎ? পকেটের মধ্যে হাত পুরিয়া টেলিগ্রাম হাতড়াইতেছে।

—হাঁ, টেলিগ্রামটি নকল নয়, তবে তার বিষয়টুকু নকল। তুমি 'ধৈর্য্যং ধর'—বলিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বলিলেন।

অশ্বিনী চোখ পাকাইয়া উঠিল।—স্কাউণ্ড্রেল্! চেহারাটা কেমন বলুন ত? দোহারা? বড় বড় চুল? ডান চোখটা সামান্য ছোট দেখায়? (একটু ভাবিয়া) গায় একটা মুগার পাঞ্জাবী? য়্যাঁ? তাই? ঠিক হয়েছে। কিরীটি। আমার রুম-মেট্। উঃ, কি শয়তান! আজ কিলিয়ে ওর ঘাড়ের ভূত নামাব আমি। অশ্বিনীর মুষ্টিবদ্ধ হস্ত উথিত হইল।

পশ্চাতে মস্তকটি ঈষৎ হেলাইয়া বৃদ্ধ কহিলেন—একটু সাম্‌লে ভায়া। তোমাদের ওই সুন্দ-উপসুন্দের দ্বন্দ্বের মধ্যে আমায় যেন নিমিত্তের ভাগী ক'রো না। বুড়ো-থুড়ো মানুষ আমি। আর তা'ছাড়া সে বন্ধুই ত। একটুখানি মজাই না-হয় করলে। তোমারও ত লাভ বই লোকসান হচ্ছে না; ললিতা লাভ হচ্ছে ত?

—কি যে বলেন আপনি। এটা কি ভদ্রলোকের কাজ? আর যদি লল্-ললিতা সেখানে থাক্‌ত! নিতান্ত কাতর কণ্ঠে অশ্বিনী কথাটা শেষ করিল।

বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—থাক্‌লেই বা? তর্জ্জনী উঁচাইয়া ললিতা-সুন্দরী তাহাকে কহিতেন, 'বেরোন্ এক্ষুনি।' সে ত সনাক্ত করতে পারত? বিয়ে ত তুমিই করেছিলে না কিরীটিকে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলে সে সময়!

—দূর, তা কেন!

—তবে?···অতএব মেজাজ সরিফ্ রাখো। সম্পর্ক ধরতে গেলে কিরীটির সঙ্গেও ত আমার তামাশার সুবাদ হচ্ছে। বাটপাড়ি একটু করাই যাক্ না? একান্তই আমাদের গেঁয়ো বানিয়ে যাবে?

পথ চলিতে চলিতে উভয়ের মধ্যে কত কি যুক্তি হইয়া গেল। অশ্বিনী দাদামহাশয়ের গৃহে না উঠিয়া দ্বিতীয় একটা গৃহে আস্তানা লইল।

পরবর্ত্তী ট্রেনে অগ্রজ প্রতুলের সহিত ললিতা আসিয়া অশ্বিনীর রশ্মি টানিয়া ধরিল।

কিরীটির স্ফূর্ত্তি দেখে কে? এই গেঁয়ো ভূতকয়টির চোখেই যদি ধূলি নিক্ষেপ করিতে না-পারিল ত বৃথাই সে এত দিন ডিটেক্‌টিভ্ নভেল্‌গুলি চর্ব্বণ করিয়াছে, গল্প লিখিয়া মাসিকের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে।···কিন্তু অশ্বিনীর শালীটালী কেহই তেমন ঘেঁষিতেছে না। পল্লীগ্রামের লাজুক মেয়ে আর কাহাকে বলে? জামাইবাবুদের উপর শ্যালিকা-সম্প্রদায়ের যে অখণ্ড প্রতাপ তাহা কি ইহাদের জানা নাই? আমার কাছে আসিলে কি কুম্ভকর্ণের মত উদরসাৎ করিয়া ফেলিব? কাল বৈকালে সেই যে একবার আসিয়াছিল, টুলি না কি তাহার নাম? ভাল নাম এই যেমন রেবা কি তপতী নিশ্চয়ই একটা আছে। বেশ মেয়েটি! সবচেয়ে বেশ তাহার চক্ষু দুইটি, আর ঠোঁট দুইখানি! সেই যে, "তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী"। কালিদাস বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকে আমার বিবাহের ঘটক নিযুক্ত করিতাম।···দোতলায় ড্রেসিং টেব্‌লের সম্মুখে কিরীটি ক্ষৌরকার্য্য করিতেছিল। আয়নাতে একখানি ফুল্ল আননের প্রতিবিম্ব পড়িতেই সে কুচ্ করিয়া তাহার গণ্ডের একাংশ কাটিয়া ফেলিল। গ্রাহ্য না করিয়া ফিরিয়া চাহিল, টুলি—শিখরদশনা! চোখ নামাইয়া কহিল,—কি খবর? কাল থেকে আর দেখাই নেই যে? বেচারা মরল্ কি বাঁচল একটু খোঁজও নিতে নেই?

—দাদামণি আপনাকে একবার ডাক্‌চেন নীচেয়, আসুন শীগগির।

কিরীটির বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। ধরা পড়িয়া গেল না কি! চাবুক প্রস্তুত?…বারকয়েক ঢোঁক গিলিয়া গলাটা একটু ভিজাইয়া লইল।…দুত্তোর্ কি ছাইভস্ম সে ভাবে দিন-রাত্তির! চেষ্টাকৃত সহজ কণ্ঠে কহিল এক্ষুনি? দাড়িটা কামিয়ে নিয়ে…

ঘাড় নাড়িয়া টুলি বলিল—উঁহু, এক্ষুনি চলুন, এসে। কামাবেন।

কি সুন্দর গ্রীবাভঙ্গি! কিরীটির মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছে। একদিক্ কামানো অবস্থাতেই কলের পুতুলের মত উঠিয়া বলিল—চল, শুনেই আসি?…কিন্তু এত জরুরি! বুকটা বারণ মানে না, ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়াই চলিয়াছে।

দাদামহাশয় বিষাদ-গম্ভীর মুখে একখানি মোড়ায় বসিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে বেশ হৃষ্টপুষ্ট একটি ভদ্রলোক একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট; সুতীক্ষ্ণভাবে চারিদিকে চাহিতেছেন।

—আমায় ডেকেছেন?

—হ্যা বোস।…ওরে আর একখানা চেয়ার দিয়ে যা ত?

—থাক্ বসছি আমি।—ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—কামাতে কামাতেই …হেঁঃ…

ভদ্রলোকটি চাহিলেন—হ্যা, মানাইয়াছে বেশ! একটি গাল দিব্য পরিষ্কৃত, অন্যটিতে সাবানের ফেন পুঞ্জীভূত।

দাদামহাশয় খুবই কাতর কণ্ঠে কিরীটিকে কহিলেন,—কি সাংঘাতিক ব্যাপার শোন এঁর কাছে, বলিয়া ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া দিলেন।

ভদ্রলোকটি ঈষৎ হাসিয়া, ঈষৎ নড়িয়া-চড়িয়া সুরু করিলেন,—কর্ত্তব্যের খাতিরে কত অপ্রিয় কাজই করতে হয় আমাদের…

দাদামহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—পেটের দায়ে চাকুরী করতে হয়, নইলে এই সব পাজি কাজ কি মানুষে করে? উনি আজ এখানে এসেছেন, ওঁকে নিয়ে আপনারা কোথায় একটু আমোদ-আহ্লাদ করবেন, তা না…

কিরীটির দিকে পুনরায় চাহিলেন,—আপনার নাম অশ্বিনী মুখার্জ্জি? খুবই দুঃখের সহিত জানাচ্ছি, আপনার নামে একটা ওয়ারেণ্ট আছে। দয়া ক'রে একবার থানায় যেতে হবে আমার সঙ্গে। আমি ইন্‌ভেষ্টিগেশন্ ব্রাঞ্চের লোক।

বিষাদভরে দাদামহাশয়ের মস্তক নত হইয়া পড়িল।

কিরীটির অবস্থা? সে তখন অত্যুচ্চে উড্ডীয়মান এয়ারোপ্লেন্ হইতে সুদূর নিম্নস্থ ভীষণ সমুদ্রবক্ষে পড়িয়া যাইতেছে এবং নিম্নেও একটি বৃহদাকার কুম্ভীর বিশাল মুখব্যাদান করিয়া তাহাকে যেন সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছে, আমি প্রস্তুত, এস!—

বলিয়া উঠিল,—আমি কিরী…আমি—আমি যদি অশ্বিনী না হই?

গম্ভীর হাসি হাসিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন—প্রমাণ না পেয়েই কি একটা ভদ্রলোককে মিছামিছি অপমান করতে এসেছি, স্যর?—কি চাটুজ্জে-মশাই, আপনার কিছু বল্‌বার আছে এতে?

—আমি আর কি বল্‌ব? জামিনও চল্‌বে না, শুন্‌লাম্। দাদামহাশয় ব্যথিত দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরাইলেন।

কিরীটি সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—কিন্তু আমি যদি প্রমাণ ক'রে দিতে পারি, আমি অশ্বিনী নই?

—সে কি মশাই, কৈলাসবাবুর নাৎজামাই, আপনি অশ্বিনীবাবু, কাল এখানে এসেছেন; এখন আবার এসব কি বল্‌ছেন?…লেবু রগড়ালে তেতো হয়; …এসব ব্যাপারে চুপচাপ আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিরীটি আর আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। দাদামহাশয়ের একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, —মাফ্ করুন, দাদামশাই, আমি আপনাদের সঙ্গে জোচ্চুরি ক'রেছি। আমার নাম কিরীটি বাঁড়ুজ্জে। অশ্বিনীর বন্ধু আমি, সেখানে এক হোষ্টেলেই থাকি।

দাদামহাশয়ের নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত!—সে কি মশাই? আপনি, আপনি ভদ্রলোকের মান-সম্ভ্রম নষ্ট কর্‌তে এসেছেন? য়্যাঁ, আপনি…

ভদ্রলোকটি অবাক্! বলিলেন—উঃ কি সাংঘাতিক, দাদামহাশয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বলেন তো এই অপরাধেই এঁকে…

দরজার ওপাশ হইতে ললিতার হাসি মুখখানি দেখা

গেল। ওঁর মামলাটা এবার আমাদের এজলাসেই ছেড়ে দিন্ দাদামশাই? শাস্তির ব্যবস্থা আমরাই করছি।

কিরীটির সব গোলমাল হইয়া গেছে। দুরূহ রহস্য! মুখ তুলিয়া বক্তৃীর দিকে চাহিতে যাইবে, সম্মুখে অশ্বিনী! ভদ্রলোকটির পিঠে হাত দিয়া বলিতেছে—আর না প্রতুল-দা, একটু দয়ামায়াও কি নেই আপনাদের?...চল রে কিরীটি, উপরে চল।

ওঃ!...প্রতুল ত অশ্বিনীর বড় শ্যালকের নাম! চেয়ারের পিঠ ধরিয়া কিরীটি সম্মুখের দিকে খানিকটা ঝুঁকিয়া পড়িল।...সমস্ত বাড়িখানির মধ্যে তখন হাস্য-বৃষ্টি সুরু হইয়া গিয়াছে। দরজার ফাঁকে ফাঁকে, থামগুলির আড়ালে আড়ালে, পাতকুয়ার ওপাশে যেন হাজারো সংযত কণ্ঠ এক-সঙ্গে হাসির ঐকতান জুড়িয়া দিয়াছে।—হা-হা, হো-হো, হি-হি। টুলির ছোটভাইটি, কি বুঝিয়াছে সেই জানে, অথবা দেখাদেখি, ছোট মাথাটিকে প্রবল ভাবে দোলাইয়া দোলাইয়া হাসিতেছে খিথ্খি—খি—থ্খি।

বসুমতী আশ্রয় দাও মা! কিরীটির মস্তকের মধ্যে ঝন ঝন করিতেছে, কর্ণাভ্যন্তর হইতে যেন অগ্নি বাহির হইয়া আসিতেছে। চোখেও যাহা দেখা যায়, সব বিকৃত, যেন দাদামহাশয়, প্রতুল, অশ্বিনী, চেয়ার, মোড়া সব গলিয়া এক স্থানে পিণ্ডীভূত!

কিরীটি পলায়নের উদ্দেশ্যে সুটকেস গুছাইতেছে। অশ্বিনী প্রবেশ করিল।—কিরীটি?

—কেন?

—কিরীটি, শুনছিস?

—বলই না ছাই?

—তোর কি শাস্তি হয়েছে জানিস?

উদাস কণ্ঠেই কিরীটি বলিল,—ছ-মাস ফাঁসি!

—ঠিক অমনটি নয়। যাবজ্জীবন তাঁবেদারি।

—তাঁবেদারি? কার?

—টুলির।

'তন্বী শ্যামা'। মন্দ কি?—কিরীটিকে নির্লজ্জই বলিতে হয়। কহিল,—সত্যি, না এবার আবার কোন নতুন চাল? তাহ'লে কিন্তু...

ওষ্ঠাধরে তর্জ্জনী রাখিয়া অশ্বিনী বলিল—চুপ! পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া মৃদুস্বরে কহিল—শুনতে পাচ্ছিস?

তথায় ললিতার কণ্ঠ শুনা গেল,—সব ঠিক।

টুলি বলিল—হুঁ!

—কি বুঝলি যে হুঁ বললি?

—যা তোমাদের ঠিক।

—কি ঠিক বল্ দিকি?

—তুমিই বল দিকি?

—তবে না-জেনেশুনে উত্তর দিস্ কেন?...বিয়ের সব ঠিক।

—কা'র বিয়ে, অশ্বিনীবাবুর?

ঝাঁজালো গলায় উত্তর হইল,—এমন এক চড় লাগাব তোকে!

—তবে সোজাসুজি বল্‌লেই ত হয়, বাবু!

—তোর বিয়ে, তোর তোর, মা গো, মেয়ে যেন শোনবার জন্যে নিস্‌পিস্ করছে!

—তাই না কি? কিছু নেই দিদি, নইলে মিষ্টি মুখ করাতাম তোমায়, এমন খবরটা...

—ইয়ারকি নয়, সত্যি।

—কার সঙ্গে?

—কিরীটিশ্বরের সঙ্গে।

—বয়েই গেছে ওই জোচ্চোরটাকে বিয়ে করতে।

—তা হ'লে মানা ক'রে দিচ্ছি গে?

—বা রে! শেষটায় আমার ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাও? ফিক্ করিয়া টুলি হাসিয়া ফেলিল।

অপচয়-নিবারণে রসায়ন-বিদ্যা

শ্রীপুলিনবিহারী সরকার, এম্‌-এসসি

অনেক মনীষীর মতে মানুষের অভাববোধ জন্মাইয়া দেওয়া মানেই তাহাকে সভ্য করিয়া তোলা। পক্ষান্তরে যে-জাতির প্রয়োজন যত বেশী, সে-জাতি তত সভ্য। ভগবানের প্রথম সৃষ্ট মানব-দম্পতি হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিক নরনারীর সাজসজ্জা, বসনভূষণ, আহার-বিহার প্রভৃতির ক্রমোন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহা অনেকটা সত্য বলিয়াই মনে হয়। জ্ঞানের প্রথম উন্মেষে সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষকে অভিশাপ দিয়াছিলেন—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তাহাকে পেটের অন্ন সংগ্রহ করিতে হইবে। মানব-জ্ঞানের পরিধি তার পর অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে—বিধাতার অভিসম্পাতও সেই অনুপাতে কঠোরতর হইয়াছে। শুধু মস্তকের নয়, সর্ব্বশরীরের ঘর্ম্মে কেবল পদযুগল নয়, নিম্নস্থ ধরণীতল সিক্ত করিয়াও আজ মানুষ দুই বেলা দুই মুঠা খাবার জোগাড় করিতে পারিতেছে না। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা হয়ত উন্নতির প্রায় চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে নতুবা চারিদিকে এত হাহাকার, এত অসন্তোষ, এত মারামারি কাটাকাটি কেন? তারপর, মা-ষষ্ঠীর কৃপায় "পুত্রকন্যা বন্যার মত" নামিয়া আসিয়া সমগ্র ধরণীতল ছাইয়া ফেলিতেছে—এক শতাব্দীতে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ৬০ হইতে ২০০ কোটীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জন্ম-নিরোধের প্রতি রুচিবাগীশদের প্রবল বিতৃষ্ণা, শান্তিকামী মহাপুরুষদের পৃথিবী হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ চিরতরে বিদুরিত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা, উন্নত চিকিৎসাশাস্ত্রের সাহায্যে মানবের মৃত্যুহার হ্রাস ও নবযৌবন-বিধান প্রভৃতির ফলে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে। পেটের তাড়নায় কলম্বসের আবির্ভাব হইয়াছে ইদানীং অনেক—কিন্তু আমেরিকা আর কোথায়? অতি দুর্গম মেরুপ্রদেশদ্বয়ও পিয়ারী (Peary) ও আমুনসেন (Amundsen) আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। স্থানবৃদ্ধির একমাত্র উপায় গ্রহান্তরে চলিয়া যাওয়া—আকাশযান মঙ্গলগ্রহযাত্রা সুগম করিবে কিনা, আর করিলেও, সে ছোট তরীতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ঠাঁই হইবে কিনা, কে জানে? তাই বর্ত্তমান যুগের মানব জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা—পুনরায় অসভ্য হওয়া নয়, অজ্ঞান-তিমিরে ফিরিয়া গিয়া পূর্ব্বপুরুষ-কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাও নয়—সমস্যা আজ, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের গ্রাসাচ্ছাদন ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা। জ্ঞানবৃক্ষের ফলভক্ষণহেতু যে দুঃখের উৎপত্তি, জ্ঞানের চর্চ্চা ও পরিবর্দ্ধন দ্বারাই তাহার প্রতিকার করিতে মানুষ বদ্ধপরিকর। তারই ফল আজিকার জ্ঞান-বিজ্ঞান ললিতকলার অত্যদ্ভুত বিকাশ। উন্নত কৃষি, পণ্যোন্নতি ও অপচয়-নিবারণ দ্বারা এই কঠোর সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। বলা বাহুল্য, এই ত্রিবিধ উপায়ের মূলে রসায়ন-বিদ্যার জ্ঞান। অপচয়-নিবারণে রসায়ন-শাস্ত্র কতখানি সাহায্য করিয়াছে এবং তাহার ফলে নিতান্ত তুচ্ছ ও অব্যবহার্য্য দ্রব্য হইতে কেমন সুদৃশ্য ও মুল্যবান জিনিষ প্রস্তুত হইয়া দেশের ধনবৃদ্ধি ও বেকার-সমস্যা দূর করিতেছে, এই প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

আল্‌কাত্‌রার সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে, ঘ্রাণের তীব্রতায়, অঙ্গরাগের যোগ্যতায়—এক কথায়, রূপে-রসে-গন্ধে-স্পর্শে জিনিষটি একেবারে অনবদ্য। যেখানে নগর আলোকিত করিবার জন্য পাথরকয়লা গ্যাসে পরিণত করা হয় সেই গ্যাসের কারখানায় এবং লৌহ প্রভৃতি ধাতু প্রস্তুত করিবার জন্য যেখানে কাঠ কিংবা পাথর-কয়লা আংশিক পুড়াইয়া কোক তৈয়ারী হয় সেই কোক-ওভেনে এই রূপে-গুণে অতুলনীয় বস্তুটি একান্ত অবাঞ্ছিত (by-product) রূপে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কারখানার মালিকগণ ইহা কি ভাবে এবং কোথায় ফেলিয়া দিয়া নিষ্কৃতি পাইবেন কিছুদিন আগেও তাহা ভাবিয়া পাইতেন না। আল্‌কাত্‌রার সদ্গতির কথা তাঁহাদের কল্পনায়ও আসিত না—কেহ ইহা লইতে

স্বীকৃত হইলে তাহাকে বরং কিছু দিতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু রসায়ন-শাস্ত্রের কৃপায় আজ ইহা মানুষের অনেক কাজে লাগিতেছে। আল্‌কাতরা হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যে-সব মূল্যবান জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে তাহার শুধু তালিকা দিলেই পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার আশঙ্কা আছে। তাই মাত্র অতিপ্রয়োজনীয় কয়েকটি দ্রব্যের উল্লেখ করা গেল।

বায়ু-বিহীন পাত্রে আলকাত্‌রা উত্তপ্ত করিলে কঠিন ও তরল কতকগুলি যৌগিক দ্রব্য পাওয়া যায়—যেমন বেন্‌জিন (benzene), কার্ব্বলিক্ এসিড্, [illegible], ক্রিয়োজোট (creosote), টোলুইন (toluene), য়্যানথ্‌্রাসিন (anthracene) ইত্যাদি। প্রায় অর্দ্ধেকটা পীচরূপে পাত্রের তলদেশে পড়িয়া থাকে। রাস্তানির্ম্মাণ-কার্য্যে ও 'ব্রিকেট' (briquette) তৈয়ারী করিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত কেরোসিনের খনি সংখ্যায় খুব বেশী নয়, কিন্তু পাথর-কয়লা অনেক দেশেই প্রভূত পরিমাণে আছে। অধুনা শুধু যান-বাহন হিসাবেই নয়, অন্যান্য অনেক কাজেও মোটর ব্যবহৃত হইতেছে। ফলে পেট্রোল-সমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকা ও ইউরোপে পেট্রোলের সহিত বেন্‌জিন মিশ্রিত হইয়া মোটরের ইন্ধন-রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। পোষাক-পরিচ্ছদ জলে না ভিজাইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে পরিষ্কার করিতে বেন্‌জিন যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন হয়। ইহাকে 'ড্রাই ক্লিনিং' বলে। ন্যাপথেলিন জিনিষটির সহিত আমরা অনেকেই পরিচিত—পোকার উপদ্রব নিবারণ করিতে ন্যাপথেলিন-গুটিকা আমরা কাপড়ের ভাঁজে রাখিয়া দিই। কিন্তু ইহার চাহিদা সবচেয়ে বেশী হয় কৃত্রিম রং প্রস্তুত করিতে। বেনজিন ও য়্যানথ্‌্রাসিনও সেজন্য দরকার হয়। বাজারে যত রকম রং দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশ আল্‌কাতরা হইতে প্রস্তুত। যে-সকল রঙের স্থায়িত্ব, ঔজ্জ্বল্য ও মনোহারিত্ব সম্বন্ধে একবাক্যে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র দিবেন আমাদের তরুণীরা—শাড়ী ব্লাউজের রং পছন্দ করিতে যাঁহাদের ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইতে হয়, অতি-কুৎসিত আলকাতরা হইতে সেই সকল রঙের উৎপত্তি শুনিয়া তাঁহারা হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। আরব্য-উপন্যাস-বর্ণিত আলাদিনের প্রদীপ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যে ইহা সম্ভব হইতে পারে জনসাধারণকে তাহা বিশ্বাস করান শক্ত। জার্ম্মানী ও ইংলণ্ডের সুবৃহৎ বহু-সংখ্যক রঙের কারখানায় শত সহস্র লোক কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার রং বিক্রী করিয়া দেশ সমৃদ্ধ হইতেছে। জীব-রসায়নের (Organic Chemistry) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগারে নানাবিধ যৌগিক পদার্থ মানবের রোগ-নিবারণে ব্যবহৃত হইতেছে। ক্ষত আরোগ্য করিতে ও সাপ মারিতে আমরা কার্ব্বলিক এসিড্ ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা রোগের বীজাণুনাশক। ফিনাইল জিনিষটি কার্ব্বলিক্ এসিড্-জাতীয় কতকগুলি পদার্থের সংমিশ্রণ মাত্র। ঘরবাড়ি, নর্দ্দমা পরিষ্কার করিতে ফিনাইল্ নিত্য ব্যবহৃত হয়। এ-সকলই আল্‌কাত্‌রা হইতে উৎপন্ন হয়। উপদংশের একমাত্র মহৌষধ স্যালভার্সন (অথবা ৬০৬) এবং অনিদ্রা-নিবারক নানা প্রকার ঔষধও আল্‌কাতরা হইতে তৈয়ারী হয়। সব-চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার—দুনিয়ার মিষ্টতম জিনিষ স্যাকেরিনও আল্‌কাতরা হইতে প্রস্তুত হইতেছে। ইহা চিনি অপেক্ষা অন্ততঃ ৫০০ গুণ বেশী মিষ্ট। বহুমূত্র রোগীরা চিনি হজম করিতে পারে না—প্রায় সমস্তটা প্রস্রাবের সহিত অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় নির্গত হয়। অথচ দৈনন্দিন আহারে মিষ্টি ছাড়া চলে না। স্যাকেরিন তাহাদিগকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। গত মহাযুদ্ধে বিবিধ বিস্ফোটক ও বিষাক্ত গ্যাস্ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়ায় যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। এই বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের সুবিধাও অনেক। তাই ভবিষ্যৎ কালে যুদ্ধে (যদি সত্যই যুদ্ধ কখনও আবার বাধে) এই সকল দ্রব্যের প্রচুরতর প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হয়। আল্‌কাতরা হইতে প্রস্তুত নানা রকম যৌগিক পদার্থ হইতেই অধিকাংশ বিষাক্ত গ্যাস ও বিস্ফোটক তৈয়ারী হইয়াছে। গত যুদ্ধের সময় একা ইংলণ্ডই আল্‌কাতরা হইতে ৩,০০,০০০ টন টি. এন. টি. (T. N. T.) এবং পিক্‌রিক এসিড উৎপন্ন করিয়াছিল। টোলুইন হইতে টি. এন. টি. এবং কার্ব্বলিক এসিড হইতে পিক্‌রিক এসিডের জন্ম। ছেলেদের নানা প্রকার খেলনার উপাদান ব্যাকেলাইট (backelite)—ইহা কার্ব্ব-এসিড্-সম্ভূত।

শহরের আবর্জ্জনার সুব্যবস্থা করা মিউনিসিপালিটির একটা বড় সমস্যা—স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়াও বটে, সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়াও বটে। আমাদের দেশের শহরগুলিতে পোড়ো জায়গায় আবর্জ্জনারাশি স্তূপীকৃত করিয়া রাখাই সনাতন প্রথা। উৎকট দুর্গন্ধে এগুলি চারিদিকের বাতাস দূষিত করে। মূষিককুল আসিয়া ইহার মধ্যে উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে এই সকল আবর্জ্জনা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য প্রস্তুত হয়। শিশি-বোতলগুলি পরিষ্কৃত করিয়া ব্যবহৃত হয়, ভাঙা কাঁচ দ্রবীভূত করিয়া নূতন জিনিষ তৈয়ারী হয়। ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রা হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। অব্যবহার্য্য লৌহখণ্ড হইতে হীরাকশ (Ferrous Sulphate) তৈয়ারী হয়। কালি প্রস্তুত করিতে ইহার চাহিদা। ছিন্ন পাদুকা চূর্ণীকৃত হইয়া জমির উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করে। টিনের টুক্‌রা হইতে ক্লোরিন-সংযোগে 'টিন ক্লোরাইড' প্রস্তুত হয়। কাপড়ের কলে ইহার প্রয়োজন। অবশিষ্ট দ্রব্য পোড়াইয়া যে তাপ পাওয়া যায় তাহা বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত হইয়া কল চালায়, শহর আলোকিত করে। যে ভস্ম পড়িয়া থাকে তাহা দিয়া প্রস্তুত কন্‌ক্রিট (concrete) গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। যে অংশ ধূলিতে পরিণত হয় তাহারও নিস্তার নাই—বৈদ্যুতিক উপায়ে তাহা একত্র করিয়া শুষ্ক রক্ত, ফসফরিক এসিড এবং সোরার সহিত মিশ্রিত হইয়া জমির সার হয়। আমেরিকায় এই সকল আবর্জ্জনা হইতে প্রচুর স্নেহ-পদার্থ (fat and grease) উদ্ধার করা হয়। সাবান তৈয়ারী করিতে ইহা লাগে। হ্যালিফাক্স শহরে কসাইখানার রক্ত হইতে ব্লাড সিরাম (blood serum) প্রস্তুত হইয়া থাকে। রসায়ন-বিদ্যার কৃপায় আবর্জ্জনাও মিউনিসিপালিটির একটা আয়ের পন্থা হইয়াছে। বার্মিংহাম শহরে আবর্জ্জনা হইতে বার্ষিক আয় প্রায় ৫৩,০০০ পাউণ্ড—গ্লাসগো নগরের আয় আনুমানিক ৪০,০০,০০০ পাউণ্ড। আশ্চর্য্যের বিষয়, এশিয়ার বৃহত্তম শহর কলিকাতায়ও (যে কর্পোরেশনের আয় আসাম প্রদেশের চেয়ে বেশী) বিপুল আবর্জ্জনারাশি আদি ও সনাতন প্রথায় স্থানে স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া এখনও নগরের শোভা বর্দ্ধন করে।

জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক লিবিগ (Liebig) বলিয়াছিলেন—যে-দেশ যত সাবান ব্যবহার করে সে-দেশ তত সভ্য। সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাবানের চাহিদা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে। নানা প্রকার প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে কষ্টিক সোডা সংযোগে সাবান প্রস্তুত হয়। এই সকল তৈলের অন্যতম প্রধান উপাদান—গ্লিসারিন। সাবান তৈয়ারী ব্যাপারে ইহা কোনই কাজে লাগে না। আগেকার দিনে সাবানের টুক্‌রা লইয়া গেলে জলের সহিত মিশিয়া এই গ্লিসারিন নর্দ্দমায় স্থান লাভ করিত। নোবেল সাহেবের ডিনামাইট আবিষ্কারের পর হইতে গ্লিসারিনের চাহিদা বাড়িয়া গেল। তাহারই ফলে আজকাল সাবানের কারখানা হইতে গ্লিসারিন উদ্ধার করা হয়। সারা পৃথিবীতে গড়ে প্রতি-বছর ৮০,০০০ টন গ্লিসারিন উৎপন্ন হয়। গত মহাযুদ্ধের আগে ইহার শেষ বিন্দু আসিত সাবানের কারখানা হইতে। বর্ত্তমানে এই প্রতিযোগিতার দিনে সাবানের কারখানার উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে এই গ্লিসারিন উদ্ধারের উপর। বস্তুতঃ, গ্লিসারিন হইতে সাবান-তৈয়ারী খরচ উঠিয়া যায়—সাবান থাকে লাভের অঙ্কে। কলিকাতায় অনেক সাবানের কারখানা হইয়াছে, কিন্তু কোনও কারখানায় গ্লিসারিন উদ্ধার করে বলিয়া অবগত নহি।

সালফিউরিক এসিড-সংযোগে কাপড় কাচিবার সোডা প্রস্তুত করিতে প্রভূত পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক এসিড গ্যাস উত্থিত হইয়া আগেকার দিনে চতুষ্পার্শ্বস্থ অধিবাসীদের স্বাস্থ্য হানি করিত—ঘর-বাড়ি ও গাছপালা নষ্ট করিত। এজন্য ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট কর্তৃক আইন (Alkali Act) বিধিবদ্ধ হইল—হাইড্রোক্লোরিক এসিড গ্যাস বাতাসে ছাড়িয়া দিলে আইনতঃ দণ্ড পাইতে হইবে। তখন সোডার কারখানা সংখ্যায় কম ছিল—লাভ হইত প্রচুর। হাইড্রোক্লোরিক এসিড উদ্ধার করিবার প্রয়োজনীয়তা কারখানার মালিকগণ অনুভব করিত না। কিন্তু জগতের বৃহত্তম সোডার কারখানা—ব্রুণার-মণ্ড এণ্ড কোং নূতন উপায়ে সস্তায় সোডা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। পুরাতন কারখানাগুলির অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিত হাইড্রোক্লোরিক এসিড উদ্ধার করিতে না-

পারিলে। শাপে বর হইল—হাইড্রোক্লোরিক এসিড বিক্রী করিয়া কারখানাগুলি টিকিয়া রহিল। আজকালও বহু পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক এসিড এই ভাবে প্রস্তুত হয়। ব্লিচিং পাউডার তৈয়ারী করিতে ক্লোরিন লাগে—হাইড্রোক্লোরিক এসিড হইতে এই ক্লোরিন পাওয়া যায়।

ভারতের নানা স্থানে অফুরন্ত কাঁচা মাল রহিয়াছে, কিন্তু সে তুলনায় কারখানার সংখ্যা অতি অল্প। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু আজকাল শুধু কৃষির উপর নির্ভর করিয়া কোন জাতির চলিতে পারে না। দেশের ধনবৃদ্ধির উপায় ত্রিবিধ—কৃষি, পণ্যোৎপাদন ও সরবরাহ এবং যাতায়াতের উপায়-বিধান। দেশের লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্য দ্বিবিধ উপায়ে ধনবৃদ্ধির চেষ্টা না-করিলে দেশের আর্থিক দুর্গতি দূর হইবার নহে। সেজন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন ফলিত-রসায়নের জ্ঞান। রসায়ন-বিদ্যার সাহায্যে অতি অল্প আয়াসে ও অল্প অর্থ ব্যয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রভূত ধনাগম হইতে পারে। মান্দ্রাজের মালাবার উপকূলের মৎস্য-ব্যবসায়ীরা প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্য উন্মুক্ত সমুদ্রের তীরে রৌদ্রে শুকাইয়া জমির সার প্রস্তুত করিয়া বিক্রী করিত। এই সকল মৎস্যে তৈলের পরিমাণ অত্যধিক বলিয়া খাদ্য-হিসাবে অব্যবহার্য্য। উগ্র গন্ধও অন্যতম প্রধান কারণ বটে। ১৯০৯ সালে মান্দ্রাজের সরকারী মৎস্য-বিভাগ অত্যন্ত সহজ উপায়ে মাছ হইতে তৈল নিষ্কাসন করিবার এক অভিনব প্রণালী প্রচলিত করেন। সুবৃহৎ লৌহপাত্রে মাছের টুকরা বাষ্প দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া তাহা থলিয়ায় পুরিয়া চাপ দিয়া তৈল বাহির করা হইতে লাগিল। যে তৈল আগে পচিয়া দুর্গন্ধে সন্নিকটস্থ অধিবাসীদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত, তাহার শেষবিন্দু ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীতে সাবান, মোমবাতি প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য উপযুক্ত মূল্যে রপ্তানী হইতে লাগিল। থলিয়ার অবশিষ্ট কঠিন অংশ (fish guano) জমির উৎকৃষ্ট সাররূপে সিংহলে প্রেরিত হইল। গত বিশ বছরে অনূন আড়াই শত কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। সে দেশের অধিবাসীদিগের আয়ের একটা নূতন পথ খুলিয়া গিয়াছে—জনসাধারণের অবস্থাও এজন্য কথঞ্চিৎ সচ্ছল হইয়াছে। প্রতিবৎসর প্রায় ৬,০০০ টন তৈল প্রস্তুত হইতেছে। ১৯১৯-২০ সালের সরকারী বিবরণ হইতে জানা যায়—১,০৫,৩১৩ টাকার তৈল এবং ১১,৫৭,৮৮৪ টাকার সার বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ইহাতে কোন দক্ষ রাসায়নিকের প্রয়োজন হয় নাই—রসায়ন-শাস্ত্রের সামান্য জ্ঞান কাজে লাগান হইয়াছে মাত্র।

এই মৎস্য-তৈল কিছুদিন আগেও বিশেষ কোন কাজে লাগিত না। উগ্র দুর্গন্ধহেতু ইহা সাবান, মোমবাতি প্রভৃতি নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারিত না। সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশে প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক মৎস্য পাওয়া যায়—নরওয়ে, সুইডেন্ প্রভৃতি দেশের অনেক লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় মৎস্য ধরা। সুদীর্ঘকালব্যাপী ব্যর্থ চেষ্টার পর রাসায়নিক ইহার গন্ধ দূর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। অতি সূক্ষ্ম নিকেলকণার বর্ত্তমানে হাইড্রোজেন-সংযোগে এই সকল তৈলের গন্ধ নষ্ট করা হয়। ঘনীভূত তৈলের কাঠিন্য সংযুক্ত হাইড্রোজেনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এই আবিষ্কারের পর হইতে দুর্গন্ধযুক্ত নানা প্রকার তৈল সাবান, মোমবাতি তৈয়ারী করিতে, এমন কি খাদ্যহিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। এদেশে উদ্ভিজ্জ ঘিয়ের আবির্ভাব খুব বেশী দিনের কথা নয়। কৃত্রিম মাখন অবশ্য আমাদের দেশে প্রায় অচল। ঘনীভূত তৈল এজন্য ব্যবহৃত হয়—খাদ্যহিসাবে এগুলি নিকৃষ্ট নয়, দামেও যথেষ্ট সস্তা। ভারতের তৈলবীজের সংখ্যা যেমন বহুল, উৎপাদনের পরিমাণও তেমনি বিপুল। অথচ অধিকাংশ তৈলবীজ বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। কৃত্রিম মাখন বা ঘি সম্বন্ধে লোকের ভুল ধারণা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে—এ দরিদ্রের দেশে এই সুলভ খাদ্যের শীঘ্রই যথেষ্ট প্রচলন হইবে আশা করা যায়।

জমিতে সার দেওয়া আজকালও আমাদের দেশে বিলাসিতা বলিয়া গণ্য হয়। অথচ এদেশের শতকরা ৯০ জন কৃষক। দিন দিন লোকসংখ্যা যেমন হু হু করিয়া বাড়িতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে এ-দেশে দুর্ভিক্ষ চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয়, কারণ জমির উর্ব্বরতাও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। অব্যবহার্য্য জিনিষ হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া জমির সার সাধারণতঃ খুব সস্তা। পাশ্চাত্য দেশে মৃত পশু, কসাইখানার রক্ত, পশুর শিঙের টুকরা, ক্ষুর, ছেঁড়া পশমী

বস্ত্র, চামড়ার কারখানার পরিত্যক্ত অংশ, নরবিষ্ঠা প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া সাররূপে বিক্রী হয়। বলা বাহুল্য, এগুলি আবর্জ্জনামাত্র, কিন্তু রসায়ন-বিদ্যা এই জঞ্জাল শুধু দূর করিবার উপায় বাহির করিয়াই নিবৃত্ত হয় নাই—এগুলি হইতে অর্থাগমের ব্যবস্থাও করিয়াছে। সুলভ বলিয়া সে দেশের কৃষকগণ জমির সার যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। সারযোগে জমির উৎপাদিকা শক্তি কেমন অবিশ্বাস্য রকমে বৃদ্ধি পায়, একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা বুঝা যাইবে। বিলাতী বেগুন নাসিকে আগাছার মত অপর্য্যাপ্ত জন্মে। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত বছরে প্রতি একরে নয় টনের বেশী পাওয়া যায় নাই। ইংলণ্ডের ওয়ালথাম-ক্রসে পচা ঘাস সার দিয়া এক একর জমিতে পঞ্চাশ টন উৎপন্ন করা হইয়াছে। আর আমেরিকার এক জায়গায় উৎকৃষ্টতম সার দিয়া একই পরিমাণ জমিতে এক বছরে আঠার হাজার টাকার বিলাতী বেগুন উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে।

আমাদের দেশে মোটর গাড়ী ও দ্বিচক্র যানের আমদানীর পরিমাণ দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। রবার-টায়ার-ওয়ালা ঘোড়ার গাড়ীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। ছেঁড়া টায়ারের পরিমাণও তদনুপাতে বাড়িয়াছে। এ-দেশে অন্যান্য অকেজো জিনিষের ন্যায় ইহা আবর্জ্জনাস্তূপে স্থান লাভ করে। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় এই সকল অব্যবহার্য্য টায়ার নূতন রবারের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া নূতন টায়ার প্রস্তুত হইতেছে। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে শতকরা পঁচিশ ভাগ পুরাতন রাবার মিশাইলে তৈয়ারী টায়ার কিছুমাত্র কম-টেকসই হয় না। বস্তুতঃ, সেগুলি যে পুরাতন টায়ার সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাও ধরা শক্ত। ১৯২৬ সালে শুধু আমেরিকায় ৯২,০০০ টন পুরাতন টায়ার এই ভাবে কাজে লাগান হইয়াছে। আজকাল কৃত্রিম রবার প্রস্তুত হইতেছে সত্য, কিন্তু এই ভাবে অপচয় নিবারণ করিতে না-পারিলে তাহা সত্ত্বেও টায়ারের দাম বাড়িয়া যাইত সন্দেহ নাই।

লৌহ ও স্বর্ণের বিবাদ আমরা ছোটবেলায় কবিতায় পড়িয়াছি। তার পর যান্ত্রিক সভ্যতার প্রসার ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লৌহের প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ, লোহা এবং কয়লা—এই দুইটি অত্যাবশ্যক জিনিষের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইলে জাতির ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারময়। হাজার হাজার টন লোহা টাটার কারখানায় দৈনিক প্রস্তুত হইতেছে। আর তৎসঙ্গে প্রভূত পরিমাণে ভস্মাবশেষ (slag) কারখানার চারিদিকে স্তূপীকৃত হইতেছে। বিশ বছর আগেও লৌহ-নির্ম্মাতারা এই ভস্মের কি উপায় করা যায় তাহা ভাবিয়া পাইতেন না। চারি দিকে ইহা বিক্ষিপ্ত করিয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ফলে চতুষ্পার্শ্বের জনপদের নাম হইয়াছিল কৃষ্ণদেশ (Black Country), কিন্তু রাসায়নিক এ সঙ্কট হইতে তাহাদিগকে ত্রাণ করিয়াছে। আজকাল এই ভস্ম হইতে বহুল পরিমাণে পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট প্রস্তুত হইতেছে। গত যুদ্ধের পর হইতে ইহা রাস্তা-নির্ম্মাণ ও অন্যান্য কাজের জন্য কন্‌ক্রিট (concrete) প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইতেছে। বলা অনাবশ্যক, কারখানার মালিকগণ শুধু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন নাই, আয়ের একটা নূতন পন্থা হওয়ায় উৎফুল্লও হইয়াছেন। দার্শনিকদের মতে আবর্জ্জনা মানে অস্থানে কোন দ্রব্যের অবস্থিতি। বস্তুতঃ যেখানে যে-জিনিষের কোন প্রয়োজন নাই সেখানে তাহা থাকিলেই তাহাকে আমরা জঞ্জাল বলি। যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করিলেই তাহা আবার মূল্যবান্ কাঁচা মালে পরিণত হয় এবং তাহা হইতে দামী জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে।

'Waste not, want not' কথাটা পাশ্চাত্য দেশ যতটা মানিয়া চলে আমরা ততটা চলি না, আর সেই জন্যই কমলার কৃপাকটাক্ষ তাহাদের ভাগ্যে লাভ হইয়াছে। আংশিক পচা ফল আমরা নর্দ্দমায় ফেলিয়া দি। কিন্তু সে-দেশের লোকেরা তাহা হইতে রাসায়নিক উপায়ে 'পেক্‌টিন' বাহির করিয়া লয় এবং তাহা দিয়া নানা প্রকার ফলের আচার তৈয়ার করিয়া থাকে। সুদৃশ্য বিলাতী বোতলে অগ্নিমূল্যে আমরা সেই সব কিনিয়া থাকি। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বাতাসের নাইট্রোজেনও সেদিন পর্য্যন্ত অব্যবহার্য্য দ্রব্যের পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। বায়ুমণ্ডলের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ নাইট্রোজেন। অক্সিজেন-তরলীকরণ (dilution) ছাড়া আর কোন কাজেই ইহা লাগিত না। যুদ্ধের সময় বাতাসের নাইট্রোজেন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক হাবার হাইড্রোজেন-

যোগে এমোনিয়া তৈয়ারী কাজে লাগাইলেন। একদিকে ইহা হইতে নাইট্রিক এসিড্ ও অন্য দিকে সাল্‌ফিউরিক এসিড্ সংযোগে জমির সার প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহার পর হইতে নানা দেশে এই ভাবে নাইট্রোজেন্ কাজে লাগান হইতেছে। বিশাল ভূখণ্ডের এই সর্ব্বব্যাপী কাঁচা মাল ভগবান অপক্ষপাতে সকল জাতিকে দিয়াছেন—ইহা মূল্যবিহীন। ইহা কাজে লাগাইয়া দেশের ধনবৃদ্ধির চেষ্টা সকল জাতিই করিতে পারে। বাংলা দেশের প্রকৃতির অযাচিত অপর্য্যাপ্ত দান—কচুরীপানাসমূহেও এই কথা খাটে। সরকারী বিবরণে প্রকাশ, শুধু বাংলায় ৪২৬৯ বর্গ-মাইল ব্যাপিয়া ইহা অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতির এই অহেতুক কৃপায় কৃষককুলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। আর্সেনিক-যোগে কচুরী ধ্বংস করিবার সরকারী চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এই জিনিষটির সদ্‌গতি-বিধানের ভার বাংলার রাসায়নিকদের উপর। ইহা হইতে সুরা ও পটাশ ঘটিত লবণ প্রস্তুত করিবার উপায় ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইলে সুখের বিষয় হইবে।

সুনন্দার বিয়ে

শ্রীশান্তিময়ী দত্ত

(১)

সুনন্দা যখন বি-এ পাস করিয়া বর্ম্মাদেশে পিতা-মাতার গৃহে ফিরিল, তখন ঘুমন্ত শহরটির মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বাঙালীবিরল অঞ্চলে এমন ধরণের মেয়ে কেহ আর দেখে নাই। একটি মাত্র মেয়ে সুনন্দা যখন বালিকা, তখন হইতেই ইন্দুবাবু কন্যাকে কলিকাতায় ডায়োসেসন্ কলেজের বোর্ডিঙে রাখিয়াছিলেন। সেই-খানেই সে স্কুলের এবং কলেজের পড়া শেষ করিয়াছে।

সুনন্দা যখন আই-এ পাস করিল, তখন হইতেই ইন্দু-বাবুর স্ত্রী সরলা স্বামীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন, "মেয়ের আমার বিয়ে হ'ল না, এর পরে বুড়ো মেয়ের বর কোথা পাবে,' ইত্যাদি অসংখ্য অভিযোগে। ইন্দুবাবু স্ত্রীর কথায় কোনদিনই মনোযোগ দিতেন না, মেয়েকে সুশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, এইটুকুই সব চেয়ে বড় সত্য বলিয়া বুঝিতেন। এইবার যখন মেয়ে ইংরেজীতে অনার্স লইয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হইল, তখন ইন্দুবাবু উৎসাহে বলিয়া ফেলিলেন, "এম-এ-টাও পাস ক'রে ফেলুক, আর ত দুটো বছর, দেখতে দেখতে কেটে যাবে"—গৃহিণী সরলা মুখ খিঁচাইয়া হাত নাড়িয়া কর্ত্তাকে শোনাইলেন, "তোমার সব যত অনাছিষ্টি কথা, এতদিন পরে মেয়েটাকে ম্যাণ্ডালে বেড়াতে নিয়ে যাবার লোভ দেখিয়ে বাড়ি আনিয়েছি, এখন আবার উনি এম-এ পড়ার ফ্যাচাং তুলছেন। জন-মনিষ্যির সঙ্গে ঘরকন্নার একখানা কাজ জানে না। আদব-কায়দা রেখে কথা কইতে শেখে নি, কেবল ধিঙ্গিপনা শিখেছেন মেয়েদের ইস্কুলে থেকে। এবার আর যেতে দিচ্ছি না আমি।

ইন্দুবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "আর ত দুটো বছর মাত্র, কেন মেয়েটার মনে দুঃখ রাখব? বিয়ে ত হবেই; ঘরকন্নাও সারাজীবন করবে, হেঁসেলে একবার ঢুকলে কি আর ওসব হবে? কি আর বয়েস হয়েছে এমন?"

গৃহিণী হঠাৎ আঁচলে চোখ ঢাকা দিয়া কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিলেন, "হবে গো সবই হবে, কেবল আমার অদেষ্টে দেখার সুখ ঘটবে না। ঐ ত পাশের বাড়ির দুর্জ্জন সিংয়ের মেয়ে আটার বছরে পড়েছে, তিন-চারটা ছেলের মা হয়ে কেমন ঘর-কন্না করছে।" কর্ত্তা এমন সুযুক্তিপূর্ণ অভিযোগের উত্তরে কি বলিবেন বুঝিতে না-পারিয়া সম্প্রতি গৃহিণীকে খুশী করিবার জন্য বলিলেন, "তোমার অদেষ্ট ওদের চেয়ে কি কম ভাল? দুর্জ্জন সিং মাথার ঘাম পায় ফেলে যা' দু-পয়সা আনছে, ঐ

গুষ্টির পেটও ভরছে না তাতে; এমনই জামাই এনেছে, হতভাগা কাণাকড়ির বিদ্যে ধরে না পেটে, অথচ শ্বশুরের পয়সায় মদ খেয়ে মাতলামি করতে বাধে না। ঐ কচি মেয়েটাকে দেখলে বুক ফেটে যায়। তোমার মেয়ে আজ বি-এ পাস ক'রে ঘরে এসেছে, কত জন ঈর্ষাও করছে, আবার কত লোক প্রশংসাও করছে। সেদিন জজ সাহেব বললেন, তোমার মেয়েকে দেখে বড় খুশী হয়েছি। তোমার মত সব বাঙালী-বাপ যদি এমনি ক'রে মেয়েকে লেখা-পড়া শেখাত! কাল ত ডেপুটি কমিশনার উ-পের বাড়ি একটা টি-পার্টি আছে, আমাকে মেয়ে নিয়ে যেতে নিমন্ত্রণ করেছেন। তোমাকেও নিয়ে যেতে বলেছিলেন, আমি বলেছি তুমি কোথাও বেরোও না।"

মুহূর্তের মধ্যে সরলার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, উৎসাহে বলিলেন, "ওমা, এ কথা ত আগে বল নি। কাল টি-পার্টি? গয়নার কি হবে? তোমার মেয়ে ত আবার সেকেলে গয়না পরবে না, নইলে কি আমার গয়নার অভাব? মুক্তো-বসানো, পাতলা পিনপিনে চুড়ী দু-গাছা হাতে দিয়েই সব জায়গায় যায়। সামনের বাড়ির মা-চির একটা মুক্তোর কণ্ঠী দেখে খুব পছন্দ করেছে, তাই সেই রকমই এক ছড়া গড়াতে দিয়েছি। তুমি এখুনি স্যাকরার বাড়ি তাড়া দিয়ে লোক পাঠাও। বড় মেয়ে ওকে একা পাঠানো কি ভাল দেখায়? আমিই সঙ্গে নিয়ে যাব। বর্ম্মী বাড়ি ত; বাঙালী কেউ না থাকলেই হ'ল।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "বাঙালী বড় বড় নামজাদা দু-চার জন থাকবে বইকি। তবে মেয়েটাকে ডাক-ধমক ক'রো না সেখানে, পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে দিও।"

(২)

সুন্দর সবুজ ঘাসে ঢাকা লনে টি-পার্টি চলিতেছে। এক দিকে টেনিস কোর্ট, এক দল খেলিতেছেন, এক দল খেলা দেখিতে দেখিতে চা পান করিতেছেন।

গৃহস্বামিনী মিসেস্ উ-পে গাঢ় সবুজ রঙের লুঙ্গী পরিয়াছেন—লুঙ্গীখানির প্রায় অর্দ্ধেক অংশ সুন্দর ফুল লতা-পাতা আঁকা। তানাখা-মাখা পা দুইখানিতে সোনার দুই গাছি মল, সবুজ ভেলভেটের বর্ম্মা ফানা পরিয়া, বেশ দ্রুত চলাফেরা করিতেছেন। বিরাট টোপর-খোঁপাটির ডান দিকে এক গোছা মেইড্‌ন্‌-হেয়ারের মধ্যে কয়েকটি বেলফুল গোঁজা রহিয়াছে, বাতাসে সূক্ষ্ম সবুজ পাতাগুলি উড়িয়া উড়িয়া কপালের উপর পড়িতেছে—কাজের ফাঁকে ফাঁকে একবার করিয়া ফুলগুচ্ছটি যথাস্থানে আছে কিনা হাত দিয়া দেখিতেছেন। উ-পের মেয়েটি মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ট্রে-হাতে ঘুরিতেছে। তাহার পরনে উঁচু ফ্রক, হাই-হিল্ জুতা ও মোজা, বব্ করা চুলের এক পাশে ছোট একটি ফুলের গুচ্ছ ক্লিপে আঁটা রহিয়াছে। মায়ের সহিত এবং নিমন্ত্রিতদের সহিত মিহি সুরে ইংরেজী বলিতেছে।

সুনন্দা একটি টেবিলের নিকেট বসিয়া চা খাইতেছিল, দৃষ্টি তাহার টেনিস্ কোর্টের দিকে। সরলা দেবীর দুই জন মহিলাবন্ধু সুনন্দার সহিত আলাপ করিবার জন্য উৎসুক। সুনন্দা উত্তর দিবার আগেই তাহার মা সব কথার জবাব দিয়া ফেলিতেছেন, কাজেই সে নিশ্চিন্ত মনে টেনিস্ খেলা দেখিতেছে।

এমন সময় গৃহস্বামী উ-পে সুনন্দার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মিস্ দে, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে অনেকেই উৎসুক, একবার এদিকে আসবেন কি?" সুনন্দা মাকে বলিল, "মা, আমাকে ওঁরা ডাকছেন, আমি যাচ্ছি।" সরলা দেবী একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যাও, তবে বেশীক্ষণ পুরুষদের দিকে থেকো না, এ জায়গা বড় ভাল না, একটা নিন্দে তুলে দিতে দেরি হবে না।"

টেনিস্ খেলা শেষ হইয়াছে, খেলোয়াড়রা এক এক গ্লাস বরফ-পানীয় হাতে লইয়া বিশ্রাম করিতে বসিয়াছেন। সুনন্দাকে লইয়া উ-পে সেখানে উপস্থিত হইতেই সকলে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন।

উ-পে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ইনি মিস্ দে, আমাদের সরকারী উকিল মিঃ দের কন্যা, এই বৎসর ইংরেজীতে অনার্স লইয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।" তার পর একে একে নানা জাতীয় ভদ্রলোকের সহিত করমর্দ্দন করিয়া সুনন্দা হাঁপাইয়া উঠিল। এমন সময় দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ, সুশ্রী একটি যুবক র‍্যাকেট-হস্তে সেখানে উপস্থিত হইতেই উ-পে বলিলেন, "মিস দে,—মিঃ দলীপ সিং, ইনি বর্ম্মার টেনিস্ চ্যাম্পিয়ন—

এখানকার ডিষ্ট্রিক্ট্ এন্‌জিনীয়র"—উভয়ে পরস্পরকে অভিবাদন করিলেন।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মিঃ সিং সুনন্দার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আপনি কি টেনিস্ খেলেন ?"

সুনন্দা বলিল, "খেলি বটে, কিন্তু আপনাদের মতন চ্যাম্পিয়ন্‌দের সঙ্গে কি খেলতে পারি ? সত্যি, আপনি কি সুন্দর খেলেন ! আমার ভাল খেলা দেখতে খুব ভাল লাগে।"

মিঃ সিং উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "আসুন না—এক সেট্ খেলি।"

সুনন্দা লজ্জায় রক্তিম হইয়া বলিল, "না-না, আপনার সঙ্গে কিছুতেই না।" মিঃ সিংয়ের জিদ্ বাড়িয়া গেল, সে ইন্দুবাবুকে গিয়া ধরিল সুনন্দার সঙ্গে একবার খেলিবেই। ইন্দুবাবু সানন্দে সম্মতি দিলেন কিন্তু সুনন্দা বলিল, "আজ নয়, আমার পায়ে স্লিপার রয়েছে, আর এত লোকের সামনে আমি খেলতে অভ্যস্ত নই।"

মিঃ সিংয়ের আবদারে অগত্যা সুনন্দাকে রাজী হইতে হইল—পর দিন সেই বাড়িতেই আসিয়া খেলিবে।

সেই দিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিবার পর সুনন্দা মা-বাবার নিকট বলিল, "এ জায়গাটা যত বিশ্রী লেগেছিল প্রথমে এখন দেখছি তত খারাপ নয়। একেবারে জঙ্গল ত নয়, বেশ ভাল ভাল শিক্ষিত লোকও ত অনেক আছেন। যে-কয়টি বর্ম্মীদের বাড়ি গিয়েছি—কি সুন্দর অভ্যর্থনা ! মিসেস্ উ-পেও ভারী নম্র, বিনয়ী মেয়ে। কর্ত্তব্যের ত্রুটি কোথাও খুঁজে পাবে না। উ-পের মেয়ে, এখানকার কন্‌ভেণ্টে পড়ে। বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে, ধরণ-ধারণ একেবারে মেম-সাহেবী, লুঙ্গী পরে না ত দেখলাম। ইন্দুবাবু বলিলেন, "শিক্ষিত লোক যাঁরা আছেন এখানে তাঁদের সঙ্গে মিশলে ভালই লাগবে। বাঙালী যাঁরা আছেন, তাঁরা লোক যে ভাল নয়, তা বলছি না কিন্তু বহুকাল বিদেশে পড়ে আছেন, দেশের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে কোনো যোগ রাখেন না, খবরও রাখেন না ব'লেই বোধ হয় মন বড় সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। এই দেখ না, সেদিন ক্লাবে ঢুকে দেখি মহা আলোচনা চলছে। আমি যেতেই সব থেমে গেল। মল্লিকবাবু বললেন, 'এই যে দে-বাবু! আপনার মেয়েটি ত তিন-চার মাসের মধ্যে এখানে খুব নাম ক'রে ফেলেছে। বার-লাইব্রেরীতে সকলের মুখেই মিস্ দে-র কথা। মেয়েকে পাস ত করালেন, এখন যোগ্য বর জোটাতে ত প্রাণ বেরবে।'

সুনন্দা পিতার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আচ্ছা বাবা, ওঁদের এত মাথা-ব্যথা কেন ?"

পিতা বলিলেন, "বন্ধু-মানুষ, যা বলছেন কিছু মিথ্যে নয়। সত্যিই আজকাল পণ ছাড়া ভাল ছেলে পাওয়া দুষ্কর।"

সুনন্দা বলিল, "আচ্ছা, বাবা, আমাদের ছেলেরা এমন অপদার্থ কেন ? বিয়ে ক'রে শ্বশুরের টাকা নিয়ে ভিক্ষে ক'রে বড়লোক হ'য়ে কি সম্মান বাড়ে তাদের ?"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "ভিক্ষা কই ? দস্তুর-মত জোর-জবরদস্তি করেই ত নেয়। এমন ভাব—যেন তোমার মেয়ে বিয়ে ক'রে আমি তোমার এবং তোমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করলুম।"

সুনন্দা বলিল, "বাবা, আমি তোমাকে ব'লে রাখছি আমি কিন্তু এক কড়ি পণ দিয়েও বিয়ে করব না।"

মেয়ের কথাটুকু শুনিতে পাইয়া সরলা ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি বেহায়া মেয়ে হয়েছিস্ তুই ! তোর বিয়ের খবর তুই কি জানবি ? আমরা যা ভাল বুঝে ব্যবস্থা করব, তাই করবি তুই।"

সুনন্দা বিরক্ত হইয়া বলিল, "মা, বাবার কাছেও নিজের মনের কথা বলব না ত কার কাছে বলব ? যে যা বলবে, মুখ বুজে করব, এই যদি চেয়েছিলে, দশ বছর বয়সে বিয়ে দাও নি কেন ? রাগ কর আর যাই কর, আমি চিরদিন অবিবাহিত থাকব, তবু পণ দিয়ে কখনও বিয়ে করব না।" সুনন্দা সজোরে পা ফেলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

ইন্দুবাবু গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি বড় বকো মেয়েটাকে। ও এখন বড় হয়েছে, বুদ্ধি বিবেচনা হয়েছে, ওর সঙ্গে সাবধানে ব্যবহার ক'রো।"

সরলা ঠোঁট উল্টাইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "রাগ করলে ত বয়েই গেল—তোমার মতন আমি মেয়েকে অত আস্কারা দিই না।"

(৩)

পরদিন বিকালে চারটার সময় মিঃ দলীপ সিংয়ের গাড়ীখানা দরজায় দাঁড়াইল। ইন্দুবাবু কোর্ট হইতে শীঘ্র

ফিরিয়া সুনন্দাকে উ-পের বাড়ি লইয়া যাইবেন, স্থির ছিল। মিঃ সিংয়ের গাড়ী দেখিয়া সুনন্দা নীচে নামিয়া আসিল। মিঃ সিং গাড়ী হইতে নামিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আপনাকে নিতে এসেছি, খেলার কথা মনে আছে ত?"

সুনন্দা বলিল, "আমার বাবা আমাকে অপেক্ষা করতে ব'লেছেন, তাঁর সঙ্গে যাবার কথা ঠিক্ আছে। আপনিও এসে বসুন না।"

মিঃ সিং বলিলেন, "খেলার ত একটু দেরি আছে, আমরা একটু ড্রাইভে যেতে পারতাম, আপনি এখানকার পাহাড়ে উঠেছেন কখনও?"

সুনন্দা বলিল, "না, আমার এখনও বিশেষ কোথাও বেড়ানো হয় নি। আপনার স্ত্রী বুঝি খেলেন না? আপনাকে সর্ব্বদা একা বেরোতে দেখি যে?"

মিঃ সিং সুনন্দার বেড়াইতে যাইবার সঙ্কোচের কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিল, "আমি চিরদিনই একা। বিয়ে এখনও করি নি।"

সুনন্দা অপ্রস্তুত হইয়া আলোচনার বিষয় বদ্‌লাইবার ইচ্ছায় বলিল, "আমাদের বাগানটায় কি সুন্দর গোলাপের বেড হয়েছে, দেখবেন আসুন। আমার বাগান করতে বড্ড ভাল লাগে।"

মিঃ সিং বলিলেন, "আমারও বাগান করা একটা 'হবি'। অদ্ভুত! আমাদের দু-জনের খেয়াল দেখছি একই রকমের।

সুনন্দা মহা উৎসাহে মিঃ সিংকে বাগান দেখাইতে দেখাইতে বলিল, "কলকাতায় আমাদের কলেজের কম্পাউণ্ডে আমরা কয়েক জন মেয়ে মিলে কি সুন্দর বাগান করেছিলাম। এখানে একা-একা কোন কাজে উৎসাহ লাগে না।"

মিঃ সিং বলিলেন, "যদি অনুমতি দেন, আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি। আমাদের পি-ডব্‌লিউ-ডি আপিসের বাগান দেখেছেন? আমি অবসর সময় ঐ বাগান নিয়েই কাটাই।"

সুনন্দা বলিল, "আমি বাবার সঙ্গে যাব এক দিন আপনার বাগান দেখতে।"

মিঃ সিং সুনন্দার চোখের উপর নিজের অভিমানপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কেবল বাবা আর বাবা! কেন আপনি কি কচি খুকী যে বাবা-ছাড়া এক পা চল্‌তে পারেন না?"

সুনন্দা চক্ষু নামাইয়া পা দিয়া একটা ইঁট সরাইতে সরাইতে বলিল, "আমরা যত বড়ই হই না, যতই লেখা-পড়া শিখি না কেন, আমাদের পায়ের বেড়ী কোনদিন খস্‌বে না।"

ফটকের সম্মুখে একখানি মোটর থামিল। ইন্দুবাবু গাড়ী হইতে নামিয়া ডাকিলেন, "সুনু, তুমি প্রস্তুত ত? আমার কি দেরি হ'য়েছে?"

ইন্দুবাবু এন্‌জিনীয়র সাহেবের করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "সুনন্দার দেরি দেখে বুঝি আপনি নিয়ে যেতে এসেছিলেন?"

মিঃ সিং বলিলেন, "আপনার মেয়েকে নিয়ে যাবার সৌভাগ্য আমার হ'ল না, তিনি আমার সঙ্গে যেতে রাজী হন নি।"

ইন্দুবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "না-না, সে কি কথা? আমার মেয়ে আপনার সঙ্গ পেলে খুবই সুখী হ'ত নিশ্চয়ই, তবে আমার সঙ্গে যাবে কথা ছিল ব'লে বোধ হয় যায় নি। আপনি দুঃখিত হবেন না।

ইন্দুবাবু মিঃ সিংকেও নিজের গাড়ীতে আহ্বান করিলেন। সুনন্দাও বলিল, "চলুন না একসঙ্গেই যাই।"

মিঃ সিং আপত্তি না করিয়া ড্রাইভারকে গাড়ী লইয়া যাইতে হুকুম দিয়া ইন্দুবাবুর পাশে উঠিয়া বসিলেন।

সুনন্দা আজকাল আর বর্ম্মাদেশের প্রতি বিরূপ নয়। বাবা যখন বলেন, "এই মগের মুলুক ছাড়তে পারলে বাঁচি। দিন-দিন যা অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, ভারতবাসীদের অন্নজল বেশীদিন এদেশে নেই বোধ হয়।"

তখন সুনন্দা বলে, "তা ওদের দেশ, ওরা নিজেদের লোকেদের ব্যবস্থা করবেই ত? তোমরা রাগ করলে চলবে কেন?"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, সে কথা ঠিক, তবে যাঁরা চাকরিতে আগে ঢুকেছেন, তাঁদের ত ন্যায্য পাওনা এবং দাবি থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়?"

গৃহিণী বলেন, "এদেশটা মন্দ কি? আমার ত বেশ ভাল লাগে বাপু। মেয়েটার বিয়ের জন্যেই ঘন ঘন দেশে

যাবার দরকার, নইলে এখানে যেমন রাজার হালে আছি, দেশের বাড়িঘরে সে আরাম কোথায়? এখানে যদি ভাল পাত্র একটি পেতাম, তবে বড় সুবিধাই হ'ত। হাজার টাকা চলে ফেলে যাওয়া-আসা করি, ঘটকের ফিও কিছু কম দিই না। তবু যদি একটা পছন্দসই জামাই জুট্‌ত!"

সুনন্দা বলে, "তোমার শুধু ঐ এক কথা, মা। কে বলে তোমায় বাজে খরচ করতে?"

মা রেগে জ্বলে উঠেন—এসব বাজে খরচ, আর ওঁর বি-এ, এম্‌-এ পড়ার খরচগুলাই সব কাজের হ'ল? স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাগা, বিলেত-ফেরৎ সেই ডাক্তার ছেলেটির খবর নিয়েছিলে? কত চায় সে?"

ইন্দুবাবুর ইচ্ছা নয় মেয়ের সাক্ষাতে তাহার বিবাহের আলোচনা হয়। স্ত্রীকে বলিলেন, "দ্যাখ, আমি কিন্তু কালকে দুই তিনটি বন্ধুকে চা খেতে বলেছি। সুনু, তুমি কিন্তু মা কাল হোষ্টেস্ হবে, কোথায় চা খাওয়াবে বল ত?"

সুনন্দা বলিল, "বাবা, আমাদের ফুলবাগানে করলে হয় না? ওখানে ছোট ছোট টিপয় দিয়ে ব্যবস্থা করলে দশ-বার জনকে চা খাওয়ান যায়।"

গৃহিণী বলিলেন, "ঐ দ্যাখ, মেয়ের যত বিদ্‌ঘুটে পছন্দ। অমন ভাল চেয়ার, সোফা, টেবিল, বড় বড় আয়না, ছবি দিয়ে সাজানো কাশ্মীরী কার্পেট পাতা ড্রয়িংরুমটা তোমার পছন্দ হ'ল না, পছন্দ ঐ ঝোপে, ঝাড়ে আর জঙ্গলে! নেমন্তন্ন করছ কা'কে শুনি?"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "রেঙ্গুন থেকে আমার এক ব্যারিষ্টার বন্ধু মিঃ গুপ্তের ছেলে এখানে এসেছে, সে, এখানকার হাসপাতালের ডাক্তার, আর আমাদের সিং সাহেব।"

মিঃ সিংয়ের নাম উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দার মুখখানা একটু বিশেষ রকম প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, ইন্দুবাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন।

সুনন্দা বলিল, "বাবা, আমাদের বাগানের ও-পাশে যে অনেকখানি জায়গা জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে, সেখানটা পরিষ্কার করিয়ে, সমান ক'রে নিয়ে একটা ব্যাড্‌-কোর্ট করা যায় না?"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "গুড্ আইডিয়া, খেলবে কে?"

সুনন্দা বলিল, "আচ্ছা, বাবা, মিঃ সিংকে বললে তিনি নিশ্চয় এখানে খেল্‌তে আসেন, আরও কত লোককে খেল্‌তে দেখি, খেলার লোক জুটে যাবেই।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "বেশ, কাল চায়ের টেবিলে কথাটা তুলো।"

(৪)

সুনন্দা ড্রেসিং-টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রসাধনে ব্যস্ত। কুঙ্কুমের একটি টিপ্‌ কতবার পরিতেছে, আবার মুছিতেছে। বড় মুক্তোর এক ছড়া লম্বা হার, গাঢ় নীল রঙের মারাঠী শাড়ী, আধ হাত চওড়া লাল রেশমের পাড়ের নীচে শাদা রেশমী সুতোর কল্‌কা, ভয়েলের ছোট হাতার ব্লাউসের ভিতর দিয়া সূক্ষ্ম লেসের এম্‌ব্রয়ডারীর কারুকার্য্য, কানে দুটি বড় বড় মুক্তোর দুল, পায়ে এক জোড়া গাঢ় নীল ভেলভেটের উপর সাদা পুঁতির কাজ করা বর্ম্মা চটি।

সুনন্দাকে সুন্দরী বলা যায় কিনা, সে-বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। সে গৌরবর্ণ নয়, কিন্তু কালোও বলা যায় না। চোখের তারা দুটি ঘন কৃষ্ণবর্ণ, তাহার চাউনির মধ্যে এমন একটু মাধুর্য্য আছে, যাহাতে তাহার মুখের অন্য সকল খুঁৎ ঢাকা পড়ে। মুখখানি বুদ্ধির প্রাচুর্য্যে উজ্জ্বল, স্বভাবের কোমলতায় মোলায়েম।

জানালার পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দেখা গেল একটি ট্যাক্সি বাগানে ঢুকিতেছে। অভ্যাগতদিগকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে, সে কথা মনে পড়িতেই আয়নায় শেষ একবার মুখখানা দেখিয়া লইয়া সুনন্দা দ্রুত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

ট্যাক্সি হইতে যিনি নামিলেন, সুনন্দা তাহাকে চেনে না। ইন্দুবাবু তাহার হাত ধরিয়া ঝাঁকিয়া বলিলেন, "এই যে এস, এই আমার মেয়ে সুনন্দা, আর ইনি আমার বন্ধুপুত্র সুবিমল।" সুনন্দা বলিল—বাবা, একেবারে বাগানে গিয়েই বসি, এখানে বড় গরম, না?

অতিথিরা একে একে উপস্থিত হইলেন। সরকারী ডাক্তারটি হাসিখুশী মানুষ, নানা দেশ ঘুরিয়া, নানা জাতীয় খবর জানেন, গল্প করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। সুনন্দা বলিল—ডাঃ চ্যাটার্জ্জী, আপনি ত কিছুই খাচ্ছেন না, আর এক প্লেট আইসক্রীম নিন্ না!

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী বলিলেন—নিতে পারি, যদি আপনি

একটা গান শোনান। কল্‌কাতা ছেড়ে অবধি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছি, ভাল বাংলা গান শুন্‌তে পাই না।

এক জন অ-বাঙালী উপস্থিত থাকায় কথাবার্ত্তা সব ইংরেজীতেই চলিতেছিল।

মিঃ সিং বলিয়া উঠিলেন—হাঁ একটা ইংরেজী গান হোক্। বাংলা গান আমি কি বুঝ্‌ব?

সুবিমল বলিলেন—বাংলা আর ইংরেজী দুটোই আপনার কাছে বিদেশী ভাষা, বাংলা তবু ভারতবর্ষীয় জিনিষ, খানিকটা রস গ্রহণ করতে পারবেন।

মিঃ সিং বলিলেন—সুবিমলবাবু বুঝি ইংরেজী সুর ভালবাসেন না? আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে ইংরেজী সুরগুলি।

সুনন্দা বলিল—আমি ইংরেজী সুর ভালবাসি না, তা'নয়, কিন্তু গাইতে বিশেষ ভাল লাগে না, ওতে যেন আমাদের মন খোলে না। মিঃ সিং, আপনাকে বরং আমি ভাল ভাল ইংলিশ রেকর্ড শোনাব।

সিং সাহেব বিরক্তির সুরে বলিলেন—রেকর্ড কে শুনতে চায়? আপনার গান শোনাটাই আসল।

মিঃ সিং আজ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সুনন্দা দুইটি যুবক বাঙালী বন্ধু পাইয়া, তাহাদের লইয়াই একটু ব্যস্ত হইয়াছে। তাহার মনে বেশ একটু ঈর্ষার উদ্রেক হইতেছিল। সুনন্দাও নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইল এবং চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল—চলুন ঘরে যাই, এখানে ত বাজনা নেই?

মিঃ সিং বলিলেন—আমি তা'হলে এখান থেকেই বিদায় নি, আমার এক জায়গায় ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে, আর একদিন আপনার গান শোন্‌বার ইচ্ছা রইল।

সুবিমল ছেলেটি বি-এ পাস করিয়া ব্যবসা করিতেছিল। বর্ম্মাদেশেই তাহার জন্ম, পিতা আইন-ব্যবসা করিয়া বিস্তর অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন। পুত্রকে বিলাত পাঠাইয়া উপযুক্ত করিবার সংকল্প ছিল, কিন্তু পুত্রের অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল। সে শান্‌-ষ্টেটে আলুর চাষ করিত, সেই আলু সমস্ত বর্ম্মার এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানে চালান দিয়া বেশ উপার্জ্জন করিত।

অর্থ উপার্জ্জন যথেষ্ট হইলেও পুত্র জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডাক্তার বা এন্‌জিনীয়র কিছুই হইল না বলিয়া পিতা এবং বন্ধুগণও প্রায়ই দুঃখপ্রকাশ করিতেন। সুনন্দাও তাহাকে প্রশ্ন করিয়া ফেলিল—আপনি এত ভাল স্কলার ছিলেন, বিলেত গেলে ত একটা ডক্টরেট নিয়ে আস্‌তে পারতেন। এসব ব্যবসা কি শিক্ষিতদের ভাল লাগে?

সুবিমল বলিল—আমার এরকম স্বাধীন ব্যবসা করতে বেশ লাগে। মাটি চাষ ক'রে ফসল তুলে কি আনন্দ তা যে না করে, সে বোঝে না।

সুনন্দা সুবিমলকে শ্রদ্ধা করিলেও তাহার পছন্দকে প্রশংসা করিতে পারিল না।

(৫)

সুনন্দার দিন বেশ কাটিতেছিল, তাহার আর এখন সঙ্গীর অভাব বোধ হয় না। ইন্দুবাবু গৃহিণীর আবদারে মাঝে মাঝে পাত্রের অনুসন্ধান করেন। উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় না এমন নয়, কিন্তু সকলেই পাঁচ হাজার সাত হাজার হাঁকে। মেয়ের কাছে প্রস্তাব আসিলেই মেয়ে ক্ষেপিয়া উঠে। ইন্দুবাবু গৃহের অশান্তি সহ্য করিতে না-পারিয়া বলেন—কি ঝকমারি করেছি এই বর্ম্মাদেশে এসে! সমুদ্রের এপার থেকে কি ওপারে ছেলেমেয়ের বিয়ে ঠিক করা যায়? চেষ্টার ত ত্রুটি করছি না।

কত ছেলের নামের লিষ্ট আসছে, কিন্তু যাঁদের পছন্দ হয়, তাঁদের কেউ চায় পাঁচ হাজার নগদ, কেউ চায় মোটর গাড়ী, হীরের গয়না, সুন্দরী মেয়ে। কেউ বলে বিনয় ক'রে, নগদ টাকা চাই না, ডিস্‌পেন্সারী সাজিয়ে বসিয়ে দাও। আমার ত তবু একটা মেয়ে, যার ঘরে পাঁচ ছয়টি, তাঁদের কি দুর্দ্দশা! তাই আজকাল মেয়ের বাপেরা এখানেই যেমন-তেমন ছেলে ধ'রে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে।

সুনন্দা বলে—সে কি মন্দ কথা, বাবা? এখানে বিয়ে দিতে পারলে কি করতে দেশে যাবে অত খরচ ক'রে?

বাবা বলেন—হাঁ মা, ভাল পাত্র সকলের মেলে কই? এই ত সেদিন এক বন্ধু মেয়ের বিয়ে দিলেন, পাত্রটির বয়সও বেশী, আর জলজ্যান্ত একটি বর্ম্মিণী, চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরসংসার করছিল।

সুনন্দা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—বাবা, কি বলছ? এমন জেনেও বিয়ে দিলেন?

ইন্দুবাবু বলিলেন—জেনে কি আর দিয়েছেন? ভদ্রলোক থাকেন সেই মিচিনায়—মেয়েটির উনিশ বছর বয়েস হয়েছিল,

লেখাপড়াও শেখে নি কিছু। চোদ্দ বছর দেশে যান নি, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। মিন্‌গং সিয়াতে এক বন্ধুর কাছে এই পাত্রের খবর পেয়ে বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে ফেলেন। বিয়ের পর মেয়ে স্বামীর ঘর করতে গিয়ে দেখে সতীন সংসার গুছিয়ে রেখেছেন।

গৃহিণী চটিয়া উঠিয়া বলেন, যত সব বাজে গল্প মেয়েকে শোনাচ্ছ! এম্‌নি মেয়ে ত বিয়ের নাম শুন্‌তে চায় না। এসব শুন্‌লে কি আর রক্ষে আছে? যা সুনন্দা, তোর কাজকর্ম্ম কর গিয়ে।

সুনন্দা মায়ের কথায় মনোযোগ দিল না। বলিল—আচ্ছা, বাবা, এদেশে ত নানা দেশীয় লোকের বাস, বেশ মেলামেশাও চলে। অ-বাঙালীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেই পারে।

ইন্দুবাবু বলিলেন—অ-বাঙালীর সঙ্গে কি আমাদের খাপ খায়, মা? এক ভাষাভাষী না-হ'লে কি মনের মিল হয়? যাক্ সে কথা।

আগামী সপ্তাহে আমাদের কোর্ট ছুটি হবে, দিন-দশেক বন্ধ থাক্‌বে। চল, আমরা ম্যাণ্ডালে, মেমিও বেড়িয়ে আসি।

সুনন্দা বেড়াইতে যাইবার আনন্দে উঠিয়া পড়িল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল—"পাঁচটা বাজে, মিঃ সিং আজ খেলতে এল না যে? দেয়ালে ঝোলানো র‍্যাকেটটি নামাইয়া লইয়া বলিল—এস না বাবা, তুমি আর আমি তত ক্ষণ সিংগলস্ খেলি।

ইন্দুবাবু মেয়ের আবদারে পড়িয়া টেনিস খেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গৃহিণী সরলারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। টেনিস-কোর্টে বসিয়া খেলা দেখেন, খেলার পর ঘোলের সরবৎ, রসগোল্লা, পাঁপর-ভাজা প্রভৃতি পরিবেশন করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করেন। বহুকাল বর্ম্মাদেশের মফস্বলে থাকিয়া বর্ম্মা ভাষা বলিতে শিখিয়াছেন, আলাপ জমাইতেও পারেন তাই।

ম্যাণ্ডালের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীরমানাথ দাস মহাশয়ের বাড়িতে ইন্দুবাবু সপরিবারে অতিথি হইয়াছেন। দাসবাবুর ছোট ভাই সুধীন্দ্র এম-এ পাস করিয়া কলিকাতা হইতে সম্প্রতি আসিয়াছেন। ইন্দুবাবু ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া বেশ খুশী হইলেন। দাসবাবু বলিলেন—সুধীন্দ্র আপনাদের সঙ্গে নিয়ে মেমিওর গোটিক্ ব্রিজ দেখিয়ে আনবে। আজ বিকেলে এখানকার প্যালেসটা দেখে আসুন। আপনার মেয়েটি ত বেশ সুন্দর গান করে, মেয়েটিকে ত সব রকমেই অ্যাকমৃপ্লিশড্ করেছেন।

ইন্দুবাবু মেয়ের প্রশংসায় বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিতেছিলেন, একটু বিনয়সহকারে বলিলেন—এই ত শিক্ষার বয়েস, বেশী আর কি শিখেছে। শিক্ষার আরম্ভ হয়েছে বলতে পারেন?

আপনার ভাইটিকে দেখেও আমি বড় সুখী হয়েছি। বেশ বুদ্ধিমান, বিনয়ী ছেলেটি, কি করবেন এখন?

দাসবাবু বলিলেন—বিলেত পাঠাবার ইচ্ছা আছে। বিলিতি ছাপ একটা না-মেরে আসলে কোথাও ভাল চাকরি হয় না।

বিকালে সুধীন্দ্র ইন্দুবাবুদের লইয়া ম্যাণ্ডালে শহরের যা-কিছু দর্শনীয় আছে, সব দেখাইয়া আনিল। মেমিও বেড়াইয়া আসিয়া সুনন্দা বলিল—এই আপনাদের মেমিও! এত যার প্রশংসা শুনতাম? এর চেয়ে শিলং দার্জিলিঙ অনেক সুন্দর।

সুধীন্দ্র বলিল—এইটেই বর্ম্মার দার্জিলিঙ। হিমালয় পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য এখানে কোথায় পাবেন?

ইন্দুবাবুর ছুটি ফুরাইয়া গেল, তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, সুধীন্দ্রও তাহাদের সহিত রেঙ্গুন পর্য্যন্ত আসিল।

সুধীন্দ্র কলিকাতায় অনেক মেয়ে দেখিয়াছে, তাহাদের কলেজেই ত কত মেয়ে পড়িত কিন্তু তাহাদের সহিত আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই। সুনন্দাকে দেখিয়া এবং একত্রে বেড়াইবার সুযোগ পাইয়া সে অত্যন্ত খুশী হইয়াছিল। সুনন্দারও সুধীন্দ্রকে বেশ পছন্দ হইল।

গৃহে ফিরিয়া কর্ত্তা গৃহিণী নিভৃতে যেন কি আলাপ করেন, সুনন্দা আসিলেই চুপ করিয়া যান। সুনন্দা বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে ঠিকই অনুমান করিল। গৃহিণী সুনন্দাকে ক্যাটালগ দেখাইয়া গহনার অর্ডার দেন, শাড়ী, ব্লাউস করান।

প্রতিবেশিনী মা-চির সুন্দর পছন্দ, তাহাকে ডাকাইয়া

গৃহিণী সুনন্দার জন্য মুর্শিদাবাদ-সিল্কের থানের উপর পাড় আঁকাইয়া শাড়ী করাইবার ফরমাস দিলেন। মা-চি গরিবের মেয়ে, লুঙ্গীতে এমব্রয়ডারী করিয়া দোকানে বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। লেখাপড়া কিছুই জানে না, তবু কারও গলগ্রহ হয় নাই। বিধবা মা এবং দুই ভাইয়ের সব খরচ চালায়।

মা-চি এক দিন সরলাকে বলিল—মা, তুমি কেন মিঃ সিংয়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দাও না? সে তোমার মেয়েকে বড় ভালবাসে। বিলেত-ফেরৎ সাহেব, পাঁচ-শ টাকা মাইনে পায়, সরকারী ঘর, চাকর-বাকর সব পায়, কত সম্মানও তার। তোমাদের একটিই সন্তান, কাছেও রাখতে পারতে।

সরলা বলিলেন—ওমা, ও যে পাঞ্জাবী, ভিন্ন জাতে আমরা মেয়ে বিয়ে দিই না।

মা-চি বলিল—তবে ঐ ডাঃ চ্যাটার্জ্জীকে দাও না। সেও ত ভাল চাকরি করে। সে তোমাদের জাতের ছেলে, না?

সরলা হাসিয়া বলিলেন—না না, ও বাঙালী বটে কিন্তু ব্রাহ্মণ যে, অন্য জাতের। তুমি ওসব বুঝবে না। ওদের সঙ্গে আমাদের বিয়ে চলে না, নইলে অমন সোনার চাঁদ ছেলে জামাই পেলে আমি খুবই খুশী হতুম।

মা-চি বলিল—বাপ রে বাপ! তোমাদের এতও বাচ-বিচার আছে! ভাল ছেলে, ভাল রোজগার করে, পছন্দও হয়, তবু বিয়ে দেবে না। এত জাত, জাত কর কেন? ফায়ার কাছে সবাই সমান। বলিয়া দেয়ালের কুলুঙ্গীস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তির দিকে উদ্দেশ করিয়া যুক্তকরে নমস্কার করিল।

একদিন ইন্দুবাবু আপিস হইতে আসিয়া সুনন্দাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বলিলেন—"মা, সুধীন্দ্র ছেলেটি বেশ ভাল, নয়? ওর দাদা তোমাকে খুব পছন্দ করেছেন, আমাদেরও ছেলেটি পছন্দ হয়েছে। তুমি এ-বিয়েতে আপত্তি করবে না ত? আমরা কিন্তু ৫ই ফাল্গুন বিয়ের দিন স্থির করেছি, এই দ্যাখ টেলিগ্রাম এসেছে। আর পনের দিন মাত্র সময় আছে। রেঙ্গুনে গিয়ে বিয়ে দিতে হবে, ছেলের পক্ষ এখানে আস্‌তে রাজী নন। বিয়ের পরে একবার তোমাকে ম্যাণ্ডালে গিয়ে দিনকতক থাকতে হবে। তার পর ছেলে বিলেত যাবে, তখন তুমি আমাদের কাছে চলে আসবে। এ ব্যবস্থায় তুমি খুশী নিশ্চয়।

সুনন্দা অনেক ক্ষণ মাথা নীচু করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

পিতা বলিলেন—বেশ, তোমার সম্মতি আছে বুঝলাম।

সুনন্দা বলিল—বাবা তুমি কি এ-সম্বন্ধে একেবারে কথা-বার্ত্তা ঠিক ক'রে ফেলেছ?

ইন্দুবাবু বলিলেন—হ্যাঁ মা, সবই ঠিক।

সুনন্দা নীরবে উঠিয়া গেল। নিজের ঘরে একা বসিয়া অনেক ভাবিল। সুধীন্দ্রকে যতটুকু দেখিয়াছে, মানুষটাকে তাহার ভালই লাগিয়াছে। কিন্তু দুই-এক দিনের দেখায় কি হয়? একেবারে অপরিচিত একটি যুবকের সঙ্গে আজীবনের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িতে যাইতেছে, অথচ তাহাকে চিনিবার সুযোগও সে পাইল না। বিয়ের পরই আবার বিলাত যাইবে, দুই বৎসর পরে যখন ফিরিবে তখন হয়ত আরও কত পরিবর্ত্তন হইবে। এক-এক বার ভাবিল পিতাকে গিয়া বলে, এ বিবাহ সে করিবে না, অন্ততঃ এখনই না। বরং এত দিন যাহাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও বিবাহ করা তাহার পক্ষে সহজ। কিন্তু সে ত হইবে না। মা, বাবা বলেন, স্ববর্ণে ছাড়া বিয়ে হইতে পারে না। আচ্ছা, মিঃ সিং এই সংবাদ পাইয়া খুশী হইবেন কি? কখনও নয়। আর ডাঃ চ্যাটার্জ্জী? আঃ, কেন যে এসব কল্পিত বাধা আমাদের সমাজের?

সুধীন্দ্র যেন কেমন একটু ভীরুগোছের। সব সময় বলেন, "দাদা যা ঠিক্ করবেন।"

মোটরের হর্ন কানে আসিতেই সুনন্দা চম্‌কাইয়া উঠিল, এখনও সে পোষাক করে নাই। আজ যেন তাহার খেলায় উৎসাহ নাই। মা আসিয়া বলিলেন, "কি রে সুনু, চুল বাঁধিস্ নি এখনও? শুনেছিস্ সব? বর পছন্দ হয়েছে? সুধীন্দ্র ছেলে ভাল, তবে বিলেত পাঠাবার খরচটি বড় কম পড়বে না। অর্দ্ধেক খরচ দেব বলেছি, তাতেও যেন দাদাটি সন্তুষ্ট নয়। পারলে সবটুকু আদায় করতেন। আমাদেরও ত খরচ কম নয়, ভাগ্নে-ভাগ্নীগুলি যে ঘাড়ে পড়েছে, নইলে কি আর টাকার ভাবনা?

সুনন্দা গম্ভীর হইয়া বলিল, "মা, আমি কি তোমাকে বলি নি পণ দিয়ে আমি কোন ছেলেকে বিয়ে করব না? তোমরা এ-বিয়ের আয়োজন ক'রো না।"

মা বলিলেন, "পাগলামী করিস্ না। পণ কেন? তোর বাপ যদি দিতে পারেন, দেবেন না কেন?

সুনন্দা বলিল—ইচ্ছা ক'রে কি তোমরা এত টাকা দিচ্ছ? আর তোমরা হয়ত দিতে পার, যার ঘরে পাঁচটি মেয়ে, সে কি ক'রে প্রত্যেক মেয়ের জন্যে এত টাকা দেবে? না-দিতে পারলে সে ভাল পাত্র পাবে না? তুমি কি বল্‌তে চাও বরপক্ষ টাকা দাবি করেন নি?

মা বলিলেন—তোমার অত খোঁজের দরকার কি? বিয়ের কনে, চুপ ক'রে থাক্‌বে। অত বাড় ভাল নয়।

সুনন্দা রাগ করিয়া সেদিন ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রহিল, খেলিতে গেল না। ইন্দুবাবু বার-বার ডাকিয়াও মেয়েকে ঘর হইতে বাহির করিতে পারিলেন না। অসুখ হইয়াছে, অজুহাত দিয়া বন্ধুবান্ধবের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

পরদিন ইন্দুবাবু সুনন্দাকে অনেক বুঝাইলেন। সুনন্দা শান্ত ধীর ভাবে উত্তর করিল, "তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর, আমি আর আপত্তি করব না।"

ইন্দুবাবু মেয়ের সুমতি হইয়াছে বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

(৭)

রেঙ্গুনের বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে "শশী নিয়োগী হলে" দুই দিনের জন্য পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়া বিবাহের স্থান ঠিক্ হইয়াছে। ইন্দুবাবু মফস্বলের বাসিন্দা, কাজেই রেঙ্গুন শহরে পরিচিত বন্ধুবান্ধব খুব কমই ছিল। কিন্তু বরপক্ষীয়েরাই চার শত বরযাত্রীর অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

সুনন্দার স্কুলের সহপাঠিনী দুই তিনটি বিবাহিত মেয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের সহিত বহুকাল পরে সুনন্দার সাক্ষাৎ হওয়ায় সে খুব আনন্দিত হইল। তাহারা সুনন্দাকে সাজাইতে মহা ব্যস্ত। সুনীতা বলিল, "হাঁ, রে তুই না বল্‌তিস্, যে-ছেলে পণ চাইবে, তাকে কখনও বিয়ে করবি না, এখন যে রাজী হলি? ছেলেটিকে খুব পছন্দ বুঝি?"

সুনন্দা বলিল—কে বলেছে পণ নেবে?

সুনীতা বলিল—উনি ত বল্‌ছিলেন, সুধীন্দ্র বাবু নাকি বিলেত যাবার টাকা না-পেলে বিয়েই করবেন না, বলেছিলেন। তোর বাবা নগদ দু-হাজার টাকা, গয়না, বিয়ের দিন দেবেন আর দু-বছর মাসে মাসে তিন-শ টাকা ক'রে বিলেতের পড়ার খরচ পাঠাবেন, এই কড়ারে নাকি ছেলে রাজী হয়েছে। কি জানি ভাই, সত্যি কি মিথ্যা!

নীরজা বলিল—এ আর আশ্চর্য্য কি? আজকাল পাস-করা শিক্ষিত ছেলেদেরই ত হাঁকটা বেশী। মনে করেন, পাস ক'রে যেন সকলের মাথা কিনে নিয়েছেন। আমরা যেন মুখ্যু মেয়ে, আমাদের জন্যে টাকার দাবি তবু মানায়, তোদের মতন পাস-করা মেয়ের জন্যেও টাকা চাইতে লজ্জা করে না ওদের?

সুনন্দার মুখ লজ্জায়, অপমানে রাঙা হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে কি নির্ব্বুদ্ধিতা করিয়াছে, কেন সে পিতার নিকটে সম্মতি দিল? বাবা বলিলেন, সব ঠিক হইয়াছে, তারিখ পর্য্যন্ত। মায়ের কাছে কিছু বলিতে যাওয়া অসম্ভব। কেন সে পিতাকে নিজের অসম্মতি জোর করিয়া বলিতে পারিল না? সুধীন্দ্রকে তাহার ভাল লাগিয়াছিল সত্য, কিন্তু সে ত সুনন্দাকে ভালবাসিয়া বা পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতেছে না। সে বিলাত যাইবার টাকা চায়। যদি সুনন্দার বাবা অর্থ দিতে সমর্থ না-হইতেন তবে কি সে সুনন্দাকে বিবাহ করিত? অর্থের মূল্যে আজ সে নিজেকে বিক্রয় করিতেছে? কোথায় গেল তাহার আদর্শ, কোথায় গেল তাহার শিক্ষা? যতই সে চিন্তা করিতে লাগিল, ততই তাহার দুঃখে, অপমানে, ক্রোধে দেহ মন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সাজ-সজ্জা ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল। কেবল মনে হইতে লাগিল, এখনও কি কোন উপায় নাই?

বন্ধুরা তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিল তাহার মনে কোন সংগ্রাম চলিতেছে। অরুণা বলিল—কেন ভাই, তোরা ওসব কথা এখন তুললি? দ্যাখ ত ওর মনটা কি রকম বিমর্ষ হয়ে গেল? মেয়েদের কত রকম

আশা, আকাঙ্ক্ষা, মতামত গ'ড়ে ওঠে, কিন্তু সে-সব কি আর পূর্ণ হয় কোনদিন? ছেলেবয়সে মানুষ কত স্বপ্ন দেখে, কত আদর্শের পূজা করে, বাস্তব-জগতে যখন জেগে ওঠে, তখন সে-সব কোথায় মিলিয়ে যায়, ভেঙে-চুরে যায়! মেয়েমানুষের নিজস্ব ব'লে কি কিছু বজায় থাকে? কিছু না—কিছু না।) সুনন্দা, তুই ভাই বিয়ের কনে, ও-রকম গোমড়া-মুখ ক'রে থাকলে চলবে না। ও কি, চোখে জল কেন? চন্দনের ফোঁটা মুছে যাবে যে? ঐ বুঝি বর এল—শাঁক বাজছে, চল্ সবাই বারাণ্ডায় গিয়ে দেখে আসি। সুনন্দা কাঁদিস্ না কিন্তু। আর হাসি ফুটতে দেরি হবে না, বরের মুখ দেখলে।

* * *

অন্দরের শান-বাধানো উঠানে বরকে দাঁড় করান হইয়াছে। চারি দিকে মেয়ের ভিড়, স্ত্রী-আচারের জন্য এয়োস্ত্রীরা ডালা-কুলো-হাতে দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময় এক জন মহিলা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওমা কনে কেন এখানে? যাও যাও তুমি ঘরের ভিতর, একি সব বেহায়া কাণ্ড!"

সুনন্দা সকলকে ঠেলিয়া সোজা বরের নিকটে আসিয়া বলিল, "মিঃ দাস, একবার এই দিকের ঘরে আসবেন? বিশেষ কথা আছে।"

সুধীন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া চারি দিকে চাহিয়া বলিল—এখন কি কথা? আপনি ঘরে যান, পরে হবে।

সুনন্দা কঠিন স্বরে বলিল, "পরে নয়, এখনই প্রয়োজন, আপনি না-গেলে আমি এখানেই বলছি শুনুন—আপনি আমার বাবার কাছে একটি পয়সাও দাবি না-ক'রে আমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত কি না, আমি এখনই জানতে চাই।"

সুধীন্দ্র বলিল—ওসব বিষয়ে আমার কোন স্বাধীন মতামত নেই, সব আমার দাদা জানেন। আপনি কি পাগলামী করছেন, সকলে কি ভাব্‌ছেন বলুন ত!

সুনন্দা বলিল, "আমি আবার বল্‌ছি—আপনি যদি বিনা-পণে আমাকে আপনার জীবনের সহযাত্রিণী ক'রে নিতে সম্মত থাকেন, তবেই আমাদের বিয়ে সম্ভব, নইলে আমি এ-বিয়েতে প্রস্তুত নই।"

সুধীন্দ্র বলিল—আমার দাদার অনুমতি ব্যতীত আমি কোন কাজ করতে পারি না, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

"তবে আমায়ও ক্ষমা করবেন আপনারা" বলিয়া সুনন্দা সবেগে বিবাহ-সভার মধ্য দিয়া ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

সুধীন্দ্র মাথায় হাত দিয়া উঠানে বসিয়া পড়িল। বর্ষীয়সী মহিলাগণ "আহা আহা! পুরুষমানুষের একি অপমান গো! অন্য ছেলে হ'লে লাথি মেরে মেয়েটাকে দূর ক'রে দিয়ে চলে যেত" ইত্যাদি সান্ত্বনা-বাক্য বলিয়া সুধীন্দ্রের পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। যুবতী মেয়ের দল মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল, বলিল—"বাবা মেয়ের কি তেজ!" সুনন্দার মা ভাঁড়ার-ঘরে ব্যস্ত ছিলেন, খবর পাইয়া উঠানে আছড়াইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

সভায় তত ক্ষণে সকল সংবাদ পৌছিয়াছে। ইন্দুবাবু এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধব ক্ষিপ্ত বরযাত্রীদের শান্ত করিতে ব্যস্ত। রমানাথ বাবু সুধীন্দ্রের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে গাড়ীতে উঠাইয়া বসাইলেন। যাইবার সময় ইন্দুবাবুকে অভদ্র ভাষায় কিছু শুনাইয়া যাইতে ত্রুটি করিলেন না।

সুনন্দার দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। সে বিবাহ-আসরে প্রবেশ করিয়াই পিতাকে খুঁজিয়া না-পাইয়া পাগলের মত রাস্তায় বাহির হইয়া গিয়াছে! দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ভিড়ের মধ্য দিয়া সে কোথায় চলিয়াছে, তাহা সে নিজেই জানে না। পিছন হইতে কে যেন বলিল—"কোথায় যাচ্ছেন মিস্ দে, বলুন কোথায় যাবেন, আমি পৌছে দেব!"

সুনন্দা ফিরিয়া বলিল—সুবিমল বাবু! আপনি আমায় রক্ষা করুন, আমার আর কোথাও স্থান নেই; কোথায় যাব বলুন। আমি যা করেছি, এর পর আমার বাবা, মা, আত্মীয়স্বজন, সমাজ, কেউ আমাকে ক্ষমা করবেন না, জানি।

সুবিমল সম্মুখে একখানি গাড়ী দেখিয়া ডাকিয়া সুনন্দাকে হাত ধরিয়া গাড়ীতে বসাইল। তারপর বলিল, "আপনি এখন এত উত্তেজিত, এখন কোন কথা বলা চলে না। কাজটা উত্তেজনার বশে ক'রে ফেলেছেন এমনই,

যার ধাক্কা সাম্‌লান সোজা ব্যাপার নয়। আপনার মা, বাবা, আপনাকে না-পেয়ে আরও ব্যস্ত হবেন, চলুন যাই ওখানে।

সুনন্দা বলিল, "না, না, ওখানে কিছুতেই নয়। আমি এ-বিয়ে কিছুতেই করব না। আমাকে আমার মামার বাসায় পৌঁছে দিন, আমি একটু বিশ্রাম চাই।"

সুবিমল সুনন্দাকে তাহাদের গৃহে লইয়া গিয়া একখানা সোফায় বসাইল এবং পাখাটা খুলিয়া দিল। সুনন্দা কিছু ক্ষণ মাথাটা তাকিয়ার উপর রাখিয়া চোখ বুজিয়া রহিল।

সুবিমল বলিল—আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?

সুনন্দা বলিল—বিশেষ নয়, মাথাটা কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করছে, আপনি যাবার সময় আমার আয়াটাকে ভিতর থেকে একটু ডেকে দিয়ে যাবেন?

সুবিমল বলিল—আমি যাবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত নই, তবে ওঁরা আপনার জন্য উদ্বিগ্ন হবেন, তাই ভাবছি খবরটা দিয়ে আসি।

সুনন্দা বলিল—আপনি কি আমাকে ঘৃণা করছেন এরকম কেলেঙ্কারী কর্‌লাম ব'লে?

সুবিমল বলিল—ঘৃণা! মোটেই না, আপনার মনের বলকে আমি শ্রদ্ধা না-ক'রে পারছি না। আমি মনে করি It is never too late to mend. ভুল বুঝতে পারা মাত্রই শোধরাণোর চেষ্টা করা উচিত। মনের বিরুদ্ধতা নিয়ে কোন কাজই করতে নেই, আর এ ত সারাজীবনভরা সমস্যা! তবে আমি আশা করেছিলাম আপনার মত শিক্ষিত মেয়েরা আরও একটু সাহসী এবং বিবেচনাশীল হবেন। নিজের মতামত, নিজে বা বিচার দ্বারা সত্য ব'লে বুঝবেন, তা প্রকাশ করা এবং নিজ মতে দৃঢ় থাকার নৈতিক সাহস চাই। অল্প কয়েক দিন আগে আপনি যদি এ-বিষয়ে দৃঢ়তার সহিত অসম্মতি জানাতেন, তবে আজকের এই অতি অশোভন ব্যাপারটি ঘট্‌ত না। যাক্—আমি আবার নীতি উপদেশ দিয়ে ফেল্‌ছি, ক্ষমা করবেন। আপনি বিশ্রাম করুন, উঠবেন না একেবারে, এই প্রতিশ্রুতিটুকু দাবি করতে পারি কি?

সুনন্দা কৃতজ্ঞতা-ভরা করুণ কোমল দৃষ্টিতে সুবিমলের দিকে চাহিয়া বলিল—নিশ্চয়ই। আপনি আমার গুরু, আপনার ঋণ শুধতে পারব না। সুবিমল হাত বাড়াইয়া দিতেই সুনন্দা আগ্রহে হাতখানি ধরিয়া বলিল—আপনি আজ আমায় যা দিয়েছেন—কি বলব? এমন বন্ধুর সহায়তা পেলে জীবনে ভুল হয় না বোধ হয়।

সুবিমল সুনন্দার কোমল স্পর্শে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—হাতখানি একটু চাপিয়া বলিল—নেবে কি তোমার জীবনসঙ্গী ক'রে? আমি ত এক বৎসর আগে তোমায় যেদিন প্রথমে দেখেছি, সেদিন থেকেই তোমায় ভাল-বেসেছি। সুনন্দা, আজ এই সাজেই আমাদের মালা-বদল হয়ে যাক্ না।

সুনন্দা মালাটি খুলিয়া হাতে লইয়া বলিল—মা-বাবার আশীর্ব্বাদ চাও তবে।

আয়া এক পেয়ালা গরম কাফি হাতে ঘরে প্রবেশ করিয়া সুবিমলকে ও সুনন্দাকে ঐ ভাবে দেখিয়া বিস্মিত হইল। টেবিলের উপরে পেয়ালাটি রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। এমন সময় দরজায় গাড়ী থামিল। ইন্দুবাবুর গলার আওয়াজ শুনিয়া সুবিমল নীচে নামিয়া গেল। ইন্দুবাবু বলিলেন—এই যে সুবিমল, সুনু নাকি বাড়ি এসেছে?

সুবিমল বলিল—আজ্ঞে হাঁ, ওঁকে রাস্তায় একা ছুটতে দেখে আমি গাড়ী ক'রে বাড়ি এনেছি। এত ক্ষণে একটু সুস্থ হয়েছেন। সরলাকে হাত ধরিয়া নামাইয়া ইন্দুবাবু সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "বরপক্ষ ত তখুনি গালি-গালাজ ক'রে বর উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। বরের এক আত্মীয় ব'লে গেলেন, "ডিফামেশন্ সুট আন্‌বে।" আমার ত লোকসান যা হ'ল তা বল্‌বার নয়, মেয়েটিরও আর গতি হবে না। মুখ দেখাবে কি ক'রে সংসারে তাই ভাব্‌ছি।"

গৃহিণী কপাল চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন, "আমার পোড়া অদেষ্ট, নইলে এমন মেয়ে পেটে ধরি? এখন রেঙ্গুন শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালাতে পারলে বাঁচি। ঐ পোড়ারমুখীকে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও, এম-এ পড়ুক গিয়ে, চাকরি ক'রেই ত আজীবন খেতে হবে!"

কর্ত্তা গৃহিণী ঘরে আসিয়া বসিয়া একটু শান্ত হইলে

পর সুবিমল বলিল—"এস সুনন্দা, আমরা মা-বাবাকে প্রণাম ক'রে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষে করি।"

সুনন্দা সোফা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া সুবিমলের পাশে দাঁড়াইল এবং দু-জনে একত্রে মা-বাবাকে প্রণাম করিল।

ইন্দুবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উভয়ের দিকে চাহিতেই সুবিমল বলিল—আমাদের দু-জনের মিলিত জীবনে আপনার আশীর্ব্বাদই সব চেয়ে বড়। মা, আপনিও অনুমতি দিন।

সরলা বলিলেন—ও মা, তুমি যে বদ্যির ছেলে, কি ক'রে আমাদের মেয়ে নেবে?

সুবিমল বলিল—মা, ভগবান্‌কে সাক্ষী ক'রে আমরা দু-জনে মিলিত হব, সমাজের নিয়ম না-ই বা মান্‌লাম!

ইন্দুবাবু বলিলেন—তাহ'লে কাল একবার ম্যাজিষ্ট্রেটের আপিসে এ-সম্বন্ধে খোঁজ খবর করতে হবে। একটা আইনের আশ্রয় ছাড়া দাঁড়াবে কোথায়, বল?

গৃহিণী হাসিমুখে কর্ত্তার কানে ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া বলিলেন—"আমি জানতুম, সুবিমল সুনুকে ভালবাসে। আমারও ছেলেটিকে বেশ পছন্দ ছিল। তবে সমাজে আর থাকতে পারলুম না!"

মিলের অভাব

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

কৃষকেরে ডাকি বলিলেন বাবু
মিষ্টমুখে,—
"জীবন তোদের কাটাস্‌ নাকি রে
অপার সুখে?
তোদের সুখের কথা যে কবিরা
করেন গান—"
কৃষক বলিল,—"অনাহারে মোরা
ক্লিষ্টপ্রাণ!"

গ্রামবাসীদের ডাকিয়া বলিল
শহরবাসী,—
"তোমরাই ভোগ কর প্রকৃতির
রূপের রাশি;
প্রকৃতির রূপ শহরে মোদের
নাই যে, হায়—"
তাহারা বলিল,—"ম্যালেরিয়া ভুগে
প্রাণ যে যায়!"

প্রাসাদ-মালিক কুটীর-মালিকে
বলিল ডাকি,—
"কত সুখ তুমি পাও বল দেখি
কুটীরে থাকি?
কবিরা বলেন, কুটীরগুলিতে
শান্তি ভরা—"
উত্তর এল,—"জল-ঝড়ে হেথা
বাঁচিয়া মরা!"

কবির কাব্যে এমনি কত কি
আছে যে লেখা,—
বাস্তব সাথে সে কল্পনার
হয় না দেখা।
হতাশ হইয়া ভাবিতেছি ব'সে
আজিকে তাই,
বাস্তবে আর কবির কাব্যে
মিল যে নাই!

খাইবার-সীমান্তে

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পিএইচ-ডি

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যে প্রসিদ্ধ গিরিসঙ্কট ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে, সেই খাইবার স্বচক্ষে দেখবার আকাঙ্ক্ষা বহুদিন হতেই ছিল; এবার পূজার ছুটিতে যখন লক্ষ্ণৌ-বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ ক্লাসের ছাত্রদের উত্তর-ভারতের মুঘল স্থাপত্য দেখাবার জন্য রওনা হলাম, তখন স্থির ক'রে ফেললাম যে খাইবার অবধি পাড়ি দিতে হবে—ভাগ্যে যাই ঘটুক। ছাত্রেরা আনন্দে সম্মতি দিলে, মনে হ'ল তাদের কাছে খাইবার আগ্রার তাজের চাইতেও বেশী লোভজনক। আমাদের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আর তিন জন অধ্যাপক ছিলেন, শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন দাশগুপ্ত ও মিষ্টার এফ্-টি-রয়, তাঁরাও আমার মতই সীমান্ত-প্রদেশ দেখবার জন্য সমুৎসুক। অতএব আগ্রা, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি দেখার পরই সদলবলে পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করা গেল।

নৈশ অন্ধকার ভেদ ক'রে ট্রেন যখন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পেশোয়ার ক্যাণ্টন্মেণ্ট্ ষ্টেশনের আলোকোজ্জ্বল প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়াল, আমরা সত্যই সচকিত হয়ে উঠেছিলাম। খাইবারের তলদেশে অবশেষে এসে পৌঁছেছি এই উল্লাসে ও তৃপ্তিতে তখন আমরা মশগুল। ভ্রমণের ক্লান্তি, অবসাদ ও বিরক্তি যেন এক নিমেষে অন্তর্হিত হ'ল। পেশোয়ার-প্রবাসী আমাদের একটি মুসলমান ছাত্র বাসোপযোগী একটি বাড়ি আমাদের জন্য কালীবাড়ি অঞ্চলে আগে থেকেই স্থির ক'রে রেখেছিল—সেইখানেই আমরা আস্তানা নিলাম। ছাত্রটির পিতা মিষ্টার আহমাদ-য়ার খাঁ স্থানীয় মিলিটারী-বিভাগে চাকরি করেন। তিনি অতি সদাশয় ও ভদ্র ব্যক্তি। তাঁর অতিথি-সৎকারের আয়োজনে আমরা যেমন বিস্মিত তেমনই প্রীত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম। পেশোয়ারে যে-ক'টা দিন আমরা ছিলাম তিনি সর্ব্বদা আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন ও স্বয়ং আমাদের সেবায় তৎপর থাকতেন। মুসলমান আতিথেয়তা, সভ্যতা ও রীতিনীতির একটি খাঁটি প্রতীক স্বরূপ তাঁকে আমাদের চিরদিন মনে থাকবে।

পরদিন সকালে একটি ভাড়াটে মোটর-বাস্ রিজার্ভ করা হ'ল তাতেই আমরা প্রাতরাশ সেরে খাইবারের পথে বেরিয়ে পড়লাম। ক্যাণ্টন্মেণ্টের পাশ দিয়ে বাস্ চলল, প্রশস্ত পিচঢালা রাস্তা। দূরে শৈলশ্রেণী মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতের তোরণদ্বারের রক্ষীর মত। দু-ধারে বিস্তৃত উপত্যকাভূমি—যার বুকের ওপর দিয়ে অতীত যুগ হ'তে কত অসংখ্যবার শত্রু ভারত আক্রমণ করেছে। অল্পক্ষণ পরেই আমরা কাঁটাতারের বেড়া পার হলাম। এখানে বলা আবশ্যক, পেশোয়ার ক্যাণ্টন্মেণ্টের চারি দিকে সম্প্রতি কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে সীমান্তবাসীদের অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে, প্রয়োজন হ'লে তা তড়িৎযুক্ত করা যায়। মাঝে মাঝে যে প্রবেশ-পথ বা ফটকগুলি আছে তা রাত্রে নিয়মিত ভাবে বন্ধ করা হয়। রাত্রে তার বাহিরে যাওয়া নিরাপদ নয়, সীমান্ত-প্রদেশের এমনি আপৎসঙ্কুল অবস্থা।

পথে ইসলামিয়া কলেজ দেখা গেল। এ-প্রদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এইটি। মনোরম ও বৃহদায়তন উদ্যানের মাঝে প্রকাণ্ড অট্টালিকাটি সমস্ত উপত্যকার মাঝে একটি দর্শনীয় জিনিষ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই কেন্দ্র হয়ত দূর ভবিষ্যতে এই দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সহিত জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত ক'রে দেবে। তবে যুদ্ধবিলাসী দুর্দ্ধর্ষ পাঠান কবে যে বন্দুক ছেড়ে কেতাব পছন্দ করবে তা বলা শক্ত।

পেশোয়ার থেকে দশ মাইল পরে বিখ্যাত জামরুদ-দুর্গ। স্বনামধন্য শিখ-সেনাধ্যক্ষ হরিসিং নালবা কর্ত্তৃক

এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। রণজিৎ সিংহের সেনানী হরিসিং নালবার নামে এক সময়ে সীমান্তবাসী ভয়ে কম্পমান হ'ত, এখনও এ-দেশের পাঠান-জননী দুরন্ত শিশুকে ঘুম-পাড়াবার সময় "হরিয়া"র নাম করে, এইরূপ প্রবাদ আছে। জামরুদ থেকে খাইবার-গিরিপথের প্রারম্ভ; সেই জন্য এখানকার দুর্গের প্রয়োজনীয়ত্ব সহজেই অনুমেয়। এইখানে পথের উপর একটি প্রকাণ্ড ফটক



জামরুদ-দুর্গ ও পথের ফটক

আছে—সন্ধ্যায় বন্ধ করা হয়, তার পর এ পথে যাওয়া-আসা নিষিদ্ধ। জামরুদে সরকারী কর্ম্মচারী আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য প্রভৃতি জিজ্ঞাসা ক'রে যাবার অনুমতি দিলে, ও বিকাল সাড়ে পাঁচটার ভিতর যে আমাদের অবশ্য ফেরা উচিত সে-বিষয়ে আমাদের সচেতন ক'রে দিলে।

জামরুদ থেকে বাস্ ক্রমশঃ পাহাড়ের পথে ছুটে চলল, আঁকাবাঁকা দুর্গম গিরি-বর্ম্ম শৈলশিখরের গা বেয়ে চলেছে। সে এক অভিনব দৃশ্য। চারি দিকে একটা রহস্যপূর্ণ নিস্তব্ধতা, শুধু মাঝে মাঝে কাবুলগামী দু-একটি বাস্ পথের সেই মৌনগাম্ভীর্য্য ক্ষণেকের তরে ভেঙে দিচ্ছিল। পথের পাশে কখনও বা দূরে দেখা যায় খাইবার রেলের লাইন মেখলার মত পাহাড়ের কটিতট ঘিরে রয়েছে। কয়েক মাইল চড়াই ওঠার পর সাহগাই-দুর্গ দেখা গেল।



খাইবার-গিরিপথের একটি দৃশ্য

এটি আধুনিক ব্রিটিশ দুর্গ, ইহাতে বৃহৎ সেনানিবাস আছে। কাছেই সাহগাই রেল-ষ্টেশন, সেটিও একটি দুর্গবিশেষ ও তার প্রাচীরগুলি সুরক্ষিত। এই স্থানটি সমুদ্রতীর থেকে প্রায় এক হাজার ফুট উঁচু। এর পর ক্রমশঃ পথ এঁকে-বেঁকে উপরে উঠেছে—স্থানে স্থানে শৈলশিখরের ওপর ছোট ছোট সেনানিবাস। শোনা গেল, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি খাসাদার-সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত ও বাকীগুলিতে ব্রিটিশ ফৌজ আছে। প্রত্যেক শিবিরে বেতার, টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে ও তিন মাসের উপযোগী রসদ সর্ব্বদা ভর্ত্তি থাকে। এই ছোট ছোট ফাঁড়িগুলির দ্বারা খাইবার-গিরিপথ আগাগোড়া রক্ষিত হচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য।

সাহগাই ছাড়িয়ে আমরা বণিকদের একটি উষ্ট্রবাহিনী দেখলাম,—অসংখ্য উষ্ট্র, বলদ, গর্দ্দভ প্রভৃতি মাল-বোঝাই হয়ে চলেছে মন্থরগতিতে পেশোয়ার অভিমুখে। মধ্য-এশিয়ার বাণিজ্য-কেন্দ্র থেকে দ্রব্যসামগ্রী তারা এমনি করে প্রাচীন যুগ হ'তে ভারতে বহন ক'রে আসছে। শুনলাম সীমান্ত-প্রদেশে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত স্থানে সরকারী নিয়মানুসারে বণিকদলকে নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র বন্দুক প্রভৃতি জমা রাখতে হয়, তার পর তাদের জামুরুদ অতিক্রম করতে দেওয়া হয়। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তারা সেগুলি ফেরত পায়। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক



খাইবার-গিরিসঙ্কট

হবে না যে, পেশোয়ারের আর্থিক সমৃদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে মধ্য-এশিয়ার সহিত এই বহির্বাণিজ্যের ওপর। পারস্য, আফগানিস্থান প্রভৃতি থেকে কার্পেট, মেওয়া, ফল, প্রভৃতি আমদানি হয় ও পেশোয়ার থেকে তা সমগ্র ভারতে প্রেরিত হয়। এই বৈদেশিক বণিকেরা আবার পেশোয়ার থেকে ভারতের দ্রব্যসম্ভার আহরণ ক'রে নিয়ে যায়। যাতে এই বাণিজ্য দুরন্ত সীমান্ত-বাসিগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত বা লুণ্ঠিত না-হয় সেজন্য সরকারী ফৌজ ও খাসাদারদের সর্ব্বদা সতর্ক থাকতে হয়।

নিবিড় গিরিশ্রেণী দু-ধারে উন্নতশিরে আকাশ পানে চেয়ে আছে—পথ যেন সংকীর্ণ ও ভয়াবহ মনে হয়। অদূরে রেলের লাইন সাহগাই-এর পর সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে চলেছে। পাশে গভীর খাদ, তার তলায় শীর্ণ খাইবার-নদী দেখা যায়। মাথার ওপর ফৌজশিবির স্থানে স্থানে পথ রক্ষার জন্য অবস্থিত। একটু পরেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আলিমাসজিদ-দুর্গ ও গিরিসঙ্কট। এইখানে রেলপথ অনেকগুলি সুড়ঙ্গ ভেদ ক'রে খাড়াই হয়ে লাণ্ডিকোটাল অভিমুখে গিয়েছে। পথের সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। প্রকৃতির এক ধ্যানস্তিমিত বিরাট রূপের সন্ধান মেলে এখানে, তা যেমন সুন্দর, তেমনই ভীতিজনক। পাহাড়ের গায়ে গাছের নামমাত্র নেই—শুধু নগ্ন পাষাণশিলা ও কোথাও বা মাত্র কণ্টকগুল্ম দেখা যায়, তা সত্ত্বেও সমস্ত দৃশ্যে এমন একটা অব্যক্ত গাম্ভীর্য্য আছে যা সহজেই মনকে অভিভূত করে। হঠাৎ চোখে পড়ে দূরে সুরক্ষিত দুর্গসদৃশ আফ্রিদিদের গ্রামসমূহ। প্রত্যেক গ্রাম উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা, ও তার মাঝে একটি ক'রে উঁচু বুরুজ দেখা যায়। অপর গ্রামবাসীদের সহিত যখন বিবাদ বাধে, তখন সেই বুরুজ থেকে গ্রামস্থ লোকে পালা ক'রে পাহারা দেয়।

আলিমাসজিদ পার হওয়ার পরেই খাইবার-গিরিসঙ্কট চোখের সুমুখে ভেসে উঠে। দু-পাশে সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ যেন পরস্পরে কোলাকুলি করবার জন্য অগ্রসর—মাঝ দিয়ে সাপের মত সরু লিকলিকে পথ পাহাড়ের তলা বেয়ে দৃষ্টির অন্তরালে অন্তর্হিত হয়েছে। সেইটিই হচ্ছে খাইবার-গিরিসঙ্কটের অন্তস্তল। স্থানটিতে আলো-আঁধারের যেন লুকোচুরি খেলা চলে। শৈলশৃঙ্গে এখান একটি দুর্গ রয়েছে। এই দুর্গ থেকে শুধু গিরিপথই রক্ষিত হয় না, দূরে তীরা, মোহমান্দ্‌ প্রভৃতি প্রদেশেও নজর রাখা হয়। পথ এর পর খাইবার-গিরির উচ্চতম প্রান্তে এসে পৌঁছায়, যেখানে লাণ্ডিকোটাল-দুর্গ ও সেনানিবাস অবস্থিত। লাণ্ডিকোটাল সমুদ্র থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু। এখানকার দুর্গ ও শিবির সমস্ত খাইবার প্রদেশ ও ভারতের প্রবেশদ্বারকে রক্ষা করছে। লাণ্ডিকোটাল-দুর্গ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্ম্মিত—এর সুরক্ষিত প্রাচীরগুলি দেখবার মত জিনিষ। দুর্গের বহির্ভাগে বড় বড় গুদাম ও বাজার। গুদামগুলিতে শুনলাম সব সময়ে তিন মাসের উপযুক্ত খাদ্য ও অন্যান্য মাল মজুত থাকে। যুদ্ধ বা বিদ্রোহ বাধলে, বা কোন কারণে খাইবার অবরুদ্ধ হ'লে ফৌজের বহুদিন খাদ্যাভাব হয় না।

লাণ্ডিকোটালে দলের অনেকেই স্থানীয় পোষ্ট-অফিসে খাম পোষ্টকার্ড কিনে আত্মীয়-বন্ধুবর্গকে চিঠি লিখলেন এখানে আসাটা স্মরণ রাখবার জন্য। বাসের চার ধারে পাঠানরা ঘিরে দাঁড়াল, তাদের চক্ষে আমরা যেন এক

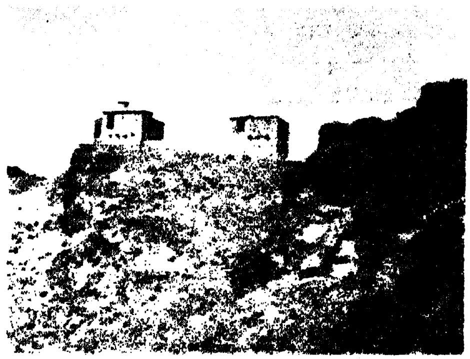
অপরূপ জীব। এইখানে কাবুল থেকে আগত অনেকগুলি মালবাহী বাস্ দেখা গেল, একটি থেকে আমরা কাবুলী খরমুজ বা সরদা কিনলাম খুব সস্তায়। সরদার সুমিষ্ট আস্বাদ যাঁরা জানেন তাঁদের অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। লাণ্ডিকোটাল থেকে বাস্ চলল ভারতের সীমান্তের অভিমুখে। এখান থেকে পথের উৎরাই আরম্ভ হয়। ঈষৎ বক্রগতিতে গিরিপথ পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে যেন গড়িয়ে চলেছে। শীঘ্রই লাণ্ডিখানা সেনানিবাস দেখা গেল—এটি আপাততঃ পরিত্যক্ত হয়েছে। লাণ্ডিখানা থেকে আরও ..ক মাইলের পর বাস্ টোরখান্ নামক পল্লীতে এসে দাঁড়াল এইটিই ব্রিটিশ ভারতের সীমানা। পথের উপর প্রকাণ্ড ফটক—তার এক দিকে সশস্ত্র ব্রিটিশ খাসাদার-প্রহরী, অপর দিকে দুটি আফগান সৈনিক—মাথায় তাদের লোহার হেল্‌মেট্, যদিও পরনের পোষাক দেখে শ্রদ্ধা হ'ল না, তা এমনই শ্রীহীন ও দারিদ্র্যব্যঞ্জক। কাবুল-রাজ্যের সৈন্য ও



খাইবার-পথে রেল

বিশৃঙ্খলা যেন তাদের আকারে ও পরিচ্ছদে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত। আকৃতিতেও তারা মোটেই বলিষ্ঠ বা দীর্ঘ নয়। ক্ষীণাকৃতি বাঙালীকে সামরিক সাজে যেরূপ দেখায় অনেকটা সেইমত তাদের বোধ হচ্ছিল।

আমাদের দলের কয়েক জন তাদের ফোটো তুলতে চাইলেন, কিন্তু তারা ইঙ্গিতে অসম্মতি জানালে। বন্ধুবর শ্রীশৈলেন দাশগুপ্ত ও মিষ্টার এফ. টি. রয় কিন্তু কৌশলে তাদের ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্রিটিশ খাসাদার-প্রহরী কিন্তু বেশ সপ্রতিভ ও অমায়িক লোক, আফগান সৈনিকদের মত অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর নয়। সে সস্মিত ভাবে আমাদের সহিত আলাপ করলে, ও আমাদের সহিত



শৈলশিখরে ছোট ছোট সেনানিবাস

ছবি তোলাতে সাগ্রহে সম্মত হ'ল। ফটকের পাশে আমাদের একটি 'গ্রুপ' ফোটো তোলা হ'ল। ফটকের এক পাশে একটি ইস্তাহার দেখা গেল—সেটি বাংলায় অনুবাদ করলে এইরূপ দাঁড়ায়।—

"ভারতের সীমান্ত—
পাসপোর্টের নিয়ম না মেনে যাত্রীগণের এই
নোটিশবোর্ড অতিক্রম করা নিষিদ্ধ।"

ফটকের দক্ষিণ দিকে একটি উঁচু টিলা আছে, সেখানে খানিক ক্ষণ বিশ্রাম ও সরদাগুলির সদ্ব্যবহার করা গেল। দূরে চোখে পড়ে জালালাবাদ ও কাবুলগামী মোটর-বাস একটির পর একটি আসছে বা যাচ্ছে। কাবুল সরকারের পেট্রোলবাহী বাস্ অনেকগুলি চোখে পড়ল, কারণ শুনলাম প্রত্যহ পেশোয়ার থেকে পেট্রোল কাবুলে পাঠানো হয়। টোরখান্ পাহাড়ের মাঝে উপত্যকাবিশেষ। এইখানে এক পাশে ভারতবর্ষের সীমানা, অপর দিকে কাবুল-রাজ্যের আরম্ভ। স্থানমাহাত্ম্য এমনই যে মনের ভিতর একটা অপূর্ব্ব বিস্ময় ও আনন্দের ভিড় লেগেছিল। নিজের দেশকে এমন ভাবে এর পূর্ব্বে কখনও অনুভব করি নি—যেমন সেদিন দেশের সীমানায় এসে করতে পেরেছিলাম। সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ স্থানে সকলেই কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ কানে এল বাস্-চালকের চীৎকার, —"বাবু দেরি করবেন না, জামরুদের ফটক বন্ধ হয়ে যাবে।"

বাধ্য হয়ে তাড়াতাড়ি সকলে বাসে এসে বসলাম। স্থানটি ছেড়ে আসতে মন কেমন করছিল; তার ওপর কাবুলের পথ যেন বার-বার হাতছানি দিয়ে আহ্বান করছিল—সে আহ্বান আমাদের দলের অনেকেরই মনে এমনই গভীরভাবে



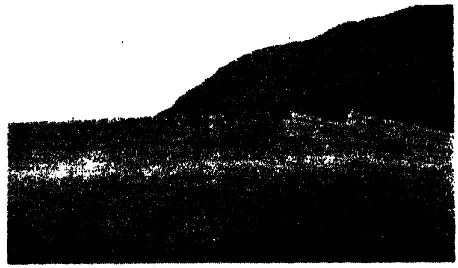
খাইবার-পথে গিরিগুহা



বণিকদল ও উষ্ট্রবাহিনী

বেজেছিল যে তাঁরা সোৎসাহে প্রস্তাব করেছিলেন, "কাবুল গেলে কেমন হয়?" কিন্তু বলা যত সহজ, কার্য্যতঃ ততটা নয়। পাসপোর্ট জোগাড় করতে সময় লাগে অনেক, এবং যথেষ্ট হাঙ্গামা পোয়াতে হয়। তার ওপর শোনা গেল, এ-সময়ে কাবুল বিদেশীর পক্ষে নিরাপদ নয়, যেহেতু নাদির শাহের মৃত্যুর পর রাজ্যের অবস্থা খুবই অশান্ত ও সঙ্কটময় যাচ্ছে।

ফেরবার পথে আমরা লাণ্ডিকোটালের বাজার দেখলাম। মন্দ নয়। মিষ্টার আহমাদ-য়ার খাঁ আগে থেকে এখানে তাঁর এক সহকর্ম্মীকে টেলিফোনে ব'লে রেখেছিলেন—তাঁরই সুব্যবস্থায় চা-পান ও জলযোগ সমাধা করা গেল। আমাদের নূতন বন্ধু মিষ্টার আবদুল বাকী খাঁ যত্নসহকারে লাণ্ডিকোটালের প্রায় সমস্তই দেখিয়ে দিলেন। অবশ্য



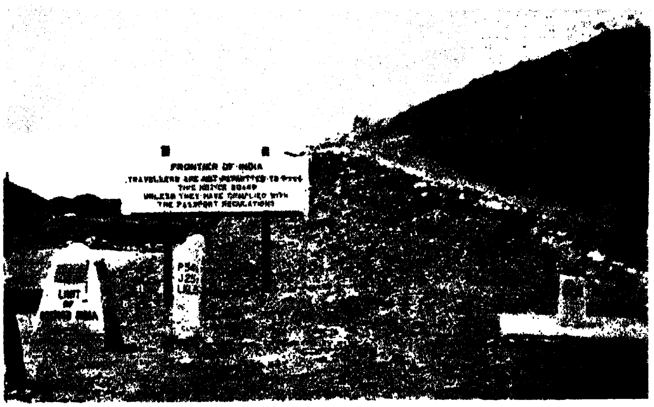
সাহগাই-দুর্গ

সময় অল্প ছিল ব'লে দুর্গের ভিতর যাওয়া হয় নি। চা-পানের পর আমরা পেশোয়ার অভিমুখে রওনা হলাম। এবার সঙ্গী ও পথপ্রদর্শক হলেন মিষ্টার আবদুল বাকী খাঁ স্বয়ং। তিনি বহুদিন যাবৎ এদেশে রয়েছেন, কাজেই অভিজ্ঞতা তাঁর যথেষ্ট, তিনি পথে খাইবারের সমস্ত বৃত্তান্ত ও খুঁটিনাটি আমাদের সম্যকরূপে বোঝাতে লাগলেন। সে-সমস্ত কথা স্থানাভাবে এখানে উল্লেখ করা অসম্ভব। তবে সীমান্তের পাঠানদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা সংক্ষেপে এখানে বলা অনুচিত হবে না।

সীমান্তবাসীদের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বা একই গোষ্ঠীর ভিতর রেষারেষি ও বিবাদ সর্ব্বদাই লেগে আছে বললে অত্যুক্তি হয় না। তুচ্ছ কারণে শোণিতপাত তাদের মধ্যে প্রাত্যহিক ব্যাপার। লোকেরা সাহসী, নির্ভীক ও বেপরোয়া,—জীবন নিয়ে তাদের চিরন্তন খেলা। এর মূল কারণ অবশ্য তাদের দারিদ্র্য। অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য দেশের ও নির্মম পারিপার্শ্বিকের মাঝে তারা শান্তশিষ্ট জীবনযাপন করবার সুযোগ বা প্রেরণা পায় না, সেই জন্যই সীমান্ত দেশে রক্তপাত, বিদ্রোহ, লুণ্ঠন, মানুষচুরি প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এই অশান্তি অনাদি ও অনন্ত বলেই মনে হয়, এর প্রতীকারের সম্ভাবনা দেখা যায় না, অন্ততঃ যত দিন না এ-অঞ্চলে সভ্যতার আলোকপাত ঘটে।

পাঠানদের নৈতিক জ্ঞান যতই নিম্নস্তরের হোক্, তারা তিনটি বিষয় অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করে। প্রথম, তারা

আশ্রয়প্রার্থীকে কখনও বিমুখ করে না; দ্বিতীয় অতিথি নিদারুণ শত্রু হ'লেও তার যথোচিত সৎকার করে; তৃতীয়, অপমানের প্রতিশোধ নিতে তারা জীবনে ভোলে না। পেশোয়ার-প্রবাসী বাঙালী কংগ্রেস নেতা ডাঃ চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত আলাপ হবার সৌভাগ্য হয়। তিনি বহুকাল পাঠানদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। তাঁর মত এই যে, পাঠানদের লোকে যতটা খারাপ ব'লে মনে করে, ততটা মন্দ তারা নয়। মিষ্টার আবদুল বাকী খাঁ ও মিষ্টার আহমাদ-য়ার খাঁ কিন্তু বলেছিলেন, "ঘোষ-মহাশয় ডাক্তার মানুষ, রোগের চিকিৎসা করেন বা বিপদে মুক্তহস্তে সাহায্য করেন সেই জন্যই পাঠানরা তাঁকে খাতির করে স্বার্থের বশে।" যাই হোক, সাধারণ পাঠান যে অতিশয় প্রতিহিংসাপরায়ণ ও নিষ্ঠুর সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মিষ্টার আবদুল বাকী খাঁ বলেছিলেন যে, তিনি এমন অনেক ঘটনা জানেন যা শুনলে আমাদের বিস্ময়ে অবাক হ'তে হয়। পারস্পরিক বিবাদে পাঠানরা শত্রুপক্ষীয় শিশুদের বা মেয়েদের গুলি ক'রে মারতে কুণ্ঠিত হয় না—এমনি তাদের দারুণ বৈরনির্যাতন-প্রবণতা। প্রতিশোধগ্রহণার্থ তারা শত্রুকে কন্যাদান পর্যান্ত করে, পরে নিমন্ত্রিত জামাতাকে সুযোগ পেয়ে কৌশলে হত্যা করে—প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে—এরূপ ব্যাপার মিষ্টার আবদুল বাকী খাঁ অনেক দেখেছেন। শত্রুতা ও হত্যার জের এমনই ক'রে বংশানুক্রমিকভাবে চলে—এর অবসান কখনও কখনও অর্থদ্বারা ক্ষতিপূরণ করার পর হয়ে থাকে। আজকাল হত্যার পর নির্দ্ধারিত একটা মূল্য দেওয়ার প্রথা ক্রমশঃ প্রচলিত হচ্ছে। পথে আমাদের সহিত মিষ্টার আবদুল বাকী খাঁর পরিচিত এক আফ্রিদি 'মালিক'-এর সহিত দেখা হ'ল—তিনি নিজের মোটর নিজেই চালিয়ে পেশোয়ারের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁকে অতি ভদ্র ও শিক্ষিত ব'লে মনে হ'ল। পরে কিন্তু শুনলাম ইনি অনেকগুলি নরহত্যা করেছেন স্বহস্তে—তবে প্রত্যেক বার টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে ভোলেন নি। গ্রামে গ্রামে, পরিবারে পরিবারে, বংশে বংশে বিবাদ বাদে হয় "জর্" (স্বর্ণ), বা "জন্" (স্ত্রীলোক), বা "জমীন" (ভূমি) নিয়ে। কোন কোন গোষ্ঠীতে নিজেদের ভিতরই এত রেষারেষি যে তারা



টোরখাম-সীমান্তে বিজ্ঞাপন



সীমান্তে খাসাদার প্রহরী



আমাদের দলের কয়েক জন

অপর গোষ্ঠীর সহিত ঝগড়া বাধাবার, বা শত্রুতা করবার অবসরই পায় না। সাধারণতঃ স্বগোষ্ঠীয়দের ভিতর ঐক্য সহজেই স্থাপিত হয়, কারণ প্রত্যেক গোষ্ঠীর "জিরগা" বা সমিতি সর্ব্বদা শান্তিরক্ষার চেষ্টা করে।

পাঠান দুনিয়ায় ভয় ও শ্রদ্ধা করে একমাত্র তাদের মোল্লাদের ও ধর্ম্মে বিশ্বাস তাদের প্রগাঢ়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর কতকগুলি ক'রে মোল্লা থাকে, তারা যেমন গোঁড়া, তেমনই ধর্ম্মান্ধ—তাদের প্রতিপত্তিও অপরিমেয়। তাদের প্ররোচনায় ধর্ম্মের নামে সীমান্তে কত যে বিদ্রোহ ও রক্তপাত আজ অবধি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মোল্লাদের একটি কথায় সীমান্তবাসী ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য প্রাণত্যাগ করতে কাতর হয় না। কাজেই মোল্লারা তাদের একাধারে পুরোহিত ও নেতা।

আমরা একটি বিষয় সকলে লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে, কোন পাঠানকে আমরা বন্দুক-ছাড়া দেখি নি। প্রত্যেকের নিজস্ব বন্দুক বা রাইফ্‌ল আছে। যারা অর্থশালী 'মালিক' তাদের পিস্তলও থাকে। এগুলি তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি রূপে বিবেচিত হয়। ছোট ছোট ছেলেদের হাতেও বন্দুক দেখলাম। মিষ্টার আবদুল বাকী খাঁ বললেন আজকাল পাঠানরা এমন-সব বন্দুক নিজেরা তৈরি করছে, যা বিলাতী বন্দুকের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। আমাদের দলের একটি ছাত্র কয়েকটি পাঠানের সহিত আলাপ ক'রে তাদের বন্দুক পরীক্ষা করলে। তার মুখেও শুনলাম যে এত বড় চোঙ্‌ ও ছিদ্র-যুক্ত রাইফ্‌ল সে কখনও দেখে নি। আগে এ-দেশের লোকে সাধারণতঃ ব্রিটিশ সেনাদলে ভর্ত্তি হয়ে বন্দুক চুরি করত, বা সুযোগ পেলে লুঠ করত। সামরিক-বিভাগে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হওয়ায় পাঠানরা পারস্য উপসাগর থেকে আনা বন্দুক অসম্ভব রকম মূল্য দিয়েও কিনতে আরম্ভ করে। সম্প্রতি অনেকে নিজেরা বন্দুক ও রাইফ্‌ল প্রস্তুত করছে। মিঃ আবদুল বাকী খাঁ নিজে একটি বন্দুকের কারখানা দেখেছেন বললেন। ডাক্তার ঘোষ মহাশয়ও এই রকমের কারখানা অনেকগুলি জানেন বললেন। তিনি আমাদের একটি দেখাবার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন, তবে সময়াভাবে ও বিপজ্জনক ব'লে আমাদের তা দেখা সম্ভব হয় নি।


আফ্রিদি পাঠান

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা জামরুদের ফটক পার হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম নিরাপদে ও বাহাল-তবিয়তে ফিরে আসার আনন্দে। তার পর সকলে যখন শ্রান্ত ও অবসন্ন অবস্থায় বাসায় এসে উপস্থিত হলাম, তখন শুধু এই কথাই মনে হয়েছিল যে, এমন দিনের স্মৃতি মনের মণিকোঠায় চিরদিন সঞ্চিতথাকবে। সীমান্ত-রক্ষণ-নীতির যে :চিরন্তন ও বিচিত্র সমস্যার কথা এত দিন কেবল বইয়েই পড়া ছিল, সে-সম্বন্ধে বাস্তবের সহিত আংশিক পরিচয় কম লাভের কথা নয়।

ভারতের লিপিসমস্যা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত মাসের 'প্রবাসী'তে ভারতের লিপিসমস্যা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধকার বাংলা বর্ণমালার স্থলে রোমান্ বা ইংরেজী বর্ণমালা গ্রহণের পক্ষপাতী, কারণ বাংলা বর্ণমালা অপেক্ষাকৃত জটিল। ইহার পূর্ব্বেও কেহ কেহ বাংলার পরিবর্ত্তে রোমান্ বর্ণমালা প্রচলনের সপক্ষে আলোচনা করিয়াছেন।

লিপিসংস্কারের এই আন্দোলন নূতন নহে। শত বর্ষ পূর্ব্বেও কেহ কেহ লিপিসংস্কারের এবং দেশীয় বর্ণমালার স্থলে রোমান্ বর্ণমালা প্রচলনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এমন কি অনেকগুলি বাংলা পুস্তকও সে-সময় রোমান্ অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। লিপিসংস্কার সম্বন্ধে এই-সব আলোচনা প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' নামক সংবাদপত্রে। ১৮৩৪ সনের ৯ই আগষ্ট তারিখের 'সমাচার দর্পণে' রোমান্ বর্ণমালা প্রচলনের সপক্ষে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব মুদ্রিত হয় ; প্রস্তাবটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

(সমাচার দর্পণ, ৯ আগষ্ট ১৮৩৪।২৬ শ্রাবণ ১২৪১)

ভারতবর্ষীয় মনুষ্যদিগের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে।

যে সকল ব্যক্তি সপক্ষ দূতরূপ খবরের কাগজ পাঠ করিয়া থাকেন তাহারা জানেন যে সংস্কৃত ও পারস্য ও বাঙ্গালা ও অন্যং ভারতবর্ষীয় ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিবার উপায় সকলকে নিবেদন করা গিয়াছে কিন্তু অনেকেই ইহা কিরূপে হইবে ও কি নিমিত্তে হইবে ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য বোধ করেন নাই এপ্রযুক্ত তাঁহারদিগের সুগোচর জন্য সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে অতএব এই নিবেদন যে এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ ও পণ্ডিত মহাশয়েরা মনোযোগপূর্ব্বক তাহা কর্ণ প্রদান করেন।

প্রথম ঐ নিবেদনের মর্ম্ম এই যে সংস্কৃত ও পারস্য ও বাঙ্গলা ইত্যাদি ভাষার বাক্য ও শ্লোক অথবা গ্রন্থ দেবনাগরী ও পারস্য অথবা বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত না হইয়া সকলি ইঙ্গরেজী অক্ষরে লেখা যায় যথা কিসী এ একটি হিন্দুস্থানী কথা নাগরী অক্ষরে লিখিত না হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে এইরূপে লেখা যায় (Kisi)......পারস্য অক্ষর লিখিত না হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে এইরূপে লিখিত হয় (Bapso) ও "পিতাকে" বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত না হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে এইরূপে লেখা যায় (Pita'ke) এইপ্রকারে অন্য সমুদায় এতদ্দেশীয় ভাষার তাবৎ শব্দ ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিত হয়। এইরূপে এক ইঙ্গরেজী বর্ণমালা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে তদ্দারা ভারতবর্ষীয় যাবৎ বর্ণমালায় যে কার্য্য হয় তাহা হইবে।

অতএব ইহার ভাব কি যে এমত নিবেদন এতদ্দেশীয় লোকদিগের প্রতি আশ্চর্য্য বোধ হয়। তাঁহারা কি বহুকালাবধি এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষার অক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন না। এবং এ বিষয় হাড়ী মজুর ধাঙ্গড় ইত্যাদি নীচ ও অজ্ঞান লোকব্যতিরেকে কি অন্য সকলে জ্ঞাত নহেন। ইহার প্রমাণ হিন্দুস্থানী কথা পারস্য অক্ষরে সচরাচর লিখিত হয় বিশেষতঃ পশ্চিম দেশে ইহার চলন অধিক আছে এবং নাগরী অক্ষরে পারস্য ও আরবী কথা লিখিত হয় এবং উরদু ভাষা অর্থাৎ পারস্য ও হিন্দুস্থানীমিলিত যে ভাষা তাহা প্রায় পারস্য অথবা নাগরী অক্ষরে লেখা যায়। তবে কিজন্য এতদ্দেশীয় সকল ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লেখা হইতে পারিবে না। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও চন্দ্রিকাসম্পাদক কুলীন মহাশয় ও মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং অন্যং বিজ্ঞ ও মান্য ব্যক্তিরা সংস্কৃত কথা ও শ্লোক ইত্যাদি কি বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া থাকেন না। তবে তাঁহারা কিজন্য সংস্কৃত শ্লোক ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিতে পারিবেন না। এই অক্ষর দেশাধ্যক্ষদিগের ভাষার বর্ণ এবং এ ভাষা অসীম জ্ঞানভাণ্ডারপ্রযুক্ত অতিশয় বিখ্যাতহওয়াতে ইহাতে বিদ্যা জন্মিলে মনুষ্য উত্তম ও জ্ঞানী ও প্রধান এবং ক্ষমতাপন্ন হয়।

যেরূপ অনায়াসে ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিতে হইবে তাহার দুই এক দৃষ্টান্ত এস্থানে লিখিলাম।

সংস্কৃত শ্লোক নাগরী অক্ষরে লিখিত।

নাগরী অক্ষরে।

अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकं।
सर्व्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यंध एव सः ॥

বাঙ্গলা অক্ষরে।

অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকং।
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

রোমাণ অক্ষরে পূর্ব্বোক্ত শ্লোক।

Aneka sanshay ochchhedi parokshārthasya darshakang
Sarvasya lochanong sha'strang yasya'na'styandha eva sah.

... ...

দ্বিতীয় ঐ নিবেদনকরণের তাৎপর্য্য এই যে তাহা মনুষ্যদিগের উপকারক হয়।

কেহ২ বা অজ্ঞানতার দ্বারা এবং কেহ২ বা কুটিলতাদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহার অভিপ্রায় এই যে স্ব২ দেশীয় ভাষা পরিত্যাগ করিবাতে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের যথেষ্ট বৈরক্তি ও ক্লেশ উপস্থিত হইবে। কিন্তু এই বিবেচনা বিপরীত সেই তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য জানিবেন এই পরামর্শের প্রধান কারণ এই যে এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের স্বদেশীয় ভাষা বিদ্যাভ্যাসের পথ সুগম করিলে ঐ ভাষা রক্ষা পাইয়া সর্ব্বদা প্রবল হয় এবং তদ্দারা তাঁহারা লভ্য প্রাপ্ত হন বর্ণমালা সমূহহইতে লিপির কারণ এক বর্ণমালা স্থির হইলেই মনুষ্যদিগের

অন্তঃকরণে বৈরক্তি থাকিতে পারে না বরং ইহাতে তাঁহাদের তাবৎ বৈরক্তির নিবারণ হয়।

যদি এক ব্যক্তি উদ্যানে অনেক খেজুর বৃক্ষ থাকে এবং তাহার প্রতিবাসী ঐ সকল বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়া একটি নিম্ব বৃক্ষ রোপণ করিতে চাহে তবে তাহার এমত প্রার্থনা অবশ্য ক্ষতিজনক হইবে কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি খেজুর বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়া প্রতিবৎসর বহুফলদায়ক একটি উত্তম আম্রবৃক্ষ সেই স্থানে রোপণ করিতে চাহে তবে কি তাহার এমত প্রার্থনা ক্ষতিকারক হইবে। তাহা কখনো নহে বরং সকলে ঐক্যপূর্ব্বক কহিবে যে ইহাতে ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা নাই বরং যথার্থ লভ্য হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনারও ঠিক এই ভাব জানিবেন। এমত ইচ্ছা নহে যে কোন সামান্য বর্ণমালা প্রবৃত্তকরণের দ্বারা অন্য সমস্ত এতদ্দেশীয় বর্ণমালার লোপ করা যায় এ কারণ প্রার্থনা ভাল নহে কিন্তু বাঞ্ছা এই যে বর্ণমালার দ্বারা অসংখ্য লভ্যের উৎপত্তি হইতে পারে এমত একটি বর্ণমালা নিরূপণ করণের দ্বারা অন্য সকল বর্ণমালার নিরাকরণ হয়। যে অন্য সমস্ত বর্ণমালা একত্রিত হইলেও তাহাতে সম্ভাবনা হয় না এমত লভ্যজনক যে বস্তু তাহাকে অবশ্য উত্তম বলিয়া মান্য করিতে হইবে এ বিষয়ে যেন তোমাদিগকে কেহ আর না ভুলায় এ কারণ ঐ প্রার্থনা-হইতে যে লভ্য উৎপত্তি হইবে তাহার কিয়দংশের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। আমরা জ্ঞানবান্ ও পণ্ডিত হিন্দুস্থানীয় মহাশয়দিগকে নিবেদন করিতেছি তাঁহারা শ্রবণ করিয়া ইহার বিচার করুন।

১ এতদ্দেশীয় অনেক বর্ণমালাতে পঞ্চাশ বর্ণ এবং প্রায় অসংখ্য যুক্ত বর্ণ আছে ইহাতে শিক্ষকদের অতিশয় বৈরক্তি ও বিলম্ব জন্মে কিন্তু এই তাবৎ বর্ণ ইঙ্গরেজী ২৪ অযুক্ত বর্ণের দ্বারা প্রতিপাপিত হইতে পারে কেবল মধ্যে২ এই চিহ্নের ব্যবহার করিতে হয়। এ মতে ছাত্রদিগের বিদ্যাভ্যাস অতি ত্বরায় এবং অনায়াসে হইতে পারে।

২ যাঁহারা কর্ম্মোপযুক্ত ও খ্যাত্যাপন্ন এবং উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতে প্রার্থনা করেন তাঁহারদিগের ইঙ্গরেজী শিক্ষা করা আবশ্যক হয়। ইহাতে যদি তাঁহারা বালককালে আপন জাতীয় ভাষা অভ্যাস করিয়া তদবধি ইঙ্গরেজী লেখা পড়া করিয়া আসিতে থাকেন তবে তাঁহারা অত্যল্প কালে এবং অনায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারেন।

৩ ইঙ্গরাজী বিদ্যা উপার্জ্জন ব্যতিরেকে অনেক ভারতবর্ষীয় ভাষা শিক্ষা করা হিন্দুস্থানস্থ লোকের আবশ্যক কিন্তু ইহা উত্তম রূপে বিদিত আছে যে নূতন২ বর্ণ অভ্যাস করিতে অনেক কালক্ষেপ হয় এবং স্বীয় ভাষার ন্যায় সেই নূতন অক্ষর লেখাতে তৎপর হইতেও অনেক কাল অপেক্ষা করে কিন্তু সর্ব্বদা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখনের চলন হইলে মনুষ্যদিগকে বহু কালীন নিষ্ফল পরিশ্রম করিতে হইবে না।

৪ এতদ্দেশীয় সকল ভাষার মূল সংস্কৃত কিন্তু সম্প্রতি প্রত্যেক ভাষার বর্ণের পৃথক২ আকার হইয়াছে এই প্রযুক্ত এ দেশের হিন্দু লোক অনুমান করে যে অন্য দেশীয় হিন্দুদের ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক্ এমত প্রকারে তাহারা পরস্পর আপনারদিগকে ও বিদেশীয় উম্মা জ্ঞান করে। এইক্ষণে যদি এ সকল দেশীয় ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিত হয় তবে দেখা যাইবে ও স্পষ্ট বোধ হইবে যে তাহারা পরস্পর এত বিদেশীয় উম্মা নহে ও তাহাদের আদি ভাষাও এক এবং যে প্রণয় ও অন্তঃকরণের ঐক্য আমরা এইক্ষণে কহিতে অক্ষম এবং এত ভিন্ন২ জাতীয় বর্ণের সত্তা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় এমন তাহাদিগের পরস্পর প্রণয় ও অন্তঃকরণের ঐক্য এ রূপে হইবে।

৫ সংস্কৃতহইতে প্রায় সকল হিন্দুস্থানস্থ লোকের ভাষার উৎপত্তি জানিবেন একারণ কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে এক ভাষাতে ব্যুৎপন্ন হইলে অল্প২ প্রত্যেক ভাষার বহুতর শব্দের অর্থ বুঝিতে পারেন অতএব যদি সকল ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিত হয় তবে কোন পণ্ডিত কিম্বা মুন্সি কেবল এক কিম্বা দুই তিন বিদ্যা বর্ত্তমান কালের ন্যায় উপার্জ্জন না করিয়া অনায়াসে তাবৎ হিন্দুদিগের ভাষাতে ব্যুৎপন্ন হইতে পারিবে। যে প্রার্থনাদ্বারা এক আধারে এ রূপ সমূহ গুণযোগ হয় তাহাকে অবশ্য উত্তম প্রার্থনা কহিতে হইবে।

৬ ইঙ্গরেজী বর্ণমালায় বড় অক্ষর ও ইটালিক বর্ণ লিখনের দ্বারা যথার্থরূপে পড়িবার এবং নামাদি ও বিশেষ ভারি কথা প্রকাশ করিবার অধিক সুগম আছে কিন্তু হিন্দুস্থানীয়দিগের বর্ণের স্বভাব ও আকার-হেতুক ইহা তদ্ভাষাতে হইতে পারে না। তবে যদি ইঙ্গরাজী বর্ণে ঐ সমস্ত ভাষা লেখা যায় তবে এমত কল্পনার দ্বারা সহস্র২ হিন্দুস্থানীয় বালকদিগের আপন২ ভাষা লিখিবার জন্য অকথনীয় উপকার হয়। তাবৎ প্রকার বিচ্ছেদ চিহ্ন এবং জিজ্ঞাসা ও আশ্চর্য্য-বোধক চিহ্ন এবং পরের লিখিত কি কথিত বাক্যবোধক চিহ্ন ইত্যাদি মুদ্রিত কি লিখিত পুস্তকে সহজে পাঠ করিবার ও ঝটিতি অবগত হইবার উপকার হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে নাই কিম্বা যদিও থাকে তথাচ সে সম্পূর্ণরূপ নহে। এই সকল এই রোমাণ অক্ষরে অনায়াসে দেওয়া যাইবে এবং তাহাতে কালক্ষেপ না হইয়া কালের রক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে এবং এই উপকারব্যতিরেকে যে অল্পকালেতে হিন্দুস্থানীয় ভাষাসকল কোনপ্রকারে স্থৈর্য্য কিম্বা অলঙ্কারবিশিষ্ট হইতে পারিবে না এই উপকারদ্বারা সেই অল্পকালেই তাহা অনায়াসে হইতে পারিবে।

৭ ইহা বাস্তবিক বটে যে যেরূপ ইঙ্গরেজী অক্ষর ক্ষুদ্র অথচ স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতে পারে তদ্রূপ হিন্দুস্থানীয়দিগের বর্ণের অনেকের যুক্তাপ্রযুক্ত ক্ষুদ্র হইতে পারে না। ইহাতে মুদ্রাঙ্কিতকরণে দ্বিগুণ কাগজ এবং প্রায় দ্বিগুণ জেলদ্ বাঁধিবার শ্রম ও দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় অর্থাৎ নাগরী পারসী ইত্যাদি অক্ষরে যে গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার ব্যয় ইঙ্গরেজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থহইতে প্রায় দ্বিগুণ হয়। অতএব এমত পথে প্রবৃত্তহওনে বালকদিগের পিতা মাতারা কি সন্তুষ্ট হইবেন না। এই মতের দ্বারা তাঁহারদিগের সন্তানের বিদ্যাভ্যাসজন্য কেবল অর্দ্ধেক মূল্যে গ্রন্থ পাইতে পারিবে এবং যে মতের দ্বারা প্রত্যেক বালকের পিতার প্রতিবৎসরে এক টাকা বাঁচিবে সে মত কি এপ্রদেশের মধ্যে অতিউত্তমরূপে গণ্য হইতে পারিবে না।

৮ বহুবিধ বর্ণপ্রযুক্ত এদেশীয় ভাষার অভ্যাসবিষয়ে অতিশয় কঠিন-হওয়াতে তদ্বিদ্যার আকর যুগযুগান্তরাবধি অপ্রকাশ রহিয়াছে তন্নিমিত্ত জ্ঞানরূপ ধন যাহাতে বটে তাহা অগোচর হইয়াছে সে কেবল ইউরোপীয় মনুষ্যদিগহইতে নহে কিন্তু এদেশীয় মনুষ্যদেরও হইতে জানিবেন। এদেশীয় কোন ব্যক্তি বরং কোন ভট্টাচার্য্য ও পণ্ডিত যিনি মহামহোপাধ্যায়রূপে বিখ্যাত তিনিও যেপর্য্যন্ত এতদ্বহুবিধ বর্ণের ব্যবহার থাকিবে সেপর্য্যন্ত কখন আপন পূর্ব্বপুরুষের লিখিত শাস্ত্রের দশমাংশ জ্ঞাত হইতে পারিবেন না। এবং আশ্চর্য্য ইতিহাস ও অলঙ্কারশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র ও আন্বীক্ষিকী ও জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলবিদ্যা ও পারমার্থিকবিদ্যা যাহা পূর্ব্বে জ্ঞানবান্ লোকেরা সংগ্রহ করিয়াছেন যদি এইক্ষণে কোন পণ্ডিত তাহার দশমাংশও জ্ঞাত হইতে অক্ষম হন তবে ইহাতে আর২ দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ লোকেরা কি সন্দেহ করিবে না যে হিন্দু লোকেরদের বিদ্যা কখন হয় নাই। তাহারা অবশ্য এমত সন্দেহ করিবে তবে এ সন্দেহ কিপ্রকারে নিবারিত হইতে পারে এবং সকল দেশের মনুষ্যদিগকে কিপ্রকারে জানান যাইতেও পারে যে হিন্দুদিগের এত রাশি২ শাস্ত্র লিখিত আছে; কিন্তু তাহা এইক্ষণে বন স্বরূপ বহুবিধ নূতন এবং নানারূপ বর্ণের ব্যবহারের দ্বারা অবিদিত আছে। এইক্ষণে এইমত কল্পনা করা যাইতেছে যে যদি হিন্দুস্থানীয়দিগের ইচ্ছা হয় তবে তাঁহারদিগের সমুদায় শাস্ত্র একইপ্রকার অক্ষরে লেখা যায় এবং সে অক্ষর সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা

ও আমেরিকা এই চারি খণ্ডের তাবৎ শিষ্ট ও পণ্ডিত লোকদিগের নিকট সে অক্ষর বিদিত আছে।

যদি হিন্দুগণ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আপন২ বিশেষ২ অক্ষর ত্যাগ করিয়া ইঙ্গরেজী অক্ষর স্বীকার করেন তবে কেবল ইঙ্গরেজ লোকের সদৃশ কর্ম্ম করিবেন। তাহার প্রমাণ এই যে সাক্সেন ও জর্ম্মণ্টেকষ্ট ইত্যাদি বিশেষ অক্ষরেতে ইঙ্গরেজ লোক আপন ভাষা লিখিতেন কিন্তু ক্রমে২ সে সকল অক্ষর দূর করা গেলে রোমাণ অক্ষর অর্থাৎ যে অক্ষর এইক্ষণে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওয়া গিয়াছে সেই অক্ষর অন্য২ তাবৎ অক্ষরের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা গেল তাহাতে সেই সময়ের সেই অক্ষরের পরিবর্ত্তনে কি ইঙ্গরেজী পুস্তকসকল লুপ্ত হইয়াছে এমত বোধ কর তাহা নয় বরং যে অক্ষর ইউরোপীয় তাবৎ লোক চিনিতে পারিল সেই অক্ষরে ঐ সকল পুস্তক প্রকাশিত হওনপ্রযুক্ত তাহা আরও সুন্দররূপে বিখ্যাত হইল এবং অদ্যাবধিও পুরাতন অক্ষরেতে যে কোন লিখিত ও মুদ্রিত পুস্তক জ্ঞাত করাইবার কাহারও প্রয়োজন হয় সেই পুস্তক তাহারা রোমাণ অক্ষরে পরিবর্ত্তন করে তাহাতে প্রায় জগতের সীমাপর্য্যন্ত তাবৎ জ্ঞানি লোক তাহা জ্ঞাত হয়। এই কারণ যদি কেহ এই পরামর্শানুসারে অক্ষরে পরিবর্ত্তনের দোষ করে তবে তাহাকে তুমি এই উত্তর দেও যে এই জগতের মধ্যে অধিক সভ্য ও সর্ব্ববিজয়ি ইঙ্গরেজ লোক এই পরামর্শের পরীক্ষা করিয়া যথার্থ পাইয়াছেন। পরীক্ষাদ্বারা জ্ঞানি লোকেরদের বিচার কি কর্ম্মের ভদ্রাভদ্র স্থির করা যায় না।

অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কোন২ ব্যক্তি অনুমান করেন যে এই বর্ত্তমান কল্পিত নকশার ব্যবহার হইলে হিন্দুশাস্ত্র অস্পষ্ট থাকিবে এবং তদ্গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গুণেরও বিবেচনা হইবে না কিন্তু ইহার দ্বারা তাহা না হইয়া তাবৎ হিন্দুশাস্ত্র উত্তমরূপে স্পষ্ট হইতে পারিবে এবং তৎশাস্ত্রের গ্রন্থকারদিগের উচিত সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা হইবে। অক্ষরের পরিবর্ত্ত হইলে কথার কিম্বা তারিখের অথবা নামের পরিবর্ত্ত হইবে না। এদেশীয় ভাষার তাবৎ শব্দ ও সমুদায় ইতিহাসসম্বন্ধীয় তারিখ এবং তাবৎ মনুষ্যের ও স্থানের এবং ঘটনার নামের পরিবর্ত্ত হইবে না এবং যেপর্য্যন্ত এই নকশার ব্যবহার হইবে সেপর্য্যন্ত তাহারা অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে। যদি হিন্দুরা যথার্থরূপ প্রার্থনা করেন যে তাঁহারা আর অধিককাল অজ্ঞান ও মূর্খরূপে গণ্য না হন এবং পৃথিবীর তাবৎ মনুষ্যই জানেন যে তাঁহারদিগের এত আশ্চর্য্য রাশি২ গ্রন্থ আছে তবে তাঁহারদিগের উচিত হয় যে তাঁহারা শীঘ্র এক প্রধান সভায় একত্র হইয়া তাঁহারদিগের গ্রন্থ ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিতে ও মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে স্থির করেন। যদি তাঁহারা ইহা করেন তবে তাবৎ হিন্দুস্থানীয় গ্রন্থকর্ত্তার উপযুক্ততা জানিতে পারগ হইবেন।

এ নিবেদনের বিষয়ে কাহারও যে কোন সন্দেহ না জন্মে তৎপ্রযুক্ত কোয়ার্টর্লি রিবিউ নাম গ্রন্থ যাহা গত অক্টোবর মাসে লণ্ডনেতে প্রকাশিত হয় তাহার প্রয়োগ আমরা এ স্থানে করিতেছি। অনেক হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিত জানেন যে কেবল ইউরোপ দেশের মধ্যে নহে কিন্তু সমুদায় পৃথিবীর মধ্যে এ গ্রন্থ অতিশ্রেষ্ঠ। ঐ গ্রন্থে যাহা উক্ত আছে তাহা শ্রবণ করুন "যদি সংস্কৃত ইঙ্গরেজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইত তবে অনেক লোক নিদান সে বিদ্যার প্রধান সোপান পাইতে পারিত কিন্তু প্রথমেই নূতন বর্ণের কাঠিন্যদর্শনে এ বিদ্যা উপার্জনে তাহারদের উদ্যোগ ভঙ্গ হয়" এইক্ষণে হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা২ জ্ঞানবান্ ও পণ্ডিত তাঁহারদিগের এই অভিলাষের এই উত্তম পথ খোলা আছে। যদি তাঁহারা তাঁহারদিগের সকল গ্রন্থ ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখেন তবে তাঁহারদিগের বিদ্যা ও বিজ্ঞতা এবং ধর্ম্ম সর্ব্বত্র ইউরোপে এবং অন্য তাবৎ শিষ্ট দেশে বিখ্যাত হইবে।

তবে এমত অন্ধ কে আছে যে এই বর্ত্তমান কল্পিত নকশার আশ্চর্য্য গুণ বিবেচনা করিতে অক্ষম হইবে।

হিন্দুদিগের বর্ণমালার পরিবর্ত্তে ইংরেজী অক্ষরে লিখনের দ্বারা অনেক লভ্য হইবে তাহার কিয়দংশের বিবরণ উপরে কথিত হইয়াছে সে সমস্ত লভ্যের সংখ্যা সংক্ষেপরূপে লেখা যাইতেছে।

১ ইঙ্গরেজী বর্ণে লিখনের দ্বারা প্রত্যেক হিন্দুস্থানীয় লোকের স্বীয় ভাষা অভ্যাসের যথেষ্ট সুগম হইবে।

২ তদ্দ্বারা তাহার ইঙ্গরেজী শিখিবারও যথেষ্ট সুগম হইবে।

৩ তদ্দ্বারা তাহার ব্যবহার্য্য অনেক অন্য২ দেশীয় বিদ্যোপার্জ্জন সুগম হইবে।

৪ হিন্দুদিগের মধ্যে এইক্ষণে যে পরস্পর বিচ্ছেদ পৃথকতা আছে তদ্দ্বারা তাহার নিবারণ হইয়া তাহারদিগের পরস্পর অনায়াসে ঐক্য ও কথোপকথন ও লিপির দ্বারা আলাপ ও আপন২ ইচ্ছা প্রকাশ সমুদায় দেশে হইবে।

৫ তদ্দ্বারা সামান্য ক্ষমতাপন্ন ধৈর্য্যাবলম্বি হিন্দুরা এদেশীয় প্রায় তাবৎ বিদ্যাতে ব্যুৎপন্ন হইবে এবং তদ্দ্বারা তাহারা অসংখ্য জাতি ও বংশের উপকার করিতে পারগ হইবে।

৬ তদ্দ্বারা বালক ও প্রাচীন ব্যক্তিরা কোন ভাষা যথার্থরূপে লিখিতে ও পড়িতে বিলক্ষণ পারগ হইবেন।

৭ ইহা হইলে বালকের প্রয়োজনীয় পুস্তকের মূল্য অনেক কম-হওয়াতে প্রত্যেকের পিতা মাতার অধিক লভ্য হইবে।

৮ তাহাতে হিন্দুস্থানীয় তাবৎ পূর্ব্বকালীন হিন্দু লোকেরদের কি২ শাস্ত্র আছে তাহা জ্ঞাত হইবে এবং পূর্ব্বকালের জ্ঞানি গ্রন্থকর্ত্তারদের জ্ঞান কত দূরপর্য্যন্ত তাহা জগৎসীমাপর্য্যন্ত তাবৎ জ্ঞানি লোকেরদের নিকটে প্রকাশিত হইবে।

অতএব প্রার্থনা যে অতিউত্তম তাহা এ সমস্ত বিবরণের দ্বারা কি সপ্রমাণ হইবে না এবং তদ্দ্বারা যে এদেশীয় মনুষ্যের যথেষ্ট উপকার ও মঙ্গল হইবে তাহার প্রমাণ কি এ সমস্ত বিবরণকর্ত্তৃক হইতে পারে না। যদি তাহা হয় তবে যাঁহারা ইহাতে প্রতিবাদী আছেন তাঁহারা বিপক্ষ অভিপ্রায় না থাকিলেও কি এদেশীয় মনুষ্যদিগের বিপক্ষ নহেন। এবং যাঁহারা ইহাতে উদ্যোগী তাঁহারা কি তাঁহারদিগের মিত্র নহেন।

আমরা মহাশয়দিগকে বিজ্ঞ জানিয়া নিবেদন করিলাম মহাশয়েরা ইহার বিবেচনা করিবেন।

হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের পরমবন্ধু।

*** বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানীয় কতক কেতাব এইক্ষণে রোমাণ অক্ষরে ছাপা হইয়াছে ঐ পত্রের অনেক পাঠক মহাশয়েরা সেই পুস্তক কিনিতে চাহিবেন অতএব তাঁহারদিগকে জানান যাইতেছে যে কলিকাতার লালদীঘীর উত্তরপূর্ব্বকোণে পুস্তকালয়কর্ত্তা অষ্টেল সাহেবের নিকট চিঠী লিখিলে কিম্বা তাঁহার নিকট গেলে অতিঅল্প মূল্যে পাওয়া যাইবে।

'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক মার্শম্যান সাহেব রোমান্ বর্ণমালা গ্রহণের অনুকূল ছিলেন না ; তিনি এই আলোচনা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তাহাও এখানে উদ্ধৃত করা হইল :—

"বিশেষ অনুরোধক্রমে দেশীয় প্রাচীন অক্ষরের পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী অক্ষর ব্যবহারকরণ বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি এক আবেদন পত্র আমরা এই সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম।...আমারদের সম্মত মিত্রগণ ও আমরা যদ্যপি এতদ্রূপ অক্ষর পরিবর্ত্তনের ঔচিত্য বিষয়ে এবং তাহাতে কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা বিষয়ে ঐ পত্র লেখকের প্রতিকূল বোধ হয় তথাপি ঐ নিয়মের পক্ষে যে অতিপ্রবল যুক্তিক্রমে যাহা কহা যাইতে পারে তাহার চুম্বক আমারদের পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রস্তাব করণের যে এই সুযোগ হইল ইহাতে আমারদের পরমানন্দ আছে ফলতঃ এই নূতন নিয়মের দোষসূচক দুই এক পত্র পূর্ব্বে আমরা দর্পণে প্রকাশ করিয়াছি এবং ঐ পত্র যদ্যপিও লঘুতর তথাপি তাহা প্রকাশ করণের এই উত্তর আমাদের দর্পণে অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইল। যদ্যপি এই নতন নিয়মের দ্বারা এতদ্দেশীয় তাবৎ প্রচলিত অক্ষরের সমূলোৎপাটন না হয় তবু উদ্যোগাভাব বলিয়া যে ঐ নিয়ম নিষ্ফল হইবে এমত কহা যাইতে পারা যায় না।"

সাহিত্যের ভাষা ও বস্তু

শ্রীসীতা দেবী

মানুষের জীবনের নানা কর্ম্মক্ষেত্রে, অর্থাৎ সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্ম কাজ করিতেছে দেখা যায়। এক রক্ষণশীলতার ধর্ম্ম, আর একটি নূতনকে আহ্বান করিয়া আনার ধর্ম্ম। এই দুইটিরই প্রয়োজন আছে। সময়-বিশেষে একটি আর একটির অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। পুরাতন যাহা-কিছু তাহাই শুধু আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্রমাগত তাহারই জয়গান করিলে যেমন চলে না, নূতন যাহা-কিছু তাহাকেই নির্ব্বিচারে ডাকিয়া আনিলেও সেইরূপ চলে না।

আমাদের আজ বঙ্গসাহিত্যের বিষয় আলোচনা করিবার দিন। সাহিত্যকে নানা দিক দিয়া দেখিয়া, নানাভাবে তাহার আলোচনা করিয়া অনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন। আমি ইহার মধ্যে সংক্ষেপে খালি কয়েকটি কথা বলিতে চাই। বাংলা-সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায় আজ আমরা কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিব? পুরাতন যাহা ছিল, দ্বিধামাত্র না করিয়া, তাহার দিকে সমালোচকের দৃষ্টিতে একেবারেই না-তাকাইয়া, ভিন্নদেশীয় সাহিত্যের সহিত তাহার তুলনামাত্র না-করিয়া, তাহাকেই রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব, না কোথায় ইহার অভাব, কোথায় ইহার ত্রুটি তাহা বিশ্লেষণ করিয়া সে ত্রুটিগুলি মোচনের চেষ্টা করিব? সাহিত্যের ভাষা এবং সাহিত্যের বস্তু দুইটির বিষয়ই এখন ভাবিবার সময় আসিয়াছে। সাহিত্যের ভাষা কি হওয়া উচিত তাহা লইয়া ত আজকাল যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোনো স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। দারুণ সংস্কৃতগন্ধী পুরাতন যে বাংলা ভাষা আমরা শিশুকালে দেখিয়াছি, এবং এখনও মধ্যে মধ্যে দেখিতেছি, তাহাই কি রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইবে, না, অতি হাল্‌কা ও পল্‌কা, মেরুদণ্ডহীন, প্রাদেশিকতাদুষ্ট অভিনব যে বাংলা ভাষার আজকাল আবির্ভাব হইয়াছে তাহাকেই যথার্থ বাংলা ভাষা বলিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে? উভয় পক্ষেই মহামহা রথী তর্ক করিতে প্রস্তুত আছেন। আমাদের মত যাঁহারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে নারাজ, তাঁহারা ব্যাকুল ভাবে অপেক্ষা করিতেছেন এই তর্কযুদ্ধের ফলাফলের জন্য। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব একটা প্রাণশক্তি আছে, উহা কাহারও অপেক্ষা না-করিয়া কাজ করিয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহারই ফলে আমরা ঐ উভয় শ্রেণীর ভাষা ভিন্নও বাংলা ভাষার আর একটি রূপ দেখিতে পাইতেছি, যাহাতে কাজ বেশ চলিয়া যাইতেছে, এবং যাহাকে লইয়া কোন তুমুল তর্ক বাধিয়া উঠিবারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এই ভাষার গঠনপ্রণালী পুরাতন বাংলার মত, কিন্তু শব্দসম্ভার এত গুরুভার নয়, সচরাচর যে-ভাষায় আমরা কথা বলি, তাহার সহিত সাদৃশ্য ইহার অনেকটাই আছে। ইহা পড়িতে চক্ষু কাতর এবং মন ভারাক্রান্ত হয় না এবং শিশুদিগকে এই

ভাষা শিক্ষা দিতে গেলে পদে পদে হোঁচট খাইতে হয় না। শব্দের বানান-প্রণালীতেও বৈচিত্র্য ইহার মধ্যে তত খানি নাই, যত খানি আছে আমাদের আধুনিকতম বাংলা ভাষার মধ্যে। তবে ভাষার এই রূপটি লইয়া তুমুল তর্ক হয় না লিখিয়াছি বটে, তাই বলিয়া ছোটখাট তর্ক যে নাই তাহা নহে। এ ভাষায় যত ক্ষণ প্রবন্ধ রচনা করা হইবে, তত ক্ষণ কোনো ভাবনা নাই, কিন্তু গল্প বা উপন্যাস লিখিতে গেলেই মহা গোলযোগ বাধিয়া যায়। গল্প-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা কথা কহিবেন কোন্ ভাষায়? যদি লেখ্য ভাষায় বলেন তাহা হইলে পড়িতে ভাল লাগে না, যথেষ্ট বাস্তবসদৃশ (realistic) হয় না। যদি কথ্য ভাষায় বলেন তাহা হইলে কোথাকার কথ্য ভাষা ব্যবহার করিবেন? কলিকাতার ভাষা হইবে, না ঢাকার ভাষা হইবে এই লইয়া বিবাদ বাধিয়া যায়। এক্ষেত্রে তর্ক করিয়া কিছু স্থির করা অসম্ভব, কারণ মানুষের মন তর্কের যুক্তিকে স্বীকার করে না, নিজের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেয়। সুতরাং এক্ষেত্রে মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই গ্রাহ্য, এই নীতির অনুসরণ করাই নিরাপদ।

সাহিত্যের বস্তু লইয়াও চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে। পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার প্রভাব আজ বাঙালীর মনকে বিশেষরূপে বিচলিত করিয়াছে দেখা যাইতেছে। সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রকলায় সর্ব্বত্র পাশ্চাত্য চিন্তার স্রোত আমাদের সনাতন যাহা-কিছু ছিল তাহা ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে। এতটাই কি সঙ্গত? ইহাকে বাধা দিবার কোনো চেষ্টাই কি করিতে হইবে না? এখন চিত্রকর আঁকিতেছেন ভিনাসের ছবি, কবি লিখিতেছেন আর্টিমিস্ (Artemis)ও হেলেন (Helen) সম্বন্ধে কবিতা, গল্পে এবং উপন্যাসে নায়ক-নায়িকারা ভুল বা ঠিক ইংরেজী ভাষায়, মধ্যে মধ্যে ফরাসী ভাষায়, কথা বলিতেছেন এবং তাঁহাদের চালচলনে, সাজসজ্জায়, এমন-কি প্রসাধন-দ্রব্যগুলির উৎকট বিজাতীয় নামে সকলকে চমক লাগাইয়া দিবার প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছেন। আনন্দের বিষয় যে, এইরূপ আজগুবি সাহিত্য এখন পর্য্যন্ত একটি বিশিষ্ট দলের মধ্যেই আবদ্ধ আছে, দেশব্যাপী মহামারী রূপে দেখা দেয় নাই। কিন্তু মহামারী উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যেমন সতর্ক নগরবাসী প্রতিষেধক সেবন ও টীকা লইবার ব্যবস্থা করিয়া নিজেদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন, আমাদেরও সেইরূপ প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়াছে।

কিন্তু পাশ্চাত্যের মোহে ভাসিয়া যাওয়ার বিপদ যতখানি, কেবল মাত্র প্রাচ্যকে আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকিয়া, দুই চোখ বুজিয়া বাহিরের যাহা-কিছু, সমস্তই ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে, তাহাতেও বিপদ কম নয়। আমাদের দেশ স্বভাবতই রক্ষণশীল, নূতন সমস্ত-কিছুকেই অতি সন্দেহের চক্ষে দেখা আমাদের অভ্যাস। সাহিত্যের ভিতরেও এই অন্ধতার পরিচয় যথেষ্টই পাইতে হয়। সুতরাং ইহাকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করা সকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে নিরাপদ নয়। দেশ-বিদেশের সমস্ত জিনিষ সমান আদরে গ্রহণ না-করিয়া তাহার ভিতর হইতে সার জিনিষটুকু গ্রহণ করিয়া লইতে পারিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। কিন্তু সে ক্ষমতা আমাদের আছে কই? বাহিরের স্রোতকে আমরা এত ভয় করি যে, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টায় নিজেদের ভাষার ও সাহিত্যের স্রোতটির চারিদিকে মাটির বাঁধন দিয়া তাহাকে পানাপুকুরে পরিণত করিতেও আমাদের বাধে না। ফলে বাহিরের বিশ্বের সহিত সকল সম্পর্ক আমাদের দূর হইয়া যায়, সাহিত্যের সজীবতা নষ্ট হয় এবং সাহিত্য জীবনের প্রতিরূপ না হইয়া শ্মশানের ছবি হইয়া দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য তাহা প্রত্যেক সাহিত্যসেবীকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আপন খেয়াল-খুশীতে মানুষ লেখে বটে, কিন্তু সাহিত্যিকের ব্যবসায়ে দায়িত্বও আছে অনেকখানি। সাহিত্যই যে সবসময় জীবনকে অনুসরণ করিয়া চলে তাহা ত নয়, জীবনও মধ্যে মধ্যে সাহিত্যকে অনুসরণ ও অনুকরণ করিতেছে। তাহার দৃষ্টান্ত ভিন্নদেশেও দেখা গিয়াছে, আমাদের দেশেও একেবারে দেখা যায় নাই, এমন নয়।

রবীন্দ্রনাথ "গোরা" লিখিবার আগে, "গোরার" মত ভাষায় কোনো যুবককে কথা কহিতে আমরা শুনি নাই, বা তাহার মত দৃষ্টিতে ভারতবর্ষকে দেখিতেও কোন মানুষকে দেখি নাই। সুচরিতা বা ললিতার মত মেয়েও যে ঘরে ঘরে দেখা যাইত তাহা নয়। কিন্তু মধ্যে এই যে কতকগুলি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, ইহারই মধ্যে ত দেখিতেছি বইয়ের পাতা হইতে

এই মানুষগুলি মাটির পৃথিবীতে নামিয়া, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা গোরা, সুচরিতা, ললিতার নিখুঁৎ ফোটোগ্রাফ না হইলেও, একই জাতের যে মানুষ তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সংসারে ভাল জিনিষের অনুকরণের বহু পূর্ব্বেই মন্দ জিনিষের অনুকরণটা আরম্ভ হয়। তাই আধুনিকতম লেখকদের এক দল যে অতি বিকৃত ও অতি অসার কতকগুলি নরনারীর চরিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, তাহাদেরও অনুকরণে ঐরূপ স্ত্রীপুরুষ গড়িয়া উঠিয়াছে ও দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ এদিক-ওদিকে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গল্পের পাতায় যখন এই সব অতি-আধুনিক ছেলেমেয়ের সাক্ষাৎ পাইতাম, তখন হাসিয়াই উড়াইয়া দিতাম যে এ রকম জীবের আবির্ভাব আমাদের দেশে অসম্ভব। কিন্তু ইংরেজীতে প্রবাদ আছে, Talk of the devil, and he appears," "শয়তানের কথা বলিতে-না-বলিতে শয়তানের আবির্ভাব হয়," আমাদেরও অবস্থা হইয়াছে তাই। ক্রমাগত শয়তানের কাহিনী বর্ণনা করিয়া করিয়া আমরা আজ শয়তানকে মর্ত্ত্যলোকে সশরীরেই টানিয়া আনিয়াছি। ইহার জন্য ঐ অসৎ ও অসার সাহিত্য একেবারেই যে দায়ী নয়, তাহা কোনোক্রমেই বলা যায় না। সুতরাং আজকাল সাহিত্যসেবী মাত্রকেই কলম ধরিবার পূর্ব্বে ভাবিতে হইবে। নিজের সংসারে, ভাই-ভগিনী, পতি-পত্নী বা পুত্র-কন্যা রূপে যাহাদের কল্পনা করা অসম্ভব, সেইরূপ কতকগুলি অতি-বিকৃত চরিত্রকে ছাপার অক্ষরে চিরস্থায়ী করিবার ইচ্ছাটাকে যথাসাধ্য দমন করিয়া যাওয়াই উচিত। বস্তুতান্ত্রিকতার (Realism-এর) নামে কত অসম্ভব ও অস্বাভাবিক জিনিষই যে আজকাল সাহিত্যে স্থান পাইতেছে তাহার ঠিকানা নাই। বাস্তব (Real) ত অনেক জিনিষই। ভদ্র, শ্লীল, ও সৎ হইলেই সে জিনিষগুলির বাস্তবতা কিছু নষ্ট হইয়া যায় না। তবে সেগুলি বাদ দিয়া যত অভদ্র ও অশ্লীল বাস্তবের প্রতি এত পক্ষপাত কেন, তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মাদার ইণ্ডিয়ার (*Mother India*র) কুখ্যাতা লেখিকা মিস্ মেয়োকে যে-কারণে মহাত্মা গান্ধী নর্দ্দামা-ইন্সপেক্টর (Drain Inspector) বলিয়াছিলেন, সেই কারণেই এই ধরণের বাস্তব চিত্রের চিত্রকরদের নর্দ্দামা-ইন্সপেক্টর এবং পাগলাগারদের পরিদর্শক বলা চলে। যাহা লিখিব তাহা চিরকাল শুধু কাগজের উপরে ছাপার অক্ষরে থাকিয়া যাইবে না, মনুষ্যসমাজে মূর্ত্তি ধরিয়াও বিচরণ করিবে, এই সম্ভাবনাটা আজকাল সকলেরই মনে রাখিয়া চলা ভাল।

রূপান্তর

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

অণিমার দেহ যখন উঠানে নামানো হ'ল, বীরেশ্বরকে সারা বাড়িময় কোথাও পাওয়া গেল না। মৃত্যু-যন্ত্রণায় যখন অণিমার মুখ বিবর্ণ হয়ে এসেছে, ঘন ঘন নাভিশ্বাস উঠ্‌ছে, ধীরে ধীরে পা দু'টো শক্ত হ'য়ে এল, তার পর হাত, তার পর ধীরে ধীরে সমস্ত দেহ হ'য়ে আস্‌ছে হিমশীতল—এ দৃশ্য সহ্য করার মত শক্তি বীরেশ্বরের নেই। তাই তা'কে সারা বাড়িময় কোথাও পাওয়া গেল না।

একখানা সাদা চাদরে অণিমার দেহ ঢাকা হয়েছে, শুধু পা দুটি আর মুখখানি এবং একরাশ রুক্ষ চুল সেই মুখখানির দুই পাশে—এই দৃশ্য! এয়োরা আল্‌তা নিয়ে এসে পা দুটিতে মাখিয়ে দিলেন, সীঁথির উপর ঢেলে দিলেন সিঁদুর—মনে হ'ল যেন অণিমার দেহ জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে, লাল রঙটা এম্‌নি জিনিষ!

'ওরে, কাগজ নিয়ে আয় রে, একখানা কাগজ নিয়ে আয়, মা'র আমার ফটো নেই, পায়ের ছাপ-দু'টো তুলে রাখ্‌ব! তবু কেষ্ট বড় হ'য়ে বল্‌তে পারবে, আমার মা'র পায়ের ছাপ!—কি বলো দিদি!'—অণিমার শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর ভারী হ'য়ে এল।

'ওগো, ঐ সিঁদুর আমাকে একটু দিতে পার? সতীলক্ষ্মী মেয়ের মাথার সিঁদুর, ওগো, দেবে একটুখানি?'

'আ মর পাগলী, ছুঁস্ নে—ছুঁস্ নে, আমার কেষ্টর অকল্যাণ হবে! যা, যা, স'রে যা, দিচ্ছি আমি সিঁদুর—যা সর এখন!'

কেষ্টর বয়স তিন বছর, বীরেশ্বরের একমাত্র সন্তান, অণিমার শেষ স্মৃতি। তার পর কতকগুলি বলশালী কণ্ঠের সমবেত হরিধ্বনি! নারীকণ্ঠের ক্রন্দনের রোল—তার পর অণিমার দেহ ধীরে ধীরে তার যৌবনের লীলানিকেতন থেকে চিরবিদায় নিল।

প্রতিবেশিনীরা ফুঁপিয়ে কাঁদছে গাছতলায়, চাঁদের আলোয়! অমন মেয়ে আর হবে না গো, আহা সতীলক্ষ্মী মেয়ে!

শ্মশান থেকে ফিরে এসে বীরেশ্বরের মনের আগুন আর নেবে না। অমন সুন্দর দেহ কি হ'য়ে গেল আগুনে, ফট্ ফট্ বাঁশ ফাটার মত সমস্ত দেহটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল, কত কথা বীরেশ্বরের মনে পড়ল—কত প্রেম, কত কাব্য ঐ দেহ নিয়ে। দূর ছাই, কি হবে আর সংসার ক'রে?

সেই থেকে বীরেশ্বর সন্ন্যাসী, মাথায় দীর্ঘ জটা, পরণে গেরুয়া! মুখময় দাড়ি—চোখের দৃষ্টি উদাসীন! মা আছেন যখন, তখন কেষ্টর সম্বন্ধে চিন্তা করাই বৃথা! আজ কাশী, কাল গয়া, পরশু হরিদ্বার—এই ভাবে বীরেশ্বর জীবন কাটাতে লাগ্‌ল।

একবার হরিদ্বার থেকে বীরেশ্বর বাড়ি এলে পর, তার মা গোপনে চোখের জল মুছ্‌লেন। 'আহা, ছেলের আমার কি চেহারা হয়েছে গো! এ দুঃখ যে আমার ম'লেও যাবে না।'—ভাবতে লাগ্‌লেন তিনি আপন মনেই। মায়ের প্রাণ, এই বয়সে ছেলে সন্ন্যাসী হ'য়ে সংসার ছেড়ে চলে যাবে—একথা ভাব্‌তেও যে কেমন করে! বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে—কত সাধের সংসার!

মায়ের এই ভাবনা বীরেশ্বরকে বোধ হয় তার নিজের অজ্ঞাতসারেই আঘাত করতে লাগল। পরদিন দেখা গেল, সে দীর্ঘ জটা ছেঁটে ফেলেছে, সযত্নে দাড়ি কামিয়েছে। স্নান করে উঠে সে মার কাছে যখন একখানা ধোয়া কাপড় চেয়ে বসল তখন মা আপন মনেই ভাব্‌লেন, ছেলেকে সংসারী দেখে না গেলে স্বর্গে গিয়েও বোধ হয় তাঁর তৃপ্তি হ'ত না।

খেতে ব'সে বীরেশ্বর বলল, 'মা, দু-বেলা রান্না-বান্না

করতে বোধ হয় তোমার কষ্ট হচ্ছে। তা ছাড়া, রান্নাও ত আগের মত আর সুস্বাদ হয় না মা! বীরেশ্বরের ওষ্ঠের এক প্রান্তে একটু হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল।

মা ঈষৎ আহত হলেন। বললেন, 'আর পারিনে বাপু বুড়ো হয়েছি, তোমাকে সংসারী দেখে যেতে পারলে আমি নিষ্কৃতি পাই।'

ক্রমশঃ বীরেশ্বর তার অবহেলিত সংসারধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান হয়ে উঠতে লাগল। কেষ্টর সম্বন্ধে অকস্মাৎ সে অতি সচেতন হ'য়ে উঠ্‌তে লাগল। তাকে এখন থেকে পড়াশুনার দিকে আকৃষ্ট করা দরকার নইলে তার ভবিষ্যতের কি হবে? পুত্রের ভবিষ্যৎ বীরেশ্বরের মনকে বিচলিত ক'রে তুলল। বীরেশ্বর এত বেশী বিচলিত হয়ে উঠল যে, তার মা'র কোনো কাজই আর তার পছন্দ হয় না। কেষ্টকে যদি তার মা কিছু বলেন, অমনি সে রেগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে ওঠে। অবশেষে এক শুভদিনে দীর্ঘশিখা-সমন্বিত এক ঘটকের শুভাগমন হ'ল বাড়িতে। তাঁর যাতায়াত চলতে থাক্‌ল।

একদা শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় বীরেশ্বর বড় আশা ক'রে সংসারী হয়েছিল। আবার এক ফাল্গুনের প্রসন্ন সন্ধ্যায় বীরেশ্বর সংসারে পুনঃ প্রবেশ করল। সংসার যাকে ডাকে, তাকে এমনি ক'রেই ডাকে। সকলেই বলল, আহা বীরেশ্বরের বরাত খুব ভাল, সেবারও একটি লক্ষ্মী মেয়েকে বিয়ে করে এনেছিল, এবারেও বৌটি এসেছে খাসা!

বীরেশ্বরের মা বেশী ধুমধাম করতে দেন নি বিয়েতে। বেশী খরচপত্র করে জাঁকজমক দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। ছেলের যে বরাত, তাতে কোনো কিছুই ভরসা হয় না।

একদল ব্যাগপাইপ ওয়ালা বাইরের বাড়ির সম্মুখে আশ্রয় নিয়ে সারাক্ষণ বাজিয়ে চলেছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এমন সময় চারিদিকে হুলুধ্বনি প'ড়ে গেল। বৌ এসেছে, নতুন বৌ! বীরেশ্বরের মা তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর কোলে রয়েছে কেষ্ট, সে ব্যাগ্‌পাইপের সঙ্গে সঙ্গে কান্নার বাজনা আরম্ভ করেছে। তাকে একটি মেয়ের কোলে ছেড়ে দিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। নতুন বৌ-কে তখন সব এয়োরা বরণ করছে।

বরণ করার সময়ে তিনি স্থির হ'য়ে ছাদ্‌লাতলার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর আর এক দিনের দৃশ্য মনে প'ড়ে গেল। এম্‌নি ক'রেই আর একটি বধূ এসেছিল, যাবার সময় সে বড় দাগা দিয়ে গেছে, তার কথা সহজে ভোলা যায় না। বরণ শেষ হ'য়ে গেছে, গাঁটছড়া-বাঁধা অবস্থায় বীরেশ্বর ও বধূর এখন ঘরে ওঠার কথা। সহসা বীরেশ্বরের মা ব'লে উঠলেন, 'ওগো, তোমরা গ্যাসের আলোটা একবার তুলে ধরো, মা'র মুখখানি আমি একবার দেখ্‌ব।'

গ্যাসের আলো তুলে ধরা হ'ল। বধূর মাথার চেলির গুণ্ঠনের চারিদিকে কল্কাপত্রিকা। সেটিকে একটু সরিয়ে গুণ্ঠন তুলে ধরা হ'ল। বধূ নতনেত্রে শাশুড়ীর পদপ্রান্তে চেয়ে রইল। মা'র বুকটি একবার ধক্‌ ক'রে উঠ্‌ল। ধীরে ধীরে তিনি বধূর চিবুকে হাত দিয়ে বললেন, 'মুখটি একবার তোলো ত মা, তাকাও, তাকাও আমার দিকে, ভয় কি তোমার?'

টানা টানা সুন্দর দুটি চোখ!

ভুরুদুটি যেন কোনো শিল্পীর হাতে রূপ নিয়েছে!

সিঁথির প্রান্ত থেকে চূর্ণ চূর্ণ কালো চুল নেমে এসেছে মাথার দু-পাশ দিয়ে—সেইদিকে একবার চেয়ে বীরেশ্বরের মা'র চোখে জল এল! এমন সাদৃশ্য ত স্বপ্নেও ভাবা যায় না—এ যেন অণিমাই আবার ঘুরে এল! বধূকে কোলে টেনে নিয়ে কান্না তাঁর যেন আর থাম্‌তেই চায় না।

বধূর নাম সুরমা।

প্রকাণ্ড বড় দালানের ভিতর দিয়ে সুরমা হেঁটে যাচ্ছে, হঠাৎ পিছন থেকে কে ডাক্‌ল, 'অণিমা'। সুরমা তাকিয়ে দেখ্‌ল, তার শাশুড়ী। তিনি ঈষৎ হেসে বল্‌লেন, 'ওমা, এমন ভুলও মানুষের হয়! হঠাৎ কেমন যেন মনে হ'ল—কিছু মনে ক'রো না মা!'

সুরমা লজ্জায় আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল! সে যে সুরমা, এ-কথাটি মেনে নিতে এ-বাড়ির লোকদের বোধ হয় কিছু দেরি হবে। সুরমার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হ'ল। কে অণিমা? তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সুরমার কি যোগ আছে?

মৃদুকণ্ঠে সুরমা জানাল যে, সে কিছু মনে করে নি।

কিন্তু তার মন যে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে এরই মধ্যে! যে এখানে ছিল, সে অণিমা! তার সেই শূন্যস্থানে দাঁড়িয়ে সুরমার আজ অবলম্বন কোথায়? ঘরের দেওয়ালে অণিমার আঙুলের দাগ, পুরানো বাক্সের একদিকে অণিমার অজস্র চিঠিপত্র—বীরেশ্বরকে লেখা! শেল্‌ফের এক দিকে চুল-বাঁধবার একটা ফিতেয় কতকগুলি মাথার কাঁটা জড়ানো। অণিমার দেহ-গন্ধ যেন আজও নিঃশেষ হ'য়ে যায় নি—ছোটখাট বহু তুচ্ছ জিনিষে তার আভাস যেন আজও পাওয়া যাচ্ছে। সুরমা ভাব্‌লে, তার স্থান এর মধ্যে কোথায় হবে? নির্জ্জন ঘরের মধ্যে জানালার শিকগুলিতে মাথা রেখে সুরমা ভাব্‌তে লাগ্‌ল, "বৌ ম'রে গেলে, মানুষ কেন আবার বৌ নিয়ে আসে?"

সেই অবস্থায় সুরমা অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বাইরের বারান্দা থেকে শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বৌমা, একা একা চুপ্‌টি ক'রে ঘরের মধ্যে থেক না! রান্নাঘরে এস—আমার কাছে এসে ব'স মা।'

সুরমা তবু সেই অবস্থায় অনেক ক্ষণ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। চৈত্র মাসের শেষ, আমের মুকুলের গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে! ঘরের মধ্যে প্রবলবেগে সেই হাওয়া প্রবেশ ক'রে ছোটখাট হাল্কা জিনিষ এখানে-ওখানে সরিয়ে দিচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সুরমার মনে হ'ল ঘরের মধ্যে কে যেন নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ কে যেন কান্নার সুরে ডেকে উঠ্‌ল, 'মা, ও মা!'

সুরমা সচকিত হ'য়ে পিছন ফিরে দেখে,—কেষ্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু-হাত দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে। ঐ মা-ডাকটির মধ্যে এমন কিছু আছে, যা হঠাৎ অবহেলা করা যায় না। সুরমা তাড়াতাড়ি জানালার কাছ থেকে স'রে এসে কেষ্টকে কোলে তুলে নিল। তার চোখ মুছিয়ে কোলের কাছে টেনে নিয়ে সুরমা বল্‌ল, 'কেষ্ট, আমি ত তোমার মা নই!' কেষ্ট সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রাণপণ শক্তিতে সুরমার মুখের দিকে চেয়ে ব'লে উঠল, 'যাঃ, তুমিই ত মা, মামা-বাড়ি ছিলে তুমি, ঠাক্‌মা ব'লেছে।'

সুরমার মন মুহূর্ত্তে বিদ্রোহ ক'রে বস্‌ল। কেষ্টকে কোল থেকে সরিয়ে দিয়ে বল্‌ল, 'ঠাক্‌মা বলেছে, ঠাক্‌মা কি বলেছে—ঠাক্‌মা বলেছে আমি তোর মা! কখ্‌খনো না, আমি তোর মা নই—'। তারপর কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে সুরমা বল্‌ল, 'ভাল ক'রে দেখো ত কেষ্ট, আমি তোমার মা কি না!'

ক্ষুদ্র শিশু অনাদরের কারণ বুঝ্‌তে পারে না, কিছু ক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে সুরমার দিকে চেয়ে থাকে, তার পর উচ্চ চীৎকারে ঘর ভরিয়ে তোলে।

তখন বাধ্য হ'য়ে সুরমা তাকে কোলে নিয়ে আদর করতে থাকে। বলে, 'না বাবা, লক্ষ্মী মাণিক আমার, চুপ করো, চুপ করো—আমি তোমার মা, তোমার মা, তোমার মা!' কেষ্ট এততেও শান্ত হ'ল ব'লে মনে হ'ল না। অন্ধকারের মধ্যে মায়ের হাত বুলিয়ে সে দেখ্‌ল যে, এখানে কিছু ফাঁকি নেই; তখন সে সন্তুষ্ট হ'য়ে বল্‌ল, 'মা, চাঁদ দেখ্‌ব।'

এই চাঁদ দেখাটি তার অভ্যাস। অণিমার সন্ধ্যার একটি কাজই ছিল কেষ্টকে চাঁদ-দেখানো। অশ্বত্থ আর বাঁশ গাছের মাথার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে চাঁদ উঠ্‌ছে—এই দৃশ্যটি কেষ্টর দেখা চাই।

সুরমা বল্‌ল, 'চল, চাঁদ দেখে আসি।'

কেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে সুরমা ছাদে উঠ্‌ছে, দালানের মধ্য দিয়ে খানিকটা হেঁটে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠ্‌তে হয়। যেতে যেতে সুরমা শুন্‌তে পেল কে যেন বল্‌ছে, বৌদিদির আমাদের হেঁটে যাওয়ার ঢংটাও তাঁরই মত—আহা বেঁচে-বর্ত্তে থাক্। একটি লঘু নিঃশ্বাসের শব্দও সুরমার কানে এল।

না আর ভাল লাগে না বাপু! কেবলই সে, আর সে! মানুষের সঙ্গে মানুষের কখনও কি মিল হয়? এরা কেন তার পিছনে লেগেছে এমন ক'রে? ঝি-চাকর পর্য্যন্ত সেই একই মন্তব্য করছে—মনের বিরক্তি মুখে প্রকাশ হ'য়ে গেল—'ছেলে যেন বাহাদুর! আবার চাঁদ দেখ্‌বার সখ্ কেন হ'ল রে বাপু?'

'ও মা, তা বুঝি জানেন না বৌদিদিমণি। ওর মা যে ওকে রোজ কোলে ক'রে নিয়ে ঐ কাণ্ড করতেন?'—ক্ষান্তমণি প্রদীপের স্বল্পালোকে দালানের এক কোণ থেকে এই মন্তব্যটি ক'রে বসল।

চাঁদ-দেখানোর মধ্যেও সেই অণিমা! আচ্ছা দেখা যাক্,

চাদ-ই ও কত দেখ্‌তে পারে?—মনে মনে এই ভেবে সুরমা কেষ্টকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

অশ্বত্থ আর বাশ বনের জটলার পার থেকে চারি দিক আলো ক'রে চাঁদ উঠ্‌ছে। কয়েকটি ছোট ছোট পাখী সেই সদ্যবিকশিত আলোক-পথটির উদ্দেশে কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। ছাদের উপর থেকে কেষ্টকে চাঁদ দেখাতে হবে। সুরমা আল্‌সের কাছে দাঁড়িয়ে কেষ্টর দিকে চেয়ে বলল, 'ঐ দেখো কেষ্ট, চাঁদ উঠ্‌ছে!'

কেষ্ট তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠ্‌ল, 'আর, তারা!'

'আবার তারাও দেখাতে হবে?'—সুরমা বলে উঠ্‌ল।

'হাঁ, হবে, তারাও দেখতে হবে!'—কেষ্টর চেয়ে এ কণ্ঠস্বর ঢের বেশী গম্ভীর; বীরেশ্বর ছাদে ব'সে বই পড়ছিল, সুরমাকে দেখে উঠে এসেছে।

সুরমার আর তারা-দেখানোর ধৈর্য্য রইল না। তাড়াতাড়ি কেষ্টকে বীরেশ্বরের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে নীচে চ'লে গেল।

বীরেশ্বর ছেলেকে কোলে তুলে নিল। প্রকাণ্ড ছাদের উপর তাকে কোলে নিয়ে বীরেশ্বর ঘুরতে লাগল। একটি দুটি ক'রে অনেকগুলি তারা উঠেছে আকাশে। কেষ্টকে আদর করতে করতে বীরেশ্বর বলল, 'কেষ্ট, কোন্‌ তারাটি তোমার?'

কেষ্ট বিহ্বলভাবে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ঐ যে।'

বীরেশ্বর দেখল বাঁশগাছের পিছনে খুব বড় একটা তারা দপ্‌-দপ্‌ ক'রে জ্বলছে। কেষ্টর দিকে তাকিয়ে চেয়ে সে বলল, 'কেষ্ট ঐটে তোমার?'

কেষ্ট তখন আর একদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'না, ঐ যে।'

বীরেশ্বরের মনে পড়ল ঠিক অমনি ক'রেই অণিমা তার ছেলেকে নিয়ে তারাদের সঙ্গে খেলা করত। বীরেশ্বর কেষ্টকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেষ্ট, তোমার মা কোথায়?'

কেষ্ট তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'মা? মা নীচে আছে।'

বীরেশ্বর বলল, 'না কেষ্ট, মা তোমার ঐখানে আছে।'—ব'লে সে আকাশের দিকে বাঁশগাছের পিছনের সেই বড় তারাটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

কেষ্ট কিছুতেই তা স্বীকার করে না। সে ক্রমাগত ব'লে চলল, 'মা নীচে আছে!'

বীরেশ্বরের মনটা প্রসন্ন হ'ল এই ভেবে যে, ছেলে যদি সুরমাকে এখনই মা ব'লে চিনে নিয়ে থাকে, তা'হলে পরিণামে ভয়ের আর কোনো কারণ থাকে না। অবশেষে সে ছেলের কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রে বলল, 'হ্যা কেষ্ট, মা তোমার নীচেই আছে।'

শূন্য স্থান ক্রমশঃ পূর্ণ হয়ে আসছে। শাশুড়ী, কেষ্ট ঝি-চাকর সকলেই সুরমার মধ্যে অণিমাকে প্রতিক্ষণে দেখতে পাচ্ছে। সেই হাসি, সেই মধুর কথাবলার ভঙ্গী, সেই কর্ম্মশীলতা—আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। সংসার প্রতিদিন প্রতিনিয়ত মানুষের কাছ থেকে যা আশা করে, দাবি করে, সুরমার কাছ থেকে তা পাওয়া যাচ্ছে—আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। যেটা অণিমার প্রাপ্য, সেটা তাই সুরমার পদতলে অনায়াসে সমর্পিত হ'তে থাক্‌ল। অত শান্তির মধ্যেও কিন্তু সুরমার মনের ক্ষোভ মেটে না। অণিমার ব্যক্তিত্বের কাছে তার হ'ল পরাজয়, তার যে একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, সেই রূপটির দিকে কেউ ভুলেও চাইল না। একটা মনগড়া, সান্ত্বনার সাদৃশ্যের মধ্যে সেটা লুপ্ত হ'য়ে যেতে উদ্যত। অণিমাকে তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে এরা অণিমাকে ভুলতে চায়, কিন্তু যেদিন সমস্ত শান্তি আর প্রসন্নতার মধ্যে সুরমার তুচ্ছতম কোনো ত্রুটি ঘটবে সেদিন অণিমা তার সমস্ত বিগত ঔজ্জ্বল্য নিয়ে জেগে উঠবে। হায়, সেদিন সুরমার স্থান কোথায় হবে?

একটা স্থান যদি কোথাও তার থাকৃত,—তার নিজের!

বীরেশ্বরকে সুরমা আজও চিন্‌তে পারে নি—প্রচ্ছন্ন, গম্ভীর; নিজের চারি দিকে সে যেন একটি দুর্ভেদ্য গণ্ডী রচনা করেছে। সুরমার তৃপ্তিহীন ক্ষুব্ধ মন সেই গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে না।

অনেক সময় বীরেশ্বরকে দেখলে সুরমার কেমন যেন ভয় হয়। বীরেশ্বর যেন জীবনের বহু অভিজ্ঞতার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে স্থির হ'য়ে আছে। সেই অবিচলিত প্রশান্তি সুরমাকে যেন আঘাত করে—এই লোকটির জীবনের যে

অধ্যায়টি সুরমার কাছে অজ্ঞাত, সেই অধ্যায়টির সমস্ত খুঁটিনাটি সুরমার জানতে বড় ইচ্ছা করে; কিন্তু বীরেশ্বর তার মনের সমস্ত দ্বার বন্ধ ক'রে সেখানে অতি সতর্ক পাহারা বসিয়েছে। ভুলে যেতেই চায় বীরেশ্বর, ভুলে গিয়ে তার নূতন জীবনের আনন্দ সে পেতে চায়—বীরেশ্বরের এই অভিলাষ সুরমার কাছে অজ্ঞাত। কিন্তু বীরেশ্বরের সমস্ত উৎসাহ এই সতর্ক পাহারায় নিঃশেষিত হয়ে যায়—মনের যে নূতন শাখাটিতে পল্লব মুঞ্জরিত হবে, মুকুল ধরবে, সেদিন বীরেশ্বরের কেমন যেন একটা সঙ্কোচ।

সংসারের এক দিকে এই সঙ্কোচ, সাবধানতা আর গাম্ভীর্য্য আর একদিকে শুধু 'অণিমা' 'অণিমা' রব—সুরমার জীবনে অবিমিশ্র শান্তি আনতে দিল না।

'দেখ, সুরমা, কেষ্টকে একটু-আধটু পড়িও, মা'র কাছ থেকেই ছেলেরা শিক্ষা পায় প্রথম'—বীরেশ্বর একদিন বলল সুরমাকে।

সুরমা তখন অতি যত্নে কাপড়গুলি কুঁচিয়ে রাখছিল। তার মনের সেই মধুর নিষ্ঠার ভাবটি যেন আহত হ'ল বীরেশ্বরের কথায়। সুরমা অতি ধীরভাবে বলল, এত অল্পবয়সেই কি পড়বে, আরও কিছুদিন যাক্, তবে ত!'

'দেখ ঠিক ঐ কথাই অণিমা বল্‌ত, বলত—।' বীরেশ্বরের মুখের কথা অর্দ্ধ পথে থেমে গেল, কারণ, এর আগে দু-এক বার অণিমা-সম্বন্ধে সুরমার অসহিষ্ণুতার পরিচয় সে পেয়েছিল। অণিমার নাম শুনেই সুরমা তাড়াতাড়ি কাপড়-কোঁচানো শেষ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। উভয়ের মধ্যে কেষ্টকে কেন্দ্র ক'রে কথাবার্ত্তা আর তেমন জম্‌তে পেল না।

নদীর স্রোতের মাঝখানে কে যেন বাধ বেঁধে দিয়েছে। উপচীয়মান জলভার বাধের প্রান্তদেশে এসে কলরোল তুলেছে। প্রবাহের বাধাহীনতার ভাবটা যেন আর আসে না কিছুতেই।

মা এসে সম্মুখে বসেছেন, বীরেশ্বর খেতে বসেছে। বীরেশ্বরের খাওয়া প্রায় অর্দ্ধেক হয়েছে, এমন সময় মা বললেন, 'একটা কথা বলি বীরু তোমাকে! বৌমার আমার শরীর শুকিয়ে যে আধখানা হয়ে গেল, অথচ তুমি কোনো ব্যবস্থাই করলে না, না ডাক্তার, না বদ্যি, কিছু!' —তার পর কণ্ঠস্বর ঈষৎ নামিয়ে বললেন, 'অণিমাও ঐ রকম শুকিয়ে যাচ্ছিল, তার পর এক দিন কঠিন রোগ দেখা দিল; পত্নীঘাতী-যোগ আছে তোমার—আমি যা বলি শোন, ভাল ডাক্তার নিয়ে এসে সুরমাকে দেখাও, এই বয়সে আর রোগ-তাপ ভাল লাগে না বাপু।'

বীরেশ্বর কোনো কথা না ব'লে একমনে খেয়ে যেতে লাগল। তার মনে হচ্ছিল সমস্তই ব্যর্থ হবে, সুরমাও একদিন হয়ত এ বাড়ি থেকে বিদায় নেবে। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে সে বলল, 'কি আর হবে ডাক্তার দেখিয়ে মা? সারবার হ'লে ও আপনিই সেরে যাবে, তোমরা অণিমার নামটি ওর কাছে বেশীবার ক'রো না। তাকে ভুলে যাও মা, তাকে ভুলে যাও।'

মা ঈষৎ আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, 'ভোলা কি সহজ কথা পাগল? তবে সুরমাও তার কাছে কোনো অংশে খাটো নয়। তাকে হয়ত ভুলে যেতে পারি, কিন্তু একে ভুলতে পারব না, আমি বলি, তুমি শীগ্‌গীর ডাক্তার আনবার ব্যবস্থা করো।'

বীরেশ্বর শুধু সংক্ষেপে বললে, 'আচ্ছা তাই হবে।' সেদিন সন্ধ্যায় বীরেশ্বর আর বাড়ির বার হ'ল না। নির্জ্জন ঘরের মধ্যে ধূপের একটা চমৎকার গন্ধ আসছে; কেউ কোথাও নেই! এই অবকাশে সে সুরমার একটু সত্যিকার সান্নিধ্য অনুভব করতে চায়।'

সুরমা ঘরে ধূপ দিয়ে জানালার বাইরে চেয়ে আছে। মনটা তার নিরুদ্দেশের দিকে ভেসে যেতে চায়। কোথায় তার ঘর? ঘরের অস্তিত্ব তার কাছে নিরর্থক—আর এক জনের শূন্য আসনের উপর সে প্রাণপণে নিজের অধিকার দাবি করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা, সে আসনের কিছুমাত্র মর্য্যাদা তার কাছে নেই। তার একটা নিজের স্থান কি কোথাও নেই?—আজও তার মনের মধ্যে সেই একই চিন্তা বারে বারে জেগে উঠছে।

এই রকম ভাবছে সুরমা, এমন সময়ে বীরেশ্বর নিঃশব্দে ঘরে এসে দাঁড়াল। ঘরে আলো নেই, শুধু ধূপের একটা মৃদু সৌরভ আসছে এবং জানালা দিয়ে বাইরের সন্ধ্যাকাশের

যেটুকু ম্লান বিষণ্ণ আলো আসছে, তারই সম্মুখে সুরমাকে যেন একটা অস্পষ্ট ছায়ামুর্ত্তির মত মনে হ'ল বীরেশ্বরের।

শান্তকণ্ঠে বীরেশ্বর বলল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কে?—সুরমা কি?'

সুরমা সন্ত্রস্ত হ'ল না, বিচলিত হ'ল না, সুদূর রহস্যলোকবাসিনীর মত নিঃশব্দে যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

বীরেশ্বর ধীরে ধীরে সুরমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে তার মাথাটি বুকের উপর টেনে নিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'কি হয়েছে তোমার সুরমা? আমায় বল্‌বে না কি?'

সুরমা বল্‌ল, 'কই, কিছুই ত হয় নি! আমি ত বেশ ভাল আছি।'

'কোথায় ভাল আছ তুমি? শরীর এত খারাপ হ'ল কি করে?'

সুরমা সংক্ষেপে বল্‌ল, 'না, ও কিছু নয়।'

'স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে তোমার। অথচ তুমি বল্‌ছ, কিছুই হয় নি—আমি ত এ-কথা বিশ্বাস কর্‌তে পারি নে।'

'আমি জানি, আমার কিছু হয় নি, তুমি বিশ্বাস না কর্‌লে কি হবে?'

'না, বলো লক্ষীটি, ডাক্তার ডাকতে হবে—অসুখ যদি সত্যিই কিছু হ'য়ে থাকে, তার ব্যবস্থা ত আমার করা দরকার।'

'ব্যবস্থা কর্‌বে, ব্যবস্থা? কি ব্যবস্থা কর্‌তে পার তুমি? মরে গেলে আবার একটা বিয়ে কর্‌বে, এই ত তোমাদের পেশা?'

সুরমার কণ্ঠস্বর দৃঢ়, সতেজ। বীরেশ্বর সহসা কোনো উত্তর খুঁজে পেল না এ-কথার। যে কথা বল্‌বে ব'লে ভেবেছিল, সব কোথায় গোলমাল হ'য়ে গেল। প্রাণপণ চেষ্টায় সে শুধু বল্‌ল, 'এখানে তোমার ভাল লাগছে না সুরমা, কোথাও চেঞ্জে যা'বে কি?'

সেই নির্জ্জন ঘরের মধ্যে সুরমা খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠল! বল্‌ল, 'চেঞ্জ? কিসের চেঞ্জ? না, সে সব দরকার নেই, এইখানেই বেশ আছি।'

বীরেশ্বর কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে সুরমার কাছ থেকে স'রে দাঁড়াল। তারপর শান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে বল্‌ল, 'তাই হ'বে সুরমা, এইখানেই থাক!' আরও যেন কিছু তার বল্‌বার ছিল, কিন্তু সে কথা আর সে বলতে পারল না—ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বীরেশ্বর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুরমার হাসিটা বীরেশ্বর ভুলতে পারল না, ঐ রকম অদ্ভুত হাসি ছিল অণিমার—মন যখন তার ক্ষুব্ধ হ'ত, তখন সে ঐ ভাবে হেসে উঠত, শাণিত ক্ষুরধারের মত সেই হাসি, বিদ্যুতের কষাঘাতের মত সেই হাসি—মনের এবং ঘরের বিরস নিস্তব্ধতাকে কেটে খণ্ড খণ্ড ক'রে দেয় যেন সেই হাসি। নির্জ্জন ছাদের উপর পায়চারি করতে করতে বীরেশ্বর কিছুতেই অণিমার হাসির সঙ্গে সুরমার হাসির অদ্ভুত সাদৃশ্যের কথা ভুল্‌তে পারে না!

ইজি-চেয়ারটা বারান্দার এক পাশে টেনে নিয়ে চাকরকে চা আনবার কথা ব'লে দিয়ে বীরেশ্বর তন্ময় হ'য়ে ভাবতে লাগল।

'এ-ও কি কখনও সম্ভব হয়?—একজনের সঙ্গে আর এক জনের সাদৃশ্য—এও কি সম্ভব? মানুষের মনগড়া কল্পনার শক্তি কি এত বেশী?'

'কিন্তু মা ওকে অণিমা ব'লে ডাক্‌লেন কেন? আর, অস্পষ্ট সন্ধ্যায় তারার ম্লান আলোয় কেউ কি ক'রে সুরমাকে মা ব'লে চিন্‌তে পারল? কই, আমার ত তেমন মনে হয় নি কখনও! কিন্তু ঐ দিনের সেই হাসি, ওঃ, ভাবতে পারা যায় না একেবারেই!'

টি-পয়ের উপর চাকর কখন চা দিয়ে গেছে, বীরেশ্বরের সে খেয়াল নেই। সম্মুখের নারকেল গাছের একটি মাত্র পাতা অকারণে দুলছে। বীরেশ্বরের মনে পড়ল ঠিক এই রকম সময়টাতে অণিমা এসে তার কাছে বসত। মাথার মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কত গল্প সে করত—কই, এখানে ত সুরমার দেখা পাওয়া যায় না। তবে, আর সাদৃশ্য কি ক'রে সম্ভব?

'না, ওসব একেবারে বাজে কথা! কোথাও ভিত্তি নেই ওর! এই সব পাগলামি চিন্তা যত কম হয়, ততই ভাল! খুব কাজের মধ্যে থাকা দরকার, যাতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ওসব চিন্তা মনে না আসে, সেই রকম ব্যবস্থার দরকার।'—বীরেশ্বর এই রকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে

ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে আবার ছাদে পায়চারি করতে আরম্ভ করল।

সুরমার মনটা আজ ভাল নেই। চেঞ্জে যাওয়ার কথা বলেছিলেন, সে সময়টায় ও-রকম হাসা তার উচিত হয় নি, আর সেই কথাটা বলা একেবারেই ঠিক হয় নি—কেমন যেন হ'ল তা'র সেই সময়ে, নিজেকে সে সামলাতে পারল না। তার যে ঠিক কি হয়েছে, সে বুঝতে পারে না, শুধু শুধু সকলের উপর সে অকারণে বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। দিদির নাম ওঁরা করেন, তাতে এমনি কি হয়েছে;—কিন্তু বড় বেশী বার সেই নাম তাকে শুনতে হয়, তাতেই মনটা খারাপ হয় কি না! আচ্ছা, এবার যদি চেঞ্জে যাওয়ার কথা বলেন, তা হ'লে বেশ ভাল হয়। এক কথাতেই সুরমা রাজি হ'য়ে যাবে।

উঃ, মাথাটা তার বড্ড ধরেছে, একটুও ব'সে থাকা যায় না। এই সময়টায় যদি তিনি আসতেন একবার! বলতেন, তোমাকে ক্ষমা করেছি সুরমা, মনে আমার কোনো গ্লানি নেই, তা হ'লে বেশ হ'ত, না?

এই রকম ভাবতে ভাবতে কখন যে সুরমা তার সুন্দর বিছানার এক পাশে শুয়ে পড়েছে, তার নিজেরই সে খেয়াল নেই। মা এসে কতবার ডাকলেন খাওয়ার জন্য, সুরমার তখন গভীর তন্দ্রা। গায়ে মাথায় হাত দিয়ে মা বললেন, 'না বাপু, কিছুই ভাল বুঝছি নে আমি। বীরেশ্বরকে বললাম এক-শ বার, ডাক্তার নিয়ে এসে দেখাও, আমার কথা কি ও শুনবে?'—এই ব'লে তিনি নীচে চলে গেলেন।

সুরমার বিছানার পাশে তারই মত আর একটি মেয়ে এসে বসল। এক রাশ এলো চুল তার মাথায়, অপরূপ তার চোখের চাহনি!

সুরমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সেই মেয়েটি। 'কি হয়েছে তোমার সুরমা?' সুরমা তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে। কথা কইতে পারে না।

'অসুখ করেছে তোমার? আমি ত ছিলাম এই-খানেই, আমাকে ডাক নি কেন?'

সুরমা স্থির হয়ে তার কথা শোনে। গভীর জ্যোৎস্না রাত্রে যে পাখী ডাকে, সেই পাখীর সুরের মত তার কণ্ঠস্বর! কত অরণ্য, কত পর্ব্বত, কত স্বচ্ছসলিলা নদীর পরপার থেকে সেই সুর যেন ভেসে আসছে। অজ্ঞাত বিস্ময়ে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত অবস্থায় সুরমা সেই সুর শুনতে থাকে, মুখে তার ভাষা জোগায় না!

'আমাকে ডাকলেই ত পারতে সুরম, আমি তোমার অসুখ সারিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার কেষ্ট কোথায়? তাকে ত দেখতে পাচ্ছিনে আমি!'

'কি বললে? এইখানেই আছে, ভাল আছে! অনেক দিন তাকে দেখি নি আমি,—তা তোমার কাছে আছে, ভাল আছে শুনেও সুখ। কিন্তু তোমার অসুখ আমি সারিয়ে দেব সুরমা! তুমি উঠে এস আমার সঙ্গে!'

সুরমা যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়াল। তার সর্ব্ব শরীর তখন একটি লতার মত কাঁপছে।

'কাঁপছ কেন? এস, আমার সঙ্গে—ভয় কি? আমাকে চিনতে পারছ না তুমি, আমি যে অণিমা, দেখ না আমার দিকে চেয়ে! দেখ।'

সুরমা চেয়ে দেখল, গভীর দুটি কালো চোখের দৃষ্টি। সেদিন কেষ্টকে সে যে তারা দেখিয়েছিল, অশ্বত্থগাছের ওপারের সেই বড় তারাটি—সেই তারার দীপ্তি যেন তার দুই চোখে জ্বল জ্বল করছে।

খোলা দরজার বাইরে ছাদ, সেই ছাদের উপর থেকে অণিমা ডাকছে যেন সুরমাকে, 'এস, এস—বাইরে বেরিয়ে এস, দেখ, এখানে কত আলো, ঘরের মধ্যে থেক না।' সুরমা নিঃশব্দে ছাদে এসে দাঁড়াল।

একটি বড় প্রজাপতি যেন তার সম্মুখে ভেসে বেড়াচ্ছে। সাদা, স্বচ্ছ, লঘু এবং সুন্দর প্রজাপতি।

'দেখ, আর বেশী দূর এস না! এই আলসের পাশে চুপ ক'রে শুয়ে থাক। গায়ের কাপড়টা দিয়ে পা দু'টা ঢেকে ফেল। জ্যোৎস্না এসে পড়ুক তোমার শরীরে, হাওয়া এসে লাগুক। সব অসুখ সেরে যাবে।'

সুরমা বড় আলসের পাশে পা দুটি ঢেকে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সে দেখল সেই বড় প্রজাপতিটি ছাদ পেরিয়ে

জামগাছ পেরিয়ে বাঁশবন পার হয়ে অনেক দূরে চলে গেল, অনেক দূর।

তারায় ভরা আকাশ। সুরমা তারা গুনতে লাগল, এক, দুই, তিন—এক, দুই, তিন—তার পরে আর গোণা যায় না। সর্ব্বশরীর ধীরে ধীরে স্থির হয়ে আসছে, ঘুম, গভীর ঘুম সুরমাকে যেন জড়িয়ে ধরেছে, সুরমা নিশ্চেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

বীরেশ্বর সেদিন একটু বেশী রাত্রে বাড়ি এসেছিল। ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখে সুরমা ঘুমুচ্ছে। তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বীরেশ্বরও ঘুমিয়ে পড়ল পাশেই।

রাত্রে খোলা জানালাটা দিয়ে হু-হু ক'রে হাওয়া আসছে ভিতরে। বীরেশ্বর হঠাৎ জেগে উঠে পাশে চেয়ে দেখে সুরমা নেই।

সচকিত হয়ে বীরেশ্বর কয়েক বার ডাকল, 'সুরমা, সুরমা।'

কিন্তু কোনো উত্তর না পেয়ে সে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে বাইরে ছাদে বেরিয়ে এল।

পশ্চিম আকাশের প্রান্তে চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। বাতাসের দোলা লেগে বাঁশের বন দুলে দুলে উঠছে। ছাদের উপর দাঁড়িয়ে বীরেশ্বর ডাকল, 'সুরমা!'

কোন উত্তর নেই!

কোথায় গেল সুরমা? কই, কোনোদিন ত সে রাত্রে এমন সময় বাইরে যায় না। এখনই হয় ত ফিরে আসবে এই মনে ক'রে বীরেশ্বর ছাদের ওপর ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে দেখে পূবদিকের আল্‌সের পাশে কে যেন শুয়ে আছে চাদরমুড়ি দিয়ে।

কাছে গিয়ে দেখে সুরমা অকাতরে ঘুমুচ্ছে। মাথার চুলগুলো ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছে। মুখখানা মৃতের মত পাণ্ডুর, বিবর্ণ।

বীরেশ্বরের বুকের ভিতরটায় তখন যেন নিদারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে। ম্লান চাঁদের আলোয় তার মনে হ'ল, গেল, গেল সব গেল—আবার তাকে সন্ন্যাসী হতে হবে! আবার সেই গয়া, কাশী, হরিদ্বার।

তাড়াতাড়ি সুরমার পাশে ব'সে সে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রাণপণে ডাকতে লাগল, 'সুরমা, সুরমা!'

সুরমা ধীরে ধীরে উঠে বসল। অসম্বৃত বেশ-বাস। দীর্ঘ চুলগুলো মুখের উপর এলোমেলো হ'য়ে পড়েছে; চাহনি অদ্ভুত—যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত!

ধীরে ধীরে তার হাত ধরে বীরেশ্বর তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। আর এক রাত্রির কথা তার মনে পড়ল। অণিমা ঠিক এইরকম ভাবে এক দিন ঐ পুব দিকের আল্‌সের পাশে এসে শুয়েছিল। সর্ব্বাঙ্গে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে অণিমা শুয়েছিল। তার ঠিক এক মাস পরেই তার সেই নিদারুণ অসুখ আরম্ভ হ'ল। বীরেশ্বরের সর্ব্বাঙ্গ থর-থর ক'রে কাঁপছে—এমন অলৌকিক ব্যাপার যে ঘটতে পারে, এ তার স্বপ্নেরও অগোচর। কি জানি এর পরে কি আছে? আশঙ্কায় বীরেশ্বরের মন যেন মূর্চ্ছাহত।

খাটের উপর সুরমাকে বসিয়ে বীরেশ্বর নিজে তার পাশে ব'সে তার একখানি হাত হাতের মধ্যে নিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'সুরমা, হঠাৎ ছাদে গিয়েছিলে কেন?'

তড়িৎস্পৃষ্টের মত সুরমা উঠে দাঁড়াল, খাট থেকে নেমে ঠিক বীরেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'আমি সুরমা নই, আমি অণিমা—ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, দেখ, তুমি!'

বীরেশ্বর নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সুরমার দিকে চেয়ে রইল। মৃতের মত পাণ্ডুর, বিবর্ণ বিশ্রী—কপালের পাশে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরটা তার বেতসলতার মত কম্পমান। আর, সব চেয়ে আশ্চর্য্য, মৃত্যুর দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান পার হয়ে অণিমার দুটি দীপ্ততারা চোখ্ যেন সুরমার দুটি স্নিগ্ধ চোখের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে। দুটি বড় শুকতারা যেন জ্বল্-জ্বল্ ক'রে জ্বলছে।

বীরেশ্বর স্থিরদৃষ্টিতে সুরমার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি অণিমা—তুমি সুরমা নও?'

তেমনি দৃঢ় কণ্ঠে সুরমা উত্তর দিল, 'না, সুরমা মরেছে, আমি অণিমা!'

বীরেশ্বরের ভয় হ'তে লাগল, কিন্তু সে কাউকে জাগাল না। সেই নিদ্রিত পুরীর মধ্যে বীরেশ্বর তন্দ্রাহীন চোখে প্রহর জাগতে লাগল।

সুরমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার মাথায় মুখে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বীরেশ্বর বলতে লাগল, 'অণিমা, কতদিন পরে তুমি এলে! আমার জীবনে যে কোনো সুখ নেই অণিমা! তুমি আস নি ব'লে আমার জীবন শ্রীহীন—দেখ, মনে আমার সুখ নেই অণিমা! কত ঘুরে বেড়ালাম, কত তীর্থ, কত দেশ—কোথাও ত তোমাকে দেখ্‌তে পাই নি! আজ এতদিন পরে তুমি দেখা দিলে! আমি বাঁচলাম অণিমা, তুমি এসেছ, তোমাকে এইবার সব বুঝিয়ে দিয়ে আমি বিদায় নেব। আমি আবার বেরিয়ে পড়ব অণিমা,—তোমার ছেলে, তোমার সংসার তুমি বুঝে নাও, এ সব বোঝা আমার বইবার শক্তি নেই!'—বীরেশ্বরও যেন স্বপ্নাবিষ্ট, কথার তরঙ্গ যেন তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করছে। অশ্রুসজল চোখে বীরেশ্বর তার হৃদয়কে নিঃশেষে উজাড় ক'রে দিতে চায়।

বীরেশ্বরের বাহুবন্ধনের মধ্যে সুরমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, নিস্তব্ধ রাত্রে শিশির ঝ'রে পড়ছে বাইরে ঘাসের উপর।

বীরেশ্বরের কথায় তার স্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে—সে যে সুরমা এই বোধ যখন তার ফিরে এল, তখনও বীরেশ্বর ব'লে চলেছে, 'আমার জীবনে যে কোনো সুখ নেই অণিমা—কোনো সুখ নেই।'

সুরমার সমস্ত মনের মধ্যে একসঙ্গে কান্না যেন উচ্চরবে হাহাকার ক'রে উঠল। তখন তার চোখের দৃষ্টি হয়েছে শান্ত, প্রকৃতির স্বপ্নাবিষ্ট উগ্রতা কেটে গেছে। বীরেশ্বরের দিকে শান্ত ভাবে তাকিয়ে সে বলল, 'আমিই তোমার সেই অণিমা! মনে আমার কোনো ক্ষোভ নেই আর! দিদি আমাকে দেখা দিয়েছেন আজ, তাঁকে আমি স্পষ্ট দেখেছি।'

রাত্রি ভোরের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রতিদিন ভোরে কেষ্ট ঠাক্‌মার বিছানা ছেড়ে দিয়ে তার বাবার দরজায় এসে ধাক্কা দিয়ে তাদের জাগিয়ে তোলে। প্রতিদিনের অভ্যাস মত কেষ্ট একটা কোট গায়ে দিয়ে এসে বাইরের দরোজায় ধাক্কা দিচ্ছে। ডাক্‌ছে, 'মা, ওমা, ওঠ—দরজা খুলে দাও।'

'এই যে, যাই বাবা'—ব'লে সুরমা বিছানা ছেড়ে দিয়ে দরজা খুলতে গেল। এতক্ষণ পরে বীরেশ্বর নিশ্চিন্ত মনে ভাল ক'রে ঘুমবার চেষ্টা করতে লাগল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈরাগ্য

পরলোকগত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী

[৺ পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত]

আজ মহর্ষিদেবের বৈরাগ্যের ও তত্ত্বজ্ঞানের কথা কিছু বলি—বৈরাগ্য না জন্মিলে আত্মানন্দের আস্বাদ পাওয়া যায় না, যেমন দুঃখের জ্ঞান না হইলে সুখের জ্ঞান হয় না, অন্ধকারে না পড়িলে আলোকের শুভ্র রশ্মির রমণীয়তা উপলব্ধ হয় না। সংসারে মহর্ষির বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল, এমন কি যে-ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন সেই ব্রাহ্ম সমাজের লোকেদের অনেকের মধ্যে ধর্ম্মভাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে না পাইয়া তাঁহার বৈরাগ্য তীব্রতর হইল। তিনি সমাজের কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রকাশ হ'ল না যে, কোথায় ছিলাম, এখানে কেন আসিলাম। দুঃখ ও পরিতাপ যে আপনার কাজ আপনি ভুলে রয়েছি। কোথায় ছিলাম, কেন এখানে আসিলাম, আবার কোথায় যাইব, অদ্যাপি আমার নিকট প্রকাশ হইল না। অদ্যাপি এখানে থাকিয়া ব্রহ্মকে যতটা জানা যায় তাহা আমার জানা হইল না। আর আমি লোকের সঙ্গে হো-হো করিয়া বেড়াইব না, বৃথা জল্পনা করিয়া আর সময় নষ্ট করিব না। একাগ্রচিত্ত হইয়া একান্তে তাঁহার জন্য কঠোর তপস্যা করিব। আমি বাড়ি হইতে চলিয়া যাইব, আর ফিরিব না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আমাকে

উপদেশ দিতেছেন,—কস্ত্বং বা কুত আয়াতঃ। তত্ত্বং তদিদং চিন্তয় ভ্রাতঃ—কার তুমি এবং কোথা হইতেই বা আসিয়াছ হে ভ্রাতঃ, এই তত্ত্বটি চিন্তা কর।" এই সময়ে ১৭৭৮ শকের শ্রাবণ মাসে তিনি বরাহনগরে গোপাললাল ঠাকুরের বাগানে থাকিতেন এবং এখানে শ্রীমদ্ভাগবত পড়িতেন। পড়িতে পড়িতে এই শ্লোকটি তাঁহার মনে লাগিয়া গেল, "আমায়া যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতং।" অর্থাৎ হে সুব্রত, জীবদিগের যে-রোগ যে-দ্রব্য দ্বারা জন্মে সে-দ্রব্য কখনও রোগীকে আরাম দিতে পারে না। অতএব তিনি ভাবিলেন যে, "আমি সংসারে থাকিয়াই এই বিপদ-ঘোরে পড়িয়াছি। অতএব এ-সংসার আর আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব এখান হইতে পালাও।" সন্ধ্যার সময়ে তিনি এই বাগানে গঙ্গাতীরে বন্ধুদিগের সঙ্গে বসিতেন। বর্ষার ঘনমেঘ তাঁহার মাথার উপর আকাশ দিয়া উড়িয়া চলিয়া যাইত। সেই নীল নীরদ তখন তাঁহাকে বড়ই সুখ দিত। বড়ই শান্তি দিত। তিনি মনে করিতেন, এই মেঘ কেমন কামচার, কেমন মুক্তভাবে যেখানে-সেখানে ইচ্ছামত চলিয়া যাইতেছে। আমি যদি ইহাদের মত কামচার হইতে পারি, ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে চলিয়া যাইতে পারি তবে আমার বড়ই আনন্দ হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে, "য ইহাত্মান-মনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।" অর্থাৎ, যাহারা এই মর্ত্ত্যে থাকিয়াই পরমাত্মাকে জানে এবং তাঁহাতে যে-সকল সত্য কামনা আছে তাহা জানে তাহারা পরকালে সকল লোকেই কামচার হয়, সকল লোকেই ইচ্ছানুসারে যাতায়াত করিতে পারে। এইটিই তাঁহার বড় লোভনীয় হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, আমি এখান হইতে গিয়া লোকলোকান্তর ঘুরিয়া বেড়াইব। আবার উপনিষদের ভাষ্যে যখন দেখিলেন যে, "ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মনা ত্যাগেনৈকেনা মৃতত্ব মানশুঃ"—না ধনের দ্বারা না পুত্রের দ্বারা না কর্ম্মের দ্বারা কিন্তু কেবল এক ত্যাগের দ্বারাই সেই অমৃত তত্ত্বকে ভোগ করা যায়—তখন এ-পৃথিবী আর তাহার মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সংসারের মোহগ্রন্থি সকলই তাঁহার ভাঙিয়া গেল, তখন তিনি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন কখন আশ্বিন মাস আসিবে—কখন এখান হইতে পলাইবেন, সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইবেন, আর ফিরিবেন না। তিনি হাফেজের ভাষায় নিজেকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোরা জঙ্কেদি বায়ে অধ-সেজনন্দ সফির
নদানমৎ .ক দঁবীদামগাহে দে ওফ্তাদ অস্ত্।

সপ্তম স্বর্গ থেকে তোমার আহ্বান আসিতেছে না জানি এই পৃথিবীর মোহপাশে তোমার কি কাজ আটকাইয়াছে।

তিনি যে আশ্বিন মাসের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহা উপস্থিত হইল তিনি কাশী পর্য্যন্ত একখানি বোট ভাড়া করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। তিনি সংসার ছাড়িয়া তাঁহার প্রিয়তমের উদ্দেশে চলিয়া যাইতেছেন। তাহাতে তাঁহার কি আনন্দ, কি উৎসাহ! তিনি বলিয়াছেন, "১৭৭৮ শকের ১৯শে আশ্বিন বেলা ১১টার সময়ে গঙ্গায় জোয়ার আইল আমার মনেও নব উৎসাহের উৎস ছুটিল। আমি গিয়া নৌকাতে আরোহণ করিলাম। নোঙ্গর উঠিল, বোট চলিল। আমি ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া বলিলাম,

কীস্তঁ এ নসিস্তগানর্ইম অ্যায় বাদ সরত বার্থজ
বাসদ কে বাজ বিনয়ীম দীদারে আসনারা।"

আমরা এখন নৌকাতে বসিয়াছি, হে অনুকূল বায়ু; তুমি ওঠ হয়ত আবার আমাদের সেই দর্শনীয় বন্ধুকে দেখিতে পাইব।"

মহর্ষি মহিমাতে সেই মহিমময়কে দেখিতে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন। মুঙ্গেরে গিয়া প্রথমে তিনি সীতা-কুণ্ড দেখিতে যান। মন্দির হইতে ভোর চারিটার সময় রওনা হইয়া হাঁটিয়া তিন ক্রোশ দূরে, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সীতাকুণ্ডে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানকার সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আবার সেই তিন ক্রোশ হাঁটিয়া ক্ষুধিত তৃষিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া বোটে ফিরিলেন। "পরিশ্রান্তে-ন্দ্রিয়াত্মাহহং তৃট পরীতো বুভুক্ষিতঃ।" তাহার পরে ফতুয়ায় বিস্তীর্ণ গঙ্গার মধ্য দিয়া যাইতেছেন এমন সময় প্রবল ঝড় উঠিল। তাড়াতাড়ি বোট ডাঙার দিকে লইয়া গেল। ডাঙায় ত গেল, কিন্তু প্রতিকূল ঝড় গঙ্গার উচ্চ পাড়ে নৌকাকে আছড়াইতে লাগিল। নৌকা ভাঙে, আর কিছুতে রক্ষা পায় না। মহর্ষি সেই দোলায়মান নৌকা হইতে উঠিয়া পাড়ের উপরে দাঁড়াইলেন। মহর্ষি বলিয়াছেন, সেখানে ভূমিতে যদিও আমার প্রতিষ্ঠা হইল,

কিন্তু ঝড়ে আমি অস্থির, চড়ার বালু যেন ছিটার গুলির মত আমার শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। আমি একটা মোটা চাদর গায়ে দিয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া গঙ্গার সেই ভীষণ প্রমত্ত মূর্ত্তির মধ্যে সেই "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" পরমেশ্বরের মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গের পানসীখানা সকল আহার্য্য সামগ্রী লইয়া গঙ্গার গর্ভে ডুবিয়া গেল। মহর্ষি এই ভাবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে দেখিতে কখন বা ডুলিতে চড়িয়া আম্বালা হইয়া লাহোরে পঁহুছিলেন।

এলাহাবাদে এক রাত্রি গঙ্গার পূর্ব্ব পারে খেয়া-নৌকাতে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। দিল্লীতে সুখানন্দ স্বামীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সুখানন্দ, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য, ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের আদি সমাজের প্রথম আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। সুখানন্দ মহর্ষিকে বলিয়াছিলেন যে, "আমি এবং রামমোহন রায় উভয়েই হরিহরানন্দের শিষ্য।" সুদীর্ঘ কত পথ কত ক্লেশ সহ্য করিয়া মহর্ষি তখন সিমলা পাহাড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সিমলা হইতে যখন তিনি আরও উত্তর হিমাদ্রিতে পর্য্যটনে গিয়াছিলেন তখন একদিনের পথের বৃত্তান্ত তিনি এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—"...পর্ব্বতের গাত্রেতে বিবিধ প্রকারের তৃণলতাদি যে জন্মে তাহারই শোভা চমৎকার। তাহা হইতে যে কত জাতের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ সকল বর্ণেরই পুষ্প যথা-তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্প সকলের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য তাহাদের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান বোধ হইল। যদিও তাহাদের যেমন রূপ তেমন গন্ধ নাই। কিন্তু আর এক প্রকার শ্বেতবর্ণ গোলাপ পুষ্পের গুচ্ছসকল বন হইতে বনান্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া সমুদয় দেশ গন্ধে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। আমার সঙ্গের এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে দিল। এমন সুন্দর পুষ্পিত শাখা আমি আর কখনও দেখি নাই। আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিল মাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। এই বনের মধ্যে কে বা সেই সকল পুষ্পের সুগন্ধ পাইবে, কে বা তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখিবে। তথাপি তিনি কত যত্নে, কত স্নেহে, তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া লতাতে সাজাইয়া বসাইয়াছেন। তাঁহার করুণা ও স্নেহ আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। নাথ! যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরে তোমার এত করুণা তখন আমাদের উপরে না জানি তোমার কতই করুণা। তোমার করুণা আমার মন-প্রাণ হইতে কখনই যাইবে না। তোমার করুণা আমার মন-প্রাণে এমনই বিদ্ধ হইয়া আছে যে যদি আমার প্রাণ যায় তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না।" এই পুষ্পগুচ্ছ হাতে করিয়া এবং হাফেজের উপরি উক্ত ভাবাপন্ন কবিতা পথে সমস্ত দিন উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে পড়িতে তাঁহার করুণা রসে নিমগ্ন হইয়া সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে সায়ংকালে সুঙ্গ্রী নামক পর্ব্বত-চূড়াতে উপস্থিত হইলেন। দিন কখন চলিয়া গেল কিছুই জানিতে পারিলেন না।

যখন মহর্ষি সিমলাতে ছিলেন তখন এক দিন পৌষ মাসের প্রাতঃকালে দেখেন যে রাত্রে দুই-তিন হাত পুরু বরফ পড়িয়া সকল পথঘাট বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেই বরফের পথেই বেড়াইতে বাহির হন। স্ফূর্ত্তি ও আনন্দে তিনি এতদূর এত বেগে চলিয়া গেলেন যে সেই শীতকালে বরফের মধ্যে তিনি গ্রীষ্ম অনুভব করিলেন এবং ভিতরের বস্ত্র ঘামে আর্দ্র হইয়া গেল। তখনকার তাঁহার শরীরের বল ও সুস্থতার এই পরিচয়। দুই প্রহরের সময় তিনি স্নানে বসিয়া বরফমিশ্রিত জল আপনা-আপনি মস্তকে ঢালিয়া দিতেন। নিমেষের জন্য তাঁহার দেহে শোণিত-চলাচল বন্ধ হইয়া যাইত এবং পরক্ষণেই তাহা দ্বিগুণ বেগে চলিয়া তাঁহার শরীরে সমধিক স্ফূর্ত্তি ও তেজের সঞ্চার করিত। পৌষ মাঘ মাসের শীতেও তিনি গৃহে আগুন জ্বালাইতে দিতেন না। শীত শরীরে কতদূর সহ্য হয় তাহা পরীক্ষার জন্য এবং তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি রাত্রে শয়ন-ঘরের দরজা খুলিয়া রাখিতেন, রাত্রির সেই শীতের বাতাস তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। তিনি কম্বল জড়াইয়া বিছানায় বসিয়া সকল ভুলিয়া অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত ব্রহ্মসঙ্গীত ও হাফেজের

কবিতা গান করিতেন—"যোগী জাগে,—ভোগী রোগী কোথায় জাগে। ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দ রস পান প্রীতি ব্রহ্মে যার সেই জাগে।

"ইয়ারব আ সামা বয়াঁক রোজ কাসনাএ কীস্ত্।
জানমা সোখৎ বপোসীদ্ কে জানানএ কীস্ত ॥

"যে-দীপ রাত্রিকে দিন করে সে-দীপ কাহার?...আমার ত তাতে প্রাণ দগ্ধ হ'ল। জিজ্ঞাসা করি তাহা প্রিয় হ'ল কার?"

যে-রাত্রে মহর্ষিদেব ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সহবাস অনুভব করিতেন, মত্ত হইয়া অতি উচ্চৈস্বরে বলিতেন, "আজ আমার এ সভাতে দীপ আনিও না। আজিকার রাত্রিতে সেই পূর্ণচন্দ্র আমার বন্ধু এখানে বিরাজমান।"

তিনি রাত্রি ত এইরূপ আনন্দে কাটাইতেন, দিনের বেলায় গভীর ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, প্রতিদিন দুই প্রহর পর্য্যন্ত তিনি দৃঢ় আসনবদ্ধ হইয়া একাগ্রচিত্তে আত্মার মূল তত্ত্বের আলোচনা ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিতেন। এই সাধনবলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, যাহা মূল তত্ত্ব উহার উন্টা ভাবনা মনেতেও স্থান পাইতে পারে না, তাহা কোন মনুষ্যের ব্যক্তিগত সংস্কার নহে, কালনির্ব্বিশেষে সর্ব্ববাদিসম্মত। মূল তত্ত্বের প্রামাণিকতা আর কাহারও উপরে নির্ভর করে না, তাহা আপনি আপনার প্রমাণ, তাহা স্বতঃসিদ্ধ, যেহেতুক আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত। এই মূল তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া উপনিষদের পূর্ব্ব ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন—দেবস্যৈষ মহিমাতু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্ম চক্রং। পরমদেবেরই এই মহিমা যাহার দ্বারা এই বিশ্বচক্রং ভ্রাম্যমান হইতেছে। কোন কোন পণ্ডিত মোহে মুগ্ধ হইয়া বলেন, প্রকৃতির স্বভাবেতে জড়ের অন্ধশক্তিতে কেহ কেহ বা বলেন কোন কারণ ব্যতীত কেবল কালেরই প্রভাবে এই প্রকাণ্ড জগৎ চলিতেছে, কিন্তু আমি বলি পরমদেবেরই এই মহিমা যাঁহার দ্বারা এই বিশ্বচক্র চলিতেছে।

"স্বভাব মেকে কবয়ো বদন্তি কালন্ত যাস্তে পরিমহ্য মাত্রাঃ
দেবস্তৈয মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্ম চক্রং
যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।

—যাহা কিছু এই সমুদয় জগৎ প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে এবং প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া চলিতেছে।

এই দেবতা বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সর্ব্বদা লোকদিগের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া আছেন। মূলতত্ত্বের এই অকাট্য সত্য-সকল ঋষিদিগের পবিত্র হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।

সম্মুখে সে বৃক্ষ যে আছে তাহাকে দেখিতেছি ও স্পর্শ করিতেছি, কিন্তু সেই বৃক্ষ যে-আকাশে আছে সে-আকাশকে আমরা দেখিতেও পাই না, স্পর্শ করিতেও পাই না। কালে কালে বৃক্ষের শাখা হইতেছে, পল্লব হইতেছে, ফুল হইতেছে ফল হইতেছে, এ সকল দেখিতেছি কিন্তু তাহার সেই মূল কারণকে দেখিতে পাই না, বৃক্ষ যে-জীবনী-শক্তির প্রভাবে মূল হইতে রস আকর্ষণ করিয়া আপনাকে পুষ্ট করিতেছে, যে-শক্তি তাহার প্রতি পত্রের শিরায় শিরায় কার্য্য করিতেছে, সেই শক্তির প্রভাব আমরা দেখিতেছি কিন্তু সেই শক্তিকে আমরা দেখিতে পাই না এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গুঢ়োত্মান প্রকাশতে। এই গূঢ়পরমাত্মা সর্ব্বভূতে ও সর্ব্ব বস্তুতে আছেন। কিন্তু তিনি প্রকাশিত হন না। ইন্দ্রিয়সকল বাহিরের বস্তুই দেখে, অন্তরের বস্তুকে দেখিতে পায় না—ধিক্ ইন্দ্রিয় সকলকে।

"পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণং স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতিনান্তরাত্মন্ কশ্চিদ্বীরঃ [illegible] আবৃত চক্ষুরমৃতত্ব মিচ্ছন্।

স্বয়ম্ভু ঈশ্বর ইন্দ্রিয়দিগকে বহির্মুখ করিয়াছেন, সেই হেতু তাহারা বাহিরেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কোন ধীর অমৃত তত্ত্বকে ইচ্ছা করিয়া, মুদ্রিত চক্ষু হইয়া সর্ব্বান্তর্গত এক আত্মাকে দেখেন। উপনিষদের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া, মনন করিয়া নিধিধ্যাসন করিয়া ঐ ব্রহ্ম-যজ্ঞভূমি হিমালয় হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলেন। চর্ম্মচক্ষুতে নয় জ্ঞানচক্ষুতে। মহর্ষির প্রতি উপনিষেদের আদেশ এই—"ঈশবাস্য মিদং সর্ব্বং।" ঈশ্বরের দ্বারা এই সকল আচ্ছাদন কর। তিনি ঈশ্বরের দ্বারা এই সকল আচ্ছাদন করিলেন। এবং বলিলেন—বেদাহামেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। আমি এই তিমিরাতীত আদিত্য বর্ণ মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—

"বাদ আজি মুর বা এফাক্ দহম্ অজ দিলে খেষ। কে বখুর্শেদ রসীদয়ন গোবার আখের সোদ।"

—এখন অবধি জ্যোতি আমার হৃদয় হইতে পৃথিবীতে ছড়াইব। যেহেতুক আমি সূর্য্যোতে পৌছিয়াছি ও অন্ধকার বিনাশ হইয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই বৈরাগ্য ও সাধনের ফলই ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গতা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

আলোচনা

কলিকাতা ও মফস্বলের কলেজসমূহের তুলনা

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় "কোন্‌টি চান?" নামক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে কলিকাতা ও মফস্বলের কলেজসমূহের তুলনা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে কলিকাতার স্বাস্থ্য ভাল নয়, সেখানকার খরচ বেশী, সেখানে বিলাসিতার প্রাবল্য ভয়ানক, এবং সেখানকার কলেজগুলির শিক্ষাপ্রণালী মফস্বলের কলেজগুলির শিক্ষাপ্রণালী হইতে যে উৎকৃষ্টতর এমন প্রমাণ নাই। কাজেই তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন—এত বেশী ছাত্র কলিকাতায় কেন আসে?

রায় মহাশয়ের উল্লিখিত কারণসমূহে এবং অন্যান্য কারণে (যেমন অত্যধিক ছাত্র বিশিষ্ট কলেজসমূহের অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে জানাশোনা থাকিবার সুযোগের অভাব) কলিকাতার প্রতি ছাত্রদের এতটা আকর্ষণ অবাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই, এবং সরকারী পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা-রিপোর্টেও (১৯২৭-৩২) তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ছাত্রেরা যে মফস্বলে থাকিতে চায় না তাহার কয়েকটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ—"বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বার্ষিক সমাগমে, ভাইস-চেন্সলার স্যর হুসেন সুরওয়ার্দ্দি ব'লেছিলেন, কলিকাতার বাইরের কলেজে গুণী শিক্ষক নাই, কলিকাতার কলেজে আছেন।"

এ-কথা সকল স্থানে সত্য না হইলেও অনেক স্থলে সত্য। মফস্বলের কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ আর্থিক অভাববশতঃ অনেক সময় যোগ্যতম অধ্যাপক নিয়োগ করিতে পারেন না। যোগ্য ব্যক্তিরা অনেক সময় ভাল বেতন পাইলেও মফস্বলে থাকিতে চাহেন না কারণ সেখানে গবেষণা করিবার সুযোগ নাই এবং যথেষ্টসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সাহচর্য্য পাওয়া যায় না। তার পর বর্ত্তমান সময়ে স্থানীয় প্রভাব, দলাদলি, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ প্রভৃতি বিবিধ কারণে অনেক সময় যোগ্যতম প্রার্থীদের দাবি উপেক্ষিত হয়। রায় মহাশয় বলিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের "গুণহীন শিক্ষককে ইঙ্গিতে সরাতে পারেন।" ইহা সব স্থলে সত্য নয়; কারণ অধ্যাপক নিয়োগ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। যদি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবর্ণমেণ্ট সম্মিলিতভাবে এমন একটি নিরপেক্ষ বোর্ড গঠন করেন যাহার অনুমোদন ব্যতীত কোন বেসরকারী কলেজে কোন অধ্যাপক নিয়োগ হইতে পারিবে না, তবে এই সমস্যার অন্ততঃ আংশিক সমাধান হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, মফস্বল শহরের আবহাওয়া সাধারণতঃ জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি ও তাহার তৃপ্তির পক্ষে অনুকূল নয়। "কলিকাতায় কত সাধু পুণ্যাত্মা আছেন, বিদ্বান্ মহাবিদ্বান্ আছেন, উপাধ্যায় মহা-মহা উপাধ্যায় আছেন, কত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়, গ্রন্থশালা পাঠশালা আছে, কত সভা, সম্মেলন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যান চ'লছে! এ সব দেখা ও শোনা যে মস্ত শিক্ষা।" রায় মহাশয়ের মতে এই "যুক্তিটা কিছু সত্য, বেশীর ভাগ কাল্পনিক।" কিন্তু আমার মত যাঁহারা মফস্বল ও কলিকাতা, এই দুই স্থানেই পড়াশোনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে মফস্বলে যথার্থ শিক্ষার্থীর অসুবিধা কত বেশী। সেখানে অধ্যাপক-চক্রের বাহিরে এমন লোক কমই থাকেন যাঁহাদের সংস্পর্শ, উপদেশ ও সাহায্যে মানসিক উন্নতিলাভ সম্ভবপর হয়।

তৃতীয়তঃ, মফস্বল কলেজসমূহে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনমত স্বেচ্ছা-পঠিতব্য সমস্ত বিষয় পড়াইবার বন্দোবস্ত থাকে না, এবং সেখানে ইংরেজী প্রভৃতি কয়েকটি সাধারণ বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে 'অনার্স' নেওয়া যায় না। কোন কোন কলেজে বিজ্ঞান-অধ্যাপনার ব্যবস্থাই নাই; আবার যেখানে আছে সেখানেও প্রায়ই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নী-বিদ্যা ব্যতীত অন্য বিষয় পড়া যায় না, এবং যন্ত্রাদির বিশেষ অভাব থাকে। এই কারণে বহু ছাত্র বাধ্য হইয়া কলিকাতায় যায়।

উপসংহারে বলা যায় যে মফস্বলের উৎকৃষ্ট কলেজগুলিতে ছাত্রের অভাব হয় না, এবং সেখানে রায় মহাশয়ের আদর্শ অনুসারে পাঁচ শতের বেশী ছাত্র না-লইবার ব্যবস্থা হইলে বহু প্রবেশার্থীকে নিরাশ হইতে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলিতে পারি যে, ১৯৩২ সনে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে এক হাজারের বেশী, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ৬৫০ (১৯২৭ সনে ৯৯৩), দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি-তে ৫২০ (১৯২৬ সনে ৭৭৪), বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ৫১০, রঙ্গপুর কারমাইকেল কলেজে ৫৫০, এবং ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ৭১৩ জন ছাত্র ছিল। সরকারী কলেজগুলির মধ্যে হুগলীতে ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে, কৃষ্ণনগরে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ক্রয় করিলে এবং কয়েকটি নূতন বিষয়ে অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিলে আরও ছাত্র পাওয়া যাইত, চট্টগ্রামের স্থানাভাব সত্ত্বেও ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে এখন কম-সংখ্যক ছাত্র ভর্ত্তি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং রাজসাহীতে ১৯৩২ সনে ৬১৭ জন ছাত্র ছিল (১৯২৭-৩২ সনের পঞ্চমবার্ষিক শিক্ষা-রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।) মফস্বল কলেজসমূহের মধ্যে নড়াইল (ছাত্রসংখ্যা ১০৩), হেতমপুর (১০৫), উত্তরপাড়া (৫৩) এবং কাঁথী (৪৬) প্রভৃতি যে-সব স্থানে ছাত্র অত্যন্ত কম, সেখানে পড়াশোনার ব্যবস্থাও অত্যন্ত খারাপ।

"বাংলা দেশে ব্যায়াম-চর্চ্চা"

শ্রীসমরেন্দ্রকিশোর বসু

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতা মহাশয় বাংলা দেশে ব্যায়াম চর্চ্চা নামে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, উহার একস্থানে (২৭৪ পৃষ্ঠা, ব্যায়াম করিবার নিয়ম) আছে, "যেদিন যে ব্যায়াম করিতে ভাল লাগে সেইদিন সেইরূপ ব্যায়াম করা উচিত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যায়াম করিলে লাভ না-হইয়া ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী।" একথা সত্য বলিয়া আমার মনে হয় না। এ-সম্বন্ধে আমার যাহা অভিমত, সংক্ষেপে তাহা এই :—

প্রত্যেকের শরীরের বাঁধুনী, শক্তি ও সহনশীলতা একরূপ নয়;—বিশেষতঃ কোন্ ব্যায়ামে কিরূপ ফল লাভ হয়, বলিতে গেলে বাংলা দেশের শতকরা ৯৯ জনেরই সেই জ্ঞান নাই। সেই অবস্থায় নিজ অভিরুচি-মত ব্যায়াম করিলে লাভ না-হইয়া গুরুতর ক্ষতিও হইতে পারে। ধরা গেল, কোনো এক ক্ষীণকায় ব্যক্তির ফুস্‌ফুসের জোর যেন খুবই কম; অথচ, সে যদি কোন উপযুক্ত গুরুর উপদেশ ছাড়া কেবল মাত্র নিজে খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া বড় বড় বারবেল লইয়া কঠিন কঠিন ব্যায়াম করিতে সুরু করে, তবে তাহার যে অকাল মৃত্যু ঘটিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? রোগী যেমন কুপথ্য গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হয়, তেমনি দুর্ব্বল লোকেরও অনেক সময় কঠিন কসরৎ

করিবার ইচ্ছা হয় ; সেইজন্য কি তাহাকে সেই কসরৎই করিবার অনুমতি দেওয়া উচিত ?

প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই একটা শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা থাকা চাই। তাহা না হইলে সবই বৃথা হইবার কথা। একই ব্যক্তি যদি কুস্তি, ভারোত্তোলন, সন্তরণ, নৃত্য প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যায়াম করে তবে সে কোনদিনই উহার কোন একটি বিষয়েও নৈপুণ্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে না—তবে, তাহার সহনশীলতা সাধারণতঃ অন্য সকলের চেয়ে বেশী হইবে। যাহারা কোন একটা বিশেষ বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে শুধু সেই বিষয়টি শিক্ষা না দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শিক্ষককে ইহাও পরীক্ষা করিতে হইবে যে, কোন্ বিষয় শিক্ষা দিলে তাঁহার ছাত্রের প্রকৃত উন্নতি হইবে।

রাজেনবাবু বলিয়াছেন যে, খাদ্যের পরিমাণ ঠিক রাখিয়া ও ব্যায়ামের মাত্রা কমাইয়া এবং বিশ্রামের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেই কুস্তিগীরগণ ক্রমশঃ মোটা হইয়া পড়ে। ইহা আংশিক সত্য হইলেও প্রকৃত কারণ নয়। পঞ্জাবী মুসলমান পালোয়ানগণ বৃদ্ধ বয়সেও যেরূপ ব্যায়াম করিয়া থাকে, তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয় এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, শ্রেষ্ঠ মল্লরা যৌবনেও স্থূলকায় ছিলেন। আসল কথা এই, মাটির মধ্যে এমন একটা রস আছে, যাহার সংস্পর্শে শরীর ধীরে ধীরে মোটা হইয়া উঠে এবং কুস্তিগীরগণ কুস্তি লড়িবার সময় মুখ দিয়া খুব জোর শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে ও ছাড়ে বলিয়াও উহা তাহাদের শরীর ভারী করিবার সহায়তা করে। যাহারা খুব বড় পালোয়ান, তাহারা উপরি উক্ত অবস্থায় অনেক ক্ষণ কুস্তি লড়ে বলিয়াই শীঘ্র শীঘ্র স্থূলকায় হইয়া পড়ে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বড়-গামাকে জানি, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন তিনি ব্যায়াম অনেকটা কমই করেন, তবু তাঁহার শরীরের এখনকার মাপ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কম।

গোঁদজাতি

শ্রীপ্রমথনাথ পাল

অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গোঁদজাতি সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন। গোঁদজাতি সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে কিনা জানি না। তবে তিনি প্রবন্ধের মধ্যে কতকগুলি নজীরের উল্লেখ করিয়াছেন। আমি গত ষোল বৎসর মধ্যপ্রদেশের পল্লীতে বাস করিতেছি এবং গোঁদবহুল তিনটি জেলার বিভিন্ন পল্লীগ্রামে বাস করিয়াছি এবং করিতেছি। গোঁদজাতি সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত। প্রকৃত উচ্চারণ গোঁদ, গোঁড় নয়।

গোঁদরা দ্রাবিড়ী বা অনার্য্য ভাষায় কথা বলে এবং তাহারা সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণীর উপত্যকাভূমিতে অনাদিকাল হইতে বসবাস করিতেছে। তাহারা মধ্যপ্রদেশের আদিম অধিবাসী। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "সম্ভবতঃ তাহারা দাক্ষিণাত্য হইতে মধ্যপ্রদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে" —এই উক্তি অনুমান বা প্রক্ষেপ। দাক্ষিণাত্যের কোন আদিম অধিবাসীদের সহিত ইহাদের কোন প্রকার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সাদৃশ্য নাই। ইহারা অত্যন্ত ঘরকুণো ও রক্ষণশীল। ইহারা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—রাজ-গোঁদ ও সাধারণ গোঁদ। রাজ গোঁদদের পূর্ব্বপুরুষগণ আদিমকাল হইতে মধ্যপ্রদেশ শাসন করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আর্য্যরাজগণের সংঘর্ষে তাহারা পরাজিত, নিহত এবং ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখনও রাজ-গোঁদদের বংশধরগণ করদমিত্র রাজারূপে মধ্যপ্রদেশে বাস্তার, রায়গড়, সারণগড় প্রভৃতি রাজ্য শাসন করিতেছে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত গোঁদজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনীর ঐতিহাসিক কোন মূল্য নাই।

গোঁদদের সভ্যতা, সামাজিকতা ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে পাঠকগণকে কিছু জানাইতেছি। মধ্যপ্রদেশ পৌরাণিক যুগ বা প্রাচীনকাল হইতে ছোট ছোট বহু ক্ষুদ্র গোঁদ-রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সকল রাজগণেরই নিজ রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেল্লা ও সৈন্য-সামন্ত ছিল এবং তাঁহারা আপন আপন স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেন। এখনও বনে জঙ্গলে অনেক স্থানে প্রাচীন যুগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেল্লা দেখা যায়। কোন গোঁদরাজবংশই নিজেকে রাজচক্রবর্ত্তী আখ্যা দেন নাই বা বড় রকমের দিগ্বিজয় করেন নাই। গোঁদ-রাজগণ রাম-রাজত্বের সময়ও নিজেদের আবাসভূমিতে স্বাধীন ভাবে বাস করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশ সাধারণতঃ পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও জমিও অনুর্ব্বর, সেই-জন্য ভারতের একচ্ছত্র রাজাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

গোঁদরা স্বভাবতঃই শান্তিপ্রিয় ও রক্ষণশীল। সমাজে স্ত্রী-পুরুষের দাবি সমান, বরং সমাজে নারীর মর্য্যাদা উপরে। কন্যার মাতাপিতা বা অভিভাবকদের নিকট বরপক্ষের লোকেরা বিবাহের প্রস্তাব করিয়া থাকে। কন্যাপক্ষের অভিভাবকদের বিবাহ-প্রস্তাব মর্য্যাদাহানিকর। বনিয়াদী গোঁদ-বংশের কন্যারা অনেক স্থানে চিরকুমারী থাকে এবং ইহা সমাজে আদৌ নিন্দনীয় নয়। সমাজে নারীর কোনরূপ পর্দা নাই। সামাজিক ভোজে নর-নারী একসঙ্গে বিভিন্ন পংক্তিতে ভোজন করে। আহার্য্য-দ্রব্যের কোন বিধিনিষেধ নাই। মদ্য, শূকর-মাংস, গো-মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করে। তাহারা নিজেদের দেবদেবী, ভূতপ্রেত ছাড়াও হিন্দুদের মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি দেব-দেবীদের মান্য বা পূজা করে। চুরি, জুয়াচুরি, বাহ্যাড়ম্বর ও অমিত-ব্যয়িতা গোঁদ-জাতির স্বভাবে নাই। তবে যে-সমস্ত তরুণ গোঁদ শহরের বা কারখানার আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহারাও অন্যান্য ভারতীয়দের মত আধুনিক সভ্যতার আবর্জ্জনা মাখিতেছে। গোঁদদের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম বা স্বভাব—সহগুণ, ধৈর্য্য, শান্তিপ্রিয়তা ও মিতব্যয়িতা।

যদি পৃথিবীতে কোন জাতির প্রকৃত মনুষ্যত্ব থাকে, তাহা গোঁদ-জাতির আছে। তাহাদের স্বাস্থ্য অটুট, রোগে তাহারা জড়ীবুটীর চিকিৎসায় বিনা-খরচে আরোগ্যলাভ করে। তাহাদের আহার ও জীবনযাত্রা-প্রণালী অত্যন্ত সাদাসিধে। তাহাদের পেশীতে বাঙালীর চেয়ে দশ গুণ বল। স্ত্রী-পুরুষে সমানভাবে পরিশ্রমে অভ্যস্ত বলিয়া গোঁদ-নারী অবলা নয়, সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী। স্বামীর মৃত্যুতে বা পুরুষের দুর্দ্দিনে গোঁদ নারী নিজ নিজ পরিবার প্রতিপালনে সমর্থ। গোঁদদের আত্মসম্মানজ্ঞান সভ্য-নামধারী বাবুভায়াদের চেয়ে অনেক বেশী। ভারতবর্ষীয় রাজকর্ম্মচারিগণ কেবলমাত্র গোঁদদের উপর অযথা অত্যাচার করেন, এই উক্তি অমূলক। রাজভৃত্যগণ চিরকালই প্রজাগণের নিকট অন্যায় আবদার ও প্রতিপত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছে।



গ্রহমুক্তি—শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেন। প্রকাশক—শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ সেন। ২৪ নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট। দাম বারো আনা।

নাটক। শুধু টানা টানা বক্তৃতা এবং ভাবের উচ্ছ্বাস। আখ্যানভাগও নিতান্ত স্থূল, মোটেই কৌতূহল জাগে না। ভাষাও স্থানে স্থানে নিতান্ত পণ্ডিতী রকমের হইয়া পড়িয়াছে।

নাটকের মর‍্যাল টোন বা নৈতিক সুরটি প্রশংসনীয় ; কিন্তু লেখক মনে রাখিবেন শুধু ঐটুকু দিয়াই আজকাল দর্শকের মন ভরান যায় না।

বহিরাবরণ মামুলী।

কৃপণের দ্বিতীয় পক্ষ—ডাঃ অজিতকুমার দে, প্রকাশক—ভারত লাইব্রেরী, ২০৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। দাম তিন আনা।

ছোট একটি কৌতুক-নাট্য। এক বিয়ে-পাগলা কৃপণের এক চানাচুরওয়ালার সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল—কতকগুলি ছেলেছোকরার ষড়যন্ত্রে মাঝে মাঝে প্রকৃত হাস্যরসের ছিটেফোঁটা আছে, তবে বেশীর ভাগই মামুলী।

মানবের শত্রু নারী—শ্রীসুবোধ বসু। প্রকাশক—পি. সি. সরকার এণ্ড কোং, ২ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম ১।০

নারীকে, প্রেমকে অস্বীকার করিতে করিতেও তাহাদের পানে অগ্রসর হইতে হয়, এমনই তাহাদের অনতিক্রম্য মোহ—লেখক এই ভাবটি বইখানিতে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। গল্পাংশটা বৈচিত্র্যহীন হওয়ায় এবং ভাষার মধ্যে অতিরিক্ত শিথিলতা আর ন্যাকামি থাকায় বইখানি জমে নাই।

ছাপা, বাঁধাই, কাগজ ভাল।

বিবর্ত্তন—শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—পি. সি. সরকার এণ্ড কোং। দাম এক টাকা।

সাতটি ছোট গল্প লইয়া বইখানি ১১২ পাতায় শেষ হইয়াছে। গল্পগুলি সব দিক দিয়াই বেশ ভাল লাগিল। ভাষার ঋজু গতি এবং গাম্ভীর্য্য মনে বেশ তৃপ্তি আনে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে লেখক কি ভাষা. কি ভাব উভয় বিষয়েই বেশ মিতব্যয়ী।

প্লটগুলিও বেশ স্বাভাবিক অথচ নিতান্ত গতানুগতিক নয়। মোটের উপর বইখানি বেশ ভালই হইয়াছে। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ ভাল।

অনুচ্চারিত—শ্রীঅবনীনাথ রায়। প্রকাশক—পি. সি. সরকার এণ্ড কোং। দাম এক টাকা।

লেখক জীবনের ছোটখাট ঘটনা এবং কয়েকটা কিম্বদন্তীকে আশ্রয় করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহার সবগুলি টেক্‌নিক্-দুরস্ত গল্প না হইলেও সুখপাঠ্য হইয়াছে—কেননা বেশ দরদ দিয়া লেখা। প্রথম গল্প 'অনুচ্চারিত' পাকা হাতের পরিচয় দেয়।

ছাপা, বাঁধাই সুরুচিসঙ্গত।

দুই নারী—শ্রীআশালতা দেবী। কাত্যায়িনী বুক ষ্টল, ২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাত সিকা।

বেশ সরেশ একখানি ইণ্টেলেকচুয়াল নভেল অর্থাৎ সেই জাতীয় উপন্যাস যা বুদ্ধিকে কৌতূহলী করিয়া তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে পরিতৃপ্ত করিতে প্রয়াস পায়। বিষয়, সেই ইটারন্যাল্ ট্র্যাঙ্গ্‌ল্ বা ত্রয়াস্ত্রিকা প্রেমের সমস্যা ; কিন্তু প্রতিভার আলোয় যে ওটাকে নিতুই নূতনভাবে দেখান যায়, এই বইখানি তাহার প্রমাণ। অবশ্য লেখিকা যাহা বলিয়াছেন তাহার সবটুকুতে সায় দেওয়া যায় না—তাহা হইলেও তাঁহার বলিবার ভঙ্গি মোহন এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করিবারও সাহস ও ক্ষমতা আছে। এই বইয়ে কাহারও প্রেমই একনিষ্ঠ নয়—বুদ্ধি দিয়া ক্রমাগতই তাহাকে যাচাই করিতে গেলে এবং স্বাধীনতার সঙ্গে পদে পদে তাহার সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে সে প্রেম সম্ভব নয়। তবু এই যে নিত্য-পাওয়া আর নিত্য-হারাণোর প্রেম, যা আদর্শ না হইলেও এই ধূলিমলিন পৃথিবীর নিত্যবস্তু—তাহাই কি কম মধুর ? বইখানিতে এরই মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এর ট্র্যাজেডি, আধুনিক আধুনিকার অতি সূক্ষ্মানুভূতির ট্র্যাজেডি—এই অনুভূতি বিশ্লেষণে লেখিকা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে শিক্ষিত অভিজাত সমাজের ছবিটি সুন্দর ফুটিয়াছে।

ছাপা, বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

অনন্যা—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস। ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲

একটি প্রতিভাসম্পন্না আধুনিকার জীবন সমাজের তথা দরিদ্র সংসারের পাওনা মিটাইতে মিটাইতে কেমন করিয়া নিষ্ফল হইয়া গেল—লেখক উপন্যাসখানিতে তাহাই দেখাইয়াছেন। চরিত্রগুলির অধিকাংশই এবং ঘটনাগুলিও বেশীর ভাগ টাইপ্ হিসাবে লওয়া, সুতরাং নালিসটা তাঁহার ব্যাপকই। সমাজ যে এখনও নারীপ্রতিভা-বিকাশের অনুকূল হয় নাই তাহা সত্যই এবং তাহার চৈতন্যোদয়ের জন্য এরকম লেখার দরকারও যথেষ্ট। তবে যে-পিতা শত বাধা ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া কন্যার প্রতিভা বিকশিত করিয়া তুলিল তাহাকে লেখক শেষ পর্য্যন্ত অমন কদর্য্যভাবে স্বার্থপর করিয়া তুলিলেন কেন বুঝা গেল না। পিতার চরিত্রের এই অসামঞ্জস্যে বইয়ের এক দিকটা বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

খুব বেশী রকম এ্যাবস্ট্র্যাক্ট (abstract) করিতে গিয়া ভাষা মাঝে মাঝে এই রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে—"বীথি নিঃশব্দে একটা আর্ত্তনাদ করে উঠল," "তার শরীরে ছিল না এতটুকু শারীরিকতা," "কথা কি মানুষের অনেকগুলির মধ্যে আরেকটা ব্যর্থ আবিষ্কার নয় যা তার অতীত সেই ইসারাকে শুধু কথা দিয়ে বোঝাতে গিয়ে সেই অকথনীয়তা ফেলে হারিয়ে ?"

—শেষের এই গোলকধাঁধায় পড়িয়া কি মনে হয় না যে ও-ছাই-কথার আবিষ্কার না হইলেই ছিল ভাল ?

বাঁধাই, কাগজ, ছাপা ভাল।

কষ্টিপাথর—জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত। আর, পি, মিত্র এণ্ড সন্স, ৬৩ বীডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

তিন অঙ্কের একটি সামাজিক নাটক। বইখানি বেশ ভাল লাগিল। সব চরিত্রগুলি বেশ স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোথাও কষ্ট-কল্পনা পীড়া দেয় না। সমস্ত নাটকটির পটভূমিকা দেশচর্য্যা, তাহারই মধ্যে তিনটি হৃদয়ের প্রেমের কাহিনীটি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখকের সূক্ষ্ম অনুভূতিও আছে এবং প্রকাশের ভাষাও সাবলীল।

শেষের দিকে এক সন্ন্যাসীর অবতারণা করা হইয়াছে; এমন কিছু দোষের কথা নয়, তবে সন্ন্যাসী আসিলেই যেন মনে হয় সব দিকটা সামলাইয়া লইবেন; ইহাতে পাঠকের স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা নষ্ট হয়। এ-যুগে ওঁদের ছুটি দেওয়াই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বৈষ্ণবপদাবলী (চয়ন)—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত; ১৯৩০। মূল্যের উল্লেখ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদিগের জন্য সংকলিত আলোচ্য পদসংগ্রহগ্রন্থটিতে ভূমিকাংশ।/০ পৃষ্ঠা হইতে ১॥০ পৃষ্ঠা এবং পাদটীকা সমেত মূলাংশ ১-১৫০ পৃষ্ঠা। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ, প্রার্থনা, বাল্যলীলা ও কালীয়দমন, পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মিলন, বংশীশিক্ষা নৃত্য ও মান, আত্মনিবেদন, মাথুর, মিলন ও ভাবসম্মিলন—এই কয়টি শীর্ষকে মূলাংশে সর্ব্বসমেত ১২০টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি দাশরথি রায়ের গান এবং একটি কৃষ্ণকমল গোস্বামীর তুক বা আখরসমষ্টিও আছে। পুস্তকটির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই উত্তম।

শ্রীসুকুমার সেন

বার্ষিক শিশুসাথী—৯ম বর্ষ ১৩৪১ সাল। সম্পাদক শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা ও ঢাকা মূল্য দেড় টাকা।

বার্ষিক শিশুসাথী, শিশুসাথী নামক মাসিকপত্রের বার্ষিক সংস্করণ। বইখানি প্রকাণ্ড। সুন্দর কাগজ, ছাপা অতি পরিপাটি, ছবিও বিস্তর। ছেলেমেয়েদের শিক্ষনীয় বিষয় এতে অনেক আছে। গল্প ও কবিতাগুলি থেকে তারা আমোদও পাবে প্রচুর। কিন্তু বইখানি নামে শিশুসাথী হলেও, শিশু বলতে যাদের বোঝায়, ঠিক তাদের উপযোগী হয়েছে ব'লে মনে হয় না। অনেক প্রবন্ধ ও গল্পের ভাব ও ভাষা দুর্ব্বোধ্য; কোন-কোন স্থলে প্রাদেশিকতা-দোষে দুষ্ট। শিশুদের কি বিষয় দিতে হবে, আর কি ভাবেই বা তা দিতে হবে, এই এক মস্ত সমস্যা রয়েছে লেখকদের সামনে। এই বইখানির বহুস্থলে তার সমাধানের অভাব রয়েছে ব'লে মনে হয়।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

বৈজ্ঞানিক ভোজ—ডক্টর শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র প্রণীত, ২৭।১ কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥০

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য গল্পের বই; ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধ চারিটি গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে,—বৈজ্ঞানিক বরযাত্রী-সম্বর্দ্ধনা, অচেনা সই, ভাবী রায়-বাহাদুর ও ফুলের পরী। শেষোক্ত গল্পটি একটি জাপানী রূপকথার ছায়া অবলম্বনে লিখিত। গল্পগুলি বেশ সহজ সরল ভাষায় এবং বালক-বালিকাদের মনোরঞ্জনের উপযোগী করিয়া লিখিত, উহাতে হাস্যরস ও বৈচিত্র্য উভয়ই আছে। ইহাদিগের মধ্যে "বৈজ্ঞানিক ভোজ" গল্পটি একেবারে মৌলিক এবং বিশেষ আমোদপ্রদ। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই বেশ সুন্দর।

মহামানুষ মুহ্‌সিন—মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রণীত। ২৩ ক্রেমেটোরিয়াম ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বুলবুল পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

হাজী মুহম্মদ মুহ্‌সিন বাংলা দেশের এক জন বরেণ্য সন্তান, শ্রেষ্ঠ ত্যাগী ও দানবীর; তাঁহার ত্যাগ, সন্ন্যাস ও দানশীলতা, তাঁহার পরদুঃখকাতর নিরহঙ্কার চিত্ত, ধার্ম্মিকতার সহিত অপূর্ব্ব উদার দৃষ্টি, তাঁহার বিদ্যা, জ্ঞান ও ভূয়োদর্শন—সকলই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং হাজী মুহম্মদ মুহ্‌সিনের একটি বিশদ জীবনীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল, ওয়াজেদ আলী সাহেব সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। লেখকের ঘটনাসন্নিবেশ ও বর্ণনার ক্ষমতা অতি সুন্দর, ভাষা সরল ও সতেজ, সমস্ত পুস্তকখানি পাঠ করিতে একটুও ক্লেশ হয় না। ওয়াজেদ আলী সাহেব বাংলা ভাষার এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, এই গ্রন্থ রচনায়ও তাঁহার সেই যশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান বালক ও যুবকগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পুস্তকখানার ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই বেশ সুন্দর।

ছুতোরের ছেলে রাজা—শ্রীদীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত এবং গ্রন্থকার কর্ত্তৃক কাশীধাম হইতে প্রকাশিত। মূল্য নয় আনা।

ইহা আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনচরিত। এই পুস্তকখানি W. M. Thayer প্রণীত "Abraham Lincoln And How He Became President" শীর্ষক গ্রন্থের সাহায্যে লিখিত। কিরূপে দুঃখদারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াও নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে মানুষ বড় হইতে পারে লিঙ্কনের জীবনী তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বাংলা ভাষায় তাঁহার জীবনী প্রকাশ করিয়া লেখক মহাশয় বাংলা দেশের বালক ও যুবকদিগের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। পুস্তকখানি বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। ভাষা সরল, বর্ণনাবাহুল্য নাই। জীবনের মূল ঘটনাগুলি সহজভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। কাগজ ও ছাপা সুন্দর।

মায়াপ্রদীপ—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী। পি, সি, সরকার এণ্ড কোং, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য গল্পপুস্তক; ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধ পাঁচটি গল্প আছে—তপনকুমারের একরাত্রি, পাগলা জগাইয়ের কাহিনী, একাদশী দাদা, গোল সিঁড়ি ও ফকিরের ভিটে। গল্পগুলি বালক ও কিশোরদের জন্য লিখিত হইলেও দুই একটি গল্প প্রবীণদেরও ভাল লাগিবে, বিশেষতঃ গোল সিঁড়ি ও ফকিরের ভিটে এই দুইট গল্পে বেশ নূতনত্ব আছে। গল্পগুলি সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত এবং বালক-বালিকাদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। শুধু একাদশী দাদা গল্পটি মাঝে মাঝে অবান্তর কথার অবতারণায় তেমন জমিতে পারে নাই। মোটের উপর পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। কাগজ, বাঁধাই, ছাপা সুন্দর।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

(১) হায়দার আলী, (২) টিপু সুলতান—শ্রীআবদুল কাদের। প্রকাশক—ইতিকথা বুকডিপো, ৩৮ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। প্রত্যেকখানির মূল্য ॥৵০।

আমরা ভারতবাসী আত্মবিস্মৃত জাতি। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার অবধি নাই।···যে সকল পুণ্যশ্লোক বীরের কাহিনী আমাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের কথা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া থাকি। সুতরাং যখন কোন লেখক সে কথা স্মরণ করাইয়া দেন তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হন। মৌলভি আব্দুল কাদের সাহেব এই গ্রন্থ দুইটিতে সেই চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরেজের শক্তিবিস্তারের প্রথম আমলে হায়দার আলী ও টিপু সুলতান যে অপূর্ব্ব বীরত্বসহকারে সেই শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সাময়িক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই কাহিনী অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থকার এই দুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থ-দুইটি ইতিহাস-সম্মত প্রণালীতে লিখিত; তাহাদের ভাষা প্রাঞ্জল ও সুন্দর, বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অধুনা যে এক প্রকারের উর্দ্দু-মিশ্রিত বাংলা বাংলার মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে, গ্রন্থকার সেরূপ ভাষা ব্যবহার না করিয়া স্বাধীন বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। জাতিধর্ম্মভেদে আমাদের মাতৃভাষার রূপভেদ না করাই উচিত। তেমনি ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসেরও জাতিধর্ম্ম-ভেদ না করাই উচিত। ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সকল বীরই আমাদের পূজার্হ। হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের এই কাহিনী দুইটি হিন্দু মুসলমান সকল পাঠকেরই পক্ষে উপভোগ্য হইয়াছে, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

জপজী—গুরু নানক কৃত ও কিরণচাঁদ দরবেশ কর্ত্তৃক অনূদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক শ্রীসুবোধগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আউধ সরবী, বারাণসী। মূল্য আট আনা।

গুরু নানক কৃত শ্রীজপজী-সাহেব শিখগণের অতি পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ। ভক্ত সাধক কিরণচাঁদ দরবেশ কবিতায় তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদের সহিত মূলও দেওয়া হইয়াছে। মুখবন্ধে গুরু নানকের জীবনকাহিনী ও সাধনার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। গ্রন্থ-খানির দ্বিতীয় সংস্করণ করার প্রয়োজন হইয়াছে দেখিলেই বোঝা যায় যে ভক্ত পাঠকগণের নিকট ইহার যোগ্য আদর হইয়াছে। অনুবাদক ভক্তগণের কথা মনে রাখিয়াই এই অনুবাদ করিয়াছেন; সুতরাং সাধারণ পাঠকের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিচার করেন নাই। সাধারণ পাঠক বোধ করি মূল গুরুমুখীর বিশুদ্ধ পাঠ ও আক্ষরিক অনুবাদ (যতদূর সম্ভব) পাইলে খুশী হইতেন। অবশ্য একথা সত্য যে, আক্ষরিক অনুবাদে প্রসাদগুণের অভাব হইবে ও মূল গুরুমুখীর বাংলা-লিপ্যন্তর সহজ হইবে না। গুরু নানককে গুরুবাদী বলিলে বোধ করি তাঁহার মতের প্রতি উচিত বিচার করা হয় না। অন্ততঃ গুরুবাদ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, নানক সে ভাবের গুরুবাদ স্বীকার করেন নাই। শিখধর্ম্মে গুরু ও ব্রহ্ম এক নহে। শেষ গুরু একথা স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, যে তাঁহাকে ভগবান বলিয়া মনে করিবে সে ভুল করিবে। শিখধর্ম্ম আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, নানক মূলতঃ ব্রহ্মবাদীই ছিলেন।

বিজ্ঞানকাহিনী—শ্রীসুশীলচন্দ্র রায়চৌধুরী। প্রকাশক—দি বুক ষ্টল, ১৬৯ রসা রোড, কলিকাতা। পৃঃ ১৪৬। মূল্য বারো আনা।

(১) বিজ্ঞানের নানা কথা, (২) বিজ্ঞানের খবর—শ্রীসুশীলচন্দ্র রায়চৌধুরী। প্রকাশক—এম. সি. সরকার এণ্ড সন্‌স ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ ১২৯। মূল্য বারো আনা।

বাংলা ভাষায় ছেলেমেয়েদের পড়িবার উপযোগী বিজ্ঞান-গ্রন্থের অভাব এখনও দূর হয় নাই। জগদানন্দ রায় মহাশয় এ অভাব দূর করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতি সহজভাবে নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ভয় হইয়াছিল বুঝিবা তাঁহার শূন্যস্থান অধিকার করিবার লোকের অভাব ঘটিবে। কিন্তু এই গ্রন্থ কয়টি দেখিয়া সেই ভয় দূর হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীসুশীলচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় এই তিনটি অতি মনোজ্ঞ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া শুধু ছেলেমেয়েদের নয় আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই বিজ্ঞানের যুগে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের চিত্ত ছোটবেলা হইতেই যাহাতে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহার জন্য কোন বিশেষ আয়োজন আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে দুর্ভাগ্যক্রমে নাই। অথচ চারি দিকে প্রকৃতির ক্ষুদ্রবৃহৎ যে নানা রহস্য অহরহ আমাদের চোখে পড়ে তাহাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হইতেই শুধু বিজ্ঞান-শিক্ষার নহে সকল শিক্ষারই আরম্ভ। সেই জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্থান এত উচ্চে। সুতরাং ছেলেমেয়েদের উপযোগী বিজ্ঞানগ্রন্থের এত প্রয়োজন। যিনিই সে অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিবেন তিনিই আমাদের কৃতজ্ঞতা লাভ করিবেন।

'বিজ্ঞানকাহিনী' নামক গ্রন্থে লেখক আর্কিমিডিস, গ্যালিলিও, এডিসন প্রমুখ কয়েক জন বৈজ্ঞানিক মনীষীর জীবনকাহিনী বর্ণনা-প্রসঙ্গে তাঁহাদের আবিষ্কারগুলির সংক্ষিপ্ত ও সরল ইতিহাস মোটামুটি ভাবে দিয়াছেন। "বিজ্ঞানের নানা কথা" ও "বিজ্ঞানের খবর" নামক গ্রন্থ দুইটিতে সুশীলবাবু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে-সকল প্রাকৃতিক ঘটনা (যথা, লোহা জলে ভাসে কেন, জল আগুন নিবায় কেন, গাছপালার সহিত মানুষের সম্বন্ধ, রঙের কথা, দিনের বেলায় নক্ষত্র দেখা যায় না কেন, ইত্যাদি) আমাদের মনে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা উদ্রেক করে তাহাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল ভাষায় অতি সহজভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রত্যেকটি গ্রন্থই অতি সুন্দর হইয়াছে। সুশীলবাবুর ভাষা মনোজ্ঞ ও বর্ণনা চিত্তাকর্ষক। ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে গ্রন্থগুলির আদর হইবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বইগুলির ছাপা ও বাঁধাই ভাল, মূল্যও কম। তবে 'বিজ্ঞান কাহিনীর' কাগজ ও ছাপার কালির নির্ব্বাচন ভাল হইতে পারিত বলিয়া মনে হয়। দু-এক জায়গায় ছাপার ভুল ও "বাষ্পীভবন" প্রভৃতি কয়েকটি কঠিন শব্দ চোখে পড়িল।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

ধর্ম্মষোড়শী—শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ, বিদ্যানিধি প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট) হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা।

হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন দিকের মূল তথ্য সম্বন্ধে ষোলটি সুলিখিত প্রবন্ধের সমাবেশে এই পুস্তক গ্রথিত। হিন্দুধর্ম্মের বাহ্যিক আচার আপাততঃ নিরর্থক বলিয়া প্রতীয়মান হয় সত্য, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, এইগুলির অন্তরালে এক গভীর রহস্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই কথাই গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্যের সাহায্যে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী.

শ্রীশ্রীব্রজদর্শন—শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, এম্‌-এস্‌সি। প্রকাশক—শ্রীসত্যরঞ্জন বিশ্বাস, ৪ সেণ্ট জেম্‌স্ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৭৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

বইখানা বৃন্দাবন ভ্রমণের বৃত্তান্ত। গ্রন্থকার উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক

এবং পরম বৈষ্ণব ও ভগবদ্‌বিশ্বাসী। গ্রন্থে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও যথেষ্ট রহিয়াছে। গ্রন্থশেষে প্রদত্ত ব্রজমণ্ডলের মানচিত্রটি নূতন তীর্থযাত্রীর উপকারে আসিবে;

বৈষ্ণবীয় শ্রদ্ধার নিদর্শন গ্রন্থকারের ভাষায়ও রহিয়াছে। প্রত্যেকটি বৈষ্ণব-নামের পূর্ব্বে অন্ততঃ একটি শ্রী শব্দ তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন—এমন কি, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, নামের পূর্ব্বেও (৭ পৃ.)। বিশেষ বিশেষ নামের পূর্ব্বে একাধিক 'শ্রী'ও ব্যবহৃত হইয়াছে; যেমন, 'শ্রীশ্রীব্রজধাম,' 'শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল' ইত্যাদি। মোটের উপর, 'শ্রীদাম' 'সুশ্রী' প্রভৃতি শব্দের 'শ্রী' এবং গ্রন্থকার ও প্রকাশক প্রভৃতির নামের পূর্ব্বের 'শ্রী' কয়টি বাদ দিয়াও ১৭৬ পৃষ্ঠার বইয়ে অনূন ৫৫০টি 'শ্রী' ব্যবহৃত হইয়াছে; অর্থাৎ গড়ে প্রতি পৃষ্ঠায় প্রায় ৩⅛টি এবং প্রতি ৭ ছত্রে একটি করিয়া 'শ্রী' রহিয়াছে। কিন্তু অ-বৈষ্ণব নামের পূর্ব্বে 'শ্রী'র ব্যবহার তত উদারভাবে করা হয় নাই; যথা, ৫৫ পৃষ্ঠায় কয়েকটি মহাদেবের উল্লেখ রহিয়াছে, তাঁরা সবই স্বর্গীয়—অর্থাৎ ৺চিহ্নযুক্ত; অথচ 'শ্রী'কৃষ্ণের প্রপৌত্র ব্রজনাভ এখনও স্বর্গীয় হন নাই, 'শ্রী'যুক্ত!

গ্রন্থকারের ভক্তি ও বিশ্বাস অসাধারণ। গোবর্দ্ধন গিরিকে তিনি দুধ কিনিয়া খাওয়াইয়াছেন, কিন্তু পাহাড়টির যেটি মুখ কল্পনা করা হয়, সেখানে দুধ ঢালিতে হইলে পাহাড়ের গায়ে পা ঠেকে, তাই তিনি নিজে দুধ ঢালিতে পারেন নাই; পাণ্ডা কিন্তু অম্লান বদনে তাহা পারিয়াছে। "ব্রজবাসী সেবাইতের অবশ্য এতে কোন দোষ হয় না, নচেৎ সেবাই চলে না" (১২২ পৃ.)।

বৃন্দাবনে কয়েকটি তমালবৃক্ষে গ্রন্থকার শালগ্রাম দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে "খুব সম্ভব এগুলি অতি প্রাচীন ভগবদ্ভক্ত, ভগবান্ এঁদের অঙ্গকে আপনার অঙ্গ বলেই মনে করেন, তাই এঁদের অঙ্গে আপনার অঙ্গ প্রকাশ করেছেন (১৭৬ পৃ.)। বর্ত্তমান সমালোচকও এ-সকল দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মনে এ-সিদ্ধান্ত জাগে নাই। এইখানেই ভক্তির তফাৎ!

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত পরিবর্ত্তন—শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ গায়ক, তিনি জীবনে সঙ্গীতে যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা বলিতে গিয়া অনেক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য-গণকে নিন্দা করিয়াছেন। ধ্রুপদ গানের সুর পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন বলিয়া তিনি সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দোষারোপ করিয়াছেন। যদি সুর সুন্দর হইয়া থাকে তবে পরিবর্ত্তন অমার্জ্জনীয় অপরাধ নহে। যদুভট্ট ও কৃষ্ণধন বাবু ইহজগতে নাই। তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি যে ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা না-করাই ভাল ছিল। সঙ্গীতাচার্য্য ভাতখণ্ডের সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাও না লিখিলেই শোভন হইত। মোটের উপর নিজের প্রাধান্য দেখাইতে গিয়া অপরকে ছোট করিবার চেষ্টা সকলের পক্ষেই পরিহার্য্য।

বৈজু বাওরা ও তানসেন—শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থকার সঙ্গীত-রাজ্যের দুই জন দিকপালের জীবনী তাঁহার নিজ অনুসন্ধান ও কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বইখানি বিশেষত্ববর্জ্জিত, তবে কিম্বদন্তীগুলি সুন্দর বলিয়া গল্পের ন্যায় একটানা পড়িয়া ফেলিতে কষ্ট হয় না।

শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

অতি বোগাস্—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, ২০৩।১-১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য ১॥০

ছোটগল্পের বই। বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নাই। বইখানির ছাপা ভাল, অনেকগুলি ছবিও আছে।

পোড়ো জমি—আবুল কালাম শামসুদ্দীন। মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

বইখানি টুর্গেনিভের Virgin Soilএর অনুবাদ। মূলপুস্তকের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক—সাহিত্যরসিক সুধীগণ উক্ত বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসের সহিত সুপরিচিত। অনুবাদটি সরস ও প্রাঞ্জল হইয়াছে।

স্বপনকুহেলী—শ্রীগোপেন্দ্রলাল রায়। প্রকাশক—সত্যেন্দ্র-নাথ রায়, ১৩নং ভুবন সরকার লেন, কলিকাতা। মূল্য ১॥০

একখানি কবিতার বই। অনেক স্থলে রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ। কিন্তু লেখকের নিজস্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয়ও নানা স্থলে সুস্পষ্ট। প্রথম রচনায় তিনি যে প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, মনে হয় যে পরবর্ত্তী জীবনে সেই প্রভাবই তাঁহাকে নিজের পথটি চিনিয়া লইতে সাহায্য করিবে। বইখানির কাগজ, ছাপা, বাঁধাই অতি সুন্দর। ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত প্রচ্ছদপটটি ভাল লাগিল।

স্রোত—শ্রীভুবনমোহন মিত্র। নারায়ণ সাহিত্য-মন্দির, ৮ নং রাধামাধব গোস্বামীর লেন, বাগবাজার। দাম দেড় টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে নীলাদ্রি ও ঝরণার চরিত্রটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। শ্যামলার ছবিটিও দরদ দিয়া আঁকা। তবুও বলিতে হয় উপন্যাস হিসাবে বইখানার সার্থকতা তেমন নাই—উপন্যাস না-বলিয়া বড় গল্প বলিলে ইহার স্বরূপ ঠিক বোঝা যাইবে। ভাষা ভাল ও ঝরঝরে।

ছায়াপথ—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানি আমাদিগকে আনন্দ দিয়াছে। লেখিকা চরিত্র-অঙ্কনে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—সুপ্রিয়া ও বিভাসের ছবি অত্যন্ত স্পষ্ট ও অকৃত্রিম। প্রকৃতির বর্ণনাতেও লেখিকার পাকা হাত। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঘ আসিয়াছে—

শ্রীবিমল মিত্র

খবরটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে।

মতি মল্লিক বৃদ্ধ অথর্ব্ব মানুষ। বাতে ভাল নড়িতে পারেন না বলিয়া দাওয়ায় বসিয়া দড়ি পাকাইতেন; কয়েক দিন হইল তাঁহাকেও আর দেখা গেল না। বলেন—হাঁ বাপু, প্রাণ অম্‌নি সস্তা নয়—খাই-না-খাই ঘরে পড়ে থাকব, তা ব'লে বাইরে বেরুচ্ছি নে—

নন্দ কলুর ডোবাটার পাশের দিকে একটু জঙ্গল মতন। কয়েকটা শ্যাঁওড়া আর আসশ্যাওড়া গাছ জন্মিয়া বহুদিন হইতে জায়গাটি অগম্য। তথাপি বর্ষার দিনে ডোবায় যখন জল ভরিয়া উঠিত, পাড়ার বৌ-ঝিরা ওই ডোবা হইতে কলসী-কলসী জল বহিয়া লইয়া যাইত; ভয় বলিয়া কোন দিন কিছু ছিল না। কিন্তু খবরটা জানাজানি হইবার পর হইতে ঐদিকে আর কেহ মাড়ায় না,...বিকাল হইতে-না-হইতে গ্রাম যেন খাঁ-খাঁ করিতে থাকে!

রাত্রে সারা গ্রাম যখন নিশুতি—অন্ধকারের তন্দ্রা ভেদ করিয়া কত বিকট শব্দ সকলের কানে আসে—সকলেই শুনিতে পায় যেন কাছাকাছি পোয়াটাক পথ দূরেই সারা পল্লী চকিত সন্ত্রস্ত করিয়া দিয়া শব্দ হইতেছে—ফেউ-ফেউ—

শব্দটা কানে আসিতেই সকলের ঘুম ভাঙিয়া যায়। জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিলে গ্রীষ্মকালে ঘরের ভিতর থাকা যায় না, কিন্তু উপায় নাই। ঘরের ভিতর গরমে বদ্ধ থাকিবে তবু অপঘাতে কেহ প্রাণ দিবে না! সন্ধ্যা হইতেই সকলে শয্যাগ্রহণ করে, আবার ওদিকে রৌদ্র উঠিয়া বেলা হইলে তবে সকলে বিছানা ছাড়িয়া উঠে। দিনের আলো থাকিতে থাকিতে যে-যাহার কাজ সারিয়া লয়—সন্ধ্যাবেলা বাহির হইয়াছে কি অম্‌নি গলার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া প্রাণটি বাহির করিয়া লইবে।

প্রথম প্রথম দু-এক জন বিশ্বাস করিতে চায় নাই।

শশিনাথ ছেলেবেলা হইতেই ডান্‌পিটে, বলিত,—হ্যাঃ, বাঘ অম্‌নি বল্‌লেই হ'ল কি না—ও বাঘ-টাঘ নয়, বুঝলি অমেরতো—কুঁদো শ্যাল্‌-ট্যাল্‌ হবে আর কি—

কিন্তু এক দিন সকলেই বিশ্বাস করিল। গ্রামের চৌকীদার গিরিধারীকে কয়েক দিন ধরিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। চারিদিকে খোঁজ পড়িল। পরের দিন দেখা গেল বিলের ধারে শুক্‌নো নল্‌খাকড়ার গাদার ধারে মরিয়া পড়িয়া আছে। কতকগুলি শকুনি শেয়াল দেহটি খাইয়া অর্দ্ধেক নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে।

অমৃত বলিল,—এ যদি সেই শালার কীর্ত্তি না হয় ত এই দিককার গোঁফ আমি কামিয়ে ফেলে দেব—দিব্যি করলাম—

খবরটা যে মিথ্যা নয় তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল আর এক দিন। নিত্যানন্দ পিওন গ্রামে গ্রামে চিঠি বিলি করিয়া দিয়া পোষ্টাপিসে ফিরিয়া যায়। পোষ্টাপিস সেই গাজনায়। ফিরিতে তাহার রাতই হইত। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা জলাহাটির ধানক্ষেত হইতে ডাঙ্গার উপর উঠিতেই কি রকম একটা গোঁ গোঁ শব্দ নিত্যানন্দের কানে আসিয়াছিল।

নিত্যানন্দ বলিল,—বুঝলি অমেরতো, ভয় ত আমার কোনও কালে নেই ভাই—কিন্তু এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি, সেই শব্দ না শুনে যেন ঠিক থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলাম, বুঝলি—পাশে ছিল একটা তেঁতুলগাছ, আর কিছু নেই—পেছন পানে কেবল ধানক্ষেত আর সম্মুখে কেবল ছাড়াছাড়া জঙ্গল—দুগ্‌গা ব'লে গাছের ওপর উঠে গে পড়লাম—তার পর দেখি কি জানিস্—যেখানটায় ঢালু জায়গাতে একটুখানি জল জমেছে, ঠিক সেখেনে একটা ছাগল ধ'রে চিবোচ্ছে—তোকে বলবো কি—যেমন তেমন নয়—মাপলে যদি পুরোপুরি দশ হাত না হয় ত...

মতি মল্লিক ঘরের ভিতর বসিয়া পথের লোককে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, কাল কাকে নিলে গা, পাঁচুর মা?

পাঁচুর মা বলিল,—আমার রামীর বাছুরটাকে পাচ্ছি নে মতিকাকা, সেই কালোপানা বক্‌না বাছুরটা—দেখি একবার ও-পাড়ায় খোঁজ ক'রে—

মতি মল্লিক বলিলেন,—ও উলোর বাঘ, বুঝলে পাঁচুর মা, নোনাগাটির জঙ্গল কাটা হচ্ছে কি না, তাই এখেনে এয়েছে পেল্লায় বড় বড় বাঘ—বাছুরটাছুর আর ছেড়ো না—

বারোয়ারীতলায় একটা মাচার উপর বহুকাল হইতে আড্ডা বসিত, অমৃত, শশিনাথ, এমনি আরও অনেকে আসিয়া সেই আড্ডায় জুটিত। দুই হাতে চলিত তাস, সকাল দুপুর এবং রাত্রি বারোটা অবধি। নিত্যানন্দ-পিওন চিঠি বিলি করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় এক হাত তাসও মাঝে মাঝে খেলিতে বসিত। কোন-কোন দিন ডুগি তব্‌লা হারমোনিয়ম লইয়া গান-বাজনাও চলিত। কিন্তু বাঘ আসিবার পর হইতে সেই আড্ডাটি মৃতপ্রায়। দিনের বেলা কেহ কেহ আসিয়া হয়ত নামমাত্র দেখা দিয়া যায়—কিন্তু আড্ডা আর জমে না—এ যেন বর্গী-আসারও বাড়া!

সেদিন দুপুরবেলা জনকয়েক মিলিয়া মিশিয়া মাচায় বসিয়া সেই কথাই বলিতেছিল। এমন করিয়া আর কত দিন চলে? এখন না-হয় একটি দুইটি বাঘ আছে—কিন্তু এম্‌নি ভাবে চালালে গ্রামে কি আর মানুষ থাকিবে! আজ দুটি বাঘ আছে—কাল তাহাদেরই বাচ্ছা হইয়া হইবে তিনটি! এমনি করিয়া বাঘের বংশ বাড়িতে চলিলে গ্রামে যে বাস করা দায় হইয়া উঠিবে! এইবেলা সকাল সকাল একটা কিছু উপায় করিতে না পারিলে চলিতেছে না আর!

শশিনাথ বলিল,—খাঁচা বানাও—আর সেই খাঁচার ভেতর রাখো ছাগল-ছানা বেঁধে—তারপর যা ব্যবস্থা করবার আমি করবো'খন—

বুড়ো অক্ষয়ের তিন-চারিটা ছাগল-ছানা আছে। এই সেদিন সবে হইয়াছে। অক্ষয় জানে তাহার ছাগলগুলির উপরই সকলের লোভ! বলিল,—খাঁচা যেন হ'ল—ছাগল-ছানা কে দেবে?…আজকাল যা দর ছাগলের—

সূর্য্য কামার বলিল,—তুমিই দাও না খুড়ো একটা, তোমার অতগুলো ছাগল, কোনদিন গোয়ালসুদ্ধ ধরে নিয়ে যাবে—তা'র চেয়ে একটা দিয়ে যদি হয় দেখ না—

বুড়ো অক্ষয়ের রাগ বেশী। বলিল,—কেন শুনি, চাঁদা তোল না, কত আর পড়বে—তিনুটে টাকা দিলে একটা ছানা ছাড়তে পারি—নইলে এই মাগ্যিগণ্ডার বাজারে—ছেলেপুলে নিয়ে আমায় বাস করতে হয়—ছাগল আমি মাগনা দিতে পারবো না, তা ব'লে রাখছি—বলিয়া আর কো[ন] উপায় না দেখিয়া অক্ষয় আড্ডা ছাড়িয়া এক-পা এক-প[া] করিয়া বাড়ি মুখে চলিতে আরম্ভ করিল—

সেদিনকার মত কোনও কিছুই মীমাংসা হইল না—এমন কি, শুধু সে দিনই নয় কতদিন ধরিয়া যে এম্‌[নি] কথাবার্ত্তা চলিল—পরামর্শ হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই কিন্তু একটা-না-একটা কিছু বিঘ্ন আসিয়া সমস্তই প[ণ্ড] করিয়া দেয়। কেহ এতটুকু স্বার্থত্যাগ করিবে না,—কাহারও ব্যক্তিগত দায় হয় বলিয়া কেহ নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব লইতে চায় না। পরের উপর দিয়া কাজটা সুসমা[ধা] হইয়া গেলেই যেন সকলে খুশী!

কিন্তু অসুবিধা হইল সকলের চেয়ে বেশী প্রসন্ন ঠাকুরের

গ্রামের এক দিকে বহুদিনকার এক দেবীর মন্দির আছে সারদেশ্বরী বলিতে দশখানা গ্রামের লোক অজ্ঞান এ-অঞ্চলকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন দেবী সারদেশ্বরী গ্রীষ্মকালে আকাশে এক খণ্ড মেঘ নাই—এক ফোঁটা বৃ[ষ্টি] নাই—মাঠের ধান মাঠে শুকাইয়া যাইতেছে—দশখান গাঁয়ে লোক আসিয়া দেবীর পূজা দিয়া গেল; তার পর দি[ন] দেখিতে দেখিতে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আসিয়া মাঠ ঘা[ট] পুকুর ডোবা ভাসাইয়া দিয়া গেল।…মায়ের এম্‌নি কৃপা প্রকাণ্ড গম্বুজওয়ালা মন্দির; মন্দির বহু পুরান কালের—মাহাত্ম্যও তাই অনেক বেশী—

প্রসন্ন ঠাকুর সেই মন্দিরেরই পুরোহিত।

প্রসন্ন ঠাকুরের ঘরবাড়ি সবই আছে—একটু দূরে কিন্তু দিনের বেলা প্রসন্ন ঠাকুর বাড়িতে গিয়া খাওয়া-দাওয়া দেখা-শুনা সবই করিয়া আসে। রাত্রে মন্দিরের দাওয়া উপর শুইয়া পড়িয়া থাকে! মন্দিরের দরজায় একটা প্রকাণ্ড তালা লাগানো থাকে—আর বাহিরে প্রসন্ন ঠাকু[র] ঘুমায়!

বউ কত দিন বলিয়াছে—বাড়িতে তোমার কে শত্তুর আছে শুনি যে বাইরে যাবে ঘুমুতে?

প্রসন্ন ঠাকুর বলিত,—ঘুমুই কি সাধ ক'রে?…

সে কথা সত্য! শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই, প্রসন্ন ঠাকুর যে মন্দিরের ভাঙা দাওয়ার উপর শুইয়া থাকে তাহা সাধ করিয়া নয়। তাহার কারণ আছে। সে-কারণ সকলকে প্রকাশ করিয়া বলা যায় না!

চুপি চুপি প্রসন্ন ঠাকুর বউয়ের কানে কানে বলিত,—চল্লিশ ভরি সোনার গয়না ঠাকুরের গায়ে আছে—এই দুর্ভিক্ষের বাজারে—এ-দেশের যে আকালে লোক—এরা সব পারে—

চল্লিশ ভরি সোনার লোভে যে এ-দেশের লোক ঠাকুরের গায়ে হাত দিবে তাহা বউ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু প্রসন্ন সে-কথা শুনিবার পাত্র নয়! মানুষে কি না পারে? পয়সার জন্য লোকে যখন নিজের বাপকে খুন করিতে পারে—তখন পাথরের দেবতা কোন্ ছার! মানুষে সব পারে!

দুপুরবেলা সেই আড্ডায় আসিয়া প্রসন্ন ঠাকুর বসিল। বলিল,—একটা উপায় তোমরা ক'রে ফেল শশি, তোমরা হচ্ছ জোয়ান লোক, গায়ে ক্ষমতা আছে—আমি ত আর পারি নে,…রাতের বেলা দাওয়ায় শুয়ে থাকি, কোন্ দিন টেনে নিয়ে যাবে বাঘে,…সেইটিই ভাল হবে?…

শশিনাথ বলিল,—শিগ্গিরই একটা ব্যবস্থা করছি ঠাকুর মশাই—কিন্তু দাওয়ায় শোওয়া তোমার আর চলবে না—বাড়িতে ঘরে গিয়ে শুতে হবে—মন্দিরের দরজায় তালা দেওয়া থাকে ত, তবে আবার ভয় কিসের তোমার, শুনি?

প্রসন্ন ঠাকুর বলিল,—চোর-টোর—বুঝলে না,—বলা যায় কি, কার মনে কি আছে?

—চোর? অমৃত ভাবিতেছিল। বলিল—চোর হাত দেবে ঠাকুরের গায়ে। বল কি ঠাকুর মশাই? দেব্‌তার গায়ে হাত?…কুষ্ঠ হবে না? হাত যে খ'সে পড়বে—তার কি গতি হবে?…জয় মা সারদেশ্বরী—কি যে বল ঠাকুর মশাই! আর চোরের কি বাঘের ভয় নেই ভেবেছ? দেব্‌তা না-হয় যদি রেহাই দেয়, বাঘ ত আর ছাড়বে না তা'বলে—?

উপস্থিত সকলেই সেই কথা বলিল। চোরই হোক্—আর যাহাই হোক বাঘের ভয় করে না, এমন প্রাণী ত ত্রিভুবনে নাই! প্রাণের মায়া সকলেরই আছে।…প্রাণ অমন কাহারও সস্তা হয়।…

সেদিন সত্য সত্যই মন্দিরের দাওয়ায় আর শোওয়া হইল না। পুরোহিত বলিয়া বাঘ ত আর তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না! বাঘের যদি অত বুদ্ধিই থাকিবে, তবে আর ভগবান তাহাকে বাঘ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন কেন! প্রসন্ন ঠাকুর সেদিন বাড়ি আসিয়া শুইল।

রাত্রিবেলা দুই প্রহরে শশিনাথ আসিয়া অমৃতকে ডাকিল,—ও অমের্‌তো, অমের্‌তো, অমের্‌তো রে, ওঠ্—উঠে পড়্—

অমৃত ধড়ফড় করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। আগে হইতেই সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়া ছিল। বাহিরে আসিয়া অমৃত বলিল—লোহার ডাণ্ডাটা নিয়েছিস্ ত? সমস্ত ঠিক্।

নিঝুম পল্লীর দ্বিপ্রহরের নিদ্রা—তন্দ্রাচ্ছন্ন আকাশ! বাঘের ভয়ে সারা পৃথিবী যেন অবশ হইয়া আছে! যে-যাহার বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ করিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। কোথায় এতটুকু টু-শব্দ নাই—নিস্তব্ধতার সমুদ্র এখন নিটোল নিস্তরঙ্গ!

তালা ভাঙিয়া মন্দিরে ঢুকিতে হইবে।

তা শশিনাথ ওস্তাদ লোক! তালা ভাঙিতে তাহার দেরি হইল না; দরজা খুলিয়া শশিনাথ আর অমৃত ভিতরে ঢুকিল। ফস্ করিয়া একটা দেশলাই-কাটি জ্বালিতেই ঘরের ভিতরটা আলোময় হইয়া উঠিল।

কিন্তু বিস্ময়ের উপর বিস্ময়!…শশিনাথ দেখিল—অমৃতও দেখিল।…দেখিয়া দুই জনের চক্ষুই কপালে উঠিল।

এমন ঘটনা যে ঘটিবে তাহা দু-জনের মধ্যে কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই। শশিনাথ অমৃতর দিকে চাহিল, অমৃত চাহিল শশিনাথের দিকে। দেশলাই-কাটিটি পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গেল।…

অন্তকালের পুরান জাগ্রত দেবী! সকলেই দেখিয়াছে সোনায় মোড়া তাহার দেহ! চল্লিশ ভরি সোনা কম নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—এক তিল সোনা তাহার গায়ে নাই। নিরলঙ্কার পাথরের দেহ বড় ম্লান!

শশিনাথ বলিল—এ ঐ বেটার কাজ!…

—কোন্ বেটার?

—ঐ পুরুত বেটার।

সত্যসত্যই দু-জনের কাহারও সন্দেহ রহিল না যে, প্রসন্ন ঠাকুরই নিজের বাড়িতে সব সরাইয়া ফেলিয়াছে। কয়েকটা বাসনপত্র—ঘটি নৈবেদ্যের থালা ইত্যাদি যাহা ছিল তাহাই দু-একটা নিল শশিনাথ, দু-একটা নিল অমৃত!

পরের দিন প্রসন্ন কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির।

লোকের সামনে গিয়া বুক চাপড়ায়, আর বলে,—হায় হায়, কি হ'ল—কি হ'ল—

ব্যাপারটা লঘু নয়, সারদেশ্বরীর গহনা চুরি! গ্রামময় হৈ চৈ পড়িয়া গেল সেই দিনই। প্রসন্ন চোখের জলে বুক ভাসাইয়া ফেলে আর বলে—মা'র গয়না চুরি ক'রে সে ভোগ করতে পারবে না, তা দেখো! কুষ্ঠ হবে না?…যে-হাত দিয়ে নিয়েছে সে-হাত খ'সে পড়বে না? কদ্দিন খাবে খাক্ না—মা'র ঠিক দৃষ্টি আছে—উপরে উপরওয়ালা যিনি আছেন—তিনি দেখছেন ঠিক্—

দুপুরবেলা কাঁদিয়া আসিয়া পড়িল বারোয়ারীতলার আড্ডায়। বলিল—তোমরাই ত বললে শশি, আমায় ঘরে গিয়ে শুতে, এখন দেখ ত!…তা এ আর দেখতে হবে না, মা'র রাগ চড়ে গেছে। কি যে ক'রে বসেন কে জানে! শীগগিরই একটা কিছু বিপদ ঘটবে!…কাল রাতে, মা কি স্বপ্ন দিয়েছেন, জান?…আমার বুকের উপর পা দিয়ে বললেন—যেখান থেকে পারিস্ আমার গয়না আবার গড়িয়ে দে…এখন কি করা যায় বল ত—গয়না না দিলে ত সব রসাতলে যাবে, কিছু কি আর থাকবে? হয় আবার গয়না গড়িয়ে দাও—নয় ত—

শশিনাথ আর অমৃত দু-জনে চোখ-চাওয়াচাওয়ি করিল।

বুড়ো অক্ষয় বলিল—বেটা চোরের কি বাঘের ভয়ও নেই রে?

যেখানে যত লোক ছিল—কেবল শশী আর অমৃত ছাড়া—আর সবাই তখন সেই কথাই ভাবিতেছিল…বেটা চোরের কি বাঘের ভয়ও নাই?

প্রসন্ন ঠাকুর আবার বলিল—তোমরা আমায় ঘরে শোওয়ালে, গয়না-চুরির অপরাধ তোমাদের যদি লোকে দেয় লোককে 'না' বলব কোন মুখে?

শশী ও অমৃতর মুখে জবাব আটকাইয়া গেল।



সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় শিক্ষা-বিস্তারের অন্তরায়

(সরকারী রিপোর্টের সাক্ষ্য)

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজনীতিক উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়সমূহের জন্য অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইহাদ্বারা কি মুসলমানদিগের মধ্যেই শিক্ষার উপযুক্ত রূপ বিস্তার হইতেছে? সরকারী শিক্ষাবিবরণীগুলি ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছে—না। কেবল ইহাই নহে, উহাদিগের দ্বারা সাধারণের অর্থের (যাহার অধিকাংশ হিন্দুর প্রদত্ত) উক্ত প্রকার অপব্যয়ের জন্য এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও পার্থক্য ভাব বৃদ্ধি হয় বলিয়া, দেশের অসাম্প্রদায়িক সাধারণ স্বার্থও ক্ষুন্ন হইয়া থাকে।

ভারত-গবর্ণমেণ্টের ১৯২৭-৩২ সালের পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা-বিবরণীতে মুসলমানদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উপসংহারে বলা হইয়াছে :—

যত দিন পর্য্যন্ত পৃথক বিশেষ (সাম্প্রদায়িক) বিদ্যালয়সমূহ এত অধিক সংখ্যায় বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন মুসলমানদিগের (শিক্ষায়) উন্নতি গুরুতররূপে বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে। (পৃ. ২৪৪)।

উক্ত রিপোর্টেই শিক্ষায় অপব্যয় সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে, বিহার-উড়িষ্যার ডিরেক্টর সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়সমূহের কুফলের বর্ণনা করা হইয়াছে :—

বিহার-উড়িষ্যার ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক্ ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন ১৯২২-২৭ সালের পঞ্চবার্ষিক বিবরণীতে, সাম্প্রদায়িক পার্থক্যভাবের প্রতি ক্রমবর্দ্ধনশীল অনুরাগের ফলে (শিক্ষায়) যে অনাবশ্যক অর্থব্যয় হইতেছে, তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন :—

'গ্রামের সাধারণের জন্য একটি বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তে যাহাতে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, সেই জন্য একটি আন্দোলন চলিতেছে···আমরা এখন এমন একটি অবস্থায় উপনীত হইতেছি যে প্রত্যেক গ্রামই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মক্তব, ও একটি পাঠশালা চাহিতেছে। অধিকন্তু, ইহাও দাবি করা হয় যে নিম্ন-প্রাথমিক ক্ষেত্রেও বালিকাদিগের জন্য পৃথক্ বিদ্যালয় দরকার, এবং অনেক স্থানে, অনুন্নত শ্রেণীর বালক-বালিকাদিগের জন্যও পৃথক্ বিদ্যালয় আবশ্যক। এইরূপে, ভারতের দরিদ্রতম প্রদেশে, প্রতি গ্রামে পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দিতে আমাদিগকে বলা হইতেছে।'

দুর্ভাগ্যবশতঃ, তীব্র আর্থিক অনটনের সময়েও, এই সতর্কতা-সূচক কথাগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত রিপোর্টে ডিরেক্টর মহাশয় বলিয়াছেন যে—

'পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা এখনও প্রযোজ্য। বিহার-উড়িষ্যা একটি দরিদ্র প্রদেশ এবং অতিব্যয় সহ্য করিতে পারে না; এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়গুলি অতিব্যয়ের কারণ। অপরিমিত ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই অতিব্যয়মূলক বিদ্যালয়গুলি উপকারপ্রসূ নহে, কারণ মক্তব ও পাঠশালাগুলির শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্য ব্যতীত অন্য বিষয় পড়াইতে এত অক্ষম যে তাহা সর্ব্বজনবিদিত।'

তার পর, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবরণীতে ইহা লক্ষ্য করা হইয়াছে যে পঞ্জাবে অত্যধিক সংখ্যক সাম্প্রদায়িক মধ্য-বিদ্যালয় (Secondary schools) আছে বলিয়া উহার ফলে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রতিযোগিতা হয়, এবং তাহার জন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়গুলিতে নিয়মানুবর্ত্তিতা (discipline) লোপ ও কর্ম্মক্ষমতা (efficiency) হ্রাস পাইয়াছে; তথাপি, এই নির্ব্বুদ্ধিতাপূর্ণ ব্যয়ের প্রতিকারের জন্য কোনরূপ সংহত ও সাহসিকতাপূর্ণ চেষ্টা হইয়াছে, এরূপ ইঙ্গিত পঞ্জাবের রিপোর্টে নাই। (ভারত-গবর্ণমেণ্টের দশম পঞ্চবার্ষিক বিবরণী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫)*

উদ্ধৃত কথাগুলি পড়িতে পড়িতে মনে এক কৌতুহলের উদয় হয়। ভারত-গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের কমিশনার মহোদয়, এবং অন্ততঃ একটি প্রাদেশিক ডিরেক্টর (বাংলার রিপোর্টেও ঐরূপ মত দেখা যায়) সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়-গুলিকে অবাঞ্ছনীয় বস্তু মনে করিবেন এবং ঐগুলিদ্বারা ঘটিত অপব্যয়ের প্রতিকার হয় নাই বলিয়া দুঃখিত। অথচ সাধারণে জানে যে সাধারণের অর্থের ঐ অপব্যয়ের প্রতিকার, যাঁহারা 'হা-হুতাশ' করিতেছেন, সেই উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদেরই হাতে। তাঁহাদের ঐ সব সদুক্তি প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য বর্ত্তমান কংগ্রেস-ওয়ার্কিং-কমিটির সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রস্তাবের মত, "ধরি মাছ না ছুঁই পানি," এই নীতির পরিচায়ক।

যাহা হউক, ভারত-গবর্ণমেণ্টের উক্ত রিপোর্টের ৩০ পৃষ্ঠায়, পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের বালক-বালিকার জন্য পৃথক্

* Tenth Quinquennial Review (Progress of Education in India, 1927-32, Vol. I.)

পৃথক্ বিদ্যালয়ের (Segregate Schools for Children of particular communities) সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :—

এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান এইগুলি মুসলমানদিগের জন্য মক্তব-মাদ্রাসা ও মোল্লা-বিদ্যালয় (Mulla school) এবং হিন্দুদিগের জন্য পাঠশালা ; এবং ব্রহ্মদেশে বহুসংখ্যক (বৌদ্ধ) মঠাশ্রিত (monastic) বিদ্যালয়...

যে ছাত্রদিগকে বর্ত্তমান যুগের জীবনযাত্রায় উন্নতি করিতে হইবে, তাহাদের পক্ষে ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষা অসম্পূর্ণ (অথবা ত্রুটিপূর্ণ)। শিক্ষা-বিভাগের গুরুতর অর্থ-অপচয়ের জন্যও ঐ সকল বিদ্যালয় বহুলাংশে দায়ী, কারণ উহাদের জন্য একই কাজ দুইবার করার দরকার (overlapping) হয়।

এই স্থলে, রিপোর্টে উল্লিখিত "পাঠশালার" কথা আলোচনা না করিয়া থাকা যায় না। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, "মুসলমানদিগের জন্য মক্তব-মাদ্রাসা আর হিন্দুদিগের জন্য পাঠশালা"। ইহাতে বুঝা যায়, যেমন মক্তব-মাদ্রাসা কেবল মুসলমানদিগের জন্য, তেমনি পাঠশালাগুলিও কেবল হিন্দুদিগের জন্য। এই উক্তি অসত্য অথবা অতিরঞ্জিত মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অন্ততঃ, বাংলা দেশে সাধারণ শিক্ষার জন্য যে-সকল পাঠশালা আছে, তাহা হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সকলের জন্য। অন্য কোন প্রদেশেও সরকার এই অতুলনীয় মুসলমান-প্রীতির ও প্রকাশ্য ধারাবাহিক হিন্দু-উপেক্ষার দিনে কেবল হিন্দু বালক-বালিকার জন্য মক্তব-মাদ্রাসার ন্যায় বহুসংখ্যক বিদ্যালয় সাধারণের অর্থে চালাইবেন, বা চালাইতে দিবেন, ইহা অবিশ্বাস্য।

যদি "পাঠশালা" অর্থে সংস্কৃত-বিদ্যালয় অর্থাৎ টোল বুঝি, তথাপি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কথা। বাংলা দেশের দৃষ্টান্ত ধরিলে, ১৯৩১-৩২ সালে টোলের জন্য সাধারণ ধনভাণ্ডারের (public funds) অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর টাকা যে-পরিমাণে ব্যয় হইয়াছে, তাহার ষোল গুণ অর্থ মক্তব-মাদ্রাসার জন্য ব্যয় হইয়াছে* (১৯২৭-৩২ সালের বঙ্গদেশের পঞ্চবার্ষিক শিক্ষাবিবরণী)। ভারতের অন্য কোন প্রদেশে যে সরকার মুসলমানদিগের প্রতি এই বিষয়ে কম পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন, এবং হিন্দুদের প্রতি অধিক উদারতা দেখাইয়াছেন, এইরূপ মনে করিলে শিক্ষা-বিভাগের বর্ত্তমান চরিত্রে কলঙ্কারোপ করা হয়। সুতরাং, মক্তব-মাদ্রাসার সঙ্গে সঙ্গে "হিন্দুদের জন্য পাঠশালা" এইরূপ বলিবার কারণ বোধ হয় এই যে, মুসলমানদিগের সাম্প্রদায়িক শিক্ষার নিন্দার সঙ্গে সঙ্গে যদি হিন্দুদের সকারণ বা অকারণ একটা নিন্দা জুড়িয়া না-দেওয়া যায় তবে লোকে কি বলিবে? এই সম্বন্ধে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সরকারী কোন রিপোর্টে কদাপি ইহা বলা হয় নাই যে সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ের সংখ্যাবাহুল্যবশতঃ হিন্দুদের শিক্ষার উন্নতি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু সরকারী রিপোর্টেই বারংবার এই কথা লিখিত হইয়াছে যে, "পৃথক সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়"গুলির সংখ্যাধিক্য মুসলমান-সমাজের শিক্ষার অনুন্নতির একটি কারণ। যথা, বাংলা-গবর্ণমেণ্টের ৭ম পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা বিবরণীতে† (১৯২২-২৩—১৯২৬-২৭ সালের) এইরূপ লিখিত দেখা যায় :—

...পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক বিবরণীতে যাহা যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে সেই শক্তিগুলিই উন্নতির বাধা ঘটাইতেছে—জনসাধারণের (অর্থাৎ মুসলমান সাধারণের) উদাসীনতা...মুসলমানদিগের কর্তৃত্বাধীন মক্তব-মাদ্রাসা প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রকারের বিদ্যালয়, যাহাতে ইসলাম ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান শিক্ষা দেওয়া হয়, তৎপ্রতি (মুসলমানদিগের) অনুরাগ। এই কারণগুলি এখনও বর্ত্তমান এবং, আপাতঃদৃষ্টিতে বোধ হয় যে, অক্ষুণ্ণ শক্তিতেই বর্ত্তমান (পৃ. ৭)।

উদ্ধৃত কথাগুলি হইতে বুঝা যায় যে ১৯১২-১৭ সালের রিপোর্টে, মুসলমানদিগের মক্তব-মাদ্রাসা প্রভৃতি যে তাঁহাদেরই শিক্ষার উন্নতির অন্তরায়, শিক্ষা-বিভাগের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা প্রসূত এই সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। আবার, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টে (Eighth Quinquennial Review) অর্থাৎ ১৯২৭-৩২ সালের রিপোর্টেও সেই একই কথা :—

মুসলমানদিগের শিক্ষার উন্নতিতে যে-সকল শক্তি বাধা দেয়, তাহা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। সেগুলি এই—সাধারণ বিদ্যালয়ে যে অ-সাম্প্রদায়িক (liberal) শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই বিদ্যাচর্চ্চার প্রতি উদাসীনতা...মক্তব-মাদ্রাসার ন্যায় বিশিষ্ট শ্রেণীর বিদ্যালয়, যেখানে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ইসলাম ধর্ম্ম ও আচার-অনুষ্ঠান শিক্ষা দেওয়া হয়, তৎপ্রতি মুসলমান অভিভাবকগণের পক্ষপাতিত্ব। (পৃ. ৭০)

* মুসলমানদিগের ইসলামিয়া কলেজ ও হিন্দুদের সংস্কৃত-কলেজের ব্যয় ধরিলে, পার্থক্য হয় ১৭ গুণের বেশী!

† Seventh Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal for the years 1922-23—1926-27.

দেখা যাইতেছে যে, মক্তব-মাদ্রাসা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ের প্রতি অনুরাগ মুসলমান-সমাজের শিক্ষার উন্নতির বাধা ঘটাইতেছে। এই বাধা অকস্মাৎ এখন উপস্থিত হইয়াছে, এমন নহে। ইহা অন্ততঃ কুড়ি বৎসরের পুরাতন; এবং সরকারী রিপোর্টে ইহার বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে, বাংলার শিক্ষা-বিভাগের যদি এই মত হয়, তবে সেই বিভাগই আবার ঐ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের জন্য সাধারণের অর্থ অপরিমিত মাত্রায় ব্যয় করিতেছেন কেন? এই বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগের দরদ এত বেশী যে, বাংলা দেশে এখন প্রাথমিক শিক্ষা 'আবশ্যিক" (compulsory) হইতে চলিলেও, মক্তবগুলি যে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এই আশ্বাস সম্প্রতি দেওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে ভাল করিয়া দেখা যাউক, ভারত-গবর্ণমেণ্টের অভিমত কি। দশম পঞ্চবার্ষিক রিভিউতে* মুসলমান-দিগের শিক্ষার আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উক্তিগুলি দেখা যায়:—

> হার্টগ্ কমিটি (Hartog Committee) 'পৃথক্' (separate) ও 'বিশিষ্ট' (special) বিদ্যালয়ের প্রভেদ দেখাইয়াছেন।... মক্তব, মাদ্রাসা, কোরাণ বিদ্যালয়, মোল্লা বিদ্যালয় এইগুলি বহুসংখ্যায় বিস্তৃতভাবে বিদ্যমান; এইগুলি 'বিশিষ্ট বিদ্যালয়'। এই সকল বিদ্যালয়ে যে ছাত্রেরা পড়ে তাহাদের মধ্যে মাত্র নগণ্য সংখ্যাই পরবর্তী জীবনে উন্নতি করিবার মত উপযুক্ত পরিমাণে সাধারণ বিদ্যা লাভ করিয়া থাকে।' (পৃ. ২৪২)।

পুনরায়:—

> কিন্তু শিক্ষার উচ্চ স্তরে উন্নতির বৃহত্তম অন্তরায় হইতেছে এই যে, ক্রমবৃদ্ধিশীল সংখ্যায় (মুসলমান) বালক-বালিকারা পৃথক (segregate) বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া থাকে।

হার্টগ্ কমিটি এই মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে

> অসাম্প্রদায়িক ও সাধারণের কর্ত্তৃত্বাধীন বিদ্যালয়সমূহে যে সুবিধা পাওয়া যায় তাহা যদি একমাত্র সুবিধা হইত, তাহা হইলে যাহা হইত, এই সকল বিদ্যালয় (মক্তব-মাদ্রাসা ইত্যাদি) যে তদপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃতভাবে (অর্থাৎ বেশী সংখ্যায়) এবং দ্রুততর মুসলমান ছাত্রদিগকে বিদ্যাশিক্ষায় ব্রতী করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত তুলনায়, মুসলমানদিগের মধ্যে শিক্ষার সাধারণ নিরিখ উন্নত করিবার মত প্রায় কিছুই এই সকল বিদ্যালয়ের দ্বারা করা হয় নাই। এই সকল বিদ্যালয় বহু সংখ্যায় চালাইতে থাকিলে তদ্দ্বারা মুসলমানদিগের নিজের এবং জনসাধারণেরও স্বার্থের অনিষ্ট করা হইবে। (পৃ. ২৪৩-২৪৪)†

হার্টগ্ কমিটির এই মত উদ্ধৃত করিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে মুসলানদিগের শিক্ষার আলোচনার অধ্যায়ের উপসংহারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই প্রবন্ধের প্রথমেই দেখান হইয়াছে।

মুসলমান ছাত্রদিগকে হিন্দু ছাত্র অপেক্ষা বেশীসংখ্যক ভাষা পড়িতে হয়, এবং ইহা উহাদিগের শিক্ষার উন্নতির একটি বাধা এইরূপ বলা হয়। সে-সম্বন্ধে বোম্বাই প্রদেশের রিপোর্টে এইরূপ আছে:—

> এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে দুইটি ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা মুসলমান বালক-বালিকাদিগের উন্নতির বাধা জন্মায়। কিন্তু, এ-বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট, ঐ সম্প্রদায়ের ইচ্ছাদ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন এবং শিক্ষা-বিভাগ বিশ্বস্ততার সহিত (loyally) এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন—যদিও ইহা উপলব্ধি করা হইয়াছে যে, মুসলমানেরা যদি স্থানীয় মাতৃভাষাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করিয়া লয়েন এবং অন্য সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতা করেন, তবে তাঁহাদেরই অধিকতর সুবিধালাভ হইবে। (ভারত-গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট পৃঃ ২৪২)।

বোম্বাই প্রদেশে অন্যত্রও যাহা মুসলমান সম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত অধিকতর হিতকর, তাহা না-করিয়া যাহা অহিতকর, তাহাই করা হইতেছে; কারণ মুসলমানেরা শেষোক্ত ব্যবস্থাই চাহেন। এই উর্দ্দু-প্রীতির কারণ ভারত-গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী শার্প (Sharp) সাহেব স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন:—

> উহাদিগের সংখ্যাল্পতা কখন কখন উহাদিগকে (মুসলমানদিগকে) নিজেদের দৃঢ় একতা ও আত্মরক্ষার জন্য উর্দ্দু ভাষার সংরক্ষণ অথবা পুনরুত্থাপন করিতে প্ররোচিত করে, যথা, মাদ্রাজের দক্ষিণাঞ্চলের মুসলমানেরা, যাহাদের মাতৃভাষা তামিল, উর্দ্দুর দিকে অগ্রসর হইতেছে; বোম্বাই প্রদেশের সেই জেলাসমূহে, যেখানে সাধারণ লোকের কাছে উর্দ্দু প্রায় অজ্ঞাত, সেখানেও উর্দ্দুর জন্য একটা আন্দোলন চলিতেছে।‡

যেখানে উর্দ্দু মুসলমানদিগের মাতৃভাষা নহে, সেখানেও উহা তাঁহারা মাতৃভাষা করিতে চাহেন কেন, তাহার কারণ শার্প সাহেবের কথায় বুঝা গেল। আমরা, হিন্দুরা, অনুমান করিলেও, সে কথা হয়ত "বিদ্বেষের" কথা হইত।

* Tenth Quinquennial Review on the Progress of Education in India for the Years 1927-32, Vol I.

† Hartog Report, page 199.

‡ Progress of Education in India 1907-12, Vol. I, p. 249.

যাহা হউক, বাংলা দেশে মৌলবী ফজলল হক প্রভৃতিরা যে উর্দ্দুর জন্য এত আগ্রহ দেখান, তাহারও উদ্দেশ্য মুসলমানদের সংগঠন (cohesion)। মক্তব-মাদ্রাসা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যও প্রধানতঃ ঐ সংগঠন, ইহাও সহজেই বুঝা যায়। মুসলমানদের "আত্মরক্ষার" কথার কোন অর্থ নাই। যে-যুগে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত, এবং ভারতের "পূর্ণ-স্বরাজে"র অভিলাষী শ্রেষ্ঠ স্বদেশসেবক মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট ছোট নেতা পর্য্যন্ত অনেকেই মুসলমানদিগের আবদার-পূরণে অতি ব্যগ্র, সে-যুগে "আত্মরক্ষা"র জন্য মুসলমানদিগকে মোটেই চিন্তা করিতে হইবে না।

যাহা হউক, আমরা দেখিলাম যে মক্তব-মাদ্রাসা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় মুসলমানদিগের শিক্ষায় উন্নতির অন্তরায়—এ-কথা শিক্ষা-বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীরা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। হার্টগ কমিটি বলেন যে, ঐ সকল বিদ্যালয় বহু সংখ্যায় রাখা শুধু মুসলমানদের নহে, সর্ব্বসাধারণের স্বার্থহানিকারক (কারণ, ঐরূপে ব্যয়িত অর্থ, সাধারণ শিক্ষায় ব্যয় করা যাইত।) অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ও সরকারী কর্ম্মচারীদিগের এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল বিদ্যালয় অতিরিক্ত সংখ্যায়, সাধারণের অর্থে, পোষণ করিয়া আসিতেছেন।* কারণ বোধ হয়, এই (মুসলমানেরা উহা চাহেন, এবং তাঁহাদের ঐ ইচ্ছা "সভক্তি (loyally) পূরণ করা শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তব্য!

মক্তব-মাদ্রাসাগুলির গুণবত্তা সম্বন্ধে একজন ইন্‌স্পেক্ট যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ সমা করিব :—

> ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে মত অন্য কিছু দ্বারাই বর্ত্তমান, দুর্ভাগ্যসূচক সাম্প্রদায়িক মনোমালি এত অধিকরূপে চিরস্থায়ী করা হইতে পারে না।
>
> ...মক্তব-মাদ্রাসাগুলি অতিশয় (শিক্ষাদানে) অপটু। ই বিদ্বেষমূলক সমালোচনা নহে, কিন্তু মুসলমান ইন্‌স্পেক্টরদিগের সর্ব্বসম্ম অভিমত।...এরূপ প্রতিষ্ঠানের ফল-স্বরূপ ছাত্রেরা যে সাধা উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কদা কৃতকার্য্য হইবে ইহার সম্ভাবনা খুবই কম।†

সাম্প্রদায়িক শান্তির জন্য অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের প্র ন্যায় বিচারের খাতিরে এবং সর্ব্বোপরি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের মক্ত মাদ্রাসার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ কমান উচিত।

---

* অধিকন্তু মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা বেশী হইলে, যে-কোন সাধা প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কার্য্যতঃ মক্তবে পরিণত করার জন্য বাংল শিক্ষা-বিভাগের একটি নিয়ম আছে। সম্ভব হইলে তাহা পরে আলোচ করা হইবে।

† Seventh Quinquennial Review on the Progress Education in Bengal for the years 1922-23–1926-27.

যশ্চায়ম্ আত্মনি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিজ্ঞানের পথে মানুষের শক্তি যে আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করেছে তার তুলনা নেই। বহু শতাব্দীর চেষ্টায় জ্ঞান-সাধনা যে ফল লাভ করেছিল এই অল্পকয়েক বৎসরে মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে। শুধু যে নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছে তা নয়, পূর্ব্বে বিজ্ঞানের যে ভূমিকা ছিল তা পর্য্যন্ত নূতন করে তৈরি করেছে। সভ্যতার প্রথম যুগে মানুষ সত্যকে খুঁজেছিল বাইরে; আহার বাসস্থান প্রিয়জনের সঙ্গ ও শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা, এই দিকেই তার শক্তি ধাবিত হয়েছিল। এই চেষ্টার ভিতর দিয়ে বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। নানা প্রক্রিয়ার অনুবর্ত্তী হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে তার এই প্রথম দ্বন্দ্ব, তার বুদ্ধির ও শক্তির লীলার এই প্রথম আরম্ভ। সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি তখন নিবিষ্ট ছিল—যতটুকু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ তারই আবেষ্টনে তার সকল পরীক্ষা সকল আশঙ্কা ছিল আবদ্ধ। সেই এক দিন স্বল্প পাথেয় নিয়ে মানুষ জ্ঞানের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, তার পর বহু পথ অতিক্রম করে মহাবিশ্বের যে-পরিচয় প্রচ্ছন্ন আছে গভীরে ঊর্দ্ধে, দূরে নিকটে, ক্ষুদ্রে বৃহতে, মানুষ এক দিন সেই পরিচয় পেয়েছে—তার শক্তির সীমা এখন কল্পনা করাও যায় না; মানুষ যে বড় তাতে কোনো সন্দেহ নেই—সে কথা নিয়ে আমাদের উৎসব করবার কারণ আছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য্য, মানুষের যখন এই অপরিসীম উন্নতি ঠিক সেই সময়ে তার এ কী পরিচয়, এ কী হানাহানি, এ কী অসামান্য হিংস্রতা! মানুষের প্রতি মানুষের অন্তহীন শত্রুতা! সমস্ত য়ুরোপখণ্ডে মানব-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এ কী অভিযান! গৌরব করব কিসের?

এই থেকে বুঝতে হবে, হওয়াটাই বড়ো কথা, পাওয়াটা নয়। পাওয়ার দিকে জানার দিকে সংগ্রহের দিকে জয়ী হয়েছে মানুষ, বাইরের দিকে যত ঐশ্বর্য্য সে জড়ো করেছে—তার সমস্ত সাধনা চেষ্টা সে দিয়েছে বাইরের পাওয়া ও কাজের দিকে, বিশ্বশক্তিকে আয়ত্ত করে স্বশক্তিকে বড়ো করার দিকে। প্রাকৃতবিজ্ঞানীরা অসীম আকাশে মনকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন, পৃথিবীর দেশে দেশে তারায় তারায় বুদ্ধিকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু ভুলে যাই, আরেক অসীম আছে, যা'র পথ রুদ্ধ হ'লে বাইরের ঐশ্বর্য্য অপরিসীম হ'লেও দারিদ্র্য ঘুচতে চায় না। বাইরের দীনতায় তো শুধু অন্নবস্ত্রের দুঃখ, কিন্তু অন্তরের দীনতায় দেখা দেয় সর্ব্বনেশে দানবিক হিংস্রতা। সভ্যতা আপনি আপনার বিষ উৎপন্ন করছে; বুদ্ধির যোগেই মানুষ মরবে এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রত্যহ মানুষ প্রখরতর অস্ত্র আবিষ্কার করছে—এমনি ক'রে সে প্রচণ্ড দক্ষতার জোরে বিনাশের পথে যাচ্ছে। আকাশে আলোকে যিনি আছেন, যিনি আছেন "আত্মনি," তাঁকে অস্বীকার ক'রে মানুষের কী পরাভব প্রত্যহ তা দেখতে পাচ্ছি। সে অসীম তো বস্তুব্যক্ত নয়, তাঁকে উপলব্ধি করা যায় কিন্তু তাঁকে তো সঞ্চয় করা যায় না। অন্তরতম তাঁর উপলব্ধি আপনার মাঝখানে, যেখানে "হওয়ার" জায়গা। বাইরের শক্তিতে আমরা ধন পাই, অন্তরের সত্যে পাই মুক্তি—সে আরেক ঐশ্বর্য্য। সেই ঐশ্বর্য্যকে পেয়েছিলেন আমাদের দেশের সাধকেরা; বিজ্ঞান যেমন পেয়েছে দেশগত কালগত অসীমকে তেমনি আমাদের দেশের ঋষি পেয়েছিলেন আত্মগত অসীমকে। কত বড়ো সাহসের সঙ্গে তাঁরা বলেছিলেন, আমরা ব্রহ্মের মধ্যে আপনাকে পাব। অসীমের মধ্যে পরম পুরুষের মধ্যে আপনার ব্যক্তিরূপকে দেখে মুক্তি লাভ করব। বলেছিলেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্।

দেশবিদেশে কত তথ্য আজ আবিষ্কৃত হয়েছে—সে তো বুদ্ধিগত দৈহিক জগতের। কিন্তু এ কী কথা! মহান পুরুষকে দেখেছি, যাঁর বাহিরের ধর্ম্ম নেই, আপনাতে যিনি আপনি আলোকিত। এ তো বস্তুর জগতের কথা নয়, আমার দেহ

যেখানে আছ, যেখানে আছে নানা আয়োজন, তার কথা নয়। এর রূপ নেই ভার নেই; এর আশ্রয় চন্দ্র সূর্য্য বিশ্বকে নিয়ে নয়। এই কথা বলতে পারি নে বলেই আজ এত হানাহানি। পৃথিবী রসাতলের দিকে চলেছে, কী কলুষ তাই আজ চার দিকে! রক্তে রক্তাক্ত আজ এই সুন্দর পৃথিবী। আত্মার মধ্যে পরমাত্মার যোগ, আশ্চর্য্য আমাদের এই কথাটি কবে অন্তকার বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্বকোলাহলের উর্দ্ধে ধ্বনিত হবে! পূজা দেব কোথায়? ছোটো ঘর থেকে মানুষ বাইরে যায়, কারণ সেখানে দেয়ালের মধ্যে দেহের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা ছাড়া পায় না, মন ক্লান্ত হয়, তাই অবারিতকে আমরা চাই।—ঘরের মধ্যে বদ্ধ মন যেমন বৃহদাকাশকে খোঁজে তেমনি মহান্ পুরুষকে সন্ধান করে সংসারে বদ্ধ মন। কোথায় রাখব আমাদের পূজা? এই দেশকালের সীমানায়? উপনিষৎ বলেছেন,—না, বাইরের সংসারে এই দেশকালের আয়তনের মধ্যে তো আত্মার মুক্তি নেই—মহান পুরুষের মধ্যে যে অসীম আশ্রয় সেই তো বড়ো আশ্রয়। বিজ্ঞান প'ড়ে দেশকালগত বিশ্বপ্রকৃতির বৃহত্বে আমরা অভিভূত হই—কিন্তু সেও তুচ্ছ আত্মার অসীমতার কাছে সেইখানে যে-মুক্তি মানুষ তারই সন্ধান করেছে, এই কথা দেখি ইতিহাসের মধ্যে। সে-পথে তার কত বিকৃতি কত পতন, কিন্তু তার মধ্যে এই অর্থই নিহিত, এই ভূমার আকাঙ্ক্ষা। সমস্ত বিকৃতির মধ্য দিয়ে চিরদিন মানুষ এরই সন্ধান করেছে। অবশেষে দেখলে, আত্মার তৃপ্তি বস্তুরূপে না, দেশকালের মধ্যে না। আত্মার মধ্যে তাঁকে দেখো, সেখানে যদি তাঁকে পাও তবে সব সত্য হবে—এই কথাটি যেমন ক'রে ভারতবর্ষের ঋষি বলেছেন তেমন আর কোথাও কেউ বলেন নি। বাইরের অর্ঘ্যে আমাদের পূজা নয়, হওয়ার দিকেই আত্মার পূর্ণতা আমাদের চিরকালের বাঞ্ছিত। সেখানে সত্য হ'তে পারলে আমাদের সব পূজা সার্থক। অন্যের আত্মায় আপনার আত্মাকে এক ক'রে দেখো—উপনিষদের এই তত্ত্বটি বুদ্ধ ব্যবহারে রূপ দিয়েছিলেন "মৈত্রীর" তত্ত্বে। বাইরের জগতে আলোক যে ঐক্য আনে অধ্যাত্মলোকে সেই আলোকই প্রেম, সেই আনন্দ, সকলের প্রতি প্রসারিত আনন্দ। বিজ্ঞান বলে, জ্যোতিঃ-কণার সন্নিবেশেই অণুপরমাণু, তাতেই সৃষ্টি, উপনিষৎ বলেছেন আনন্দেই সৃষ্টি। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে তো তার দেখা পাবার উপায় নেই, বাইরের থেকে সে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। আত্মার মধ্যে তার সন্ধান করতে হবে। বাইরের সাধনা কৃত্রিম—বিনি আনন্দরূপমমৃতম্ সর্ব্বত্র তাঁর আনন্দ পাওয়া চাই। প্রেমের দ্বারা আত্মার ঐক্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সেইখানেই তো অধ্যাত্মলোক। সেইখানে পৌঁছতে পারে নি বলেই তো মানুষের এত দুঃখ। অন্তরে তার বেদনা, কিন্তু সে পায় নি, যেমন ক'রে সে বাইরের এই মহাবিশ্বকে পেয়েছে তেমন ক'রে আত্মাকে পায় নি। তাকে লাভ করবার জন্যই তো মহাপুরুষের আহ্বান—সে আহ্বান জপতপের জন্য নয়, পরম মুক্তির জন্য সে আহ্বান। কত বড়ো বিশ্বাসে বুদ্ধ আহ্বান করেছিলেন, বলেছিলেন "যেমন ক'রে এক পুত্রকে মাতা ভালবাসেন, তেমনি করেই মৈত্রীর সাধনা করতে হবে।"

আত্মার অর্ঘ্য প্রেম। সেই বাণী ভুলি নে যেন। সংসার আজ পীড়িত। আঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সত্যভ্রষ্ট হয়েছি এই বেদনা মনে জাগা চাই—অধ্যাত্মলোকে আশ্রয়ের অভাব যদি আমাদের পূর্ণ হয় তবেই আমরা বাঁচলুম। সেই সত্যের কামনা মনের মধ্যে রেখে সাধনাকে যেন আমরা জাগ্রত ক'রে রাখতে পারি।*

---

* গত ৭ই পৌষের উৎসবে শান্তিনিকেতনে মন্দিরে আচার্য্যের উপদেশ।

উদ্বোধন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান—"তুমি আপনি জাগাও মোরে।"

আজ এখানকার কর্ম্মসংসারে আমাদের নববর্ষের প্রথম দিন। প্রতি বর্ষে আজকের দিনে আমাদের অন্তরের এই প্রার্থনা। সব সময়ে সে প্রার্থনা সফল না হ'তে পারে, বারেবারেই তা আমরা বিস্মৃত হই, জাগ্রত চিত্ত নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারি নে, চিত্তকে সরিয়ে দিয়ে অভ্যস্ত নৈপুণ্যে যন্ত্রের মতো কাজ করি হৃদয় তাতে যোগ দেয় না। কর্ম্মই যেখানে শেষফল সেখানে এতে কোনো ক্ষতি হয় না, নৈপুণ্যের যোগে সেখানে সিদ্ধি লাভ ঘটতে পারে, কাজ হয় নিখুঁত, বরাবরকার অভ্যাস বশত সহজেই কাজের চাকা চলে। কিন্তু এই আশ্রমের কাজে বাইরের সম্পূর্ণতাটাকেই তো আমরা মুখ্য ব'লে স্বীকার করি নি, সত্যের সাধনাকেই ঊর্দ্ধে তুলে রাখতে চেয়েছি।

এখানে আমরা কর্ম্মের যোগে মিলিত। কিন্তু তার লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি পরম সত্তাকে উপলব্ধি করা যাতে এই মিলনের পথে জীবন সার্থক হয়। তার তো আর কোনো উপায় নেই। একলা ব'সে পূজা ধ্যান, একলার মধ্যে অধ্যাত্মরস সম্ভোগ—তার কোনো মূল্য নেই, এমন কথা বলছি নে। কিন্তু সত্যকে পাবার প্রথম সোপান, ত্যাগের দ্বারা সকলের মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করা। তারই উপলক্ষ্য আমরা এখানে রচনা করেছি; এই জন্যই আমরা একে বিদ্যালয় বলি নে, বলি আশ্রম, কেন-না এর মধ্যে আশ্রয়ের ভাব আছে। এখানে মিলনের সূচনা হয়েছে—সেই মিলন যাতে পরম মিলনের বার্ত্তা আনে; তারই জন্য আমাদের সাধনা। আফিসে অনেক স্থানেই তো আমরা অনেক মানুষ জড়ো হই, কিন্তু সেখানে আমরা একত্র হই, মিলিত হই নে। সকলের শক্তিকে কর্ম্মের রজ্জুতে মিলিয়ে কর্ম্মকর্ত্তা আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না। রিপু সেখানে পরস্পর মিলনে বাধা দেয়, ঈর্ষা বিদ্বেষ নিরস্ত হয় না। সেই জন্যই আজ আমাদের এই প্রার্থনা—"তুমি আপনি জাগাও মোরে"—সমস্ত জড়তা হ'তে তুমি আমাদের জাগাও, কর্ম্মের মধ্যে পরম মিলনে তুমি আমাদের চিত্তকে জাগাও, একান্ত অব্যবহিত যে উপলব্ধি, সত্যের আলোকে সেই সহজ উপলব্ধি আমাদের মনে উদ্বুদ্ধ করো। এই আশ্রমের চারিদিকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সে-সাধনার আনুকূল্য আছে—আজকের প্রভাতের সেই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য সেই বার্ত্তাই বহন করে আনছে। সকল সাধনার উপরে সত্যের সাধনা, অন্তঃকরণকে জাগিয়ে তুলে সেই কথাটিই বলতে হবে—সংকল্প যেন ব্যর্থ না হয়, সমস্ত চৈতন্য যেন আজকের প্রভাতের এই আলোকে উদ্বোধিত হয়। সমস্ত পৃথিবী আজ বাধায় সংশয়ে আবিল: উপর থেকে আলোক নামুক আমাদের অন্তরে। রাত্রির অন্ধকারকে ভয় করি নে, সে তো আনে বিশ্রাম: ভয় করি সংশয়ের কুহেলিকাকে, বুদ্ধির অহমিকাকে, বাইরেই যে আপনার শক্তি ব্যয় করে ফেলে। পৃথিবীর ঘরে ঘরে আজ এই সংশয়; এমন মানুষ ক'জন আছে যে নিষ্কৃতি পেয়েছে এই বিশ্বব্যাপী কুহেলিকা থেকে, যে-কুহেলিকা প্রভাতের নির্ম্মলতাকে অস্বীকার করে, যে-তর্কজাল আপন আকাশকে অস্বচ্ছ করে পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই এই সংশয় আজ অল্প-বিস্তর প্রবেশ করেছে—যাদের সঙ্গে, যাদের জন্য কাজ করি সর্ব্বত্রই এই বিদ্রূপের হাসি। সহজ উপলব্ধি নিয়ে বিশ্বাস করি, একথা বলতে বুদ্ধি অভিমানী সাহস করে না। এই চারিদিকের ভীরুতাই সাধনায় আমাদের বাধা। সেই বাধাকে অতিক্রম করে আমরা যেন সত্যকে অন্তরে প্রবেশ করতে দিই, যে আলোক আপনি নেমে আসছে তাকে স্বীকার করি। চারিদিকের কোলাহল দ্বন্দ্ববিদ্বেষ যেন আমাদের কর্ম্মকে নিষ্প্রভ না করে। কর্ম্মলোভী না হয়ে তার চেয়েও বড়ো ফল যেন আমরা আকাঙ্ক্ষা করতে পারি। নববর্ষের সর্ব্বপ্রথম দিনে এই আমাদের প্রার্থনা। বাইরে যিনি বিশ্বকে জাগান্ আলোকে, আমাদের চিত্তকেও তিনি জাগরিত

করুন। আলোককে প্রমাণ করবার জন্ত যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হয় না, কোনো পণ্ডিতের কাছে যেতে হয় না—আপনাকে সে আপনি সপ্রমাণ করে; সত্যের আলোক, সেও তেমনি চিত্তের মধ্যে আপনাকে সপ্রমাণ করে—সহজে যেন তাকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারি, এ প্রার্থনা।*

*গত ৭ই পৌষের উৎসবে শান্তিনিকেতনে মন্দিরে আচার্যে উদ্বোধিনী বক্তৃতা।

মহিলা-সংবাদ



শ্রীমতী লাবণ্যলতা সেনগুপ্তা

শ্রীমতী লাবণ্যলতা সেনগুপ্তা ঢাকা বোর্ডের অধীনে ১৯২৬ সনে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯২৮ সনে আই-এ পরীক্ষায় মহিলা ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হইয়া কুড়ি টাকা করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩০ সনে বেথুন কলেজ হইতে গণিতে অনার্স লইয়া তিনি বি-এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন এবং 'শান্তিলতা বসু রায়' স্বর্ণপদক লাভ করেন। প বৎসর ডায়োসেসন কলেজে বি-টি পরীক্ষায়ও উত্তী হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হই গত এম-এ পরীক্ষায় গণিতশাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চ স্থান লা করিয়াছেন।

বহির্জগৎ

নৌবহরের কথা ও জাপানের দাবি

১

বৎসর-তিনেক পূর্ব্বে এক বিশিষ্ট বন্ধু ইউরোপ-ভ্রমণের পর স্বদেশে ফিরিয়া বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যের যুবকগণ আবার যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কথায় তখন কর্ণপাত করি নাই। কিন্তু গত তিন বৎসরের ঘটনাপরম্পরায় এখন আর একথা অবিশ্বাস করা যায় না। স্থলবাহিনীর ন্যায় নৌবাহিনী ও নব নব আবিষ্কৃত অস্ত্রশস্ত্র আধুনিক কালের রাষ্ট্রবর্গের প্রধান সম্পদ—আধুনিক যুদ্ধেরও প্রধান উপকরণ। বিমান-পোত ও সাবমেরিনও যুদ্ধের সময় বেশ কাজে লাগিয়া থাকে। সাবমেরিনের মহিমা গত মহাযুদ্ধে প্রকট হইয়াছিল। ইদানীং পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি নিজেদের রণসম্ভার বাড়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। মহাযুদ্ধ আসন্ন কি-না কে বলিতে পারে?

ব্রিটেন, মার্কিন ও জাপান এই তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে নৌবহর নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্ত্তমান বৎসরে একটি বৈঠক হইবার কথা। গত ১৯৩৪ সনের শেষভাগে লণ্ডনে আগামী বৈঠকের বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে ইহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়। কিন্তু কোন স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই ইহা স্থগিত রাখা হইয়াছে। এই আলোচনার ফলে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে মনে হয় আগামী নৌবৈঠকও ব্যর্থ হইবে। জাপান কিছুকাল যাবৎ নৌবহর সম্পর্কে ব্রিটেন ও মার্কিনের সমান হইবার দাবি করিতেছে। প্রকাশ, জাপানের এই অত্যধিক দাবিতেই আলোচনা স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। ইহার উপর গত ২১এ ডিসেম্বর জাপান মার্কিনকে ১৯২২ সনের ওয়াশিংটন নৌচুক্তির অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছে। অন্যদিকে সিঙ্গাপুর ঘাঁটিতে ব্রিটিশ নৌবহরের মহড়া হইয়া গিয়াছে। এই সব কারণে নানা লোকে নানা পত্রে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিতেছেন।

এই সব আলোচনার মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। ব্রিটেন ও মার্কিনের পক্ষে ওকালতির অভাব নাই। বেচারা জাপানই এখন সকলের কোপে পড়িয়াছে। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। আমরা বিদেশ হইতে সংবাদ পাই রয়টারের মারফত। বিদেশী মতামতের পরিচয় পাই প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তক-পুস্তিকা ও সাময়িক পত্রের মধ্য দিয়া। এগুলির অধিকাংশই আবার ইংরেজ ও মার্কিনীদের লেখা। ইহাদের মধ্যে জাপানের বিরোধী ভাবই বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠে। সেদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপে বুঝিলাম, জাপানের বিরুদ্ধ মতামত প্রাচ্যবাসীদের চিন্তাধারাও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি স্পষ্টই বলিলেন, নৌবহর সম্পর্কে জাপানের কোন দিকই নাই অর্থাৎ তাহার তরফ হইতে বলিবার কিছুই নাই। এই জন্য জাপানের বর্ত্তমান দাবির কথা আলোচনা করাও বিশেষ প্রয়োজন।

২

গত শতাব্দীতে বঙ্গকবি জাপানকে অসভ্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দীর চেষ্টায় তাহার সে অপবাদ ঘুচিয়া গিয়াছে। জাপান বর্ত্তমানে অন্যতম সুসভ্য দেশ। ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি সব দিকেই সে অগ্রসর। জাপান সৌন্দর্য্যের উপাসক, এবং এই কারণে জগতের আদর্শস্থল। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ যখন প্রাচ্যখণ্ড লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছিল তখন জাপান মা ভৈঃ রবে মাথা তুলিয়া



য়্যাডমিরাল টোগো। ইনি ১৯০৪ সনে রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় পোর্ট আর্থারে রুশ রণতরী ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। ইনি গত মে মাসে পরলোকগমন করিয়াছেন।

তাহা রোধ করিয়াছিল। ১৯০৪ সনে পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে এ্যাডমিরাল টোগো রুস নৌবহর ছত্রভঙ্গ করিয়া নিখিল জগদ্‌বাসীকে দেখাইয়াছিলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতি অবলম্বন করিলে প্রাচ্যও পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির সমশক্তি অর্জ্জন করিতে পারে—এমন কি প্রয়োজন হইলে ইহাদিগকে হারাইয়া দিতেও সক্ষম। প্রাচ্যের বহু ভূখণ্ড ইতিপূর্ব্বে বিদেশীর

করতলগত হইলেও নবারুণ রঙে রঞ্জিত স্বাধীন জাপানের দিকে চাহিয়া তাহারা আশ্বস্ত হইয়াছিল। ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিতে প্রাচ্যগণ একই সূত্রে গাঁথা, কাজেই একের শ্রীবৃদ্ধিতে অন্যের উৎফুল্ল হওয়া স্বাভাবিক।

জাপানের 'অত্যধিক দাবি'র স্বরূপ জানিতে হইলে ওয়াশিংটন নৌচুক্তির কথা আলোচনা করা আবশ্যক। গত মহাযুদ্ধের বিভীষিকার ছায়ায় ১৯২২ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটন নৌচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তখন জেতা বিজিত সকলেই পরিশ্রান্ত ও হীনবল। নিছক আত্মরক্ষা ছাড়া যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে নৌবহর যাহাতে না বাড়ান হয় সেদিকে সকলেরই শ্যেন দৃষ্টি।

এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে ওয়াশিংটন নৌচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই সময়ে আরও কতকগুলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু নৌচুক্তিকে ঘিরিয়াই বর্ত্তমানের আন্দোলন। এই চুক্তির অন্য নাম পঞ্চশক্তি-চুক্তি। কারণ ব্রিটেন, মার্কিন, জাপান, ফ্রান্স ও ইটালি এই পাঁচটি শক্তির প্রতিনিধিগণ ইহাতে স্বাক্ষর করেন। পরে শেষোক্ত দুই সরকার এই চুক্তি স্বীকার করিতে অসম্মত হইলে ইহা ওয়াশিংটন নৌচুক্তি বলিয়াই অভিহিত হয়। কাজেই, ব্রিটেন মার্কিন ও জাপান সম্পৃক্ত সর্ত্তগুলিই এখানে বিবেচ্য।

ওয়াশিংটন নৌচুক্তিতে বড় যুদ্ধজাহাজগুলির অনুপাত নির্দ্ধারিত হয় ৫ : ৫ : ৩। অর্থাৎ ব্রিটেন ও মার্কিন প্রত্যেকে ৫২৫,০০০ টন ও জাপান ৩১৫,০০০ টন পরিমাণ রণপোত রাখিতে পারিবে। এই রণপোতগুলির প্রত্যেকখানি হইবে ৩৫,০০০ টনের অনধিক ও ইহাদের কামানের ভিতরকার ব্যাস ১৬ ইঞ্চি। ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট রণপোতগুলির অনুপাত ও পরিমাণ এ বৈঠকে নির্ণীত হয় নাই, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকখানি ১০,০০০ টনের মধ্যে ও কামানের মুখ ৮ ইঞ্চির মধ্যে হইবে স্থির হয়। বিমানপোতবাহী জাহাজের অনুপাত বড় রণপোতের মতই হইবে, ইহার প্রত্যেকখানি হইবে ২৭,০০০ টনের মধ্যে। ব্রিটেন ও মার্কিনের মোট পরিমাণ ১৩৫,০০০ টন করিয়া, ও জাপানের ৮১,০০০ টন (অনুপাত ঠিক ৫ : ৫ : ৩)।

ওয়াশিংটন বৈঠকের অমীমাংসিত বিষয়গুলি ১৯৩০ সনের প্রথম ভাগে লণ্ডন নৌবৈঠকে স্থির হয়। বহু দিনের আলোচনার ফলে ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার ও সাবমেরিনের পরিমাণ নিম্নরূপ ধার্য্য হয়।—

শ্রেণী	মার্কিন	ব্রিটিশসাম্রাজ্য	জাপান
ক্রুজার			
(ক) ৮.০ ইঞ্চির			
অধিক মুখের কামান	১৮০,০০০ টন	১৪৬,৮০০ টন	১০৮,৪০০ টন
(খ) ৬.১ ইঞ্চি বা			
তাহার কম মুখের কামান	১৪৩,০০০ "	১৯২,২০০ "	১০০,৪৫০ "
ডেষ্ট্রয়ার	১৫০,০০০ "	১৫০,০০০ "	১০৫,৫০০ "
সাবমেরিন	৫২,৭০০ "	৫২,৭০০ "	৫২,৭০০ "

ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার ও সাবমেরিন প্রত্যেকখানা কত পরিমাণের হইবে তাহাও এই বৈঠকে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১৯৩৬, ৩১এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই চুক্তি বহাল থাকিবার কথা। আর একটি সর্ত্ত স্থির হয় যে, ১৯৩৫ সনে আবার নৌচুক্তি সম্পৃক্ত বৈঠকের আহ্বান করা হইবে। ওয়াশিংটন নৌচুক্তিও ১৯৩৬ সনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তবে ইহার অদল-বদল করিতে হইলে দুই বৎসর পূর্ব্বে শক্তিবর্গকে জানাইতে হইবে। এই সর্ত্ত অনুসারেই জাপান ওয়াশিংটন নৌচুক্তির অস্বীকৃতি গত ২৯এ ডিসেম্বর ঘোষণা করিয়াছে।



লণ্ডন নৌবৈঠক, ১৯৩০। ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এখানে যে নৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাহা ১৯৩৫ সনের পরে আর বহাল থাকিবে না।

৩

১৯৩০, ২২এ এপ্রিল লণ্ডন নৌচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাহার পর হইতে এই পাঁচ বৎসর বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপে একটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা বিগত মহাযুদ্ধের স্মৃতিবিমুক্ত হইয়া ভাবী ভীষণতর যুদ্ধের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। বিভিন্ন দেশের স্বার্থের মুখে রাষ্ট্রসংঘের মিলন প্রচেষ্টা, নিরস্ত্রীকরণ-বৈঠক প্রভৃতি সকলই ব্যাহত। ইউরোপীয় দায়িত্বশীল রাষ্ট্রনায়কেরা সভাসমিতিতে যুদ্ধের মহিমা ঘোষণা করিয়া জনগণকে আসন্ন মহাসমরের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন। ইটালীর সর্ব্বাধ্যক্ষ সিনর মুসোলিনী এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"War is for man what materty is for woman." নারীর পক্ষে মাতৃত্ব, পুরুষের পক্ষে সংগ্রাম দুই-ই সমপর্য্যায়ভুক্ত—সিনর মুসোলিনীর ইহাই অভিমত। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল নেতা মিঃ বল্‌ডুইন আসন্ন সংগ্রামের স্থান নির্দ্দেশও করিয়া দিতেছেন। তিনি পার্লামেণ্টে রণসম্ভার বাড়াইবার প্রস্তাব সমর্থন করিতে গিয়া বলেন—"When you think of the defence of England, you no longer think of the chalk cliffs of Dover but of the Rhine." অর্থাৎ 'তোমরা যখন ইংলণ্ড রক্ষার কথা চিন্তা কর তখন আর তোমরা শ্বেতশিখরবিশিষ্ট ডোভার শহরের কথা ভাব না, রাইন নদীর কথাই তোমাদের মনে আসে।' দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকের মুখনিঃসৃত এই সকল বাণী লোকের মনে আতঙ্কের উদ্রেক করিতেছে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালী অস্ত্রশস্ত্র-সংগ্রহে ও রণপোত-নির্ম্মাণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে। সম্প্রতি প্রকাশ, জার্ম্মানীও এবিষয়ে এখন আর কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ নহে।

ইউরোপের প্রধান রাষ্ট্রগুলির কার্য্যকলাপ জগতের অন্যান্য রাষ্ট্রকেও সজাগ করিয়া দিতেছে। ইংলণ্ডের সহিত মার্কিন ও জাপান নৌচুক্তিতে আবদ্ধ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অন্য রাষ্ট্রগুলি নৌবৈঠকে যোগ দিলেও তাহাদের সরকার ইহার চুক্তি স্বীকার করে নাই। কাজেই ইহারা যখন নূতন কিছু করিতে চাহে তখন মার্কিন বা জাপানের কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু ইংলণ্ড যখন এই সম্পর্কে কিছু করিতে অগ্রসর হয় তখনই চুক্তিবদ্ধ অপর দুই রাষ্ট্রের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের নৌবহর-মন্ত্রী এক জনসভায় বলেন, "I believe a strong Navy helps more than anything towards world peace." 'বিশ্বের শান্তি স্থাপনে শক্তিশালী নৌবহর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করে।' প্রকাশ, ইংলণ্ড-সরকার ১৯৩৪ সনে ১৪,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে নূতন রণপোত নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, এবং ঐ বৎসরের শেষে ১৩খানা ক্রুজার, ২৭খানা ডেষ্ট্রয়ার, ৮খানা সাবমেরিন, ১৪খানা স্লুপ ও একখানা বিমানপোতবাহী জাহাজ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে জানা গিয়াছিল। ইদানীং নির্ম্মাণকার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়া থাকিবে। ১৯৩৫ সনে নৌবৈঠকের অধিবেশনের প্রাক্কালে বিলাতের এইরূপ কার্য্যের উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্বন্ধে নিম্নের উক্তি যথেষ্ট আলোকপাত করিবে। 'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা নিউ ইয়র্ক হইতে লেখেন,—

"While it may be argued that the new British programme would discourage the Japanese, making them feel they cannot afford equality on such an expensive scale, it is feared here that the result may be just the contrary and may embolden the Japanese to demand a tremendous increase in their fleet."

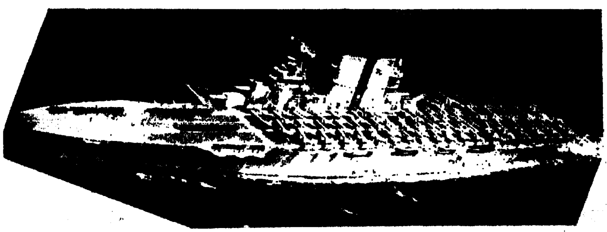
ইহার মর্ম্ম এই বলা হইতেছে ইংলণ্ডের অনুকরণে জাপান অনুরূপ আয়োজন করিতে নিরস্ত হইবে। কারণ বিপুল অর্থব্যয়ে সমশক্তি লাভ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু লোকে আশঙ্কা করিতেছে, ইহার ফল বিপরীতই হইবে—জাপানীরা নৌবহর বাড়াইতে অধিকতর বদ্ধপরিকর হইবে।

গত কয়েক মাসের ঘটনায় এই আশঙ্কা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের নৌবহর-বৃদ্ধিই জাপানের বর্ত্তমান সঙ্কল্পের একমাত্র কারণ নহে। মার্কিনও তাহার নৌশক্তি এরূপ বাড়াইয়া চলিয়াছে যে, পূর্ব্ব অনুপাত মানিয়া লওয়া জাপানের পক্ষে এখন অসম্ভব। এখানে যে তালিকাটি দিলাম তাহা হইতে ১৯৩৪ সনের ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত প্রধান রাষ্ট্রগুলির নৌশক্তির সন্ধান মিলিবে। রণপোতের প্রধান প্রধান কয়েকটি শ্রেণীর মাত্র এখানে উল্লেখ করিব।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের রণতরীর হিসাব

শ্রেণী	ব্রিটিশসাম্রাজ্য	মার্কিন	জাপান	ফ্রান্স	ইটালি	রুশিয়া	জার্ম্মানী
রণপোত (বড়)	১২	১৫	৯	৯	৪	৩	৬
ক্রুজার (মোট)	৫৪	২১	৩৬	১৯	২৪	৮	৮
বিমানপোতবাহী জাহাজ	৮	৩	৪	২	১	—	—
ডেষ্ট্রয়ার	১৩৪	২৫১	১০২	৬৮	৭৪	১৭	১৬
সাবমেরিন	৫২	৮২	৫৯	৯৮	৪১	১৬	—
স্লুপ	৩০	—	—	১২	২৬	৪	—
মাইন সুইপার	২৭	৪৩	১২	২৫	৪৮	৬	২৯

এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে। তথাপি ইহা হইতেই বুঝা যাইবে জাপান নৌশক্তিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ইংলণ্ডে নবনির্ম্মিত পোতগুলি অবশ্য ইহার বাহিরে।



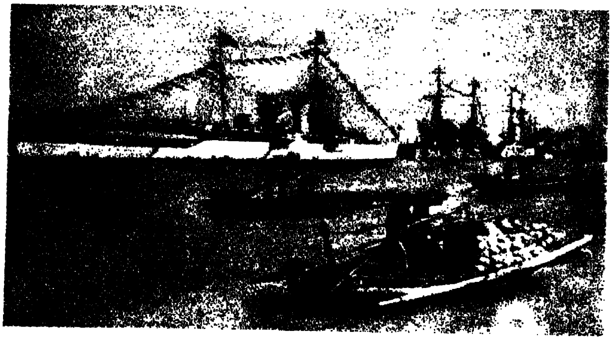
"সারাটোগা"—মার্কিনের একখানি বিমানপোতবাহী জাহাজ। বিমানপোতগুলি এই জাহাজ হইতে উড়িতে পারে ও ইহার উপর নামিতে পারে।

৪

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রিটেন, মার্কিন ও জাপানের নৌবহর সম্পর্কে অনুপাত ৫: ৫: ৩। জাপানের বর্ত্তমান দাবি ৫: ৫: ৫—অর্থাৎ তিনটি রাষ্ট্রই নৌশক্তিতে সমান হওয়া চাই। জাপানের এই দাবির বিরুদ্ধে নানা যুক্তি উপাপিত হইয়াছে। মার্কিনের এ্যাডমিরাল প্রাট্ নামক নৌবহরে বিশেষজ্ঞ ও ইহার অন্যতম নায়ক গত জুলাই সংখ্যা *Foreign Affairs* পত্রে জাপানের এই দাবির অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রধানতঃ ইহার উপর নির্ভর করিয়া

এদেশে জাপানী-বিরোধী মত প্রচারিত হইয়াছে। প্রাটের মতবাদের জবাব দিয়াছেন নৌবহর-বিশেষজ্ঞ মাসানরী ইতো এক জাপানী পত্রিকায়। তাঁহার কথাও আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

জাপানের দাবির বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে একটির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ব্রিটেন চারিটি সমুদ্রের মালিক, মার্কিনকেও দুইটি সাগরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে হয়; অপর পক্ষে জাপান মাত্র একটি সমুদ্রের উপর খবরদারি করিয়া থাকে। এই জন্য ব্রিটেন ও মার্কিনেরই বর্দ্ধিত অনুপাত আবশ্যক, জাপানের ইহার প্রয়োজন নাই। মাসানরী ইতোর মতে এই যুক্তি ভ্রমাত্মক। ইংরেজেরা সচরাচর বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের সমুদ্র রক্ষা করিতে হয়, ইহার বস্তুতঃ অর্থ—শত্রুর বিরুদ্ধে সমুদ্র রক্ষা করা। শত্রুর শক্তি বিবেচনা করিয়াই নৌশক্তি বাড়াইতে কমাইতে হয়। চারিটি কি দুইটি কি একটি সমুদ্রের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে হয় বলিয়া ইহা প্রয়োজন হয় না। এই দিক দিয়া ব্রিটেন মার্কিন জাপান সকলের প্রয়োজনই অনুরূপ।



সাংঘাইয়ের নিকটবর্ত্তী হোয়াংপু নদীতে স্থিত রণপোতসমূহ। এই চিত্রে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও মার্কিনের রণতরী দেখা যাইতেছে।

বর্ত্তমানে ব্রিটেন ও মার্কিনের জলপথে শত্রুপক্ষ কেহ নাই। তথাপি তাহারা এরূপ বিরাট নৌবহর পোষণ করিতেছে কেন? ভাবী শত্রুর (hypothetical enemy) আক্রমণের বিরুদ্ধেই এই আয়োজন। নৌশক্তিতে ইহারা প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে লড়িতে এখন আর কোন রাষ্ট্র ভরসা পায় না। অবশ্য সাবমেরিন বা বিমানপোতের সাহায্যে বড় বড় রণতরী ঘায়েল করা সম্ভব। কিন্তু ইহাও শেষ পর্য্যন্ত লাভজনক নয়। সেজন্য এগুলির কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নহে।

বর্ত্তমান অনুপাত সমুদ্রপথে প্রাধান্য লাভ হইতেই নহে, আত্মরক্ষার জন্য যে-শক্তিলাভ প্রয়োজন তাহা হইতেও জাপানকে বঞ্চিত করিয়াছে। অথচ সমুদ্রপথে ব্রিটেন বা মার্কিনের যেরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে বর্ত্তমান জাপানেরও তাহাই রহিয়াছে। ইহাদের মত জাপানেরও এরূপ শক্তি প্রয়োজন যাহাতে শত্রুপক্ষ কোনরূপে তাহাকে আক্রমণ করিতে সাহস না-পায়। জগতের অন্যান্য রাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্র ও নৌশক্তি এত দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে যে, বর্ত্তমান অনুপাতে সে কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। জাপানের জনসাধারণের আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়া আনিতে হইলে উচ্চতর অনুপাত অবশ্যই নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

বর্ত্তমান অনুপাতের অন্যায্যতা আর একটি দিক হইতেও বিচার্য্য। এখন বড় রণপোতের যে অনুপাত ও সংখ্যা নির্দ্ধারিত আছে, তাহাতে ব্রিটেন ও মার্কিন নিরাপদ। ইহারা প্রত্যেকে ১৫ খানা পর্য্যন্ত বড় রণপোত রাখিতে পারে, জাপান রাখিতে পারে ৯ খানা। রণপোতসংখ্যা অধিক হইলে জাপানের পক্ষে বিপদের সম্ভাবনা কম হইত। ধরুন, ব্রিটেন ও মার্কিনের রণপোত যদি ১০০ খানা করিয়া থাকিত, তাহা হইলে জাপানের থাকিত ৬০ খানা। সুপরিচালিত হইলে ৬০ খানা রণপোতই যুদ্ধজয়ের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ১৫ খানার বিরুদ্ধে ৯ খানার পারিয়া উঠা অসম্ভব। এ অনুপাতে জাপান বস্তুতঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

৫

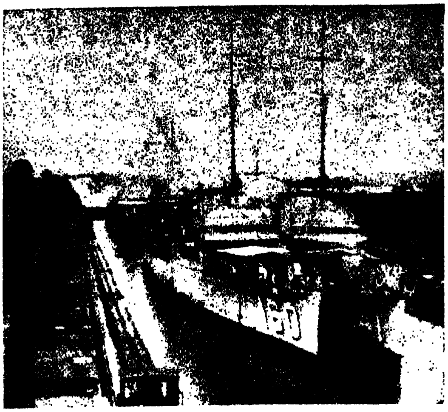
কাহারও কাহারও মতে জাপানের এই দাবির মূলে তাহার সাম্রাজ্য-ক্ষুধা। ইহা সত্য হইলে জগতের শান্তি বিনষ্ট হইবে। জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া ও জেহোল প্রদেশ কার্য্যতঃ অধিকারের প্রতি এই উক্তির ইঙ্গিত আছে। ইতো বলেন, সম অবস্থায় পড়িলে সকল রাষ্ট্রই অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। ইটালী কর্ত্তৃক ট্রিপলি, বেলজিয়ম কর্ত্তৃক কঙ্গো, ফ্রান্স কর্ত্তৃক কাম্বোডিয়া অধিকার একই পর্য্যায়ভুক্ত। আরও শত শত দৃষ্টান্ত দ্বারা এই তালিকা বাড়ান যায়।

অবশ্য এখানে একথা বলা দরকার যে, বর্ত্তমান সাম্রাজ্যবাদই পররাজ্য-হরণ কি স্বরাজ্য-বর্দ্ধন-স্পৃহার জন্য দায়ী। গত তিন শত বৎসর ধরিয়া বর্ত্তমান সাম্রাজ্যবাদ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সকল শক্তিশালী রাষ্ট্রই অনুরূপ অপরাধে অপরাধী। বর্ত্তমান চিন্তাধারা সাম্রাজ্যবাদ আদৌ সমর্থন করে না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদকে ঘায়েল করিতে যে শক্তি প্রয়োজন তাহা মনুষ্যসমাজে এখনও জাগ্রত হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজন। কোন রাষ্ট্রবিশেষকে দোষী সাব্যস্ত করিলেই ইহার উচ্ছেদ সাধিত হইবে না।

ইতো মহাশয়ের মতে আর এক কারণে সমান অনুপাত একান্ত আবশ্যক। বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির রণসম্ভার ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। সকলের শক্তি যদি সমান হয় তাহা হইলে সবল দুর্ব্বলের তারতম্য আর থাকিবে না। পাঁচ লক্ষ টনই বলুন কি দুই লক্ষ টনই বলুন—রণপোতের পরিমাণ সম্মিলিতভাবে যদৃচ্ছা হ্রাস করা সম্ভব হইবে। ইতো বলেন, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক তখন সাফল্যমণ্ডিত হইবে—কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি ও রাষ্ট্রসংঘের নির্দ্দেশ কিছুই মানিয়া লইতে বাধা থাকিবে না। কারণ সকলের মন হইতে বৈষম্যের ভাব বিদূরিত হইবে।

কিন্তু এই বৈষম্য নিরাকরণের প্রধান অন্তরায় ব্রিটেন ও মার্কিন। মিঃ ফ্রাঙ্ক সিমণ্ডস্ *Can Europe keep the Peace* (ইউরোপ কি শান্তি রক্ষা করিতে পারে?) নামক পুস্তকে সত্যই লিখিয়াছেন,—

"Anglo-Saxon conceptions are, however, a curious mixture of hypocrisy and blindness. The



মার্কিনে নৌবহরের মহড়া। চারখানি ডেষ্ট্রয়ার একই সময়ে যাত্রা করিতেছে। সাতচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সর্ব্বসমেত এক শত দশখানা রণপোত পানামা—ক্যানেল দিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

hypocrisy is disclosed in the fact that for themselves both Great Britain and the United States claim complete and overwhelming naval supremacy in those waters which are vital to them......And, although both nations discuss disarmament, neither has any intention of modifying, in the smallest degree, the relative superiority it maintains."

সিমণ্ড্স্ সাহেবের মতে ভণ্ডামি ও অন্ধতার আশ্চর্য্য সংমিশ্রণে এ্যাংলো-স্যাকশন ধারণাগুলি গঠিত। ভণ্ডামি একটা বিষয়ে বেশ ধরা পড়ে। যে-সব সমুদ্রে নিজেদের স্বার্থ রহিয়াছে সে-সব স্থলে ব্রিটেন ও মার্কিন নৌবহরের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত রাখিবার দাবি করে এবং যদিও উভয় রাষ্ট্রই নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক আলোচনায় যোগ দিয়া থাকে তথাপি তাহারা তাহাদের বর্ত্তমান প্রাধান্য বিন্দুমাত্রও হ্রাস করিতে ইচ্ছুক নহে।

এই সব কারণে মনে হয়, ব্রিটেন ও মার্কিনের ন্যায় প্রবল প্রতিপক্ষের সম্মুখে জাপানের সমান অনুপাতমূলক দাবি এতটুকুও অসঙ্গত নহে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

১

ঘড়ির ঘণ্টা সশব্দে বাজিয়া উঠিল। অরুণ বিছানাতে চোখ বুজিয়া নিদ্রাজাগরণের স্বপ্নাবেশময় আবছায়ায় অলস সুখে শুইয়াছিল; কি এক সুখস্বপ্ন-শেষে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। স্বপ্নটি কি তাহার ঠিক মনে পড়িতেছিল না, স্মৃতির পটে অতি হাল্কা রঙীন ছোপ, বালুকাতটে সমুদ্রতরঙ্গের ফেনিল লিপির মত ক্ষণিকের মধ্যে মিলাইয়া যায়—এক গানের মধুর সুর, অজানা পুষ্পদলের মৃদু গন্ধোচ্ছ্বাস, এক কিশোরীর স্নিগ্ধ মুখ কখনও হাস্যে, কখনও কৌতুকে ভরা। সুখস্বপ্নস্মৃতিকে সে জীবন্ত করিয়া তুলিতে চাহিতেছিল।

ঘড়ির এলার্ম-ধ্বনিতে অরুণ চমকিয়া উঠিল, স্বপ্নস্মৃতিজাল ছিন্ন হইয়া গেল। ঘড়ির দিকে কটাক্ষপাত করিয়া তরল অন্ধকারময় ঘরের দিকে চাহিল। ভোরের বাতাসে বড় খাটের পায়ের দিকে ডানপাশে পূর্ব্বের জানালা খুলিয়া গিয়াছে, পঙ্কের কাজ-করা পুরাতন বিবর্ণ দেওয়ালে উষার পাণ্ডুর আলো বড় করুণ দেখাইতেছে, সুবৃহৎ গৃহ আলোছায়াময়।

এলার্ম বাজিতে লাগিল। স্কুলের অনেক পড়া মুখস্থ করিতে হইবে। আজ আবার ইতিহাসের মাসিক পরীক্ষা, দিল্লীর বাদশাহগণের নাম, ভারতের গবর্ণর-জেনেরাল-গণের নাম ও শাসনকাল, নানা সন তারিখ মুখস্থ করিতে হইবে; তার পর সংস্কৃত-ক্রিয়ার ধাতুরূপ, য়্যালজ্যাব্রার ফরমুলা, কবি শেলির একটি কবিতা। যাক, এখনও পাঁচটা বাজে নাই, আরও পনের মিনিট সে বিছানাতে শুইয়া থাকিতে পারে। কাল রাত সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত

জাগিয়া পড়িয়াছে, স্কুলের বই নয়, ডেভিড কপারফিল্ড নামে এক গল্পের বই, তাহার কাকার লাইব্রেরী হইতে আনিয়াছিল ; কাকা কিন্তু রাত বারোটার মধ্যেও ফেরেন নাই। বড় করুণ ডেভিডের জীবন, কিন্তু সে বড় বোকা, য়্যাগনেস যে তাহাকে ভালবাসে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে না, ডোরাকে বিবাহ করিয়া সে কি সুখী হইবে? বোকারা জীবনে ত অসুখীই হইবে। আচ্ছা, য়্যাগনেস কাহাকে বিবাহ করিবে? সে বড় ভাল মেয়ে। চার্লস ডিকেন্স লেখেন ভাল।

ঘড়ির শব্দ ধীরে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। বাড়ির পূব দিকের বাগান পাখীর গানে ভরিয়া উঠিল। অরুণের আর ঘুম আসিল না। চোখ মেলিয়া সে শুইয়া রহিল। নানা কারুকার্য্যময় বৃহৎ খাট, ঘরের এক-তৃতীয়াংশ জুড়িয়া তাহার মায়ের বিবাহের খাট, মেহগনী পালিশ প্রায় কালো হইয়া গিয়াছে।

খাটের মাথায় দক্ষিন দেওয়ালে অরুণের মাতার বৃহৎ অয়েল-পেন্টিং ; মায়ের মৃত্যুর পর তাহার পিতা এক ফরাসী চিত্রকর দিয়া ফটো হইতে এই ছবি আঁকাইয়াছিলেন। এ ঘরে পিতার বৃহৎ ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট রাখিবার আর স্থান নাই, আর তাহার ছোটবোন প্রতিমা তাহার ঘরে একটি ফটো রাখিতে চায় ; স্বর্গগত জনক-জননীর ছবি আসবাবপত্র জিনিষ দুই ভাইবোনে ভাগ করিয়া লইয়াছে।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিয়া গেলে অন্ধকারময় স্নিগ্ধ স্তব্ধতায় অরুণের ছেলেবেলার কথা ভাবিতে ইচ্ছা করে, —স্বপ্নছবির পর স্বপ্নছবি। সোনালী শস্যভরা অবারিত মাঠের মধ্য দিয়া নদীর রজতধারা আঁকিয়া-বাঁকিয়া সুনীল প্রান্তরে গিয়া মিশিয়াছে, তাহার তীরে তাহাদের বাংলো-বাড়ি ছবির মত ; সেখানে বাবা ও মায়ের সঙ্গে সে ও টুলি কি সুখে আনন্দে দিন কাটাইয়াছে,—নদীতে সাঁতার-কাটা, বাগানে ফলপাড়া, বাবার সঙ্গে বজরাতে 'টুরে' যাওয়া, আমগাছে বাঁধা দোলনাতে দোলা, সেই বুড়ো বটগাছের তলায় চড়ুইভাতি, সন্ধ্যায় মায়ের গল্প বলা—তখন তাহারা ডেপুটি সাহেবের ছেলেমেয়ে, কত যত্ন, কত আদর।

মা কি সুন্দরী দেখিতে ছিলেন, তেমনি সুন্দর রাঁধিতে পারিতেন। ফরাসী চিত্রকর অরুণের করমর্দ্দন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—কি হে, ঠিক হয়েছে, তোমার মা'র ছবি? সে উত্তর দিয়াছিল আমার মা এর চেয়ে অনেক সুন্দরী ছিলেন, সে তুমি আঁকতে পারবে না। সে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য অয়েল-পেন্টিংএ কেমন করিয়া আসিবে! এ-দৃষ্টিতে সে স্নেহ-মমতা কই?

দরজায় করাঘাত হইল। অরু, উঠেছিস—ওঠ্ অরু—উঠেছিস অরু। ঠাকুমার গলা। ঠাকুমাকে সে বলিয়াছিল, ভোরে জাগাইয়া দিতে। দরজা ধাক্কা দিয়া খুলিয়া জল-ছড়া দিয়া ঠাকুমা চলিয়া গেলেন। অরুণকে এবার উঠিতেই হইল।

সিঁড়ির উত্তরে প্রতিমার ও দক্ষিণে অরুণের ঘর, মধ্যে ঘোরান-সিঁড়ি পূজার দালানের পাশ দিয়া দুই মহল বিভাগ করিয়া ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে ; দুই মহলওয়ালা বৃহৎ বাড়ি প্ল্যান করিয়া তৈরি নয়, গত নব্বই বৎসর ধরিয়া ঘোষ-বংশের নানা কর্ত্তার খুশীমত গড়িয়া উঠিয়াছে—ছোট-বড় ঘর, নানা বারান্দা, আঁকাবাঁকা অন্ধকার করিডর, অন্ধ কুঠরী, বাড়িটি বিচিত্র গোলকধাঁধা।

হাত-মুখ ধুইয়া অরুণ সিঁড়ির ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতিমার ঘরের দরজা বন্ধ, কোন সাড়াশব্দ নাই। প্রতিমা ভোরে উঠিয়া গান গায়, গলা সাধে। আজ কোন অসুখ করিল কি? কাল রাতে সে ভাল করিয়া খায় নাই। মাঝে মাঝে প্রতিমার জন্য তাহার বড় ভাবনা হয়, বড় রোগা সে।

তেতলার ছাদে সিঁড়ির পাশে এক ছোট ঘর ভাঙা চেয়ার ঝাড়লণ্ঠন ছেঁড়া সতরঞ্চি কার্পেট ইত্যাদি সভা সাজাইবার নানা বহুব্যবহৃত দ্রব্যে পূর্ণ ছিল, সেই ঘর সাফ করিয়া অরুণ তাহার পড়িবার ঘর করিয়াছে। এ-বৎসর তাহার ম্যাট্রিক পরীক্ষা, এখন তাহার সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য সকলে উদ্যোগী।

অরুণ পড়ার ঘরে গেল না, এক তলায় নামিল। বড় লাইব্রেরী-ঘরের পাশ দিয়া পূর্ব্ব দিকের বাগানে বাহির হইয়া গেল। ক্লাসের কোন পড়া ভাল করিয়া হয় নাই, তবু পড়িতে বসিতে তাহার মন লাগিতেছিল না। আপন

মনের চঞ্চলতা বিহ্বলতা তাহার নিজের কাছে অদ্ভুত লাগে। কোন দিন সে নিবিষ্ট মনে সমস্ত সকাল পড়ে, কোন সকাল পড়ায় মন বসে না, বাগানে অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইতে, পুকুরের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বা প্রতিমার সহিত খুনসুটি করিতে বড় ভাল লাগে।

কলিকাতায় কোন বাড়িতে এত বড় বাগান ও পুকুর নাই বলিলেই হয়। ও বাগানের প্রতি বৃক্ষ রোপণের ইতিহাস অরুণ তাহার ঠাকুমার নিকট শুনিয়াছে। তাহার প্রপিতামহী যে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এখন তাহার অৰ্দ্ধেক বুজান হইয়া গিয়াছে। তাহার কোন পূর্ব্বপুরুষ মালদহ হইতে কোন আমগাছের কলম আনিয়া পুঁতিয়াছিলেন, হটহাউস তৈরি করিয়া নানা জাতীয় ফার্ণ, ইংরেজী ফুলের গাছ করিয়াছিলেন, সে-সব গল্প তাহার জানা। এখন সে-হটহাউস ভাঙিয়া গিয়াছে, পরীওয়ালা ফোয়ারা-গুলির জলধারা নিঃশেষিত, ইতালীয় মার্ব্বেলের অৰ্দ্ধভগ্ন নগ্না নারীমূর্ত্তিগুলি জঙ্গলে লজ্জায় লুকাইয়া।

ফাল্গুনের প্রভাত স্নিগ্ধ সুন্দর; তালপুকুরের স্থির জলে নবীন রৌদ্রালোক কচি শিশুর হাসির মত; নারিকেল গাছগুলির শ্যামমসৃণ পাতা ঝিকমিক করিতেছে; এক মর্ম্মরের পরী-শিশুর ভগ্ন হস্তে মাকড়সার জাল বোনা, তাহার উপর শিশিরবিন্দু মুক্তার মত; নব বসন্তের তৃণ—পুষ্প-শোভিত পৃথিবীর অপূর্ব্ব গন্ধোচ্ছ্বাস বর্ণোৎসব অরুণকে যেন অভিভূত করিল। তাহার অন্তর কি অজানা বিষাদে এ-প্রভাতে আরও উদাস হইয়া গেল।

অরুণ যখন তেতলায় পড়িবার ঘরে আসিল, প্রভাত আতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে প্রখর সূর্য্যালোক। টেবিলের উপর চাকর যদু গরম দুধের বাটি, রুটি ও মোহন-ভোগ রাখিয়া গিয়াছে। দুধ ও একখানি বাসি রুটি খাইয়া অরুণ আওরঙ্গজেবের পর দিল্লীর পাতশাহগণের নাম মুখস্থ করিতে বসিল।

স্কুলের বই-খাতা লইয়া প্রতিমা তাহার ঘরে আসিল।

—দাদা, অ-দাদা, আমার অঙ্কগুলো কষে দাও, তা না হ'লে সুধাদি আমায় আজ খেয়ে ফেলবেন।

—সুধাদির তুই প্রিয় ছাত্রী, সুধাদি তোমায় খেয়ে ফেলছেন!

—সত্যি।

—হ্যারে টুলি আজ তোর গলা শুনলুম না?

—বা, গলা কি রকম ধরেছে দেখছ না!

—সর্দ্দি করেছ ত, রাতে কেশেছিলে—শোন্, আমার ঘরে পাথরের টেবিলে সেই পুরনো ফ্রেঞ্চ ঘড়িটার পাশে এক লাল রঙের শিশি আছে, চল্, আমিই যাই।

—বাবা, তোমার ডাক্তারি আর করতে হবে না, আমি ওষুধ খাচ্ছি।

অরুণ স্নেহসিক্ত নয়নে প্রতিমার মুখের দিকে চাহিল। কেন তাহাকে সে এত ভালবাসে, তাহার জন্য মনে বড় ভয় হয়, বড় রোগা সে।

—আচ্ছা, দাদা, বল ত, থার্ড ক্লাসে কখনও এত শক্ত অঙ্ক দেয়, সুধাদি কেবল হেড-মিষ্ট্রেসের কাছে নাম কিনতে চান।

—বেশী জ্যাঠামি করিস না, অঙ্ক পার না, সুধাদির দোষ, ওষুধ খেয়েছিস আজ সকালে?

—খেয়েছি গো, অঙ্কগুলো কষে দাও।

অঙ্ক কষিতে কষিতে অরুণ বলিতে লাগিল—টুলি, অজয়ের বোনেরা তোর স্কুলে পড়ে?

—হ্যাঁ, পড়েই ত!

উচ্চ স্বরে প্রতিমা হাসিয়া উঠিল। হাসিলে তাহার গালে সুন্দর টোল পড়ে।

—উমা কি তোর সঙ্গে পড়ে?

—বা! উমাদি আমার সঙ্গে পড়ে! উমাদি ত সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, আমার সঙ্গে খুব ভাব, জান—সুন্দর গান গায়।

—তোর চেয়ে ভাল?

—অত জানি না বাপু।

—আর শীলা?

—শীলা, বোধ হয় কিফ্‌থ ক্লাস।

—হুঁ, দেখ দেখি, রেজাল্ট মিলল কিনা।

—মিলেছে। আর এইটা। জান দাদা, একটা ভাল গান শিখেছি, তোমার রবিবাবুর নতুন টাটকা গান,

সুরটা কিন্তু আমার তেমন ভাল লাগল না, তবে কথা চমৎকার, তোমার খুব ভাল লাগবে।

—রোস, অঙ্কটা শেষ করি।

—আজ আমি গাইতে পারব না কিন্তু, যা গলাব্যথা।

—ব্যথা! তা ত বলিস নি এতক্ষণ, আজ আর স্কুলে যাস না, আমি ঠাকুমাকে ব'লে দিচ্ছি।

—না, না, আজ স্কুলে যেতে হবে, আজ বড় মজা আছে, শোন, দাদা, আস্তে গাই।

প্রতিমা ধীরে গাহিতে লাগিল—

প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে
মোরে আরও আরও দাও প্রাণ

অর্দ্ধেক গাহিয়া সে থামিয়া গেল। আর তাহার কথা মনে পড়িতেছে না।

—অদ্ভুত তোমার স্মরণশক্তি!

—আচ্ছা দাদা আজ উমাদির কাছ থেকে লিখে নিয়ে আসব। থাক, ওই দুটো অঙ্কতেই হবে। মেনি থ্যাঙ্কস্, তোমার পড়ার অনেক ক্ষতি হ'ল।

প্রতিমা চলিয়া গেল। অরুণের আর পড়া বিশেষ কিছু হইল না। গানের সুর তাহাকে উন্মনা করিয়া দিল। উমা নিশ্চয় এ গান খুব চমৎকার গায়।

২

অরুণ যখন স্কুলের গলির মোড়ে, স্কুলের ঘণ্টা বাজিতেছে। ছুটিয়া সে স্কুলের দিকে চলিল।

প্রথম ঘণ্টা, ইংরেজী, 'নাকুর' ক্লাস। 'নাকু' একটু দেরি করিয়াই আসেন, আর দেরি হইলেও অরুণকে তিনি কিছুই বলিবেন না।

বস্তুতঃ, এই নম্র স্বল্পভাষী সুদর্শন ছাত্রটিকে সকল মাষ্টারই ভালবাসেন; বোধ হয় তাহার বংশের আভিজাতিক গৌরবের জন্য একটু সম্মানও করেন। সহপাঠীদিগের মধ্যেও অরুণ প্রিয়। বন্ধু তাহার খুব বেশী নাই, সে বড় লাজুক; কিন্তু যে-কয়জন বন্ধু আছে তাহারা তাকে সত্যি ভালবাসে, আপন সুখ-দুঃখের কথা বলে। কাহারও সহিত ঝগড়া মারামারি করিতে তাহার কেমন লজ্জা হয়, অন্য ছাত্ররাও তাহার সহিত অভদ্রাচরণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে।

স্কুলের গেটে পৌঁছিতেই জয়ন্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার সঙ্গ লইল।

অরুণ বলিল—ঘণ্টা বেজে গেছে!

জয়ন্ত গানের সুরে বলিয়া উঠিল—আমার ভাগ্যে ত বকুনি আছে।

তার পর অরুণের হাত ধরিয়া বলিল—চল অরু, শেষ বেঞ্চিতে আমার পাশে বসবে, তোমার সঙ্গে ভয়ঙ্কর দরকার।

—কি নতুন কবিতা লেখা হ'ল?

—না, কবিতা নয়, সে ভীষণ ব্যাপার।

জয়ন্ত চৌধুরীকে ক্লাসে সবাই 'কবি' বলিয়া ডাকে। সে লম্বা চুল রাখিয়া কোঁকড়ায়, ঢিলে পাঞ্জাবী পরিয়া গায়ের চাদর লুটাইয়া চলে, পায়ে জরির নাগরা। লম্বা, শ্যামবর্ণ, চোখে উদাস স্বপ্নভরা দৃষ্টি রচনা করিবার প্রয়াস, মন বড় কোমল, বেদনাপ্রবণ।

অরুণ ক্লাসে ঢুকিয়া দেখিল, মাষ্টার মহাশয় আসেন নাই। ভূদো বৃন্দাবনকে লইয়া খুব হৈ রৈ চলিতেছে। বৃন্দাবন গুপ্ত ছেলেটি যেমন মোটা তেমনই কালো, লম্বা হইলেও বেঁটে দেখায়, পায়ে কালো বুট, খাকি হাফপ্যাণ্ট ও সবুজ রঙের বুক-কাটা কোট পরিয়া সে স্কুলে আসে, 'বাস্কেট বল' খেলার বলের মত দেখায়, ছোটবেলা হইতে কলিকাতায় থাকিলেও রাগাইয়া দিলে তাহার পৈতৃক গ্রামের ভাষা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। স্কুলের ছেলেদের মধ্যে হাফপ্যাণ্ট পরার রেওয়াজ তখনও হয় নাই। নাম, চেহারা, বেশ ও ভাষা, ব্যঙ্গ করিবার এতগুলি বিষয়। ছেলেরা ছাড়িবে কেন? অরুণ দেখিল, ক্লাসের মধ্যে বৃন্দাবন পৈতৃক গ্রাম্য ভাষায় তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে আর কেহ সুর করিয়া বলিতেছে, আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব। কেহ বলিতেছে, ওহে হাফপ্যাণ্ট-পরা ধেনু, মোদের ক্লাসে চরতে এল কেনু?

সুহাস সেন ক্লাসের আর্টিষ্ট। পিছনের বেঞ্চে বসিয়া সে মাষ্টার ও ছাত্রদের নানা ব্যঙ্গচিত্র আঁকে। তাহারই আঁকা বৃন্দাবনের একটি সরস চিত্র হাতে হাতে ঘুরিতেছে।

চাণিয়াৎ চট্টো জুতা মসমস করিতে করিতে প্রবেশ করিল। ছেলেটির নাম অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, লম্বা, ফর্সা,

নিখুঁত ভাঁজ-করা সুট পরিয়া হাতে বইখাতা-ভরা চামড়ার ব্যাগ লইয়া আসে, কোটের বুক-পকেটে রঙীন রুমালে এসেন্সের গন্ধ, পিছনে চশমার কালো চওড়া ফিতা কানের পিছনে দোলে। তাহার বাবা ইংরেজী সওদাগর আপিসের বড়বাবু না সেজবাবু, ইহা লইয়া ছেলেদের মধ্যে তর্ক হয়। চালিয়াৎ চট্টো ইংরেজীতে কথা বলে। সে ক্লাসে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর ভাবে বসিল, হোয়াট ইজ-দি ম্যাটার?

ছেলের দল হাসিয়া উঠিল। এক জন বলিল, চালিয়াৎ চট্টো বড় কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে, বস্তু কি? কোথায় হে বাণেশ্বর তর্কচঞ্চু—

অরবিন্দ আসাতে বৃন্দাবন একটু রেহাই পাইল। সে গজগজ করিয়া দ্বিজেনের পাশে বসিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র ক্লাসের 'ভাল ছেলে', প্রায় সব বিষয়ে প্রথম হয়।

অরুণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, বন্ধু অজয় আসিয়াছে কি না। অজয় তাহার সীটে বসিয়া কি লিখিতেছে, নিশ্চয় কোন স্কুলকে ম্যাচ চ্যালেঞ্জ করিয়া চিঠি। অরুণ নিশ্চিন্ত হইল। যতীনকে ডাকিয়া তাহারা পাশাপাশি বসিল।

যতীনকে তাহার বড় ভাল লাগে। খুব গরিবের ছেলে হইবে, ফ্রী পড়ে। পায়ে কাদাভরা চটি, ময়লা কাপড় ও ছেঁড়া শার্ট পরা, শীর্ণ দেহ, কিন্তু মুখখানি বুদ্ধিতে ভরা, টানা কালো চোখ দুটিতে তীক্ষ্ণধী। সেও অরুণের মত স্বল্পভাষী, শান্ত; কাহারও সহিত মিশিতে চায় না। সে যে দরিদ্র এই হীনতাবোধ তাহার চিত্তকে সর্ব্বদা বেদনা-প্রবণ করিয়াছে।

যতীনের সহিত অরুণের বেশভূষায় অত্যন্ত পার্থক্য। অরুণ ময়লা কাপড় পরিতে পারে না, ময়লা জামা গায়ে দিলে তাহার গা ঘিন-ঘিন করে, সহজ সৌন্দর্য্য ও শুচিতার বোধ তাহার জন্মগত। কিন্তু চেহারায় ও মানস প্রকৃতিতে যতীনের সহিত তাহার যোগ রহিয়াছে। তাহার দেহ যতীনের মতই কৃশ, ভঙ্গুরতার ভাবময়; পাণ্ডুর মুখশ্রী কখনও বেদনায় করুণ, কখনও বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। যতীন অরুণের সহিতও বেশী কথা কয় না, কিন্তু কয়েকটি কথাতেই তাহাদের চিত্তের কোন গভীর গোপন যোগ স্থাপিত হইয়া যায়।

ইংরেজী মাষ্টার-মহাশয়ের চোগাচাপকান-পরা দীর্ঘ মূর্ত্তি বারান্দায় দেখা যাইতেই ক্লাস নিস্তব্ধ হইয়া গেল। লম্বা রোগা কালো চেহারা, লম্বা মুখের উপর খাঁড়ার মত নাক, অজীর্ণতাশীর্ণ জলজলে চোখ; অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোক; কেহ কখন তাঁহাকে ক্লাসে হাসিতে দেখে নাই। বেশের কৃষ্ণতায়, দেহের দৈর্ঘ্যে, শীর্ণচক্ষের সুতীব্র দীপ্তিতে সর্ব্বক্ষণ ভয়াবহ স্তব্ধতা সৃষ্টি করিয়া তিনি কিশোর-মনে ভয়ের শাসন স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ছেলেরা পিছনে তাঁহাকে নাকু বলে, কিন্তু তাঁহাকে বাঘের মত ভয় করে। আতঙ্কিত কিশোর-চিত্তের কল্পনায় তিনি রুদ্রদেবতার রূপ।

চেয়ারে বসিয়া নাকু ক্লাসের দিকে চাহিলেন। সবাই ভীত মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পুত্তলিকার মত তাঁহার দিকে চাহিল। তাঁহার দীর্ঘ শীর্ণ তর্জ্জনী যাহার প্রতি নিক্ষেপ করিবেন, তাহাকে সোজা দাঁড়াইয়া আজিকার ইংরজী-পাঠ রীডিং পড়িতে হইবে। তিনি কোন কথা বলিবেন না, শুধু তর্জ্জনীর ইঙ্গিত।

নাকুর তর্জ্জনী অরবিন্দের প্রতি পড়িল। চালিয়াৎ চট্টোকে পড়িতে হইবে ক্লাসের সবাই খুশী।

ড্রিল-সার্জ্জেন্ট যেরূপ গম্ভীর তীক্ষ্ণস্বরে হুকুম করিয়া শিক্ষানবীশ সৈনিকদের কুচকাওয়াজ শেখায়, সেইরূপ অর্ডারের মত নাকুর এক-একটি ইংরেজী কথা বাহির হয়, ছেলেদের বুক দুরদুর করে—সোজা, সোজা দাঁড়াও, সোজা বই।

অরবিন্দ কম্পিত হস্তে চশমার ফিতা ঠিক করিয়া লম্বা টানা সুরে পড়িতে লাগিল; ক্লাসের সকলে চুপ। যখন এক প্যারাগ্রাফ পড়া শেষ হইল, অরবিন্দ নূতন প্যারাগ্রাফ পড়িতে যাইবে, অর্ডার আসিল,—থাম। একি গান? গানের সুর! প্রোজ, প্রোজ!

অরুণ অজ্ঞাত ভাবে হাসিয়া উঠিল। রুক্ষ শীর্ণ তর্জ্জনী অরুণের বেঞ্চের দিকে পড়িল। অরুণের বুক কাঁপিয়া উঠিল, রীডিং সে বেশ পড়িতে পারিবে, কিন্তু শক্ত কথার অর্থগুলি দেখিয়া আসে নাই। সহসা তাহার পাশ হইতে যতীন দাঁড়াইয়া উঠিল। বাঁচা গেল। যতীন বেশ ইংরেজী পড়ে।

অরবিন্দ বসিতে যাইতেছিল, অর্ডার হইল, দাঁড়িয়ে শোন। তর্জ্জনী বেঞ্চির পর বেঞ্চি ঘুরিতে লাগিল। ক্লাস যখন শেষ হইল, সকলে ঘামিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় ঘণ্টা সংস্কৃত, হেড্ পণ্ডিতের ক্লাস। সকলে পঞ্চতন্ত্র খুলিল।

যজ্ঞেশ্বর তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত, ভাটপাড়ার এক প্রাচীন পণ্ডিত-বংশের। এ-যুগে টোল করিয়া চলে না, স্কুল-মাষ্টারি লইতে হইয়াছে। তাঁহার প্রতি সমাজের অবিচারের জন্য তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই কুপিত; চারিদিকে আধুনিক অনাচার-স্লেচ্ছাচারের জন্য তিনি অত্যন্ত বিরক্ত। তাঁহার প্রগাঢ় সংস্কৃত বিদ্যাতেও আর্থিক উন্নতি খুব বেশী হইল না, সুতরাং ছাত্ররা মন দিয়া সংস্কৃত না-পড়িলে তিনি ক্ষুণ্ন হন না। তবে পাস করিবার মত পড়িলেই হইল।

পায়ে তালতলার চটি, মোটা থান কাপড় পরা, গায়ে গলাবন্ধ জামার উপর চাদর, মাথায় শিখা, চোখে ষ্টিল্-ফ্রেমের চশমা। পণ্ডিত-মহাশয়কে ছাত্ররা পছন্দ করে।

পণ্ডিত-মহাশয় ক্লাসে প্রবেশ করিলে, ছাত্ররা দেখে, পণ্ডিত-মহাশয়ের শিখা ঊর্দ্ধে বাঁধা না অধোতে। আর পণ্ডিত-মহাশয় দেখেন তাঁহার পুত্র বাণেশ্বর ক্লাসে আসিয়াছে কি না। পণ্ডিত-মহাশয়ের শিখা যদি ঊর্দ্ধেতে থাকে তাহা হইলে তাঁহার মেজাজ ভাল নাই, আর যদি নিম্নে থাকে, তাহা হইলে, হয়ত অর্দ্ধঘণ্টা ছুটিও দিতে পারেন।

ছাত্ররা দেখিল, শিখা উঁচু করিয়া বাঁধা; সকলে প্রমাদ গণিল। বাণেশ্বরের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। পিতা প্রথমেই তাহাকে পাঠ জিজ্ঞাসা করিবেন। সেজন্য সে ভীত নয়, কিন্তু তাহাকে যখন তিনি বাড়ির ডাকনাম ধরিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকেন, তাহার ভয়ঙ্কর রাগ হয়। নামটিও সুমধুর নয়—হাঁদা!

পণ্ডিত-মহাশয় পুত্রকে রেহাই দিলেন। আরবিন্দকে ডাকিলেন, ওহে সাহেব!

পণ্ডিত-মহাশয় নিজ পুত্রকে যেমন ডাকনামে ডাকেন, তেমনই ক্লাসের আর সকলকেও একটা নাম তৈরি করিয়া ডাকেন।

সাহেব সমাসটি ঠিক বলিল। তার পর 'মাকাল-ফলে'র আহ্বান হইল। কাশীপ্রসাদ মল্লিকের নাম মাকাল-ফল। পাড়ার মল্লিকদের বাড়ির ছেলে। মোটা, গোলগাল মুখ, ফুটফুটে দেখতে, সব সময়ে হাসিখুশী ভাব; পায়ে পাম্পস্থ, কোঁচান দেশী ধুতি ও রঙীন সিল্কের পাঞ্জাবী পরিয়া আসে। মাকাল-ফল বড় মুস্কিলে পড়িল, সব সময় সুপারি চিবাইয়া সে একটু তোতলা হইয়া গিয়াছে, দীর্ঘ সমাসংযুক্ত সংস্কৃত ভাষা তাহার জিহ্বার উচ্চারণের জন্য নয়। সে দাঁড়াইলে পণ্ডিত-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—পড়া তৈরি হয়েছে?

কাশীপ্রসাদ অম্লানবদনে উত্তর দিল—স্যর, ভাল হয় নি।

পণ্ডিত-মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, আচ্ছা বোস্, কেন স্কুলে আস? বাবার আপিসে বেরুতে আরম্ভ কর্। বিন্দে!

বৃন্দাবন বুটের শব্দ করিয়া দাঁড়াইয়া গড়গড় পড়িতে আরম্ভ করিল।

পণ্ডিত-মহাশয় আবার মাথা নাড়িয়া বলিলেন—আস্তে আস্তে, দেবভাষা ম্লেচ্ছের মত পড়িস্ না।

এ-ঘণ্টাতেও অরুণকে কিছু পড়িতে হইল না।

তৃতীয় ঘণ্টা অঙ্কের। অঙ্কের মাষ্টার গোপালবাবু ক্ষীণজীবী, অতি ভালমানুষ। তিনি ক্লাসে ঢুকিয়াই বোর্ডে দুইটি অঙ্ক লেখেন, ছেলেদের নিজ নিজ খাতায় অঙ্ক দুইটি কষিতে বলিয়া নিজে একটি বই বা খাতা লইয়া চেয়ারে বসেন। অনেকে অঙ্ক কষে, অনেকে অঙ্কগুলি খাতায় টুকিয়া বসিয়া গল্প করে। তবে কেহ গোলমাল করে না। মাষ্টার-মহাশয়ের সঙ্গে ছেলেদের যেন বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি ছাত্রদের জ্বালাবেন না, ছাত্ররাও যেন তাঁহাকে বিরক্ত না করে। তাঁহার চাকরি যেন বজায় থাকে। উৎসাহী ভাল ছেলেরা অঙ্ক কষিয়া তাঁহার কাছে লইয়া যায়। আর ক্লাসে মাকাল-ফলের সুপারির কৌটা, সুহাস সেনের নাক্ু বা পণ্ডিত-মহাশয়ের সরস রেখাচিত্র বেঞ্চি হইতে বেঞ্চে চালিত হয়।

কিছু ক্ষণ পর গোপালবাবু নিজে উঠিয়া বোর্ডে অঙ্ক কষেন ও ছেলেদের খাতায় টুকিতে বলেন। এ-বিষয় তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি। বলেন—বাপু, পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ ক'রো না। অধিকাংশ ছেলেই টুকিয়া লয়।

অঙ্ককষা শেষ হইলে অনেক সময় তিনি ঘণ্টা বাজিবার আগেই চলিয়া যান। ছেলেরা কোন গোলমাল করে না, তবে ভূদো বিল্টেকে চিমটি-কাটা চলে।

টিফিনের সময় অরুণ অজয়কে খুঁজিতে বাহির হইল।

অজয়ের সহিত তাহার গভীর বন্ধুত্ব। এক বছর হইল অজয় স্কুলে আসিয়াছে। ইহার মধ্যে তাহাদের কিরূপে এরূপ ভাব হইল, ভাবিলে অরুণ অনেক সময় আশ্চর্য্য হয়।

অজয় অরুণের চেয়েও লম্বা, তরুণ শালবৃক্ষের মত সুঠাম দৃঢ় দেহ, বীর্য্যব্যঞ্জক সজীব স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি। মুখ তারুণ্যমণ্ডিত বটে, কিন্তু অরুণের মুখশ্রীর পাণ্ডুর ভাবপ্রবণতা, স্বপ্নময় উদাসতা নাই। তাহার দেহের মত তাহার মনও সরল, ঋজু। সে হৈ চৈ করিয়া কথা বলে, সারাক্ষণ চেঁচায়, হাসে, কিশোর প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভরা। 'ফ্যাটি' বিল্টের পেটে ঘুসি মারিতে, চালিয়াৎ চট্টোর চশমার ফিতা টানিয়া দিতে, ছেলেদের সহিত ঘুসোঘুসি করিতে, অত্যাচরিত দুর্ব্বল ছেলের জন্য লড়িতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ক্লাসের মধ্যে সে সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়, স্কুলের ফুটবল ক্লাবের ক্যাপ্টেন। স্কুলে বিদ্যাচর্চ্চা অপেক্ষা খেলার মাঠে দেহচর্চ্চা করিতে বেশী ভালবাসে। তবে পড়াশোনাতেও অমনোযোগী নয়। এক শতের মধ্যে পঞ্চান্ন পাইবার মত পড়া পড়ে। তার বেশী পড়া, তার মতে পণ্ডশ্রম। সে কল্পনাপ্রিয় নয়, বলে, আমি রিয়ালিষ্ট। জয়ন্তের কবিতাকে সে বলে, প্যানপ্যানানি ও বাণেশ্বরের তর্ককে বলে জ্যাঠামি, তবে সুহাসের ব্যঙ্গচিত্রগুলিকে প্রশংসা করে।

অজয়কে নিভৃতে ডাকিয়া অরুণ বলিল—মামাবাবু কেমন আছেন?

অজয় একটু গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল—বাবা, বাবা সেই রকমই আছেন। কাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি। তাছাড়া অন্য কোন নতুন উপসর্গ নেই। শোন, মা ব'লে দিয়েছেন, আজ বিকেলে তুমি যেও নিশ্চয়। দু-দিন যাও নি কেন, স্কুল থেকেই যেও, ওখানে চা খাবে।

অরুণ জিজ্ঞাসা করিল—তুমি থাকবে ত?

অজয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আমার ফিরতে রাত হবে, আজ স্কুলের ম্যাচ, আমি ক্যাপ্টেন, যাওয়া চাই। আচ্ছা, এখুনি টীম তৈরি করতে হবে। যেও, না হ'লে মা ভাববেন।

মামীমা তাহাকে সত্যই বড় স্নেহ করেন। এক বৎসরের পরিচয়, কত আপন করিয়া লইয়াছেন, যেন জন্মজন্মান্তরের জানা।

অজয় চলিয়া গেল। জয়ন্ত আসিয়া তাহার হাত ধরিল, চোখ ছল ছল করিতেছে। জয়ন্ত সামান্য আবেগেই কাঁদিয়া ফেলে।

অরুণ ধীরে বলিল—কি হয়েছে ভাই?

ভগ্নস্বরে জয়ন্ত বলিল—চল ক্লাসে, বলছি।

ক্লাস প্রায় শূন্য। দুই জনে এক কোণে বসিল।

জয়ন্ত কিছু ক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—বাবা চলে গেছেন।

বিবর্ণ বিস্মিত মুখে অরুণ বলিল—তোমার বাবা, কি হ'ল হঠাৎ!

—তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহ ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন।

—ও, তাই বল, আমি ভাবছিলুম—

—কিন্তু আমাদের অবস্থাটা কি হ'ল!

—তোমার ত মা নেই।

—না, কিন্তু ছোট ভাই এক আছে।

—তোমাদের এক দোকান আছে না?

—হাঁ, ঘড়ির দোকান, রাধাবাজারে। বাবার মত অমন ঘড়ি নাকি কেউ সারতে পারত না, ঘড়ি সেরে সেরে তাঁর চোখ খারাপ হয়ে গেছল। তিনি আর বড় মেসোমশাই দু-জনে দোকান করেছিলেন, দোকান ত মেসোমশাইকে দিয়ে গেছেন।

—তোমরা ত একসঙ্গে থাক।

—হ্যাঁ, বড় মাসীর সঙ্গে, বাবাই বেশীর ভাগ খরচ দিতেন। আমার জন্যে ভাবি না, কিন্তু মণ্টুর কি হবে, ছ-বছরের ছেলে সে—বাবা একটু ভাবলেন না।

—মাসী দেখবেন।

—হাঁ, মাসীর চার ছেলে চার মেয়ে—মাসী দেখবেন! শোন, তোমার ব্যারিষ্টার-কাকার সঙ্গে আমি পরামর্শ করতে

চাই। দোকানে আমাদের অংশ কি, মণ্টু ত নাবালক, সব ঠিক ক'রে নিতে হবে।

—আচ্ছা, আমি বলব।

—শীগ্গির একটা ব্যবস্থা করা চাই। মেশো কোন্ দিন বলবেন, চরে খাও গে।

—আচ্ছা, আমি নিশ্চয় বলব।

—বাবা বেশ, সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন।

টিফিনের শেষে দুই ঘণ্টা ইতিহাসের মাসিক পরীক্ষা হইল। প্রশ্নগুলি সহজই ছিল। কলিকাতা-স্থাপনের ইতিহাস, শেষ পানিপথ যুদ্ধ মারাঠাশক্তি পতনের কারণ, ইত্যাদি। অরুণ উত্তরগুলির সঙ্গে নিজের নানা মন্তব্য জুড়িয়া দিল। ইতিহাসের শিক্ষক জগদীশবাবুর সে প্রিয় ছাত্র। সে নির্ভয়ে প্রশ্নের উত্তর লেখে। জগদীশবাবু নিজেও ছাত্র, এম-এ পাস করিয়া ল' পড়িতেছেন। সেজন্য বোধ হয় কিশোর-মনের উচ্ছ্বাস স্নেহের চোখে দেখেন।

অরুণ লিখিল, শেষ পানিপথ-যুদ্ধে যদি আ'মদ শা দুরানীর পরাজয় হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস কি হইত কে জানে। হয়ত কি হইতে পারিত, এ প্রশ্নের সে নানা কাল্পনিক উত্তর লিখিল। আর এক প্রশ্নোত্তরে সে লিখিল, জব চার্ণক যদি কলিকাতায় কুঠিস্থাপন না-করিতেন তাহা হইলে পলাশীর যুদ্ধ হইত কি? ইতিহাস পড়িতে পড়িতে তাহার মনে এইরূপ নানা প্রশ্ন জাগে।

স্কুলের শেষে অরুণ অজয়কে খুঁজিয়া পাইল না। স্কুলের বই লইয়া একা অজয়দের বাড়ি যাইতে তাহার লজ্জা বোধ হইল। বইগুলি বাড়িতে রাখিয়া ঠাকুমাকে বলিয়া যাইবে, ঠিক করিল। হয়ত, মামীমা রাতে খাইয়া যাইতে বলিবেন।

একা পথ দিয়া বাড়ি ফিরিতে প্রতিমার সকালে গাওয়া গানের সুর তাহার কানে বাজিতে লাগিল। গানের কথাগুলি প্রতিমাকে দিয়া লিখাইয়া লইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

নিশীথে

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

কী পাখী ডাকে!
গান কার বেধে গেল পথের বাঁকে॥
অজন ছায়া ঢাকা
ক্ষীণ কাঁপে ঝাউশাখা,
সহসা শ্বসিয়া বায়ু থমকি থাকে॥

উৎসুকে বিকশিত শুভ্রা বেলি
শূন্যে দিয়েছে মৃদু গন্ধ মেলি।
দীঘিতে অথৈ জল
থেকে থেকে টলমল,
উঁকি ঝুঁকি মারে চাঁদ মেঘের ফাঁকে॥

ঝিল্লির ঝিঁঝিঁ-রব চলিছে টানা,
অজানার বাঁশি যেন না মানে মানা।
মৌন গভীর করি
মাতায় সে বিভাবরী
কত কী বলিতে চায় কে যে কাহাকে॥

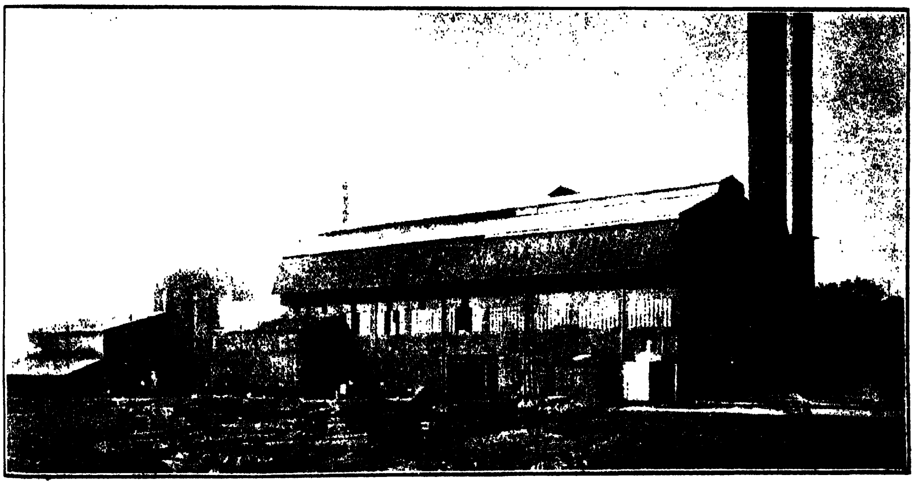
শিশু কেঁদে লেগে রয় মায়ের বুকে,
প্রিয় জেগে চেয়ে রয় প্রিয়ার মুখে।
কেহ বা স্বপনঘোরে
বাঁধে তারে বাহুডোরে,
জল ভ'রে আসে কারো বিনিদ আঁখে॥

কুকুরের ভাঙা গলা মিলায় দূরে,
ঝোপে ঝাড়ে মিটিমিটি জোনাকি উড়ে।
পাতা ঝরে টুপ্ টুপ্
আবার সবাই চুপ,
যেন সবে কান দুটি পাতিয়া রাখে॥

সিংভূমের তাম্রখনি

শ্রীপিণাকীলাল রায়

সুবর্ণরেখা নদীর প্রায় সমান্তরালে লীলায়িত পাহাড়ের শ্রেণী সিংভূম জেলার পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়া দিঙ্‌মণ্ডলকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই সকল পাহাড় ব্যাপিয়া যে একটি তাম্র-প্রস্তরের স্তর (Singhbhum Copper Belt) বিদ্যমান আছে, কাননকুন্তলা ধরিত্রীর কটি-মেখলার মত, তাহার অস্তিত্ব পাশ্চাত্য খনিতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু এই সেদিন, দুই জন জর্ম্মান বিশেষজ্ঞ (Geo-physicist) তাঁহাদের নবাবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই তাম্র-প্রস্তরের প্রধান স্তর ও তাহার শাখা-উপশাখার সঠিক অবস্থান হাতে-কলমে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, এই ধরিত্রীরই পিঠের উপর বসিয়া—যেমন কোন অভিজ্ঞ অস্ত্র-চিকিৎসক দেহাভ্যন্তরস্থ শিরা-উপশিরাগুলির অবস্থান বুঝিতে পারিয়া ছুরি চালাইতে সমর্থ হন।

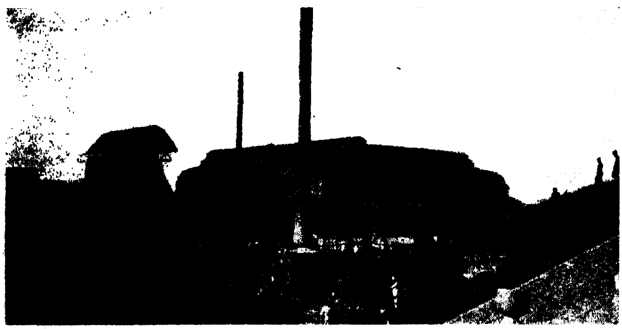


মৌভাণ্ডার কারখানার এক পার্শ্বের সাধারণ দৃশ্য

অতি প্রাচীনকালে, যখন ভারত তৎকালিক সভ্যতা ও কৃষ্টির লীলাভূমি রূপে সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই সময় এই সকল পাহাড় হইতে তাম্র-প্রজনন ক্রিয়া যে যথেষ্টই চলিয়াছিল তাহার প্রমাণের অভাব নাই। তাম্র-প্রস্তর উত্তোলনের গহ্বর (shaft), ফারনেস্ হইতে তাম্র-নিষ্কাসনের পর পরিত্যক্ত ময়লার স্তূপ (slags), এবং গলিত তামা ঢালিবার জন্য তৈরি বড় বড় মুচির (crucibles) ভগ্ন খণ্ড, এখনও পার্ব্বত্য অঞ্চলের স্থানে স্থানে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজা অশোকের নামাঙ্কিত তাম্রমুদ্রা ও তাম্রফলক কচিৎ কোন জংলী সাঁওতাল কিংবা খেরোয়াল দেখিতে পাইলে এখনও কুড়াইয়া আনে, আমাদিগকে দেখাইবার জন্য।

কালমাহাত্ম্যে ও অনুশীলনের অভাবে এই খনিজ শিল্পের কথা লোকে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল, যদিও এই মূল্যবান সম্পদের বিষয় ভুলিয়া যাওয়ার মত আশ্চর্য্যও জগতে কিছু নাই। তত্রাচ বলিব, এই আত্মবিস্মৃত জাতির পক্ষে এটা বিশেষ রকম আশ্চর্য্য নয়, বরং ইহা স্বাভাবিক

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; নতুবা, ইহার চেয়েও কত শত অমূল্য সম্পদ এই জাতি হেলায় হারাইয়া আজ সর্ব্বহারা হইয়া পড়িয়াছে। তবুও এই জাতি আত্মবিস্মরণের অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়া যদিই বা কোন দিন জাগিয়া উঠে—যদিই বা কোন দিন এই মেঘ-ভরা রজনীতে, কোন্ হাজার বৎসর আগে হারিয়ে-যাওয়া বিদ্যুৎ-আঁকা পথটির সন্ধান সে ফিরিয়া পায়, তাহা হইলে তাহাকে সেই শুভদিনের জন্য অপেক্ষা করিতেই হইবে।



রোলিং মিল ও ওর-বিনের এক পার্শ্বের দৃশ্য

বহুকাল পরে সিংভূম জেলার সেই নষ্ট শিল্পের আবার পুনরুদ্ধার হইয়াছে, উদ্যমশীল ব্রিটিশ জাতির উদগ্র চেষ্টায় ও তাহাদের কর্ম্মকুশলতায়। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহারা জানিতে পারে যে, এই সকল পাহাড়ে তামার অস্তিত্ব আছে এবং প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে ১৮৩৩ সালে মিঃ জোনস্ (Mr. Jones) নামক জনৈক ইংরেজ খনিতাত্ত্বিক্ নানা রকম কারণ দর্শাইয়া প্রতিপন্ন করেন যে, এই সকল পার্ব্বত্য অঞ্চলের কোন-না-কোন স্থানে নিশ্চয়ই প্রচুর তাম্র-প্রস্তরের স্তর বিদ্যমান আছে।

পরে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের গভর্ণর জেনের‍্যালের এজেণ্ট ক্যাপটেন্ জে, সি, হটন্ (Captain J. C. Haughton) এই সব পাহাড় যন্ত্রপাতির সাহায্যে খনন করাইয়া তাম্র-প্রস্তরের নমুনা সংগ্রহ করেন ও এই স্তরটির সঠিক অবস্থিতির বিষয় জানিতে পারেন। ইহার ফলে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম একটি তাম্র-সমবায়ের সৃষ্টি হয় কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ মহাজনের চেষ্টায়। এই কোম্পানীটি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে "দি হিন্দুস্থান কপার কোম্পানী" নামে আর একটি দ্বিতীয় কোম্পানী এক লক্ষ কুড়ি হাজার পাউণ্ড বা প্রায় ষোল লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া রাজদোহা নামক স্থানে তাহাদের কারখানার পত্তন আরম্ভ করেন। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ইহার পরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এক জন সুপ্রসিদ্ধ ভূতাত্ত্বিক (Geologist) মিঃ ভ্যালেন্টাইন্ বল্ (Mr Valentine Ball) সিংভূমের তাম্রখনির বিষয়ে একটি হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, প্রাচীন কালে রাজপুতানা অঞ্চল হইতে জৈনধর্ম্মাবলম্বী জাতি বা শরাক্ জাতীয় এক দল লোক প্রতি বৎসর বাণিজ্যব্যপদেশে এদেশে আসিত এবং তাহাদের আনীত মাল-মশলার বিনিময়ে তাহারা লইয়া যাইত এদেশের প্রধান উৎপন্ন পণ্য তাম্র। ফলে তাহারাই এদেশে বসবাস করিয়া তামা তৈরি করিবার প্রণালীটি শিখিয়া লয়, কতকটা কুটীর-শিল্পের আকারে এবং স্থানীয় ভূস্বামী ঘাটশিলার রাজার নিকট এমন একটা পাকাপাকি রকমের বন্দোবস্ত করিয়া লয় যাহাতে এই কার্য্যটি বহুকাল ধরিয়া তাহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তার পর কোন কারণে এই ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয় লইয়া রাজার সহিত মনোমালিন্য ঘটায় তাহারা চিরদিনের জন্য এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কোন কোন স্থানে উক্ত শরাকদের স্থাপিত পুষ্করিণী, বাঁধ, কূপ, রাস্তা প্রভৃতি এখনও তাহাদের এদেশে অবস্থিতির ও কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছে। তাহারা চলিয়া যাওয়ার পর এই খনিজ শিল্পটি যাহা কুটীর-শিল্পের আকারে কোনরূপে জীবিত ছিল তাহা একেবারেই লোপ পাইয়া যায়।

পুনরায় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে "দি রাজদোহা' মাইনিং

কোম্পানী” নামে আর একটি কোম্পানী সংগঠিত হয়। তাহারা সরাসরি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ধলভূম তাম্র-প্রস্তর স্তরের কতকটা অংশ ইজারা লয় এবং রাখা হইতে রাজদোহা পর্য্যন্ত প্রায় ২৪ বর্গ-মাইল পরিমিত স্থানের উপর তাহাদের কর্ম্মস্থলের সীমানা ধার্য্য করে। এই নূতন কোম্পানী রাজদোহা ও রাখা এই উভয় স্থানেই একসঙ্গে তাহাদের কার্য্য আরম্ভ করে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাহারাও পাততাড়ি গুটাইতে বাধ্য হয় তাহাদের মূলধনের অসচ্ছলতার দরুণ।

তার পর ১৯০৫ হইতে ১৯০৯ সালের মধ্যে স্যর টমাস্ হল্যাণ্ড্ (Sir Thomas Holland) এই সিংভূমের তাম্র-প্রস্তর সম্বন্ধে অনেক গবেষণার পর একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া তাহা ভারত-গবর্ণমেণ্টের দরবারে পেশ করেন। ইহার ফলে ভারত-গবর্ণমেণ্টের জরীপ-বিভাগ (Geological Survey of India) এই তাম্র-প্রস্তর স্তরের উপর যান্ত্রিক পরীক্ষা চালাইয়া তামার অস্তিত্বের সন্তোষজনক প্রমাণ প্রাপ্ত হয়। এই রিপোর্টটি প্রকাশিত হইবার পর দি কেপ্ কপার কোম্পানী (The Cape Copper Co., Ltd.) নামে আর একটি কোম্পানী ইংলণ্ডের জন্ টেলার এণ্ড সন্সের (John Taylor & Sons) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া “দি রাজদোহা মাইনিং কোম্পানী”র নিকট হইতে পরীক্ষা-স্বরূপ খনির কার্য্যভার গ্রহণ করে এবং খনিটি কার্য্যকরী বিবেচিত হইলে স্থায়িভাবে ইহার ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইবে এই প্রতিশ্রুতিও প্রদান করে।

পরে ১৯০৭-০৮ সালে উক্ত কেপ্ কপার কোম্পানী “রাজদোহা মাইনিং কোম্পানী”র নিকট হইতে ১৪০০০ পাউণ্ড বা প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার টাকায় ইজারাটি স্থায়িভাবে কিনিয়া লয় এবং ১৯১৪ সালে ইহা খনির আকারে পরিণত হইয়া সম্পূর্ণরূপ কার্য্যকরী হইয়া উঠে। এই ১৯১৪ সালেরই এপ্রিল মাসে মিলের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং বহুকাল পরে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ব্রিটিশ জাতি ভারতে প্রথম তাম্র উৎপাদন করিয়া রাখা পাহাড়ের শীর্ষদেশে তাঁহাদের জাতীয় পতাকা সগৌরবে প্রোথিত করেন।

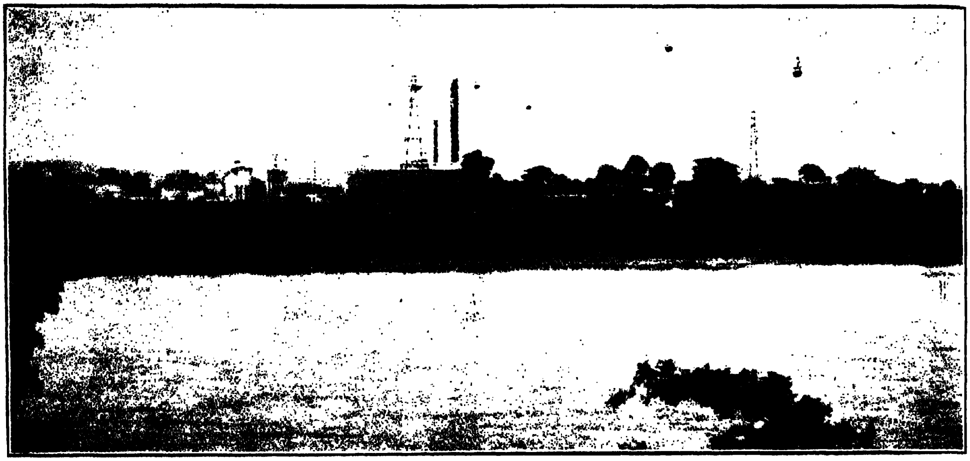


পালভারাইজড্ কোল্-প্ল্যাণ্ট্ ও বয়লার-হাউসের এক অংশ

এই কোম্পানীর তাম্র-প্রজনন ক্রিয়া ১৯২১ সালের ২০শে জুন পর্য্যন্ত কোনরকমে চলিয়াছিল; তারপর, ইহার আয় ও ব্যয় সঙ্কুলান সুবিধাজনক না-হওয়ায় রিসিভারেরা এই খনিটির কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ইহার পর-বৎসর ১৯২২ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে খনির তাম্র-প্রজনন ক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়, যদিও খনিটি ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত কার্য্যোপযোগী করিয়াই রাখা হইয়াছিল।

এই শেষোক্ত কয়েক বৎসরের শেষ দিকে ১৯২৯ সালে ইনডিয়ান কপার কর্পোরেশন্ কোম্পানী এই খনিটি পরীক্ষা-স্বরূপ লইয়াছিল মাত্র, কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত মোটেই ইহা পরিচালিত করে নাই।

১৯২০ সালে “দি করডোবা কপার কোম্পানী” মোষাবনীর খনিটি পরীক্ষা-স্বরূপ লইয়াছিল। এই খনিটিও কেপ কপার কোম্পানীরই সম্পত্তি এবং ইহার আংশিক কার্য্য জন টেলার এণ্ড সন্স-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছিল। ১৯২৪ সালে উহাদের পরীক্ষার কাল শেষ হইলে ২০ বর্গ-মাইল



সুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণ তীর হইতে গৃহীত আলোকচিত্রে কারখানার সাধারণ দৃশ্য। এরিয়াল রোপ ওয়ের দুইটি টাওয়ার ও ঝুলন্ত বাকেটগুলি দেখা যাইতেছে।

পরিমিত স্থানের খনি-স্বত্ব কেপ কপার কোম্পানীর নিকট হইতে করডোবা কপার কোম্পানী কিনিয়া লয়। পরে এই বৎসরেরই ২১শে জুলাই তারিখে এই কোম্পানীটির পুনর্গঠন হয় "দি ইনডিয়ান কপার করপোরেশন্ লিমিটেড" এই নামে, প্রায় উনত্রিশ লক্ষ বিরাশী হাজার টাকা মূলধন লইয়া। এই নূতন কোম্পানী সেই সঙ্গে সেই একই সময়ে "দি নর্থ অনন্তপুর গোল্ড মাইনিং কোম্পানীর এবং "দি ওরিগাম্ গোল্ড মাইনিং কোম্পানী"র নিজস্ব সম্পত্তি সিদ্ধেশ্বর পাহাড় ও খরসোয়ান্ নামক স্থান দুইটির খনি-স্বত্বও কিনিয়া লইয়াছিল।

এই নব-গঠিত কোম্পানীর কাজ মোষাবনী অঞ্চলেই এত দিন নিবদ্ধ ছিল এবং খনিটি কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার কার্য্য পুরা দমে চলিয়াছিল ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত। এই সময় ইহার পূর্ণ পরিচালনের ভার "দি এ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল এণ্ড জেনের‍্যাল ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিমিটেড"-এর হস্তে অর্পিত হয়। তার পর উপরি উক্ত মূলধনের উপর পুনরায় প্রায় ছেচল্লিশ লক্ষ আট ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়, স্বতন্ত্র ভাবে কোম্পানীর নূতন কারখানা খুলিবার জন্য। এই কারখানাটি ঘাটশিলার নিকট সুবর্ণরেখা নদীর উত্তর তীরে স্থাপিত; এখানে যে-সকল যন্ত্রপাতি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার মধ্যে পাওয়ার প্ল্যাণ্ট, কন্‌সেন্‌ট্রেশান্ মিল্, স্মেল্‌টার এবং রোলিং মিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যাহা হউক, ১৯২৭ সালেই বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত উক্ত যন্ত্রগুলির পত্তন আরম্ভ হয় এবং পর বৎসর নভেম্বর মাসে ঐ সকল যন্ত্রের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়া ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এই কোম্পানীর প্রথম তাম্র-প্রস্তুতন ক্রিয়ার সূত্রপাত হয়।

এই এত বড় বৃহৎ ব্যাপার এত অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্যকরী করিয়া তোলার জন্য যদি কেহ যশ-গৌরবের প্রার্থী হয় তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে এই কোম্পানীর তিনটি প্রতিভাবান লোকের উপর সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। প্রথম এই কোম্পানীর বড়সাহেব, রাসেল বি. ওকস্ (R. B. Woakes); ইনি এই কোম্পানীর জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বিতীয়, কারখানার ম্যানেজার, এইচ. সি. রবসন্ (H. C. Robson)। ইনি এক দিন গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি

এই কোম্পানীকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে না-পারি তাহা হইলে আমার এই মস্তকের টুপি সুবর্ণরেখার জলে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া যাইব।” তৃতীয়, সন্তোষ ভট্টাচার্য্য,—এস্. ভট্টাচারীয়া নামে পরিচিত—এই কোম্পানীর গঠনমূলক কার্য্যের ছিলেন অক্লান্তকর্ম্মী অগ্রদূত। বাস্তবিকই যত দিন এই কোম্পানীর অস্তিত্ব বজায় থাকিবে তত দিন পর্য্যন্ত এই তিনটি লোকের হাতের ছাপ ইহার প্রত্যেক কার্য্যের ও কার্য্যপ্রণালীর উপর অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিবে।



রোলিং মিলের একটি ফারনেস্ ও তাহার বামপার্শ্বে স্ক্রেপিং মেশিন

যাহা হউক, ইহার প্রায় দেড় বৎসর পরে এই তামার কারখানার পাশেই রোলিং মিল নামে আর একটি সুবৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইল। পিতল ও পিতলের শিট তৈরি করিবার জন্যই এই যন্ত্রটির পরিকল্পনা এবং এই সময়েই ভারতে সর্ব্বপ্রথম পিতলের শিট এই কারখানায় প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়।

ইহার পর ১৯৩১ সালে কোম্পানীর টেক্‌নিক্যাল-বিভাগের কাজ “দি নিউ কনসোলিডেটেড গোল্ড ফিল্‌ড, সাউথ্ আফ্রিকা লিমিটেড্” নামীয় একটি কোম্পানীর উপর ন্যস্ত হয় এবং অদ্যাবধি উক্ত কোম্পানীরই তত্ত্বাবধানে কর্‌পোরেশনের কাজ চলিয়া আসিতেছে।

যাহাতে তামা ও পিতলের প্রজনন-ক্রিয়া বর্ত্তমানের চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায়, এই আশায় কোম্পানী পুনরায় প্রায় ষোল লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে কারখানার এই ক্রমবর্দ্ধমান অংশের নির্ম্মাণ কার্য্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। এক্ষণে এই কোম্পানীর সর্ব্বসমেত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা।

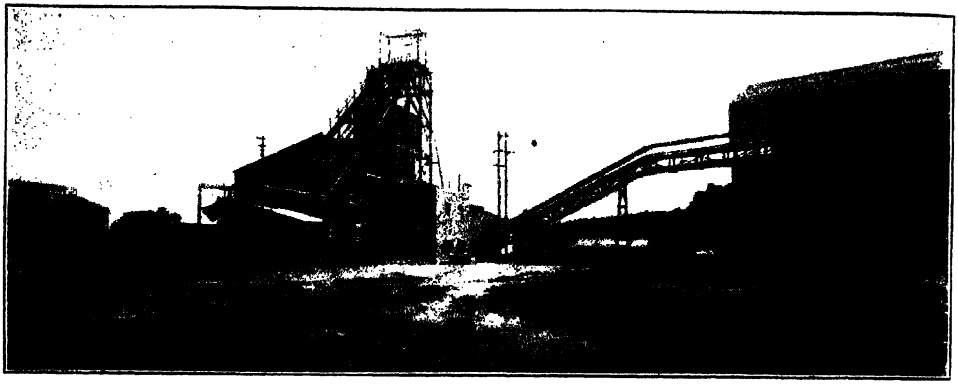
এই কারখানাটি স্থাপিত হইবার পর হইতে উৎপন্ন পণ্যের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সাল	খনি হইতে উত্তোলিত তাম্র-প্রস্তর টন্	বিশুদ্ধ তামার ইন্‌গট্ টন্	পিতলের শিট টন্
১৯২৯	৭৩৫১৯	১৬৩৫	০
১৯৩০	১১৯৭৮৭	২৯৭৪	৭ ৮
১৯৩১	১৪৪২৫০	৪০৬৯	৩৬৩৭
১৯৩২	১৬৫৯৭৭	৪৪৪৩	৫৪৪০
১৯৩৩ ৯ মাস	১২৮২৬৩	৩৫৩০	৪৪২০
মোট	৬৩১,৭৯৬	১৬,৬৫১	১৪,২১৫



রোলিং মিল ফাউণ্ড্রিতে—‘ব্লুম’ (পিতলের ব্লক) তৈরি করিবার জন্য গালিত ও ফুটন্ত পিতল পরিপূর্ণ একটি মুচি ইলেক্‌ট্রিক্ ক্রেনের দ্বারা চালিত হইতেছে।

এক্ষণে গড়পড়তা হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে, বৎসরে পঁচানব্বই লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাত শত তেইশ



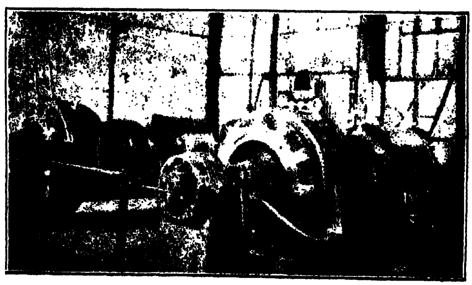
মোষাবনী খনির প্রধান শ্যাফ্‌টের উপরের দৃশ্য। হেড্‌গিয়ার, প্রাইমারী, ক্রাশার, কম্‌প্রেস্‌ড্‌ এয়ার বেল্ট্‌-কন্‌ভেয়ার, ওর-বিন ইত্যাদি

টাকার পিতলের শিট্‌ এবং সাতষট্টি লক্ষ পনর হাজার সাত শত বিয়াল্লিশ টাকার তামার ইন্‌গট্‌ উৎপন্ন হইতেছে, অবশ্য ৯১৪১ টন্‌ তামা বাদে যাহা পিতল তৈরি করিতে খরচ হইয়া থাকে।

এইবার মোষাবনীর খনি হইতে উত্তোলিত তাম্র-প্রস্তরগুলি কি উপায়ে মৌভাণ্ডারের কারখানায় আনীত হইতেছে সে-সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ তাম্র-প্রস্তরগুলি প্রাইমারী ক্রাশিং প্ল্যাণ্টে চূর্ণীকৃত হইয়া বেল্ট্‌ কন্‌ভেয়ারের দ্বারা এরিয়্যাল্‌ রোপওয়ের 'বিনে' আসিয়া সঞ্চিত হয়। তার পর সেগুলি বড় বড় ঝুলন্ত বালতিতে বোঝাই হইয়া এরিয়্যাল রোপের সাহায্যে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী মৌভাণ্ডারের ওর-বিনে আসিয়া পড়ে। পরে কন্‌ভেয়ার-বেল্ট সেগুলিকে কন্‌সেণ্ট্রেশন্‌ মিলে আনিয়া দেয়। মোষাবনীর খনির উপরিভাগে ইলেকট্রিক হয়েষ্ট, ক্রাশিং প্ল্যাণ্ট, কম্‌প্রেস্‌ড্‌ এয়ার প্ল্যাণ্ট, ড্রিল শার্পেনিং প্ল্যাণ্ট, ওয়ার্কশপ ও ফাউণ্ড্রি এই কয়েকটি বিভাগ আছে। এই যন্ত্রপাতিগুলি বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা মৌভাণ্ডারস্থ কারখানার পাওয়ার হাউস হইতে এগার হাজার ভোল্ট্‌ দুইটি লাইন দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া মোষাবনী খনির যন্ত্রগুলিকে সচল করিয়া রাখে।

এখন মোষাবনী ও ধবানী প্রায় পাশাপাশি দুইটি খনিতে কাজ চলিতেছে। এক জন সাহেব মাইন্‌-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্‌ নিযুক্ত আছে এতদঞ্চলের খনি-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য পরিচালনার জন্য। তাঁহার অধীনে মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রিশিয়ান্‌, মাইনার, ডাক্তার প্রভৃতি ২৮ জন দেশীয় ও বিদেশীয় শিক্ষিত কর্ম্মচারী ও প্রায় ২৩০০ জন দেশীয় শ্রমিক নিযুক্ত আছে। ৯০০ টন্‌ হইতে ১০০০ টন পর্য্যন্ত তাম্র-প্রস্তর দৈনিক খনি হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে।



পাওয়ার প্ল্যাণ্টে টারবাইনের দৃশ্য

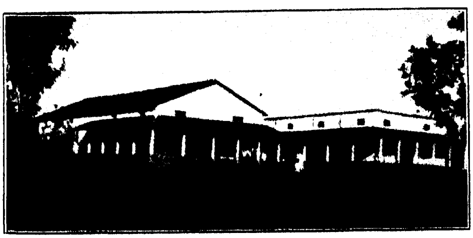
এই প্রস্তরগুলি এরিয়্যাল্‌ রোপওয়ের সাহায্যে মৌভাণ্ডারস্থ কারখানার ওর-বিনে আসিয়া পড়ে। তার পর কনভেয়ার-বেল্টের দ্বারা "হার্ডিঞ্জ-বল্‌ মিলের" মধ্যে আপনা-আপনি উপনীত হয় এবং এই চূর্ণ প্রস্তরগুলি এই

মিলে গুঁড়া হইয়া ঠিক ধূলির আকারে পরিণত হয়। তখন ইহা মিল্ হইতে বাহির হইয়া উপরিউক্ত প্রণালীতে মিনারেল সেপারেশন বা অয়েল্ ফ্লোটেশন্ যন্ত্রে চালিত হয়। তথায় তেল জল ও অন্যান্য রসায়ন সংযোগে উক্ত ধূলিবৎ প্রস্তর খুব পাতলা কাদার আকারে পরিণত হয় এবং খাঁটি প্রস্তরের অংশ তামা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠে। এই ভাসমান ময়লাগুলি তেল ও জলের সঙ্গে অনবরত পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বাহির হইয়া গিয়া সুবর্ণরেখা নদীতে পতিত হইতেছে।



ড্রিল-শার্পেণিং শপ্

ময়লাগুলি বাহির হইয়া গেলে যাহা নীচে থিতাইয়া থাকে তাহা 'ড্রাইং সেক্‌শেনে' লইয়া গিয়া শুষ্ক করা হয় এবং এইখানেই মিলের কার্য্য শেষ হইয়া যায়। এক্ষণে তাম্র-প্রস্তরগুলি যে-অবস্থায় উপনীত হইল ইহাই 'কন্‌সেন্‌ট্রেট ওর' নামে অভিহিত। ইহার মধ্যে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ থাকে তামা আর ৭০ ভাগ থাকে অন্যান্য ধাতু—যেমন লোহা, নিকেল, সাল্‌ফার ইত্যাদি।



ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন কোম্পানীর জেনেরাল আপিসের এক পার্শ্বের সাধারণ দৃশ্য

এই শুষ্ক কন্‌সেনট্রেট ওর গালাই করিবার জন্য রিভারবারেটোরি ফারনেসে চালিয়া দেওয়া হয় এবং তথায় গন্ধকের অংশ সাল্‌ফার ডাইওকসাইড্ গ্যাসে পরিণত হইয়া চিমনী দ্বারা বাহির হইয়া গেলে, অবশিষ্ট লোহা, নিকেল ও অন্যান্য পদার্থগুলি দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। তারপর সেগুলি ময়লার গাড়িতে ঢালিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই রকম প্রক্রিয়া দ্বারা এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহাই বিশুদ্ধ তামা বলিয়া পরিগণিত এবং এই গালিত অবস্থাতেই তাহা ছোট ছোট লোহার ছাঁচে ঢালিয়া ইষ্টকাকারে পরিণত করা হয়।

স্মেল্‌টার প্ল্যাণ্টটি পর-পর কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম—মেক্যানিক্যাল রোষ্টার, দ্বিতীয়—পালভারাইজ্‌ড কোল্ ফায়ারড্ রিভারবারেটোরি ফারনেস্, তৃতীয়—বেসিমার কনভারটার্স এবং চতুর্থ—পালভারাইজড্ কোলফায়ার্ড রিফাইনারী ফারনেস্।

এক্ষণে এই যে নানা রকম প্রণালী দ্বারা বিশুদ্ধ তামা উৎপন্ন হইল ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে বি. এস. কিংবা বেষ্ট সিলেকটেড্ কপার ইনগট্‌স্ রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাতে পাওয়া গিয়াছে শতকরা ৯৯·৫ হইতে ৯৯·৭ ভাগ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ তামা। আজকাল কলিকাতার বাজারে বি. এস্. এবং আই. সি. সি. অক্ষর গুলিদ্বারা চিহ্নিত যে তামার ইষ্টকগুলি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই কোম্পানীরই তামা। এই সমস্ত তামা ভারতবর্ষের বাজারেই বিক্রয় হইয়া থাকে এবং ইহার পরিমাণ বৎসরে প্রায় ১২০০ টন হইতে ১৫০০ টন পর্য্যন্ত। ইহা ছাড়া আরও তামা ব্যবহৃত হইয়া থাকে পিতল বা ইয়োলো মেটাল্ শিট তৈরি করিবার জন্য। শতকরা ৬২ ভাগ তামা এবং ৩৮ ভাগ দস্তার সংযোগে এই পিতল বা ইয়োলো মেটাল শিট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পিতলের কারখানায় তামা ও দস্তার ইষ্টকগুলি ইলেকট্রিক ইন্‌ডাক্‌শন্‌ ফারনেসে গালাই হইয়া ঠাণ্ডা জলসিক্ত ছাঁচে ঢালাই করা হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ায় তৈরি পিতলের ইষ্টকগুলির নাম দেওয়া হয় "ব্লুম্‌স্‌"(Blooms)। যখন এই ব্লুম্‌গুলি ছাঁচ হইতে বাহির করা হয় তখন সেগুলির উপরি ভাগ এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো ও ময়লায় ভর্ত্তি থাকে। তখন, স্ক্রেপিং মেশিনের দ্বারা ব্লুমের উপরিভাগের এক পর্দ্দা চাঁচিয়া ফেলিয়া মসৃণ ও ঝক্‌ঝকে করা হয়, সেগুলিকে রোলিং মিলের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য।

ব্লুমগুলি প্রথমে রোলিং মিলের একটি ফারনেসে উত্তপ্ত করিয়া লইয়া "রাফ রোলের" দ্বারা সেগুলি মোটা প্লেটের আকারে পরিবর্ত্তন করা হয়। তার পর, তাহা পুনরায় গরম করিয়া ও "স্মুথ্‌ রোলের" সাহায্যে সেগুলিকে খরিদ্দারদের অর্ডার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় 'গেজে' পরিবর্ত্তিত করিয়া চারি বর্গফুটের আকারে কাটিয়া লওয়া হয়।

ইহাই এই শিট্‌গুলির চরম অবস্থা নহে। বাজারে বিক্রয়োপযোগী করিবার পূর্ব্বে আর একটি ফারনেসে্‌ শিটগুলি টেম্‌পার করিয়া লইতে হয় এবং ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য রাসায়নিক দ্রাবকে ধুইয়া লইয়া ইহার সর্ব্বশেষ প্রসাধন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়।

এক্ষণে মাসে মাসে প্রায় ৭০০ টন্‌ করিয়া এই পিতলের শিট তৈরি হইতেছে এবং এই যাবতীয় শিট কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের বাজারে বিক্রয় হইতেছে।

বি. এন্‌. রেলওয়ের ঘাটশিলা ষ্টেশন্‌ হইতে একটি সাইডিং লাইন বাহির হইয়া মৌভাণ্ডারের কারখানা পর্য্যন্ত আসিয়াছে এবং যাহা কিছু প্রয়োজনীয় আমদানী ও রপ্তানী পণ্যের যাতায়াত-কার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইতেছে।

ঘাটশিলার নিকটবর্ত্তী মৌভাণ্ডারে কোম্পানীর প্রধান আপিস স্থাপিত হইয়াছে। এই মৌভাণ্ডার কারখানাটি ২৩ জন সাহেব ও ভারতীয় কর্ম্মচারী এবং ১৫০০ জন দেশীয় শ্রমিকের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। মৌভাণ্ডার ও মোবাবনী উভয় ক্যাম্পের সর্ব্বসমেত কর্ম্মচারীর সংখ্যা হইতেছে ৪০ জন সাহেব এবং প্রায় ৪০০০ জন ভারতীয়। সম্বৎসরে কোম্পানীর উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ ৬৫০০ টন বিশুদ্ধ তামা এবং ৮০০০ টন পিতলের শিট।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ গিলানডার্স আরবুথ্‌নট এণ্ড কোম্পানী এই সমস্ত পণ্য ভারতের বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য কোম্পানীর সোল্‌ সেলিং এজেণ্ট রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।*

* ছবিগুলি কোম্পানীর জেনের‍্যাল ম্যানেজারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।





বাংলা

পরলোকে সঙ্গীতজ্ঞ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—

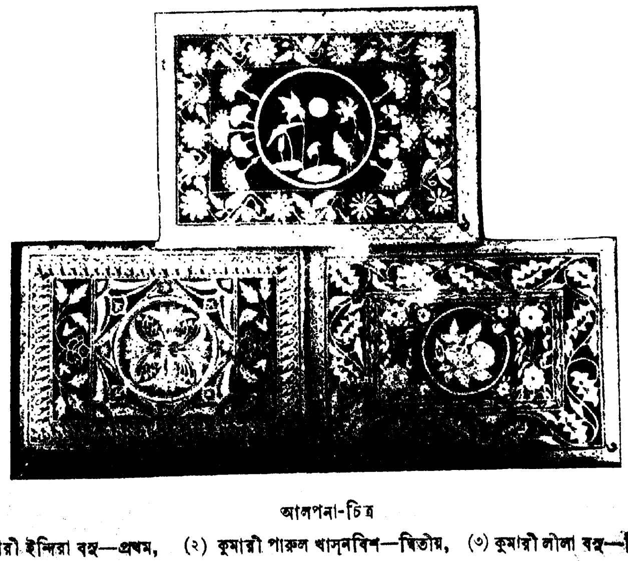
বঙ্গের শ্রেষ্ঠ যন্ত্রসঙ্গীতকলাবিদ্‌গণের মধ্যে বহরমপুরের হরিমোহন ন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম। ইউরোপীয় সঙ্গীতকে বাংলায় এবং াংলা সঙ্গীতকে ইংরেজী স্বরলিপির দ্বারা নূতন ভঙ্গীতে রূপান্তরিত রিয়া তিনি অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ভারতীয় ইংরেজ-ণের সঙ্গীতের আসরে তাঁহার যন্ত্রসঙ্গীত সাধনার নূতন ভঙ্গী উরোপীয় সঙ্গীতকলাবিৎ ও দেশীয় রাজন্যবর্গকে মুগ্ধ করিত। হরমপুরের অনেক উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজ রাজপুরুষকে তিনি তাঁহার বভাবে প্রবর্ত্তিত যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই সব ইংরেজ াত্রগণের দ্বারা তাঁহার নাম সুদূর ইউরোপেও বিস্তৃত হইয়াছিল। হারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, রাজা জগৎকিশোর এবং শ্রীবনবিহারী সেন এই তন জন তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। বহরমপুরের বিখ্যাত এমেচার কনসার্ট পার্টি"র তিনি একমাত্র প্রধান শিক্ষক ও কর্ণধার শ্রেষ্ঠ যন্ত্রসঙ্গীত সঙ্ঘের (concert party) তিনি অনেক বার ভারতীয় সঙ্গীতকলা শিক্ষা দিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। গত ২১শে ডিসেম্বর তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

সাইকেলে মেয়েদের বৰ্দ্ধমান যাত্রা—

কলিকাতা ছাত্রীসঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীমতী আভা দে, শ্রীমতী বিজলী মিত্র ও শ্রীমতী গীতা পাল ইহার শিক্ষক শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার ঘোষের তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি সাইকেলে বৰ্দ্ধমান যাত্রা করেন। বৰ্দ্ধমান কলিকাতা হইতে চুয়াত্তর মাইল। এই দীর্ঘপথ গমনে ছাত্রীদের কোনই কষ্ট হয় নাই। ছাত্রীসঙ্ঘের মেয়েরা ছাড়া এপর্য্যন্ত আর কেহ সাইকেল যোগে এত পথ গমন করেন নাই।

আলপনা-চিত্রে প্রতিযোগিতা—

বগুড়া হইতে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দাস লিখিতেছেন—



আলপনা-চিত্র

(১) কুমারী ইন্দিরা বসু—প্রথম, (২) কুমারী পারুল খাসনবিশ—দ্বিতীয়, (৩) কুমারী লীলা বসু—দ্বিতীয়

ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের সভাক্ষেত্রে তিনি কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথকে—"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী"র ইংরেজী াং শুনাইয়া মুগ্ধ করিয়াছিলেন। বিলাত ও ফ্রান্সের কয়েকটি

"অপ্রয়োজনের আনন্দে মানুষ যা গড়ে, সেখানে মেলে তার শিল্প ও কবি-মনের পরিচয়। আর এই রসকলাক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতিভার দান অমূল্য। ছড়ায়, গাথায়, বিবাহে, ব্রতকথায়, ব্রতনৃত্যে,

আল্‌পনায়, কাঁথাচিত্রে, মৃৎশিল্পে, তক্‌তির ছাচে, জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে আমাদের মেয়েদের হাতের ছাপ মেলে।

"চর্চ্চার অভাবে বহু গৃহশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে আল্‌পনা-শিল্পেরও অকাল সমাধি হতে বসেছে। এই সমস্ত লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার চেষ্টায় কিছুদিন পূর্ব্বে বগুড়া শহরে 'এমেচার আর্টিষ্ট এসোসিয়েসনে'র উদ্যোগে মেয়েদের মধ্যে একটি আল্‌পনা-প্রতিযোগিতা হয়। কলিকাতার বাহিরে ও উত্তর বাংলায় এই প্রচেষ্টা প্রথম। সুখের বিষয়, প্রতিযোগিনীদের মধ্যে আজকালকার মেয়েদের সংখ্যাই ছিল বেশী।"

তিনি আরও লিখিয়াছেন, এই প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী ইন্দিরা বসু প্রথম এবং শ্রীমতী পারুল খাসনবিশ ও শ্রীমতী লীলা বসু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

পরলোকে প্রিয়ম্বদা দেবী—

পাবনার অন্তর্গত তাড়াশের জমিদার শ্রীযুক্ত কুমার রাধিকাভূষণ রায় মহাশয়ের পত্নী প্রিয়ম্বদা দেবী মহাশয়া সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাড়াশের জমিদার পরিবার দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ। বহু শিক্ষা



প্রিয়ম্বদা দেবী

প্রতিষ্ঠানে এই পরিবারের বিস্তর দান আছে। প্রিয়ম্বদা দেবী শুধু দানশীলাই ছিলেন না, তিনি ধর্ম্মপরায়ণা বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। মৃত্যুর দিনেও তাঁহার ধর্ম্মালোচনা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

শ্রীমতী অমলা নন্দীর কৃতিত্ব—

এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি সঙ্গীত-সম্মেলনের বিষয় গত মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নৃত্যবিদ্‌গণও যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কলিকাতার শ্রীমতী অমলা নন্দীর প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসিত



শ্রীমতী অমলা নন্দী

হইয়াছিল। তিনি তাঁহার কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ সাতখানি স্বর্ণ পদক ও তিনখানি রৌপ্যপদক লাভ করেন।



শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দে

দেশে বাঙালীর কৃতিত্ব—

শ্রীযুত রাসবিহারী দে গত ইং ১৯৩০ সালে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ১৯৩২ সালের পরে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ জার্মানী গমন করেন। সেখানে প্রথমতঃ কয়েক মাস প্রসিদ্ধ এম-এ-এন্ এর কারখানায় ইঞ্জিন সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিয়া বিখ্যাত সিমেন্স সুকার্টের (বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রস্তুতকারী) কারখানায় এক বৎসরের উপর কাজ করেন। তাঁহার পারদর্শিতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি গত ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে "জার্ম্মান ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার সমিতির" ও গত অক্টোবর মাসে "আমেরিকার ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার সমিতি"র সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

—

ভারতবর্ষ



শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মেলন—

সম্প্রতি কাশীধামে নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কাশীর মহারাজা ইহার উদ্বোধন করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু সঙ্গীতজ্ঞ রাজন্য ও জনমোহনগণ ইহাতে যোগদান করিয়া নিজ নিজ গুণপণা প্রদর্শন করেন। স্থানীয় থিওসফিক্যাল স্কুলের বালক-বালিকারা গীত-নৃত্য সহযোগে 'সঙ্গীতোৎপত্তি' দৃশ্য দেখাইয়াছিল। এই সম্মেলনে বাংলা দেশ হইতেও প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েক জন বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন। বাংলার সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ভৈরব ও আশাবরীর আলাপ ও গান গাহিয়া উপস্থিত সকলকে আপ্যায়িত করেন। তিনি গানের মধ্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাধনার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'সঙ্গীত-ভারতী'র প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল আজিজ খাঁ, শ্রীযুক্ত দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র সেন মহাশয়গণের নামও উল্লেখযোগ্য। এই সম্মেলনের একটি বিশেষত্ব—হারমনিয়মের সাহায্যে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত নিষিদ্ধ ছিল। অধিবেশনের শেষ দিন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত থাকিয়া সম্মেলনকে গৌরবান্বিত করেন। সম্মেলনের সেক্রেটারী ডক্টর মতিচন্দ্ চৌধুরী মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে ইহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

মাদ্রাজে নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন, নবম অধিবেশন—



কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

বিগত ৮ই ও ৯ই পৌষ মাদ্রাজে কংগ্রেস ভবনে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, এম্. এল্. সি'র সভাপতিত্বে নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের নবম অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভায় ভারতের নানা স্থান হইতে প্রতিনিধি সমাগম হইয়াছিল, সেই সঙ্গে একটি প্রদর্শনীও হইয়াছিল। তাহার দ্বারোদ্ঘাটন করেন মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব

মেয়র মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর জি. নারায়ণ স্বামী, কে. টী. সি. আই. ই। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ নরসিংহ রাও সম্বর্দ্ধনাসূচক বক্তৃতা করিলে পর কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান মিঃ আশাদুল্লা সম্মেলন উদ্বোধন করেন। তাহার পর সভাপতি কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণে ভারতবর্ষের লাইব্রেরী আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত এবং এতৎ সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাবের অবতারণা করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, স্থানীয় কৃষ্টির উন্নতিকল্পে গ্রন্থাগার এবং স্থানীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সহকারিতা ও সাহচর্য্য আবশ্যক। গ্রন্থাগার ভালরূপে পরিচালন করিতে হইলে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পল্লীগ্রামেই হউক আর নগরেই হউক, প্রত্যেক য়ুনিয়ান বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে অন্ততঃ একটি ভাল গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যক। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পরস্পর পুস্তক লেন-দেন এবং ছোটখাট গ্রন্থালয়ের অভাব পূরণ জন্য ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

—

অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ

ভারত-ব্রহ্ম বাণিজ্য-চুক্তি—

নূতন শাসন-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে, কিন্তু উভয় দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্থাপিত হইবে। এই চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা-বৈঠক নয়া দিল্লীতে বসিয়াছে (১৮ই জানুয়ারী ১৯৩৫)। এই বৈঠকে ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যের তুলনামূলক আলোচনা হইয়াছে। ১৯৩২—৩৩ সনে ভারতে ব্রহ্মদেশের রপ্তানি এইরূপ—

পণ্য		লক্ষ টাকা
ধান	...	৫৫
চাল	...	৬,৩৭
ডাল	...	৩২
কেরোসিন	...	৮,৪২
বেঞ্জিনো ও পেট্রোল	...	৫,৩৪
সেগুণ কাঠ	...	১,৩৬
মেশিন তৈল	...	৭০
লা	...	২
অন্য কাঠ	...	১৬
মোট (অন্যান্য সহ)		২,৩৫৯

ঐ বৎসর ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে আমদানি করে—

পণ্য		লক্ষ টাকা
কয়লা	...	৫৬
কার্পাস সুতা	...	৬৫
কার্পাস [illegible]কোরা	...	২৮
,, [illegible]ধোলাই	...	১৪
,, [illegible]প, রঙীন, ছিট	...	৭০
পাটের ছালা, থলি	...	১,১১
সুপারী		৩৪
তামাক		২৮
ডাল		২০
ময়দা ও আটা		৩০

এতদ্ব্যতীত ১৩ লক্ষ টাকার বিদেশী বস্ত্র ভারতবর্ষ হইয়া ব্রহ্মদেশে যায়। ইহা সর্ব্বসমেত মোট দাঁড়ায় মাত্র ৪৬৮ লক্ষ টাকা।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ—

পাটের চাষ কি পরিমাণ এবৎসর কমানো উচিত এ-সম্পর্কে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট এইবার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। রুরাল ডেভালপমেণ্ট কমিশনার ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন যে, ১৯৩৪ সনে যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল তাহাকে ষোল আনা ধরিয়া ১৯৩৫ সালে পাঁচ আনা কম জমিতে পাট উৎপাদন করা উচিত।

ইণ্ডিয়ান জুটমিল এসোসিয়েসন পাট হইতে নানাবিধ পণ্যের উৎপাদন কমাইবার জন্য গত ১৯৩১ সন হইতে এক চুক্তি করিয়া সমিতির অধীনস্থ যাবতীয় কলগুলিকে শতকরা ১৫টি তাঁত বন্ধ রাখিতে এবং সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা মাত্র কাজ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু গত নবেম্বর মাসে এই সমিতি শতকরা ২২½টি তাঁত খুলিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, এখন শতকরা আরও ২½টি তাঁত খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গ্রেটব্রিটেন-ভারত চুক্তি—

ম্যানচেষ্টার চেম্বার অব কমার্স এবং কার্পাস বস্ত্র ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে একদল প্রতিনিধি ইংলণ্ডের বাণিজ্য-সচিব (প্রেসিডেণ্ট, বোর্ড অব ট্রেড) স্যর ওয়াল্টার রান্‌সিম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের প্রধান অভিযোগ এই যে, গত বৎসর স্যর উইলিয়ম ক্লেয়ার লিজ ও মিঃ এইচ, পি, মোদীর মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে তাহা অনুসরণ পূর্ব্বক কোন সরকারী ব্যবস্থা হয় নাই। লাঙ্কাশায়ারের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতবর্ষ ও লাঙ্কাশায়ারের মধ্যে কোনই বাণিজ্যচুক্তি নাই—প্রতিনিধিগণ ইহাতে বড়ই দুঃখ প্রকাশ করেন। মিঃ রান্‌সিম্যান প্রতিনিধিগণকে আশ্বাস দেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব একটি বাণিজ্য-চুক্তি যাহাতে স্থাপিত হয় সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা হইবে।

সম্প্রতি ভারত-সরকারের বাণিজ্য বিভাগ প্রচার করিয়াছেন যে, গত ৯ই জানুয়ারী গ্রেট ব্রিটেন সরকারের পক্ষে স্যর ওয়াল্টার রান্‌সিম্যান ও ভারত-সরকারের পক্ষে স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র লণ্ডন নগরে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন। অটোয়া চুক্তি যতকাল বলবৎ থাকিবে এই নূতন চুক্তি তাহারই অনুপূরকরূপে অব্যাহত থাকিবে। এই চুক্তিপত্রে সাতটি দফা আছে। ভারতের কোন শিল্পকে 'সংরক্ষণনীতি'র আমলে আনিবার প্রশ্ন যখনই আলোচিত হইবে, গ্রেট ব্রিটেনের ঐ শিল্পের পরিচালকগণকে তাঁহাদের বক্তব্য উপস্থিত করিতে সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে ভারত সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন। বর্ত্তমানে যে সকল ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণ-নীতির সুবিধাভোগ করিতেছে, তাহাদিগের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিলে, সংরক্ষণ কাল অতীত হইবার পূর্ব্বেই গ্রেট ব্রিটেন সরকারের অনুরোধে ঐ শিল্পকে সংরক্ষণের সুবিধাভোগ করিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত কি না এ সম্পর্কে তদন্ত করিতে এবং এরূপ তদন্তকালে গ্রেট ব্রিটেনের ঐ শিল্পে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লোকদের বক্তব্য উপস্থিত করিতে সুযোগ দিতে ভারত সরকার চুক্তিবদ্ধ হইলেন।

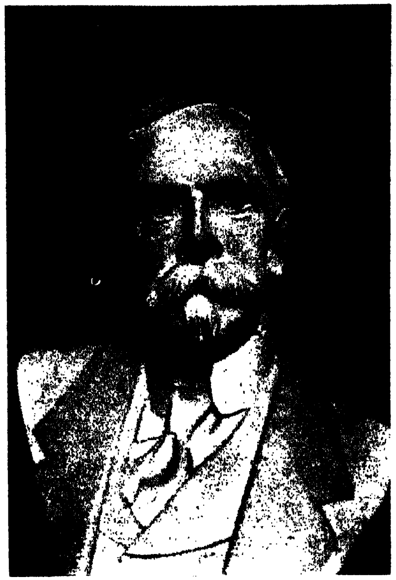
পরলোকগত ঈ বী হ্যাভেল

ঈ বী হ্যাভেল

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সে তখনকার কথা যখন এক দিকে বড় বড় নামজাদা প্রত্নতাত্ত্বিকরা (archæologist) আমাদের প্রাচীন মন্দির মঠাদির বর্ণন ও ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছেন, আর এক দিকে আর্ট-স্কুলে প্রাচীন গ্রীক্ রোম্যান মূর্ত্তির মাটির ছাঁচ এবং প্রাচীন ইউরোপীয় চিত্রকলার মাঝারিগোছের সস্তা নমুনা থেকে নকল নিয়ে নিয়ে আমাদের দেশে শিল্পশিক্ষার্থিদের ক'রে তোলা হচ্ছে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে oil-painter, water-colour painter—নকল র‍্যাফেল, টিশিয়ান হয়ে ওঠবার অভিনয় চলেছে, যেন বাঙালী ছেলে ব্রুটাস সেজে মুখস্থ-করা স্পীচ আউড়ে যাচ্ছে আর ভাবছে নিজেকে সত্যই সে রোম্যান সেনেটের এক জন। আমরা যে কেবলই আর্টিষ্ট হবার অভিনয় ক'রে চলেছি সেটা ভ্রমেও মনে হ'ত না কারু। শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যে আর্টের সৌন্দর্য্য বোঝার পক্ষে একেবারেই কাজে আসে না এটা বুঝলেম আমরা প্রথম হ্যাভেল (Havell) সাহেবের লেখা থেকে—এ যেন এতকাল আমাদের ভাস্কর্য্য-শিল্পের বহিরঙ্গীন অংশের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বয়েস ইত্যাদির হিসেব ধরা হচ্ছিল আমাদের আগে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা—ঠিক যে-ভাবে ঘোড়ার দালাল ঘোড়ার দাঁত ল্যাজের দৈর্ঘ্য কাঠামোর লম্বাই চওড়াই দিয়ে ঘোড়ার সৌন্দর্য্য বর্ণন করে সেই ভাবে কাজ হচ্ছিল। কিন্তু হ্যাভেল সাহেব তাঁর লেখায় একাধারে প্রত্নতত্ত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, ভারতীয় শিল্পের নিগূঢ় রস পরিবেশন করলেন আমাদের।

সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষা-পদ্ধতিও তিনি দেশী প্রথায় এ-দেশের ছাত্রগণের উপযোগী ক'রে তোলবার চেষ্টায় রইলেন। খাঁচা থেকে পাখীকে টেনে বার ক'রে বনস্পতির ডালে তাকে বসিয়ে দিতে গেলে সে যেমন মানুষটাকেই কামড় দিতে থাকে তেমনি ঘটনা ঘটল এ-দেশীয় শিল্পী ও



ঈ বী হ্যাভেল

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট-আর্ট-স্কুলে স্থাপিত হ্যাভেল সাহেবের আবক্ষমূর্ত্তির প্রতিলিপি। এই মূর্ত্তিটির নির্ম্মাতা শ্রীযুক্ত কে. ভেঙ্কটাপ্পা। চিত্রখানি শ্রীযুত মুকুলদের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

হ্যাভেল সাহেবের মধ্যে—আর্ট-স্কুলের প্রথম শিক্ষাসংস্কার কালে। তখন আমাদের কোন শিক্ষাসদনে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ট-শিক্ষার স্থান ছিল না,—আজকাল নৃত্যকলা শিক্ষা নিয়ে যে হৈ চৈ বেধেছে তার চেয়ে অধিক আপত্তি উঠেছিল তখনকার কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের মধ্যে শিক্ষাগারগুলোর মধ্যে ড্রয়িংশিক্ষার প্রথম প্রচলন ব্যাপার নিয়ে। অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সে-বিষয়ে সফলকাম হলেন হ্যাভেল। যে চোখে হ্যাভেল সাহেব আমাদের দেশের শিক্ষা, দীক্ষা, শিল্প, ইতিহাস প্রভৃতি দেখে গেছেন তা এক জন ঋষির পক্ষেই সম্ভব, সেই কারণেই আমরা না বুঝলেও তিনি জগতে শ্রদ্ধার পাত্র এবং এ-দেশের

শিল্পশিক্ষার মূল প্রতিষ্ঠাতা বলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে হবে আমাদের।

শিল্প-শিক্ষার্থী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ড্রয়িং-শিক্ষার জন্য ড্রয়িংবুক এবং শিল্পসৌন্দর্য্য বুঝিয়ে আমাদের এবং বিদেশের রসপিপাসুগণের মধ্যে সুচিন্তিত পুস্তকাদি লেখা হ্যাভেল সাহেবের সারা জীবনের ব্রত ছিল—এমন ক'রে আমাদের শিল্পের আর শিল্পিগণের জন্যে নিঃস্বার্থ প্রাণপণ পরিশ্রম অন্য কে করেছে?

হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ

শ্রীমুকুলচন্দ্র দে

তখন আমি ছেলেমানুষ—বোলপুরে পড়ি; ইণ্ডিয়ান আর্টের বই হ্যাভেল সাহেবের সেই প্রথম বের'ল। তখন ভাবতেও পারি নি যে তাঁর সঙ্গে কোনদিন আমার দেখাসাক্ষাৎ বা আলাপ-পরিচয় হবে।

১৯২০ সালে ইংলণ্ডে যখন গেলুম, তখন খুব ইচ্ছা হ'ল যে হ্যাভেল সাহেবকে একবার দেখ্ব। লণ্ডনে থাকতে হ্যাভেল সাহেব যদিও দু-চার বার এসেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে ওঠে নি। ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে তিনি আমায় একখানি চিঠি লেখেন, তাতে বলেন, আমি অক্সফোর্ডে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি বড় খুশী হবেন। কিন্তু তাও নানা কারণে তখন হয়ে ওঠেনি।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ স্তর জন্ উড্রফ আমাকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। উড্রফ সাহেব সেই সময়ে জজের কাজ থেকে অবসর নিয়ে অক্সফোর্ডে বসবাস করছিলেন। সেখানে তখন তিনি ভারতবর্ষীয় আইনের অধ্যাপক। তাঁর বাড়িতে আমাদের দেশের আর্টের নূতন পুরাতন অনেক রকম খুব ভাল ভাল সংগ্রহ আছে দেখলুম। সেই সময়ে একদিন স্তর জন্ উড্রফ হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা করার জন্য সময় ঠিক ক'রে এলেন। পরের দিন সকালবেলায় আমরা প্রাতর্ভোজন সেরে হেঁটেই হিডিংটন-হিলের দিকে রওনা হলুম। মাইল-দুই পথ হেঁটে শহরের বাইরে—উঁচু-নীচু খোলা মাঠে—বন-জঙ্গলের ঝোপ-ঝাড়ের ধারে ছোট্ট একটি ফেরোকংক্রীট ও কাঠের তৈরি আমাদের দেশী ধরণের একতালা বাংলায় পৌছলুম। বাড়িটির নাম "Hvide Hus."

আশপাশে আর কারও বাড়ি নেই বললেই হয়, দূরে দূরে দু-একটি বাড়ি দেখলুম। এই খোলা মাঠে বন-ঝোপের ধারে নিরালা ছোট্ট একটি নূতন ঘর, শীতকাল, বাইরে প্রচণ্ড শীত। বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে বন্ধ দরজায় স্তর জন্ ঠক্ ঠক্ করতেই—বৃদ্ধা মিসেস্ হ্যাভেল এসে দোর খুলে দিয়ে আমাদের ভিতরে ডাকলেন। ঘরে ঢুকে দেখি ম্যাণ্টেলপিসের সামনে মাথায় হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বৃদ্ধ হ্যাভেল ব'সে আছেন। বললেন, "এস ব'সো," কিন্তু ব'লে কিছুক্ষণ ঐরকম ভাবে বসেই রইলেন। তাঁর মুখ আমরা দেখতে পেলুম না, হাতের মধ্যে গোঁজা কেশহীন শাদা মাথাটি শুধু দেখতে পাচ্ছিলুম। একটি বেতের চেয়ারে ব'সেছিলেন—পায়ের গোড়ায় ছোট একটি কার্পেট পাতা, ঘরে আসবাবপত্র কিছুই প্রায় ছিল না। ঘরে আগুন নেই—কন্‌কনে ঠাণ্ডা ঘর, ফায়ারপ্লেসের উপর একখানি ওঁর নিজের হাতে আঁকা ছবি—দার্জ্জিলিং থেকে কাঞ্চন-জঙ্ঘার দৃশ্য। ছবিখানি শুকনো অয়েলপেণ্টিং ছবির মত দেখতে মনে হ'ল। বরফের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘাই বিশেষ ক'রে দেখা গেল। পাশে একটি টেবিলের উপরে একখানি প্রকাণ্ড মোটা নিউজ্‌কাটিং-এর বই (খবরের কাগজ থেকে কাটা প্রবন্ধাদির বই) দেখতে পেলুম। তাতে ভারতবর্ষের চিত্রকলার সম্বন্ধে যত খবর বাদ-প্রতিবাদ বেরিয়েছে সব, এবং তাঁর নিজের লেখা খবরের কাগজে প্রকাশিত আলোচনাদিও রয়েছে। মনে হ'ল বৃদ্ধ ঋষি হিমালয়ের পাদমূলে ব'সে ভারতের বিষয় নিয়ে তপস্যা করছেন!

আমাকে দেখে খুশী হ'য়ে বললেন, "আমি ভারতের কথাই ভাবছিলুম। তোমার ছেলেবেলার কাজ আমি কিছু কিছু জানি।" গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। দিল্লীর নূতন রাজধানী গঠন ব্যাপার নিয়ে তিনি মনে বড়ই কষ্ট পাচ্ছিলেন। ভারতের কত টাকা খরচ ক'রে দিল্লীতে নূতন রাজধানী তৈরি হচ্ছিল, আর সেও লণ্ডনের অফিসে ব'সে! ভারতের বহু শিল্পী যে কিছু কাজ করতে পাচ্ছিল না, তাই নিয়ে তিনি দুঃখ করলেন, স্তর এড্‌উইন

লাটিন্‌স্ যে প্রকাণ্ড ভুল করছিলেন, সে-কথাও তিনি বললেন। তিনি আমায় বার বার বললেন, "তুমি তোমার দেশে গিয়ে দিল্লীতে এবং কলকাতায় শিক্ষাদানের ভার নিয়ে কাজ শিখাও, তাতে খুব বড় কাজ ও উপকার হবে।" লণ্ডনে যে ইণ্ডিয়া অফিস হবে, তাও তিনি জানতেন, এবং তাতেও দেশী শিল্পীদের কাজ করা এবং দেশী ভাবের স্থাপত্য হওয়া উচিত সে কথাও তিনি আমাকে বলেছিলেন। তিনি এই সব ব্যাপার নিয়ে সেই সময়ে কাগজপত্রে খুব লেখালেখি করছিলেন; সেই সব কাগজপত্রও আমায় দেখালেন। চলে আস্‌বার সময় হ্যাভেল সাহেব তাঁর লেখা "The Himalayas in Indian Art" ("ভারতীয় ললিত-কলায় হিমাদ্রি") বইখানি আমায় উপহার দিলেন; বইখানি মাথায় ছুঁইয়ে আমি বিদায় নিলাম। আমার সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ এই একবারই হয়েছিল, কিন্তু ভারতের দুঃখে দুঃখী এবং ভারতের চিন্তায় নিমগ্ন সেই ঋষিমূর্ত্তি চোখের সাম্‌নে আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি।

ভারতবর্ষকে নানা দেশের নানা লোকে নানা ভাবে ভালবেসে এসেছেন, কিন্তু ভারতীয় শিল্পকে হ্যাভেল সাহেবের মত এমন গভীর ও একনিষ্ঠ ভাবে জীবনের সব সময়ে কেউ ভালবেসেছেন কি না আমার জানা নেই। বিদেশীর মধ্যে তিনিই প্রথম ভারতবর্ষের শিল্পকে বিদেশীর হাত থেকে উদ্ধার ক'রে তার নিজস্ব মূর্ত্তিতে প্রকাশ হবার সাহায্য করেন। সেই জন্য তিনি বর্ত্তমান কালের সমস্ত শিল্পীরই আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র।

আর্নেষ্ট্ বিন্‌ফীল্ড্ হ্যাভেল

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এক জাতির পক্ষে অন্য জাতির বিভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতার, কৃষ্টির ও শিল্পসাধনার বিশিষ্ট রস আস্বাদন করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। জগতের নানা স্থানে নানা দেশে, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে আপন আপন বিভিন্ন শক্তি ও চিন্তাধারার আদর্শে, বিভিন্ন প্রকৃতির কৃষ্টি ও শিল্প-সাধনার সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়াছে। এই বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন প্রকৃতির সাধনার সংস্পর্শে, বিনিময়ে ও প্রভাবে বিশ্বমানবের বিরাট সাধনার কলেবর, বিধাতার বিধানে যুগে যুগে, দেশে দেশে, পরিণতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বাণিজ্যের স্বার্থ, রাজনৈতিক স্বার্থ, ব্যক্তিগত স্বার্থ ইত্যাদি নানা স্বার্থবাদের বিপাকে পড়িয়া মানুষের সম্মিলিত সাধনার জয়যাত্রা পদে পদে বাধা পায়, পদে পদে পথ হারায়। এই জন্য মধ্যে মধ্যে এক জন নেতার আবশ্যক হয়, যিনি এই পথ-হারান সভ্যতার পথ-প্রদর্শক হইয়া, বিভিন্ন পথের বিভিন্ন যাত্রীদের মধ্যে পরিচয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া—যূথভ্রষ্ট যাত্রীদের একত্র করিয়া, সম্মিলিত করিয়া, বিশ্বমানবের কৃষ্টির পথে আবার পরিচালনা করেন। য়ুরোপ ও ভারতের সাধনার সম্মিলনক্ষেত্রে হ্যাভেল সাহেব ছিলেন বিধাতার প্রেরিত এক জন বিশিষ্ট অগ্রদূত।

ভারতের শাসনতন্ত্রের উপযোগী যে কয়টি যন্ত্র ব্রিটিশ-শাসকের কারখানায় উদ্ভাবিত হইয়াছে 'ভারতীয় শিক্ষা-তন্ত্র' তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাপার। হ্যাভেল সাহেব এই শিক্ষাতন্ত্রের এক জন যন্ত্রচালক হইয়াও, এই শিক্ষাযন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বড় কর্ত্তাদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, হ্যাভেল সাহেবের প্রদর্শিত শিক্ষানীতি অবলম্বন করিয়া যুবক ভারতের জাগ্রত জাতীয়তাকে কৃষ্টি ও সাধনার নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে পরিচালিত করিলে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে সন্ত্রাসবাদের ঘনঘটার কাল-ছায়ার আবির্ভাব হইত না। হ্যাভেল সাহেব যে দৃষ্টিশক্তি লইয়া ভারতের সাধনা ও সভ্যতার গভীরতম অন্তর্দেশ অনুসন্ধান করিয়া তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন, সাধারণ শিক্ষিত ইংরেজের মধ্যে এই শ্রেণীর পর্য্যালোচকের একান্ত অভাব। জাপানে লফকদিয় হীয়রন্ ও ফেনেলোসা, পারস্যে বার্টন ও নিকলসন্ কৃষ্টির ক্ষেত্রে যে উদার দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনাদির ক্ষেত্রে মোক্ষমুলার ও স্যর উলিয়ম্ জোন্স যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনায়, ভারতের শিল্প সাধনার ক্ষেত্রে হ্যাভেলের গভীরতর অধ্যাত্ম দৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। ভারতের শিল্পের অন্তর্নিহিত রসের অনুসন্ধান দিয়া, ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল জগতে সুপরিচিত করিয়া, হ্যাভেল সাহেব ভারতের সভ্যতাকে নূতন গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এই হিসাবে হ্যাভেল সাহেবের প্রচেষ্টা জাতীয় সাধক কোনও ভারতীয়ের চেষ্টা হইতে কম মূল্যবান্ নহে। পক্ষান্তরে, ইংরেজী শিক্ষার অতি-প্রভাবে বিজাতীয় ভাব-গ্রস্ত 'শিক্ষিত' ভারতীয়কে আপনার দেশের শিল্পসাধনার মর্ম্মস্থান উদ্ঘাটন করিবার পথ দেখাইয়া দিয়া, হ্যাভেল সাহেব ভারতের নূতন দেশাত্মবোধের ইন্ধন যোগাইয়া, জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ পুরোহিতের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন শিল্পের বিশিষ্ট রূপ ও প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া, জগতের শিল্পের দরবারে ভারতীয় শিল্পের জন্য শ্রেষ্ঠ আসন দাবি করিয়া, ভারত এবং য়ুরোপের শিক্ষিত সমাজে নানা অপমান ও লাঞ্ছনা হ্যাভেল সাহেবকে বরণ করিতে হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই, যে, শিক্ষিত ভারতবাসী তাঁহার ভারতীয় শিল্পের স্তুতিবাদ প্রথমে বিরোধের দৃষ্টিতে এবং চিরকালই কিছু সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। আজও শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন, যাঁহারা হ্যাভেল সাহেবের ভারত-শিল্পের মূল্যের দাবি অকপটে ও সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। ভারতের অকৃত্রিম সুহৃদ হ্যাভেল সাহেবের জীবন ও কর্ম্মপদ্ধতি ভারতের সাধনার বিশিষ্ট গুণাবলীর ব্যাখ্যা ও প্রচারে একান্তভাবে নিয়োজিত ছিল। তাঁহার লিখিত নানা গ্রন্থ ও পুস্তকাদিতে ভারতীয় সাধনার উপর তাঁহার গভীর প্রেম ও ভক্তির পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। কলিকাতার সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ নানা কর্ত্তব্য ও নানা দায়িত্বের পদ। এই পদের নানা কর্ত্তব্যের মধ্যে অবসর খুঁজিয়া লইয়া তিনি যেরূপে ভারতের শিল্প-সাধনার ঐকান্তিক অনুশীলন ও সেবা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের ব্যাপার। অধ্যক্ষতার অনবসরের অবকাশের মধ্যে তাঁহার ভারতীয় কৃষ্টির নানা বিভাগের গভীর অনুশীলন ও অনুসন্ধানের চেষ্টার পরিচয় তাঁহার রচিত এক একটি পুস্তকে ভারতের প্রাচীন শিল্প-মন্দিরে ভক্তের অর্ঘ্যের মত বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'প্রাচীন বাংলার প্রস্তর-শিল্প' (*Stone-Carving in Bengal*)। এই পুস্তক প্রণয়ন করিবার সময় তিনি প্রথম খুঁজিয়া পান, যে, প্রাচীন পদ্ধতির প্রস্তর-শিল্প ও বাস্তুশিল্প কুড়ি-শতকেও জীবিত আছে। এই সময়ে পুরীর 'এমার-মঠে,' অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত একটি নূতন পান্থশালা সবেমাত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে অনেক শিক্ষিত বাঙালী পুরীতে তীর্থযাত্রাদি ও স্বাস্থ্যের উদ্দেশে যাতায়াত সুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নূতন পান্থশালার অপূর্ব্ব স্থাপত্যের পরিচয় হ্যাভেল সাহেবের পূর্ব্বে কোনও বাঙালীই দিতে পারেন নাই। ভারতের সাধনার অকৃত্রিম ভক্তের দ্বিতীয় উপহার—"বারাণসীর পবিত্রপুরী: হিন্দু-জীবন ও ধর্ম্মের চিত্র" (*Benares, the Sacred City: Sketches of Hindu Life and Religion*, 1905)। এই গ্রন্থে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে, হিন্দুর জীবন ও কর্ম্মপদ্ধতি অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের সমষ্টি-মাত্র নহে, পরন্তু, হিন্দুর কর্ম্মজীবনে ও আচারের মধ্যে উচ্চ-অঙ্গের ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিক দার্শনিকতা সুন্দরের রূপ লইয়া প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। ৺কাশীধামের সাধারণ জীবন-যাত্রার নানা খুঁটিনাটির সাহায্যে, তিনি হিন্দুর ধর্ম্মজীবনের গভীর আধ্যাত্মিকতার চিত্র অপূর্ব্ব কৌশলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সামান্য উপকরণে, তৈজসাধারে, স্নান-ঘাটের আকস্মিক দৃশ্যে, পথের ধারে একটি উপেক্ষিত পাথরের নক্সায়, মন্দিরের প্রবেশ-পথের স্তিমিত-আলোকের ফাঁকে ফাঁকে যাত্রীদের নানা ভঙ্গীতে, ভজনারত সাধু-সন্ন্যাসীদের নিবিষ্ট চিত্রাদিতে, হ্যাভেল সাহেব হিন্দুর আধ্যাত্মিক জীবনের রহস্যের যে সমগ্র মূর্ত্তিটি আমাদের চক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা আর কোনও শিক্ষিত বিজাতীয়ের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাঁহার তৃতীয় পুস্তক "আগ্রা ও তাজ" (*Hand Book to Agra and the Taj, 1st ed.*, 1907, Revised Edition, 1912)। এটি একখানি 'যাত্রী'দের উপযোগী পরিচয় পুস্তিকা মাত্র। কিন্তু এই পুস্তিকায় হ্যাভেল সাহেব নিপুণ বিশ্লেষকের কৌশলে সহজে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে, মোগল-যুগের স্থাপত্য-কলা পারস্যশিল্পের জারজ সন্তান নহে, কিংবা ইতালীর ওস্তাদশিল্পীর বিজাতীয় পরিকল্পনা নহে, পরন্তু, ভারতের মানস-সরোবরের সহজাত শ্রেষ্ঠ সরসিজ। মোগল-স্থাপত্যের রসানুসন্ধানের প্রথম-সূচনা এই পুস্তিকায় প্রথম পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি প্রাচীন-পন্থী পুরাতাত্ত্বিকজের অন্ধবিশ্বাসের দুর্গে প্রচণ্ড আঘাত

করিয়া নূতন দৃষ্টিতে ভারত-শিল্পের বিশ্লেষণ-রীতির প্রথম সূত্রপাত করিয়াছিল। ইহার ঠিক পরেই ভারত-শিল্পের রস-বোধক যুগপ্রবর্ত্তক গ্রন্থ "ভারতের চিত্র ও ভাস্কর্য্য" (*Indian Soulpture and Painting*, January 1908) প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে হ্যাভেল সাহেব ভারত-শিল্পের সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অলৌকিক স্বাতন্ত্র্য ও গৌরবের ইতিহাসে নানা শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের প্রতিলিপির সাহায্যে সাহস ও সত্যানুভূতির শক্তি দিয়া হাতে-কলমে প্রমাণ করিয়া দিলেন, যে, ভারতের শিল্পের চাবিকাটি তাহার অভিনব আধ্যাত্মিক ইতিহাসের মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। ভারত-শিল্পের সৌন্দর্য্যের আদর্শ ও প্রকাশ-রীতি তাহার বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত আছে। প্রাচীন গ্রীক্ বা ইতালীর নব যুগের আদর্শের পরকলা চোখে আঁটিয়া ভারত-শিল্পের সৌন্দর্য্য বিচারের চেষ্টা, অন্ধের চেষ্টা। অর্দ্ধ শতাব্দীর অনুসন্ধানে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক কনিংহাম, ফর্গুসন, বর্জেস ও মার্শ্যাল প্রমুখ দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণের চক্ষে যে সত্য অবগুণ্ঠিত ছিল, যথার্থ সৌন্দর্য্যরসিক ও ভক্তের চক্ষে ভারতের রূপলক্ষ্মী আত্ম-প্রকাশ করিলেন। ভারতে শিল্পের পক্ষ হইতে এই স্বাতন্ত্র্য, সম্মান ও গৌরবের দাবি য়ুরোপের শিক্ষিত সমাজে যে কোলাহল ও প্রতিবাদের কলরব তুলিয়াছিল আজও তাহার প্রতিধ্বনি স্তব্ধ হয় নাই। হ্যাভেল সাহেবের দাবি স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে একাধিক জর্ম্মন শিল্পবিৎ ভারতের শিল্পের অনুশীলনে যে অক্লান্ত সাধনা ও গবেষণায় আজ পঁচিশ বৎসর নিযুক্ত আছেন তাহার অনুরূপ সাধনা ভারতের কোনও শিক্ষাকেন্দ্রে অদ্যাপি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কারণ, এই নূতন দৃষ্টিশক্তির কেবল যে য়ুরোপীয় মনীষীদের অত্যন্ত অভাব ছিল তাহা নহে, ইংরেজী শিক্ষার মাদকতায় সংজ্ঞাহীন ও দৃষ্টিহীন বিজাতীয় ভাবাপন্ন শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষে এই সত্যদৃষ্টির চক্ষুলাভের একান্ত প্রয়োজন ছিল। হ্যাভেল সাহেবের অনুশীলনক্ষেত্রে ভারতবাসী তাহার নিজের দেশের শিল্পকে নূতন করিয়া দেখিতে, বুঝিতে ও চিনিতে শিখিল। ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে এই নূতন শিক্ষার দিন, একটি নবজাগরণের শুভদিন। এই শুভদিনে হ্যাভেল সাহেবের পরিচালনায় ভারতের নবযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পের নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিলেন। ভারতের প্রাচীন ও সত্য আদর্শ নূতন রূপে যুগের উপযোগী আকারে ফুটাইয়া তুলিলেন। এই প্রাচীন ভারতকে বর্ত্তমানের মধ্যে মূর্ত্তিমান ও জীবন্ত করিবার গৌরব অবনীন্দ্রনাথ বাঙালী শিল্পীদের কপালে উজ্জ্বল করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। বাংলার নূতন চিত্রকলার বিচিত্র ও গৌরবজনক ইতিহাস "প্রবাসী"র পাঠকদের অবিদিত নাই এবং এই নূতন আন্দোলন ও সাধনার গৌরবের একাংশ যে "প্রবাসী"র সম্পাদকের প্রাপ্য এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। হ্যাভেলের প্ররোচনায় কয়েকটি রূপরসিক ইংরেজের উৎসাহে কলিকাতায় "প্রাচ্য-শিল্পের ভারতীয় সংঘে"র (Indian Society of Oriental Art) প্রতিষ্ঠা হয়। এই পরিষদের নানা চেষ্টায় ভারতের নূতন পদ্ধতির চিত্রকলা দেশে বিদেশে পরিচিত হইয়া হ্যাভেলের প্রদর্শিত সঙ্কেত সার্থক ও সফল করিয়া তুলিয়াছে।

১৯০৮ সালে প্রকাশিত হ্যাভেল সাহেবের "ভারতের ভাস্কর্য্য ও চিত্র" পুস্তকে যে একটু তর্কবাদের সুর ছিল, যে একটু প্রতিবাদের গর্জ্জন ছিল, ভারত-শিল্পের প্রতি ন্যায্য বিচারের দাবি ছিল, পক্ষপাতী ও প্রতিবাদীর সেই সুর সংযত ও উচ্চ স্বর মধুর করিয়া লইয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইল—"ভারত-শিল্পের আদর্শ" (*Ideals of Indian Art*, 1911)। তাঁহার প্রথম পুস্তকে ভারত-শিল্পের আদর্শের অনুসন্ধান ভারতের প্রাচীন শিল্পের নিদর্শনের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তকে ভারতের দর্শনশাস্ত্র ও প্রাচীন ধর্ম্মসাহিত্য আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, যে, ভারতের প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া, নানা প্রভাব ও প্রগতির মধ্য দিয়া আর্য্য সভ্যতার মূল ধারাটি কি সাহিত্যে, কি শিল্পে সমান ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও শ্রেষ্ঠ শিল্পের আদর্শ অভিন্ন। মধ্য যুগের ব্রাহ্মণ্য ভাস্কর্য্য ও "পৌরাণিক" শিল্প বৈদিক সাধনার ভাব ও ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তার পর স্থাপত্য শিল্পের পালা। ১৯১৩ সালে মোগল যুগের স্থাপত্য সম্বন্ধে এক বৃহৎ পুস্তক প্রকাশিত হইল। ইহার নাম "ভারতের স্থাপত্যঃ তাহার মনস্তত্ত্ব,

গঠনরীতি ও ইতিহাস" (*Indian Architecture, Its Psychology, Structure and History*, 1913)। এই গ্রন্থে শতাধিক চিত্র সহযোগে হ্যাভেল সাহেব দেখাইয়াছেন যে মোগল-যুগের স্থাপত্যরীতি পারস্য দেশের আমদানী নহে, মোগল-যুগের নূতন সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম-উপাসনার উপযোগী আকার ও রীতিতে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য শিল্পের নূতন বিবর্ত্তন। যুগে যুগে, স্থানে স্থানে, সামাজিক ও ধর্ম্ম উপাসনার নূতন রীতি-পদ্ধতির আবশ্যক অনুসারে কখনও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, কখনও জৈনধর্ম্ম, কখনও বৌদ্ধধর্ম্ম, কখনও ইসলামধর্ম্মের বিভিন্ন উপাসকগণের ধর্ম্মসাধনার উপযোগী, বিভিন্ন মন্দির, বিহার ও মসজিদ প্রস্তুত করিয়া দিয়া ভারতের স্থপতিরা তাহাদের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবুদ্ধির ও সৃষ্টি-শক্তির প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। তিনি আরও প্রমাণ করিলেন যে, মোগল বাদশাহরা ভারতের স্থাপত্য শিল্পীদের নূতন ক্ষেত্রে নিযুক্ত করিয়া ভারতের প্রাচীন শিল্পবিদ্যাকে উন্নতি ও পরিণতির পথে চালিত করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসনকালেও সেই প্রাচীন শিল্পের ধারা সম্পূর্ণ শক্তি ও প্রতিভা লইয়া জীবিত রহিয়াছে এবং এই প্রাচীন শিল্পধারাকে নূতন যুগের প্রশস্ততর ক্ষেত্রে নিযুক্ত করিয়া তাহার নূতন পরিণতির অবসর দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সূত্রে হ্যাভেল সাহেব বিলাতে এমন এক বৃহৎ আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, যাহার ফলে সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট একটি বিশেষ কমিশন বসাইয়া বর্ত্তমান কালে ভারতের স্থাপত্য শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পরিচয় লইতে বাধ্য হইলেন। গর্ডন সাণ্ডার্স্ন তাঁহার লিখিত রিপোর্টে (*Modern India Building*, 1913) হ্যাভেল সাহেবের দাবি স্বীকার করিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, ভারতের স্থপতিরা তাহাদের প্রাচীন শিল্পের ধারা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এখনও জীবিত রহিয়াছে এবং অনুরূপ সুযোগ পাইলে মোগল-যুগের স্থাপত্য কলা অতিক্রম করিয়া নবযুগের উপযোগী নূতন ধারার স্থাপত্য শিল্পের প্রবর্ত্তন করিবার সামর্থ্য ভারতশিল্পীরা দেখাইতে পারে। এই দাবির সমর্থন করিয়া হ্যাভেল সাহেব তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক লিখিলেন ১৯১৫ সালে। পুস্তক খানির নাম "প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প" (*The Ancient and Mediaeval Architecture of India*, 1915)। এই পুস্তকে তিনি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও জৈন মন্দিরাদির রূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন, যে, ভারতের অলৌকিক শিল্পবুদ্ধি প্রাচীন 'ভাষা' ও ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিত্যনূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং তাহার সৃষ্টির প্রতিভা এখনও জীবন্ত ও জাগ্রত আছে এবং নূতন ক্ষেত্রে নূতন সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে। ব্রিটিশ সরকার ভারতের সভ্যতার বিকাশ ও পরিণতির সুযোগ না দিলে, ভারতবাসীকে তাহার নূতন জীবনের নানা ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের পথ না দিলে, ভারত ও ভারতীয়দের উপর বিশেষ অন্যায় বিচার করা হইবে। হ্যাভেল সাহেব বিশ্বাস করিতেন যে, কেবল চারু কলার পুনরুত্থানে নহে, পরন্তু নিত্য-ব্যবহার্য্য নানা কারু-শিল্পাদির (handicrafts) পুনঃ সংস্থাপনের ব্যবস্থা না হইলে ভারতের অন্ন-সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব এবং এই হস্ত-জাত শিল্পের পুনরুদ্ধারের প্রথম চেষ্টা ও উপায় হাতের তাঁত ও বস্ত্রশিল্পের (hand-loom) উন্নতি সাধন। কিন্তু এই বস্ত্রশিল্পের উন্নতির উপদেশ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। আপন উদ্যোগে "Havell-Hattersley Loom" নামক উন্নত-পদ্ধতির তাঁতের আমদানী করিয়া তিনি হাতে-কলমে প্রমাণ করিয়াছিলেন, কিরূপে ভারতের প্রাচীন বয়ন-শিল্প মিলের যন্ত্র-চালিত তাঁতের কাপড়ের প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিতে পারে। এই সম্বন্ধে তাঁহার প্রচেষ্টার ফল তাঁহার "Hand-loom Weaving" প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ আছে। 'বয়নশিল্পের উন্নতিই ভারতের অন্ন-সমস্যার একমাত্র পথ'—এই বাণী হ্যাভেল সাহেব মহাত্মা গান্ধীর অন্ততঃ পনর বৎসর পূর্ব্বে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

কেবল শিল্পের ক্ষেত্রে নহে, শিক্ষার ক্ষেত্রে হ্যাভেল সাহেবের আন্দোলন ভারতের ন্যায্য দাবীর সমর্থন করিয়াছে। তিনি পুনঃ পুনঃ এই কথাই গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, ভারতে প্রচলিত ব্রিটিশ শিক্ষাতন্ত্র ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার বিকাশের উপযোগী নহে, পরন্তু ভারতীয় সাধনার হানিকারক। ভারতের সভ্যতা কেবল ভারতবাসীর সম্পত্তি নহে, পরন্তু, য়ুরোপের সভ্যতার নানারূপ ব্যাধির আরোগ্যের অব্যর্থ ঔষধ এবং এই হিসাবে

ভারতের সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তৃতি-সাধন ভারতের ন্যাসরক্ষক হিসাবে ব্রিটিশ সরকারের অবশ্যকর্ত্তব্য। ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয় শাসনরীতির এরূপ নির্ভীক সমালোচক সে সময়ে কংগ্রেস দলের মধ্যেও বোধ হয় খুব অল্পসংখ্যক লোকই ছিলেন।

শিক্ষা ও শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের দাবি হ্যাভেল সাহেবই বোধ হয় প্রথম উপস্থিত করেন। শেষ বয়সে ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি দুইটি দান দিয়া গিয়াছেন। এই দুইটি নূতন পদ্ধতিতে লিখিত ভারতের ইতিহাস। প্রথমটির নাম :—"আর্য্য শাসনের ইতিহাস" (*History of Aryan Rule in India*), দ্বিতীয়টি স্কুল-পাঠ্য পুস্তক—"ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" (*A Short History of India*, 1924)। এ-কথা শিক্ষিত ভারতবাসী সকলেই জানেন, যে, ইংরেজের লিখিত ভারতের ইতিহাস নানা ভুলভ্রান্তি প্রমাণাদির পরকলার মধ্য দিয়া অন্ধ বিশ্বাস ও আপনাদের জাতীয় অহঙ্কারের লেখনীতে লিখিত এক উদ্ভট রচনা। ভারতের সভ্যতার মর্ম্মস্থান যাঁহারা খুঁজিয়া পান নাই, ভারতের সভ্যতাকে যাঁরা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শিখেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে ভারতের ইতিহাস রচনা যে বিড়ম্বনা মাত্র হ্যাভেল সাহেব তাঁহার এই দুইটি পুস্তকে উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মর্ম্মস্থান অনুসন্ধান করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতের সামাজিক নীতি, সাম্রাজ্যনীতি, শাসননীতি ও ধর্ম্মনীতি কিরূপে যুগে যুগে, প্রদেশে প্রদেশে, নানা কল্যাণের মুর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; ভারতের সভ্যতাকে সার্থক করিয়াছে, সফল করিয়াছে।

তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, পাঠান ও মোগল-যুগের বিদেশী বাদশাহরা তাঁহাদের তথাকথিত যথেচ্ছাচারী শাসন-তন্ত্র দ্বারা আর্য্য সভ্যতার বিকাশ-লাভের বাধা প্রদান করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের সমস্ত শক্তির দ্বারা আন্তরিক ভাবে তাহার পরিণতির সাহায্য করিয়াছেন এবং নূতন নূতন পথে তাহার সফলতার অবকাশ দিয়াছেন। তিনি নানা প্রমাণ অবলম্বন করিয়া অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করিয়াছেন, যে, টুগ্‌লকের শাসন, সেরসাহের শাসন, আকবরের শাসন বিজেতার শাসন নহে, ভারতীয় নীতিতে, ভারতীয়ের সম্পূর্ণ সহযোগিতায়, ভারতের কল্যাণের উদ্দেশে ভারতীয় রাজার ধর্ম্ম-শাসন।

ভারতের সভ্যতার মূলসূত্র ও আদর্শে তাঁহার যে গভীর ও অবিচলিত বিশ্বাস ছিল তাহা কোনও ভারতবাসী অপেক্ষা কিছু মাত্র হীন নহে। এই বিশ্বাস ও গর্ব্ব তাঁহার একটি মাত্র বাণীতেই ফুটিয়া রহিয়াছে,—

"ভারতবর্ষ, আজ তাহার শ্রেষ্ঠ জাতীয় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াই বিশ্বমানবের সভায় জাতীয়তার আসন হারাইয়াছে এবং ভারতবর্ষ আবার উচ্চ আসনে তখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখনই ভারত বর্ত্তমান য়ুরোপ যে আদর্শে তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শের পতাকা তাহার নিজের জন্য সমগ্র মানবের কল্যাণের জন্য উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিবে" ("India has sunk in the scale of nations, because, she has been false to her highest ideals, and India will rise again, when she holds up for herself, and for humanity, higher ones than modern Europe now brings her.")

ভারতের সভ্যতার এইরূপ দরদী প্রেমিক, ভারতীয় সাধনার আদর্শের এরূপ বিশ্বাসী ভক্ত, ভারতীয় শিল্প ও কৃষ্টির এরূপ সহৃদয় ও সুনিপুণ ব্যাখ্যাকার, ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের এরূপ অকৃত্রিম সুহৃদ, নবজাগরণের ও দেশ-পূজার এরূপ সুযোগ্য পুরোহিত ভারতের সমসাময়িক ইতিহাসে অতি অল্পই দেখা দিয়াছে। কটন, ওয়েডারবরণ, বেশাণ্ট, নিবেদিতা প্রমুখ ভারতের অন্যান্য বিদেশী বন্ধুগণের স্মৃতি যে-সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত, তাহারই পার্শ্বে ভারতের এই বরেণ্য বন্ধুর স্মৃতি-চিত্র সুবর্ণের প্রভায় চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে।

চার অধ্যায় *

শ্রীরাজশেখর বসু

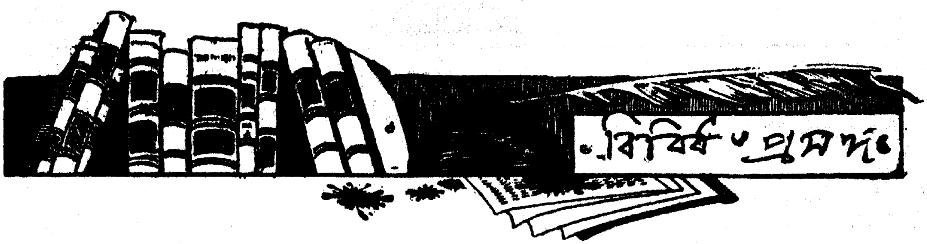
বিখ্যাত লেখকের গল্প পড়বার সময় কেউ কেউ একটা ভুল ক'রে ফেলেন। লেখক তাঁর পাত্র পাত্রীকে দিয়ে যে কথা বলান তার অনেক কথা পাঠক অকারণে লেখকের মতামত ব'লে মনে করেন। গল্পে যদি সেকেলে রীতিতে কেবল আদর্শচরিত নায়ক নায়িকা আর খাঁটী দুরাত্মা চিত্রিত হয় তবে লেখকের টান কোন দিকে তা বুঝতে বাধা হয় না। কিন্তু লেখক যদি এমন চরিত্র আঁকেন যারা স্বাভাবিক সদসৎ-নরধর্ম্মী এবং যাদের মনের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব মনোহর ভাষায় প্রকাশ পায়, তবে অসাবধান পাঠক পাত্র পাত্রীর অনেক উক্তি নির্ব্বিচারে লেখকের উপর আরোপ ক'রে বসেন। যে লেখক অনতিখ্যাত তাঁর রচনা পড়বার সময় এই ভুল বড় একটা হয় না, কারণ পাঠকের কৌতূহল পাত্র পাত্রীর উপরেই নিবদ্ধ থাকে, লেখক অন্তরালে থেকে নিস্তার পান। কিন্তু যেখানে লেখক স্বয়ং পরম কৌতূহলের বিষয়, সেখানে পাত্র পাত্রী সাধারণের কাছে সব সময়ে সুবিচার পায় না। পাঠক ছত্রে ছত্রে লেখককেই সন্ধান করে এবং তার ফলে সৃষ্টিকেই স্রষ্টা ব'লে ভুল করে। রবীন্দ্রনাথের পাত্র পাত্রী এই কারণে একটু বিপন্ন। তাই একদল পাঠক সন্দীপের উক্তি সইতে পারেন না এবং আর এক দল অনুযোগ করেন যে গ্রন্থকার কমলার সহজ নারীধর্ম্ম হঠাৎ ঘুচিয়ে দিয়ে বেচারীকে সনাতনী সতী বানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বে যে সব গল্প লিখেছেন তাতে তিনি নিরপেক্ষ স্রষ্টা, তাঁর পাত্র পাত্রীর মতিগতির তিনি অনুমন্তাও নন অবমন্তাও নন। কিন্তু 'চার অধ্যায়' গল্প ভিন্ন পদ্ধতিতে লেখা। তার লক্ষণ—'আভাস' শীর্ষক মুখবন্ধ। তাঁর কোনও আধুনিক গল্পে মুখবন্ধ নেই। 'চার অধ্যায়'এর উদ্দেশ্য কি তার আভাস প্রথমেই পাওয়া যায়। গল্পের প্রধান পাত্র পাত্রীরা ঘোরাচারী বিপ্লবী। রাজনৈতিক বিক্ষোভের ফলে আমাদের দেশে যে বিজাতীয় হিংস্রতা দেখা দিয়েছে, গ্রন্থকার তারই ব্যর্থতা চিত্রিত করেছেন। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' গল্পেও হিংস্র নরনারীর সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু তাতে বিপ্লবীদলের যে বিবরণ আছে তা গল্পের সূত্র মাত্র, মুখ্য বিষয় নয়। সেই নিরীহ গল্পটির প্রধান ব্যাপার চরিত্র-চিত্রণ, আর কিঞ্চিৎ রোমহর্ষণ। 'চার অধ্যায়' গল্পের ধারা অন্য রকম। নায়ক অতীন্দ্র নায়িকা এলা ও উপনায়ক ইন্দ্রনাথের বিচিত্র আলাপে তাদের চরিত্র ও মানসিক দ্বন্দ্ব যেমন আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে, সেই সঙ্গে লেখকের মতামতও নিঃসংশয়ে ধরা দিয়েছে। আপদ্‌ধর্ম্মের রূপ ধ'রে আমাদের দেশে যে সব অপধর্ম্ম মাথা খাড়া করেছে, গ্রন্থকার তার উপর তাঁর তীব্র বিরাগ গোপন করেন নি।

এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ একাধিক মৌচাকে কাঠি দিয়েছেন, তার ঝঙ্কার শোনবার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।

---

* চার অধ্যায়।—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৭½"×৫", ১৩৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷০ ও ১৷৹।



বঙ্গের গবর্মেণ্ট-তপশীলভুক্ত জাতিসমূহ

গত ২৮শে ডিসেম্বর বঙ্গের গবর্মেণ্ট-"তপশীলভুক্ত জাতিসমূহে"র একটি তালিকা বাংলা-গবর্মেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধীয় নির্দ্ধারণটিতে বলা হইয়াছে—

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তারিখের নং ১২২ এ, আর, নির্দ্ধারণ দ্বারা বঙ্গদেশের গভর্ণমেণ্ট তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের একটি খসড়া তালিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অবনত শ্রেণীসমূহের ভোটাধিকার সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক মীমাংসায় প্রথমে যে-সকল প্রস্তাব ছিল ও তৎপরে পুণাচুক্তি অনুযায়ী উহাদের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করা হইবে তাহার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণার্থ ঐ তালিকা প্রস্তাবিত হইয়াছিল। ঐ সকল জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনত অবস্থা ও উহাদের স্বার্থ রক্ষার্থ উহাদিগকে বিশেষ ভোটাধিকার দেওয়া আবশ্যক বোধে উক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

২। উক্ত তালিকায় কোন একটি বা একাধিক জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করা বা না-করা সম্বন্ধে মতামত জানাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট সাধারণ প্রতিষ্ঠান, জাতিবিশেষের সমিতি বা ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিভাগীয় কমিশনার ও জেলার কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহাদের বিভাগে বা জেলায় যে-সকল জাতির লোক বেশী সংখ্যায় আছে সেই সকল জাতির বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ও গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট আদর্শের হিসাবে ঐ সকল জাতি তালিকাভুক্ত করা সঙ্গত কি না সে-বিষয়ে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে বলা হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে আরও বলা হইয়াছিল যে, যাহার নাম তালিকাভুক্ত করা হয় নাই কিন্তু তাঁহাদের মতে তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত, তাঁহাদের বিভাগে বা জেলায় এরূপ কোন জাতি আছে কি না তাহা জানাইবেন।

৩। গভর্ণমেণ্টের আহ্বানের উত্তরে সাধারণ প্রতিষ্ঠান, জাতিবিশেষের সমিতি ও ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে গভর্ণমেণ্ট বহু আবেদন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐগুলি এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা কর্ম্মচারীদিগের মতামত এক্ষণে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা হইয়াছে, এবং এতৎসংলগ্ন জাতিসমূহের তালিকাটি বঙ্গদেশের জন্য তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য বলিয়া মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের বিবেচনার জন্য সুপারিশ করিবেন বলিয়া গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন।

উদ্ধৃত বাংলা বাক্যগুলি সরকারী দপ্তর হইতে প্রাপ্ত।

"তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের তালিকা" নীচে দিতেছি। তাহাতে সাতাত্তরটি জাতির নাম আছে। তাহাদের মধ্যে যে-সব জাতির মধ্য হইতে তপশীলভুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে গবর্মেণ্টের কাছে আপত্তি গিয়াছিল, তাহাদের নাম ও লোকসংখ্যা তাহার পর দিব।

তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের তালিকা।

আগরীয়া	বাগদী	বাহেলীয়া	বাইতী
বাউরী	বেদিয়া	বেলদার	বেরুয়া
ভাতিয়া	ভুঁইমালী	ভুঁইয়া	ভুমিজ
বিন্দ	বিন্‌ঝিয়া	চামার	ধেনুয়ার
ধোবা	দোয়াই	ডোম	দোসাধ
গারো	ঘাসী	গোণরী	হাড়ী
হাজং	হালালখোর	হরি	হো
জালিয়া কৈবর্ত্ত	ঝালোমালো বা মালো	কাদার	কাণ
কাঁধ	কাঁদরা	কেওরা	কাপুরিয়া
করেঙ্গা	কাস্থা	কাউর	খয়রা
খাতিক	কোচ	কোনাই	কোণ্ডার
কোঁড়া	কোটাল	লালবেগী	লোধা
লোহার	মাহার	মাহলী	মাল
মাল্লা	মাল পাহাড়িয়া	মেচ	মেথর
মুচী	মুণ্ডা	মুসহর	নাগেসিয়া
নমঃশূদ্র	নট	নুনিয়া	ওরাওঁ
পলিয়া	পাণ	পাসি	পাটনী
পোদ	রভা	রাজবংশী	রাজবার
সাঁওতাল	শুঁড়ি	সূত্রধর	তিয়র
তুরি			

১৯৩৩ সালের ২৯শে আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে বাংলা-গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে স্যর উইলিয়ম প্রেণ্টিস্ বলেন, যে, নিম্নমুদ্রিত ছাব্বিশটি জাতির মধ্য হইতে তপশীলভুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি আসিয়াছিল।

জাতি	লোকসংখ্যা	জাতি	লোকসংখ্যা
বাগ্দী	৯,৮৭,৫৭০	মুচী	৪,১৪,২২১
ভুঁইমালী	৭২,৮০৪	মাগর	১৬,১৬৪
ধোবা	২,২৯,৬৭২	নমঃশূদ্র	২০,৯৪,৯৫৭
হাড়ী	১,৩২,৪০১	নাথ	৩,৮৪,৬৩৪
জালিয়া কৈবর্ত্ত	৩,৫২,০৭২	নুনিয়া	২৮,১০০
ঝালো মালো	১,৯৮,০৯৯	ওরাওঁ	২,২৮,১৬১
কালোআর	১৩,৫৫০	পোদ	৬,৬৭,৭৩১
কপালী	১,৬১,৫৮৯	পুণ্ড্রী	৩১,২৫৫
বড়াইত	৩৫,০৮০	রাজবংশী	১৮,০৬,৩৯০

কোঙার	১৩৩	রাজু	৫৬,৭৭৮
লোধা	১১,০০১	শাগির পেশা	৬৩৩
লোহার	৫০,১৮২	শুক্লি	৩,৮৬০
মালা	১,১১,৪২২	শুঁড়ী	৭৬,৯২০

এই ছাব্বিশটি জাতির লোকদের মোট সংখ্যা ৮১,৬৯,০৬৯। লোকসংখ্যাগুলি আমরা সেন্সস্ রিপোর্ট হইতে বসাইয়া দিয়াছি। গবর্মেণ্ট "অবনত" জাতিদের যে খসড়া তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে ৮৭টি জাতির নাম ছিল। তাহাদের মোট লোকসংখ্যা এক কোটির কিছু উপর ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তাহাদের মোটামুটি চারি-পঞ্চমাংশ লোকদের অনেকে অবনত বলিয়া গণিত হইতে আপত্তি করিয়াছিল। যে ছাব্বিশটি জাতির মধ্য হইতে আপত্তি গবর্মেণ্টের কাছে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে গবর্মেণ্ট নিম্নলিখিত জাতিদের সম্বন্ধে আপত্তি না শুনিয়া তাহাদের নাম "অবনত" জাতিদের পাকা তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন:—

জাতি	লোকসংখ্যা	জাতি	লোকসংখ্যা
বাগদী	৯,৮৭,৫৭০	লোহার	৫০,১৮২
ভুঁইমালী	৭২,৮০৪	মালা	১,১১,৪২২
ধোবা	২,২৯,৬৭২	মুচী	৪,১৪,২২১
হাড়ী	১,৩২,৪০১	নমঃশূদ্র	২০,৯৪,৯৫৭
জালিয়া কৈবর্ত্ত	৩,৫২,০৭২	মুনিয়া	২৮,১০০
ঝালো মালো	১,৯৮,০৯৯	ওরাওঁ	২,২৮,১৬১
কোঙার	১৩৩	পোদ	৬,৬৭,৭৩১
লোধা	১১,০১১	রাজবংশী	১৮,০৬,৩৯০
		শুঁড়ী	৭৬,৯২০

ইহাতে দেখা যাইতেছে, যে-সব জাতির লোকসংখ্যা এক লাখের বেশী, তাহাদের মধ্যে কেবল কপালী ও নাথদের সম্বন্ধে সরকার আপত্তি শুনিয়াছেন, আর কাহারও সম্বন্ধে শুনেন নাই। সকলের চেয়ে সংখ্যায় বেশী যাহারা তাহাদের সম্বন্ধে আপত্তি মোটেই শুনেন নাই—যথা নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পোদ, বাগ্‌দী, জালিয়া কৈবর্ত্ত, মুচী, ধোবা, ইত্যাদি। তাহাতে মনে হইতেছে, যে-সব সরকারী কর্ম্মচারী তালিকাভুক্ত জাতিসমূহের সামাজিক মর্য্যাদার বিচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকটা এই মানদণ্ড ব্যবহার করিয়াছিলেন, যে, যাহারা সংখ্যায় বেশী তাহারা নিশ্চয়ই অবনত! অবশ্য সকল জাতি সম্বন্ধেই এই নিয়ম প্রয়োগ করিলে তাঁহারা নিতান্তই ধরা পড়িয়া যাইতেন বলিয়া বোধ হয় দুই-এক স্থলে ব্যতিক্রম করিয়াছেন!! তাঁহাদের মনে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটা এই রূপ ঝোঁক থাকার আভাস ইহা হইতে পাওয়া যায়, যে, "অবনত" জাতিদের লোকসংখ্যা কম দেখাইতে দেওয়া চলিবে না।

আমরা আগে আগে অনেক বার বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি, যে, যিনি আপনাকে "অবনত" বলিয়া স্বীকার করেন না, এরূপ এক জন লোককেও অবনত তালিকাভুক্ত করিবার অধিকার কাহারও নাই, অথচ গবর্মেণ্ট এরূপ বিস্তর লোককে "অবনত" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে যে-রকমের অস্পৃশ্য জাতি আছে বঙ্গে সে-রকমের অস্পৃশ্য অল্পই আছে। অথচ মিঃ ম্যাক-ডোনাল্ডের বঙ্গের হিন্দুদিগকে দ্বিখণ্ডিত ও হীনবল করা চাই-ই! সুতরাং বঙ্গের ও অন্য কোন কোন প্রদেশের পক্ষে ফরমাইস হয়, যে, এখানে সামাজিক ও রাজনৈতিক হিসাবে অবনতদের একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

বাংলা-গবর্মেণ্ট যখন ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে খসড়া তালিকা বাহির করেন, তখন লিখিয়াছিলেন, যে, তেলী ও কলুদের মত জাতিদিগকে ঐ তালিকাভুক্ত করা হয় নাই, কারণ তাহাদের নিকট হইতে আপত্তি আসিয়াছিল। কিন্তু এই ন্যায়সঙ্গত বিচার ১৭টি জাতি সম্বন্ধে করা হয় নাই, যদিও তাহাদের মধ্য হইতেও আপত্তি আসিয়াছিল। ইহা সরকারী অসঙ্গতির একটি প্রমাণ।

"অবনত" জাতিদের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ত্রিশটি আসন রক্ষিত আছে। কিন্তু "অবনত" "তপশীলভুক্ত" জাতির সংখ্যা ৭৭টি। ইহার মধ্যে নমঃশূদ্র ও অন্য দুই-একটি জাতি নিশ্চয়ই প্রত্যেকে একাধিক আসন দখল করিতে পারিবে। কিন্তু ইহা না ধরিয়া যদি মনে করা যায়, যে, কোন জাতির লোকই একটির বেশী আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইবে না, তাহা হইলেও কেবল ত্রিশটি জাতির ত্রিশ জন লোক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবে, বাকী ৪৭টি জাতির এক জনও একটি আসন পাইবে না—তাহাদের "জা'ত যাইবে অথচ পেট ভরিবে না।" সোজা বাংলায় বলিতে গেলে, তাহারা সরকারী তালিকায় "নীচ জা'ত" ও "ছোট লোক" বলিয়া গণ্য

হইবে, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার সভ্যত্ব রূপ প্রলোভনের জিনিষের কোন অংশ পাইবে না।

আমরা সম্পাদক রূপে জানি, "প্রবাসী"র কোন লেখকের কোন গল্পে যদি কোন পাত্র বা পাত্রী অপর কোন পাত্র বা পাত্রীকে "ছোট লোক" বলিয়া উল্লেখ করে, তাহা হইলে এইরূপ অবজ্ঞাব্যঞ্জক কথায় অভিহিত কাল্পনিক ব্যক্তিদের স্বজাতীয় ব্যক্তিরা "প্রবাসী"র সম্পাদককে আক্রমণ করেন। কিন্তু সেই সব জাতিরই মধ্যে কোন কোন জাতি এখন সরকারী "তপশীলভুক্ত" হওয়াতে আপত্তি করিতেছেন না, যদিও "তপশীলভুক্ত" মানে সোজা কথায় "নীচ জা'ত" বা "ছোট লোক"। গল্প আছে, যে, কোন এক ব্যক্তি পাদুকা দ্বারা প্রহৃত হইয়া আপনার মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিল, যে, জুতাটা ডসনের জুতা। যাঁহাদের স্বদেশবাসীরা তাঁহাদিগকে "নীচ জা'ত" বলিলে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হন (এবং তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত) এবং আপনাদের দ্বিজত্ব প্রমাণ করিতে চান, ইংরেজরা তাঁহাদিগকে পরোক্ষভাবে "নীচ জা'ত"-সকলের তালিকাভুক্ত করিলে দেখিতেছি তাঁহারা খুশী হন।

"তপশীলভুক্ত" কতকগুলি জাতির কতকগুলি লোক যে তপশীলভুক্ত হইতে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের বহুবৎসরব্যাপী দাবীর অনুযায়ী হইয়াছিল। এই প্রকারে সঙ্গতি রক্ষার জন্য তাঁহারা প্রশংসার্হ।

১৯৩১ সালের বঙ্গের সেন্সস রিপোর্টে দেখিতে পাই, কতকগুলি জাতি ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্বের দাবী করিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনও অবনতত্ব স্বীকার না করিয়া পূর্ব্ব দাবী বজায় রাখিলে তাঁহাদের কোনই ক্ষতি হইবে না, বরং তাঁহারা আত্মসম্মান রক্ষা করিতে ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবেন এবং সঙ্গতি রক্ষার জন্য অপরেরও সম্মানভাজন হইবেন। কয়েকটি জাতি আপনাদিগকে কি নামে অভিহিত করেন, তাহা নীচে লিখিত হইল।

বাগদী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়; ভুঁইমালী, বৈশ্যমালী; মালো, মল্লক্ষত্রিয়; মালো, মল্লক্ষত্রিয়; নমঃশূদ্র, নমব্রাহ্মণ, নমব্রহ্ম; পোদ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়; পুণ্ডরী, পুণ্ড্রক্ষত্রিয়; রাজবংশী, রাজবংশী ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয় রাজবংশী; শুঁড়ী, শৌণ্ডিক ক্ষত্রিয়, শোণ্ডিয়া ক্ষত্রিয়; হাড়ী, হৈহয় ক্ষত্রিয়।

—

সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনতত্ব

গবর্ন্মেণ্ট সামাজিক অবনতত্ব বোধ হয় এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, যে, কতকগুলি জাতির দেওয়া বা ছোঁয়া জল অপর জাতির লোকেরা পান করে না, এবং কতকগুলি জাতির পাক করা বা ছোঁওয়া অন্নব্যঞ্জন অন্য জাতির লোকেরা খায় না। এই যে অবনতত্ব-বোধ, ইহার জন্য হিন্দু সমাজ অবশ্যই দায়ী। কিন্তু সামাজিক অবনতত্ব ত শুধু অন্নজলেই আবদ্ধ নহে। অতিশয় আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা অন্য কোন জাতির অন্নজল গ্রহণ করেন না; কিন্তু তা বলিয়া অন্য সব জাতিই অবনত নহেন, গবর্ন্মেণ্ট ও তাঁহাদের সকলকে তপশীলভুক্ত করেন নাই। এইরূপ, ব্রাহ্মণেতর কোন কোন জাতিও স্বজাতির ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির অন্নজল গ্রহণ করেন না। কিন্তু শেষোক্ত এই সকল জাতিই অবনত বলিয়া গণিত বা সরকারী তপশীলভুক্ত হন নাই।

শিক্ষার অভাব এবং দারিদ্র্যও সামাজিক অবনতত্বের কারণ। এই শিক্ষাভাব ও দারিদ্র্যের জন্য দায়িত্বের ন্যায্য অংশ গবর্ন্মেণ্টকেও লইতে হইবে, সব দোষ হিন্দুসমাজ এবং অশিক্ষিত ও দরিদ্র জাতিদের ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না—তাহা ন্যায়সঙ্গতও হইবে না। শিক্ষা ও আপেক্ষিক ধনশালিতার প্রভাবে অবনতত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছেন, এরূপ জাতির নাম করা কঠিন নয়। তাঁহারা যেমন সামাজিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার উন্নতির দ্বারা অন্যেরাও তেমনি সামাজিক উন্নতি লাভ করিতে পারেন।

রাজনৈতিক হিসাবে অবনত ত আমরা সবাই। আমরা অবনত বলিয়াই নেশ্যন হিসাবে বিদেশে কোথাও সম্মানিত নহি—স্বদেশেও নহি, সুতরাং "পলিটিক্যালি ব্যাক্ওয়ার্ড" "রাজনৈতিক হিসাবে অনগ্রসর" বলিয়া কতকগুলি জাতিকে আলাদা করার ঠিক কোন মানে হয় না। যেন আর সবাই রাজনৈতিক হিসাবে স্বাধীন ও অগ্রসর! তবে যদি বলেন, যাহারা রাজনীতি

কিছু বুঝে, রাজনৈতিক আন্দোলন করে ও চেঁচায়, তাহারাই অগ্রসর, তাহা হইলে সেটা ত লেখাপড়া শেখার ব্যাপার, লেখাপড়া শেখার উপর নির্ভর করে। সরকার "অবনত"দিগকে দশটা বা ত্রিশটা আসন না দিয়া, সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা করুন, তাহা হইলে সবাই ঐ অর্থে রাজনৈতিক হিসাবে অগ্রসর হইয়া যাইবে। আর এক অর্থে কতকগুলি লোককে রাজনৈতিক হিসাবে অগ্রসর বলা যায়—যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, দুঃখ বরণ করিয়াছেন তাঁহারা অগ্রসর। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে হয়ত বেশী লোক "উচ্চ" জাতির হইলেও অন্য জাতির লোকও আছেন—এখানে জাতিভেদ নাই।

গবর্মেণ্ট হয়ত অন্য একটা মানদণ্ড দ্বারা অবনতত্ব ও উন্নততার নির্দ্ধারণ করিয়া থাকিবেন, মনে করিয়া থাকিবেন, যাঁহাদের মধ্যে কেহই ইউনিয়ন বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, বা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন নাই, তাঁহারা অবনত। কিন্তু দেখা গিয়াছে, সরকারী তপসীলভুক্ত নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পোদ, চামার, মেথর প্রভৃতি জাতির লোকেরা এই প্রকার কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুতরাং এই সব জাতিকে উক্ত অর্থে অবনত বলা চলে না।

—

কোন্ জাতি কাহার হিত করেন

এইরূপ একটা যুক্তি শুনিয়াছি, যে, যে-সব জাতি অবনত, তাহারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে ও পরস্পরের হিত করিবে; "উচ্চ" জাতিরা তাহাদের তেমন দরদী ও হিতৈষী নহে। কিন্তু বাস্তবিক কি "উচ্চ" জাতিদের চেয়ে অন্য জাতিরা এ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ? "নিম্ন" জাতিসমূহ পরস্পরকে যতটা "অস্পৃশ্য" মনে করে, "উচ্চ" জাতির লোকেরা তাহাদিগকে তার চেয়ে বেশী অস্পৃশ্য মনে করে কি? কোন কোন স্থলে বরং কম করিতেই দেখা যায়। অশিক্ষিত ও দরিদ্র লোকদের শিক্ষার ও আর্থিক উন্নতির চেষ্টা "উচ্চ" জাতির লোকেরাও করিয়া থাকে; অন্য জাতির লোকেরা এরূপ চেষ্টা বেশী করিয়া থাকে বলিয়া শুনি নাই। "তপশীলভুক্ত" জাতিদের মধ্যে যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন, এ-বিষয়ে তাঁহাদের কৃতিত্ব বা চেষ্টা "উচ্চ" জাতির লোকদের চেয়ে বেশী হইলে দেশের মঙ্গল হইবে। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত যে তাহা বেশী হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ আমরা অবগত নহি।

—

পরস্পরনির্ভরশীলতা

সমস্ত জাতের লোক যদি পরস্পরনির্ভরশীল হন, তাহা হইলেই সকলের কল্যাণ ও উন্নতি হইতে পারে। যাঁহারা আপনাদিগকে উন্নত মনে করেন কেবলমাত্র তাঁহাদের চেষ্টায় দেশের উন্নতি হইতে পারে না—এমন কি তাঁহাদের নিজেরও সম্যক উন্নতি হইতে পারে না। যাঁহাদিগকে অন্যেরা "অবনত" মনে করে, "অস্পৃশ্য" বা নীচ জা'ত মনে করে, এবং হয়ত যাঁহারা নিজেও আপনাদিগকে হীন মনে করেন, তাঁহারাও কেবল নিজেদের চেষ্টায় আত্মোন্নতি করিতে পারিবেন না, দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন না। বিদেশীদের সম্পূর্ণ সাহায্য পাইলেও তাহা করিতে পারিবেন না, এবং তাহাদের সম্পূর্ণ সাহায্য পাইবেনও না। তাঁহাদের অনেকেরই শিক্ষার ও জ্ঞানের অভাব এত বেশী, যে, তাঁহাদের মনে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত উন্নতির চিন্তাই উদিত হয় না। তাঁহারা যে এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া আছেন, তাহার জন্য প্রধানতঃ হিন্দুসমাজের গঠন দায়ী, হিন্দুসমাজের "উচ্চ" জাতিরা দায়ী। সমগ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে, সব জাতির মধ্যে যে পরস্পরনির্ভরশীলতা নাই, তাহার জন্যও আমাদের সমাজ দায়ী।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের কাজ করিবার জন্য যোগ্যতম যাঁহারা, তাঁহারা যে-জাতির লোকই হউন, সকল জাতির লোকে সম্মিলিত ভাবে তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিলে তবে দেশের কল্যাণ হইতে পারে। ন্যায়বুদ্ধি ও কল্যাণবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বিদেশীরা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, এরূপ আশা করা মূঢ়তা। তাঁহাদের নিজের প্রভুত্ব রক্ষা ও স্বার্থ রক্ষা যাহাতে হয়, তাহাই তাঁহারা করিবেন, এইরূপ আশা করাই স্বাভাবিক ও উচিত।

আমাদের দুর্ব্বলতার জন্য আমরা দায়ী

আমরা যে সঙ্ঘবদ্ধ সংহত অখণ্ড জাতি নহি, তাহার জন্য আমরা দায়ী। আমরা আগে কতকগুলি লোককে "নীচ জা'ত" ও "ছোট লোক" ভাবিয়াছি, বলিয়াছি ও তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছি, তবে বিদেশীরা হিন্দু সমাজকে দুটা শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারিয়াছে। সরকারী যে "তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের তালিকা" বাহির হইয়াছে, তাহার সমালোচনা আমরা করিয়াছি, অপরেরাও করিবেন। কিন্তু তাহার একমাত্র প্রকৃত ও ফলপ্রদ উত্তর হিন্দুসমাজ হইতে "অস্পৃশ্যতা" ও অন্নজল সম্বন্ধে সামাজিক "অনাচরণীয়তা" উঠাইয়া দেওয়া। হিন্দুসমাজে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, প্রাণবত্তা ও শক্তিমত্তা এবং তদনুযায়ী ন্যায়পরায়ণতা ও সাহস থাকিলে ইহা অচিরে করা যাইত। আমরা অনেকেই জাপানের অভ্যুদয়ের কথা ভাবি ও বলি, কিন্তু সব সময় মনে রাখি না যে, জাপান প্রাণবত্তা ও শক্তিমত্তা এবং সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা ও সাহস দ্বারা স্বীয় অভ্যুদয় আনয়ন করিয়াছে। জাতীয় কল্যাণের জন্য যখন আবশ্যক হইল, যখন মানবতার ও স্বাজাতিকতার আহ্বান আসিল, তখন সামুরাই নামক জাপানী অভিজাত সম্প্রদায় অচিরে আপনাদের সমুদয় বিশেষ অধিকার পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহাদের ও জাপানের "এতা" নামক অস্পৃশ্য লোকদের মধ্যে সামাজিক মর্য্যাদার কোন পার্থক্য রহিল না। আমাদের সমাজে এরূপ ন্যায়পরায়ণতা, সাহস, মহাপ্রাণতা ও বুদ্ধিমত্তা থাকিলে বা কখন জন্মিলে তবে আমরা টিকিয়া থাকিতে ও বড় হইতে পারিব, নতুবা হিন্দুসমাজের আরও ক্ষয় এবং বর্ত্তমান প্রকারের হিন্দুত্বের লোপ অবশ্যম্ভাবী।

সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারার বহু প্রতিবাদ হইয়াছে, আরও হইবে। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি বড় নেতারা তাহার আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু অবনত শ্রেণী সকলকে গবর্মেণ্ট যাহা দিয়াছেন ও দিবেন বলিয়াছেন, তাহা তাঁহারা ছাড়িবেন কেন? আমরা বলি, আমরা তাঁহাদের বন্ধু ও হিতৈষী। কিন্তু তাহর কার্য্যগত প্রমাণ কোথায়? সামান্য প্রমাণ সেইসব অল্পসংখ্যক লোকেরা বহুবৎসর ধরিয়া দিয়া আসিতেছেন যাঁহারা কোন জাতিরই লোককে হীন মনে করেন না, অবজ্ঞা করেন না, এবং স্বীয় আচরণ দ্বারা "অস্পৃশ্যতা" ও "অনাচরণীয়তা"'র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বিশাল হিন্দুসমাজের তুলনায় তাঁহারা সংখ্যায় কয় জন? সকলের সহিত সামাজিক সাম্য স্থাপন ব্যতিরেকে সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধিত হইবে না।

সমগ্র হিন্দুসমাজ জাগ্রত হউন। বিশেষ করিয়া জাগ্রত হউন যাঁহারা আপনাদিগকে সনাতনী বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনেকে আমদের চেয়ে ভাল করিয়াই জানেন, যে, শাস্ত্র অনুসারে যাঁহারা মুনি ঋষি বলিয়া পূজনীয় ও পূজিত তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সেইরূপ পিতা বা মাতার সন্তান যাঁহাদের স্বজাতিদিগকে এখন সনাতনীরা অনাচরণীয় মনে করেন। আধুনিক সনাতনী মত ও আচার বাস্তবিক সনাতনী মত ও আচার নহে।

—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ"

অদ্য প্রাতে "গীতাঞ্জলি" খুলিতেই রবীন্দ্রনাথের "হে মোর দুর্ভাগা দেশ" শীর্ষক কবিতাটি চোখে পড়িল। কবিতাটি ভারতীয় মহাজাতির বর্ত্তমান প্রধান কর্ত্তব্যের শ্রেষ্ঠ স্মারক বলিয়া সকলের পড়িবার সুবিধার জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্র রোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্ব্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে
ধূলায় সে যায় বয়ে,
সেই নিম্নে নেমে এস নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান॥

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে।
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

শতেক শতাব্দী ধরে' নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার!
তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান,
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান॥

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে।
সবারে না যদি ডাক,
এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান॥

এই কবিতাটি সাড়ে চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩১৭ সালের ২০শে আষাঢ় রচিত হয়। এখন কতকগুলি লোক সচেতন হইয়াছেন। তাহাতে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইতে পারা যায়। এখন ঐ ১৩১৭ সালেরই পর দিন, ২১শে আষাঢ়, রচিত কবির নিম্নমুদ্রিত কবিতাটি আশ্বাস-বাণী বিবেচিত হইতে পারে।

ছাড়িস্ নে ধরে থাক্ এঁটে,
ওরে হবে তোর জয়।
অন্ধকার যায় বুঝি কেটে,
ওরে আর নেই ভয়।
ওই দেখ পূর্ব্বাশার ভালে
নিবিড় বনের অন্তরালে
শুকতারা হয়েছে উদয়।
ওরে আর নেই ভয়!

এরা যে কেবল নিশাচর—
অবিশ্বাস আপনার পর,
হতাশ্বাস, আলস্য, সংশয়,
এরা প্রভাতের নয়।
ছুটে আয়, আয়রে বাহিরে
চেয়ে দেখ্, দেখ্ ঊর্দ্ধশিরে,
আকাশ হতেছে জ্যোতির্ম্ময়
ওরে আর নেই ভয়।

—

অবনতত্বস্বীকারে সূত্রধরদের ন্যায্য ও স্বাভাবিক আপত্তি

ঢাকায় সূত্রধর সমিতির এক অধিবেশনে সম্প্রতি (৬ই জানুয়ারী) সূত্রধর জাতি তাঁহাদিগকে সরকারী অবনত জাতিদের তপশীলভুক্ত করায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—বহুপূর্ব্বে যখন রিজ্‌লী সাহেব ভারতীয় জাতিসমূহের শ্রেণীবিভাগ করেন, তখন তিনি সূত্রধরদিগকে "এক্লীন্ কাষ্ট্" অর্থাৎ শুদ্ধাচারবান্ জাতি বলিয়াছেন; ১৯৩১ সালের সেন্সসে তাঁহাদিগকে অবনত বা অনুন্নত বলা হয় নাই; বাংলা-গবর্ণমেণ্টের ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসের "অবনত"দের খসড়া তালিকায় সূত্রধরদের নাম ছিল না; এই তালিকা প্রকাশের সময় গবর্ন্মেণ্ট জানিতে চাহিয়াছিলেন, যে, যাঁহাদের নাম তালিকাভুক্ত হয় নাই, এমন কোন জাতি তপশীলভুক্ত হইতে চান কি না, তাহার উত্তরে সূত্রধর জাতি তপশীলভুক্ত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে নাই; তবে কেন সূত্রধরদিগকে পাকা তালিকায় ফেলা হইল?

তাঁহারা আরও বলেন, শাস্ত্রানুসারে তাঁহারা দেব-শিল্পী।

কাঁচড়াপাড়াতেও সূত্রধরদিগের এইরূপ প্রতিবাদ-সভা হইয়া গিয়াছে।

সম্ভবতঃ নানা জায়গাতেই অনেক জাতির প্রতিবাদ-সভা হইবে।

আমরা আগেই বলিয়াছি, যে-কেহ বলিবেন তিনি বা তাঁহার জাতি অবনত নহেন, তাঁহাকে অবনত বলিয়া তপশীলভুক্ত করা অনুচিত।

—

হিন্দুসমাজের কর্ত্তব্য

যে-কোন জাতি আপনাদিগকে হিন্দু বলিবেন, তাঁহাদেরই অন্নজল গ্রহণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ও তাহা প্রকাশ করা হিন্দুনেতাদের কর্ত্তব্য। অবশ্য সেই সঙ্গে ইহাও বক্তব্য, যে, নেশাখোর ও কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তির। যে-কোন জাতিরই হউক তাহাদের অন্নজল গ্রহণীয় বলিয়া তাহারা দাবী করিতে পারিবে না। প্রকৃত শুচিতা সকলেরই আদর্শ হওয়া উচিত।

—

প্রবাসী বাঙালীর সম্মান

বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষে ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবন সাধন করিয়াছেন শ্রীযুক্ত ডক্টর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য হইয়াছেন অনেক। তাঁহার পরই তাঁহা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইঁহার আঁকা উৎকৃষ্ট অনেক ছবি আমরা প্রবাসীতে প্রকাশ



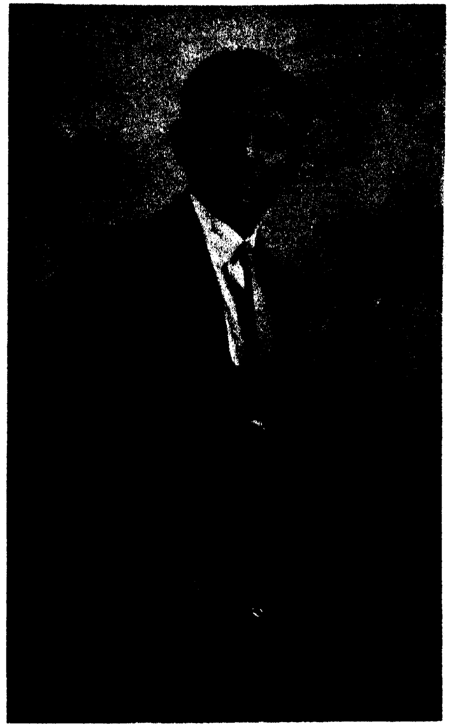
শ্রীঅসিতকুমার হালদার

করিয়াছি। ইনি অনেক বৎসর হইতে লক্ষ্ণৌয়ের সরকারী ললিতকলা ও কারুশিল্প বিদ্যালয়ের (Government School of Arts and Crafts এর) অধ্যক্ষের কাজ যোগ্যতার সহিত করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তিনি বিলাতী রয়াল সোসাইটী অব্ আর্টসের সদস্য (Fellow of the Royal Society of Arts) মনোনীত হইয়াছেন। আমরা গত নবেম্বর মাসে যখন লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলাম, তখন অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে নূতন রীতিতে অসিতবাবুর দ্বারা অঙ্কিত একখানি ছবি দেখিয়াছিলাম।

—

বাঙালী বৈমানিকদের ভূপ্রদক্ষিণ সঙ্কল্প

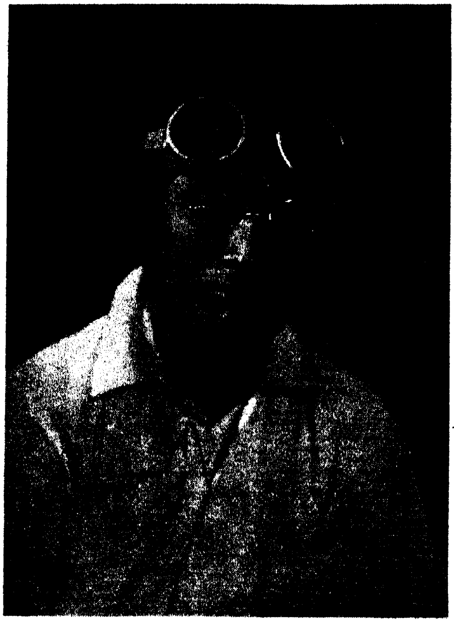
গত অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে লণ্ডন হইতে মেলবোর্ণ পর্য্যন্ত বিমান-চালনার প্রতিযোগিতার বৃত্তান্ত দিবার উপলক্ষ্যে আমরা লিখিয়াছিলাম, "দিন আগত ঐ, ভারত তবু কৈ।" কাহারও সহিত প্রতিযোগিতায় না হইলেও



শ্রীদেবকুমার রায়

ইহা সুসংবাদ, যে, সম্প্রতি দুই জন বাঙালী যুবক বিমানযোগে ভূপ্রদক্ষিণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইঁহারা কলিকাতা হইতে লণ্ডন, লণ্ডন হইতে জাপানের রাজধানী তোকিয়ো, এবং তোকিয়ো হইতে কলিকাতা বিমানযোগে ভ্রমণ করিতে চান। ইহাতে মোটামুটি পঁচিশ হাজার মাইল আকাশপথে ভ্রমণ করা হইবে। ইঁহাদের এক জনের নাম শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায়। বৈমানিক বলিয়া বঙ্গে ইনি পরিচিত। ইনি বেহালা মিউনিসিপালিটির সভাপতি। অন্য যুবকটির নাম শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়। ইনি বিজ্ঞানে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হইবার পর বিলাত যান এবং সেখানে ব্রিষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করেন। তাহার পর বৈমানিকের সব রকম কাজ শিখিয়া ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বিমান-চালনার "এ" ও "বী" উভয়বিধ লাইসেন্স পাইয়াছেন।

ইনি মিঃ এন্ কম্পার্ নামক ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বিমানচালকের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।



শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

এই দুই যুবকের সঙ্কল্প প্রশংসনীয়। আমরা ইঁহাদের সাফল্য কামনা করি। এই কাজ কিছু ব্যয়সাধ্য, তবে বেশী ব্যয়সাধ্য নহে। বিমান ক্রয় করিতে ও অন্যান্য ব্যয় বাবতে ইঁহাদের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আবশ্যক হইবে। আশা করি সঙ্গতিপন্ন লোকেরা ইঁহাদের সহায় হইবেন।

স্বর্গীয় মহিতকুমার মুখোপাধ্যায়

মহিতকুমার মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে বাঙালী বালকদের বেঙ্গল একাডেমী নামক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ, বি এল, ও বি টি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষাদান-বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ও অনুরাগ ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বেঙ্গল একাডেমী ও ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয় সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সৎকর্ম্মানুরাগ, চরিত্রবত্তা ও বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। এই জন্য, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ যে-সভা আহূত হইয়াছিল, তাহার আহ্বানকারীদের মধ্যে ব্রহ্মদেশীয় ও ব্রহ্ম-প্রবাসী নানা প্রদেশের ভারতীয়দের নাম ছিল।



স্বর্গীয় মহিতকুমার মুখোপাধ্যায়

মহিত বাবু বঙ্গদেশে সুপরিচিত ছিলেন না; কারণ দূরস্থ ব্রহ্মদেশ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, বঙ্গে তিনি কচিৎ আসিতেন। আমরা তাঁহাকে জানিতাম। যখন কলিকাতায় প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনের আয়োজন করা হইতেছিল, তখন উদ্যোক্তারা দূর দূর জায়গার প্রবাসী বাঙালীদিগকে কলিকাতায় আনিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই অভিপ্রায় অনুসারে মহিত বাবুকে সম্মেলনের একটি শাখার সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত পীড়িত বলিয়া অভ্যর্থনা-সমিতির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আমরা যখন প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে রেঙ্গুনে গিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্ব হইতেই তিনি কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছিলেন।

পৌষের নানা সভা-সমিতি

আমাদের শাসনকর্তারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহাদের প্রধান পর্ব্বকে (Christmas কে) বড়দিন বলা হয়, এবং এই বড় দিন উপলক্ষ্যে ও খ্রীষ্টীয় নববর্ষের প্রথম দিন উপলক্ষ্যে সমুদয় সরকারী আফিস আদালত ও স্কুল কলেজ আদির দিন-দশ ছুটি থাকে। এই সুযোগে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় নানা সভা-সমিতির অধিবেশন হয়। সমুদয় সভা-সমিতির বিস্তারিত বিবরণ দৈনিক কাগজসমূহও ছাপিয়া উঠিতে পারেন না—মাসিক কাগজের পক্ষে ত তাহা অসম্ভব। যাহা ঘটে তাহার বৃত্তান্ত ও সংবাদ দেওয়া দৈনিক কাগজের একটি প্রধান কাজ। যাহা ঘটে এবং সভা-সমিতিতে যাহা বলা হয় এবং যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার উপর মন্তব্য প্রকাশ ও টিপ্পনী করা মাসিক কাগজের একটা কাজ। কিন্তু এতগুলি সভাসমিতির বক্তৃতাসমূহ ও প্রস্তাবাবলীর উপর মন্তব্য প্রকাশ করিবার জায়গা আমাদের নাই। প্রধান প্রধানগুলির উপরও কিছু বলা আমাদের সাধ্যাতীত। সভাসমিতিগুলির অধিবেশন বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হইলে সর্ব্বসাধারণ অনেকগুলিতে কতকটা মন দিতে পারে, আমরাও পারি। কিন্তু সব মাসে ত ভারতব্যাপী অন্যূন আট দশ দিন ছুটি পাওয়া যায় না। সুতরাং একই মাসে একই সপ্তাহে বহু সভা-সমিতির অধিবেশন হয়।

কংগ্রেসের জন্ম হইতে বহু বৎসর উহার অধিবেশন হইত পৌষ মাসে। করাচীতে শেষ যে অধিবেশন হয়, তাহা হয় চৈত্র মাসে। তাহার পর রীতিমত অধিবেশন হইয়াছে বোম্বাইয়ে গত কার্ত্তিক মাসে।

এবার পৌষ মাসে যে কটি সমগ্রভারতীয় রাজনৈতিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল পুনায় উদারনৈতিক সংঘের। সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু। ইনি জনহিতকর কাজে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রতিষ্ঠিত ভারতভৃত্য সমিতির ইনি এক জন প্রধান সভ্য। ইঁহার বক্তৃতায় জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্টের বিশ্লেষণ ও তীব্র নিন্দা ছিল। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও খুব ঝাঁঝাল বক্তৃতা করেন, বলেন, "আমরা জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী আইন হইলে তদনুযায়ী কাজে গবর্ন্মেণ্টের সহিত বিন্দুমাত্রও সহযোগিতা করিব না।" এলাহাবাদের লীডারের প্রধান সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তামণি বলেন, "তোমাদের প্রস্তাবিত কন্সটিটিউশ্যনটা চাই না, এখন যেটা চলছে বরং তাও ভাল।" অন্য দিকে কিন্তু আর এক উদারনৈতিক নেতা স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু বলিয়াছেন, "নূতন যে শাসনবিধি হইতেছে, সেটা অনুসারে কাজ যে করা যায় না তা নয়। আর, আমরা যদি সেটাকে না চালাই, সেটা আমাদিগকে চালাইবে।" সুতরাং উদার-নৈতিক কেহই গবর্ন্মেণ্টের সহায় হইবেন না, এমন মনে হয় না।

করাচীতে সমগ্রভারতীয় মহিলা-কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শিক্ষাবিষয়ক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা প্রকার বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। এই কনফারেন্সেও জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট খুব নিন্দিত হইয়াছে। তা ছাড়া নারীদের শিক্ষা, উত্তরাধিকার, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিরোধের সমর্থক প্রস্তাব অনেক মহিলা-কনফারেন্সে গৃহীত হইয়া গিয়াছে, করাচীতেও হইয়াছে। অনেক নারী কেন ইহার সমর্থন করেন, তাহা বুঝা কঠিন নয়। কিন্তু সমর্থনের যে সব কারণ বলা হয়, তাহা সব প্রদেশে সব পরিবারে সব সধবা নারীর পক্ষে খাটে না। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের বসতি ঘন নয়; সব পরিবার দরিদ্র নয়; জন্মনিরোধ দরিদ্রা নারীদের চেয়ে সৌখীন ধনী নারীরাই বেশী করিয়া থাকে; কোন কোন রোগে চিররুগ্না দুর্ব্বলদেহা মাতাদের পক্ষে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে জন্মনিরোধ আবশ্যক; কিন্তু অনেক সুস্থ সবল বিবাহিতা নারী ইহা করিয়া থাকে। অবিচারিত জন্মনিরোধের প্রতিকারের জন্য ইটালীতে ও জার্মেনীতে নানা উপায়ে বিবাহে ও বহুসন্তানপালনে উৎসাহ দিতে হইতেছে।

পাটনায় যে নিখিলভারতীয় ধনবিজ্ঞান সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতায় প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে সর্ব্বসাধারণের খুব কৌতূহল দেখা গিয়াছিল।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনও পৌষ মাসে কলিকাতায় হইয়াছিল। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে বিজ্ঞানবিদ্‌রা আসিয়া ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

আরও নানা সভা-সমিতির অধিবেশন নানা স্থানে হইয়াছিল।

—

ভারতীয়দের পরিচ্ছদ

খবরের কাগজে আজকাল ছবি দেওয়ার রীতি খুব বাড়িয়াছে। এই সব শাদা-কাল ছবি যে-সব মানুষের, তাঁহাদের গায়ের রং তাহা হইতে বুঝিবার যো থাকে না, নাম দেখিয়া ও পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিতে হয় তাঁহারা কে। অনেক সভার লোকদের, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ও অধ্যাপকদের ছবিও কাগজে বাহির হয়। তাঁহাদের অধিকাংশের কেবল পরিচ্ছদ দেখিয়া বিচার করিতে হইলে, নাম ছাপা না থাকিলে, মনে হইত তাঁহারা ইউরোপীয়। অনেক সভায় গেলে অবশ্য গায়ের রঙে প্রায়ই বুঝা যায় কে ইউরোপীয় কে নহে; পাগড়ী ও হ্যাট হইতেও তাহা বুঝা যায়। বাংলা দেশ ছাড়া ভারতের অন্যত্র ইউরোপীয় কোট, টাই ইত্যাদির সঙ্গে পাগড়ীও দেখা যায়, কিন্তু হ্যাটও কম দেখা যায় না। মোটের উপর বলা যাইতে পারে, "শিক্ষিত" ভারতীয়েরা পরিচ্ছদে অনেকটা ইউরোপীয় বনিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় মহিলারা পরিচ্ছদে ইউরোপীয় বনেন নাই—যদিও অনেকের জ্যাকেট ব্লাউস কতকটা ইউরোপীয় ধরণের বটে। তবে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে, কোন কোন মেম-ঘেঁষা ভারতীয়া শাড়ীটাকেই পরেন আঁট-সাঁট-খাট স্কার্টের মত করিয়া।

সম্প্রতি কলিকাতায় যে দুটি বৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনগুলিতে সব উদ্বোধক, সভাপতি ও প্রতিনিধি এবং প্রায় সব দর্শককে বাঙালী বলিয়া বুঝা গিয়াছিল। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের যে-দুটি জলযোগ-সভায় গিয়াছিলাম, তাহাতে বাঙালী বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মধ্যে কয়েক জন এবং পঞ্জাবের বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক রুচিরাম সাহনী ছাড়া (অবশ্য ভারতীয় মহিলাদেরও ছাড়া) আর সকলের পরিচ্ছদ ছিল ষোল আনা বা চৌদ্দ আনা ইউরোপীয়।

ইউরোপীয় বলিয়া কোন কিছুর নিন্দা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। যাহা কাজের পক্ষে সুবিধাজনক, যাহা স্বাস্থ্যকর, যাহা অল্পব্যয়সাধ্য, যাহাতে শ্লীলতা রক্ষা হয়, যাহা জটিল ও নানা অঙ্গ বা অঙ্গের সমষ্টি নহে, পরিচ্ছদ এইরূপ হওয়া ভাল। তাহার উপর তাহা সুন্দর এবং জাতীয় হইলে আরও ভাল। জাতীয় বলিতেছি এই জন্য, যে, তাহা হইলে দেশের সর্ব্বসাধারণের সঙ্গ পার্থক্য কম হয়। অন্যদের সঙ্গে অনাবশ্যক অসাদৃশ্যবৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নহে—তাহাতে জাতীয় সংহতি নষ্ট হয়।

খদ্দরের চলন যে কোন সময়েই খুব বেশী হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু আগে যতটুকু হইয়াছিল, এখন তাহাও বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

খবরের কাগজের ছবি এবং নানা প্রাদেশিক সভা-সমিতি দেখিয়া মনে হয়, বাঙালীরা এখনও দলবলে ধুতি ত্যাগ করে নাই।

—

সুভাষচন্দ্র বসু

সুভাষচন্দ্র বসু পিতৃশ্রাদ্ধের পর ভিয়েনা যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা উদ্বেগজনক সংবাদ। ভিয়েনায় তাঁহার অস্ত্রোপচার হইবে। এখানে তাহা হইবার বোধ হয় উপায় ছিল না। তাঁহার নিজের ব্যয়ে পুলিস তাঁহাকে ভিয়েনা যাতায়াতের টিকিট কিনিয়া দিয়াছে, ইহা মন্দের ভাল। ইহাতে মনে হয় দেশে ফিরিতে তাঁহাকে বাধা দেওয়া হইবে না। তিনি সুস্থ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসুন এবং দেশের কল্যাণ করুন, ইহাই আমরা চাই।

—

শরৎ চন্দ্র বসু

শরৎ চন্দ্র বসু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইবার জন্য গবর্ণর-জেনার্যালের সমন পাইয়াছেন। আবার, তিনি গবর্ণর-জেনার্যালেরই হুকুমে রাজবন্দী হইয়া এক জায়গায় (কার্সিয়ঙে) আটক আছেন। সুতরাং একই কর্ত্তৃপক্ষ

তাহার উপর পরস্পর-বিরোধী দুটা হুকুম জারি করিয়াছেন। অবশ্য এই বিরোধভঞ্জনের ক্ষমতাও ঐ কর্ত্তৃপক্ষের আছে। তাঁহাকে পীড়িত পিতাকে দেখিবার ও পরে পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার নিমিত্ত অনুমতি ও ছুটি দেওয়া হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইবার জন্যও গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে অনুমতি ও ছুটি দিতে পারেন।

বিচারান্তে অপরাধ প্রমাণিত হইবার পর মানুষের যেরূপ শাস্তি হয়, বিনা বিচারে এবং কোন অপরাধ প্রমাণিত না-হইলেও তাহার শাস্তি তার চেয়ে বেশী হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বাংলা দেশে—অনেক আছে। শরৎ বাবুর বিরুদ্ধে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের স্বরাষ্ট্র-সচিব যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ তিনি দেন নাই —প্রমাণ থাকিলে ও দিতে পারিলে আদালতে শরৎ বাবুর বিচার হইত। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে, তাঁহার বিরুদ্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্য, তাহা হইলেও নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য তাঁহার স্বাধীনতা লোপ এবং কতক অর্থদণ্ড হইত। কিন্তু তাঁহার ব্যারিষ্টারির আয় দীর্ঘ কালের জন্য নষ্ট হওয়ায় প্রকারান্তরে তাঁহার যে জরিমানা হইয়াছে সেরূপ প্রভূত অর্থদণ্ড পীন্যাল কোড অনুসারে কোন অপরাধীরই হয় না, এবং নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য স্বাধীনতলোপের পরিবর্ত্তে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তাঁহার স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে। শাসনযন্ত্রের মহিমা।

—

সুভাষচন্দ্রের পুস্তক বাজেয়াপ্তী

সুভাষচন্দ্র করাচী পৌঁছিবার পর তাঁহার জিনিষপত্র হাতড়াইয়া তাহার মধ্য হইতে তাঁহার অচিরে প্রকাশিতব্য ভারতীয় স্বাধীনতা প্রচেষ্টা-বিষয়ক রাজনৈতিক পুস্তকের টাইপ-লিপি পুলিস হস্তগত করে, এবং পরে তাহা সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। প্রকাশিত হইবার আগেই বাজেয়াপ্ত! শাসন-যন্ত্রের ঘূর্ণনের ফল নানা রকম হইয়া থাকে। যাহা হউক, সুভাষ বাবুর পুস্তকের উহাই একমাত্র টাইপ-লিপি ছিল না (কোন বুদ্ধিমান ভারতীয় লেখকই স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা-বিষয়ক বহির একমাত্র পাণ্ডুলিপি সঙ্গে লইয়া বেড়ান না), অন্য একটি তাঁহার বিলাতী প্রকাশকদের কাছে ছিল। তাঁহারা বলিয়াছেন, উহা বর্ত্তমান জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি বাহির হইবে। তাহাতেও যে বাধা জন্মিতে না-পারে, এমন নয়। সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেবের যে "ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ" পুস্তকের প্রকাশক বলিয়া প্রবাসীর সম্পাদককে দুই হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইয়াছিল, তাহা বিলাতের জর্জ্জ্ য়্যালেন এণ্ড্ আনউইন নামক প্রকাশকদের ছাপিবার কথা ছিল। সব আয়োজন ঠিক্ হইয়াছিল, তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠক আরম্ভ হইবে এবং ঐ বহির বিলাতী সংস্করণও বাহির হইবে। পরে খবর পাওয়া গেল, বিলাতী কর্ত্তৃপক্ষের হুকুমে উহার প্রকাশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বিলাতেও মুদ্রাযন্ত্রের ও প্রকাশকদের স্বাধীনতা স্বদেশ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যতটা আছে, ভারতবর্ষীয় ব্যাপারে কার্য্যতঃ ততটা নাই।

কাগজে বাহির হইয়াছে, বিলাতের বার্ণার্ড শ, এইচ জি ওয়েল্‌স্, য়্যাল্ডস্ হক্সলী, এবং আর্ল রাসেল প্রমুখ লেখকগণ এবং ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ সুভাষ বাবুর বহির টাইপ-লিপি বাজেয়াপ্ত করার জোরাল প্রতিবাদ করিয়াছেন বা করিবেন। এরূপ প্রতিবাদ প্রতিবাদকারীদের পক্ষে প্রশংসার বিষয়, কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ প্রকাশ সম্পর্কে প্রবাসীর সম্পাদকের দণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার প্রধান প্রধান উদারনৈতিকেরা মিঃ ম্যাকডন্যাল্ডের কাছে তীব্র প্রতিবাদ পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

—

বঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষা

বঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য গবর্ন্মেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। তাঁহারা ১৭২ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। উহাতে তাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন না-হওয়া পর্য্যন্ত মক্তবগুলি এখন-কার মতই চালাইতে বলিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে অমুসলমান ভারতীয়দের মতের মধ্যে মুসলমানরা কুঅভিসন্ধির অস্তিত্ব সন্দেহ করিতে পারেন। সরকারী ইংরেজ কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের বন্ধু; তাঁহাদের মত হয়ত তাঁহারা দুরভিসন্ধিহীন মনে করিবেন। সেই

সব মত প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে তাঁহারা সঙ্কলিত দেখিতে পাইবেন।

—

কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতিসভা

যাঁহারা ধর্ম্মানুরাগী ও ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, তাঁহারা কেশবচন্দ্র সেনকে প্রতি বৎসর স্মরণ করিয়া সমবেত ভাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝেন। যাঁহারা সমাজ-সংস্কার আবশ্যক মনে করেন কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন, তাঁহারাও এই সাধু পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন কর্ত্তব্য মনে করেন। আধুনিক যুগে রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা করিয়া এক দিক দিয়া সমাজ-সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অসবর্ণ-বিবাহ-প্রচলন, বালিকাদের বিবাহের বয়সবৃদ্ধি, সুরাপান-নিবারণ, প্রভৃতির চেষ্টা বিশেষ করিয়া কেশবচন্দ্রই প্রবর্ত্তন করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিও কেশবচন্দ্রের দ্বারা হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়াই সুবিদিত হওয়ায় তিনি যে বাংলার সুলেখক ছিলেন তাহা যেমন লোকে ভাবে না, তেমনি কেশবচন্দ্রকেও লোকে কেবল ধর্ম্মাচার্য্যই মনে করায় তিনি যে সরল ও প্রাণস্পর্শী বাংলা বলিতেন ও লিখিতেন, তাহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া থাকি। সস্তায় বাংলা খবরের কাগজের বহুল প্রচার তিনিই প্রথমে "সুলভ সমাচার" দ্বারা করেন। উহার দাম ছিল এক পয়সা। আমাদের মনে পড়ে আমরা যখন বাঁকুড়া জেলা-স্কুলে পড়ি তখন উহার অন্যতম শিক্ষক ভোলানাথ অধ্বর্য্যু সপ্তাহে ১৪০খানা পর্য্যন্ত ঐ কাগজ আনাইয়া বিক্রী করিতেন। প্রথম পৃষ্ঠায় উহার নামের নীচে চারি পংক্তি পদ্য ছাপা থাকিত। প্রথম দুই ছত্র—

"সহজে পাইতে যদি চাও জ্ঞানধন
সুলভ সংবাদপত্র কর অধ্যয়ন।"

অন্য দুই পংক্তি ঠিক মনে নাই। উহার পূজা-সংখ্যা রঙীন কাগজে ছাপা হইত ও আমাদের বড় প্রিয় ছিল। ইংরেজীতে ইণ্ডিয়ান মিরারও কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। সাবেক আলবার্ট-হল তাঁহার আর একটি কীর্ত্তি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারত-আশ্রমে অনেকগুলি পরিবার সাম্যবাদী রীতিতে (communistic principleএ) বাস করিতেন। উহা অবশ্য রুশিয়ার কম্যুনিজমের মত হিংসার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় নাই—মানবপ্রীতিরই উহা বাহ্য প্রকাশ ছিল।

ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও কেশবচন্দ্রের প্রভাব বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল। যাঁহারা পরমহংস রামকৃষ্ণের মণ্ডলীভুক্ত বা মণ্ডলীভুক্ত না হইলেও তাঁহার প্রতি ভক্তিমান, তাঁহারা পরোক্ষভাবে কেশবচন্দ্রেরও নিকট ঋণী। কারণ রামকৃষ্ণ ও কেশব উভয়ের আধ্যাত্মিকতা যেমন নিজ নিজ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সাধনায় তেমনি অংশতঃ পরস্পরের প্রভাবে বিকশিত হইয়াছিল।

—

শ্রীযুক্ত করুণাদাস গুহ

শ্রীযুক্ত করুণাদাস গুহ যে সিংহল গবর্ন্মেণ্টের পণ্য-শিল্পবিষয়ক পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়া সিংহল গিয়াছেন,



শ্রীযুক্ত করুণাদাস গুহ

তাহা প্রবাসীতে আগে লেখা হইয়াছে। তিনি বঙ্গের সরকারী পণ্যশিল্প-বিভাগে সার্ভেয়ার অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীজের কাজ করিতেন। তিনি প্রথমে যাদবপুরের এঞ্জিনিয়ারিং

স্কুলে শিক্ষালাভ করেন, পরে লিভারপুল গিয়া সেখানে পণ্যশিল্পবিষয়িনী রসায়নীবিদ্যায় এম্ এস্‌সী উপাধি লাভ করেন। বাঙ্গালোরে গবেষকের কাজও তিনি কিছু দিন করেন। তাঁহার জার্ম্মেনীর অভিজ্ঞতাও আছে।

—

পাটের চাষ কত কমাইতে হইবে

সরকারী একটি জ্ঞাপন-পত্র হইতে জানা যায়, যে, সরকার পাটচাষীদিগকে পাটচাষের রকম পাঁচ আনা জমিতে এবার "স্বেচ্ছায়" পাটচাষ না-করিতে "পরামর্শ" দিবেন।

পাটচাষ বস্তুতঃ কত কমিবে এবং পাটের দর তাহাতে বাড়িবে কিনা, পরে তাহা বুঝা যাইবে।

—

"অবনত"দিগের জন্য আসন সংরক্ষণের কুফল

"অবনত"শ্রেণীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষণের একটা কুফল এই হইয়াছে, যে, যাঁহারা আগে অবনতত্ব অস্বীকার করিয়া আপনাদের সামাজিক মর্য্যাদা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহারা অনেকে এখন সংরক্ষিত আসনগুলির প্রলোভনে সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছেন। ভবিষ্যৎ কুফল এই হইবে, যে, তাঁহারা সংরক্ষিত আসনের "সুবিধা" হারাইবার ভয়ে অবনতত্ব অস্বীকার করিয়া তাহার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাহিবেন না। "উচ্চ" জাতির লোকেরা অবনত"দের উন্নয়ন চেষ্টায় ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে যোগ দিতেছিলেন। ইহাতে অতঃপর বাধা পড়িতে পারে।

এই সকল আশঙ্কা ও বাধা সত্ত্বেও সমুদয় হিন্দুর মধ্যে সংহতিবৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

—

গ্রামশিল্পসভা সম্বন্ধে গুজব

দিল্লী হইতে আগত এই একটা গুজব সব কাগজে স্থান পাইয়াছে, যে, মহাত্মা গান্ধী সমগ্রভারতে গ্রামশিল্প পুনরুজ্জীবনের নিমিত্ত একটি সভা স্থাপন করায় ভারত-গবর্ন্মেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট-সমূহকে এ-বিষয়ে সচেতন করিয়া দিয়াছেন। তাহার কারণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও গুজবটা নীরব নহে। অনুমান এই, যে, গবর্ন্মেণ্ট চান না, যে, ভারতবর্ষের গ্রামবাসীদের উপর (অর্থাৎ ভারতের অধিকাংশ লোকের উপর) গান্ধীজীর প্রভাব বর্দ্ধিত হয়। গ্রামশিল্প-সকল পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইলে গ্রামের লোকেরা উপকৃত হইবে, এবং তাহাদের উপর গান্ধীজীর (সুতরাং কংগ্রেসের) প্রভাব বাড়িবে। গুজব এই, যে, সরকার তাহা পছন্দ করেন না, এবং এই জন্য সরকার নিজেই সব গ্রামশিল্প সংরক্ষণ ও পুনঃপ্রবর্ত্তনের ভার লইবেন। বাস্তবিক তাহা লইলে ত ভালই হয়, এবং গান্ধীজীও তাহাই মনে করেন। কিন্তু সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। ভারতবর্ষের অনেক শিল্প যে মৃতপ্রায় তাহা পাশ্চাত্যের (প্রধানতঃ ইংলণ্ডের) বড় বড় কারখানা-সকলের প্রতিযোগিতার ফলে। গ্রামশিল্প পুনঃপ্রবর্ত্তনের মানে ইংলণ্ডীয় অনেক কারখানার জিনিষের কাট্‌তি কমান। এমন কাজ যাহাতে হইতে পারে, যাহাতে ইংরেজ কারখানাওয়ালা ও ব্যবসাদারদের ক্ষতি হইতে পারে, সেরূপ কাজ ভারতীয় ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট করিতে পারেন কি?

গুজবের আর একটা অংশ এই, যে, গবর্ন্মেণ্ট সন্দেহ করেন, গান্ধীজীর আসল মতলব গ্রামশিল্পের সংরক্ষণ ও পুনঃপ্রবর্ত্তনের ব্যপদেশে তিনি গ্রাম্য লোকদের উপর প্রভাব স্থাপন করিয়া ভবিষ্যতে খুব ব্যাপকভাবে আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা চালাইবেন। গবর্ন্মেণ্ট বাস্তবিক এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকিলে পুলিসের লোকেরা গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠিত ভারতব্যাপী সমিতিটির কাজ পণ্ড করিবার চেষ্টা করিতে পারে। গান্ধীজীর মনে যে এরূপ আশঙ্কা না আসিয়াছে এরূপ বোধ হয় না। তিনি আগে হইতেই সমিতিটিকে কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান রূপে স্থাপিত করিয়াছেন।

—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন

বোম্বাইয়ে গত অক্টোবর মাসে যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়, তাহাতে বাংলাভাষী সভ্য এক জনও নাই; অর্থাৎ ব্রিটিশ-ভারতের অন্তর্ভূত কংগ্রেস-প্রদেশসমূহ ভাষা

অনুসারে গঠিত হইয়া থাকিলেও উহার এক-পঞ্চমাংশ যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে তাহাদের এক জনও ঐ কমিটিতে নাই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যসংখ্যা ২৫ জন বা অন্ততঃ ২১ জন করিলেই ত প্রত্যেক প্রদেশের এক জন করিয়া প্রতিনিধি উহাতে থাকিতে পারেন। তাহা করা হয় না কেন?

বাঙালী এক জনও যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে নাই, সেই দোষটি সারিয়া লইবার জন্য কমিটির অধিবেশনে ২।১ জন বাঙালী কংগ্রেসওয়ালাকে ডাকা হয়। এবারও ডাকা হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের মনে রাখা উচিত, যে, এমন কংগ্রেসওয়ালারাই বঙ্গের প্রতিনিধি যাঁহারা অন্তরে ও বাহিরে স্পষ্টতঃ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধী। বঙ্গে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনির্ব্বাচনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, সুভাষ বাবুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি-নির্ব্বাচনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, এবং এবার বঙ্গের দুই কংগ্রেসী দলের মধ্যে রফার দ্বারা মিলিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হওয়ার দ্বারাও তাহা অংশতঃ প্রমাণিত হইয়াছে।

—

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে বড়লাট

কলিকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়া গেল বড়লাট তাহার প্রারম্ভিক বক্তৃতা করেন। উহা পড়িলে লোকের মনে হইতে পারে, যেন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভারতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য নিজের কর্ত্তব্য করিয়াছেন, এখন অন্যেরা তাহা করিবার করুক। আমাদের ধারণা সেরূপ নহে। আমরা মনে করি, গবর্ন্মেণ্ট "পিণ্ডিরক্ষা" মাত্র করিয়াছেন। সব প্রদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তবে দেশে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বাড়িবে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রশস্ত ভিত্তি স্থাপিত হইবে। গবর্ন্মেণ্টের নিজ ব্যয়ে দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-মন্দির অল্পই স্থাপিত হইয়াছে ও পরিচালিত হইতেছে। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন ও তাহার কাজ চলা তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ ও খয়রার কুমারের দান ব্যতীত হইতে পারিত না।

বিজ্ঞান কলেজের সকল বিভাগ এক জায়গায় একত্র করিলে তবে উহার কাজ ভাল করিয়া চলে। আপার সার্কুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজের কাছে জমিও প্রায় আট-নয় বিঘা আছে। দাম আনুমানিক তিন লাখ টাকা পড়িবে। তাহার পর ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণের খরচ আছে। ভারত-গবন্মেণ্ট অন্ততঃ ঐ তিন লাখ টাকা ত অনায়াসেই দিতে পারেন। তাহা হইলে বুঝিব, ভারত-গবন্মেণ্ট খুব বিজ্ঞানোৎসাহী।

—

জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান

স্যর চন্দ্রশেখর রামন্ বাঙ্গালোরে একটি বৈজ্ঞানিক পরিষদ স্থাপন করিয়া ও তাহার নাম ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ (Indian Academy of Science) দিয়া সমগ্র ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পরিষদটি নিজের প্রভুত্বের অধীন রাখিবার চেষ্টা করেন। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক ও বাগ-বিতণ্ডার ইহাই সূত্রপাত। সুখের বিষয়, যে, এই ঝগড়া মিটিয়া গিয়াছে, এবং সমগ্র ভারতের জন্য "জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান" (National Institute of Science) কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে। শুনিলাম এই মিটমাট প্রধানতঃ এক জন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক কর্ম্মচারীর মধ্যস্থতায় হইয়াছে। কেবল দেশী লোকদের সুবুদ্ধিতে হইলে আরও সন্তোষের বিষয় হইত।

এই "জাতীয়" প্রতিষ্ঠানটির প্রথম (অবৈতনিক) কর্ম্মচারী ও সদস্যদের তালিকা দ্রষ্টব্য। ইঁহাদের মোট সংখ্যা ৩৩। তাঁহাদের মধ্যে ১৩ জন ইংরেজ। সভাপতি ইংরেজ ও সরকারী কর্ম্মচারী, সহকারী সভাপতি ইংরেজ ও সরকারী কর্ম্মচারী। ২০ জন ভারতীয়ের মধ্যে ৬ জন বাঙালী। দু-জন সাধারণ সেক্রেটরীর মধ্যে এক জন সরকারী ইংরেজ কর্ম্মচারী।

ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এত বেশী পরিমাণে ইংরেজদের দ্বারা হইয়াছে ও হয়, তাহা সর্ব্বসাধারণের অজ্ঞাত।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

গোরখপুরে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন সম্বন্ধে আমরা গত বৎসর ফাল্গুনের প্রবাসীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এ-বৎসর কলিকাতায় যে অধিবেশন হইয়া গেল, তাহার সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখিবার আছে। কিন্তু এখনই তাহা লিখিতে পারিতেছি না, পরেও সব কথা পারিব কিনা বলিতে পারি না। তাহার কারণ, এবার প্রবাসীর সম্পাদককে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির কাজ করিতে হইয়াছিল, সুতরাং দোষ গুণ উদ্‌ঘাটন, এবারকার অধিবেশন যে-ভাবে হইয়া গেল তাহার জন্ত দায়ী নহেন এমন কোন লোকের দ্বারা হইলেই ভাল হয়।

বাংলা দেশের বাহির হইতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বঙ্গে যাঁহারা বিদ্যা ও কৃষ্টির নানা বিভাগে কৃতী তাঁহাদিগকে দেখিবার ও তাঁহাদের কিছু কথা শুনিবার সুযোগ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাঁহাদের কয়েক জন কোন-না-কোন অধিবেশনে আসিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বাঙালীদের কলিকাতার কোন কোন প্রতিষ্ঠান দেখাইবার চেষ্টাও করিয়াছিলাম। এরূপ সব প্রতিষ্ঠান দেখাইবার ও দেখিবার সময় ছিল না। প্রবাসী বাঙালী ও বঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে যে আত্মীয়তার সম্বন্ধ আছে, এই বোধটি উজ্জ্বল করিবার অভিপ্রায়ও আমাদের ছিল।

—

ব্রহ্মদেশবাসী ভারতীয়দের দাবী

জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্টে পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে, যে, ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক্ করা হইবে ও পৃথক্ দেশ বলিয়া শাসন করা হইবে। তাহার সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে, যে, ব্রিটিশ সম্রাটের ব্রিটিশ-বংশীয় প্রজারা বা ব্রিটেনের স্থায়ী অধিবাসী অন্ত প্রজারা অবাধে ব্রহ্মদেশে যাইতে, বসবাস করিতে ও তথায় কোন চাকরী ব্যবসায় বা অন্ত কাজ করিতে পারিবে; তাহাতে বাধা হয় এরূপ কোন আইন ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপক সভা প্রণয়ন করিতে পারিবে না। কিন্তু ভারতীয়দের সম্বন্ধে উক্ত রিপোর্টে তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্ত এরূপ কিছু বলা হয় নাই, বরং বলা হইয়াছে, যে, ব্রহ্মের গবর্ণরের সম্মতি লইয়া ভারতীয়দের ব্রহ্মদেশ-প্রবেশে বাধাজনক আইনের খসড়া ব্রহ্মদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মদেশের গবর্ণর হইবেন জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির সভ্যদের জা'তভাই ইংরেজ। সুতরাং কমিটি ভারতীয়দের প্রতি যেরূপ ন্যায়পরায়ণতা ও সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, গবর্ণর তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে ঐ দুটি গুণের পরিচয় দিবেন, আশা করা যায় না—তিনি ওরূপ আইন ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিবার অনুমতি সহজেই দিবেন।

আমরা এরূপ একচোখো সুপারিশের সম্পূর্ণ বিরোধী। ভারতবর্ষের লোকদের ব্রহ্মদেশে এবং ব্রহ্মদেশের লোকদের ভারতবর্ষে যাতায়াত, বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী প্রভৃতি করার সম্পূর্ণ ও অবাধ অধিকার থাকা উচিত।

ব্রহ্মদেশের আয়তন ২,৩৩,৪৯২ বর্গ-মাইল, লোকসংখ্যা মাত্র ১,৩২,১২,১৯২। অর্থাৎ তথায় প্রতি বর্গ-মাইলে ৫৭ জন করিয়া লোক বাস করে। সুতরাং এরূপ বিরলবসতি বৃহৎ দেশে আরও অনেক লোকের জায়গা হইতে পারে। অব্যবহিত নিকটেই ঘনবসতি ভারতবর্ষ—বঙ্গদেশ ও আসাম। ব্রহ্মের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি ভারতবর্ষ হইতে তথায় গিয়াছে। ভারতবর্ষের অনেক অর্থ ব্রহ্মদেশে ব্যয়িত হইয়াছে ও খাটিতেছে। ব্রহ্মদেশ শীতপ্রধান দেশ নহে, যে, সেখানে কেবল ইউরোপীয়রাই উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে। সুতরাং আইনের জোরে ভারতীয়দিগকে ব্রহ্মে যাইতে না-দেওয়া বা তাহাদিগকে সেখানে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়া তাড়ান অত্যন্ত অন্যায় ও অস্বাভাবিক হইবে।

ব্রহ্মদেশবাসী ভারতীয়েরা গত খ্রীষ্টমাসের সময় কন্‌ফারেন্স করিয়া রিপোর্টের প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার্থ যে যে ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাহাও বলিয়াছেন। আমরা এই কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাবগুলি ন্যায়সঙ্গত মনে করি। আশা করি ভারতীয় দৈনিক কাগজগুলিতে সেই সকল প্রস্তাবের সমুচিত আলোচনা ও সমর্থন হইবে।

—

লণ্ডনে ভারতীয় ললিতকলা প্রদর্শনী

লণ্ডনে ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামক একটি সমিতি আছে।

এই সমিতিই প্রথমে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইঁহারা ভারতবর্ষের এবং যে-সব প্রাচ্য দেশ ভারতবর্ষ দ্বারা প্রভাবিত ও ভারতবর্ষ যাহাদের দ্বারা প্রভাবিত, সেই সব দেশের ললিতকলা ও সাহিত্যাদির অনুশীলন করিয়া থাকেন। "ইণ্ডিয়ান আর্ট এণ্ড লেটার্স" নামক ইঁহাদের একখানি পত্রিকা আছে। তাহা বৎসরে দুই বার বাহির হয়।

এই সমিতি গত ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে ভারতীয় নানা প্রকারের চিত্র, মূর্ত্তি, এবং স্থাপত্যের ফোটোগ্রাফ ও রেখা-চিত্রের প্রদর্শনী খুলেন। প্রদর্শিত জিনিষগুলির সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০।

প্রদর্শনীটি খুলিবার তারিখ নির্দিষ্ট ছিল ১০ই ডিসেম্বর। উহা খোলা হইবার আগে ঐ তারিখের টাইম্‌স্‌ উহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে লিখিত ছিল :—

"It is a much better exhibition than the somewhat scrappy representation of contemporary Indian art that we have had hitherto in London would have led anybody to expect, which is to say that it has completely fulfilled its purpose."

টাইম্‌স্‌ আরও বলেন :—

"So far as can be judged the representation of the different parts of India is fairly well balanced, and it is unlikely that anything of special significance has been ignored."

টাইম্‌সে লিখিত হইয়াছে, যে, "A good many of the works are loans," "প্রদর্শিত সামগ্রীসমূহের অনেকগুলি ঋণ দেওয়া," অর্থাৎ সেগুলি আর্টিষ্টরা স্বয়ং পাঠান নাই, তৎসমুদয়ের ক্রেতা বা অন্য প্রকারের অধিকারীরা পাঠাইয়াছেন। যাঁহারা যাঁহারা ঋণ দিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম করিবার পর টাইম্‌স্‌ লিখিতেছেন :—

"The works are grouped according to States and Provinces. This makes for convenience, though it would be extremely rash for anybody but a person thoroughly acquainted with the whole history of Indian art to attempt a definition of local styles. The broad division is that between the work of the Bombay school and that from other parts of India. It is at Bombay that the application of Western methods of teaching has gone farther. Speaking generally it can be said that the results—in the first gallery—seem to show that such teaching can be digested without serious disturbance to the native tradition. A fair statement of the case would be to say that, having regard to contemporary conditions, the work from Bombay strikes one as being more businesslike, but that many of the things of the highest artistic interest are to be found elsewhere."

শেষ উদ্ধৃত বাক্যটিতে বোম্বাইয়ের কাজের সম্বন্ধে মন্তব্যটিকে, আর্টের দিক্‌ দিয়া, বোম্বাইয়ের শিল্পীরা আপনাদের প্রশংসা মনে করিবেন কিনা জানি না। তাহাতে যাহা বলা হইয়াছে সোজা কথায় তাহার মানে, বোম্বাইওয়ালারা ব্যবসা বুঝে ভাল, কিন্তু উচ্চতম আর্টের নিদর্শন দেখিতে হইলে প্রদর্শনীর অন্যত্র যাইতে হইবে।

১১ই ডিসেম্বর টাইম্‌সে প্রদর্শনী খুলিবার সভার বৃত্তান্ত দেওয়া হয়। তাহার সভাপতি ছিলেন বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড জেটল্যাণ্ড। পূর্ব্বে তিনি লর্ড রোনাল্ডশে ছিলেন। তিনি বলেন :—

"The art movement noticeable in India during recent years was the outcome of an instinctive impulse towards self-expression. Indian art had certainly been affected by contact with the art of Europe—more so in the West of India perhaps than in the East—and there had been occasions on which it had been in danger of becoming little more than imitative. But when such a tendency had shown itself the movement had always languished, and he had little hesitation in saying that the recent art of India remained true to what, broadly speaking, might be said to have been throughout the centuries the distinguishing characteristic of Hindu as compared with European art—that the artist had aimed at giving expression to mental concepts than at reproducing the objects of the external world around him.

"It was the same spirit of revolt against the Westernization of India which had played so large a part in the National Movement that inspired the little circle of men who brought into being the new school of painting in Bengal."

বিলাতের রয়্যাল একাডেমীর সভাপতি স্যর উইলিয়ম লিউয়েলিন অতঃপর বলেন :—

"The exhibition was the first complete survey of modern Indian art that had been held in this or any other country, and he thought it would be of great interest to British artists. He quoted a comment made in *The Times* yesterday that the exhibition proved that 'practically all over India the native talent familiar to us in works of the past survives, and is well worth cultivating.' This, he thought, was a very important matter. The tendency today was to universalize everything in all matters of life, and art had not escaped. They were glad to see work that indicated that India had developed on its own lines and not on Western lines."

অতঃপর সহকারী ভারত-সচিব মিঃ বাট্‌লার কিছু বলেন। তাহাতে বোম্বাই বা বাংলা কিম্বা বঙ্গের ভারতীয় আর্টের বা তাহার ইউরোপীয় বা বাঙালী প্রবর্ত্তকদের নিন্দা বা প্রশংসা ছিল না। তাঁহার বক্তৃতা হইতে কেবল দুটি বাক্য উদ্ধৃত করিলেই চলিবে।

"We in this country were apt to hear of India and her doings mainly in connection with politics, and it was a welcome change to politicians as much as to anybody to have an opportunity of assessing the great achievements of modern India in some other field. He was afraid that hitherto only those who had had the chance of visiting India had been able, apart from isolated examples, to realize that India today had an art that was the legitimate successor of all those priceless treasures which dated from the times before the British came to her country."

টাইম্‌সে যাঁহাদের বক্তৃতা বা তাহার সংক্ষিপ্তসার বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে কেবল মাত্র বৰ্দ্ধমানের মহারাজা, আর কাহারও প্রশংসা বা নিন্দা না করিয়া, বোম্বাইয়ের আর্ট-স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ সলোমনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"He was glad to see the vigorous development of art in Western India under the guidance of Mr. Gladstone Solomon, the Principal of the Bombay School of Art."

অন্যান্য বিষয়ের মত আর্টের সম্বন্ধেও বৰ্দ্ধমানের মহারাজার মন্তব্যের মূল্য যাচাই করা অনাবশ্যক।

পরম্পরাগত ঐতিহ্য অনুযায়ী রীতির প্রশংসা কেহ কেহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ইংরেজদের মধ্যেও অনেকে তাহা করিলেও হ্যাভেল সাহেব প্রথমে তাহা করিয়া নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন। সুতরাং আধুনিক সময়ে ভারতীয় আর্টের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে হ্যাভেল সাহেবের প্রশংসা কেহ প্রসঙ্গক্রমে করিলে তাহা বেখাপ হইত না। কিন্তু কেহ তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন দেখিতেছি না; তবে তাঁহার নিন্দাও চোখে পড়িল না।

অনেকেই মনে করেন, বিলাতী দৈনিক ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের মতের গুরুত্ব আছে। প্রদর্শনীটি সম্বন্ধে ঐ কাগজে লিখিত হইয়াছিল :—

"Indian art today is still conscious of its past and its rather muddled present. As a general criticism it may be justly said that those artists who have worked on traditional lines—whether of Buddhist or Hindu or Moslem inspiration—are in a fair way to laying the foundations of modern Indian art, which may well be no less than the great art of her past. Unfortunately, in this renaissance, with few teachers and a sub-conscious feeling that Indian art was Indian rather than universal, many Indian painters turned to Europe or the Far East. Although Indian art in the past has shown that it is capable of assimilating foreign pictorial modes, up to the present the influence of the West and of Japan has been deplorable. This exhibition shows that, if Indian artists are content to work on the basis of the great Buddhist, Hindu, and the Mogul schools, they may succeed in creating an art at least equal to the great art of India's past."

এই মত ঠিক হইলে বাঙালী চিত্রকরেরা ঠিক পথ ধরিয়াছেন বলিতে হইবে। শুর মারে হ্যামিক্ এক সময় ভারতবর্ষে কাজ করিতেন। তিনি কোন বাঙালী ভদ্রলোককে যে ব্যক্তিগত চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রদর্শনীটি সম্বন্ধেও কিছু কথা আছে। তিনি লিখিয়াছেন :—

"We thoroughly enjoyed our visit to the opening and seeing your work and the pictures from your students. It is a beautiful Exhibition and much appreciated by many visitors. For myself, I think you in Bengal are working on better lines than Bombay—though I dare say for those who have not been to India the Bombay pictures have the greater appeal."

প্রদর্শনীটি সম্বন্ধে টাইম্‌স্ ও ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান ছাড়া অন্যান্য বিলাতী কাগজে মন্তব্য বাহির হইয়া থাকিলে তাহা আমাদের হস্তগত হয় নাই। উপরে যাঁহাদের মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহারা ছাড়া প্রদর্শনীর প্রত্যক্ষদর্শী অন্য কোন ইংরেজের মতও আমরা অবগত নহি।

—

কোথায় কত জন ভোট দিয়াছে

সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার যে সভ্যনির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নির্ব্বাচকদের মোট সংখ্যা, তন্মধ্যে কত জন ভোট দিয়াছিলেন এবং শতকরা কত জন ভোট দিয়াছিলেন, তাহার তালিকা নীচে দেওয়া হইতেছে। ইহাতে সব প্রদেশের সংখ্যা দেওয়া হয় নাই।

প্রদেশ	মোট সংখ্যা	ভোট দিয়াছিলেন	শতকরা অনুপাত
আজমীর	৬৫৯৬	৫৮৫৪	১৬.৬
আসাম	২৮৪৫০	১৩০৩৫	৪৫.৮৯
বাংলা	১৭৮৯৩৫	৫১২২০	২৮.৭
ব্রহ্মদেশ	৫০৫৭৭	১৫১৭১	২০.৯৯
মধ্যপ্রদেশ	৪৫০৫৬	২৬৩৫৭	৫৮.২
দিল্লী	১১৩৭১	৪৩৯২	৩৮.৬২
উ-প. সী. প্র	৭৬১৩	৫৫২৪	৭৩.০০
পঞ্জাব	৬৪০৭৭	৪১৯৮৫	৬৫.৫

দেখা যাইতেছে, যে, বঙ্গে শতকরা কম লোক ভোট দিয়াছে।

নারী নির্ব্বাচিকাদের তালিকা নীচে দিতেছি।

প্রদেশ	মোট সংখ্যা	ভোট দিয়াছিলেন	শতকরা অনুপাত
আসাম	৬০৪	১১২	১৮.৫৪
বাংলা	৯৩৫৯	৮৯৮	৯.৬
ব্রহ্মদেশ	৬০২৮	১১১১	১৮.৪৩
মধ্যপ্রদেশ	১৩৬৭	২৩৭	১৭.৩
দিল্লী	৯১৩	২৩৭	২৫.৯৫
পঞ্জাব	২৫৪৭	৫৭৮	২২.৭

নারীদের মধ্যেও বঙ্গে শতকরা কম নির্ব্বাচিকা ভোট দিয়াছিলেন।

বাংলা দেশে নানা বিষয়ে অবসাদ ও ঔদাসীন্য আসিয়াছে। বাঙালী পুরুষ ও নারীর জাগরণ আবশ্যক।

—

"চার অধ্যায়"

কয়েক মাস পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে ছোট উপন্যাসটি পড়িয়াছিলেন, তাহা "চার অধ্যায়" নাম দিয়া সম্প্রতি বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রধান নায়ক বিভীষিকাপন্থী অতীন্দ্র, যদিও সে দলের সর্দ্দার নয়। দলের সর্দ্দার ইন্দ্রনাথ এক জন উপনায়ক। অন্য কয়েক জন উপনায়কেরও দেখা পাওয়া যায়। নায়িকা এলা। এলা দলে থাকিলেও তাহার কৃত কোন বিভীষিকা-পন্থানুসারী বৈপ্লবিক কাজের বর্ণনা বা উল্লেখ পুস্তকে নাই। অতীন্দ্রের নিজের মুখেই তাহার কোন কোন কাজের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যখন রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় গল্পটি পড়া শেষ করেন, তখন শ্রোতাদের মন এরূপ অভিভূত হইয়াছিল, যে, কেহ কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। একা আবার পড়িয়া মনের অবস্থা সেইরূপই হইল। একবার শুনিয়াছিলাম, তথাপি কৌতূহল হ্রাস পায় নাই। যখন পড়া শেষ করিলাম, তখনকার মনের অবস্থা প্রকাশ করিবার মত কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

—

নাগপুরের কংগ্রেস-নেতা অভ্যঙ্কর

নাগপুরের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত অভ্যঙ্করের অকালমৃত্যুতে মধ্যপ্রদেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি ১৯২১ সালে ব্যারিষ্টরী ত্যাগ করিয়া অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এবারও তিনি উহার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ডাক্তার মুঞ্জে। তিনি যে ডাক্তার মুঞ্জে অপেক্ষা অনেক বেশী ভোট পাইয়াছিলেন তাহা হইতেই তাঁহার লোকপ্রিয়তা অনুমিত হইতে পারে।

—

আর্নেষ্ট বিন্‌ফীল্ড হ্যাভেল

ভারতীয় ললিতকলার প্রথম ও প্রধান ইউরোপীয় ব্যাখ্যাতা ও সমর্থক, ভারতীয় কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবনপ্রয়াসী, এবং ভারতীয় আর্য্য-ইতিহাসের অন্যতম লেখক কলিকাতা গবন্মেণ্ট আর্ট-স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ আর্নেষ্ট বিন্‌ফীল্ড হ্যাভেল সাহেবের সম্প্রতি ইংলণ্ডে ৭৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে তিনটি লেখা অন্যত্র প্রকাশিত হইল। তাঁহার মূর্ত্তির ফোটোগ্রাফখানি কলিকাতা গবন্মেণ্ট আর্ট-স্কুলের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে সৌজন্য সহকারে তুলিয়া দিয়াছেন। মূর্ত্তিটি শিল্পী শ্রীযুক্ত কে বেঙ্কটাপ্পা নির্ম্মিত। উহা গবন্মেণ্ট আর্ট-স্কুলে আছে।

—

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ

কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও বা অতিরিক্ত প্লাবনে বঙ্গের অনেক জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। অনাবৃষ্টির কুফল দেখা দিয়াছে প্রধানতঃ মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায়। বাঁকুড়া জেলাতেও অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছে। প্লাবন হইয়াছিল মালদহ, রাজসাহী, নদীয়া, যশোহর, ত্রিপুরা এবং ময়মনসিং জেলার কোন কোন অঞ্চলে।

অল্পস্বল্প সরকারী সাহায্য কোথাও কোথাও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অধিকতর সাহায্য আবশ্যক।

—

নিখিলবঙ্গ বেকার যুবক সম্মেলন

গত ২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতার আলবার্ট-হলে নিখিলবঙ্গ বেকার যুবক সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাংলা-গবর্মেণ্টের কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী নবাব কে জি এম ফারোকী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য গবর্মেণ্ট কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন মন্ত্রী-মহাশয় তাহা বলেন। মেয়র মহাশয়, সরকারী ও বেসরকারী কি কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করেন।

—

বেকার সমস্যা দুই প্রকার। "শিক্ষিত" ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে উপার্জ্জনের উপায়ের অভাব এক সমস্যা, এবং অশিক্ষিত ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে জীবিকার অভাব আর এক সমস্যা। দুটিরই সমাধান আবশ্যক। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে যে বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে তথাকার গবর্ন্মেণ্ট স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রুকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা "শিক্ষিত" শ্রেণীর মধ্যে বেকার-সমস্যা।

অবশ্য দুই প্রকার বেকার-সমস্যারই পরস্পরের সহিত সম্পর্ক আছে, এবং রোজগারের কোন্ কোন্ উপায় শিক্ষিতদের ও কোন্ কোন্ উপায় অশিক্ষিতদের অবলম্বনীয়, তাহা ঠিক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া যায় না। তথাপি বেকার-সমস্যা যে দু-রকমের তাহা মনে রাখা দরকার।

লেখাপড়াজানা লোকদের বেকার অবস্থা নানা কারণে লোকের অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাহা দূরীকরণের উপায় অনেকে অনেক রকম বলেন যাহা অনুসারে কাজ বেশী হয় না। তাহার সব দোষ অবশ্য বক্তাদের নয়। আমাদের মাথাতেও নানা বুদ্ধি, খেয়াল বা স্বপ্ন আসিয়া থাকে। তাহার একটা অনেক বার বলিয়াছি, আবার বলি—যদিও তদনুসারে কাজ গবর্ন্মেণ্ট করিবেন না। দেশময় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য এত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হউক, যাহাতে পাঁচ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক ছেলেমেয়েরা সবাই বিনা বেতনে পড়িতে পারে। এইগুলিতে অনেক হাজার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট আবশ্যক-মত মূলধন ধার করুন। তাহার সুদ ও আসল [সি]ঙ্কিং ফণ্ড স্থাপন দ্বারা শোধ করিবার ব্যবস্থা করুন। [জা]নি, বলা হইবে বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের টাকা নাই। কিন্তু [য]দি ভারত-গবর্ন্মেণ্টের অন্যায় শোষণে বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট দরিদ্র, [তব]ে ভারত-গবর্ন্মেণ্টকে বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট চাপিয়া ধরুন।

—

ব্রিটেনে-ভারতে বাণিজ্যচুক্তি

ব্রিটেনে-ভারতে আবার একটা বাণিজ্যচুক্তি হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় কোন ব্যবস্থাপক সভার, ভারতীয় লোকদের প্রতিনিধিস্থানীয় কোন সভার সম্মতি লইয়া এই চুক্তি হয় নাই। ইহা ভারতবর্ষের ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট এবং ব্রিটেনের ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের মধ্যে চুক্তি। অথচ ইহার নাম ইণ্ডো-ব্রিটিশ প্যাক্ট! এটা অটোয়া-চুক্তির ছোট ভাই—সহোদর কিংবা মাসতুতো, যা বল তাই। ইহাতে ব্রিটেনের স্বার্থের দিকে যে খুব দৃষ্টি রাখা হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য, ভারতবর্ষের স্বার্থের কথা না-তোলাই ভাল।

—

বেলুড়ে লোহার কারখানা

বেলুড়ের কাছে যে বৃহৎ লোহার কারখানা স্থাপিত হইতেছে, তাহাতে বাঙালীদের মূলধন বোধ হয় বেশী নাই। তাহার জন্য উদ্যোক্তাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। তাহার ডিরেক্টরদের মধ্যে এক জন বাঙালী, এক জন ইংরেজ, দু জন জাপানী ও তিন জন মাড়োয়ারী। কারখানাটি যখন বাংলা দেশে স্থাপিত হইয়াছে, তখন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালীদিগকে ইহার কাজে নিযুক্ত করিলে তাহা অন্যায় ও অস্বাভাবিক হইবে না।

—

ছেলেমেয়েদের একত্র শিক্ষা

করাচীতে সম্প্রতি যে সমগ্রভারতীয় নারী-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ছেলেমেয়েদের একত্র শিক্ষা সমর্থিত হইয়াছে। ইহা প্রাচীনপন্থীদের মনঃপূত হইবে না। কিন্তু তাঁহাদিগকেও মনে রাখিতে হইবে, যখন ছাত্রছাত্রীদের একত্র শিক্ষার ঔচিত্যানুচিত্যের কথা কেহ তুলে নাই, তখন হইতে পাঠশালায় ছেলেদের সঙ্গে অনেক মেয়ের লেখাপড়া শেখা চলিয়া আসিতেছে। অতএব, তাঁহারা অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহাদের একত্র অধ্যয়নে সম্মতি ও উৎসাহ দান করুন। নতুবা বালিকাদের সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা কবে যে বালিকা-বিদ্যালয়সকলে হইবে, তাহা ভবিষ্যৎ ইতিহাসের অধ্যায়বিশেষে থাকিতে পারে, না-থাকিতেও পারে।

প্রাচীনপন্থীরা জানেন, কণ্বমুনির আশ্রমে পালিতা শকুন্তলার সখী যেমন অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা ছিলেন, তেমনি সতীর্থ ছিলেন শার্ঙ্গধর ও শারদ্বত। শকুন্তলা কিন্তু ইঁহাদের কাহারও প্রণয়পাশে বদ্ধ হন নাই—হইয়াছিলেন দুষ্মন্ত নামক এক আগন্তুকের।

—

বঙ্গে নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব

ভারত-গবর্মেণ্ট বঙ্গদেশে সংগৃহীত রাজস্বের খুব বেশী অংশ শোষণ করায় বাংলা-গবর্মেণ্ট বরাবরই দরিদ্র। সেই দারিদ্র্য কিঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য গোটা চার পাঁচ নূতন ট্যাক্স বসিবে শুনা যাইতেছে। যথা—(১) যত বৈদ্যুতিক শক্তি গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত হয়, তাহার একক (unit) প্রতি অতিরিক্ত মূল্য আদায়; (২) থিয়েটার সিনেমা সার্কাস প্রভৃতির এক টাকার কম মূল্যের টিকিটেরও উপর আমোদ-কর; (৩১) প্রোবেট-ট্যাক্স বৃদ্ধি; (৪) কোর্ট-ফী বৃদ্ধি; (৫) তামাক ইত্যাদি বিক্রীর জন্য লাইসেন্স ফী।

—

যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতাল

যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতালে এ-পর্য্যন্ত ৬১৩ জন রোগী ভর্ত্তি করা হইয়াছে। চিকিৎসার ফলে প্রায় ২০০ অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ইহার দ্বারা ইহার উপকারিতা বুঝা যাইতেছে। ইহাতে মোট ৭৫টি শয্যা আছে, তাহার মধ্যে ২৫টির জন্য রোগীদের কাছ থেকে টাকা লওয়া হয় না। সঙ্গতিপন্ন লোকেরা সাহায্য করিলে ইহার দুই রকম শয্যারই সংখ্যা বাড়িতে পারে। বাড়া আবশ্যক ও উচিত। ডাঃ স্যর নীলরতন সরকার মহাশয় ইহার পরিচালক-সমিতির সভাপতি।

—

সুভাষ বাবুর কয়েকটি মন্তব্য

সুভাষ বাবু ইউরোপ যাইবার জন্য বোম্বাই বন্দরে জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে সংবাদিকদিগের প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুলিস তাহাতে বাধা দেয় নাই। তাহাতে বুঝা যায়, তিনি তখন রাজবন্দী ছিলেন না।

মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসরগ্রহণ সুভাষ বাবু কার্য্যতঃ প্রকৃত অবসরগ্রহণ মনে করেন না। কারণ, কংগ্রেস তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যতালিকা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারই গোঁড়া অনুচরেরা এখন উহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য, তাহাতে ভিন্নমতাবলম্বী কংগ্রেসওয়ালাদের স্থান হয় নাই, এবং কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রধান কর্ম্মীরা এখনও গান্ধীজীর পরামর্শ গ্রহণ ও অনুসরণ করেন এবং তিনি পরামর্শ দিয়া থাকেন। সুভাষ বাবুর মন্তব্য ভিত্তিহীন বলা যায় না।

তিনি বলিয়াছেন, জাতীয়তার সার বস্তু বাদ দিয়া ঐক্যস্থাপনের বা ঐক্যের কোন মূল্য নাই। জাতীয়তার উপর দাঁড়াইয়া যদি একতা পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা বাঞ্ছনীয়। বাস্তবিক, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কার্য্যতঃ মানিয়া লইয়া ঐক্যস্থাপনের কোনই মূল্য নাই।

সুভাষ বাবুর অন্যান্য কথাও মূল্যহীন নহে।

—

মডার্ণ রিভিয়ুর ঊনত্রিংশ বৎসর

আমাদের ইংরেজী মাসিকপত্র মডার্ণ রিভিয়ুকে ভারতবর্ষের বাহিরে, ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে, এমন কি বাংলা দেশেও অনেকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র বলেন। আমেরিকার ভারত-বন্ধু সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেব ত বলিয়াছেন, এত ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও আলোচনায় পূর্ণ ইহার মত মাসিক কাগজ আমেরিকায় নাই, ইংলণ্ডেও নাই। এই সব প্রশংসায় আমাদের আনন্দ হয় না বলিলে ঠিক্ বলা হইবে না। ইহার গ্রাহকসংখ্যাও কম নয়। কিন্তু ইহা যেরূপ বহুব্যয়সাধ্য ও বহুশ্রমসাধ্য, তাহাতে ইহার গ্রাহকসংখ্যা দ্বিগুণ হইলে তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। পত্রিকাটি ২৯শ বৎসরে পড়িয়াছে।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাহিত্যবিচার

শ্রীরাজশেখর বসু

মানুষের মন একটি আশ্চর্য্য যন্ত্র। কোন্ আঘাতে এ যন্ত্র কি রকম সাড়া দেয় তা আমরা অল্পই জানি। রাম একটি কড়া কথা বললে, অমনি শ্যাম ক্ষেপে উঠল; রাম একটু প্রশংসা করলে, শ্যাম খুশী হয়ে গেল। মনের এই রকম সহজ প্রতিক্রিয়া আমরা মোটামুটি বুঝি এবং তার নিয়মও কিছু কিছু বলতে পারি। কিন্তু রাম যদি ব্যক্তি বা দল-বিশেষকে উদ্দেশ না ক'রে কিছু লেখে বা বলে, অর্থাৎ কবিতা গল্প প্রবন্ধ রচনা করে বা বক্তৃতা দেয়, তবে তাতে কোন্ গুণ থাকলে সাধারণে খুশী হবে তা নির্ণয় করা সোজা নয়। পাঠক বা শ্রোতা যদি সাধারণ না হয়ে অসাধারণ হন, যদি তিনি সমঝদার রসজ্ঞ ব্যক্তি হন, তবে তাঁর বিচারপদ্ধতি কিরূপ তা বোঝা আরও কঠিন।

একটা সোজা উপমা দিচ্ছি। চা আমরা অনেকেই খাই এবং তার স্বাদ গন্ধ মোটামুটি বিচার করতে পারি। কিন্তু চা-বাগানের কর্তারা চায়ের দাম স্থির করেন কোন্ উপায়ে? এখনও এমন যন্ত্র তৈয়ারী হয় নি যাতে চায়ের স্বাদ গন্ধ মাপা যায়। অগত্যা বিশেষজ্ঞের শরণ নিতে হয়। এই বিশেষজ্ঞ বিশেষ কিছুই জানেন না। এঁর সম্বল শুধু জিব আর নাক। ইনি গরম জলে চা ভিজিয়ে সেই জল একটু চেখে বলেন—এই চা ত্ন-টাকা পাউণ্ড, এটা পাঁচ সিকে, এটা এক টাকা তিন আনা। তিনি কোন্ উপায়ে এই রকম বিচার করেন তা নিজেই বলতে পারেন না। তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অতি অল্প ইতরবিশেষও তাঁর কাছে ধরা পড়ে। এই বিধিদত্ত ক্ষমতার খ্যাতিতে তিনি টি-টেস্টারের পদ লাভ করেন এবং চা-ব্যবসায়ী তাঁর বাচাইকেই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নেয়। তিনি যদি বলেন এই চায়ের চেয়ে ঐ চা ঈষৎ ভাল, তবে ত্ন-দশ জন সাধারণ লোকে হয়ত অন্য মত দিতে পারে। কিন্তু বহু শত বিলাসী লোক যদি ঐ ছুই চা খেয়ে দেখে তবে অধিকাংশের অভিমত টি-টেস্টারের অনুবর্ত্তী হবে।

যাঁরা সাহিত্যে বৈদগ্ধ্যের খ্যাতি লাভ করেন তাঁরা টি-টেস্টারের সহিত তুলনীয়। টি-টেস্টারের লক্ষণ—স্বাদ-গন্ধের সূক্ষ্ম বোধ আর অসংখ্য পেয়ালার সঙ্গে পরিচয়। বিদগ্ধ ব্যক্তির লক্ষণ—সূক্ষ্ম রসবোধ আর সাহিত্যে বিপুল অভিজ্ঞতা। স্বাদ গন্ধ কাকে বলে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, আমরা কেবল মনে মনে বুঝি। কিন্তু রসের স্বরূপ সম্বন্ধে মনে মনে ধারণা করাও শক্ত। সাহিত্য-বিচারককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—আপনি কি কি গুণের জন্য এই রচনাটিকে ভাল বলছেন—তবে তিনি কিছুই স্পষ্ট ক'রে বলতে পারবেন না। যদি বলতে পারতেন তবে রসবিচারের একটা পদ্ধতি খাড়া হ'তে পারত। তাঁর যদি বিদ্যা জাহির করবার লোভ থাকে (থাকতেও পারে কারণ, বিদ্যা দদাতি বিনয়ং সব ক্ষেত্রে নয়), তবে তিনি হয়ত আর্টের উপর বক্তৃতা দেবেন, অলঙ্কারশাস্ত্র উদ্‌ঘাটন করবেন, রসের বিশ্লেষণ করবেন। সেই ব্যাখ্যান শুনে শ্রোতা হয়ত অনেক নূতন জিনিষ শিখবে। কিন্তু রসবিচারের মাপকাঠির সন্ধান পাবে না।

সাহিত্যের যে রস তা বহু উপাদানের জটিল সমন্বয়ে উৎপন্ন। সঙ্গীতের রস অপেক্ষাকৃত সরল। আমরা লোকপরম্পরায় জেনে আসছি যে অমুক স্বরের সঙ্গে অমুক স্বর মিষ্ট বা কটু শোনায়, কিন্তু কিজন্য এমন হয় তা ঠিক জানি না। বিজ্ঞানী এইটুকু আবিষ্কার করেছেন যে আমাদের কানের ভিতরের শ্রুতিযন্ত্রে কতকগুলি তন্তু আছে, তাদের কম্পনের রীতি বিভিন্ন কিন্তু নির্দিষ্ট। বিবাদী স্বরের আঘাতে এই তন্তুগুলির স্বচ্ছন্দ স্পন্দনে বাধা হয়, কিন্তু সংবাদী স্বরে হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের রহস্য যদি আরও জানা যায় তবে হয়ত সঙ্গীতের অনেক তত্ত্ব বোধগম্য হবে। যত দিন তা না হয় তত দিন সঙ্গীতবিদ্যাকে কলা বা আর্ট বলা চলবে কিন্তু বিজ্ঞান বলা চলবে না।

সাহিত্যের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই

অস্পষ্ট। সুললিত বর্ণনার মায়াজালে এই অজ্ঞতা ঢাকা পড়ে না। কেউ বলেন—art for art's sake, কেউ বলেন—মানুষের কল্যাণই সাহিত্যের কাম্য, কেউ বলেন—সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনসাধন। এই সমস্ত ধাপ্‌সা কথায় রসতত্ত্বের নিদান পাওয়া যায় না। আমরা এইটুকু বুঝি যে সাহিত্যরসে মানুষ আনন্দ পায়, কিন্তু রসের বিভিন্ন উপাদানের মাত্রা ও যোজনার বিষয় আমরা কিছুই জানি না। যে যে উপাদান সাহিত্যরসের উপজীব্য তার কয়েকটির সম্বন্ধে আমরা অস্পষ্ট ধারণা করতে পারি, যথা — জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের রুচিকর বিষয় বর্ণন, চিরাগত সংস্কার ও অভ্যাসের আনুকূল্য, মানুষের প্রচ্ছন্ন কামনার তর্পণ, অপ্রিয় বাধার খণ্ডন, অস্ফুট অনুভূতির পরিস্ফুটন, জ্ঞানের বর্দ্ধন, আত্মমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এই সকল উপাদানের কতকগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ, কতকগুলি নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু সাহিত্যরচয়িতা কোনও উপাদান বাদ দেন না। ওস্তাদ পাচক যেমন কটু অম্ল মিষ্ট সুগন্ধ দুর্গন্ধ নানা উপাদান মিশিয়ে বিবিধ সুখাদ্য তৈয়ার করে, ওস্তাদ সাহিত্যিকও সেই রকম করেন। খাদ্যে কতটা ঘি দিলে উপাদেয় হবে, কটা লঙ্কা দিলে মুখ জ্বালা করবে না, কতটুকু রসুন দিলে বিকট গন্ধ হবে না,—এবং সাহিত্যে কতটুকু শান্তরস বা বীভৎসরস, তত্ত্বকথা বা দুর্নীতি বরদাস্ত হবে, এ সবের নির্দ্ধারণ একই পদ্ধতিতে হয়। কয়েক জন ভোক্তার হয়ত বিশেষ বিশেষ রসে অনুরক্তি বা বিরক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাদের পছন্দই জগতে চরম ব'লে গণ্য হয় না। যিনি কেবল দলবিশেষের তৃপ্তিবিধান করেন অথবা কেবল সাধারণ ভোক্তার অভ্যস্ত ভোজ্য প্রস্তুত করেন, তিনি সামান্য পেশাদার মাত্র। যিনি অসংখ্য খোশখোরাকীর রুচিকে নিজের অভিনব রুচির অনুগত করতে পারেন তিনিই প্রকৃত সাহিত্যস্রষ্টা; এবং যিনি অন্যের রচনায় এই প্রভাব স্বয়ং উপলব্ধি ক'রে সাধারণকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন তিনিই সমালোচক হবার যোগ্য।

তামাক একটা বিষ, কিন্তু ধূমপান অসংখ্য লোকে করে এবং সমাজ তাতে আপত্তি করে না। কারণ, মোটের উপর তামাকে যতটা স্বাস্থ্যহানি হয় তার তুলনায় লোকে মজা পায় ঢের বেশী। পাশ্চাত্য দেশে মদ সম্বন্ধেও এই ধারণা, এবং অনেক সমাজে পরিমিত ব্যভিচারও উপভোগ্য ব'লে গণ্য হয়। মজা পাওয়াটাই প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু তাতে যদি বেশী স্বাস্থ্যহানি ঘটে তবে মজা নষ্ট হয় এবং রসের উদ্দেশ্যই বিফল হয়। সাহিত্যরসের উপাদান বিচারকালে সুধীজন এ-বিষয়ে স্বভাবতঃ অবহিত থাকেন। যিনি উত্তম বোদ্ধা বা সমালোচক তিনি মজা ও স্বাস্থ্য উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে রসের যাচাই করেন। তাঁর যাচাইয়ের নিক্তি আর কষ্টিপাথর কি রকম তা তিনি অপরকে বোঝাতে পারেন না, নিজেও বোঝেন না। তথাপি তাঁর সিদ্ধান্তে বড় একটা ভুল হয় না, অর্থাৎ শিক্ষিত জন সাধারণতঃ তাঁর মতেই মত দেয়।

ধারাবাহী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

এক সময় তোমরা এই বিদ্যালয়ে ছিলে—দূরে গেলে মনের বিচ্ছেদ ঘটতেও পারে, সেই জন্য দু-একটি কথা তোমাদের কাছে বলা প্রয়োজন মনে করি।

আমাদের এই বিদ্যালয় নানারকম যোগাযোগে গড়ে উঠেছে, কিন্তু সর্ব্বদাই এর মধ্যে একটা মূলতত্ত্ব কাজ করছে। আমি যদি বলি সে তত্ত্ব আমার, কঠিন ছাঁচে ঢালাই ক'রে তাকে রক্ষা করতে হবে—তা হবার নয়; আমি বলব না যে এমন একটা কাঠামো তৈরি করতে হবে যা চিরকাল থাকবে। এর ভিতরকার সে মূল কথাটি এই যে একটি বৃহত্তর জীবনের ভূমিকায় আমরা অনেকে একসঙ্গে এখানে মিলিত হয়েছি—নানা বিচিত্রতা বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে একটি প্রাণবান অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সে নিজেও জানে না কোন্ পথে যাবে, তার কোনো বাঁধা পথ নেই।

একলা যখন ছিলুম তখন আমার অভিপ্রায়ই এ অনুষ্ঠানের মধ্যে কাজ করেছে। পথ তখন সহজ ছিল। যখন কথা হ'ল যে সাধারণের হাতে সমর্পণ না করলে এ বেশি দিন স্থায়ী হবে না দেশের যোগ থাকবে না তখন একটা কনষ্টিটুাশুন করতে হয়েছিল—তৎপূর্ব্বেই অন্যান্য দেশের সঙ্গে এর যোগ ঘটেছিল, অনেকে জেনেছিল এর কথা। আমার মতে, এই কলকৌশলের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার প্রয়োজন আছে। তোমরা অনেকে জানো এই বিদ্যালয়ের জন্য নিজেকে আমি অনেক বঞ্চিত করেছি—সাহিত্য যে আমার পন্থা তাতেও আমি আঘাত সয়েছি। আমার অবর্ত্তমানে এ যদি একটা কল মাত্র হয়, তবে কেন এত করেছি। আমার সেই গোপন দুঃখের ইতিহাস কখনো কেউ জানবে না। আনুকূল্যের চেয়ে অধিক মিথ্যে উক্তি আমি লাভ করেছি—বহু বিদ্রূপ নিন্দা মাথায় ক'রে এখন আমার জীবনের শেষভাগ উপস্থিত। এখন যদি এ একটা জীবন্মৃত পদার্থে পরিণত হয়, এর প্রাণশক্তি না থাকে, তবে ব্যর্থ হলুম। যতটা দিয়েছি তার কিছুই ফল পাব না তা ইচ্ছে করে না।

তোমরা সবাই অনুকূল হবে এমন আমি আশা করি নে, তবে আশা করি এক দল আছ যাদের এর সম্বন্ধে মমতা থাকা স্বাভাবিক। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এ বিদ্যালয় প্রাণবান্, এর মধ্যে অসঙ্গতি থাকতে পারে, কিন্তু এর অন্তরে প্রাণ সঞ্চারিত। তোমরাও যদি তাই মনে করো তবে এর অঙ্গীভূত হয়ে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা স্থায়ী প্রভাব এর উপরে বিস্তার করতে পারো।

বিরুদ্ধতাকেও আমি স্বীকার করি—তোমাদের কাছে আমি শুধু এইটুকু চাই যে অকৃত্রিম মমতার সঙ্গে একে তোমরা গ্রহণ করো।

কী করে তার অবকাশ হ'তে পারে তা আমি জানি নে—কনষ্টিটুাশুন সম্বন্ধে কিছু বলতে আমি অক্ষম—আমি শুধু আমার ইচ্ছাপ্রকাশ করতে পারি; যখন আমি থাকব না তখন এর মধ্যে প্রাণকে জাগিয়ে রাখতে পারে এমন একটা শক্তি থাকা দরকার—তোমরা যদি অগ্রসর হয়ে একে গড়ে নাও তবে সেই অভাব মোচন হ'তে পারে।*

২

প্রৌঢ় বয়সে একদা যখন এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেম তখন আমার সম্মুখে ভাসছিল ভবিষ্যৎ, পথ তখন লক্ষ্যের অভিমুখে, অনাগতের আহ্বান তখন ধ্বনিত—তার ভাবরূপ তখনও অস্পষ্ট, অথচ একদিক দিয়ে তা এখনকার চেয়ে অধিকতর পরিস্ফুট ছিল কারণ তখন যে-আদর্শ মনে ছিল তা বাস্তবের অভিমুখে আপন অখণ্ড আনন্দ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। আজ আমার আয়ুষ্কাল শেষপ্রায়, পথের অন্ত প্রান্তে পৌঁছিয়ে পথের আরম্ভ-সীমা দেখবার সুযোগ হয়েছে, আমি সেই দিকে গিয়েছি,

---

* আশ্রমিক-সঙ্ঘের প্রতিনিধিমণ্ডলীর নিকট কথিত।

যেমনতর সূর্য্য যখন পশ্চিম অভিমুখে অস্তাচলের তটদেশে তখন তার সামনে থাকে উদয়দিগন্ত, যেখানে তার প্রথম যাত্রারম্ভ।

অতীতকাল সম্বন্ধে আমরা যখন বলি তখন আমাদের হৃদয়ের পূর্ব্বরাগ অত্যুক্তি করে, এমন বিশ্বাস লোকের আছে। এর মধ্যে কিছু সত্য আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নেই। যে দূরবর্ত্তী কালের কথা আমরা স্মরণ করি তার থেকে যা কিছু অবান্তর তা তখন স্বতই মন থেকে ঝরে পড়েছে। বর্ত্তমান কালের সঙ্গে যত কিছু আকস্মিক যা কিছু অসঙ্গত সংযুক্ত থাকে তা তখন স্খলিত হয়ে ধূলিবিহীন; পূর্ব্বে নানা কারণে যার রূপ ছিল বাধাগ্রস্ত তার সেই বাধার কঠোরতা আজ আর পীড়া দেয় না। এই জন্য গতকালের যে-চিত্র মনের মধ্যে প্রকাশ পায় তা সুসম্পূর্ণ, যাত্রারম্ভের সমস্ত উৎসাহ স্মৃতিপটে তখন ঘনীভূত। তার মধ্যে এমন অংশ থাকে না যা প্রতিবাদরূপে অন্য অংশকে খণ্ডিত করতে থাকে। এই জন্যই অতীত স্মৃতিকে আমরা নিবিড়ভাবে মনে অনুভব ক'রে থাকি। কালের দূরত্বে, যা যথার্থ সত্য তার বাহ্যরূপের অসম্পূর্ণতা ঘুচে যায়, সাধনার কল্পমূর্ত্তি অক্ষুণ্ন হয়ে দেখা দেয়।

প্রথম যখন এই বিদ্যালয় আরম্ভ হয়েছিল তখন এর আয়োজন কত সামান্য ছিল, সেকালে এখানে যারা ছাত্র ছিল তারা তা জানে। আজকের তুলনায় তার উপকরণ-বিরলতা, সকল বিভাগেই তার অকিঞ্চনতা অত্যন্ত বেশি ছিল। ক'টি বালক ও দুই-এক জন অধ্যাপক নিয়ে বড় জামগাছতলায় আমাদের কাজের সূচনা করেছি। একান্তই সহজ ছিল তাদের জীবনযাত্রা—এখনকার সঙ্গে তার প্রভেদ গুরুতর। এ কথা বলা অবশ্যই ঠিক নয় যে এই প্রকাশের ক্ষীণতাতেই সত্যের পূর্ণতর পরিচয়। শিশুর মধ্যে আমরা যে রূপ দেখি তার সৌন্দর্য্যে আমাদের মনে আনন্দ জাগায় কিন্তু তার মধ্যে প্রাণরূপের বৈচিত্র্য ও বহুধাশক্তি নেই। তার পূর্ণ মূল্য ভাবী-কালের প্রত্যাশার মধ্যে। তেমনি আশ্রমের জীবনযাত্রার যে প্রথম উপক্রম, বর্ত্তমানে সে ছিল ছোট, ভবিষ্যতেই সে ছিল বড়। তখন যা ইচ্ছা করেছিলাম তার মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না। তখন আশা ছিল অমৃতের অভিমুখে, যে-সংসার উপকরণ-বহুলতায় প্রতিষ্ঠিত তা পিছনে রেখেই সকলে এসেছিলেন। যাঁরা এখানে আমার কর্ম্মসঙ্গী ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন তাঁরা। আজ মনে পড়ে, কী কষ্টই না তাঁরা এখানে পেয়েছেন, দৈহিক সাংসারিক কত দীনতাই না তাঁরা বহন করেছেন। প্রলোভনের বিষয় এখানে কিছুই ছিল না, জীবনযাত্রার সুবিধা তো নয়ই, এমন কি খ্যাতিরও না, অবস্থার ভাবী উন্নতির আশা মরীচিকারূপেও তখন দূরদিগন্তে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে নি। কেউ তখন আমাদের কথা জানত না, জানাতে ইচ্ছাও করি নি; এখন যেমন সংবাদপত্রের নানা ছোটবড় জয়ঢাক আছে যা সামান্য ঘটনাকে শব্দায়িত ক'রে রটনা করে তার আয়োজনও তখন এমন ব্যাপক ছিল না। এই বিদ্যালয়ের কথা ঘোষণা করতে অনেক বন্ধু ইচ্ছাও করেছেন, কিন্তু আমরা তা চাই নি। লোকচক্ষুর অগোচরে, বহু দুঃখের ভিতর দিয়ে সে ছিল আমাদের যথার্থ তপস্যা। অর্থের এত অভাব ছিল যে আজ জগদ্ব্যাপী দুঃসময়েও তা কল্পনা করা যায় না। আর সে কথা কোনোকালে কেউ জানবেও না, কোনো ইতিহাসে তা লিখিত হবে না। আশ্রমের কোনো সম্পত্তি ছিল না সহায়তা ছিল না—চাইও নি। এই জন্যই, যাঁরা তখন এখানে কাজ করেছেন তাঁরা অন্তরে দান করেছেন, বাইরে কিছু নেন নি। যে আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছি তার বোধ সকলেরই মনে যে স্পষ্ট বা প্রবল ছিল তা নয় কিন্তু অল্প পরিসরের মধ্যে তা নিবিড় হ'তে পেরেছিল। ছাত্রেরা তখন আমাদের অত্যন্ত নিকটে ছিল—অধ্যাপকেরাও পরস্পর অত্যন্ত নিকটে ছিলেন, পরস্পরের সুহৃৎ ছিলেন তাঁরা। আমাদের দেশের তপোবনের আদর্শ আমি নিয়েছিলাম। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সে আদর্শের রূপের পরিবর্ত্তন হয়েছে, কিন্তু তার মূল সত্যটি ঠিক আছে—সেটি হচ্ছে, জীবিকার আদর্শকে স্বীকার ক'রে তাকে সাধনার আদর্শের অনুগত করা। এক সময়ে এটা অনেকটা সুসাধ্য হয়েছিল, যখন জীবনযাত্রার পরিধি ছিল অনতিবৃহৎ। তাই বলেই সেই স্বল্পায়তনের মধ্যে সহজ জীবনযাত্রাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। উচ্চতর সঙ্গীতে নানা ত্রুটি ঘটতে পারে, একতারায় ভুলচুকের সম্ভাবনা কম, তাই ব'লে একতারাই শ্রেষ্ঠ এমন

নয়। বরঞ্চ কর্ম্ম যখন বহুবিস্তৃত হয়ে বন্ধুর পথে চলতে থাকে তখন তার সকল ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও যদি তার মধ্যে প্রাণ থাকে তবে তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। শিশু অবস্থার সহজতাকে চিরকাল বেঁধে রাখবার ইচ্ছা ও চেষ্টার মতো বিড়ম্বনা আর কী আছে? আমাদের কর্ম্মের মধ্যেও সেই কথা। যখন একলা ছোট কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে ছিলুম তখন সব কর্ম্মীদের মনে এক অভিপ্রায়ের প্রেরণা সহজেই কাজ করত। ক্রমে ক্রমে যখন এ আশ্রম বড় হয়ে উঠল তখন এক জনের অভিপ্রায় এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে এ সম্ভব হ'তে পারে না।—অনেকে এখানে এসেছেন, বিচিত্র তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা—সকলকে নিয়েই আমি কাজ করি, কাউকে বাছাই করি নে বাদ দিই নে, নানা ভুলত্রুটি ঘটে নানা বিদ্রোহ-বিরোধ ঘটে—এ সব নিয়েই জটিল সংসারে জীবনের যে-প্রকাশ ঘাতাভিঘাতে সর্ব্বদা আন্দোলিত তাকে আমি সম্মান করি। আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারাযন্ত্রে গুঞ্জরিত করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করি নে। আমি যাকে বড় ব'লে জানি, শ্রেষ্ঠ ব'লে যা বরণ করেছি অনেকের মধ্যে তার প্রতি নিষ্ঠার অভাব আছে জানি, কিন্তু তা নিয়ে নালিশ করতে চাই নে। আজ আমি বর্ত্তমান থাকা সত্বেও এখানকার যা কর্ম্ম তা নানা বিরোধ ও অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে প্রাণের নিয়মে আপনি তৈরি হয়ে উঠছে; আমি যখন থাকব না, তখনও অনেক চিত্তের সমবেত উদ্যোগে যা উদ্ভাবিত হ'তে থাকবে তাই হবে সহজ সত্য। কৃত্রিম হবে যদি কোনো এক ব্যক্তি নিজের আদেশ-নির্দ্দেশে একে বাধ্য ক'রে চালায়—প্রাণধর্ম্মের মধ্যে স্বতোবিরোধীতাকেও স্বীকার ক'রে নিতে হয়।

অনেক দিন পরে আজ এ আশ্রমকে সমগ্র ক'রে দেখতে পাচ্ছি; দেখছি, আপন নিয়মে এ আপনি গড়ে উঠেছে। গঙ্গা যখন গঙ্গোত্রীর মুখে তখন একটিমাত্র তার ধারা। তার পর ক্রমে বহু নদনদীর সহিত যতই সে সঙ্গত হ'ল, সমুদ্রের যত নিকটবর্ত্তী হ'ল, কত তার রূপান্তর ঘটেছে। সেই আদিম স্বচ্ছতা আর তার নেই, কত আবিলতা প্রবেশ করেছে তার মধ্যে, তবু কেউ বলে না গঙ্গার উচিত ফিরে যাওয়া, যেহেতু অনেক মলিনতা ঢুকেছে তার মধ্যে, সে সরল গতি আর তার নেই। সব নিয়ে যে সমগ্রতা সেইটিই বড়—আশ্রমও স্বতোধাবিত হয়ে সেই পথেই চলেছে, অনেক মানুষের চিত্তসম্মিলনে আপনি গড়ে উঠছে। অবশ্য এর মধ্যে একটা ঐক্য এনে দেয় মূলগত একটা আদিম বেগ; তারও প্রয়োজন আছে, অথচ এর গতি প্রবল হয় সকলের সম্মিলনে। নিত্যকালের মতো কিছুই কল্পনা করা চলে না—তবে এর মূলগত একটি গভীর তত্ত্ব বরাবর থাকবে একথা আমি আশা করি—সে-কথা এই যে এটা বিদ্যাশিক্ষার একটা খাঁচা হবে না, এখানে সকলে মিলে একটি প্রাণলোক সৃষ্টি করবে। এমনতরো স্বর্গলোক কেউ রচনা করতে পারে না যার মধ্যে কোনো কলুষ নেই দুঃখজনক কিছু নেই—কিন্তু বন্ধুরা জানবেন যে এর মধ্যে যা নিন্দনীয় সেইটাই বড় নয়। চোখের পাতা ওঠে, চোখের পাতা পড়ে; কিন্তু পড়াটাই বড় নয়, সেটাকে বড় বললে অন্ধতাকে বড় বলতে হয়। যাঁরা প্রতিকূল, নিন্দার বিষয় তাঁরা পাবেন না এমন নয়—নিন্দনীয়তার হাত থেকে কেউই রক্ষা পেতে পারে না। কিন্তু তাকে পরাস্ত ক'রে উত্তীর্ণ হয়েও টিকে থাকাতেই প্রাণের প্রমাণ। আমাদের দেহের মধ্যে নানা শত্রু নানা রোগের বীজাণু—তাকে আলাদা ক'রে যদি দেখি তো দেখব প্রত্যেক মানুষ বিকৃতির আলয়। কিন্তু আসলে রোগকে পরাস্ত ক'রে যে স্বাস্থ্যকে দেখা যাচ্ছে সেইটেই সত্য। দেহের মধ্যে যেমন লড়াই চলছে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মধ্যেই তেমনি ভালমন্দের একটা দ্বন্দ্ব আছে—কিন্তু সেটা পিছন দিকের কথা। এর মধ্যে স্বাস্থ্যের তত্ত্বটাই বড়।

আমি এমন কথা কখনও বলি নি আজও বলি নে যে আমি যে-কথা বলব তাই বেদবাক্য—সে রকম অধিনেতা আমি নই। অসাধারণ তত্ত্ব তো আমি কিছু উদ্ভাবন করি নি; সাধকেরা যে অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলেন সে-কথা যেন সকলে স্বীকার করে নেন। এই একটি কথা ধ্রুব হয়ে থাক। তার পরে পরিবর্ত্তমান পরিবর্দ্ধমান সৃষ্টির কাজ সকলে মিলেই হবে। মানুষের দেহে যেমন অস্থি, এই অনুষ্ঠানের মধ্যেও তেমনি একটি যান্ত্রিক দিক আছে। এই অনুষ্ঠান যেন প্রাণবান হয় কিন্তু যন্ত্রই যেন মুখ্য না হয়ে ওঠে, জয় প্রাণ কল্পনার সঞ্চরণের পথ

কেন থাকে। আমি কল্পনা করি, এখানকার বিদ্যালয়ের আস্বাদন এক সময়ে যারা পেয়েছেন, এখানকার প্রাণের সঙ্গে প্রাণকে মিলিয়েছেন—অনেক সময় হয়তো তাঁরা এখানে অনেক বাধা পেয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু দূরে গেলেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পান এখানে যা বড় যা সত্য। আমার বিশ্বাস সেই দৃষ্টিবান অনেক ছাত্র ও কর্ম্মী নিশ্চয়ই আছেন, নইলে অস্বাভাবিক হ'ত। এক সময়ে তাঁরা এখানে নানা আনন্দ পেয়েছেন, সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, এর প্রতি তাঁদের মমতা থাকবে না এ হ'তেই পারে না। আমি আশা করি, কেবল নিষ্ক্রিয় মমতা দ্বারা নয় এই অনুষ্ঠানের অন্তর্বর্ত্তী হয়ে যদি তাঁরা এর শুভ ইচ্ছা করেন তবে এর প্রাণের ধারা অব্যাহত থাকতে পারবে, যন্ত্রের কঠিনতা বড় হয়ে উঠতে পারবে না। এক সময়ে এখানে যাঁরা ছাত্র ছিলেন, যাঁরা এখানে কিছু পেয়েছেন কিছু দিয়েছেন, তাঁরা যদি অন্তরের সঙ্গে একে গ্রহণ করেন তবেই এ প্রাণবান হবে। এই জন্য আজ আমার এই ইচ্ছা প্রকাশ করি যে যাঁরা জীবনের অর্ঘ্য এখানে দিতে চান যাঁরা মমতা দ্বারা একে গ্রহণ করতে চান তাঁদের অন্তর্বর্ত্তী ক'রে নেওয়া যাতে সহজ হয় সেই প্রণালী যেন আমরা অবলম্বন করি। যাঁরা একদা এখানে ছিলেন তাঁরা সম্মিলিত হয়ে এই বিদ্যালয়কে পূর্ণ ক'রে রাখুন এই আমার অনুরোধ। অন্য সব বিদ্যালয়ের মতো এ আশ্রম যেন কলের জিনিষ না হয়—তা করব না বলেই এখানে এসেছিলাম। যন্ত্রের অংশ এসে পড়েছে কিন্তু সবার উপরে প্রাণ যেন সত্য হয়। সেই জন্যই আহ্বান করি তাঁদের যাঁরা এক সময়ে এখানে ছিলেন, যাঁদের মনে এখনও সেই স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। ভবিষ্যতে যদি আদর্শের প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে আসে তবে সেই পূর্ব্বতনেরা যেন একে প্রাণধারায় সঞ্জীবিত ক'রে রাখেন, নিষ্ঠাদ্বারা শ্রদ্ধাদ্বারা এর কর্ম্মকে সফল করেন—এই আশ্বাস পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।*

* গত ৮ই পৌষ (১৩৪১ সন) বিশ্বভারতী পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে আচার্য্যের অভিভাষণ।

দুই-টি অভিভাষণই শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন কর্ত্তৃক অনুলিখিত ও তদনন্তর বিশ্বকবি কর্ত্তৃক সংশোধিত ও অনুমোদিত।

কান্তা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

বুঝি, তোমার কতই কষ্ট হয়!
সবচেয়ে যে আপন তারেই
পর না করলে নয়!
কোথায় তোমার রুক্ষ কেশের সযত্ন বিন্যাস
রঙীন বসন, আঁখির কোণে বিদ্যুৎ উল্লাস,
কেন যে নাই আয়োজনের একটুকু আভাস
সহজ সমুদয়,
সব-ই বুঝি;—তোমার কাছে ওসব সজ্জা আজ
প্রেমের লজ্জাময়॥

সবার কাছে সকল সময় মুক্ত তোমার গতি
পূর্ব্ব হ'তে কথার বেগও বেড়েছে সম্প্রতি,
কেন, কেবল আমার বেলায় ক্রমেই তোমার মতি
উদাস অতিশয়;
জানি, তোমার সিন্ধু করে কোন ডুবুরির তরে
কী রত্ন সঞ্চয়!

ভুলেও তোমার নাম-সে আমার নিন্দা ঘটায় পাছে,
সে উদ্বেগের তলায় দরদ সদাই চাপা আছে,
এই ক'রে কি প্রথম প্রেমের কান্নাপরাণ বাঁচে,
মৃত্যু কারে কয়?
আপনি ম'রে আমায় তুমি রাখবে মহীয়ান,
—জয় তোমারই জয়॥

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১

দাদার মৃত্যুর মাস-তিনেক পরে বাতাসার কারখানার কুণ্ডুমশায় হঠাৎ মারা গেলেন। এতে আমাকে বিপদে পড়তে হ'ল। কুণ্ডুমশায়ের প্রথম পক্ষের ছেলেরা এসে কারখানা ও বাড়িঘর দখল করলে। কুণ্ডুমশায়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিতান্ত ভালমানুষ পেয়ে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তার হাতের হাজার দুই নগদ টাকা বার ক'রে নিলে। টাকাগুলো হাতে না-আসা পর্য্যন্ত ছেলের বৌয়েরা সৎ-শাশুড়ীকে খুব সেবাযত্ন করেছিল, টাকা হস্তগত হওয়ার পরে ক্রমে ক্রমে তাদের মূর্ত্তি গেল বদলে। যা দুর্দ্দশা তার সুরু করলে ওরা! বাড়ির চাকরাণীর মত খাটাতে লাগল, গালমন্দ দেয়, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। আমি একদিন গোপনে বললাম—মাসীমা, পঞ্চুকে ডাকঘরের পাস-বই দিও না বা কোন সই চাইলেও দিও না। তুমি অত বোকা কেন তাই ভাবি। আগের টাকাগুলো ওদের হাতে তুলে দিয়ে বসলেই বা কি বুঝে?

ডাকঘরের পাস-বইয়ের জন্যে পঞ্চু অনেক পীড়াপীড়ি করেছিল। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত মাসীমা দিয়েই দিত—আমি সেখানা নিজের কাছে এনে রাখলাম গোপনে। কত টাকা ডাকঘরে আছে না জানতে পেরে পঞ্চু আরও খেপে উঠল। বেচারীর দুর্দ্দশার একশেষ ক'রে তুললে। কুণ্ডুমশায়ের স্ত্রীর বড় সাধ ছিল সৎছেলেরা তাকে মা ব'লে ডাকে, সে সাধ তারা ভাল করেই মেটালে। একদিন আমার চোখের সামনে সৎমাকে ঝগড়া ক'রে খিড়কীদোর দিয়ে বাড়ির বার ক'রে দিলে। আমি মাসীমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলাম, চিঠি লিখে তার এক দূরসম্পর্কের ভাইকে আনালাম—সে এসে মাসীমাকে নিয়ে গেল। আমার অজ্ঞাতসারে মাসীমা আমার বৌদিদির হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে ব'লে গেল যাবার সময়—জিতু মাসীমা বলেছিল, আমি তিলির মেয়ে, কিন্তু বেঁচে থাক সে, ছেলের কাজ করেছে। আমার জন্যেই তার কারখানার চাকরিটা গেল, যত দিন অন্য কিছু না-হয়, এতে চালিয়ে নিও, বৌমা। আমি দিচ্ছি এতে কিছু মনে ক'রো না, আমার তিন কুলে কেউ নেই, নিতুর বৌয়ের হাতে দিয়ে যদি সুখ পাই, তা থেকে আমায় নিরাশ ক'রো না।

পঞ্চু কারখানা থেকে আমায় ছাড়িয়ে দিলেও আমি আর একটা দোকানে চাকরি পেলাম সেই মাসেই। সৎমায়ের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করার দরুন কালীগঞ্জের কেউই ওদের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, মাসীমার অমায়িক ব্যবহারে সবাই তাকে ভালবাসত। তবে পঞ্চুদের টাকার জোর ছিল, সব মানিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে একদিন সীতার শ্বশুরবাড়ি গেলাম সীতাকে দেখতে। দাদা মারা যাওয়ার পরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, কারণ এক বেলার জন্যেও ওরা সীতাকে পাঠাতে রাজী হয় নি। সীতা দাদার নাম ক'রে অনেক চোখের জল ফেললে। দাদার সঙ্গে ওর শেষ দেখা মায়ের মৃত্যুর সময়ে। তার পর আমার নিজের কথা অনেক জিগ্যেস করলে। সন্ধ্যাবেলায় ও রান্নাঘরে বসে রাঁধছিল, আমি কাছে বসে গল্প করছিলাম। ওর শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভাল না, বসতবাটীটা বেশ বড়ই বটে, কিন্তু বাস করবার উপযুক্ত কুঠুরী মাত্র চারটি, তাদেরও নিতান্ত জীর্ণ অবস্থা, চূণবালি-খসা দেওয়াল, কার্নিসের ফাটলে বট অশ্বত্থের গাছ। রান্নাঘরের এক দিকের ভাঙা দেওয়াল বাঁশের চাচ দিয়ে বন্ধ, কার্ত্তিক মাসের হিম তাতে আটকাচ্ছে না। সীতার বড়-জা ওদিকে আর একটা উনুনে মাটির খুলিতে টাটকা খেজুর-রস জাল দিচ্ছিলেন, তিনি বললেন—যা হবার হয়ে গেল ভাই, এইবার তুমি একটা বিয়ে কর দিকি? এই গাঁয়েই বাড়ুয্যে-বাড়িতে ভাল মেয়ে আছে, যদি মত দাও কালই মেয়ে দেখিয়ে দিই। সীতা চুপ ক'রে রইল। আমি বললাম—

একটা সংসার ঘাড়ে পড়েছে, তাই অতি কষ্টে চালাই, আবার একটা সংসার চালাব কোথা থেকে দিদি? সীতা বললে—বিয়ে আর কাউকে করতে বলি নে মেজদা, এ অবস্থায় বড়দারও বিয়ে করা উচিত হয় নি। তোমারও হবে না। তার চেয়ে তুমি সন্নিসি হয়ে বেড়াচ্ছিলে, ঢের ভাল করেছিলে। আচ্ছা মেজদা, তুমি নাকি খুব ধার্ম্মিক হয়ে উঠেছ সবাই বলে?

আমি হেসে বললাম—অপরের কথা বিশ্বাস করিস্ নাকি তুই? পাগল! ধার্ম্মিক হলেই হ'ল অমনি—না? আমি কি ছিলাম না-ছিলাম তুই ত সব জানিস সীতা। আমার ধাতে ধার্ম্মিক হওয়া সয় না, তবে আমার জীবনের আর একটা কথা তুই জানিস নে, তোকে বলি শোন।

ওদের মালতীর কথা বললুম, দু-জনেই একমনে শুনলে। ওর বড়-জা বললে—এই ত ভাই মনের মত মানুষ ত পেয়েছিলে—ওরকম ছেড়ে এলে কেন?

আমি বললাম—এক তরফা। তাতে দুঃখই বাড়ে, আনন্দ পাওয়া যায় না। সীতা ত সব শুনলি, তোর কি মনে হয়?

সীতা মুখ টিপে হেসে বললে—এক তরফা ব'লে মনে হয় না। তোমার সঙ্গে অত মিশত না তা হ'লে—বা তোমার সঙ্গে কোথাও যেত না।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—তুমি আর একবার সেখানে যাও, মেজদা। আমি ঠিক বলছি তুমি চলে আসবার পরেই সে বুঝতে পেরেছে তার আখড়া নিয়ে থাকা ফাঁকা কাজ। ছেলেমানুষ, নিজের মন বুঝতে দেরি হয়। এইবার একবার যাও, গিয়ে তাকে নিয়ে এস ত?

সীতা নিজের কথা বিশেষ কিছু বলে না, কিন্তু ওর ওই শান্ত মৌনতার মধ্যে ওর জীবনের ট্র্যাজেডি লেখা রয়েছে। ওর স্বামী সত্যিই অপদার্থ, সংসারে যথেষ্ট দারিদ্র্য, কখনও বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু-পয়সা আনবার চেষ্টা করবে না। এক ধরণের নিষ্কর্ম্মা লোকের। মনের আলস্য ও দুর্ব্বলতা প্রসূত ভয় থেকে পূজো-আচ্চার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে, সীতার স্বামীও তাই। সকালে উঠে ফুল তুলে পূজো করবে, স্নানের সময় ভুল সংস্কৃতে স্তবপাঠ করবে, সব বিষয়ে বিধান দেবে, উপদেশ দেবে। একটু আদা-চা খেতে চাইলাম—সীতাকে বারণ ক'রে ব'লে দিলে, রবিবারে আদা খেতে নেই। দুপুরে খেয়ে উঠেই বিছানায় গিয়ে শোবে, বিকাল চারটে পর্য্যন্ত ঘুমুবে—এত ঘুমুতেও পারে! এদিকে আবার ন'টা বাজতে না-বাজতে রাত্রে বিছানা নেবে। সীতা বই পড়ে ব'লে তাকে যথেষ্ট অপমান সহ্য করতে হয়। বই পড়লে মেয়েরা কুলটা হয়, শাস্ত্রে নাকি লেখা আছে।

দেখলাম লোকটা অত্যন্ত দুর্ম্মুখও বটে। কথায় কথায় আমার মুখে একবার যীশুখ্রীষ্টের নাম শুনে নিতান্ত অসহিষ্ণু ও অভদ্র ভাবে ব'লে উঠল—ওসব ম্লেচ্ছ ঠাকুরদেবতার নাম ক'রো না এখানে, এটা হিন্দুর বাড়ি, ওসব নাম এখানে চলবে না।

সীতার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলাম, নইলে এ-কথার পর আমি এ বাড়িতে আর জলস্পর্শ করতাম না। সীতা ওবেলা পায়েস পিঠে খাওয়াবার আয়োজন করছে আমি জানি, তার আদরকে প্রত্যাখ্যান করতে কিছুতেই মন সরল না। আমি রাগ ক'রে চলে গেলে ওর বুকে বড় বিঁধবে। ওকে একেবারেই আমরা জলে ভাসিয়ে দিয়েছি সবাই মিলে। সীতা একটাও অনুযোগের কথা উচ্চারণ করলে না। কারুর বিরুদ্ধেই না। বৌদিদিকে ব'সে ব'সে একখানা লম্বা চিঠি লিখলে, আসবার সময় আমার হাতে দিয়ে বললে—আমায় পাঠাবে না কালীগঞ্জে, তুমি মিছে ব'লে কেন মুখ নষ্ট করবে মেজদা। দরকার নেই। তার পর জল-ভরা হাসি-হাসি চোখে বললে—আবার কবে আসবে? ভুলে থেক না মেজদা, শীগগির আবার এসো।

পথে আসতে আসতে দুপুরের রোদে একটা গাছের ছায়ায় বসে ওর কথাই ভাবতে লাগলুম। উমপ্লাঙের মিশন-বাড়ির কথা মনে পড়ল, মেয়েরা সীতাকে কত কি ছুঁচের কাজ, উল-বোনার কাজ শিখিয়েছিল যত্ন ক'রে। কার্ট রোডের ধারে নদীখাতের মধ্যে বসে আমি আর সীতা কত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি এঁকেছি ছেলেমানুষী মনে—কোথায় কি হয়ে গেল সব। মেয়েরাই ধরা পড়ে বেশী, জগতের দুঃখের বোঝা ওদেরই বইতে হয় বেশী ক'রে। সীতার কথা যখনই ভাবি, তখনই তাই আবার মনে হয়।

সবটাতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে সীতার স্বামীর একটা

কথায়। সে আমার লক্ষ্য ক'রে একটা শ্লোক বললে কাল রাত্রে। তার ভাবার্থ এই—গাছে অনেক লাউ ফলে, কোন লাউয়ের খোলে কৃষ্ণনাম গাইবার একতারা হয়, কোন লাউ আবার বাবুর্চ্চি রাঁধে গোমাংসের সঙ্গে।

তার বলবার উদ্দেশ্য আমি হচ্ছি শেষোক্ত শ্রেণীর লাউ। কেন-না, আমি ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের আচার মানি নে। দেবদেবীর পূজো-আচ্চা করি নে ওর মত। এই সব কারণে ও আমাকে অত্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখে বুঝলাম এবং বোধ হয় নিজেকে মনে মনে হরিনামের একতারা বলেই ভাবে।

ভাবুক তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার মতের সঙ্গে মিল না হ'লেই সে যদি আমায় ঘৃণা করে তবে আমি নিতান্ত নাচার। কোন্ অপরাধে আমি বাবুর্চ্চির হাতে-রাঁধা লাউ? ছেলেবেলায় হিমালয়ের ওক্ পাইন বনে তপস্যাস্তব্ধ কাঞ্চনজঙ্ঘার মূর্ত্তিতে ভগবানের অন্য রূপ দেখেছিলাম, তাই? রাঢ়দেশের নির্জ্জন মাঠের মধ্যে সন্ধ্যায় সেবার সেই এক অপরূপ দেবতার ছবি মনে এঁকে গিয়েছে, তাই? সেই অজানা নামহীন দেবতাকে উদ্দেশ ক'রে বলি—যে যা বলে বলুক। আমি আচার মানি নে, অনুষ্ঠান মানি নে, সম্প্রদায় মানি নে, কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত মানি নে, গোঁড়ামি মানি নে, আমি আপনাকে মানি। আপনাকে ভালবাসি। আপনার এই বননীল দিগন্তের রূপকে ভালবাসি, বিশ্বের এই পথিক রূপকে ভালবাসি। আমার এই চোখ, এই মন জন্মজন্মান্তরেও এই রকমই রেখে দেবেন। কখনও যেন ছোট ক'রে আপনাকে দেখতে শিখি নে। আর আমার উপাসনার মন্দির এই মুক্ত আকাশের তলায় যেন চিরযুগ অটুট থাকে। এই ধর্ম্মই আমার ভাল।

২

বাড়ি ফিরে দেখি বৌদিদি অত্যন্ত অসুখে পড়েছে।

মহাবিপদে পড়ে গেলাম। কারুও সাহায্য পাই নে, ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট—দাদার বড় মেয়েটি আট বছরের হ'ল, সে সমস্ত কাজ করে, আমি রাঁধি আবার বৌদিদির সেবাশুশ্রূষা করি। রোগিণীর ঠিকমত সেবা পুরুষের দ্বারা সম্ভব নয়, তবুও আমি আর খুকীতে মিলে যতটা পারি করি।

বৌদিদির অসুখ দিন-দিন বেড়ে উঠতে লাগল। সংসারে বিশৃঙ্খলার একশেষ—বৌদিদি অচৈতন্য হয়ে বিছানায় শুয়ে, ছেলেমেয়েরা যা খুশী তাই করছে, ঘরের জিনিষপত্র ভাঙছে ফেলছে ছড়াচ্ছে—এখানে নোংরা, ওখানে অপরিষ্কার—কোন্ জিনিষ কোথায় থাকে কেউ বলতে পারে না, হঠাৎ অসময়ে আবিষ্কার করি ঘড়ায় খাবার জল নেই, কি লণ্ঠন জ্বালাবার তেল নেই। বাজার নিকটে নয়, অন্ততঃ দেড় মাইল দূরে এবং বাজারে যেতে হবে আমাকেই। সুতরাং বেশ বোঝা যাবে অসময়ে এসব আবিষ্কারের অর্থ কি।

প্রায় এক মাস এই ভাবে কাট্‌ল। এই এক মাসের কথা ভাবলে আমার ভয় হয়। আমি জানতুম না কখনও যে জগতে এত দুঃখ আছে বা সংসারের দারিদ্র্য এত বেশী। রাত দিন কখন কাটে ভুলে গেলেম, দিন, বার, তারিখের হিসেব হারিয়ে ফেলেছিলাম—কলের পুতুলের মত ডাক্তারের কাছে যাই, রোগীর সেবা করি, চাক্‌রি করি, ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করি। এই দুঃসময়ে দাদার আট বছরের মেয়েটা আমাকে অদ্ভুত সাহায্য করলে। সে নিজে রাঁধে, মায়ের পথ্য তৈরি করে, মায়ের কাছে বসে থাকে—আমি যখন কাজে বেরিয়ে যাই ওকে ব'লে যাই ঠিক সময় ওষুধ খাওয়াতে কি পথ্য দিতে।

মেজাজ আমার কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়, একদিন কোথা থেকে এসে দেখি রোগিণীর সামনের ওষুধের গ্লাসে ওষুধ রয়েছে, খুকীকে ব'লে গিয়েছি খাওয়াতে কিন্তু সে ওষুধ গ্লাসে ঢেলে মায়ের পাশে রেখে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। দেখে হঠাৎ রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল আর ঠিক সেই সময় খুকী আঁচলে কি বেঁধে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমি রুক্ষ সুরে বললাম—খুকী এদিকে এস—

আমার গলার সুর শুনে খুকীর মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। সে ভয়ে ভয়ে দু-এক পা এগিয়ে আসতে লাগল, বরাবর আমার চোখের দিকে চোখ রেখে। আমি বললাম—তোর মাকে ওষুধ খাওয়াস্ নি কেন? কোথায় বেরিয়েছিলি বাড়ি থেকে?

সে কোন জবাব দিতে পারলে না—ভয়ে নীলবর্ণ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ কি যে রাগ হ'ল চণ্ডালের মত! তাকে পাখার বাঁট দিয়ে আথালি-পাথালি মারতে লাগলাম—প্রথম ভয়ে মার খেয়েও সে কিছু বললে না, তার পরে আমার মারের বহর দেখে সে ভয়ে কেঁদে উঠে বললে—ও কাকাবাবু আপনার পায়ে পড়ি, আমায় আর মারবেন না, আমি আর কখন এমন করবো না—

তার হাতের মুঠো আলগা হয়ে আঁচলের প্রান্ত থেকে দুটো মুড়ি পড়ে গেল মেজেতে। সে মুড়ি কিনতে গিয়েছিল এক পয়সার খিদে পেয়েছিল ব'লে। ভয়ে তাও যেন তার মনে হচ্ছে কি অপরাধই সে ক'রে ফেলেছে!

আমার জ্ঞান হঠাৎ ফিরে এল। মুড়িক'টা মেজেতে পড়ে যাওয়ার ঐ দৃশ্যে বোধ হয়। নিজেকে সামলে নিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেলাম। সমস্ত দিন ভাবলাম—ছিঃ এ কি ক'রে বসলাম! আট বছরের কচি মেয়েটা সারাদিন ধরে খাটছে, এক পয়সার মুড়ি কিনতে গিয়েছে আর তাকে এমনি ক'রে নির্ম্মমভাবে প্রহার করলাম কোন্ প্রাণে?

জীবনে কত লোকের কত বিচার করেছি তাদের দোষগুণের জন্যে—দেখলাম কাউকে বিচার করা চলে না—কোন্ অবস্থার মধ্যে প'ড়ে কে কি করে সে কথা কি কেউ বুঝে দেখে?

বৌদিদির অসুখ ক্রমে অত্যন্ত বেড়ে উঠল। দিন-দিন বিছানার সঙ্গে মিশে যেতে লাগল দেখে ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যাচ্ছে; এদিকে, এক মহা দুশ্চিন্তা এসে জুটল, যদি বৌদিদি নাই বাঁচে—এই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি কি করব? বিশেষ ক'রে কোলের মেয়েটাকে নিয়ে কি করি? ছোট্ট খুকী মোটে এই দশ মাসের—কি সুন্দর গড়ন, মুখ, কি চমৎকার মিষ্টি হাসি! এই দেড় মাস তার অযত্নের এক শেষ হচ্ছে—উঠোনের নারকোলতলায় চটের থলে পেতে তাকে রদ্দুরে শুইয়ে রাখা হয়—বড় খুকী সব সময় তাকে দেখতে পারে না—কাঁদলে দেখবার লোক নেই, মাতৃস্তন্য বন্ধ এই দেড় মাস—বার্লি খাইয়ে অতি কষ্টে চলছে। রাত্রে আমার পাশে তাকে শুইয়ে রাখি, মাঝরাত্রে উঠে এমন কান্না সুরু করে মাঝে মাঝে—ঘুমের ঘোরে উঠে তাকে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াই—বড় খুকীকে আর ওঠাই নে। রাত্রে ত প্রায়ই ঘুম হয় না, রোগীকে দেখা-শুনো করতেই রাত কাটে—মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে পড়ি। পাড়ার এত বৌ-ঝি আছে—দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম কেউ কোনদিন বললে না যে খুকীকে নিয়ে গিয়ে একবার মাইয়ের দুধ দিই। আমি একা কত দিকে যাব—তা ছাড়া আমার হাতের পয়সাও ফুরিয়েছে। এই দেড় মাসের মধ্যে সংসারের রূপ একেবার বদলে গিয়েছে আমার চোখে—আমি ক্রমেই আবিষ্কার করলাম মানুষ মানুষকে বিনা স্বার্থে কখনও সাহায্য করে না—আমি দরিদ্র, আমার কাছে কারুর কোন স্বার্থের প্রত্যাশা নেই, কাজেই আমার বিপদে কেউ উঁকি মেরেও দেখতে এল না। না আসুক, কিন্তু কোলের খুকীটাকে নিয়ে যে বড় মুস্কিলে পড়ে গেলাম! ও দিন-দিন আমার চোখের সামনে রোগা হয়ে যাচ্ছে, ওর অমন কাঁচা সোনার রঙের ননীর পুতুলের মত ক্ষুদে দেহটিতে যেন কালি মেড়ে দিচ্ছে দিন-দিন—কি করবো ভেবে পাই নে, আমি একেবারেই নিরুপায়। স্তন্যদুগ্ধ আমি ওকে দিতে ত পারি নে?

কিন্তু এর মধ্যে আবার মুস্কিল এই হ'ল যে স্তন্যদুগ্ধ ত দূরের কথা, গরুর দুধও গ্রামে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল। গোয়ালারা ছানা তৈরি ক'রে কল্‌কাতায় চালান দেয়, দুধ কেউ বিক্রী করে না। এক জন গোয়ালার বাড়িতে দুধের বন্দোবস্ত করলাম—সে বেলা বারোটা-একটার এদিকে দুধ দিত না। খুকী খিদেতে ছট্‌-ফট্‌ করত, কিন্তু চুপ ক'রে থাকত—একটুও কাঁদত না। আমার বুড়ো-আঙুলটা তার মুখের কাছে সে সময় ধরলেই সে কচি অসহায় হাত দুটি দিয়ে আমার আঙুলটা ধরে তার মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে ব্যগ্র, ক্ষুধার্ত্ত ভাবে চুষত—তা থেকেই বুঝতাম মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত এই হতভাগ্য শিশুর ক্ষুধার পরিমাণ।

ওকে কেউ দেখতে পারে না—দু-একটি পাড়ার মেয়ে যারা বেড়াতে আসত, তারা ওকে দেখে নানা রকম মন্তব্য করত। ওর অপরাধ এই যে ও জন্মাতেই ওর বাবা মারা গেল, ওর মা শক্ত অসুখে পড়ল। খুকীর একটা অভ্যাস যখন-তখন হাসা—কেউ দেখুক আর নাই দেখুক, সে

আপন মনে ঘরের আড়ার দিকে চেয়ে ফিক্ ক'রে একগাল হাসবে। তার সে সুধাশীর্ণ মুখের পবিত্র, সুন্দর হাসি কতবার দেখেছি—কিন্তু সবাই বল্ত, আহা কি হাসেন, আর হাসতে হবে না, কে তোমার হাসি দেখছে? উঠানের নারকোলতলায় চট পেতে রৌদ্রে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে, কত দিন দেখেছি নীল আকাশের দিকে চোখ দুটি তুলে সে আপন মনে অবোধ হাসি হাসছে। সে অকারণ, অপ্রার্থিত হাসি কি অপূর্ব্ব অর্থহীন খুশীতে ভরা! ছোট্ট দেহটি দিন-দিন হাড়সার হয়ে যাচ্ছে, অমন সোনার রং কালো হয়ে গেল, তবুও ওর মুখে সেই হাসি দেখেছি মাঝে মাঝে—কেন হাসে, কি দেখে হাসে কে বলবে?

এক এক দিন রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি ও খুব চেঁচিয়ে কাঁদছে। মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে আবার ঘুমিয়ে পড়ত। বড় খুকীকে বলতাম, একটু দুধ দে ত গরম ক'রে, হয়ত খিদেয় কাঁদছে। সব দিন আবার রাত্রে দুধ থাকত না। সেদিন আঙুল চুষিয়ে অনেক কষ্টে ঘুম পাড়াতে হ'ত। একদিন সকালে ওর কান্না দেখে আর থাকতে পারলাম না—রোগীর সেবা ফেলে দু-ক্রোশ তফাতের একটা গ্রাম থেকে নগদ পয়সা দিয়ে আধ সের দুধ জোগাড় ক'রে নিয়ে এসে ওকে খাওয়ালুম। গোয়ালাকে কত খোসামোদ করেও বেলা বারোটার আগে কিছুতেই দুধ দেওয়ানো গেল না।

মানুষ যদি বিবেচনাহীন হয়, নির্ব্বোধ হয় তবে বাইরে থেকে তাকে পশুর চেয়েও নিষ্ঠুর মনে করা দোষের নয়। যখন খুকীর দুধের জন্যে আমি সারা গ্রামখানার প্রত্যেক গোয়ালাবাড়ি খুঁজে বেড়িয়েছি যদি সকালের দিকে কেউ একটু দুধ দিতে পারে—যে বলেছে হয়ত ওখানে গেলে পাওয়া যাবে সেখানেই ছুটে গিয়েছি, আগাম টাকা দিতে চেয়েছি কিন্তু প্রতিবারই বিফল হয়ে ফিরে এসেছি—সে সময় ঠিক আমার বাড়ির পাশেই সুরপতি মুখুয্যের বাড়িতে দেড় সের করে দুধ হ'ত। সুরপতি সস্ত্রীক বিদেশে থাকেন, বাড়িতে থাকেন তাঁর বিধবা বড় ভাজ নিজের একমাত্র বিধবা মেয়ে নিয়ে। এঁদের অবস্থা ভাল, দোতলা কোঠা বাড়ি দু-জোড়া গরু, জমিজমা, ধানভরা গোলা। সকালে যারে-যিরের চা খাবার জন্যে দুধ দোয়া হয়, মেয়েটি নিজেই গাই দুইতে জানে, সকালে আধ সের দুধ হয়, দুপুরে বাকী এক সের। ওঁরা জানেন যে দুধের জন্যে খুকীর কি কষ্ট যাচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে কথা হয়েছে অনেকবার, আমায় অনেকবার প্রৌঢ়া মহিলাটি জিগ্যেসও করেছেন আমি দুধের কোনো সুবিধে করতে পারলাম কি না—দু-চার দিন সকালে ডেকে আমায় চাও খাইয়েছেন কিন্তু কখনও বলেন নি এই দুধটুকু নিয়ে গিয়ে খুকীকে খাওয়াও ততক্ষণ। আমিও কখনও তাঁদের বলি নি এ নিয়ে, প্রথমতঃ আমার বাধ-বাধ ঠেকেছে, দ্বিতীয়তঃ, আমার মনে হয়েছে এঁরা সব জেনেও যখন নিজে থেকে দুধের কথা বলেন নি, তখন আমি বললেও এঁরা ছলছুতো তুলে দুধ দেবেন না। তবুও আমি এঁদের নিষ্ঠুর বা স্বার্থপর ভাবতে পারি নে—বিবেচনাহীনতা ও কল্পনাশক্তির অভাব এঁদের এরকম ক'রে তুলেছে।

কতবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি—"ওর কষ্ট আমি আর দেখতে পারি নে, আপনি ওকে একটু দুধ দিন।" ওর মুখের সে অবোধ উল্লাসের হাসি প্রতিবার ছুরির মত আমার বুকে বিঁধেছে। কতবার মনে মনে ভেবেছি আমি যদি দেশের ডিক্‌টেটর হতাম, তবে আইন ক'রে দিতাম শিশুদের দুধ না-দিয়ে কেউ আর কোন কাজে দুধকে লাগাতে পারবে না।

কতবার ভেবেছি বৌদিদি যদি না বাঁচে, এই কচি শিশুকে আমি কি ক'রে মানুষ করব? অন্তদুধ একে কেউ দেবে না এই পাড়াগাঁয়ে, বিলিয়ে দিলেও মেয়েসন্তান কেউ নিতে চাইবে না—নিতান্ত নীচু জাত ছাড়া। আটঘরাতে থাক্‌তে ছেলেবেলায় এরকম একটা ব্যাপার শুনেছিলুম—গ্রামের শশিপদ ভট্‌চাজের স্ত্রী মারা যায় দুটি শিশুসন্তান রেখে। শশিপদ ভট্‌চাজের কেউ ছিল না—এদিকে শিশু দুটিই মেয়ে, অবশেষে যদু মুচির বৌ এসে মেয়ে দুটিকে নিয়ে গিয়েছিল।

এই সোনার খুকীকে সেই রকম বিলিয়ে দিতে হবে পরের হাতে? কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি ঘুমন্ত শিশুর মুখের দিকে চেয়ে এই ভাবনায়। এই বিপদে আমার প্রায়ই মনে হয়েছে মালতীর কথা। মালতী আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবে, সে কোন উপায় বার করবেই, যদি

খুকীকে বুকে নিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। সে চুপ ক'রে থাকতে পারবে না। তার ওপর অভিমান ক'রে চলে এসেছিলাম, দেখা পর্য্যন্ত ক'রে আসি নি আসবার সময়—আর তার পর এতদিন কোনো খোঁজখবর নিই নি—একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দিই নি, আমার বিপদের সময়ে সে আমার সব দোষ ক্ষমা ক'রে নেবে।

কিন্তু খুকী আমার সব চিন্তা থেকে মুক্ত ক'রে দিলে। তার যে হাসি কেউ দেখতে চাইত না, একদিন শেষরাত্রি থেকে সে হাসি চিরকালের জন্য মিলিয়ে গেল। অল্পদিনের জন্যে এসেছিল কিন্তু বড় কষ্ট পেয়ে গেল। কিছুই সে চায় নি, শুধু একটু মাতৃস্তন্য, কি লোলুপ হয়ে উঠেছিল তার জন্য, তার ক্ষুদে ক্ষুদে হাত দুটি দিয়ে ব্যগ্রভাবে আমার আঙুলটা আঁকড়ে ধরে কি অধীর আগ্রহে সেটা চুষত মাতৃস্তন ভেবে! আমারও কি কম কষ্ট গিয়েছে অবোধ শিশুকে এই প্রতারণা করতে? জগতে কত লোক কত সঙ্গত অসঙ্গত খেয়াল পরিতৃপ্ত করবার সুযোগ ও সুবিধা পাচ্ছে, আর একটি ক্ষুদ্র, অস্ফুটবাক্ শিশুর নিতান্ত ন্যায্য একটা সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল কেন তাই ভাবি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

১

বৌদিদি ক্রমে সেরে উঠলেন, কিছুদিন পরে আমার হঠাৎ একদিন একটু জ্বর হ'ল। ক্রমে জ্বর বেঁকে দাঁড়াল, আমি অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়লাম। দিনের পর দিন যায় জ্বর ছাড়ে না। একুশ দিন কেটে গেল। দিনের রাতের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি যেন, কখন রাত কখন দিন বুঝতে পারি নে সব সময়। মাঝে মাঝে চোখ মেলে দেখি বাইরের রোদ একটু একটু ঘরে এসেছে তখন বুঝি এটা দিন। বিছানার ওপাশটা ক্রমশঃ হয়ে গেল বহু দূরের দেশ, আফ্রিকা কি জাপান, ওখানে পৌঁছানো আমার শরীর ও মনের শক্তির বাইরে। অধিকাংশ সময়ই ঘোর-ঘোর ভাবে কাটে—সে অবস্থায় যেন কত দেশ বেড়াই, কত জায়গায় যাই। যখন যাই তখন যেন আর আমার অসুখ থাকে না, সম্পূর্ণ সুস্থ আনন্দে মন ভরে ওঠে, রোগশয্যা স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। ছেলেবেলাকার সব জায়গাগুলোতে আবার গেলাম যেন, আটঘরার বাড়িও বাদ গেল না। হঠাৎ ঘোর কেটে যায়, দেখি কুণদা ডাক্তার বুকে নল বসিয়ে পরীক্ষা করছে।

একবার মনে হ'ল দুপুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে, আমি ঘার-বাসিনীতে যাচ্ছি ছোট খুকীকে কোলে নিয়ে। দুর্গাপুরের ডাঙা পার হয়ে গেলাম, আবার সেই কাঁদোড় নদী, সেই তালবন, রাঙা মাটির পথ। মালতী বড় ঘরের দাওয়ায় বসে কি কাজ করছে। উদ্ধবদাস আমায় দেখে চিনলে, কাছে এসে বললে—বাবু যে—কি মনে ক'রে এতদিন পরে? আপনার কোলে ও কে? মালতী কাজ ফেলে মুখ তুলে দেখতে গেল উদ্ধবদাস কার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছে। তার পর আমায় চিনতে পেরে অবাক ও আড়ষ্ট হয়ে সেইখানেই বসে রইল। আমি এগিয়ে দাওয়ার ধারে গিয়ে বললাম—তুমি কি ভাববে জানি নে মালতী, কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়েই এসেছি। এই ছোট খুকী আমার দাদার মেয়ে, এর মা সম্প্রতি মারা গিয়েছে। একে বাঁচিয়ে রাখবার কোন ব্যবস্থা আমার মাথায় আসে নি। আর আমার কেউ নেই—একমাত্র তোমার কথাই মনে হ'ল, তাই একে নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। একে নাও, এর সব ভার আজ থেকে তোমার ওপর। তুমি ছাড়া আর কারও হাতে একে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না।

মালতী যেন তাড়াতাড়ি খুকীকে আমার কোল থেকে তুলে নিলে। তার পর আমার রুক্ষ চুল ও উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। পরক্ষণেই সে দাওয়া থেকে নেমে এসে বললে—আপনি আসুন, উঠে এসে বসুন।

আখড়ায় আর যেন কেউ নেই। উদ্ধবদাসকেও আর দেখলাম না। শুধু মালতী আর আমি। ও ঠিক সেই রকমই আছে—সেই হাসি, সেই মুখ, সেই ঘাড় বাঁকিয়ে কথা বলার ভঙ্গি। হেসে বললে—তার পর?

আমি বললাম—তার পর আর কি? এই এলাম।

—এতদিন কোথায় ছিলেন?

—নানা দেশে। তার পর দাদা মারা গেলেন, আমার ওপরে ওদের সংসারের ভার।

—উঃ কি নিষ্ঠুর আপনি!

তার পর সে বললে—আপনি বসুন খুকীর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা ত করতে হবে। একবার নীরদা-দিদিকে ডাকি।

আমি বললাম—আমি কিন্তু এখনই যাব মালতী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ফেলে রেখে এসেছি পরের বাড়িতে। আমাকে যেতেই হবে।

মালতী আশ্চর্য্য হয়ে বললে—আজই? আমি বললাম—আমার কাজ আমি শেষ করেছি, এখন তুমি যা করবে কর খুকীকে নিয়ে। আমি থেকে কি করব? আমি যাই।

মালতী স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল—আমায় নিয়ে যান তবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম—সে কি মালতী? তুমি যাবে আমার সঙ্গে? তোমার এই আখড়া?

মালতীর সঙ্গে যেদিন ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, সেদিনটি যেমন ও চোখ নামিয়ে কথা বলেছিল—ঠিক তেমনই ভঙ্গিতে চোখ মাটির দিকে রেখে স্পষ্ট ও দৃঢ় সুরে বললে—আপনি আমায় নিয়ে চলুন সঙ্গে যেখানে আপনি যাবেন। এবার আপনাকে একলা যেতে দেব না।

*   *   *   *

একচল্লিশ দিনে জ্বর ছেড়ে গেল। সেরে উঠলে বৌদিদি একদিন বললেন—জ্বরের ঘোরে 'মালতী' 'মালতী' ব'লে ডাকতে কাকে? মালতী কে ঠাকুরপো?

আমি বললাম—ও একটি মেয়ে। বাদ দাও ও-কথা। রোজ বলতাম? কত দিন বলেছি?

এই অসুখ-বিসুখে মাসীমার দেওয়া সেই একশো টাকা ত গেলই, বৌদিদির গায়ের সামান্য যা দু-একখানা গহনা ছিল তাও গেল। নতুন চাকুরীটাও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে কামালপুর ব'লে একটা গ্রাম আছে। নিতান্ত পাড়াগাঁ এবং জঙ্গলে ভরা। সেখানকার দু-এক জন জানাশোনা ভদ্রলোকের পরামর্শে সেখানে একটা পাঠশালা খুললাম। বৌদিদিদের আপাততঃ কালীগঞ্জে রেখে আমি চলে গেলাম কামালপুরে। একটা বাড়ির বাইরের ঘরে বাসা নিলাম—বাড়ির মালিক চাকুরীস্থানে থাকেন, বাড়িটাতে অনেক দিন কেউ ছিল না। বাড়ির পিছনে একটা বড় আম-কাঁটালের বাগান।

পাঠশালায় অনেক ছেলে হুইল—কতকগুলি ছোট মেয়েও এল। যা আয় হয়, বংসার একরকম চলে যায়।

সময় বড় বড় মনের দাগ মুছে দেবার মন্ত্র জানে। আবার নতুন মন, নতুন উৎসাহ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের একটা নতুন অধ্যায় কি রকমে সুরু হ'ল তাই এখানে বলব।

পাঠশালা খুলবার পরে প্রায় দু-বছর কেটে গিয়েছে। ভাদ্র মাস। বেশ শরতের রোদ ফুটেছে। বর্ষার মেঘ আকাশে আর দেখা যায় না। একদিন আমি পাঠশালায় গিয়েছি একটা ছোট মেয়ে বলছে—মাষ্টার মশায়, পেনো হিরণদিদির হাত আঁচড়ে কামড়ে নিয়েছে, ওই দেখুন ওর হাতে রক্ত পড়ছে।

যে মেয়েটির হাতে আঁচড়ে নিয়েছে তার নাম হিরণ্ময়ী, বয়স হবে বছর চোদ্দ, পাঠশালার কাছেই ওদের বাড়ি—কিন্তু মেয়েটি আমার পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়েছে বেশী দিন নয়। ওর বাবার নাম কালীনাথ গাঙ্গুলী, তিনি কোথাকার আবাদের নায়েব, সেইখানেই থাকেন, বাড়িতে খুব কমই আসেন

আমি লক্ষ্য করেছি এই মেয়েটি সকলের চেয়ে সজীব, বুদ্ধিমতী, অত্যন্ত চঞ্চলা। সকলের চেয়ে সে বয়সে যেমন বড়, সকলের চেয়ে সে সভ্য ও সৌখীন। কিন্তু তার একটা দোষ, কেমন একটু উদ্ধত স্বভাবের মেয়ে।

একদিন কি একটা অঙ্ক ওকে দিলাম, সবাইকে দিলাম। ওর অঙ্কটা ভুল গেল। বললাম—তুমি অঙ্কটা ভুল করলে হিরণ? অঙ্কটা ভুল গিয়েছে শুনে বোধ হয় ওর রাগ হ'ল—আর দেখেছি সব সময়, অপর কারোর সামনে বকুনি খেলে ও খেপে ওঠে। খুব সম্ভব সেই জন্যই ও রাগের সুরে বললে—কোথায় ভুল? কিসের ভুল? ব'লে দিন না? আমি বললাম—কাছে এস, অতদূর থেকে কি দেখিয়ে দেওয়া যায়? আমি দেখে আসছি যে কদিন ও এসেছে, আমার কাছ থেকে দূরে বসে।

ও উদ্ধতভাবে বললে—কেন এখান থেকেই বলুন না? আপনার কাছে কেন যাব?

আমার মনে হ'ল ও বড় মেয়ে ব'লে আমার কাছে আসতে বোধ হয় সঙ্কোচ অনুভব করে। কিন্তু তার জন্যে ওরকম উদ্ধত সুর কেন? বললাম—কাছে এসে আঁক দেখে নিতে দোষ আছে কিছু? ও বললে—সে-সব কথায় কি

দরকার আছে? আপনি দিন অঙ্ক ওখান থেকেই বুঝিয়ে।

রাগে ও বিরক্তিতে আমার মন ভ'রে উঠল। আচ্ছা মেয়ে ত? মাষ্টারের সঙ্গে কথাবার্ত্তার এই কি ধরণ? আর আমার যখন এত অবিশ্বাস তখন আমার স্কুলে না-এলেই ত হয়? সেদিন আমি ওর সঙ্গে আর কোন কথাই বললাম না। পরদিনও তাই, স্কুলে এল, নিজে ব'সে ব'সে কি লিখলে বই দেখে, একটা কথাও কইলাম না। ছুটির কিছু আগে আমায় বললে—আমার ইংরিজিটা একবার ধরুণ না? আমি ওর পড়াটা নিয়ে তার পর শান্তভাবে বললাম—হিরণ, তোমার বাড়িতে ব'লো, আমি তোমাকে পড়াতে পারব না। অন্য ব্যবস্থা করতে ব'লো কাল থেকে।

হিরণ্ময়ীর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল—বললে—কেন?

আমি বললাম— না—তুমি বড় মেয়ে, এখানে তোমার সুবিধা হবে না।

ও বললে—রাগ করেছেন নাকি? কি করেছি আমি?

আমি বললাম—কাল তোমার ও-কথাটা কি আমায় বলা উচিত হয়েছে হিরণ? কি ব'লে তুমি বললে আপনার কাছে কেন যাব?···এখান থেকেই বলুন না? তুমি আমার কাছে তবে পড়তে এসেছ কেন?···

হিরণ্ময়ী হেসে বললে—এই! তা কি এমন বলেছি, আমি? তা যখন আপনি বলছেন দোষ হয়েছে বলাতে, তখন দোষ নিশ্চয়ই হয়েছে।

—কেন তুমি বললে ও রকম? তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত ওকথা বলার জন্যে, তা জান?···

হিরণ্ময়ী বললে—হাঁ, হয়েছি! হ'ল ত? এখন নিন।

তার পর যখন ওর অঙ্ক দেখছি, তখন হঠাৎ আমার মুখের দিকে কেমন একটা বুঝতে না-পারার দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—উঃ আপনার এত রাগ?···আগে ত কখন রাগ দেখি নি এ রকম?···তখনও সে আমার মুখের দিকে সেই রকম দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন বুঝবার চেষ্টা করছে। ওর রকম-সকম দেখে আমি হাসি চাপতে পারলাম না—সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তে হিরণ্ময়ীকে নতুন চোখে দেখলাম। দেখলুম হিরণ্ময়ী অত্যন্ত লাবণ্যময়ী, ওর চোখ দুটি অত্যন্ত ডাগর, টানা-টানা জোড়া ভুরু দুটি কাল সরু রেখার মত, কপালের গড়ন ভারী সুন্দর, চাঁচা ছোট, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। মাথায় একরাশ ঘন কাল চুল।

ও তখনও আমার দিকে সেই ভাবেই চেয়ে আছে। এক মিনিটের ব্যাপারও নয় সবটা মিলে।

পরদিন থেকে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, হিরণ্ময়ী আমার কাছ থেকে ততদূরে আর বসে না—আর না-ডাকলেও কাছে এসে দাঁড়ায়।

একদিন আমায় বললে—জানেন মাষ্টার-মশায়, আমার সব দল এরা—আমায় এরা ভয় করে।

অবাক্ হয়ে বললুম—কারা?

হাত দিয়ে পাঠশালার সব ছাত্রছাত্রীদের দেখিয়ে দিয়ে বললে—এরা। আমার কথা না-শুনে কেউ চলতে পারে না।

—ভয় করে কেন?

—এম্‌নি করে। আমি যা বলব ওদের শুনতেই হবে।

পাঠশালার সকলেরই ওপর সে হুকুম ও প্রভুত্ব চালায়, এটা এতদিন আমার চোখে পড়ে নি—সেদিন থেকে সেটা লক্ষ্য করলাম। তবে পেনো যে সেদিন ওর হাত আঁচড়ে নিয়েছিল সে আলাদা কথা। দেশের রাজার বিরুদ্ধেও ত তাঁর প্রজারা বিদ্রোহী হয়?

রোজ রাত্রে বাসায় এসে সন্ধ্যাবেলা পরোটা গড়ি। দু-এক দিন পরে সন্ধ্যাবেলা ময়দা মাখছি একা রান্নাঘরে বসে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার বেশী নয়, একটা হারিকেন-লণ্ঠন জ্বলছে ঘরে। কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে হিরণ্ময়ী। শশব্যস্তে উঠে বিস্মিত মুখে বললাম—হিরণ! এস এস, কি মনে ক'রে?···

হিরণ্ময়ীর একটা স্বভাব গোড়া থেকে লক্ষ্য করেছি, কখনই প্রশ্নের ঠিক জবাবটি দেবে না। আমার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে বললে—ময়দা মাখেন বুঝি নিজে রোজ? ওই বুঝি ময়দা মাখা হচ্ছে?

আমি বিপন্ন হয়ে পড়লুম—চোদ্দ বছরের মেয়েকে পাড়াগাঁয়ে বড়ই বলে। আমার কাছে এরকম অবস্থায়

আসাটা কি ঠিক হ'ল ওর? এসব জায়গার গতিক আমি জানি ত?

বললাম—তুমি যাও হিরণ, পড়গে।

হিরণ্ময়ী হেসে বললে—তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন? আমি যাব না—এই বললাম। বেজায় একগুঁয়ে মেয়ে, আমি ত জানি ওকে! বললে—একটা অঙ্ক কষে দেবেন? না—থাক্, একটা গল্প বলুন না?···ও আপনি বুঝি ময়দা মাখবেন এখন! সরুন, সরুন দিকি! আমি মেখে বেলে দিচ্ছি। কি হবে রুটি না লুচি?···আপনি এই পিঁড়িটাতে বসে শুধু গল্প করুন।

সেই থেকে হিরণ্ময়ীর রোজ সন্ধ্যাবেলা আমাকে সাহায্য করতে আসা চাই-ই। মৃদু প্রদীপের আলোতে ও হাসি-হাসি মুখে সে তার খাতাখানা খুলে নামে অঙ্ক কষে—কাজে কিন্তু সে আমার রুটি পরোটা তৈরি ক'রে দেয়। কিছুতেই আমার বারণ শোনে না—ওর সঙ্গে পারব না ব'লে আমিও কিছু আর বলি নে। ওর মায়ের বারণও ও শোনে না, একদিন কথাটা আমার কানে গেল।

শুনলাম একদিন মাকে বলছে ওদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে—কেন যাই তাই কি? আমি অঙ্ক কষতে যাই। বেশ করি—যাও।

হিরণ্ময়ীকে বললাম—শোন হিরণ, আমার এখানে সন্ধ্যেবেলা আর এস না—যখন তোমায় মা বকেন। আমার কথাটা অন্ততঃ তোমার মানা উচিত। বুঝলে?

পরদিন হিরণ্ময়ী সত্যিই আর এল না। আমার সন্ধ্যাটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে ওর না- আসাতে, সেদিন প্রথম লক্ষ্য করলাম। সাত-আট দিন কেটে গেল—হিরণ্ময়ী পাঠশালাতে রোজই আসে। তাকে জিজ্ঞাসা করি না অবিশ্যি কেন সে সন্ধ্যাবেলা আসে না।

একদিন সে পাঠশালাতেও এল না। দু-তিন দিন পরে জিগ্যেস্ ক'রে জানলাম সে মামার বাড়ি গিয়েছে তার মায়ের সঙ্গে।

দেখে আশ্চর্য্য হ'লাম যে আমার পাঠশালা আর সে পাঠশালা নেই—আমার সন্ধ্যাও আর কাটে না। হিরণের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে ওর মামার বাড়ি থেকে, মেয়ে দেখাতে নিয়ে গিয়েছে—বরপক্ষ ওখানেই মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করবে।

মানুষের মন কি অদ্ভুত ধরণের বিচিত্র! হঠাৎ কথাটা শুনেই মনে হ'ল এ গাঁয়ের পাঠশালা উঠিয়ে দেব, অন্যত্র চেষ্টা দেখতে হবে। কেন, যখন প্রথম পাঠশালা খুলেছিলাম এ গাঁয়ে, তখন ত হিরণের অপেক্ষায় এখানে আসি নি, তবে সে থাকলো বা গেল—আমার তাতে কি আসে যায়?

মাসখানেক কেটে গিয়েছে। আমি কলের মত কাজ করে যাই, একদিন সামান্য একটু বাদলামত হয়েছে—পাঠশালার ছুটি দিয়ে সকাল-সকাল রান্না সেরে নেব ব'লে রান্নাঘরে ঢুকেছি, বেলা তখনও আছে। এমন সময় দোরের কাছে দেখি হিরণ্ময়ী এসে হাসিহাঁসি মুখে দাঁড়িয়েছে। আমি বিস্ময়মিশ্রিত খুশীর সুরে ব'লে উঠলাম—এস, এস হিরণ,—কখন এলে তুমি? ব'সো।

হিরণ্ময়ী বললে—কেমন আছেন আপনি? তার পর সে এগিয়ে এসে সলজ্জ আড়ষ্টতার সঙ্গে ঝপ্ ক'রে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'রে আবার সোজা হয়ে দোরের কাছে দাঁড়াল।

আমি এত খুশী হয়েছি তখন, ওকে কি বলবো ভেবেই পাই নে যেন। বললাম—ব'সো হিরণ, দাঁড়িয়ে কেন?

হিরণ্ময়ী বোধ হয় একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই এসেছিল, আমি ওর আসাটা কি চোখে দেখি—এ নিয়ে। আমার কথা শুনে—হাজার হোক্ নিতান্ত ছেলেমানুষ ত?—ও যেন ভরসা পেল। ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা পিঁড়ি পেতে বস্‌ল। আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি সেই শিখিয়ে দিলেন, 'মল পরিত্যাগ-প্রণালী' না কি? সব ভুলে গিয়েছি—হি-হি—

দেখলাম ওর বিয়ে হয় নি—ওকে আর কোন কথা বলি নি অবিশ্যি তা নিয়ে। দেনা-পাওনার ব্যাপার নিয়ে সে-সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছে—দু-চার দিনে অপরের মুখে শুনলাম। আবার হিরণ্ময়ী আমার পাঠশালাতে নিত্য আসে যায়—সন্ধ্যাবেলাতেও রোজ আসে—ঝড় হোক্, বৃষ্টি হোক্, তার সন্ধ্যায় আসা কামাই যাবে না। কেন তার মা এবার তাকে বকেন না—সে কথা আমি জানি নে—তবে বকেন না যে এটা আমি জানি।

বরং একদিন হিরণ্ময়ী বললে—আজ আলো জেলে

একটা বই পড়ছি, মা বললে আজ যে তুই তোর মাষ্টারের কাছে গেলি নে বড়? তাই এলুম, মাষ্টার মশায়। আমি বললাম—তা বেশ ত, গল্পের বই পড়লেই পারতে। মা না ব'লে দিলে ত আজ আসতে না?

কথাটা বলতে গিয়ে নিজের অলক্ষিতে একটা অভিমানের সুর বার হয়ে গেল—হিরণ্ময়ী সেটা বুঝতে পেরেছে অমনি! এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে এইটুকু বয়সে!—বললে—নিন্‌, আর রাগ করে না। ভেবে দেখুন, আপনিই না আমায় এখানে এলে তাড়িয়ে দিতেন আগে আগে?

দুঃখিত ভাবে বললাম—ছিঃ ও-কথা ব'লো না হিরণ, তাড়িয়ে আবার তোমায় দিয়েছি কবে? ও-কথাতে আমার মনে কষ্ট দেওয়া হয়।

হিরণ্ময়ী মুখে কাপড় দিয়ে খিল্‌ খিল্‌ ক'রে উচ্ছ্বসিত ছেলেমানুষী হাসির বন্যা এনে দিলে। ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগল—না—না দেন নি? ব'টে? একদিন—সেই—তাড়ালেন না! আজ আবার বলা হচ্ছে—পরে আমার সুরের নকল করতে চেষ্টা করে—'ওতে আমার মনে কষ্ট দেওয়া হয়'—কি মানুষ আপনি!—হি-হি-হি-হি—

আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর হাসিতে উদ্ভাসিত সুকুমার লাবণ্যভরা মুখের দিকে চেয়ে রইলাম—চোখ আর ফেরাতে পারি নে—কি অপূর্ব্ব হাসি! কি অপূর্ব্ব চোখ মুখের শ্রী!

যখন চোখ নামিয়ে নিলাম তখন সে আমার বেলুনটা তুলে নিয়ে রুটি বেলতে ব'সে গিয়েছে। সেদিন ও যখন চলে যায়, ঝোঁকের মাথায় অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেই ওকে আবার বললাম—এ রকম আর এস না, হিরণ। না সত্যি বলছি তুমি আর এস না।

মনকে খুব দৃঢ় ক'রে নিয়ে কথাটা ব'লে ফেলেই ওর মুখের দিকে চেয়ে আমার বুকের মধ্যে যেন একটা তীক্ষ্ণ তীর খচ্‌ ক'রে বিঁধলো। দেখলাম ও বুঝতে পারে নি আমি কেন একথা বলেছি—কি বোধ হয় দোষ ক'রে ফেলেছে ভেবে ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে উদ্বেগে ও ভয়ে।

আমার মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে রইল—যদি দুঃখের ভাবে কারণ কিছু বুঝতে পারে।—না-বুঝতে পেরে যাবার সময় দেখলাম শুষ্ক বিবর্ণ মুখে বললে—আমায় তাড়িয়ে দিলেন না? এই দেখুন—তাড়ালেন কি না।

দুঃখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। নিমগাছটার তলা দিয়ে ও ওই যাচ্ছে, এখনও বেশী দূর যায় নি, ডেকে দুটো মিষ্ট কথা বলব, ছেলেমানুষকে একটু সান্ত্বনা দেব?...

ডাকলুম শেষটা না-পেরে।—শোনো ও হিরণ—শোনো—

ও দাঁড়াল না—শুনেও শুনলে না, হন্‌হন্‌ ক'রে হেঁটে বাড়ি চলে গেল। পরদিন খুব সকালে উঠে বারান্দাতে ব'সে ব্রাউনিঙের A Soul's Tragedy পড়ছি—হিরণ এসে দাঁড়িয়ে বললে—কি কচ্ছেন?—এস, এস হিরণ। কাল তোমাকে ডাকলাম রাত্রে, এলে না কেন? তুমি বড় একগুঁয়ে মেয়ে—একবার শোনা উচিত ছিল না কি বলছি?

মুখরা বালিকা এবার নিজমূর্ত্তি ধরলে। বললে—আমি কি কুকুর না শেয়াল, দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবেন, আবার তু ক'রে ডাকলেই ছুটে আসব? আপনি বুঝি মনে ভাবেন আমার শরীরে ঘেন্না নেই, অপমান নেই—না? আমি বলতে এলাম সকালবেলা যে আপনার পাঠশালায় আমি পড়তে আসব না—মা অনেক দিন আগেই বারণ করেছিল—তবুও আসতাম, তাদের কথা না-শুনে। কিন্তু যখন আপনি কুকুর-শেয়ালের মত দূর ক'রে তাড়িয়ে—ওর চোখে জল ছাপিয়ে এসেছে—অথচ কি তেজ ও দর্পের সঙ্গে কথাগুলো বললে সে! আমি বাধা দিয়ে বললাম—আমায় ভুল বুঝো না ছিঃ হিরণ—আচ্ছা, চেঁচিও না বেশী, কেউ শুনলে কি ভাববে। আমার কথা শোন—রাগ করে না ছিঃ।

হিরণ দাঁড়াল না এক মুহূর্ত্ত। অতটুকু মেয়ের রাগ দেখে যেমন কৌতুক হ'ল, মনে তেমনই অত্যন্ত কষ্টও হ'ল। কেন মিথ্যে ওর মনে কষ্ট দিয়েছি কাল? আহা, বেচারী বড় দুঃখ ও আঘাত পেয়েছে। আমার জ্ঞান আর হবে কবে? ছেলেমানুষকে ও-কথাটা ও-ভাবে বলা আমার আদৌ উচিত হয় নি।

মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল—ভাবলাম, এ গ্রামের পাঠশালা তুলে দিয়ে অন্যত্র যাবই। এদিকে হিরণ্ময়ীও আর আমার পাঠশালাতে আসে না। মাসের বাকী আটটা দিন পড়িয়ে নিয়ে পাঠশালা তুলে দেব ঠিক ক'রে ফেললাম। সবাইকে বলেও রাখলাম কথাটা। আগে থেকে যাতে সবাই অন্য ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

য়ুরোপে স্ত্রীধর্ম্মনীতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার প্রেরিত বইখানি পেলুম।

পৃথিবীতে যুগান্তর এলো। তার লক্ষণ য়ুরোপে দেখা দিচ্ছে। কারণ য়ুরোপে মানুষ ভালোয় মন্দয় বেঁচে আছে সম্পূর্ণরূপে।

অতীত ইতিহাস যদি সন্ধান করি তবে দেখতে পাব, কী আর্থিক কী সামাজিক পদ্ধতি মানবসংসারে একটানা চ'লে আসে নি। এক মহাভারত আলোচনা করলে তার যত পরিচয় পাই তেমন কোনো একখানা বইয়ে পাওয়া যায় না। যে সব রীতি সব শেষে পরিণত হয়েচে তাই যে সব চেয়ে ভালো আমাদের চার দিকে চেয়ে দেখলে সে কথা মানা যায় না।

মানুষ অনেক প্রথা তৈরি ক'রে তুলেছে যা মোটের উপর [illegible], অথচ যা নানা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে দুঃখকর, এমন কি, মনুষ্যত্বের অপমানজনক। জীবনযাত্রা যখন সংকীর্ণ পরিধিতে স্তব্ধ হয়ে জটাবহুল ছিল না তখনকার প্রত্যেক রীতিনীতি ধর্ম্মের নামে সনাতন চেহারা ধারণ করবার শান্ত অবকাশ পেয়েছিল। যেখানে অবস্থা আজও প্রায় সেই রকমই অচঞ্চল, নব যুগের আবর্ত্ত যেখানে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নি সেখানকার স্থাবরতায় পুরাতন নীতির ভিত্তি কাঁপে নি—সেখানে অবস্থান্তরের তাণ্ডবনৃত্যে পুরাতন অনুশাসনপাশ ছিন্ন হয় নি। সেই অবস্থার ভাষায় অন্য অবস্থাকে বিচার করা চলে না।

য়ুরোপে আর্থিক নীতি অনেক দিন থেকেই বিশেষ পন্থায় চলছিল। সেখানে ধনসৃষ্টি ও ধনভোগে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাই ছিল প্রবল। তার প্রথম আঘাত লেগেছে গার্হস্থ্যে। গৃহযাত্রায় স্বভাবতই স্ত্রীপুরুষের অধিকারভাগ আছে। পুরুষের কর্ত্তব্য ধন আহরণ, মেয়ের কর্ত্তব্য সংসারের প্রয়োজনে তার ব্যয়ের ব্যবস্থা। মেয়েকে আর্থিক দিকে পুরুষের অধীন থাকতেই হয়। সেই অধীনতায় পুরুষের ইচ্ছা ও আদর্শের সঙ্গে নিজেকে নম্রভাবে না মেলাতে পারলে সে বাঁচেই না। কিছুকাল থেকে য়ুরোপে জীবনযাত্রার আদর্শ বহুব্যয়সাধ্য হওয়াতে পুরুষেরা অনেকেই স্ত্রীর দায়িত্ব স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। সেখানে ঘর ভেঙে বাসার বিস্তার বেড়ে চলেছে। মেয়েরা তাদের চিরকালের আশ্রয়চ্যুত হয়ে স্বয়ং জীবিকা-উপার্জ্জনে বাধ্য হয়েছে। আর্থিক স্বাতন্ত্র্য যে লাভ করে সে স্বভাবতই ভীরুভাবে পরের মন জোগায় না। পাশ্চাত্য মহাদেশে এই অর্থোপার্জ্জনরীতির বিপর্য্যয় ঘটাতেই ক্রমশই স্ত্রীধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তন স্বতই ঘটে আসছে। এর প্রভাব পুরুষের উপর পড়তেও বাধ্য। তারা অনেকেই গার্হস্থ্যের দায়িত্ববন্ধন থেকে মুক্ত, অপর পক্ষে বহুসংখ্যক মেয়েও তাই। এরা উভয়েই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চায়; অতএব এদের বিবাহ ঠিক কোন্ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে এই নিয়ে সে দেশে আন্দোলনের সীমা নেই।

এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিজ্ঞান—বিশেষত মনোবিজ্ঞান। স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় সমস্ত আব্রু সে খসিয়ে দিয়েছে। উপন্যাস নাটক রঙ্গভূমি সব জায়গাতেই মানব-প্রকৃতি আজ অনাবৃত। মানব-ইতিহাসের আদিযুগে দেহ ছিল নগ্ন। আজ মানুষের মনের রইল না বস্ত্র।

এমন সময় য়ুরোপে এল সর্ব্বনেশে এক যুদ্ধ। অতিকায় মৃত্যু এসে মানুষের মনকে দিয়েছে নির্লজ্জ নির্ম্মম ক'রে। সেই কয় বৎসর বহুসংখ্যক মানুষ এমন এক অনিত্যতার মধ্যে দিনযাপন করেছে যেখানে সে আজ আছে কাল নেই। মৃত্যু ব্যাপারটা যদিও চিরসত্য তবু মানুষ যখন সংসারযাত্রা করে তখন মৃত্যু যেন নেই এইভাবেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। মৃত্যুকে কাছে দেখা সত্ত্বেও মৃত্যুকে যদি ভুলে না থাকতে পারে তবে কোনো বিশ্বাস কোনো ব্যবস্থার উপরেই সে বাসা বাঁধতে পারে না। কিন্তু য়ুরোপে এত বৎসর ধরে

এত বিরাটরূপেই মৃত্যুকে সামনে রাখতে হয়েছে যে সংসারের সমস্ত স্থিতিপ্রবণ নীতির পরেই তার আস্থা গেছে শিথিল হয়ে। এই সমস্ত কারণ জড়িয়ে মানুষ আজ আপন অর্থব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা একেবারে মূলের থেকে পরখ ক'রে দেখতে প্রবৃত্ত। যখন মানুষের ছিল সম্পন্ন অবস্থা, তার ভোগের অধিকার ছিল ব্যাপক, তখন পুরাতন নিয়মকে নাড়া দিতে তার ভয় ছিল, পাছে কোনো জায়গায় তার আরামে তার ঐশ্বর্য্যে ভাঙন লাগে—আজ সেই ভয়ের দশা গেছে—যার যার পুরোনো আশ্রয়ের জীর্ণ ভিত্তি থেকে সবাই বেরিয়ে পড়ছে। নতুন ক'রে পরীক্ষা করবার ভয় আর রইল না কারো।

য়ুরোপে যে তোলাপাড়া চল্‌চে সে স্বভাবের নিয়মে, বহু লোককে নিয়ে—কেবল বইপড়া কয়েক জন চষমাপরা লেখক-পাঠকের সৌখীন বিচার নিয়ে নয়। ভীষণ তাদের আগ্রহ, রুশিয়ার দিকে তাকালেই তা দেখা যায়। এই আগ্রহ সম্ভবপর হ'ত না যদি নূতন অবস্থায় মানুষের কাছে একান্তভাবে ধরা না পড়ে থাকে যে, যে-সব বাঁধন একদা ছিল স্থিতির অনুকূলে, আজ তাতে স্থিতির সহায়তা আর করছে না কেবল তা বন্ধনরূপেই আছে। বলা বাহুল্য, সেখানেও সনাতনী আছে মানবস্বভাবে। সেও রীতিমাত্রকেই পবিত্র প্রত্যাদেশ ব'লে মানে। তাদেরকেও সমাজে প্রয়োজন আছে। পরখ করবার দিনে তাদের বিরুদ্ধতাও সত্যের পরিচয়ে সহায়তা করে।

আজ যুগান্তরের দিনে আমরা বইপড়া পণ্ডিতরা অপেক্ষাকৃত দূরে আছি। জিনিষটাকে কেউ বা দেখছি বন্ধমুক্ত প্রবৃত্তির দিক থেকে, কেউবা অন্ধদৃষ্টি সনাতনের মোহের থেকে। আমার মন বল্‌ছে, নিশ্চিত জানি নে মানুষ কী ক'রে আপন অপরিহার্য্য সমস্যার সমাধান করে—পাশ্চাত্যে সমূল সমাধানের যে প্রচণ্ড উদ্যম চলেছে সেটা শাস্ত্রিক নয়, সাহিত্যিক নয়, সেটা সামাজিক জীবনমৃত্যুর একান্ত প্রয়োজনঘটিত। যদি পরজন্ম থাকে, তবে পৌত্র হয়ে জন্মিয়ে তখন ফলাফল দেখে বিচার করব। ইতি ২১ এপ্রেল ১৯৩৩।

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[প্রবাসী সম্পাদককে লিখিত চিঠি]

মৃত্যু নাহি মম

শ্রীমলিনা হালদার

কবি কহে, মৃত্যু তার আপনার জন,
দুরাশার কুয়াশায় নিরাশ-স্বপন
নামে যবে তন্দ্রাহত ম্লান আঁখিপাতে
আলো-আঁধারের মাঝে; কঠোর আঘাতে
সচকিত হৃদে দেখে নাহি সূর্য্য তার,
চন্দ্র সেও কালো মেঘে ঢাকে বার-বার।
আসে যবে ধরণীর বিবাহ-লগন,
কবি কহে, মৃত্যু তার শ্যাম-সম ধন।
মিথ্যা কথা, কেবা কহে নাহি কিছু বড়
মৃত্যু চেয়ে? ভস্ম-স্তূপ হর্ষে করি জড়ো
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া মোর মহাদেব সম
জানাবো জগতজনে মৃত্যু নাহি মম।
প্রেমিক মরে না কভু, প্রেম সে অমর,
প্রেম যেথা নাহি সেথা মৃত্যু বাঁধে ঘর।

কুটীর-শিল্প ও বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগ

শ্রীকরুণাদাস গুহ, এম-এস্‌সি (লিভারপুল)

বাংলার নিজস্ব শিল্প বাঙালীর জীবন এবং সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কুটীরেই বেড়ে উঠেছে। বাংলার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলার শিল্পপ্রচেষ্টা একটা বিশিষ্ট আকার নিয়েছিল। তখন বাংলার প্রত্যেকটি গ্রাম ছিল স্বাবলম্বী। চাষীরা চাষ ক'রত, কুটীরে কুটীরে তখন চরকা চলত, গ্রামের তন্তুবায় সেই সুতো নিয়ে কাপড় বুনে দিত। গ্রামের চর্ম্মকার পাদুকা তৈরি ক'রত, গ্রামের কুম্ভকার প্রয়োজনীয় হাঁড়িকুড়ি ক'রে দিত। অনেক রকমের কর্ম্মকার থাকত গ্রামে, কেউ ক'রে দিত চাষবাসের জন্য লাঙ্গলের ফাল কোদালী দা কাস্তে ইত্যাদি, কেউ করত তামা-কাঁসার বাসনপত্র, কেউ বা গড়ত মেয়েদের অলঙ্কার—অলঙ্কারের প্রতি মেয়েদের দুর্ব্বলতাটা একেবারে প্রাগৈতিহাসিক কালের। গ্রামে গ্রামে সূত্রধর ছিল, তারা ঘর তৈরি করত, কৃষকদের লাঙ্গল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ক'রে দিত। কাঠের পাদুকা, আসবাবপত্র, নৌকা ইত্যাদিও তৈরি করত। কলুরা ঘানিতে তেল ক'রত, জেলেরা মাছ ধ'রত, গোয়ালারা ঘি দই ইত্যাদি ক'রত, পটুয়ারা ছবি আঁকত, বাদ্যকররা উৎসবের সময় ঢাক ঢোল সানাই ইত্যাদি বাজাত—তখন বাংলার পল্লীতে ম্যালেরিয়া ঢোকে নাই। তখন বাংলার ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুর-ভরা মাছ এবং বাঙালীর বুকভরা প্রাণ ছিল। তখন বাংলার কবি ছিলেন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব।

বাংলার সেদিন অনেক কাল চ'লে গেছে। বিভিন্ন ভাব এবং সভ্যতার সংঘাতে বাঙালীর জীবনপ্রণালীর সেই সহজ ভঙ্গীটি আজ আর দেখতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন সামাজিক গঠন আজ অনেক দিন হ'ল ভেঙে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে আমাদের কুটীর-শিল্পগুলিও। বাঙালী-জীবনের এই নতুন অভাববোধকে পূরণ করতে আমাদের সেই পুরনো কুটীর-শিল্প আজ অক্ষম। অভাবপূরণ-হিসাবে বাংলার গ্রামের স্বাবলম্বন এখন ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে।

বাঙালীর জীবন-তরী চলেছিল ভাটিয়াল সুরে। চলতে চলতে হঠাৎ ধাক্কা খেল সে পাশ্চাত্য সভ্যতার বাষ্পীয়পোতের সঙ্গে। সব ওলট-পালট হয়ে গেল। পাশ্চাত্য সভ্যতা হ'ল বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক সভ্যতা—গতির সভ্যতা। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সেই সভ্যতার গতির ঘূর্ণিপাকের মধ্যে আমরা এসে পড়েছি। আজ নিরালা পল্লীর শ্যামলিমার মধ্যে বাংলার তালগাছ-ঘেরা পুকুরপাড়ে শীতলপাটিকে আশ্রয় ক'রে পুরাতনের সাধনা অসাধ্য হয়ে উঠেছে। জীবনসংগ্রাম চার দিক থেকে ঘনীভূত হয়ে উঠছে, একটু বসবার অবকাশ নাই, কেবল গতি আর গতি। বিজ্ঞান পৃথিবীর সমস্ত বিভিন্নতাকে একত্বের দিকে নিয়ে আসছে, কোনও জাতিই আজ এর হাত থেকে নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে পারবে না,—এটা যুগধর্ম্ম। আমাদেরও চলতে হবে। নইলে যারা আজ চলছে তাদের পায়ের নীচে আমরা ধূলি হয়ে যাব।

পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি মূলসূত্র হ'ল অর্থনীতি। ইহাকে প্রধানতঃ বণিক-সভ্যতাও বলা চলে। ইহার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎও আমাদের বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশসমূহ শিল্প ও বাণিজ্যে যে বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছে সেটা হ'ল ব্যাপক ভাবে উৎপাদন (mass production) ও কেন্দ্রীকরণ (centralization)। এই পন্থা অবলম্বন ক'রে পাশ্চাত্য দেশসমূহ বিপুল অর্থের অধিকারী হয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে অনর্থও যে না এসেছে তা নয়, সমস্ত পৃথিবী আজ ধনিক ও শ্রমিক স্বার্থের টানা-হেঁচড়ায় বীভৎসতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সে যাই হোক, পাশ্চাত্য পন্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাংলার অসংবদ্ধ কুটীর-শিল্প বিশেষভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। কতকগুলি বিশেষ শিল্প—যেমন ঢাকার মসলিন, বিলুপ্ত হয়ে

গেছে। আর যে-সব শিল্প এখনও আছে তাদের অধিকাংশেরই অবস্থা অতীব শোচনীয়। শীঘ্রই উন্নত প্রণালী ও শুল্কের সাহায্য না-পেলে পঞ্চত্বলাভ ছাড়া বাজারে তাদের আর কোনও লাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

গত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ বাংলা দেশে পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিদেশী ও দেশী মূলধনে অনেক বড় বড় কল-কারখানাই হয়েছে। কিন্তু এতে বাংলার সর্ব্বসাধারণের সমৃদ্ধির দিক থেকে বিশেষ কল্যাণ হয়েছে ব'লে মনে হয় না। বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। এখন প্রশ্ন হ'ল কুটীর-শিল্পকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন ক'রে তার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা, না অর্দ্ধমৃত কুটীর-শিল্পগুলিকে যথারীতি সৎকার ক'রে তার স্থানে বড় বড় কলকারখানা স্থাপন করা। এই সমস্যা মীমাংসার পূর্ব্বে বাংলা দেশের বর্ত্তমান অবস্থাটা একটু আলোচনা করা যাক।

১৯৩১ সনের সেন্সস বা আদমসুমারীতে করদ-রাজ্য বাদে বাংলার লোকসংখ্যা ছিল ৫০,১১৪,০০০ (পাঁচ কোটী এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার)। তার মধ্যে—

উপার্জ্জক— ১৩,৭৫০,০০০

কর্ম্মী পোষ্য (Working dependent) ৬৬৩,০০০

মোট কর্ম্মী—১৪,৪১৩,০০০ (এক কোটী চুয়াল্লিশ লক্ষ তের হাজার)

অর্থাৎ মোট লোকসংখ্যার মধ্যে শতকরা মাত্র ২৯ জন কাজ করে আর বাকী ৭১ জন পোষ্য। ১৯২১ সনের আদমসুমারীতে দেখিতে পাই শতকরা ৩৫ জন কর্ম্মী ও বাকী ৬৫ জন পোষ্য। বাংলার বেকার-সমস্যা যে ক্রমশঃ অতীব গুরুতর আকার ধারণ করছে বা পূর্ব্বেই করেছে সে-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে বাংলার কর্ম্মক্ষম লোকসংখ্যা ২৩,০০০,০০০ (দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ), তার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী অর্থাৎ ৮,০৫০,০০০ (আশী লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) লোক সম্পূর্ণ বেকার। বেকারের এই বিরাট বাহিনী দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

বাংলা দেশের শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক কৃষিজীবী। কৃষির উপরেই বাংলার জীবন-মরণ নির্ভর করে। কিন্তু এই কৃষির অবস্থাও অতীব শোচনীয়। জন-প্রতি কৃষকের ভাগে জমীর পরিমাণ অতি কম। যে জমী এক জন লোক চাষ ক'রতে পারে সেখানে আজ পাঁচ জন লোক নিযুক্ত আছে। লাভও সেই পরিমাণে জন-প্রতি এক-পঞ্চমাংশ হয়ে গেছে। তা ছাড়া বাংলার কৃষকদের বৎসরে প্রায় নয় মাস ব'সে থাকতে হয়। বর্ত্তমানে পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুরবস্থার জন্য কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অসম্ভব রকম কমে যাওয়ায় বাংলার আর্থিক জীবন প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। কৃষকদের ক্রয় করবার ক্ষমতা প্রায় অক্ষমতার সীমায় এসে পৌঁছেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও অসম্ভব রকম কমে গেছে। কৃষকদের আয়ের পথ বাড়িয়ে তাদের ক্রয় করবার ক্ষমতা বৃদ্ধির উপরেই দেশের শিল্প ও আর্থিক উন্নতি নির্ভর করছে।

এই ত গেল কৃষকদের অবস্থা। এ ছাড়া বর্ত্তমানে আর একটি জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, সেটা হ'ল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের বেকার-সমস্যা। স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে বাঙালী যুবক আজ চারি দিক অন্ধকার দেখছে। চাকরির আশা দুরাশা হয়ে উঠেছে। চার দিকে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলা দেশ কৃষিসর্ব্বস্ব দেশ। কিন্তু কোন রাষ্ট্রই কেবল মাত্র কৃষির সাহায্যে তার অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না। কৃষি ও শিল্প এই দুয়ের সামঞ্জস্যের ওপরেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য নির্ভর করে। এই অসামঞ্জস্যতার জন্যই বাংলার আজ এই দুরবস্থার দিনে কুটীর-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা এমন ভাবে অনুভূত হচ্ছে।

সামাজিক প্রথা ও লোকের মানসিক গড়নের উপরই জাতীয় শিল্পানুষ্ঠানের প্রকার ও কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে। গত ৫০ বছরের অভিজ্ঞতায় মনে হয় বাঙালী বড় বড় কল-কারখানার চেয়ে কুটীর-শিল্পকেই বেশী ভালবাসে। ১৯২১ সনের আদমসুমারীতে দেখতে পাওয়া যায়, বাংলার বড় বড় কলকারখানাতে প্রায় ১৭০,০০০ (এক লক্ষ সত্তর হাজার) দক্ষ কারিগর কাজ ক'রত, তার মধ্যে বাঙালী ছিল মাত্র ৭১,০০০ (একাত্তর হাজার) জন, অর্থাৎ শতকরা ৪২ জনেরও কম। অবশ্য এমন অনেক শিল্প আছে যা বড় বড়

কলকারখানাতেই কেবল করা সম্ভব, যেমন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। তা ছাড়া আর প্রায় সব প্রয়োজনীয় জিনিষই অল্প-বিস্তর কুটীর-শিল্প হিসাবে করা চলে এবং শিল্পে শিক্ষা ও দক্ষতা অনুসারে নানা প্রকারের দ্রব্য তৈরি ক'রে কৃষক তার বৎসরের কর্ম্মহীন নয় মাস এবং বেকার তার বৎসরের কর্ম্মহীন বার মাসকে উর্ব্বর ক'রে তুলতে পারে।

আমি প্রথমেই বলেছি বাংলার সভ্যতা, সমাজ ও প্রতিভার সঙ্গে কুটীর-শিল্পের একটা নাড়ীর যোগ আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিশেষ বিধ্বস্ত হ'লেও বাংলা দেশ যৌথ-পরিবারের দেশ। যৌথ-পরিবার ভাল কি মন্দ সে বিচারের স্থান এ নয়। যৌথ-পরিবারে আর যাই থাক আলস্য এবং দায়িত্বহীনতার প্রশ্রয় যে সেখানে অনেকটা হয় তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। পরিবারের একটি প্রাণী হয়ত রাত-দিন ক্রীতদাসের মত খাটছে আর তার উপর কর্ম্মক্ষম আত্মীয়েরা ব'সে ব'সে খাচ্ছে—এ দৃশ্য বাংলার ঘরে ঘরে। নানা প্রকার কুটীর-শিল্পকে সহজসাধ্য ক'রে তুলে বাংলার দুয়ারে দুয়ারে নিয়ে যেতে হবে—একান্নভুক্ত প্রত্যেক বাঙালীই যাতে নিজান্নভুক্তের মর্য্যাদা পেতে পারে; ব'সে থাকবার সব যুক্তিই যাতে অচল হয়। এদিক থেকে আজ কুটীর-শিল্পের প্রয়োজন বাঙালীর আর্থিক জীবনে সবচেয়ে বেশী। এই জন্যই আজ বাংলা-সরকার বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগের সাহায্যে কুটীর-শিল্পের উন্নতিসাধনে এমন তৎপর হয়ে উঠেছেন।

দেশী ও বিদেশী কলকারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রেও আজ যে সব কুটীর-শিল্প—বিশেষ ক'রে বয়নশিল্প, বাংলায় বেঁচে আছে তাতেই প্রমাণ হয় বাংলার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে এর একটা বিশেষ সঙ্গতি আছে। আজও বাংলা দেশে হাতের তাঁতের কাজে পাঁচ লক্ষেরও বেশী লোক নিযুক্ত আছে এবং সেই সম্পর্কে আরও বহু লোক প্রতিপালিত হচ্ছে।

আমরা বৈজ্ঞানিক যুগে বাস ক'রছি। প্রতি দিনের গবেষণা ও আবিষ্কার মানুষের হাতে নতুন নতুন যন্ত্র নতুন নতুন কৌশল তুলে দিচ্ছে। বাংলার কুটীর-শিল্পকেও আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে এবং সেই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের উপরেই কুটীর-শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আজ কয়েক বছর হ'ল বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগ পাগলাডাঙাতে একটি গবেষণাগার স্থাপন করেছেন। শিল্প-বিভাগের এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্র, রাসায়নিক শ্রীযুক্ত রসিক-লাল দত্ত ও চর্ম্ম-পারদর্শী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দাসের তত্ত্বাবধানে বিশেষ গবেষণা চলছে এবং তাঁদের সাফল্য ইতিমধ্যেই নানা কুটীর-শিল্পকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেছে। এ ছাড়া বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগের অন্তর্গত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় শ্রীরামপুরের বয়ন-বিদ্যালয় দেশের কারিগর ও শিক্ষিত যুবকদের উন্নত প্রণালীর বয়ন ও রং-করা শিক্ষা দিয়ে বাংলা দেশের বয়ন-শিল্পকে উন্নত করার চেষ্টা ক'রছেন। বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলার বয়নশিল্প তার বর্ত্তমান সাফল্যের জন্য শ্রীরামপুরের শিক্ষার কাছেই সম্পূর্ণভাবে ঋণী।

বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা কুটীর-শিল্পের প্রচার ও উন্নতির পথে বিশেষ কয়েকটি বাধা লক্ষ্য করেছি, যথা—

(১) কুটীর-শিল্পে অভ্যাস ও উৎসাহের অভাব।

(২) শিল্পকার্য্যে উপযুক্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাব।

(৩) বড় বড় কলকারখানায় প্রস্তুত সস্তা জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা।

(৪) মহাজন ও বেপারীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত টাকা-পয়সার অভাব।

(৫) আধুনিক উন্নত প্রণালীর ছোট ছোট যন্ত্রপাতির অপ্রচলন।

(৬) উপযুক্ত বিজ্ঞাপন এবং শিল্পজাত জিনিষ সম্বন্ধে প্রচারকার্য্যের অভাব বা অজ্ঞতা।

(৭) বাজারের অবস্থা এবং চাহিদা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা এবং শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রীর সুবন্দোবস্তের অভাব।

বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বা ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এ. টি. ওয়েষ্টনের অধীনে শিল্প-বিভাগ উক্ত সমস্যা-গুলির সমাধানে বিশেষরূপে অগ্রসর হয়েছেন। উন্নত প্রণালীর তাঁতের প্রচলন এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রং-করা শিক্ষা দিয়ে শিল্প-বিভাগ বাংলার বয়নশিল্পকে অনেকটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন

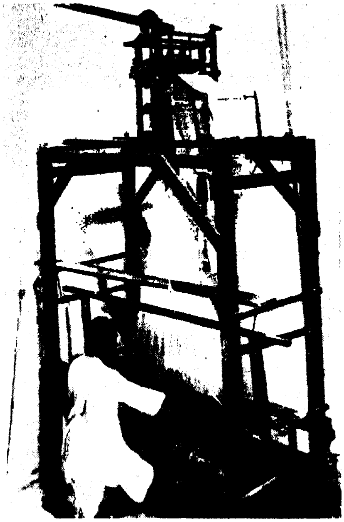
করেছেন। আপনারা হয়ত অনেকেই জানেন না যে, পাবনা জেলার সাহজাদপুর, এনায়েৎপুর, নদীয়া জেলার শান্তিপুর, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, ঢাকা জেলার কুমারভোগ, কাজিরপাগলা ইত্যাদি স্থানের বয়নশিল্পের আজকের এই অপ্রত্যাশিত সাফল্য শিল্প-বিভাগের একান্ত চেষ্টারই ফল। শিল্প-বিভাগের ভ্রাম্যমাণ (peripetitic) বয়ন-বিদ্যালয়গুলি ঐ সব স্থানে গিয়ে অনেক দিন ধ'রে কুটীর-কর্ম্মীদের উন্নত প্রণালীর তাঁতে কাজ এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে রং-করা শিক্ষা দিয়েছে। তাই কিছুদিন আগে যেখানে অতি সেকেলে ধরণের কয়েকটা হাতের তাঁত চলত আজ সেখানে শত শত উন্নত প্রণালীর তাঁতে (fly-shuttle এবং Jacquardএ) নানা ধরণের কাপড় হয়ে বাংলার বাজার ছেয়ে ফেলছে।

গত দেড় বছরের মধ্যে শিল্প-সংক্রান্ত কাজে আমাকে অনেকবার পাবনা জেলায় যেতে হয়েছিল। পাবনার শিল্পকেন্দ্রগুলি—বিশেষ ক'রে বয়নশিল্পের কেন্দ্রগুলি, এবং তাদের কর্ম্মপদ্ধতি আমি একাধিকবার পরিদর্শন করেছি। গৃহের আবেষ্টনের মধ্যে নিজের পরিবারের লোক নিয়ে কুটীর-শিল্পের কাজে এবং যন্ত্রপরিবেষ্টিত একঘেয়ে কারখানার কাজে কি পার্থক্য। ইউরোপের অনেক বড় বড় কারখানা দেখবারও সুযোগ আমার হয়েছিল। জার্ম্মেনীর ক্রুপ, ম্যানচেষ্টারের কাপড়ের কলগুলি, রঙের কারখানা, ফোর্ডের শাখা-কারখানা, পোর্ট সানলাইটের সাবানের কারখানা, ইত্যাদি অনেক দেখেছি। সে-সব কারখানায় একান্ত বিশেষজ্ঞতা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্য্যকরী হলেও কর্ম্মীকে শিল্পের সমগ্রতার সৌন্দর্য্য ও আনন্দ দিতে পারে না। ফোর্ডের কারখানায় জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম গত দশ বছর হ'ল একটা লোক মোটর গাড়ীর স্থানবিশেষে কেবল স্ক্রু টিপে দিচ্ছে। স্ক্রু-টেপার ব্যাপারে সে হয়ত অতিপূর্ণতা লাভ করেছে, কিন্তু কর্ম্মের যে আনন্দ আছে, এ ধরণের কাজে তা পাওয়া যায় ব'লে মনে হয় না। ফোর্ডের কারখানায় মানুষকে একেবারে যন্ত্র ক'রে তোলার সাফল্য দেখে মনটা এত দমে গিয়েছিল তা আর কি বলব। একঘেয়ে কাজের বৈচিত্র্যহীনতার জন্যই মনে হয় কারখানার কর্ম্মীদের মন ও চরিত্রে স্বাতন্ত্র্য এত অভাব। পাবনা জেলার কুটীর-কর্ম্মীদের মধ্যে সেই স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য দেখলাম।

কিছুদিন আগে থেকেই দুইটি ভ্রাম্যমাণ বয়ন-বিদ্যালয় উক্ত জেলায় কাজ ক'রছিল। তাদের সাফল্য অভূতপূর্ব্ব। বর্ত্তমানে সমস্ত জেলায় প্রায় বিশ হাজার তাঁত চলছে। কেউ কৃষিকার্য্যের অবসরে তাঁত চালায়, কারও বা তাঁতের কাজই একমাত্র অবলম্বন। এই বিশ হাজার তাঁতের মধ্যে উন্নত ধরণের তাঁত (fly-shuttle এবং Jacquard) প্রায় পাঁচ হাজার এবং তার সবগুলিই শিল্প-বিভাগের চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত হয়েছে। সাহজাদপুরে হোসেন আলী নামে একটি লোক কয়েক বছর আগে শিল্প-বিভাগের ভ্রাম্যমাণ বয়ন-বিদ্যালয় থেকে উন্নত প্রণালীর কাজ শিখে প্রথমে মাত্র দুইখানি তাঁত নিয়ে কাজ আরম্ভ করে। আজ চার-পাঁচ বছরের মধ্যে সে প্রায় দুই শত তাঁতের মালিক হয়েছে। বাংলা দেশে এখনও এরূপ বহু হোসেন আলীর স্থান আছে। এই আর্থিক দুর্দ্দিনেও পল্লীতে পল্লীতে কারিগরদের মুখের হাসি ও মাথায় তেলের প্রাচুর্য্য তাদের ব্যবসায়ের সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করছে। এখানে ম্যাঞ্চেষ্টার, বোম্বাই, আমেদাবাদ, কলকাতা, এমন কি জাপানও হার মেনেছে। কুটীর-কর্ম্মীরা অনেকে এখনও মহাজনের হাত থেকে রক্ষা পায় নাই বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে বোম্বায়ের মিল-ওয়ালাদের মত ধর্ম্মঘটের ভয়ও তাদের নাই।

ভ্রাম্যমাণ বয়ন-বিদ্যালয় ছাড়া বাংলা-সরকার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের বেকার-সমস্যার যথাসাধ্য সমাধানের জন্য উন্নত প্রণালীর কুটীর-শিল্প প্রচলনের যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তাতেও আট রকমের ভ্রাম্যমাণ শিল্প-বিদ্যালয় গত দেড় বছর হ'ল বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে কাজ করছে। ইতিমধ্যেই বহু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক এই সব বিদ্যালয়ে ছয় মাস থেকে এক বছর পর্য্যন্ত বিনা-বেতনে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে নানা শিল্প শিক্ষা ক'রে নিজেরা ছোটখাট কারখানা করেছে এবং চারদিক থেকেই তাদের কাজের সাফল্যের কথা শোনা যাচ্ছে। এই সম্পর্কে আপাততঃ যে আটটি শিল্প শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাদের নাম :—

(১) সাবান প্রস্তুত করা—রাসায়নিক ডাঃ রসিক লাল দত্ত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে।



উন্নত প্রণালীর জ্যাকার্ড তাঁত



উন্নত প্রণালীর ঠক্‌ঠকি তাঁত

(২) জুতা প্রস্তুত করা—চর্ম্ম-পারদর্শী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দাস মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে।

(৩) নক্‌শাদার পশমী কাপড় বয়ন করা।

(৪) পাট রং-করা এবং তা থেকে নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য বয়ন করা—বয়ন-পরিদর্শক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে।

(৫) ছাতা তৈরি করা।

(৬) ছুরি কাঁচি ইত্যাদি ইস্পাতের জিনিষ তৈরি করা।

(৭) পিতল-কাঁসার জিনিষ তৈরি করা।

(৮) উন্নত চাকে মাটির জিনিষ তৈরি ক'রে উন্নত পোয়ানে বা পাঁজায় পুড়িয়ে নেওয়া।

এই শেষোক্ত চারটি শিল্প এঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। উক্ত আটটি কুটীর-শিল্পের মধ্যে দুইটি বয়ন-শিল্প এবং জুতা প্রস্তুত করা বাদে বাকী পাঁচটি শিল্প কলিকাতার কেনাল সাউথ রোডে শিল্প-বিভাগের গবেষণাগারেও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষ গবেষণা দ্বারা এই সব শিল্প বাংলা দেশে লাভজনক ব'লে বিবেচিত হয়েছে এবং এই আটটি শিল্পের প্রত্যেকটি শিক্ষা দেওয়ার জন্য চার জন ক'রে শিক্ষক-দল নিয়ে ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয় গঠন করা হয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপর এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শিল্প-বিভাগের এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর উদ্ভাবিত ছাতার বাঁটে নানারূপ চিত্র করার কল, মাটির জিনিষ তৈরি করার উন্নত চাক এবং কাঁসার পরিবর্ত্তে সেই গুণেরই অথচ সস্তা একটি নূতন মিশ্র-ধাতুর প্রবর্ত্তন কুটীর-শিল্পে বিশেষ দান।

গিরিডির ঔপনিবেশিক বাঙালী এবং ব্যবসা-বাণিজ্য

শ্রীসরোজকুমার দে ও শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

ছোটনাগপুরের স্বাস্থ্যকর স্থানসমূহের মধ্যে গিরিডি* অন্যতম। ইহা হাজারীবাগ জেলার একটি মহকুমা শহর। গিরিডিকে "কুরহর বাড়ী" নামেও অভিহিত হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে ইহা খড়কডিহা জেলার অন্তর্গত ছিল; এখন খড়কডিহা নামে পৃথক কোন জেলার অস্তিত্ব না থাকিলেও, ইহা খড়কডিহা পরগণার অন্তর্ভুক্ত বটে। কলিকাতা হইতে গিরিডির দূরত্ব দুই শত ছয় মাইল মাত্র। সাগরাম্বুরেখা (sea-level) হইতে ইহার উচ্চতা এক হাজার ফুট। গিরিডির উত্তরে উস্রী নামক পার্ব্বত্য নদী, দক্ষিণে কুলডিহা, পূর্ব্বে বারওয়াডী ও জরিয়াগাদী গ্রামদ্বয় ও পশ্চিমে পচম্বা। ইহাই বর্ত্তমান গিরিডির মিউনিসিপ্যাল সীমানা। ইহার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ২১,২১৬। জরিপ-বিভাগের ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্রে গিরিডির নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। গিরিডির তৎকালীন টীকাইৎ (দেশীয় জমিদার) ছিলেন পচম্বার ৺সিদ্ধনাথ সিংহ। কয়লা-খনির দিগন্তপ্রসারী সুবিস্তীর্ণ জমিগুলি তিনি গভর্ণমেণ্টকে মাত্র নয় লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন। গভর্ণমেণ্ট ঐ জমি ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানীকে বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকা খাজনায় ইজারা দেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কয়লাখনি আবিষ্কৃত হয় ও সেই সঙ্গেই গিরিডিতে রেলপথ স্থাপনার সূত্রপাত হয়। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর আবশ্যক সমুদয় কয়লা অদ্যাবধি এই স্থান হইতেই সরবরাহ হইয়া থাকে।

তৎকালে গিরিডি গহন অরণ্যে পরিবৃত ছিল। রেল কোম্পানীর চাকুরী লইয়া প্রথমে কয়েক ঘর বাঙালী পরিবার মকতপুরা নামক স্থানে আসিয়া বসবাস করেন। এখন যে-স্থানে মকতপুরার বাজার বসে, সেই স্থান হইতে বর্ত্তমান "পুরাতন কুটীর" ("Oldest Cottage") নাম বাটী অবধি বিস্তৃত ভূভাগেই বাঙালীরা প্রথম উপনিবে স্থাপন করেন। বহু স্বাস্থ্যান্বেষী অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী ভদ্রলোক এই স্বাস্থ্যকর স্থানটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া এখ এই স্থানে মনোরম উদ্যানবেষ্টিত সুদৃশ্য বাটী নির্ম্মাণ করি স্থানটিকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বে সেই জঙ্গলাবৃ স্থানে দিনমানেও লোকচলাচল নিরাপদ ছিল না। এ-বিষ একটি কৌতুকাবহ সত্যঘটনামূলক জনশ্রুতি আছে সে-সময় গিরিডিতে নারো রায় নামক এক দুর্দ্দান্ত দেশী ঘাটোয়ার দস্যুর ভয়ানক অত্যাচারে জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হই থাকিত। তৎকালীন নবাগত বাঙালীদের সহিত এ দস্যুর এক রফা হয় যে প্রত্যেকে তাহাকে মাসিক কিছু কি অর্থদান করিলে সে বাঙালীদের উপর কোন অত্যাচা করিবে না। ৺মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন কয়লা খনিতে নেটিভ ইনস্পেক্টর-রূপে কার্য্য করিতেন। একদি কার্য্যান্তে গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে মস্তকে সহ গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ধরাশায়ী হন; স্বগৃ নীত হইবার পর তাঁহার চেতনা হইলে নারো রায় আসি তাঁহার নিকট তাহার ভ্রম স্বীকার করিয়া অপরাধের জ ক্ষমা প্রার্থনা করে। দস্যু হইলেও তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ছি সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই নারো রায় অমিতবিক্রমশালী ছিল। একবার নাকি সে গ্রেপ্তার হইয়া পুলিশ-পাহারা রেলে করিয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হইতেছিল। হস্তপ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও উস্রীনদীর উপর গাড়ী পৌঁছিবামাত্র, সে সেই বদ্ধ অবস্থায় প্রহরীদের প্রহার করি চলন্ত গাড়ী হইতে লম্ফপ্রদানে নদীমধ্যে পতিত হয় নিমেষমধ্যে প্রস্তরাঘাতে হস্তপদের শৃঙ্খল মোচন করি

* কেহ কেহ এই স্থানটির নাম গিরিধি লেখেন। তাহা ভুল। ইহার নাম গিরিডি—গিরিডিহি বা গিরিডিহ হইতে উৎপন্ন। ডিহি শব্দ বঙ্গের আরও অনেক স্থানের নামে পাওয়া যায়। ডিহির অর্থ, "গ্রামসমষ্টি; কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে একটি মৌজা হয়, কয়েকটি মৌজায় একটি ডিহি হয়।"—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'।

পলায়ন করে। পরে অবশ্য এক 'বাটোয়ার' জমিদার তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া গভর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন ও সেই সময় হইতে দস্যুর অত্যাচারও দূর হয়। বর্ত্তমান কাছারিবাটীর অনতিদূরে এই দস্যুর গৃহ ছিল।

যাহা হউক, কয়লাখনি ও রেলপথ বিস্তৃতির সহিত ক্রমশঃ এই স্থানে একটি জনপদ গড়িয়া উঠে। বাঙালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এইস্থানে আগমন করেন ৺রাখালচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়। তখন তিনি রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টার ছিলেন। তাঁহার আদিনিবাস খন্নেন ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ইটেচোনা গ্রামে। পরে তিনি গিরিডিতে বাড়িঘর করিয়া স্থায়ী বসবাস করেন। স্থানীয় উচ্চ-ইংরেজী বালক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁহার উদ্যোগ ছিল। তাঁহার পুত্র ৺গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু মহাশয় বহু বৎসর যাবৎ গিরিডির অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বারগণ্ডার নিকট উশ্রী নদীর অপর তীর হইতে খান্ডুলি পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সির্সিয়া নামক সুবিস্তীর্ণ জমিদারী গোষ্ঠবাবু ক্রয় করেন। সাধারণের সুবিধার জন্য উশ্রীর উপর তারের একটি দোলায়মান সেতু তিনি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন ও স্থানীয় হাসপাতাল-বাটী নির্ম্মাণকল্পে অর্থসাহায্য করেন। এখন তাঁহার পুত্র শ্রীযুত ক্ষিতীন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয় জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। গিরিডিতে বাঙালী গৃহস্থবাটীর মধ্যে একমাত্র ইঁহাদের বাটীতেই দুর্গোৎসব হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান গিরিডির ক্রমোন্নতির ইতিহাস লিখিতে হইলে যাঁহাদের কথা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়, সেই লোকহিত-ব্রতী উদ্যমশীল ব্যক্তিদিগের বিষয়ে কিছু লিখিতেছি।

৺তিনকড়ি বসু মহাশয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে গিরিডিতে আসিয়া পচম্বায় বাস করিতে থাকেন। তাঁহার আদিনিবাস হুগলী দশঘরা গ্রামে। সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠায় তাঁহার যথেষ্ট উদ্যোগ ছিল। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার উদারতা ছিল অনন্যসাধারণ। ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠা প্রথমে তাঁহারই পচম্বাস্থিত গৃহে হয়, যদিও তিনি নিজে হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় হইতে প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের পাকা বাটী স্থাপিত হয়। র‍্যাট্রে দাতব্য চিকিৎসালয়ের (Rattray Charitable Hospital) প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও তিনি অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন। স্থানীয় উচ্চ-ইংরেজী বালক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ও তাঁহার সাহায্য নিতান্ত সামান্য ছিল না। তিনি এই জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর রাজ-এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ধানওয়ার-রাজ-এষ্টেটের ম্যানেজার রূপেও তিনি কিছুদিন কার্য্য



উশ্রী নদীর উপর দোলায়মান তারের পুল

করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তি-বর্গের চেষ্টায় সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের পার্শ্বে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ উক্ত সমাজের প্রচারকগণের বাসের জন্য "৺তিনকড়ি বসু প্রচারক আশ্রম" নামে একটি একতলা পাকা বাটী প্রায় পাঁচ ছয়-বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি এই স্থানে জমি ক্রয় ও নিজস্ব বাড়ি-ঘর করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু মহাশয়ও পিতার ন্যায় ধানওয়ার রাজ-এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন; এখন অবসর লইয়া গিরিডিতে বাস করিতেছেন।

৺ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর গ্রাম হইতে এই স্থানে উচ্চ-ইংরেজী বালক-বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক রূপে আগমন করেন ও পরে ঐ কার্য্য ত্যাগ করিয়া এই স্থানেই ওকালতি করিতে থাকেন। র‍্যাট্রে দাতব্য চিকিৎসালয় ও সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণকল্পে তিনি অর্থসাহায্য করেন। স্বয়ং হিন্দুসমাজভুক্ত হইলেও সকল ধর্ম্মেই তাঁহার সমান শ্রদ্ধা ছিল। সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিত। পচম্বা

রোডের উপর বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি গিরিডিতে স্থায়ী ভাবে বাস করেন। পরে ধরমপুর নামে একখানি মৌজাও ক্রয় করেন। একাদিক্রমে প্রায় চল্লিশ বৎসর এই স্থানে বাস করিবার পর পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই স্থানের অন্যতম য্যাডভোকেট ও স্থানীয় ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর।

শ্রীযুত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ এইস্থানে বাস করিতেছেন। কলিকাতা আহিরী-



উশ্রী জলপ্রপাত

টোলায় ইঁহার আদিনিবাস। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইনি অভ্রের ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হওয়ায় ও ব্যবসায়ে ইঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ একমাত্র উপযুক্ত পুত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ইঁহার ব্যবসায়ে লোকসান হয় ও পরে ইনি অভ্রের কার্য্য ছাড়িয়া দেন। ইনি বহুকাল সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে গিরিডিতে ইনিই সর্ব্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। স্থানীয় বঙ্গশিশুবিদ্যালয় ও উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়ের সংস্থাপকদিগের মধ্যে ইনি অন্যতম। অতি অমায়িক ও বিনয়ী পুরুষ; ইঁহার বয়স এখন তিয়াত্তর বৎসর।

শ্রীযুক্ত শক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানে প্রবাসী হন। ইনি এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রধান উকীল। পচম্বা-রোডের উপর শক্তিকণ্ঠ বাবুর বৃহৎ অট্টালিকা ব্যবসায়ে ইঁহার সাফল্যের সাক্ষ্য দেয়। স্বীয় গুণে ইনি প্রভূত সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। লোকহিতকর প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের সহিতই ইঁহার যোগ আছে। বর্ত্তমান সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির স্থাপনার সময়ে ইনি সাহায্যকারীদিগের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন। উচ্চ-ইংরেজী বালক-বিদ্যালয়ের বাটী-নির্ম্মাণকল্পেও ইনি যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেন। উকীল-লাইব্রেরী-প্রতিষ্ঠায় ইঁহার বিশেষ উদ্যোগ ছিল। ইনি গিরিডি মিউনিসি-প্যালিটীর প্রথম ভাইস্-চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন।

৺রাজকৃষ্ণ সাহানা মহাশয় বাঙালী অভ্রব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই স্থানে আগমন করেন। ইঁহাদের অভ্রের খনি কোডার্ম্মায় অবস্থিত। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয় বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য। ৺রাজকৃষ্ণ বাবুর এই স্থানে অনেকগুলি বাড়িঘর আছে। ইঁহাদের বসতবাটী হাজারিবাগ রোডের উপর অবস্থিত। র‍্যাট্রে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় ইনি সাহায্য করেন। পুরাতন প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে ইনি অন্যতম।

৺রাখালচন্দ্র তা মহাশয় প্রথমে রেলওয়ে কন্‌ট্রাক্টররূপে এই স্থানে আসেন; পরে কয়লার ব্যবসায় করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। গিরিডিতে ইনি বাড়িঘর করিয়া গিয়াছেন। 'লতাবৈহার' নামে একটি মৌজাও ইনি ক্রয় করেন। ইঁহার পুত্রের একটি মুদির দোকান আছে।

৺গদাধরচন্দ্র রায় মহাশয় বাঁকুড়া হইতে আসিয়াছিলেন। কথিত আছে তাঁহার কাকা ৺প্রসন্ন বাবু প্রথমে গরুর গাড়ী করিয়া বাঁকুড়া হইতে এই স্থানে আসেন। ৺গদাধর বাবুর কয়লার ব্যবসায় ছিল। গিরিডিতে তখন রেল-চলাচল হয় নাই। তিনি এই স্থান হইতে কুলি-মারফৎ ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলের মেন-লাইনস্থিত লক্ষীসরাই ষ্টেশনে কয়লা চালান দিতেন। তৎকালে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক এত কম ছিল যে, মাল-চালানের এইরূপ অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি এই ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ লাভ করেন। মকতপুরায় তিনি বাড়ি করিয়াছিলেন।

স্থানীয় সুপরিচিত মোক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীপতি সামন্ত মহাশয় শক্তিকণ্ঠ বাবুর সমসাময়িক ব্যক্তি। গত বৎসর ইনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। ইঁহার দ্বিতল বসতবাটী পচম্বা-রোডের উপর অবস্থিত; এতদ্ভিন্ন ইনি গিরিডিতে বহু ঘরবাড়ি করিয়াছেন। ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ সামন্ত মহাশয় উপর্য্যুপরি দুইবার স্থানীয় লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৺ডাক্তার যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়, এম্-বি, মহাশয় ১৯০১ সালে স্থানীয় হাসপাতালের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন রূপে আগমন করেন। এই স্থানে তিনি একাদিক্রমে প্রায় আট বৎসর অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন। পরে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই স্থানে নিজস্ব বাটী করিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া যান। ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই স্থানের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

৺রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার দুই ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এই স্থানের পুরাতন বাঙালী অধিবাসীদিগের মধ্যে অন্যতম। চকের উপর পূর্ব্বে শরৎ বাবুর একখানি কাপড়ের দোকান ছিল। লক্ষ্মীবাবু স্থানীয় কোন অভ্র-ব্যবসায়ীর আপিসে কার্য্য করিতেন; পরে তিনি এই কার্য্য ছাড়িয়া দেন। গাওয়া নামক স্থানে ইঁহাদের অভ্রের খনি আছে। "হেল্‌থ হল্" (Health Hall) নামক যে সুপরিচিত ঔষধালয়টি ১৯০৫ সালে গিরিডিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইঁহারাই তাহার স্বত্বাধিকারী। পরে ঔষধালয়টি পচম্বা-রোডের উপর অবস্থিত ইঁহাদের নিজ বাটীতে স্থানান্তরিত হয়। এস্থানে ইঁহাদের একাধিক বাড়িঘর আছে। ইঁহারা এ স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় রেলওয়ের ডাক্তার ছিলেন; পরে নিজ বাটী করিয়া গিরিডিতে স্থায়ী ভাবে বাস করেন। ইনি পুরাতন ঔপনিবেশিক বাঙালী-বাসিন্দাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ।

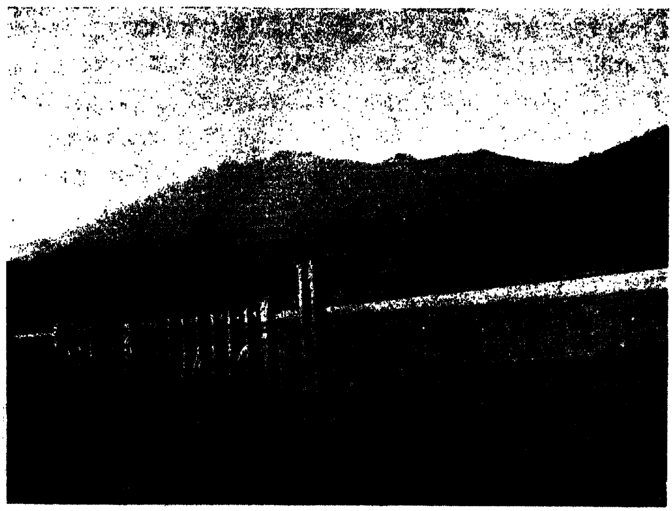
পূর্ব্বোক্ত ৺মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কয়লা-খনির দেশীয় ইন্সপেক্টর রূপে গিরিডিতে আগমন করেন। ইঁহার আদি নিবাস বৰ্দ্ধমান জেলাস্থ রায়না গ্রামে। ইনি নিজে



গিরিডি ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন লিমিটেড

এই স্থানে বাড়িঘর না-করিলেও, ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি পচম্বা-রোডের উপর নিজস্ব বাটী করিয়াছেন। তিনকড়ি বাবু ওকালতি করেন। তিনি কিছুদিন দাতিয়া-ষ্টেটের চীফ্ জুডিশিয়াল অফিসার ছিলেন। বৰ্ত্তমানে ইনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর এক জন কমিশনার। উচ্চ-ইংরেজী বালক-বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে সাত বৎসর যাবৎ রহিয়াছেন। গিরিডির প্রায় সকল জনহিতানুষ্ঠান ও উৎসবাদিতে ইঁহার উৎসাহ পরিদৃষ্ট হয়।

গিরিডির তিন মাইল পূর্ব্বে ভুরুন্তিহা নামক স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙালী। ইঁহারা 'মিশ্র' উপাধিধারী। ইঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত হালিশহর গ্রামে। এখন ইঁহারা



ঝরিয়া ওয়াটার ওয়ার্কস, তোপচাচি। দূরে পরেশনাথ পাহাড় দেখা যাইতেছে

কোম্পানীর কার্য্যালয় ও আকরিক তাম্র হইতে বিশুদ্ধ তাম্র নিষ্কাশনের জন্য যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়। আসল খনিটি বারগণ্ডা নামক স্থানে অবস্থিত বলিয়া এবং আপিস ও তাম্র-নিষ্কাশণ সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য এস্থানের সহিত বারগণ্ডা নামক স্থানের যোগ থাকায় কালক্রমে এই স্থানের নামও বারগণ্ডা হইয়া যায়। কপারফীল্ড নামক বাটীটি এখন শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের অধিকারে আছে। পরে খনিজ তাম্র নিঃশেষিত হওয়ার জন্যই হউক অথবা ব্যবসায়ে কোম্পানীর

প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ ঘর গৃহস্থ এইস্থানে বাস করিতেছেন। অনুমান বঙ্গাব্দ ১১৭৬ সালে এই জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরের তদানীন্তন রাজা, রামচন্দ্র মিশ্র নামক এক বাঙালী ব্রাহ্মণকে হালিশহর হইতে তাঁহার পুরোহিত রূপে গিরিডিতে আনয়ন করেন ও তাঁহাকে তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ বিস্তর ভূমিদান করেন। ভুরুস্তিহার বর্ত্তমান প্রবাসী বাঙালী ব্রাহ্মণেরা সকলে তাঁহারই বংশোদ্ভূত। ইঁহারা এই স্থানে পৌরোহিত্য করেন। সুখের বিষয়, ইঁহারা দীর্ঘকাল প্রবাসী হইয়াও বাঙালীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইঁহাদের বংশের এক ব্যক্তি স্থানীয় কাছারীতে ওকালতি করেন।

গিরিডিতে বারগণ্ডা নামক স্থানেই অধিকাংশ বাঙালীরা বাস করেন। এই বারগণ্ডা নামের উৎপত্তি কিরূপে হইল বলিতেছি। গিরিডি হইতে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে হাজারিবাগ রোডের নিকট বারগণ্ডা নামক স্থানে পূর্ব্বে বার্ড এণ্ড কোং-এর একটি তাম্রের খনি ছিল। গিরিডিস্থ বর্ত্তমান বারগণ্ডা রোড যে-স্থানে উশ্রী নদীর তীর অবধি আসিয়া শেষ হইয়াছে, ঐস্থানে কপারফীল্ড নামক একটি দ্বিতল অট্টালিকা আছে। তৎকালে উহাতেই উক্ত

ক্ষতি হওয়ার কারণেই হউক উক্ত আকর হইতে তাম্র-উত্তোলনকার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। বারগণ্ডা নামক স্থানটি এখন বেঙ্গল ইকুইটেব্‌ল কোল কোম্পানীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। ইঁহারা স্থানীয় টীকাইৎ-এর নিকট হইতে প্রথমে কয়লা-উত্তোলনের উদ্দেশ্যে জমিটি ক্রয় করেন; কিন্তু পরে কয়লা না-পাওয়ায় জমি পড়িয়া থাকে। কথিত আছে, ইকুইটেব্‌ল্ কোল কোম্পানী এককালে মাত্র ছয় শত টাকা বাৎসরিক খাজনায় সমগ্র বারগণ্ডা ইজারা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সেই জঙ্গলাবৃত কঙ্করাকীর্ণ অনুর্ব্বর জমিতে ফসলোৎপাদনের চেষ্টা সুদূরপরাহত বুঝিয়া তখন কেহই সেই জমি ইজারা লইতে ভরসা করেন নাই। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বসু মহাশয়ের পরামর্শে উক্ত কোম্পানী এই জমিগুলি বহু অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশ বাৎসরিক দশ টাকা খাজনায় বিলি করিবার বন্দোবস্ত করেন। শশীবাবুই প্রথম এই সব জমিতে ব্রাহ্মদের বসবাস করাইতে আরম্ভ করেন। তদবধি গিরিডি ব্রাহ্ম-উপনিবেশ রূপে পরিগণিত হয়। শশীবাবুর আদি নিবাস ছোট-জাগুলিয়া গ্রামে। তিনি পূর্ব্বে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বারগণ্ডায় তাম্রখনির আপিস প্রতিষ্ঠার সময়ে

বার্ড কোম্পানীর সাহেব-কর্ম্মচারীদের জন্য আপিস-বাটীর অদূরে তিনখানি বাংলো-বাটী নির্ম্মিত হয়। পরে ইহারই একখানি শশীভূষণ বাবু ক্রয় করেন। এখনও ইহা তাঁহারই অধিকারে রহিয়াছে। বাড়িটির বর্ত্তমান নাম "বারগণ্ডা বাংলো।" অপর দুইটি বাটী ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকার ও শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু ক্রয় করেন। গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের মধ্যে শশীভূষণ বাবু অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন। গিরিডিতে ব্রাহ্ম-উপনিবেশস্থাপনের ইচ্ছা, শুনিয়াছি, প্রথমে ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের মনেই উদিত হয়। তিনি পচম্বায় কিছু জমিও সেই উদ্দেশ্যে বন্দোবস্ত করেন; কিন্তু যে-কারণেই হউক, শেষ-পর্য্যন্ত তাঁহার ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। তিনি পচম্বায় "মজিলপুর ভিলা" নামক বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন।

বারগণ্ডার পুরাতন অধিবাসীদিগের মধ্যে ৺সাতকড়ি দেব মহাশয় অন্যতম ছিলেন। ইঁহার আদি নিবাস ছিল কোন্নগর গ্রামে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইনি প্রথম এই স্থানে বাড়িঘর নির্ম্মাণ করাইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় সর্ব্বপ্রথম এই স্থানে দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী আনাইয়া ভাড়া খাটাইতে থাকেন। সেই হইতে এ স্থানে ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন হয়। সেই জন্য এ কথাটির উল্লেখ করিলাম। পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ বীরেন্দ্র বাবু গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রী-আবাস নির্ম্মাণোদ্দেশ্যে দুই সহস্র মুদ্রা দান করেন। স্থানীয় শ্মশানসংস্কার কার্য্যের জন্যও তিনি পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন। বীরেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মসমাজভুক্ত।

ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকার মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের বারগণ্ডায় নিজ বাটী আছে। উশ্রী নদীর অপর তীরে পাঁড়েডিহি নামক মৌজাখানিও ইঁহার। উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়ের ইনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

গিরিডির প্রধান খনিজ পণ্য কয়লা ও অভ্র। কয়লার খনিগুলি রেল-কোম্পানীর অধিকৃত। উপস্থিত বাজার মন্দা হওয়ায় খনিগুলিতে কয়লার চাহিদা হিসাবে সপ্তাহে কয়েক দিন মাত্র কয়লা উত্তোলিত হয়। গত মহাসমরের সময়ে যখন অভ্রের মূল্য অত্যধিক ছিল, তখন স্থানীয় বহু লোক ও প্রবাসী বাঙালী অভ্র-ব্যবসায়ীরা অনেকেই বিশেষ বিত্তশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি সে সময়ে অভ্র-ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সাধারণ দিনমজুররা অবধি প্রত্যহ গড়ে তিন চারি টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিত। কিন্তু পরে অভ্রের দর অসম্ভব রকম হ্রাস হওয়ার সঙ্গেই উক্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। ঠিক গিরিডিতে কোন অভ্রের খনি না-থাকিলেও, কোদার্ম্মা, গাওয়া প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের খনিগুলি হইতে প্রচুর উৎকৃষ্ট অভ্র পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থান হইতে অভ্রের পুরু স্তবক সংগ্রহ করিয়া গিরিডিতে আনীত হয়। এই স্থানে তাহা হইতে অনতিস্থূল তক্তি প্রস্তুত হয় ও পরে তাহার মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট হিসাবে শ্রেণী-বিভাগ হইলে ছুরির সাহায্যে স্তর বিচ্ছেদ করিয়া খুব সূক্ষ্ম অভ্রপত্র প্রস্তুত হয়। গিরিডির বহু বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ অভ্রের স্থানীয় কারখানা হইতে অভ্রতক্তি আনিয়া নিজ বাটীতে বসিয়া উপরিউক্ত প্রথায় কাটিয়া-ছাঁটিয়া অভ্রপত্র প্রস্তুত করিয়া পুনরায় ঐ কারখানায় দিয়া আসেন। এই কার্য্যেই বহু পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। ইহার পর কারখানায় এই অভ্রপত্রগুলি হইতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন আকার ও স্থূলতা বিশিষ্ট অভ্রের তক্তা প্রস্তুত হইয়া বিদেশে রপ্তানী হয়। অভ্র-ব্যবসায়ের সাময়িক অবসাদ হেতু গিরিডিতে উপস্থিত অন্নাভাব প্রকট হইয়াছে।

বাঙালী অভ্র-ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রথমেই শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি এককালে "অভ্রের রাজা" (Mica Prince) নামে পরিচিত ছিলেন। গিরিডিতে ইঁহার বাড়িঘর ও অভ্রের প্রকাণ্ড কারখানা-বাটী অবস্থিত। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষের পচম্বাস্থিত বসতবাটী ও কারখানা-বাটী ইঁহারও ব্যবসায়ে উন্নতির পরিচয় প্রদান করে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ হেতু অতি দীন অবস্থা হইতে ইনি লক্ষপতি হইয়াছেন এবং এখনও এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। ইনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার। শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ দে মহাশয় এক সময়ে অভ্র-ব্যবসায়ে লক্ষপতি হইয়াছিলেন। উশ্রী নদীর তীরে 'কপারফীল্ড' নামক সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকাখানির ইনিই অধিকারী।

রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত ৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের এক সময়ে গিরিডিতে অভ্রের খনি ছিল। ইনি স্থানীয় পুরাতন প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। গিরিডিতে ইঁহার বাটী বর্ত্তমান। শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এক জন স্থানীয় অভ্র-ব্যবসায়ী। ইঁহার এস্থানে নিজস্ব বাটী ও জমি আছে। ইনি এক জন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার। ইঁহার পিতা ৺মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাদিক্রমে কুড়ি বৎসর যাবৎ এস্থানের ষ্টেশন-মাষ্টার ছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বে কলিকাতায় বেচু চাটুজ্জে ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। ১৯১৫ সালে গিরিডিতে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় আসিয়া কিছুকাল স্থানীয় কাছারীতে ওকালতি করিয়াছিলেন; পরে অভ্রের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া বিশেষ লাভবান হন। এখনও ইনি বিলাতে অভ্র রপ্তানী করিয়া থাকেন। স্থানীয় বিহার-মাইকা কোম্পানীর ইনিই স্বত্বাধিকারী। গিরিডিতে ইঁহার একাধিক বাড়িঘর আছে; ইনি এ স্থানের স্থায়ী অধিবাসী। ৺রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় ও ৺রাজকৃষ্ণ সাহানা মহাশয়দের কোদার্ম্মার নিকট অভ্রখনি বর্ত্তমান। গিলোপী রজার্স পিয়েট কোম্পানী এই স্থানের প্রধান অভ্র-ব্যবসায়ী; ইহার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু বৎসর যাবৎ এই কোম্পানীতে কার্য্য করিতেছেন। সামান্য কর্ম্মচারী হইতে স্বীয় কার্য্যদক্ষতায় এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে ইনি উন্নত হইয়াছেন। অভ্রের শ্রেণী-বিভাগকার্য্যে ইঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিরল। গিরিডিতে ইঁহার বাড়ি আছে।

বাঙালীদের মুদিখানার দোকান গিরিডিতে পাঁচখানি আছে। তন্মধ্যে মকতপুরার জ্ঞানবাবুর দোকান সমধিক জনপ্রিয় ও প্রাচীন। ইহার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের আদি নিবাস ছিল যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা অমৃতবাজার গ্রামে। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বাস্থ্যোন্নতিকামনায় ইনি গিরিডিতে আগমন করেন। পরে ক্রমে একখানি ছোট মুদির দোকান খুলিয়া বসেন। এখন নিজস্ব বাটী করিয়া ইনি এ-স্থানে স্থায়ী বসবাস করেন। কয়লার ডিপো, মণিহারী দোকান ও চারি-পাঁচখানি মিষ্টান্নের দোকানও বাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

হেল্‌থ হল, ইম্পিরিয়াল মেডিক্যাল হল, বিহার ড্রাগিষ্টস্ হল, সুলভ ফার্ম্মেসী, কৃষ্ণভাবিনী মেডিক্যাল হল প্রভৃতি স্থানীয় সকল ঔষধালয়গুলিই প্রবাসী বাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত। ইম্পিরিয়াল মেডিক্যাল হলের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সত্যদাস রায় মহাশয় ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানীর স্থানীয় কোলিয়ারী আপিসের হেড ক্লার্ক।



শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গিরিডিতে দর্জ্জিমহল্লা নামক স্থানে 'ঘোষ হাজরা এণ্ড কোং' নামে বাঙালীদের একটি কাপড়-কাচা সাবানের কারখানা আছে। সুখের বিষয়, ইঁহাদের প্রস্তুত সাবান এস্থানে বেশ আদৃত হওয়ায় কারখানা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে।

গিরিডি ইলেকট্রিক কোম্পানী ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালীর ক্রমোন্নতির আর একটি নিদর্শন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বারগণ্ডায় তিন বিঘা জমি নিরানব্বই বৎসরের জন্য ইজারা লইয়া ইহার বিদ্যুৎ-উৎপাদন গৃহ (power house), বিশ্রাম কুটীর নামক কার্য্যালয় প্রভৃতি নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় ও তজ্জন্য একুশ হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। সাতাশী হাজার টাকা মূল্যের বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্রপাতি ক্রীত হয় ও বিদ্যুৎ-সরবরাহের আনুষঙ্গিক অন্যান্য বন্দোবস্তের জন্যও একানব্বই হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। ১৯৩১ সালের ২৮এ মার্চ্চ তারিখে ইহার দ্বারোদ্‌ঘাটন-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে ও ৩১এ মার্চ্চ হইতে গিরিডিতে তড়িৎ-প্রবাহ সরবরাহ হইতেছে। এই কোম্পানী এখন সমস্ত গিরিডি শহরে তড়িৎপ্রবাহ সরবরাহ করিয়া থাকেন। লালজী এণ্ড কোম্পানী উপস্থিত ত্রিশ বৎসরের জন্য ইহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। ৩৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতায় ইহার একটি শাখা-

কার্য্যালয় আছে। ইহার ডিরেক্টরেরা সকলেই বাঙালী; তন্মধ্যে শ্রীযুত বিধুভূষণ সিংহ মহাশয় স্থানীয় অভ্র-ব্যবসায়ী। মিঃ এন. এল. রায়, এম-ই (কর্ণেল, ইউ. এস. এ) ইহার প্রধান ইঞ্জিনিয়ার; ইহা ভিন্ন সাত জন বিচক্ষণ বাঙালী ফোরম্যান ও এক জন বাঙালী সহকারী এঞ্জিনিয়ার বিদ্যুৎ-উৎপাদন ও আপিস-সংক্রান্ত সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। কোম্পানী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

গিরিডির অদূরবর্ত্তী দ্রষ্টব্যস্থান-সমূহের কথা উল্লেখ করিতে হইলে বারগণ্ডা হইতে সাত-আট মাইল দূরস্থ উশ্রী জলপ্রপাতের কথাই প্রথমে মনে উদিত হয়। বর্ষার শেষে অথবা শরৎকালের প্রারম্ভে জলপ্রপাত দেখিতে যাওয়াই প্রশস্ত। উচ্চ পর্ব্বতশীর্ষ হইতে অজস্র ফেনশুভ্র উচ্ছলিত জলধারার সশব্দ পতন ও শূন্যোৎক্ষিপ্ত ধূমাভ বারিবিন্দুর উপর সূর্য্যকিরণপাতে সপ্তবর্ণের বিচিত্র লীলা সত্যই মনোরম।

গিরিডি হইতে সাতাশ-আটাশ মাইল দূরে ঐ অঞ্চলের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত পরেশনাথ। পূর্ব্বে রেলযোগে গিরিডি গিয়া পুস্‌পুস্ অথবা গোযানে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া পরেশনাথ যাইতে হইত; ইহা ভিন্ন অন্য পথ ছিল না। এখন অবশ্য পরেশনাথ ষ্টেশনে নামিয়া যাইবার সুবিধা হইয়াছে। গিরিডি হইতে যাইতে হইলে এখন সকলে মোটরকারে অথবা মোটরবাসে ঐ স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকেন। পরেশনাথ প্রসিদ্ধ জৈনতীর্থস্থান।

গিরিডি হইতে প্রায় আটচল্লিশ মাইল দূরে তোপচাচি নামক স্থানে ঝরিয়া ওয়াটার ওয়ার্ক্‌স্‌ও অনেকে দেখিতে যান। এই স্থানের নৈসর্গিক দৃশ্য অতি রমণীয়। বর্ষার সময়ে চারি ধারের সুউচ্চ গিরিগাত্র হইতে যে বারিধারা নামিয়া আসে, স্থাপত্যকৌশলে এক দিকে দীর্ঘ বাঁধ দিয়া সেই বারি সঞ্চিত করা হয় ও পরে তাহাই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শোধন করিয়া ঝরিয়া প্রভৃতি স্থানে নলের মধ্য দিয়া সরবরাহ করা হয়। ফলে এই স্থানে মনোহর প্রাকৃতিক পরিপার্শ্বের মধ্যে প্রায় সার্দ্ধ তিন মাইল দীর্ঘ ও সাতষট্টি ফুট গভীর একটি কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে।

গিরিডির শ্মশানের বিষয়ে কিছু না-লিখিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। উশ্রী নদীর তীরে এই শ্মশান অবস্থিত। শ্মশানঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দেন প্রসিদ্ধ অভ্র-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়। শ্মশানঘাট-সংস্কার-সঙ্ঘ (Burning Ghat Improvement Trust) বিহারী ও প্রবাসী বাঙালীদের সহযোগিতায় গঠিত হইয়াছে। এই সঙ্ঘ শবানুগামী ব্যক্তিদের জন্য এই স্থানে একটি বিশ্রামগৃহ নির্ম্মাণকল্পে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। এ-পর্য্যন্ত প্রায় সাত শত পঁচাত্তর টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে প্রদত্ত পাঁচ শত টাকা ও নিউ-বারগণ্ডার অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রদত্ত দুই শত পঞ্চাশ টাকা উল্লেখযোগ্য।



বাঁশীর সুর

শ্রীআশালতা দেবী

১

মেয়েটি আজ ক'দিন হইল ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতে উঠিয়াছে। অসুখটা হইয়াছিল শক্ত রকমের। রোগা হইয়া গিয়াছে, মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা। সমস্ত মুখে রোগ-শীর্ণ একটি করুণ আভা।

সকালবেলা হইতে একটি কমলানেবু হাতে করিয়া শুধু মোজা পায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নেবুটি তখনই খাইতে মীরার মায়া হইতেছে। জানে ফুরাইয়া গেলে মায়ের কাছে আর নাই।

মীরার মা তখন ভাঁড়ার-ঘরের রোয়াকে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন। সামনেই কল। সেখানে চাকরে বাসন ধুইতেছে। স্থানটা জলে এবং কাদায় ভর্ত্তি। মীরা মায়ের কাছে ঘোরাফেরা করিতেছে। মা ডাক দিয়া কহিলেন, "ও মানিক, শুধু মোজা প'রে ঘুরে বেড়ায় না। জলে এখনই ভিজে মোজা নষ্ট হয়ে যাবে আর পায়ে ঠাণ্ডা লাগবে।"

মীরা করুণ ভাবে মায়ের পানে চাহিয়া বলিল, "আমার যে জুতো নেই মা। তুমি তো জান।"

তখন মায়ের স্মরণ হইল তাই বটে। মীরার জুতা-জোড়াটা অন্ততঃ দশবার মুচির কাছে পাঠাইয়া তিনি তালি দিয়া আনিয়াছেন কিন্তু আর সেটা দিয়া কাজ চলে না। এত দিন মীরার অসুখ চলিতেছিল, শুইয়া তাহার দিন কাটিত, জুতার প্রয়োজন তেমন ছিল না।

সময়টা শীতকাল, পশ্চিমের শীত দুরন্ত, তাহার উপর মেয়েটা সদ্য এতবড় অসুখ হইতে উঠিল।

মীরার মা মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, মাসকাবার শেষ হইলে বাক্স খুলিয়া তাঁহার তহবিল মিলাইবেন এবং যেমন করিয়া হোক ও-বাড়ির ঠাকুরপোকে দিয়া বিকালে তাহার জন্য একজোড়া জুতা আনাইবেন। এখন মেয়েকে কাছে ডাকিয়া পাশে একখানা আসন পাতিয়া বসিলেন, "এখানে এসে বোস্ মা। আজ বিকেলে তোর জন্যে দোকান থেকে নতুন জুতো নিশ্চয় আনিয়ে দেব।"

খবরটা মীরার পক্ষে এমন অভাবনীয় যে আনন্দে তাহার শীর্ণ মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কবে যে তার জুতা কেনা হইয়াছে সে আর এখন তার মনেও পড়ে না। বোধ হয় বছর-তিনেক আগে। অত্যন্ত খুশী হইয়া সে আসনে বসিয়া কহিল, "সত্যি মা?"

—হ্যাঁ, মা। কিনে দেবো বইকি।

নেবুটা আলেষ্টারের ছিন্ন পকেটে গুঁজিয়া রাখিয়া সে স্থির হইয়া বসিল। এখন বোধ হয় ঘড়িতে নটা বাজে। আর কিছুক্ষণ পরে দুপুর হইবে, তার পরে বিকাল, আর তার কিছুক্ষণ পরেই তার নতুন জুতা আসিবে। পৃথিবীতে এত সুখও অবশেষে ছিল। মধ্যবিত্ত, অভাবের ঘরের মেয়ে, এই তো মোটে তার ছ-সাত বছর বয়স হইয়াছে ইহারই মধ্যে ঘরকন্নার কাজ অনেক শিখিয়াছে। বলিল "দাও না মা তোমার শুকনিটা আমি ততক্ষণ কুটে দিই। নটা বাজে, বাবা খেয়ে-দেয়ে কাছারি যাবেন। তুমি রান্না করবে না?"

মা সস্নেহে একবার তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন "তোর রোগা শরীর, থাক না মীরা। ক'টা আনাজ কুটতে আমার কতক্ষণই বা লাগবে।"

তার পরে মীরার বাবা আসিলেন। তিনি চার-পাঁচ বছর হইতে পশ্চিমের এই শহরে ওকালতী করিতেছেন স্থানীয় বড় উকিল [illegible] কাছে জুনিয়ারি করেন। সকাল সাতটা বাজিতে-না-বাজিতে তাঁর বাড়িতে ছোটেন এবং কাছারি যাইবার আধ ঘণ্টা আগে বড়জোর বাড়ি ফিরিয়া আসেন। শুধু যে তাঁহার জুনিয়ারি করেন এমন নয়। তাঁহার [illegible] করিয়া পড়ান শহরের একপ্রান্তে গোয়ালটুলির এক দোকানে কাশীর

জর্দা আর লক্ষ্ণৌয়ের সুর্তি এবং কিমাম পাওয়া যায়, সেখান হইতে ধনধনিয়া-গৃহিণীর জন্ত তাহা সংগ্রহ করিয়া আনেন। আরও কত টুকি-টাকি কাজ যে করিয়া দেন, প্রত্যহের কত পুঞ্জীভূত হীনতা, কত মিথ্যা চাটুবাক্যের গ্লানি যে তাঁহাকে বহন করিয়া চলিতে হয়। তথাপি তিনি সুবিধা করিতে পারেন নাই। কত বেহারী জুনিয়ার উকিল তাঁহার ক্ষুধার্ত্ত লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে প্রতিদিন মোকর্দ্দমা লইয়া যায়, তিনি পান না। কায়ক্লেশে তাঁর সংসার চলে। জীবনযুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন এবং প্রকৃতি রুক্ষ হইয়া গেছে।

২

ঘড়িতে এগারটা বাজিল। মীরার বাবা মন্মথবাবু স্নান এবং আহার সারিয়া চাপকানের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে একার চড়িয়া কাছারির উদ্দেশে বাহির হইয়া গেলেন।

মীরা কয়েকটা সুজির রুটি অনেক ক্ষণ ধরিয়া বসিয়া খাইল। তার মায়ের রান্নাঘরের সব কাজ মিটিল। ক্ষুদ্র অপরিসর বারান্দায় যেখানে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে সেইখানে একটি মাদুর বিছাইয়া মীরার মা বসিলেন মীরার ছোট ভাইটিকে লইয়া। এই তো দুপুর কাটিয়া আসিল, এইবারে বিকাল হইবে। তার পরেই মীরার জুতা। আনন্দে মীরা তাহার বহু পুরাতন আলেষ্টারের পকেট হইতে কমলানেবুটি বাহির করিয়া এতক্ষণ পরে তার খোসা ছাড়াইল।

খোকাকে ডাকিয়া কহিল, "চুনি, নেবু নিয়ে যা। তোকে দু-কোয়া দেবো।'

মীরার মা সুনন্দা বড়লোকের মেয়ে। কলিকাতায় বাপের বাড়ি। কিন্তু আজ দশ-বার বছর বিবাহ হইয়াছে, দীর্ঘকাল ধরিয়া অভাবের স্বামীর সংসারের ঘরণী হইয়া সে-সবই ভুলিয়াছেন। একটু পরে খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া উঠিয়া ভিতরে ঘরে আসিয়া বাক্স খুলিলেন। টাকার ব্যাগ খুলিয়া গণিলেন, আটটি টাকা আছে। আজ ইংরাজী মাসের একুশে, এখনো খোকার সাবান, বাজার-হাট [illegible] স্বামীর উপার্জ্জন এই হইয়াছে। এখনও কত বাকী। মাস ফুরাইতে-না-ফুরাইতেই গোয়ালার দুধের দাম, ঠিকা চাকরটার মাহিনা, বাড়িভাড়া সমস্তই দিতে হইবে। কিন্তু ভাবিয়া ফল নাই।

পাশের বাড়ির নিতু তখন দুয়ারের কাছে আসিয়া ডাক দিতেছে, "বৌদি ডেকে পাঠিয়েছিলে, কিছু দরকার আছে না-কি?"

"হ্যা, ভাই। মীরার পায়ের এক জোড়া জুতো এনে দিতে হবে।"

"কেমন জুতো চাই?"

"ওরই মধ্যে একটু শক্ত টেকসই হয়। জানই তো একবার কিনলে আবার যে কিছুদিন পরে কিনে দোব যে সামর্থ্য নাই।"

চোখ-মুখ খুশীতে উজ্জ্বল করিয়া মীরা নিতুর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "নিতু কাকা, আমি সেই রকম ফুলওয়ালা জুতো নেব। সেই যে তোমার বোন কমুর পায়ে দেখেছি।"

তাহার মা তাড়া দিয়া বলিলেন, "না না পামৃশু নিতে হবে না। বড্ড তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়।" নিতু মমতাভরা চোখে একবার মীরার দিকে চাহিল। বেচারা জানে না জাল-কাজ-করা পামৃশু, কমু যেমন পায়ে দিয়েছিল, তার দাম পাঁচ-ছ টাকা। কহিল, "আচ্ছা বৌদি এক কাজ করলে হয় না, মীরাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাই। জুতো কেনা, যার জন্তে কিনব সে সঙ্গে থাকলেই ভাল হয়।"

"বেশ তাহলে ক'টাকা তোমায় দেব?"

"এটুকু বাচ্চার জুতোর দাম আর কত হবে? আচ্ছা আগে আমি নিয়ে আসি তার পরে সে-সব হবে।"

ঘণ্টা-দুই পরে লাইমজুস খাইয়া পিপারমেন্ট-দেওয়া পানে ঠোঁট দুটি লাল টুকটুকে করিয়া খুব সৌখীন এক পামৃশু পায়ে, জুতার বাক্সটা বগলে চাপিয়া আনন্দে উদ্বেলিত মীরা যখন তাহাদের বাড়িতে ঢুকিল, ঠিক সেই সময়ে মীরার বাবা কাছারি-ফেরত ক্লান্তমুখে টাঙ্গা হইতে নামিতেছেন।

নিতু মীরাকে তার মায়ের কাছে দিয়া বলিল, "নাও বৌদি তোমার মেয়ে। আহা বেচারা অসুখে ভুগে বড় দুর্ব্বল হয়ে গেছে। এক দোকান থেকে আর এক দোকানে

একটুখানি যেতেই একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শেষে কোলে ক'রে নিলুম। জুতো কেমন হয়েছে?…কত দাম নিয়েছে?…দাম আর কত, টাকা-দুয়েক।" আসলে জুতার দাম চার টাকা পনের আনা। কিন্তু নিতু ঠিক করিয়াছিল বৌদির কাছে দু-টাকার বেশী কিছুতেই লইবে না।

"…ও কি, আবার মোজা, গার্ডার। এ-সব কেন ঠাকুরপো?"

"হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে। তোমাকে বলতে ভুলেছিলুম, জুতোর দাম এক টাকা ছ-আনা। আর মোজা-টোজা সবশুদ্ধ ধরে দু-টাকা।…" নিতু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল। সে অনেকবার নিজে হইতে মীরাকে কিছু দিতে গিয়া দেখিয়াছে দারিদ্র্যাভিমানিনী বৌদি তাহা নেন না। তাই এবারে এই ছলনাটুকু করিল।

সুমনা অপ্রসন্ন মুখে বাক্স হইতে দুটি টাকা বাহির করিয়া আনিল। মনে মনে ভাবিল, আবার মোজা কেনা কেন। তা না হইলে ত পুরা দুইটি টাকা লাগিত না।

নিতু চলিয়া যাইবার ঘণ্টাখানেক পরে মন্মথ ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীকে কহিল, "ওগো বাক্সে টাকা আঠার আছে, নয়? কাল যে কাছারি যাবার আগে গুণেছিলুম আঠার টাকা এগার আনা ছিল। তা দু-দিনের বাজার-খরচে খুচরো পয়সাটা বাদে আঠার টাকাই নিশ্চয় থাকবে। তুমি এক কাজ কর দেখি, খরচের জন্য একটি টাকা রেখে সতের টাকা আমাকে বার ক'রে দাও। আজ আর কাছারিতে কিছুই পাই নি।"

"একসঙ্গে এত টাকা কি হবে?"

"তোমাকে বলি নি, আর ব'লেই বা কি হবে! মাসে যা যৎসামান্য পাই, তাতে খরচ চলে কই। প্রত্যেক মাসেই তারাপদর কাছে কোন মাসে আট কোন মাসে দশ এমনি ধার করতে করতে প্রায় একশো টাকা দাঁড়িয়ে গেছে। আজ বার-লাইব্রেরীতে সকলের সামনেই অপমান ক'রে বসলে। আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। বলেছে আজ পনের টাকা কম ক'রে তাকে দিতেই হবে।"

"তবে সতের চাইছ কেন?" সুমনা সাহস সঞ্চয় করিয়া ক্ষীণ স্বরে কহিল।

"আর দুটো টাকা জরদা আর কিমাম বিক্রী করে যেই মুসলমানটাকে দিতে হবে। ধনধনিয়া-গিন্নীকে নিজের পয়সায় দুর্তি আর জরদা কিনে ভেট দিতে দিতে ফতুর হয়ে গেলাম, তবু যদি একটা মক্কেলের মুখ দেখবার জো রয়েছে। আজ মুসলমান বুড়োটা পথের মাঝে একা দাঁড় করিয়ে বলে, 'বাবুজি, আমার দোকানে কমসে কম তোমার পনের রূপেয়া বাকী। আজ পাঁচ মাস ছ-মাস হয়ে গেল এক পয়সা দিলে না। আর আমি কেমন ক'রে অপেক্ষা করব।' তাকেও আজ টাকা-দুয়েক না দিলে অনর্থ করবে।"

"তোমার যে এত জায়গায় ধার রয়েছে সে-কথা আগে ত আমাকে ঘূণাক্ষরেও বল নি।" সুমনা বিহ্বলের মত তার নিজের নাম লেখা ক্যাশ-বাক্সটার দিকে চাহিল।

"ব'লে কি হবে? বলবার মত কথা হ'লে বলতুম। এখন দাও দিকি টাকাটা চটপট বাক্স থেকে বার ক'রে।"

আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই। সুমনা মরীয়া হইয়া কহিল, "অত টাকা নেই বাক্সে, ষোলটি টাকা রয়েছে।"

মন্মথ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, "এর মধ্যে এত খরচ ক'রে ফেলেছ? কিসে খরচ করলে? এবার থেকে টাকাকড়ি হিসেবপত্র সব আমি নিজে করব। চাবিও রাখব আমার কাছে। চুপ ক'রে রইলে কেন? জবাব দাও। এত কি নবাবের মেয়ে হয়েছ যে এক জন মুখের রক্ত উঠিয়ে টাকা রোজগার করবে আর তুমি তা জলের মত খরচ ক'রে যাবে, হিসেবটাও দিতে পারবে না।"

"মেয়েটার জুতো ছিল না।"…সুমনার মূর্চ্ছিতপ্রায় কণ্ঠস্বর হাওয়ায় মিশাইয়া গেল।

"জুতো কিনেচ মীরার?…দু-টাকা খরচ ক'রে! তাই বটে, আজ কাছারি থেকে ফেরবার সময় দেখলুম মেয়ে নতুন সৌখীন জুতো পায়ে আহ্লাদে ডগমগ হয়ে আসছে। তোমাদের লজ্জা নেই? দেনার দায়ে স্বামীকে পথের লোকে অপমান ক'রে যাচ্ছে আর এদিকে এই সব হচ্ছে।"

মন্মথর গলার আওয়াজ, ক্রমশঃ উচ্চতর হইতে লাগিল। মীরা ভয় পাইয়া দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নতুন জুতোটি পা হইতে খুলিয়া বাক্সে ভরিয়া কাগজের বাক্সটা সে বুকের কাছে চাপিয়া ছিল। তাহার দিকে চোখ পড়িতেই মন্মথ যেন ক্ষেপিয়া গেল। ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার হাত হইতে বাক্সটা কাড়িয়া লইয়া উন্মত্তের মত দুলিতে লাগিল,

"এই সব হচ্ছে, এই সব হচ্ছে! আহ্লাদে মেয়ে, অমন জুতোর নিকুচি কর!" বলিয়া জুতাজোড়া সবেগে দেওয়ালের দিকে নিক্ষেপ করিল। একটা জুতার ফুল ছিঁড়িয়া খুলিয়া গেল। মীরা কাঁদিবার উপক্রম করিতেই তাহার বাবা গালে সশব্দে এক চড় মারিয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া দিলেন।

মা ছুটিয়া অশ্রুস্তম্ভিত চক্ষে মেয়েকে তুলিয়া স্থিরকণ্ঠে কহিলেন, "রোগা মেয়েকে অমন ক'রে মেরো না। হয়ত এখন তোমার মন খুব উত্তেজিত হয়ে রয়েছে, অন্য জায়গায় যাও। পয়সা না-থাকলেও মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে, সেটা যায় না। এটুকু অন্ততঃ তোমার কাছে আশা করতে পারি।"

৩

ঘরের মাঝে একটুক্‌রো জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। সুমনা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে। স্বামী এখনও ফেরেন নাই। অদূরে ক্ষুদ্র বিছানায় খোকা আর মীরা শুইয়া আছে। সুমনা বসিয়া ভাবিতেছিল আগেকার দিনের কথা। বাবা ছিলেন কলিকাতার বড় ডাক্তার, চাল-চলন ছিল একালের মত। সুমনাকে গান শিখাইয়াছিলেন, মেম রাখিয়া সেলাই শিখাইয়াছিলেন। বেথুন কলেজিয়েট্ স্কুলে সে যখন ফোর্থ ক্লাসে পড়ে তখন বিয়ে হয়। স্বামী মন্মথ ছিল দেখিতে সুপুরুষ, তাহার চেহারা দেখিলে দু-দণ্ড তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়ে। লেখাপড়ায় অত্যন্ত ভাল। হরকুমার বাবুর সঙ্গে আলাপ হইয়া গেল একদিন কি-একটা উপলক্ষ্যে। বুঝি কোন বন্ধুর অসুখে সে তাঁহাকে ডাকিয়া নিয়া গিয়াছিল। দেখিবামাত্র ছেলেটিকে তিনি কি যে সুচক্ষে দেখিলেন। সুমনার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করিবার পরেও বাড়ির মেয়েরা আপত্তি তুলিয়াছিল ছেলের আর্থিক অবস্থা ভাল নয় বলিয়া। কিন্তু হরকুমার সে আপত্তি গ্রাহ্যে আনেন নাই।...সোনারটুক্‌রো ছেলে। ওকালতী পাস করাইয়া কলিকাতার আদালতে তিনি বসাইবেন। নিজে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী, জামাইকে সাহায্য করিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া যাইবেন। তোমার যা কি হইল, যে বছর মন্মথ ওকালতী পাস করিয়া বাহির হইল, সেই বছর সুমনার বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। মারা যাইবার পরে দেখা গেল কিছুই রাখিয়া যান নাই। বালীগঞ্জে এক সুবৃহৎ বাড়ি, মোটর, ছোট পাঁচ-বছর বয়সের একটি মেয়ে এবং বিধবা স্ত্রী। তবে একমাত্র আশার কথা তাঁর বড় ছেলে বছর-দুই আগে বিলেতী ডিগ্রী লইয়া ডাক্তারি সুরু করিয়াছে এবং বাবার পশার আস্তে আস্তে তাহার হাতে আসিতেছে। নরেন্দ্র প্রথমটায় খুব ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। বাবা বাঁচিয়া থাকিতে এত নাম এত টাইল কিন্তু মৃত্যুর পরে তাঁহার সিন্দুক শূন্য। এমন গোলমালের সময়ে সুমনা বা তার স্বামীর কথা কেহ ভাবিল না। পশ্চিমে জীবনযাত্রার ব্যয় অল্প, জিনিষপত্র সস্তা, তাই মন্মথ এখানে আসিয়া ওকালতীতে বসিল। সুমনা তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল সেই সব দিন কত আশা কত আনন্দেই না কাটিয়াছে। ওকালতি পাসের খবর যেদিন বার হইল সেদিন মন্মথ কত হাস্য-পরিহাস কত আমোদের ভিতর দিয়া তার কানে কানে এই অতিশয় প্রিয় সংবাদটি দিয়াছিল। তার পরে দুই জনে মিলিয়া ভবিষ্যতের কত ছবি আঁকা...কত স্বপ্ন দেখা...হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত সুমনার বাবা সন্ন্যাসরোগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন। যেখানে অনেক আলো জ্বলিতেছিল, সভা বসিয়াছিল, সঙ্গীতপ্রবাহ বহিতেছিল, সেখানে অকস্মাৎ আলো নিবিয়া গেল। গাঢ় তমিস্রায় সকলের নয়ন অন্ধকার হইয়া গেল। যাহা কিছু ছিল সমস্তই অকালে ভাঙিয়া গেল। সেই হইতে সুমনা বিদেশে। অল্প আয়ে অপরিচিত জায়গায় কোনক্রমে জীবনতরণী বাহিয়া চলিয়াছে। মনে আর আশা নাই, জীবনে আর জ্যোতি নাই। কালে সবই সহিয়া আসিতেছে।...কেবল আজিকার ব্যাপারটায় মনে বড় লাগিয়াছে। রোগা মেয়েটা অত মার খাইয়া কেমন যেন নির্জ্জীবের মত হইয়া পড়িয়াছে। অত যে সখের জুতা তাও অনাদৃতের মত আলনার তলায় পড়িয়া আছে। সুমনা ভাবিতেছিল সে ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে মোটরে করিয়া নিউমার্কেটে গিয়া কত দিন কত দামী জুতা কিনিয়া আনিয়াছে আর নিজের মেয়ের একটা সামান্য সখ... না, সখও নয়, অত্যপ্রয়োজনীয় একটা সামান্য জিনিষ, তাও কিনিয়া দিবার অধিকার বা সামর্থ্য তাহার নাই। নানা স্মৃতির আলোড়নে আপন অজ্ঞাতসারে চোখ দিয়ে-

তাহার জল পড়িতেছিল অত খেয়াল করে নাই। অস্ফুট চন্দ্রালোকে নিঃশব্দে অপরাধীর মত কে ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়া নিদ্রিতা মীরার পাশে আসিয়া বসিল। অনেক ক্ষণ ধরিয়া বড় যত্নে তাহার নরম রেশমের মত চুলগুলির উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

আধা আলোছায়াময় ঘরে কিছুই স্পষ্ট করিয়া দেখা যায় না।

"সুমনা!"

সুমনা চমকাইয়া উঠিল। তাহার পরে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া স্বামীর পানে চাহিয়া কহিল, "কি বলছ?"

"মেয়েটা কি বড় বেশী কাঁদছিল?…" মন্মথ ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে ঘুমন্ত মীরার মুঠিবাঁধা হাতটি খুলিয়া দিল।

"না, তেমন আর কি কাঁদছিল। ছেলেমানুষ অল্প সময়ের মধ্যেই সব ভুলে যায়। কিন্তু ফিরতে তোমার এত রাত হ'ল কেন?"…সুমনা তখন সাংসারিক জগতে ফিরিয়া আসিয়াছে। একটুখানি আগেকার ক্রন্দনবিবশা স্মৃতিভারাতুরা নারী তখন আর নাই, তাহার জায়গায় মমতাময়ী স্ত্রী আসিয়া স্থান নিয়াছে। সুমনা মনে মনে স্বামীকে ক্ষমা করিল তখনই। ভাবিল, একে ত লোকটা সংসারের ভার বহিয়া নানা জ্বালায় উদ্‌ভ্রান্ত। তাঁহাকে আর বৃথা কষ্ট দিই কেন।

"রাত অনেক হয়েছে। এবারে তুমি খেতে বসো। ভাতটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ব'লে গরম জলের কড়ার উপর বসিয়ে রেখে দিয়েছি। চলো দিইগে।"

কিন্তু মন্মথ যেন শুনিতেই পায় নাই, সে আপন মনে বলিয়া চলিয়াছিল, "ছুটে পালালুম…দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মীরার কান্না শুনতে পারলুম না। আহা মা আমার কতদিন পরে সবে দুটি ভাত মুখে দিয়েছিল। কি মনে করলে যে! এমনিতেই ত অনেক কষ্ট সুমনা, ছেলেমেয়েকে কখনও না-দিতে পেরেছি একটা সখের জিনিষ, না একটা খেলনা। বলে, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, আমারও হয়েছে তাই। সামনে পিছনে কোনদিকে তাকাবার আর অবসর নাই।"

"নাও, কি যে বকতে সুরু করলে পাগলের মত তার ঠিক নেই। রাগের সময় মানুষের অত ঠিক থাকে না। ছেলে-মেয়েকে তখন অন্যায় ক'রে দুটো বকে, মারে। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। আর সত্যিই ত, তোমার মাথা কি ঠিক রয়েছে, এক জনের উপর কত ভার।" সুমনা সান্ত্বনামাখা স্নিগ্ধ সুরে কহিল। দুই জনেই এবারে দু-জনের মনের কথা বুঝিল। বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকিল। আর কথা হইল না, মন্মথ খাইবার জন্য উঠি-উঠি করিতেছে এমন সময় হঠাৎ রাত্রির স্তব্ধতাকে চিরিয়া কোন্‌খান হইতে বাঁশীর একটা আওয়াজ আসিল। ক্রমে সিন্ধু, তার পর বাঁরোয়া, তার পরে ইমনকল্যাণ এবং তাহারও পরে বেহাগ বাজিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল সুরের সেই তরঙ্গাবেগে জ্যোৎস্নার সূক্ষ্ম উত্তরীয় যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মন্মথ অস্ফুট স্বরে কহিল, "ধনধনিয়ার সেই বেকার ভাইপোটা, রামখেলাওন্, এ তারই বাঁশী। ছোক্‌রা বাজায় ভাল। যেদিন তার মন খুলে যায় সেদিন প্রাণ দিয়ে বাজায়।" বাঁশী বাজিয়াই চলিল। অনেক ক্ষণ পরে থামিল। কিন্তু সুরের মূর্চ্ছনা যেন থামিতেই চায় না।

সুমনা আর মন্মথ চুপ করিয়া আছে। সুমনা ভুলিয়া গিয়াছে আর খাওয়ার তাগিদ দিতে। এখন যে তার অনেক কাজ বাকী। মন্মথর খাওয়া হইলে সে খাইবে, তার পর রান্নাঘর ধুইবে, হেঁসেল তুলিবে। সে-সব কথা নিঃশেষে ভুলিয়া গিয়াছে। মন্মথ ভুলিয়া গিয়াছে তাহার পাওনাদারের তাড়া, ভুলিয়া গিয়াছে তাহার নিরীহ রোগা মেয়েটাকে বিনা দোষে মারিয়া ফেলার মর্ম্মজ্বালা। বাঁশীর সুর তাহাকে প্রতিদিনের কাঁটার ঘা হইতে তুলিয়া আরও অনেক ঊর্দ্ধলোকে লইয়া গিয়াছে।

সেখানকার জ্যোৎস্নার আলো-হাওয়ার কম্পন, আকাশের তারা সমস্তই কেন্দ্র করিয়া আছে একটি অনিন্দ্যসুন্দর কিশোরী মুখকে। বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিয়া মন্মথ মৃদুস্বরে কানে কানে কথা বলার মত করিয়া কহিল, "মনে পড়ে সু—সেই যে তোমাকে বলতুম, বাড়ি থেকে যখন কলকাতায় আসতুম, কলকাতা ষ্টেশন যত এগিয়ে আসত ততই বুকের মধ্যে কি রকম করত। চোখে জল এসে পড়ত। মনে হ'ত, আর একটু পরে, তার পরেই তোমাকে দেখতে পাব। এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি আছে!"

সুমনা কোন কথা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তাহার

সমস্ত মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রীতিভরা চোখে সে একবার স্বামীর দিকে একবার ঘুমন্ত ছেলে-মেয়ের পানে চাহিল। একটু আগে মেয়েকে অন্যায় করিয়া অমন মারার জন্য স্বামীর উপর তাহার মনে যত অভিমান যত ক্লেশ সঞ্চিত হইয়াছিল, যত অশ্রুবাষ্প ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্ত কাটিয়া গেল। বাঁশীর সুরের মায়ায় তাহার একটানা ক্লান্তিকর জীবনের উপর হইতে এক নিমেষে যেন সকল আবরণ খসিয়া পড়িল। ছেলে অসুস্থ হইলে, রাগ অভিমান করিলে সব সময়ে ত তাহার মেজাজ ভাল থাকে না, তখন মায়ের উপর অযথা পীড়ন করে। মাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তাই বলিয়া মা কি ছেলের উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারেন? মাতার সেই বিশাল ধৈর্য্যপূর্ণ অন্তর লইয়া সুমনা তাহার স্বামীর সমস্ত কঠোর ব্যবহার ক্ষমা করিয়া ফেলিল। মনে মনে কহিল, 'বাইরের নানা অপমান নানা ধাক্কা ওঁকে সইতে হয়। তাইতেই আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে এমন ব্যবহার ক'রে ফেলেন। না-হয় মানলুম আমার ছোট সংসারে অনেক দৈন্য অনেক অভাব-অনটন। কিন্তু আমার মত এমন ক'রে ভালবাসবার সুযোগ পেয়েছিল ক'জনে, আর এত বেশী ক'রে তা ফিরে পেয়েছিলই বা কে।"

কয়েকটা বাড়ির পরে ধনধনিয়াদের মস্ত বড় ত্রিতলের ছাদে তখন রামখেলাওন বাঁশীতে কানাড়ার সুর ধরিয়াছিল। আকাশের তারা অতন্দ্র হইয়া চাহিয়াছিল, আর নিভৃত জ্যোৎস্না ক্ষণে ক্ষণে মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতেছিল।

সংস্কৃত-শিক্ষা ও জীবিকা

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

সংস্কৃত ভাষা একদিন ভারতের জাতীয় ভাষা ছিল। আজ হিন্দী ভাষাকে যে-স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে—ভাব-সম্পদে ও ভাষার চমৎকারিতায় সংস্কৃত ভাষা কোন আদিম যুগে আপনিই সে-স্থান অধিকার করিয়াছিল। জগতের বিভিন্ন জাতি এই ভাষার দর্শন সাহিত্য জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দে বিভোর। এই সংস্কৃত ভাষার অন্তরালে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের যে অমূল্য দান আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে তাহার সন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদের ক্রিয়াকলাপ ভজন-পূজন প্রায় সমস্ত বিষয়ই সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে হইয়া থাকে। আজও আমরা জ্ঞানে অজ্ঞানে উৎসবে ব্যসনে সেই সংস্কৃত ভাষারই সেবা করিয়া আসিতেছি। বিবাহ জীবনের শ্রেষ্ঠ সংস্কার। তাহাতেও আমরা সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্রপাঠ করিয়াই দাম্পত্য-জীবন লাভ করিয়া সংসারপথে প্রবিষ্ট হইতেছি। আমাদের চরম সংস্কার শ্রাদ্ধ তর্পণ—তাহাও দেবভাষার সাহায্যেই চলে।

জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি জাতীয় সাহিত্য। আজ অবশ্য রবীন্দ্র-শরৎ-সেবিত বঙ্গভাষা বাঙালীর জাতীয় সাহিত্যের দাবি রাখে। ভারতের কিন্তু নয়। একদিন এই সংস্কৃত ভাষা সে-স্থান পূরণ করিয়াছিল। সংস্কৃত আলোচনা শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারা ভারতের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতের হিন্দু সমাজের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের সাধারণ ভাষা ছিল সংস্কৃত। রাষ্ট্র বাণিজ্য প্রভৃতির কার্য্যকলাপের সংস্কৃত ভাষাই ছিল একমাত্র যোগসূত্র। আজ অবশ্য রাজভাষা ইংরেজী সে-স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার গৌরব বেদ বেদান্ত তন্ত্র পুরাণ স্মৃতি দর্শন সাহিত্য সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ।

যে-জাতি নিজের বিশেষত্ব বিসর্জ্জন দিয়া অপরের

ভাবধারায় ভাসিয়া চলে জগতের ইতিহাস হইতে সে জাতি শীঘ্রই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। হিন্দুর ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার সহিত পরিচয় রাখা একান্ত প্রয়োজন।

তথাপি একটি কথা ভয়ে ভয়েই বলিতে হয়—সংস্কৃত ভাষার সহিত আমরা আর ওতপ্রোত ভাবে মিলিতে পারিতেছি না। যদিও ক্রিয়াকলাপে আজও সংস্কৃত মন্ত্রই চলিতেছে, তথাপি আমাদের অজ্ঞতায় তাহা দিন দিন অসংস্কৃতই হইয়া উঠিতেছে। অনেক স্থানেই দেখা যায় পুরোহিত না-বুঝিয়া মন্ত্র পড়ান—যজমান তোতাপাখীর মত সেই বুলিই কপ্‌চাইয়া চলেন। কেহই অর্থ বোঝেন না; ইহারই জন্য ইন্দ্রশত্রুযাগের মত বিপরীত ফল প্রসব হয় কি না তা কে বলিবে?

অবশ্য ইহার জন্য দায়ী আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা। সংস্কৃত শিক্ষার্থীদিগের সম্মুখে একমাত্র যাজনক্রিয়া ভিন্ন অন্য কোনও পথ খোলা নাই। তাহা ভিক্ষারই নামান্তর। যতই তাহার অঙ্গে নৈতিক পোষাক পরান হউক্ না কেন, তবু তাহাকে আজ আর কেহ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না।

একদিন শাস্ত্রকারগণ উদাত্ত সুরে ঘোষণা করিয়াছিলেন 'সেবা শ্ববৃত্তির্মতা'—কাহারও সেবা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকে কুকুরের বৃত্তির সহিত তুলনা করিয়াছেন। সেই সেবাই আজ অবশ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের বরণীয় পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেবা শ্ববৃত্তি—একথা যাঁহারা বলিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন—'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'। ভিক্ষা অপেক্ষা চাকরি অর্থাৎ রাজসেবাও ভাল।

সংস্কৃত শিক্ষার্থীদিগের প্রধান বৃত্তিই যাজনক্রিয়া। কিন্তু আজ প্রতীচ্য শিক্ষিত সমাজে ঐ বৃত্তি ভিক্ষারই রূপান্তর। শ্রদ্ধাশীল যজমান নাই বলিলেও বেশী বলা হইবে না। শিক্ষিত মর্য্যাদাসম্পন্ন পুরোহিতের বুকেও আস্থাহীন যজমান-বাড়িতে কাজ করিতে আঘাত লাগে।

ইহা ভিন্ন জীবিকার আর একটি উপায়—স্কুলে পণ্ডিতী করা। কিন্তু তাহাও নির্দ্দিষ্টসংখ্যক। সে কাজের জন্যও প্রত্যেক স্কুলই চাহিয়া থাকেন—'ইংরেজী-জানা কাব্যতীর্থ'। আর আজিকার দিনে গ্রাজুয়েট কাব্যতীর্থও বিরল নয়। প্রতিবৎসর যে এতগুলি 'তীর্থ'-উপাধিধারী পণ্ডিত বাহির হইতেছেন তাঁহাদের সম্মুখে খোলা আছে কোন্ পথ? তাঁহারা নির্দ্দোষ ভাবে জীবিকার্জ্জনের জন্য কোন্ উপায় অবলম্বন করিবেন?

এই সকল কারণে দিন দিন সংস্কৃত পরীক্ষায় ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও কেবল সংস্কৃতাধ্যায়ী ছাত্রসংখ্যা দিন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, নিষ্ঠাবান পণ্ডিতের পুত্রও আজ শ্ববৃত্তির আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী অধ্যয়ন করিতেছেন। তাঁহার বা তাঁহার পিতার কাহারও আর সংস্কৃত-শিক্ষার প্রতি তেমন আস্থা নাই। গুরু বা পুরোহিত বংশের বহু সন্তান শ্ববৃত্তির মোহে স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিতেছেন। সেই শ্ববৃত্তিও আজ উঞ্ছবৃত্তিতে আসিয়া পর্য্যবসিত হইতেছে। ইহার প্রতিকার-চিন্তার সময়ও আসন্ন।

আজকাল সংস্কৃত-শিক্ষায় আর অন্নসংস্থান হয় না। অধ্যাপক-বিদায় শহরে বা শহরের উপকণ্ঠে দুই একটি হইলেও পল্লীর অধ্যাপকদিগের অদৃষ্টে তাহা জোটে না। তেমন বড়লোক বিরল যিনি অধ্যাপকবৃন্দকে মাসে মাসে দূরে থাক, বৎসরেও একবার সাহায্য করিতে পারেন বা করিয়া থাকেন। অথচ শত শত অকার্য্য করিয়াও (অপকার্য্য শতং কৃত্বা) যাহাদের ভরণপোষণ করিতে হইবে সেই পোষ্য পরিবারবৃন্দের ভরণপোষণ আর সংস্কৃত-শিক্ষার সাহায্যে চলে না। সংস্কৃত-শিক্ষার্থী যেন আজ সমাজের বুকে অভিশাপ-স্বরূপ। শত অকার্য্যের স্থানে সহস্র অকার্য্য করিয়াও তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও উপায় করিতে পারিতেছেন না।

সমাজ আজ শত ঝঞ্ঝাবাতে বিপর্য্যস্ত। অভাব-উৎপীড়ন আজ সার্ব্বজনীন হইতে বসিয়াছে। দীনতা-হীনতা-সঙ্কীর্ণতা ইহাকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়াছে। সম্মুখে পথ নাই—কোনও উপায় নাই।

সত্য কথা—পরের প্রতি চাহিয়া থাকার দিন চলিয়া গিয়াছে, এ-কথা উজ্জ্বল সত্য যে—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং
সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।

আজিকার দিনে সংস্কৃত-শিক্ষার্থী ছাত্রদিগকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যেন তাহাদিগকে সমাজের গলগ্রহ হইয়া জীবিকার জন্য পরের দ্বারস্থ না-হইতে হয়।

অবশ্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন অনেকে করিতেছেন। ঐরূপ হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি বিদেশীয় চিকিৎসা-বিদ্যা ভারতীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষা করিয়াও ঐ সকল বৃত্তি অবলম্বন করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণের বৈদ্যবৃত্তিগ্রহণ সমাজের কাছে আর হেয় নহে।

সংস্কৃত শিক্ষা করিলেই অন্নের জন্য ধনীর দ্বারে স্তাবক সাজিয়া দাঁড়াইতে হইবে ইহার কোনও মানে নাই। সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াও বিভিন্ন অর্থকর অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করা যাইতে পারে। পূর্ত্ত, স্থাপত্য, শিল্পবিদ্যা, বাণিজ্য প্রভৃতি যে কেবল ইংরেজীনবীশদিগের জন্যই খোলা আছে তাহা নয়। সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্রগণকেও পূর্ত্তবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে। এ-দেশে অনেক নিরক্ষর লোকও গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যের কন্ট্রাক্টারি করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। পণ্ডিতগণ কি সে কার্য্যেরও অনুপযুক্ত? ছবি আঁকিতে শেখাও তাঁহাদের উচিত। চিত্রবিদ্যাতেও অর্থ আছে।

আমরা হিন্দু। নিষ্ঠা আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া আছে। শাস্ত্র আমাদের শিখিতেই হইবে। কিন্তু মনে হয় ঐ সঙ্গে আর একটি অর্থকরী বিদ্যাও আমাদের শিক্ষা করা উচিত। তাহা হইলে শাস্ত্র ও সংসার উভয়েরই একসঙ্গে সেবা করিয়া জীবন-আহবে জয়শ্রী মণ্ডিত হওয়া যাইতে পারে।

আমি ভুক্তভোগী। সেই জন্য সমস্যাস্বরূপ এই প্রবন্ধটি সমাজের দ্বারে পেশ করিলাম। হয়ত, বর্ত্তমান শিক্ষা—সামাজিক আব্‌হাওয়া—আমাদের চালচলন ইহার বিপরীত পথেই উদ্দাম বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, তবু মনে হয়—আন্তরিক আগ্রহ, মধুর সহানুভূতি—পরস্পরের প্রীতির আদান-প্রদান হয়ত এ-পথকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিতে পারে। এ-সম্বন্ধে পূজনীয় বিদ্বন্মণ্ডলী, সামাজিকবর্গের অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু কি জানি কাহার যেন উদাত্ত সুরে ধ্বনিত হইতেছে—'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়'।

চিরন্তনী

শ্রীপারুল দেবী

এলাহাবাদেই বিয়ে। বরপক্ষীয়েরা প্রথমে আপত্তি তুলেছিলেন যে ঢাকা থেকে এলাহাবাদে আসবার সুবিধা হয়ে উঠ্‌বে না, বড়জোর কলিকাতা অবধি যাওয়া যেত পারে। বরযাত্রীরা কেউ কেউ রাগ ক'রে বললেন, যদি যেতেই হয় এলাহাবাদে, ত বর একাই যাক্‌—একরাত্রি নিমন্ত্রণ খাবার জন্য এতটা কষ্ট স্বীকার ক'রে তাঁরা কেউ যাবেন না। কিন্তু শেষ-অবধি আপত্তি টিকল না। পঁয়ষট্টি জন বরযাত্রীর রেলভাড়া ইত্যাদির খরচের টাকা এবং বিনয়বচনপূর্ণ সাদর নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়ে দিয়ে কন্যাপক্ষীয়েরা সে আপত্তি খণ্ডন করলেন।

দুই পুরুষ থেকে এলাহাবাদেই বাস—বাংলা দেশ এঁদের কাছে প্রায় বিদেশ হয়ে এসেছে। বাড়ির প্রথম মেয়েটির বিয়ে—কোথায় অজানা অচেনা কলিকাতায় যাবেন, কারই বা সাহায্য সেখানে নেবেন—কনের বাপ-মা ভেবেই দিশাহারা। যা হোক, পথখরচ ইত্যাদি বাবদে মোটা টাকা হাতে পেয়ে বরপক্ষীয়েরা যখন এলাহাবাদেই আসতে রাজী হলেন, কন্যাপক্ষীয়েরা সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

বসত-বাড়িতে এত লোক কুলোবে না ব'লে পাশেই আর একটা বাড়ি কিছুদিনের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাতেও এখন আঁটছে না। পরমাত্মীয়, আত্মীয় এবং অনাত্মীয়ের ভিড়ে বাড়ি গিস্‌গিস্‌ করছে। কোলাহলের বিরাম নেই। "ও ছোট বৌ, ছেলে যে কেঁদে সারা হ'ল, তোল্‌ না ভাই," "ওরে, হেমাকে ডাক্‌ না পুরুত-মশাইকে জলখাবারটা খাওয়াক কাছে বসে," "ছোটদা, এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

যাও না বাইরে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে একবার—বকুনি খাবে” ইত্যাদি মেয়েদের কলরবে এবং ছেলেদের “ওরে আন, ওরে ডাক্, ওরে তোল্” ইত্যাদি হাঁকাহাঁকি ডাকা-ডাকিতে বাড়ি একেবারে সরগরম। সকলেরই কাজ আলাদা, প্রয়োজন বিভিন্ন এবং সকলেই সব গোলমাল ছাপিয়ে নিজের দরকারী কথাটি অপরকে শুনিয়ে দিতে চায়। একটি ঘরে চারি পাশে বিছানার স্তূপ এবং কাপড়-চোপড়ের স্তূপের মধ্যে একটুখানি স্থান ক'রে নিয়ে বসে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে একটি বক্স-হারমোনিয়ামের সাহায্যে সঙ্গীত-চর্চ্চা করছিল। ওরই মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় বয়সের একটি ছেলে প্রাণপণ চেঁচিয়ে গান ধরেছিল “যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল, সখি গো।” যথাসম্ভব মুখ ব্যাদান ক'রে এবং গলার জোরে সুরের ত্রুটি ঢেকে নেবার চেষ্টার অভাব ছিল না এবং অন্য ছেলেগুলি নিজেরাও অল্পবিস্তর হাঁ ক'রে গায়কের মুখের দিকে তাকিয়েছিল, এমন সময়ে করুণা ঘরে ঢুকল।

করুণার চাবি হারিয়েছে। তারই বাক্সে কনের নূতন বাজুবন্ধ আছে, একটু পরেই কনে সাজাতে হবে, গয়নাটা চাই, কিন্তু চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। করুণা ঘরে প্রবেশ করতেই ‘সখি গো'র বিকট টান এক মুহূর্ত্তে থেমে গেল। করুণা বললে, “ওরে, বাপ্ রে, এই গরমে গলা ফাটিয়ে আর ভুল সুরে কীর্ত্তন গাস নে বাবা—থাম্ সব। কান গেল। একেই ত গোলমালে বাড়িতে টেঁকা দায় হয়েছে।…ওরে ওই ছেলেরা, লক্ষী বাবা সব—আমার চাবিটা খুঁজে দে না! পয়সা পাবে যে আমার চাবি খুঁজে দেবে—চার আনা পয়সা। সেই যে লম্বা চক্‌চকে চেনে-বাঁধা চাবির গোছা—একটা মস্ত লম্বা লোহার সিন্দুকের চাবি ঝোলান আছে তাতে—মনে নেই, সেই যে রে, ভানু, তুই যে আমার চাবি কাল নিয়েছিলি আমার বাক্স খুলতে, মনে নেই আবার কেন? দরকারের সময়ে বুঝি ভুলে গেলি? নে, নে, খোঁজ্ সব, পয়সা পাবি খুঁজে দিলে।”

ছেলেরা লোহার সিন্দুকের লম্বা চাবি ঝোলান ঝক্‌ঝকে চেনে বাঁধা চাবির গোছা এই বিয়েবাড়িতে যে কতগুলো দেখেছে তা গুণে উঠতে পারলে না—ঠিক কোন্ চাবিটা যে তাদের খুঁজে বার করতে হবে তাও বুঝলে না; কিন্তু এ-সব তুচ্ছ কারণে তাদের খোঁজা আটকাল না। কে প্রথমে খুঁজে পাবে এবং খুঁজতে পারলে চার আনা পয়সার অধিপতি হয়ে সে প্রথমে সেই পয়সায় কি করবে, তারা ঘোর গবেষণা করতে করতে কেউ খাটের তলায়, কেউ কাপড়ের আলনায়, কেউ খোলা বাক্সের মধ্যে চাবি খুঁজতে লেগে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাপড়ে-চোপড়ে জিনিষ পত্রে ঘরের গোছান জিনিষ সব হারিয়ে গেল, কিন্তু হারান চাবির সন্ধান পাওয়া গেল না।

ভাঁড়ার-ঘরের সামনের চওড়া বারান্দায় সারি সারি বঁটি পড়েছে, এবং তারই পাশে পাশে বস্তা বস্তা আলু, ঝুড়ি ঝুড়ি বেগুন এবং রাশীকৃত পটল রয়েছে। অল্পবয়সী মেয়েরা এদিকে কেউ ঘেঁষে নি; এখানে কনের মাসী পিসী খুড়ী জ্যেঠীর দল। কালিয়ার আলু কোটার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখে কথারও বিরাম নেই। বিরাজ-পিসী বলছিলেন, “তুমি আর বোক না মেজ বৌ, রেণুর বয়েস আর আমি জানি নে! তোমার যখন বিয়ে হ'ল, তখন তোমার ঐ ভাইঝি ত' মেজে থেকে হাত-দেড়েক উঁচুতে শূন্যে হাত রেখে মেয়েটির উচ্চতার পরিমাপ দেখিয়ে বললেন, “এই এত বড় মেয়েটি। আমার ইন্দু ত তখন মোটে মাস-আষ্টেকের মেয়ে। তা হ'লেই হিসেব ক'রে দেখ না রেণুর বয়েস কত হ'ল—ইন্দুর চেয়ে অন্ততঃ চার-পাঁচ বছরের বড় হ'ল কি না। তোমার দাদা মেয়ের বিয়ে না-দিয়ে আইবুড় ক'রে রেখেছেন বলেই ত আর মেয়ের বয়েসটিও তাই থেমে থাকবে না। আমার ইন্দু যে দু-ছেলের মা হ'ল।”

মেজবৌ ব'ললে, “না ঠাকুরঝি, রেণু ত আমার বিয়ের সময়ে অতবড় মেয়ে ছিল না। ও ত তখন হাঁটতেই পারত না। ও ইন্দুর চেয়ে মাস-কয়েকের বড় যদি হয়। এই ত মোটে সতেরোয় পা দিয়েছে।”

সই-মা বললেন, “তোমাদের ভাই কেমন বয়েস ভাঁড়ান স্বভাব। রেণুর সতেরো যে কোন্ কালে পেরিয়েছে—এখন আবার নতুন ক'রে সে সতেরোয় পা দেবে কেমন করে লা? এই আমি সেদিনই হিসেব ক'রে দেখছিলুম যে আমার সুরমার চেয়ে, রেণু তবে গিয়ে ঐ ইন্দু, সকলেই বড়। সেই আমার শাশুড়ী যে বছর মারা গেলেন, সেই বছরেই সুরমা হ'ল কি না—তাই হিসেবে ত ভুল হবার জো নেই। সবাই বললে, আমার শাশুড়ীই আমার মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়েছেন।

মায়া কাটাতে পারেন নি। আহা এমন শাশুড়ী কিন্তু কারুর হয় না ভাই, এমন মানুষ আজকালকার দিনে আর পাবে না, তা আমি তোমাদের বলছি। কিন্তু আমি হাজার হোক ছেলেমানুষ ছিলুম ত, ও-সব কথা শুনে ভয়েই মরি।... তা সে যাই হোক, তা হ'লেই হিসেব ক'রে দেখ না যে কার কত বয়েস। ইন্দু, রেণু, সুরমা সবাই ত ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছে। বয়েসে ছোট ছিল ব'লে সুরমাটা কেবল মার খেয়ে মরত সকলের কাছে, মনে নেই? আমার কাছে সবারই বয়েসের হিসেব পাবে, ভুল হবার জো নেই।"

পাশের বাড়ির বৌটি এলাহাবাদেরই মেয়ে, এলাহাবাদেরই বৌ-ও হয়েছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রং, দোহারা গড়নটি, পাতলা ঠোঁট দুখানিতে চাপা হাসিটি লেগেই আছে। বৌটি এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে আলু কুটছিল, এত ক্ষণ কুট্‌নো শেষ ক'রে বাল্‌তির জলে হাত ধুতে ধুতে হাসিমুখে বললে, "কি জানি দিদি, আমি ত নিজের মেয়েদেরই বয়েসের হিসেব রাখতে পারি নে, তা আবার পরের মেয়ের। কি ক'রে তোমরা এত মনে রাখ কি জানি! আমার বড় মেয়েটি এই বছর ম্যাট্রিক দিয়েছে; আমার যতদূর হিসেব তাতে ত তার এই আষাঢ় মাসে ষোল ভরল। কিন্তু সেদিন ঐ মুখুজ্জেদের বড়বৌ এসে ব'লে গেলেন যে ওর নাকি একুশ ভরে গেছে। ও-বাড়ির বড় পিসীমাও বলেন যে, আমার মেয়ের বয়েস না-কি তাঁর কাছে লেখা অবধি আছে—এই তেইশে পড়ল। শুনে শুনে ভাই ঘুলিয়ে যায় সত্যিকারের বয়েসটা কি—একুশ, না তেইশ, না ষোল। তাই নিজে আর হিসেব করবার চেষ্টাও তেমন করি নে—ভাবি পাড়ার পাঁচ জনে যখন সে কাজটা করছেন, আমি আর নাই করলাম।"

কথাটার প্রচ্ছন্ন খোঁচা বিরাজ-পিসী কতটা বুঝলেন তা ঠিক বলা যায় না; তবে এটুকু স্পষ্টই বুঝলেন যে কথাটা ঠিক সোজা ভাবে বলা হয় নি, একটু গোল আছে। কি উত্তর দেবেন ভাবছেন, এমন সময়ে সইমা খন্‌-খন ক'রে ব'লে উঠলেন, "তা ভাই—নিজেদের মেয়ের বয়েসটি কমিয়ে কমিয়ে বল যে তোমরা—কাজেই পরকে হিসেব রাখতে হয়। না হ'লে কার আর কি মাথাব্যথা বল না? এই দেখ না লীলা—ঐ যে ঐ হরিনাথবাবুর মেজছেলের বৌ গো, জাঁকে যার মাটিতে পা পড়ে না, অথচ কিসের যে এত জাঁক তা ত জানি নে—ঐ লীলা আজ তিন বছর থেকে ব'লে আসছে যে ওর মেজমেয়ে সরযূর চৌদ্দ বছর বয়েস। কাজেই না ব'লে থাকতে পারি নে। তবে তোমরা হ'লে লেখাপড়া-জানা মেয়ে, পাসটাশ্‌ করেছ, তোমাদের হিসেবই বোধ করি আলাদা। আমরা মুখ্যু মানুষ, অত ত জানি নে, যেটা চোখে দেখি সেইটেই বলি।"

মেজবৌ হেসে উঠল। বললে, "রাগ করছেন কেন সই-দি? সব মেয়েরই ত একদিন চৌদ্দ বছর বয়েস হয়, একদিন ষোলও হয়, আবার একদিন সে তেইশেও পড়ে—কেউ ত কোনটা ডিঙিয়েও যায় না, কোনখানে থেমেও থাকে না। আমার ভাইঝি রেণুর তেইশ হ'লে যদি আপনারা সব খুশী হন ত বেশ ত, তাই না, হয় হ'ল। আমার ত তাতে কিছু আপত্তি নেই।" বলতে বলতে বঁটি ছেড়ে উঠে মেজবৌ পাশের বাড়ির বৌটিকে উদ্দেশ ক'রে বললে, "ও কি ভাই, চলে যাচ্ছ যে? বলেছি না খোকার জন্যে মিষ্টি রেখেছি, না নিয়ে যেও না? আজ মিষ্টি না পাঠালে খোকা যে তার মাসীকে খেয়ে ফেলবে। এস, সরা সাজিয়ে ভাঁড়ারে রেখেছি, দিই গে। যা মাছি এখানে, খাবার জিনিষ কি বার করবার জো আছে?"

মেজবৌ বৌটিকে নিয়ে ভাঁড়ারের উদ্দেশে চলে গেল। বিরাজ-পিসী কিছু ক্ষণ তাদের দিকে চেয়ে থেকে তার পর এদিকে মুখখানা ফিরিয়ে বললেন, "মেজবৌর কথা শুনলে? আমরা যেন সব মিথ্যেবাদী! কেন সই মন্দ কথাটা কি বলেছে? চোদ্দ বছরের মেয়ে কি সত্যি চিরকাল ধ'রে চোদ্দই থাকবে নাকি? সত্যি কথাটা মুখের ওপর বলতে গেলেই আর সে কথা মিষ্টি লাগে না, অমনি রাগ হয়ে ওঠে সব। নিজেরাও সব খুকী সেজে আছেন—ধাড়ি ধাড়ি মেয়েদেরও সব খুকী ক'রে রেখেছেন, লজ্জাও করে না! ঐ দেখ না মেজবৌকে—বাক্স একেবারে রং-বেরঙের জামা-কাপড়ে ঠাসা—যেন পরবার বয়েস এখনও আছে আর কি। জিজ্ঞেস কর গে না—বলবে এখন ওরও এই তেইশ ভরেছে।"

সই-মা বললেন, "ঠিক বলেছ ভাই। বয়েস কমান হয়েছে

আজকালকার এক ফ্যাশান। ঐ রেণুর বয়েসের কথায় মেজবৌ অমন রাগ ক'রে উঠল বটে, কিন্তু বিনুনী পিঠে ঘুরিয়ে বেড়ালে কি হবে? কম-সম ক'রে ধরলেও ওর বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ হবে। হবে না ভাই প্রভা?"

প্রভা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে এবং নিস্তারিণীর দিকে তাকিয়ে বললে, "তা হবে। হবে না নিস্তার-দিদি?"

নিস্তার-দিদিও ঘাড় নেড়ে জানালেন যে তাঁরও সেইরকম মনে হয়—যদিও তিনি এই মাত্র তিন মাস হ'ল ছাপরা থেকে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য এলাহাবাদে ননদিনীর নিকট এসেছেন এবং এই তিন মাসের মধ্যে বার-দুইয়ের বেশী রেণুকে চোখে দেখেন নি।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে যখন স্থির হ'ল যে রেণুর সতের বছর বয়স সতের বছর আগে পেরিয়ে গেছে, তখন সকলে হৃষ্টচিত্তে যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রে বঁটি ছেড়ে অন্য কাজে গেলেন।

ক'নে নমিতার ঘরে আরও ভিড়। কুমারী এবং বিবাহিতা, বালিকা এবং কিশোরীর দল ক'নেকে ঘিরে ব'সে আছে। অত্যন্ত সাধারণ নমিতা যেন আজ অকস্মাৎ এক বিস্ময়কর বস্তু হয়ে উঠেছে, কেউ আর তার মুখ হ'তে একদণ্ড দৃষ্টি নামাতে চায় না। ক'নের মা গৌরাঙ্গিনী বাক্স খুলে কন্যার বিবাহসজ্জার উপকরণ বার ক'রে করুণার হাতে দিচ্ছিলেন—সে-ই কনে সাজাবে। শুধু কপালে চন্দন পরাবার নূতন পদ্ধতিটা তার ভাল জানা নেই—মেজবৌ এসে পরিয়ে দিয়ে যাবে। গহনায়, কাপড়ে করুণার শাড়ীর আঁচল ভরে উঠ্‌ল—গহনার ছোট-বড় নানা রকম বাক্সগুলি সে খাটের উপর সাজিয়ে রাখতে রাখতে বললে, "বাব্বা, যা রোগা মেয়ে, এত গয়নার বোঝা বইতে পারলে হয়।"

সারাদিনের উপবাসে ক্লান্ত দেহ—তার ওপর একমাত্র মেয়েটির আসন্ন বিরহ-বেদনায় মায়ের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেছে, কোনও কাজে মন লাগছে না। ইচ্ছা হচ্ছে সব সরিয়ে নিভৃতে মেয়ের কাছে একটু বসেন—তাকে কোলে বসিয়ে মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেন; তার নবগৃহযাত্রা-পথকে স্নেহ-অভিষিক্ত ক'রে দেন। যে তাঁরই একমাত্র আপনার ধন ছিল, সে আজ পরের গৃহে পর হ'তে চলেছে। সেই বিদায়ের আয়োজন করতে করতে মায়ের দুই চোখে অশ্রুর আর বিরাম নেই। সকলের নিকট হ'তে আপনাকে তিনি লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন—বার-বার নিজেকে বোঝাচ্ছেন যে আজ মঙ্গলের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই—কিন্তু মন মানে না।

যা-কিছু বাক্সে গোছান ছিল, সব বার ক'রে করুণার হাতে দিয়ে মা বললেন, "ওরে, ঘরে যে বড় ভিড় হয়েছে মা। যে যে তোরা ক'নে সাজাবি, তারাই শুধু ঘরে থাক্—আর সকলকে বল্ যে ক'নে সাজান হয়ে গেলে পরে তখন এসে দেখবে। উপোস ক'রে এই গরমে আর লোকের ভিড়ে মেয়েটার মুখ শুকিয়ে কি হয়ে উঠেছে!"

করুণা হেসে বললে, "মাসীমা কেবলই মেয়ের মুখ শুকনো দেখছ—কোথায় বাপু তোমার মেয়ের শুকনো মুখ? এখন তোমাকে দেখে ওর চোখ ছলছলিয়ে এল—না হ'লে এতক্ষণ ত কত হাসি-তামাশা করছিল আমাদের সঙ্গে। তুমি যাও না নিজের কাজে—শুক্‌নো মুখে হাসি ফুটতে দেরি লাগবে না। তোমার মুখখানা যা হয়েছে, ও দেখে আমাদেরই কান্না পাচ্ছে, তা ওর ত পাবেই। তুমি যাও এ-ঘর থেকে।"

গৌরাঙ্গিনী মেয়েদের ভিড় ঠেলে নমিতার কাছে এসে বসলেন। আঁচল দিয়ে তার মুখটি মুছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "খাবি কিছু?" মায়ের স্নেহস্পর্শে নমিতার চোখে জল ভরে এল, সে কথা বলতে পারলে না, ঘাড় নেড়ে জানালে যে সে কিছু খেতে চায় না। মায়ের বুকে কান্নার ঢেউ কণ্ঠ অবধি ঠেলে এল, তিনি তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

পাশের ঘরে করুণার মা অর্থাৎ গৌরাঙ্গিনীর দিদি ব'সে কনের বাক্সে কাপড় গোছাচ্ছিলেন। গৌরাঙ্গিনী সেই ঘরে ঢুকতেই তিনি মুখ তুলে বললেন, "হ্যারে গৌরী, তুই কি বাজারে আর কিছু কাপড় রাখিস নি? করেছিস কি? এত কাপড় এই একটা বাক্সে আমি ধরাই কি ক'রে? এ বাক্স যে শুধু বেনারসী আর রেশমের কাপড়েই ভরে উঠ্‌ল—এই শান্তিপুরী, ঢাকাই, আর তাঁতের শাড়ীর গাদা আমি এখন ঢোকাই কোথা?"

গৌরাঙ্গিনী ক্লান্ত ভাবে আলমারীর গায়ে ঠেস দিয়ে সেইখানে মেজেতে বসে পড়লেন। উদাসীন ভাবে

বললেন, "যা ভাল বোঝ কর দিদি, আমি আর অত ভাবতে পারি নে।"

তাঁর দিদি জিজ্ঞাসুভাবে ভগিনীর দিকে তাকালেন। প্রশ্ন করলেন, "কেন রে, তোর হ'ল কি?"

গৌরাঙ্গিনী বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, "হবে আবার কি? মেয়েটা চলল আমার ঘর ছেড়ে পরের ঘরে কোথায় কত দূরে তার ঠিক নেই, আমার কি যে হচ্ছে মনের মধ্যে তা ত কেউ বুঝতে পারছে না। ও-সব গয়নাগাঁটি কাপড়-চোপড় যখন সখ্ ক'রে কিনেছিলুম তখন কিনেছিলুম, এখন আর ও-সব কিছুই ভাল লাগছে না। তুমি আমায় ও-সব কথা কিছু জিজ্ঞেস ক'রো না দিদি।"

দিদি বললেন, "ওমা, ও কি রে? অমন ভাল জামাই হচ্ছে, কত ভাগ্যি তোর—কত আনন্দের দিন আজ, আজকে অমন মনখারাপ করতে আছে কি? তোর ঘর ছেড়ে যে ঘরে যাচ্ছে আজ সেই ঘরে চিরকাল থাকে যেন ভাই। তোর ঐ একটি মেয়ে, বড় একলা পড়বি ওকে দূরে পাঠিয়ে, তাই কিছু কষ্ট হবে বইকি প্রথম প্রথম; কিন্তু এর পর মেয়ের হাসিমুখ দেখলে তখন আবার নিজের কষ্ট ভুলে যাবি, তাও ব'লে দিলাম।... ওমা, দেখেছ, এই কাপড়ের রাশ থেকে আবার একখানা পূরবী শাড়ী বেরোল! না ভাই, তোমার মেয়ের কাপড় তুমিই গোছাও এসে, আমাকে দিয়ে হবে না। আচ্ছা, এক পূরবী শাড়ীই ক'খানা কিনেছিস কি করতে বল্ ত?"

গৌরাঙ্গিনী শাড়ীর কথায় কান দিলেন না। বললেন, "হ্যাঁ, মেয়ের হাসিমুখ! কেঁদে কেঁদে ত সারা হচ্ছে আজ সাত দিন থেকে! এই এখনই দেখে এলাম চোখের জলে ভাসছে। রোজ রাত্তিরে যা ক'রে আমাকে আঁকড়ে শুয়ে থাকে। কখনও একদিন আমাকে ছেড়ে দূরে থাকে নি—কি ক'রে যে সেই অত দূরে ঢাকায় গিয়ে থাকবে জানি নে।"

মেয়ের বাপ অমরেন্দ্র ঘরে ঢুকলেন। লম্বা ফরসা চেহারা, রগের কাছে চুলে সামান্য পাক ধরেছে—চশমা-পরা। স্বামি-স্ত্রী কাউকে দেখেই বোঝা যায় না যে এঁদেরই আজ জামাই আসছে।

অমরেন্দ্র ঘরে ঢুকে বড় শ্যালিকার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি দিদি, তুমি যে কাপড়ের রাশির মধ্যে ডুব দিয়েছ একেবারে! করছ কি ওগুলো নিয়ে?"

গৌরাঙ্গিনীর দিদি হাসিমুখে বললেন, "কি করব ভাই—যা কাপড়ের রাশ কিনেছ তোমরা—না ডুবে করি কি বল? গৌরীকে তাই ত বলছিলুম যে এ কি কাণ্ড তোমাদের? এ কাপড়ে যে পাঁচটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়, একটাকে এত দিলে সে প'রে উঠবে কত দিনে? আমি ত তাই ভাবছিলুম যে খানকতক এই থেকে বেছে নিয়ে রেখে দিলে হয়—আবার ত এই পূজো আসছে সামনে, তখন তত্ত্ব দিলেই হবে। তা মেয়ের মা ত মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার ভাবনাতেই উতলা—ও ত কোনও কথায় কান দেয় না। তুমিই বল না, রাখব নাকি?"

অমরেন্দ্র জিব কেটে বললেন, "সর্ব্বনাশ! মতামত দেব আমি? কোনও দিন ওটা অভ্যেস নেই দিদি, জানই তো। সে কাজটা এই ইনিই সব সময়ে ক'রে থাকেন। দুই-এক বার মত প্রকাশ করতে গিয়ে দেখেছি যে, ঠিক যে জায়গাটিতে মত দেওয়া আমার উচিত ছিল, সেইখানেই ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে ফেলেছি এবং যেখানে ঘোর আপত্তি জানান উচিত ছিল, সেই জায়গাটিতেই সম্মতি দিয়ে এসেছি। অবিশ্যি আমার সে-সব ভুল ইনিই আমাকে পরে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, না হ'লে আমি বোকা মানুষ, অত বুঝতে পারি নে। কাজেই ও গোলমালের মধ্যে আমাকে আর কেন?"

গৌরাঙ্গিনীর দিদি হাসতে লাগলেন। বললেন, "ওমা, ও কি গো? শ্বশুর হ'তে যাচ্ছ, একটা মত অবধি দেবার ক্ষমতা নেই নিজের বাড়িতে? এমন পুরুষমানুষও ত কখনও দেখি নি। দেখ ত একবার গৌরী কি টাকাটাই নষ্ট করেছে! পাঁচখানা দামী দামী বেনারসী কিনেছে বাক্সে দেবার—একে নষ্ট বলে না? বেনারসী পরে কোথা আজকালকার মেয়েরা? সে সব ছিল আমাদের কালে—তখন ত আর এত রকম-বেরকমের শাড়ী হয় নি—ভাল শাড়ী না-হয় ঐ বেনারসী, কিন্তু এখন এত কেন? দু-খানা কিনলেই ত ঢের হ'ত।"

গৌরাঙ্গিনী ক্লান্ত দেহে আলমারীতে ঠেস দিয়ে নিস্পৃহ

চোখে কাপড়ের রাশির দিকে চেয়ে নীরবে বসেছিলেন। এখন বললেন, "কেন আর গোলমাল করছ দিদি? মেয়েটার নাম করেই কিনেছি সব, দাও না বাপু ওকেই সব দিয়ে। ভগ্নীপতিকে এত রাখারাখির কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? ও রেখে হবে কি ছাই? তোমার ভগ্নীপতি কি আবার একটা বৌ বিয়ে ক'রে আনবে নাকি যে তাকে ছুটো বেনারসী দেবে?"

অমরেন্দ্র বললেন, "কথার সংযোগটা দেখলে দিদি? তোমার বোন ত লজিক পড়েন নি—কিন্তু ছুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন কথাকে একটি সূত্র দিয়ে যুক্ত ক'রে দেখাবার কি অদ্ভুত ক্ষমতা দেখলে একবার? আশ্চর্য্য!"

গৌরাঙ্গিনীর দিদি হেসে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "ওর এখন মন খারাপ হয়ে রয়েছে ভাই—তুমি আর ওকে রাগিও না।...কিন্তু হ্যারে গৌরী, এত মন খারাপই বা কেন বাপু তোর? বিয়ে হ'লেই মেয়ে পরের বাড়ি যাবে, এ ত যেদিন মেয়ে জন্মেছে সেইদিনই জেনেছিস—আজ কি নতুন জানলি? আর কই, নমিতার ত দিব্যি হাসি-মুখ দেখে এলাম রে—কত মেয়ে কত কান্নাকাটি করে, তোর মেয়ে ত লক্ষ্মী। কুণির বিয়ে হ'ল দেখিস নি? বাপ্‌রে, মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না ত, যেন ধ'রে মারছে। এমনি কাণ্ড তার! ও বাপু আমার কিন্তু ভাল লাগে না, তা যাই বলিস। করুণাও বিয়ের সময়ে সুরু করেছিল অমনি কান্না—ছুই ধমক দিয়ে তখন চুপ করাই।"

গৌরাঙ্গিনী অপ্রসন্ন মুখে বললেন, "আমাদের করুণার একটু মায়াই কম দিদি, তা তুমি যা-ই বল। সব মেয়ের কি আর সমান টান হয়? নমিতা যে দিদি 'মা' বলতে অজ্ঞান। মা খাওয়াবে, মা শোওয়াবে, মা ওর সব কাজ ক'রে দেবে এখন অবধি, তবে মেয়ের হবে। আমার কেবল ভয় হয় ও শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কান্নাকাটি ক'রে একটা অসুখে না পড়ে। ছেলেমেয়েরা কত মাসীর বাড়ি, পিসীর বাড়ি সখ ক'রে বেড়াতে গিয়েও ছু-চার দিন মা ছেড়ে থাকে ত? তা ও মেয়ে তা-ও এক দিনের জন্যে কখনও যেতে চাইত না। উনি বরং কতদিন বলেছেন যে ইস্কুলের ছুটির সময়ে যাক্ না রাঁচিতে, হয় তোমার কাছে নয় ন'দির কাছে, তা কি কিছুতে যেতে চাইত? এই ত উনি বসে—ওঁকেই জিজ্ঞেস কর না। আমি কি আর মিছে বলছি?"

দিদি বললেন, "মিছে কেন বল্‌বি? আইবুড় মেয়ে, একটি মোটে মেয়ে—মা-অন্ত-প্রাণ ত হবারই কথা। এতে আশ্চর্য্যির কি আছে? কিন্তু তা ব'লে যাই বলিস গৌরী, মাসী-পিসীর বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ি আমাদের বাঙালীর মেয়ের কখনও এক হয় না। মাসী-পিসীর বাড়ি লোকে ছু-দিন পাঁচ দিন বেড়াতে যায়—সে কারুর ইচ্ছে হ'ল ত গেল, না ইচ্ছে হ'ল ত না-ই গেল—কিন্তু শ্বশুরঘর না ক'রে উপায় কার আছে? যা করতেই হবে জানে—বড় হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, লেখা-পড়া শিখেছে, তাতে অবুঝের মত কান্নাকাটি করবে কেন? তুই মিছে ভাবিস নে, দেখিস্ শ্বশুরবাড়ি গিয়ে নমিতা দিব্যি থাকবে। সবাইকেই ত দেখছি।...আমি আর একটা বাক্সর জোগাড় দেখি, এতে ত আঁটল না। অমনি তুইও ওঠ্, চল্ একটু সরবৎ-টরবৎ কিছু খাবি। মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।"

অমরেন্দ্র বসে পড়েছিলেন, এখন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "সবাই এ পৃথিবীতে নিজের নিজের দেখে। ইনি ভাবছেন এঁর মেয়ের কথা, তুমি ভাবছ তোমার বোনের কথা—আমার ত এখানে মাও নেই, বোনও নেই, আমার কথা আর কে ভাববে বল? আর এ পৃথিবীর এমনই নিয়ম যে, যে-হতভাগ্যের জন্যে ভাববার কেউ নেই, সে নিজেও নিজের জন্যে ভাবতে ভুলে যায়। দেখ না, আমি বাইরে থেকে এসেইছিলুম ঐ সরবৎ-টরবৎ জাতীয় কিছু একটা চেয়ে খাব ব'লে—গরমে, খেটে খেটে, আর সকাল থেকে উপর্য্যুপরি চারবার শুধু শুকনো সন্দেশ গিলে উপোস ক'রে তেষ্টায় আমার গলা শুকিয়ে গেছে। তা তোমাদের ছুই ভগ্নীকে এখানে একত্র দেখে নিজের কষ্টের কথা ভুলেই ব'সে আছি। তুমিও কেবল তোমার বোনের তৃষ্ণাটাই অনুভব করলে—অথচ খুব সম্ভব তিনি তাঁর কন্যার শ্বশুর-গৃহযাত্রারূপ মহা গোলমেলে ঘটনায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তৃষ্ণা অনুভব করতে ভুলেই গেছেন। কিন্তু আমার বুক, গলা, মুখ, চোখ সব শুকিয়ে উঠেছে তেষ্টায়, তা তোমার চোখেও পড়ল না। হা অদৃষ্ট!"

গৌরাঙ্গিনীর দিদি হেসে বললেন, "এখনও যে এক ঘণ্টাও হয় নি গো, তোমাকে সন্দেশ ফল জল সব খাইয়ে এসেছি—এর মধ্যেই আবার যে তোমার পা থেকে মাথা অবধি তেষ্টায় শুকিয়ে উঠেছে তা কেমন করে জানব বল? বাপ রে, সকাল থেকে মোটে চারবার সন্দেশ খেয়ে নির্জ্জলা উপোস করা—তোমার বড়ই কষ্ট হ'ল বল।"

অমরেন্দ্র বললেন, "অমন একটা তৃষ্ণায় ছাতি-ফাটার করুণ কাহিনী শোনালাম তাতেও দয়া নেই? 'পাষাণী রমণী' কবিরা কি আর সাধ ক'রে ব'লে গেছেন? সবায়েরই এমনি এক একটি হৃদয়হীনা প্রাণী ছিল আর কি! যাক্, আমারই অন্যায় হয়েছিল তোমাদের কাছে তৃষ্ণার জল চাইতে আসা। যাই দেখি পিসীমাদের ভাঁড়ারে, যদি কিছু পাই।"

গৌরাঙ্গিনীর দিদি বললেন, "চল, চল, আমিই দিচ্ছি, পিসীমাদের কাছে আর যেতে হবে না। আয় রে গৌরী।"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "মেয়েটাকেও ডাক না দিদি—খাওয়াই কিছু। ক'দিন দিনে খাওয়া নেই, রাত্রে ঘুম নেই, সারা হ'ল মেয়েটা।"

"এগো তোরা, আমি নমিতাকে ডেকে আনছি" ব'লে দিদি বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে অমরেন্দ্র ও গৌরাঙ্গিনীও তাঁর অনুসরণ করলেন।

* * * *

আশ্বিন মাস। পূজা এল বলে, আর দশ দিন মাত্র বাকী আছে। নমিতাকে শ্রাবণ মাসে বিয়ের পরেই তাঁরা নিয়ে গেছেন, তার পর ভাদ্র মাস পড়ে যাওয়াতে আর পাঠান হয়ে ওঠে নি। গৌরাঙ্গিনী থাকতে না-পেরে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি স্বামীকে জোর-জবরদস্তি ক'রে ধ'রে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় গিয়ে চার দিনের জন্য মেয়েকে দেখে এসেছেন; তার পর ফিরে এসে দিন গুণছেন মেয়ে কবে তাঁর কাছে আসবে। পূজার সময়ই পাঠাবার কথা। জামাইকে বেয়াইকে বার-বার ব'লে এসেছেন পূজার সময়ে জামাই মেয়ে যেন আসে তাঁর কাছে, কিছুতে যেন অন্যথা না-হয়। নূতন কুটুম্ব অত্যন্ত ভদ্র। ছেলের পিতা বেহানকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁর মেয়ে-জামাই তাঁর কাছে যাবে এ আর বড় কথা কি, তিনি নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন।

গৌরাঙ্গিনীর এলাহাবাদের বাড়িতে ঘর অনেকগুলি। স্বামি-স্ত্রী দু-জনের মাত্র সংসার—সব ঘরই খাঁ-খাঁ করে। দুপুরে শূন্যগৃহে গৌরাঙ্গিনী একবার এঘর, একবার ওঘর করে বেড়ান; কর্ম্মবিহীন দীর্ঘ অবসর কাটানো দুষ্কর হয়ে ওঠে, কন্যাহীন অনভ্যস্ত গৃহে কোনও মতে মন বসে না। নমিতার কাপড়ের আলমারীতে তার পুরান কাপড়জামা ঠাসা—বিয়ের ক'নের সঙ্গে পুরান কাপড় দিতে মায়ের মন সরে নি, তাই সবই রয়ে গেছে। সে এইবার এসে সব আবার পরবে, তার পর যাবার সময়ে নিয়ে যাবে। সেই আলমারী খুলে, বার-বার ঝেড়ে কাপড়গুলি নূতন ক'রে গুছিয়ে রাখেন। মেয়ের কাপড়গুলি নাড়াচাড়া ক'রে মায়ের মন তৃপ্তি পায়।

সেদিন অমরেন্দ্র আপিস থেকে ফিরে দেখলেন যে, তাঁর শয়নগৃহ-সংস্কারকার্য্যে বাড়ির চাকরগুলা, মায় মালীটা পর্য্যন্ত সকলেই মহা ব্যস্ত। ঘরের জিনিষপত্র বারান্দায় বার করা হয়েছে এবং চাকরেরা ধরাধরি ক'রে ও-ঘরের বড় আলমারী এ-ঘরে নিয়ে আসছে, বসবার ঘরের বড় গালিচাটা এ-ঘরে টেনে এনেছে, পাতা হবে মেজেতে, জিজ্ঞাসু নেত্রে স্ত্রীর প্রতি তাকিয়ে তিনি বললেন, "ক'দিনই বা আছে আর? নমিতা আসছে, প্রথমবার জামাই আসছে, ভাল শোবার ঘরটা না-ছেড়ে দিলে কখনও হয়? আমরা ঐ পশ্চিমের দিকের ঘরটায় শোব ক'দিন।"

অমরেন্দ্র বললেন, "সে ত এখনও দশ দিন দেরি গো। আর আসে কিনা তাই দেখো আগে। কই, এখন অবধি ত ওরা নিশ্চয় আসছে ব'লে কোনও খবরই পাই নি। তুমি এতও পার সত্যি! কোথায় কি তার ঠিক নেই, তার জন্যে এই জিনিষপত্র নাড়ানাড়ি করছ আজ সারাদিন ধরে? ক্রমে ক্রমে করলেই ত হ'ত, এত তাড়াতাড়ি কি?"

গৌরাঙ্গিনী স্বামীর কথায় অপ্রসন্ন হয়ে বললেন, "তাড়া আবার কোথায় করলাম? তোমাদের সেই শেষ মিনিটেতে সব না করলেই অমনি তার নাম হয়ে যায় তাড়াতাড়ি করা। ঘরদোর গোছাব, ঝাড়াব, জিনিষপত্র ঠিক করাব—শেষের দু-দিন ত আমার ওদিকের খাবার-দাবার করতেই যাবে,

তখন কি আর এসব দিক দেখবার সময় পাব? আমাকে ত আবার সব দিক একাই দেখতে হয় কি না—তোমাকে দিয়ে ত এতটুকু সাহায্য কোনও দিকে পাবার জো নেই। নমি আবার বার-বার বলে দিয়েছে—মা, যদি যাই ত তুমি নিশ্চয় ষ্টেশনে নিতে এস। মাকে দেখবার জন্তে তার প্রাণ যা করছে তা আমিই জানি। এসেই যদি ষ্টেশনে আমাকে না-দেখতে পায় ত কি অনর্থ করবে দেখো তখন।... এই দেবী সিং, ও আয়নাটা কোথায় রাখছিস? ব'লে দিলুম না যে ওটা এই পূবমুখো রাখবি? সর্ সর্, আমিই টেনে আনছি। তোরা ত সব সময়ে উল্টোটি ক'রে আমার কাজ বাড়াতেই আছিস কিনা।"

অমরেন্দ্র এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, "এ-ঘর ত তোমার মেয়ের ঘর হয়ে গেল দেখছি—আমার বোধ হয় প্রবেশ নিষেধ? আচ্ছা, পশ্চিমের ঘরটাই ওদের দিলে দোষ হ'ত কি? সেটা ত আমার মনে হয় এর চেয়ে ভালই ঘর—আর এত নাড়াচাড়ি ক'রে হাঙ্গামও করতে হ'ত না। তা যাক্, যা করছ তা কর, কিন্তু আমি এখন স্নান-টান করি কোথা? স্নানের ঘরটাও আজ থেকে আমার ব্যবহার বন্ধ নাকি?"

গৌরাঙ্গিনী বললেন, "এ স্নানের ঘরটা ওদেরই দিলুম। তোমার জন্তে ঐ পশ্চিমের গোসলখানাটা ঠিক করিয়ে দেব—এই যাচ্ছি এখনই। এই আলনায় নমির সেমিজ-টেমিজগুলো বার ক'রে রেখেই চল যাচ্ছি ওদিকে তোমার সব ব্যবস্থা করিয়ে দেব।"

ইংরেজী গানের একটা শিষ দিতে দিতে অমরেন্দ্র নিজের নূতন শোবার ঘরের উদ্দেশে চলে গেলেন। কিন্তু একটু পরেই সে ঘর থেকে চেঁচামেচি শুনতে পাওয়া গেল, "কই গো, আমার কাপড় কই, তোয়ালে কই, জল কই, সাবান কই? কিছু যে নেই এখানে। তোমার মেয়ে স্নান করবে আজ দশ দিন পরে এসে, তার কাপড় বার ক'রে সাজান হয়ে গেল, আর আমি এদিকে কি দাঁড়িয়ে থাকব নাকি? ও:গো—।"

কিন্তু গৌরাঙ্গিনীর কাছে থেকে সাড়া পাওয়া গেল না। অমরেন্দ্র এসে আবার সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। একখানা ডাকের চিঠি হাতে নিয়ে গৌরাঙ্গিনী খাটের উপর বসে আছেন। অমরেন্দ্র ভয় পেয়ে কাছে এসে স্ত্রীর হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে নিলেন; উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "কি হয়েছে গৌরী?" বলতে বলতেই চিঠিখানার দিকে চেয়ে দেখলেন যে নমিতার লেখা। পড়লেন নমিতা লিখেছে, "শ্রীচরণেষু মা, এবার পূজার ছুটিতে আমাদের তোমার কাছে যাবার কথা ছিল, আমার শ্বশুরেরও ইচ্ছা যে আমরা যাই, কিন্তু উনি বলছেন যে এলাহাবাদ বড় পুরান জায়গা, ওখানে যা দেখবার ছিল অনেক বারই দেখা হয়ে গেছে। পূজার ছুটিটা এবার কোনও নূতন জায়গায় কাটাতে চান। ওঁর খুব ইচ্ছা যে আমি ওঁর সঙ্গে পুরী বেড়াতে যাই। সমুদ্র ত কখনও দেখি নি, তাই তোমরা যদি অমত না কর ত আমিও ভাবছি এবার না-হয় পুরীর সমুদ্রটা দেখে আসি। শুনেছি নাকি অমন ঢেউ আর কোথাও হয় না। বড়দিনের ছুটিতে তোমাদের কাছে যাব। তোমার জন্তে বড় মন কেমন করে; বাবার কথাও সব সময়ে মনে হয়। আমার প্রণাম জেনো। ইতি তোমার নমিতা।"

অমরেন্দ্র স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। গৌরাঙ্গিনী চোখের জল সামলাইতেছিলেন।

ছোটনাগপুরে সাহিত্যসেবার উপাদান

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়

২

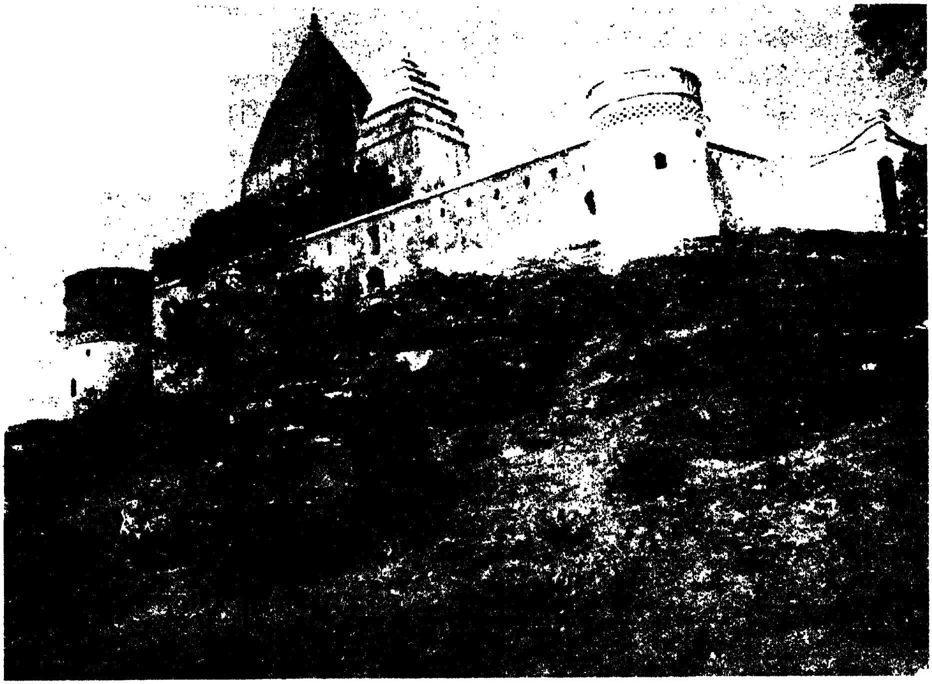
ঐতিহাসিক যুগ

প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা ছাড়িয়া এইবার ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিব। সর্ব্বপ্রথমে আমরা ছোটনাগপুরের আর্য্যবংশসম্ভূত জৈনদের প্রভাবের কিছু নিদর্শন পাই। মানভূম জেলায় তেলকুপী, পাড়া, দল্‌মা প্রভৃতি গ্রামে অনেকগুলি জৈনমূর্ত্তি পাওয়া যায়; তাহাদের কতক অটুট এবং কতক ভগ্ন। রাঁচি জেলাতে ও মানভূমে যে সরাক নামে জাতি এখনও বর্ত্তমান তাহারা জৈন 'শ্রাবক'দেরই বংশধর। রাঁচি জেলার এক গ্রামে একটি নগ্ন জৈনমূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় পাইয়াছি। হাজারিবাগ জেলার পরেশনাথ পাহাড়ে জৈন-তীর্থঙ্কর পরেশনাথ তপস্যা ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; ইহা বহুকাল হইতে জৈনদের একটি প্রধান তীর্থস্থান। সিংহভূম জেলায় বেণুসাগর গ্রামে বেণুসাগর নামে যে বাঁধ বা দীর্ঘিকা আছে তাহার তীরে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বেগ্‌লার (Beglar) সাহেব একটি জৈনমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন; তিনি এখানে একটি প্রস্তরমূর্ত্তিও পাইয়াছিলেন—তাহা জৈন কি বৌদ্ধ ঠিক নির্ণয় করা যায় না।

বৌদ্ধ প্রচারকগণ যে বর্ত্তমান মানভূম জেলায় আগমন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আরও সন্তোষজনক; সেখানে কয়েকটি গ্রামে কতকগুলি সমগ্র বৌদ্ধমূর্ত্তি ও অনেক বৌদ্ধ মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়; তাহাদের মধ্যে একটি গ্রামের নামই বুদ্ধপুর। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউএন সাঙ্ যে কিরণসুবর্ণ (Kio-lo-na Sufa-la-na) প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন সুবর্ণরেখা নদীর উপত্যকা মানভূম জেলা তাহারই অন্তর্গত ছিল, কানিংহাম এরূপ অনুমান করেন; কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁহার পরবর্ত্তী বিশেষজ্ঞগণ অন্য মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ছোটনাগপুরের ওঁরাও জাতি যে 'ধর্ম্মে' বা ধর্ম্মদেবতার পূজা করে, ভগবানের সেই নাম সম্ভবতঃ বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত। তবে ওঁরাওরা বিহার হইতে রোহটাস্ পাহাড়ের পথ দিয়া মুণ্ডাদের অনেক পরে পালামৌ হইয়া রাঁচি জেলায় আগমন করে। সম্ভবতঃ বিহার হইতে এই 'ধর্ম্মে' নামটি আসিয়াছিল। পালামৌ শহরের অনতিদূরে চেরো রাজাদের যে পুরাতন কেল্লা দেখা যায়, তাহার পূর্ব্ব-তোরণে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল। ঐ চেরো রাজারাও রোহটাস্‌গড়ের পথে ছোটনাগপুরে আসে।

ছোটনাগপুরের সঙ্গে পুরাকাল হইতে বাহিরের যোগ ছিল, এ-সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্তি বন্দর (আধুনিক তমলুক) হইতে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের বামনঘাটি হইয়া সিংহভূম জেলার পোড়াহাট পর্য্যন্ত বাণিজ্যের রাস্তা ছিল। পোড়াহাট পরগণা রাঁচি জেলার সংলগ্ন। ঐ বামনঘাটি গ্রামে অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল; তাহার মধ্যে কয়েকটি মুদ্রা কন্সটানটাইন, গর্ডিয়ান প্রভৃতি রোমান্ সম্রাটদের সময়ের। চাইবাসার কয়েক মাইল দক্ষিণে গুলফা গ্রামে এক হাঁড়ি পুরাতন তাম্রমুদ্রা পাওয়া যায়, সেগুলি কুশান-মুদ্রা (Indo-Scythian)—ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কার্য্যবিবরণীর ত্রয়োদশ খণ্ডে এরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কুশান-সম্রাট হুবিষ্ক ও কনিষ্কের সময় ছোটনাগপুরের সঙ্গে উত্তর-ভারতের যে আদান-প্রদান চলিত, তাহার আরও প্রমাণ রাঁচি জেলায় প্রাপ্ত কুশান-রাজাদের মুদ্রা। রাঁচি জেলায় হুবিষ্কের একটি স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছিলাম, তাহা এখন পাটনার যাদুঘরে আছে এবং আরও কয়েকটি ইম্পিরিয়াল কুশান-মুদ্রা গ্রাম্য বালকবালিকার গলায় কবচস্বরূপ পরিহিত দেখিয়াছি—উদ্ধার করিতে পারি নাই। সবগুলিই মাটি

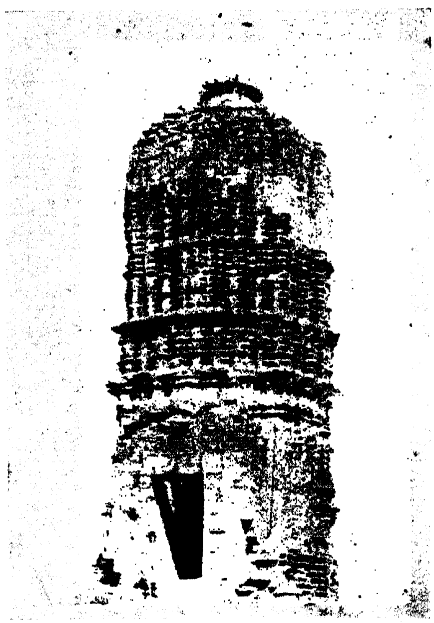


জগন্নাথ-মন্দির, রাঁচি [শ্রীযুত বিভূতিভূষণ মিত্রের সৌজন্যে

খনন করিতে গিয়া পাওয়া যায়। কুশান-সম্রাটদের মুদ্রার অনুরূপ যে মুদ্রাগুলি "পুরী কুশান মুদ্রা" নামে অভিহিত হয় তাহার অনেকগুলি রাঁচি জেলায় পাওয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর কয়েকটি মুদ্রা প্রথমে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গঞ্জাম জেলায় পাওয়া যায় এবং ঐ সনের *Madras Journal of Literature and Science*-এ সেগুলির বিবরণ আছে। তার পর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পুরী জেলায় ৫৪৮টি ঐরূপ মুদ্রা পাওয়া যায়; ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ হর্ণলী (Dr. Hoernle) *Proceedings of the Asiatic Society*তে সেগুলির সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন তাহাতে প্রথমে উহাদের "পুরী কুশান-মুদ্রা" এইরূপ নামকরণ করেন। এই শ্রেণীর মুদ্রা কুশান-রাজাদের সমসাময়িক বা তাঁহাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী—কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। অধ্যাপক র‍্যাপসন্ (*Indian Coins*, pp. 13-14) এই পুরী কুশান-মুদ্রাগুলির কাল খ্রীষ্টীয় তিন শতাব্দীর মধ্যে, এবং ভিনসেণ্ট এ স্মিথ তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর—এরূপ স্থির করিয়াছেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাঁচি জেলায় প্রাপ্ত একটি পুরী কুশান-মুদ্রা-পৃষ্ঠে খোদিত 'টঙ্কা' শব্দটি দেখিয়া স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উহাকে ষষ্ঠ শতাব্দীর বা সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের, এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি প্রায় এক শত পুরী কুশান-মুদ্রা রাঁচি জেলায় পাইয়াছিলাম; তাহার কোনটিতে কোনও লেখা নাই; কেবল কুশানদের ন্যায় রাজপরিচ্ছদপরিহিত মূর্ত্তি আছে। পরবর্ত্তী গুপ্ত-সম্রাটদের, কিংবা পাল-বংশ বা সেন-বংশ অথবা অন্য কোন হিন্দুরাজবংশের মুদ্রা অন্ততঃ রাঁচি জেলায় এ-পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তার পর কোন কোন মুসলমান বাদশাহের মুদ্রা মধ্যে মধ্যে এখানে পাওয়া যায়। আর বিশেষতঃ জৌনপুরের শার্কী (Sharqui) রাজাদের অনেকগুলি মুদ্রা এখানে পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে ছোটনাগপুরের কিরূপ যোগ ছিল ইতিহাসে ঠিক পাওয়া যায় না।

তবে ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, দিল্লী-সম্রাট মুবারক শাহের প্রধান মন্ত্রী মলিক সর্ব্বর ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে "সুলতান-উষ-শার্ক" (পূর্ব্বদেশের রাজা) উপাধি অবলম্বন করিয়া সম্রাটকে অবজ্ঞা করিয়া জৌনপুরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন এবং পশ্চিমে অযোধ্যা হইতে কোইল পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে ত্রিহুত ও মগধ পর্য্যন্ত আপন রাজ্য বিস্তার করেন। ঐ বংশের তৃতীয় রাজা শামসুদ্দীন ইব্রাহিম বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন এবং বঙ্গভূপতির প্রধান সামন্ত রাজা গণেশের পুত্র জয়মল্লকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, কিন্তু দিল্লীশ্বরের সৈন্যদল জৌনপুর আক্রমণ করিতে আসিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। ইব্রাহিমের পৌত্র হুসেন উড়িষ্যা আক্রমণ করেন ও উড়িষ্যার রাজার নিকট হইতে বহু অর্থ আদায় করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু পরে সম্রাট বুহলুল লোদী কর্ত্তৃক স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া বঙ্গদেশে পলায়ন করেন ও শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের আশ্রয়ে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাস করেন। যদিও শার্কী-রাজাদের ছোটনাগপুর-অধিকারের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, তথাপি মনে হয় বঙ্গদেশে এবং উড়িষ্যা-অভিযান উপলক্ষে ছোটনাগপুরে শার্কী-রাজাদের প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফিরোজ শাহ উড়িষ্যা-অভিযান হইতে প্রত্যাগমনকালীন ঝাড়খণ্ড বা ছোটনাগপুরের পথে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার সৈন্যদল পথ হারাইয়া ছয় মাস কাল ছোটনাগপুরের জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়।

শের শাহের সময় হইতে ছোটনাগপুরের জঙ্গলের হাতী ও শঙ্খ নদীর হীরা মুসলমান রাজাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর শাহের প্রেরিত সৈন্যদল ছোটনাগপুরের তৎকালীন নাগবংশী রাজাকে পরাস্ত করে। আর ঐ রাজা মোগল সম্রাটকে বাৎসরিক কর দিতে স্বীকৃত হন। তখন রাজাদের রাজধানী ছিল বর্ত্তমান খুখ্‌রা পরগণাস্থ খুখ্‌রা গ্রামে। সেই জন্য এই প্রদেশ মোগল সম্রাটের সরকারে 'খোখ্‌রা' নামে অভিহিত হয়। 'আইন-ই-আকবরী'তে দেখিতে পাই, 'খোখ্‌রা' প্রদেশ মোগল-সাম্রাজ্যে "মোখেরাজি" তালুক রূপে সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। গ্লাডউইন সাহেব তাঁহার 'আইন-ই-আকবরী'র



পাড়াগ্রামে পাথরে নির্ম্মিত দেউল

অনুবাদে এবং Grant's *Fifth Report of the Revenues of the East India Company*তে 'মোখেরাজি' শব্দের অনুবাদ করা হইয়াছে 'unattached' অর্থাৎ অসংলগ্ন। খোখ্‌রার রাজা স্বেচ্ছায় বোধ হয় এই কর কখনও দেন নাই; মধ্যে মধ্যে ফৌজ প্রেরণ করিয়া এই কর আদায় করা হইত এবং ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে ছোটনাগপুর বা খোখ্‌রার রাজা দুর্জ্জন শাল বন্দী হইয়া গোয়ালিয়র-দুর্গে কারারুদ্ধ হন ও বাৎসরিক ছয় সহস্র টাকা কর দিবার কড়ারে কারামুক্ত হন। তিনি স্বরাজ্যে ফিরিয়া কিছু দিন পরে খোখ্‌রা হইতে ডোএসা নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কথিত আছে, গোয়ালিয়র-দুর্গে অবস্থানকালে খোখ্‌রার রাজা ঝুটা হীরা ও আসল হীরার প্রভেদ দেখাইয়া দিয়া বাদশাহকে খুশী করেন এবং তাঁহার অনুরোধে তাঁহার কয়েকটি সহ-বন্দী হিন্দুরাজাও কারামুক্ত হন। পরে ঐ হিন্দুরাজগণ রাজা দুর্জ্জন শালের সঙ্গে সাক্ষাৎকারমানসে নাগবংশী-রাজার রাজধানীতে রাজার অনুপযোগী সামান্য



রামগড়ে বিষ্ণুপুরী ঢঙের পঞ্চরত্ন-মন্দির

রাজবাটী দেখিয়া বিস্মিত হন ও স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া নিপুণ রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি কারিগর প্রেরণ করেন এবং তাহারাই ডোএসা নগরের 'নৌরতন' (নব-রত্ন) নামক রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করে। আর ঐ সময় হইতে সভ্য প্রদেশের হিন্দু রাজাদের সংস্পর্শে আসিয়া ছোটনাগপুরের নাগবংশী রাজারাও রাজোচিত আড়ম্বর ও পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য বিহার ও মধ্যপ্রদেশ হইতে হিন্দু আমলা সিপাহী প্রভৃতি আমদানী করেন। সেই অবধি বর্ত্তমান রাঁচি জেলায় হিন্দু সভ্যতার প্রচলন দস্তরমত আরম্ভ হয়। অবশ্য ছোটনাগপুরের সীমান্ত-স্থানগুলিতে—যেমন বঙ্গভাষাভাষী মানভূম জেলা এবং মিশ্রিত বঙ্গ ও উড়িয়াভাষী ধলভূম পরগণায়—হিন্দু সভ্যতার প্রচলন বহু পূর্ব্ব হইতেই ছিল।

ছোটনাগপুরের মালভূমিতে হিন্দুধর্ম্মের বিস্তার সম্বন্ধে জানা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে চৈতন্যদেব পুরীধাম হইতে মথুরা যাইবার পথে ঝাড়খণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন ও সেখানকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছিলেন। ছোটনাগপুর ঝাড়খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল এরূপ অনুমিত হয়। পুরীধাম হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাইবার পুরাতন রাস্তা রাঁচি জেলার বুণ্ডু ও তামাড় পরগণার মধ্য দিয়া বিস্তৃত ছিল; এখনও স্থানে স্থানে সে-রাস্তার নিদর্শন পাওয়া যায়। স্থানীয় প্রবাদ এই যে বুণ্ডু গ্রামের



বোড়েয়ার মন্দিরে "নবগুঞ্জর"

নিকট চৈতন্যদেব বিশ্রাম করিয়াছিলেন; বস্তুতঃ বুণ্ডু ও তামাড় পরগণায়, এমন কি অসভ্য মুণ্ডাদের মধ্যেও, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব এখনও দেখা যায়। নিকটবর্ত্তী সিরি, শোণপুর প্রভৃতি অন্যান্য পরগণায় মুণ্ডাদের মধ্যেও মুণ্ডা ভাষায় রাধাকৃষ্ণের সঙ্গীতের প্রচলন আছে। এমন কি বিবাহের "সিন্দুরদান" শেষ হইলে মুণ্ডারা 'রাধে' 'রাধে' ধ্বনি করে, কিন্তু অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে বলে ইহার অর্থ 'আড়ান্দিটুণ্ডু-জানা' অর্থাৎ 'বিবাহক্রিয়া সমাপ্ত হইল'। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয় যে চৈতন্যচরিতামৃতে এই প্রদেশের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে—

মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড,
[ভিল্ল প্রায় লোক তাহে পরম পাষণ্ড],
নামপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার
চৈতন্যের গূঢ় লীলা বুঝে সাধ্য কার?

ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম ছিল যত
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত,
যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি।

মুণ্ডাদের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের যে-সব গান প্রচলিত আছে এবং বুণ্ডু, সিলি প্রভৃতি "পাঁচ পরগণা"র কুড়মী প্রভৃতি জাতির মধ্যে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক যে বাংলা ঝুমুর গীত শোনা যায়, সেগুলি এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের ফল। এখানকার অসভ্য জাতিদের মধ্যে যে 'ভক্ত' বা 'ভকত' সম্প্রদায় আছে, তাহাও অজ্ঞাত বৈষ্ণব-গুরুদের প্রভাবে গঠিত হইয়াছে। ছোটনাগপুরের পূর্ব্বভাগে যেমন বাংলা দেশের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত প্রচলিত, তেমনি মধ্য ও পশ্চিম ভাগে রামানন্দী সম্প্রদায়ের মতের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ডোরাণ্ডার নদীর মধ্যে যে মঠটি আছে উহা রামানন্দী সম্প্রদায়ের। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার মনে করেন; কিন্তু রামানন্দীরা শাস্ত্রের দশ অবতার ভিন্ন অন্য কাহাকেও অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না; চৈতন্যদেব প্রভৃতিকে কেবল পরমভক্ত ও আচার্য্য বলিয়াই মানেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম স্থান দেন; রামানন্দীরা রামচন্দ্রকে প্রথম স্থান দেন। ছোটনাগপুরের দক্ষিণ ভাগে ধলভূম পরগণায় যে বৈষ্ণব মত প্রচলিত তাহাও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত। কিন্তু উড়িয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে দুই দল হইয়াছে। অধিকসংখ্যক বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম স্থান দেন আর প্রথমে বলেন, "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে," আর এক দল রামানন্দীদের মত রামনামকেই প্রথম স্থান দেন এবং প্রথমে বলেন, "হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।" এই শেষ শ্রেণীর বৈষ্ণবদের নাম হইয়াছে 'অতিবড়ি' বা 'অতি-বড়' সম্প্রদায়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে জোলাবংশসম্ভূত কবীর যে ভক্তিযোগ ধর্ম্ম প্রচার করেন, মধ্যপ্রদেশ হইতে তাহা গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে ছোটনাগপুরের ওঁরাওদের মধ্যে প্রচারিত হয় এবং কতকগুলি ওঁরাও-পরিবার এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়; এমন কি কয়েকটি ওঁরাও-ভক্ত এখন কবীরপন্থী-গুরুর কাজও করেন। গত শতাব্দী হইতে ছোটনাগপুরের আদিম নিবাসীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মান পাদ্রীরা আসেন, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ য়্যাংলিকান পাদ্রীরা আসেন, এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা চাইবাসায় প্রথম প্রচার আরম্ভ করেন। ধর্ম্মবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মমন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও ধর্ম্মগ্রন্থের প্রচার ও আলোচনার প্রবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়।



বুড়াডিহি গ্রামের একটি প্রাচীন ঢিবি

ছোটনাগপুর ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নামমাত্র মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিলেও এখানে মুসলমান সভ্যতার বা ধর্ম্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। কেবল মুসলমান সৈন্যদের ও তাহাদের অনুচরদের মধ্যে কতকগুলি মুসলমান ছোটনাগপুর হইতে গিয়াছিল ও সম্ভবতঃ নিম্নশ্রেণীর স্থানীয় লোকদের মধ্যে কোন কোন পরিবারকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। ইহাদেরই সংমিশ্রণে রাঁচি জেলায় বর্ত্তমান নিম্নশ্রেণীর জোলা প্রভৃতি মুসলমানের উদ্ভব হইয়াছে। নাগ-বংশীয় রাজা দুর্জ্জন শাল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে যে রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি দ্বারা ডোএসা নগরে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করান তাহারাও



বুড়াডিহি গ্রামে আবিষ্কৃত পুরাতন প্রস্তর-মন্দির

দেবের মন্দির ১৭৪৮ সম্বতে অর্থাৎ ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে "ঠাকুর"-উপাধিধারী জমিদার আইনিসাহি নির্ম্মাণ করান। এই মন্দির অনেকটা পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত।

এই খোদিত লিপিগুলি ছাড়া দুই-একটি দীর্ঘিকা, ইঁদারা ও কূপের খননকাল ও খনন-কর্ত্তার নামের স্মারক-চিহ্নস্বরূপ শিলালিপি দেখা যায়; উদাহরণ-স্বরূপ তিলসি গ্রামের অকবর নামক নাগবংশী 'ঠাকুর' উপাধিধারী জমিদারের দ্বারা ১৭৯৪ সম্বতে (অর্থাৎ ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত কূপ বা ইঁদারার উল্লেখ করা যাইতে পারে। হাজারীবাগ জেলায় রামগড় থানায় কতকগুলি হিন্দুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। তাহার কোনটিই সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার বলিয়া মনে হয় না। উহাদের মধ্যে রাজরোপ্পায় ছিন্নমস্তার মন্দির প্রসিদ্ধ।

পূর্ব্বকালে হিন্দু রাজারা যেরূপ তাম্রশাসন দ্বারা গ্রাম ও ভূমি দান করিতেন, ছোটনাগপুরে গত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ঐরূপ পিতলের পাট্টা দেওয়ার প্রচলন ছিল। আমি ঐরূপ একটি পিতলের পাট্টা সংগ্রহ করিয়াছি; তাহার উপর সম্বৎ ১৯..(১৮.. খ্রীষ্টাব্দ) এই তারিখ আছে।

সম্ভবতঃ পরে এই প্রদেশেই অবস্থান করে। ডোএসার 'নওরতন' প্রাসাদ যদিও খানিকটা মুসলমানী প্রথায় নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেখানকার পরবর্ত্তী মন্দিরাদি হিন্দু প্রথায় নির্ম্মিত। ডোএসা নগরে জগন্নাথ-মন্দিরের যে ভগ্নাবশেষ আছে তাহার খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, ১৭৩৯ সম্বতে অর্থাৎ ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজগুরু হরিনাথ ব্রহ্মচারী উহা নির্ম্মাণ করান। আর সেখানকার কপিলনাথ-দেবের মন্দিরের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, সে মন্দির ১৭৬৮ সম্বতে অর্থাৎ ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। তথাকার বোধীমঠ, পঞ্চমঠ ও মহাদেবের মন্দিরে কোন লিপি পাওয়া যায় না। রাঁচির ছয় মাইল উত্তরে বোড়েয়া গ্রামে যে মদনমোহনের মন্দির আছে তাহাতে খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, ১৭২২ সম্বতে অর্থাৎ ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৭৩৯ সম্বতে অর্থাৎ ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। হিন্দু রাজমিস্ত্রী অনিরুদ্ধ ইহার নির্ম্মাতা এবং নির্ম্মাণ-ব্যয় চৌদ্দ হাজার এক টাকা। ঐ মন্দিরের একটি কপাটের খাপে (panelএ) কাঠের উপর একটি "নব-গুঞ্জর" মূর্ত্তি খোদিত আছে।* উড়িষ্যার বাহিরে আর কোথাও এই মূর্ত্তি দেখা যায় না।

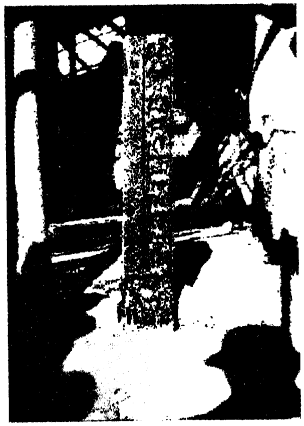
হিনুর নিকটস্থ জগন্নাথপুর পাহাড়ের উপরে জগন্নাথ-

রাঁচি জেলায় পুরাতন মন্দিরাদি যাহা উল্লেখ করিয়াছি তাহার একটিও খ্রীষ্টীয় ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু দুইটি বুট-পরা সূর্য্যমূর্ত্তি পাইয়াছি, তাহা হয়ত অপেক্ষাকৃত পুরাতন। উহাদের মধ্যে বড়টি পাটনার সরকারী যাদুঘরে রক্ষিত আছে। মানভূম জেলায় আরও অনেক আগেকার পুরাতন মন্দিরাদি আছে। কয়েক বৎসর হইল রাঁচি-পুরুলিয়া রেল-লাইনের গড়জয়পুর ষ্টেশনের এক মাইল দূরে বোড়াম গ্রামে যে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কয়েকটি সুন্দর মূর্ত্তি দেখা যায়। সেগুলি মধ্যযুগের। রাঁচি জেলার বুড়াডিহি গ্রামের নিম্নস্থ নদীর অপর তীরে কয়েকটি পুরাতন দেউলের ধ্বংসাবশেষ ও

* শ্রীমান্ নির্ম্মলকুমার বসু এই মূর্ত্তিটি প্রথম লক্ষ্য করেন।



১। বুড়াডিহি গ্রামে প্রাপ্ত দেবী-মূর্ত্তি



২। বুড়াডিহিতে প্রাপ্ত খোদিত প্রস্তরের চৌকাট



৩। বুড়াডিহি গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিঙ্গ-মূর্ত্তি

পুরাতন দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও সম্ভবতঃ বোড়ামের মূর্ত্তিগুলির সমসাময়িক। ইহার প্রধান মন্দিরটি পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত।

পালামৌ জেলায় ডালটনগঞ্জ শহরের অদূরবর্ত্তী জঙ্গলে 'চেরো' রাজাদের যে কেল্লা আছে তাহার গঠনপ্রণালী রোহটাস্‌গড় ও শেরগড়ের অনুরূপ; মোগল সাম্রাজ্যের প্রথম দিকের বলিয়া মনে হয়। সিংহভূম জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে বেণুসাগরের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি, সেখানকার পুরাকালের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে পুরাতন প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলি—শিবকালী, মহিষাসুরী দেবী, গণেশ প্রভৃতি—একটি প্রস্তরের হস্তিমূর্ত্তি বেগলার সাহেব পাইয়াছিলেন, সেগুলি তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল বেণুসাগর হইতে আরও কতকগুলি সুন্দর দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি পাটনার যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

মন্দির-নির্ম্মাণ ও দেবমন্দির-গঠন ছাড়া ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও সমৃদ্ধির আর একটি নিদর্শন ধর্ম্মগ্রন্থের প্রচার। রাঁচি জেলার বুণ্ডু পরগণা পাঁচপরগণার বৈষ্ণবদের কেন্দ্রস্থল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সংখ্যা অধিক; তবে রামানন্দী বৈষ্ণবও আছে। বুণ্ডু পরগণায় নৃতত্ত্ব গবেষণা উপলক্ষ্যে অবস্থান-কালে আমি কয়েকখানি হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এগুলি প্রায় সবই ধর্ম্মগ্রন্থ; সবই বাংলা অক্ষরে লেখা। ইহার মধ্যে চারিখানির ভাষা বাংলা, ষোলখানির ভাষা সংস্কৃত এবং পাঁচখানি উড়িয়া অক্ষরে লেখা। এই পাঁচখানি উড়িয়া পুস্তকের মধ্যে দুইখানির ভাষা সংস্কৃত ও তিনখানি উড়িয়া।

প্রথম বাংলা পুঁথিখানির নাম 'তত্ত্ববিলাস'। ইহাতে পদ্যে রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বকথা বলা হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার নাম বৃন্দাবনদাস। তারিখ দেওয়া নাই। গ্রন্থের প্রারম্ভে গৌরাঙ্গদেব ও তাঁহার ভক্তদের বন্দনা আছে; বিশেষ করিয়া গৌরাঙ্গ-পার্ষদ গদাধর পণ্ডিতের বন্দনা করা হইয়াছে; তাহাতে মনে হয় গ্রন্থকার গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য-পরিবার ছিলেন। গ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন:—

> "বৃন্দাবন দাস কহে তত্ত্ববিলাস।
> শুনিলে যমের দুত নাহি আশে পাশ॥"

দ্বিতীয় বাংলা পুঁথি কবিচন্দ্রের 'অঙ্গদরায়বার'। নকলের তারিখ ৭ই আষাঢ় সন ১২০৬ সাল; অর্থাৎ এ পুঁথি ১৩৫ বৎসর আগের লেখা। তৃতীয় বাংলা পুঁথি রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড। কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে ভাষায় কিছু প্রভেদ আছে। শেষে লেখক ও তারিখের বিবরণ এইরূপ:—

> "ইতি সন ১২০৫ সাল পঃ নাগপুর, তঃ বারন্দা, মৌ পাণ্ডাডি, ২০শে ভাদ্র, কৃষ্ণপক্ষ সপ্তমী, লিখিতং শ্রীবিজৈরাম মণ্ডল।"

চতুর্থ বাংলা পুঁথি মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্ব। কাশীরাম-দাসের মহাভারতের সঙ্গে মেলে; লেখক শ্রীকমলনাথ দাস,



ছিন্নমস্তার মন্দির, রাজরোপ্পা [শ্রীযুত বিভূতিভূষণ মিত্রের সৌজন্যে

(১৪) পঞ্চামৃতং, (১৫) হনুমান-পূজাপদ্ধতি।

রাঁচি জেলার দক্ষিণ ভাগে তালপত্রে উড়িয়া অক্ষরে লেখা কয়েকখানি পুঁথি ও একটি লৌহের লেখনী পাই। প্রথমখানি উড়িয়া ভাষায় 'করম কথা' (অর্থাৎ করম একাদশীতে আবৃত্তি করিবার জন্য করম-ধরমের কাহিনী), দ্বিতীয়খানি উড়িয়া অক্ষরে লেখা শিবদাস-বিরচিত 'বেতালপঞ্চবিংশতি'। তৃতীয়খানি উড়িয়া অক্ষরে লেখা সংস্কৃত 'দশকর্ম্মাণি' (গর্ভাধান প্রভৃতি); চতুর্থখানি উড়িয়া অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় 'নবগ্রহ স্তব ও মন্ত্র ও গ্রহশান্তির পদ্ধতি ও মন্ত্র'

সাং খাস্ বুও, ১৮৯৮ সম্বৎ (=১৮৪১ খ্রীঃ), অর্থাৎ ৯৩ বৎসর আগেকার।

বাংলা অক্ষরে লেখা সংস্কৃত পুঁথিগুলির নাম—

(১) বিল্বমঙ্গলকৃত 'গোবিন্দদামোদর স্তোত্র';

(২) শ্রীবিষ্ণুপুরী সংগৃহীত 'শ্রীভগবদ্ভক্তিরত্নাবলী' (লিখিতং কুতুবপুর মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র সমীপে; সংবৎ ১৯৬৩)

(৩) সনৎকুমার-সংহিতায় নারদোক্ত "শ্রীরামচন্দ্র-স্তবরাজস্তোত্র"

(৪) শ্রীরামকর্ণামৃত, (৫) রামমন্ত্রবিধিপদ্ধতিপটল,

(৬) গৌর অষ্টক, (৭) গীতা, দশম অধ্যায়,

(৮) শ্রীরামানুজকৃতং "শ্রীরামপদ্ধতি" (বেদোক্ত)

(৯) শ্রীব্রহ্মযামলে সৃষ্টিপ্রশংসায়াং উমামহেশ্বরসংবাদে রকারাদি শ্রীরামসহস্র স্তোত্র। ১৯৬৩ সাল।

(১০) কামরত্ন (বশীকরণ-বিদ্যার বই)…(নাগরী অক্ষর)

(১১) রকারাদি রামসহস্র নামস্তোত্র (ব্রহ্মযামলে সৃষ্টিপ্রশংসায়াং উমামহেশ্বরসংবাদে)

(১২) পঞ্চরাত্রোক্ত আরাধনাক্রম (ভগবানদাসকৃত)

(১৩) পদ্মপুরাণে ভৃগুসংবাদে নারায়ণস্তুতি।

প্রভৃতি। পঞ্চমখানি উড়িয়া অক্ষরে ও উড়িয়া ভাষায় লেখা পঞ্চতন্ত্রের ও মহাভারতের কয়েকটি উপাখ্যান ও দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে কবিতা।

ঐতিহাসিক কালের প্রত্নতত্ত্ব, মূর্ত্তিতত্ত্ব, খোদিত লিপিতত্ত্ব ও প্রাচীনমুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার প্রচুর উপাদান না থাকিলেও, ভাষাতত্ত্ব—বিশেষতঃ নৃতত্ত্ব—সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ছোটনাগপুর একটি সুবিস্তৃত ও উর্ব্বর ক্ষেত্র। ছোটনাগপুরের উত্তরে মগধ বা বিহার, দক্ষিণ-পূর্ব্বে উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরে এবং পশ্চিমে যুক্তপ্রদেশ এবং পূর্ব্বে বাংলা দেশ। এইরূপ সীমান্ত প্রদেশের ভাষা যেরূপ সঙ্কর বা দোআঁস্‌লা হইয়া থাকে এ প্রদেশের প্রচলিত সংস্কৃতজ তিনটি ভাষাই—বাংলা হিন্দী ও উড়িয়া—সেই সাঙ্কর্য্য দোষে দুষ্ট। এই দোষে সীমান্ত দেশের ভাষা কতদূর দুষ্ট হইতে পারে তাহার একটি চরম দৃষ্টান্ত 'করমালি' বুলি, আর একটি 'হেটগোলা' বা খোট্টাই বাংলা।

রাঁচি জেলার পাঁচপরগণার এবং মানভূম জেলার কুর্ম্মি জাতি যে বিকৃত বাংলা ভাষা ব্যবহার করে তাহা ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারির রিপোর্টে ও তৎপূর্ব্বে বাংলা ভাষার একটি বুলি (কুরমালি বাংলা) বলিয়া পরিগণিত

হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারির রিপোর্টে এই 'কুরমালি' বুলিকে হিন্দী ভাষার মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, এই রিপোর্টের ৩৮৮ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, এই বুলিকে স্থানীয় লোকে 'খোট্টা বাংলা' বলে এবং ইহা বাংলা অক্ষরে লিখিত হয়।

"This patois is known as *Khotta Bengali* and is written in the Bengali character. Locally it is regarded as a corrupt form of Bengali."

স্যর জর্জ্জ গ্রীয়ারসনও এই কুরমালি ঠার বা বুলিকে Eastern Magahi dialect বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহার যে নমুনা দিয়াছেন তাহা হইতে বাঙালী পাঠক ইহাকে বাংলা ভাষারই অপভ্রংশ বলিয়া চিনিবেন। মানভূম জেলায় কুরমালি ঠারের নমুনা এইরূপ :—

"এক লকের ছুটা বেটা ছালিয়া রেহেক। তান্নাদের মইধে ছুটু বেটাটায় অকর্ বাপকে কেহলাক্ যে বাপ্-হে হামরাকর দৌলতকর যে মঁয় হিসা পায়ম্ সে মকে দে। তখন তাকর বাপ্ আপন দৌলত বাঁটিকে অকর হিসা দেঁই দেলাক্। থড়েক দিন বাদে ছুটু বেটা ছাওয়াটা আপন ধন দরিব লেইকে বিদেশ গেল্।" (*Linguistic Survey of India*, Vol. v, part II, p. 152.)

রঁাচি জেলার পাঁচপরগণায় কুরমালি ঠারের বা পাঁচ-পরগণিয়া বুলির নমুনা এইরূপ :—

"কোনোঁ এক আদমিকের দুইটা ছুয়া রোহে। তেকর মাঁহনে ছোট ছুয়াটা আপন বাপকে কোহলক 'বাপ, মোএঁ ধনকের যে হিস্‌সা পামু সে মোকে দেউ।" (*Ibid*, p. 170)

আবার হাজারিবাগ জেলার গোলা, কাস্মার ও রামগড় থানায় যে বাংলা বুলি প্রচলিত আছে তাহা বরাবর বাংলা বুলি বলিয়াই পরিচিত; কিন্তু তাহাও ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সস রিপোর্টে বিকৃত মগাহি হিন্দী ("a corrupt form of Magahi Hindi") বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধেও ঐ রিপোর্টে স্বীকার করিতে হইয়াছে

"This patois which is called *Het Gola* contains Bengali words and phrases and locally is considered to be Bengali."

তবে তৎপূর্ব্বে গ্রীয়ার্সনও ইহাকে "So-called Bengali of Hazaribagh" এই আখ্যা দিয়া মগাহি হিন্দীর মধ্যে স্থান দেন।

এই ভাষায় যে বাংলা ও মগাহি হিন্দীর মিশ্রণ হইয়াছে তাহা গ্রীয়ার্সন প্রদত্ত নিম্নলিখিত উদাহরণে বুঝা যাইবে—

"এক লোকের দু বেটা ছিল। তকরুমে ছোট বেটা আপন বাপ্‌সে কহলই,এ বাপ চিজকে যে বখ্‌রা হাম পায়েব সে হামরা দেই দে।...... তব সে ধায়কে সে দেশের এক লোকের আশ্রয় লেলক।" (*Ibid*, p. 163.)

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারির রিপোর্টে ১৯১১ সনের রিপোর্ট অনুসরণ করিয়া 'কুরমালি' বাংলা ও খোট্টা বাংলাকে হিন্দী ভাষার মধ্যে পরিগণিত করা হয়। কিন্তু সম্ভবতঃ এইরূপ শ্রেণী-বিভাগের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া সেন্সস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ট্যালেণ্টস (Mr. Tallents) ২০৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "এই খোট্টা বুলি হিন্দী কি বাংলা বলা কঠিন; তবে যখন ১৯১১ সনের সেন্সসে হিন্দীর মধ্যে ধরা হইয়াছে তখন মোটের উপর এবারেও তাই করাই ভাল।"* ভাষার এইরূপ নাম-পরিবর্ত্তনের ফলস্বরূপ এই সব স্থানের স্কুলে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্ত্তে হিন্দী পড়ান হইতেছে। আবার, সিংহভূম জেলার আদালতের ভাষা হিন্দী, কিন্তু দরখাস্ত ও দলিলাদি যদিও হিন্দী অক্ষরে লেখা হয় তাহার মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি উড়িয়া অক্ষর এবং বাংলা কথা ও বাক্যসমষ্টি পাওয়া যায়।

মুণ্ডাভাষাগুলিতে বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ অনেক শব্দ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে কতক শব্দ মুণ্ডারা কোনও প্রাকৃত বা বাংলা বা হিন্দী ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছে, আবার কতক শব্দ মুণ্ডাদের নিকট হইতে সংস্কৃতে বা বাংলাতে কিংবা যে প্রাকৃত হইতে বাংলা ভাষা হইয়াছে তাহাতে পুরাকালে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এ-সম্বন্ধে সম্যক্ গবেষণার প্রয়োজন।

এই সব সংস্কৃত ভাষা ছাড়া ছোটনাগপুরে আদিম জাতিদের অনেকগুলি ভাষা আছে। সেগুলি agglutinative, এবং সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ inflexional ভাষাগুলি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন গোষ্ঠীর। এখানে প্রায় ২০টি বিভিন্ন জাতি আছে, তন্মধ্যে ওঁরাও জাতির ভাষা দ্রাবিড়ী শ্রেণীর অন্তর্গত এবং মুণ্ডা, হো, ভূমিজ, অসুর, সান্তাল, বিরহোড়, খাড়িয়া, কোড়োয়া, তুরি প্রভৃতি জাতি মুণ্ডাশ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন বুলি ব্যবহার করে। অবশিষ্ট জাতি-

* "It is impossible to say that Khotta is either Hindi or Bengali. As it was treated as Hindi in 1911 it was thought better on the whole to treat it as such again on the present occasion."

গুলি—যথা, ভুঁইয়া, চেরো, খারোয়ার, পহিড়া, নাগেসিয়া, বেদেয়া প্রভৃতি—আপন আপন পূর্ব্বপুরুষদের মুণ্ডাশ্রেণীর ভাষা বিস্মৃত হইয়া স্থানীয় গাঁওয়ারী হিন্দী বা বিকৃত বাংলা বুলি ব্যবহার করে। মানভূমের অসভ্য খাড়িয়াদের মুখে বাংলা ভাষা বিকৃত হইয়া কিরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত মানভূম জেলার খাড়িয়াদের বুলি হইতে দিতেছি।

"তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" ইহার খাড়িয়া বাংলা—"তুই কুথা?"

"কি এনেছ?" ইহার খাড়িয়া বাংলা—"কিস্ আইনে?"

"বন্দনা পূজা রবিবারে হইবে নাকি?" ইহার খাড়িয়া বাংলা—"বন্দনা রব বারে হিথ না কই?"

"আমি দোকানে বসিয়া নাড়ু কিনিতেছিলাম; আমি কিছু জানি না; আমার দোষ নাই।" ইহার খাড়িয়া বাংলা এই:—"মুই দোকানে বসি নাড়ু কিনিৎগে না। মুই কিসক্ জানু নাই। মহর দষ নাই।"

সম্ভবতঃ এক সময়ে মুণ্ডাগোষ্ঠীর ভাষা ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই, অন্ততঃ উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতের অধিকাংশ ভাগে প্রচলিত ছিল, এবং অন্যান্য ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাংলা, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অশিক্ষিত লোকে যে কুড়ি হিসাবে গণনা করে সম্ভবতঃ সেটা মুণ্ডাদের ভাষা হইতে লওয়া। এইরূপ আরও কত রকমে আর্য্য ও দ্রাবিড়ী ভাষাগুলি মুণ্ডা ভাষার নিকট ঋণী, সে-সম্বন্ধে এখনও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

এইবার নৃতত্ত্বের কথা। নৃতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এক কথায় বলিতে গেলে—মানুষ প্রথমে কি ছিল, এখন কি হইয়াছে, কেন ও কি রীতিতে এমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এই পরিবর্ত্তনের গতি মোটের উপর কোন্ দিকে চলিয়াছে?

আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে ভিন্ন ভিন্ন শাদা, কালো, তামাটে ও পীত রঙের লম্বা, বেঁটে ও মাঝারী ধরণের বিভিন্ন জাতির মানুষ আছে, তাহাদের শারীরিক গঠনের যেরূপ পার্থক্য তেমনই জীবিকা ও পরিচ্ছদ, গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্ম্মমত ও পূজা-পদ্ধতি প্রভৃতির সেইরূপ পার্থক্য বর্ত্তমান। বিভিন্ন জাতির শারীরিক গঠনের পার্থক্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা যে-কারণ নির্দ্দেশ করেন, আমাদের সহজ বুদ্ধিতে সেটা অনুমান করিয়া লইতে পারি। সহজ বুদ্ধিতে আমরাও বুঝি যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আবহাওয়া ও খাদ্যাদির প্রভাবে এরূপ পার্থক্য উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে যে আমরা সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত দেখি, ইহার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে সব চেয়ে নিম্ন স্তরের জাতিদের লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর জাতির সভ্যতার সহিত তুলনা করা প্রয়োজন এবং তাহাদের মধ্যে প্রভেদের প্রকার ও পরিমাণ এবং তাহাদের প্রত্যেকের ইতিহাস ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া প্রভেদের কারণ অন্বেষণ করিতে হয়। ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য মালভূমিতে বিভিন্ন স্তরের, বিশেষতঃ নিম্নতর স্তর-গুলির, যেরূপ বহুসংখ্যক জাতি আছে, তাহা ভারতে খুব অল্প প্রদেশেই বর্ত্তমান। এই জন্য নৃতত্ত্বের গবেষণার ইহা একটি প্রধান ক্ষেত্র।

সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের জাতিদের এইরূপে তুলনা করিলে ও তাহাদের সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে সভ্যতার উন্নতি ও অবনতি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ সভ্যতার উন্নতির একটি প্রধান উপায়। তৃতীয়তঃ, অন্য জাতির সঙ্গে সংস্পর্শে সকল জাতি সমান ফললাভ করিতে পারে না। বদ্ধমূল পূর্ব্ব সংস্কারের প্রভাবে ও শিক্ষার অভাবে কোন কোন জাতি সম্যক ভাবে নূতন ভাব, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি গ্রহণ করিতে অসমর্থ; আবার কোন কোন সৌভাগ্যবান্ জাতি অধিকতর উন্নত জাতির সংস্পর্শে ও সাহায্যে একেবারে দুই চারি ধাপ উপরে উঠিয়া যায়। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া মোটের উপর এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে সভ্য জাতিদের সঙ্গে অসভ্য জাতিদের প্রভেদ প্রকৃতিগত নয়—কেবল শিক্ষাগত মাত্র। যে-সব জাতিকে আমরা অসভ্য বলিয়া অবহেলা করি তাহারা সাধারণতঃ সভ্যতাভিমানী জাতিদের অপেক্ষা স্বাভাবিক বুদ্ধি বা অপরাপর মনোবৃত্তিতে নিকৃষ্ট নয়; কেবল প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বা উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগের অভাবে সেগুলির যথাযথ স্ফুরণ বা পরিমার্জ্জন হইতে পারে নাই। এই জন্য প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, বস্তুতঃ শবর কোল ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা প্রকৃতিগত ক্ষত্রিয় জাতি; কেবল

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আচার্য্যের দর্শনাভাবে বৃষলত্ব বা পাতিত্য প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই ইহারাও প্রকৃতির সহিত সাধ্যমত সংগ্রাম করিয়া যতটা সম্ভব নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া আবাসস্থান ও খাদ্যসমস্যা প্রভৃতির মোটামুটি একটা সমাধান করিয়া লইয়াছে। পারিবারিক ও সামাজিক বিধিবিধান, আইনকানুন, নীতিধর্ম্ম প্রভৃতির উদ্ভাবন করিয়াছে, প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, সাজশয্যা, অলঙ্কারাদি ও অন্যান্য গৃহসামগ্রী ও বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির উদ্ভাবন করিয়াছে। বস্তুতঃ সভ্য জাতিদের অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্রাদি, অলঙ্কার ও সাজসজ্জা, আসবাবপত্র প্রভৃতির মধ্যে অনেকগুলিই আদিম নিবাসীদের উদ্ভাবিত জিনিষের উন্নত ও সংস্কৃত সংস্করণ মাত্র। যে 'অসভ্য' জাতিরা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা জীবিকা-অর্জ্জনের ও শরীর-রক্ষার চেষ্টা ছাড়াও মনের অল্পবিস্তর উৎকর্ষ সাধন করিবার অবকাশ পাইয়াছে। সুতরাং অবসর-বিনোদনের ও জীবনের সৌকুমার্য্য সম্পাদনের জন্য নৃত্যগীত ও শিল্পকলার সৃষ্টি করিয়াছে। জীবনের সমস্যা ও মৃত্যুর পরপারের প্রহেলিকা তাহাদের মনকেও আলোড়িত করিয়াছে, ভূতপূজার অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্মের ও ভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছে। এই চেষ্টাতেই মুণ্ডাদের মধ্যে 'বীরসা' ধর্ম্মের, ওঁরাওদের মধ্যে 'টানা ভকত' ধর্ম্মের, সাঁওতালদের মধ্যে 'সাফাহোড়' ধর্ম্মের এবং সম্প্রতি ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় 'হরিবাবা' ও 'হরিরাজ' ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, কিন্তু শিক্ষার ও পরিচালনার অভাবে অবাস্তর পথে চলিয়া গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ে সভ্য জাতিদের সঙ্গে অসভ্য আদিম অধিবাসীদের প্রভেদ কেবল 'উৎকর্ষের পরিমাণে, প্রকারে নয়'।

প্রমাণস্বরূপ ছোটনাগপুরের অসভ্য মুণ্ডাদের গীতি-সাহিত্যের সামান্য পরিচয় দিব। মুণ্ডাজাতি নিরক্ষর। তাহারা গদ্য পদ্য কিছুই লেখে না। তাহাদের মধ্যে কতিপয় ভাবুক ব্যক্তি কখনও কখনও মনের আবেগে মুখে-মুখে গান বাঁধে ও গায় এবং তাহাদের ভাষার দৈন্য, সুর-তালের অসম্পূর্ণতা ও অলঙ্কারের অভাব তাহারা পূরণ করে গভীর ভাবের আবেগে তালে তালে নৃত্য করিয়া। জনসাধারণ সেই গীতগুলিতে আপন আপন মনোভাবের প্রকাশ দেখিয়া পুলকিত হয় ও সাগ্রহে গীতগুলি আরম্ভ করে।

স্বভাবের সৌন্দর্য্য, যুবক-যুবতীর প্রেম, মিলনের সুখ ও বিরহের দুঃখ; পার্থিব সুখের, সৌন্দর্য্যের ও মানবজীবনের নশ্বরতা প্রভৃতি যাহা চিরকাল সর্ব্বদেশে কবি-হৃদয়কে ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত করিয়াছে তাহা অসভ্য মুণ্ডা-কবিদের হৃদয়কেও উদ্বেলিত করে। সভ্য জাতির কবির উচ্চাঙ্গের কবিতায় যে উচ্ছ্বাস মুখরিত হয়, সেই সব সুখ-দুঃখ, প্রেম ও মৃত্যু, আশা ও ভয় নিরক্ষর মুণ্ডার হৃদয়কেও আলোড়িত করে এবং সেই ভাবের উচ্ছ্বাস তাহারাও গানের দ্বারা ধ্বনিত করে। কিন্তু তাহাদের ভাষা ভাবের গভীরতায় তলস্পর্শ করিতে না-পারিয়া হস্তপদের বিভিন্ন ভঙ্গী বা নৃত্যের সাহায্য লইয়া থাকে। মুণ্ডাকবি ভাবের গভীরতা প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় একই ভাব নানা ছন্দে পুনরাবৃত্তি করে, একই শব্দ বার-বার আবৃত্তি করে, আর প্রতিশব্দের উপর প্রতিশব্দ চাপায়। আর শ্রুতিমধুর করিবার জন্য গানে শব্দের প্রথম অক্ষর স্বরবর্ণ বা 'হ' থাকিলে তাহার আগে 'ন' জুড়িয়া দেয়, যেমন 'হাতু'র স্থানে 'নাতু', 'হুণ্ডি'র স্থলে 'নুণ্ডি', 'ওড়া'র পরিবর্ত্তে 'নোড়া' ও আরও কয়েকটি উপায় অবলম্বন করে।

প্রথমে একটি প্রেমগীতি বলিতেছি। একটি মুণ্ডা যুবক তাহার ঈপ্সিত যুবতীকে বলিতেছে—

কুচা মুচা কুন্দুরুম্ কুচা কোটোং তাদিঙ্গী কুন্দুরুম্,
কুচা কোটোং তাদিঙ্গা নাইরি।
নাড়িঁ নাড়িন পলাণ্ডুম নাড়িন্। কোটোং তাদিঙ্গী পলাণ্ডুংনাড়িন্,
কোটোং তাদিঙ্গা নাইরি।
জিউরে মুকুয়ানরে দো দোলাং সেনোয়া
কুন্দুরু দো দোলাং সেনোয়া নাইরি।
কুড়ামবারে রেড়াখানরে, মারে দোলাং বিরিদা, পলাণ্ডু,
মারে দোলাং বিরিদা নাইরি॥

অনুবাদ

কুন্দুরু লতা যেমন বৃক্ষকে জড়িয়ে রাখে,
তুমিও তেমনি তোমার [প্রেম] ডোরে আমাকে বেঁধে ফেলেছ।
পলাণ্ডুলতা যেমন বৃক্ষকে আলিঙ্গন ক'রে আঁকড়ে রাখে,
তুমিও তেমনি আমার হৃদয়কে জড়িয়ে রেখেছ॥

যখন হৃদয় [এমন] আনন্দে উথলে উঠছে, হে আমার কুন্দুরুলতিকে,
চল আমরা একত্র জীবনপথে পাড়ি দিই।

প্রাণ যখন প্রেমানন্দে ভ'রে গেছে চল, পলাশুলতিকে,
চল আমরা একত্রে জীবনপথের পথিক হই।

তার পর যুবতী তার প্রেমাস্পদের জন্ত ফুলের মালা লইয়া সারা দিন মাঠে মাঠে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, মালার ফুল শুকাইয়া যাইতেছে, তবু প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ মিলিতেছে না; তখন এইরূপে বিলাপ করিতেছে—

মোদে পিড়ি লেলেম্‌য়ে গাতিং কাম্‌ লেলো লেলোয়া গাতিং,
বারে পিড়ি লেলেম্‌য়ে গাতিং বাম্‌ চিনাও চিনাও।
সুন্দিবাইং গুতুলেদা গাতিং কাম্‌ লেলো লেলোয়া গাতিং,
বাগড়ি বা-ইং গালাঙ্গলেদা সাঙ্গাইং কাম্‌ চিনাও চিনাও।
সুন্দি বা-ইং গুতুলেদা গাতিং চাম্নিগে গোসোয়ানা,
বাগড়ি বা-ইং গালাং লেদা সাঙ্গাইং সুতাম্‌ রেগে মরলাখানা।

অনুবাদ

হে সখা, তোমার সন্ধানে প্রথম এক ক্ষেতে গেলাম, কিন্তু পেলাম না তোমার দেখা পেলাম না,
দ্বিতীয় ক্ষেতে গেলাম, সখা, তবু তোমার সন্ধান মিললো না সখা, মিললো না।
আমি (তোমারই জন্ত) সুন্দি ফুলের মালা গেঁথেছিলাম, তোমার দেখা পেলাম না, সখা, পেলাম না।
বাগড়ি ফুলের মালা গেঁথেছিলাম, সখা, কিন্তু তোমার সাক্ষাৎ মিললো না, সখা, মিললো না।
(খড়িকার উপর) সুন্দি ফুলের মালা গেঁথেছিলাম, সখা, (হায়) সে মালা খড়িকার উপরেই শুকিয়ে গেল।
বাগড়ি ফুলের মালা গেঁথেছিলাম, সখা, (হায়) সে মালা সুতোর উপরেই ম্লান হ'য়ে গেল।

তার পর যৌবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে অনেক গীত আছে। একটি গীত এইরূপ :—

[গেনা]

সিরিজাটি নোড়ারে মা গাতিম্‌, পাটাগোঁড়া রোসোম রে।
বা'লেকাম্‌ সুড়ুঙ্গলেনা, গাতিম; ডালি'লেকাম্‌ পারায়লেন।
বালেকাম্‌ সুড়ুঙ্গলেনা, গাতিম্‌, বালেকাম্‌ গোসোয়ান্‌
ডালিলেকাম্‌ পারায়লেনা, সাঙ্গাইং ডালিলেকাম্‌ মইলায়ান।
ওতে লোলোতেচি, গাতিম্‌, সিরিমা জেটেতে?
বালেকাম্‌ গোসোয়ানা গাতিম্‌, ডালিলেকাম্‌ মরলায়ান্‌।
ওতে লোলোতেও কা'গে; সিরিমা-জেটেতেও কা'গে;
সোমায় সেনোতানা, গাতিম্‌, নোসাড় বিরিদতান্‌।

অনুবাদ

ছিটে বেড়ার ঘর থেকে, সখি, ছিঁটে বেড়ার ঘর থেকে;
তুমি ফুলের মত দীপ্তিতে বেরিয়ে আসতে, সখি,
বেরুতে ময়ূর-ঝুটির মত শোভাতে।
তখন [প্রস্ফুটিত] ফুলের মত শোভায় বেরুতে, সখি,
এখন (ঝরা) ফুলের মত গেছ শুকিয়ে।
তখন তুমি ময়ূর-ঝুটির মত দীপ্তিতে শোভা পেতে, সখি,
এখন শুকনো ময়ূর-ঝুটির মত গেছো মলিন হ'য়ে।
তোমার ছিটে বেড়ার ঘর কি এত উত্তপ্ত হয়েছে, সখি,
যে তোমার সে সৌন্দর্য্য আজ শুকনো ফুলের মত শুকিয়ে ফেলেছে?
শুকনো ময়ূর-ঝুটির মত মলিন ক'রে ফেলেছে?

(উত্তর)

মাটির উত্তাপেও এমন হয় নি, সখা, সূর্য্যের উত্তাপেও এমন হয় নি,
সময় চ'লে গেছে, সখা, তাই এমন হয়েছে,
যৌবন ফুরিয়ে গেছে,—তাই এমন হয়েছে।

মিলন বিরহ এবং জীবন ও যৌবনের নশ্বরতা ছাড়া, মুণ্ডাদের সঙ্গীতের প্রধান বিষয়,—রাধাকৃষ্ণপ্রেম, বিবাহ, মৃগয়া, যুদ্ধ, বর্ষায় চাষীর আনন্দ, বাদ্যের মধুর স্বরে মুণ্ডা-হৃদয়ের আনন্দ, ধান্তলক্ষ্মীর সম্বর্দ্ধনা, প্রখর রৌদ্রে কিংবা অনাবৃষ্টিতে কৃষকের আশঙ্কা, অত্যাচারীর উপর ঘৃণা বা রোষ। একটি গানে মুণ্ডাকবি ধানকে 'লক্ষ্মীরাজা' বলিয়া আহ্বান করিয়াছে ও নদী-তীরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীতে 'লক্ষ্মীরাজা' কাঁপিতেছেন মনে করিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে। অনেক গানেই ফুলের সৌন্দর্য্যে কবি-হৃদয়ের আনন্দ নানা রূপে বর্ণনা করিয়াছে। কোন ফুলকে উদীয়মান প্রভাতসূর্য্যের সঙ্গে, কোন ফুলকে উদীয়মান চন্দ্রের সঙ্গে, এইরূপ নানা ভাবে ফুলের শোভা ও সুগন্ধের বর্ণনা আছে। ফুলের ভিতর মুণ্ডাকবি ফুলের প্রাণ অনুভব করে ও তাহার সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করে। শিকারীদের বল্লমের আঘাতে হুণ্ডি ফুল ও শিঁয়াড়ী ফুল ভাঙিয়া গিয়াছে আর বাঙ্গুর ও বকাই ফুলের পাতা ছিঁড়িয়া গিয়াছে কিংবা অন্ত কোন ফুল বা পাতার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, এই জন্ত সেই ছিন্ন ফুল ও পাতার সঙ্গে সমবেদনাজ্ঞাপক অনেকগুলি গান আছে। সেগুলি শুনিলে স্কটলণ্ডের কৃষক-কবি বার্ণস্‌-এর কবিতা মনে পড়ে। মুণ্ডাগীতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—ছোট ছোট পাখীদের সুখ-দুঃখে কবির সহানুভূতি। মুণ্ডাগীতি-রচয়িতা যেমন আপন ছোট ছেলে-মেয়ের সুখদুঃখে সহানুভূতি ও সমবেদনা গানে প্রকাশ করেন, ঠিক সেইরূপে পাখীদের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ, আশঙ্কায় আশঙ্কা, গানে প্রকাশ করেন।

অসভ্য আদিম অধিবাসীদের হৃদয়েও যে সর্ব্বভূতের সঙ্গে নিজের প্রাণের যোগ এবং ভগবানের যোগের উপলব্ধি হইতে পারে, ইহার প্রমাণ-স্বরূপ উঁরাও ভকতদের একটি গীতের নমুনা দিতেছি। গীতটির প্রারম্ভ এইরূপ :—

মনুখায় গাহি জিয়া, বাবা, মনুখার গাহি,
ভৈঁস গাহি জিয়া, বাবা, ভৈঁস গাহি।
মনুখায় গাহি জিয়াকা, মনুখার গাহি জিয়া,
গাই গাহি জিয়া বাবা, গাই গাহি জিয়া
মনুখায় গাহি জিয়াকা, মনুখার গাহি জিয়া; ইত্যাদি

অনুবাদ

মহিষের জীবন আর মানুষের জীবন একই জীবন। মহিষ-শাবকের জীবন আর মানুষের জীবন একই জীবন! এইরূপ গরু বাছুর—ইত্যাদি।

সকল জীবজন্তুরই জীবন মনুষ্য-জীবনের অনুরূপ এই মর্ম্মে ওঁরাও ভকত প্রত্যেক প্রাণীর সম্বন্ধে গীত গায়।

তার পর ওঁরাও ভক্তের গানের চরম এই :—

বাবা বাবা বাদর হায়ো ভৈয়ো, বাবাস্ নামহাই
জিয়ানুম্ রাদস হায়ো, ভৈয়ো,
বাবাস নামহাই কায়ানুম্ রাদস
'বাবা বাবা' বাদর হায়ো, ধর্ম্মে বাবাস জিয়ানুম রাদস

অনুবাদ

হে ভাই, তুমি মুখে ভগবনকে 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া ডেকে থাকো; কিন্তু সেই বাবা তোমার প্রাণের ভিতরেই আছেন, বাবা তোমার শরীরের ভিতরেই আছেন।

রাশিয়ায় আইন-আদালত

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মস্কোর একটি আদালতে ঢুকলাম। প্রথমেই বিস্মিত হ'লাম এর অনাড়ম্বরতা দেখে। পোষাক-পরা আর্দ্দালীর দল হৈ হৈ ক'রে লোক থামাচ্ছে না, জয়ী দলের পেছন পেছন বকশিসের দাবি নিয়ে বিরক্ত করছে না; মামলাকারী লোকজনও খুব বেশী নেই। আমি ও আমার তরুণী গাইডটি গিয়ে একটি বিচারগৃহে বসলাম। একটি কাঠের নীচু তক্তার ওপর একটি টেবিল ও তিনটি চেয়ার; দু-জন পুরুষ-বিচারক ও এক জন নারী। মহিলা বিচারকটির মাথায় একটি বড় রুমাল বাঁধা ছিল; পুরুষ-বিচারকদের মাথার চুলগুলি ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা, দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ-মণ্ডল, শিরা ও পেশীবহুল হাতগুলি, দেখেই মনে হয় বিলাসে এই সব বিচারকের দল লালিত নয়, জীবনে কঠোর সংগ্রাম করেছে এরা, সে সংগ্রামের সমস্ত চিহ্ন আজও সুস্পষ্ট ওদের সর্ব্বশরীরে। বিচারকদের টেবিলের সামনে একটি কাঠের লম্বা দণ্ড আড়াআড়ি ভাবে রক্ষিত, তার এ-পাশে বিচারার্থী ও শ্রোতাদের জন্ত বেঞ্চ। আমরা এই বেঞ্চে বসলাম। আমরা যখন বিচারগৃহে ঢুকলাম তখন একটি স্ত্রীলোক কাঠের দণ্ডটির ওপর ঠেস দিয়ে মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কি সব বলছিল, আবার পরক্ষণেই চেঁচিয়ে কেঁদে উঠছিল। গাইডকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপারটা কি?" সে কিছুক্ষণ শুনে বললে, "মেয়েটি তার ছেলের খোরপোষের জন্ত এক জনের ওপর নালিশ করেছে, কিন্তু সেই লোকটি বোধ হয় ছেলেটির পিতৃত্ব অস্বীকার করছে।"

বড় কৌতুক বোধ হ'ল; রাশিয়ার নবপ্রবর্ত্তিত সমাজ-ব্যবস্থার ফলে উদ্ভূত এই সব নূতন রকমের মোকদ্দমা। এখন রাশিয়ার নরনারীকে একত্রে থাকতে হলেই লৌকিক বিবাহের প্রয়োজন হয় না, বিবাহ না-করেও একত্রে থাকলে সমাজ বা রাষ্ট্র তাতে বাধা দেয় না, এর ফলে ব্যভিচার বাড়বে বলেই আমাদের ধারণা। এই রকম মোকদ্দমায় কি বিচার হয় জানতে বড় কৌতূহল হ'ল।

যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে ডাকা হ'ল—সে স্পষ্টই বললে সে ছাড়া আরও অনেকে ঐ নারীর সঙ্গে বাস করেছে, কাজেই সন্তান যে তারই ঔরসজাত সে-বিষয়ে নিশ্চয় কি? অতঃপর যারা যারা বাস করেছিল বা আসা-যাওয়া করত তাদের ও যারা তাদের আসা-যাওয়া দেখেছে তাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ নেওয়া হ'ল। এর পর এই মোকদ্দমার কোনও রায় না দিয়েই আর একটি মোকদ্দমা ধরলে। এরও বাদী একটি স্ত্রীলোক; এর নালিশের বিবরণ এই যে,

কিছু দিন পূর্ব্বে স্ত্রীলোকটি তার স্বামীর বিরুদ্ধে স্বামীর বেতনের এক-তৃতীয়াংশ ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণের জন্য ডিক্রী পেয়েছিল। এখন সেই স্বামীর বেতন অনেক বেড়েছে কিন্তু সে পূর্ব্ব বেতনেরই এক-তৃতীয়াংশ এখনও দেয়, তার দাবি বর্ত্তমান বেতনের এক-তৃতীয়াংশ তাকে দেওয়া হোক। এই মোকদ্দমাটির দুই পক্ষের শুনানী হ'তে প্রায় পনের মিনিট লাগলো। এর পর বিচারকেরা পাশের ঘরে পরামর্শের জন্য উঠে গেলেন। যাবার সময় এক জন বিচারক আমার গাইডকে ডেকে আমাকে তাদের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে বললে।

পাশের ঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট ; একধারে একটি টেবিল, তাতে কতকগুলো বই ও খাতাপত্র ছড়ান, তার পাশে একটি চেয়ারে এক জন নারী সেক্রেটারী, আর খান-দুই চেয়ার ও একটি টুল ঘরটিতে ছিল। ঘরে কোন ছবি, ফুল বা সাজাবার আসবাব একটিও ছিল না। প্রথমে আমি কোথাকার লোক, কি জন্য রাশিয়ায় এসেছি, বিচার কেমন দেখলাম ইত্যাদি তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন। পরে আমি রাশিয়ার বিচার-বিভাগের গঠনপ্রণালী, আপীলের ব্যবস্থা, বিচারক-নিয়োগের ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে একে একে প্রশ্ন করতে লাগলাম ; তাঁরাও সানন্দে গাইড-মারফত তার জবাব দিতে লাগলেন।

রাশিয়ার সর্ব্বনিম্ন আদালতের নাম পিপ্‌লস কোর্ট (People's Court), এর এলাকা ছোট হলেও ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। এই বিচারালয়ের বিচারের বিরুদ্ধে প্রভিন্সিয়াল বা রিজিয়নাল আদালতে আপীল চলে। এইখানে রাশিয়ার রাষ্ট্র-বিভাগগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা ভাল, নচেৎ এই আদালতগুলির এলাকা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে কষ্ট হবে।

সমস্ত রাশিয়াটি (U. S. S. R.) সাতটি রিপাব্লিকে বিভক্ত। এই রিপাব্লিকগুলি প্রভিন্স বা রিজিয়ন অর্থাৎ নানা প্রদেশে বিভক্ত ; এই প্রদেশগুলি আবার জেলা ও গ্রামে বিভক্ত। কাজেই সাধারণ বিচারালয়ের আপীল প্রভিন্সিয়াল বিচারালয়ে হয়। তবে এই বিচারালয়গুলি শুধু আপীল-শোনা ছাড়াও প্রদেশের সমস্ত বিচারানুষ্ঠানের কার্য্যকলাপের ওপর নজর রাখে এবং যে-সব দুরূহ প্রশ্নের আইনগত সমস্যা নীচের আদালতগুলি ক'রে উঠতে পারে না, সেগুলি এই আদালতের বিচারকেরা তাঁদের সাধারণ সভায় মীমাংসা করেন। এই সঙ্গে একটা জিনিষ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাশিয়ায় আমাদের মত 'কেস-ল' (case laws) নাই অর্থাৎ কবে কোন্ বিচারক একটা মোকদ্দমার কি বিচার ক'রে গেছেন সেই নজীরে পরবর্ত্তী বিচারকদের বিচার করতে হবে এ ব্যবস্থা সেখানে নাই। তারা বলে এতে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি ব্যাহত হয়। এটা যে বাস্তবিকই একটা ভুল ও অনিষ্টকর প্রথা তা আমরাও আমাদের দেশে দেখতে পাই। একই রকম মোকদ্দমার বিচার কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গার হাইকোর্ট ভিন্নরূপে ক'রে থাকে ; যে-বিচারক যেমন বোঝেন তেমনি বিচার ক'রে থাকেন, কিন্তু যদি নিম্নআদালতগুলিকে অন্ধভাবে সেই সব নজীর মানতে হয় তা হ'লে সত্যই বিবেকবুদ্ধি ব্যাহত হয়। ওদেশে আইন শেখাবার জন্যে 'ইনষ্টিটিউট অব সোভিয়েট ল' আছে, সেখানে আইন ছাড়াও রাজনৈতিক অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি শেখান হয়। বিচারক বিবেকবুদ্ধি নিয়ে বিচার করে আর আইন-মত তার দণ্ড দেয়।

প্রভিন্সিয়াল বা প্রাদেশিক আদালতগুলির ওপরওয়ালা রিপাব্লিকগুলির সুপ্রীম-কোর্ট। প্রত্যেক রিপাব্লিকের সুপ্রীম-কোর্ট স্বাধীন। সব রিপাব্লিকের সুপ্রীম-কোর্ট একমাত্র ইউনিয়ন অব সোশ্যালিষ্ট সোভিয়েট রাশিয়ার (U. S. S. R.) সুপ্রীম-কোর্টের এবং সামরিক আদালতের অধীন। এই দুটি আদালত ছাড়া আরও একটি প্রতিষ্ঠান সমস্ত রাশিয়ার সর্ব্বময়কর্ত্তা। তার নাম 'গেপেয়ু' যার ইংরেজী প্রতিশব্দ আমরা জানি G. P. U.। এটা দেশের রাজনৈতিক গোয়েন্দা-বিভাগ। কাজেই সব রিপাব্লিকের ওপরই এর অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং এর শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের (U. S. S. R.) অধীন। রিপাব্লিকগুলির সুপ্রীম-কোর্টের মোটামুটি তিনটি কাজ—(১) আপীল-শোনা, (২) বিচার-বিভাগ (original) ও (৩) কঠিন আইন-সমস্যাগুলির সমাধান করা। প্রভিন্সিয়াল বিচারালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে এখানে আপীল শোনা হয় এবং এই

বিচারালয়ের আদেশই চূড়ান্ত, যদি-না এখানকার প্রেসিডেন্ট অনুমত হন। যদি প্রেসিডেন্ট ভিন্ন মত পোষণ করেন তা হ'লে সে বিষয়টি 'প্লেনাম' বা আদালতের সাধারণ সভায় উপস্থিত ক'রে মীমাংসা করা হয়। তবে সাধারণতঃ বাদী বা প্রতিবাদী পক্ষ এই আদালতে আপীল করতে পারে না। যদি এই আদালত ইচ্ছা ক'রে কোন মোকদ্দমা পুনর্বিচার করতে চায় বা রিপাব্লিকের প্রোকিউরেটার কোনটি এখানে পাঠাতে চান তা হ'লে নিম্ন-আদালতের রায় উল্টে দেবার ক্ষমতা এই আদালতের আছে। এর বিচার-বিভাগে কেবল দেশের অত্যন্ত দায়িত্বশীল লোকেদের (যথা, প্রোকিউরেটার, সুপ্রীম-কোর্টের বিচারক ইত্যাদি) বিচার হয়। রিপাব্লিকের সব আইন-কানুন বা বিচার-পদ্ধতির (procedure) সমস্যা এই আদালত সমাধান ক'রে দেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের (U. S. S. R.) সুপ্রীম-কোর্টেরও উল্লিখিত সমস্ত ক্ষমতা আছে। এই আদালত সাতটি রিপাব্লিকের সুপ্রীম-কোর্টের বিচার পুনরায় তদন্ত করতে পারে ও অন্য রায় দিতে পারে। রিপাব্লিকগুলির মধ্যে কোন ঝগড়া-ঝাঁটি হ'লে এই আদালত তার বিচার করে এবং এর বিচারকেই চূড়ান্ত ব'লে শিরোধার্য্য ক'রতে হয়। খুব উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের বিচার এই আদালত করে। এর 'প্লেনাম' বা সভার রিপাব্লিকগুলির সেণ্ট্রাল এক্‌সিকিউটিভ কমিটির সিদ্ধান্ত বা বিচারের কিছু কিছু ওলট-পালট ক'রে দেবার ক্ষমতা আছে। এই সেণ্ট্রাল একসিকিউটিভ কমিটিগুলিই রিপাব্লিকগুলির কর্ণধার। এই সব বিচারালয় ছাড়াও রেড আর্মি বা সৈন্যদলের বিচারার্থ মিলিটারী কোর্ট আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "বিচারকদের মাইনে কত? তাদের শিক্ষা-দীক্ষাই বা কতদূর? ওদের মাইনে নিশ্চয়ই বেশী?"

গাইড উত্তর দিল, "ফ্যাক্টরীতে কুশলী কর্ম্মীরা (skilled labourer) যে বেতন পায় বিচারকরাও তাই পেয়ে থাকে। ও এক সময় শ্রমিকই ছিল, পরে ওর বিচার-বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা দেখে ওকে বিচারক করা হয়েছে।" পরে মহিলা-বিচারক ও অন্য বিচারককে দেখিয়ে গাইড বলতে লাগল "ওরা এখনও কারখানাতেই কাজ করে। বছরে ছ-দিন মাত্র ওদের বিচার করতে দেওয়া হয়েছে—এর পর ওরা আবার কারখানায় ফিরে যাবে। যদি ওরা বিচারে নৈপুণ্য ও বুদ্ধি দেখাতে পারে হয়ত একদিন ওরাও এমনি পাকাপোক্ত বিচারক হবে।"

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই সব আনাড়ী লোক দিয়ে বিচার হয়? ওরা নিশ্চয়ই আইন পড়ে।"

গাইড হেসে উত্তর দিলে, "না, কিন্তু ওদের বিবেক-বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞান আছে, তা ছাড়া মাঝে মাঝে কারখানায় আইন-বিষয়ে ওদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানেও ঐ বিচারক ওদের আইনের ধারা বুঝিয়ে দেন।" জিজ্ঞাসা করলাম, "তা হ'লে যদি স্থায়ী বিচারক ও এই দুই জন ছ-দিনের বিচারকের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটে তা হ'লে কার মত বাহাল থাকবে? ঐ আনাড়ীদের, না শিক্ষিত বিচারকের?"

"যদি ওরা দু-জনেই একমত হয় তবে শিক্ষিত বিচারকের মত বাতিল হবে, কারণ মতাধিক্য এদিকেই বেশী।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, মহিলা-বিচারকদের কি পুরুষদের মতই বিচক্ষণ মনে কর; ওদের বিচার-বুদ্ধি কি সমান তীক্ষ্ণ?" আমার মহিলা গাইড এ-প্রশ্নে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি সস্মিত মুখে বললেন, "কেন তারা সমান হবে না? তারা কি পুরুষদের চেয়ে বোকা? মেয়েরা যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষদের চেয়ে চালাক হয় এ-কথা স্বীকার কর না?" তার হাসির মধ্যেও অন্তরের উষ্মার আঁচ পেলাম। বললাম, "তারা বুদ্ধিমান হ'তে পারে কিন্তু তারা ভাবপ্রবণ, যেটা বিচারের সময় নিরপেক্ষতার একটা প্রধান অন্তরায়।" হেসে গাইড উত্তর দিলে, "ওটা সেকেলে যুক্তি। একই শিক্ষা ও আবহাওয়ায় মানুষ হ'লে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে ভাবপ্রবণ হবে কেন? আর যদিই বা হয় তাতেই বা বিশেষ ক্ষতি কি? বিচারার্থীদের সব বিষয় দরদ দিয়ে দেখতে পারলে তবেই ন্যায়বিচার হয়।"

বললাম, "আচ্ছা, ও তর্ক পরে হবে। এখন বিচারকদের

সময় নষ্ট করা হবে না। আচ্ছা, এই বিচারকদের কে নিযুক্ত করে এবং কত দিনের জন্যে কায়েমী বিচারকেরা নিযুক্ত হয়?"

"এই আদালতের বিচারক প্রভিন্সিয়াল এক্সিকিউটিভ কমিটি নিযুক্ত করে সাধারণতঃ এক বৎসরের জন্য, কিন্তু এরাই আবার পুনর্নির্ব্বাচিত হয়।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, তোমাদের আদালতে কি উকীল য়্যাডভোকেট নাই? তাদের বড় বড় পকেট নিয়ে ত কাউকে ঘুরতে দেখলাম না।"

গাইড উত্তর দিলে, "আমাদের এখানে উকিল আছে, তবে উকিল দিতেই হবে এমন কোন আইন নাই। বিচারার্থীরাই নিজেরা সমস্ত খাতাপত্র দেখতে পায়, দরকার হ'লে নকল করতে পারে, বিচারের সময় যা-খুশী বলতে পায়, কাজেই উকিল দিয়ে পয়সা নষ্ট করবে কেন? বিস্মিত হয়ে বললাম, "পয়সা নষ্ট কেন? উকিলেরা কি পয়সা নেয়?"

"নিশ্চয়ই, এখনও ত আমরা কম্যুনিষ্ট নই, আমরা যে সোশ্যালিষ্ট, কাজেই সবকিছুর বিনিময়েই ত অর্থ এখনও চলছে। শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে অর্থ নেয়, শ্রমের তারতম্য অনুসারে পারিশ্রমিকের তারতম্য আছে। ষ্টেট এখন তার বাড়ির বদলে ভাড়া নেয়, খাবারের মূল্য নেয়, যানের ভাড়া নেয়, কাজেই পয়সা না-নেবার কথা উঠছে কোথায়। যখন আমরা কম্যুনিষ্ট হব তখনই কেবল পয়সার বিনিময় উঠে যাবে, তখন প্রত্যেকে দেবে তার যথাসাধ্য শ্রম আর পাবে তার যা যা প্রয়োজন, মুদ্রার মধ্যস্থতা তখন লোপ পাবে। এখন উকিল পয়সা নেবে না কেন? শুধু পয়সা নেওয়া নয়, প্রত্যেক উকিল তার যোগ্যতা হিসেবে মক্কেলদের কাছ থেকে ফি আদায় করে। তবে এই ফি সবার কাছ থেকেই সব উকিল সমান পায় না। অন্যান্য সব জিনিষের মতই যার যেমন বেতন অর্থাৎ আয় তাকে সেই হারে উকিল ফি-ও দিতে হয়; তবে উকিলরা এই ফি সোজাসুজি পায় না। এই সব ফি "কলেজিয়াম" বা উকিল সমিতিতে জমা হয়, পরে প্রত্যেক উকিলকে তার যোগ্যতা অনুসারে মাসে মাসে ঐ টাকা ভাগ ক'রে দেওয়া হয়।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "তাহ'লে যারা অতি দরিদ্র, যাদের রোজগার থেকে কেবল খাওয়া-পরা চলতে পারে মাত্র, তারা উকিল দিতে পারে না তোমাদের দেশে?"

গাইড বেশ জোর দিয়ে বললে, "নিশ্চয়ই পারে। কনসালটেশান ব্যুরোতে তাকে খালি দরখাস্ত করতে হয়; যদি ঐ প্রতিষ্ঠান বোঝে যে, সে সত্যই ফি দিতে অপারগ তখন তাকে বিনিপয়সায় ঐ সমিতি থেকে সাহায্য করা হয়।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, তোমাদের কোর্ট-ফির হার কি রকম?"

"কোর্ট-ফি-ই আমাদের লাগে না। বিচারের জন্য রাষ্ট্র আদালত রেখেছে, তার সমস্ত খরচ রাষ্ট্র বইবে; তার ওপর আবার কোর্ট-ফি চাপিয়ে দরিদ্র লোককে সুবিচার থেকে বঞ্চিত ক'রে লাভ কি? কোর্ট-ফি সৃষ্টি করা মানেই দরিদ্রদের অদালতের বাইরে রাখা বা তাদের ঘাড়ে ঋণের বোঝা চাপান; জা'রের রাজত্বে এটা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি, কাজেই কোর্ট-ফি ব'লে কোন জিনিষ এখন নাই।"

বললাম, "কিন্তু এর ফলে অযথা মোকদ্দমার সংখ্যা অনেক বাড়বে।"

"যদি কারও কোন অভিযোগ থাকে সে আদালতে এসে বলুক না; সত্যমিথ্যা আদালত দেখবে। কতকগুলো হাল্কা মামলা এসে কোর্টের কাজ বাড়াবে ব'লে দরিদ্রকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করলে সে আবার ধনীর হাতে পিষ্ট হবে।"

হেসে বললাম, "তোমাদের দেশে ত ধনী আর নেই; কি বল?" অপেক্ষাকৃত ধনী ও নির্ধন শ্রেণী যে এখনও রাশিয়ায় আছে এ-বিষয়ে পূর্ব্বে তার সঙ্গে আমার তর্ক হয়ে গিয়েছিল এবং তাকে আমার যুক্তি মানতে হয়েছিল, তাই সে একটু লজ্জিত হয়ে বললে, "বলেছি ত, এখনও আমরা সোশ্যালিষ্ট।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত একই ব'লে মনে হয়; তাই কি?"

—হ্যাঁ।

অতঃপর বিচারকদের আমার সব প্রশ্নের উত্তর

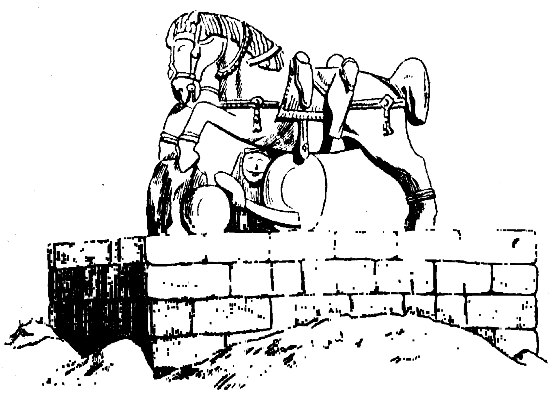
দেওয়ার ও আমার জন্ত তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্ত ধন্তবাদ দিয়ে করমর্দ্দন ক'রে উঠে বাইরে এলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিচারকরা বাইরে এলেন। প্রথম মামলার রায় হ'ল, যে-যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সহবাস করেছিল সকলকেই ছেলেটির ভরণপোষণের দায়ী হ'তে হবে।

এই রকম বিচারের ফলেই রাশিয়ায় বিবাহ-বন্ধন শিথিল হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার বাড়িতে পারে নাই, একদিন ব্যভিচারের ফলে হয়ত বেতনের এক-তৃতীয়াংশ নিয়মিত কেটে দিতে হবে—এই আর্থিক শাসনের ফলে ব্যভিচার বাড়তে পারে না। দ্বিতীয় মামলায় বাদিনী তার স্বামীর বর্ত্তমান বেতনের এক-তৃতীয়াংশই ডিক্রী পেল।

রাশিয়ার আদালতের বিচারে, বাদী-প্রতিবাদীর নিজেদের কথা বলবার স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে, সব-কিছুর মধ্যে অর্থলিপ্সু দালাল ও লোভী কর্ম্মচারীদের বিষাক্ত আব্‌হাওয়ার অভাব এবং সর্ব্বোপরি বিচারকমণ্ডলী আমায় মুগ্ধ করেছিল। এখানে বিচার করে তারা যারা বিচারপ্রার্থীদের অন্তরের ও বাইরের সব কথা, আচার-ব্যবহার, মনস্তত্ত্ব সবই জানে। অন্তান্ত দেশে সাধারণতঃ ধনী সম্প্রদায় থেকে বিচারকদল নির্ব্বাচিত হয়, ফলে তারা অধিকাংশই সাধারণ লোকের সুখদুঃখের সঙ্গে প্রাণের যোগের অভাবে অনেক সময় অজ্ঞতায় সাধারণ লোকের ওপর অযথা কঠোর ব্যবহার ক'রে বসে। অন্তান্ত দেশে বিচারার্থীর দল বিচারকদের দিকে একটা ভয়ের চোখে দেখে, ফলে তাদের সব কথা সরলভাবে বলতে ভয় পায়। বিচারকও নিজের আসন থেকে নেমে সাধারণের সঙ্গে মিলতে দ্বিধা বোধ করেন—তাতে সম্মান-হানির আশঙ্কা আছে। রাশিয়ায় যদি কোন বিচারকের মনে এই ভ্রান্ত আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান উঁকি মারে, তা ধরা পড়বা-মাত্র তাকে বিচারকের আসন থেকে নামিয়ে শ্রমিকের দলে ঠেলে দেওয়া হয়। যত ক্ষণ বিচারের আসনে সে আসীন তত ক্ষণ তার সম্মান, কিন্তু সেই সম্মানবোধ বিচারককে বিচারের পর সাধারণের সঙ্গে মিশতে বাধা দেয় না। এই জন্তই বিচার করা এক বৎসরের জন্ত মনোনীত হয়।

রাশিয়ার বিচার-বিভাগের অনাড়ম্বরতা, দরিদ্রতম ব্যক্তির ন্তায়বিচার পাবার সুবিধা, অর্থগৃধ্নু ঘুষখোর কর্ম্মচারীদলের অভাব এবং দিনকে রাত তৈরি করতে সুপটু উকিলমহলের স্বল্পতা পৃথিবীর যে-কোন সভ্য দেশের বিচার-বিভাগের অনুকরণীয়।



আধুনিকী

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

এখনও লোকেরা ভুলে কবিতারে খোঁজে—
চাঁদিনীর মধুরাতে, আধফোটা হাস্নুহোহানায়,
সেতারের মধুর গুঞ্জনে, আর প্রেয়সীর শরীর-সীমায়,
নির্ঝরের কলগীতে, মর্ম্মরিত বনবীথিকায়,
প্রভাতের সায়াহ্নের পাখীর কূজনে—।
ভুল, ভুল—সেথা হ'তে আসন টলেছে তার—
নামিয়াছে প্রত্যহের জীবন-সংগ্রামে,
অন্নকষ্টজর্জ্জরিত আমাদের দরিদ্র এ দেশে।
যেথায় সমষ্টি এই,—ব্যষ্টির তুষ্টিতে সেথা
কবিতা থাকিতে পারে, বিলাস-ব্যসনে
গর্ব্বিতার সুরভিত রেশমী-আঁচলে!
তাহারা শোনে নি—কি ছন্দ গাঁথিছে গানে
কোলাহলে মুখর বাজার,
গম্যমান ষ্টীমারের চাকার আওয়াজ।
কলরবে যে সঙ্গীত উঠিতেছে রেলের ষ্টেশনে
পাথর-বাঁধানো পথে লোহা-বাঁধা চক্রের ঘর্ঘরে
নিরন্তর যে ছন্দের প্রতিধ্বনি বাজে, সেই সুরে—
এস নেমে কবিতা আমার।
বিশ্বের আতপ হ'তে সারাদিন রহিয়া বঞ্চিত
কারখানা-ছাদতলে কোটি কোটি লোক,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বরে মৃত্যু-হিম কোল—
কান পেতে শোনো গান, মেশিনের লোহ-নিষ্কাশন।
যেথা, লোহারে গলায়ে জ্বলে প্রদীপ্ত 'ফারনেস'
প্রকাণ্ড চিমনী-নীচে উড়িতেছে ছাই—
যে-তালে ঠুকিছে মাথা নেহায়ে হাতুড়ি
কিম্বা গ্রাম্য কামারের ফাঁপর হাপরে
বাজিয়া ওঠে না গান, নাহিক কবিতা?
আকাশের রৌদ্রদগ্ধ চন্দ্রাতপ-তলে
গাঁতিতে রাখিয়া মাথা মজুর ঝিমায়—
পাশে গান গাহে তার, 'ষ্টীমে'র 'রোলার'।
ফেনায় ভরেছে মুখ—ঘোড়া ও সহিস,
সারাদিন যাত্রী খুঁজি পায় নি হদিস;
শকটের একটানা ক্লান্ত রব—কবিতা গাঁথে না?
গরু ও মোষের মত টানে গাড়ী রিক্‌শওয়ালা
পীচ গলে পদতলে তার, তবু টানে—
দুপুর-স্তব্ধতা হরে হাতের নূপুর।
[পশুক্লেশ-নিবারণী রয়েছে সমিতি,
মানুষ-পশুর তরে নাই কেহ, রয়েছে শ্মশান।]
কারাগারে নির্ব্বাসিত নির্ব্বাচিত নর
শৃঙ্খলের বিশৃঙ্খলে হতেছে বানর—
তাদের পায়ের সেই ভারী শিকলেরা
গাহিয়া ওঠে না গান, যবে তারা চলে
আপনার 'সেলে' ফিরে ঘানিটানা-শেষে?
এঞ্জিনের চক্রতলে বাজিতেছে অধুনা কবিতা।
হাটুরে নৌকার সেই তালে তালে বৈঠার বিক্ষেপ,
চারিতলে মজুরেরা ছাদ পেটে যবে—
সুর নাই তাল নাই সেও কি বেসুরা!
সে ছন্দে গুঞ্জরি ওঠ কবিতা আমার।
জীবন-সংগ্রামে শোন আজের কবিতা।
কবির লেখনী যদি, বেদনার নাহি গাহে গান
বেদনারে আনন্দেতে রূপান্বিত না করিতে পারে
বৃথা সে কবিতা তবে বৃথা সে লেখনী।

বাংলা ভাষার প্রশ্নপত্র

শ্রীসনৎকুমার সিংহ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের মাতৃভাষাকে সম্মানের আসনে বসাইয়াছেন। সুধীবৃন্দ বঙ্গভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য চেষ্টাও করিতেছেন। বঙ্গভাষা এখন কিয়ৎ পরিমাণে সমৃদ্ধিশালিনী। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, প্রবেশিকা, আই-এ, বি-এ, এবং এম-এ পরীক্ষার বাংলা ভাষার প্রশ্নপত্র ইংরেজী ভাষায় করা হয়। বহুদিন হইতেই এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহার কোনরূপ সঙ্গত কারণ নাই। যাহারা বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যে পরীক্ষা দিতে যাইতেছে, তাহাদের ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত প্রশ্নপত্র দেওয়া হয় কেন? বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্ন করিতে হইলে কি ইংরেজী ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা হয় না? ইহা কি লজ্জার কথা নহে যে, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ভারতবর্ষের একটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষারই বাংলা প্রশ্নপত্রে আগাগোড়াই ইংরেজী হরফ, কেবলমাত্র যে-অংশ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—যাহা ইংরেজীতে দেওয়া অসম্ভব—তাহাই শুধু বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়?

এমন বহু ছাত্র আছেন যাঁহারা ইংরেজীতে দেওয়া প্রশ্ন অপেক্ষা মাতৃভাষায় দেওয়া প্রশ্নকে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুচিন্তিত উত্তর প্রদান করিতে পারেন। ইংরেজী ভাষার প্যাঁচ-দেওয়া কঠিন শব্দে বাংলা ভাষার প্রশ্ন করিয়া এই সকল ছাত্রদের উপর কিরূপ অবিচার করা হয়, প্রশ্নকর্ত্তারা বোধ হয় তাহা খেয়াল করেন না। অনেক সময়ে বি-এ, এম-এ পরীক্ষার বাংলা প্রশ্ন বেশ কঠিন হয়, এবং সেগুলি ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত থাকায় তাহাদের মাতৃভাষায় অর্থ করিয়া প্রাঞ্জল ও সরলভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতেই ছাত্রদের অনেকটা সময় অযথা নষ্ট হয়। ইহার জন্য কাহারা দায়ী?

ইংরেজী ভাষার অনাদর বা অবহেলা করিতেছি না, কিন্তু বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্নপত্র বঙ্গভাষাতেই হওয়া শোভন ও সঙ্গত নহে কি? ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রকে পরীক্ষার সময়ে জার্ম্মান বা ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত প্রশ্নপত্র দিলে সে কি করে? অবশ্য কথা উঠিতে পারে যে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী অবশ্যশিক্ষণীয় ভাষা। কিন্তু তাই বলিয়া যে বাংলা প্রশ্নপত্র ইংরেজী ভাষাতেই করিতে হইবে, ইহার কি যুক্তি আছে? একথা মানিতেই হইবে যে, যাঁহারা বঙ্গভাষার ও সাহিত্যের প্রশ্নকর্ত্তা তাঁহারা সকলেই বঙ্গসাহিত্য ও ভাষাটিকে সম্যকরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে তাঁহাদের যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াই তাঁহাদের প্রশ্নকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইয়াছে। তবে কেন তাঁহারা প্রশ্নগুলি করিবার সময়ে ইংরেজী ভাষার কাছে ভিক্ষা করিতে যান? ইহা কি হাস্যকর ব্যাপার নহে যে, যে-ভাষায় উত্তর লিখিতে হইবে সে-ভাষায় সেই উত্তরের প্রশ্ন করা চলে না? এ-কথাও নিশ্চিত যে, বঙ্গভাষার এতবড় দৈন্য ঘটে নাই যাহাতে প্রশ্নপত্র করিবার সময় শব্দের বা ভাবের অনটন পড়ে। বাংলা প্রশ্নপত্র ব্যাপারে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় মাতৃভাষার উপর অনাস্থা প্রকাশ করিতেছেন বলিয়াই বোধ হয়। সিণ্ডিকেটের সভ্যবৃন্দ এবং বঙ্গভাষার অন্যতম সেবক আশুতোষের সুযোগ্য পুত্র বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলারের দৃষ্টি এই বিষয়ের উপর আকর্ষণ করিতেছি।



শান্তিনিকেতন, প্রথম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১॥০ টাকা, বাঁধান ২৲ টাকা। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৩০০ পৃষ্ঠা। সুমুদ্রিত।

রবীন্দ্রনাথের "শান্তিনিকেতন," "ধর্ম্ম," ও ধর্ম্মবিষয়ক অপ্রকাশিত সমস্ত প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া একত্র প্রকাশ করিবার যে আয়োজন ও চেষ্টা হইয়াছে, এই পুস্তকটি তাহার প্রথম ফল। ইহা দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা ইহা হইতে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, তাঁহাদের অনেক সন্দেহ দূর হইবে; আবার অনেক প্রশ্ন ও সন্দেহও তাঁহাদের মনে উদিত হইবে। তাহাও সমুদয় প্রকৃত ধর্ম্মোপদেষ্টার অভিপ্রেত।

ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ ইহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক প্রত্যেক উপদেশের উপর দক্ষিণ পার্শ্বে বৎসর, মাস ও দিন মুদ্রিত করিয়া দিলে ভাল হইত। অনেকগুলিতে শুধু মাস ও দিন আছে, বৎসর খুজিয়া বাহির করিতে হয়। ইহা বৃহৎ কোন দোষ নয়; কিন্তু যাহা করা হয় তাহা নিখুঁৎ ভাবেই করা ভাল।

বঙ্গীয় মহাকোষ—নমুনা সংখ্যা ও প্রথম সংখ্যা। প্রধান সম্পাদক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। 'বঙ্গীয় মহাকোষ'-কার্য্যালয়, ৩-এ, রামরতন বোসের লেন, শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।

ইংরেজীতে এবং অন্য কোন কোন প্রধান ভাষায় প্রত্যেকটিতে একাধিক এন্সাইক্লোপীডিয়া আছে। কোনটিই অনাবশ্যক নহে, এবং কোনটিতেই সব প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। সুতরাং বাংলায় এক "বিশ্বকোষ" প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে বলিয়া আর একটি এন্সাইক্লোপীডিয়া অনাবশ্যক, ইহা কেহ বলিতে পারেন না। বরং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত পরিশ্রমী, বহু বিদ্যাবিৎ, উদ্যোগী ও পণ্ডিত ব্যক্তির সম্পাদকতায় আর একটি এই জাতীয় মহাগ্রন্থের প্রকাশে বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেরই আনন্দিত হইবার কথা। তাঁহার মহাকোষের নমুনা সংখ্যা ও প্রথম সংখ্যা আমাদের মনে যুগপৎ আনন্দ, উৎসাহ ও আশার সঞ্চার করিয়াছে। তিনি ভাল কাগজে, নূতন অক্ষরে, ভাল ভাল ছবি দিয়া গ্রন্থখানি ছাপাইতেছেন। সমুদয় তথ্য সাবধানতার সহিত বহু যত্নে সংগৃহীত হইতেছে। প্রত্যেক সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠা পরিমিত। মূল্য আট আনা। আট বৎসরে ২১১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইবে। বিদ্যার নানা বিভাগে বিশেষজ্ঞ ও বিদ্বান্ বহু সংখ্যক লেখক নিয়মিত রূপে অমূল্য বাবুর সহায়তা করিতেছেন। তিনি নিজে ত অনেক বৎসর ধরিয়া মহা সঙ্কল্পটি হৃদয়ে পোষণ করিয়া পরিশ্রম করিয়া আসিতেছিলেন, এবং এখনও খাটিতেছেন। তাঁহার ব্রতের যে-দিন উদ্‌যাপন হইবে, সেদিন তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা ইহা ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারিবেন, যে, বাঙালীদিগকে তাঁহারা এমন একটি মহাগ্রন্থ দিলেন যাহা অধ্যয়ন করিয়া তাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন।

র. চ.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবাণী—শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক—ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, ৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৶০+৩০৮+।/০, মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কতকগুলি উপদেশ ও বাণী সংগৃহীত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় এরূপ একটি সংগ্রহের বিশেষ অভাব ছিল; এই গ্রন্থ সেই অভাব দূর করিবে। বর্ত্তমান সংস্করণে পরমহংসদেবের কয়েকটি উপদেশ নূতন করিয়া সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে পরমহংসদেবের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সারদেশ্বরী দেবীর (শ্রীশ্রীমায়ের) ও স্বামী বিবেকানন্দের কতকগুলি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই সংস্করণে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছে। সঙ্কলয়িতা বিষয় ভাগ করিয়া উপদেশগুলি সাজাইয়াছেন এবং গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ভক্ত পাঠকগণের নিকট এই গ্রন্থ যে সমাদর লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাপুরুষগণের বাণী যতই প্রচার লাভ করে ততই মঙ্গল। ছাপা, বাঁধাই ও আকার হিসাবে গ্রন্থের মূল্য খুবই কম।

প্রবর্ত্তক বিজয়কৃষ্ণ—বিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত। প্রকাশক প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪২। মূল্য পাঁচ সিকা।

স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল 'প্রবর্ত্তক' মাসিক পত্রে পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের একটি জীবনকাহিনী ধারাবাহিক ভাবে লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সে রচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষ সেই অসম্পূর্ণ জীবনকাহিনী বর্ত্তমানে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বিপিনবাবু গোস্বামী মহাশয়ের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন ও তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। গ্রন্থের বিষয়-সূচনায় তিনি কি ভাবে গোস্বামী মহাশয়ের এই জীবনকাহিনী লিখিবেন স্থির করিয়াছিলেন তাহার একটি পরিকল্পনা পাওয়া যায়। তাহা পড়িলে মনে হয় যে, লেখা শেষ হইলে গ্রন্থখানি বাংলা ভাষার জীবনচরিত-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিত। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিপিনবাবু যেটুকু লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বইখানির ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার, তবে আকার হিসাবে ইহার মূল্য কিছু বেশী বলিয়া মনে হইল।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

রাতের অতিথি—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। পি. সি. সরকার এণ্ড কোং। ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দশ আনা। ১৩৪১

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত ছয়টি কাহিনীর সমষ্টি। ঐতিহাসিক, ভূতুড়ে, জীবজন্তু—সব রকমের গল্পই আছে। গল্পগুলি সুলিখিত এবং উপভোগ্য, বয়স্ক পাঠকেরাও ইহাতে আনন্দ পাইবেন।

স্থানে স্থানে যে সকল ইঙ্গিত আছে, শিশু-চিত্ত হয়ত সেগুলির অর্থ সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু কোথাও সরসতার অভাব নাই।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

ঝড়—শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। পি. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲

একখানি সুবৃহৎ উপন্যাস। সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন হইলেও কয়েকটি বিশিষ্ট শক্তির জোরে লেখক দ্রুত নিজের স্থান করিয়া লইতেছেন। তাঁহার বইয়ের আখ্যানভাগ বেশ গতিশীল—সদাই নবতর ঘটনার মধ্য দিয়া বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, অতিরিক্ত রিফ্লেক্সন বা মন্তব্যের চাপে কোথাও রুদ্ধগতি হইয়া পড়ে না। ইহাতে উপন্যাসের মোহটুকু বরাবর বজায় থাকিয়া যায়। ভাষাও বেশ সমৃদ্ধ অথচ জটিলতাবর্জ্জিত।

আলোচ্য বইখানিতে এক দিকে প্রধান পুরুষচরিত্রগুলি ও অপর দিকে প্রধান নারীচরিত্রগুলির মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্য আছে। লেখক শক্তিশালী, ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট আরও বৈচিত্র্যের আশা রাখিলাম। বইয়ের ছাপা, বাঁধাই, কাগজ প্রকাশকের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমার ব্যবসা-জীবন—রায়-সাহেব বিনোদবিহারী সাধুর্খাঁ। ২য় সংস্করণ, ১৩৪১। প্রকাশক—শ্রীবিজয়চন্দ্র দাশ, বি-এল, সাহিত্য-ভূষণ, ২০ উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা, মূল্য ১॥০ টাকা। পৃষ্ঠা ।/০+॥০+২১১+৮

এক বৎসরের মধ্যে যে উল্লিখিত গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিতে হইল, ইহা হইতেই ইহার উপযোগিতা বুঝা যাইবে। আমরা আশা করি পুস্তকখানি পড়িয়া বাংলার উদীয়মান ব্যবসায়িগণ লাভবান হইবেন।

জহরলালের চিঠি বা পৃথিবীর ইতিহাস—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত। প্রকাশক শ্রীসুশীলচন্দ্র দাশগুপ্ত, ১৬৪ লেক রোড, কলিকাতা। মূল্য ১॥০।পৃঃ ১৩৫।

জওহরলাল তাঁহার কন্যাকে "Letters from a Father to his Daughter—নামে যে সকল চিঠি লেখেন বর্ত্তমান গ্রন্থখানি তাহারই অনুবাদ। ছোটদের জন্য পৃথিবীর ইতিহাস গল্পাকারে আগেও বাংলায় বাহির হইয়াছে। কিন্তু সেগুলি অপেক্ষা এ বইখানি অনেক ভাল হইয়াছে। প্রথমতঃ জওহরলালজী খুব সরস করিয়া বিষয়টি লিখিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ, অনুবাদের ভাষাও স্বচ্ছ ও সরস হইয়াছে। আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

চুম্বক-রহস্য—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম্-এস্‌সি প্রণীত; ২০৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে এস্. গুপ্ত এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

পুস্তকখানি বালক-বালিকাদিগের জন্য লিখিত। চরিত্রে ও চিত্রে চুম্বক সম্বন্ধে সাধারণ তত্ত্বগুলি সরস ও সরলভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে চুম্বকের উপাদান, উহার উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুর বিশেষত্ব, চুম্বকের লৌহাকর্ষণ, লৌহের চুম্বকত্ব প্রাপ্তি, লৌহ ও ইস্পাতের প্রভেদ, দুইটি চুম্বকের দুইটি বিসদৃশ মেরুর পরস্পর আকর্ষণ ও দুইটি সদৃশ মেরুর বিকর্ষণ, চুম্বকের প্রতি অংশের চুম্বকত্ব প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি গল্পচ্ছলে এমন সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করিয়া লিখিত হইয়াছে যে পুস্তকখানি প্রধানতঃ বালক-বালিকাদিগের জন্য রচিত হইলেও, ইহা ছোট-বড় সকলকে সমান ভাবে তৃপ্তি দান করিবে। বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলি শিশুপাঠ্য ও বালকপাঠ্য করিয়া প্রকাশ করার বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই জন্যই গ্রন্থকারের এই উদ্যম প্রশংসার্হ। গ্রন্থের ভাষা বেশ সরল ও মনোজ্ঞ। দুই এক স্থলে আর একটু সহজ করিয়া লিখিলে ভাল হইত। যাহা হউক, পুস্তকখানি সুখপাঠ্য ও সুলিখিত হইয়াছে। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই, ও কাগজ প্রশংসনীয়।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

লেনিন—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণবাণী পাবলিশিং হাউস, ২৬ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, মূল্য আট আনা, ১১৬ পৃষ্ঠা।

বইখানিতে মোটামুটি ১৮৮৭ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত লেনিনের কার্য্যধারা ও বক্তৃতাবলীর অংশবিশেষ উল্লেখ ক'রে লেখক রাশিয়ার ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এটিকে লেনিনের জীবনী বলা যায় না, কারণ জীবনীর যা উপাদান, বইটিতে তার অভাব। লেনিনকে কেন্দ্র ক'রে বইখানিতে সমাজতন্ত্রের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্যও যে তাই একথা তাঁর ভূমিকাতেই বোঝা যায়। লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে; ভাষা জোয়াল, সহজ। তবে অনাবশ্যক ইংরেজী শব্দগুলি বাংলা ভাষার মধ্যে বাংলা হরফে না থাকলেই ভাল হ'ত। অনেক ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা অপরিহার্য্য কিন্তু এমন বহু শব্দ বার-বার ব্যবহৃত হয়েছে, যার ভাল বাংলা প্রতিশব্দ আছে। লেখক স্বনামখ্যাত; তাঁর রাজনৈতিক মতামতও প্রখ্যাত। কাজেই এর মধ্যে আমরা সমাজতন্ত্র মতবাদের নিরপেক্ষ সমালোচনা পেতে পারি না। তবু তিনি লেনিনের যে-সব মত ও পথ লেনিনের লেখা থেকে উদ্ধৃত করেছেন সেগুলো বাংলার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে। যে-সব না-পড়ে-পণ্ডিত লেনিন সম্বন্ধে খালি শুনে শুনে রাশি রাশি প্রবন্ধ লিখে ও জোয়ালো বক্তৃতা দিয়ে শ্রমিকবন্ধু সেজে সস্তায় নাম কিনবার চেষ্টা করে, তাদের এই সব বই প্রভূত কল্যাণ করবে। সমাজতন্ত্র কি, কখন এর বিকাশ সম্ভব, প্রভৃতি সম্বন্ধে লেনিনের মতবাদের সত্যপরিচয় বইটিতে পাওয়া যাবে।

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বক্তৃতা ও উপদেশ—আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ। প্রকাশক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়। গুরুসঙ্গ লাইব্রেরী, ২০৩।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। তৃতীয় সংস্করণ। পৃষ্ঠা ১৬১, মূল্য ৸০।

শ্রীমদাচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত উপদেশ ও বক্তৃতার সমষ্টি। সাধুজনের বক্তৃতা সর্ব্বদাই সুখপাঠ্য। মুদ্রণ ও ছাপা চলনসই।

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল

সোজন বাদিয়ার ঘাট—জসীম-উদ্দীন প্রণীত কাব্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

শহরের কোলাহল, মোটর-ট্রামের বিকট আওয়াজ আর শত কর্ত্তব্যের টানাটানিতে কলিকাতায় প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে। মাঝে মাঝে পল্লীর পথ ঘাট গাছ লতা পুকুর নদী ফিঙে বুলবুলি আর

তাহাদেরই সঙ্গে পল্লীর গাছের ছায়া ও নদীর জলের আদরে-সোহাগে-গড়া মানুষগুলিকে যখন মনে পড়ে তখন আরামে আশ্বাসে মন জুড়াইয়া যায়।

কবি জসীম-উদ্দীনের এই কাব্যগ্রন্থখানি পল্লীর সকল ছবি, সকল রীতি, সকল বিবাদ-মিলন, সকল শান্তি-বিষাদ এবং সকল সোহাগ-আদর লইয়া শহরবাসীদের হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাব্যের কাহিনীটি অতি সরল, অত্যন্ত গ্রাম্য এবং সেই জন্য সম্পূর্ণ নির্মল ও খাঁটি।

এক মুসলমান যুবক ও এক নমঃশূদ্র যুবতীর প্রণয়-কাহিনী নানাবিধ সামাজিক বাধাবিঘ্ন এবং ব্যর্থতার মধ্য দিয়া আসিয়া অবশেষে অপরূপ করুণ মর্ম্মস্পর্শী সার্থকতার পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই প্রেম-কাহিনীটি বিবৃত করিতে গিয়া বর্ত্তমান কালের হিন্দু-মুসলমানের বহু বিরোধ-মিলনের কথা, সামাজিক অসাম্যের কথা, চক্রীর চক্রান্তজাত সাম্প্রদায়িক কলহের কথা এবং অত্যাচারী গ্রাম্য জমীদার ও তাহার অত্যাচারী স্বার্থান্বেষী নায়েবের কূটজালে হিন্দু-মুসলমানের সর্ব্বনাশের কথা কবিকে বলিতে হইয়াছে। কিন্তু এই গুরুতর সাম্প্রদায়িক সমস্যার উল্লেখ সত্ত্বেও সমস্ত কাব্যখানির মধ্যে কবির উদারচিত্ততার ফল্গুস্রোত বহিয়া গিয়াছে, এবং তাহাই কাব্যখানিকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বহু স্থানে কবির সরল ভাষা ও সরল গ্রাম্য উপমা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

এমন গ্রাম্য প্রেম, এমন গ্রাম্য সমাজ ও এমন গ্রাম্য প্রকৃতির কথা অনেক দিন পাই নাই; সেইজন্য কাব্যখানি আমাদিগকে যথার্থই আনন্দ দান করিয়াছে।

কাব্যখানির ছাপা ও বাঁধাই ভালই; কিন্তু ছাপার ভুল অনেক আছে।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

শ্রীবামলীলা—(বামাক্ষ্যাপাবাবার জীবনী ও সাধ্যসাধন-তত্ত্বকথা)। আদি লহরী। শাস্ত্রী শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক—শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, সম্পাদক, শ্রীবামসেবক সম্প্রদায়। ৪৮।২, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বীরভূম তারাপীঠের বাহ্যাড়ম্বরহীন আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ সাধক বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বা বামাক্ষ্যাপার জীবনের আংশিক বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্য ও অন্ত্যলহরী নামে আর দুই খণ্ডে তাঁহার জীবনের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইবে। বাঙ্গালা দেশের এই অনতিপরিচিত সাধকপ্রবরের ধর্ম্মজীবনের ঘটনাবলীর বিবরণ এই গ্রন্থে এতদ্‌বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা বিষদ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের শিষ্যজনোচিত আবেগ ও আন্তরিকতা সুব্যক্ত। যে প্রকরণে সাধক সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে, প্রকরণের প্রারম্ভে এক একটি সংস্কৃত শ্লোকে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই শ্লোকগুলির আকর সম্বন্ধে গ্রন্থকার সম্পূর্ণ নির্ব্বাক। সাধকের জীবনবৃত্তান্ত ছাড়া, ধর্ম্মকৃত্যের অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে বিবিধ মতবাদ ও সাধারণ ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থমধ্যে করা হইয়াছে। এই আলোচনা গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে সত্য. তবে ইহা একটু সংক্ষিপ্ত হইলেও গ্রন্থের গৌরব হানি হইত বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ, আশঙ্কা হয়, সর্ব্বথা আড়ম্বরসম্পর্কশূন্য সাধকের এই জীবনী সাধারণ পাঠক ও ঐতিহাসিকের নিকট একটু আড়ম্বরবহুল বলিয়া মনে হইতে পারে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

যুগের বাংলা—শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত প্রণীত। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৬৩ পৃঃ মূল্য ৷৹ আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে গ্রন্থকার বাংলা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাস, ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালার স্থানাভাব, বাংলার শিল্পের অবনতি, নারী-প্রগতির নূতন ধারা ও তাহার বিপদ—এই সমস্ত বিষয়েই আলোচনা ইহাতে রহিয়াছে। নারী-জাগরণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার মনে করেন যে, যে-জাগরণে নারী "বিজয়া সভ্যতার অনুকরণে ডাইভোর্স চায়, পরীক্ষামূলক বিবাহের অভিনয় চায়,...কুমারী, যুবতী, বিধবা নির্ব্বিশেষে গর্ভনিরোধ-বটিকায় অনিয়ন্ত্রিত যৌবনের মুস্কিল আসান খুঁজে"—সে জাগরণ জাতির ভবিষ্যৎ রক্ষা করিতে পারিবে না। (৬৩ পৃঃ)। কিন্তু এই সেদিন করাচীতে নিখিল ভারতীয় নারী-সম্মেলনের ৯ম অধিবেশনে ৫৪ : ৩৫ ভোটে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, জন্মনিরোধ সম্বন্ধে উপদেশ লইবার অধিকার মেয়েদের আছে এবং উহা বর্ত্তমানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও হইয়া পড়িয়াছে। অতঃপর পরবর্ত্তী সংস্করণে আমাদের গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে তাঁর মত পরিবর্ত্তন করেন কিনা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম। যে-সব বিপদের ইঙ্গিত তিনি করিয়াছেন তাহা আমরাও সম্পূর্ণ স্বীকার করি; কিন্তু উদ্ধারের পথ কোন্ দিকে?

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আকাশ ও মৃত্তিকা—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স; ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। পৃঃ ২৯২;

এই উপন্যাসখানি গতানুগতিক নয়। প্রধান চরিত্র জয়ন্তীকে অতি বিচিত্ররূপে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, চরিত্র বলিতে এই একটিই; অপরগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ইহার বিকাশে সাহায্য করিয়াছে মাত্র। লেখকের সকল সৃষ্টিচাতুর্য্য তাই ইহারই উপর পড়িয়াছে। ইহাকে লইয়াই সুশুভ্র আকাশ ও আবিলতাময় পৃথিবীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এ যেন সরু দড়ির পোলের উপর দিয়া চলিয়াছে। পড়িতে পড়িতে তাই চমকিয়া উঠিতে হয়। একটু এদিক-ওদিক হইলেই হয় অস্বাভাবিকত্বের কোঠায় পৌঁছিত, নয়ত শিব গড়িতে বানর হইয়া যাইত। কিন্তু বিস্ময়কর লেখনী-সংযমে সকল দিক সামলাইয়া গিয়াছে; চরিত্রটি সুসমঞ্জস পরিণতি লাভ করিয়াছে। সুলেখক বলিয়া সরোজ-কুমারের খ্যাতি আছে; বর্ত্তমান উপন্যাসে সে যশ বাড়িবে। ছাপা বাঁধাই সুন্দর

শ্রীমনোজ বসু

কলিকাতা-পরিচয়—মূল্য এক টাকা, প্রাপ্তিস্থান—অজন্তা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ৬ নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা।

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে অভ্যর্থনা-সমিতি আগত প্রবাসী বাঙালীদিগকে কলিকাতা সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে কলিকাতার ইতিহাস, প্রাচীন বাঙালী মনীষিগণের জীবনী ও তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে কলিকাতার দ্রষ্টব্যস্থানসমূহ ও বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সচিত্র বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞাতব্য তথ্যাদি এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাধারণভাবে কলিকাতা সম্বন্ধে যাহা জানা দরকার, এই পুস্তক পাঠ করিলে তাহা জানা যাইবে।

বাঁকুড়ার পুরাকৃতি-রক্ষা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বাঁকুড়া জেলা কয়েকটি ভূমে বিভক্ত। ভূম, ভূমি, দেশ। উত্তরে সামন্তভূম, দক্ষিণে মল্লভূম, পূর্বে শূরভূম, পশ্চিমে বরাহভূম, ধবলভূম, তুঙ্গভূম। এক এক ভূমের এক এক রাজা ছিলেন; সে সে রাজার বংশের নামে ভূমের নাম। এই সকল ভূমের মধ্যে মল্লভূম বিস্তীর্ণ। এককালে শূরবংশ হীনবল হইলে শূরভূম মল্লরাজার শাসনে আসিয়াছিল। মল্লভূম ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর আমল পর্যন্ত আট-নয় শত বৎসর প্রায় স্বাধীন ছিল। বর্গী-দস্যু ভাস্করপণ্ডিত মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর আক্রমণ ও অবরোধ করিয়াছিল, কিন্তু দলমর্দন (দলমাদল) কামানের অগ্ন্যুদ্গার সহিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছিল। মল্লরাজ বীরহাম্বীর মোগল বাদশাহকে কিঞ্চিৎ কর স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন বৎসর দিতেন, কোন বৎসর দিতেন না। বঙ্গের পাঠান সুলতানেরা মল্লভূমে প্রবেশ করিয়াছিলেন কিনা, তাহার কোন কিম্বদন্তীও নাই। লোকে শুনিয়াছে, শ্রীনিবাস আচার্যের দুই গাড়ী গ্রন্থ মল্লভূমে লুণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ভাবে নাই, মল্লভূম স্বাধীন রাজ্য ছিল, সে রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে বিদেশীকে রাজার অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইত। শ্রীনিবাস আচার্য একা শূন্যহস্তে গমন করিলেও ঘাটিতে (পুলিস আউটপোষ্ট) জানাইয়া যাইতে হইত। কোন্ বিদেশী কোন্ রাজ্যে স্বাধীন ভাবে গমনাগমন করিতে পারে? আচার্য-ঠাকুরের সর্বস্ব অপহৃত হইয়াছিল, প্রত্যর্পিতও হইয়াছিল। দেশশাসনের এই সনাতন বিধি লঙ্ঘিত হয় নাই। রাজা অপহৃত গ্রন্থের মূল্য বুঝেন নাই, এমন নহে। তিনি ভাগবতপাঠ শুনিতেছিলেন, আচার্যঠাকুর-কৃত ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মল্লভূমের রাজা গোপাল সিংহের সময়ে এক বিদেশী পর্যটক লিখিয়া গিয়াছেন, প্রজা রাত্রিকালে গৃহদ্বার রুদ্ধ না করিয়া নিদ্রা যায়, সে রাজ্যে বিদেশী প্রবেশ করিলে ঘাটিআলেরা ঘাটিতে ঘাটিতে পঁহুছাইয়া দেয়।

কিন্তু কবে বিষ্ণুপুর রাজধানী হইয়াছিল, কবে হইতে ও কেন মল্লাব্দ প্রচলিত হইয়াছিল, আমরা কিছুই জানি না। কে সে কোটেশ্বর, যাঁহার কোট (দুর্গ) লোকমুখে কোড়াসুর-গড় হইয়াছে; কে সে ঈশ্বর, ভূমিনাথ, যাঁহার নামে (বি এন রেলের পিয়ারডোবা ষ্টেশনের কাছে) অসুরগড় প্রসিদ্ধ হইয়াছে? কে সারংগড় নির্মাণ করাইয়াছিলেন? তিনি কোন্ দেশ শাসন করিতেন? দক্ষিণে বেত্রগড়, হোমগড়, রামগড়, লালগড়, মন্দারগড়, ইত্যাদি এক এক গড়ে এক এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু কে সে অতীত কাহিনী শুনাইবে? শূরভূম নিশ্চয় শূরবংশীয় রাজাদিগের রাজ্য ছিল। দামোদরের পশ্চিম পার্শ্বে রাজ্য। ভূমি উর্বরা, রাজ্যস্থাপনের যোগ্য। শূরবংশের যিনি আদি, যিনি পশ্চিমদেশ হইতে পঞ্চ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তিনি কি এই শূরভূমের রাজা ছিলেন? ধবলভূমের প্রতিষ্ঠাতা কি গুর্জর-প্রতীহার, ও তুঙ্গভূমের কর্ণাটদেশীয় ছিলেন? লাউসেন কি এই দুই বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন?

শিশুনিয়া পাহাড়টি শিশুনাগ (শিশুহস্তী) তুল্য শুইয়া আছে। কে তাহার গাত্রে বিষ্ণুচক্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন? তিনি পুষ্করণার অধিপতি সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মা। আমরা উৎকীর্ণ লিপি হইতে এইটুকু জানিতেছি। লিপিপ্রাজ্ঞেরা চতুর্থ খ্রিষ্টশতাব্দের বলিয়াছেন। প্রথমে শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব অজমের দেশের পুষ্করতীর্থের চন্দ্রবর্মা মনে করিয়াছিলেন। পরে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মালবদেশাধিপতি সিংহবর্মার পুত্র অনুমান করেন। দুই জনেরই যুক্তি খণ্ডিত। এক জনও জানিতেন না, শিশুনিয়া হইতে ২৪ মাইল পূর্বে পোখর্না নামে গ্রাম আছে। দামোদরের দক্ষিণ তীরে গ্রাম। এখানে গড়ের চিহ্ন আছে। ইহার প্রাচীনতার বহু নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে, দ্বিতীয় খ্রিষ্টশতাব্দের আছে, বহু চিহ্ন দামোদরের

বন্যায় লুপ্ত হইয়াছে। চন্দ্রবর্মা এই প্রাচীন পুষ্করণার অধিপতি ছিলেন কি? কে আমাদের সংশয়চ্ছেদ করিবে? ছাতনায় ও কেঞ্জাকুড়ায় যুদ্ধে নিহত আয়ুধিক সৈনিকের পাষাণ-মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা কত কালের মৃত সাক্ষী, কোন্ যুদ্ধের, কোন্ প্রতিপক্ষের সাক্ষী, কে সে বিজয়বার্তা-ঘোষণার কাহিনী শুনাইবে? সে পক্ষ পরাজিত হইয়াছিল। সে নিমিত্ত মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ মূর্তি অন্য স্থানেও আছে।

দেশটি অনার্যের অধিকৃত ছিল। নিরুপমা রাঢ়ভূমিও এককালে তাহাদের ভোগে ছিল, পবিত্র ব্রহ্মাবর্তও ছিল। তাহাতে দেশের গৌরবহানি হয় না। নিবিড় অরণ্যানী রাঢ়ের পশ্চিমের দেশটিকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। দেশটি নূতনও নয়। কত যুগ চলিয়া গিয়াছে, যাহার সংখ্যা করিতে ভূবিদ্যার আশ্রয় লইতে হইবে। বাঁকুড়া নগরের যেখানে সরকারী কৃষি আপিস, দেখিতেছি স্তর-বিকৃত প্রস্তরের বৃষ্টিবাত্যা-শীতাতপহত পর্বতের উপরে রহিয়াছে। তখন গন্ধেশ্বরী নদীর জন্ম হয় নাই, বর্ষার বন্যা দ্বারকেশ্বরে পড়িত। বন্যার কর্দমে সে ভগ্ন ক্ষয়িত বিশ্লিষ্ট পর্বতের শিরোদেশে এখনও আধহাত-পুরু মৃত্তিকা রহিয়াছে। সে বন্যার পলিতে কৃষিক্ষেত্র হইয়াছে। সে শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি কতকাল জনহীন ছিল, কে জানে? তার পর মানুষের কুঠারে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ আরম্ভ হইয়াছিল। সে কুঠার কেহ খুজে নাই, কে খুজিবে? হয়ত দৈবাৎ চোখে পড়িয়াছে, সামান্য পাথর মনে হইয়াছে, দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কোথাও কোথাও এখনও শিলাশস্ত্র আছে। কিন্তু কে অন্বেষণ করে, রক্ষা করে?

বাঁকুড়ার উত্তরসীমা হইতে পার্শ্বনাথ পর্বত অধিক দূরে নয়। এটি শেখর ভূম। বাঁকুড়া ও শেখরভূম মিশিয়া গিয়াছে, উভয়ের অবচ্ছেদক রেখা আধুনিক ও কৃত্রিম। দেশটি গয়া হইতে দক্ষিণগামী পথেও পড়ে। জৈন ও বৌদ্ধ পরিব্রাজক এদেশে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নির্মিত শিলামূর্তি নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের পূর্বভাগে দ্বারকেশ্বর নদের কূলে বৌদ্ধ বিহার ছিল। এখনও লোকে সে গ্রামকে বিহার বলে। সেখানে মকরাক্ষ নামে নরপতি চাঁপাইর ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। কে সে রাজা? তিনি কবে ছিলেন? একতেশ্বর শিবমন্দিরের বহিঃপ্রাচীরের মধ্যে 'ধাঁদারাণী' নামে যে শিলামূর্তি পূজিত হইতেছে, সেটি জৈন কি বৌদ্ধ তাহাও অজ্ঞাত রহিয়াছে। কোন্ শাক্ত মহানুভব রাজা অম্বিকানগর নামে রাজধানী করিয়াছিলেন? কোন্ বিচক্ষণ তত্ত্বদর্শী জৈন-বৌদ্ধ-শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব-গাণপত্য-সৌর প্রতিমা কুমারী নদীতটে বর্তমান কালের চিত্রশালা করিয়াছেন? কত প্রতিমা নদীগর্ভে বিনষ্ট হইয়াছে, কত অপহৃত হইয়াছে, কত সাগরান্তরিত হইয়াছে! এখনও এখানে ওখানে মৃত্তিকা হইতে নূতন নূতন শিলামূর্তি পাওয়া যাইতেছে। কে সে সব সংগ্রহ ও রক্ষা করিবে? কে বাহুলাড়া গ্রামের সিদ্ধেশ্বর শিবের, কে ইন্দ্রপুরের চণ্ডীর মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন? কে কবে একতেশ্বরের মন্দির, কে খুটগড়িয়ার মন্দির, সোনাতাপলের মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন?

পূর্বকালে দেশটি দরিদ্র ছিল, এখনও দরিদ্র। তথাপি কৃমিজ বস্ত্র, উত্তম কাংসপাত্র নির্মিত হইত। সেকালের বস্ত্র, লৌহতাম্রপিত্তলকাংসপাত্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ অলঙ্কার, মৃন্ময় পুত্তলিকা দেশের কলানৈপুণ্যের ও রূপকল্পনার সাক্ষী। সে পট-কার কই যে রামলীলা ও কৃষ্ণের ব্রজলীলার চিত্র লিখিত, দশাবতার তাস লিখিত? কোন্ সে লৌহকার যে আকর হইতে লৌহ নিষ্কাশিত করিত? কোন্ সে কর্মকার যে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করিত? সে যুদ্ধাস্ত্রের কি রূপ ছিল? কোন দক্ষ কর্মকার ১ ফুট সুষিরের ১২ ফুট দীর্ঘ দলমর্দন কামান গড়িয়াছিল? কত কর্মকার দুই শত মণ লৌহ জুড়িয়াছিল? লৌহের নিমিত্ত কর্মকারকে দূরে যাইতে হয় নাই। বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে রাইপুরের নিকটে এক ছোট পাহাড় হইতে এখনও লৌহ নিষ্কাশিত হইতেছে। হাজারিবাগ হইতেও আকর আসিত, কেঞ্জাকুড়ার নিকটে লৌহ পৃথক হইত, লৌহমল তাহার সাক্ষী।

সমতাল, ভূমিজ, মৃত্তিজ ও বর্বর জাতির বাসভূমিতে কাঞ্জিলাল গাঞির ব্রাহ্মণের আদিগ্রাম কেঞ্জাকুড়ায় স্থাপিত হইয়াছিল। কনৌজ হইতে কত পাঠক, ত্রিবেদী, অধ্বর্যু, বাজপেয়ী, অগ্নিহোত্রী আসিয়া বাস করিয়াছেন। উত্তর-বঙ্গ হইতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। উৎকল হইতে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য আসিয়া নিবাসী হইয়াছেন। বর্দ্ধমান হইতে

অসংখ্য কুলীন ব্রাহ্মণ আসিয়া চিরবাসী হইয়াছেন। এই রূপ নানা দেশাগতেরা নূতন দেশ বর্জন করেন নাই, স্ব স্ব দেশের বিদ্যানুশীলন ও আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন নাই। ইহারা ও অপরে অনেক পুথী লিখিয়াছিলেন। গহন বনের ভিতর দিয়া বাহিরের লোকের গমনাগমন ছিল না। বাহিরের পুথী বাহিরের লোকের সহিত আসিয়াছিল, কিন্তু বাহিরে যায় নাই। এইরূপে দীর্ঘকালে বহু পুথী সঞ্চিত হইয়াছিল। কত পুথী ইঁদুর কাটিয়াছে, উই মাটি করিয়াছে, বর্ষার জল পচাইয়াছে, আগুনে ভস্ম করিয়াছে; নষ্ট পুথী ডোবার জলে ও সারকুড়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তথাপি গাড়ী গাড়ী পুথী স্থানান্তরিত হইয়াছে। "এশিয়াটিক সোসাইটি"র পুথীশালায়, "বিশ্বকোষ" কার্যালয়ে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথীশালায়, কিছু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথীর সংখ্যা বাড়াইয়াছে। সে সকল পুথী সযত্নে রক্ষিত হইতেছে, সত্য; কিন্তু বাঁকুড়া নিঃসত্ত্ব হইয়াছে। আর যে কত পুথী, কত পুথীর পাতা গ্রন্থগৃধ্র ছলে বলে আত্মসাৎ করিয়া অজ্ঞাত দেশে লইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কাশীরামদাসের মহাভারতের তিনখানা পুথী পাত্রসায়র হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথীশালায় গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি কাশীরামদাসের নিজের পুথীর মাত্র পনর বৎসর পরে পাত্রসায়রে অনুলিখিত হইয়াছিল। "ধর্মপূজাবিধানে"র ও রামাই পণ্ডিতের "শূন্যপুরাণে"র পুথী বিষ্ণুপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছিল। এত পুথী নষ্ট ও স্থানান্তরিত হইবার পরেও যে বিষ্ণুপুরে আদি কবি বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলীর পুথী পাওয়া গিয়াছে, আশ্চর্য বটে। এই আবিষ্কারে সাহিত্যিক-সমাজ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই চণ্ডীদাসই কি ছাতনার বাসলী দেবীর বড়ু ছিলেন? আঠার বৎসর হইল সে পুথী মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও ইঁহাদের বিস্ময় কাটে নাই। স্বাধীন দেশে গতানুগতিকতা থাকে, থাকেও না। বড়ু রাধাকৃষ্ণলীলা-গীতে কোথাও পুরাণ মানিয়াছেন, কোথাও নূতন গড়িয়াছেন। গীতবাদ্যের দেশেই উত্তম উত্তম গীতের উদ্‌ভব হইয়া থাকে। শত বৎসর পূর্বেও বিষ্ণুপুরে বড়ুর গীত ধরিয়া নারদমতে তাল শিক্ষা দেওয়া হইত। সে গীতের ও তালের পুথী পাওয়া গিয়াছে। আর, কে না যদু-ভট্টের খেয়াল, কীর্তি-গোস্বামীর পাখোয়াজের খ্যাতি শুনিয়াছে? আর কোথায় জগৎ-গোস্বামীর টোলে শিষ্যেরা প্রতিপালিত ও গন্ধর্ববিদ্যা আয়ত্ত করিয়া গিয়াছে? সে ধ্রুপদ এখনও নিঃশব্দ হয় নাই।

যে শুভঙ্করী আর্যা বঙ্গদেশের তাবৎ পাঠশালায় অধীত হইতেছে, আদি শুভঙ্কর যিনিই হউন, তিনি এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর কোন্ শুভঙ্করী আর্যায় ভূমিপরিমাণের প্রাচীন পদ্ধতি আছে? শুভঙ্করী 'দাঁড়া' নামে যে আট ক্রোশ দীর্ঘ খাল আছে, কৃষকের হিতার্থে খনিত হইয়াছিল, সে দাঁড়ার নামেই প্রকাশ সূত্রধর (ইঞ্জিনিয়র) সূতা ধরিতে জানিতেন, দাঁড়ার শিরায় শিরায় জলনালা করিয়াছিলেন। কত গ্রামে কত 'বান্ধ' নির্মিত হইয়াছিল, কত পোখরী খনিত হইয়াছিল। এখনও বামন দ্বাদশী দিনে ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলিত হয়, এখনও আখ্যান দিনে (১লা মাঘ) গ্রামবাসীরা মৃগয়া করে। দেশ স্বাধীন ছিল, দেশবাসী স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। দেশের গ্রহাচার্যেরা স্বরচিত গ্রহগণিতযোগে পঞ্জিকা প্রণয়ন করিতেন। তাহার চিহ্ন এখনও বগড়ি-তে (বকদ্বীপ) আচার্য-বংশে রহিয়াছে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, ভরণী নক্ষত্রে রবি প্রবেশ করিলে (১৩ই বৈশাখ) নববর্ষ গণনা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। অশ্বিনীর উদয়ের পরেই সূর্যের প্রকাশ দেখিয়া এই বিধি হইয়া থাকিবে। কিন্তু উৎপত্তি অজ্ঞাত।

প্রত্যেক জেলাতেই পুরাবৃত্তের উপকরণ আছে। প্রত্যেক জেলাতেই উপকরণ সংগ্রহ ও রক্ষা, নূতন উপকরণ অন্বেষণ ও বিনিয়োগ নিমিত্ত যে নামেই হউক এক সমিতি স্থাপন কর্তব্য। কয়েক বৎসর পূর্বে কে জানিত দামোদরের দক্ষিণে মহানাদ নামক স্থানে পুরাকৃতি পাওয়া যাইবে? এক এক দিন যাইতেছে, কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু নষ্ট হইতেছে। পুরাকৃতির মূল্য নাই। আর, যে মানুষ তাহার বাসভূমির বর্তমান ও অতীত দশা স্মরণ না করে, সে অন্ধ থাকিয়া কাল কাটায়। স্বদেশের জ্ঞান নিমিত্ত আর কত কাল বিদেশীর কৌতূহলের প্রতীক্ষায় থাকিবেন? যে দেশ নূতন নূতন ধন উপার্জন করে, সে দেশ ধন্য। আর, যে দেশ পৈতৃক ধন রক্ষা করিতে উদাসীন, সে



বাঁকুড়া জেলার বাহুলাড়ার মন্দির
[ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে]

কিসের গৌরব করিবে? বাঁকুড়ায় যত প্রকারের যত উপকরণ আছে, রাঢ়ের অন্য কোন জেলাতে তত নাই।

১৩২৯ বঙ্গাব্দে বাঁকুড়ায় 'সারস্বত সমাজ' স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অনুষ্ঠান-পত্রের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে। "সারস্বত-সমাজ জনগণের চিত্তে কর্ষণ ও বর্ষণ প্রয়াসী। অন্ন-পানে দেহ রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু মনের ভোজ্য না পাইলে সে দেহ শুষ্ক ও শীর্ণ হয়।··· কেহ কেহ অলীক আশঙ্কা করেন; মনে করেন তিনি লেখাপড়া করেন না, সারস্বত-সমাজ সরস্বতীর বরপুত্রের সমাজ। কিন্তু সরস্বতীর পূজা কে না করেন? কে মন ব্যতীত দেহ লইয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করেন? আমরা জনে জনে শস্য উৎপাদন করি না, কিন্তু আমরা সকলেই ভোক্তা। কেহ ভোজ্য আহরণ করেন, কেহ পরিবেবণ করেন।··· সম্প্রতি সারস্বত-সমাজের কর্তৃত্বে টোলের ছাত্রদিগের সংস্কৃত পরীক্ষা হইতেছে।* কিন্তু ইহা বিপুল কার্যক্ষেত্রের এক ক্ষুদ্র কোণ মাত্র।"

নানা কারণে সারস্বত-সমাজ দেশজ্ঞানসঞ্চয়ে মনোযোগী হইতে পারেন নাই। কিন্তু কোথায় কি আছে, কোথায় কি পাওয়া যাইবে, সে অনুসন্ধানে বিরত হয়েন নাই। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে প্রত্নভবন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সারস্বত-সমাজে দুই দিন বিমৃষ্ট হইয়াছে। আনুমানিক ব্যয় ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। ঢাকা চিত্রশালার অবেক্ষক ('কিউরেটর') শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের সহিত পত্রব্যবহার হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, বাহুলা দেবীর মন্দিরের আদর্শে বাঁকুড়া প্রত্নভবন নির্মিত হইবে। ভবনে পাঁচটি কক্ষ থাকিবে। এক দীর্ঘ কক্ষে গ্রন্থাগার, দুই সরু কক্ষে শিলা ধাতু ও মৃত্তিকার মূর্তি, এক কক্ষে পুথী থাকিবে। অপর কক্ষে নিয়োগী বসিবেন। ব্যয় এইরূপ হইবে,

ভূমি ও ভবন	···	১৩০০০৲
দ্রব্য আহরণ	···	৫০০০৲
গ্রন্থাগার	···	৪০০০৲
সজ্জা	···	৩০০০৲
		২৫০০০৲

বার্ষিক ব্যয় সম্প্রতি		
অবেক্ষক (৫০৲-৫৲-১০০৲)	···	৬০০৲
প্রতীহারী (১২৲)	···	১৪৪৲
অনিশ্চিত ব্যয়	···	১০০৲
		৮৪৪৲

পরে অবেক্ষকের বেতন বৃদ্ধি হইবে, আহরণের নিমিত্ত ৫০০০৲ ও গ্রন্থাগারের নিমিত্ত ৪০০০৲ টাকা ক্ষয় হইলে বার্ষিক ১৫০৲ এবং ৩০০৲ টাকা লাগিবে। বাঁকুড়ায় একটি উচ্চ শ্রেণীর কলেজ, তিনটি ইংরেজী ইস্কুল, একটি মেডিকাল ইস্কুল আছে।. কিন্তু গ্রন্থাগার নাই। প্রত্নভবনের গ্রন্থাগারে দেশজ্ঞানবৃদ্ধির অনুকূল সারবান্ গ্রন্থ থাকিবে। সে কক্ষের ভিত্তিতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মন্দিরের চিত্র থাকিবে।

সমাজের আশা আছে, বাঁকুড়া মুন্সিপালটি ও ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড বার্ষিক ব্যয় ৮৫০ হইতে ১২০০৲ টাকা দিবেন। প্রথম

* সুখের বিষয় এখন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া আড়াই শত হইয়াছে।

ব্যয় ২৫০০০৲ টাকা দানশীল স্বদেশহিতেচ্ছু দান করিবেন। যিনি এই টাকা দান করিবেন প্রত্নভবন তাঁহার নামে আখ্যাত হইবে। যিনি ৫০০০৲ টাকা দান করিবেন, তিনি 'গোপ্তা' নাম পাইবেন, এবং ভবনের এক কক্ষ তাঁহার নামে আখ্যাত হইবে। যিনি ১০০০৲ টাকা দিবেন, তিনি ভবনের 'পোষ্টা'; এবং যিনি ৫০০৲ টাকা দিবেন, তিনি 'মিত্র' নামে পরিচিত হইবেন।

ইতিমধ্যে প্রত্নভবন নিমিত্ত কিছু কিছু দান প্রতিশ্রুত হইয়াছে। কেহ কেহ এই দান লইয়া পুথী সংগ্রহ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু পুথীকে অমূল্যনিধি মনে করিয়া তাহা রক্ষা করিতে হইবে। সমাজের নিজের গৃহ না হইলে ধর্মরক্ষা হইবে না। পুথীর স্বামী কি দেখিয়া কাহাকে দেখিয়া তাহার বংশের ক্রমায়াতরিক্থ কোথায় ন্যস্ত করিবেন? কে লগ্নক হইবেন? এদিকে যত দিন যাইতেছে, শিলাপ্রতিমা ও পুথীও তত নষ্ট ও স্থানান্তরিত হইতেছে। এই সঙ্কটে পড়িয়া বাঁকুড়া সারস্বত-সমাজ বাঁকুড়াবাসী ও স্বদেশবাসী বদান্য ও বিদ্যোৎসাহীর নিকটে ২৫০০০৲ টাকা প্রার্থনা করিতেছেন। আপনাদের শিববুদ্ধি হউক, দেশের মুখ উজ্জ্বল হউক।

বাঁকুড়া
সারস্বত-সমাজ
১৩৪১ সাল, মাঘ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়,
প্রত্নভবন অনুষ্ঠানের অনুযোজক

বঙ্গের পট-চিত্র

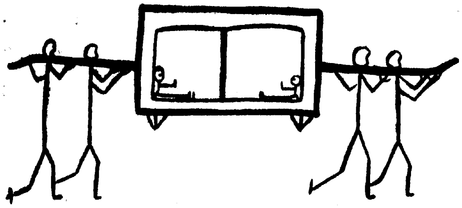
শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ভারতে বৌদ্ধযুগকে জাগরণের যুগ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না, কেন-না, বৌদ্ধযুগে ভারত সর্ব্ববিষয়ে—চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, স্থপতি-কলায় যেরূপ উন্নত হইয়াছিল সেরূপ বিকাশ আর কোনও যুগে দেখা যায় না। এই কারণে বাংলার চিত্র-পরিচয় দেওয়ার পূর্ব্বে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ কিরূপ ছিল তাহার আলোচনা একান্ত প্রয়োজন।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার পর ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় পূর্ব্ব-ভারতেই প্রথম অধিকাংশ লোক বৌদ্ধমত গ্রহণ করিতে থাকে। এমন কি আফগানেরা যখন বাংলা আক্রমণ করে তখন পূর্ব্ব-ভারতের অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ ছিল। তাহারও পূর্ব্বে পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা বাংলা ও বিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেনেরা ইহার মধ্যে এক শত বৎসর ধরিয়া বাংলার একাংশে রাজা ছিলেন মাত্র এবং বল্লাল সেন যখন তাহাদের সংখ্যা গণনা করেন তখন বাংলায় দুই হাজার ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিল। পালেরা বৌদ্ধ ছিলেন। বাংলা ও বিহারে রাজত্ব ব্যতীতও অন্য অনেক দেশ তাঁহাদের অধিকারে আসে। এক শত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ হইতে গোদাবরীর মুখ পর্য্যন্ত আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সমস্ত ভারত যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্পর্শে আসে নাই তখন বাংলায় রীতিমত বৌদ্ধ ধর্ম্মের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে ভিত্তি করিয়াই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা পৃথিবীর নানাস্থানে বৌদ্ধমত প্রচার করিতে থাকেন। বাংলার ও মগধের বৌদ্ধ সাহিত্য, বৌদ্ধ ব্যাকরণ, এবং বৌদ্ধ কোষ, বৌদ্ধ শাস্ত্র, বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধ শিল্প ও বৌদ্ধ সভ্যতা সমস্ত ভারতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। (৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত প্রবন্ধ, 'ভারতবর্ষ')।

এই সময় বৌদ্ধ শিল্প, ভাস্কর্য্য, স্থপতি-কলা বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত যুক্ত হইয়া দিগ্বিজয় করিতে ছুটিয়াছিল এবং ইহার

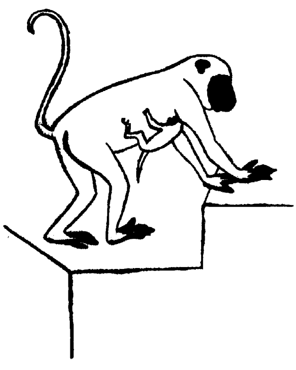
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন খ্রীঃ-পূঃ প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এই সাত শত বৎসর অর্থাৎ বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান পর্য্যন্ত বাংলা দেশ বৌদ্ধদের লীলাক্ষেত্রে



ক'নে-বউ

ছিল এবং এই বাংলা দেশের শিল্পকুশলীরা ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিল্প-বিভাগে প্রতিভার কি পরিচয় দিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে আমরা এখন আলোচনা করিব।

খ্রীঃ-পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পাল-রাজাদের



হনুমান ও সন্তান (অজন্তা)

শেষ-সময় পর্য্যন্ত মগধে শিল্পের চরম উন্নতি সাধিত হয় এবং বঙ্গদেশেই মগধের চিত্রাগার ছিল ইহা ক্রমশই প্রমাণিত হইতেছে। পাল-রাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই গৌড় উত্তর-ভারতের সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ও বর্দ্ধিষ্ণু নগর বলিয়া বিদেশীয়গণের আকর্ষণ-ভূমি ছিল। এই সময় হইতেই বঙ্গদেশ চারু-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। দেবপালের রাজত্বকালে আমরা দুই জন প্রতিভাশালী



মাতৃমূর্ত্তি—কালীঘাট

শিল্পী ধীমান্ ও তৎপুত্র বীতপালের পরিচয় পাই। ভিক্ষু তারনাথ তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দেবপালের রাজত্বের সময়ে বরেন্দ্রভূমিতে নিপুণ দক্ষশিল্পী ধীমান্ ও তৎপুত্র বীতপাল ধাতুশিল্পে, ভাস্কর্য্যে, চারুকলায় বহু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। বীতপালের শিষ্য মগধেই বেশী ছিল এবং ধীমানের শিল্পপদ্ধতিকে 'পূর্ব্ব বিভাগ' এবং বীতপালের পদ্ধতিকে 'মধ্যদেশ শিল্পবিভাগ' বলা হইত।

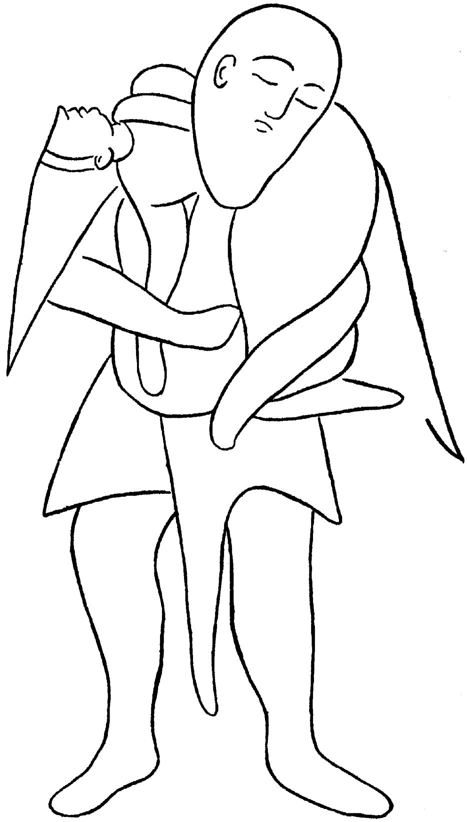
দশম শতাব্দীর শেষভাগে দ্বিতীয় গোপাল সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সময়ের একখানি সচিত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা বর্ত্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এই সময় তিব্বতীয়েরা উত্তর-বঙ্গ আক্রমণ করাতে বঙ্গশিল্পের অধঃপতন সুরু হইয়াছিল। ইহার পর একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহীপাল দেবের সময় বঙ্গশিল্পের পুনর্জ্জাগরণের মহতী চেষ্টা হইয়াছিল এবং এই সময়েই 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পুঁথি লিখিত হয়। এই পুঁথিখানির চিত্রগুলি ত্রিবর্ণে রঞ্জিত এবং ইহা 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র গ্রন্থশালায় রক্ষিত আছে।

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই তিব্বতীয়েরা বাংলায়



অন্নপূর্ণা—কালীঘাট

...মালয় প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিত।* চতুর্থ শতাব্দীতে ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্ত বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়াছেন। প্রায় দুই বৎসর এখানে থাকিয়া তিনি তাম্রলিপ্তের একখানি পোতে চৌদ্দ দিনে সিংহলে পৌছেন। ইহার আড়াই শত বৎসর পরে হুয়েন-সাং আসিয়াও তাম্রলিপ্তকে একটি সমৃদ্ধ নগর বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। হুয়েন-সাঙের পরবর্ত্তী



সতীর দেহত্যাগ—কালীঘাট

প্রবেশ করিতে থাকে এবং মহীপালদেবের রাজত্বের সময় বিক্রমশিলার প্রধান বৌদ্ধ ভিক্ষু অতীশ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য নেপাল ও তিব্বত গমন করেন। এই সময় হইতেই বোধ হয় বঙ্গশিল্প নেপাল ও তিব্বতে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। এলিস গেটি লিখিয়াছেন, "বাংলায় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তৈজসপত্রে মগধরীতি অনুযায়ী যে চিত্রাঙ্কন হইত সেই চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি তিব্বত এবং নেপালে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"* নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের গ্রন্থের† ভূমিকায় ষ্টেপল্‌টন্ লিখিয়াছেন যে একাদশ শতাব্দীর তিব্বতীয় 'Pog-Sam-Zom-Zam' গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যে, ভাস্কর্য্য এবং চিত্রে বঙ্গশিল্পীরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার পরে নেওয়ার ও তিব্বতীয় শিল্পিগণ এবং সর্ব্বশেষে চীনাশিল্পী।

কেবলমাত্র স্থলপথে নয় জলপথেও বঙ্গদেশের সহিত সুদূর পূর্ব্বখণ্ডের বহু পূর্ব্ব হইতেই যোগাযোগ ছিল। বাংলার প্রসিদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্ত, চট্টগ্রাম, সাতগাঁ প্রভৃতি হইতে বহু প্রকার বঙ্গপোত সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান,

ইৎ-সিংও তাম্রলিপ্ত বন্দরে নির্ম্মিত পোতে চীনে প্রত্যাগমন করেন। এই ভাবে বঙ্গ-প্রভাব চারি দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। রাধাকুমুদ বাবুর *Indian Shipping* গ্রন্থে লিখিত আছে যে জাপানের হরিউজি মন্দিরে রক্ষিত কয়েকখানা

* *The Gods of Northern Buddhism.*

† *Iconography of Buddhist and Brahminical Sculptures in the Dacca Museum.*

* রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের *Indian Shipping and Maritime Activities from the Earliest Time* দ্রষ্টব্য।



দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালীন রঞ্জিত পুঁথি (ব্রিটিশ মিউজিয়ম)

জাপানী ধর্ম্মগ্রন্থের বর্ণমালা একাদশ শতাব্দীর বাংলা অক্ষরের অনুরূপ।

ডাক্তার আনন্দকুমারস্বামী ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত পেগান মন্দিরের গাত্রে অঙ্কিত ফ্রেস্কো চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "এই ফ্রেস্কো চিত্রাঙ্কন-রীতির সহিত বাংলা ও নেপালের একই প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১০৪৩ খ্রীষ্টাব্দের রঞ্জিত পুঁথি (নেপাল ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দ), এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুঁথি (নেপাল ১০৭১ খ্রীষ্টাব্দ), ১৪৬৮ এবং ১০৮৮ খ্রীষ্টাব্দের কেম্ব্রিজে রক্ষিত পুঁথি (বাংলা একাদশ শতাব্দীর, বোষ্টনে রক্ষিত পুঁথি) প্রভৃতি বিচার করিলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।"† আবার ভিক্ষু তারনাথও তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দেবপালের সময় হইতেই নেপালের শিল্প বঙ্গশিল্পের দ্বারা গভীর-ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল এবং তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম্মের বর্ত্তমান রূপ অতীশই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তখন তিব্বতের শিল্পও পালশিল্পদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। আমরা নেপাল ও তিব্বতের মন্দির-গাত্রে লম্বমান চিত্র ও সমসাময়িক বঙ্গচিত্র বিশ্লেষণ করিলে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি।

ইহার পর পালেরা মাত্র কয়েক পুরুষ বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পালরাজা মদন পালের সময় হইতেই বঙ্গদেশ বার-বার বিদেশীগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে থাকে। অবশেষে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেনেরা বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এতদিন পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণেরা শান্তিতেই পরস্পর বাস করিতেছিলেন, কিন্তু সেন রাজাদের সময় হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই সব কারণে বোধ হয় বঙ্গশিল্পীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া



গোপাল

সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়েন। আমাদের মনে হয় কাংড়া-উপত্যকার শিল্পীরা ইহাদেরই বংশধর। কাংড়া-শিল্প বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই ইহার বিষয়-বস্তু, বর্ণবিন্যাস ও মূর্ত্তি-রচনা বঙ্গশিল্পের একই ধাঁচে গঠিত। যদিও ইহাতে রাজপুত শিল্পের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা সম্ভবপর, কেন-না, তদ্দেশে বসবাস করিয়া রাজপুত শিল্পীর প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া কঠিন ছিল, তথাপি তাহাদের চিত্রাঙ্কনে বঙ্গশিল্পের ধারা যথেষ্ট পরিমাণে অক্ষুণ্ণ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দেবপালের রাজত্ব উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত জে. সি. ফ্রেঞ্চ মহাশয়ের গ্রন্থে ইহার আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

"লেখক যখন পাঞ্জাব 'হিল্' ষ্টেটে ছিলেন তখন তিনি পালবংশ-সম্পর্কীয় একটি কৌতূহলোদ্দীপক ও অপ্রত্যাশিত প্রবল প্রবাদ শুনিতে পান যে সুকেত, কাওনথল, কাস্থওয়ার, মুণ্ডি প্রভৃতি ষ্টেটের নৃপতিগণ বাংলায় গৌড়-রাজবংশোদ্ভূত। এই সব প্রাচীন রাজপুত রাজবংশের

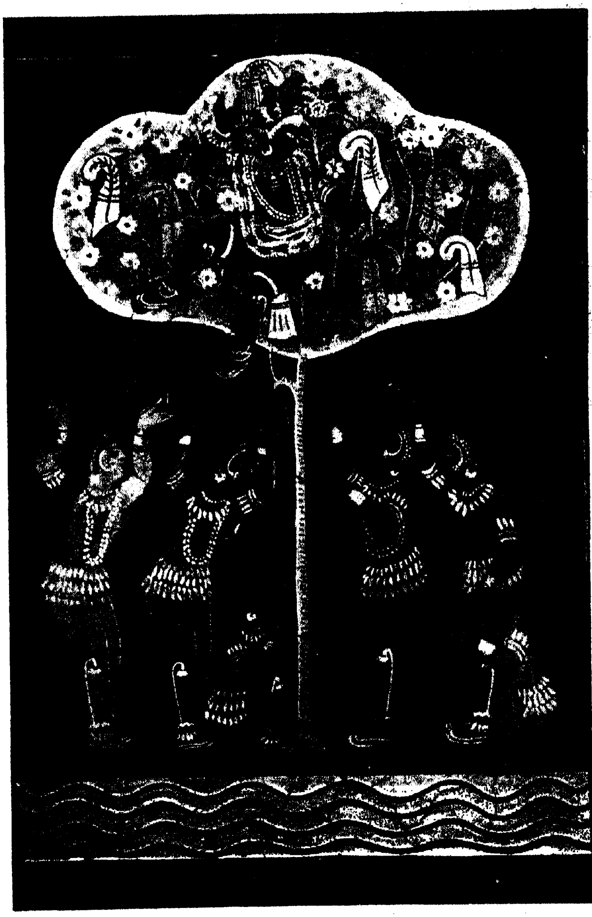
† *History of India and Indonesian Art*, p. 172.

প্রবাদগুলি শক্তিশালী ও নিভুর্ল বলিয়া পরিগণিত। কথিত আছে যে, কাম্‌তওয়ার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 'কাহন পাল' একদল ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া রাজ্যস্থাপনার্থ ঐ প্রদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় হইতে আসিয়াছিলেন এবং তথাকার রাজবংশের কুমার ছিলেন।"*

ইহা ছাড়া গভর্ণমেণ্টের গেজেটিয়ারেও লিখিত আছে—তদ্দেশীয় অনেক নৃপতি পালবংশোদ্ভূত এবং তাঁহারা এখনও উহা বলিয়াই পরিচয় দেন।†

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পাল-রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয়েরা বঙ্গদেশ বার-বার আক্রমণ করিতেছিল এবং সেন-রাজত্বের সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানে বাংলার শিল্পে এক নূতন প্রভাব বিস্তার লাভ করে। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বঙ্গদেশ জয় করেন এবং প্রথম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জৈনধর্ম্ম সুদূর পশ্চিম-বাংলার প্রধান ধর্ম্ম ছিল, এই সুযোগে মানসিংহের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে জয়পুর-পদ্ধতি বাংলার শিল্পে অতি সহজেই স্থান করিয়া লইল। বোধ হয় বাংলার শিল্পে মুসলমান পদ্ধতি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, তবে পরবর্ত্তী সময়ে বাংলা দেশ ইহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই।

তাহা হইলে আমরা চিত্রকলা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে বাংলার সমগ্র শিল্পকে বিশেষভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমটি প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পের ধারা, এবং দ্বিতীয় ধারাটি জয়পুর শিল্পের সংমিশ্রণ। ইহার মধ্যে আবার বাংলার শিল্প-পদ্ধতি, দুই ভাগে বিভক্ত। একটি সুদূর পশ্চিম-বাংলার শিল্প-পদ্ধতি আর একটি খাস বাংলার শিল্প-পদ্ধতি এবং বাংলার সমগ্র শিল্প-বিভাগকে আমরা এক কথায় পট-চিত্র বা চিত্র-পট বলিতে পারি। কেন-না, বাংলায় পাহাড়-পর্ব্বতের অভাবে কোন শিল্পীই স্থায়িভাবে কোন চিত্রাঙ্কন করিয়া যাইতে পারেন নাই।



বস্ত্রহরণ

তার পর বাংলার মন্দিরগুলি অধিকাংশই মৃন্ময় এবং এই সব মন্দিরেরও অস্তিত্ব বেশী দিন থাকে না, এইরূপ বহু অসুবিধার জন্য বাংলার চারুচিত্র জনসাধারণের শিল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

খাস বাংলায় সাধারণতঃ আচার্য্য এবং পাল এই

* *Art of the Pala Empire*, p. 91.

† দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ' দ্রষ্টব্য।



[redacted]

অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা
(ফুশের পুস্তক হইতে গৃহীত)

দুই শ্রেণীর শিল্পীরাই চিত্রাঙ্কন করিয়া থাকেন। আচার্য্যেরা সাধারণতঃ জড়ানো পট, চালচিত্র, কুল, পিঁড়ি ইত্যাদি এবং পালেরা লক্ষ্মীসরা, পুতুল ও দেবদেবীর প্রতিমাগুলি চিত্রিত করিয়া থাকেন। পাল-শিল্পীরা মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর উপর স্বপ্রণোদিত হইয়া অঙ্কন করিতে প্রায়ই অক্ষম। ইহার কারণ বোধ হয় তাঁহারা বহু দিন হইতেই উৎসাহের অভাবে চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা পরিত্যাগ করেন এবং পরবর্ত্তী কালে পূজা-পার্ব্বণে শুধু মৃন্ময়-মূর্ত্তি গড়িতে গড়িতে বর্ণবিন্যাস একেবারে ভুলিয়া যান। তাঁহাদের হস্তাঙ্কিত চিত্র মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা ব্যর্থ অনুকরণের চেষ্টা মাত্র এবং এই রচনার মধ্যে নিম্নশ্রেণীর কৃত্রিমতা ভিন্ন অন্য কোন প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না।

আচার্য্যদের চিত্রগুলি অনেক উচ্চ স্তরের এবং ইহাদের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিতে অনাবিল সৌন্দর্য্য রক্ষিত আছে। চাহিদা এবং উৎসাহের অভাবে তাঁহারা বর্ত্তমানে জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করিলেও বংশানুক্রমিক চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিগুলি এখনও শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং নিজেদের অন্য কোন উপাধি থাকিলেও অমুকচন্দ্র আচার্য্য বলিয়াই পরিচয় দেন। আচার্য্যদের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কালীঘাটের পটুয়ারা প্রাচীনকালে চিত্রাঙ্কন করিতেন এবং তাঁহারা বর্ণবিন্যাস অপেক্ষা রেখা-সমন্বয়-চিত্রে অতি চমৎকার মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কালীঘাটের প্রতিভা জীবন্ত সৃষ্টিতে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পাশ্চাত্য প্রভাবে কালীঘাটের শিল্পীরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয় হইয়া উঠেন। তাঁহারা সস্তায় জনসাধারণের মনোরঞ্জনার্থ দৈনন্দিন জীবনের ব্যঙ্গচিত্রগুলি আঁকিতে আরম্ভ করেন। যদিও চিত্রের দিক হইতে বিচার করিলে এই সব ব্যঙ্গচিত্রে বিশেষ কোন প্রতিভার পরিচয় পাই না, তথাপি সেই সময়ে শিল্পীদের এই চিত্রগুলি মূক ও বধির জনসাধারণকে কথা বলাইতে শিক্ষা দিয়াছিল এবং এই সব চিত্রাঙ্কনে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী থাকা সত্ত্বেও তাহাদের প্রকাশে একটি কোমল পেলবতা ও শ্রী মণ্ডিত আছে।



[redacted]

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথি
(ফুশের পুস্তক হইতে গৃহীত)

ওদিকে সুদূর পশ্চিম-বাংলায় পটুয়ারাই প্রধান শিল্পী। এই শিল্পীদের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির সঙ্গে খাস বাংলার চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির একটি পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এখানকার চিত্রাঙ্কনের প্রধান উপাদান ছিল পুঁথির পাটা। এই সময়েই পুঁথির পাটার উপর রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, পৌরাণিক ও বৈষ্ণবীয় ঘটনাবলী চিত্রিত হইতে থাকে। পুঁথির ভিতরকার বিষয়বস্তুগুলি তাঁহারা এই পাটার উপর প্রতিফলিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণতঃ তেরেট বৃক্ষের পত্রে কিংবা পুঁথির পাটাতে ময়দা, খোল, বেল, বাবলার আঠার লেপন দিয়া চিত্রাঙ্কন করা হইয়া থাকে। এই পাটার চিত্রাঙ্কন-

পদ্ধতি আবার দুইটি শ্রেণীভুক্ত। একটি জয়পুর-শিল্পের সংমিশ্রণ এ কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, অন্যটি উড়িষ্যা-পদ্ধতি। বোধ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন গঙ্গা-বংশীয় হিন্দু রাজারা এই সব অঞ্চল জয় করেন তখন হইতেই উড়িষ্যা-পদ্ধতি এখানে স্থানলাভ করে এবং ঐ সময়েই শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচল-ভ্রমণে বঙ্গ ও উড়িষ্যার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

অবশ্য সর্ব্বত্রই যে এ-কথা সত্য তাহা বলা চলে না। অধুনা আবিষ্কৃত বীরভূমের পটগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে ইহাতে খাস বাংলার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ হয়ত এই পট-শিল্পীরা খাস বাংলার প্রভাবে পরবর্ত্তী কালে আসিয়াছিলেন, নতুবা খাস বাংলা হইতে যে-কোন কারণে বিতাড়িত হইয়া পশ্চিম-বাংলায় গিয়া বসবাস করিতে থাকেন। যদিও বর্ত্তমানে ইঁহাদের অনেকে মুসলমান, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম যাদব, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি এবং ইঁহারা যে দুই এক পুরুষ পূর্ব্বেও হিন্দু ছিলেন ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। (শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রণীত 'পটুয়া')

এই অঞ্চলের পটুয়াগণ প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত লম্বা কাপড়ে পাতলা মৃত্তিকা লেপনের উপর কাগজ আঁটিয়া রামলীলা ও কৃষ্ণলীলার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি চিত্রিত করিয়া থাকেন এবং রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার পট পরিবর্ত্তন সময়ে স্বরচিত গান করিয়া চিত্রিত বিষয় জনসাধারণের সম্মুখে ফুটাইয়া তোলেন।

সুদূর বাংলায় এখনও এইরূপ ধরণের চিত্রিত পটের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু খাস বাংলায় এইরূপ জড়ানো পটের দুই-এক জায়গায় সামান্য প্রচলন থাকিলেও ইহার চলন বহু পূর্ব্বেই উঠিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ বোধ হয় খাস বাংলার মুসলমানাধিক্য। তাহাদের সম্মুখে রামায়ণ মহাভারতের গান গাহিয়া চিত্রপট দেখাইয়া রোজগার করায় বিপদ আসিতে পারে বলিয়াই ধীরে ধীরে জড়ানো পটের প্রচলন খাস বাংলায় থামিয়া যায়। এই জড়ানো পটের অনুরূপ গাজির পটের প্রচলন আজকাল খাস বাংলায় দেখিতে পাই। পশ্চিম-বাংলার পটশিল্পে অনেক পটুয়া আবার আজকাল পটের শেষভাগে সামাজিক রহস্যমূলক চিত্র এবং যমালয়ের দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া থাকেন।

পুঁথির পাটার উপর চিত্রাঙ্কনের সময় হইতেই আমাদের মনে হয় বঙ্গদেশে প্রতিকৃতি-অঙ্কনের প্রবর্ত্তন হয়। এই সময় শুধু রাধাকৃষ্ণের নয় নিমাই ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী প্রভৃতিরও প্রতিকৃতি পাটার উপর অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন :—

হরিবংশের চিত্রলেখা আদি যুগের চিত্রকরী। প্রাগ্-জ্যোতিষ-পুরের বাণ-রাজার কন্যা উষা স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র কামদেবের পুত্র অনুরুদ্ধকে দেখিয়া প্রেমে পতিত হন। এই স্বপ্ন-দৃষ্ট তরুণ সুদর্শন রাজকুমার কে তাহা তিনি কিছুতেই জানিতে না পারিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন। তাঁহার সখি চিত্রলেখা তখন ভারতীয় তৎকাল প্রসিদ্ধ যাবতীয় তরুণ রাজকুমারের চিত্র অঙ্কন করিয়া কুমারী উষার নিকটে উপস্থিত করেন। তন্মধ্য হইতে উষা সহজেই অনুরুদ্ধকে চিনিয়া লইয়াছিলেন। হরিবংশের পূর্ব্বে মনুষ্যমূর্ত্তির অবিকল প্রতিকৃতি অঙ্কনের কথা বোধ হয় আর কেহ বলেন নাই। চিত্রলেখার সময়ে এবং তাঁহার পূর্ব্ব হইতে যে এদেশে চিত্র-বিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল এই বিবরণ হইতে তাহা অনুমিত হয়।

এইরূপ বর-কনের চিত্র আঁকিয়া দেশ-বিদেশে ঘটক বিবাহ স্থির করিতেন। এতৎ সম্বন্ধে বাঙ্গালার বহু দিনের কিংবদন্তী আছে। প্রাচীন পল্লী-গীতিকায় দৃষ্ট হয় বহু পল্লী-সুন্দরীর চিত্র লইয়া ঘটকেরা দেশ-বিদেশে আনাগোনা করিতেন। কথিত আছে, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমও এই নিদর্শন হইতেই প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল। রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় এই কথা পাওয়া যায়। পূর্ব্বরাগের প্রথমাংশের নামই 'চিত্রদর্শন'।

কি চিত্র বিচিত্র মরি দেখাইল চিত্রকরী, প্রাণ মম নিল যে হরি।
বিশাখা যখন দেখায় চিত্রপট, মোরা বলেছিলাম সে বড় লম্পট॥

প্রভৃতি বহুবিধ গান বৈষ্ণব কবিগণ রচনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক যুগেও ঐরূপ চিত্রাঙ্কনের দ্বারা পাত্র-পাত্রীর মন আকর্ষণ করার রীতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ফিরোজ খাঁ বানিয়াচঙ্গের দেওয়ান-কুমারী সখিনার চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া কুমারব্রত অবলম্বনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন, 'ফিরোজ খাঁ' নামক পল্লী-গীতিতে তাহা দৃষ্ট হয়।

চণ্ডীদাসের,

হাম সে অবলা, সরলা অখলা, ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি॥

(বৃহৎ বঙ্গ, পৃ. ২৩৮)

ইহা ছাড়া বাংলা দেশে আর একটি শিল্পধারা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ ঘরে ঘরে সময়-অসময়ে আঁকা হইয়া থাকে, ইহার কোন একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথ নাই। চাউলের গুঁড়া অথবা সিন্দুর দিয়া আঙুলের ডগায় অথবা নেকড়া দিয়া এই সব চিত্রাঙ্কন করা হইয়া থাকে। পাল্কীতে ক'নে-বউ স্বামীর সহিত শ্বশুরবাড়ি যাইতেছে, এই ছবি-

খানিতে দুই-একটি রেখার টানে বেহারাদের পায়ের গতি দেখান হইয়াছে। এই ধারার শিল্প যে এখনও জীবিত আছে তাহার কারণ বোধ হয় ঘরে ঘরে ইহার প্রচলন এবং দৈনন্দিন জীবনের দেখাশুনা লইয়া চিত্রগুলি আঁকা হইত। কোন সুপটু শিল্পীর হাতে এই এক চিরন্তন গড্ডলিকা প্রথায় আঁকা অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। আজকাল এই শিল্পের ধারা বাংলা হইতে এক রকম উঠিয়া যাইতেছে, তবে শিবদুর্গা প্রভৃতি চিত্র পূজানুষ্ঠানে আঁকিতে হয় বলিয়াই ইহার প্রচলন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

এই গেল বাংলার মোটামুটি শিল্পের ইতিহাস। এখন আমরা চিত্রগুলি বিচার করিয়া দেখিব এই ইতিহাসের সঙ্গে ইহাদের সামঞ্জস্য কতটুকু আছে।

আমরা কালীঘাটের পটুয়াদের অঙ্কিত 'অন্নপূর্ণা' চিত্রখানিতে দেখিতে পাই—পট-ভূমিকাশূন্য শুধু রেখা-চিত্রে বিরাট কল্পনাকে রূপ দিবার অদ্ভুত পরিচয় শিল্পী এখানে দিয়াছেন। চিত্রখানিতে শিল্পী রেখাটানের নৈপুণ্যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাংলার শিল্পীদের বরাবর এই দিব্যছন্দ ও জীবনগতির উপর লক্ষ্য ছিল। 'অন্নপূর্ণা' চিত্রখানিতে শিব ভিখারীর বেশে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া রিক্ত হস্তে সতীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সতীও তাঁহার সর্ব্বত্যাগী উমানাথকে দেখিয়া ভিক্ষা দিতে ভুলিয়া গেলেন, দুই জনেই আজ একে অন্যের মধ্যে আত্মহারা। শিবের ব্যাঘ্র-চর্ম্ম খসিয়া পড়িয়াছে, চোখের পলক নাই, তিনি আজ সর্ব্বত্যাগী আত্মভোলা মহেশ্বর।

কালীঘাটের পটুয়াদের অঙ্কিত "মাতৃমূর্ত্তি" এবং আচার্য্যদের অঙ্কিত "বস্ত্রহরণ" চিত্র দুইখানিতেও বাংলার শিল্পীদের মৌলিক কল্পনার প্রসার কতদূর হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি। গো-দোহনের সময় সন্তান দুধ খাইতে আসিয়াছে। উহা দেখিয়া ছেলে মায়ের কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুধ খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। কয়েকটি রেখায় এইরূপ অসাধারণ চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে বাঙালী শিল্পীরাই পারিত। অজন্তায় আমরা এইরূপ কয়েকটি মাতৃমূর্ত্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাই এবং অজন্তার শিল্পীরা "হনুমান ও তাহার সন্তান"—এই মাতৃমূর্ত্তি চিত্রখানিতে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। বাংলায় অন্যান্য পশুপক্ষী হইতে গোমাতার চিত্রই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে গরু তাহার সন্তানকে দুধ দিতে দিতে আদর করিতেছে, শিল্পী এই ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"বস্ত্রহরণ" চিত্রে (এই পদ্ধতিতে অঙ্কিত একখানি বস্ত্রহরণ চিত্র শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত *Journal of the Oriental Society of Art* পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন, উহার বিষয়বস্তু এই চিত্রখানি হইতে আরও উৎকৃষ্ট) জলটা বড় কথা নয়, গোপিনীদের স্নান করাটাও সর্ব্বস্ব নয়; বস্ত্র তাহাদের চুরি গিয়াছে, এখন তাহারা নিরাভরণ এই সমস্যাই প্রবল। এখানে শিল্পী তাহাদের এই অসহায় ক্ষুব্ধ অভিমান খুব সামঞ্জস্য রাখিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহা ছাড়া বাংলায় সূত্রধর, মালাকরেরাও কিছু কিছু চিত্রাঙ্কন করিয়া থাকেন, তবে উহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

বাংলার চিত্রশিল্প ধীরে ধীরে এইরূপ একটি বিশেষ ভাবে মূর্ত্তি লাভ করিতে পারিয়াছিল এবং চিত্রগুলির সৌন্দর্য্য-বহুলতা ও কমনীয়তাই এই শিল্পের বিশেষত্ব। বঙ্গশিল্পের একটি চিত্রাঙ্কন-রীতিতে মূর্ত্তিগুলির মুখ, হাত, পা দুইটি দীর্ঘ রেখার দুই পার্শ্বে তুলি দিয়া রঙের নিটোল টানে অঙ্কিত এবং ইহাতে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কমনীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ মূর্ত্তিগুলির বক্ষ উন্মুক্ত, শুধু কটিদেশ বস্ত্রাবৃত এবং উহাও আবার মাত্র কয়েকটি রেখার সমাবেশে পূর্ণ। এই পদ্ধতির সঙ্গে অজন্তার চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির একটি পরস্পর ঐক্য ভাব লক্ষিত হয়। গ্রিফিথ সাহেব তাঁহার অজন্তা পুস্তকের প্রথম খণ্ডে, ১৮-১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "অজন্তা-গুহার কতকগুলি চিত্রে মেয়েদের শাড়ী ও পুরুষদের ধুতি ঠিক বাঙালীর মত।" যদিও অজন্তার চিত্রগুলিতে মুকুট, সিঁথী, অঙ্গদ, বলয়, কণ্ঠহার, মুক্তাজাল, মেখলা, কাঞ্চী, বাজুবন্ধ, মণিবন্ধ, কটিবন্ধ, নূপুর প্রভৃতি অসংখ্য অলঙ্কার চিত্রিত দেখিতে পাই এবং বাংলার পটচিত্রে ইহার অঙ্কন যদিও কম, তথাপি বাংলার মৃন্ময়-মূর্ত্তিতে এইরূপ বহুপ্রকার বেশ ও অলঙ্কারের প্রচলন আছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ মৃন্ময়-মূর্ত্তিতে এই পদ্ধতিগুলি এখনও সুস্পষ্ট আছে। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অজন্তা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

"আশ্চর্য্যের বিষয় অজন্তার ছবির মধ্যে আমরা বাংলা দেশের প্রচুর

আভাস পাই। প্রথমতঃ আমরা গুহার নিকটবর্ত্তী দূরবর্ত্তী গ্রামে বেড়াতে গিয়ে যত কুটীর দেখেছি, সবগুলিই মাটির ছাদ, অজন্তার ছবিতে অবিকল বাংলার খড়ে-ছাওয়া আটচালা। সে দেশের লোক নারিকেল গাছ চোখে দেখে নি, কিন্তু ছবিতে নারকেল যথেষ্ট। বঙ্গদেশে ষাঁড়ের দেহের তুলনায় তাহার স্কন্ধটা যতটা বেশী উঁচু দেখা যায় অন্য কোন দেশে সে রকম দেখা যায় না। অজন্তার ১নং গুহার ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবিতে ঠিক আমাদের দেশের ষাঁড়ই অঙ্কিত। যশোহর, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের শত শত বৎসরের প্রাচীন কাঠের পাটার উপর আঁকা যে সকল চিত্র দেখা যায়, অজন্তার ছবির সঙ্গে তার অঙ্কন-পদ্ধতি, এমন কি বর্ণ ও রেখাগুলির (অজন্তার মত অত উৎকৃষ্ট না হলেও) একটা অদ্ভুত মিল সহজেই অনুভূত হয়। আমাদের দুর্গা-প্রতিমা প্রভৃতির চালচিত্রগুলি এখনও ঠিক অজন্তার নিয়মেই গোবর-মাটির জমির উপর সাদা রং দিয়া তার উপর আঁকা হয়। কালীঘাটের পটের ও অজন্তার রেখাকৌশলের মধ্যে খুবই সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। কালীঘাটের এই প্রচলিত পটগুলির রেখার টান দেখলেই অজন্তার শিল্পীদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।"

বাংলার পট-শিল্প ও অজন্তার চিত্রাঙ্কন-রীতিতে রেখার সুস্পষ্টতা ও অঙ্কন-নিপুণতা একই সাদৃশ্যে পূর্ণতায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং চিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় বাংলার নায়ক-নায়িকার সুন্দর ও কমনীয় ভঙ্গীর প্রকাশ অজন্তার চিত্রকেও ছাপাইয়া যায়। বাংলার এই পদ্ধতিতে অঙ্কিত সমস্ত চিত্রই বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহা ফ্রেস্কো-ধরণে অঙ্কিত। এমন কি 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' প্রভৃতি পুঁথির ক্ষুদ্র চিত্রগুলিকেও বিশ্লেষণ করিলে এই সত্য উপলব্ধি করা যায়। ভারডেনবার্গ 'রূপম' পত্রিকার ১৯২০ সনের জানুয়ারীর প্রথম সংখ্যায় এই পুঁথির চিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,

"মূর্ত্তিগুলির সহজ ও মাধুর্য্যমণ্ডিত ভঙ্গী ও তাহাদের দেহের অলঙ্কার-সজ্জা এবং বেশ-ভূষার অঙ্কন রীতি, অজন্তার যে পদ্ধতির সহিত আমরা পরিচিত উহার সহিত মিলিয়া যায় এবং স্থাপত্য-শিল্প ও বৃক্ষাদি অঙ্কনের পদ্ধতিও অনুরূপ।

'রূপম' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় আমাকে লক্ষ্য করাইয়া দেন যে ঐসব ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র পুস্তক-প্রসাধনের কোন স্বতন্ত্র পদ্ধতি নয়, উহা বৃহৎ চিত্রাঙ্কনের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র।" (১০ পৃষ্ঠা)

ওদিকে আর একটি বিভিন্ন পদ্ধতির চিত্রগুলিতে, বিশেষতঃ পুঁথির রঞ্জিত চিত্রে, এইরূপ নিটোল ভাবের অভাব আছে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এইরূপ ‥

সাধারণতঃ মূর্ত্তির পাদদেশ‥

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি প্রকা‥

বক্ষে আভরণ, দেহ কিংবা মস্তক চা‥

পদ্ধতির বাহিরের রেখা কঠোর, রং প্রখর ও ...এক দৃশ্যের মধ্যে কেমন একটা ভাবের দীনতা সুস্পষ্ট আছে। এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিতে শিল্পীরা রাজপুত ও জয়পুরী অত্যুজ্জ্বল রং ফলানোর অনুকরণে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেন। বাংলার খাঁটি চিত্রের পট-ভূমিকার সাধারণতঃ প্রধানতম রং হিঙ্গুল ছিল। বোধ হয় ইহা সূর্য্যের রক্তাভ বর্ণকেই চিহ্নিত করে এবং বঙ্গ-শিল্পীর চিত্র-পটের এই বর্ণবিন্যাস অতীব নয়নস্নিগ্ধকর। এই সব ওস্তাদ শিল্পীর হাতের রং এমন আশ্চর্য্য গভীর ও পাকা যে প্রায় তিন-চারি শত বৎসরের অযত্ন ও অসাবধান নাড়া-চাড়া সত্বেও এখনও নূতনের মত উজ্জ্বল ও অটুট আছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলার চারুশিল্পের অধঃপতন সুরু হয় এবং চিত্রকরেরা সাহায্যের অভাবে বাধ্য হইয়া ভিন্ন ভিন্ন উপার্জ্জনের উপায় অবলম্বন করিতে থাকে। এইরূপে চর্চ্চা ও উৎসাহের অভাবে বাংলায় চিত্র-সৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। বর্ত্তমানে বাংলা দেশে ইহাদেরই এক-আধ জন বংশধর পূর্ব্ব-পুরুষের শিল্পকলা নকল করিয়া আসিতেছে, ইহার মধ্যে স্বকীয় কোন বিশেষত্ব বা আত্মশক্তির কোন পরিচয় পাই না, শুধু তাহার পূর্ব্বপুরুষের চিত্রাঙ্কন-রীতির ধারাটাই চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে।*

* বঙ্গশিল্প-সংগ্রহ নিম্নলিখিত স্থানে আছে :—

শ্রীগুরুসদয় দত্তের সংগ্রহ, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনের সংগ্রহ—বর্ত্তমানে ইহা ত্রিপুরাধিপতির সংগ্রহাগারে রক্ষিত, শ্রীঅজিত ঘোষের চিত্রশালা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ, শ্রীযামিনী রায়ের সংগ্রহ—বর্ত্তমানে ইহার কয়েকখানি চিত্রের স্বত্বাধিকারী ষ্টেলা ক্রামরিশ। বাংলার এই লুপ্ত শিল্পীদের মধ্যে জহুরী, মটর, ষষ্ঠীচরণ আচার্য্য, বামাচরণ আচার্য্য এবং কালীঘাটের কয়েক জন পটুয়া বাঁচিয়া আছেন।

বৈরী

শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী

১

"শিকল-দেবীর ঐ যে পূজা-বেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া ?"

এই ত সেদিন মহাযুদ্ধের অবসান হ'ল, এখনও তার বিভীষিকা ইউরোপের ঘরে ঘরে ত্রাস সঞ্চার করে, আবার রণ-ভেরীর গভীর নিনাদ মহাদেশ কম্পিত ক'রে তুলল—প্রবল ফরাসীবাহিনী চলেছে জার্ম্মেনীর শিল্পকেন্দ্র রুর্ অধিকার করতে। নিরস্ত্র জার্ম্মেনী শঙ্কিত হ'য়ে উঠল।

১৯২৩ সাল জানুয়ারীর দুরন্ত শীতে রাইন নদের বিপুল জলপ্রবাহ জমে বরফ হয়ে গেছে, হয়ত নিরন্ন জার্ম্মান জাতির রঙীন জীবন-প্রবাহের একই দুর্দ্দশা হ'তে চলেছে,—তার হৃৎযন্ত্র রুর্-ই যে ফরাসীর অধীন হ'তে চলল !

রুর্-অভিযাত্রী ফরাসীবাহিনীর পথে পড়ে বিখ্যাত শিল্প-নগর ড্যুসেল্ডর্ফ। রাইনের পশ্চিম তীরে তিন নম্বর রেজিমেণ্ট হুকুম পেল ড্যুসেলডর্ফ দখল করতে হবে, তারা রওনা হোক ! অমনি আরম্ভ হ'ল রেজিমেণ্টের রওনা হবার তোড়জোড়,—বিগেল বাজে, ডেরাডাণ্ডা ওঠে, সারি সারি মোটর লরি ও ভারি ভারি কামানের গাড়ী ঘর-বাড়ি কাঁপিয়ে বরফ কেটে কেটে চলে, চারিদিকে ধ্বনিত হয় সৈনিকদের পদচারণ-ধ্বনি ও কুচ-কাওয়াজের উচ্চ সামরিক নির্দ্দেশ এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রণবাদ্য "লা-মার্সেইএস্"-এর উন্মত্ত সুর উচ্ছল হ'য়ে অতুল সুন্দর রাইনের তুষারমণ্ডিত দুই কূল ভাসিয়ে দেয়।

কিন্তু সৈনিকরা কেউ সন্তুষ্ট হ'ল না। হয়ত তাদের প্রচ্ছন্ন বশ্*-ভীতি এখনও যায় নি। শুধু সি-কোম্পানীর সার্জ্জেণ্ট্-মেজর ল্যাকক্ এ-সংবাদ পাওয়া মাত্র তার ঘরে ছুটে এসে টেবিলের ওপর দাঁড় করানো একটা ছবি বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে চীৎকার ক'রে উঠল, "কেতে !—কেতে !!" তার পরই একবার ছুটে যায় একটা ব্যাগে জিনিষপত্তর ভরতে, সেটা ফেলে আবার ছোটে তার জামাকাপড় ঝাড়তে, সেগুলো ফেলে আবার অস্থির হ'য়ে সুরু করে তার জুতোজোড়া ঝাড়তে, আর মাঝে মাঝে টেবিলের কাছে ছুটে এসে সেই ছবিটাকে পাগলের মত চুমু খায়।

এই দেখে সেই ঘরেরই বাসিন্দে স্থূলকায় সার্জ্জেণ্ট্ ড্রাপ অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি হে ?" ল্যাকক্ উল্লসিত হ'য়ে বলল, "আরে জান না ?—হুকুম হ'য়েছে ড্যুসেল্ডর্ফে রওনা হবার !" এবং হঠাৎ ড্রাপের সেই বিশাল দেহ আঁকড়ে ধ'রে অবলীলাক্রমে নাচতে আরম্ভ করল। ড্রাপ বেচারী যত বলে, "ছাড়ো !—আরে ছাড়ো !" ল্যাকক্-ও তত তাকে চেপে ধ'রে নাচে আর চেঁচায়, "ড্যুসেল্ডর্ফ—ড্যুসেল্ডর্ফ !" ড্রাপ প্রাণপণ চেষ্টায় তার স্থূল দেহ মুক্ত ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "এ কি ?—পাগল হ'লে না কি ?" ল্যাকক্-এর ভ্রূক্ষেপ নেই, সে নাচে আর সমানে চেঁচায় ! এতক্ষণে সেখানে একটা ভিড় জমে গেল, সকলে হাঁ ক'রে এই ব্যাপার দেখতে লাগল। শেষে ড্রাপের ইঙ্গিতে সকলে মিলে ল্যাককৃকে জাপটে ধ'রে থামাল ! ড্রাপ জিজ্ঞাসা করল, "কি হ'ল তোমার ?"

"জান না ?—আমরা যে চলেছি ড্যুসেল্ডর্ফে !"

মুখ ভেঙ্ছে ড্রাপ বলল, "ড্যুসেল্ডর্ফে !—তাতে কি হবে যে অমন করছ ?—হবে ত শুধু বশ্-এর হাতে অক্কা পাওয়া, তার জন্যে আমাকেসুদ্ধ টেনে নাচা ?"—অপর সকলে হেসে ফেলল।

ল্যাকক্ চীৎকার ক'রে উঠল, "তোমরা কি বুঝবে ?" সজোরে তাদের হাত ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে সেই ছবিটা নিয়ে বলল, "বিশ বছর পরে পাব আমার এই কেতেকে—" ড্রাপ বাধা দিয়ে বলল, "এই ব্যাপার !—তা ভেবে রেখেছ, এই বশ্-এর দেশে ঐ সুন্দরী বিশ বছর অমনিটি রয়েছে ?

* বশ্ [Boche] :—শূয়ার। যুদ্ধের সময়ে ফরাসীগণ জার্মানদের প্রতি এই অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন ব্যবহার করতেন।

এত দিনে অন্ততঃ ডজনখানেক হজম ক'রে একটা বোকা বশ্-এর কাঁধে জেঁকে বসে নি?—"

সঙ্গে সঙ্গে লকক্-এর কানে গেল সকলের একটা চাপা হাসির শব্দ। "থামো শূয়ার!" চীৎকার ক'রে হঠাৎ সে বাঁ-হাত দিয়ে ড্যুপঁর মুখ চেপে ধরল, "এই রিভল্‌ভারের বাঁট দিয়ে তোমার মুখ থেঁতলে দেব—তোমাকে—" তার ডান হাত খাপ থেকে রিভল্‌ভার টেনে বার করল, তৎক্ষণাৎ সকলে তার দুই হাত চেপে ধরল। "ছেড়ে দাও—ওকে খুন করব—" কয়েক জন তার রিভল্‌ভার ছিনিয়ে নিল। এখন ল্যকক্-এর উত্তেজনা সীমা অতিক্রম করেছে, তার সর্ব্বশরীর থর থর ক'রে কাঁপছে, সকলে ভয়ে তার হাত ছেড়ে দিল, সে তার বিছানার ওপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল।

সকলে হতভম্ব! এর চেয়ে কত মজার কথা তাদের মধ্যে রাতদিন চলে, সবাই তাতে প্রাণ খুলে হাসে— এ কি? আর ল্যকক্-এর এত উত্তেজনা? সেই ল্যকক্, যাকে সকলে জানত দৃঢ়চেতা, স্বল্পভাষী! অনেকে অবশ্য সন্দেহ করত তার জীবনে কোন রহস্য আছে, সে হয়ত একটা দারুণ ব্যথা চেপে রাখে, কারণ তার মুখে নিরন্তর লেগে থাকত বিষাদের গভীর রেখা! এমন কি রণক্ষেত্রের চরম উত্তেজনায় তার মুখে এই বিষণ্ণতার সুস্পষ্ট ছায়া স্থানচ্যুত হ'ত না। হেতু জিজ্ঞাসার খোঁচা দিয়ে তার হৃদয়ে এই গভীর ব্যথার কঠিন আবরণ উন্মোচন করতে কারও কোন দিন সাহস হয় নি। কিন্তু আজ এ কি হ'ল?

ফরাসী-সৈন্য ড্যুসেল্‌ডর্ফ দখল করেছে। সদাহাস্যময়ী নগরী আজ বিষাদের কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। ফরাসী কর্ত্তৃক পাশবিক শক্তির এমন অসঙ্কোচ অপপ্রয়োগ জার্ম্মান্ জাতির বক্ষে শেল বিদ্ধ করেছে। নিরুপায় জার্ম্মান্ সরকার এই জুলুমের একমাত্র প্রতিকার-স্বরূপ অসহযোগ ঘোষণা করেছে। তাই কল-কারখানা কর্ম্মিশূন্য, রাস্তাঘাট জনশূন্য, আনন্দভবন সব নিরানন্দ—শহর যেন শোকাতুর! এমন কি যে-সব সশস্ত্র ফরাসী-সৈন্য চমৎকার পোষাক প'রে বুক ফুলিয়ে চলা-ফেরা করছিল, তাদেরও মুখে কিসের একটা শঙ্কা!

এই ভীষণ পুরীর মধ্যে শুধু এক ব্যক্তি পরম উৎসাহে চলেছে রাস্তার ওপর স্তূপীকৃত বরফ ভেঙে—সে আমাদের সার্জ্জেন্ট্-মেজর ল্যকক্। এতক্ষণে ছুটি পেয়ে, সে তার উৎকৃষ্ট পোষাক আর চক্‌চকে সখের জুতা-জোড়াটি প'রে, কাঁচাপাকা চুলের বাহারে টেরির ওপর কায়দা ক'রে টুপিটি চড়িয়ে, হাতে একটা সৌখীন ছড়ি নিয়ে বার হয়েছে। ছুটে গিয়ে হাজির হ'ল তার সেই চিরপরিচিত রাস্তায়, কিন্তু অবাক হয়ে দেখল তার দু-ধারে নতুন নতুন অট্টালিকার সারি উঠেছে আর তার ঢালু ছাদের ওপর জমাটবাঁধা বরফের চাঁই ভেঙে ভেঙে ফুটপাতে পড়ছে—রাস্তা জনশূন্য! তার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে উঠল। কিন্তু বিশ বছর একটি মুখ ধ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে যে-বাড়ির ছবিটাও তার মনের পটে খোদা হ'য়ে গেছে তার কি কখনও ভুল হয়? অল্প সন্ধানের পরই তার সামনে এল সেই বাড়ি।

হ্যাঁ, এই ত সেই! শুধু একটু পুরনো হয়েছে। সেই একতালায় কেক আর চকোলেটের দোকান, তার সকল দেওয়াল কাঁচের, তার পাশ দিয়ে উঠেছে সেই সিঁড়ি তেতলায়! তেতলায় রাস্তার দিকে সেই জানালা এখনও ঠিক তেমনই রয়েছে, সেই রঙ্, সেই কাজ, সেই পর্দ্দা। এমন কি তার ওপর বরফও জমেছে ঠিক পূর্ব্বের মত! ফটকের ফ্রেমে তেতলার রীঙ্‌বেলের বোতামটা সে তাড়াতাড়ি টিপল—একবার দু-বার আড়াইবার—ঠিক পূর্ব্বের সঙ্কেতমত। আশা এখুনি ঐ রঙীন পর্দ্দা সরে যাবে, ঐ জানালার কাঁচ ধীরে ধীরে খুলে যাবে, ঐ বাতায়নে এখুনি ফুটে উঠবে সেই স্মিত সুচারু আনন, সেই ভীত কুরঙ্গনয়নের চকিত বিলোল চাহনি—তার কানে সুধা ঢালবে সেই মিষ্ট মদির সম্বোধন—তার শিরায় শিরায় উদ্বেলিত হবে সেই উন্মত্ত জাগরণ। তার সারা সত্তায় লীলায়িত হবে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-প্রাণের সেই উদ্দাম আলোড়ন।

কিন্তু এ কি? কি হ'ল? সাড়া নেই কেন? ঐ পর্দ্দা ত কই সরছে না, ঐ জানালা ত কই খুলছে না—অনেক ক্ষণ যে কেটে গেল! আবার ঠিক সেই রকম ক'রে বোতাম টিপল—অনেক ক্ষণ জানালার দিকে চেয়ে রইল—তবু কোন সাড়া নেই?

তবে? হয়ত তার জানালার কাছে আসতে ভয় হ'চ্ছে।—যদি সে ভুল শুনে থাকে? আগেও হয়ত কতবার অমন হয়েছে?

আবার সেই বোতাম টিপল, কর্‌র্‌ রীং, কর্‌র্‌ রীং—ক্রিং! সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত কণ্ঠ সর্ব্বোচ্চ স্বরে জানাতে চাইল, "আমি—আমি—আমি!"

তবু কেউ এল না? তবে? তবে সে নিশ্চয় মূর্চ্ছা গেছে। তিন-তিন বার এ সঙ্কেত শুনে তার সন্দেহ গেছে ঘুচে, অমনি এক আনন্দ-সমুদ্র উথ্‌লে উঠে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় প্লাবিত ক'রে দিয়েছে—সে মূর্চ্ছা গেছে। ছি, ছি, ছি-ই! সে কি অন্যায়ই করেছে! আগে ওকে খবর দিয়ে প্রস্তুত ক'রে তবে তার আসা উচিত ছিল!

আর রীঙ্‌ বেল্‌ টিপে কি হবে ছাই! সে দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা মারতে আরম্ভ করল। তবু সাড়া নেই? হঠাৎ তার হুঁস হ'ল সে যে ফরাসী সৈনিক, তার প্রেয়সী মূর্চ্ছিতা, ঐ জার্ম্মান্‌-বাড়িতে কে তাকে দরজা খুলে দেবে? সে চীৎকার ক'রে উঠল, "দরজা খোল, কোন ভয় নেই, ওগো তোমরা দরজা খোল!" আর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজা-ভাঙার জোগাড় করল—তাকে তার মূর্চ্ছিতা কেতের কাছে যে যেতেই হবে! হঠাৎ দরজা খুলে গেল, এক বৃদ্ধা ভয়ে বিবর্ণা হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল, "সেনাপতি-মশায়, কী চান?"

"সে কেমন আছে?"

"কে?"

"কেতে—আবার কে?"

"কেতে?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, যে মূর্চ্ছা গেছে!"

"কি বলছেন? ও নামেরই ত কেউ এখানে নেই!"

"তুমি জাহন্নমে যাও!" এই ব'লে ল্যকক্‌ দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আরম্ভ করল। বৃদ্ধা তার পিছু পিছু ছোটে আর মিনতি করে, "থামুন—কথা শুনুন—ও নামের কেউ যে এখানে নেই—তেতালায় যে রুগী থাকে—ওখানে অমন চেঁচামেচি করবেন না—" ল্যকক্‌ তীরের মত তেতলায় উঠে দরজায় ভীষণ ধাক্কা মারতে লাগল।

২

নিবিড় নিশীথ। তুষারাচ্ছন্ন নগর নীরব—তমসাবৃত। মাঝে মাঝে শুধু ভেসে আসে প্রহরীর পদচারণ-ধ্বনি—মচ্‌-মচ্‌! তাঁবুর মধ্যে ব'সে ল্যকক্‌ কত কি ভাবে! এই দশ দিন সে সর্ব্বত্র খুঁজেছে—কোথাও পায় নি তার কেতে-র সন্ধান। সে নিয়েছে জার্ম্মান্‌ পুলিসের সাহায্য, তারাও কোন সংবাদ দিল না—কেনই বা দেবে, সমস্ত জার্ম্মান্‌ জাতি যে অসহযোগী? তার বক্ষে জমেছে আঁধার নিরাশা, তার মর্ম্মে বিঁধেছে নির্ম্মম ব্যথা—সে হ'ল নিশ্চিহ্ন?

হঠাৎ যেন একটা শব্দ হ'ল—কট, কট্‌, কট্‌! কাঁটা-তার কাটার আওয়াজ? তার চিন্তাজাল গেল বিচ্ছিন্ন হ'য়ে। আবার সেই?—অতি ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট! সে মনোযোগী হ'ল। গত মহাযুদ্ধে সে চার বৎসর ট্রেঞ্চে কাটিয়েছে—এ শব্দ সে চেনে! কতবার হুসিয়ার জার্ম্মান্‌ স্নাইপার সৈন্যকে সে কাঁটা-তার কাটার অবস্থায় হঠাৎ গ্রেপ্তার ক'রে এনেছে—তার ফলে, ফরাসী-সৈন্যের অনেক উপকার হয়েছে—কারণ এদের কাছে শত্রু-সৈন্যের দামী খবর পাওয়া যায়—এই কারণে তার যথেষ্ট সুনাম হয়েছে। তাই আজ তার এত বড় খাতির, সে রুর্‌-দখলকারী ফরাসী-বাহিনীর প্রধান সেনাপতির বাসায় প্রহরি-নায়ক সে প্রাসাদ যেন একটা দুর্গ। তার চারি ধারে ঘন কাঁটা-তারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর—প্রাচীরের স্থানে স্থানে মেশিন্‌গান—প্রধান দেউড়ির সামনে মেশিন্‌গান্‌-এর সারি! প্রত্যেকটির পেছনে সর্ব্বদা-সতর্ক সশস্ত্র সৈনিক। এ ছাড়া ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে, ও প্রাচীরের সর্ব্বত্র সঙ্গীন্‌-চড়ানো রাইফেল্‌-কাঁধে সজাগ সৈনিক সর্ব্বদা পাহারা দিচ্ছে। ল্যকক্‌ এই দুর্দ্দম প্রহরিবৃন্দের চালক।

আবার হ'ল সেই আওয়াজ?—হ্যাঁ, এ তাই! এখন দু-জায়গা থেকে শব্দ আসছে! তবে কি একটা দল এসেছে ঐ কাঁটা-তারের বেড়া কাটতে?—হ্যাঁ, তাই! ওদের সকলকে জ্যান্ত ধরতে হবে! মেজেয় খড়ের বিছানায় জনকয়েক সৈন্য ঘুমিয়ে ছিল, তাদের চুপি চুপি তুলে, চুপি চুপি নানা রকমের নির্দ্দেশ দিয়ে তাঁবুর কোণে স্তূপীকৃত অস্ত্রশস্ত্র নিঃশব্দে নিয়ে, আস্তে আস্তে সকলে বেরিয়ে পড়ল।

কয়েক মিনিট পরে হ'ল কয়েক বার রিভল্‌ভারের আওয়াজ, বাইরে হ'ল তুমুল সোরগোল, কয়েক বার হ'ল রাইফেলের শব্দ, কিছুক্ষণ ধ'রে হ'ল বহু মেশিন্‌গান্ ছোঁড়ার তীক্ষ্ণ ধ্বনি—টা-টা-টা-টা-টা-টা-টা—। তার পরই সব স্তব্ধ—একেবারে নিঝুম।

কিছুক্ষণ পরে তাঁবুর বাইরে সৈন্যদের ফেরার শব্দ আর ল্যাকক্-এর উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ল্যাকক্ বকতে বকতে ঢুকল, "সব মাটি হ'ল—সমস্ত মাটি হ'ল—" আর তার পেছনে পেছনে এক আষ্টেপিষ্টে দড়ি-বাঁধা যুবককে নিয়ে সৈন্যরা ঢুকল। চীৎকার ক'রে ল্যাকক্ এক কর্পোরালকে ধমকাল, "এখন লিয়্যৎন'াকে মুখ দেখাই কি ক'রে? ওদের গেল দু-দুটো লোক পালিয়ে, তারা আমাদের তিনটেকে মারলে গুলি ক'রে, আর তোমরা না-পারলে তাদের একটাকেও ধরতে, না-পারলে মারতে? ছি, ছি, ছি-ই!

"আজ্ঞে সের্জ'া তাতে কি হয়েছে? আপনার ধরা ছোক্‌রার কাছেই সব খবর পাওয়া যাবে।

"তাতে তোমার কি বাহাদুরী? আমি ঐ দিকটায় গিয়ে একে নিজে হাতে না-ধরলে এও ত যেত পালিয়ে! যেখানে শুয়ে পড়ে বুকে হাঁটতে বলেছিলাম সেখানে না ক'রে বিশ হাত দূরে সুরু করলে কেন? আমার হুকুম শুনলে না কেন? জান, আমার হুকুম না শুনে এই যে ভয়ানক লোকসান করালে, এর জন্যে তোমার কি শাস্তি হবে?"

"সের্জ'া, জানি! দোহাই সের্জ'া মাপ করুন—আমাকে বাচান—না হ'লে আমার প্রাণ যাবে—আপনিই আমাদের মালিক—"

"থামো!—এই ছোকরা, কে তুমি?"

যুবক বুক ফুলিয়ে বলল, "জার্ম্মান!"

"তা আর শেখাতে হবে না, ফাজিল! নাম কি? বাড়ি কোথায়? এখানে এসে কাঁটা-তার কাটছিলে কেন?"

"যদি না বলি?"

"বলবে না?—আলবৎ বলতে হবে!—বল!—বল!!"

"সত্যিই ঠিক করেছি এ-সব কিছুই বলব না।"

ল্যাকক্ ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে যুবকের গালে চড় মারল।

"এই কি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্য জাতির রীতি? অসহায় বন্দীর ওপর পাশবিক অত্যাচার!"

"বন্দী?—এসেছ চুরি করতে, আশা করো বন্দীর খাতির পাবে?"

"আর তোমরা বুঝি আমাদের দেশে সাধুতা করতে এসেছ?"

"তুমি বলা?—পাজি বশ্! মুখ সামলে কথা বল, না হ'লে—"

হয়ত আর একটা চড় যুবকের গালে পড়ত, কিন্তু হঠাৎ বাইরে প্রহরীর গোড়ালী ঠুকে ও রাইফেলে হাত ঠুকে সেলাম করার শব্দ হ'ল, সকলে চমকে উঠে সতর্ক হ'ল—সম্ভবতঃ কোন অফিসার আসছেন! সি-কোম্পানীর প্রথম লেফ্‌টেনেন্ট্ প্রবেশ করলেন, যুবক ভিন্ন সকলে য়্যাটেন্‌শনে দাঁড়াল। লেফ্‌টেনেন্ট্ নাকি চশমাটা লাগিয়ে বন্দীকে কিছুক্ষণ সহাস্যে নিরীক্ষণ ক'রে বললেন, "আ!—তরুণ জার্ম্মান্, আঁ্যা? দারুণ স্বদেশ-হিতৈষী, আঁ্যা?"

"তারুণ্য, স্বদেশ-প্রীতি এ-সব কি আপনাদের 'লা গ্রাঁদ্ নাসিয়ঁ'র'* কাছে পরিহাসের বিষয়?"

"বা!—প্রাণে বেজায় আঘাত লাগল, আঁ্যা? দেশভক্তির মাত্রাটা তা'হলে অতি ভীষণ, আঁ্যা? তাই দেশের জন্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করতে আসা হয়েছে, রুর-দখলের প্রতিহিংসা, আঁ্যা?"

"হ্যা!"

"হ্যা-আঁ্যা! সাবাশ!" [পকেট থেকে সিগারেট্-কেস্ বার করে খুলে যুবকের সামনে ধরে,] "সিগারেট?"

"না।"

"আ!—তীব্র ফরাসী-বিদ্বেষ, আঁ্যা? সের্জ'া ল্যাকক্, খুশী হলাম, বেশ হ'য়েছে!"

"ধন্যবাদ, লিয়্যৎন'া!"

যুবকের আশ্চর্য্য ভাবান্তর হ'ল! সে বিস্মিত হ'য়ে ল্যাককে নিরীক্ষণ করতে থাকল। লেফ্‌টেনেন্ট্ জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ, হের্ পেট্রিয়টের নাম?"

যুবক হ'ল অধিক বিচলিত, সে শুধু ইতস্ততঃ চাইতে

* লা গ্রা দ্‌ নাসিয়ঁ [La grande Nation] :— The grand nation বা শ্রেষ্ঠ জাতি।

লাগল, ল্যাকক্‌কে বার-বার দেখতে লাগল, কিন্তু তার বাক্যস্ফূরণ হ'ল না।

"সে কি হের্‌ পেট্রিয়ট্‌, ভয় হ'চ্ছে? চারি দিকে এই সব সতর্ক সেপাইদের নজর এড়িয়ে, ঐ কামান বন্দুকের জঙ্গল ভেদ ক'রে, অমন দুর্ভেদ্য কাঁটা-তারের বেড়ায় দরজা ফুটিয়ে এই গভীর রাত্রে, এই দারুণ শীতে একা এসেছিলেন ফরাসীবাহিনীর প্রধান সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, আর—"

হঠাৎ ল্যাকক্‌ ব'লে ফেলল, "একা নয় লিয়্যৎনাঁ, ওর সঙ্গে আরও দু-জন ছিল!"

"তারা কোথায়?"

"আমারই বোকামিতে তারা পালিয়ে গেছে লিয়্যৎনাঁ।"

"পালিয়ে গেছে?" রোষকষায়িত নেত্রে লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ ল্যাকক্‌-এর দিকে তাকালেন, "পালিয়ে গেল?" ক্রোধে তাঁর মুখ আরক্ত হ'ল।

কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে বললেন, "হ্যাঁ!—মহাশয়ের এতখানি বুকের পাটা হয়েছিল, আর নাম বলতে গিয়ে সেই বুক কেঁপে উঠল?"

"আমার নাম—সীগ্‌ফ্রীড।"

"সীগ্‌ফ্রীড, অ্যাঁ? মহাবীর সীগ্‌ফ্রীড?—বা! সেই ড্র্যাগন-বিজয়ী জার্ম্মান্‌ বীর পুনর্জন্ম নিয়ে এসেছেন, অ্যাঁ?—চমৎকার! কিন্তু, সীগ্‌ফ্রীড কী?"

"ঐটি জিজ্ঞাসা করবেন না।"

"ঐটি জিজ্ঞাসা করব না?—কেন?"

"অনুরোধ করি ঐটি জিজ্ঞাসা করবেন না।"

"আ!—ঐটি সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন, যদি অবশ্য হের্‌ পেট্রিয়ট্‌ ব'লে দেন, মহাশয় কোন্‌ দলের লোক, কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রধান সেনাপতির সন্ধান করছিলেন, আর যে-সব মহামতি পেট্রিয়ট্‌দের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁদের কি নাম—"

"আমি বিশ্বাসঘাতক নই।"

"এই খবরটুকু দিলে মহাশয়কে নাম জিজ্ঞাসা ক'রে আর বিরক্ত ত করবই না, বরং প্রচুর পুরস্কার দিয়ে এখুনি খালাস ক'রে দেব।"

"আমি বিশ্বাসঘাতক নই!"

"আ!—হের্‌ পেট্রিয়ট অকারণ ভয় পাচ্ছেন! কেউ জানবে না এ-সব খবর আমরা কোথায় পেলাম।"

"সেটা বড় কথা নয়।"

"সেইটাই আসল কথা! লোকে জানলে সব মাটি, না-জানলে আপনি ত নিষ্কলুষ স্বদেশহিতৈষী থেকেই যাবেন! চাই কি রটিয়ে দেবেন, এখান থেকে বহু ফরাসী-সৈন্য খুন ক'রে পালিয়েছেন, আমরাও তার কোন প্রতিবাদ করব না, ফলে হবে আপনার স্বদেশে অশেষ খ্যাতি, আর আমাদের প্রচুর অর্থ নিয়ে আদর্শ স্বদেশ-সেবক হিসাবে—"

"বৃথা বাক্যব্যয় করবেন না!"

"অ্যাঁ!—আ! হের্‌ শুধু পেট্রিয়ট্‌ নন, ভীষণ আদর্শবাদী, অ্যাঁ? কিন্তু দুঃখের সহিত জানাতে হ'চ্ছে, এ খবর না দিলে মহাশয়ের কিছু বিপদ হবে। হয়ত বা প্রাণদণ্ড দেওয়া আমাদের অপ্রিয় কর্ত্তব্য হবে।"

"জানি।"

"তবু কিছু বলবেন না?"

"না?—আ! আদর্শবাদের পরিমাণটা কিছু বেশী। ভাল!—স্যের্জাঁ ল্যাকক্‌, এই ভদ্রলোকের জন্যে উত্তম বিশ্রামের ব্যবস্থা হোক।"

"যে আজ্ঞে, লিয়্যৎনাঁ, কোথায়?"

"জেলে, আবার কোথায়! কিন্তু সাবধান, কেউ যেন ওঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত না করে।"

"যে আজ্ঞে লিয়্যৎনাঁ।"

"হ্যাঁ, কাল সকালে আবার দেখা যাবে। আউফ্‌ভিদারসেন্‌* হের্‌ পেট্রিয়ট্‌। আশা করি রাত্রে ভাল ঘুম হবে, তার পর মাথা ঠাণ্ডা হ'লে এই অনাবশ্যক আদর্শবাদের বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পাবেন।" লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ প্রস্থান করলেন।

এর পর আরও এক সপ্তাহ অতীত হ'ল, সে যুবক কিছুই প্রকাশ করল না। সুসভ্য বৈজ্ঞানিক যুগে স্বীকার করানোর যত উৎকৃষ্ট উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে তার সব কিছু ঐ তরুণের ওপর প্রয়োগ করা হ'ল, কোন

* আউফ্‌ভিদারসেন্‌ [Aufwiedersehen]:—জার্ম্মানীতে বহু প্রচলিত শব্দ, অর্থ পুনর্দর্শনায়।



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রাধাকৃষ্ণ

[শ্রীযুত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ হইতে]

ফল হ'ল না। শেষে সামরিক বিচারে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'ল।

কিন্তু সি-কোম্পানীর সেই প্রথম লেফ্‌টনেণ্ট্ তখনও হাল ছাড়লেন না। ঐ ছোক্‌রা বশ্‌-এর কাছে হার মানতে হবে তাঁর মত চতুর ফরাসী অফিসারকে? তাঁর তীক্ষ্ণ শ্লেষ-শক্তি বাঁকা মুরিশ তলোয়ারের মত ক্ষুধিত হ'য়ে উঠল, কিন্তু তার নির্ম্মম আঘাত যুবকের জিদ বাড়াল বই কমাল না। তিনি বুঝলেন তাঁকে অন্য অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। তাঁর শ্যেন-দৃষ্টি মাত্র যুবকের মনে একটি ছিদ্র লক্ষ্য করেছিল। মধ্যে মধ্যে যখন ল্যাকক্‌কে সঙ্গে নিয়ে তার কাছে যেতেন, ল্যাকক্‌কে দেখা মাত্র যুবকের অদ্ভুত ভাবান্তর হ'ত, যেন তাকে কষ্টে মন শক্ত করতে হ'ত, তার অপূর্ব্ব মানসিক গঠনের সৌষ্ঠব নষ্ট হ'য়ে যেত। কিন্তু তখন যুবকের ঐ কেন্দ্রচ্যুত মনকে আয়ত্তে আনবার জন্যে যেই তিনি মুখ খুলতেন, অমনি শামুকের মত সেটা যেত এক কঠিন আবরণের মধ্যে লুকিয়ে, আবার তাঁর তীক্ষ্ণধার শ্লেষের আঘাত পড়ত শুধু একখণ্ড ইস্পাতের ওপর।

অবশেষে লেফ্‌টেনেণ্ট্ মনস্থ করলেন সেই চরম মুহূর্ত্তের কিছু পূর্ব্বে ল্যাকক্‌কে তার কাছে একা পাঠাতে হবে। ল্যাকক্ অতি পাকা লোক, সম্পূর্ণ নির্ভর-যোগ্য। অমন ভীষণ মুহূর্ত্তে তার কাছে যুবকের মন অধিক বিকল হবে এবং সুদক্ষ ল্যাকক্ সফল হবে।

সেদিন ভোর ছটায় সি-কোম্পানীর বিশটা রাইফেলের জ্বলন্ত গুলি বালকের বুক ঝাঁঝরা ক'রে দেবে। তার ঠিক এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ল্যাকক্ এল তার ঘরের সামনে। লোহার দরজা খোলার শব্দে বালকের ঘুম ভাঙ্‌ল। উঠে ব'সে, হাই তুলে, আড়মোড়া ভেঙে সে বলল, "বুঝেছি, এখুনি প্রস্তুত হচ্ছি।" বিছানা থেকে লাফ্ দিয়ে নেমে, পাশেই স্নানের ঘরে গেল। ল্যাকক্ ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। বালক ফিরে এল স্নান ক'রে, উত্তম পোষাকে ভূষিত হ'য়ে, প্রফুল্ল মনে। ল্যাকক্‌কে দেখেই চমকে উঠে বলল, "আপনি? এ কাজও করবেন আপনি?" আত্মসম্বরণ ক'রে বলল, "ভাল! কেনই বা তা না হবে? চলুন, আমি প্রস্তুত।"

"আমি এসেছি তোমাকে বাঁচাতে।"

"বাঁচাতে? ও বুঝেছি! আপনি চান, শেষ মুহূর্ত্তেও আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে, অর্থ-পুরস্কার দেওয়া হবে, যদি ঐ হীন কাজ করি।—না, এমন কুৎসিত প্রস্তাব আপনি মুখে আন্‌বেন না!"

"কিন্তু কেন?—"

"ও প্রসঙ্গ আর তুলবেন না। আমার প্রতি আপনার শেষ কর্ত্তব্য পালন ক'রে আমাকে শান্ত মনে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে দিন—কোন দোষ হবে না। কিন্তু এমন কুৎসিত প্রস্তাব আপনি ক'রে আমার মন ক্ষোভে ভ'রে দেবেন না—বিশেষ ক'রে আপনি!"

"বিশেষ ক'রে আমি?—এ-কথা কেন বলছ?"

* * * *

ল্যাকক্ বুঝল, তারা পিতা ও পুত্র।

৩

বসন্ত তখনও অনাগত, ধরণী তখনও তুষারমণ্ডিত, শীতের সে জমাট জড়তা পরাজয় করতে যৌবন হয়ে ওঠে সহসা উচ্ছ্বসিত। "ফাশিং"এর রাত্রে সারা জার্ম্মেনী উন্মত্ত হয় মদনোৎসবে। দলে দলে নরনারী আসে ঘর ছেড়ে, বিচিত্র সাজে সজ্জিত হ'য়ে, ধনী-গৃহের সুন্দরীরা আসেন অবগুণ্ঠিতা হ'য়ে। সেদিন তরুণ-তরুণীর মিলনে প্রয়োজন হয় শুধু নিয়মহীন খেয়াল, অথবা হয়ত সেই দুর্নিবার আকর্ষণ! ধনী-নির্ধনের পার্থক্য যায় ঘুচে, আভিজাত্যের গৌরব হয় ধুলিসাৎ, সমাজের বন্ধন হয় শিথিল, যৌবন হ'য়ে ওঠে উচ্ছল উদ্দাম, নির্ব্বাধ, বৃদ্ধেরাও ফিরে পায় যৌবন—সকলে করে সারারাত্র বাধাহীন নৃত্য।

ঠিক বিশ বৎসর পূর্ব্বে এমনি এক রাত্রে এই উৎসবের মধ্যে ল্যাকক্-এর সঙ্গে হয়েছিল কেতের মিলন, আর সেই রাত্রেই উভয়ে করেছিল উভয়কে হৃদয়-দান।

কেতের পিতা হের্ গেহাইম্‌রাট* লিঙ্ক, কাইসারের উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, ল্যাকক্-এর মত পাত্রের হাতে একমাত্র সন্তান ঐ কেতেকে সমর্পণ করা যে তাঁর পক্ষে চিন্তাতীত তা ঐ প্রণয়ীযুগল বুঝল। কিন্তু তাদের প্রণয় এতই গভীর হ'য়ে উঠল যে তারা গোপনে বিবাহ না ক'রে থাক্‌তে পারল না।

* গেহাইম্‌রাট [Geheimrat]—জার্ম্মান কাইসারদত্ত উচ্চ উপাধি বিশেষ, অনেকটা ইংরেজী Sirএর মত।

হের্ গেহাইম্‌রাটের কাছে এ সংবাদ গোপন থাকল না। তিনি তৎক্ষণাৎ জার্ম্মান্-সরকারের সাহায্যে জামাতাকে জার্ম্মেনী পরিত্যাগ করতে বাধ্য ত করলেনই, এমন কি নবদম্পতীর মধ্যে পত্র-বিনিময়টাও যাতে অসম্ভব হয় তার নিপুণ ব্যবস্থা করলেন এবং এই দুর্ঘটনার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলবার জন্যে রাজকার্য্য থেকে অবসর নিয়ে কন্যাসহ প্রস্থান করলেন দূরে, ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিক্ শহরে। কিন্তু তাঁর নিষ্কণ্টক মিউনিক্-ভবনেও যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হ'ল ঐ যুবক, এবং তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে স্বামীর প্রিয় নাম ডাকতে ডাকতে তাঁর অতি আদরের কন্যা কেতে ইহধাম ত্যাগ করল।

নবজাত হ'ল মাতামহের গৃহে লালিতপালিত। তাকে দেওয়া হ'ল জার্ম্মেনীতে অতি বিরল, অখ্রীষ্টীয় নাম, সীগ্‌ফ্রীড্। হের্ গেহাইম্‌রাট হয়ত আশা করেছিলেন অতীত জার্ম্মেনীর বীরত্বের প্রতীক এই নাম, এর দাপটে বালকের জন্ম-ঋণ লুপ্ত হবে!

কিন্তু যথাকালে বালকের পিতৃ-পরিচয়ের ক্ষুধা তীব্র হ'য়ে উঠল। হের্ গেহাইম্‌রাট তাকে বোঝালেন, তার পিতার নাম ল্যাকক্ হ'লেও তিনি ছিলেন এক দেশগতপ্রাণ জার্ম্মান্। ফরাসীরা তাঁকে কৌশলে বন্দী ক'রে তাদের আফ্রিকায় অবস্থিত ভীষণ "বিদেশী বাহিনী"তে জোর ক'রে সৈনিকের কাজে নিযুক্ত করেছে!—বালকের মনে পুষ্ট হ'ল উগ্র ফরাসী-বিদ্বেষ। সে তার জনক-জননীর একত্রে-তোলা ফটোটা যত্ন ক'রে তার ঘরের টেবিলে রাখত, তাকে নিত্য ফুল দিত, আর প্রতিজ্ঞা করত, একদিন সে এর প্রতিশোধ নেবে, তার পিতাকে উদ্ধার করবে, তার নামের উপযুক্ত কাজ সে করবে।

নির্ব্বাসনের বজ্রাঘাত পেয়ে, ততোধিক কষ্টকর বিরহকে অতিক্রম করবার জন্যে ল্যাকক্-দম্পতী মনে করেছিল একত্রে ফরাসী দেশে পলায়ন করবে। কিন্তু হের্ গেহাইম্‌রাটের নিপুণ ব্যবস্থায় তাও হ'ল অসম্ভব! ল্যাকক্‌কে একাই দেশে ফিরতে হ'ল।

ল্যাকক্-এর পিতা, প্যারিসের এক ক্ষুদ্র মুদী, এই ঘটনাকে এক প্রকাণ্ডযোগ্য ব্যাপার মনে করলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ঐ ভাবপ্রবণ অপদার্থ পুত্রকে ব্যবসায় নিযুক্ত ক'রে মানুষ ক'রে তুলতে, তার জন্যে তিনি অর্থব্যয় করতেও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁর মূর্খ পুত্র পালিয়ে গিয়েছিল ড্যুসেল্‌ডর্ফে। এখন বহু চেষ্টা ক'রে কেতের একটা সংবাদ পর্য্যন্ত না-পেয়ে তাঁর পুত্রের মন যখন সেই ব্যবসার দিকেই গেল, তিনি হ'লেন অতিশয় সন্তুষ্ট।

কিন্তু ল্যাকক্-এর পক্ষে ইউরোপবাস অসহ্য হ'য়ে উঠল। সে আবার পালাল—এবার সুদূর ইন্দো-চীনে। সেখানে দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় ক'রে আবার যখন দেশে ফিরল, তখনই আরম্ভ হ'ল বিশ্ব-সমর, সে বাধ্য হ'ল ফরাসী সৈনিক হ'তে। সে ধনী হ'লে তার গেহাইম্‌রাট শ্বশুরও সন্তুষ্ট হবেন, তার কেতেকে ফিরে পাবে, এ সব দীর্ঘ-সঞ্চিত আশা নিবে গেল।

তার পর এই দশ বৎসর সে করেছে নিষ্ঠার সহিত সৈনিকের কাজ—উৎকৃষ্ট স্বদেশ-সেবা! তার পুরস্কার? —আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই তার কেতের একমাত্র চিহ্ন ঐ বালককে হত্যা করবে!—কারা? সেই সব তরুণ সৈন্য যাদের সে আপন হাতে রাইফেল্ ছুঁড়তে শিখিয়েছে!

সে চাইল তার প্রাণ-পুত্তলীকে বুকের মধ্যে নিয়ে পলায়ন করতে। কারাগারের সকল প্রহরী তারই অধীন, তাকে বাধা দেবার কেউ ছিল না। কিন্তু যুবক হ'ল অস্বীকৃত —অমন পলায়ন সে চায় না।

ল্যাকক্ বুঝল, এ তার মাতৃহীন পুত্রের কত বড় অভিমান। সে তখন সব বলল—তার দুই গণ্ড অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠল। যুবক বিগলিত হ'য়ে বলল, "বুঝেছি, এ শুধু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস!"

"চল সীগ্‌ফ্রীড্, পালাই, এ থেকে রেহাই পাই—"

"ছি! সে কাজ তোমার জীবনে কী এনে দেবে? তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।"

ল্যাকক্ এ-কথার মর্ম্ম অনুভব করল। কিন্তু, তাই ব'লে সে হবে পুত্রহন্তা? কোন্‌টা ভীষণতর? যুবক হয়ত সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ,—ল্যাকক্? ঐ পুত্র যে তার কেতের একমাত্র চিহ্ন! ও বালক তার কী বুঝবে? দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে শুধু বলল, "হা, ভগবান!"

"দুর্ব্বল হ'লে চলবে না পিতা, তা হ'লে আসবে হীনতা। এ ত শুধু অদৃষ্টের পরিহাস নয়, এ যে এক নিষ্ঠুর বিধানের

নির্ম্মম আঘাত! কিন্তু, সে বিধান দুর্ব্বোধ্য অলঙ্ঘ্য, তার আঘাত বীরের মত গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই—"

"উপায় আছে, আমি যে তোমার বাবা!" এই ব'লে ল্যকক্ আপন বক্ষে বেওনেট্ বিদ্ধ করতে উদ্যত হ'ল, যুবক ক্ষিপ্রবেগে তার হাত ধ'রে ফেলল, তার বেওনেট জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ ক'রে পিতাকে আলিঙ্গন করল। ল্যকক্ পুত্রকে স্কন্ধে তুলে নিয়ে দ্রুত দরজার দিকে অগ্রসর হ'ল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সি-কোম্পানীর প্রথম লেফ্‌টেনেণ্ট্ কারাকক্ষে প্রবেশ করল। ল্যকক্ পুত্রকে স্কন্ধ হ'তে নামিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। নাকি চশমাটা লাগিয়ে পরম বিস্ময়ে লেফ্‌টেনেণ্ট্ এ দৃশ্য দেখতে থাকলেন। বাইরে সৈন্য-বাহিনীর পদশব্দ মশ্, মশ্, মশ্, মশ্ স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠল, তারা এল যুবককে বধ করতে। লেফ্‌টেনেণ্ট্ হাঁক দিলেন, "সোর্জ্জাঁ ল্যকক্!" ল্যকক্ যন্ত্রবৎ পুত্রকে ছেড়ে দিয়ে য়্যাটেন্‌শনে দাঁড়াল, "হাঁ, লিয়্যৎনাঁ!"

"এর অর্থ?"

সব শুনে, লেফ্‌টেনেণ্ট্ যুবককে বললেন, "বা! মৃসিয়্য ল্যকক্—অ্যাঁ? ভুল ক'রে মৃসিয়্য এতদিন জার্ম্মান ভেবে এসেছেন—আজ মসিয়্যর বশ্-জীবন থেকে মুক্তি হ'ল—অ্যাঁ? ফেলিসিতাসিঁয়* মৃসিয়্য, হাঁ! সোর্জ্জাঁ ল্যকক্, এমন বীর পুত্র ফরাসী জাতিকে দেওয়া মস্ত গৌরব—হাঁ—অ্যাঁ!"

"লিয়্যৎনাঁ, প্রাণের ধন্যবাদ নিন। সীগ্‌ফ্রীড্ এখন তুই এই দেবতার দয়ায় খালাস পেলি, আর কোন ভয় নেই! প্রাণের ধন্যবাদ নিন, লিয়্যৎনাঁ—"

"এ! বেশ, বেশ! হাঁ, আশা করি মৃসিয়্য তাঁর পিতাকে সব খবর ঠিক ঠিক দিয়েছেন।"

"কিসের খবর লিয়্যৎনাঁ? আমার ছেলে কি খবর দেবে?—ও হাঁ, খবর!"

"হুঁ! সোর্জ্জাঁ দেখছি বড়ই আত্মহারা হয়েছেন—হ্যাঁ, তার কারণও কিছু হয়েছে! [ঘড়ি দেখে] কিন্তু, কিন্তু অমূল্য সময় নষ্ট হ'য়ে গেছে সোর্জ্জাঁ! জানেন, সামরিক আইনে এই কর্ত্তব্যের অবহেলা কত বড় অপরাধ?"

যুবক চীৎকার ক'রে উঠল, "পিতা!"

"স্থির হও সীগ্‌ফ্রীড্!—জানি লিয়্যৎনাঁ! এর শাস্তি কি তাও জানি! কিন্তু যে ফরাসী রিপাব্লিক্‌কে এত বছর প্রাণ দিয়ে সেবা করেছি, তার কাছে শুধু এই ভিক্ষে চাই, আমার একমাত্তর ছেলের প্রাণটুকু যেন বাঁচে!"

"এ আপনার অন্যায় দাবি নয়! এর জন্যে দরখাস্ত করুন, আমি তা ভাল ক'রে সুপারিশ করব।"

"যে আজ্ঞে লিয়্যৎনাঁ, ধন্যবাদ!"

"হ্যাঁ সোর্জ্জাঁ ল্যকক্, এখন একটু বাইরে যান।"

ল্যকক্ সে কক্ষ ত্যাগ করল। তার অদৃশ্য হওয়া পর্য্যন্ত লেফ্‌টেনেণ্ট্ তাকে অবজ্ঞা ভরে দেখলেন—"স্নেহদুর্ব্বল ক্ষুদ্র কীট!" তার পরই যুবকের দিকে ফিরে বললেন, "হ্যাঁ, এইবার আশা করি, মৃসিয়্য তাঁর ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যটুকু শিগ্গির সেরে ফেলবেন, অ্যাঁ? বিশেষ ক'রে এখন যখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির সভ্য হ'লেন—"

"পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি জার্ম্মান্!"

"অ্যাঁ!—বুঝেছি! [ঘড়ি দেখে] তা হোক তবু খবরটা শিগ্গির দিয়ে ফেলুন।"

"না।"

"না?—আ কিন্তু মৃসিয়্য ভুলে যাচ্ছেন, এক জন ফরাসী হিসাবে—"

"আমি জার্ম্মান্!"

"অ্যাঁ?—এখনও বশ্?"

"আমি জার্ম্মান্! যেখানে আমার জন্ম, যার অন্নে আমি পুষ্ট, যার শিক্ষায় আমার মনুষ্যত্ব, আমি সেই পুণ্যভূমির সন্তান—আমি জার্ম্মান্।"

"আ, বুঝেছি! মৃসিয়্য এখন হারানো জিনিষ আঁকড়ে ধরতে চান—অ্যাঁ?"

"আমি জার্ম্মান্!"

"বেশ ত!—কিন্তু, যে পিতৃভূমির* জয়গান করতে বাল্যকাল থেকে অভ্যস্ত, এখন সেই পিতৃভূমিকেও একটু দয়া করুন!—কি? চুপ ক'রে রইলেন যে? সন্দেহ হ'চ্ছে কোনটা বড়? পিতৃভূমি না মাতৃভূমি,

* ফেলিসিতাসিঁয় [Felicitation]:—অভিনন্দন-জ্ঞাপন। [Congratulation]

* পিতৃভূমি:—জার্ম্মানরা স্বদেশকে বলে Das Vaterland, অর্থাৎ পিতৃভূমি।

আঁ্যা? আশা করি, মৃসিয়্য এমন নির্ব্বোধ নন যে এমন সন্দেহস্থলে সঠিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করতে ভুল করবেন।”

“আমার কর্ত্তব্য আমি জানি।”

“নিশ্চয়!—এই ত চাই! [ঘড়ি দেখে] এখন পিতৃভূমির খাতিরে—”

“আমি বিশ্বাসঘাতক নই।”

“আ! মৃসিয়্য এখন বাড়াবাড়ি করছেন। এ সংবাদ না দিলেও যে আপন পিতৃভূমির বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, আর তার ফলে আপনার নিজের জীবন ত নষ্ট হবেই—আপনার পিতারও সর্ব্বনাশ হবে—”

“কেন? তিনি কি অপরাধ করেছেন?—”

“এটা বুঝছেন না, পুত্র দেশদ্রোহী হ'লে, পিতার কখনও সেই দেশের সৈন্যে স্থান থাকে, না থাকা উচিত?—”

“ও!”

“তাই বলি মৃসিয়্য, এই খবরটুকু দিয়ে ফেলে নিজের পিতাকে বাঁচান, তাহ'লে সব দিক রক্ষা পাবে, আপনিও আমাদের প্রচুর অর্থ নিয়ে ফ্রান্সের কোন মনোরম নগরে সুখে বাস ক'রে জীবন সার্থক করতে পারবেন।—আ! ভয় নেই মৃসিয়্য। পিতৃভূমির এত বড় উপকার করলে লোকে আপনাকে দেবতার মত পূজা করবে—”

“অমন পূজা চাই নে, জীবনকে অমন ভাবে সার্থক করাও চাই নে।”

“কিন্তু, জীবনদাতা পিতাকে রক্ষা করা কি আদর্শ-বাদীর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য নয়?”

“বৃথা চেষ্টা, কিছুই বলব না।”

“না বললে, আপনার পিতার সর্ব্বনাশ হবে, তাকে কোর্টমার্শাল করা হবে, তাকে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হবে, তাকে—”

“তাঁর কি দোষ? তিনি ত ইতিপূর্ব্বে আমার জন্ম-সংবাদও জানতেন না—”

“আপনার এই জিদ—এই সর্ব্বনেশে জিদ—”

“আপনারা না তাঁর কাছে অশেষ ঋণী? আমার স্বর্গীয় মাতামহ ছিলেন গোঁড়া জার্ম্মান, তিনি ওঁর জীবন দুঃখে ভ'রে দিয়েছেন, আপনারা তাঁর চেয়েও নিষ্ঠুর হ'বেন?

“আ! মৃসিয়্য সাবধান! সেই বৃদ্ধের আত্মাটি কিন্তু আপনার কাঁধে চেপেছেন—হাঁ আঁ্যা!—কী? ঘাব্‌ড়ে গেলেন যে? ভয় নেই মৃসিয়্য, শুধু এই কুইক্সটিক্ জিদ ছেড়ে দিন, তাহ'লেই সব রক্ষা পাবে।—এ কাজ ত অতি সহজ, চিন্তা কিসের?”

“সহজ নয়, অসম্ভব। আমার পিতাকে রক্ষা করার জন্যে আমার সহচরদের মৃত্যুমুখে তুলে দিতে আমি পারি নে—কিছুতেই নয়। আমার জন্ম যদি ফরাসী দেশে হ'ত, আমার মাতা যদি ফরাসী নারী হ'তেন, এ সব অন্যায় করেছি এমন ধারণা যদি বদ্ধমূল হ'ত, তাহ'লেও এমন হীন কাজ করতে আমি পারি নে—কিছুতেই নয়! কিছুতেই নয়!!”

লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ স্তম্ভিত হলেন। কিছুক্ষণ তাঁর মুখেও বাক্যস্ফূরণ হ'ল না—এও সম্ভব? হঠাৎ তাঁর মনে জাগল, বহু বৎসর পূর্ব্বের স্মৃতি, যখন তিনি এই বয়সে নতুন ইউনিফর্ম্‌ প'রে ‘ক্যাডেট’ হয়েছিলেন—হয়ত তিনিও তখন এমনিটি ছিলেন! আর যুগপৎ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল অশীতিপর বৃদ্ধ ব্যারনের তরুণী স্ত্রী সুন্দরী ব্যারনেস্‌ আঁদ্রে দ্য লা-র সেই আবেশ-জড়িত আয়ত লোচনের উন্মাদক কটাক্ষ, যা সেই সময়ে তাঁর কৈশোর ঘুচিয়ে যৌবনের উন্মেষ করেছিল,—কী তার মাদকতা! মনে পড়ল পরবর্ত্তী কত রোমাঞ্চকর ঘটনা, যা অজ্ঞাতে তাঁর পূর্ব্বের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিকৃত ক'রে দিয়েছে, যার তীব্র স্মৃতি তাঁর এতক্ষণ অর্দ্ধচেতন রক্ত-পিপাসা জাগ্রত ক'রে দিল।

তাঁর ক্ষুধিত দৃষ্টি পড়ল সুকুমার কিশোরের নবীন কান্তির ওপর। সে দৃষ্টি যুবকের মনে কেমন একটা অস্বস্তি সৃষ্টি করল।

তিনি হাঁক দিলেন “সোর্জ্জা ড্রাপে।” ড্রাপে ও ল্যাকক্ প্রবেশ করল।

“আ!—সোর্জ্জা ল্যাকক্, আমি নিরুপায়! আপনার তরুণ পুত্র নিজের নবীন জীবন বিসর্জ্জন করতে দৃঢ়সঙ্কল্প, আমি কি করব? অমন তাজা দেহ ধ্বংস করার প্রখর আনন্দের কাছে ওঁর পিতা, ওঁর পিতৃভূমি এ-সব তুচ্ছ।”

যুবক বলল, "আমার পিতৃভূমি জার্ম্মেনী, আমার মাতৃভূমি জার্ম্মেনী, আমার স্বর্গ—জার্ম্মেনী!"

!"

"লিয়ৎন্যঁ, ও পাগল, ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি সব ঠিক ক'রে নেব—"

"তার আর সময় নেই!—সোর্জ্যঁ হ্যাপ, বন্দীকে নিয়ে চল।"

"লিয়ৎন্যঁ, ও শিশু, ওকে মাপ করুন—"

"অসম্ভব—"

"তবে আর এক ঘণ্টা সময় দিন, প্রধান সেনাপতির কাছে গিয়ে এখুনি ওর প্রাণ ভিক্ষে ক'রে আনছি! আমি তাঁর জীবন বাচিয়েছি, তিনি আমাকে এটুকু দয়া করবেন, লিয়ৎন্যঁ, মাত্তর এক ঘণ্টা—"

"এক মুহূর্ত্তও নয়! এ সামরিক নির্দ্দেশ—অলজ্ঘ্য!"

* * * * *

রণ-দামামা বেজে উঠল। যুবক বধ্যভূমিতে দাঁড়াল—মাথা খাড়া ক'রে, বিংশতি রাইফেলের দিকে বুক পেতে দিয়ে।

ঠিক ছ'টায় লেফ্‌টেনেন্টের মুখ-নিঃসৃত হ'ল আদেশ।

যুবক শতচ্ছিন্ন বক্ষ নিয়ে তার প্রাণাধিক পিতৃভূমিকে চুম্বন ক'রে চিরনিদ্রায় শায়িত হ'ল।

সহসা সকলে দেখে, তাদের সার্জ্জেণ্ট্‌-মেজর ল্যাকক্‌ ছিন্ন-মূল তরুর ন্যায় ভূপতিত হ'ল! প্রথম লেফ্‌টেনেণ্ট ছুটে গিয়ে দেখেন, তাঁর বিশেষ আদেশ সত্ত্বেও ল্যাকক্‌-এর অঙ্গুলী রাইফেলের ঘোড়া টানতে অসমর্থ হয়েছে, তার হৃৎযন্ত্রও বিকল হয়েছে,—তার দেহ প্রাণহীন।

লাভষ্ট্রোক্‌

আবুল হাছানাৎ

১

চাকুরীটি আমার বিশেষ বড় নয়, তবে অসাধ্যসাধন আমাদের নিত্যকর্ম্ম। নাটক-নভেল লেখকেরা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু আমাদের তাতে পাকা হাত। দিনগুলো বেশ কাটিয়া যাইতেছে; ছোটখাটো বিপদ্‌ দূরে থাকুক, বড় বড় কঠিন সমস্যাও এখন হেলায় কাটাইয়া দিই। কিন্তু প্রথম চাকুরী-জীবনে সামান্য একটি ব্যাপারেই বড় মুষড়াইয়া গিয়াছিলাম! দয়াময়ের উদ্দেশে কত কাতর মিনতি, নির্জ্জনে কত অশ্রুপাত! মনের সেই অস্থিরতায় ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি বড়ই আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন শুধু হাসি আসে সে কথা মনে পড়িলে।

সে বৎসর ট্রেনিং কলেজ হইতে পাস করিয়া আসিয়া আবার জেলায় কাজ শিখিতে হইল। প্রবেশনারী অবস্থার লাঞ্ছনা মনে পড়িলে ঘৃণার উদ্রেক হয়। কত লোকের ধমকানি, চোখরাঙানি যে সহ্য করিতে হইল! একদিন মনের দুঃখ খুলিয়া এক চার্জ্জ-অফিসার অর্থাৎ পাকা দারোগাজীর কাছে বলিলাম। বলিলেন,—"ওহে, আর একটু সবুরই কর না! দেখবে কত লোকের জানমালের মালিক হ'য়ে পড়বে। তখন তোমাকে খোসামদ না করে এমন লোকই এলাকায় থাকবে না। ক্ষমতা হবে তোমার অসীম, দাপট হবে বিষম!"—আপাততঃ আশ্বস্ত হইলাম। শিক্ষাদীক্ষার চোটে এক রকম মনমরা হইয়াই গিয়াছিলাম; তাই কবে কখন এমন সুযোগ আসিবে তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

আসিলও খুব তাড়াতাড়ি! গোয়ালদিঘী থানার বাসাগুলি সেবার ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গেল। চার্জ্জ-অফিসার অসুস্থ ছেলেমেয়ের অজুহাতে ছুটি লইয়া পলাইয়া গেলে, সাহেব আমাকেই ডাকিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"যাও, তোমাকে গোয়ালদিঘীর চার্জ্জে পোষ্ট্‌ করা গেল! ভালমতে কাজকর্ম্ম করিও।"

লাইনে খবর লইয়া জানিলাম বিবাহিত অনেকেই এই অজুহাতে সাহেবের নিকট হইতে এই থানাটার পালা এড়াইয়া ফেলিয়াছে। আর আমি? আমি যে সদ্যবিবাহিত! একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিলাম। লাইন বাবু বলিলেন,—"সাহেবকে বলা হয়েছিল কিন্তু তিনি ছেলেপিলেওয়ালাদের আপত্তি আরও বেশী গ্রাহ্য বলিয়া উহাকে উড়াইয়া দিয়াছেন।

মনে মনে সকলের চৌদ্দপুরুষের গুণগান করিলাম, আর নব-দম্পতির অতি ন্যায্য অধিকারটুকুর দিকেও যাহারা চাহিল না তাহাদের পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও হিতকামনা করিয়া রওনা হইলাম। স্বামীসুখবঞ্চিতা তরুণীর করকমলে হৃদয়ের গভীরতম ব্যথাটুকু জানাইয়া শুধু এই বলিয়া

অশ্রুলিপি পাঠাইলাম,—দারোগাদের নৈতিক উন্নতি অবনতির জন্য দায়ী তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতি!

পথ নৌকাযোগে। সময়টা আর কাটিতে চাহে না। মনের সেই বিরাগ, বিরক্তি মেজাজটাকে গরম করিয়াই রাখিল। থানাঘাটে যখন পৌঁছিলাম, তখন সংবাদ শুনিয়া সবাই ছুটিয়া অভ্যর্থনা করিতে আসিল। মাঝিদের সঙ্গে ভাড়া লইয়া একটু তর্কবিতর্ক হইতেই একেবারে জ্বলিয়া উঠিলাম। বেদম প্রহারে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল তাহার আর খোঁজ মিলিল না।

বেতখানির সেই প্রথম সদ্ব্যবহার, কিন্তু শাসনকার্য্যে আমায় বড়ই সহায়তা করিয়া বসিল। "বাবু বড় কড়া," "ভারী তাঁর মেজাজ," ইত্যাদি কথা দুই-তিন দিনেই থানায় ও এলাকাময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

২

ট্রেনিং কলেজে বড় বড় ওস্তাদের নিকট 'ল' পড়া হইয়াছিল। তাই আইনের ব্যবহারিক দিকটা বেশ করিয়া আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম। শিক্ষকেরা সবাই ছিলেন অভিজ্ঞ—জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটা কাটাইয়াছিলেন দারোগাগিরি করিয়া; চাকুরী-জীবনে আমাদিগকে দুইটি প্রধান তথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। একটি ছিল, Discarding of uncorroborated statement—অর্থাৎ যে-কথার কোন উপযুক্ত সমর্থক না থাকে তাহার উপর ভরসা করিতে নাই। দ্বিতীয়তঃ, Careful cross-examination of persons—অর্থাৎ কাহাকেও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে ভালমতে জেরা করিয়া লইতে হইবে।

তাই নিম্নতন কর্ম্মচারীরা যখন বলিয়া বসিত আমরা সবাই এক একটি সেরা অফিসার, তখন তাহাদিগকে শুধু জেরা করিয়াই ব্যতিব্যস্ত করিতাম না, কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবিজ তলব করিয়া রীতিমত বিচারে বসিয়া যাইতাম। কয়েক দিনের মধ্যেই আব্দারের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া বাঁচিলাম। সবাই বলিত, দারোগা বাবু ভারী নিটখুঁটে লোক বটেন, তাঁর কাছে ধাপ্পায় কাজ চলবে না।

সাক্ষী দিতে আসিয়া প্রায় সকলেই মুষড়িয়া যাইত। আমার সন্দেহসূচক বিস্ময়োক্তি শুনিয়া ও মুখের হাবভাব দেখিয়া তাহারা থামিয়া থামিয়া তলাইয়া দেখিয়া অতিশয় সঙ্কোচের সহিত জবানবন্দী করিত। জেরার চোটে ও মেজাজের দাপটে তাহাদের মুখ এতটুকু না-হইয়া যাইত না। সবাই বলিত,—হুজুরের অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি।

কাজকর্ম্ম চলিল বেশ। ভাবিলাম যে-রকম নাম করিয়া ফেলিলাম তাহাতে আর কোন কাজে বিশেষ আট্‌কাইতে হইবে না। মনটি মাঝে মাঝে ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিত আর ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকদের উদ্দেশে প্রায়ই হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া গোপনে প্রণাম করিয়া ফেলিতাম।

৩

একদিন বৈকালবেলায় আনমনে নদীর ধারে বেড়াইতে আসিলাম। সকলের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার প্রশ্রয় কখনই দিতাম না, তাই থানার অন্য কাহারও আমার সঙ্গে আসার মত দুঃসাহস হইত না। তবে অন্যতম সহায় "বেত্রবর" অর্থাৎ শাসনদণ্ডখানি সর্ব্বদাই হাতে থাকিত।

খুলনা হইতে ষ্টীমারখানি আঁকাবাঁকা কাটা খালটি বাহিয়া আসিয়া ঘাটে লাগিল। হঠাৎ স্বামীসুখবঞ্চিতা তরুণী স্ত্রীর কথা মনে পড়িয়া গেল। এই খুলনায়ই তিনি বর্ত্তমান! শুধু কয়েক ঘণ্টার রাস্তার ব্যবধান; অথচ বহুদিন মিলন ঘটে নাই। মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিল, রাগ করিবার মত কেহ সঙ্গেও ছিল না, তাই আত্মসংবরণ করিলাম।

ছাতা, লাঠি, বাক্স, পুঁটলী লইয়া যাত্রীরা দিগ্বিদিকে ছুটিল। তাহাদের মধ্যে ও কে? কঠিন সুরে ডাকিলাম,—রজনী! ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস্? আমি যে এখানে!

নমস্কার বাবু মশাই। তাই ত! জরুরী খবর। বাবা আমায় পাঠিয়ে দিলেন, বললেন জামাইবাবুকে তাড়া ক'রে নিয়ে আয় গে।

নিমেষের মধ্যে বুকের রক্ত জমাট হইবার উপক্রম হইল। ব্যাপারটা তবে কি? বলিলাম,—হ্যাঁ, চল্ বেটা আগে থানায় যাই, তার পরে সব শুনব।

রজনী রজনীর মতই অন্ধকার-মুখে মাথা হেঁট করিয়া পিছু পিছু চলিল। থানায় পৌঁছিয়াই হাঁকিলাম,—জমাদার বাবু! একখানা টেলিগ্রাফের ফর্ম্ম নিয়ে আসুন ত! খবর বিশেষ ভাল বোধ হচ্ছে না, তবে বেটাকে 'জেরা' করা যা বাকী।

ফর্ম্ম একখানার জায়গায় দশখানা আসিল ও ভক্ত প্রজাবৃন্দের মত থানার সবাই আসিয়া জড়ো হইল। আমি 'জেরা' ধরিলাম,—

—আচ্ছা, বল্ ত, তোকে কে পাঠালেন? তোর বাবা, মা, না তোর ঐ দিদিমণি, বুঝলি কি না ঐ আমার স্ত্রী।

—পাঠালেন ত বাবা, মাও নিকটে দাঁড়িয়েছিলেন। দিদিমণির সঙ্গে আসবার আগে আর দেখাই হয় নি।

—তবেই মরেছ রে ব্যাটা! তিনি তবে কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন শিগ্গীর ক'রে ব'লে ফেল!

জমাদার বাবু—শিগ্গীর ক'রে বল ত বাপু!

—তা আমি মোটেই জানি নে। তবে বাবা, মা কি অবস্থায় কোথা থেকে হুকুম দিলেন তা বলতে পারি বটে।

—বেশ, তাই বল্ দিকিন ! শিগ্গীর !

জমাদার বাবু—তাই ব'লে ফেল।

—আজ সকালবেলায় ঘুম ভাঙতে-না-ভাঙতেই ডাক পড়ল—রজনী, রজনী ! হাত-মুখ তখনও ধুতে পারি নি। দৌড়ে গেলাম মায়ের কোঠায়। বাবু আমাকে দেখে নড়ে-চড়ে পাশ ফিরে শুলেন, মা পাশ থেকে ঘোমটা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাবু জোরে হাই তুললেন, হাতের দশ-দশটি আঙুল মটকালেন, তার পরে আস্তে আস্তে ভারী গলায় বললেন,—রজনী, যা একটু গোয়ালন্দিধী,—এখনকার ষ্টীমারেই যা, জামাই বাবু'কে নিয়ে আয়। বলবি—বাবা আপনাকে অবশ্যই যেতে বলেছেন।

"শ্বশুর ভারী অসুস্থ, এক মাসের বিদায় চাই"—বলিয়া 'তার' লেখা হইল। জমাদার বাবুরা দুই জন, সিপাই গণ্ডা-তিনেক—সবাই "আমি 'তার' করে আসি," "নেই হাম যাতে হ্যায় দৌড়কে" বলিয়া যে কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিল তাহাতে আমার প্রতি তাহাদের অটল শ্রদ্ধা না হউক তাহাদের উপর আমার যে অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। রজনী আমার বিরক্তিপূর্ণ রক্তিম চাহনি দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে বাসায় লইয়া গিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা লইয়াও খুব কাড়াকাড়ি টানাটানি পড়িয়া গেল।

বিছানা, ট্রাঙ্ক্ বাক্স মালপত্তর ইত্যাদি কম ত নয় ? সাজাইয়া-গুছাইয়া ষ্টেশনে আসিতে প্রায় নয়টা বাজিয়া গেল। ষ্টীমার তখনও দেখা দেয় নাই। মাষ্টার বাবু 'চেয়ার' 'চেয়ার' করিয়া অস্থির, শীঘ্র জোগাড় করিতে না পারিয়া নিজের আসনই ছাড়িয়া দিলেন।

বসিয়া সিগারেটের উল্টোদিকটা ধরাইয়া ফুঁকিতে ফুঁকিতে হাকিয়া ডাকিলাম, "রজনী, ব্যাটা এদিকে আয় ত ছুটে।"

বেচারা পিছনে মাথা গুঁজিয়া ছিল, ভয়ে ভয়ে আসিয়া বলিল, "বাবু !"

—তোর মণিমালা দিদি কিছুই ব'লে দেন নি ?

—বাবু, না, তাঁর সঙ্গে ত দেখাই হয় নি ?

—বলিস্ কি ? কালও হয় নি।

—কাল বিকেলে, কি একটা কাজের জন্ত ডেকেছিলেন, মুখচোখ তাঁর একটু ভারী বোধ হচ্ছিল।

—ব্যাটা গরু ! আসবার সময়ে আবার একটু দেখাও ক'রে এলি নে ?

—বাবু, না,—বাবা আমায় যে তাড়া ক'রে পাঠিয়ে দিলেন, তাতে ত আমি ছুটো মুখেও দিয়ে আসতে পারি নি।

শ্বশুর-মহাশয়ের এই অযথা তাড়াহুড়ার জন্ত তাঁহাকে ধন্তবাদ দিতে পারিলাম না। অসুস্থ মন লইয়াই ষ্টীমারে উঠিয়া পড়িলাম।

ইণ্টার ক্লাসের টিকিট হইলেও ফার্ষ্ট ক্লাসটা দখল করিয়া লইতে আর বেগ পাইতে হইল না। রজনীকে মালপত্তরের পাহারায় রাখিয়া গিয়া কেবিনে শুইয়া পড়িলাম।

'জেরা' করিয়া অন্ত সব ক্ষেত্রে সুফল পাইয়া থাকিলেও এক্ষেত্রে কেমন যেন উল্টো ফলই ফলিল। শ্বশুর-মহাশয়ের হাইতোলা—দশ-দশটি আঙুল মটকানো—মণিমালার চোখ মুখ ভারী—উঃ—কিছুই ত হদিস্ মিলে না ! ইহার উপর ছারপোকার কামড়ে একেবারে ছটফট করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম এ ক্লাসের যাত্রীরা নেহাৎ 'ভালমানুষ' হিসাবে বোকা, তাহা না হইলে তাহারা ষ্টীমার কোম্পানীকে ভাড়া এবং ছারপোকা মাকড় ও জোঁককে গায়ের রক্ত দিতে কিছুতেই সম্মত হইত না।

৪

পরদিন সকালবেলায় খুলনা ষ্টেশনে পৌছিয়া জেটি পার হইতে-না-হইতেই "বাবা অনিল, এই যে তুমি এসেছ ?—এই ঘোড়াগাড়ী—রজনী গাড়ীটা ডাক্ত"—ইত্যাদি চীৎকার করিতে করিতে স্বয়ং শ্বশুর-মহাশয় দর্শন দিলেন। তাই ত—লোক না-পাঠালে কি আর তোমার আসা হত ?—আচ্ছা, আচ্ছা, থাম, পদধূলিটুলি নেওয়াটা, ও পূর্ব্বকালের অমার্জ্জিত প্রথা—বলি শরীর ভাল ত ?

গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিলাম,—আজ্ঞে হ্যাঁ, এক রকম ভালই—তবে মনে অশান্তি—এই যা ! বাড়িতে কারুর অসুখ-বিসুখ নেই ত ?

দোলা খাইতে খাইতে—না ; বালাই, সবাই বেশ আছে।

আমি···হঠাৎ সুখস্বপ্নে অচেতন হইয়া পড়িলাম। তাহা হ'লে ত তরুণী ভার্য্যার সহিত একমাস কালের অবিচ্ছিন্ন মিলন। সে যেন মূর্ত্ত হইয়া চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনে হইল গাড়ী মোটেই চলে না, হাঁকিলাম,—এই বেটা—চা—লা।

কিছু ক্ষণের জন্ত অন্তমনস্ক হইয়া পড়ায় গুরুজনের বক্তৃতার অনেকটা ধরিতেই পারি নাই। কেবল শিষ্টতার খাতিরে হাঁ বা না করিয়া যাইতেছিলাম। উত্তর ঠিক না হওয়ায়ই বোধ করি ক্ষেপিয়া গিয়া আমার হাতখানা ধরিয়া বেশ নাড়া দিয়া তিনি বলিলেন—বলি, শুনছ ত ? কাল রবিবার ও পরশু বন্ধ—এ দু-দিনেরই ছুটি নিয়ে এসেছ ত ? হঠাৎ মুখ শুকাইয়া গেল, সাহসে ভর করিয়া বলিয়া ফেলিলাম—ছুটি ত এক মাসেরই নিয়ে এসেছি। ব্যাপার গুরুতর বলেই মনে হয়েছিল। যাক্ [illegible]—

—ক্ষতি আর কিই বা হয়েছে ? ছুটি ক্যান্সেল ক'রে জয়েন্ ত করাই যেতে পারে। বিষয়টা একটু খুলেই

ব'লে ফেলি। কাল রাতে তোমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ হঠাৎ বললেন,—অনেক দিন জামাই বেড়াতে আসে নি। তাকে একবার আনাও না। আমি বললাম, সে কি করে হ'তে পারে? সে এখন নূতন চার্জ্জ পেয়েছে। কাজের যে ক্ষতি হবে। দেখ আমার মতে ছুটি-ফুটি ও-সব ঐ গোরাদের জন্যে। সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে ওরা আসে আর আমরা ত ধর না এই বাড়ি বসেই চাকরি করি। এই কত বছর জজের সেরেস্তাদারী করছি। ছুটি নিয়ে ব'সে থাকলে ত ওরা সবাই যা পারে লুটে নেবে। অসমর্থ হ'লে ত ওঁরাই আমাকে একেবারে ছুটি দিয়ে দেবেন। যত দিন শক্তি আছে—এই এসে পড়ল যে—রজনী তোর মাকে খবর দে—আমরা এসে পড়েছি।

শ্বশুর-মহাশয়ের পশ্চাতে পশ্চাতে ক্লান্ত দেহখানি ও বিরক্তভরা মুখখানি লইয়া বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলাম। শাশুড়ী-ঠাকুরাণীকে আর প্রণাম করাও হইয়া উঠিল না। নিতান্ত অশোভন না হইলে হয়ত বেতখানি অনর্থক রজনী বেচারার পিঠের উপর দিয়া চালাইয়া দিতাম। শাশুড়ী বলিলেন,—কি বাবা অসুখ-বিসুখ হয় নি ত? চেহারা ত একেবারে ছাই হয়ে গেছে—

—হ্যাঁ—একটু খারাপই লাগছে—বলিয়া যেন কাঁদিয়াই ফেলিলাম।

বাধা দিয়া,—ও কিছু নয়, ষ্টীমারের ঝাঁকানিতে একটু খারাপ লাগেই—এক্ষুনি সেরে যাবে—তুমি না-হয় একটু চা খেয়ে আরাম কর গে, আমার আফিসের সময় হয়ে এল—বলিয়া শ্বশুর মহাশয় সরিয়া পড়িলেন।

ভিন্ন একখানি সুসজ্জিত কামরায় শুইয়া পড়িয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। মণিমালার আসিতে দেরি হইতেছিল। ভাবিলাম—কপাল! এরা বুঝি সবদিকেই সমান! মেয়েটিকে আফিসে নিয়ে যান্ নি ত?

হঠাৎ অলঙ্কারের রুনুঝুনু শব্দে চারিদিক মুখরিত হইল। বুঝিলাম—প্রিয়তমার আগমন। অভ্যর্থনা করিবার মত উৎসাহ আর হইল না, রাগ তখনও পড়ে নাই।

নিজেকে নিজেই ইণ্ট্রোডিউস করিতে বা বোধ করি বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল, বলিল,—উঃ তাই ত মা বললেন তোমার শরীর খারাপ! মাথা ধরেছে কি? জলপটি বেঁধে দেব? য়্যাস্পিরীন আনব? স্নান ক'রে নেবে?—না থাক, পাখাটা নিয়ে আসি গে।

ফিরিয়া আসিয়া হাওয়ার চোটে চাদর ও রুমাল উড়াইয়া দিয়া অভিমানের সুরে কহিল,—কে বলেছিল তোমায় অসুখ নিয়ে আসতে? আমার পোড়া কপাল! নইলে এমন হবে কেন?

অভিমানে অভিমান আনে, তাই এত ক্ষণে উত্তর দিলাম,—না গো না, তোমাদের কড়া তলবে আসতে হ'ল। শরীর ভালই ছিল, মনে করেছিলাম এখানে কারুর অসুখ-বিসুখ হয়েছে। কিন্তু তোমরা ত দেখছি দিব্যি চলাফেরা করছ। অসুখের অজুহাতে এক মাসের ছুটি নিয়ে এলুম, তা কারুর অসুখ-বিসুখ না থাকলে আমাকেই অসুস্থ হ'য়ে পড়তে হবে। না-হয় শিগ্গীর ফিরে যেতে হ'বে।—তোমার বাবা হুকুম করেছেন।

—কেন, লোকে কি শুধু গাধার মত খাটবেই বার মাস? বেড়াতে নেই, আমোদ-প্রমোদ নেই? এ কি রকম? নাঃ, তোমাকে একটি মাস থেকে যেতেই হবে। তুমি তার জন্যে ভেব না।

ক্ষণিকের জন্য আশ্বস্ত হইয়া প্রিয়তমার অনভ্যর্থনার ক্ষতিপূরণ করিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পরে দুপুরটা এক রকম ভালই কাটিল।

শ্বশুর-মহাশয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হইয়াছে ঘোষণা করার অপরাধে রজনীকে তিরস্কার করিয়া উঠিলাম। আবার দুর্ভাবনা আসিয়া জুটিল। তাঁহার সহিত পূর্ব্বে এত আলাপের সুযোগ হয় নাই, এবার তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধির যে বহর দেখিলাম তাহাতে সমস্যা জটিল বলিয়াই মনে হইল। তবে মণিমালার আশ্বাস?—সে ত নিতান্ত মেয়েমানুষ! জজ-সাহেবের সেরেস্তাদার ও থানার বড় দারোগার মধ্যকার ব্যাপারে তার হাত আর কত দূর থাকিতে পারে?

৫

শ্বশুর-মহাশয় পাশের ঘরে ঢুকিয়া কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে শাশুড়ী-মাতাকে বলিলেন,—দেখ, জামাই মাত্র দু-দিনই এখানে আছে—খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত যেন একটু ভালই হয়।

আমি মনে মনে বলিলাম,—তার বদলে একটু বিষ খাইয়ে দিন না কেন?

চটীজুতা পায়ে দিয়া চট-চট করিয়া এ ধারে আসিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, এখন ত বেশ লাগছে? চেহারা দেখেই ত বুঝতে পাচ্ছি। বেশ, চল একটু চা খেয়ে নিই গে।

সমস্ত শরীর তখন রাগে পুড়িয়া যাইতেছিল। দম বন্ধ করিয়া চক্ষু মুদিয়া সমস্ত মুখখানি জোরে বিকৃত করিয়া বলিলাম,—মোটেই নয়, মাফ করবেন। চা খাবার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। খাবই না।

অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও হারিয়া গিয়া শেষে চায়ের দোষকীর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—চা খাই বলেই যে ওটার প্রশংসা করব তা নয়। ওটার দোষ রয়েছে অনেক। বেশ, নাই খেলে এবেলা। রাত্রে একটু দুধ-রুটীর বন্দোবস্ত দেখা যাবে। কাল সকালে নিশ্চয় দেখবে দিব্যি সেরে গেছে। যদি না-যায় তবে—ও মণিমা, ও মণিমা আমার—বক্তৃতা আর ভাল লাগিল না, তাই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম।

বল না

—।

কেবল মে

না, বাবা মা

সময় অতি

করিলাম, শেষে হ

এত লোক থাকিতে?

মাকে চট্ ক'রে খবর দে।

বিছানার পাশে সকলের জড়ে

হইল না। কেহ বলিল মূর্চ্ছা গেছে,

সোনার চাঁদকে রাহুতে ধরেছে বলিয়া কতকটা কাঁ

ফেলিল।

আমার শুধু দুঃখ হইল, এ বাড়িতে এত লোক থাকিতে আমার কেবল আর এক দিনেরই সঙ্গিনীকে ভূতে ধরিল।

—ভাল শরীরে হঠাৎ মূর্চ্ছা গেলে তাকে ভূতে-ধরা ছাড়া আর কিই বলিব—বলিয়া আক্ষেপের সহিত মন্তব্য প্রকাশ করিলাম।

শ্বশুর-মহাশয় তখন আসিয়া পড়িয়াছেন। সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া আমাকেই উদ্দেশ করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন,—ভূতে যদি ধরেই থাকে, তা হ'লে বাবা, তুমিই গোয়ালদিঘী থেকে ভূত সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছ। কি বল তুমি, মণির মা! এ বাড়িতে ত আর কখনও এ বালাই এসে জোটে নি। এখন ওঝা ডাকাই, না ডাক্তার?

বিরক্তি চাপিয়া গম্ভীর গলায় বলিলাম, ভাল ডাক্তার—আর যদি পাওয়া যায় তবে লেডী ডাক্তার ডাকাইয়া রোগ নির্ণয় করাই ভাল।

—আ-রে বলেছ ভাল। ঐ প্রিয় ডাক্তার আর তার ঐ মোটা বৌটি—দু-জনেই একসঙ্গে রোগী দেখে বেড়ায়। যাও না বাবা রজনীকে সঙ্গে ক'রে—একবার তাদের নিয়ে এস দৌড়ে। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু তারা রোগীর সম্বন্ধে আগেই যত খুঁটিনাটি প্রশ্ন করেন 'জেরা' করেন তার উত্তর তুমিই দিতে পারবে বেশী।

প্রিয় ডাক্তার বারান্দায় বসিয়া আনমনে কি একটা কাগজ পড়িতেছিলেন। আমি সিঁড়ির তলায় পৌছিতেই

হিসাব

ফুসফুস

তবে কথা

আমি ত বাহ

শ্বশুর-মহাশ

বলিলেন,—তা হ

তবে রজনী—

প্রিয়বাবু বাধা দিয়

দিন চ'লে গিয়েছে। নিজে

হ্যা, কি ক'রে ধরতে পা

রোগের পূর্ব্বকার ইতিহাসটা

ধরেছি। ঐ যে সেদিন তোমা

আবার একটা নূতন রোগ দেখা দিয়েছে, 'লাভ্ষ্ট্রোক্'। এক্ষুনি প্রেস্ক্রিপ্শন ক'রে দি

এক টুকরো কাগজ।

কাগজ লইয়া ইংরেজীতে লিখিলেন,—"

ইন্ বোটল্ ডি লিউক্"—"সেণ্ড ওয়ান্ য়্যা

বলিলেন, শীগ্গীর একটি লোক পাঠিয়ে দিন নিয়ে আস্তে। আমার ডিস্পেন্সারী ছাড়া অন্য মিলবে না।

এখন

...ধের দাম
...ীক উঠিয়া
না দেখিয়া
...টি ৮॥৹ টাকা

কৃত্রিম হাসির ভান
বেশ করেছ ? তা হিসেব
...য় দিতে হবে না, অর্দ্ধেকটা
...মী ও বাবা হিসেবে আমার ও
...ণমালার সমান দাবি। যাও, এখন
...বিবার কিছু নেই, ওষুধটা একটু খাইয়ে দাও গে !

...খাস্
...ডাক্তার-
...মত হ'তে
...—ধরুন না ও
...টেছে।—"স্ত্রীর
...খ হয়েছে, ছুটে
...বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত ঘটেছে,
...হ-বিবাদ ত স্বামি-স্ত্রীর
...—তাতে ক'রে আমার ত
কখনও সংজ্ঞালোপ বা রোগ-
...নার হাতে যখন কেস্ গিয়েছে
। জামাই বাবু তাহ'লে কালই
...ওঁর নূতন চার্জ্জ ! সেবা-শুশ্রূষা ত
...নবে আমাদের করতেই হবে।—কি বলুন ?
...গায়ের রক্ত আবার ফুটিয়া উঠিল, মনে হইল
...য়া গিয়া উঁহার ধরিয়া ফেলি !
...বু বৃদ্ধের দিকে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিয়া ঝঙ্কার
...লেন,—আপনার মতামতে আসবেই কি আর
...কি ? চিকিৎসাশাস্ত্রের আপনি জানেনই বা কি ?
...গের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাই বেশী দরকার। ওঁকে
...র দিন এখানে থাকতেই হবে এবং এই যে ওষুধটা
পড়ল এটি আমার নিজের তৈরি, মনে করেছি

৬

ঔষধ খাওয়ান আমার একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইল। তিন-চার দিন অন্তর ডাক্তারেরা আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন এবং একই ঔষধের পুনর্ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মণিমালার মনস্তুষ্টিসাধন—অনুপান বা আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাস্বরূপ—আমাকেই করিতে হইবে পুনঃ পুনঃ আদেশ দিয়া যাইতেন।

মণিমালা বলিল—শরীর ত আমার একটু অসুস্থ হয়েই ছিল, কিন্তু তা ব'লে তুমি চিকিৎসার ঘটা ক'রে এত টাকা উড়োবে নাকি ? যাও, আমি ভাল হ'য়ে গিয়েছি।

আমি বলিলাম,—তুমি বল্‌লে ত হবে না ! তোমাকে ডাক্তারী আইনের চক্ষে সেরে উঠতে হবে। টাকা ত ভারী জিনিষ, তোমার নিকটে থাকতে পারছি, এর মূল্য কি কম ?

সময়টা বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। তেইশ-চব্বিশ দিন পরে ডাক্তারবাবু লিখিয়া পাঠাইলেন, তাঁহাদের আর আসিতে হইবে না। ঔষধটি মাঝে মাঝে এক ডোজ দিলেই হইবে।

এবার নিজেই শ্বশুর-মহাশয়ের সমীপে প্রস্তাব করিলাম,—ভগবানের ইচ্ছায় মণিমালার শরীর ত বেশ ভালই হয়ে গেছে। এবার যাত্রার উদ্যোগ করি ?

—হ্যাঁ যাবে বইকি ? মণির মা, মণির মা, দেখ ত এদিক,—হ্যাঁ বাবা, তুমি মোট কত টাকা ব্যয় করেছ ? ৫২৲ টাকা ?—হ্যাঁ, মণির মা, দেখ ত অনিলের ছাব্বিশটি টাকা দেওয়া যায় কি না ? না হয়ত আসছে মাসের মাইনে পেলেই

পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। ওর হাতে টাকাও যা আমার হাতেও তা।

—কেন দেওয়া যাবে না? এই আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি,—বলিয়া শ্বশ্রূমাতা উদারতার পরকাষ্ঠা দেখাইলেন।

মাসের শেষে বিদায় লইতে গিয়া মণিমালার ছল ছল চোখ দুটি দেখিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলাম। হাতখানি বুকে টানিয়া লইয়া বলিলাম,—প্রিয়তমে, কেন? তুমি ত তোমার কথা রেখেছই,—একটি মাস বেশ কেটে গেল। এখন আসি! তোমার শিক্ষাতেই ত এমন অভিনয় করতে পারলাম।"

—হ্যাঁ, আসবে বইকি? একটি মাস বইত নয়?—আচ্ছা, কথা দাও,—যত দিন তোমার ওখানে বাসা তৈরি না হয়, তার মধ্যে আর অন্ততঃ একবার এসে বেড়িয়ে যাবে। বল, কথা দাও!

হঠাৎ শ্বশুর-মহাশয়ের অভিমত ও হাবভাব মনে পড়িয়া গেল, রাগিয়া উঠিয়া বলিলাম,—কথা দিতুম বইকি? কিন্তু তোমার বাবা ত ভুলেও আর খরচ পাঠাবেন না, আর এমনি এলে অভ্যর্থনা যে কেমন করবেন তা'ত দেখলেই।—

ব্যথিত সুরে মণিমালা কানের কাছে মুখটি আনিয়া বলিল—তবে সে সময়ও আসবে না?

শ্বশ্রূমাতার নিকট বিদায় লইয়া আসিয়া এবার শ্বশুর-মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত হইলাম। তিনি খড়ম পায়ে দিয়া তাঁহার ঘরের মধ্যে পাইচারি করিতেছিলেন, বোধ করি আমি অবশেষে বিদায়ই লইতেছি সেই সুখে! আমি প্রণাম করিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—বেঁচে থাক বাবা, সুখে থাক,—ধন, গৌরব দুই-ই তোমার হউক,—হ্যাঁ, বাবা বুড়ো মানুষের কথাটা মনে রেখ—এ বয়স খাটবার আর উপার্জ্জনের। একনিষ্ঠ হ'য়ে এবার কাজে লাগবে।—আর, তোমায় আমরাও বিরক্ত করছি না—

—আজ্ঞে, হাঁ, আর শীগগীর ছুটিও মিলবে না! তবে—

—ও চিঠিপত্রে খোঁজখবর নেবে ও দেবে। এখান থেকে বেশী দূরও ত নয়?

—না ভাবছি কি—তবে, মণিমালার ডেলীভারির সময়টায় একটু বিশেষ যত্ন নেবেন। ঐ ডাক্তারই ওর স্ত্রীকে নিয়ে এসে দেখে যাবেন। আমি ওখান থেকে খোঁজ নেব।

চমকিয়া—না, না, র'সো, একটু ভেবে দেখছি—বলিয়া খানিকক্ষণ চোখ মুদিয়া রহিলেন, বলিলেন—না, তবে বাবা, তুমিই এসে প'ড়ো। ব্যাপারটা ত কিছুই নয়। তবে কি জান? ভয় করি ঐ রোগ-টোগের। আবার দেখলে ত? প্রিয়বাবুর পেটেণ্ট ওষুধগুলির দাম? তা বাবা, তুমিই হিসব রাখবে ভাল! ভেব না, অর্দ্ধেক খরচ ত আমিই দেব। বোঝাপড়াটা কেবল ঐ ডাক্তারের সঙ্গে, তুমিই না-হয় সবটা কর। মনে থাকে যেন আবার এসো।

—আজ্ঞে, তবে আসাই যাবে। এখন আসি।

—আচ্ছা বাবা, এস, রজনী ও রজনী, আমার জামাটা দে ত। ষ্টেশনে ওকে দিয়ে আসি।

ষ্টীমার বাঁশি দিয়া ছাড়িয়া দিল। শ্বশুর-মহাশয় তখনও পাড়ে দাঁড়াইয়া রুমাল ঘুরাইয়া বলিতে লাগিলেন—মনে থাকে যেন। আবার ছুটি নিয়ে এস গো—এসে ···

আলোচনা

"ভারতে লিপি-সমস্যা"

পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের "ভারতে লিপি-সমস্যা" পড়ে যে দুই-একটি কথা জানাবার ব'লে মনে করি, তাই জানাচ্ছি। ভারতীয় 'অক্ষর'গুলির জটিলতা স্বীকার্য্য—অতএব তার সংস্কারও কাম্য। কিন্তু রোম্যান লিপি গ্রহণে আমাদের কি কি বাধা আসতে পারে তাই এখানে জানাতে চাই।

১। প্রথম কথা হচ্ছে দুইটি পৃথক পৃথক বর্ণ নিয়ে যে একটি বর্ণ বুঝাবে—ঘ = gh ; ঠ = th ; থ = th প্রভৃতি, তাহাকে সরলতর করা উচিত। অর্থাৎ ঘ ঠ থ প্রভৃতি বর্ণগুলিকে এক একটি পৃথক পৃথক বর্ণ বিশেষ দ্বারা সূচিত করা উচিত। দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বর্ণ মিলে যে কি ক'রে একটি বর্ণ সৃষ্টি করল তা মনে আসতে পারে। যেমন, গ (g) আর হ (h) মিলে 'ঘ' ইত্যাদি।

আমাদের ভাষা যে এই রূপকে সহ্য করতে পারে নি তার প্রমাণ হচ্ছে, ক+ষ = ক্ষ ; ম+হ = হ্ম ; জ+ঞ = জ্ঞ প্রভৃতি দুইটি পৃথক বর্ণ মিলে যখনই একটি বিশেষ ধ্বনি সৃষ্টি করেছে, তখনই তারা হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেনের মিলনের মত এক বিশেষ পৃথক রূপ পেয়েছে। তাই এই সব যমজ বর্ণ মিশে গিয়ে একটি বিশেষ রূপ পাবে ইহাই বাঞ্ছনীয়।

২। আমাদের বর্ণমালার যে যে উচ্চারণ সেই সেই বর্ণমালাই থাকিল, কেবলমাত্র নূতন সংস্করণে ঐগুলিকে অন্য ভাবে লিখব—এই ত হচ্ছে নূতন সংস্কারের মূল কথা? অর্থাৎ আমরা 'কাকা'কে Kaka লিখব। এখানে একটি কথা আসছে, যে, আমাদের ছেলে-মেয়েরা এই নূতন কাকাকে (Kaka) বানান করবে কি ক'রে! এত দিন যে 'ক'য় আকারে কা, 'ক'য় আকারে কা = কাকা ছিল, 'কাকা'র সেই 'কার'গুলি বুঝি আর থাকে না। অবশ্য না-ই যদি থাকে তার জন্য আমার আফশোষ নেই! কিন্তু এই নূতন Kakaর যে বিপদটুকু তাই বল্‌লাম।

৩। আমাদের প্রতিলিখনের অনুযায়ী লিখতে হবে 'বই লও'র জায়গায় 'bai lao', এইখানে আরও একটু মুস্কিল আছে। আর সে মুস্কিলই একটু বিশেষ। তা হচ্ছে এই যে, আমাদের ব্যঞ্জনবর্ণগুলি সবই 'অ'কারান্ত। অন্য অনেক ভাষার ব্যঞ্জনগুলি হ'তে আমাদের ব্যঞ্জনগুলির এই বিশেষ। সুতরাং আমাদের 'প্রতিলিখনে' এই সব 'অ'কারান্ত ব্যঞ্জনগুলির 'অ' লোপ পাবে। কেননা, যখনই 'ব'র পরে 'অ' হবে, তখনই তা দেখিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ 'ba' দিয়ে 'ব' লিখতে হবে। পূর্ব্বে যে আমাদের 'ব'র ভিতরেই ব+অ ছিল এখন আর তা রাখা যাবে না ; আর তা-ই যদি না যায়, তবে আমাদের ব্যঞ্জনগুলির নামও বদলাতে হবে। অর্থাৎ সব ব্যঞ্জনগুলির 'অ'কারান্ত নাম না হয়ে হসন্ত বা ঐ রকমই কিছু হবে।

তখন আমাদের প্রতিলিখনের ফ ph, ল l, ক k, ন n, ট t, প্রভৃতিকে এফ্, এল্, কে, এন্, টি প্রভৃতি ব'লে ডাকতে হবে। এতটা স্বীকার করবার স্পর্দ্ধা রাখলেও নিস্তার নেই—আবার সন্ধির ভীতি আছে। বর্ণমালার এই নূতন নামকরণে সন্ধিকে ভাষা থেকে বিসর্জ্জন দিতে হবে। তাই এই সব দেখে মনে হয়, আমাদের রোম্যান লিপি নেওয়ার পথে বাধা কম নয়। তুরস্কের কেমাল পাশা যে নিজের দেশে সংস্কার করেছেন তাতে বেগ পেতে হয় নি তাঁকে, কেন-না, রোম্যান বর্ণমালার মতই বোধ হয় আরবী বর্ণমালা 'অ'কারান্ত ধ্বনি পায় না। সুতরাং 'বে'র স্থলে 'বি' b নেওয়া সহজ হয়েছে। জার্ম্মান দেশের গথিক বর্ণমালার সম্বন্ধেও আমার জ্ঞান নেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস সেগুলিও রোম্যান বর্ণমালার মত 'অ' ধ্বনি পায় না ; সুতরাং জার্ম্মানরা গথিক ছেড়ে রোম্যান সহজেই নিতে পারছে।

কিন্তু আমাদের বেলা এই বিপদকে পেরিয়ে যাওয়া অসম্ভবও হ'তে পারে। তাই বাংলা লিপির যুক্তবর্ণ দূর ক'রে অক্ষর কমিয়ে আমাদের সংস্করণ চলে কিনা দেখা উচিত।

শ্রীসুধীরচন্দ্র আচার্য্য

১। মুদ্রাযন্ত্র, টাইপরাইটার, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধার জন্য ভারতীয় বর্ণমালার যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক ইহা স্বীকার করি।

২। ভারতীয় বর্ণমালাসমূহের আদি সংস্কৃত বর্ণমালা যে রোমক বর্ণমালা অপেক্ষা অনেক বেশী বিজ্ঞানসম্মত ইহা সুবিদিত। এরূপ অবস্থায় রোমক বর্ণমালা গ্রহণ করিতে যাওয়া পশ্চাদ্‌বর্ত্তন হইবে মাত্র।

৩। সুতরাং বোঝা যাইতেছে যে, সংস্কৃত বর্ণমালার ত্রুটিগুলি অপসারণ করিয়া পরিবর্ত্তিত আকারে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। ইহা অতিশয় সহজসাধ্য। কতিপয় সহজ চিহ্নের সাহায্য লইয়া মাত্র একাদশ বর্ণদ্বারা সমুদায় সংস্কৃত ব্যঞ্জনবর্ণ এবং মাত্র পাঁচটি বর্ণদ্বারা সমুদায় স্বরবর্ণ প্রকাশ করা যাইতে পারে।

৫। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে, অন্তবর্ণ বাদ দিলে, ক, চ, ট, ত, প এই পাঁচটি বর্গীয় প্রত্যেক বর্ণ একটি মূল শব্দের উচ্চারণের গাঢ়ত্ব ভেদ মাত্র। কেবল মাত্র পাঁচটি মূল বর্ণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া চিহ্নের সাহায্যে অপর সমুদয় বর্ণগুলি প্রকাশ করা যাইতে পারে। বর্গীয় সমুদয় অন্ত্যবর্ণগুলি চিহ্নের সাহায্যে কেবলমাত্র একটি বর্ণদ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। আবার 'ট' ও 'ত'কে মূলতঃ একই শব্দের উচ্চারণের গাঢ়ত্ব ভেদ ধরিয়া, চিহ্নের সাহায্যে সমুদয় বর্ণ কেবল মাত্র একটি বর্ণ সাহায্যে প্রকাশ করা যাইতে পারে। অন্য সকল বর্ণ সম্বন্ধেও উপযুক্ত উপায় খাটে।

৬। অধ্যাপক মহাশয় ঐতিহ্য ও "সেন্টিমেন্টে"র কথা একেবারে ভুলিয়াছেন। এগুলি এত তাচ্ছিল্যের বিষয় মনে করি না।

শ্রীউমাদাস গুপ্ত

শ্রীসুধীরকুমার আচার্য্য যে-কয়টি বাধার কথা উল্লেখ করেছেন সে-বিষয়ে এই বলা যেতে পারে :—

১। খ, ঘ, ছ, ঝ ইত্যাদির জন্য পৃথক বর্ণ উদ্ভাবন করার প্রয়োজন

কিছু নেই, কেন-না, প্রতি বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্গের ধ্বনি ১ম ও ৩য় বর্গের সঙ্গে 'h' অর্থাৎ 'হ' ধ্বনি, যোগ ক'রে সহজেই প্রকাশ করা যায় এবং এখনও করা হয়, যেমন, কামাখ্যা Kamakhya। ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়েও 'ক' ও 'হ' ধ্বনি মিলিত হয়ে 'খ' ধ্বনিই হয়, উচ্চারণ ক'রে দেখলে সহজেই সেটা বুঝা যাবে। এই 'h' ধ্বনিকে aspirate বলা হয় এবং এই অনুসারে 'খ'কে aspirated 'ক', 'ঘ'কে aspirated 'গ', ইত্যাদি বলা যেতে পারে। পুনশ্চ, বর্গগুলির ২য় ও ৪র্থ বর্গের জন্য নূতন বর্ণ উদ্ভাবন করতে গেলে আমাদের বর্ণমালার এখন যে জটিল অবস্থা তাই থাকবে, কোন লাভ হবে না; তাছাড়া রোম্যান অক্ষরের যে সরলতার কথা আমার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি সেটা রক্ষা করা যাবে না।

২। বানান করার অসুবিধা অসংযুক্ত বর্ণের সময়ে বিশেষ কিছু হবে না, এখন যে ভাবে হয় তাই হবে এবং 'কার' ও 'ফলা'ও থাকবে, কেবল অ-কারান্ত ব্যঞ্জন ভিন্ন অন্য ব্যঞ্জনের পরের স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ এখনকার মতই 'কার' ও 'ফলা' ক'রে বানান করতে হবে। যুক্তবর্ণের বানানেও তাই, যদিও প্রথম প্রথম এক এক স্থানে কিছু অসুবিধা হওয়া সম্ভব; ক্রমে ক্রমে এ-সব অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা সহজেই করা যেতে পারে।

৩। কোন অক্ষরের নাম বা উচ্চারণ পরিবর্ত্তন করার আমি পক্ষপাতী নই এবং প্রয়োজন মনে করি না। অক্ষর-পরিচয়ের সময় এখন আমরা যে-ভাবে পড়ি সেই ভাবেই k, kh, ইত্যাদিকে ক, খ, পড়া হবে, কেবল লিখার সময় অ-কারান্ত ব্যঞ্জনগুলির পরে 'a' অর্থাৎ অ-কার, প্রকাশ করতে হবে; যেমন, কখন=kakhana। 'হসন্ত' প্রকাশের সময় হসন্তের চিহ্ন (্) বর্ত্তমান আকারে ব্যবহার করা শ্রেয় মনে হয়; ছাপার সময়ে 'হসন্ত' একটি পৃথক typo হবে, লেখার সময়ে 'হসন্ত'-অক্ষরে 'a' অর্থাৎ অ-কার না দিয়ে নীচের দিকে হসন্তের টান দিলেই হবে। এরূপ হ'লে 'সন্ধি' নিয়ে কোন অসুবিধা থাকবে না।

শ্রীউমাদাস গুপ্ত যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন সে-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য :—

১। মনে হয় গুপ্ত মহাশয় 'বর্ণ' ও 'ধ্বনি', এই দুটিকে মিলিয়ে ফেলেছেন; এই ভয়েই আমার প্রবন্ধে পাঠকদের দৃষ্টি এ-বিষয়ে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছিলাম। 'সংস্কৃত (?) বর্ণমালা'কে সকলে বিজ্ঞান-সম্মত ব'লে স্বীকার করেন এই জন্য যে পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষার ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলিকে এরূপ সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সাজান দেখা যায় না। এই ধ্বনিক্রমের জন্য এর এত প্রশংসা, কিন্তু বর্ণ বা অক্ষরের আকারের জন্য নয়। আমার প্রবন্ধে এই ধ্বনিক্রমের কোন ব্যতিক্রম আমি প্রস্তাব করি নি, বরং রোম্যান লিপিতেও এই ক্রমরক্ষার কথাই বলেছি, সুতরাং প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন 'পশ্চাদ্‌বর্ত্তন' নয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সংস্কৃতের স্বর-ধ্বনিক্রম-সম্পর্কে এ প্রশংসা চলে না, কারণ ইহা কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সাজান নয়।

২। 'সংস্কৃত বর্ণমালা'র যে ত্রুটিগুলির উল্লেখ আমার প্রবন্ধে করেছি সেগুলির অপসারণ সম্ভব নয়।

৩। একাদশটি বর্ণদ্বারা কতকগুলি 'সহজ চিহ্নে'র সাহায্যে তিনি যে বর্ণমালা উদ্ভাবন করতে চান, সেটা না দেখলে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা যায় না। তিনি যদি ঐ বর্ণমালা প্রস্তুত ক'রে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করেন তবেই সকলে বিচার ক'রে দেখবার সুযোগ পাবেন যে সেটা চলতে পারে কিনা। এই বর্ণমালা উদ্ভাবনের সময় প্রবন্ধে আদর্শ লিপির যে বিশেষত্বের কথা বলা হয়েছে, সেগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

৪। ঐতিহ্য ও সেন্টিমেণ্টকে আমি তাচ্ছিল্য করি না। কিন্তু কখনও কখনও এমন অবস্থা উপস্থিত হ'তে পারে যখন এগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব নয়। লিপিসংস্কার সেই প্রকার একটি বিষয় ব'লে মনে হয়। তাছাড়া, গুপ্ত-মহাশয় চিহ্নাদি সাহায্যে যে নূতন অক্ষর প্রচলিত করতে চান তাতেও কি ঐতিহ্য ও সেন্টিমেণ্টের আপত্তি আসতে পারে না?

শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী

বাণীবন বালিকা-বিদ্যালয়

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন

বাণীবন কথাটা উল্লেখ করিবামাত্র যাঁহার নাম লোকের মনে পড়ে, তিনি কর্ম্মবীর পরলোকগত এককড়ি সিংহরায় মহাশয়। যাঁহারা জানেন তাঁহারা বলেন, "বাণীবন বললে এককড়ি বাবু এবং এককড়ি বাবু বললে বাণীবন বুঝায়।" একথা কত লোকের মুখে যে শুনিয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। এই বিদ্যালয়টি তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় প্রথম তাঁহার বাড়ির বারান্দায় শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত বসু মহাশয়ের শিক্ষকতায় ১৯০০ সালে আরম্ভ করা হয় এবং বর্ত্তমান সুন্দর পাকা বাড়িটিও তাঁহার ও স্বর্গীয় হারাণচন্দ্র সিংহরায়ের প্রদত্ত জমির উপরই প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং এজন্য অর্থসংগ্রহ করিতে যাঁহারা খাটিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, স্বর্গীয় এককড়ি বাবু ও বর্ত্তমান লেখক অগ্রণী ছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য নিজেও অনেক টাকা এজন্য দান করিয়াছেন। পাকাবাড়ি তৈরি করিবার সময় স্বর্গীয় এককড়ি সিংহরায় মহাশয় ঐ স্কুলের সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁহার উপর নির্ভর করিয়াই বালিকাদের জন্য বোর্ডিং স্থাপন করা হয়। ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে তাঁহার মত অক্লান্ত-কর্ম্মীর আবশ্যক। ভগবান সেরূপ কর্ম্মী আনিয়া দিন।

বাণীবন স্কুলটির কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের নামের মধ্যে ব্রাহ্মবালিকা-বিদ্যালয়ের ট্রেনিং-বিভাগের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বালিকা-বিদ্যালয়ে যখন Standard Examination প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বাণীবন বালিকা-বিদ্যালয় হইতে প্রথম স্বর্গীয় এককড়ি বাবুর জ্যেষ্ঠাকন্যা সুষমা দাস ও স্বর্গীয় হারাণ বাবুর কন্যা পরলোকগতা অমিয়া সিংহরায়কে পরীক্ষা দিতে পাঠান হয়। তখন এই প্রবন্ধ-লেখক স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। ইহার পরই Miss L. Brook যিনি সেই সময় স্কুলের Inspectress ছিলেন—স্কুল পরিদর্শন করিতে আসেন এবং ইহার কার্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। ফলে সেই সময় হইতে Grant-in-aid পাওয়া যায়। প্রবন্ধ-লেখক ও স্বর্গীয় এককড়ি সিংহরায়ের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন, এম-এ, ইহার সম্পাদক হন এবং ৯ বৎসরকাল সম্পাদকের কার্য্য করেন। এই স্কুলে যাঁহারা প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে স্বর্গীয় ক্ষিরোদচন্দ্র দাস মহাশয়ের কথা। স্বর্গীয় মণিলাল মল্লিক, স্বর্গীয় অনাথবন্ধু সরকার, স্বর্গীয় হরিমোহন ঘোষাল, স্বর্গীয় কিশোরীমোহন দাস বড়ুয়া ও শ্রীযুক্ত বনমালী প্রামাণিকও ইহার প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন।

ভারতে মনঃসমীক্ষা

শ্রীহিরণ্ময় মুন্সী

গত পৌষ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে শ্রীসুবোধচন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় 'ভারতে মনঃসমীক্ষা' বিজ্ঞানের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে লেখক মনঃসমীক্ষা বিজ্ঞান বিষয়ে আর একখানি বইয়ের নাম উল্লেখ করেন নাই। সে বইখানি অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের 'মনের পথে,' ১৩৩৩ সালে পাবনা সৎসঙ্গ হইতে প্রকাশিত হয়।

"পাটের বদলে অন্য ফসল"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পৌষ মাসের 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে "পাটের বদলে অন্য ফসল" শীর্ষক অনুচ্ছেদে যাহা লেখা হইয়াছে সে-সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

চীনাবাদাম বেলে, বেলে দোয়াঁশ ও দোয়াঁশ জমিতে উৎপন্ন হয়; বেলে দোয়াঁশ ও দোয়াঁশ জমিতে পাটও জন্মে; এইরূপ উঁচু জমিতে বগী পাট জন্মে; সুতরাং বগী পাট চাষ কম করিবার জন্য যে-সকল উঁচু বেলে দোয়াঁশ ও দোয়াঁশ জমি (অর্থাৎ যাহার উপর জল দাঁড়ায় না) উদ্বৃত্ত থাকিবে সেই সকল জমিতে চীনাবাদামের চাষ করা যাইতে পারে। চীনাবাদাম বৎসরে দুইবার অর্থাৎ শীতকালে ও বর্ষাকালে রোপণ করা যাইতে পারে।

তামাক শীতকালের অর্থাৎ রবি-ফসল; পাট বর্ষাকালের অর্থাৎ খরিস্‌-ফসল; শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে পাট উঠাইয়া পাটের জমিতে তামাকের ফসল করা যাইতে পারে।

পাটের বদলে রবিশস্যের ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে বলিলে ভুল বলা হইবে; রবি-ফসল সম্বন্ধে যে পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে পাটের বদলে রবিশস্যের ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই। পাটের দাম কম হওয়ার জন্য কৃষকদিগের যে আর্থিক ক্ষতি হইতেছে তাহা তাঁহারা রবিশস্যের আবাদ বাড়াইয়া ও নূতন নূতন লাভজনক রবিশস্যের চাষ করিয়া কতক পরিমাণে পূরণ করিতে পারেন; এই উদ্দেশ্যেই রবি-ফসলের চাষ সম্বন্ধে কৃষকদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

বিক্রমপুর—একালে ও সেকালে*

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

[যখন আড়িয়ল পল্লীমণ্ডলের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি-পদ গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, তখন মনে করিয়াছিলাম, ব্যাপার বুঝি সাহিত্য-সম্মিলন বা ঐরূপ কিছু, তাই সহসা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার সাহস করিয়াছিলাম। তার পর আড়িয়ল পল্লীমণ্ডলের প্রথম দশ বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া দেখিলাম, এই মণ্ডলের মাণ্ডলিকগণ কেবল গ্রন্থাগার, মূর্ত্তি সংগ্রহ, পুঁথি সংগ্রহ, বিদ্যালয় পরিচালন করিয়া ক্ষান্ত নহেন, বুদ্ধিমান লোকেরা যাহাকে বলে কাজের কাজ এমন অনেক কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া ইঁহারা সফলতা লাভ করিয়াছেন। ব্যাঙ্কস্থাপন, চোর-ডাকাতের হস্ত হইতে গ্রাম-রক্ষণ, ব্রতীদল ও সেবা-সমিতি গঠন, এমন কি পদব্রজে ভূপর্য্যটনের ব্যবস্থাও আপনারা করিয়াছেন। মণ্ডলাচার্য্য বা মহামাণ্ডলিক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় চিনি ও তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য গ্রামের মধ্যে কল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আপনারা আপনাদের পল্লীর সকল প্রকার উন্নতসাধনে রত; আর আমি আমার পল্লী হইতে পলায়িত; সুতরাং আপনাদের সমাজে অপাংক্তেয়। এইরূপ অপাংক্তেয় ব্যক্তিকে আপনারা কেবল পংক্তিতে নহে, আপনাদের পংক্তির প্রথম আসনে বসাইয়াছেন। এই জন্য যে আপনাদিগকে কি বলিব তাহা আমি বুঝিতে পারি না; কিন্তু দু-দিনের জন্য এই পলাতককে যে আপনাদের সৎসঙ্গ লাভের সুযোগ দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।]

বর্ত্তমান যুগে নগর পল্লীর গৌরব অপহরণ করিয়াছে। কিন্তু এক সময় পল্লীই ছিল দেশের সর্ব্বস্ব। আমাদের সভ্যতা পল্লীর সভ্যতা, নগরের অনুপযোগী। নগরের আশ্রয় লইয়া এই সভ্যতা ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। পল্লীর অনেক দোষ ছিল, কিন্তু অনেক গুণও ছিল। এখনকার হিসাবে, পল্লীসমাজের প্রধান দোষ, জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা। কিন্তু পল্লীতে যেমন জাতিভেদ আছে, তেমন জাতিভেদ নাই বা ছিল নাও বলা যাইতে পারে। কারণ, পল্লীতে জাতিভেদের সঙ্গে তাহার প্রতিষেধকও ছিল। নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন প্রকাশ্য ভাবে নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, তখন নবদ্বীপের কাজী তাহা নিষেধ করিয়াছিলেন। এই নিষেধাজ্ঞার উত্তরে বিরাট এক দল কীর্ত্তনিয়া লইয়া গিয়া নিমাই কাজীর বাড়ি চড়াও

* আড়িয়ল পল্লীমণ্ডলের দশম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ।

করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' (আদিলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদ, ১৪৮-১৫০) লিখিয়াছেন, কাজীসাহেব তখন বাড়ির বাহির হইয়া নিমাইকে বলিয়াছিলেন—

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সেই সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥

এখনও আমাদের গ্রাম হইতে গ্রাম সম্বন্ধ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। এখনও গ্রামের আচরণীয় হিন্দু, অনাচরণীয় হিন্দু, এবং মুসলমান পরস্পরকে চাচা, খুড়া, মামু, ভাই, ভগিনী, পিসী, মাসী বলিয়াই সম্বোধন করে, এবং ঝগড়ার সময় পর্য্যায় লঙ্ঘন করিয়া গালি দেওয়া বিশেষ অপরাধজনক মনে করে। এই গ্রাম-সম্বন্ধে গ্রামের বিভিন্ন জাতির লোককে আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। গ্রামের সকল অধিবাসী আদৌ একই বংশোদ্ভব এইরূপ সংস্কারও বোধ হয় গ্রাম-সম্বন্ধের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। জাতিভেদ, লঘু-গুরু-ভেদ, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-ভেদ, এইরূপ বিবিধ বৈষম্যের অন্তরালে একপ্রকার সাম্যও এক সময় ছিল। প্রভুর পুত্র বয়োজ্যেষ্ঠ ভৃত্যকে রীতিমত সম্মান করিত; এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ভৃত্য কনিষ্ঠ প্রভুপুত্রকে অভিভাবকের মত শাসন করিত। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি'তে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ির ভৃত্যতন্ত্র-শাসনের চিত্র আছে। এই চিত্র প্রীতিকর নয়। কিন্তু অন্যপ্রকার ভৃত্যতন্ত্র-শাসনের সহিতও আমাদের পরিচয় আছে। এইরূপ শাসনের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে, প্রভু-ভৃত্যে, ধনী-নির্ধনে এখন যত ভেদ তখন তত ভেদ ছিল না। প্রকৃত জাতিভেদের উৎপত্তি হইয়াছে এখনকার শহরে। শহরে গ্রাম-সম্বন্ধের বন্ধনমুক্ত জাতিভেদ ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সভ্য-অসভ্য ভেদের সহিত মিলিত হইয়া বিকট আকার ধারণ করিয়াছে। পল্লীগ্রামে অপরিচিত দীন ব্যক্তিকেও "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করা হয়। শহরে আসিয়া পাশ্চাত্য ফ্রেটারনিটি বা ভ্রাতৃত্ব-মন্ত্রে দীক্ষিত আমরা এইরূপ "ভাই" ডাক ভুলিয়া গিয়াছি। দেশের লোকের প্রকৃতি এবং দেশাচারের মর্ম্ম-অনভিজ্ঞ-সমাজ-সংস্কারকগণ শহরের সমাজের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতেছেন। শহরের সামাজিক ব্যাধির বিষ ক্রমশঃ পল্লীতে সংক্রামিত হইতেছে। এমন সময় ভোট-বাটোয়ারার এবং শাসন-পরিষদে আসন-বাটোয়ারার বিতণ্ডা উপস্থিত হওয়ায় আমাদের এক সময়ে গ্রাম-সম্বন্ধের একতাসূত্রে সম্বদ্ধ সমাজ ত্রিখণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য প্রস্তুত। এই দুর্য্যোগে দেশনায়কগণ এদেশের জনগণের মধ্যে অনৈক্য স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া লইয়া ঐক্যস্থাপনের জন্য নানা প্রকার বিদেশী ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন। ইঁহারা আপনাকে পর করিয়া লইয়া পরহিতের তৃপ্তি ও খ্যাতি লাভ করিতেছেন; স্বজনকে হরিজনে পরিণত করিয়া হরিভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। আমাদের পল্লীসমাজে এই যে অনৈক্যের এবং অন্তর্দ্রোহের সূত্রপাত হইতেছে, ইহার পরিণাম চিন্তা করিতে গেলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

পল্লীসমাজের অন্তরে যখন এই অন্তর্দ্রোহের সূচনা হইতেছে, তখন আবার বাহির হইতে রাজদ্রোহের তাপ আসিয়া সমাজকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রধান প্রতিষ্ঠান নিরস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় যুবক সশস্ত্র বিদ্রোহ—অলক্ষিতভাবে রাজপুরুষ হত্যা আরম্ভ করিয়াছিল। নিরস্ত্র বিদ্রোহ আপাতত স্থগিত আছে এবং সশস্ত্র বিদ্রোহেরও বিরাম দেখা যায়। গুপ্ত সশস্ত্র বিদ্রোহের অপকারিতা এবং নিষ্ফলতা সম্বন্ধে অনেক বহুদর্শী এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু এদেশে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন-ক্ষেত্রে সকল প্রকার চরম পন্থার অনুপযোগিতা সম্বন্ধে আমার একটি কথা বক্তব্য আছে।

দেশের মুক্তি সকলেরই প্রার্থনীয় এবং এই মুক্তির জন্য দেশবাসী মাত্রেরই সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদের মুক্তির দাবি যে অসঙ্গত নহে এ-কথা সরকারও স্বীকার করিয়াছেন; কালে আমাদিগকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সালোক্য মুক্তি (Dominion Status) দান করিবেন এরূপ আশাও দিয়াছেন। সুতরাং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দোষের কথা নহে এবং মুক্তির বিলম্ব ঘটিলে অধৈর্য্য হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু অধৈর্য্য হইয়া চরম পন্থা অবলম্বন করিলে এদেশে লাভের অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক মনে হয়। রাষ্ট্রীয় মুক্তিসাধনের

গুরু য়ুরোপীয়গণ আরিষ্টোটলের সংজ্ঞা অনুসারে মানুষকে মনে করেন রাষ্ট্রীয় জীব (political animal), অর্থাৎ তাঁহারা বিশ্বাস করেন, মানুষের সুখ-দুঃখ অনেকটা রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। কিন্তু হিন্দু-সাধারণ তাহা মনে করে না। হিন্দু-সাধারণ মনে করে, মানুষ কর্ম্মফলের হাতের ক্রীড়াপুতুল; এই কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য সে পুনঃ পুনঃ জন্মে এবং পুনঃ পুনঃ মরে। এই পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণের হাত হইতে মুক্তি বা মোক্ষলাভ করা মনুষ্য-জীবনের প্রধান লক্ষ্য। মোক্ষ অবশ্য সহজলভ্য নহে এবং প্রকৃত মুমুক্ষুর সংখ্যা কখনও খুব বেশী হইতে পারে না। গীতাকার বলিয়াছেন—

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।

হাজার হাজার লোকের মধ্যে এক-আধজন সিদ্ধির (মোক্ষের) চেষ্টা করে। কিন্তু হিন্দু-সাধারণের মধ্যে যাহারা মোক্ষের জন্য চেষ্টা করিতে অসমর্থ, তাহারাও ঐহিক ব্যাপারে অনেক সময় অর্দ্ধবিরাগী; দৃষ্ট বিষয় অপেক্ষা অদৃষ্ট তাহাদের মনকে অধিক আকর্ষণ করে। এইরূপ সংস্কারসম্পন্ন জনগণকে ঐহিক মুক্তির জন্য চরম পন্থায় পরিচালিত করা অসাধ্য মনে হয়। কথায় বলে, "গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা না মিলে এক।" পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার ফলে এদেশে কতক জন চরম পন্থার নায়ক অভ্যুদিত হইতেছেন এবং হইবেন। কিন্তু কর্ম্ম-জন্মান্তরে বিশ্বাসী জনসাধারণের পক্ষে দীর্ঘকাল তাঁহাদের অনুসরণ করা অসম্ভব। যত দিন না হিন্দু-সাধারণের মনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তত দিন তাহারা য়ুরোপীয় জনসাধারণের মত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে সম্পূর্ণ মাতিতে পারিবে না। কিন্তু সেদিন বোধ হয় অনেক দূরে। এইরূপ অনধিকারী শিষ্য-সম্প্রদায় লইয়া চরম পন্থা অবলম্বন করিতে গেলে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং আমাদের দেশের যে-সকল যুবক-বৃদ্ধের মনে রাষ্ট্রীয় ভাব জাগরিত হইয়াছে তাঁহাদিগকে সংযত হইয়া, জনসাধারণ যতটা বেগে তাঁহাদের সঙ্গে অগ্রসর হইতে পারে ততটা বেগে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাঁহারা যদি ধীর পদে অগ্রসর হইতে সম্মত হন তবে পূর্ণ স্বরাজ না হউক স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন।

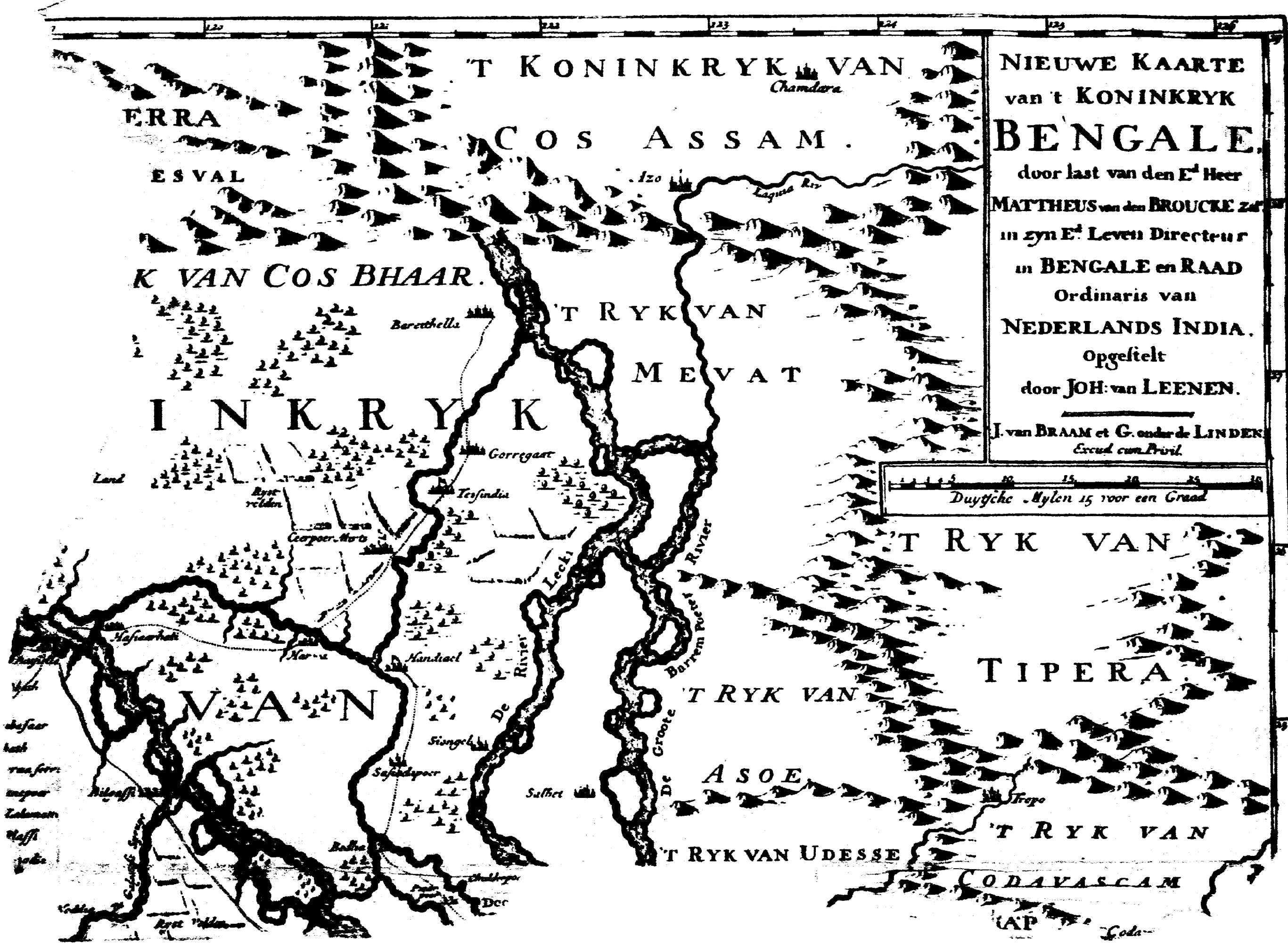
কিন্তু ধীর পদে চলিতে হইবে বলিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও লক্ষ্য বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। লক্ষ্য অবশ্য আমাদের মাতৃভূমির উপর মুক্তিমণ্ডপ-গঠন। মুক্তিমণ্ডপ-গঠনের বিলম্ব হয় হউক; কিন্তু যে-ভূমির উপর মুক্তিমণ্ডপ গঠিত হইবে সেই ভিত্তিভূমির বাটোয়ারা হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। সম্প্রদায়ভেদ বা জাতিভেদ অনুসারে শাসন-পরিষদের আসন বাটোয়ারা করিলে মুক্তিমণ্ডপের ভিত্তিভূমি খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। যদি আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ এবং 'অনাচরণীয়' হিন্দু ভ্রাতৃগণ হিন্দু ভদ্রলোককে বিশ্বাস করিতে না পারেন, সকল আসনই তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; রাগ করিয়া নয়, অভিমান করিয়া নয়, কাহারও অসুবিধা জন্মাইয়া নয়, সানন্দে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তথাপি বাটোয়ারায় সম্মত হওয়া উচিত নহে।

বাঙ্গালার যে-সকল ভদ্রসন্তান দেশগতপ্রাণ তাঁহাদের কাজের অন্ত নাই। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কাজ, বাঙালীর জন্য বাঙ্গালার সম্পদ (natural wealth) বা আর্থিক স্বরাজ রক্ষা। শৈশবে আমরা একটি হেঁয়ালি শুনিতাম—

"বল ত পৃথিবীটা কার বশ।"

হেঁয়ালির উত্তর ছিল—"পৃথিবী টাকার বশ।"

জনসমাজে সম্পদের সাম্যবাদী কার্ল মার্কস দেখাইয়া গিয়াছেন, মানবের ভাগ্যচক্র অর্থের দ্বারা পরিচালিত। মার্কসের ব্যাখ্যাত এই তত্ত্বের নাম ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা (economic interpretation of history)। টাকা শুধু টাকশালে মুদ্রিত টাকা নহে; যে-সকল বস্তুর দ্বারা বা যে-সকল উপায়ে টাকা উপার্জ্জন করা যায় তাহাও টাকা। যে-দেশের টাকা-উপায়ের সকল পথ বিদেশীর হাতে, সে দেশের মুক্তি অসম্ভব। বাঙ্গালার টাকা-উপায়ের অধিকাংশ পথই এখন বিদেশী বা ভিন্ন প্রদেশীর হস্তগত। উচ্চজাতীয় হিন্দুরা ইংরেজের আমলে চাকুরী, ওকালতি, ডাক্তারী প্রভৃতি পেশার মোহে চাষবাস, শিল্প-বাণিজ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং সঞ্চিত অর্থের দ্বারা জমিদারী খরিদ করিতেছিলেন। ফলে বাঙ্গালার সম্পদ—কয়লার খনি, পাটের বাজার, চা-বাগান, কল-কারখানা, দোকান-পসার পরহস্তগত হইয়াছে। তন্মধ্যে এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা দেশবাসীর জন্য রক্ষা করিতে না পারিলে দেশের কোন প্রকার মুক্তিই সম্ভব হইবে না।


NIEUWE KAARTE
van 't KONINKRYK
BENGALE,
door last van den Ed. Heer
MATTHEUS van den BROUCKE zal:
in zyn Ed. Leven Directeur
in BENGALE en RAAD
Ordinaris van
NEDERLANDS INDIA.
Opgestelt
door JOH: van LEENEN.
J. van BRAAM et G. onder de LINDEN
Excud. cum Privil.
Duytsche Mylen 15 voor een Graad
'T KONINKRYK VAN
Chamdara
COS ASSAM.
ERRA
ESVAL
K VAN COS BHAAR.
'T RYK VAN
MEVAT
INKRYK
VAN
Barethella
Gorregaat
Tesfindia
Land
Cerpoer Merts
Masiaarhati
Harua
Handiael
Siongel
Safiadpoer
Bilonsse
Badha
Salhet
Dec
Izo
Laqua Riv.
Lecki
De Rivier
De Groote Barrem Poeter Rivier
'T RYK VAN
TIPERA.
'T RYK VAN
ASOE
'T RYK VAN UDESSE
Trepo
'T RYK VAN
CODAVASCAM
AP
Coda

ভদ্রলোকের হস্তগত চাকুরী এখন করিবেন মুসলমান এবং অনাচরণীয় হিন্দুগণ। তাঁহারা যে শীঘ্র চাকুরীর এবং শাসন-পরিষদে আসনের মোহ কাটাইয়া দেশের সম্পদরক্ষার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার অবসর পাইবেন এরূপ আশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালার অবশিষ্ট সম্পদ রক্ষার ভার এখন অপর হিন্দুদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তাঁহারা এ ভার বহনে অসমর্থ হয়েন তবে শাসন বিষয়ে অন্তরাজ অপেক্ষা গুরুতর বিপদ, ধনসম্পদের ক্ষেত্রেও আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অন্তরাজ হইতে হইবে। শাসনবিধিসংস্কার হঠাৎ আমাদের জন্য নূতন অবস্থার (environmentএর) সৃষ্টি করিয়াছে। এরূপ নূতন অবস্থার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে হইলে (adaptation to environment) অবকাশের দরকার। সে অবকাশ আর পাওয়া যাইবে না। সুতরাং আর সকল কর্ম্ম, আর সকল আন্দোলন, ত্যাগ করিয়া আর্থিক পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। নতুবা যে ভদ্রলোকই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তাহা নয়; তাঁহাদের প্রতিবেশী মুসলমান এবং অন্য জাতীয় হিন্দুগণও কালে অধঃপাতে যাইবে। আড়িয়ল পল্লী-মণ্ডলের মণ্ডলীগণ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং শ্রীধর মিল প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিক্রমপুরে আর্থিক মুক্তির প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। সমস্ত বিক্রমপুরবাসীর, বিশেষতঃ স্বদেশগতপ্রাণ যুবকগণের, অনন্যকর্ম্মা হইয়া এই আদর্শের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

বড়ই আনন্দের বিষয়, আপনারা ব্যাঙ্ক এবং মিল করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, দেশবাসীর দৈহিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনের মুক্তির (intellectual emancipationএর) জন্য পুস্তকালয়, প্রাচীন পুঁথিশালা, এবং চিত্রশালাও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিক্রমপুরের প্রত্নসম্পদের দিকে প্রথমতঃ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তার পর ঢাকা মিউজিয়মের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী অনেক রত্ন উদ্ধার করিয়া ঢাকার চিত্রশালায় সঞ্চিত করিয়াছেন, এবং তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী পুস্তকে আরও অনেক রত্নের পরিচয় দিয়াছেন ইতিহাস বিক্রমপুরের এই দুই জন সুসন্তানকে বিস্মৃত হইবে না। আড়িয়ল চিত্রশালায় সংগৃহীত মূর্ত্তিসমূহকে শ্রীযুক্ত রমেশ বসু মহাশয় দ্বাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্য নিদর্শন বলিয়া মনে করেন। এরূপ অনুমানের কারণ, বিক্রমপুরে প্রাপ্ত এই ধরণের কোন কোন মূর্ত্তিতে দ্বাদশ শতাব্দীর অক্ষরের লিপি পাওয়া গিয়াছে। বিক্রমপুরে যে-রকমের সূর্য্যমূর্ত্তি পাওয়া যায়, ঠিক এই রকমের একখানি সূর্য্যমূর্ত্তি ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। এই মূর্ত্তির পাদপীঠের লিপির অক্ষরের উপর সরল মাত্রা নাই; প্রত্যেক লম্বমান রেখার অগ্রভাগ একটু চেপ্টা পেরেকের মাথার মত। এইরূপ লিপিযুক্ত মূর্ত্তিকে দশম শতাব্দীর পরে ফেলা যায় না। সুতরাং আড়িয়ল চিত্রশালার এই সকল মূর্ত্তিকে গৌড়ের পালশিল্পের নিদর্শন ভিন্ন বড় বেশী কিছু বলা কঠিন। আড়িয়ল হইতে সংগৃহীত এবং ঢাকা জীবনবাবুর বাড়ি রক্ষিত লক্ষ্মণ সেনের তৃতীয় বর্ষের লিপিযুক্ত চণ্ডীমূর্ত্তি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, দ্বাদশ শতাব্দের চতুর্থ পাদ পর্য্যন্ত এই মূর্ত্তিশিল্প সজীব ছিল।

এদেশের সকল পদার্থেরই গুণাগুণ বিচারের বিচারালয় এখন য়ুরোপে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দে আমাদের প্রাচীন মূর্ত্তিশিল্প বর্ব্বরতার নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইত। বর্ত্তমান শতাব্দে সেই মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এই মত পরিবর্ত্তনের মূলে পরলোকগত হেবেল সাহেবের ১৯০৮ সালে প্রকাশিত ভারতীয় ভাস্কর্য্য এবং চিত্র বিষয়ক পুস্তক। হেবেলের দৃষ্টান্ত প্রথম অনুসরণ করেন ডাক্তার কুমারস্বামী। তার পরের ঘটনা সম্বন্ধে সার উইলিয়ম রোটেনষ্টাইন তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—

"Later, when Havell returned to England, he, Coomaraswamy and I went to hear a lecture by Sir George Birdwood, who, while praising her crafts denied fine art to India; the noble figure of Buddha he likened to a noble suet pudding! This so disgusted me that, there and then, I proposed we should found an India Society. A meeting was held at Havell's house, and with the support of Dr. and Mrs. Herringham, Thomas Arnold, W. R. Lethaby, Roger Fry, Dr Thomas, T. W. Rolleston and others the new society was formed." (*Men and Memoirs*, 1903—1922. Vol. 2, p. 231.)

১৯১০ সালে ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং অনেকে সার জর্জ্জ বার্ডউডের প্রকাশ্য প্রতিবাদও করিয়াছিলেন। তদবধি পাশ্চাত্য রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভারতের প্রাচীন মূর্ত্তির আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

ধ্যান-ধারণা-সমাধিতে আধ্যাত্মিক ভাবের চরম বিকাশ লক্ষিত হয়। আমাদের দেশের ভাস্কর দেবদেবীর এবং বুদ্ধ ও জিনের মূর্ত্তিতে ধ্যান-ধারণা-সমাধিকে মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সার উইলিয়ম রোটেনষ্টাইন বলিয়াছেন, ভারতীয় শিল্পী তিনটি মহাভাবকে রূপদান করিতে সমর্থ হইয়াছে।

(১) The plastic interpretation of *samadhi* সমাধির রূপের সৃষ্টি।

(২) জগৎসৃষ্টিকারিণী মহাশক্তির প্রচণ্ড লীলা যে ঐকতান বাদ্যের তালে তালে চলিতেছে তাহার প্রকাশ। নটরাজের মূর্ত্তি।

(৩) The intepretation in material form of a moment between movement and tranquillity গতিশীলতার এবং শান্ত অবস্থার সন্ধিক্ষণের রূপ। ইহার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় দাক্ষিণাত্যের শিল্পে।

প্রাচীন ভারতের মূর্ত্তিশিল্পের কি ইহা ছাড়া আর কোন গুণ নাই? রোটেনষ্টাইন ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পের যে-সকল গুণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা symbolic meaning বা সাঙ্কেতিক অর্থের সামিল। ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্প কি কেবল সঙ্কেত মাত্র? ইহার রূপের কি কোন স্বতন্ত্র মহিমা বা সার্থকতা (formal meaning) নাই? মূর্ত্তিশিল্পের এই সকল গুণ রূপকে সার্থকতা দান করে—সজীবতা, নিরেট বস্তুর দর্শন এবং স্পর্শ সুখের অনুভূতি, এবং গুরুত্বের অনুভূতি। দৃষ্টান্তস্বরূপ আড়িয়ল চিত্রশালার কল্কিমূর্ত্তির উল্লেখ করিব। মূর্ত্তির মুখ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, পাষাণ যেন স্বতঃস্ফীত হইয়া অশ্বে এবং অশ্বারোহীতে পরিণত হইয়াছে। অশ্বের সুগোল পৃষ্ঠ এবং গ্রীবা দর্শকের স্পর্শ-সুখ জাগাইয়া দেয়। আরোহীর এবং অশ্বের গুরুত্ব সহজেই অনুভূত হয়। আরোহীর বক্ষস্থল, বাহু এবং জানুর গড়ন নয়নমনের তৃপ্তিকর। চারিটি বাহুর বিন্যাসে সুসঙ্গতি রহিয়াছে। আড়িয়ল চিত্রশালায় যে কয়খানি মূর্ত্তি আছে তাহার কোন খানিই নির্জ্জীব নহে, এবং কোনখানিরই আকার একেবারে অর্থহীন নহে। এই সকল মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় বিক্রমপুরবাসী সেকালে আধ্যাত্মিক হিসাবে কত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাঁহাদের রুচি কত মার্জ্জিত ছিল, এবং তাঁহাদের অনুভূতি কত সূক্ষ্ম ছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত গৌড়মণ্ডলের সার্ব্বভৌম পালনরপালগণের কোন লিপি এ-পর্য্যন্ত বিক্রমপুরে পাওয়া যায় নাই; পক্ষান্তরে চন্দ্র, বর্ম্মা এবং সেন রাজগণের তাম্রশাসনে বিক্রমপুর স্কন্দাবারে বাসের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে মনে হয়, পালযুগে বিক্রমপুর একটি খণ্ডরাজ্য ছিল। এই খণ্ডরাজ্যের অধিপতিগণ গৌড়াধিপের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। আমার অনুমান হয়, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত এই খণ্ডরাজ্য কখনও করদ, কখনও স্বাধীনরূপে বর্ত্তমান ছিল, এবং সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কর্ত্তৃক কেদার রায়ের পরাজয়ের এবং নিধনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অবসান হয়। কেদার রায়ের পরাজয়ের দিন বিক্রমপুরের জীবনসন্ধ্যা। তার পর হইতে ধ্বংসলীলা চলিতেছে। কীর্ত্তিনাশা পদ্মার দক্ষিণ তীরে বিক্রমপুরের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে; এখনও প্রবাদ আছে, এই কীর্ত্তিনাশা এক সময় একটি সরু খাল মাত্র ছিল। বিক্রমপুরের জীবনসন্ধ্যায় বিক্রমপুর যে কত বড় ছিল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দের অঙ্কিত বাঙ্গালার দুইখানি মানচিত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

(১) মেথুজ ভেন ডার ব্রুকের ম্যাপ। ভেন্‌ডার ব্রুক (Matheus van der Broucke) ১৬৫৮ হইতে ১৬৬৪ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় ওলন্দাজ (Dutch) বণিকগণের অধিনায়ক ছিলেন। ভেন্ ডার ব্রুকের ম্যাপের প্রথম সংস্করণ পাওয়া যায় নাই। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বেলেন্টিনের (Valentyn's) ইষ্ট ইণ্ডিয়া (East India) নামক পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে ব্রুকের ম্যাপের যে সংস্করণ আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে আনীত তাহার ফটোগ্রাফ প্রদর্শিত হইল। ভেন ডার ব্রুকের সময় কলিকাতা একটি

নগণ্য গ্রাম ছিল। বেলেন্টিনের প্রকাশিত ম্যাপের এই সংস্করণে কলিকাতার স্থানে সুতানুটী কলিকাতা (Collecatta) এবং কলকুল (Calcula) নামক তিনটি গ্রাম দেখা যায়। কলকুল গোবিন্দপুরের স্থলবর্ত্তী। এই তিনটি গ্রাম এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রাম বোধ হয় ভেন্ ডার ব্রুকের পরে চিহ্নিত হইয়াছে।

(২) খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দে বাঙ্গালা মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরাজ বণিকগণ তখন প্রজার হিসাবে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিত, সুতরাং জরীপ করিয়া ম্যাপ তৈরি করিবার তাঁহাদের অধিকার বা প্রয়োজন ছিল না। নদীপথে নৌকায় মাল চালান করিয়া তাঁহারা ব্যবসা করিতেন। মালের নৌকার মাঝিমাল্লার সুবিধার জন্য তাঁহাদের নদ-নদীর এবং আড়ঙ্গের ম্যাপ আবশ্যক ছিল। এই জন্য ভেন্ ডার ব্রুক ম্যাপ তৈরি করাইয়াছিলেন। ইংরাজ বণিকদেরও মালের নৌকার মাঝির সহায়তার জন্য ম্যাপসহ নদ-নদীর বিবরণ প্রকাশিত করা আবশ্যক ছিল। এই শ্রেণীর বিবরণীর নাম English Pilot, ইংরাজীনদীপথপ্রদর্শক। এইরূপ একখানি পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে।* এই পুস্তকে একখানি ম্যাপ আছে। তাহাতে লেখা আছে যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা ইহা প্রস্তুত করিয়াছে, এবং জন থর্ণটন কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের এক খণ্ড মাত্র লণ্ডনের নৌসেনা-বিভাগের বড় আফিসে (Admiraltyতে) আছে। সেখান হইতে ম্যাপের ফটোগ্রাফ আনা হইয়াছে।

এই দুইখানি ম্যাপে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। ভেন্ ডার ব্রুকের ম্যাপে নাম বেশী আছে; সুতরাং এই ম্যাপ হইতে বিক্রমপুর অংশের বিবরণ সংগৃহীত হইল।

বর্ত্তমানে শুষ্কপ্রায় করতোয়া নদীর খাতের পূর্ব্বতীরে ঘোড়াঘাট অবস্থিত। এই মানচিত্রে একটি নদীর পশ্চিমে ঘোড়াঘাট (Gerregaat) চিহ্নিত হইয়াছে। এই নদী



কল্কিমূর্ত্তি

অবশ্য করতোয়া, এবং ভ্রমক্রমে পশ্চিম পারে ঘোড়াঘাট চিহ্নিত হইয়াছে। এই ম্যাপে করতোয়া প্রবহমান। এখন আর করতোয়ার সেদিন নাই। সেকালে যে জলরাশি করতোয়ার খাত দিয়া প্রবাহিত হইত, এখন তাহা তিস্তার খাতে চলিতেছে।

পশ্চিমে করতোয়া এবং পূর্ব্বে শীতললক্ষ্যা (Lecki) এই দুই নদীর মধ্যভাগে আর কোন নদী চিহ্নিত হয় নাই; অর্থাৎ তখন তিস্তা আত্মপ্রকাশ করে নাই, এবং ব্রহ্মপুত্র নদের জলরাশি তখন যমুনার খাত দিয়া বহিতে আরম্ভ করে নাই। ব্রহ্মপুত্রের জলরাশি তখন কতক লক্ষ্যা দিয়া, এবং কতক লক্ষ্যার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত দিয়া গিয়া মেঘনায় পতিত হইত। শীতললক্ষ্যার এবং ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমের উত্তরে কাঠারব (Catterabo), এবং কাঠারবর রাজধানী সোণারগাঁও (Sonnergam)। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ঈশাখাঁ কাঠারবর অধিপতি ছিলেন। লক্ষ্যার পশ্চিম দিকে, একটি অল্পপরিসর নদীর তীরে বৃহৎ ঢাকা নগরী। এই নদী বোধ হয় বুড়িগঙ্গা। এই নদীর দক্ষিণে যে আর একটি অল্পপরিসর নদী আছে এই ক্ষুদ্র নদী কীর্ত্তিনাশার প্রাচীন খাত। এই নদীর অনেক দক্ষিণ দিয়া পদ্মার বিপুল জলধারা প্রবাহিত হইত। এই নদীর তীর হইতে লক্ষ্যার তীর পর্য্যন্ত কেদার-রায়ের রাজ্য

* *The English Pilot*: The Third Book, Describing, sea............Original Navigation, collected for the general benefit of our own countrymen. By John Seller, Hydrographer to the King.

বিস্তৃত ছিল। আমার অনুমান হয় এক সময় এই সমস্ত ভূভাগই বিক্রমপুর নামে পরিচিত ছিল।

ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি প্রাচীন খাত পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান যমুনার পথে প্রবাহিত হইয়া বিক্রমপুরকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে এবং কেদার-রায়ের কীর্ত্তিনাশ করিয়া কীর্ত্তিনাশা নামধারণ করিয়াছে। কীর্ত্তিনাশা কত যে সমৃদ্ধ গ্রাম ধ্বংস করিয়াছে তাহা গণনা করা অসম্ভব। কীর্ত্তিনাশার কীর্ত্তিনাশের এখনও বিরাম নাই। কালে বিক্রমপুরের উত্তর পারের চিহ্ন থাকিবে কি না সন্দেহ।

সুতরাং বিক্রমপুরবাসী আমাদের সকল দিকেই বিপদ। এই বিপদ হইতে মুক্তির পথও সুপরিচিত। এই পথে চলিবার শক্তির একটি উপাদান ভক্তি বা ভাবের টানেরও অভাব নাই। কিন্তু আমাদের এই ভক্তি শুদ্ধা ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি নহে। এই জটিল বিপজ্জাল অতিক্রম করিতে হইলে জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি বা ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানের আবশ্যক। এইরূপ জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি? এইরূপ জ্ঞান-লাভের উপায় জানিতে হইলে আড়িয়লের চিত্রশালায় বা অন্যান্য চিত্রশালায় যে-সকল উৎকৃষ্ট প্রাচীন দেব-দেবীর এবং বুদ্ধ জিনের প্রতিমা রক্ষিত হইয়াছে এই সকল প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। এই সকল প্রতিমা কেবল সজীব নহে, সবাক; প্রাণ পাতিয়া, অনুভূতির দ্বারা, ইঁহাদিগের বাণী শুনিতে পাওয়া যাইবে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। নারায়ণ অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান। তাঁহার মুখমণ্ডলে—

> কিঞ্চিৎ প্রকাশ স্তিমিতোগ্রতারৈ
> র্জ্র বিক্রিয়ায়াং বিরত প্রসঙ্গৈঃ।
> নেত্রৈ রবিস্পন্দিত পক্ষ্মমালৈ
> লক্ষীকৃতঘ্রাণমধো ময়ূখৈঃ॥

কুমারসম্ভব কাব্যে (৩।৪৭) কালিদাস ধ্যানমগ্ন শিবের চক্ষুর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বুদ্ধ ও জিনের মূর্ত্তির ন্যায় বিষ্ণুমূর্ত্তিতেও দেখা যাইবে, ঈষৎ-উন্মীলিত চক্ষুর তারার অধোমুখী রশ্মি নাসাগ্র লক্ষ্য করিতেছে। এইরূপ নয়নভঙ্গী ধ্যানমগ্ন মনের পরিচয় দেয়। সুতরাং পাষাণের বিষ্ণু দর্শককে নীরবে উপদেশ দিতেছেন, আমি যেমন ধ্যান করি, তুমিও তেমন ধ্যান কর।

হরগৌরীর যুগল মূর্ত্তিও সেই কথাই বলিতেছেন। গৌরীকে ক্রোড়ে করিয়া হর ধ্যানমগ্ন; হরের ক্রোড়ে বসিয়া গৌরী ধ্যানমগ্ন। আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন দেবদেবীর মূর্ত্তিতে দেখা যায়, ধ্যান কেবল বুদ্ধের বোধির, এবং জিনের কেবল জ্ঞানের নিদর্শন নহে; দেবতার দেবত্বের নিদর্শন ধ্যান; মানুষের মোক্ষলাভের উপায়ও ধ্যান। উপনিষদে, বেদান্তে, ভগবদ্গীতায়, সকল শাস্ত্রে মুমুক্ষুর জন্য ধ্যানই বিহিত হইয়াছে। এখন আমাদের মনে ঐহিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়াছে। এই মুক্তির মন্ত্র আসিয়াছে য়ুরোপ হইতে। কিন্তু এই মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলেও ধ্যান করিতে হইবে; একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে হইবে, মুক্তিলাভের উপায় কি। মুক্তির বাহ্য-আভ্যন্তর দুই প্রকার বাধাই আছে। আভ্যন্তরীণ বাধাগুলি অতিক্রম না-করিয়া বাহ্য বাধার সম্মুখীন হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আভ্যন্তরীণ বাধা যে কি তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না; ধ্যান করিলেই ধরা পড়িবে, এবং ধ্যান করিলেই তাহা অতিক্রম করিবার উপায় দেখা যাইবে। আমার বিশ্বাস, ধ্যানের পথ পরিত্যাগ করার ফলে হিন্দুদের অধঃপতন ঘটিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে মানুষের ইতিহাসকে কৃত (সত্য), ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগে বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং যুগে যুগে মানুষের শারীরিক মানসিক সকল প্রকার শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে; এবং মানুষের শক্তির ক্রমিক হ্রাস হিসাব করিয়া যুগে যুগে বিভিন্ন আচার বিহিত হইয়াছে। যথা বিষ্ণুপুরাণ (৬।২।১৫-১৮)—

> যৎকৃতে দশভির্বর্ষৈ স্ত্রেতায়াং হায়নেন যৎ।
> দ্বাপরে যচ্চ মাসেন অহোরাত্রেণ তৎকলৌ॥
> তপসো ব্রহ্মচর্য্যস্য জপাদেশ্চ ফলং দ্বিজাঃ।
> প্রাপ্নোতি পুরুষ স্তেন কলিঃ সাধ্বিতি ভাষিতম্॥
> ধ্যায়ন্ কৃতে, যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
> যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥

কৃতযুগে দশ বৎসরকাল তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, জপ করিলে যে-ফল পাওয়া যায়, ত্রেতাযুগে এক বৎসরকাল অনুষ্ঠান করিলে, দ্বাপরযুগে এক মাস অনুষ্ঠান করিলে, এবং কলিযুগে মাত্র এক দিবারাত্র অনুষ্ঠান করিলে সেই ফল পাওয়া যায়।

এই নিমিত্ত কলিযুগকে সাধু বলা হয়। কৃতযুগে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিয়া, দ্বাপরে দেবতার অর্চ্চনা করিয়া যে-ফল পাওয়া যাইত, কলিযুগে কেশবের সংকীর্ত্তন করিয়া সেই ফল পাওয়া যায়।

পারত্রিক মুক্তির ক্ষেত্রে কলিধর্ম্ম-পালন কতটা কার্যকরী তাহা বলা আমাদের অসাধ্য। আমাদের চিত্রশালায় রক্ষিত এবং প্রদর্শনীতে সজ্জিত ধ্যানমগ্ন প্রাচীন প্রতিমা দেখিলে মনে হয়, পালযুগে এবং সেন-যুগেও এদেশে কৃতযুগের পালনীয় ধ্যানই মুক্তির সোপান বলিয়া গণ্য হইত। বঙ্গালা দেশে ধ্যানমগ্ন চতুর্ভুজ বিষ্ণুর স্থানে বংশীবাদনরত গোপীনাথের পূজা এবং সংকীর্ত্তন বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে ষোড়শ শতাব্দে চৈতন্যের সময় হইতে। পারত্রিক ব্যাপারে যাহাই হউক, ঐহিক ব্যাপারে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্যগণের সংযম এবং সংগঠন শক্তি কলি উল্টাইয়া দিয়াছে। এখন আর্থিক ব্যাপারে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মুক্তিলাভ করিতে হইলে সত্যযুগের ধর্ম্ম ধ্যানে ফিরিয়া যাইতে হইবে; শুধু সংকীর্ত্তনে চলিবে না। ধ্যান করিলে জ্ঞানলাভ হইবে, এবং সেই জ্ঞানের আলো আমাদিগকে মুক্তির প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার মোহে আমরা আমাদের দেশ-কাল-পাত্র ভুলিয়া, পাশ্চাত্য মন্ত্রে মাতিয়া, উদ্‌ভট সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছি, এবং পদে পদে হুচট খাইয়া আহত হইতেছি। এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ধ্যান করা আবশ্যক।

পরিশিষ্ট

বলা বাহুল্য কলিকাতায় বসিয়া এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম। তার পর আড়িয়লে গিয়া যাহা দেখিলাম এবং শুনিলাম তাহা হৃদয়-বিদারক। যাহাদের শহরে গিয়া বাস করিবার সাধ্য আছে তাহারা এখন আর গ্রামে বাস করে না। ভদ্রলোকের মধ্যে যাহারা এখন গ্রামে বাস করে তাহাদের মুখে হাসি নাই, মনে আনন্দ নাই। ভীতির ছায়া অনেকের মুখের মলিনতাকে গাঢ়তর করিয়াছে। গ্রামের উপকণ্ঠে গোরা-সৈন্যের শিবির। গ্রামের অনেক যুবকই গৃহে আবদ্ধ। পুলিস এবং গোরা-সৈন্য রাত্রিতে গিয়া ইহাদিগকে দেখিয়া আসে। গোরা-সৈন্যেরা কোন অত্যাচার করে না। পথ না চিনায় এবং ভাষা না জানায় সময় সময় ইহারা গ্রামবাসীদিগের অসুবিধার সৃষ্টি করে এবং নিজেরাও অসুবিধা ভোগ করে। আড়িয়লের গোরা-সেনার অধিনায়ক খুব ভদ্র এবং অমায়িক। বিক্রমপুরে এইরূপ আটটি গোরা-সেনার শিবির আছে। প্রত্যেক শিবিরের অধিনায়ক এক জন লেফ্‌টেনাণ্ট, চারিটি শিবিরের অধ্যক্ষ এক জন কাপ্তান। আশা করিয়াছিলাম গত ১৫ বৎসর যাবৎ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ঢেউ যে-ভাবে পল্লীসমাজ আন্দোলিত করিয়াছে, তাহার ফলে পল্লীর ভদ্রলোকেরা অন্ততঃ দলাদলি ভুলিয়া একযোগে কাজ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, লোকশিক্ষার হিসাবে বিক্রমপুরের এই অংশে আন্দোলন নিষ্ফল হইয়াছে। গ্রাম্য দলাদলির ফলেও বোধ হয় অনেক হতভাগ্য যুবকের পরকাল নষ্ট হইতেছে। গ্রামবাসীর মধ্যে কেহই কাহাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না; কে যে বন্ধু, কে যে গুপ্তচর (spy), তাহা চেনা যাইতেছে না। কথায় বলে, "আঁধার ঘরে সাপ, সুতরাং সকল ঘরেই সাপ।" এইরূপ সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া বিক্রমপুরের পল্লীবাসী দরিদ্র ভদ্রলোকগণ অতি কষ্টে দিনযাপন করিতেছেন।]

কলিকাতায় প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

প্রবাসী শব্দটি নূতন নয়, পুরাতন। কিন্তু বাংলা দেশের বাহিরে যে-সব বাঙালী বাস করেন, তাঁহাদের প্রতি বিশেষণরূপে ইহার প্রয়োগ পুরাতন নয়। বোধ হয় চৌত্রিশ বৎসর আগে প্রয়াগে আমরাই এই মাসিকপত্রখানিতে এই প্রয়োগ চালাইতে আরম্ভ করি। তখন তর্ক উঠিয়াছিল এবং এখনও তা চলে, পরেও চলিতে পারিবে, যে, ভারতবর্ষ যখন আমাদের ভারতীয় মহাজাতির দেশ, তখন বাংলার বাহিরে অন্য সব প্রদেশকে প্রবাস বলা ঠিক নয়। ইহাও বলা যাইতে পারে, যে, যেহেতু "উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্," সেই জন্য পৃথিবীর কোন জায়গাই প্রবাস নয়, সব মানুষই আত্মীয়। অন্য দিকে চিরঞ্জীব শর্ম্মা গাহিয়াছেন—

> হরিবোল হরি, চল যাই বাড়ী, বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল।
> ফুরাল খেলা ভাঙ্গল মেলা, আর কেন বিলম্ব বল?
> বিদেশে প্রবাসে ভব পান্থবাসে, কিছুই আর লাগে না ভাল,
> বাড়ীপানে মন ছুটেছে এখন, মা মা ব'লে ঘরে চল।

অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীটাই প্রবাস।

বঙ্গের বাহিরের বাঙালীরা প্রবাসী কিনা তাহার বিচার না-করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে, যে, তাঁহাদের ও বঙ্গের



কুমার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়



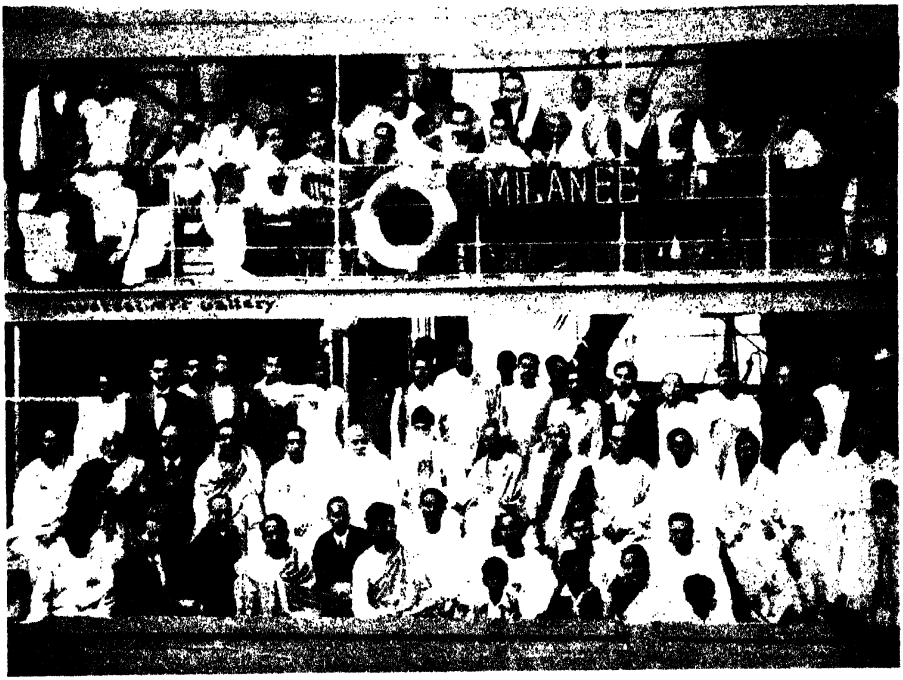
শ্রীযুক্ত ডক্টর সত্যচরণ লাহা

অধিবাসী বাঙালীদের পরস্পর আত্মীয়তা-বোধ জাগাইয়া তোলা ও বাড়ান আবশ্যক। এই চেষ্টা প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন করিতেছেন। তা ছাড়া, অন্য কর্ত্তব্যও অবশ্য সম্মেলনের আছে—সম্মেলন তাহাও করিতেছেন। সম্মেলনের সহিত 'প্রবাসী' মাসিকপত্রের কোন বিশেষ, একচেটিয়া, সম্বন্ধ না-থাকিলেও, একটি দাবি 'প্রবাসী' করিতে পারে, যে, ইহাই বিশেষ করিয়া প্রবাসী বাঙালীদের কথা বাঙালী সমাজের নিকট বার-বার বলিতে আরম্ভ করে এবং চৌত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাহা তাহার নিকট মধ্যে মধ্যে উপস্থিত করিয়াছে। প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন যে কাজ বার বৎসর করিতেছেন, 'প্রবাসী' মাসিকপত্রও ৩৪ বৎসর সেই কাজ কিছু কিছু করিয়াছে।

সেই জন্য 'প্রবাসী' বঙ্গের বাহিরের ও বঙ্গের বাঙালীদের আত্মীয়তার কথা পুনঃপুনঃ বলিতে চায়। কলিকাতায় প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনের উদ্বোধিনী বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ এই আত্মীয়তার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—

রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার তরফ থেকে ভারতবর্ষে বঙ্গেতর প্রদেশের প্রতি প্রবাস শব্দ প্রয়োগ করায় আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু মুখের কথা বাদ দিয়ে বাস্তবিকতার যুক্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অকৃত্রিম আত্মীয়তার সাধারণ ভূমিকা পাওয়া যায় কি না, সে তর্ক ছেড়ে দিয়েও, সাহিত্যের দিক থেকে ভারতের অন্য প্রদেশ বাঙালীর পক্ষে প্রবাস, সে কথা মানতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের পার্থক্য এত বেশি যে, অন্য প্রদেশের বর্ত্তমান সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির সামঞ্জস্য অসম্ভব। এ ছাড়া সংস্কৃতির প্রধান যে বাহন ভাষা, সে সম্বন্ধে বাংলার সঙ্গে অন্য প্রদেশীয় ভাষার কেবল ব্যাকরণের প্রভেদ নয়, অভিব্যক্তির প্রভেদ। অর্থাৎ ভাবের ও সত্যের প্রকাশকল্পে বাংলা ভাষা নানা প্রতিভাশালী ব্যক্তির সাহায্যে যে রূপ ও শক্তি উদ্ভাবন করেছে, অন্য প্রদেশের ভাষায় তা পাওয়া যায় না, অথবা তাহার অভিমুখিতা অন্য দিকে; অথচ সে সকল ভাষার মধ্যে হয়তো নানা বিষয়ে বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে। অন্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে বাঙালীর হৃদয়ের মিলন অসম্ভব নয়। আমরা তার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখেছি, যেমন পরলোকগত অতুলপ্রসাদ সেন। উত্তর-পশ্চিমে যেখানে তিনি ছিলেন, মানুষ হিসাবে সেখানকার লোকের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে হৃদয়ে মিল ছিল; কিন্তু সাহিত্যরচয়িতা বা সাহিত্যরসিক হিসাবে সেখানে তিনি প্রবাসীই ছিলেন, একথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।

তাই বলছি, আজ প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন বাঙালীর অন্তরতম ঐক্যচেতনাকে সপ্রমাণ করবে। নদী যেমন স্রোতের পথে নানা বাঁকে



প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে ষ্টীমারে প্রীতিসম্মিলনী। মধ্যস্থলে রবীন্দ্রনাথ উপবিষ্ট

াকে আপন নানাদিক্‌গামী তটকে এক ক'রে নেয়, আধুনিক াংলা-ভাষা ও সাহিত্য তেমনি করেই নানা দেশপ্রদেশের বাঙালীর দয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাকে এক প্রাণধারায় মিলিয়েছে।

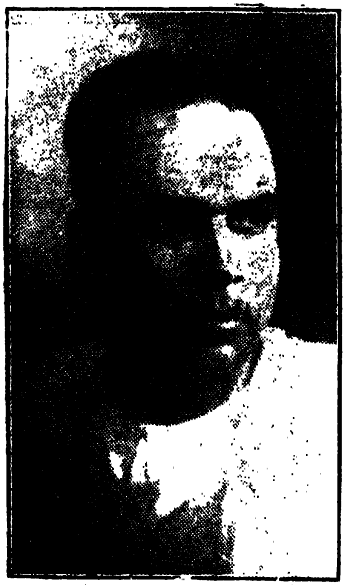
কলিকাতায় প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে যাঁহারা বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদিগকে ভোজনে ও কথোপকথনে সম্মিলিত হইয়া "নানা দেশ প্রদেশের বাঙালীর হৃদয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত" "এক প্রাণধারা" অনুভব করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা সমগ্র বাঙালী সমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

কলিকাতায় "মিলনী" নামে একটি ক্লাব আছে। ইহার পক্ষ হইতে লালগোলার কুমার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যবৃন্দ প্রভৃতির একত্র সম্মিলিত হইবার আয়োজন করেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ প্রায় তিন ঘণ্টা ষ্টীমারযোগে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করেন। প্রচুর জলযোগের ও কথোপকথনের ব্যবস্থা ছিল। ঘাট হইতে ষ্টীমার রওনা হইবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ আগমন করেন এবং তাঁহাকে লইয়া একটি ফটোগ্রাফ তোলা হয়। তাহার পর তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১২ই পৌষ ২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার টাউন-হলে প্রতিনিধিবর্গ ও অন্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের একটি প্রীতি-সম্মেলনের বন্দোবস্ত করেন। সকলে প্রচুর জলযোগ ও কথোপকথনে আপ্যায়িত হন।

তাহার পরদিন মহিলা প্রতিনিধিগণ ও অপর নিমন্ত্রিত মহিলাবৃন্দ ডাঃ স্যর নীলরতন সরকার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা লেডী নির্ম্মলা সরকার মহোদয়ার বাটীতে উদ্যান-সম্মেলনে একত্র সমবেত হন। সেখানেও জলযোগ আদির ব্যবস্থা ছিল।

ঐ দিন ঐ সময় ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা আগড়পাড়ায় তাঁহার সুরম্য বাগান-বাড়ি ও পক্ষিনিবাসে



শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার



শ্রীযুক্তা লেডী নির্ম্মলা সরকার

উদ্যান-সম্মেলনের আয়োজন করেন। উন্মুক্ত প্রশস্ত তৃণাচ্ছাদিত সমতলভূমিতে নীল আকাশের নীচে তিনি যে শুধু রসনার তৃপ্তির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহা নয়, তাঁহার নানাজাতীয় স্থলচর জলচর পক্ষী সকলের নামধাম আহার জীবনযাত্রা-প্রণালী প্রভৃতি এক এক দল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে পরে পরে অবগত করাইবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের উদ্যোক্তারা মহিলা-দিগকেও পক্ষিনিবাসটি দেখিবার সুযোগ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যে নানা শাখা-সভার অধিবেশন, অনেক প্রীতি-সম্মেলন এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠান-দর্শনের বন্দোবস্ত করিতে হওয়ায় মহিলাদের জন্য পক্ষি-নিবাস-দর্শন এবং উদ্যান-সম্মেলন একই দিনে একই সময়ে পড়িয়া গিয়াছিল।

১০ই পৌষ ২৬শে ডিসেম্বর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। তখন যত প্রতিনিধি আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, তাঁহারা উপস্থিত ছিলেন। পরে আবার ১৪ই পৌষ পরিষদ সকল প্রতিনিধি ও অপর বহু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিকে পরিষদ-মন্দির ও রমেশ ভবনের মূর্ত্তি সংগ্রহাদি দর্শন করিতে আহ্বান করেন এবং তাঁহাদের সকলের জলযোগের ব্যবস্থা করেন।

ঐ দিন রাত্রে কলিকাতাস্থ ভারতীয় সাংবাদিক সমিতি (Indian Journalists' Association) সমুদয় প্রতিনিধি ও কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে টাউন-হলে বিদায়ভোজ দেন। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু এই সমিতির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক।

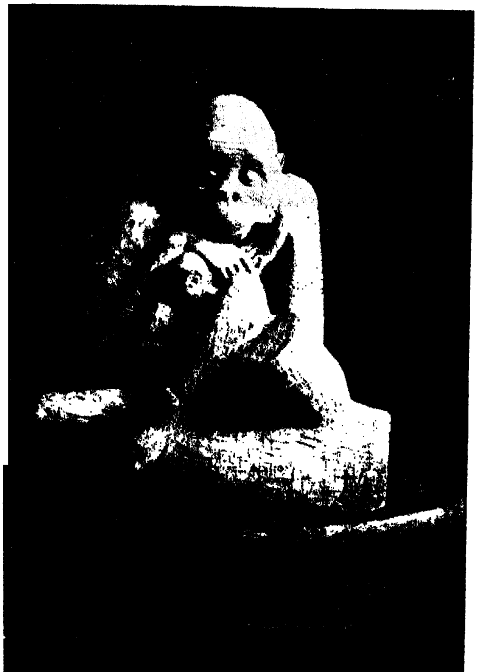
এই সকল প্রীতি-সম্মেলন ব্যতীত শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "বিশ্বকোষ" কার্য্যালয়ে, শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় তাঁহার চিত্রশালায়, এবং আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের প্রেসে প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলসমূহে চিত্রকলা-প্রদর্শনী

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে চিত্রকলা-প্রদর্শনী—

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে চিত্রকলা-প্রদর্শনী প্রতি বৎসর হইয়া থাকে। আর্ট স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণের অঙ্কিত চিত্র এখানে প্রদর্শিত হয়। এবারেও গত ডিসেম্বর মাসে এই প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে।

এবারকার প্রদর্শনী একটি বিষয়ে বিশেষ স্মরণীয়। স্কুলের তিন শত ছাত্রের আঁকা দুই হাজারের অধিক চিত্র এখানে প্রদর্শিত হইয়াছিল। আর একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই স্কুলের ছাত্রদের ভারতীয় রীতিতে আঁকা প্রায় পঞ্চাশখানি চিত্র লণ্ডনের বেলিংটন হাউসে প্রদর্শিত হইয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। এ-বৎসরের স্থানীয় প্রদর্শনীটিও বিভিন্ন ধরণের চিত্র-সমাবেশে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।



কলিকাতা প্রদর্শনী

চিড়িয়াখানার একটি দৃশ্য (মাটির কাজ)—শ্রীহৃষিকেশ ঘোষ

আর্ট স্কুলের শিক্ষকগণের চিত্রাবলী একটি বিশেষ স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এগুলি প্রদর্শনীর সৌষ্ঠব যথেষ্ট বাড়াইয়াছে। ছাত্রগণের চিত্রগুলি কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে রাখা হইয়াছিল। ভারতীয় রীতিতে অঙ্কিত চিত্রকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়। শ্রীযুত ইন্দু রক্ষিতের প্রাচীর-চিত্র চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। এই বিভাগে শ্রীযুত সুশীল সেন, শ্রীযুত পূর্ণেন্দু বসু, শ্রীযুত তারক বসু, শ্রীযুত নির্ম্মল মুখুজ্যে, শ্রীযুত ত্রিপুরেশ্বর মুখুজ্যে, শ্রীযুত সত্য মজুমদার,



মাদ্রাজ প্রদর্শনী

উপরে : ক্লান্তি—শ্রীপ্রবোধ দাশগুপ্ত, নিম্নে : মুখোস—শ্রীকার্ত্তিকেয়

শ্রীযুত মাণিকলাল বাঁড়ুজ্যে ও মৌলবী আব্দুল মৈনের চিত্রাবলীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কমার্শ্যাল আর্ট ও কাঠ-খোদাই চিত্র বিভাগও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপন-কলারও চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। কোন্ জিনিষের কিরূপ বিজ্ঞাপন দিলে সহজে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা যায় তাহা কলা-বিভাগের একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। ইংরেজীতে ইহাকে কমার্শ্যাল আর্ট বলে। আর্ট স্কুলের ছাত্রগণ এবিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ছাত্রগণ কাঠ-খোদাই বিভাগেও বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। আর্ট স্কুলের শিক্ষক মৌলবী আব্দুল মৈন এবিষয়ে সকলেরই ধন্যবাদার্হ। কারণ তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টা-যত্নে ছাত্রগণ এ-বিভাগে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন।



কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে শ্রীযুত ইন্দু রক্ষিত প্রাচীর চিত্র আঁকিতেছেন

এবারকার চিত্র-প্রদর্শনী হইতে একটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা সম্ভবপর হইয়াছে। শুধু সৌন্দর্য্যের অনুভূতির জন্যই নহে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য তথা আর্থিক উন্নতির জন্যও কলা-বিদ্যার চর্চ্চা একান্ত প্রয়োজন।

মাদ্রাজে চারু ও কারু শিল্প প্রদর্শনী—

কলিকাতার ন্যায় মাদ্রাজের সরকারী আর্ট স্কুলেও গত কয়েক বৎসর ধরিয়া চারু ও কারু শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে। এ-বৎসর গত জানুয়ারী মাসে এই স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টা-যত্নে প্রতি-বৎসর সুষ্ঠুভাবে এই প্রদর্শনী হইয়া আসিতেছে। মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড এর্‌স্‌কিন মহোদয় এবারে প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিয়াছিলেন।

সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য্য-চিত্রের সমাবেশে এই প্রদর্শনীর চারুশিল্প বিভাগ বড়ই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। ভাস্কর শ্রীযুত কালিকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, শ্রীযুত প্রদোষ দাশগুপ্ত শ্রীযুত বেঙ্কট নারায়ণ রাও, শ্রীমতী মুথুভেলু ও শ্রীযুত কার্ত্তিকেয়র ভাস্কর্য্য-চিত্র সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণ-কৌশলে মৌলিকতা যথেষ্ট। কালিকিঙ্করের "প্রয়াস", নারায়ণ রাওএর "ধ্যানী বুদ্ধ" প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। শ্রীমতী মুথুভেলুর ন্যায় ছাত্রী শ্রীমতী কমলার চিত্রও উল্লেখযোগ্য।

পাশ্চাত্য রীতিতে অঙ্কিত বহু চিত্রও প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীযুত রাম রাও, শ্রীযুত পল্‌রাজ ও শ্রীযুত খগেন্দ্র রায়ের চিত্রগুলি এই বিভাগের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল।

যে-সব চিত্রে ভারতীয় পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল সেগুলি এক স্থলে প্রদর্শিত হয়। সৈয়দ আহমেদ, কালিকিঙ্কর, লোকিয়া, খগেন্দ্র রায়, ডোরাইস্বামী বেঙ্কটনারায়ণ রাও, রাম রাও, বেঙ্কটরত্নম্, পি. সি. রাজু প্রভৃতির চিত্রাবলী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরীর চিত্রাবলী যে মনোরম হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

৩

অরুণ যখন অজয়দের বাড়িতে আসিয়া পৌঁছাইল, কলিকাতার সৌধাবলীর উপর অপরাহ্ণের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে, নগরের গলিতে প্রাসাদগুলির দীর্ঘতর ছায়া।

ছাদ হইতে অরুণকে দেখিতে পাইয়া চন্দ্রা সিঁড়ি দিয়া ছুটিয়া আসিল, অরুণের হাত ধরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—বেশ, কাল আস নি কেন? কাল বড়দির জন্মদিন গেল।

অরুণ বিস্মিত হইয়া বলিল—আমি কি জানতুম?

হাত নাড়িয়া চুল দোলাইয়া চন্দ্রা বলিল—তোমার কিছু মনে থাকে না। আমার লাট্টু এনেছ?

—ওই, আনতে ভুলে গেছি।

—বড় ভোলা মন বাপু তোমার।

—লাট্টু ত ছেলেরা খেলে, আচ্ছা, খুকু তোর জন্যে বড় পুতুল এনে দেব, কেমন?

—না আমার পুতুল চাই না, আমার লাট্টু চাই, বা, ছেলেরা স্কিপ্ করে কেন?

চন্দ্রা অজয়ের ছোট বোন। ছয় বৎসর বয়স হইবে। খয়ের-রঙের ফ্রকের ওপর ফুল-কাটা সাদা এ্যপ্রন; কচি আমপাতার মত শ্যামশ্রী; মুখখানি মঙ্গোলীয়, চাঁদের সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে, স্কুলের মেয়েরা তাহাকে চাঁদামাছ বলিয়া ডাকে। তাহার দুই চোখে দুষ্টামি, দেহে মনে চঞ্চল কৌতুক, গিরিঝর্ণার মত ছুটিয়া

সিঁড়ি নামে, কলহাস্যে উচ্চ স্বরে কথা বলে, নৃত্যের ভঙ্গীতে চলে।

চন্দ্রার সহিত দ্রুতপদে সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে অরুণ বলিল—মামীমা কোথায়?

দুষ্টামিভরা চোখ নাচাইয়া চন্দ্রা উত্তর দিল—মা তোমার সঙ্গে আজ দেখাই করবেন না, খুঁজেই পাবে না মাকে।

—তুই বুঝি লুকিয়ে রেখেছিস, আচ্ছা, কোন্ রঙের লাট্টু তোর পছন্দ? অরুণ পকেট হইতে তিনটি লাট্টু বাহির করিল।

চন্দ্রা লাফাইয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল—ও, কি দুষ্টু তুমি! থ্যাঙ্কস্ থ্যাঙ্কস, আমি তিনটিই নিচ্ছি।

বিদ্যুদ্বেগে চন্দ্রা অন্তর্হিত হইল। অরুণ রান্নাঘরের দিকে চলিল। মামী এখন নিশ্চয় রান্নার তদারক করিতে গিয়াছেন। ভাঁড়ার-ঘরের সম্মুখে খোলা বারান্দায় আসিতে চলার গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। আলোছায়াময় ঘরের পটে এক কিশোরীমূর্ত্তি সন্ধ্যাকাশে তারার মত ফুটিয়া উঠিল। পদশব্দে উমা প্রবেশ-দ্বারের চৌকাটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাতীর দাঁতের মত গৌরবর্ণ দেহে লাল-পাড় তসরের শাড়ী অপরাহ্ণের আলোয় যেন আগুনের আভা।

অরুণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। সৌন্দর্য্য তাহাকে এমন করিয়া অভিভূত করে কেন!

উমা ধীরে বলিল—মা বাড়ি নেই। উমা বড় শান্ত সুরে কথা বলে, কণ্ঠে একটু আবেগ আনে না কেন!

লজ্জিত ভাবে অরুণ বলিল—ও, আমার আসতে দেরি হয়ে গেল।

—তাতে কি, এক ঘণ্টার মধ্যেই আসবেন, মাসীমার ওখানে গেছেন। বাবা তোমায় খুঁজছিলেন।

—আচ্ছা।

—শোন, কি খাবে!

—আমি খেয়ে এসেছি, কিছু খাব না।

—তা হবে না, মা এসে আমায় বকবেন, তিনি নেই ব'লে—

গজদন্তশুভ্র আননে মৃদু হাস্য খেলিয়া গেল। উমার হাসি বড় সংযত, উচ্ছ্বসিত হইয়া একটু হাসে না কেন!

—সত্যি, আমার এখন ক্ষিদে নেই।

—বেশ, রাতে খেয়ে যেও।

—অজয় এসেছে?

—না, দাদা আসেন নি—বাবা ওদিকে ছাদে আছেন।

অরুণ একটু অগ্রসর হইয়া আবার নীরবে দাঁড়াইল। সূর্য্যাস্তের স্বর্ণাভামণ্ডিত ঐ অলৌকিক সৌন্দর্য্যরূপ যেন সে দৃষ্টিচ্যুত করিতে চায় না। একটু ব্যথিত স্বরে সে বলিল—কাল তোমার জন্মদিন আমি জানতুম না।

—দাদা বুঝি বলতে ভুলে গেছল। কিন্তু সেদিন যে মা'র সঙ্গে তোমার অত হিসেব হচ্ছিল,—তোমার জন্মদিনের দশ দিন পরেই আমার জন্মদিন, সব ভুলে গেছলে—

—হাঁ, আজকাল কিছু মনে থাকে না।

—খুব পড়ছ বুঝি, দেখ অরুণ—

—এই বললে, আমি তোমার চেয়ে বড়, আমায় দাদা বলা উচিত।

—ভারি দশ দিনের বড়, তবু যদি এক মাস হ'ত।

উমা অরুণকে দাদা বলিতে কেমন সঙ্কোচ বোধ করে। তাহার অন্য বোনেরা, এমন কি মাসতুতো বোনেরাও, অরুণকে স্বচ্ছন্দে দাদা বলে, কিন্তু সে তেমন পারে না।

—আচ্ছা, আমি তোমাকে আমার নাম ধরে ডাকবার অনুমতি দিলুম, এটা তোমার পঞ্চদশ জন্মদিনে আমার উপহার জেনো।

—খুব কথার ভট্‌চার্য্যি হয়েছ, না দিলেও আমি তোমায় ডাকতুম। কিন্তু অত গম্ভীর কেন!

—কি জান, উমা, মনটা তেমন ভাল নেই।

—মন খারাপ কি জন্যে? যত ঢং, অত রাজ্যের বই পড়লে মন কেন, মাথাই খারাপ হয়ে যায়। আমি মাকে ব'লে দেব, তোমায় আর বই দেবেন না।

—তুমিও কিছু কম বই পড় না।

—আমার তাতে মন খারাপ হয় না, যাও বাবা একা ছাদে আছেন, আমি যাচ্ছি।

অজয়ের পিতা শ্রীহেমচন্দ্র রায় মহাশয় ভারত-গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানার এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। অসুস্থতার জন্য প্রায় দুই বৎসর হইল চিকিৎসা করাইতে

কলিকাতায় ছুটি লইয়া আছেন। অরুণের মাতা তাঁহার জন্মগ্রামের মেয়ে, তাঁহাকে দাদা বলিতেন, ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলাধুলা করিয়াছেন। সেই সম্পর্কে অরুণ তাঁহাকে মামাবাবু বলে।

হেমবাবু যুবাবয়সে কলেজে পাঠের সময় ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কে ও প্রভাবে আসেন। একবার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন। পরে হিন্দুসমাজে বিবাহ করিলেও ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক সংস্কার আধুনিক আদর্শ নিজপরিবারে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ-বিষয়ে তাঁহার স্ত্রী স্বর্ণময়ী তাঁহার সাহায্যকারিণী। বিবাহের পর তিনি স্ত্রীকে মেম রাখিয়া ইংরেজী শিখাইয়াছিলেন, তাহা বৃথা হয় নাই। দিল্লী সিমলার উচ্চতম অফিসার-সমাজে তিনি নিঃসঙ্কোচে সসম্মানে মিলিতে পারিয়াছেন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে সিমলাতে ঠাণ্ডা লাগিয়া হেমবাবুর জ্বর ও পেটের অসুখ হয়। দিল্লীতে নামিয়া পেটের অসুখ কমিল, কিন্তু জ্বর ছাড়িল না। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে কিছু সুস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু জ্বর একেবারে ছাড়িতেছে না। ডাক্তারেরা আশ্বাস দেন, শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিবেন, আর একটু বল পাইলেই চেঞ্জে গেলে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবেন। বস্তুতঃ, রোগ যে কি, তাহা ঠিকরূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই।

শয়নগৃহের সম্মুখে ঢাকা বারান্দায় এক লম্বা চেয়ারে পিঠে বালিশ ঠেসান দিয়া হেমবাবু শুইয়াছিলেন। ফাল্গুনের শেষে বেশ গরম পড়িয়াছে, সন্ধ্যায় ঘরে থাকিতে আর ইচ্ছা করে না।

বারান্দার সামনে বড় খোলা ছাদ জুড়িয়া নানা ফুলের গাছ—জুঁই, বেল, গোলাপ, এ্যষ্টর, ডালিয়া, ক্রিসেনথিমাম্। কন্যাদের সহায়তা ও উৎসাহে বিছানাতে শুইয়া হেমবাবু এই সুন্দর রুফ-গার্ডেন তৈরি করিয়াছেন।

অরুণ বারান্দায় প্রবেশ করিতেই চন্দ্রা চেঁচাইয়া উঠিল—বাবা, অরুণদা এসেছেন।

হেমবাবু একটু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—এস, অরুণ এস, ওরে শীলা, তোর অরুণদার জন্যে একটা চেয়ার দে।

অরুণ ধীরে বলিল—আমি এই মোড়াতে বসছি, কেমন আছেন মামাবাবু?

শীলা ফুলের টবে জল দিতেছিল। ঝাঁঝরি নামাইয়া পিতার নিকট ছুটিয়া আসিল। হাতে একটি ফুল।

—বাবা, দেখ, কি সুন্দর নীলফুল, দেখ অরুণ-দা—কি নাম বল ত?

—কোন বিলিতি ফুল হবে।

শীলা একটি লম্বা নাম বলিল। সব ফুলের নাম তাহার মুখস্থ।

—অরুণ-দা, তোমার ত বাটন্-হোল নেই।

—তোমার মাথায় গোঁজ, বেশ দেখাবে।

খোঁপাতে গুঁজিবার ইচ্ছা হইলেও, ফুলটি শীলা পিতার চেয়ারের পার্শ্বে ছোট মার্ব্বেল টেবিলের উপর ফুলদানির পুষ্পগুচ্ছে গুঁজিয়া দিল।

হেমবাবু অতি সৌখীন প্রকৃতির মানুষ। অসুস্থতায় তাঁহার শুচিতা ও সৌন্দর্য্যবোধ আরও সূক্ষ্ম প্রবল হইয়াছে। তাঁহার শয্যা, আসবাব, গৃহ সব সময়ে পরিষ্কার থাকা চাই। জানালায় রঙীন সিল্কের পর্দ্দা, নীল দেওয়ালে রাফায়েলের 'মাতৃমূর্ত্তি', মাইকেল এঞ্জিলোর 'আদামের জন্ম' কোরো-র 'ল্যাণ্ডস্কেপ' ইত্যাদি কয়েকখানি ছবি যথাযথ টাঙানো; চেয়ারে রঙীন রেশমের ঝালরওয়ালা বালিশ, টেবিলে সূচের সূক্ষ্ম কাজ-করা সাদা আচ্ছাদন, চারি দিকে শোভন পরিচ্ছন্নতা। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলকে তাঁহার নিকট পরিষ্কার পরিচ্ছদে থাকিতে হয়, সকলে সুবেশে থাকে, সুচারু জীবন যাপন করে, ইহাই তাঁহার বাসনা। তাঁহার সম্মুখে ভৃত্যরাও ময়লা কাপড়ে আসিতে পারে না।

হেমবাবু স্নেহকণ্ঠে বলিলেন—ওরে অরুণকে কিছু খেতে দে।

—না, আমি এই খেয়ে আসছি।

—তা হোক, কিছু ফল খাও, উমা!

—না, মামাবাবু!

শীলা হাসিয়া বলিল—বাবা, অরুণদা কি লাজুক।

চন্দ্রা বড়দিদির নিকট ছুটিল, খাবার আনিতে।

উমা মিষ্টি ও ফল লইয়া আসিলে অরুণ আর আপত্তি করিল না।

হেমবাবু বলিলেন—তুমি খাও অরুণ।

রোগে ভুগিয়া তাঁহার অন্তর যেমন সকলের হৃদয়ের প্রেম

পাইবার পিয়াসী হইয়াছে, তেমনি স্নেহে প্রেমে আপনাকে বিলাইয়া দিবার জন্ত তিনি তৃষিত।

খাওয়া শেষ করিয়া অরুণ বলিল—খুকু কি নতুন গান শিখেছ? এবার অরুণের প্রতিশোধের পালা।

চন্দ্রা ছুটিয়া ঘর হইতে শীলার এস্রাজ লইয়া আসিল।

—ছোটদির এস্রাজ সেরে এসেছে বাবা।

—আচ্ছা, তোমার বড়দি'কে ডাক।

হেমবাবু নিজে সুকণ্ঠ গায়ক না হইলেও, অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়। রোগশয্যায় সঙ্গীতানুরাগ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। দিল্লীতে তিনি মেয়েদের সঙ্গীতশিক্ষার জন্ত ওস্তাদ রাখিয়া দিয়াছিলেন। সুস্থ বোধ করিলে কলিকাতাতেও মধ্যে মধ্যে ভাল গায়ক আহ্বান করিয়া জলসা হয়। প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই কন্যাদের লইয়া পারিবারিক সঙ্গীতসভা বসে।

উমার গলা ভাল, কিন্তু কলিকাতাতে আসার পর প্রায়ই তাহার সর্দি-কাশি হয়, নিয়মিত ভাবে গান শিখিতে পারে না। শীলা গান ভাল গায় না, তবে সেতার এস্রাজ সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে সুনিপুণা। চন্দ্রা যে কোন দিন গায়িকা হইবে এ আশা তাঁহার পিতাও করেন না; তবে রুগ্ন পিতাকে সাধ্যমত গান গাহিয়া আনন্দ দিতে তাহার অত্যন্ত উৎসাহ। সে উৎসাহ কেহ দমন করিতে চায় না।

চন্দ্রার গান দিয়াই সে সন্ধ্যার জলসা আরম্ভ হইল। বড়দিদির সাহায্যে সে সুর-সমুদ্রে অকুতোভয়ে পাড়ি দিল।

শীলার এস্রাজ বাজান শেষ হইলে উমা বলিল—কোন্ গান করব, বাবা?

—আজ সকালে কি গানটা গুন-গুন করছিলে?

—ও, তিমির-দুয়ার খোল এস, এস নীরব চরণে—

—হাঁ।

—সে ত ভোরবেলার গান বাবা।

—ওই গানই ত রাতে বসে গাইবার গান মা, যখন আলো শেষ হ'ল, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, 'তিমির-দুয়ার খোল—' এ যে অন্ধকারে আলোর জন্ত প্রার্থনা।

উমা ধীরে গান ধরিল,

'তিমির-দুয়ার খোল এস, এস নীরব চরণে
জননি আমার দাঁড়াও এই নবীন অরুণ কিরণে।'

ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে; চারি দিকে মায়াময় আবছায়া; পশ্চিমাকাশে নারিকেল বৃক্ষগুলির অন্তরালে সূর্য্যাস্তের সুবর্ণদ্যুতি প্রকৃতি-লক্ষ্মীর ললাটে রক্তচন্দনের মত। হাস্নাহানার গন্ধভরা বাতাস মৃদু বহিতেছে।

অরুণ গান শুনিতে লাগিল।

উমা প্রতিমার মত অত চমৎকার গায় না। দু-জনের গান গাহিবার ভঙ্গীর কত প্রভেদ। প্রতিমা যদি এ গানটি গাহিত, মনে হইত, নীড়ে-জাগা ভোরের পাখী সহজ উচ্ছ্বসিত আনন্দ সুরে অরুণোদয়ের অভ্যর্থনা করিতেছে। উমা গাহিতেছে, যেন শ্রান্ত পথিক ক্লান্ত চরণে অন্ধকার রাত্রে পথহারা হইয়া আলোর জন্ত ব্যাকুল প্রার্থনা করিতেছে। উমার কণ্ঠ এমন করুণ উদাস কেন?

উমা তাহার মাতার সুন্দর রং পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার মুখের সামঞ্জস্যপূর্ণ সুগঠিত রূপ পায় নাই। মুখখানি লম্বা, অনতিপক্ক পেয়ার-ফলের মত; প্রশস্ত উন্নত ললাটে একটি টিপ জলজ্বল করিতেছে, যেন উষার গগনে শুকতারা; টানা ভ্রূর নীচে আয়ত নয়ন নীচু করিয়া বসান, সে নয়নে কখনও নিষ্কাষিত অসি-লতার দীপ্তি, কখনও আষাঢ়ের নবীন মেঘের ছায়াস্নিগ্ধতা; অপরিপুষ্ট অধর একটু শীর্ণ, সে শীর্ণতা রোগশয্যার সেবাক্লিষ্টতা, রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি; গণ্ড দুইটিতে কখনও উষার পাণ্ডুরতা, কখনও সন্ধ্যার রক্তিমা; প্রশস্ত চোয়াল হইতে কমনীয় চিবুকের রেখার ছন্দ ঔদাস্যে ভরা; যেন সমুদ্রের একটি তরঙ্গরেখা ললাটে উচ্ছ্বসিত, নয়নে আনত, কপোলে প্রবাহিত হইয়া চিবুকের দিগন্তে কোন্ অসীমে মিশিয়া গিয়াছে। স্বর্ণাভ প্রদোষান্ধকারে পটভূমিকায় গায়িকা কিশোরীর মূর্ত্তি।

তিন বোনের মধ্যে দেহরূপে কত প্রভেদ। শীলার মুখ উমার মত লম্বা নয়, গোল হইয়া আসিয়াছে, তার পর চন্দ্রার মুখ ত চাঁদামাছ। শীলার রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বয়সের তুলনায় স্থূলকায়, সহজেই আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, যেন এক সতেজ বনলতা নিজের চারি দিকে ভাবের কুঞ্জ রচনা করিতে চায়।

উমার দেহের গঠন পরিমিত, মুখে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য, ঠোঁটের টানে স্থিরসঙ্কল্প, কণ্ঠের সুরে শাণিত ভাব, হ্রী ও ধীশক্তি অন্তরাবেগকে সংযত করিয়া তাহাকে শ্রীমণ্ডিত

করিয়াছে ; কিন্তু তাহার একটু ভাবোচ্ছ্বাস থাকিলে বুঝি ভাল হইত, মনে হয় তার হৃদয়ে কোথাও নিষ্ঠুরতা, শূন্যতা আছে।

উমার গান শুনিতে অরুণের বড় ইচ্ছা করে, কিন্তু উমা যখন গান গায় সে আনন্দ পায় না। প্রতিমার গান গাওয়ায় যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দসুর আছে, উমার কণ্ঠে সে সুর খুঁজিয়া পায় না।

হেমবাবুর রোগাতুর মুখের দিকে চাহিয়া, উমার শীর্ণরুক্ষ নয়নপল্লবের দিকে তাকাইয়া সে অন্তরে কি বেদনা অনুভব করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল এই সুখ, এই সঙ্গীতের আনন্দ যেন কোন বিশুদ্ধ মহানন্দের ছায়ামাত্র, যে বেদনাহীন মহানন্দের একটুকু আভাস সে পাইতেছে, কল্পলোকের দিগন্তে সে পূর্ণ আনন্দচ্ছটা ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া আবার মিলাইয়া যায় কেন, ব্যথাভরা তৃষ্ণা রাখিয়া যায়।

সেই অলৌকিক সন্ধ্যায় অরুণের জীবনে প্রেম, বেদনা ও অসুস্থতা এক সূত্রে তিনটি মুক্তার মত গাঁথা হইয়া গেল।

৪

রাত প্রায় নয়টার সময় অরুণ বাড়ি ফিরিল। ঘরের সম্মুখে বারান্দায় ঠাকুমা তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে খেয়ে এসেছিস?

অরুণ উত্তর দিল—হ্যাঁ, ঠাকুমা, আমি ত তোমায় বলেই গেলুম।

ঠাকুমার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করেন, মামী কি খাওয়ালেন। কিন্তু অরুণ খাদ্যদ্রব্যের সম্পূর্ণ তালিকা দেবে না, আর অত খাবারের নাম শুনিলে পরদিন তাঁহাকে কিছু বেশী রাঁধিতে হইবে।

—আজ আর বেশী রাত জেগে পড়িস নে, শুয়ে পড়।

—আমি শুচ্ছি, তুমিও শুতে যাও ঠাকুমা।

অরুণ যে অজয়দের বাড়ি অত বেশী যায়, খায়, গল্প করে, ঠাকুমা তাহা মনে মনে পছন্দ করেন না। কোন বাধাও দিতে ইচ্ছা হয় না। এই মাতৃহীন বালকের অন্তরের স্নেহক্ষুধা তিনি ত মিটাইতে পারেন না। অরুণ যদি কোথাও গিয়া আনন্দ পায়, তাহাতে তিনি বারণ করিবেন কেমন করিয়া। প্রতিমার কিন্তু এ সব হাঙ্গাম নাই। সে বাড়িতে বেশ থাকে। স্কুলের পড়া পড়ে, গান গায়, পাখীদের পালন করে, হেলা-ফেলা করিয়া কাটাইয়া দেয় ; মাঝে মাঝে তাহার কোন সহপাঠিনীকে নিমন্ত্রণ করিয়া সখ করিয়া রাঁধিয়া খাওয়ায়। কাহারও বাড়ি যাইতে সে রাজী হয় না। পুরুষেরা চিরকালই বাহিরমুখো।

প্রতিমার ঘরে উঁকি মারিয়া ঠাকুমা নিজের ঘরে গেলেন। প্রদীপ নিবাইয়া বারান্দায় মাদুর পাতিয়া শুইলেন। সুন্দর চাঁদ উঠিয়াছে।

কৃশাঙ্গী, খর্ব্বাকৃতি, কাঁচাপাকা চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা বলিয়া বার্দ্ধক্যরেখাঙ্কিত মুখ শীর্ণ দেখায়। দেহের তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, আঁটসাট গড়ন, মুখের স্নেহপ্রসন্নতা দেখিলে বোঝা যায়, ঠাকুমা এক সময়ে সুন্দরী ছিলেন। বস্তুতঃ, অতি গরিব ঘরের মেয়ে হইলেও, অতুলনীয়া সুন্দরী ছিলেন বলিয়াই এই ধনী বনিয়াদী বংশে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ছোটবেলায় সবাই তাঁহাকে পুতুল বলিয়া ডাকিত। তাঁহার সমস্ত জীবন নিষ্ঠুর বিধাতার হস্তে পুতুলের খেলাই হইয়াছে। ছোট মেয়ে আপন পুতুলকে আদর করিয়া নানা রঙীন কাপড়ের টুকরায় খুশীমত সাজায়, হৈ চৈ করিয়া তাহার বিবাহ দেয়, আবার রাগ হইলে সমস্ত সজ্জা ছিঁড়িয়া সেই মাটিতে আছড়ায়। বিধাতাও একদিন তাঁহাকে বালিকাবয়সে বধূবেশে সাজাইয়া কোন সোনার সংসারে পাঠাইয়াছিলেন। সে-কথা ঠাকুমার স্বপ্নের মত মনে হয়। সোনার স্বপ্ন মিলাইয়া গেল, যৌবনেই তাঁহাকে যোগিনী হইতে হইল। যে শ্রাবণ-রাত্রে দুই শিশুপুত্রকে বক্ষে চাপিয়া তিনি বিধবা হইয়াছিলেন, মনে হইয়াছিল সে অন্ধকার নিশীথের বুঝি অবসান হইবে না। সে রাত্রিও প্রভাত হইল। বড় সাধ করিয়া প্রথম পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। সে পুত্র, সে লক্ষ্মীস্বরূপিণী পুত্রবধূ আজ কোথায়! সব ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তার-পর দুঃখ তাঁহার ললাটে যতই আঘাত করিয়াছে, তিনি মনের বল হারান নাই, কোথা হইতে নবশক্তি পাইয়াছেন। নিষ্ঠুর বিধাতা সংসারাঙ্গনে এ পুতুলটিকে বার-বার আছড়াইয়াছেন,

ভাঙিতে নয়, আরও মজবুত করিতে। কোন অখ্যাত জন্মগ্রাম হইতে এক সরলা শঙ্কিতা বালিকা যেদিন সালঙ্কৃতা গৃহবধূরূপে এই গৌরবময় বনিয়াদী পরিবারে আসিয়াছিল, ওই পূজার অঙ্গনে বরণডালার প্রদীপশিখায় সেদিন এই বংশের মহিমা মর্য্যাদা রক্ষার ভার যে তাহারই হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছিল। অরুণ ও প্রতিমার জীবনে সেই মহিমার অক্ষুণ্ণ রূপ দেখিয়া না-যাইতে পারিলে ঠাকুমা শান্তিতে মরিতে পারিবেন না।

দ্বিতীয় পুত্রের উপর তিনি কিছু আশা করেন না। বিলাত হইতে সে মদ্যপ, অনাচারী, হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী হইয়া আসিয়াছে। কেহ কেহ বলে, সে বিলাতে বিবাহ করিয়াও আসিয়াছে। ঠাকুমা তাহা বিশ্বাস করেন না, তবে তাহার বিবাহেরও কোন চেষ্টা করেন নাই। সে শুধু তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকুক।

অরুণ ও প্রতিমাকে তিনি জীবনের সমস্ত আশা ও স্নেহ দিয়া জড়াইয়াছেন। এ-বংশের আদর্শানুসারে তাহাদের মানুষ করিতে হইবে। তাহারা যখন পিতার মৃত্যুর পর ঠাকুমার সহিত বাস করিতে আসিল, তাহাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা লইয়া মাতা ও পুত্রে বিবাদ বাধিল। প্রতিমার বিলাত-ফেরৎ বাবা তাহাকে কোন মেমসাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিতে চাহিলেন, আর ঠকুমার ইচ্ছা, প্রতিমা সংসারের কাজকর্ম্ম করে, খুব-জোর কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শ্লোক শিক্ষা করে। এ-বংশের কোন মেয়ে কখনও গাড়ী করিয়া স্কুলে যায় নাই। শেষে রফা হইল প্রতিমা কলিকাতার কোন বাঙালী মেয়েদের স্কুলে পড়িবে, বাড়ির গাড়ী তাহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। স্কুলে গিয়া প্রতিমা কোন দুরন্তপনা, বেহায়াপনা শিখে নাই, বেশ শান্ত, বাধ্য মেয়ে, তবে মাঝে মাঝে বড় একগুঁয়েমি করে।

অরুণের জন্য ঠাকুমার বড় ভাবনা। ঘরে তাহার মন নাই, তাহার বহু বন্ধু, তাহারা বনিয়াদী বংশের ছেলে বলিয়া মনে হয় না। তাহার শরীরও রোগা, টো-টো করিয়া ঘোরে, বাগানে একা বসিয়া থাকে, প্রতিমার মত আব্দার করে না, মন খুলিয়া কথা বলে না, তাহার মনে কিসের দুঃখ? তাহাকে তিনি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

অরুণ বি-এ ক্লাসে উঠিলেই, সুন্দরী মেয়ে দেখিয়া ঠাকুমা তাহার বিবাহ দিবেন, গরিব বনিয়াদী ঘরের মেয়ে আনিবেন। তাহাকে বিলাত যাইতে দিবেন না।

ঠাকুমার চোখে জল আসিল। রেখাঙ্কিত কপোল অশ্রুতে ভিজিয়া গেল। মাদুর হইতে উঠিয়া তিনি ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিলেন।

ঠাকুমা চলিয়া গেলে অরুণ হাতমুখ ধুইয়া জামা বদলাইয়া খোলা জানালার কাছে এক চেয়ার টানিয়া বসিল। স্তব্ধ জ্যোৎস্নারাত্রি স্বপ্নের কুহেলিকাজড়ান।

স্কুলের বই পড়িতে ইচ্ছা করিল না। মন যেদিন বিষণ্ণ বা আনন্দপূর্ণ থাকে, সে ডায়েরি লেখা বা রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ খুলিয়া পড়ে। মামীমার নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন পুস্তিকাগুলি লইয়া আসিয়াছে। উপদেশ-গুলি একটু সুর করিয়া মৃদুস্বরে পড়িতে বসিল, যেন মহান কবিতা। সব বুঝিতে পারিল না, গভীর ভাবগর্ভ কথাগুলির তরঙ্গাঘাতে তাহার অন্তরের কোন গোপনগুহার সুপ্ত জলে চঞ্চলতা জাগিল। উপদেশের শেষে প্রার্থনা সে ভক্তির সহিত পাঠ করিল, এ যেন তাহার অব্যক্ত আত্মার ভাষাহীন বেদনার বাণী।

ডায়েরি লেখা হইল না। শান্তিনিকেতন হইতে কয়েকটি অংশ ডায়েরিতে টুকিল।

"জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি এই তিন ধারা যেখানে একত্র সঙ্গত সেইখানেই আনন্দতীর্থ। আমাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের যে পরিমাণে পূর্ণ মিলন সেই পরিমাণেই আমাদের পূর্ণ আনন্দ।"

তাহার নীচে অরুণ লিখিল—জ্ঞানের সাধনা করিতে হইবে সত্য কি জানিবার জন্য, শক্তির সাধনা করিতে হইবে মানবকল্যাণের জন্য, কিন্তু প্রেমের সাধনা কিসের জন্য? সৌন্দর্য্যের জন্য? বেদনার জন্য? কবি বলিতেছেন, জ্ঞান প্রেম ও শক্তির সমন্বয় করিতে হইবে তবে আনন্দতীর্থে পৌঁছান যায়।

এ বিষয় জয়ন্তর সঙ্গে আলোচনা করিতে হইবে।

ডায়েরি বন্ধ করিয়া অরুণ প্রতিমার ঘরের দিকে চলিল।

প্রতিমা নিশ্চয় তখন ঘুমায় নাই। তাহার এত রাতজাগা উচিত নয়।

গৃহদ্বারের নিকট আসিয়া অরুণ শুনিতে পাইল, প্রতিমা একা ঘরে বসিয়া আপন মনে উচ্চ স্বরে হাসিতেছে। মাথা খারাপ হইল না কি!

ঘরে ঢুকিয়া অরুণ দেখিল, প্রতিমা নিবিষ্ট মনে কি বই পড়িতেছে; ও ডনকুইক্সোট।

—দাদা, কি মজার বই, তুমি আমায় এত দিন দাও নি!

—টুলি, কি মজা? খুব চেঁচিয়ে হাসছিস ত!

—এই তোমার ডন্‌কুইক্সোট গো।

—ওতে হাসবার কি আছে?

—বা, হাসবার নেই? আচ্ছা, উইণ্ডমিলগুলোর সঙ্গে কি ব'লে যুদ্ধ করতে যায়? শোন, আমি একটা কবিতা লিখেছি, তোমার কবিবন্ধু এমন লিখতে পারবে না, ছন্দ মিলেছে—

ডন্‌কুইক্‌সোটের লাগল চোট
রক্ত ঝরিল বক্ষে
অমন কাণ্ড হতেই হবে
দেখে না যারা চক্ষে

দু-চার লাইনে ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করিতে প্রতিমা সুনিপুণা।

অরুণ হাসিয়া বলিল—তুই গল্পটা কিছুই বুঝিস নি, ও কত বড় আইডিয়াল নিয়ে বাহির হয়েছে।

—মাথায় থাক অমন আইডিয়াল, ওর ত বই পড়ে পড়ে মাথা খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, তোমার বন্ধু কি সব বাজে কবিতা লেখেন, এই গল্পটা কবিতায় অনুবাদ করতে ব'লো।

—টুলি, যা বুঝিস না তাই নিয়ে ঠাট্টা করিস না।

—বা আমি ত সিরিয়স্‌লি বলছি।

অরুণ ভাবিল, পৃথিবীর ডন্‌কুইক্সোটদের মেয়েরা কি চিরকাল পরিহাস করিবে, তাহাদের আদর্শ বুঝিয়া ভালবাসিবে না?

—দাদা, তুমি বড় গম্ভীর হয়ে যাও। কিন্তু তোমার কবিবন্ধুটিকে সাবধান ক'রে দিও। আমাদের স্কুলের গাড়ীর ঘোড়াটি ওই উইণ্ডমিলের চেয়েও বেগবান ও সজীব।

—কেন কি হয়েছে?

—কবিটি আর একটু হ'লে ঘোড়া-চাপা পড়তেন, একেবারে আকাশের দিকে চেয়ে হাঁটেন।

—যা, বাজে বকিস না, এখন বই বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়। বেশী পড়লে কি অবস্থা হয়, দেখছিস্ ত ডনকুইক্সোট—

—সেটি তুমিও মনে রেখো। আমি বাপু গল্পটি শেষ না ক'রে শুচ্ছি নে।

—আচ্ছা, আর আধ ঘণ্টা।

—ও, ভুলেই গেছলুম, এই নাও দাদা সেই গানটা।

গানের কাগজখানি লইয়া অরুণ নিজের ঘরে গেল না। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বাগানে বাহির হইয়া গেল। মুঞ্জরিত রক্তকরবীকুঞ্জের ছায়ায় ভগ্ন মর্ম্মর বেদিকায় ধীরে বসিল।

জ্যোৎস্না-নিশীথের নৈঃশব্দ দক্ষিণ সমীরণে ক্ষণে ক্ষণে মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতেছে। সুপ্তসৌধ মহানগরী যেন কোন সুদূরে। এই প্রাচীন পরিত্যক্ত উদ্যানে ঝরা-পাতার গন্ধময় রহস্যান্ধকারে, ঝুরিনামা বটগাছের পুঞ্জীভূত স্তব্ধতায় অরুণ তাহার জীবন-কল্লোলময় বেদনাপূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে একটি শান্তির আশ্রয় লাভ করে; এই নিভৃত নির্জ্জনতায় তরুরেখাবেষ্টিত যে খণ্ডিত আকাশ দেখা যায়, সেই নীলকান্তপ্রভ সুনির্ম্মল আকাশটুকু তাহার নিজস্ব; এই আকাশের সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্তে চুনি-পান্না-গলানো আলো, চন্দ্রমার স্বপ্নময় শুভ্রতা, তারালোকের অসীমতা, নীহারিকার জ্যোতির্ম্ময় বন্যাধারা, এ আলোক অন্ধকার কেবল মাত্র তাহারই। এ শ্যামল বিজনতার আকাশটুকু তাহার একমাত্র সঙ্গী।

আজ কিন্তু সেই পরিচিত নীল যবনিকার নিঃসঙ্গতা রহিল না, নিভৃত আশ্রয়ে নানা গানের সুর ভিড় করিয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

মহিলা-সংবাদ



শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্ত্তী

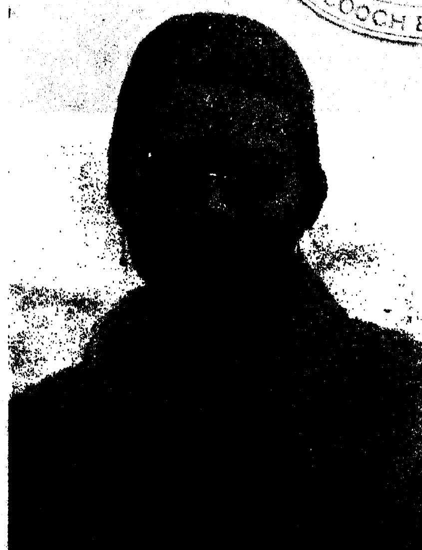


শ্রীমতী মিথোবাঈ এম্ চিন্ময়

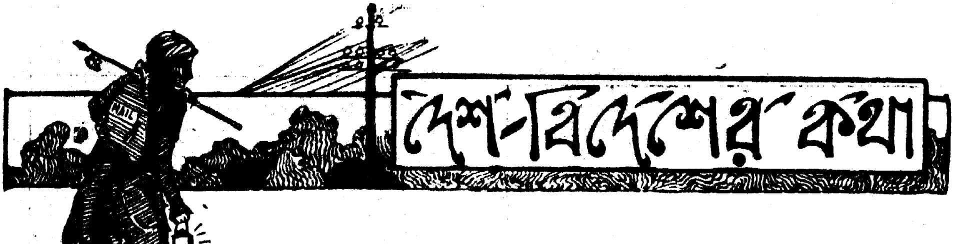
শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্ত্তী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-এ পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

শ্রীমতী মিথোবাঈ এম্ চিন্ময় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় আঠার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি ডক্টর দাদাভাই নওরোজী বৃত্তি পাইয়াছেন।

শ্রীমতী অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে অক্সফোর্ডে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গত বৎসর তিনি অক্সফোর্ড হইতে শিক্ষা বিষয়ে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমতী অমিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও একজন কৃতী ছাত্রী, তিনি এখান হইতে ইংরেজীতে এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তিনি সরকারী বৃত্তি লইয়া অক্সফোর্ডে গমন করিয়াছিলেন।



শ্রীমতী অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়



দেশ-বিদেশের কথা

বাংলা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে চিত্র-প্রতিষ্ঠা—

সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে দুই জন বাঙালী মনীষীর চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাঁরা যথাক্রমে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বি-ই, বিদ্যারত্ন, এম্-আর-এ-এস, এবং রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর। স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয় চিত্র দুইখানি উন্মোচন করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। মুকুন্দবাবুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ-পরিচয় থাকায় বক্তৃতার এই অংশটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। মুকুন্দবাবুর প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

"মুকুন্দদেব যেমন তাঁহার আকৃতির সৌসাদৃশ্যে তেমনি তাঁহার চরিত্রগুণে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি অতি উজ্জ্বলভাবে আনিয়া দিতেন। তিনি পিতার সেই বুঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু দেহ, সেই প্রশস্ত নির্ম্মল ললাট, সেই সৌম্য সহাস বদন পাইয়াছিলেন। আর ভূদেববাবুর মতই ছিল তাঁহার স্থির বুদ্ধি, আত্মসংযম, গভীর সংসারজ্ঞান, নিজসুখে নিস্পৃহতা, লোকহিতপরায়ণতা। আমাদের মহাকবি ভারতের আদর্শ নৃপতির বর্ণনায় বলিয়াছেন—

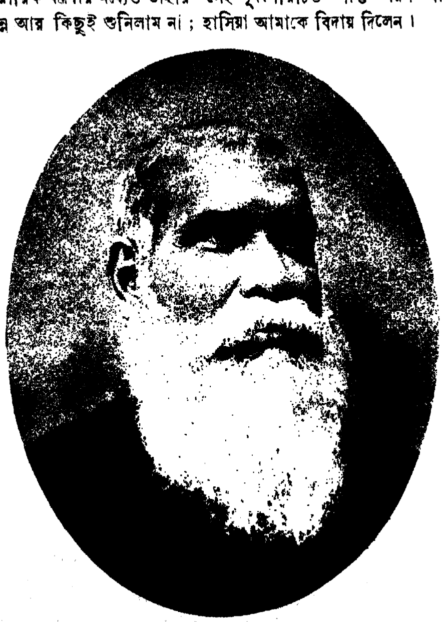
স্বসুখ-নিরভিলাষঃ খিদ্যতে লোকহেতো প্রতিদিনম্।

এই দুটি ব্রাহ্মণ সন্তানের জীবনেও ঠিক সেই কথা সত্য প্রমাণ হইয়াছিল।

পিতাপুত্র দু-জনের চরিত্রেই একাধারে নৈতিক দৃঢ়তা ও জীবের প্রতি অগাধ দয়া মিলিত ছিল। তাঁহাদের হৃদয়ে করুণা আর চোখের কোণে বিশুদ্ধ রসজ্ঞান উঁকি মারিত। তাঁহারা সরকারী কর্ম্ম উপলক্ষে বঙ্গ ও বিহারের অনেক শহরে বাস করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই তাঁহাদের অদম্য ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বমানবপ্রীতির কথা লোকের মনে আছে।

মুকুন্দবাবুর সহিত আমার তিন পুরুষের পরিচয়। ভূদেববাবু আমার পিতার গুরুস্থানীয় ছিলেন, বন্ধু বলিলে অসঙ্গত হইবে, কারণ বাবা তাঁহার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। ভূদেববাবু রেল-সুবিধা হইবার পূর্বে আমাদের রাজশাহীস্থ পৈত্রিক গ্রামে একবার গিয়াছিলেন। আর, মুকুন্দবাবুর সঙ্গে আমি অনেক বৎসর পাটনায় ছিলাম, সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ হইত। তিনি অবসর লইয়া কাশী যাইবার পরও আমি সেখানে অনেক বার তাঁহার অসিধামে গিয়া দেখা করি। এই সব সুযোগে তাঁহার নিকট ভূদেববাবু মাইকেল প্রভৃতির অনেক গল্প এবং মুকুন্দবাবুর নিজ জীবনের অনেক কাহিনী শুনি; এগুলি যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি মনোরম। ইহার কয়টি মাত্র "সদালাপ" ও "ভূদেব-চরিত" গ্রন্থে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও স্থানে স্থানে নাম বদলাইয়া।

শেষবার যখন তাঁহার নিকট যাই, তখন দেখি যে তিনি শয্যাশায়ী, বাতে আক্রান্ত, হাত-পা ফ্লানেলের মোজা ও দাস্তানা দিয়া জড়াইয়া কষ্ট লাঘবের চেষ্টায় আছেন। রোগটি অত্যন্ত ক্লেশকর, তাঁহার তখন বয়সও খুব অধিক, কিন্তু ব্যাধি তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই, শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার সেই পূর্ব্বপরিচিত শান্ত সরস বাণী ভিন্ন আর কিছুই শুনিলাম না; হাসিয়া আমাকে বিদায় দিলেন।



মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়

তিনি জীবনে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক ভূদেব-বাবুর মতই, তাহা নিজ ভোগে ব্যয় না করিয়া নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্যে দান করিতেন। একটি দৃষ্টান্তে তাঁহার চরিত্রের অসাধারণতা দেখাইতেছি—

সেবার পাটনায় বিহার ন্যাশনাল কলেজ অর্থাভাবে ডুব ডুব হইয়াছে, উহা রক্ষার জন্য সভা হইল, সব ন্যাশনাল নেতারা লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিলেন, কিন্তু পয়সা দিলেন না। একমাত্র মুকুন্দবাবু কোম্পানীর কাগজ দান করিলেন, বলিলেন যে ইহা হইতে অন্ততঃ কিছু স্থায়ী আয় হইবে।

মুকুন্দবাবু জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছিলেন। পুত্র সোমদেব থার্ড ইয়ারে উঠিয়া অকালে মারা গেল। পুত্র প্রতিমরাম দেব আমার কলেজে প্রথম হইত, সেও ডেপুটী পদ পাইয়া, অসামান্য নাম ও উন্নতি অর্জ্জন করিয়া, মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী সেই ভীষণ ইনফ্লুএঞ্জা রোগে

হঠাৎ সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মুকুন্দবাবুও শেষবয়সে ব্যাধিতে পড়িলেন। কিন্তু এই মহাপুরুষের ধৈর্য্য ও ধর্ম্মজ্ঞান তাঁহাকে এ-সব রোগশোক নীরবে সহ্য করিতে সমর্থ করিয়াছিল। এমন হৃদয়বল ভূদেব-পুত্রেরই সম্ভবে।

বঙ্গসাহিত্যে মুকুন্দদেবের অনেক দান আছে, তাহা চিরদিনই আদৃত হইবে, কারণ তাহার মধ্যে অনেক মূল্যবান তথ্য নিহিত। "নেপালে ছত্রী," "সদালাপ" ও "ভূদেবচরিত" অনেকেই পড়িয়াছেন। তাহা ভিন্ন অনেক সত্য সদ্‌গল্প তাঁহার মুখ হইতে শুনিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল।



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য কর্ম্মিগণ। ইঁহারা শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন।

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ১৩২৭–১৩৩১ সাল পর্য্যন্ত তিনি ইহার চিত্রশালাধ্যক্ষ ছিলেন। পরিষদ-মন্দিরের



মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

[illegible]-অংশে চিত্রশালা আছে তাহা রমেশ-ভবন নামে পরিচিত। [illegible] রমেশ-ভবনের পরিকল্পনা গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের। তিনি [illegible]কাধারে প্রত্নতাত্ত্বিক ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। ভাস্কর্য্য বিষয়েও [illegible]হার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার পুস্তকাবলীই ইহার [illegible]মাণ। "Orissa and Her Remains," "Vivekananda—[illegible] study," "Handbook to the Sculptures in the Museum [illegible] the Bangiya Sahitya Parishad" প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া দক্ষিণ-ভারতীয় মূর্ত্তিতত্ত্ব সম্বন্ধেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিগত ১৩৩২ সালে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ সনের জানুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ২৪এ জানুয়ারী ইহার প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কলিকাতার কলেজগুলির বহু ছাত্র-ছাত্রী এই উৎসবে যোগদান করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাঙ্গণ হইতে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রাও বাহির হইয়াছিল।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ শতবার্ষিকী—

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ শতবার্ষিকীও সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। ইহা লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের আমলে ১৮৩৫, ২৮এ জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয়। শতবার্ষিকীর স্মৃতিরক্ষার জন্য মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালের একটি নূতন ওয়ার্ড নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র প্রভৃতিরও একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল।

শিক্ষাকার্য্যে দান—

চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত গোবিন্দপুর-নিবাসী শ্রীযুত কালীচরণ কয়াল গোবিন্দপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ষাট হাজার টাকা মূল্যের প্রায় তিন শত পঁচিশ বিঘা জমি দান করিয়াছেন। তিনি আরও দশ হাজার টাকায় বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত জমি হইতে বার্ষিক আয় হইবে আনুমানিক আড়াই হাজার টাকা। কালীচরণবাবুর দান সকল অর্থশালী ব্যক্তির অনুকরণীয়।

অর্থনৈতিক-প্রসঙ্গ

লাঙ্কাশায়ার ও ভারতীয় কার্পাস—

ইংলণ্ডে একটি সমিতি আছে, তাহার নাম "লাঙ্কাশায়ার ভারতীয় কার্পাস কমিটি"। ইহার সভাপতি সার রিচার্ড জ্যাকসন। তিনি গত বৎসর ভারতীয় কার্পাস সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই কমিটির প্রথম বার্ষিক বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে প্রকাশ যে এই কমিটি স্থাপিত হইবার পর ইংলণ্ড কর্তৃক ভারতীয় কার্পাসক্রয় দ্বিগুণ মাত্রা বাড়িয়াছে। সমগ্র লাঙ্কাশায়ারের কলসমূহে ভারতীয় কার্পাসের প্রচলন করাই এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য। যে সকল কল পূর্ব্বে কখনও ভারতীয় কার্পাস ক্রয় করে নাই, এখন তাহারা ভারতীয় কার্পাস ব্যবহার করিয়া ভাল ফল পাইতেছে। চাহিদামত উপযুক্ত পরিমাণে ভাল কার্পাস যাহাতে সরবরাহ হয় ভারতে সে চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। ইতিপূর্ব্বে জাপানই ভারতের বড় খরিদ্দার ছিল কিন্তু এখন জাপান ভারতীয় অপেক্ষা মিশরীয় ও আমেরিকার কার্পাসই বেশী ক্রয় করে। ওদিকে লাঙ্কাশায়ার প্রধানতঃ আমেরিকার কার্পাসের উপরই বস্ত্রশিল্প গড়িয়া তুলিয়াছিল কিন্তু অটোয়া চুক্তির ফলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। লাঙ্কাশায়ারে ভারতীয় কার্পাসের চাহিদা বাড়িয়াছে। ভারতেও স্বদেশীয় শিল্পের পরই লাঙ্কাশায়ারের শিল্পের চাহিদা হওয়া উচিত।

লাঙ্কাশায়ারে ভারতীয় কার্পাসের চাহিদা যাহাতে বাড়ে এই জন্য কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথম লাঙ্কাশায়ার-ভারতের বাণিজ্য যাহাতে অব্যাহত থাকে এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডের বাজারে ভারতীয় কার্পাসের নিয়মিত সরবরাহ ও তৃতীয়তঃ ভারতীয় বাজারে লাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি। ভারতীয় তুলাতে সকল কল বস্ত্র প্রস্তুত করে তাহার তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে।

ভারতীয় কার্পাস সম্পর্কে টেকনিকাল অনুসন্ধান জন্য কমিটি একটি সভা গঠন করিয়াছেন, শিলে ইনস্টিটিউটের সহায়তায় এরূপ সম্মেলন হইয়াছে। এই সভার অনুরোধে গত ১৯৩৪ জানুয়ারী মাসে একটি প্রদর্শনী হইয়াছে। ইহার ফল অতীব সন্তোষজনক।

কমিটি আরও বলেন যে কেবল কার্পাসের উৎকর্ষ সাধিত হইলেই হইবে না, নিয়মিতভাবে সরবরাহ আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে প্রধানতঃ মূল্য সম্পর্কেই প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। কম মূল্য ছিল সকলেরই লক্ষ্য সুতরাং নানা বিভিন্ন শ্রেণীর কার্পাস মিশ্রিত হইত। ফলে তাহার উৎকর্ষ সম্পর্কে কেহই নিঃসন্দিহান হইতে পারিতেন না।

সাম্রাজ্যের ভিতর যে বাণিজ্য আনুকূল্য নীতি বর্ত্তমান সময়ে চলিতেছে সে সম্পর্কে কমিটি বলেন যে বিশ্বব্যাপী অর্থ সঙ্কটে এরূপ ব্যবস্থা সমীচীন। রাজনৈতিক বা সাম্রাজ্য-প্রীতির কথা ছাড়িয়া দিলেও এই ব্যবস্থাই যে ভারত ও ইংলণ্ডের পক্ষে নিরাপদ। সৌভাগ্য-বশতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত ও এরূপ প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ যে বাহিরের সহায়তা ভিন্নও ইহা স্বয়ং নিজকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে পারে। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশ আদান প্রদানের চুলচেরা ভাগ করিতে বসিলে ব্যাপার কঠিন হইবে। যতটুকু দিব ঠিক ততটুকু চাই—সকলের এই দাবি হইলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যাইবে না। অংশীদার-দের পরস্পরের প্রতি আস্থা ও স্বার্থত্যাগের আকাঙ্খা থাকা প্রয়োজন। কেহ কেহ এরূপ কথাও বলেন যে লাঙ্কাশায়ার ভারতে যে বাজার হারাইয়াছে তাহা উপযুক্ত পরিমানে ফিরিয়া না পাইলে ভারতীয় কার্পাস সম্পর্কে সহযোগীতা করা লাঙ্কাশায়ারের পক্ষে উচিত নহে। কিন্তু কমিটী মনে করেন যে অপর পক্ষও অনুরূপ ব্যবস্থা করিবেন এই বিশ্বাসেই পারস্পরিক বাণিজ্য পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষ হইতে তাহারা উৎসাহ পাইবেন এ বিশ্বাস কমিটীর আছে।

ইঙ্গ-ভারত চুক্তি—

এই বিবৃতি ভারতে প্রচারিত হইবার অল্পদিন পরেই রাষ্ট্রীয় পরিষদে "ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি" সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। মতাধিক্যে পরিষদ ইহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পরিষদের এই মত প্রকাশের ফলে ইঙ্গ-ভারত চুক্তি যে বাতিল হইল তাহা নহে।

এদিকে ইংলণ্ডে কমন্‌স্ সভায় ভারতীয় সংস্কার সম্পর্কে বিতর্কে মিঃ এস্ এস্ হামার্সলে বলেন যে রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন ভারতীয়গণ লাঙ্কাশায়ারকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ভারতীয় শাসনযন্ত্রের চাকা লঙ্কাশায়ারে স্বার্থের জন্যই ঘুরে এ ধারণা ভুল! পরিষদের সিদ্ধান্ত নৈরাশ্যজনক কিন্তু লাঙ্কাশায়ার মনে করে যে চুক্তির যুক্তিযুক্ততার উপর পরিষদের এই বিরুদ্ধ মত প্রকাশ হয় নাই, ভারত-সরকার ভারতীয় বণিকমতবাদকে উপেক্ষা করিয়াছেন এই ধারণায়ই এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। যাহাই হউক লাঙ্কাশায়ার বর্ত্তমান নীতি ত্যাগ করিবেন না।

মিঃ এস এস হামার্সলের প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচিব স্যর সামুয়েল হোর কমন্‌স-সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে পরিষদের সিদ্ধান্ত ভারত-সরকার গ্রহণ করিবেন না। এই সিদ্ধান্তে চুক্তির বৈধতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, নীতিরও পরিবর্ত্তন হইবে না।



মহাত্মা গান্ধী

কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা মন্দিরের ছাত্রী শ্রীমতী নলিনীবালা রায় কর্ত্তৃক সূচীশিল্প হইতে।

প্রথম বিলাতযাত্রী বাঙালী চিকিৎসাশিক্ষার্থী ছাত্রগণ



Soorjo Coomar Chuckerbutty Gopaul Chandra Seal Bholanoth Bose Dwarika Nath Das Basu

সূর্যাকুমার চক্রবর্ত্তী, গোপালচন্দ্র শীল, ভোলানাথ বসু, দ্বারিকানাথ দাস বসু।
(১৯২৯ সনের অক্টোবর মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রথম প্রকাশিত)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-দিবস



ছাত্রীদের শোভাযাত্রা—একাংশ



ছাত্রদের শোভাযাত্রা—শ্রীপ্রভাত ঘোষ কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ



শোভাযাত্রার পূর্ব্বে—শ্রীভক্তকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ



বয়-স্কাউট ও গার্ল-গাইড—শ্রীপ্রভাত ঘোষ কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ

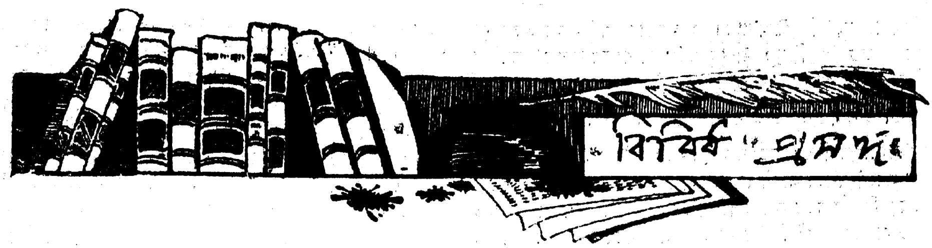


ছাত্র-বাদক বাহিনী

অর্দ্ধোদয় যোগ



অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে স্নানের দৃশ্য

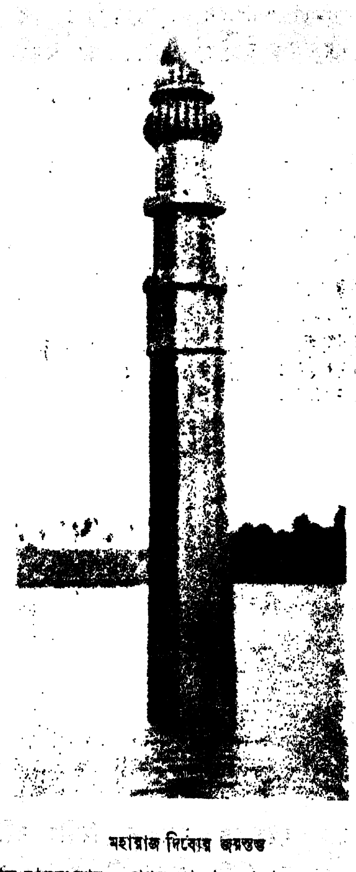


বঙ্গে অষ্টম শতাব্দীতে নৃপতি-নির্ব্বাচন

দিনাজপুর জেলার দিবর গ্রামের "দিব্য" দীঘির গর্ভে প্রতিষ্ঠিত একটি স্তম্ভ আছে। উহা মহারাজ দিব্য বা দিব্বোক কর্তৃক নির্ম্মিত জয়স্তম্ভ বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। উহার একটি চিত্র ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "গৌড় রাজমালা" গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে উহা দিব্যের জয়স্তম্ভ। এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত না হইলেও অনেকেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

গত ২৬শে মাঘ এই দীঘির নিকট মহারাজ দিব্যের সিংহাসন-আরোহণ দিবসের স্মৃতি-উৎসব হইয়া গিয়াছে। সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, প্রত্নতত্ত্ববিৎ রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ। তাঁহার অভিভাষণে তিনি দিব্যের বিষয় বিবৃত করিবার পূর্ব্বে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে গোপাল দেব প্রজাদের দ্বারা নৃপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন ; বলিয়াছেন ঃ—

আমাদের দেশে মহাত্মা, মহাজন, মহাপুরুষ বলিতে আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধ পুরুষই বুঝায়। কিন্তু ঐহিক জগতে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রকৃত মহৎকার্য্য সাধন করিতে হইলেও সংযমের সহিত সাধনার আবশ্যক। এইরূপ ঐহিক সাধনায় সিদ্ধপুরুষও মহাপুরুষরূপে গণনীয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমরা এইরূপ মহাপুরুষদিগকে পূজা করিতে শিখিয়াছি। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস রাজার এবং রাজপুরুষগণের লীলাক্ষেত্র। এই সকল রাজা এবং রাজপুরুষের মধ্যে মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাধনরত, এবং সাধনায় যথা-সম্ভব সিদ্ধ, মহাপুরুষের অভাব নাই। কিন্তু আদৌ স্বেচ্ছায় নহে, জনসাধারণের দ্বারা আহুত বা নির্ব্বাচিত হইয়া, রাষ্ট্রীয়সাধন-সমরে অবতীর্ণ হইয়া যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে সুলভ নহে। সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ দুই জন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই দুই জনের মধ্যে এক জন, পাল-রাজবংশের প্রথম রাজা গোপালদেব, যিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জনসাধারণ কর্ত্তৃক অরাজকতা নিবারণের জন্য রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ; দ্বিতীয়, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সংঘটিত রাষ্ট্রবিপ্লবের নায়ক দিব্য, যাঁহার স্মৃতির পূজার জন্য আজ আমরা মিলিত হইয়াছি।



মহারাজ দিব্যের জয়স্তম্ভ

পাল-রাজবংশের প্রথম রাজা গোপাল দেবের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ধর্ম্মপাল দেবের তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে আছে ঃ—

"মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ শ্রীগোপাল-ইতি ক্ষিতীশশিরসাংচূড়ামণিস্তৎসুতঃ।" "তাঁহার (বপ্যটের) পুত্র

নৃপতিগণের চূড়ামণি শ্রীগোপাল। মাৎস্যন্যায় অর্থাৎ অরাজকতা দূর করিবার জন্য প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার অর্থাৎ গোপালের করে রাজলক্ষ্মীকে অর্পণ করিয়াছিলেন।''

রমাপ্রসাদবাবু তাঁহার অভিভাষণে দেখাইয়াছেন, যে,

"গোপালের নির্ব্বাচনের কাল খুব সম্ভব খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের শেষ-ভাগ" এবং নির্ব্বাচন আদৌ বর্ত্তমান মালদহ দিনাজপুর রাজশাহী বগুড়া ও পাবনা জিলার সমষ্টি প্রাচীন বরেন্দ্রীতে হইয়াছিল। "কিন্তু বাঙ্গলার অন্যান্য প্রদেশেরও এই নির্ব্বাচনে সম্মতি থাকা সম্ভব * * * গোপালের নির্ব্বাচনের সময়ে বাঙ্গলার অপরাপর অংশের, বিশেষতঃ রাঢ়ের, অধিবাসিগণ বারেন্দ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।"

গোপালের অসাধারণ রণনৈপুণ্য, বিনয় এবং রাষ্ট্রকে শান্তিসুখ দান ও রাষ্ট্রের কল্যাণসাধনের ক্ষমতা ছিল। "ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই মহাপুরুষের তুলনা পাওয়া যায় না।"

বঙ্গে নৃপতি-নির্ব্বাচন মুসলমান রাজত্বকালেও একবার হইয়াছিল।

''খোজা রাজা মজঃফর সাহের অত্যাচারে উৎপীড়িত হিন্দু মুসলমান নায়কগণ একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন এবং এই বিদ্রোহের নায়ক মজঃফরের উজীর আলাউদ্দিন হোসেন সাহ নামক এক যোগ্য ব্যক্তিকে সকলে মিলিয়া রাজা নির্ব্বাচিত করেন।'' (ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ৫ম। ৬ষ্ঠ মানের পাঠ্য ভারতের ইতিহাস, ৮৭ পৃষ্ঠা ও ম্যাট্রিক পাঠ্য ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১৩৭ পৃষ্ঠা ১৯৩৩ অব্দে প্রকাশিত)।

মহারাজ দিব্য

রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহার অভিভাষণে সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত "রামচরিত" এবং কোন কোন তাম্রশাসনের বিচার করিয়া মহারাজ দিব্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন।

"প্রকৃতিপুঞ্জকর্ত্তৃক গোপালের রাজপদে প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন শত বৎসর পরে বাঙ্গলায় আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনা, রাষ্ট্রবিপ্লব, ঘটিয়াছিল। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের অনন্তসামন্তচক্রের নির্ব্বাচিত নায়ক ছিলেন দিব্য বা দিব্বোক।''

বিদ্রোহ হইয়াছিল মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে—যেহেতু তিনি অত্যাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন।

''গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় মহীপাল সন্দেহের বশে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়, শূরপাল এবং রামপালকে, লোহার শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বিপ্লবের অপর কারণ স্বরূপ কবি বলিয়াছিলেন, মহীপাল 'অনীতিকারম্ভরত,' অর্থাৎ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে রত, এবং 'ভূতনয়াত্রাণযুক্ত,' অর্থাৎ সত্যের এবং নীতির মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী ছিলেন। দিব্যের বিদ্রোহ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না; ঘটনাচক্রে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া তিনি রাজদ্রোহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দিব্য উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া বরেন্দ্রী অধিকার করেন নাই, উপায়ান্তর না থাকায় রাজপদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভণ্ড তপস্বী হওয়া দোষের কথা, কিন্তু ভণ্ড বিদ্রোহী, অর্থাৎ যে সাধ করিয়া বিদ্রোহ করে না, কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে বিদ্রোহ করে, সে মহৎ ব্যক্তি। এই বিদ্রোহ কোন জাতিবিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। ইহা সার্ব্বজনীন বিদ্রোহ বা রাষ্ট্রবিপ্লব।''

রমাপ্রসাদ বাবু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ঐতিহাসিক। রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্ব ও আন্দোলন তিনি করেন না, তাহা তাঁহার কাজ নয়। এই কারণেই তাঁহার অভিভাষণের শেষে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রণিধানযোগ্যতা বাড়িয়াছে। তিনি বলিয়াছেন :—

''মিলিত অনন্ত সামন্তচক্র নির্ব্বাচিত গোপাল দেব এবং দিব্য জাতিবর্ণের অতীত মহাপুরুষ ছিলেন। সেকালের সামন্তচক্রের স্থলবর্ত্তী বর্ত্তমান জননায়কগণ। গোপাল দেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন সার্দ্ধ একাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে এবং দিব্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন সার্দ্ধ আট শত বৎসর পূর্ব্বে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পরিবর্ত্তন আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তি পল্লীসমাজ, যাহা মুসলমানগণকেও আপনার করিয়া ভাই চাচা, নানায় পরিণত করিয়াছিল, তাহা প্রাণ হারাইয়াছে, এবং পল্লীসমাজের প্রাণশূন্য দেহ এখন আবার খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রনীতির বর্ত্তমান লক্ষ্য স্বাধীনতা, কিন্তু স্বাধীনতা চরম লক্ষ্য (end) নহে চরম লক্ষ্যে পঁহুছিবার পথ (means) মাত্র। রাষ্ট্রনীতির চরম লক্ষ্য, সার্ব্বজনীন কল্যাণ, সার্ব্বজনীন সুখসম্পদ।

''এই লক্ষ্যে পঁহুছিতে হইলে সেকালেও যে উপায় অবলম্বন করিতে হইত, এখনও তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সেই উপায় অনন্তসামন্তচক্রের মিলন; সকল জনসেবকের ঐক্য। এরূপ ঐক্য বর্ত্তমানে অসাধ্য মনে হয়। যে দুই জন মহাপুরুষ বিশেষ বিপদকালে এদেশে অনন্ত-সামন্তচক্রের মঙ্গলময় ঐক্যের সুমতি উদ্‌বোধিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চরিতকথা আমাদের স্মরণীয়, মাননীয় এবং কীর্ত্তনীয়। এইরূপ স্মরণ, মনন, কীর্ত্তন আমাদের মনে ঐক্যের সুমতি উদ্বোধনের সহায়তা করিতে পারে। ইহাই দিব্যস্মৃতি-উৎসবের সার্থকতা। আর এক কারণেও এই উৎসব বড় সময়োপযোগী হইয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী আজ আত্মনির্ভর এবং আত্মমর্য্যাদা হারাইয়াছে। তাহাকে আবার দেশের দিকে ফিরাইয়া আনায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় দেখা যায় না।''

সুভাষ বাবুর পুস্তক ভারতে নিষিদ্ধ

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ইউরোপে থাকিবার সময়ে ভারতবর্ষের আধুনিক স্বাধীনতালাভ-প্রয়াস সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লেখেন। তাহারই একটি টাইপলিপি

মত নূতন আইন ইঁহারা করেন, পুরাতন আইনের সংশোধন করেন, এবম্বিধ কাজ। ইত্যাকার কাজ করিতে গিয়া ব্যবস্থাপক সভায় ইঁহাদের পরাজয় হইলে, অর্থাৎ যত প্রতিনিধি ইঁহাদের দিকে ভোট দেয় ইঁহাদের বিরুদ্ধে তার চেয়ে বেশী লোক ভোট দিলে, ইঁহারা পদত্যাগ করেন। তখন নূতন প্রতিনিধিনির্ব্বাচন দ্বারা বা অন্য প্রকারে নূতন মন্ত্রীমণ্ডল ও "গবন্মেণ্ট" গঠিত হয়।

এই প্রকারে প্রজাদের প্রতিনিধি-দিগের দ্বারা যে সব দেশের রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় জয়পরাজয়ের সদ্য সদ্য একটা ফল ফলে। আমাদের দেশের ব্যবস্থাপক সভায় জয়পরাজয়ে এরূপ কিছু ঘটে না, ঘটিতে পারে না। ইংরেজ জাতি ভারতের প্রভু। তাহারা ইংলণ্ড হইতে শাসনকর্ত্তা পাঠায়। সেই কর্ত্তারা "গবন্মেণ্ট"। ব্যবস্থাপক সভার ভোটে এই "গবন্মেণ্টকে" যতবারই পরাজিত কর না, ইহারাই গবন্মেণ্ট থাকিবে, জয়ী ভারতীয় প্রতিনিধিরা মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিয়া "গবন্মেণ্ট" নামধেয় হইতে পারিবে না। সুতরাং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় জয়পরাজয়ে ইংরেজদের কিছু আসে যায় না। গবন্মেণ্ট পক্ষ পরাজিত হইয়াছে বলিয়া যে শরৎ চন্দ্র বসুর মুক্তি হইবে, কিংবা তথাকথিত ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য-চুক্তি নাকচ হইবে, তাহার বিন্দুমাত্রও আশা নাই। মিঃ মোহম্মদ আলী জিন্নার সংশোধক প্রস্তাবের শেষ দুই অংশ অধিকাংশ ভোটদাতার ভোট অনুসারে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া যে বিলাতী গবন্মেণ্ট দেশী রাজ্যগুলির সহিত ফেডারেশ্যন ত্যাগ করিয়া কেবল ব্রিটিশ ভারতের জন্যই নূতন শাসনবিধি প্রণয়ন করিবেন বা ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলির লোক-দিগকে সত্যকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিছু দিবেন, এরূপ মনে করা দুরাশা মাত্র।



স্যার আবদুর রহিম

তবে, মিঃ জিন্নার সংশোধক প্রস্তাবের প্রথম অংশ গৃহীত হওয়ায় কুফল ফলিবে। তাহা গৃহীত না হইলেও প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কোন পরিবর্ত্তন হইত না, এখনও ভালর দিকে পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু এখন এই কুফল হইল, যে, ইংরেজরা ইহা বলিবার সুযোগ

পাইল, যে, ভারতবর্ষের লোকেরা বাঁটোয়ারাটা গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেস পার্লেমেণ্টারী দলের "না-গ্রহণ না-বর্জ্জন" নীতির এই ব্যাখ্যা বিলাতের সরকারী লোকেরা করিয়াছে, যে, কংগ্রেস বাঁটোয়ারাটা মানিয়া লইয়াছে, উহাতে সায় দিয়াছে। এই ব্যাখ্যাটা এখন জোর পাইল।

—

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ও ডেপুটী সভাপতি

স্যার আবদুর রহিম ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ও শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত তাহার ডেপুটী সভাপতি



শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত

নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উভয়েই যোগ্য ব্যক্তি। স্যার আবদুর রহিম মেদিনীপুরের ও শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত কুমিল্লার অধিবাসী।

—

নিখিলব্রহ্ম ভারতীয়-শ্রমিক কন্‌ফারেন্স

প্রথম নিখিলব্রহ্ম ভারতীয়-শ্রমিক কন্‌ফারেন্স ভারত-গবর্ন্মেণ্টের নিকট নিজ মতামত জানাইবার জন্য দুই জন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। ইঁহাদের নাম শ্রীযুক্ত ঈ পী



শ্রীযুক্ত ঈ পী পিলেই শ্রীযুক্ত ডক্টর লঙ্কাসুন্দরম্

পিলেই ও শ্রীযুক্ত ডক্টর লঙ্কাসুন্দরম্। ইঁহাদের চেষ্টায় ব্রহ্মদেশের ও তথাকার ভারতীয় শ্রমিকদের কল্যাণ হইলে সুখের বিষয় হইবে।

—

কংগ্রেস পার্লেমেণ্টারী দলের কার্য্যতঃ দেশদ্রোহিতা

কংগ্রেস এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছে, যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটা ঠিক্ নয়, কিন্তু যে-হেতু সকল সম্প্রদায় উহার বিরোধী নহে, অতএব কংগ্রেস উহা গ্রহণও করে না, বর্জ্জনও করে না। কংগ্রেসের এই প্রকার মতের সমালোচনা আমরা 'প্রবাসী'তে এবং বিশেষ করিয়া আমাদের ইংরেজী মাসিক পত্রে করিয়াছি। এখন পুনর্ব্বার তাহা করিব না। এখন আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, কংগ্রেস পার্লেমেণ্টারী দলের নিজের মতে স্থির থাকা উচিত। মিঃ জিন্নার প্রস্তাবের প্রথম অংশের বিরুদ্ধে তাঁহারা ভোট না দেওয়ায়, তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকায়, তাঁহাদের সঙ্গতি রক্ষা হয় নাই—তাঁহারা কার্য্যতঃ দেশদ্রোহী হইয়াছেন। অবশ্য দেশদ্রোহিতা করা তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না।

কংগ্রেস পার্লেমেণ্টারী দলের মত এই, যে, তাঁহারা বাঁটোয়ারাটা গ্রহণও করেন না, বর্জ্জনও করেন না। সুতরাং ইহার সোজা মানে এই, যে, কেহ যদি উহা গ্রহণ করেন, তাঁহার বিরোধী তাঁহারা, এবং কেহ যদি

উহা বর্জ্জন করেন, তাঁহারাও বিরোধী তাঁহারা ;—কেবল মাত্র যিনি উহা "গ্রহণ করেন না বর্জ্জনও করেন না" তিনিই তাঁহাদের দলভুক্ত।

মিঃ জিন্নার প্রস্তাবের প্রথম অংশ বলিতেছে, "এই ব্যবস্থাপক সভা, বাঁটোয়ারাটা যত দূর গিয়াছে তত দূর, উহা গ্রহণ করিতেছে।" ব্যবস্থাপক সভার যে সব সভ্য উহা গ্রহণ করেন না (এবং বর্জ্জনও করেন না) তাঁহাদের নিশ্চয়ই বলা উচিত ছিল, "না, আমরা উহা গ্রহণ করি না।" তাহার পর যদি আর কেহ প্রস্তাব করিতেন, "এই ব্যবস্থাপক সভা বাঁটোয়ারাটা বর্জ্জন করিতেছে," তখনও তাঁহাদের বলা উচিত ছিল, "না, আমরা উহা বর্জ্জন করি না।" অবশ্য, দুইবার এই দুই রকমে ভোট দিলে তাহা একটা হাস্যকর ব্যাপার হইত। কিন্তু উপায় কি? তাঁহাদের "না-গ্রহণ না-বর্জ্জন" ব্যাপারটাই যে হাস্যকর। উহার সোজা মানে দাঁড়াইয়াছে "গ্রহণ," এবং জিনিষটা ভাল বলিয়া গ্রহণ নহে—সাহস ও দৃঢ়তার অভাব রাষ্ট্রনৈতিক কূট চা'ল ভেদ করিবার শক্তির অভাবে গ্রহণ, কয়েক জন স্বাজাতিকতার ছদ্মবেশ ও ছদ্মনাম-ধারী চতুর লোকের ছলনায় প্রতারিত হইয়া গ্রহণ।

—

ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় সম্মতির মূল্য

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা কি পরিমাণে দেশের লোকদের প্রতিনিধিস্থানীয় তাহার আলোচনা না করিয়া, ইহা ধরিয়া লওয়া যাক্ যে, উহার নির্ব্বাচিত সদস্যেরা দেশের লোকদের প্রতিনিধি। তাহা হইলে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দেশের লোকে অনুমোদন করে কি না তাহা ব্যবস্থাপক সভার ভোট দ্বারা স্থির করিতে হইলে, কেবল নির্ব্বাচিত সদস্যদেরই ভোট লওয়া উচিত ছিল। তাহা না করিয়া গবন্মেণ্ট সরকারী সদস্য এবং সরকারের মনোনীত সদস্যদিগকেও ভোট দেওয়াইয়াছেন। ইঁহাদের ভোটের সাহায্যে, এবং তদুপরি কংগ্রেস পার্লেমেণ্টারী সদস্যদের নিরপেক্ষতায়, যে প্রস্তাবটি অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হইয়াছে, তাহা দেশের লোকদের অনুমোদিত বলিলে নিতান্ত মিথ্যা কথা বলা হইবে।

মিঃ জিন্নার প্রস্তাবের সমর্থক ৬৮ জন সদস্যের মধ্যে ২৫ জন গবন্মেণ্ট সদস্য, ৯ জন গবন্মেণ্ট-মনোনীত সদস্য, এবং বাকী ৩৪ জন মুসলমান সদস্য। সুতরাং অ-মুসলমান নির্ব্বাচিত সদস্য এক জনও উহার পক্ষে ভোট দেন নাই। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে, কংগ্রেসের "না-গ্রহণ না-বর্জ্জন" নীতি মুসলমানদিগকে খুশী করিবার জন্য অভিপ্রেত হইলেও, এক জন অকংগ্রেসী মুসলমান সদস্যও একারণে নূতন করিয়া কংগ্রেসী দলে গিয়া ভোটের সময় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন নাই।

—

ঢাকায় সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের শাখায় বাঙালী এজেণ্ট

সেণ্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ভারতবর্ষের একটি প্রধান ব্যাঙ্ক। ঢাকায় সম্প্রতি ইহার একটি শাখা খোলা হইয়াছে।



শ্রীযুক্ত গোকুলকৃষ্ণ দে ধাড়া

শ্রীযুক্ত গোকুলকৃষ্ণ দে ধাড়া ইহার এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্যাঙ্কের কার্য্যে তাঁহার অনেক বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে। তিনি বিশেষ যোগ্য ব্যক্তি না হইলে বোম্বাই-ওয়ালাদের ব্যাঙ্ক ইহার একটি শাখায় এক জন বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করিত না। আশা করি, তাঁহার ও তাঁহার মত অন্য বাঙ্গালীদের দ্বারা বঙ্গে বাঙ্গালীদের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা হইবে।

—

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এবং স্বয়ং তথাকার এক জন প্রধান অমাত্য ও জায়গীরদার



ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয়ের আনন্দ আমরা পাইয়াছিলাম। বঙ্গদেশে জলপ্লাবনাদিতে মানুষ বিপন্ন হইলে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সাহায্য পাঠাইতেন। ইহা আমরা সাক্ষাৎভাবে জানি। পাঠকবর্গ তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় জয়পুর-প্রবাসী ডাক্তার পান্নালাল দাস কর্ত্তৃক 'প্রবাসী'র জন্য লিখিত নিম্নমুদ্রিত প্রবন্ধটি হইতে পাইবেন :—

কালের পরিবর্ত্তনে যদিও বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমশই বিরল হইতেছে ; যদিও পূর্ব্বের মত রাজস্থানের বিবিধ রাজ্যে, মন্ত্রী-পদাধিষ্ঠিত বি[illegible] ভট্টাচার্য্য, হরিমোহন সেন, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সংসারচন্দ্র সেন, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ বিশ্বাস ও মতিলাল ভট্টাচার্য্য প্রমুখ মনীষী প্রবাসী বাঙ্গালীর আর আবির্ভাব নাই ; তথাপিও যাঁহারা সেই স্বনামধন্য পুরুষপ্রবরদের কীর্ত্তিরশ্মির অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম এক জন ছিলেন রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এত দিন প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা করিয়া তিনি আজ বিধাতার আহ্বানে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

গত ১৯শে জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যার সময় চন্দ্রগ্রহণের কিছু পূর্ব্বে তিনি স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। কৌন্সিলের সদস্য-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনার ফলে পীড়িত হইয়া তাহার পরিণামেই একদিন মাত্র অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন।

রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভূতপূর্ব্ব জয়পুর নরেশের প্রধান অমাত্য রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সি-আই-ই, মহোদয়ের তৃতীয় পুত্র। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জয়পুর নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা জয়পুরেই হয়। এখানে মহারাজার কলেজে বি-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার পিতার নিকট হইতে নৈতিক ও রাষ্ট্র-শাসন পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভ করেন। পরে উপযুক্ত হইলে জয়পুরাধিপতি মহারাজা সওয়াই মাধো সিংজী সাহেব বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার পিতা কান্তিবাবু তাঁহাকে আপীল কোর্টের জজ রূপে নিযুক্ত করেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কান্তিবাবু গবর্ণমেণ্ট দ্বারা ভারতীয় দুর্ভিক্ষ-নিবারণ কমিশনে সদস্য মনোনীত হইলে, মহারাজ ভারতের হিতকর ঐ কার্য্যে তাঁহাকে প্রেরণ করেন। তখন কান্তিবাবুর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায়, বড়লাট লর্ড কর্জ্জন স্বয়ং তাঁহার পুত্র ঈশান বাবুকে পিতার সাহচর্য্যে থাকিতে অনুমতি প্রদান করেন। এই বিশেষ কার্য্যে থাকাতে এবং বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করাতে তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মে। কমিশন যখন নাগপুরে আসেন, তখন দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ কান্তিবাবুর পীড়া বৃদ্ধি পাওয়াতে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

এই অভাবনীয় ঘটনাতে গভর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং ঈশান বাবুকে যথারীতি সান্ত্বনা প্রদান করিতে বিলম্ব করেন নাই। নাগপুর শহরে কান্তিবাবুর স্মারক-মন্দির নির্ম্মাণ জন্য এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড দান করেন, যাহাতে ঈশানবাবু তাঁহার পিতার স্মরণার্থে এক স্মারক-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর নাম অক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। মহারাজা মাধো সিংজী তাঁহার বিশ্বস্ত প্রধান অমাত্যের অকালমৃত্যুতে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং অনন্যোপায় হইয়া কৌন্সিলের সদস্য পদে উন্নীত করিয়া, আপনার "গুরুভাই" ঈশানবাবুকে রাজ্যশাসনের গুরুভার অর্পণ করেন ; এবং গুরুভাইকে গুরুপদে বরণ করেন। কান্তিবাবু ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দেহত্যাগ করেন। মহারাজা এপ্রিল মাসেই ঈশানচন্দ্রকে কৌন্সিলের সদস্যপদ দেন, এবং কান্তিবাবুর মৃত্যুর এক মাসের মধ্যেই তাঁহাকে তাজিমী সরদার পদে জায়গীরদার স্বীকার করিয়া "মহাৎমী" অর্থাৎ সনদ দিবার জন্য তাঁহার বাটীতে স্বয়ং আসেন। এত অল্প সময়ে, অর্থাৎ কোন জায়গীরদারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রের মহাৎমী, এক মাসের মধ্যে হয় না। কিন্তু অধ্যয়রাও মহারাজ মাধো সিংজী তাঁহার 'গুরুভাই'এর জন্যই এরূপ অনুগ্রহ দেখাইয়া শীঘ্রই মহাৎমী করেন।

কান্তিবাবুর জীবদ্দশায় ঈশানচন্দ্র বিবিধ রাজকার্য্যে পিতার সহকারী রূপে থাকায় হাতেকলমে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার তাঁহার সুযোগ হয়। সে

শিক্ষা ভবিষ্যতে কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ উপকারে আসে। কৌন্সিলের সকল বিভাগেই রাজস্ব ফৌজদারী দেওয়ানী প্রভৃতিতে এরূপ যোগ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত তিনি কার্য্য করেন যে, রাজা প্রজা সকলেরই অল্পসময়ের মধ্যে প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন। তাঁহার সহকর্ম্মী অন্যান্য সদস্যবর্গ পলিটিকাল অফিসার ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা সকলেই তাঁহার বিচারে নির্ভীকতা ও সততার জন্য মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি যে রাজ্যশাসন কার্য্যে এক স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন তাহা তাঁহারা মনে করেন।

মহারাজ সওয়াই মাধো সিংজী সাহেব বাহাদুর স্বর্গলাভ করিবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে অসুস্থ হইয়া থাকেন; তাহার জন্য তিনি রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিদর্শন করিতে না পারায় কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর সওয়াই মহারাজা মানসিং বাহাদুরের নাবালকতায় ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট একটি কমিটি গঠন করিয়া ঐ বিশৃঙ্খলতা দূর করিতে মনস্থ করেন, এবং ঈশানবাবুকে একমাত্র উপযুক্ত সদস্য নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহাকে ঐ কমিটিতে নিযুক্ত করেন। তাঁহার অভিজ্ঞতার ফলে রাজ্যের ঐ বিশৃঙ্খলতা দূর হয় এবং অপরাধীরা দণ্ডিত হয়। এই জটিল কর্ম্মের সমাধানে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট অতীব প্রীত হইয়া তাঁহাকে জানুয়ারী ১৯২০ খ্রীঃ অব্দে রায় বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করেন।

কৌন্সিলের সদস্য পদের নির্দ্ধারিত বেতন আছে, কিন্তু ঈশান বাবু তাঁহার পৈতৃক জায়গীরের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া, অনেক দিন অবৈতনিক ভাবেই কর্ম্ম করেন। পরে মহারাজার আদেশানুসারে ঐ নির্দ্ধারিত বেতন গ্রহণ করেন।

গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে চালিত কৌন্সিল অব রিজেন্সীতেও বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া তিনি ইংরেজ রাজপুরুষদের বিশ্বাসভাজন ও শ্রদ্ধার পাত্র হন। তিনি এমন স্বাধীনচেতা ও উচিতবক্তা ছিলেন যে নিজের সুবিবেচিত মত পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেন না, তজ্জন্য ক্ষতিস্বীকার করিতেও প্রস্তুত হইতেন।

ঈশানচন্দ্রের পিতামাতা তাঁহাকে আদর করিয়া "হাতি" বলিয়া ডাকিতেন। তাই সাধারণ্যে "হাতি বাবু" নামেই তিনি প্রসিদ্ধ।

১৯২৫ অব্দে শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও কখনই তিনি আলস্যে কালক্ষেপ করিতেন না। স্বর্গলাভের এক দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও দৈনিক বিষয়কর্ম্ম, পুস্তকপাঠ, উদ্যান-পরিদর্শন প্রভৃতি কোন কার্য্যই অসমাপ্ত রাখেন নাই।

উদ্যানের উন্নতি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা তাঁহার এক প্রধান দৈনিক কর্ম্ম ছিল। প্রাতে, সায়াহ্নে, নিয়মিত ভাবে উদ্যান পরিদর্শন ও উদ্যানপালদের কার্য্য দেখান, তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিত। দূর দেশ হইতে আনীত বহুমূল্য নানাবিধ বৃক্ষলতাদিতে তাঁহার মনোরম উদ্যানটি সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার বাগানের আম্র এত সুবাসিত ও উত্তম, যে, মহারাজা তাঁহার নিজের ব্যবহারের জন্য কয়েকটি বৃক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, এবং দূর প্রবাসে বা তীর্থস্থলে থাকিলেও তথায় বিশ্বস্ত লোকের হস্তে ঐ আম্র তাঁহাকে অতি যত্নের সহিত পাঠাইতে হইত। এরূপ সুন্দর উদ্যান যে-কোন নগরেরই গৌরবকর। বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা ব্যতিরেকে তাঁহার প্রাসাদতুল্য সৌধমালাকেও সর্ব্বদা সংস্কৃত ও শোভিত করিতে উচ্চদরের শিল্পী নিযুক্ত করিয়া প্রত্যহ তাহাদের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। ইহা অপেক্ষাও তাঁহার সংস্কৃতির অধিক পরিচায়ক তাঁহার বহুমূল্য ও সুন্দর পুস্তকাগার। এই পুস্তকাগারে শিক্ষানুরাগী সকলেরই অবারিতদ্বার ছিল। তাঁহার পছন্দসই কোন পুস্তক, কি ইংরেজী, কি বাংলা, কি হিন্দী, কি সংস্কৃত, কি উর্দ্দু, যখনই যাহা প্রকাশিত হইত, তখনই তিনি তাহা আনাইয়া নিজে পাঠ করিয়া বা পাঠ করাইয়া আলমারী শোভিত করিতেন। যখন কোন কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতা বা অন্য নগরীতে যাইতেন, তখন পুরাতন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করা তাঁহার এক বিশেষ কার্য্যের মধ্যে ছিল। তিনি পুরাতন পুস্তকালয়গুলি অনুসন্ধান করিয়া তথায় নিজে গিয়া পুস্তক-বিক্রেতাদিগকে অতিরিক্ত মূল্যে পুস্তক ক্রয় করিয়া উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার পুস্তকাগার সংরক্ষণের জন্য মুন্সী ও দপ্তরী প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল।

ধর্ম্মবিষয়ে তিনি সনাতনপন্থী হইলেও, তাঁহার ধর্ম্মমত উদার ছিল। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সকলকেই সমদৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাঁহারাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তির চক্ষে দেখিত।

৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথমা পত্নীর স্বর্গলাভ হয়। আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ও মহারাজার আদেশে তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন।

জয়পুর-প্রবাসী হইলেও তিনি তাঁহাদের পৈত্রিক বাসভূমিকে ভুলেন নাই। শ্যামনগরের নিকট রাহুতা তাঁহাদের আদিম গ্রাম। সে গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে তিনি উদাসীন ছিলেন না। তাহার রাস্তাঘাট স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি সমস্ত সৎকার্য্যেই তাঁহার আগ্রহ ছিল এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যে শিক্ষাবিস্তার, তাহাতে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া "কান্তিচন্দ্র হাই স্কুল" নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, তাহার সমস্ত খরচ বহন করিয়া দেশের সকলেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

বাহ্যিক আকৃতি প্রকৃতিতে তিনি সম্পূর্ণ আড়ম্বরশূন্য ও আভিজাত্য-গর্ব্বহীন ছিলেন। আভিজাত্যমণ্ডিত এ রাজস্থানের কায়দা-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন না। সাধারণ কর্ম্মচারী প্রভৃতির সহিত একাসনে বসিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। তাঁহার এই অমায়িক ব্যবহার এদেশে আদব-কায়দার খেলাপ-ভ্রমে, লোকে প্রথমে তাহা তত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না। কিন্তু পরে তাঁহার গুণগ্রামের ও সদ্ব্যবহারের পরিচয় পাইলে, স্বতঃই তাহাদের আদব-কায়দাজড়িত মস্তক শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে অবনত হইত।

অভ্যাগত বাঙ্গালীরা তাঁহার ধর্ম্মশালায় আদরের সহিত স্থান পাইতেন এবং যাহাতে বাঙ্গালীর কোন উপকার হয় তিনি তাহা করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। জয়পুর-প্রবাসী বাঙ্গালীদের নেতাস্বরূপ হইয়া তিনি অনেকের দুঃখকষ্ট নিবারণ করিয়াছেন। গত পাঁচ বৎসর তাঁহার নেতৃত্বে সকল বাঙ্গালী একনিষ্ঠ হইয়া শারদীয়া বারোয়ারী পূজা উপলক্ষ্যে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। তাঁহার মহিমাময়ী ভার্য্যার বার-ব্রত উপলক্ষ্যে রাস দোল প্রভৃতি উৎসবে সুদূর এই মরুভূমিতেও ভক্তি-উৎস প্রবাহিত হইত। শিল্প, নাট্যকলা ও সঙ্গীতেও তাঁহার বিলক্ষণ সহানুভূতি ছিল। সে-সব আজ প্রবাসী বাঙ্গালীদের মানসপটে মরীচিকামাত্র প্রতীত হইতেছে!

বাল্যকালে তাঁহার দুই অগ্রজের অকালমৃত্যুতে ঈশানচন্দ্র পৈত্রিক বিস্তীর্ণ জায়গীর, স্বর্ণদালকারভূষিত তাজিমী সরদারী ও গুরুপদের অধিকারী হন।

তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত দুই পুত্র ও দুই কন্যা এবং কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত দুই পুত্র ও দুই কন্যা এবং তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বৃহৎ পরিবারবর্গ বন্ধুবান্ধব [illegible] তাঁহার মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রেরা সকলেই শিক্ষিত এবং আশা করা যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র

শ্রীমান্ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, বি-এ, মহাশয় তাঁহার পৈত্রিক বিষয় ও মর্য্যাদার অধিকারীরূপে তাঁহাদের বংশগৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর মুখোজ্জলকারী হইবেন।

—

মিঃ জিন্না কি চান

জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট এবং তদনুসারে প্রণীত ভারতশাসন বিল ভারতীয়দিগকে কোন প্রকৃত ক্ষমতা দেয় নাই, ইহা মিঃ মোহম্মদ আলী জিন্না বেশ জানেন। তাহা হইলে লোকের কৌতূহল হইতে পারে, যে, এই যে সারশূন্য ভারতীয় কন্‌ষ্টিটিউশুন বা শাসনবিধি হইতেছে, তাহার ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে মিঃ জিন্না নিজের সম্প্রদায়ের জন্য একটা বড় বখরা (যাহা তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা নহে) লইয়া কি করিবেন। শূন্যের রকম পাঁচ আনা চার পাই বা আট আনা বা বার আনা বা ষোল আনা—কিছুরই কোন মূল্য নাই। সেই জন্য মিঃ জিন্না গবন্মেণ্ট অব ইণ্ডিয়া বিলটাকে তাঁহার প্রস্তাবের একটি অংশ দ্বারা এরূপ ভাবে সংশোধিত করাইতে চান যাহাতে কতকটা ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে আসে। সেরূপ সংশোধন হইলে সেই ক্ষমতার রকম পাঁচ আনা চার পাই মুসলমানেরা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অনুসারে পাইবে—যদিও তাহারা শিক্ষা, সার্ব্বজনিক কার্য্যে উৎসাহ, আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগ, ধনশালিতা, এমন কি লোকসংখ্যা অনুসারেও সমুদয় ক্ষমতার এক-তৃতীয়াংশ পাইবার অধিকারী ন্যায়তঃ নহে।

মিঃ জিন্না ইহাও জানেন, যে, প্রধানতঃ হিন্দুদের চেষ্টায় এবং আত্মোৎসর্গ ও দুঃখবরণের জোরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কালক্রমে দেশের লোকদের হাতে আসিবেই। তখন, এখন যাহা শূন্য (০), তাহা কিছু-একটাতে পরিণত হইবে, এবং তখন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কায়েম থাকিলে সেই কিছু-একটার এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানেরা পাইবে। এই জন্য, তিনি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটাকে জীয়াইয়া রাখিতেছেন, এবং সেই অভিসন্ধিতে ডাঃ আন্সারী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি তথাকথিত ন্যাশন্যালিষ্টদের বরাবর যোগ আছে অনুমান করা অনুচিত হইবে না।

কংগ্রেস জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী শাসনবিধি মোটেই চান না—মহাত্মা গান্ধীরও মত তাই, কংগ্রেস ওরূপ শাসনবিধি সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয় মনে করেন। উদারনৈতিক সংঘও উহা সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয় মনে করেন। হিন্দু মহাসভাও তাই মনে করেন।

কিন্তু মিঃ জিন্না তাহা বলেন নাই। তিনি চতুর লোক। তিনি জানেন, কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা গ্রহণীয় নয়, বর্জ্জনীয়ও নয় বলিলেও, জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী রিপোর্টটা সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যক্ত হইলে তাহার অঙ্গীভূত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটাও পরিত্যক্ত হইবে। সেই জন্য, তিনি প্রস্তাবিত শাসনবিধিটার সংশোধন চান, সম্পূর্ণ বর্জ্জন চান না, এবং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটাকে ত আগে হইতেই বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন!

তার পর, মিঃ জিন্না দেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের সংযোগে একটি সমগ্রভারতীয় ফেডারেশুন চান না। যেরূপ ফেডারেশুনের প্রস্তাব হইয়াছে, আমরাও তাহা চাই না। আমরা চাই না, যে, দেশী রাজ্যের প্রজারা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়ক্ষমতাহীন থাকে, এবং তাহাদের উপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্বশালী রাজারা নিজেদের মনোনীত কতকগুলি লোককে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধিরূপে পাঠায়; আমরা চাই না, যে, ঐ সভার ৩৭৫ জন সভ্যের এক-তৃতীয়াংশ ১২৫ জন দেশী রাজাদের দ্বারা মনোনীত হয়। কারণ, প্রথমতঃ আন্দাজ দেড় শত রাজ্যের দেড় শত রাজা (বাকী রাজাদিগকে বিলের তপশীলে কোন প্রতিনিধি পাঠাইবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই) ১২৫ জন প্রতিনিধি মনোনীত করিবে ও ব্রিটিশ-ভারতের ২৫ কোটির উপর মানুষ ২৫০ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ব্যাপার, এবং যদি ইহা শোচনীয় না হইত তাহা হইলে ইহাকে সাতিশয় হাস্যকর ব্যাপার বলা চলিত। দ্বিতীয়তঃ, যদি দেশী রাজ্যের প্রজারাও ব্রিটিশ-ভারতের প্রজাদেরই মত নির্ব্বাচনাধিকার পায়, তাহা হইলেও দেশী রাজ্যের ৮ কোটি প্রজা পাইবে ১২৫ জন প্রতিনিধি এবং ব্রিটিশ-ভারতের ২৫ কোটির উপর অধিবাসী পাইবে ২৫০ জন প্রতিনিধি, ইহা ন্যায্য ব্যবস্থা নহে।

প্রস্তাবিত ফেডারেশুনের বিরুদ্ধে আরও নানা আপত্তি আমাদের আছে। মিঃ জিন্নারও সেই সমস্ত আপত্তি থাকিতে পারে। তা ছাড়া মুসলমানদের আর একটা আপত্তির

অস্তিত্ব তাঁহাদের একটি দাবী হইতে বুঝা যায়। তাঁহারা ফেডারাল অ্যাসেম্বলীতে (Federal Assemblyতে) ২৫০টি আসনের মধ্যে ৮২টি অর্থাৎ মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ পাইবেন প্রস্তাবিত গবর্মেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া বিলে এইরূপ আছে। মুসলমানেরা চাহিয়াছেন, যে, দেশী রাজ্যগুলির ১২৫টি আসনেরও এইরূপ একটি ভাগ আইন দ্বারা তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়; কিন্তু তাহা দেওয়া হয় নাই। অবশ্য ১২৫টিরও কতক অংশ তাঁহারা পাইবেন, কিন্তু তাঁহারা চান নির্দিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ, কিন্তু দেশী রাজ্যের অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশও মুসলমান নহেন। দেশী নৃপতিদের মধ্যেও মুসলমান নৃপতির সংখ্যা কম—হিন্দু ও শিখই বেশী। সুতরাং দেশী নৃপতিদের মনোনীত প্রতিনিধিদের মধ্যে মুসলমান থাকিবে কম, এবং তাহা অন্যায় নহে। সেই জন্য অ্যাসেম্বলীর ৩৭৫ জন সদস্যের মধ্যে মুসলমান সদস্যদের প্রভাব ততটা হইবে না, যতটা হইবে ব্রিটিশ-ভারতের ২৫০ জনের মধ্যে ৮২ জন মুসলমান সদস্যের। এই কারণে মুসলমানরা দেশী রাজ্যগুলির সহিত ফেডারেশ্যন চান না, তাঁহারা কেবল ব্রিটিশ-ভারতের জন্যই এমন একটা শাসনতন্ত্র চান যাহাতে তাঁহাদের পাওনার অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকে। মিঃ জিন্নার ফেডারেশ্যন-বিরোধিতার রহস্য ইহা হইতে বুঝা যায়।

—

আইন-সচিবের নিরপেক্ষ থাকা

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্বন্ধে মিঃ জিন্নার প্রস্তাবে আইন-সচিব স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার কোন পক্ষেই ভোট দেন নাই। ইহা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত কার্য্য হইয়াছে। তিনি আইন-সচিব হইবার পূর্ব্বে বিলাতে ও ভারতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধিতা উৎসাহ ও দক্ষতার সহিত করিয়াছিলেন। এখন সরকারী কর্ম্মচারী হইয়া উল্টা সুর ধরিলে তাহা অসঙ্গত ও নিতান্ত অশোভন হইত। অবশ্য তিনি স্বাধীন সদস্য নহেন বলিয়াই বাটোয়ারাটার বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন নাই।

—

ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর আত্মরক্ষা

ইংলণ্ডের লোকেরা স্বদেশে "বাই ব্রিটিশ" ("Buy British") নীতির অনুসরণ করে, ইংরেজের তৈরি জিনিষ পাইলে বিদেশী জিনিষ কেনে না। তথাকার যুবরাজ এই নীতির প্রধান পাণ্ডাগিরি করিয়াছেন। এদেশে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "আমার গ্রামে যে জিনিষটি তৈরি হয়, তাহাই আমার স্বদেশী জিনিষ," অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই জিনিষ কিনিবেন, তাহা না-পাইলে বা তাহা না-থাকিলে অন্য ভারতীয় জিনিষ কিনিবেন। অথচ আমরা দেখিতে পাই ও শুনিতে পাই, যে, বাংলা দেশে যদি কেহ বলে, "আমি আগে বঙ্গে বাঙালীর তৈরি জিনিষ কিনিব, তাহা না-থাকিলে বা না-পাইলে তবে অন্য প্রদেশের ভারতীয় জিনিষ কিনিব," তাহা হইলে তাহাকে সংকীর্ণমনা বলা হয়! যদিও দেখিতে পাই, এই কলিকাতা শহরে শিখরা বাঙালীদিগকে বয়কট করে, নিজেদের হোটেল, মুদিখানা, চিকিৎসা পর্য্যন্ত পঞ্জাব হইতে আমদানী লোকদের দ্বারা চালায়; গুজরাটী ব্যবসাদাররা নিজেদের দোকান ও ব্যাঙ্কের কেরানীটি পর্য্যন্ত অনেকটা গুজরাট হইতে আমদানী করে; কিন্তু বাঙালী নিজের শহরে ও গ্রামে বসিয়া যদি বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষার ও বেকার বাঙালীদের অন্নের উপায়ের কথা ভাবে, তাহা হইলে সে হয় সংকীর্ণমনা! সংপ্রতি হাবড়া মিউনিসিপালিটিতে এইরূপ একটি প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে, যে, যোগ্য বাঙালী থাকিলে চাকরি তাহাকেই দিতে হইবে, যোগ্য বাঙালী কণ্ট্রাক্টর থাকিলে তাহাকেই কণ্ট্রাক্ট দিতে হইবে, মিউনিসিপালিটির জিনিষপত্র খরিদ করিবার সময় বাঙালীর তৈরি জিনিষই কিনিবার চেষ্টা আগে করিতে হইবে। এরূপ প্রস্তাব আমরা ন্যায্য মনে করি। বঙ্গপ্রবাসী অবাঙালীদের ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা উচিত নয়। বরং তাঁহাদের পক্ষে বঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া যাওয়াই ভাল, যেমন স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পূর্ব্বপুরুষেরা হইয়াছিলেন, পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্করের পূর্ব্বপুরুষেরা হইয়াছিলেন। বাঙালীরা এমন কথা বলে না, যে, তাহারা অন্য প্রদেশের বা অন্য প্রদেশীয়দের জিনিষ কিনিবে না। বঙ্গের ও বাঙালীর তৈরি জিনিষ না পাইলে, অন্য প্রদেশের ও

প্রদেশীয় সেরূপ জিনিষ বাঙালী নিশ্চয় কিনিবে ও কেনে।

বাংলা দেশের ও বিহারের কয়লা না কিনিয়া বোম্বাই ও আহমেদাবাদের মিলওয়ালারা যে দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লা কেনে, তাহাতে ত আমাদের সমগ্রভারতীয় স্বদেশপ্রেমের শিক্ষাদাতারা কোন উচ্চবাচ্য করেন না!

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মোৎসব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার ৭৭ বৎসর পরেও যে ইহার জন্মোৎসবের কথা কর্তৃপক্ষের মনে পড়িয়াছে, তাহার জন্য তাঁহারা প্রশংসার পাত্র। এই উপলক্ষ্যে যে শোভাযাত্রা ব্যায়ামাদি হইয়াছিল, তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ভবিষ্যতে কলিকাতার বাহিরের ছাত্র-ছাত্রীদিগকে এরূপ উৎসবে যোগ দিবার—অন্ততঃ তাহাদের প্রতিনিধিদের যোগ দিবার—সুযোগ দিতে হইবে, যাহারা পঠদ্দশা অতিক্রম করিয়াছে সেই সব প্রাক্তন ছাত্রদিগকেও সুযোগ দিতে হইবে, দৈহিক ক্রিয়াশীলতার পরিচয় ছাড়া মানসিক কর্ম্মিষ্ঠতার প্রমাণ দিবার সুযোগ দিতে হইবে, এবং কোন-না-কোন প্রকারে ও কোন-না-কোন দিকে শিক্ষালাভের সুবিধা প্রতি বৎসরই কিছু বাড়াইতে হইবে।

—

মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিক উৎসব

১৮৩৫ সালে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। এই বৎসর তাহার শতবার্ষিক উৎসব হইয়া গেল। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞানোন্নতি ও আরোগ্যবিধান যাহার উদ্দেশ্য, এরূপ প্রতিষ্ঠানের উৎসব যেরূপ হওয়া উচিত, মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিক উৎসব সেইরূপই হইয়াছিল। বক্তৃতাদি ছিল, অস্ত্র-চিকিৎসা ও অন্যরূপ চিকিৎসার জন্য আবশ্যক অস্ত্র যন্ত্র ঔষধ পথ্যাদির প্রদর্শনী হইয়াছিল, এবং তাহার উপর আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত লোকদের জন্য একটি হাসপাতালের ভিত্তিও স্থাপিত হইয়াছে।

—

অর্দ্ধোদয় যোগে স্নান

অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষ্যে গঙ্গায় স্নান করিবার জন্য বাহির হইতে পাঁচ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসিয়াছিল অনুমিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কলিকাতারও চার-পাঁচ লক্ষ লোক স্নান করিয়া থাকিবে। এতগুলি লোকের স্নানে যে অতি অল্পসংখ্যক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, অতি অল্পসংখ্যক লোকের যে ওলাউঠা আদি সংক্রামক রোগ হইয়াছিল এবং অতি অল্পসংখ্যক লোক যে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, ইহা স্নানার্থীদিগের সাহায্যকারী সকল কর্তৃপক্ষের ও স্বেচ্ছাসেবকদের বিশেষ প্রশংসার বিষয়। কলিকাতা মিউনিসিপালিটি সকল রকমের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পুলিস কর্ম্মচারী ও কনষ্টেবলেরা সকলের সাহায্য করিয়াছিলেন। ধাঙ্গড় মেথর প্রভৃতি তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কাজ সানন্দে ও সোৎসাহে করিয়াছিলেন। বিশ হাজার পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছাসেবক দিন-রাত রেলওয়ে ষ্টেশনে, স্নানের ঘাটসমূহে, নদীবক্ষে নৌকায়, এবং নানা পান্থশালায় ও স্থায়ী ও অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্রে আপনাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সেবার কাজ করিয়াছিলেন। শিক্ষালয়, ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠান ও অন্যবিধ নানা প্রতিষ্ঠান হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ আসিয়াছিলেন।

কংগ্রেস অর্দ্ধোদয়যোগ কেন্দ্রীয় বোর্ড এই উপলক্ষ্যে কৃত সেবাকার্য্যের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন,

> স্বেচ্ছাসেবকগণকে ড্রিল বা কুচকাওয়াজ কিছুই অভ্যাস করান হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ছাত্রগণ প্রমুখ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী হইতে সংগৃহীত ২০ হাজারেরও অধিক স্বেচ্ছাসেবক কর্তব্যসম্পাদনে অতি আশ্চর্য্যরকম কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করে। এই সাফল্যের জন্য প্রশংসা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম স্বেচ্ছাসেবকগণেরই উহা প্রাপ্য। স্বেচ্ছাসেবকগণ সম্পূর্ণরূপে নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করিয়া পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করে ও সম্মিলিতভাবে কার্য্য করে। আমরা যুব-বাঙ্গলাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দুই-এক দিন, দুই-এক সপ্তাহ বা তদপেক্ষা কিছু দীর্ঘ কালের জন্য উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত কঠিন কাজ করিতে বাঙালী ছেলেমেয়েরা আপনাদের সামর্থ্য অনেক বার দেখাইয়াছেন, এবং তাঁহারা যে প্রশংসা পাইবার জন্যই সকল স্থলে এইরূপ কাজ করিয়াছেন, তাহাও নহে। যেখানে বহু জনসমাগমজনিত উত্তেজনা ও উৎসাহের আকর্ষণ নাই, সেরূপ কার্য্যক্ষেত্রেও লোকচক্ষু হইতে দূরে তাঁহারা বৎসরের পর বৎসর জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ

করিতে পারিবেন, তাঁহাদের কৃতিত্ব হইতে এই আশা পোষণ করিতেছি।

কংগ্রেস বোর্ড বলিয়াছেন :—

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও আশানুরূপভাবে কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্যের ও সন্তোষের বিষয় এই যে, এই সকল প্রতিষ্ঠান তাহাদের শক্তি ও উপাদান সমবেতভাবে নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং সম্মিলিতভাবে একটি প্রতিষ্ঠানরূপে কার্য্য করিতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অগ্রসর হন।

কংগ্রেস বোর্ড কোন কোন প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ বিশেষ ভাবে করিয়াছেন।

যে স্থানে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই অপরের কৃতিত্ব ছাপাইয়া উঠিতে চেষ্টা করে, সে স্থলে কোনও বিশেষ প্রতিষ্ঠানের বৈষম্যমূলকভাবে নামোল্লেখ করা নিতান্ত অন্যায়রূপে প্রভেদাত্মক বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা শিয়ালদহ ষ্টেশনে যে সুন্দর কার্য্য করিয়াছে ও এখনও করিতেছে, চারিদিকে তাহা শতমুখে প্রশংসিত হইতেছে। সেই প্রশংসায় যদি আমরা যোগদান না করি, তবে আমাদের কর্ত্তব্যে ত্রুটি হইবে। শিয়ালদহে এবং শ্যামবাজারে মার্টিন কোম্পানীর রেল ষ্টেশনে অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকগণ এখনও কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য্য সম্বন্ধে বোর্ড বলেন :—

কলিকাতা কর্পোরেশনও তীর্থযাত্রিগণের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য সুচারুরূপেই সম্পন্ন করিয়াছেন। মনে হয়, উত্তমতর রূপে উহা আর করা সম্ভব নহে। যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কি করা কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে সকলের অভিমত তাঁহারা চাহিয়া পাঠান এবং যে সকল প্রস্তাব যাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন, তাহার ব্যবস্থাও তাঁহারা করিয়াছিলেন। প্রধান কর্মকর্ত্তা হইতে সামান্য ভৃত্য পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের যাবতীয় কর্মচারিগণকে আমরা আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও অল্ডারম্যানগণ, তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ রেজ্জাক, অতি সুন্দর রূপে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন।

অন্য সকলকেও কংগ্রেস বোর্ড ধন্যবাদ দিয়াছেন।

স্থানীয় বিভিন্ন রেল কর্ত্তৃপক্ষ এবং তাঁহাদের অধীনস্থ কর্মচারিগণ ও বিশেষ করিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনের কর্ত্তৃপক্ষ ও তাঁহাদের অধীন রেল-কর্মচারিগণ আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। আমরা অকুণ্ঠিত ভাবে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা যাত্রিগণের ও কর্ম্মিগণের প্রতি ধীর স্থিরভাবে, প্রসন্নতরূপে সহানুভূতি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে অতি সদ্ব্যবহার করেন। ট্রাম কোম্পানী ও বেঙ্গল টেলিফোন কোম্পানীকেও আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আহত ও পীড়িতদের চিকিৎসায় যে সকল প্রতিষ্ঠান সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পত্রিকাসমূহও আমাদিগকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগকেও আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

—

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ

৭ই ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী রিপোর্টের প্রতিবাদ করিবার দিবস কংগ্রেস কর্ত্তৃক ঘোষিত হয়। তদনুযায়ী প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে। ঐদিন কলিকাতার আলবার্ট-হলে ঐ উদ্দেশ্যে জনসভা আহূত হয়। কংগ্রেস ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন ঐ সকল সভায় জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্টের প্রতিবাদ-সূচক প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হইবে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার উল্লেখ আদৌ তাহাতে ছিল না। কিন্তু কলিকাতার এই সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ তাহার অন্তর্ভূত করা হইয়াছিল, এবং সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত তুলসী চন্দ্র গোস্বামী বলিয়াছিলেন, যে, কলিকাতার জনগণের এরূপ পরিবর্ত্তিত প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত করিবার ও গ্রহণ করিবার অধিকার আছে।

কলিকাতায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসুর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সমগ্র হিন্দুসমাজের যে কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে, তাহাতেও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ হইয়াছে।

১০ই ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে এই বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ প্রকাশ্য সভায় হইয়া গিয়াছে। কলিকাতাতেও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে এক সভায় হইয়াছিল।

তথাপি এই বাঁটোয়ারার ভেদনীতির ভিত্তির উপর নির্ম্মিত ভারতশাসন-বিল পার্লেমেণ্টে আইনে পরিণত হইবে। কিন্তু তাহা যেন ভারতীয় মহাজাতি-ধ্বংসকারী এই বাঁটোয়ারার উচ্ছেদ-চেষ্টা হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত না করে।

—

ভারত-সচিব ও ডোমীনিয়ন ষ্টেটস

জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্টে (ও তাহার পর ভারতশাসন-বিলে) ব্রিটিশ জাতির ভারতশাসনের লক্ষ্য যে ভারতবর্ষকে স্বশাসক ডোমীনিয়নে পরিণত করা, এ-কথার উল্লেখ না থাকায় ডোমীনিয়নত্ব-প্রার্থীদের পক্ষ হইতে নানা সমালোচনা ও প্রতিবাদ হইয়াছে। সেই জন্য, পার্লেমেণ্টে

ভারতশাসন-বিল দ্বিতীয় বার পঠিত হইবার সময় তর্কবিতর্ক উপলক্ষ্যে ভারত-সচিব স্যার সামুয়েল হোর বলিয়াছেন, ব্রিটিশ-সরকার ও জাতির পক্ষ হইতে ডোমীনিয়নত্বকে লক্ষ্য বলিয়া যখন যাঁহার দ্বারা যাহা বলা হইয়াছে, সেরূপ কোন অঙ্গীকার হইতেই আমরা সরিয়া যাই নাই, লক্ষ্য স্থির আছে। কিন্তু ইহাতে আমাদের লাভটা কি হইল? আগে ব্রিটিশ নৃপতি এবং রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত অভিজাত ও সাধারণ ব্রিটিশ মনুষ্য কেহ কেহ যাহা বলিয়াছিলেন, স্যার সামুয়েলের কথা সেই রূপ আর একটা কথা মাত্র। কোন্ বৎসর কি উপায়ে ভারত ডোমীনিয়ন হইবে, তাহা যেমন আগে কেহ বলেন নাই, ভারত-সচিবও তেমনি তাহা বলেন নাই। কেহ যদি কাহাকেও বলে, তোমাকে এক শত টাকা দিব, কিন্তু যদি দিবার তারিখ ও স্থান নির্দ্দিষ্ট না-থাকে এবং অঙ্গীকারের কোন দলিল না-থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রতিশ্রুতির কোনই মূল্য নাই। অঙ্গীকার-কারী প্রত্যহই বলিতে পারে, "হাঁ হাঁ, দিব।" কোন্ অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে কত বৎসর, যুগ, বা শতাব্দী পরে ভারতবর্ষ ডোমীনিয়ন হইবে? ব্রিটিশ শক্তি ও সাম্রাজ্য তত দিন থাকিবে কি? তাহার পর দলিলের কথা। ভারতশাসন-বিলের মধ্যে যদি থাকে, যে, ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন করা এই আইনের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে তাহার কিছু মূল্য থাকিবে স্বীকার করা যায়। কিন্তু তাহাও যথেষ্ট নয়। দেখাইতে হইবে যে, বিলটার অর্থাৎ প্রস্তাবিত আইনটার অভিমুখিতা ও গতি ডোমীনিয়নত্বের দিকে—দেখাইতে হইবে যে, উহা বর্ত্তমান ভারতশাসন-আইন অপেক্ষা বেশী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভারতবাসীদিগকে দিতেছে, এবং সর্ব্বোপরি দেখাইতে হইবে, যে, প্রস্তাবিত ভারতশাসন-আইনে ভারতীয়দিগকে প্রদত্ত ক্ষমতার ব্যবহার দ্বারা তাহারা স্বয়ং ডোমীনিয়নত্বে পৌঁছিতে পারিবে, তাহাদিগকে তাহার জন্য ব্রিটিশ জাতির ও পার্লেমেণ্টের দ্বারস্থ হইতে হইবে না, এবং ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট ও জাতি পদে পদে তাহাদের স্বশাসন-অধিকার-লাভচেষ্টায় বাধা দিতে পারিবেন না।

কিন্তু ভারতশাসন-বিলে এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই—ডোমীনিয়নত্বের নাম পর্য্যন্ত নাই। বিপরীত দিকে আছে এরূপ সব ব্যবস্থা যাহাতে প্রস্তাবিত শাসনবিধি বর্ত্তমান শাসনবিধির চেয়েও অপকৃষ্ট, যাহাতে উহা ভারতীয়দিগকে এখনকার চেয়েও বেশী ক্ষমতাহীন এবং তাহাদের বিদেশী শাসকদিগকে এখনকার চেয়েও অধিক নিরঙ্কুশ প্রভুত্বশক্তিশালী করিয়া ভারতবর্ষকে ডোমনিয়নত্বের বিপরীত দিকে লইয়া যাইতে চায় ও লইয়া যাইবে।

অতএব স্যার সামুয়েল হোরের কথার কোনই মূল্য নাই। ভারতীয়রা প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাহাতে পায় ভারতশাসন-বিলে এরূপ কোন পরিবর্ত্তন না-করিয়া যদি কেবল ডোমীনিয়নত্বের একটা তারিখহীন অঙ্গীকারাভাস উহাতে কোথাও বসাইয়া দেওয়া হয়, তাহারও বিশেষ কোন মূল্য থাকিবে না—বরং বিলটার অভিমুখিতা বিপরীত দিকে হওয়ায় তাহাতে ঐ আভাসের সমাবেশ বিলটাকে স্ববিরোধী ও প্রহসনবৎ করিয়া তুলিবে।

ইংরেজ জাতির শাসক-শ্রেণী বুদ্ধিমান্, কিন্তু তাহারা মধ্যে মধ্যে বড় রকমের ভুল করে, এবং তাহাতে তাঁহাদের দেশের ক্ষতি হয়। যাহা কালক্রমে মানিয়া লইতেই হইবে, তাহা তাহারা কখন কখন যথাসময়ে মানিয়া লয় না, অন্যকে পরে যাহা অপেক্ষা বেশী অধিকার দিতে বাধ্য হয়, কাহাকেও কাহাকেও যথাসময়ে তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে দিতে চায় না। আমেরিকার সুবৃহৎ কানাডা দেশ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নামে মাত্র, কার্য্যতঃ স্বাধীন। কানাডার ক্ষমতা যত তাহার অর্দ্ধেক ক্ষমতাও অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার অন্য ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিকে দিলে তাহারা বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হইত না। বর্ত্তমানে যাহা আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ বা যুক্তরাষ্ট্র তাহা হইলে তাহা এখনও কানাডার মত ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিয়া ব্রিটিশ মহাজাতিকে আরও ক্ষমতাশালী করিত।

ডোমিনিয়নত্ব যখন দিলে ভারতীয়েরা লুফিয়া লইত, ইংরেজ তখন তাহাতে কর্ণপাত করে নাই; এখনও কেবল ডোমিনিয়ন ষ্টেটস্ কথা দুটা মাত্র উচ্চারণ করিতে রাজী, উহার ভিতরকার প্রকৃত বস্তুটা দিতে নারাজ। এদিকে কিন্তু ভারতে যাহারা সকলের চেয়ে সাহসী, উৎসাহী, ত্যাগী, ও দুঃখবরণে সমর্থ, ডোমিনিয়নত্বের নামে তাহারা হাসে—তাহারা চায় পূর্ণস্বরাজ। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?

ভবিষ্যতে ভারতবর্ষও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত শক্তিশালী সাধারণতন্ত্র হইবে না, কে বলিতে পারে ?

—

বঙ্গে নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব

বঙ্গে বিদ্যুৎ-শুল্ক বিল ও তামাক বিক্রীর লাইসেন্স বিল দ্বারা দুটি নূতন ট্যাক্স বসিবে, এবং ভারতীয় ষ্ট্যাম্প বিল, কোর্ট ফী বিল ও বঙ্গীয় আমোদ-কর বিলের সংশোধন দ্বারা অধিকতর ট্যাক্‌স আদায়ের চেষ্টা হইবে। এই পাঁচ প্রকারে বাংলার অধিবাসীদের কাছ থেকে আরও বেশী টাকা আদায় করিবার চেষ্টা ন্যায়সঙ্গত নহে। বঙ্গে যত ট্যাক্স সংগৃহীত হয়, তাহার অত্যন্ত অধিক ভাগ ভারত-গবর্মেণ্ট দখল করেন, অন্য কোন প্রদেশ হইতে এত অধিক ভাগ গ্রহণ করেন না। বাংলা-গবর্মেণ্টের হাতে অত্যন্ত কম টাকা থাকিবার ইহাই প্রধান কারণ। সুতরাং বাংলা-সরকারের অধিক টাকা পাইবার জন্য বঙ্গীয় জনগণের ট্যাঁকে হাত দিবার আগে ভারত-গবর্মেণ্টের সহিত সংগ্রাম (অবশ্য অহিংস সংগ্রাম !) করাই উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, বাংলা-সরকার যে ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি বসাইয়াছিলেন, সেই কমিটির প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিলে, নূতন ট্যাক্স দ্বারা যে ২৪½ লক্ষ টাকা পাইবার আশা করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা বাঁচিত। "জাতিগঠনমূলক" বিভাগগুলিতেও ঐ কমিটি ব্যয় ছাঁটিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। আমরা তাহার সমর্থন করি না। কিন্তু কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অন্য সব বিভাগের ব্যয় কমাইলে নূতন ট্যাক্স বসাইবার প্রয়োজন হইত না।

তৃতীয়তঃ, বাংলা-গবর্মেণ্ট সরকারী চাকরেয়দের যে বেতন হ্রাস করিয়াছিলেন, এখন তাহা রহিত করিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব হারে বেতন দিবেন, স্থির করিয়াছেন। কাহারও আয় বৃদ্ধিতে আমরা দুঃখিত হইব না। কিন্তু সরকারী চাকরোরাই দরিদ্রতম ও কেবল তাঁহাদেরই আয় সর্ব্বাগ্রে বাড়া দরকার, এবং সেই আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে (ও কতকটা সেই আয়বৃদ্ধির জন্যই) জনগণের স্কন্ধে নূতন ট্যাক্সের বোঝা চাপান উচিত মনে করি না।

চতুর্থতঃ, বঙ্গের অনেক জায়গায় কেবল মাত্র হিন্দুদিগকেই নিগ্রহ-ট্যাক্স বাবতে হাজার হাজার টাকা দিতে হইয়াছে ও হইতেছে। তাহার উপর আরও ট্যাক্স বসান পীড়াদায়ক হইবে।

পঞ্চমতঃ, বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার সবে মাত্র বঙ্গে আরম্ভ হইয়াছে, বিশেষতঃ মফঃস্বলে। মফঃস্বলে বৈদ্যুতিক শক্তির মূল্য অত্যন্ত অধিক, কলিকাতাতেও যে বিশেষ কম, তাহা নহে। তাহার উপর ট্যাক্স বসাইলে বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধিতে বাধা পড়িবে। এখন পর্য্যন্ত প্রধানতঃ উহার ব্যবহার আলোকের জন্যই বঙ্গে হইতেছে। শিল্পকার্য্যের ও রন্ধনের জন্য উহা এখনও বেশী ব্যবহৃত হয় না। কৃষিকার্য্যের জন্য ত, আমরা যত দূর জানি, হয়ই না। এমত অবস্থায়, ট্যাক্স বসান সমীচীন মনে হয় না।

আরও অনেক কথা বলা যায়। কিন্তু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অবস্থা ভাবিলে অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় না।

—

নিখিলবঙ্গ প্রজাসম্মেলন

ময়মনসিংহে যে নিখিলবঙ্গ প্রজাসম্মেলন হইয়া গেল, তাহাতে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তের অভিভাষণ, সভাপতি মৌলবী ফজলল হক্ সাহেবের অভিভাষণ এবং নবাব ফরোকি সাহেবের উদ্বোধিনী বক্তৃতা ২৭শে মাঘের দৈনিক কাগজে প্রথম দেখিলাম। এই সম্মেলন বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যাবহুল শ্রেণীর অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভাবে কৃষিজীবীদের হিতার্থে কল্পিত। অতএব ইহার অভিভাষণসমূহ ও প্রস্তাবাবলী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

—

প্রাথমিক-শিক্ষক-সম্মিলনীর অধিবেশন

এবার যশোর জেলার বনগ্রামে প্রাথমিক-শিক্ষক-সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায় চৌধুরী ইহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে (এবং অন্য শিক্ষা সম্বন্ধেও) গবর্মেণ্ট ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানগুলি যে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিতেছেন না, মহীতোষ বাবু তাঁহার অভিভাষণে তাহা দেখাইয়াছেন। তদ্ভিন্ন, তিনি সত্যই বলিয়াছেন :—

প্রাথমিক শিক্ষকগণের দুরবস্থা কেবল মাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে নহে,

আমাদের দেশবাসীরও ইহা নিরতিশয় কলঙ্ক ও লজ্জার কথা। আমরা শিক্ষিত, সম্রান্ত ও দেশভক্ত বলিয়া যাহারা গর্ব্বানুভব করি, আমাদের মধ্যে যাঁহারা ভগবানের ইচ্ছায় ঐশ্বর্য্য, অর্থ ও সম্পৎশালী, তাঁহারা মুখে যাহা বলুন না কেন, অন্তরে অন্তরে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। বিশেষতঃ, আমাদের এই বাংলা দেশে নেতৃগণের দৃষ্টি উচ্চ ও মধ্য শিক্ষার প্রতি যে পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি তাহা হয় নাই।

তাঁহার মতে নিম্নলিখিত দাবীগুলি করা উচিত।

১। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অনতিবিলম্বে প্রবর্ত্তনের দাবী।

২। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটির তহবিল হইতে অধিকতর অর্থব্যয়ের দাবী।

৩। অধিকসংখ্যক ট্রেনিংস্কুল স্থাপন এবং তাহাতে গুরুগণের শিক্ষা লাভ করিবার অধিকতর সুযোগের দাবী।

৪। নিয়মিত ভাবে এবং বিনাক্লেশে সরকারী ও বেসরকারী নির্দ্দিষ্ট সাহায্য প্রাপ্তির দাবী।

দাবী যে করা উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষার ব্যয় উত্তরোত্তর বাড়াইবার পরিবর্ত্তে গবন্মেণ্ট তাহা ক্রমান্বয়ে কমাইয়াই চলিতেছেন।

—

স্যার আবদুল্লা সুহ্রাওয়ার্দী

স্যার আবদুল্লা সুহ্রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে বঙ্গদেশ হইতে এক জন বহুভাষাবিৎ বিদ্বান্ ব্যক্তির অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, এবং বিশেষ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি বঙ্গদেশে, ইংলণ্ডে ও মিশর দেশে শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে তিনি অধ্যাপকের কাজ বহু বৎসর করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য তিনি বহু বৎসর ছিলেন।

যৌবন কালে তিনি যেমন বিলাতে বিশ্ব-ইস্লামিক সমিতি (Pan-Islam Society) স্থাপন করিয়াছিলেন, তেমনই উৎসাহী স্বাজাতিকও (Nationalist) ছিলেন। আমরা ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম :—

"সৈয়দ আবদুল্লা অল্ মামুন সুহ্রাওয়ার্দী বয়সে নবীন হইলেও জ্ঞানে প্রবীণ, নানা বিদ্যায় পারদর্শী। তিনি লণ্ডনের বিখ্যাত বিশ্ব-মুসলমান-সমিতির স্থাপনকর্ত্তা। সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। প্রায় এক মাস হইল পূর্ণিয়ায় চতুর্থ মুসলমান শিক্ষাসম্বন্ধীয় আলোচনা সভার অধিবেশন হয়। তিনি তাহার সভাপতি মনোনীত হন। তাঁহার অভিভাষণ উৎসাহপূর্ণ, এবং ধর্মভাব, স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, ধর্ম্মবিষয়ক ঔদার্য্য, ও বিদ্যানুরাগের একত্র সম্মিলনে উপাদেয় হইয়াছিল।

ঐ অভিভাষণ উহা হইতে আমরা প্রবাসীর প্রায় এক পৃষ্ঠাব্যাপী দুটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। তাহার কয়েকটি বাক্য নীচে মুদ্রিত হইল।

"I for one am proud to declare that the blood of the Aryans flows in my veins with that of the Semitic. A greater and a wider heritage becomes mine when I feel that I owe allegiance not only to Moses, Christ and Muhammad, but also that Zarathustra, Srikrishna and Gautama claim my homage. The Gita as well as the Gospel of Islam belongs not to this race or that, but to whole humanity."

"The Muslim is often reproached for lack of patriotism. Yet it was the prophet of Islam who declared patriotism to be a part of religion."

—

অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জেনিভাতে যে লীগ্ অব্ নেশুন্স বা রাষ্ট্রসংঘ আছে তাহার সভ্য সমুদয় রাষ্ট্রকে চাঁদা দিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। ভারতবর্ষকেও চাঁদা দিতে হয়, যদিও লীগে ভারতবর্ষের ক্ষমতা কিছুই নাই। ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের অধীন গবন্মেণ্টরূপে ভারত-গবন্মেণ্টের স্থান লীগে আছে। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলিয়া যাঁহারা লীগে প্রেরিত হন, তাঁহারা বস্তুতঃ ভারত-গবন্মেণ্টের আজ্ঞাধীন মনোনীত লোক।

লীগের সভ্য স্বাধীন দেশসকল লীগ হইতে কোন কোন রকম সুবিধা পাইয়া থাকে, ভারতবর্ষ না-পাওয়ারই মধ্যে। ইউরোপের স্বাধীন দেশসমূহের অনেক লোক লীগের বড় বড় কর্ম্মচারী। জাপান যত দিন সভ্য ছিল, তত দিন জাপানেরও এই সুবিধা কিয়ৎ পরিমাণে ছিল। ভারতবর্ষ লীগে টাকা নিতান্ত কম দেয় না, কিন্তু ভারতীয় অতি অল্পসংখ্যক লোক লীগের কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। খুব বড় কাজে কোন ভারতীয় নাই। মাঝারী-গোছ কাজে জন চার-পাঁচ ছিলেন। তাহার মধ্যে স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এক জন। তিনি আগে লীগের সংবাদ-বিতরণ বিভাগে (Information Sectionএ) কাজ করিতেন, পরে রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগে কাজ পান। সম্প্রতি তিনি ছুটিতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। হঠাৎ কলিকাতায় তিনি যে মোটর গাড়ীতে যাইতেছিলেন তাহার সহিত ট্রামগাড়ীর ধাক্কা লাগায় তিনি পড়িয়া গিয়া সাংঘাতিক আঘাত পান। তাহাতেই অবিলম্বে হাসপাতালে

তাঁহার মৃত্যু হয়। এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে লীগে ভারতের মুষ্টিমেয় কর্ম্মীদের সংখ্যাও কমিয়া গেল। অমূল্যবাবু ভারতবর্ষে থাকিতে বোম্বাইয়ে রয়টার ও এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। জেনিভায় লীগের কাজে তিন জন বাঙালী ছিলেন। এখন দুই জন রহিলেন। তাহার মধ্যে ডক্টর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস কতকটা বড় কাজ করেন, স্যার বিপিনবিহারী ঘোষের পুত্র ডক্টর শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনের কাজ করেন।

—

বাণিজ্য-চুক্তি

ব্রিটেনে ও ভারতবর্ষে এক বাণিজ্য-চুক্তি হইয়া গিয়াছে, জগতের লোক ইহা শুনিয়াছে। কিন্তু ইহার অর্থ এই, প্রভু ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট তদধীন ভারত-গবর্ন্মেণ্টের কর্ম্মচারীর দ্বারা ব্রিটেনের পক্ষে সুবিধাজনক কতকগুলি সর্ত্তে দস্তখত করাইয়া লইয়াছেন। তাহার আগে সর্ত্তগুলা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাকে জানানও হয় নাই।

এইরূপ আর একটা বাণিজ্য-চুক্তির নাম ইণ্ডো-বর্ম্মা (ভারত-ব্রহ্ম) চুক্তি। ইহাও ভারতীয় লোকদের ভারতীয় প্রতিনিধি এবং ব্রহ্মদেশীয় লোকদের ব্রহ্মদেশীয় প্রতিনিধির মধ্যে আলোচনার পর উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে স্বাক্ষরিত চুক্তি নহে। ইহাও ভারত-গবর্ন্মেণ্ট ও তদধীন বর্ম্মা-গবর্ন্মেণ্টের মধ্যে চুক্তি। অর্থাৎ কোন মানুষের ডান হাত বাঁ হাতের মধ্যে চুক্তি হইলে যেমন হয়, কতকটা সেই প্রকার। সভ্যতায় যত রকমের ভান আছে, এগুলা তাহারই অন্যতম।

—

লণ্ডনে ভারতীয় চিত্রাদির প্রদর্শনী

গত ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে ভারতীয় চিত্র প্রভৃতি ললিতকলার যে প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে বিলাতী কাগজে প্রকাশিত কতকগুলি মত আগে প্রকাশ করিয়াছিলাম। পরে আরও কিছু এইরূপ মত হস্তগত হইয়াছে। তাহার কিছু কিছু নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

বর্লিংটন ম্যাগাজিনের সম্পাদক মিঃ ট্যাটলক্ ডেলী টেলিগ্রাফে লিখিয়াছেন :—

What astonishes the English visitor is not any discernible differences between one part of India and another, but an essential unity of aesthetic feeling.

The most surprising impression is that the inhabitants of a country so vast as India have contrived so splendidly to "pull together."

The population of India is roughly equivalent to that of extra-Russian Europe. But if we were to envisage an exhibition of European art we should take it for granted that there would be many "clashes." This exhibition gives the impression very distinctly that, so far as art is concerned, India is much more closely knit than Europe. It is true that Bombay, best seen in Gallery I, attracts the occidental eye most insistently, but that may be due to Mr. W. E. Gladstone Solomon's power of organization.

মিঃ ট্যাটলক্ বলিতেছেন, যে, যদিও ভারতবর্ষ রুশিয়া-বাদে সমস্ত ইউরোপের সমান, তথাপি এত বড় দেশে ইহার ললিতকলাসৃষ্ট রসে একটি সামঞ্জস্য ও ঐক্য দৃষ্ট হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে, প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি নিঃসন্দেহ সর্ব্বাধিক ভারতীয় ("The best pictures are undoubtedly the most Indian")।

মর্নিং পোষ্টের আর্ট-সমালোচক বলেন, এখন ভারতবর্ষে আর্টের মোটামুটি দুটি স্রোত প্রবাহিত। একটিকে বাংলা ও অন্যটিকে বোম্বাইয়ের সঙ্গে সংপৃক্ত বলা যাইতে পারে। বাংলা ভারতবর্ষের পরম্পরাগত রীতিসমূহের প্রতিনিধি, বোম্বাই পাশ্চাত্য য়্যানাটমি অনুশীলনের মূল্যের পরিচয় দেয়। তাহার পর এই সমালোচক লিখিতেছেন, বাংলা দেশ সমগ্র ভারতবর্ষে ভারতীয় ললিতকলার পুনরুজ্জীবনে ব্যাপৃত আছে। যথা—

"Bengal also is active in the renaissance of Indian art throughout the Peninsula. The thirty odd years' revival in Calcutta, based upon a continuity of India's artistic tradition, has been inspired by the lead of the Tagore family, and spread by Bengalee artists who removed to other parts of the country. Moreover, young students came from distant places to the School of Oriental Art at Calcutta, and the Institute founded by the Poet Rabindranath Tagore at Shantiniketan."

তাহার পর এই সমালোচক বলিতেছেন—

"Poetry, vigorous romance, and somewhat timid Western realism characterize Bengalee art. . . . "

ললিতকলা-সমালোচক মিঃ ফ্রাঙ্ক রটর (Mr. Frank Rutter) সণ্ডে টাইম্‌সে লিখিয়াছেন :—

"The great lesson taught by the current exhibition at the New Burlington Galleries is that Indian Artists are far more fruitfully inspired when following the noble traditions of their own country, than when they seek to imitate the superficial realism of Western academic art. . . . While much from elsewhere also commands our admiration, it is most instructive to compare the work of the two principal schools, that of

Calcutta and of Bombay. For of these two the latter has been far more influenced by European art; and its products have far less charm and distinction than those of the former, which has remained loyal to the Hindu and Moghul masters of the past.

"The renaissance of Indian art dates from rather more than a generation ago, when, under the sympathetic guidance of Mr. E. B. Havell, the students of the Calcutta School of Art were persuaded to base their practice on the style of India's indigenous masterpieces rather than on that of imports from the West. London became aware of the rise of a new Calcutta School when the work of those two fine artists, Abanindranath Tagore and J. P. Gangooly, was seen in the first London Salon of the Allied Artists in 1908; and it is a pleasure to see the first so well represented in the present exhibition. There are many of his name among the exhibitors, and there is a very beautiful wash drawing, "Devatatma Himalaya" (384), by the poet Rabindranath Tagore; but just as he was one of the earliest leaders of the revival, so Abanindranath Tagore remains the outstanding modern master of Bengal.

"Whether on the smaller scale of miniature painting or on the larger scale of such a decoration as Sarada Ukil's "Shiva's Grief" (115), the superiority of the traditional linear style is incontestable in this exhibition."

—

বাঁকুড়ায় মিউজিয়ম্ স্থাপনের প্রস্তাব

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বাঁকুড়া জেলার পুরাকৃতি অর্থাৎ প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি, ধাতু-মূর্ত্তি, শিলা বা ধাতুর তৈরি অস্ত্রশস্ত্র, প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাঁকুড়া শহরে একটি মিউজিয়ম স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটি 'প্রবাসী'র বর্ত্তমান সংখ্যায় অন্যত্র মুদ্রিত হইল। আমরা তাঁহার প্রস্তাবটির সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তিনি যে-সকল প্রাচীন জিনিষ রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন, তাহা একবার নষ্ট হইলে বা বাঁকুড়া হইতে অন্যত্র অপসৃত হইলে আর পাওয়া যাইবে না, অথচ সেগুলি বাঁকুড়া জেলার অমূল্য সম্পদ। প্রবাসীর পাঠকগণ বিক্রমপুরের একটি গ্রাম আড়িয়লের মিউজিয়মটি সম্বন্ধে ১৩৪০ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত সচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন ও করিতে পারেন। একটি গ্রামে যাহা হওয়া আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে এবং যাহা বাস্তব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, তাহা একটি শহরে নিশ্চয়ই হওয়া উচিত ও হওয়া সম্ভবপর। ২৫,০০০ টাকা কিছু বেশী নয়। বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী এবং বাঁকুড়ায় যাঁহাদের জন্ম কিন্তু এখন অন্যত্র বাস করিতেছেন, এরূপ অনেক লোক আছেন যাঁহারা এই টাকা দিতে পারেন। যাঁহারা বিশেষ সঙ্গতিপন্ন নহেন, তাঁহারাও যথাসাধ্য দান করিলে—ন্যূনকল্পে দান সংগ্রহ করিয়া দিলে, এই কাজটি হইতে পারে।

—

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক আসনবণ্টনে ন্যায় ও নিয়মের অভাব

বর্ত্তমান ভারতশাসন-আইন অনুসারে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলিকে যতগুলি করিয়া সদস্যের আসন দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কোন ন্যায্য নিয়মের অনুবর্ত্তিতা নাই। ইহা আমরা অনেক বার দেখাইয়াছি। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক সাংবাদিকগণ, এমন কি ততোধিক স্বদেশপ্রেমিক কংগ্রেসওয়ালারাও, এ-বিষয়ে দৃক্‌পাত করেন নাই। গবর্মেণ্ট ত দৃক্‌পাত করিবেনই না। নূতন যে ভারতশাসন-আইন হইতে যাইতেছে, তাহাতেও প্রদেশগুলির মধ্যে আসনবণ্টনে কোন নিয়ম ও ন্যায়বিচার দেখা যাইতেছে না। যখন প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে খুব জ্ঞানী, খুব যোগ্য, খুব ধনীর এক ভোট, এবং নিরক্ষর কম যোগ্য, অল্পবিত্ত লোকেরও এক ভোট, এবং যখন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই এক ভোট (অর্থাৎ adult suffrage) এই আদর্শের দিকে সব দেশ চলিতেছে (এবং কোথাও কোথাও এখনও তাহাই নিয়ম), তখন প্রত্যেক প্রদেশের লোকসংখ্যা অনুসারে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহার জন্য আসনের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। ইহা আমাদের উদ্ভাবিত একটা আদর্শ নহে। ইহার বাস্তব দৃষ্টান্ত ও নজীর দিতেছি।

আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে ৪৮টি ষ্টেট বা রাষ্ট্র আছে। উহার প্রতিনিধি-সভায় (House of Representatives এ) প্রতিনিধির সংখ্যা ৪৩৫। প্রত্যেক ষ্টেট প্রতি ২১০৪১৫ জন অধিবাসীর জন্য এক জন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া তাহাতে পাঠাইতে পারে। তদনুসারে নিউ ইয়র্ক ষ্টেট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ৪৫ জন, প্রতিনিধি পাঠায় এবং ছয়টি ষ্টেট ১ জন করিয়া পাঠায়।

নূতন ভারতশাসন-বিলে ব্রিটিশ-ভারতের প্রদেশগুলিকে ফেডারাল ব্যাসেম্‌ব্লীতে ২৫০ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইবে, এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছে, এবং কোন্

প্রদেশ কত আসন পাইবে, বিলের তপশীলে তাহা লেখা আছে। প্রদেশগুলির অধিবাসীর সংখ্যা অনুসারে এই আসন ভাগ করা উচিত। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। যাহা করা হইয়াছে এবং যাহা করা উচিত তাহা আমরা দেখাইতেছি।

ব্রহ্মদেশকে ভারতসাম্রাজ্য হইতে পৃথক করা হইবে স্থির হইয়াছে। তাহাকে বাদ দিয়া ব্রিটিশ-ভারতের মোট লোকসংখ্যা ২৫,৬৮,৫৯,৭৮৭। ইহাদিগকে ২৫০ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে বলিলে, ১০,২৭,৪৩৯ জন লোকের সমষ্টিকে এক এক জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে দেওয়া উচিত। এই নিয়ম অনুসারে কোন্ প্রদেশের কত প্রতিনিধি পাওনা হয়, এবং বাস্তবিক কোন্ প্রদেশকে কত প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে, তাহা নীচের তালিকায় দেখাইতেছি। গোটা গোটা অঙ্কগুলিই ধরা হইয়াছে, ভগ্নাংশ ধরা হয় নাই।

প্রদেশ।	লোকসংখ্যা।	প্রাপ্য আসন।	প্রদত্ত আসন।
মান্দ্রাজ	৪২৭৪০১০৭	৪৫	৩৭
বোম্বাই	১৯৯৯২০৫৩	১৭	৩০
বাংলা	৫০১১৪০০২	৪৮	৩৭
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৮৪০৮৭৬৩	৪৭	৩৭
পঞ্জাব	২০৬৮০৮৫২	২২	৩০
বিহার	৩২৪০০০০০	৩১	৩০
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	১৫৫০৭৭২৩	১৫	১৫
আসাম	৮৬২২২৫১	৮	১০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	২৪২৫০৭৬	২	৫
উড়িষ্যা	৬৭০০০০০	৬	৫
সিন্ধুদেশ	৩৮৮৭০৭০	৩	৫
ব্রিটিশ বালুচিস্থান	৪৬৩৫০৮	০	১
দিল্লী	৬৩৮২৪৬	০	২
আজমীর-মেয়োআড়া	৫৬০২৯২	০	১
কুর্গ	১৬৩৩২৭	০	১

প্রশ্ন হইতে পারে, যে, ছোট ছোট চারিটি প্রদেশের প্রাপ্য আসন যে শূন্য (০) ধরা হইয়াছে, তাহা হইলে তাহারা কি প্রতিনিধিশূন্য থাকিবে? উত্তর এই, যে, এত অল্প অল্প লোককে লইয়া এক-একটা প্রদেশ করিয়া খরচ বাড়ানই ভুল। কোন-কোনটাকে সন্নিহিত বড় কোন কোন প্রদেশের সামিল করা উচিত। যদি তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখিতেই হয়, তাহা হইলে তাহাদের কয়েকটার সমষ্টিকে ১টা বা ২টা আসন দেওয়া যাইতে পারে। এ প্রস্তাবের নজীরও আছে। দেশী রাজ্যসমূহের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যসমষ্টিকে একটি করিয়া আসন দেওয়া হইয়াছে।

কতকগুলি ছোট ছোট প্রদেশ নিজেদের রাজস্ব হইতে নিজেদের ব্যয়নির্ব্বাহে অসমর্থ। ভারত-গবর্মেণ্ট তাহাদের ঘাটতি পূরণ করিয়া কাজ চালাইয়া দেন। অর্থাৎ বড় প্রদেশগুলি হইতে—বিশেষতঃ বাংলা দেশ হইতে—রাজস্ব শোষণ করিয়া ভারত-সরকার তাহা এই সব চির-দেউলিয়া ছোট ছোট প্রদেশে অপব্যয় করেন। বড় প্রদেশগুলির উপর—বিশেষ করিয়া বঙ্গের উপর—এই এক অবিচার। আর এক অবিচার, বড় কোন কোন প্রদেশকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রাপ্য আসন হইতে কতকটা বঞ্চিত করিয়া ছোট ছোট কোন প্রদেশকে আসন দেওয়া ও বেশী আসন দেওয়া। ইহাতে বড় প্রদেশগুলির মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী বঞ্চিত হইয়াছে বাংলা দেশ—ইহার প্রাপ্য অন্ততঃ ১১টি আসন ইহা পায় নাই। অন্ততঃ বলিতেছি এই জন্য, যে, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বঙ্গের অন্তর্গত কতকগুলি জেলাকে বিহার ও আসামের মধ্যে ফেলিয়া বাংলার আয়তন ও বঙ্গের অধিবাসী-সংখ্যা কম করা হইয়াছে। বাস্তবিক বাংলা দেশ যত বড় তাহাকে তত বড় থাকিতে দিয়া তাহার অধিবাসীসমষ্টিকে ন্যায্যসংখ্যক প্রতিনিধি দিলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙালীদের যে প্রভাব হইতে পারিত, বাঙালীদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে যাহা লিখিত হইল, বঙ্গের নেতৃবর্গ বা বঙ্গের সাংবাদিকগণ তাহার আলোচনা করিবেন, এরূপ আশা কম। অবাঙালীরা—বিশেষতঃ বোম্বাইওয়ালারা—ইহাতে মন দিবেন না। বোম্বাইয়ের যত আসন পাওনা, বর্ত্তমান ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতে তদপেক্ষা বেশী আসন বোম্বাইয়ের আছে। নূতন ভারতশাসন-বিলে বোম্বাইয়ের ন্যায্য প্রাপ্য অপেক্ষা তাহাকে ১৩টি আসন বেশী দেওয়া হইয়াছে।

অবিচারদুষ্ট ও পক্ষপাতদুষ্ট এই প্রকার আসন-বণ্টনের কারণ কি? অভিপ্রায়ই বা কি? যে-সব প্রদেশকে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তথাকার অধিবাসীদের মূল্য কি কারণে কম বিবেচিত হইল?

উড়িষ্যার বাঙালী, এবং বঙ্গের বাঙালী ও প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

নিম্নমুদ্রিত মন্তব্যটি 'সঞ্জীবনী' হইতে উদ্ধৃত।

উড়িষ্যায় বাঙ্গালীর দুরবস্থা—কলিকাতায় প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। উড়িষ্যায় বহু বাঙ্গালীর বাস কিন্তু উড়িষ্যা-বাসী বাঙ্গালাদের মধ্যে এই সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য তেমন উৎসাহ দেখা যায় নাই। সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি সুদূর স্থান হইতে বাঙ্গালী আসিয়া এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালার পার্শ্বে অবস্থিত ও এককালে বাঙ্গালা দেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উড়িষ্যার প্রবাসী বাঙ্গালাদের মধ্যে এই সম্মেলনে যোগ দিবার উৎসাহ নাই কেন? উড়িষ্যার পল্লীতে পর্য্যন্ত বহু বাঙ্গালী বাস করে। এমন সকল পল্লী আছে যথায় বাঙ্গালীর সংখ্যা উড়িয়াদিগের অপেক্ষা অধিক। তাহাদের প্রায় সকলেই বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে। কিন্তু

আশ্চর্য্যের কথা, তাহাদিগকে উড়িয়া সমাজে গ্রহণ করা হয় নাই। তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। সংখ্যায় অল্প বলিয়া তাহারা এক পরিবারের মধ্যেই বিবাহাদি করিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই সকল বাঙ্গালীদিগকে এই অবস্থা হইতে উন্নত করা প্রয়োজন। যাহাতে তাহারা বাঙ্গালীর কৃষ্টি পুনরায় অধিগত করিতে পারে, পুনরায় জ্ঞান, সভ্যতার ও শিক্ষার আলোক পায়, তাহার জন্য বাঙ্গালীরই চেষ্টা করা উচিত। এই জন্য তাহাদিগকে বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার জন্য তাহারা ভীত ও নিম্নগামী হইয়াছে, তজ্জন্য তাহারা নিজেই যে উন্নতির চেষ্টা করিবে তাহা সম্ভব নহে। বাঙ্গালা দেশ ও অপর স্থানের বাঙ্গালীর এই জন্য চেষ্টা করা উচিত। ইহা বিশাল কার্য্য এবং তজ্জন্য বহু বৎসর ক্রমাগত চেষ্টার প্রয়োজন। এই কার্য্যের জন্য ঐ সকল স্থানে বাঙ্গালীকে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। যাহাতে তাহারা পুনরায় বাঙ্গালী সমাজে গৃহীত হয়, তজ্জন্য বাঙ্গালীর আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন কেবল প্রবন্ধ পাঠ না করিয়া এই কার্য্যকরী বিষয়ে নামিবেন কি?

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের কিছু কিছু সমালোচনা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি। সবগুলির আলোচনা করা আবশ্যক নহে, সম্ভবপরও নহে। 'সঞ্জীবনী'র মন্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আগেই বলিয়া রাখি, ইহার সম্পাদক মহাশয় প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতিতে কোন কারণে যোগ দেন নাই বলিয়াই যে সম্মেলনের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়াছেন, আমরা এরূপ অনুমান করিতেছি না; তিনি হিতৈষণা হইতে সম্মেলনকে উপদেশ দিয়াছেন, এইরূপ মনে করাই উচিত।

উড়িষ্যার বাঙালীদের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া দুঃখ বোধ করিতেছি। ইঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য করা সমগ্র বাঙালী সমাজের উচিত। বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের চেয়ে বঙ্গের অধিবাসী বাঙালীদের সংখ্যা, ধনসমষ্টি, জ্ঞানসম্ভার, সংহতি ও প্রভাব অনেক বেশী। সুতরাং এই কর্ত্তব্য বঙ্গের অধিবাসী বাঙালীদেরই বেশী করিয়া করা উচিত। বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদেরও এই শুভচেষ্টায় যোগ দেওয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন একটি ক্ষুদ্র সমিতি। ইহার লোকবল অর্থবল অত্যন্ত কম। বৎসরে একবার যখন ইহার অধিবেশন কোথাও হয়, তখন ইহার প্রতি বাঙালীর কিছু দৃষ্টি পড়ে মাত্র। ইহার সভ্য-সংখ্যা ও অর্থাগম বেশী হইলে ইহার দ্বারা অনেক কাজ হইতে পারে। এবার কলিকাতায় অধিবেশন হওয়ায় কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহের দ্বারা ইহার কার্য্যবিবরণ অনেকের গোচর হইয়াছে। এমন কি, যে-উড়িষ্যা সম্বন্ধে ন্যায্য দুঃখ করা হইয়াছে, সেখান হইতেও বাঙালী আসিয়াছিলেন।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের সমালোচক যত, ইহা সে পরিমাণে সহায়ক পাইলে ইহার কার্য্যসৌকর্য্য বাড়িত। কলিকাতায় ধনজনের অভাব নাই। কিন্তু অভ্যর্থনা-সমিতির কয়েকটি লোক অর্থসংগ্রহের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করাতেও আবশ্যকমত সামান্য টাকা উঠে নাই, কয়েক শত টাকা ঘাটতি পড়ে; আবার চেষ্টা করায় তাহা প্রায় শোধ হইয়া আসিয়াছে। এরূপ অবস্থা হইত না, যদি কোন কোন মহলে সম্মেলনের প্রতি ঔদাসীন্য ও বিরুদ্ধভাব এবং ইহা পণ্ড হইবার আশা না থাকিত। পরে অবশ্য যখন ইহা পণ্ড হইলই না, তখন ঐ ঐ মহলের কেহ কেহ সহজ উপায়ে বাহবা লইয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতি কর্ত্তব্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ বাঙালীদের নিজের এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহার সমতুল্য এরূপ আর একটি বঙ্গে আর কোথাও নাই। ভারতবর্ষের অন্য কোথাও অন্য কোন ভাষার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান নাই। মুদ্রিত বাংলা পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি এবং পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথি ইহাতে যত আছে এমন অন্য কোথাও নাই। তাহার উপর ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতি আদরের অমূল্য লাইব্রেরী স্থান পাইয়াছে, রমেশচন্দ্র দত্তের লাইব্রেরী এখানে আছে, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লাইব্রেরীও এখানে রক্ষিত হইয়াছে। এখানে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হইয়া থাকে। ইহা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থসমূহ আদরণীয়। বহুসংখ্যক পাঠক পরিষদ-মন্দিরে আসিয়া প্রত্যহ পাঠ করেন। ইহাতে এখন অত্যন্ত স্থানাভাব ঘটিয়াছে। পুস্তকের আলমারীগুলি স্থানাভাবে ঠিক্ যেন গুদামের মত করিয়া রাখা হইয়াছে। বহুমূল্য বহু পুঁথি স্থানাভাবে মেঝেতে লুটায়। স্থানাভাব দূর করিবার জন্য ইহারই অঙ্গীভূত রমেশ-ভবনের উপর দ্বিতল বৃহৎ হল নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। রমেশ-ভবনে প্রাচীন মূর্ত্তি আদি রক্ষিত আছে। উহারও মেঝে সিমেণ্ট করা দরকার। উহার মূর্ত্তিসংগ্রহ আরও সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা সফল হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, পরিষদ-মন্দির পুরাতন হওয়ায় এবং উহার সম্মুখ দিয়া প্রত্যহ আবর্জ্জনার ট্রেন যাতায়াত করায় উহার সম্পূর্ণ সংস্কার আবশ্যক। অনেক হাজার টাকা শীঘ্র চাই। বাঙালীর এই গৌরবের প্রতিষ্ঠানটিকে বাঙালী রক্ষা করুন।

স্কটিশ চার্চ কলেজ অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়

এই নৈশ বিদ্যালয় ২৪ বৎসর চলিতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। কলেজের ছাত্রেরা রাত্রে স্বেচ্ছায় জনশিক্ষাকল্পে স্থানীয় শ্রমিক ও তাহাদের সন্তানদিগকে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই সমাজ-সেবকদের প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত সকল কলেজের ছাত্রদের অনুকরণীয়। সম্প্রতি এই বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ ডাঃ স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর সভাপতিত্বে হইয়া গিয়াছে। ৬৫ জন ছাত্র পুরস্কার পাইয়াছে।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৪শ ভাগ
২য় খণ্ড
চৈত্র, ১৩৪১
৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাঁওতাল মেয়ে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যায় আসে সাঁওতাল মেয়ে,
শিমুল গাছের তলে কাঁকর-বিছানো পথ বেয়ে।
মোটা শাড়ি আঁট ক'রে ঘিরে আছে তনু কালো দেহ।
বিধাতার ভোলা-মন কারিগর কেহ
কোন্ কালো পাখীটিরে গড়িতে গড়িতে
শ্রাবণের মেঘে ও তড়িতে
উপাদান খুঁজি'
ওই নারী রচিয়াছে বুঝি।
ওর দুটি পাখা
ভিতরে অদৃশ্য আছে ঢাকা,
লঘু পায়ে মিলে গেছে চলা আর ওড়া।
নিটোল দু-হাতে তার শাদা-রাঙা কয় জোড়া
গালা-ঢালা চুড়ি;
মাথায় মাটিতে ভরা ঝুড়ি
যাওয়া আসা করে বার-বার।
আঁচলের প্রান্ত তার
লাল রেখা দুলাইয়া
পলাশের স্পর্শমায়া আকাশেতে দেয় বুলাইয়া।

পউষের পালা হ'ল শেষ,
উত্তর বাতাসে লাগে দাক্ষিণের কচিৎ আবেশ।
হিম-ঝুরি শাখা ধরে
চিকন চঞ্চল পাতা ঝলমল করে
শীতের রৌদ্দুরে।
পাণ্ডুনীল আকাশেতে চিল উড়ে যায় বহুদূরে।
আমলকী-তলা ছেয়ে খসে পড়ে ফল,
জোটে সেথা ছেলেদের দল।
আঁকাবাঁকা বনপথে আলোছায়া গাঁথা,
অকস্মাৎ ঘুরে ঘুরে ওড়ে ঝরা পাতা
সচকিত হাওয়ার খেয়ালে।
ঝোপের আড়ালে
গলা-ফোলা গিরগিটি স্তব্ধ আছে ঘাসে।
ঝুড়ি নিয়ে বার-বার সাঁওতাল মেয়ে যায় আসে।

আমার মাটির ঘরখানা
আরম্ভ হয়েছে গড়া, মজুর জুটেছে তার নানা।
ধীরে ধীরে ভিৎ তোলে গেঁথে
রৌদ্রে পিঠ পেতে।
মাঝে মাঝে
সুদূরে রেলের বাঁশি বাজে;
প্রহর চলিয়া যায় বেলা পড়ে আসে,
ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি জেগে ওঠে দিগন্ত আকাশে।
আমি দেখি চেয়ে,
ঈষৎ সঙ্কোচে ভাবি এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা
শুশ্রূষার স্নিগ্ধসুধাভরা,
আমি তারে লাগিয়েছি কেনা-কাজে করিতে মজুরী।
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁদকাঠি।
সাঁওতাল মেয়ে ওই ঝুড়ি ভ'রে নিয়ে আসে মাটি॥

৪ মাঘ
১৩৪১

রবীন্দ্রনাথের পত্র

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অজিত, তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করেছ তার উত্তর আমি পূর্ব্বেই দিয়েছি। একথা আমি ক্রমশই স্পষ্টতর ক'রে বুঝতে পারছি, ভালো নামক জিনিষটা আমাদের পক্ষে একটা কথার কথা যতক্ষণ তা আমাদের পক্ষে সত্য না হয়। অতএব আমরা ভালোকে চাই বললে কিছুই বলা হয় না, আমরা সত্যকে চাই এইটেই খাঁটি কথা। ভালোর প্রতি লোভ ক'রে সত্যকে হারানো মানুষের পক্ষে বড় দুর্গতি। বস্তুত পৃথিবীতে যথার্থ সৎলোকের এই একটা মস্ত বিপদ্ আছে। তাঁরা ভালোর প্রতি অত্যন্ত লুব্ধ হয়ে নিজের সত্যের প্রতি অন্ধ হয়ে পড়েন। তাঁরা বাইরের দিকের ভালোটাকেই সমুজ্জ্বল ক'রে দেখেন, নিজের ভিতরের দিকের ভালোটা দেখতে পান্ না। যারা bull's-eye লণ্ঠন নিয়ে দেখে তারা নিজের চারি দিকটাকে অন্ধকার ক'রে দেখে—সেটা বিশেষ কোনো একটা প্রয়োজনের দেখা হ'তে পারে কিন্তু সেটা স্বাভাবিক দেখা নয়। আমরা কোনো উপায়েই অন্যকে পেতে পারি নে;—অন্যকে দেখতে পারি, ভালবাসতে পারি, নিজেকেই পেতে পারি। ভালোকে বাইরে দেখতে পাওয়ার একমাত্র সার্থকতা এই যে, নিজের ভালোর সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সাধন করা যায়। নইলে তাকে আত্মসাৎ করতে যাওয়া চুরি করতে যাওয়ার মত। চোরাই মাল আপনার নয় এবং দণ্ডস্বরূপে আপনারটাকে খোয়াতে হয়। নিজের সত্যের সঙ্গে সকল সত্যের যোগ আছে, নিজের ভালোর সঙ্গে সকল ভালোর আত্মীয়তা আছে এইটেকে ঠিকমত অনুভব করতে পারলেই আত্মাবমাননার হাত থেকে ছুটি পাওয়া যায়। অবশ্য নিজের সত্যকে জানা অলস নিশ্চেষ্ট লোকের কর্ম্ম নয় কিন্তু বস্তুত সেইটেই সবচেয়ে কঠিন সাধনার কর্ম্ম। মা আপনার ছেলেকে যেমন আপনার প্রাণ দিয়ে তবে পায় কিন্তু অন্যের ছেলেকে কোলে তুলে নিলেই হ'ল এও তেমনি—নিজের সত্যের দায়ই সবচেয়ে বেশী। তেমনি নিজের সত্যের আনন্দেরও তুলনা নেই। কৃত্রিম কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে মানুষের নিজের ভিতরকার সত্যকে অবরোধ করতে আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ অনুভব করি। নিজের জোরকে অন্যের প্রতি প্রয়োগ করাই দৌরাত্ম্য, অন্যের জোরকে জাগিয়ে তোলাই যথার্থ হিতৈষিতা। তোমার যেখানে কাজের ক্ষেত্র সেখানে তুমি যেটা সবচেয়ে ঠিকমত করতে পার সেই দিকেই প্রাণপণে ঝোঁক দিয়ো, অন্য কিছু যতই ভালো এবং যতই আবশ্যক হোক্ না তোমার তাতে কিছুমাত্র দায়িত্ব নেই। এইটেই যথার্থ নির্লোভ এবং নিরাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করা; এই ভাবটি ঠিকমত রক্ষা করতে পারলেই কর্ম্মের দাসত্ব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সত্যের কাছেই আমি ধরা দিতে পারি, তাতেই আমার আনন্দ কিন্তু কর্ম্মের কাছে নয়;—সত্যেরই প্রকাশক্ষেত্র বলেই কর্ম্মের গৌরব, নইলে তার মত হরিণবাড়ি জগতে কোথাও আছে?

আমি সম্প্রতি গ্লসটারশায়ারে এক গণ্ডগ্রামের কৃষকের ঘরে বাস করছি। নিকটে আর এক বাড়িতে রটেনষ্টাইন থাকেন। বেশ আনন্দে আছি। শিশু থেকে একটা আধটা কবিতা তাঁকে তর্জ্জমা ক'রে দিই—তাঁর ভালো লাগে। ইতি ৩১ শ্রাবণ ১৩১৯

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

C/o Prof. Seymour
Urbana
Illinois
U. S. A.

কল্যাণীয়েষু

অজিত, আমরা আগামী শনিবারে আমেরিকায় যাত্রা করব। কথা ছিল, আমার বই বের হয়ে গেলে পর তার পরে রওনা হব—এখানকার সকলে সেই পরামর্শ দিচ্ছিলেন—

কিন্তু আমার মন শান্তি চাচ্ছে। আমি নিজের লেখা নিজের আলোচনা নিয়ে আর থাকতে পারছি নে—এখানকার বন্ধনজাল কাটিয়ে আবার একবার মুক্তিলাভ করবার জন্যে সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমি শিলাইদহের নির্জ্জন ঘরে বসে গীতাঞ্জলি তর্জ্জমা করছিলুম সে আমার আপন মনের আনন্দে করছিলুম। সেই বিজনতা থেকে একেবারে মানুষের ভিড়ের মাঝখানে এসে পড়েছি—এখন যা কিছু করছি সে তো আনন্দের কাজ নয় সে তাগিদের কাজ। সে আমার বেশি দিন পোষাবে না। যতই বেতন খোরাক পাই না কেন আমি জবাব দিলুম। বরাবর নির্জ্জন অবকাশের সমুদ্রে জাল ফেলাই আমার ব্যবসা—জাল যদি গুটিয়েও বসে থাকি তবু সমুদ্র আছে—সেই আমার সবচেয়ে বড় লাভ। এখানে আমার বন্ধুরা আমাকে টেনে রাখতে চান—কিন্তু কিছুতে আমাকে ধরে রাখতে পারবে না।

তুমি ছাড়া এবার আর কারো কাছ থেকে চিঠি পাই নি। বোধ হয় আমাদের জর্ম্মনি যাবার গুজবে তোমরা ছুটি নিয়েছ। কিন্তু শরীরটা কিছু বিগড়েছে। ক্ষিতীশ সেন নামক এখানকার এক জন ছাত্র "রাজা" তর্জ্জমা করছেন। তর্জ্জমাটা বোধ হচ্ছে ভালই হবে। বিদ্যালয় সম্বন্ধে তোমার লেখাটা আমেরিকায় গিয়ে ছাপাবার ব্যবস্থা করব ঠিক করেছি। ইতি ৩০ আশ্বিন ১৩১৯

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার

আমরা সূর্য্যাস্তের পথ অনুসরণ করতে চললুম। এবার অতলান্তিকের ওপারের ঘাটে পাড়ি দেওয়া যাচ্ছে। ভেবেছিলুম সূর্য্যের রথরেখার অনুবর্ত্তন করতে করতেই ভারতবর্ষে গিয়ে পৌঁছব—কিন্তু বোধ হচ্ছে ঠিক সে রকমটি হবে না। এখানে এঁরা ধরেছেন আবার আমার গ্রীষ্মের সময় আসা চাই। তত দিনে আমার অন্য বই ছাপবার সময় হয়ে আসবে। কাল রাত্রে ইয়েট্‌সের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। "ডাকঘরের" তর্জ্জমাটা তাঁর খুব ভালো লেগেছে। ওটা তিনি তাঁদের আইরিশ থিয়েটারে অভিনয় করবার জন্যে উৎসুক হয়েছেন। এখানকার এক জন ছাত্র "রাজা" তর্জ্জমা ক'রে দিয়েছেন, সেটাও কালরাত্রে ইয়েট্‌সকে দিয়েছি, আমার বিশ্বাস এইটেই আমার সকল লেখার চেয়ে এঁদের ভালো লাগবে। কাল সকালে এক জন ফরাসী গ্রন্থকার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি ফ্রেঞ্চে আমার তর্জ্জমাগুলো পড়ে উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে এসেছেন। তিনি বললেন, তোমার মতো কবির জন্যে আমরা অপেক্ষা করে আছি। আমাদের লিরিক্সে আমরা কেবল accidental-কে নিয়ে বৃদ্ধ হয়ে আছি—তোমার লেখা দেশকালের অতীত, চলো তুমি আমাদের ফ্রান্সে চলো, সেখানে তোমাকে আমাদের প্রয়োজন আছে। ইত্যাদি। ইনি আমার এই তর্জ্জমাগুলি ফরাসীতে অনুবাদ করবার অনুমতি নিয়ে গেলেন। এঁদের এই উৎসাহ দেখে আমি অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করি—এ আমি কখনো কল্পনা করতেও পারতুম না। ব্রজেন্দ্র বাবুকে কেম্ব্রিজে কিম্বা লণ্ডনে কোনো কাজ নিয়ে এখানে আবদ্ধ করবার জন্যে আমরা খুব চেষ্টা করছি। একটা কিছু জুটবে ব'লে মনে করছি। এদেশে উনি থাকলে আমাদের ভারি উপকার হবে।

বৈজ্ঞানিক পুস্তকগুলি এত দিনে নিশ্চয় তোমাদের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে। সেটা খুব একটা ভারি পার্শ্বেল হয়েছে—সেই জন্যে পেতে দেরি হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু পেলে যেন তোমাদের বিদ্যালয়ের কাজে লাগাতে পারো। ইতি ২রা কার্ত্তিক ১৩১৯

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

New York

২৮ অক্টোবর ১৯১২

১২ কার্ত্তিক ১৩১৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অজিত, আট্‌লান্টিক পার হয়ে এ-পারে এসে কাল পৌঁচেছি। সমুদ্র প্রথম কয়দিন যে-রকম অশান্ত ছিল এমন আর কখনো আমি দেখি নি। এই দেহপাত্রে

মধ্যে যেটুকু জীবন ছিল তাকে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে তার অর্দ্ধেকটা প্রায় বের্ ক'রে ফেল্‌লে—যেটুকু বাকি ছিল তাতে কেবলমাত্র বেঁচে থাকা চলে, তার অতিরিক্ত আর কোনো কাজই চলে না। অন্ধকারে ছোট্ট ক্যাবিনের খাঁচার মধ্যে অনাহারে পড়ে পড়ে কেবল ভাবছিলুম বরুণদেব করুণ হবেন কবে। মনে মনে মহাসমুদ্রকে একটা চতুর্দ্দশপদী মানৎ করেছিলুম। কিন্তু মহাসমুদ্র মানবচরিত্রের দুর্ব্বলতা বোধ হয় অবগত আছেন। তিনি জানেন যদি নিতান্ত সহজে তিনি আমাদের পার করেন তা হ'লে পারে এসেই তাঁকে ভুলতে আর বিলম্ব হবে না কিন্তু খুব কসে একবার দোলা দিয়ে দিলেই অন্তঃকরণে সেটা একেবারে মুদ্রিত হয়ে থাকবে। কথাটা মিথ্যা নয়—এবার আমাদের আট্‌লাণ্টিকের এই ঝুলনযাত্রা আমরা ইহ-জীবনে কখনো ভুলতে পারব না। কিন্তু একটা বড় আশ্চর্য্য জিনিষ এবার দেখলুম—শরীরে যখন কোথাও কিছুমাত্র আরাম নেই এবং চারিদিক যখন সঙ্কীর্ণরূপে বদ্ধ—তখন নিজের অন্তরতম শক্তি সেই সঙ্কীর্ণতার কোণে একটুখানি ছিদ্রপথ দিয়ে অমৃত উৎস উৎসারিত ক'রে দিয়েছিল। কতদিন এবং কতরাত্রি আমার রোগশয্যা যেন জননীর কোল হয়ে আমাকে গ্রহণ করেছিল—সমস্ত মুক্তি জগতের আনন্দ ক্যাবিনের ভিতরটিতে এসে আমার খবর নিয়ে গেছে। কী সুগভীর শান্তি, সান্ত্বনা এবং আরামের দ্বারা আমার শরীরের সমস্ত দুঃখ গ্লানি একেবারে সমাবৃত হয়ে গিয়েছিল সে আমি বলতে পারি নে। আমার চতুর্দ্দিক অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল বলেই আমি এমন একটি বৃহৎকে এমন সত্য-ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম। কেননা যে বৃহৎটি সত্য, কোনো বাহ্য সঙ্কীর্ণতায় তাকে ছোট করতে পারে না—ভূমাতে আয়তনের দ্বারা ছোটও হ'ল না বড়ও হ'ল না। আমার সেই অবরুদ্ধ ক্যাবিনটার মধ্যে সমস্ত জগৎকে ধরেছিল—আমার কোনো অভাব হয় নি।—আমি বেশ দেখতে পেলুম বঞ্চিত হলেই যথার্থ রূপে পাওয়া যায়—হারানোর ভিতর দিয়ে পাওয়ার মতো নিবিড় পাওয়া আর কিছুই নেই। সত্য মাঝে মাঝে ছল ক'রে মুখ ঢাকা দেন, তখন ব্যাকুল হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে দেখা যায় তাঁকে হারাবার জো নেই। সেদিন ভোররাত্রে যখন বাইরে ঘন মেঘ বৃষ্টি ও অশান্ত বাতাস তখন আমি গাচ্ছিলুম "জননী আমার দাঁড়াও এই নবীন অরুণ কিরণে।" তেমন নবীন অরুণ কিরণ তো আমি বোলপুরের মাঠের ধারে বসেও এমন ক'রে পাই নি। অরুণ কিরণকে পাবার জন্যে যখন সামনে অরুণ কিরণকে সাজিয়ে রাখবার কোনো দরকার হয় না তখনই জীবন ধন্য। ছবির গায়ের উপরে ছবির নাম লিখে দিতে হয় নিতান্ত ছেলেমানুষদের জন্য—বাইরের এই উপকরণগুলো তেমনি নাম লেখা মাত্র—ওগুলো না দেখলে আমরা মূঢ়রা কিছু বলতে পারি নে—কিন্তু অক্ষর তো জিনিষ নয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

New York
২৯ অক্টোবর ১৯১২

ওঁ

বিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

দেবাসুরে মিলে যখন সমুদ্রমন্থনে লেগেছিলেন তখন মহাসমুদ্রের পেটে যা-কিছু ছিল সমস্ত তাঁকে নিঃশেষে উদ্গার করতে হয়েছিল। সে সময়ে তাঁর যে কী রকম পীড়া উপস্থিত হয়েছিল সেটা তিনি মহাভারতের বেদব্যাসকে কোনোদিন বোঝাবার সুযোগ পেয়েছিলেন কিনা জানি নে কিন্তু এই বর্ত্তমান কবিটিকে খুব স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমার জঠর তাঁর জঠরের মতো এমন বিরাট নয় এবং তার মধ্যে বহুমূল্য জিনিষ কিছুই ছিল না কিন্তু বেদনার পরিমাণ আয়তনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না; সেই জন্যে অতলান্তিক পার হবার সময় তার অপার দুঃখ অল্পকালের মধ্যেই উপলব্ধি ক'রে নিয়েছিলুম। আমরা যে নিতান্তই মাটির মানুষ সেটা বুঝতে বাকি ছিল না। এখন কেবলই মনে হচ্ছে, কালো জল আর হেরব না গো দূতী, সমুদ্র আর পার হব না—ষ্টীমারের বংশীধ্বনি যত জোরেই বাজুক আর কূল ছাড়তে মন যাচ্ছে না। ডাঙায় নেমে এখনও শরীরটা ক্লান্ত হয়ে আছে। দিনরাত্রি নাড়া খেয়ে খেয়ে প্রাণটা যেন শরীরের থেকে আলগা হয়ে নড়নড় করছে। সমুদ্র আমাকে যেন তার ঝুমঝুমি পেয়েছিল—দু-হাতে ক'রে ডাইনে বাঁয়ে

নাড়া দিয়েছিল, ভেবেছিল কবির পেটের মধ্যে ত্রিপদী চতুষ্পদী যা-কিছু আছে সমস্তয় মিলে একটা হট্টগোল বাধিয়ে তুলবে—কিন্তু উলটে পাল্‌টে খানাতল্লাসী ক'রে জঠরের মধ্য থেকে ছন্দোবন্ধের কোনো সন্ধানই যখন পাওয়া গেল না তখন মহাসমুদ্র আমাকে নিষ্কৃতি দিলেন।

সুরুলের বাড়িটা পাওয়া গেছে। পূর্ব্বেই লিখেছি আপাতত সেটা ইস্কুলের কাজে লাগিয়ে দিয়ো। সিংহ লিখেছেন তার আসবাবগুলো আপাতত ঐখানেই রেখে ব্যবহার করতে। কিন্তু পাছে লোকসান হ'লে তার দাম ধরে বসেন এই আমার আশঙ্কা হয়। দ্বিপুকে জানিয়ো তিনি যেটা ভালো বোঝেন তাই করবেন। আসবাবের একটা ফর্দ্দ ক'রে বুঝে নিয়ো এবং তার একটা কাপি আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। সুরুলের বাগানে বিদ্যালয়ের জন্যে তরীতরকারী উৎপন্ন করানো যেতে পারে কিনা ভেবে দেখো—অবশ্য ফসলের দামের চেয়ে চাষের দাম বেশি না পড়ে। অন্তত ফলের গাছের গোড়া খুঁড়ে এইবেলা সার দিয়ে রাখলে নিশ্চয়ই ফল পেতে পারবে। ইলিনয়ের ঠিকানায় পত্র লিখো। ইতি

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৈথিল কবি গোবিন্দদাস ঝা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলন ও সম্পাদন করিবার জন্য ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাকে মিথিলায় যাইতে হয়। মৈথিল কবিতাসমূহ অনুসন্ধান করিবার সময় জানিতে পাই যে, বাংলা দেশে প্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যেগুলি মৈথিল ভাষায় রচিত এবং গোবিন্দদাসের ভণিতা সম্বলিত সেগুলি মিথিলাবাসী গোবিন্দদাস ঝার রচনা। আমাদের দেশে লোকে মৈথিল ভাষা বিস্মৃত হওয়াতে ঐ সকল পদ অত্যন্ত অশুদ্ধ ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে, এমন কি স্থানে স্থানে অর্থবোধ হয় না। এই সকল পদই বিশুদ্ধ আকারে মিথিলায় দেখিতে পাই।

কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এই সম্বন্ধে আমি প্রবন্ধ পাঠ করি। উহার মর্ম্ম পরিষদের কার্য্যবিবরণীতে সন্নিবেশিত আছে। সে সময় আমার সিদ্ধান্ত লইয়া কোনরূপ আন্দোলন হয় নাই, কোন সাময়িক অথবা সংবাদ পত্রে কোন প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় নাই। কয়েক বৎসর অতীত হইল আমি মৈথিল কবি গোবিন্দদাস সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পাঠ করি এবং উহা পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহার পর কলিকাতা পোয়েট্রি সোসাইটীতে ইংরেজীতে আর একটি প্রবন্ধ পাঠ করি, এবং সেই প্রবন্ধ পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়। 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে উহা প্রকাশিত হয়।

এবার আমার মতের বিস্তর প্রতিবাদ হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ও অন্যান্য পত্রে আমার সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত এই অভিযোগ প্রকাশিত হয়। প্রতিবাদীরা বলেন, ব্রজবুলিতে রচিত পদসমূহ শ্রীখণ্ড বুধরী নিবাসী গোবিন্দ-দাসের লেখা। অপভ্রংশ মৈথিল ভাষার কল্পিত নাম ব্রজবুলি। এই গোবিন্দদাস জাতিতে বৈদ্য ছিলেন ও তাঁহার উপাধি ছিল কবিরাজ—চিকিৎসক অর্থে নয়, শ্রেষ্ঠ কবি অর্থে। এই মতও কল্পিত ও আনুমানিক। যাঁহারা এ-কথা লিখিয়াছিলেন তাঁহারা বৃহদাকার 'পদকল্পতরু' আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। গোবিন্দদাস নামে কয় জন বৈষ্ণব কবি ছিলেন তাহাও বোধ হয় জানেন না। কোন্ পদ কোন্ গোবিন্দদাসের রচিত তাহা কোন-মতে নির্ণয় করিতে পারা যায় না। বৈষ্ণব কাব্যের দুইটি

প্রধান সঙ্কলন, 'পদকল্পতরু' বৈষ্ণবদাস কৃত সঙ্কলিত ও 'পদসমুদ্র' রাধামোহন ঠাকুর সঙ্কলন করিয়াছিলেন। পদকল্পতরুতে টীকা নাই, পদসমুদ্রে সংস্কৃত ভাষায় টীকা আছে, কোন কবির কোন পরিচয় নাই। গোবিন্দদাস নামে পাঁচ জন কবি ছিলেন, কোন কোন পদের ভণিতায় কবির উপাধি আছে, যেমন গোবিন্দ ঘোষ। অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে গোবিন্দদাস নামধারী সকল কবির পদ একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, কেবল একাম্ন পদ নামে স্বতন্ত্র সঙ্কলন আছে। এগুলি এক জন কবির রচনা, ভাষা বাংলা, শ্রীখণ্ডের গোবিন্দদাসের হইতে পারে। কিন্তু এ-কথাও অনুমান মাত্র, প্রামাণিক নয়। গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, কে কোন্ পদ রচনা করেন, নিঃসংশয়ে তাহা স্থির করিবার কোন উপায় নাই। কয়েকটি পদের ভণিতায় কবির পদবী আছে, নচেৎ সর্ব্বত্রই কেবল গোবিন্দদাস নাম পাওয়া যায়।

যে-সকল প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় আমি তাহার কোন উত্তর দিই নাই। দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। যাঁহারা প্রধান কবি গোবিন্দদাসকে মৈথিল স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য বাঙালী জাতির গৌরব রক্ষা করা, কিন্তু সত্যের অপেক্ষা মহত্তর কিছুই নাই এবং সত্যের অনুসন্ধানে যাহা জানিতে পারা যায় তাহা গোপন করা অসম্ভব। আমি বৈষ্ণব কবিতা অল্পস্বল্প দেখিয়াছি, কবিরাজ গোবিন্দদাসকে সাধ করিয়া মিথিলাকে প্রত্যর্পণ করি নাই। বিদ্যাপতি-সম্পাদনকালে আমাকে অনেক পরিশ্রম করিয়া মৈথিল ভাষা শিখিতে হয়। মৈথিল গোবিন্দদাসের ভাষা, তাঁহার শব্দ-কৌশল উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে কোন মতেই বাঙালী বলিতে পারা যায় না। বিশেষ যখন তাঁহার রচনা আমি মিথিলায় দেখিয়া আসিয়াছি এমন অবস্থায় দ্বিধার আর স্থান নাই।

এ-কথা কি সকলের জানা আছে যে কিছুকাল পূর্ব্বে বিদ্যাপতিকে সকলে বাঙালী বলিত? বলিবারই কথা। তাঁহার অপূর্ব্ব পদাবলী বাংলা দেশ ছাড়া আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। ১২৮০ সালে জগদ্বন্ধু ভদ্র 'মহাজন-পদাবলী' নামে বৈষ্ণব কাব্য প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি লেখেন বিদ্যাপতির নাম ছিল বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য্য এবং তিনি যশোহরনিবাসী। ১২৮২ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বঙ্গ-দর্শনে' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাপতিকে মিথিলাবাসী নির্দ্দেশ করেন। স্যার জর্জ্জ গ্রিয়রসন মিথিলা হইতে বিদ্যাপতির কতকগুলি পদ সংগ্রহ করিয়া ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। মিথিলাবাসীরা নিজের কর্ত্তব্যে উদাসীন। বাঙালীর বড় গৌরবের কথা যে, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস ঝাকে এত উচ্চ আসন প্রদত্ত হইয়াছে।

মিথিলায় মৈথিল সাহিত্যে এখন অনুরাগ হইয়াছে। লহেরিয়াসরায় দরভঙ্গায় মৈথিল সাহিত্য-পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি যন্ত্র নামক মুদ্রাযন্ত্র এবং প্রাচীন মৈথিল লিপির অক্ষর ঢালা হইয়াছে, কয়েকখানি গ্রন্থও ছাপা হইয়াছে। গত বৎসর বিদ্যাপতির জয়ন্তী-উৎসব হইয়াছিল, সভাপতি হইয়াছিলেন দরভঙ্গার মহারাজা। পাটনার বিশ্ববিদ্যালয়ে মৈথিল ভাষার শিক্ষক মহারাজার ব্যয়ে নিযুক্ত হইয়াছেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাষা পঠিত হইতেছে।

গোবিন্দদাস ঝার সম্বন্ধেও বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতি যন্ত্র হইতে 'গোবিন্দগীতাবলী' পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সঙ্কলয়িতা দরভঙ্গা রাজকীয় পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীমথুরাপ্রসাদ দীক্ষিত। যে-সকল পদ এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা বঙ্গদেশেও পাওয়া যায়। সঙ্কলনকার আমার প্রবন্ধাদির উল্লেখ করিয়া কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানেন না যে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম যে গোবিন্দদাস কবিরাজ মিথিলাবাসী।

'গোবিন্দগীতাবলী' সম্পূর্ণ গ্রন্থ নয়। বিদ্যাপতির সম্পূর্ণ পদাবলী আমি সম্পাদন করি, গোবিন্দদাস ঝারও করিব।

বাংলা দেশের একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

শ্রীঅনাথনাথ বসু

আমাদের দেশে শিক্ষাসংস্কারের কথা তুলিলেই এক দল লোক বলেন বর্ত্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে কোন ভাল কাজই আমাদের বিদ্যালয়ে করা সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের মতে পরীক্ষাবিধি, পরিদর্শন-পদ্ধতি ইত্যাদি বাহিরের শাসন আমাদের শিক্ষা-প্রণালীকে এমন কঠিন নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে সেখানে উন্নতির যে-কোন চেষ্টা করিলেই ব্যর্থ হইতে হইবে। কথাটা আংশিক হিসাবে ঠিকই বটে, কিন্তু অনেক দিন হইতেই আমার মনে সন্দেহ ছিল যে সেটা হয়ত পুরাপুরিভাবে সত্য না-হইতেও পারে। এই জন্যই অনেক কাল ধরিয়া সন্ধান করিতেছিলাম এমন কোন শিক্ষায়তন মেলে কিনা যেখানে দেশের সর্ব্বত্রপ্রচলিত সাধারণ শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করিয়াও তাহারই মধ্যে নূতন কিছু গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে, যেখানে বাহিরের সমস্ত শাসন স্বীকার করিয়াই শত বাধাসত্ত্বেও বিদ্যালয়ে নূতন প্রাণসঞ্চার করার প্রয়াস চলিতেছে এবং সেই প্রাণবোধন-তপস্যা কিছু পরিমাণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। পুরাতন প্রণালীকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়া নূতন শিক্ষাপ্রণালী গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা আমাদের দেশে কোন কোন স্থানে হইয়াছে এবং সে চেষ্টা কোথাও কোথাও হয়ত আংশিকভাবে সফল হইয়াছে; কিন্তু এরূপ চেষ্টা নানা কারণে স্বভাবতই দেশব্যাপী হইতে পারে না এবং এই নূতন ধরণের বিদ্যালয়গুলি দেশের অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রেরই অভাব মিটাইতে পারে। এই জন্য এমন বিদ্যালয় প্রয়োজন যাহা সাধারণ হইয়াও অসাধারণ, যাহা চারি দিকে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী স্বীকার করিয়াই তাহার সংস্কারের অনুষ্ঠান করিতেছে এবং সেই সংস্কৃত প্রণালীর সাহায্যে ধীরে ধীরে দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্ত্তনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। বিদ্রোহ করিবার শক্তি সকলেরই নাই, সকলেই আবার বিদ্রোহ করিয়া সফল হয় না; সে শক্তি যাঁহার আছে তিনি সে পথ অবলম্বন করিবেন, কিন্তু সে পথ প্রভূততমের পথ নহে। দেশের অধিকাংশকেই বিপ্লবের পরিবর্ত্তে ক্রমবিকাশের পথ স্বীকার করিয়া লইতে হয়। পুরাতনকে একেবারে ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে এক প্রকারের শক্তির প্রয়োজন হয়। তাহার মধ্যে উন্মাদনা আছে, সেই উন্মাদনাই আনন্দের খোরাক জোগায়। কিন্তু অসীম ধৈর্য্যের সহিত একটির পর একটি করিয়া ইট বদল করিয়া সংস্কারের যে প্রয়াস তাহার জন্য চাই আর এক প্রকারের শক্তি; তাহার মধ্যে উন্মাদনা নাই, আছে শান্ত-ধৈর্য্য। হয়ত প্রথম শক্তির তুলনায় তাহার মধ্যে বাহ্য বৈভবের, ঐশ্বর্য্যের অভাব আছে কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে ছোট করিলে চলিবে না। আমাদের দেশে আজ সে শক্তির, সেরূপ চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

সেদিন শিক্ষাসংস্কারের এইরূপ একটি প্রচেষ্টার সহিত আমার পরিচয় ঘটিয়াছে, তাহার কথা বলি।

কলিকাতার দক্ষিণে যে প্রশস্ত সুদীর্ঘ রাজপথ কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবার পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে তাহারই পার্শ্বে ডায়মণ্ড হারবার হইতে চার মাইল উত্তরে সরিষা নামে একটি নাতিবৃহৎ গ্রাম আছে। রাজপথ হইতে গ্রামের উপান্তে স্থিত প্রকাণ্ড একটি দীঘি চোখে পড়ে; তাহারই পূর্ব্বে আম কাঁঠাল নারিকেল গাছের ছায়ায় গ্রামটি অবস্থিত। রাজপথের পশ্চিমে এক কালে যেখানে শুধু ধানের ক্ষেত ছিল সেখানে আজকাল কয়েকটি ক্ষুদ্রবৃহৎ কুটীরের সমষ্টি দেখা যায়। এইগুলিই সরিষার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। প্রায় বারো বৎসর পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকটি সেবাব্রত সন্ন্যাসী মাঠের মাঝে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার ভিতর দিয়া নূতন করিয়া পল্লীসমাজ-গঠন। সেই জন্য তাঁহারা বিশেষ করিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থারই উপর জোর দিয়াছিলেন।

একদিন আমাদের দেশে যখন সমাজ সংহত এবং সমাজবোধ প্রবল ছিল তখন সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজন-অনুযায়ী সমাজের নিকট সেবাগ্রহণ করিত এবং আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজের সেবা করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিত। সেদিন সেবাগ্রহণেও লজ্জা ছিল না, সেবা করিতেও গৌরব ছিল না। তাই তখন সমাজসেবার জন্য কেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠান করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু আজ সমাজ সংহতি হারাইয়াছে এবং আমাদের সমাজবোধ ক্ষীণ হইয়া উঠিয়াছে, তাই নানা ভাবেই আজ সমাজসেবার কেন্দ্রের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে সেবার ভার লইবে কে? একদিন যে সন্ন্যাসী সমাজের নিকট হইতে জীবনধারণের অধিকারের বিনিময়ে অধ্যাত্মসম্পদ দানের ও সেবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন তিনি আজ নিতান্তই ভিক্ষাব্রতী, সমাজের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যসাধনে বিমুখ। তাই দেশের ভিখারীর সংখ্যাই বাড়িয়া চলিয়াছে, সেবকের সংখ্যা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে, তাই অধিকাংশ স্থলেই তথাকথিত আশ্রমগুলি সেবাকেন্দ্র না-হইয়া ভিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইতেছে। অথচ প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিগণের তপোবনগুলি শিক্ষা, দীক্ষা, অধ্যাত্মসাধনা ও জ্ঞানচর্চ্চা সকল দিক্ দিয়াই প্রাণের কেন্দ্র ছিল। এ-কথা মনে করিলে ভুল করা হয় যে সেই আশ্রমগুলি শুধু অধ্যাত্ম-সাধনা লইয়া ব্যাপৃত ছিল। এদেশের আয়ুর্ব্বেদের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি নামেই প্রোক্ত; বাৎস্যায়নও ঋষি ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের কালে সন্ন্যাসের সেই প্রাচীন আদর্শ নূতন করিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রামকৃষ্ণ-মিশনের সন্ন্যাসী-সেবকগণ আজ সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত সেবাপ্রতিষ্ঠান-গুলি সাধারণতঃ বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু আমি জানি না যে, আমি যে-প্রতিষ্ঠানটির কথা বলিতেছি তাহার সহিত কয় জনের পরিচয় আছে। বাংলার একটি নিভৃত অখ্যাতনামা পল্লীতে এই যে কয়েক জন সন্ন্যাসী মিলিয়া তাঁহাদের বাহ্যৈশ্বর্য্যহীন, অনাড়ম্বর চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা ভাবী কালের সূচনা করিয়াছেন, ভাবী সমাজগঠন করিতেছেন তাহা সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার; তাহার সন্ধান লওয়া আমাদের প্রয়োজন।



(১) মেয়েদের খেলা। (২) বিদ্যালয়ের কয়েক জন ছাত্রী।
(৩) মেয়েদের খেলা। (৪) ড্রিলের দৃশ্য।

এই আশ্রমের বাহিরের সৌষ্ঠব কিছু নাই। দুই

টুকরা জমির উপর ইতস্ততবিক্ষিপ্ত কয়েকটি কুটীর, একটি ইষ্টকনির্ম্মিত ক্ষুদ্রায়তন গৃহ, দেখিলেই বিদ্যালয় বলিয়া চেনা যায়, এই লইয়াই সরিষার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম।

ধানক্ষেতের জমি উঁচু করিয়া তাহার উপর আশ্রমগৃহ ও কুটীরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে চারি দিকে নয়নাভিরাম পল্লীদৃশ্য দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আশ্রমের সম্মুখে রাজপথের অপর পারে সরিষাগ্রাম; দূরে বৃক্ষপল্লবের অন্তরালে আরও দু-একটা গ্রাম দেখা যায়। এই কয়েকটি গ্রামকে অবলম্বন করিয়াই আশ্রমের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত। বাংলার অন্যান্য শত শত পল্লীগ্রামেরই মতই এই কয়েকটি গ্রাম, কোন বিষয়ে





(১) ছেলেদের সমাজ-সেবা।
(২) মেয়েরা মার্চ করিয়া যাইতেছে।

বিশেষত্বপূর্ণ বা উন্নতিশীল নহে। সেই আম-কাঁঠাল-নারিকেলের বন, বাঁশের ঝাড়, সেই শৈবালাচ্ছন্ন ছোট ছোট পুষ্করিণী, সেই প্রাচীন গৌরবের চিহ্নস্বরূপ ভগ্নমন্দির, কয়েকটি কোঠাবাড়ি ও পূর্ণপ্রায় দীর্ঘিকা এবং এই আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দারিদ্র্য-ভারক্লিষ্ট জরাজীর্ণ গুটিকতক বাঙালী সন্তান। তাহাদের মধ্যে তথাকথিত ভদ্র ও অভদ্র দুই শ্রেণী বাস করে। যাহারা ভদ্র বলিয়া পরিগণিত, তাহাদের মধ্যে যাহারা ভাগ্যবান তাহারা শহরে চাকরি করে এবং ধীরে ধীরে পল্লীজননীর স্নেহাঞ্চল ত্যাগ করিয়া নগরেই আশ্রয় খোঁজে; আর যাহাদের অদৃষ্টে সে-সৌভাগ্য জোটে নাই তাহারা গ্রামে থাকিয়া দলাদলি করে, মামলামোকদ্দমা করে, পরনিন্দা করিয়া তাম্রকূটের ধোঁয়ায় পল্লী-চণ্ডীমণ্ডপ ধূমায়িত করে আর প্রতিদিন তাহাদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। আর যাহারা অভদ্র বলিয়া পরিচিত তাহাদের মধ্যে যাহাদের অল্পবিস্তর জমি আছে তাহারা চাষ করিয়া কোনমতে দিনাতিপাত করে; যাহাদের জমি নাই তাহারা হয় দিনমজুরী করে, না-হয় নিকটবর্ত্তী পাটের কলে কুলির কাজ করে। গ্রামের মেয়েরা গৃহকর্ম্ম করে এবং তাহার অবসরে কলহ ও পরচর্চ্চা করে। এখানকার পল্লীজীবনে আজ আর কোন শ্রী, কোন সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্য নাই; মানুষের মনকে মুক্তি দিবার, তাহাকে সার্থকভাবে ব্যাপৃত করিয়া রাখিবার কোন আয়োজনই আজ সেখানে নাই।

এরূপ আবেষ্টনের মধ্যেই ১৯২১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ মিশনের সরিষা আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহার বাহিরের ঐশ্বর্য্য বিশেষ কিছু নাই। যে দুই টুকরা জমির উপর আশ্রমটি অবস্থিত তাহাদের একটির আয়তন প্রায় তিন বিঘা। তাহার উপরে বিদ্যালয়গৃহ ছাড়া আরও পাঁচ-ছয়টি কুটীর আছে; সেগুলি যথাক্রমে ব্যায়ামাগার, ডাক্তারখানা, রন্ধনগৃহ, ঠাকুরপূজার মন্দির এবং আশ্রমের সাধু ও অতিথিদের থাকিবার স্থান। যদি ইহাদের কোন বিশেষত্ব থাকে, তবে সে তাহাদের আড়ম্বরহীন পরিপাটি পরিচ্ছন্নতা; বিদ্যালয়ের সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বা অন্য কোথাও একটুও আবর্জ্জনা নাই দেখিয়া সত্যই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

অদূরে রাস্তার ওপারে সারদামন্দির বা মেয়েদের শিক্ষালয়। একটা নালার উপর বাঁশের সেতু, সেই সেতু অতিক্রম করিয়া সারদামন্দিরে যাইতে হয়। প্রকাণ্ড একটি চারচালা মাটির কোঠা, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরভাবে সাজান;

কোথাও আয়োজন-বাহুল্য নাই। আশ্রমের সর্ব্বত্রই একটা সংযত শুচিতার ভাব রহিয়াছে।

১৯২৩ সালে ছেলেদের বিদ্যালয়টি, শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এখানে ছেলেরা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়ে। ইহার ছাত্রসংখ্যা অনুমান দুই শত। এখানকার ছাত্রগণ প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি পাইতেছে।

সারদামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৯২৭ সালে; প্রথমে ইহা সামান্য একটি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহা মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং সম্প্রতি ইহার সঙ্গে উচ্চ-বিদ্যালয়েরও একটি শ্রেণী খোলা হইয়াছে। দুইটি বিদ্যালয়েই একদিন শিক্ষার্থী জুটিত না; শিক্ষামন্দির আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র পাঁচটি ছাত্রকে লইয়া। সারদামন্দিরের আরম্ভ কয়টি ছাত্রীকে লইয়া তাহার সংখ্যা ঠিক মনে পড়িতেছে না, কিন্তু আজ উভয় বিদ্যালয়েই স্থানাভাব ঘটিতেছে। শিক্ষামন্দিরের ছাত্রের সংখ্যা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সারদামন্দিরের বর্ত্তমান ছাত্রী-সংখ্যা এক শতের অধিক। এমন কি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ছাত্রীদের জন্য আশ্রমের কর্ম্মিগণকে মানখণ্ডা ও কলাগাছি গ্রামে আরও দুইটি সারদামন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে। সেই দুইটি বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যাও মোট প্রায় এক শত হইবে। সারদামন্দিরের ছাত্রীগণও প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিতেছে।

ছেলেমেয়েদের বৃত্তিলাভের কথা এই জন্যই উল্লেখ করিয়াছি যে, সাধারণ হিসাবেও ইহারা বাংলা দেশের অন্যান্য শত শত বিদ্যালয়ের চেয়ে কম নহে। বরং যদি বৃত্তিলাভ বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়ও মাপকাঠি হয়, তাহা হইলে হয়ত ইহারা অন্য বহু বিদ্যালয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই পরিগণিত হইবে।

কিন্তু শিক্ষামন্দির ও সারদামন্দিরের বিশেষত্ব সেখানে নহে। সে বিশেষত্ব চোখে পড়ে যখন এই বিদ্যালয় দুইটির ছাত্রছাত্রীগণকে দেখি।

অল্পবয়স্ক গ্রাম্য ছেলেমেয়েরা স্কোয়াড্ ড্রিল করিতেছে, লেফ্ট্ রাইট্ করিয়া বাঁশী বাজাইয়া রাজপথ দিয়া মার্চ করিয়া যাইতেছে, মেয়েরা সাইকেল চড়িতেছে, জুজুৎসু করিতেছে; ছেলেরা কুস্তী করিতেছে, সকলেই দেহ-মন দিয়া কাজ করিতেছে, প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছে, খেলা করিতেছে। সকলের দেহ বলিষ্ঠ, গতি ক্ষিপ্র, মন চলিষ্ণু সবল, মুখশ্রী উৎসাহে উজ্জ্বল, দীপ্ত; সকলেরই মনে আশা, আনন্দ ও স্বাধীনতা। তাহারা আপন কর্ম্মের ভার আপনারাই লইয়াছে; ছাত্রছাত্রীদের নিজ নিজ সঙ্ঘ আছে। সেই সঙ্ঘের উপর ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণের ভার ও অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সঙ্ঘের বিভিন্ন বিভিন্ন শাখা আছে, কোনটির উপর বিচারের ভার, কোনটির উপর নৈশবিদ্যালয়-চালনার ভার, কোনটি ব্যায়ামের ব্যবস্থা করে, কোনটি বা সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পাঠ করিয়া নূতন নূতন আদর্শ ও চিন্তা আহরণ করিবার ও ছড়াইবার ভার লইয়াছে।



(১) মেয়েদের খেলা। (২) ছেলেদের নৃত্য।

বিদ্যালয়গৃহ পরিষ্কার রাখিবার ভারও ছেলেমেয়েদেরই উপর; এমন কি তাহারা পায়খানাও পরিষ্কার করে।

এখানকার ছেলেমেয়েরা গ্রাম্যজীবনের গতানুগতিক লোকাচার, অন্ধ সংস্কার ও পুরুষানুক্রমিক অজ্ঞতা, পল্লীসুলভ সকল জড়তাই ধীরে ধীরে ত্যাগ করিয়াছে। ভোরের স্তিমিত আলোকে এখানকার ছাত্রীরা একা বা দলে দলে

সারদামন্দিরে ছুটিয়া আসে; রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে শিক্ষা দিয়া ফেরে; পিঙ্গল জ্যাকেট পরিয়া নেত্রীর আদেশের সঙ্গে তাল রাখিয়া ড্রিল করে। এখানকার ছেলেরা গ্রামের পথ তৈরি করে, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করে, নৈশবিদ্যালয় চালায়, আনন্দ-উৎসব করে।

এই নির্ভয় নিরলস, কর্ম্মনিপুণ, আনন্দসুন্দর ছাত্রছাত্রীদের দেখিয়া সত্যই তৃপ্ত হইতে হয়। বাংলার অতি অল্প বিদ্যালয়েই এইরূপ দৃশ্য দেখা যায়।

এখানে একটি পরিপূর্ণ সমাজের ছবি চোখে পড়িল। ছেলেমেয়েরা সকলেই আশ্রমকে ভালবাসে, ইহার সকল কাজেই তাহারা ছুটিয়া আসে, উৎসাহের সহিত যোগ দেয়, অধ্যবসায়ের সহিত কর্ম্ম সার্থক করে ও আপনার আনন্দদ্বারা তাহাকে সুন্দর করিয়া তোলে। এখানে তাহারা শুধু বিদ্যাই লাভ করিতেছে না, নবজীবনের দীক্ষালাভ করিতেছে। এখানকার বিদ্যালয় দুইটির কর্ম্ম মাত্র বিদ্যাদানেই পর্য্যবসিত নহে; বাহিরের বৃহত্তর সমাজ যেমন নানা চেষ্টার ভিতর দিয়া নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া পূর্ণ, এখানকার এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়সমাজও তেমনই বিদ্যালাভের ব্যবস্থা, সমাজসেবা, আনন্দ-উৎসব ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া আপনার প্রাণশক্তির বিকাশ করিয়াছে।

বিদ্যালয়ের এই সমাজ-রূপ সাধারণতঃ আমাদের চোখে পড়ে না; আমরা বিদ্যার একটি খণ্ড রূপ দেখি, ইহার উদার ও মহত্তর রূপ দেখিতে পাই না। এই জন্যই আমাদের বিদ্যালয়গুলি অধিকাংশ স্থলেই নিছক বিদ্যালাভেরই কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়, সেগুলির কোন অধ্যাত্মজীবন বা সত্তা থাকে না। তাহার ফলে সেখানে বিদ্যালাভ করা যায় বটে কিন্তু জ্ঞানলাভ করা যায় না, সেখানে চরিত্রগঠনের বা জীবনবিকাশের কোন সহায়তা পাওয়া যায় না। যেমন খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ করিতে হইলে খাদ্য ছাড়াও অন্যান্য বস্তুর প্রয়োজন হয়, তেমনই বিদ্যাকেও সার্থক করিতে হইলে বিদ্যালয়ে অন্যান্য নানা আয়োজন করিতে হয়, বিদ্যালয়কে একটি ক্ষুদ্র অথচ সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ সমাজে পরিণত করিতে হয়।

এই আশ্রমে সেই বিদ্যালয়-সমাজকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম। তাহার জন্যই ইহার শিক্ষা সার্থক হইতেছে। আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম তখন অবকাশ; বিদ্যালয়ের সাধারণ কাজ বন্ধ; কিন্তু ছেলেমেয়েদের কাজের অবকাশ ছিল না। সেখানে তখন শিক্ষাশিবির বসিয়াছিল। দ্বিপ্রহরে দেখি এক দল ছেলে ধুলাকাদা মাখিয়া ঘর্ম্মাক্ত দেহে গান করিতে করিতে ফিরিল; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ছেলেরা এবার গ্রামের একটি জীর্ণ পয়ঃপ্রণালী সংস্কার করিবার ভার লইয়াছে। তাহাদের দলে কয়েক জন যুবককেও দেখিলাম। শুনিলাম আশ্রমের মহৎ আদর্শ ধীরে ধীরে আর সকলের মধ্যেও বিস্তৃত হইয়াছে এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এক দল অনুরাগী-মণ্ডলী গড়িয়া উঠিতেছে। মনে হইল ইহাই ত ভাবী কালের বিদ্যালয়ের মূর্ত্ত প্রতীক। একদিন যখন ধর্ম্মবোধ প্রবল ছিল, তখন দেবায়তনগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই পল্লীসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল; তাহার পর নানা কারণে আজ দেবায়তনগুলি তাহাদের আকর্ষণ হারাইয়াছে, ফলে পল্লীসমাজ কোন প্রাণকেন্দ্র খুঁজিয়া পাইতেছে না। অথচ পল্লীসমাজের সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সেই প্রাণকেন্দ্র সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। সত্যকার বিদ্যালয়ের চেয়ে ভাল কেন্দ্র আর কি হইতে পারে? দেশের বিদ্যালয়গুলি যেদিন প্রাণহীন প্রতিষ্ঠান না-হইয়া নবজীবনের তীর্থস্থল পূজামন্দির হইয়া উঠিবে, সেদিন দেশ আপনার প্রাণের সন্ধান পাইবে।

এইখানে বাংলার এই অখ্যাতনামা নিভৃত পল্লীটিতে দুইটি বিদ্যায়তন দেখিলাম যাহা সত্যসত্যই নবজীবনের তীর্থস্থল পূজামন্দির হইয়া উঠিতেছে।

গিরিডির বিবিধ প্রতিষ্ঠান

শ্রীসরোজকুমার দে ও শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

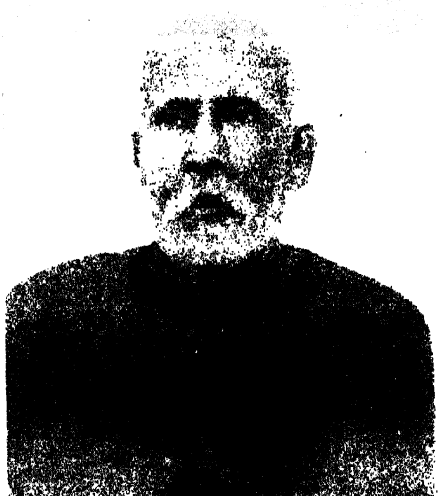
লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীরা ক্রমে ক্রমে কিরূপে গিরিডিতে লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তুলিলেন, তাহার বিশদ ইতিহাস দিতেছি।

গিরিডি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ প্রধানতঃ ৺তিনকড়ি বসু মহাশয়ের চেষ্টা ও উদ্যোগে তাঁহারই পচম্বাস্থিত বাটীতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে ইহা পচম্বা



গিরিডি নববিধান-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ৺অমৃতলাল ঘোষ

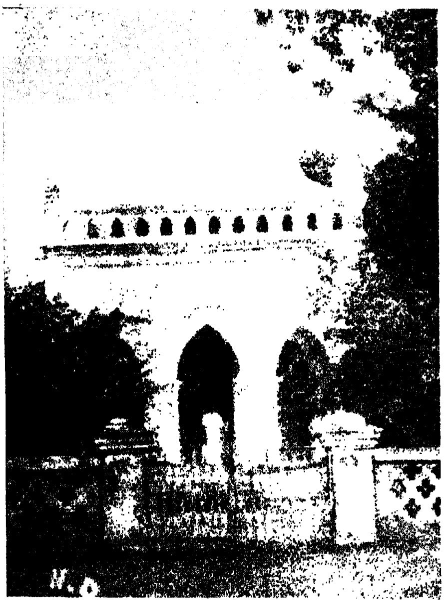
ব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত হইত। তিনকড়ি বাবু যদিও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তথাপি ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ১৮৭৪ হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ অবধি তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং ইহার তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহারই উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত ছিল। সমাজ-প্রতিষ্ঠার সময়ে গিরিডিতে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম এক জনও ছিলেন না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মকতপুরা নামক স্থানে পচম্বার তৎকালীন টীকাইৎ ৺সিদ্ধনাথ সিংহ মহাশয় প্রদত্ত নিষ্কর জমির উপর একটি ক্ষুদ্র কাঁচা মন্দিরগৃহ নির্ম্মিত হয়। সমাজের স্থাবর-অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৺আনন্দমোহন বসু, ৺পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺তিনকড়ি



৺তিনকড়ি বসু

বসু, ৺উমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এই পাঁচ জনকে লইয়া একটি অছিমণ্ডলী (Board of Trustees) গঠিত হয়। আনন্দমোহন বসু ও উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়েরা পরে স্বর্গগত হইলে ৺ভি. রায়, ডি-এল ও শ্রীযুত শশীভূষণ বসু, এম্-এ মহাশয়েরা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হন।

এতাবৎ ৺তিনকড়ি বাবুর হস্তে সমাজ-সংক্রান্ত সকল কার্য্যের ক্ষমতাই অর্পিত ছিল। তাঁহার এই গুরুভার কিঞ্চিৎ লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ৺ভি. রায়, মিঃ পি. এন্. দত্ত (পার্ব্বতীচরণ দত্ত), ৺তিনকড়ি বসু, ৺ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৺রজনীকান্ত নিয়োগী, শ্রীযুত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺উমেশচন্দ্র নাগ, এই সাত জনকে লইয়া প্রথম একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত করা হয় ও শেষোক্ত দুই জন যথাক্রমে উহার সম্পাদক ও



গিরিডি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির

সহকারী সম্পাদক মনোনীত হন। উক্ত সভ্যগণের মধ্যে মিঃ পি. এন. দত্ত ও শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত আছেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন কাঁচা মন্দিরগৃহ ভূমিসাৎ করিয়া প্রায় চারি সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে বর্ত্তমান মন্দিরগৃহ নির্ম্মিত হয়। অর্থসাহায্য প্রধানতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হইলেও কিয়দংশ ৺তিনকড়ি বসু, ৺ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত শক্তিকণ্ঠ ভট্টাচা ও ৺মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রমুখ হিন্দুসমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতেও পাওয়া গিয়াছিল। এই

মন্দিরের সুপ্রশস্ত উপাসনাগৃহে প্রায় দুই শত ব্যক্তি সমবেত ভাবে উপাসনা করিতে পারেন। প্রতি রবিবারে সকাল ও সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে উপাসনা হইয়া থাকে। উনিশ-কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে গিরিডিতে দীক্ষিত ব্রাহ্মের সংখ্যা ছিল প্রায়



গিরিডি নববিধান-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির

সাতচল্লিশ জন; বর্ত্তমান সংখ্যা প্রায় সত্তর জন। উপাসনাগৃহে বিজলী আলোকের বন্দোবস্ত হইলে মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। এ-বিষয়ে গিরিডিস্থিত প্রবাসী বাঙালীরা চেষ্টিত হইলে সুখের বিষয় হইবে।

সমাজের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস মহাশয় পূর্ব্বে সবজজ্ ছিলেন। পরে কার্য্য হইতে অবসর লইয়া সাত-আট বৎসর হইল গিরিডিতে নিজস্ব বাটী করিয়া বাস করিতেছেন। সম্প্রতি ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের অদূরে বারগণ্ডা রোডের উপর সুদৃশ্য 'নববিধান-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির' অবস্থিত। এক বিঘা বার কাঠা হাতার মধ্যে প্রায় পাঁচ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হয়। সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন কলিকাতার হ্যারিসন রোডের সুপরিচিত জুয়েলার্স মেসার্স

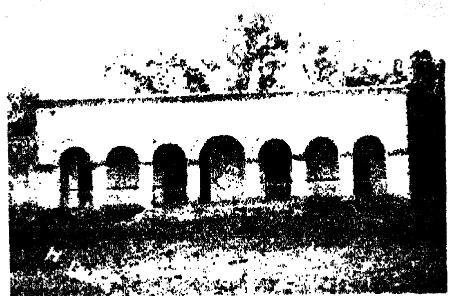
ঘোষ এণ্ড সন্সের তৎকালীন স্বত্বাধিকারী ৺অমৃতলাল ঘোষ মহাশয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে সমাজের গৃহ-প্রবেশ-উৎসব কুচবিহারের মহারাণী ৺সুনীতি দেবী কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। সমাজের স্থায়ী ধনভাণ্ডারের জন্য ৺অমৃত বাবু পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। ইঁহার নিজেরও

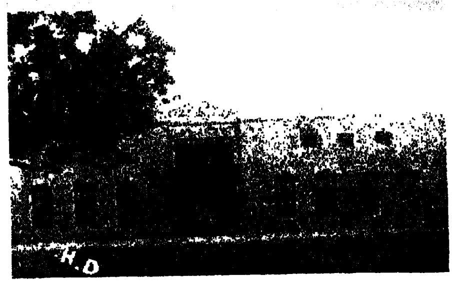


ব্যাট্রের দাতব্য চিকিৎসালয়

গিরিডিতে অনেকগুলি বাড়ির আছে। কুচবিহারের মহারাণী প্রদত্ত এক সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে সমাজের প্রচারক আশ্রম উক্ত হাতার মধ্যে নির্ম্মিত হয়। গিরিডিতে নববিধান-সমাজ-অন্তর্গত ব্রাহ্মের সংখ্যা নিতান্ত অল্প;— মাত্র তিন ঘর। এ-স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা ও অন্যতম প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার যোগানন্দ রায় মহাশয় উপস্থিত এই সমাজের সম্পাদক ও শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ পাল মহাশয় ইহার সহকারী সম্পাদক। জীবনকৃষ্ণ বাবুর গিরিডিতে নিজস্ব বাটী আছে; তিনি এ স্থানের স্থায়ী অধিবাসী।

গিরিডিতে বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত যে কয়টি প্রতিষ্ঠান আছে, গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় তন্মধ্যে অন্যতম। বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে বাঙালী জনসাধারণ উদাসীন ছিলেন, সেই সময়ে প্রধানতঃ কতিপয় ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বাঙালী ভদ্রলোকের উদ্যোগে এই বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠার সময়ে ইহার নাম ছিল ছোটনাগপুর বালিকা-উচ্চবিদ্যালয় (Choto Nagpur Girls' High School)। পরে ইহা গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় নামে অভিহিত হয়। সংস্থাপকবর্গের মধ্যে শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুত বামনদাস মজুমদার, ৺রজনীকান্ত নিয়োগী, শ্রীযুত শশীভূষণ বসু, শ্রীযুত বিনোদবিহারী রায় ও তাঁহার





(১) গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত বাটী।
(২) গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়

সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী লীলা রায়, ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকারের ভগ্নী শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী মিত্র, মিস ৺রাধারাণী লাহিড়ী (যিনি এক সময়ে কলিকাতা বেথুন কলেজ হোষ্টেলের লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন), শ্রীযুত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺তিনকড়ি বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমে মাত্র আট জন ছাত্রী লইয়া এই বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই এই সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বসমেত উনপঞ্চাশটি ছাত্রী হইলে বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী-আবাস স্থাপিত হয়। সেই সময়ে দুই জন পঞ্জাবী ও কয়েক জন আসামী ছাত্রী ভিন্ন অপর সকল ছাত্রীই বাঙালী ছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ

বসাক মহাশয়। উত্তরকালে পুরুষ-শিক্ষকের অপেক্ষা মহিলা-শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ অধিকতর সমীচীন বিবেচিত হওয়ায় কলিকাতা বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের বর্ত্তমান প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী সেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধানা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা হন। বর্ত্তমান বিদ্যালয়-বাটী পূর্ব্বে কবি ৺কামিনী রায়ের অধিকৃত ছিল; সেই সময়ে তিনি ঐ বাটী এক বৎসর বিনা-ভাড়ায় বিদ্যালয়ের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। স্যর নীলরতন সরকার মহাশয় তাঁহার বাটীতে ছাত্রী-আবাস-স্থাপনের অনুমতি দিয়াছিলেন ও ভাড়া-বাবদ তাঁহার প্রাপ্য প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা তিনি



ছাত্রীরা রন্ধন করিতেছে

অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করেন নাই। মিঃ পি. এন. দত্ত মহাশয় বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে তের শত টাকা ঋণদান করিয়াছিলেন; তিনিও ঐ অর্থ গ্রহণ করেন নাই। ৺এম্. এন. দত্ত মহাশয় বহুদিবসাবধি বিদ্যালয়কে মাসিক এক শত টাকা অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুত গৌরীকান্ত রায়, শ্রীযুত সত্যানন্দ বসু প্রভৃতির নিকট হইতেও অর্থসাহায্য লাভ করিয়া স্কুল-কমিটি উপকৃত হইয়াছিল। বিহার-গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও বিভিন্ন সময়ে মাসিক তিন শত পঞ্চাশ টাকা হইতে পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থসাহায্য পাওয়া গিয়াছে। ১৯২৭ সালে নানা কারণে বিদ্যালয়টি অতিশয় শোচনীয় অবস্থায় নীত হয়। তৎকালে ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে হইতে মাত্র আটত্রিশ জন হয় ও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্য পাঁচ শত টাকা অর্থসাহায্য বন্ধ হইয়া যায়। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় স্কুল-কমিটি শ্রীযুক্তা লাবণ্যবালা ঘোষ, এম-এ, বি-টি মহাশয়াকে বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা করেন। ইঁহার উদ্যোগে ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের তৎকালীন মন্ত্রী ফকরুদ্দিন সাহেবের চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট পুনরায় পূর্ব্বমত



গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা চরকা কাটিতেছে

মাসিক পাঁচ শত টাকা অর্থসাহায্যদান আরম্ভ করেন। উপস্থিত বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা সর্ব্বসমেত চুরানব্বই জন। তন্মধ্যে পাঁচ জন বিহারী, এক জন ওঁরাও ও এক জন ছোটনাগপুরের অধিবাসিনী ভিন্ন অপর সকল ছাত্রীই বাঙালী। বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী সর্ব্বসমেত দশ জনের মধ্যে নয় জন বাঙালী; তন্মধ্যে তিন জন গ্রাজুয়েট, এক জন শিক্ষয়িত্রী ছোটনাগপুরের অধিবাসিনী ও বিদ্যালয়েরই ভূতপূর্ব্বা ছাত্রী। ইহা ভিন্ন এক জন বিহারী পণ্ডিত মহাশয়ও আছেন। বিদ্যালয়ের ও ছাত্রী-আবাসের নিজস্ব গৃহ না থাকায় মাসিক বহু অর্থ বাড়িভাড়া-বাবদ ব্যয়িত হইতেছে। বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ ক্রয়ের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে কিছু অর্থ সংগৃহীতও হইয়াছে। শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় তাঁহার স্বর্গগত পিতা সাতকড়ি দেব মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ ছাত্রী-আবাস-নির্ম্মাণের জন্য দুই সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। রামগড় ওয়ার্ড এষ্টেট দুই সহস্র মুদ্রা ও রায় অনন্তনাথ মিত্র বাহাদুর পাঁচ শত মুদ্রা বিদ্যালয়-বাটী-নির্ম্মাণের জন্য দান করিয়াছেন। মিঃ ডি. পি. শর্ম্মা, আই-সি-এস, মিঃ এস. সলোমন, আই-সি-এস, রায়-বাহাদুর ভবদেব সরকার, মিঃ এইচ. হুইটেকার, আই-সি-এস (ছোটনাগপুরের বর্ত্তমান জুডিশিয়াল কমিশনার) প্রভৃতি স্থানীয় ভূতপূর্ব্ব সাবডিভিসনাল অফিসারেরা গৃহনির্ম্মাণের জন্য

ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছেন। এই স্থানের ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ জার্ম্মান অভ্র-ব্যবসায়ী মুর সাহেবের বাসাবাটীটি (যাহা উপস্থিত রাণাঘাট নটুদহের জমিদার ৺নফরচন্দ্র পাল মহাশয়ের পুত্রগণের অধিকারে আছে) বিদ্যালয়ের-গৃহের উদ্দেশ্যে ক্রয় করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে ঐ বাটীতে বর্ত্তমান বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হইবার আশা আছে। বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ও সম্পাদিকা শ্রীমতী লাবণ্যবালা ঘোষ মহাশয়া ইতিপূর্ব্বে পাঁচ বৎসর যাবৎ কটক র‍্যাভেন্‌শ বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন ও লক্ষ্ণৌ থবর্ণ কলেজের প্রফেসর ও রীডার রূপে তিন বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি স্বনামখ্যাত রেভারেণ্ড ৺কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্রী ও খ্রীষ্টয়ান-সমাজভুক্তা। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ইনি গবর্ণমেণ্ট মনোনীত একমাত্র ও প্রথম মহিলা সদস্যা। বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ ক্রীত হইলে বাড়িভাড়া-বাবদ মাসিক ব্যয়ের কিছু সঙ্কোচ হইবে। বিদ্যালয়-পরিচালনের বর্ত্তমান মাসিক ব্যয় প্রায় আট শত টাকার মধ্যে পাঁচ শত টাকা গবর্ণমেণ্ট-সাহায্য ভিন্ন সাধারণের অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই বিদ্যালয়টি পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু উপস্থিত পৃথিবীব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতা ও অন্যান্য নানা কারণে সাধারণের সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস হওয়ায় বিদ্যালয়-পরিচালন বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য সম্পাদিকা মহাশয়ার আর্থিক সাহায্য সংগ্রহের আন্তরিক প্রয়াস বিশেষ শ্লাঘনীয়। এতদুদ্দেশ্যে তিনি হাজারিবাগ ও অন্যান্য দূরবর্ত্তী স্থানস্থ অধিবাসীদের নিকট স্বয়ং সাহায্য ভিক্ষা করিতে যাইতেও কুণ্ঠিতা হন না। তাঁহার নিরলস চেষ্টা ব্যতিরেকে বিদ্যালয়-পরিচালন যে বিশেষ কষ্টকর হইত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত এই বিদ্যালয়ে সেবাশুশ্রূষা, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, গৃহস্থালী, রন্ধন ও নীতি শিক্ষা দিবারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। কাপড় কাটা ও সেলাই, নানা প্রকার কারুকার্য্য, উল-বোনা, চিত্রাঙ্কণ ও মৃত্তিকা সাহায্যে খেলনা প্রস্তুত করিতেও নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। চরকা ও কুটীর-শিল্প শিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। বালিকাদের এই সকল বিষয়ে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র পুরস্কার পদক প্রভৃতিও প্রদত্ত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে প্রত্যহ সমবেত অসাম্প্রদায়িক উপাসনার বিধান আছে। সাধারণ কেতাবী বিদ্যাদান ভিন্ন ছাত্রীদের শরীর, মন ও হৃদয় উন্নত করিয়া, তাহাদের শরীর, বুদ্ধি ও ধর্ম্মবোধকে জাগ্রত করাই এই শিক্ষায়তনের মুখ্য উদ্দেশ্য। গিরিডির স্বাস্থ্যকর জল-বায়ুর গুণে ও অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ও স্বাভাবিক আবেষ্টনের মধ্যে চলাফেরা খেলাধুলা করিতে পারায় ছাত্রীদের প্রায় সকলেই বেশ স্বাস্থ্যবতী। তাঁহাদের শৃঙ্খলাজ্ঞান ও নিয়মানুবর্ত্তিতাও প্রশংসনীয়। বাঙালী ধনী ব্যক্তিগণ যদি এই বিদ্যালয়ের স্থায়ী অর্থভাণ্ডারের জন্য সকলে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করেন, অথবা অন্ততঃ যদি সকলে বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হন, তাহা হইলে প্রবাসী বাঙালীদের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ স্থায়ী হইতে পারে।

গিরিডির বর্ত্তমান উচ্চ-ইংরেজী (বালক) বিদ্যালয় স্থাপনার মূলেও প্রধানতঃ বাঙালীরাই ছিলেন। প্রথমে পচম্বায় বাঙালীদের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গিরিডিতে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। শেষোক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন ৺পূর্ণানন্দ মিত্র মহাশয়। এই দুইটি বিদ্যালয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এক হইয়া যায়। পচম্বা রোডের উপর ভাণ্ডারডিহি নামক স্থানে ৺তিনকড়ি বসু, ৺পূর্ণানন্দ মিত্র, ৺রাখালদাস কুণ্ডু প্রমুখ ভদ্রলোকদের চেষ্টায় বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান নিজস্ব বাটী নির্ম্মিত হয়। এতদুদ্দেশ্যে পচম্বার তৎকালীন টীকাইৎ অনুগ্রহ করিয়া জমি দান করেন। পরে শক্তিকণ্ঠ বাবুর চেষ্টায় বিদ্যালয়-বাটীর বহু উন্নতি সাধিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক হইয়া আসেন ৺ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়; পরে তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া গিরিডিতেই ওকালতি করিতে থাকেন। তাঁহার বিষয়ে পূর্ব্বে সবিশেষ লিখিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যা উপস্থিত সর্ব্বসমেত চার শত উননব্বই জন; তন্মধ্যে বাঙালী ছাত্রের সংখ্যা এক-শ চল্লিশ জন মাত্র। বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত মণিলাল সান্যাল, এম-এ মহাশয় ১৯১৮ সাল হইতে কার্য্য করিতেছেন। অন্যান্য শিক্ষক সর্ব্বসমেত চব্বিশ জনের মধ্যে বাঙালী বারো জন। স্থানীয় উকীল শ্রীযুত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়

এম-এ, বি-এল মহাশয় প্রায় সাত বৎসর যাবৎ বিদ্যালয়ের সম্পাদক রহিয়াছেন।

স্থানীয় উচ্চপ্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয় আর একটি বিশেষ কার্য্যকর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ইহা ৺ভি. রায়, ডি-এল, ৺ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺উমেশচন্দ্র নাগ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের চেষ্টায় মকতপুরায় বারগণ্ডা রোডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়-বাটী বিদ্যালয়ের নিজস্ব সম্পত্তি। গৃহনির্ম্মাণে দেশীয় এক ভদ্রলোক কিছু অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার ছাত্রী-সংখ্যা উপস্থিত চল্লিশ জন। দুই জন মহিলা শিক্ষয়িত্রী ও এক জন পণ্ডিত মহাশয় বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করেন। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীরা সকলেই বাঙালী। গিরিডি মিউনিসিপ্যালিটি হইতে এই বিদ্যালয় মাসিক পঞ্চাশ টাকা অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হয়। স্থানীয় উকীল শ্রীযুত হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার বর্ত্তমান সম্পাদক।

গিরিডি 'বঙ্গশিশু-বিদ্যালয়' প্রায় কুড়ি বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রবাসী বঙ্গসন্তানেরা যাহাতে শৈশব হইতে মাতৃভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় শিক্ষালাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া প্রধানতঃ ৺তিনকড়ি বসু ও শ্রীযুত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা উদ্যোগী হইয়া ইহা স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যের সমান শিক্ষা প্রদত্ত হয়। ছাত্রের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ছেচল্লিশ জন; ইহারা সকলেই বাঙালী। ছাত্রদের বেতন ও স্থানীয় বাঙালীদের অর্থ-সাহায্য সম্বল করিয়া বিদ্যালয়টি চালিত হইতেছে। ইহার নিজস্ব কোন বাটী নাই। গিরিডিস্থিত প্রবাসী বাঙালীদের ইহার নিজস্ব গৃহ নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায়-সাহেব শ্রীযুত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার বর্ত্তমান সম্পাদক। ইনি উপস্থিত রেল-কোম্পানীর কয়লা-খাদে লেবার ইন্সপেক্টর রূপে কার্য্য করিতেছেন। নিউ বারগণ্ডায় নিজস্ব বাটী করিয়া ইনি স্থায়িভাবে বাস করিতেছেন। ইনি এই স্থানের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট।

গিরিডি মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপনার সহিতও স্থানীয় প্রবাসী বাঙালীরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন; তন্মধ্যে ৺ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু ও শ্রীযুত শক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরাই বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তৎকালে সাবডিভিসনাল অফিসারই মিউনিসিপ্যালিটির পদহেতুক (Ex-officio) চেয়ারম্যান হইতেন ও ভাইস্-চেয়ারম্যান্ কমিশনারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন। প্রথম ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন শ্রীযুত শক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। উত্তরকালে চেয়ারম্যানও কমিশনারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতে থাকেন। উপস্থিত সর্ব্বসমেত কুড়ি জন মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের মধ্যে সাধারণ কর্ত্তৃক ষোল জন ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত বাকী চার জন। ইঁহাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা সর্ব্বসমেত নয় জন; তন্মধ্যে সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত আট জন। গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্যবালা ঘোষ, এম-এ, বি টি মহাশয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীতা সদস্যা। এ-পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস্ চেয়ারম্যান পদ দুইটিতে স্থানীয় বাঙালীরাই নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছিলেন। গত বৎসর চেয়ারম্যান ছিলেন রায় অনন্তনাথ মিত্র বাহাদুর ও ভাইস্-চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীপতি সামন্ত মহাশয়। এ-বৎসর কোন বাঙালী চেয়ারম্যান অথবা ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন নাই। লোকমুখে শুনিলাম, বাঙালী কমিশনারদের মধ্যে দুই-এক জন তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্দেশ্যে উক্ত পদের জন্য উপযুক্ত বাঙালী প্রার্থীদের সমর্থন না করিয়া স্বাজাতিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন; তাহাতেই বাঙালীদের এই শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বিশেষ দুঃখ ও লজ্জার কথা সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, গিরিডির প্রবাসী বাঙালীগণ পরবর্ত্তী কমিশনার নির্ব্বাচনকালে বিশেষ বিবেচনা করিয়া এমন প্রার্থীদের যেন সমর্থন করেন যাঁহাদের দ্বারা অন্যায় ভাবে বাঙালীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার কোন আশঙ্কা না থাকে।

মিউনিসিপ্যালিটির হেড্ ক্লার্ক শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বত্রিশ বৎসর যাবৎ উক্ত পদে কার্য্য করিতেছেন। ইনি অতি কর্ম্মকুশল ব্যক্তি এবং গিরিডির স্থায়ী বাসিন্দা; এ-স্থানে তাঁহার নিজস্ব বাটী আছে। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র

ঘোষ কুড়ি বৎসর একাদিক্রমে মিউনিসিপ্যাল ওভারসিয়ার রূপে কার্য্য করিতেছেন।

হাজারিবাগ ব্যাঙ্কের একটি শাখা পচম্বা রোডের উপর অবস্থিত। বাটীটি ব্যাঙ্কের নিজস্ব সম্পত্তি। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও মহাজনদের নিকট ব্যাঙ্ক বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। ইহা প্রবাসী বাঙালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। ব্যাঙ্ক-পরিচালনে বর্ত্তমান ম্যানেজার শ্রীযুত কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গিরিডিতে নিজস্ব বাটী করিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছেন।

স্থানীয় হাটরে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল প্রধানতঃ ৺তিনকড়ি বসু, ৺ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রাজকৃষ্ণ সাহানা, ৺গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু, শ্রীযুত শক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য, ৺ডাক্তার অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার প্রভৃতির উদ্যোগে ও অর্থ-সাহায্যে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য সমুদয় ইষ্টক ক্রয়ের ব্যয় বহন ও চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ বহু বৎসরাবধি এক শত টাকা করিয়া মাসিক অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ডাঃ ৺অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় একাদিক্রমে বহু বৎসর যাবৎ এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই একখানি প্রতিকৃতি চিকিৎসালয়ের একটি কক্ষে এখনও শোভা পাইতেছে। ইহার য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ভিন্নও গিরিডিতে অনেকগুলি বাঙালী চিকিৎসক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ যোগানন্দ রায় মহাশয়ের পসার সর্ব্বাধিক। ডাঃ জয়ন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ও গিরিডির এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ও স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার। তদ্ভিন্ন ডাঃ হরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ডাঃ শিরীষচন্দ্র বসু, ডাঃ গোপীবল্লভ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ভূপেন চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ এ. বি. দাশগুপ্ত প্রভৃতি এই স্থানে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। ইঁহাদের মধ্যে যোগানন্দ বাবু, গোপীবল্লভ বাবু ও হরেন্দ্র বাবু বাড়িঘর করিয়া এই স্থানে স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছেন। ইহা ভিন্ন গিরিডিতে কয়েক জন বাঙালী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও কয়েক জন কবিরাজও আছেন।

স্থানীয় উকীলের সংখ্যা সর্ব্বসমেত আটত্রিশ জন; তন্মধ্যে বাইশ জন বাঙালী। য়্যাডভোকেট চারি জনই বাঙালী;—তাঁহাদের নাম, শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, শ্রীশক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সামন্ত ও শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থানীয় উকীল-লাইব্রেরীটি শক্তিবাবু, ৺ধরণীধর বাবু প্রমুখ বাঙালীদের চেষ্টায় স্থাপিত হয়। ইহার সংলগ্ন একটি টেনিস্-কোর্টও আছে। শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় ইহার বর্ত্তমান সম্পাদক।

প্রসঙ্গক্রমে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিতে চাই। গিরিডির সাধারণ জনহিতকর প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানগুলিই মুখ্যতঃ প্রবাসী বাঙালীদের চেষ্টায় ও অর্থসাহায্যে প্রতিষ্ঠিত। এ-যাবৎ স্থানীয় জনসাধারণের সহিত প্রবাসী বাঙালীদের পারস্পরিক মধুর সৌহার্দ্দ অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রতি উগ্র প্রাদেশিকতা প্রকট হওয়ায় বিহারী ভ্রাতারা বাঙালীদের অন্য চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও এ-বিষয়ে আন্দোলনও সুরু হইয়াছে। যাঁহারা গিরিডিকে নিজের দেশ বলিয়াই জ্ঞান করেন, গিরিডির কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন ও স্বোপার্জ্জিত অর্থ মুক্তহস্তে দান করেন,—বস্তুতঃ গিরিডির বর্ত্তমান সমৃদ্ধির মূলে যাঁহারা, তাঁহাদের বিপক্ষে এইরূপ বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করা নীতির দিক দিয়া যে কত বড় অন্যায় ও কিরূপ অশোভন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

উপসংহারে আর একটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। স্থানীয় বাঙালী যুবকদের সামাজিক জীবনে আশানুরূপ প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য না করিয়া ব্যথিত হইয়াছি। পরস্পরের মধ্যে মিলন ও নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি উল্লেখযোগ্য মিলনক্ষেত্র আছে বলিয়া শুনি নাই; যদিও "মিলনী" নামে একটি নামমাত্র সমিতি আছে। সেদিন পর্য্যন্ত লাইব্রেরী বলিতে গিরিডিতে কিছু ছিল না। সম্প্রতি একটি ছোট লাইব্রেরী হইয়াছে। গিরিডিতে স্থায়ী বাঙালী যুবকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেখানে একটি উপযুক্ত লাইব্রেরী না থাকায়, তাঁহাদের জ্ঞানস্পৃহা অথবা মানসিক উৎকর্ষের বিষয়ে যদি কেহ কটাক্ষ করে, তাহা হইলে সপক্ষে বলিবার তাঁহাদের হয়ত বিশেষ কিছু থাকিবে না। সুখের বিষয়, সাহিত্য-আলোচনা, আবৃত্তি, গীতবাদ্য প্রভৃতির জন্য

সময়ে সময়ে 'বাণী বৈঠকে'র অধিবেশন হয়। বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক যাঁহারা, তাঁহারাও ইচ্ছা করিলে বর্ত্তমান লাইব্রেরীটির উন্নতির অথবা একটি উপযুক্ত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যত্নবান হইতে পারেন। উন্মুক্ত বাতাসে যুবকদের ক্রীড়া ও শরীরচর্চ্চার জন্য কাছারীর নিকট সাধারণের অর্থসাহায্যে একটি সুপরিসর ক্রীড়াক্ষেত্র বহু দিন হইল ক্রীত হইয়া পড়িয়া আছে শুনিয়াছি; তাহার এক পার্শ্বে একটি ক্লাব হইবারও কথা আছে। কথা অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইলে, বিশেষ সুখের বিষয় হইবে। ক্রীড়া-কৌতুক, গীতবাদ্য, বিদ্যানুশীলন, সাহিত্যচর্চ্চা, সামাজিক মঙ্গলানুষ্ঠান প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রবাসী বঙ্গ-যুবকদের অগ্রণী দেখিতে আশা করি, সেই জন্য এই মন্তব্যটি করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।*

* শ্রীযুত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত আশুতোষ বসু প্রভৃতির নিকট হইতে প্রবন্ধ-রচনায় যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছি। শ্রীযুক্তা লাবণ্যবালা ঘোষ মহাশয়ার সৌজন্যে গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কিত ছবিগুলি ও মেসার্স লালজী এণ্ড কোম্পানীর সৌজন্যে গিরিডি ইলেক্ট্রিক্ কোম্পানীর বাটীর ছবিখানি পাইয়াছি। বাকী ফটোগুলি প্রায় সমস্তই গিরিডির ফটোগ্রাফার মিঃ এইচ্. সি. দত্ত অল্পমূল্যে তুলিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

মহোৎসব

শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

নবদ্বীপের বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি ঠাকুর হরিদাস গোস্বামী এসেছেন মহোৎসবে আমাদের গ্রামে। জ্যৈষ্ঠ মাস, গঙ্গার উপকূল বিশাল বুড়ো বটের তলে মহাসংকীর্ত্তনে জেগে উঠেছে মুহ্যমান গ্রাম। নবোদিত রবির রাঙা কিরণ গাছের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মেরে দীপ্ত করেছে উৎসব। সভার অনতিদূরে মাধবজীর মন্দির থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে নহবতের করুণ সুর। গ্রামের জমিদার-পরিবারের জন্য আলাদা আসনের ব্যবস্থা হয়েছে। জাতে 'বাবুরা' গন্ধবণিক। তাঁরা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লোক। বার মাস থাকেন কলকাতায়। কেবল প্রতি-বছর এমন সময়ে গ্রামে আসেন তাঁদের গৃহ-দেবতা শ্রীশ্রী৺ মাধবজীউর মহোৎসব উপলক্ষে। শহর থেকে তাঁদের সম্প্রদায়ের আরও অনেক নরনারী এসেছেন উৎসবে। গ্রামের দশজনও জড়ো হয়েছেন। মহিলারা ভক্তিগদগদচিত্তে গলায় আঁচল দিয়ে মধুর হরিনাম শুনছেন ঠাকুরের মুখ থেকে। জাঁকাল রকমের হাটবাজার বসেছে মাধবজীর ঘাটের চার ধারে। গোবরার মা প্রতি-বছরই মেলায় আসে তাদের গাঁ থেকে। এ-বছরও সে আর গোব্‌রা এসেছে। গোবরার মা'র মাথায় এক মস্ত ঝুড়ি। তাতে আছে মাটির পুতুল, মেয়েদের মাথার কাঁটা আর বেলোয়ারি চুড়ি। ভাল রকম একটা জায়গা দখল ক'রে সে সরঞ্জাম সাজিয়ে বসল। মাঝে মাঝে গলা হাঁকে আর খদ্দের বুঝে চোপ্ মারে। গোব্‌রা ছোট্ট ছেলে। সে ছটফট করছে হরিনাম শুনতে যাবে ব'লে। তার মা তাকে সাবধান ক'রে দিল সে যেন না কিছু ছোঁয়, কিছুতে যেন তার গা না লাগে। সে যে বাগ্‌দীর ছেলে। গোব্‌রার বাপের মতন সে একটু ডানপিটে। সে ভাল আসন দেখে বাবুদের ওধারে এগোয়। তার মা'র বুক দুরু দুরু ক'রে উঠে দেখতে পেয়ে। 'বড়বাবু বা রাগী লোক। তেনা দেখতে পেলে কি গোব্‌রাকে আস্ত রাখবেন।' সে চট্ ক'রে উঠে গোবরাকে ধরে গালে একটা থাবড়া মেরে সরিয়ে নিয়ে গেল। গোব্‌রা কিছুতে তার মা'র কাছে থাকবে না। তার মা অনেক ক'রে তাকে বুঝিয়ে দিলে যদি সে বাড়াবাড়ি করে তা হ'লে 'বাবুদের' বাড়ির জমাদার লাঠি মেরে তার

মাথার খুলিটা ভেঙে দেবে। সে হলপ করলে সে আর ওধারে যাবে না। এক পয়সা দিয়ে একখানা তেলে-ভাজা বড় পাঁপর কিনে মাধবজীর শান্‌-বাঁধানো ঘাটের বাঁ-পাশে একটা ভাঙা পৈঠের উপর ব'সে, খেতে খেতে পার-ঘাটের নৌকাযাত্রীদের দেখতে লাগল। বেলা বাড়লো। ঠাকুর হরিদাস গোস্বামী সকালকার মত সভাভঙ্গ ক'রে উঠলেন। তিনি জমিদার-বাড়ির পৈতৃক গুরুদেব। গোঁড়া গোঁসাই ব্রাহ্মণ। গৌর রং, দোহারা চেহারা, মাথা মুড়ানো, নাকে তিলক, গলায় কণ্ঠী এবং একগোছা পৈতা, পরনে গরদের কোঁচান ধুতি, খালি পা; দেখলে মনে হয় যেন আভিজাত্যের গৌরবে গৌরবান্বিত। মাধবজীর ভোগের সময় হ'ল। ভেঁপু বেজে উঠল।

গোঁসাইজী যাবেন স্নানে। পথে শত শত লোক তাঁর পায়ের ধুলা ভক্তিসহকারে মাথায় ঠেকালে। তারা ভাবলে তাদের জীবন আজ ধন্য হ'ল ঠাকুরের শ্রীচরণের ধূলিতে। শুধু যারা জীবনের এই পরম সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হ'ল তারা গ্রামের ছোট জাত। ভয়ে ভয়ে দূর থেকে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ ক'রে তারা মনের ক্ষোভ মেটালে। বড়বাবুর কড়া হুকুম কোন ছোটলোক যেন ঢুকতে না পায় ঘাটে। ভজুয়া সদলবলে ঘাড়ে লাঠি নিয়ে ঘিরে দাঁড়াল মাধবজীর ঘাট। গোব্‌রার মা রুদ্ধ নিশ্বাসে ছুটে এল গোব্‌রা বুঝিবা কি সর্ব্বনাশ করে দেখতে। "ওরে গোব্‌রা দূরে থাক্। ছুঁয়ে ফেলিস নি যেন ঠাকুরকে···। এধারে চৌধুরীপাড়ার খেঁদী কাঁটা কিনতে এসে দোকান-ওয়ালীকে দেখতে না পেয়ে হাঁকলে, "গোব্‌রার মা কোথায় গেলে গো—ও—ও—ও।" "এই যে হেথা, কি নিবে গা মাসি?" গোব্‌রার মাথায় কিন্তু ভূত চাপ্‌লো। তার মা গেল চ'লে। সে ঝুপ ক'রে জলে নেমে এক ডুবে সাঁতরে গেল ঘাটে ব্যাপারখানা দেখতে। ঠাকুর স্নান সেরে ঘাটে উঠবেন। গোব্‌রা তাড়াতাড়ি তাঁর পা-দুটো জড়িয়ে মিনতি করলে, "ঠাকুর, আমি যাব মাধবজীর মন্দিরে আপনার সাথে।" বড়বাবু চোখ রাঙিয়ে ধমকালেন, "কে তুই?" ভীড়ের ভিতর থেকে কে এক জন ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "তালপুকুরের চুড়িওয়ালীর ছেলে। ঠাকুর ওকে ছোঁবেন না; ছোঁবেন না। ও ছোট জাত"

মাধবজীর ত কোন জাত নেই বড়বাবু, উনি সকল জাতের মধ্যে যে······"

"চোপ্‌রও উল্লুক, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?"

"কিন্তু আজ আমি ঠাকুর তোমায় ছাড়ব না।" অতটুকু ছেলে গোব্‌রা। তার বুকের পাটা দেখে বড়বাবু রাগে থর থর ক'রে উঠলেন। হুঙ্কার করলেন, "ভজুয়া?"

"হুজুর!"

সকলে এক অপ্রত্যাশিত আশঙ্কায় শিউরে উঠলো। এক মুহূর্ত্ত এবং ভজুয়ার সঞ্চালিত লাঠি সসকে সজোরে আঘাত করল ঠাকুরের মাথায়। কপালের দিকে খানিকটা কেটে গিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। সবাই নির্ব্বাক। সব চুপচাপ্। বিনামেঘে বজ্রপাতের মত ভজুয়ার লাঠির আঘাতে ঠাকুরের রক্তপ্লাবিত অচেতন দেহ ধীরে ধীরে লুটিয়ে পড়লো ঘাটের উপর। বাবুরা পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগলেন চার দিকে।

* * * * *

মাধবজী সেদিন ভোগ পেলেন না।

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

২

যাবার দু-দিন আগে জিনিষপত্র গোছাচ্ছি—হঠাৎ হিরণ্ময়ী নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসে কখন দাঁড়িয়েছে। মুখ তুলে ওর দিকে চাইতেই হেসে ফেললে। বললে—আপনি নাকি চলে যাবেন এখান থেকে?

আমি বললাম—যাবই ত। তার পর এত দিন পরে কি মনে করে? হিরণ্ময়ী তার অভ্যাসমত আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বললে—কবে যাবেন?

—বুধবারে বিকেলে, গাড়ী ঠিক করা আছে, চাকদাতে গিয়ে উঠ্‌ব।

হিরণ্ময়ী একবার ঘরের চারি ধারে চেয়ে দেখলে। বললে—আপনার সে বড় বাক্সটা কই?

—সেটা কানুর বাবার কাছে বিক্রী ক'রে ফেলে দিয়েছি। অত বড় বাক্স কি হবে, তা ছাড়া সঙ্গে টেনে টেনে নিয়ে বেড়ানোও মুস্কিল।

হঠাৎ হিরণ্ময়ী ঝপ্ ক'রে মেজেতে ব'সে পড়ল—কর্ত্তৃত্ব ও আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বললে—না আপনি যেতে পারবেন না। দেখি দিকি কেমন যান?

আমার হাসি পেল ওর রকম দেখে। খুব আনন্দও হ'ল—একটা অদ্ভুত ধরণের আনন্দ হ'ল। বললাম—তোমার তাতে কি, আমি যাই আর না-যাই? তুমি ত আর এত দিন উঁকি মেরেও দেখ ত আস নি হিরণ, তুমি আমার পাঠশালা পর্য্যন্ত যাওয়া ছেড়েছ।

—ইস্! তাই বইকি!

—তুমি ভেবে দেখ তাই কি না। উড়িয়ে দিলে চলবে না, হিরণ। আমি যাবই ঠিক করেছি, তুমি আমার আট্‌কাতে পারবে না। কারুর জন্যে কারুর আট্‌কায় না—এ তুমি নিজেই আমায় একদিন বলেছিলে।

হিরণ্ময়ী বালিকাসুলভ হাসিতে ঘর ভরিয়ে ফেলে বললে—ওই! কথা যদি একবার সুরু ক'রে দিলেন, ত কি আর আপনার মুখের বিরাম আছে? কারুর জন্যে কারুর আটকায় না, হেন না তেন না—মাগো—কথার ঝুড়ি একেবারে!

—সে যাই হোক্, আমি যাবই।

—কক্‌খনো না। ইঃ, বললেই হ'ল যাব!

আমি চুপ ক'রে রইলাম—ছেলেমানুষের সঙ্গে তর্ক ক'রে আর লাভ কি।

দেখি যে বিকেলে পাঠশালায় হিরণ্ময়ী বইখাতা নিয়ে হাজির হয়েছে। সে এসে সব ছেলেমেয়েকে ব'লে দিলে আমার পাঠশালা উঠবে না, আমি কোথাও যাব না, সবাই যেন ঠিকমত আসে। এমন সুরে বললে যে সে যেন আমার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। বললে—এই হাবু, মাষ্টার-মশায় তোমায় বলেছিলেন না ধারাপাত আনতে—কেন নি কেন ধারাপাত? এই সোমবারের হাট থেকে আনতে ব'লে দেবে। বুঝলে?

হাবু বোকার মত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললে—মাষ্টার-মশাই যে সোমবারে চলে যাবেন এখান থেকে?

হিরণ্ময়ী তাকে এক তাড়া দিয়ে বললে—কে বলেছে চলে যাবেন? মেরে হাড় ভেঙে দেব ছোঁড়ার! যা বলছি তা শোন্। বাঁদর কোথাকার—

আমি বললাম—কেন ওকে মিথ্যে বকৃছ হিরণ, ছেলে-মানুষকে—ওর দোষ কি, আমি যাবই, কেউ আমায় আটকাতে পারবে না।

হিরণ্ময়ী ঝঙ্কার দিয়ে বললে—আচ্ছা, আচ্ছা, হবে। যাবেন ত যাবেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অনেক দিন পরে ও রান্নাঘরে এসে ঢুকল। বললে—গুড়ের ভাঁড়টা কই!

—সেটা তিনকড়িদের দিয়ে দিইছি। দু-দিনের মত

খানিকটা শুড় ওই বাটীতে রেখেছি—দুটো দিন ওতেই চলে যাবে।

হিরণ্ময়ী অন্য দিনের মত বসল না, দাঁড়িয়ে রইল। একবার বাইরে যাবার সময় ও ঘরে দরজার কপাটের আর দেওয়ালের মধ্যের যে জায়গাটুকু, সেখানটাতে দেখি জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলতে গেলাম—ওখানে না, ওখানে না—কাপড়ে কালিটালি লেগে যাবে কি না—বার হয়ে এস—

ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখি ওর ডাগর চোখদুটি জলে ভ'রে টল্ টল্ করছে। হিরণ্ময়ীর চোখে জল! অবাক্, এ দৃশ্য ত কখন দেখি নি! ও জল-ভরা ধরা-গলায় বললে—আপনি বলুন, যাবেন না, মাষ্টার মশায়। আমি তখন পাঠশালায় বলতে পারলাম না ওদের সামনে। ওরা হাসবে তাহ'লে। আর কেউ নয়—আর সবাই আমায় ভয় করে, কেবল ওই মণ্টুটা বড় দুষ্টু!

তার পর আমার দিকে চোখের জল আর হাসি-মিশানো এক অপূর্ব্ব দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—যাবেন না, কেমন?

হিরণ্ময়ী এই প্রথম দুর্ব্বলতা প্রকাশ করলে—এর আগে কখন দেখি নি। ছেলেমানুষ, ও কথা ত তেমন জানে না, কিন্তু ওর ডাগর সজল চোখের মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি ওর ভাষার দৈন্য ঘুচিয়ে দিয়ে এমন কিছু প্রকাশ করলে—এক জাহাজ কথাতে তা প্রকাশ করা যেত না।

আমার মনে অনুতাপ হ'ল—কেন ওকে মিথ্যে কাঁদালাম সন্ধ্যাবেলাটিতে?

জীবনের এই সব মুহূর্ত্তই না মানুষে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে? ব্রাউনিঙের 'পলিন্' কবিতার সেই সর্ব্বহারা লোকটির মত আমার মনও ব'লে উঠল:—I believe in God and Truth and Love!...

ওর হাতটি ধ'রে দরজার কপাটের ফাঁক থেকে বার ক'রে এনে আস্তে আস্তে সিঁড়ির ওপর বসিয়ে দিয়ে বললাম—ওখানে সন্ধ্যেবেলা দাঁড়াতে নেই। বিছেটিছে বেরুতে পারে—এখানে বোস। রুটিগুলো বেলে দাও দিকি, লক্ষ্মীমেয়ে। আমি যাব না—বলছ তুমি যখন, তখন আর যাব না। চোখের জল ফেলতে আছে অবেলায়? ছিঃ—

তার পরই রুটি তৈরি করতে ব'সে যে হিরণ্ময়ী, সেই হিরণ্ময়ী—সেই মুখরা বালিকা, যে সকল কথা এমন কর্ত্তৃত্বের সুরে বলে যেন ওর কথা না মেনে চললে ও ভয়ঙ্কর একটা কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করবে, সেটা আবার খুব কৌতুকপ্রদ এবং ভেবে দেখলে করুণ বলেই মনে হয়, যখন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে মুখর বুলিটুকু ছাড়া ওর হুকুমের পেছনে ওর কোন জোর খাটাবার নেই—নিতান্ত অসহায় ও নিরুপায়।

প্রেম আসে এই সব সামান্য তুচ্ছ খুঁটিনাটি সূত্র ধ'রে। বড় বড় ঘটনাকে এড়ান সহজ, কিন্তু এই সব ছোট জিনিষ প্রাণে গেঁথে থাকে—ফলুই মাছের সরু চুল-চুল কাঁটার মত। গায়ের জোরে সে কাঁটা তুলে ছুড়ে ফেলে দিতে গেলে, বিপদের সম্ভাবনা বাড়ে বই কমে না।

পুরুষমানুষ প্রেমের ব্যাপারে আত্মরক্ষা ক'রে চলতে পারে না, যেটা অনেক সময়ে মেয়েরা পারে। যেখানে যা হবার নয়, পাবার নয়, সেখানেও তারা বোকার মত ধরা দিয়ে বসে থাকে—এবং নাকালও তার জন্যে যথেষ্ট হয়। কিন্তু পুরুষমানুষই আবার বেগতিক বুঝলে যত সত্বর হাবুডুবু খেতে খেতেও সাঁতরে তীরের কাছে আসতে পারে—মেয়েরা গভীর জলে একবার গিয়ে পড়লে অত সহজে নিজেদের সামলে নিতে পারে না।

তবুও আমি হিরণ্ময়ীকে দূরে রাখবার চেষ্টাই করলাম।

একদিন দুপুরের পরে হিরণ্ময়ীদের বাড়িতে পুলিস এসেছে শুনলুম। পুলিস কিসের? একে ওকে জিগ্যেস্ করি, কেউ সঠিক উত্তর দেয় না অথচ মনে হ'ল ব্যাপারটা সবাই জানে। এগিয়ে গেলুম—ওদের বাড়ির সামনের তেঁতুলতলায় বড় দারোগা চেয়ার পেতে ব'সে—পাড়ার লোকেদের সাক্ষ্য নেওয়া চলছে। দেখলাম গ্রামে ওদের মিত্র বড় কেউ নেই। আমি আগেও যে এ-কথা একেবারে না-জানতাম এমন নয়—তবে পাড়াগাঁয়ের কাণাঘুষোতে কান দিই নি।

বিকেলের দিকে হিরণ্ময়ীর মা আর বিধবা দিদিকে থানায় ধ'রে নিয়ে গেল। কাছারির মুহুরী সাতকড়ি মুখুয্যে আমার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে বললে—ও মেয়েটার তত দোষ দিই নে—মা-ই যত নষ্টের গুরুমশাই। ওই ত ওকে শিখিয়েছে? নইলে মেয়েটার সাধ্যি কি—কিন্তু

স্বামী কি ডাকাত! মেয়েটার প্রাণের আশঙ্কা করলি নে একবারও?

ব্যাপারটা বুঝতে আমার দেরি হ'ল না। সাতকড়ি আরও বললে—কালীনাথ গাঙুলী কি গ্রাম ত্যাগ করেছে সাধে? এই জন্যেই সে বাড়িমুখো হয় না, ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না।

এত কথা আমি কিন্তু জানতাম না—এই নতুন শুনলাম। আমি মুস্কিলে পড়ে গেলাম—আমি এখন কি করি? হিরণ্ময়ীর মা আর দিদি দোষী কি দোষী নয়—সে বিচারের ভার আছে অন্য বিচারকের ওপর—সাতকড়ি মুখুয্যের ওপর নয়। কিন্তু এদের মোকদ্দমা উঠলে উকীল নিযুক্ত কে করে, এদের স্বার্থ বা কে দেখে, এদের জন্যে পয়সা-খরচই বা কে করে?

এদিকে আর এক মুস্কিল। ওর মা আর দিদিকে যখন ধ'রে নিয়ে গেল, হিরণ্ময়ী তখন ওদের বাড়ির সামনে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে। সামনে অন্ধকার রাত, সে রাত্রে সে একাই বা বাড়িতে থাকে কেমন ক'রে, বাড়িতে আর যখন কেউই নেই—অথচ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেউ তাকে নিজের বাড়িতে ডাকলে না। সন্ধ্যার সময় ও-পাড়ার কৈলাস মজুমদারের স্ত্রী এসে ওকে ও-অবস্থায় দেখে বললেন—ওমা, এ মেয়েটা এখানে একা দাঁড়িয়ে আছে যে! ছেলেমানুষ, বাড়িতে একা থাকবেই বা কি ক'রে? ওর মা দিদি কি করেছে জানি নে—কিন্তু ওকে আমি চিনি। ও পাগলী, আনন্দময়ী। এস ত মা হিরণ, তোমাদের হারিকেনটা বাড়ির ভিতর থেকে নিয়ে ঘরে চাবি দিয়ে এস। ওকে জায়গা দিলে যদি জাত না থাকে—তবে না থাকল তেমন জাত?

মজুমদার-গিন্নী যদি কোন কথা না ব'লে নিঃশব্দে হিরণ্ময়ীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন, তবে হয়ত কোনই গোলযোগ বাধতো না—কিন্তু শেষের কথাটি ব'লে ফেলে তিনি নিতান্ত নির্ব্বোধের মত কাজ ক'রে বসলেন। কাছেই গ্রামের সমাজপতি আচার্য্য-মশায়ের বাড়ি। তাদের সঙ্গে বাধলো তুমুল ঝগড়া। শশধর আচার্য্যের স্ত্রী অনেক ক্ষণ নিজের মনে একতরফা গেয়ে যাবার পর উপসংহারে বললেন—ও বড় ভাল মেয়ে—না? মুখ খুললেই অনেক কথা বেরিয়ে পড়বে। সব জানি, সব বুঝি। চুপ ক'রে থাকি মুখ বুজে—বলি মাথার ওপর এক জন আছেন, তিনিই দেখবেন সব—আমি কেন বলতে যাই?

মজুমদার-গিন্নী বললেন—যা কর ন-বৌ, আবার এ মেয়েটার নামে কেন যা তা বলছ? সেটাই কি ভগবান সইবেন?

আচার্য্য-মশায়ের স্ত্রী বারুদের মত জ্বলে উঠলেন—আরও দ্বিগুণ চেঁচিয়ে বললেন—ধর্ম্ম দেখো না ব'লে দিচ্ছি, ভাল হবে না। ওই রয়েছে মুখুয্যেরা, ভট্চাযি্যরা জিগ্যেস্ কর গিয়ে। ওই মেয়ে ওই পাঠশালার মাষ্টার-ছোকরার কাছে রাত বারটা অব্ধি কাটিয়ে আসে—রোজ তিন-শ তিরিশ দিন। সারা রাত্তিরও থাকে এক-এক দিন। বলুক ও মেয়েই বলুক, সত্যি না মিথ্যে। ভেবেছিলুম কিছু বলব না—মরুক্ গে, যার আঁস্তাকুড়, সেই গিয়ে ঘাঁটুক, না ব'লে পারলাম না। কে ও মেয়েকে ঘরে জায়গা দিয়ে কালকে আবার একটা হাঙ্গামা বাধাতে যাবে?

আমি এত ক্ষণ চুপ ক'রে ছিলুম, কথা বলি নি—কোন পুরুষমানুষ উপস্থিত ছিল না ব'লে। চেঁচামেচি শুনে আচাযি্য-মশায়, সাতকড়ি ও সনাতন রায় ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়াতেই আমি এগিয়ে গিয়ে বললুম—আপনারা আমার মায়ের মত—আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, হিরণকে এ ঝগড়ার মধ্যে মিথ্যে আনবেন না। ও আমার ছাত্রী, ছেলেমানুষ, আমার কাছে যায় সন্ধ্যেবেলা গল্প শুনতে—কোনদিন পড়েও। রাত নটা বাজতেই চলে আসে। একটা নিষ্পাপ নিরপরাধ মেয়ের নাম এ-সবের সঙ্গে না-জড়ানই ভাল! মা, আপনি ওকে বাড়িতে নিয়ে যান।

এতে ফল হ'ল উলটো। ঝগড়া না থেমে বরং বেড়ে উঠল। মজুমদার-মশায়ের দুই ছেলে ও ছোট ভাই এসে মজুমদার-গিন্নীকে বকাবকি করতে লাগল—তিনি কেন ওপাড়া থেকে এসে এই-সব ছেঁড়া ল্যাটার মধ্যে নিজেকে জড়াতে যান? এ বয়েসেও তাঁর জ্ঞান যদি না-হয় তবে আর কবে হবে?···তিনি চলে আসুন বাড়ি। এ-পাড়ার ব্যবস্থা এ-পাড়ার লোকে বুঝবে, তিনি কেন মাথাব্যথা

করতে যান—ইত্যাদি। যাকে নিয়ে এত গোলমাল, সে ভয়েও লজ্জায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েই আছে ওদের বাড়ির সদর দরজায়। ওর চোখে একটা দিশেহারা ভাব, লজ্জার চেয়ে চোখের চাউনিতে ভয়ের চিহ্নই বেশী। ওর সেই কথাটা মনেপ ড়ল—জানেন, মাষ্টার-মশায়, আমায় সবাই ভয় করে, সবাই মানে এ পাড়ায়—আমার সঙ্গে লাগতে এলে দেখিয়ে দেব না মজা?

বেচারী মুখরা হিরণ্ময়ী!

শেষ পর্য্যন্ত কৈলাস মজুমদারের স্ত্রী ওকে না নিয়েই চলে গেলেন। তাঁর দেওর ও ছেলেরা একরকম জোর করেই তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আমি তখন এগিয়ে গিয়ে বললুম—হিরণ, তুমি কিছু ভেব না। আমি এত ক্ষণ দেখছিলাম এরা কি করে। যে ভয়ে তোমাকে ডাকতে পারি নি, সে ভয় আমার কেটে গিয়েছে। তুমি একটু একলা থাক—আমি কাওরাপাড়া থেকে মোহিনী কাওরাণীকে ডেকে আনছি। সে তোমার ঘরের বারান্দাতে শোবে রাত্রে। তা'হলে তোমার রাত্রে একা থাকার সমস্যা মিটে গেল। আর এক কথা—তুমি রান্না চড়িয়ে দাও। চাল-ডাল সব আছে ত?

কাওর'পাড়া থেকে ফিরে আসতে আধ ঘণ্টার বেশী লাগল। মোহিনী-বুড়ীকে চার আনা পয়সা দিয়ে রাত্রে হিরণদের বাড়িতে শোবার জন্যে রাজী করিয়ে এলুম। ফিরে এসে দেখি দালানের চৌকাঠে বসে হিরণ্ময়ী হাপুস্ নয়নে কাঁদছে। অনেক ক'রে বোঝালুম। বড় কষ্ট হ'ল ওকে এ অবস্থায় দেখে। বললে—মার আর দিদির কি হবে মাষ্টার-মশায়? আপনি কালই বাবাকে একটা চিঠি লিখে দিন। ওদের ফাঁসি হবে না ত?

হেসে সান্ত্বনা দিলাম। বললাম—রাঁধ হিরণ। খাওয়া-দাওয়া কর। কিছু ভেব না—আমি কাল রাণাঘাট যাব। ভাল উকীল দিয়ে জামিনে খালাস ক'রে নিয়ে আসবার চেষ্টা করব। ভয় কি?

হিরণ কিছুতেই রাঁধতে চায় না—শেষে বললে—আপনিও—এখানে খাবেন কিন্তু। ঠিক ত?

ও রাঁধছে ব'সে, আমাকে রান্নাঘরেই বসে থাকতে হ'ল—ও যেতে দেয় না, ছেলেমানুষ, ভয় করে। কেবল জিগ্যেস করে মা আর দিদির কি হবে।

রান্না হয়ে গেল, ঠাঁই ক'রে আমায় ভাত বেড়ে দিলে। এদিকে হিরণ বড় অগোছালো, কুটনো-বাটনা, এঁটো-কাঁটা, ভাতের ফেন, ডালের খোসাতে রান্নাঘর এমন নোংরা ক'রে তুলেছে। ভাত বাড়তে গিয়ে উনুনের পাড়ে আঁচল লুটিয়ে পড়েছে—নিতান্ত আনাড়ি।

বললাম—দিনমানে কোন রকমে একা থেক। আমি সন্ধ্যের আগেই রাণাঘাট থেকে ফিরবো। রেঁধে খেও কিন্তু। না হ'লে বড় রাগ করব। মোহিনী কাওরাণী এল রাত ন'টার পরে। তার পরে আমি আমার বাসায় চলে এলুম।

পরদিন রাণাঘাটে গিয়ে দেখি কেস্ ওঠে নি আদালতে। উকীল ঠিক ক'রে তার সঙ্গে জামিনের কথাবার্ত্তা ব'লে এলুম। ফিরবার সময় হিরণ্ময়ীর জন্যে দু-একটা জিনিষ কিনে নিলুম ওকে একটু আনন্দ দেবার জন্যে। ফিরে দেখি ও ব'সে ব'সে আবার কাঁদছে কালকার মত। সারাদিন বোধ হয় রাঁধে নি, কিছু খায় নি। স্নানও করে নি, দু-এক গাছা রুক্ষ চুল মুখের আশেপাশে উড়ছে। মহা বিপদে প'ড়ে গেলুম ওকে নিয়ে। কি করি এখন? ওর বাবাকে আজ রাণাঘাটে পৌছেই টেলিগ্রাম করেছি, যদি আজ তা পেয়ে থাকেন, তবে কাল তিনি এসে পৌছলেও ত বাঁচি। নইলে হিরণ্ময়ীকে ভাবছি কালীগঞ্জে বৌদিদির কাছে কি রেখে আসব? কারণ এসে শুনলুম মোহিনী-বুড়ী ব'লে গিয়েছে সে রাত্রে এখানে আর শুতে আসতে পারবে না।

ও আমায় দেখেই ছুটে এসে বললে—মাকে দিদিকে দেখে এলেন, মাষ্টার-মশাই? তারা কেমন আছে? খালাস পেলে না?

আমি ওদের নিজে দেখতে যাই নি, উকীলের মুখে হিরণ্ময়ীর সংবাদ পাঠিয়ে বলেছিলুম হিরণ্ময়ীর জন্য যেন তারা কিছু না ভাবে। বললাম সে কথা।

তার পর হিরণ্ময়ী আমাকে বালতী ক'রে জল তুলে দিলে স্নানের জন্যে—ঘরে প্রদীপ জেলে উনুন ধরিয়ে চায়ের জল চড়ালে। রাণাঘাট থেকে ওর জন্যে কিছু খাবার এনেছিলুম, তার বেশী অর্দ্ধেক আমায় রেকাবী ক'রে চায়ের সঙ্গে জোর ক'রে খাওয়ালে—তার পর রান্না চাপিয়ে দিলে। ওর মনে সুখ নেই, কেমন যেন মুসড়ে পড়েছে ছেলেমানুষ, নইলে

ওর মত হাস্যময়ী আনন্দময়ী চঞ্চলা মেয়ে এত ক্ষণ কত কথা বলত, হাসি-খুশীতে ঘর ভরিয়ে তুলত।

একবার জিগ্যেস করলে—রাণাঘাটে নাকি সার্কাস এসেছে সবাই বলে? দেখেছেন আপনি? এত দুঃখের মধ্যেও ওর ছেলেমানুষী মন সার্কাসের সম্বন্ধে কৌতূহলী না হয়ে পারে নি ভেবে আমার হাসি পেল।

এ-রাত্রে মোহিনী-বুড়ী এল না—আমি ওকে ঘরের মধ্যে রেখে বাইরের বারান্দাতে শুয়ে রইলুম। বারান্দায় বিছানা পাতছি, ও আবার এত সরলা, নিষ্কলুষ—আমায় অবাক হয়ে জিগ্যেস্ করলে আপনি বাইরে শোবেন কেন? কোন নীতিবাদের সঙ্কোচ এনে ফেলে ওর নিষ্পাপ মনে দাগ দিতে আমার বাধল। বললুম—দেখছ না কি রকম গরম আজ? বাইরে শোয়াই আমার অভ্যেস তা ছাড়া। সারারাত দু-জনে গল্প ক'রে কাটালুম। ও ঘর থেকে কথা বলে, আমি বারান্দা থেকে তার উত্তর দিই। বাবা বোধ হয় কাল আসবেন, না? মা দিদি কবে আসবে? সার্কাসওয়ালা কোথায় তাঁবু ফেলেছে? কলকাতায় কখনও যায় নি—একবার যাবার ইচ্ছে আছে। কলকাতার থিয়েটার দেখতে কেমন? চৌধুরীরা বোধ হয় মোহিনী-বুড়ীকে বারণ ক'রে দিয়েছে এখানে আসতে। আমার শীত করছে কিনা। রাত বেশী, ঠাণ্ডা পড়েছে, গায়ে দেবার একটা মোটা চাদর দেবে? আরব্য-উপন্যাসের মত গল্প আর নেই। আচ্ছা, অঙ্ক কত দূর শেখা যায়? বিস্তার শেষ নেই—না? এম-এ পাস করে আরও পড়া যায়, পড়বার আছে?

ওর বাবা এলেন পরদিন সকাল দশটার সময়। তাঁর মুখে শুনলুম পুলিস থেকে তাঁকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে শীঘ্র বাড়ি এসে মেয়ের ভার নিতে। তিনি অত্যন্ত বদমেজাজী লোক, দু-একটা কথা শুনেই বুঝতে দেরি হ'ল না। আমার ওপর আদৌ তিনি প্রসন্ন হ'তে পারলেন না—তাঁর মেয়ের তত্ত্বাবধান করার জন্যে একটা ধন্যবাদ দেওয়া ত দূরের কথা, সেটাকেই তিনি আমার একটা অপরাধ ব'লে গণ্য ক'রে নিলেন এবং যে মুখুয্যে ও চৌধুরীরা পরশু সন্ধ্যেবেলা হিরণ্ময়ীকে বাড়িতে জায়গা দিতে চায় নি তাদেরই বাড়িতে খোষামোদ ক'রে তাদের সঙ্গে এ-বিপদে পরামর্শ চাইতে গেলেন।

আরও একটা ব্যাপার দেখলুম তিনি হিরণ্ময়ীকে আদৌ দেখতে পারেন না। আমার সামনেই ত তাকে তাড়না তর্জ্জন-গর্জ্জন যথেষ্ট করলেন এ নিয়ে, যে সে-রাত্রে চৌধুরী গিন্নীর পায়ে পড়ে কেন অনুরোধ করে নি তাকে জায়গা দেবার জন্যে। কারণ তারা দেখলুম লাগিয়েছে যে তাদের কি আর ইচ্ছে ছিল না ওকে জায়গা দেবার? ও মেয়ের তা ইচ্ছে নয়। হিরণের অপরাধ সে মুখ ফুটে কারও কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে নি। এ ওরা কেউ বুঝলে না যে, হিরণের বয়সের মেয়েরা মুখে কোন নাটুকে-ধরণের কথা ব'লে আশ্রয় চাইতে পারে না পরের কাছে—বিশেষ ক'রে হিরণ্ময়ীর মত একটু তেজী মেয়েরা।

আমি হিরণ্ময়ীর ভার থেকে মুক্ত হয়ে কালীগঞ্জে চলে এলুম পরদিন সকালেই। শুনেছিলুম হিরণ্ময়ীর মা ও দিদি রাণাঘাট থেকে প্রমাণাভাবে খালাস পেয়ে এসেছেন।

কালীগঞ্জে এসে বসলুম বটে, কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, মনের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েছে। হিরণ্ময়ীর সেই শুক্‌নো মুখখানা কেবলই মনে পড়ে, সেদিন সন্ধ্যার সময় ওর যে মুখ দেখেছিলাম, যেদিন ওর মাকে আর দিদিকে থানায় নিয়ে গেল। হিরণ্ময়ীর ব্যথা,...হিরণ্ময়ীর দুঃখ,...ওই রকম বাড়িতে, ওই গাঁয়ের আবহাওয়ায় হিরণ্ময়ীর মত মেয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়বে। কেই বা দেখবে, বুঝবে ওকে? একদিন মালতীর সম্বন্ধে ঠিক এই কথা ভাবতুম। কত ভেবেছি। এখন বুঝি কি দুর্জ্জয় অভিমান করেই চলে এসেছিলাম ওর কাছ থেকে! কিছুতেই সে অভিমান ভাঙলো না। তার পর দাদা মারা গেলেন দাদার সংসার পড়ল ঘাড়ে, নইলে হয়ত আবার এত দিন ফিরে যেতাম। কিন্তু বৌদিদিদের নিয়ে ত দ্বারবাসিনীর আখড়াতে গিয়ে উঠতে পারি নে? এক সময় যার ভাবনায় কত বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়েছি বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে, সেই মালতী এখন আমার মনে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হ'য়ে আসছে—হয়ে এসেছে। আর ত তাকে চোখে দেখলুম না। ক্রমে তাই সে দূরে গিয়ে পড়ল। কি করব, মনের ওপর জোর নেই—নইলে আমি কি বুঝতে পারি নে কতবড় ট্র্যাজেডি এটা মানুষের জীবনের? শ্রীরামপুরের ছোট বৌঠাকরুণ আজ কোথায়? কে বলবে কেন এমন হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১

একদিন আবার হিরণ্ময়ীকে দেখবার ইচ্ছে হ'ল। তখন মাস দুই কেটে গিয়েছে, কামালপুরে আর যাই নি, সেখানে আমার বাসায় জিনিষপত্র এখনও রয়েছে—সেগুলো আনবার ছুতো করেই গেলুম সেখানে। মাস দুই পরে, গ্রাম ঠাণ্ডা হয়েছে, কেবল শুনলুম হিরণ্ময়ীরা একঘরে হয়ে আছে। হিরণ্ময়ী আগেকার মতই ছুটে এল আমি এসেছি শুনে। এখানে ওর চরিত্রের একটা দিক আমার চোখে পড়ল—লোকে কি বলবে এ-ভয় ও করে না—এখানে মালতীর সঙ্গে ওর মিল আছে। কিন্তু মালতীর সঙ্গে ওর তফাৎও আমি বুঝতে পারি। হিরণ্ময়ী যেখানে দেবে, সেখানে পেছন ফিরে আর চায় না—মালতীর নানা পিছুটান। সবাই সমান ভালবাসতেও পারে না। প্রেমের ক্ষেত্রেও প্রতিভার প্রয়োজন আছে। খুব বড় শিল্পী, কি খুব বড় গায়ক যেমন পথেঘাটে মেলে না—খুব বড় প্রেমিক বা প্রেমিকাও তেমনি পথেঘাটে মেলে না। ও প্রতিভা যে কোন বড় সৃজনী প্রতিভার মতই দুর্লভ। এ-কথা সবাই জানে না, তাই যার কাছে যা পাবার নয়, তার কাছে তাই আশা করতে গিয়ে পদে পদে ঘা খায় আর ভাবে অন্য সবারই ভাগ্যে ঠিকমত জুটেছে, সে-ই কেবল বঞ্চিত হয়ে রইল জীবনে। নয়ত ভাবে তার রূপগুণ কম, তাই তেমন ক'রে বাঁধতে পারে নি।

হিরণ্ময়ীর তনুলতায় প্রথম যৌবনের মঞ্জরী দেখা দিয়েছে। হঠাৎ যেন বেড়ে উঠেছে এই দু-মাসের মধ্যে। আমায় বললে—কখন এলেন? আসুন আমাদের বাড়িতে। মা বলেছিলেন আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে। কত দিনের ছুটি দিয়েছিলেন পাঠশালাতে, দেড় মাস পরে খুললো?

—ভাল আছ হিরণ? উঃ মাথায় কত বেড়ে গিয়েছ?

—এত দিন কোথায় ছিলেন? বেশ ত লোক? সেই গেলেন আর আসবার নামটি নেই।

হয়ত দু-বছর আগেও এ-কথা কেউ বললে বেদনাতুর হয়ে ভাবতাম—আহা, স্বারবাসিনীতে ফিরলে মালতীও আমায় এ-রকম বলত। কিন্তু সময়ের বিচিত্র লীলা। এ সম্পর্কে মালতীর কথা আমার মনেই এল না।

দু-দিন কামালপুরে রইলাম, হিরণ্ময়ী এ-কথা ভাবে নি যে, আমি আমার জিনিষপত্র আনতে গিয়েছি ওখানে, সে ভেবেছিল আমি আবার পাঠশালা খুলব। ওখানেই থাকব। এবার কিন্তু সে আসবার সময় তর্ক, ঝগড়া করলে না, যেমন ক'রে থাকে। ও শুধু শুকনো মুখে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল আমার যাওয়া। ওর সে আগেকার ছেলে-মানুষী যেন চলে গিয়ে একটু অন্য রকম হয়েছে। তবুও কত অনুরোধ করলে ওখানে থাকবার জন্যে—গাঁ এখন ভাল হয়ে গিয়েছে, কেন আমি যাচ্ছি, গাঁয়ের ছেলেরা তবে পড়বে কোথায়? তা কি ক'রে বলব কোথায় পড়বে, আমার পোষাবে না এখানে থাকা।

কামালপুর গাঁ পিছু ফেলেছি, মাঠের রাস্তা, গরুর গাড়ী আস্তে আস্তে চলছে। কি মন খারাপ যে হয়ে গেল! মাঠের মধ্যে কচি মটর-শাক, খেঁসারি-শাকের শ্যামল সৌন্দর্য্য, শিরিষগাছে কাঁচা সুঁটি ঝুলছে, বাসুদেবপুরের মরগাঙের আগাড়ে নতুন ঘাসের ওপর গরুর দল চ'রে বেড়াচ্ছে। হিরণ্ময়ীর নিরাশার দৃষ্টি বুকে যেন কোথায় বিঁধে রয়েছে, খচ্ খচ্ ক'রে বাজছে। বেলা যায়-যায়, চাকদার বাজার থেকে গুড়ের গাড়ীর সারি ফিরছে, বোধ হয় বেলে কি চুয়াডাঙ্গার বাজারে রাত কাটাবে। জীবনটা কি যেন হয়ে গেল, এক ভাবি আর হয়, কোথায় চলেছি আমিই জানি নে। কেনই বা অপরের মনে এত কষ্ট দিই? এই রাঙা রোদ-মাখান মটর মুসুরির মাঠ যেন বটেশ্বরনাথের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। এই সন্ধ্যায় গঙ্গার বুকে বড় বড় পাল তুলে নৌকোর সারি মুঙ্গেরের দিকে যেত, আমি মালতীর স্বপ্নে বিভোর হয়ে পাষাণ-বাঁধানো ঘাটের ওপর বসে বসে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতুম। সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন। ঐ মরগাঙের ওপারে জমা সন্ধ্যার কুয়াশার মত—ফাঁকা, দু-দিনের জিনিষ। এখানে ফল পাকে না। জেরুসালেম পাথরের দেশ।

২

এর কিছুদিন পরে হিরণ্ময়ীর বাবা আমার কাছে এলেন কালীগঞ্জে। আমায় একবার তাঁদের ওখানে যেতে হবে, হিরণ্ময়ী বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছে। আর একটা কথা,

মেয়ের বিয়ে নিয়ে তিনি বড় বিপদে পড়েছেন। তিনি গরিব, অবস্থা আমি সবই জানি, গ্রামের সমাজে একঘরেও বটে। দু-তিন জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসেছিল, নানা কানাঘুষো শুনে তারা পেছিয়ে গিয়েছে। মেয়েও বেজায় একগুঁয়ে, তাকে দেখতে আসছে শুনলেই সে বাড়ি থেকে পালায়। অত বড় মেয়ে, এখনও জ্ঞানকাণ্ড হ'ল না, চিরকাল কি ছেলেমানুষী করলে মানায়? সুতরাং তিনি বড় বিপদে পড়েছেন, আমি যদি ব্রাহ্মণের এ দায় উদ্ধার না-করি তবে তিনি, কালীকান্ত গাঙ্গুলী, সম্পূর্ণ নিরুপায়। আমার কি মত?

আমি আর কিছুই ভাবলাম না, ভাবলাম কেবল হিরণ্ময়ীর আশা-ভাঙা চোখের চাউনি আর তার শুক্‌নো মুখ, সেদিন যখন জিনিষপত্র বাঁধছি সেই সময়কারের।

বৈশাখ মাসের প্রথমেই বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর ওকে নিয়ে প্রথম গেলাম আটঘরার বাড়িতে, বরণ করে নেবার সময় ছোট কাকীমা, (পানীর মা, এখন বিধবা) দূরে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে বললুম—সীতা, ছোট কাকীমাকে আসতে বল বরণের সময়। উনি দূরে থাকলে সে-কাজে মঙ্গল হবে না, সংস্কার থাকুক। আজ মা নেই, উনি আছেন, ওঁকে কি দূরে থাকলে চলে?

একদিন হিরণ্ময়ী বললে—একটা কথা শোন। যেদিন তুমি প্রথম পাঠশালাতে পড়াতে এলে, আমি তোমার কাছে গেলাম, সেদিন থেকে তোমায় দেখে আমার কেমন লজ্জা করত। সেই জন্যে কাছে বসতে চাইতাম না। তার পর তুমি একদিন রাগ করলে, তাতে আমারও খুব রাগ হ'ল। তুমি তার পর বললে—আমাদের গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। সেদিন ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। এত কান্না আসতে লাগল, কান্না চাপতে পারি নে, পাছে কেউ টের পায়, ছুটে পেছনের সজ্‌নেতলায় চলে গেলাম। সব যেন ফাঁকা হয়ে গেল মনের মধ্যে। উঃ মাগো, সে যে কি দিন গিয়েছে!

হিরণ্ময়ী গুছিয়ে কথা বলতে শেখে নি এখনও।

* * * *

ভগবান জানেন বিয়ের সময় কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। সপ্ত-সমুদ্র পারের কোন দেশে অনেক দূরে এই সব সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে একটি হাস্যমুখী তন্বী কিশোরী প্রদীপ-হাতে ভাঙা বিষ্ণুমন্দিরে সন্ধ্যা দেখাতে যেত কত যুগ আগে···পুকুর-পাড়ের তমাল-বনের আড়ালে তার সঙ্গে সেই যে সব কত সুখ-দুঃখের কাহিনী, কত ঠাকুর-দেবতার কথা, সে-সব সত্যি ঘটেছিল, না স্বপ্ন? কোথায় গেল সে মেয়েটি? আর তাকে তেমন ক'রে ত চাই না? যেন কত দূরজন্মে তার সঙ্গে সে পরিচয়ের দিনগুলো কালের কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে—তাকে যেন চিনি, চিনি, চিনি না। কেন তার স্মৃতিতে মন আর নেচে ওঠে না? কোথায় গেল সে-সব দিন, সে-সব প্রদীপ-দেখানো সন্ধ্যা?

৩

বছরখানেক পরে একদিন রাণাঘাট ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। মুর্শিদাবাদের ট্রেন থেকে অনেকগুলি বৈষ্ণব নামলো। তারা যাবে খুলনার গাড়ীতে। তাদের মধ্যে এক জনকে পরিচিত ব'লে মনে হ'ল। কাছে গিয়ে দেখি দ্বারবাসিনীর আখড়ার সেই নরহরি বৈরাগী—যে একবার জীব-গোস্বামীর পদাবলী গেয়েছিল। সে পয়লা নম্বরের ভবঘুরে, মাঝে মাঝে আখড়ায় আসত, আবার কোথায় চলে যেত। নরহরিও আমায় চিনলে, প্রণাম ক'রে বললে—এখানে কোথায় বাবু? এটা কি দেশ নাকি? আপনি ত অনেক দিন দ্বারবাসিনী যান নি। আর যাবেনই বা কি, সব শুনেছেন বোধ হয়, আখড়া আর সে আখড়া নেই। দিদি-ঠাকুরুণ মারা যাওয়ার পরে—

—কে?

—কেন আপনি জানেন না? মালতী দিদি-ঠাকরুণ ত আজ বছর-চারেক মারা গিয়েছেন।

আমি ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। নরহরি আপন মনেই ব'লে যেতে লাগল—এখন উদ্ধবদাসের এক ভাইপো তার সেবাদাসী নিয়ে কোথা থেকে এসে জুটেছে। সেই এখন কর্ত্তা। উদ্ধবদাস তো বুড়ো হয়েছে, সে কিছু দেখে-শোনে না। এখন অতিথ-বোষ্টম গেলে আর জায়গা হয় না। মালতী দিদি-ঠাকুরুণ ত মানুষ ছিলেন না, স্বর্গের দেবী ছিলেন, কি বাপের মেয়ে! তিনি স্বর্গে চ'লে

গিয়েছেন, এখন তাঁর অত সাধের আখড়ার কি দশা হয়েছে এই চার বছরে, দেখে চোখে জল আসে বাবু। তাই বড়-একটা সেখানে যাই নে।

ওরা চলে গেল। আমি ষ্টেশনের বাইরের সেগুন-বাগানে গিয়ে কত ক্ষণ ব'সে রইলাম। কত ক্ষণ…কত ক্ষণ। হিসেব ক'রে দেখলাম আমি যখন বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে তখনই সে মারা গিয়েছে। অর্থাৎ আমি আখড়া ছেড়ে আসবার এক বছর পরেই। আজ হঠাৎ মনে হ'ল তার ওপর কি সুবিচার করেছিলুম? অভিমান ভাঙাবার সুযোগও তাকে আর একবার দিই নি। আমার জীবনে সে মরে গিয়েছে অনেক দিন, যদিও খবরটা আজ পেলাম। আমার মন অলক্ষিতে আত্মরক্ষা করেছে, বেদনার স্থানে শক্ত আবরণ গড়ে তুলেছে—শামুক যেমন আত্মরক্ষার জন্যে খোলা তৈরি করে। আজ সে খোলা হয়ে পড়েছে শক্ত, অনুভূতিহীন—অন্ততঃ এত দিন তাই ভাবতাম। কিন্তু খোলার আবরণের তলায় ব্যথার জায়গাটা আজ মনে হচ্ছে একেবারে সম্পূর্ণরূপে সারে নি।

কে আজ উত্তর দেবে আমি চলে এলে গোপনে একটুখানি চোখের জলও কি ফেলে নি সে কোনদিন? বিষ্ণু-মন্দিরে প্রদীপ দিতে গিয়ে একদিনও কি অন্যমনস্ক হয় নি? দিনের কাজ মিটে গেলে সে যখন 'পাষণ্ডদলনের অনুকরণে' বই লেখবার উদ্দেশ্য নিয়ে তার সেই খাতাখানা খুলে বসত, একদিনও কি আমার কথা মনে পড়ে নি?… কত ঠাট্টা যে করতুম তার সেই বইলেখা নিয়ে! আমার যদি আজ দশ হাজার টাকা থাকত, আমি চাইলে সব টাকাই দিয়ে দিতে পারতাম, যদি এই খবরগুলো আমায় কেউ দিতে পারতো। টাকার মায়া করতুম না, করি নি কোনদিনই। ওই খবরের বদলে আমি কি না দিতে পারি!

পাগলের মত কি ভাবছি যা তা বসে! লাভ কি আজ এ-সব ভাবনায়? ভালই হয়েছে মালতী, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। সুমুখ জ্যোৎস্না রাতে পল্লী-প্রান্তের বনে মরচে-লতায় ফুল ফোটে, সুবাসে পথচারীদের মন আনন্দে ভরিয়ে তোলে, কিন্তু কত দিন তার আয়ু? জ্যোৎস্না লুকিয়ে আঁধার পক্ষ নামে, বনফুল ঝরে যায়, পুষ্প-সুরভি হিমের রাত্রির ঘন কুয়াশায় চাপা পড়ে, নয়ত অকাল বর্ষার বারি-ধারায় ধুয়ে মুছে যায়। মানুষের অনেক সেবা তুমি করেছিলে, মানুষের মনে তোমার রূপ ভগবান ম্লান হ'তে দিলেন না। ফুলের সুবাস চলে গেলে বনলতা পাছে অনাদৃতা হয়? তোমার বেলা ভগবান তা সহ্য করবেন না।

সেগুন-বাগান থেকে উঠে এলুম তখন রাত হয়ে গিয়েছে।

একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। একবার মালতীকে বলেছিলুম—আমাদের গাঁয়ে একটা হাত-ভাঙা বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। ছেলেবেলায় তাঁকে বড় ভালবাসতুম। ভগবান যদি দিন দেন, তাঁকে নিয়ে এসে তোমার বাবার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করব।

৪

দেখতে দেখতে কত দিন হয়ে গেল।

তার পর সাত-আট বছর কেটে গিয়েছে।…

আমার সে অল্প বয়সের ভবঘুরে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে অনেক দিন। তবু সে-সব দিনের ছন্নছাড়া মুহূর্ত্তগুলোর জন্যে এখনও মধ্যে মাঝে মন কেমন ক'রে ওঠে, যদিও এখন বুঝেছি হারান-বসন্তের জন্যে আক্ষেপ ক'রে কোন লাভ নেই। মহাকালের বীথিপথ অনাগত দিনের শত বসন্তের পাখীর কাকলীতে মুখর, যা পেলুম তাই সত্য, আবার পাব, আবার ফুরিয়ে যাবে…তার চলমান রূপের মধ্যেই তার সার্থকতা।

মালতীও চলে গিয়েছে কত দিন হ'ল, পৃথিবী ছেড়ে কোন্ প্রেমের লোকে, নক্ষত্রদের দেশে, নক্ষত্রদের মতই বয়সহীন হয়ে গিয়েছে।

কেবল মাঝে মাঝে গভীর ঘুমের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা হয়। সে যেন মাথার শিয়রে ব'সে থাকে। ঘুমের মধ্যেই শুনি সে গাইছে:—

মুক্ত আমার প্রাণের মাঠে
ধেনু চরায় রাখাল কিশোর
প্রিয়জনে লয় সে হরি
ননী খায় সে ননীচোর

সেই আমার প্রিয় গানটা···যা ওর মুখে শুনতে ভালবাসতুম।

চোখে'চোখি হ'লেই হাসি হাসি মুখে পুরনো দিনের মত তার সেই ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে বলেছে—পালিয়ে এসে যে বড় লুকিয়ে আছ? আখড়ার কত কাজ বাকী আছে মনে নেই?

তখন আমার মনে হয় ওকে আমি খুব কাছে পেয়েছি। দ্বারবাসিনীর পুকুর-পাড়ের কাঞ্চনফুল-তলার দিনগুলোতে তাকে যেমনই পেতুম, তার চেয়েও কাছে। গভীর সুষুপ্তির মধ্যেই তন্দ্রাঘোরে বলি—সব মনে আছে, ভুলি নি মালতী। তোমার ব্যথা দিয়ে ব্যর্থতা দিয়ে তুমি আমাকে জয় করেছ। সে কি ভোলবার?

সমাপ্ত

শীতের রোম

শ্রীপ্রমথনাথ রায়, এম-এ, ডি-লিট্

এ বৎসর রোমে প্রবল শীত পড়িয়াছে। প্রবল শীত রোমে বড়-একটা পড়ে না, কিন্তু এবার অনেক দিন তাপ শূন্যে—এমন কি শূন্যেরও কয়েক ডিগ্রি নীচে নামিয়াছে। কয়েক দিন শহরের গায় ও তার আশপাশে পাতলা বরফের জামা দেখা গিয়াছে। দুই দিন খুব বৃষ্টি হইয়াছে। টাইবার সাধারণতঃ শান্ত-প্রকৃতির নদী, কিন্তু বৃষ্টির ফলে সেও বেশ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েক স্থানে স্রোত ফুলিয়া নিকটবর্ত্তী রাস্তা ও জমি ডুবাইয়া দিয়াছিল। এরূপ দৃশ্য কলিকাতায় আমরা প্রায়ই দেখি। একটু বৃষ্টি হইলেই সেখানে রাস্তাঘাট জলে ডুবিয়া যায়। বস্তুতঃ, সেদিন এখানকার জলে-ডোবা রাস্তায় বাস ও লোক চলাচলের দৃশ্য দেখিয়া কলিকাতার কথা খুব বেশী করিয়া মনে পড়িতেছিল।

জানুয়ারির প্রথম হইতেই শীতটা বেশী হইয়াছে। অক্টোবর মাসের শেষাশেষি ও নবেম্বরের প্রথম দিকে কয়েক দিন বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। তার পর বাতাস আবার কবোষ্ণ হয়। মনে হইত যেন বসন্তের বাতাস। নবেম্বর মাসের এই বাসন্তী কবোষ্ণতাকে রোমের বাসিন্দারা বলে সেণ্ট মার্টিনের বসন্ত। এমন কি বড়দিনের কয়েক দিন আগে পর্য্যন্ত অনেক সন্ধ্যা এই অকাল বসন্তের বাতাসে মনোহর লাগিয়াছে ও তার ছোঁয়া লাগিয়া মনের ভিতর সেই "মিষ্ট কিছু না করার" (dolce far niente) ভাব জাগিয়াছে যা শুধু ইটালীর লোকেরাই জানে। তার পরেই শিশিরের ঋতু প্রবল প্রতাপে দেখা দিয়াছে ও এখন পর্য্যন্ত সকলকে অত্যাচার করিয়া মারিতেছে।

কিন্তু রোমে এ-বৎসর শীত খুব প্রবল হইলেও ইউরোপের অন্যান্য রাজধানীতে শীতকাল যত খারাপ এখানে তার অর্দ্ধেকও নয়। সাধারণ লোকের কল্পনায় শীতকালকে পলিতকেশ বিরস-বদন বৃদ্ধের সহিত তুলনা করা হয়। কিন্তু রোমে শীতের পলিতকেশ দেখা যায় না, তার বদনও বিরস নয়। রোমের শীত প্রায় সর্ব্বদাই হাসিমুখ। রোম শহরের উপর সতত সূর্য্যের আশীর্ব্বাদ ঝরিয়া পড়ে। শীতকালে এই আশীর্ব্বাদ আপনি প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারেন। দেব বিভাবসুর এই উদারতা প্রতিবৎসর শীতকালে উত্তর-ইউরোপের হাজার হাজার অধিবাসীকে রোমে আকর্ষণ করে। রোমের হোটেলওয়ালাদের তখন সুসময়, পয়সা-উপার্জ্জনের আনন্দে তখন তাহাদের মুখে হাসি আর ধরে না। রোমের বাসিন্দারাও এই সূর্য্যালোকে আকৃষ্ট হইয়া ছুটির দিনে দলে দলে ঘরের বাহির হয় ও পিন্‌চো পাহাড়ের বাগানে জড়ো হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া বসিয়া মৌমাছির মত রোদ পোহায়।

ইতিহাস বলে পিন্‌চো পাহাড়ের বাগানের নির্ম্মাতা রোমের সম্রাট লুকুলাস (Lucullus)। এই পরম বিলাসী সম্রাট এই পাহাড়ের উপর বাগান রচনা করিয়া তার মধ্যে নিজের ডাইনিং-হল তৈয়ার করেন। পিন্‌চো পাহাড়ের অবস্থিতি এমন চমৎকার যে, এর উপরে দাঁড়াইয়া প্রায় অর্দ্ধেক শহর দেখা যায়। তা ছাড়া এখান হইতে সূর্য্যাস্ত যেমন সুন্দর ভাবে দেখা যায়, শহরের আর কোথাও হইতে সেরূপ দেখা যায় না। সম্রাট নাকি শুধু সূর্য্যাস্ত দেখিবার জন্যই এখানে তাঁর ডাইনিং-হল তৈয়ার করিয়াছিলেন। তাঁর ধমনীতে যে খানিকটা কাব্য-ধারা প্রবাহিত ছিল, সন্দেহ নাই।

সম্রাটও নাই, তাঁর ডাইনিং-হলও আর নাই। এখন সেখানে একটি প্রকাণ্ড ব্যালকনি বানানো হইয়াছে। এই ব্যালকনি একটা পাথরের বেড়া দিয়া ঘেরা। এখানে দাঁড়াইলে আপনার দৃষ্টি শহরের বৃহদায়তন বাড়িগুলির উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে সেণ্ট পিটারের গির্জ্জার আকাশভেদী চূড়ায় আসিয়া আবদ্ধ হয়। এর একটু দক্ষিণে মন্তেমারিয়ো নামে পাহাড়—রোমের একটি সৌন্দর্য্যনিলয়। একটু বামে জানিকোলো নামে পাহাড়। এই পাহাড়ের উপর গারিবাল্‌দি ও তাঁর স্ত্রী আনিতার মনুমেণ্ট ও সেণ্ট ওনোফ্রিও নামক গির্জ্জায় কবি তাসোর সমাধি।

পিন্‌চো পাহাড়ের এই ব্যালকনির উপর দাঁড়াইয়া শহরের রূপ পান করা ও সূর্য্যালোক উপভোগ করা বিশেষ আনন্দদায়ক। সন্ধ্যাবেলার মিনিটগুলি বিশেষ করিয়া আনন্দদায়ক। পায়ের নীচে বিস্তৃত পিয়াৎসা দেল পপোলো, সম্মুখে সেণ্ট পিটারের গির্জ্জা ও মন্তেমারিয়ো, সূর্য্যাস্তকালে শহরের এই রূপ দেখিয়া মনে হয় যেন "একটি প্রকাণ্ড নৌকা জগতের সাম্রাজ্যের অভিমুখে ভাসিয়া চলিয়াছে" (an immense ship launched towards the empire of the world.)

যেমন রোমের সূর্য্য তেমন রোমের চাঁদ। রোমের আকাশ সর্ব্বদাই পরিষ্কার আর নীল। কিন্তু শীতের রাত্রে এর এক বিশেষ রকমের দীপ্তি চোখে পড়ে। তখন চাঁদের আলোকেও যেন এক বিশেষ কুহক জন্মে। বড়দিনের সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া ঈষ্টার পর্য্যন্ত শীতের এই কয় মাসই এই অপূর্ব্ব সূর্য্যালোক ও জ্যোৎস্নার মায়াজালের মধ্যে রোমের স্বরূপ অনুভব করিতে পারা যায়। অনেক পার্থিব আনন্দ উপভোগ করিবার পক্ষে এই সময়ই সুপ্রশস্ত। কিন্তু যারা রোমকে বুঝিতে চেষ্টা করে এই কয় মাসই সে তার হৃদয়ের রহস্য একটু খুলিয়া দেখায়।

খ্রীষ্টমাসের দিন মধ্যরাত্রে সিঁড়ি ভাঙিয়া ক্যাপিটল পাহাড়ে আরোহণ করুন ও আরা চেলি (Ara Coeli) গির্জ্জায় প্রবেশ করিয়া খ্রীষ্টের জন্মোৎসবে যোগ দিন। গির্জ্জার ঘণ্টার ঢং ঢং ধ্বনি গভীর রাত্রের নিস্তব্ধতায় দূরে ছড়াইয়া যায়। পুরোহিতের কণ্ঠ হইতে আগমনীর সুর ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া খানিক ক্ষণ গির্জ্জার অভ্যন্তরে খিলানে-খিলানে ঘুরিতে-ঘুরিতে অবশেষে জানালার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া আসে ও ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অসংখ্য নক্ষত্রের মৌন বাগ্মিতার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। তার পর বেদীর উপরে মোমের মৃদু আলোকে খ্রীষ্টের নকল জন্মগ্রহণ। এই দৃশ্য দেখিয়া আপনি গির্জ্জার বাহিরে আসুন ও ক্যাপিটল পাহাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া রোমান ফোরামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তার ভেস্তার মন্দির, ক্যাষ্টর ও পলাক্সের মন্দির, তার জয়স্তম্ভগুলির ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপের কাহিনী শুনুন। তার পর পিছন ফিরিয়া শ্বেত-পাথরের তৈরি ভিক্টর ইমানুয়েল মনুমেণ্ট ও পিয়াৎসা-ভেনেৎসিয়ার দিকে চাহিয়া নূতন রোমের কণ্ঠ শুনুন। ক্রমে এই তিন কণ্ঠ মিলিয়া আপনার ভিতর এক গভীর নাদের সৃষ্টি করিবে। আন্দোলিত মনে আপনি তখন পাহাড় হইতে নামিয়া আসেন ও নব-নির্ম্মিত "সাম্রাজ্যের রাজপথ" (via del impero) ধরিয়া পথ চলিতে থাকেন। এই রাজপথ প্রাচীন রোমকে নূতন রোমের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছে। চলিতে চলিতে আপনার মনে এই অদ্বিতীয় নগরীর ভাগ্য সম্বন্ধে চিন্তার উদয় হয়। এর অতীতের কথা, এর বর্ত্তমান নিয়তি ও ভবিষ্যৎ নিয়তির রহস্য চিত্ত অভিভূত করিয়া ফেলে।

খ্রীষ্টমাসের দিন মধ্যরাত্রে ক্যাপিটল পাহাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া রোমকে যেমন বুঝা যায়, আর কোন সময় আর কোন স্থান হইতে তেমন বুঝা যায় না। অন্যত্র ও অন্য সময় এই স্ফিংক্স-সদৃশ নগরীর রহস্যের একটু আভাস পাওয়া

যায় মাত্র। কিন্তু ২৪শে ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রে ক্যাপিটল পাহাড়ের উপরে এই মায়াবিনী আপনার সঙ্গে একটু মন খুলিয়া কথা বলে ও তার রহস্যময় অন্তরে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ দেয়। আপনার কাছে তখন এই অন্তরের সৌন্দর্য্য তার বিভিন্ন অবস্থায় প্রস্ফুট হয়—তার গর্ব্বের ভঙ্গিমায়, তার বিলাস-লালসার উত্তেজনায়, তার বিনয়ের মূর্ত্তিতে, তার করুণার কমনীয়তায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি বাস্তবিক বুঝিতে পারেন না এই সুন্দরী কা'কে তার হৃদয় দিয়াছে—রোমোলাস ও তার বংশধরদের, না গ্যালিলিয়ান ও তার শিষ্যদের। যদি প্রশ্ন করেন, সে সমান স্নেহে তার ভগ্নস্তূপের ও তার গির্জ্জাগুলির দিকে ইঙ্গিত করে।

খ্রীষ্টমাসের পরে রোমে বেফানার উৎসব। বেফানা এক রূপকথার বুড়ী। ৬ই জানুয়ারির রাত্রে এই বুড়ী বাড়িতে বাড়িতে ভাল ছেলেদের উপহার বিতরণ করিয়া বেড়ায়। ছেলেরা যখন ঘুমায় সে তখন গোপনে বাড়িতে ঢুকিয়া তাদের মোজার ভিতর উপহার রাখিয়া চলিয়া যায়। পরদিন প্রাতে ঘুম হইতে জাগিয়াই ছেলেরা ছোটে নিজ নিজ মোজার খোঁজে তার ভিতর বেফানা কি উপহার রাখিয়া গিয়াছে দেখিবার জন্য। রূপকথায় জিনিষটা এই ভাবে বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ছেলেদের মায়েরাই বেফানার কাজ করেন। তাঁরাই রাত্রিকালে ছেলেরা ঘুমাইলে মোজার ভিতর যার যা সাধ্যমত উপহার গুঁজিয়া সেটাকে ঘরের এক জায়গায়, সাধারণতঃ রান্নাঘরে, ঝুলাইয়া রাখেন। এই উপহার দেওয়া উপলক্ষে ৬ই জানুয়ারি রোমের পিয়াৎসা নাভোনায় এক মেলা বসে। পিয়াৎসা নাভোনা রোমের একটি নাম-করা জায়গা। এখানে সুবিখ্যাত বের্ণিনির অন্যান্য ভাস্কর্য্যের কাজের মধ্যে নীল, গঙ্গা, রিও দেল্লা প্লাতা ও দানিউব এই চারিটি নদীর মূর্ত্তি আছে। এই মেলা রোমের একটি বিশেষত্ব। রোমের জনসাধারণ সেদিন শ্লীলতার বন্ধন ভুলিয়া যায়। সেই জন্য সেদিন স্ত্রী-পুরুষ যারা মেলার আনন্দে যোগ দিতে চায় তাহাদিগকে শ্লীলতাবিরুদ্ধ আচরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইতে হয়।

বেফানার পরে কার্ণেভাল উৎসব আরম্ভ হয় ও ঈষ্টারের চল্লিশ দিন আগে শেষ হয়। এক সময় রোমের কার্ণেভাল জগদ্বিখ্যাত ছিল। তখন রোমের রাজপথগুলি সারা শীতকাল উদ্দাম আনন্দে মত্ত জনতায় গমগম করিত। কিন্তু আগেকার রাস্তার স্ফূর্ত্তি এখন 'বলরুমে' আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এখনও দোকানে দোকানে নানা রকমের মুখোস ও রকমারি পোষাক বিক্রয়ার্থ সাজান দেখা যায়, কিন্তু ক্রেতার দল এখন শুধু শিশুরাই। পরিণত-বয়স্কেরা শুধু ঘরের ভিতর নাচিয়াই ক্ষান্ত। আগেকার দিনের চটকদার শোভাযাত্রা, পুষ্পযুদ্ধ ও মুখোস পরিয়া নাচ আর নাই। এখনকার রোমানরা শুধু খোলা মুখে নাচিয়া, কনসার্ট শুনিয়া, অপেরা দেখিয়া ও খেলাধূলা করিয়া কার্ণেভালের সময় কাটায়। মুসোলিনির আমল হইতে খেলাধূলার প্রতি ঝোঁক খুব বাড়িয়াছে। শীতের কয় মাস দলে দলে হাজার হাজার যুবক-যুবতী রোম হইতে অনতিদূরে রক্কারাসো ও টেরমিনিল্লো নামক স্থানে স্কি খেলিতে যায়। আজকাল রোমান যুবকদের মধ্যে ইংরেজদের অনুকরণে শিয়াল-শিকার, পোলো ও ফুটবল খেলিবার আগ্রহও খুব বাড়িতেছে।

ঈষ্টারের সময় রোম আবার তার চারি শত গির্জ্জার ভিতর দিয়া জগতের কাছে নিজের মহিমা ঘোষণা করে। খ্রীষ্টের জীবনের যে ট্র্যাজেডি জেরুজালেমে সংঘটিত হয় তাহা লোকোত্তর মহিমায় মহিমান্বিত হইয়াছে রোমের মাটিতে, কারণ রোম সেণ্ট পল ও সেণ্ট পিটারকে নিজের বুকে স্থান দিয়াছে ও খ্রীষ্টধর্ম্মকে বিশ্বধর্ম্মে পরিণত করিয়াছে। প্রতি-বৎসর ঈষ্টারের দিনে রোমানরা দীর্ঘকালব্যাপী আচারের ভিতর দিয়া খ্রীষ্টের জীবনের ট্র্যাজেডির পুনরনুষ্ঠান করিয়া নিজেদের এই কীর্ত্তির কথা স্মরণ করে। রোমে আভেন্তিনো পাহাড়ের উপর বেনেডিক্‌টিন সন্ন্যাসীদের একটি বিহার আছে। নাম সেণ্ট আনসেলম। কি নিষ্ঠা ও সংযমের সহিত এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়, গত বৎসর ঈষ্টারের দিনে এই বিহারে আমি তাহা দেখিয়াছিলাম। ক্যাথলিক ধর্ম্মের ভিতর যে কতটা কাব্য আছে তাহাও আমি সেদিন উপলব্ধি করিয়াছিলাম। পূজার্চ্চনার অনুষ্ঠান-বিধির জটিলতা ও আড়ম্বরের কথা ভাবিলে ক্যাথলিকদিগকে ব্রাহ্মণদের নিকট-জ্ঞাতি বলিয়া মনে হয়।

ঈষ্টারের পরে ২১শে এপ্রিল রোমের জন্মোৎসবের দিন। শীত শেষ হইয়াছে। প্রকৃতির চেহারা বদলাইয়াছে।

ঐদিন আপনি আবার ক্যাপিটল পাহাড়ের উপরে উঠিয়া সেখান হইতে রোমের জন্মোৎসব লক্ষ্য করুন। আপনার দৃষ্টি আবার ফোরামে ও পালাটিন পাহাড়ের ভগ্নস্তূপ ও আম্রা চেলি গির্জ্জার উপর পতিত হয়। আবার আপনার মনে প্রশ্ন জাগে—রোম কা'কে তার হৃদয় দিয়াছে, রোমোলাস ও তার বংশধরদের, না গ্যালিলিয়ান ও তার শিষ্যদের? কিন্তু রোম কোন জবাব দেয় না। সে শুধু বসন্তের মৃদু সূর্য্যকিরণে আপনার দিকে চাহিয়া হাসে। সে-হাসি মোনালিসার হাসির মত দুর্ব্বোধ্য ও সুন্দর।

রোম (২০.১.৩৫)

কুলীনের মেয়ে

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ধনদা মুখুজ্জের কন্যা তরু শেষে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিল। এই মেয়েটিই অতি দুঃস্থ পরিবারটির কর্ণধারহীন সংসার-তরণীর হাল ধরিয়া বসিয়াছিল। পরিবারের মধ্যে বিধবা ভ্রাতৃজায়া, একটি বালক ভাইপো, আর নিতান্ত না-বালিকা একটি ভাইঝি। পাড়াগাঁয়ে যাহাকে বলে—সাপের গর্ত্ত, ইঁদুরের গর্ত্ত হইতে আহার সংগ্রহ করা—তাই করিয়া তরু বাপের বংশটির ভরণপোষণ করিয়া চলিতেছিল। অতিদুঃখেও তাহার মুখে হাসিটি লাগিয়া থাকিত—লোকে বলিত ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি তরু। সেই তরু কেন যে অকস্মাৎ ধৈর্য্য হারাইয়া বসিল তাহা কেহ অনুমান করিতে পারিল না। তরুও ঘুণাক্ষরে তাহার কোন আভাস দিয়া গেল না।

রাত্রি এগারটার সময়েই তরুর যন্ত্রণাকাতর ধ্বনিতে তাহার ভ্রাতৃজায়ার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে পাড়া-প্রতিবেশীর ঘুম ভাঙাইয়া সকলকে ডাকিয়া আনিল।

তরুর মুখ দিয়া তখন ফেনা ভাঙিতেছে—মৃত্যু বুকে আসিয়া নির্ম্মমভাবে চাপিয়া বসিয়াছে। তরুর দেহখানাকে সে যেন দুমড়াইয়া ভাঙিয়া জীবনটুকু টানিয়া বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। তরুর সই—প্রতিবেশিনী জমিদার-গিন্নী ডাকিলেন—সই—সই!

অতিকষ্টে চোখ মেলিয়া তরু উত্তর দিল—অ্যাঁ!

স্নেহভরেই জমিদার-গিন্নী প্রশ্ন করিলেন—এ কাজ কেন করু'ল সই?

তরু অবশপ্রায় হাতখানি কপালের উপর রাখিয়া বোধ করি ইঙ্গিত করিল—কপাল, অদৃষ্ট!

আচ্ছন্নতা প্রগাঢ় হইয়া আসিতেছিল—জমিদার-গিন্নী তাহাকে নাড়া দিয়া আবার ডাকিলেন—সই—সই! তরু!

তরু চোখ মেলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চোখ খুলিল না—ভ্রূ-দুইটি খানিকটা উপরে উঠিল মাত্র। মুখে সে জড়িতস্বরে বলিয়া উঠিল—ছি—বড় ঘেন্না!

আবার মৃদুস্বরে বলিল—আর সহ্য হ'ল না। আর—।

আবার সে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

ডাক্তার আসিয়াছিলেন। ইনজেকশন—ষ্ট্যাক পাম্প দিয়া বিষের সহিত যুদ্ধও যথেষ্ট চলিতেছিল। কিন্তু বিষ তখন বিষম হইয়া উঠিয়াছে—উপায় ছিল না। ডাক্তার হতাশ হইয়া উঠিতেছিল। সে আর একটা ইন্‌জেক্‌শন দিল। বিষ-ঘোরের আচ্ছন্নতার মধ্যে তরু একটু মুখ বিকৃত করিল মাত্র। জমিদার-গিন্নী আবার তাহাকে সজোরে নাড়া দিয়া ডাকিলেন—তরু—তরু!

ইন্‌জেক্‌শনের শক্তি-ফলেই বোধ করি তরু এবার একবার চোখ মেলিয়া কয়েকটি কথাই বলিল—আঃ—আর ডেক না গো!

জমিদার-গিন্নী বলিলেন—একবার দেখবি?

তরু স্থিরদৃষ্টিতে সইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জমিদার-গিন্নী বলিলেন—তারণকে একবার দেখবি? ডাকব?

তরু বলিল—ছি!

তরু সধবা—তাহার স্বামীও এই গ্রামেরই অধিবাসী—নাম বিপদতারণ। পেশাদার কুলীন বিপদতারণ—সর্ব্বসুদ্ধ তাহার ছয়টি বিবাহ। জমিদার-গিন্নীর চোখ দিয়া কয় ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল। দারুণ যন্ত্রণার আক্ষেপে তরু আঁকিয়া-বাঁকিয়া গোঙাইতে-গোঙাইতে জড়িত স্বরে বলিল—মুক্তি দাও—হে ঠাকুর।

মুক্তি সে পাইল ভোররাত্রে—প্রায়-অবসান রাত্রির অন্ধকার তখন শুকতারার আলোকে ঈষৎ স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে—সে অস্ফুট আলোকে তরু মানুষের অজানা পথে যাত্রা করিল।

কাঁদিবার বড় কেহ ছিল না—ভ্রাতৃজায়া একবার কাঁদিয়া নীরব হইল—কিন্তু ছেলেমানুষ ভাইপোটির কান্নায় নৈশ প্রকৃতির খানিকটা অংশ সকরুণ ভাবে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। ঐটুকুতেই বোধ করি তরুর অনির্দ্দিষ্ট যাত্রা সার্থক হইয়া উঠিল।

এদিকে কিন্তু বাস্তব সংসারে ইহার পরেও অনেক-কিছু অপেক্ষা করিয়াছিল। প্রভাত হইতে-না-হইতে পুলিস আসিয়া দরজায় বসিল। সকলের মুখ শুকাইয়া গেল, ছেলেটা এক মুহূর্ত্তে সভয়ে কান্না থামাইয়া যেন মূক হইয়া গেল।

ভদ্রলোক কয়েক জন আসিয়াছিলেন। পুলিসের সব-ইনস্পেক্টর তাঁহাদের সমক্ষে তদন্ত আরম্ভ করিলেন। তরুর বিছানার মধ্যে দুইখানা পত্র পাওয়া গেল। একখানা শিরোনামাহীন—সেখানায় সে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছে—আমি আপন ইচ্ছায় বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিতেছি। বড় লজ্জা—বড় ঘৃণার জীবন—এ যাওয়াই ভাল। আর সহ্য করিতে পারিলাম না।

অপরখানিতে দক্ষিণপাড়ার জমিদার গাঙ্গুলীবাবুর নাম লেখা ছিল—যোগীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। গাঙ্গুলীবাবুকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে দিয়াই পত্রখানি খোলান হইল। পত্রখানি পড়িতে পড়িতে তাঁহার হাত কাঁপিতেছিল—মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

* * *

পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সংসার রঙ্গমঞ্চে একটা সদ্যজাত শিশুর ভূমিকা লইয়া তরু প্রবেশ করিয়াছিল। একটি সচ্ছল গৃহস্থ—বাপ, মা, দুই বড় ভাই, তরুর আদরের আর সীমা ছিল না। বাপ ধনদা মুখুজ্জের পৈতৃক অবস্থাই শুধু সচ্ছল ছিল না—তাঁহার নিজের উপার্জ্জনও ছিল পর্য্যাপ্ত। স্থানীয় রেজেষ্টারী আপিসে কাজ করিতেন—বেতন পনের টাকা—কিন্তু উপরি-পাওনা দৈনিক দুই-তিন টাকার কম ছিল না। তাহার উপর তিনি ছিলেন একটু অস্বাভাবিক প্রকৃতির। তাঁহাদের বংশকেই লোকে বলিত মাথাখারাপের বংশ। ধনদা বাবুর পিতা এক দিন প্রয়োজনের সময় একটা সূচ না পাইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া পাঁচ টাকার সূচ কিনিয়া সমস্ত বাড়ি-ঘরের দেওয়াল সূচী-কণ্টকিত করিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—সূচের অভাব আমার বাড়িতে!

আরও একটা খেয়ালের কথা বলি—তিনি ছিলেন কুলীনের ঘরের ভাগিনেয়—মাতুলদের আশ্রয়েই বাস ছিল। মাতুল ছিলেন সে আমলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। পূজার সময় সপরিবারে দেশে আসিতেন। তখন রেল মোটর ছিল না—পাল্কীই ছিল সম্ভ্রান্ত যান। সেকালে তাঁহার মাতুলের বৃহৎ সংসার আট-দশখানি পাল্কীতে সদর হইতে যেদিন গ্রামে ফিরিত, সেদিন দশখানা পাল্কীর বেহারার হাঁকে গ্রামখানা সরগরম হইয়া উঠিত। ইতর ভদ্র সকলে দলে দলে দেখিতে ছুটিত। ভদ্রলোকেরা সাগ্রহে কুশল জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগে কথা কহিয়া ধন্য হইত। ধনদা বাবুর পিতার সে সহ্য হইত না। বলিতেন—আঃ—সবাই গিয়ে মামাকেই বলবে—কখন এলেন—কেমন ছিলেন? মুরদ ত একখানা পাল্কীর। লে আও পাল্কী। তিনি নিজে এক পাল্কী চাপিয়া গ্রাম হইতে মাইল-দুই দূরে গিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। মাতুল-পরিবারের পাল্কীবাহিনীর সাড়া পাইবা মাত্র তিনি হুকুম দিতেন—উঠাও পাল্কী হাম্‌রা পাল্কী আগে বায়ে গা। মাতুলের আগেই তাঁহার পাল্কী গ্রামে আসিয়া পৌঁছিত। পাল্কী হইতে নামিয়া তিনি প্রতীক্ষমান ভদ্রজনদের সহিত নিজেই আলাপ করিতেন—কি চাটুজ্জে মশায় যে—নমস্কার, নমস্কার। বাড়ির সব ভাল—আপনি ভাল আছেন? আমি ভালই আছি। এই আসছি।

তাঁহার পিতা—ধনদাবাবুর পিতামহ, আহার করিতে গিয়া সম্মুখে যাহাকে পাইতেন প্রশ্ন করিতেন—বলি—হ্যা-হে আর খেতে পারব—পেট ভরেছে কি না বল দেখি?

ধনদাবাবুও পিতা-পিতামহেরই মত ছিলেন। আয়-ব্যয়ের হিসাব তাঁহার ছিল না। কেহ বলিলে বলিতেন—হিসেব কিসের রে—হিসেব? একের পরে শূন্য দিলে হয় দশ—আর এক শূন্য দিলে শ—আবার শূন্য দাও হাজার—ফক্কা দিয়ে অঙ্ক বাড়ানোর নাম হিসেব? তাঁহার তিন পুত্রেও বংশের ধারা হইতে বাদ যায় নাই—বড়টি মাতাল, মেজটি বদ্ধ গোঁয়ার, ছোটটি ছিল তানসেন। স্কুলে ফোর্থ ক্লাস হইতে প্রমোশন না পাইয়া যেদিন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল, সেদিন ধনদাবাবু বলিলেন—ঝাঁটা মার স্কুলের মুখে—কিছুই জানে না বেটারা। লেখাপড়ার জন্যে কান্না কিসের—কাঁদ্‌ছিস কেন তুই—একরাতে তোকে বিদ্যোন ক'রে দেব আমি। তাহার পর দিনই তিনি ছেলেকে তবলা কিনিয়া দিলেন। যাক্, তের বৎসর পর্য্যন্ত তরুর জীবনের ভূমিকায় নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের সংস্থান নাট্যকার করেন নাই। ছোট মেয়েটি আনন্দময়ী প্রতিমার মত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত—দাদার মাষ্টারের নিকট নিজে হইতেই গিয়া গভীর মনোযোগের সহিত একখানা ইংরেজী বই খুলিয়া মনে যাহা আসিত তাহাই পড়িয়া যাইত। ছাত্রীটির অনুরাগ দেখিয়া মাষ্টার তাহাকে লিখিতে পড়িতে শিখাইলেন। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে খেলিতে গিয়া কোন্দল বাধাইয়া ফিরিয়া আসিত—তুমি শালপাতা ছেঁটে ছুয়ে দিলে কেন আমাকে? বলব না—গাল দেব না আমি? হ্যাঁ ভাই গঙ্গাজল!

সন্ধ্যায় সে মায়ের আঁচল ধরিয়া আব্দার ধরিত—গল্প বল তুমি—বিয়ের গল্প।

এই বিবাহের গল্পের উপর তরুর বিশেষ একটি প্রীতি ছিল। নিত্য সন্ধ্যায় বিবাহের গল্প না শুনিলে তাহার হইত না। তাহার তের বৎসরের সন্ধ্যার মধ্যে শৈশব ও শেষের দুই বৎসর ছাড়িয়া দিয়া এই গল্প শোনার ব্যতিক্রম যে কয় দিন ঘটিয়াছে, তাহার সংখ্যা বোধ করি হিসাব করিয়া বলা যায়। মা গল্প বলিতেন—এই রসুনচৌকী বাজবে—ঢোলের বাজনা হবে। মশালের আলো জ্বালিয়ে হুমুহাম্ ক'রে বরের পাল্কী আসবে। রাঙা টুকটুকে বর! ইদিকে লুচি ভাজা হবে, সন্দেশ হবে, মুড়কী হবে, মুড়ী হবে। ঘরের মধ্যে তরুর পাটী পেড়ে চুল বেঁধে দেব। তরু গয়না পরবে—হাতে দেব কাঁকনি, ওপর হাতে বাজুবন্ধ, গলায় মুড়কী-মাদুলী, কোমরে গোট!

তরু নীরব নিস্তব্ধ—তাহার 'হুঁ' দেওয়া কখন বন্ধ হইয়া গেছে। মা নাড়া দিয়া ডাকেন—তরু, তরু ঘুমুস না—খেয়ে ঘুমুবি। অ—তরু!

তরু জাগিয়া উঠিয়া বলে—তার পরে?

তরুর ছোটদাদা বুক বাজাইয়া তবলার একটা বোল সাধিতে সাধিতে পান লইতে আসিয়াছিল। সে তরুর মাথার উপরে একটা চাঁটি মারিয়া দিয়া বলিল—কত্তে-ধাগিনাক্—

* * *

তরুর এই 'তার পর' প্রশ্নের উত্তর নাট্যকার তাহার জীবনভূমিকার মধ্যেই রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তের বৎসর বয়সেই সে উত্তর সে পাইল। ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তখন বাংলা দেশে বল্লাল সেনেরই রাজত্ব চলিতেছে। গঙ্গাযাত্রার পথেও কুলীনকে তখন লোকের কন্যাদায় উদ্ধার করিতে হইত। ধনদাবাবু সেদিন তাঁহার পিতার মাতুলপুত্র—স্থানীয় জমিদার কৃষ্ণবাবুর বৈঠকখানার দরজা হইতেই লাফ দিতে এবং চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন—বাপ রে, বাপ রে, খেলে রে—।

কৃষ্ণবাবু শশব্যস্তে বাহির হইয়া আসিলেন—কি হ'ল, কি হ'ল—ধনদা-ভাইপো?

ধনদাবাবু বলিলেন—প্রকাণ্ড এক সাপ! বাপ রে, বাপ, হাত-চারেক লম্বা, ইয়া ফণা! খেয়ে ফেলেছিল আর একটু হ'লেই।

কৃষ্ণবাবু প্রশ্ন করিলেন—কোথায়?

ধনদাবাবু বলিলেন—তোমার সিঁড়ির মুখেই, বাপ রে বাপ!

আস্তিক—গরুড়—আস্তিকস্য মুনির্মাতা—। সাপের কথা শুনিয়াই কৃষ্ণবাবুর লোকজন লাঠিসোঁটা লইয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহারা আগাইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবাবুও গেলেন, পিছনে ধনদাবাবু।

সাপ দেখা গেল না। কৃষ্ণবাবু বলিলেন—দেখ, সব ভাল ক'রে খুঁজে—

তাঁহার কথা শেষ হইল না, ধনদাবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ঐ—সাপ!

—কই—কই?

ধনদাবাবু কৃষ্ণবাবুর কাপড় টানিতেছিলেন, বলিলেন—পালিয়ে এস—পালিয়ে এস বাবা।

কৃষ্ণবাবু প্রশ্ন করিলেন—সাপ কই?

—ঐ যে, ঐ যে ঘাসের মধ্যে। ঘাস নড়ছে। নড়ন্ত ঘাসের উপরে লাঠিবৃষ্টি হইয়া গেল। তাহার পর তাহার ভিতর হইতে বাহির হইল হাতখানেক লম্বা একটি হেলে-সাপ।

কৃষ্ণবাবু হাসিয়া বলিলেন—মধুসূদনের ঝাড়ের দোষ, তোমার দোষ কি বল!

ধনদাবাবুরা মধুসূদন তর্কালঙ্কারের বংশ। ধনদাবাবু বলিলেন—সাপ ত বটে হে বাপু। ওটাই কি কম? ওর আবার বিষ বেশী, নামই হ'ল হলাহল। ওটা খেলেই যে—বাস্, ধনদা-ভাইপো অক্কা। নাও, চা করতে বল।

চা তখন সবে দেশে ঢুকিতেছে। কৃষ্ণবাবুর বৈঠকখানা সে আমলে ছিল সমস্ত গ্রামের চায়ের আসর। সর্দ্দি হইলে কেহ কেহ এক-একটা পাঁচ সেরি খোরাবাটী-হাতে চা লইতে আসিত।

তামাক টানিতে টানিতে ধনদাবাবু হাত-পা নাড়িয়া বলিলেন—বাপজান, ফেসাদ ত চুকিয়ে ফেললাম।

কৃষ্ণবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন—ফেসাদ আবার কি হ'ল, কই কিছু ত শুনি নাই, তুমিও বল নাই।

ধনদাবাবু বলিয়া উঠিলেন—ফেসাদ নয়? মহা ফেসাদ। মেয়ের বিয়ে দাও, বিয়ে দাও! আরে বিয়ে দাও বললেই হ'ল!

কৃষ্ণবাবু হাসিয়া বলিলেন ও তরুর বিয়ের কথা বলছ?

—দেখ দেখি বাপু, ছেলে হয় মেয়ে হয় খেয়ে খেলে বেড়ায়—সেই ত ভাল। তার আবার বিয়ে কেনে রে বাপু!

কৃষ্ণবাবু হাসিতে লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। ধনদাবাবু কয়েক বার ঘন ঘন নলে টান দিয়া বলিলেন—তা আমি ত ফেসাদ চুকিয়ে ফেললাম বাপজান। সব ঠিক হয়ে গেল।

কৃষ্ণবাবু প্রশ্ন করিলেন—কোথা?

বার-দুই মাথা নাড়িয়া ধনদাবাবু বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ। বাপজান, এ কি তোমাদের চোখ, এ আমাদের শিকেরী চোখ। আমাদের ঘরের দুয়োরেই পাত্র—হরিচরণের ছেলে তারণ—ওই যাকে বলে আঁটী-চোখো তারণ।

কৃষ্ণবাবু সবিস্ময়ে ধনদাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—সে কি!

কৃষ্ণবাবুর বিস্ময় ধনদাবাবুর গোচরেই আসিল না। তিনি মহা উৎসাহভরেই বলিতেছিলেন—কুলীনের সেরা কুলীন—কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান—

কৃষ্ণবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—কুল ত ভাল, কিন্তু ছেলে যে কুলাঙ্গার।

ধনদাবাবু প্রবল প্রতিবাদ তুলিয়া বলিলেন—খুব ভাল ছেলে। পাঁচ-হিংসুকে ব'লে মন্দ। অতি উত্তম ছেলে।

কৃষ্ণবাবু উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি শুধু ধনদাবাবুর মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলেন।

ধনদাবাবু থামেন নাই। তিনি বলিলেন—সে দিন এক-নজরে আমি চিনে নিয়েছি। যে খাতিরটা আমাকে করলে সেদিন—ওঃ সে আর তোমাকে কি বলব! জলের সময় আসছি—ছাতা নাই—দেখেই আমাকে ডেকে বসালে, নিজে হাতে তামাক সেজে খাওয়ালে। বুঝলে কি না, সেইখানেই ওর মা নিজে সেধে কথা পাড়লে।

কৃষ্ণবাবু এতক্ষণে বলিলেন—এরই মধ্যে পাঁচটা বিয়ে ওর হয়ে গিয়েছে—তা জান!

ধনদাবাবু উত্তেজিত ভাবে উত্তর দিলেন—বাঃ কুলীনের ছেলে বিয়ে করবে না? আরও দশটা করে নাই এই আশ্চয্যি।

কৃষ্ণবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—কাজটা ভাল হবে না ধনদা-ভাইপো, পেশাদার কুলীনের ছেলে—ও কখনও বশ মানে না।

ধনদাবাবু হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন—রূপোর শেকল দিয়ে বেটাকে বেঁধে রাখব। ঘর ক'রে দেব, জমি দেব, আর সবরেজেষ্টারী আপিসে একটা কাজে ঢুকিয়ে

দেব, বুঝলে, বাদ্—আর যাবে কোথা, ঘুরে ঘুরে নড়েই ব'স তাঁবেদার হয়ে থাকবে। বজ্জাতি করলেই যাত্তে-তাতে ফাইন ক'রে দেব।

কৃষ্ণবাবু আর কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার অসন্তুষ্টি অনুমান করিয়া ধনদাবাবু বলিলেন—তারণের মা খোশামোদ করছে। পাত্রপক্ষ খোশামোদ করছে এ কখনও ছাড়তে আছে? কোথা এখান-ওখান ক'রে লোকের খোশামোদ ক'রে বেড়াব বল ত?

কৃষ্ণবাবু এ-কথারও কোন জবাব দিলেন না। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ধনদাবাবু আবার বলিলেন—গাঁজা মদ একটু খায়, রংটা কাল, তার আর কি হবে? কুলাঙ্গার বলছ—ও আঙ্গারে আগুন ঠেকালেই আঙ্গার আগুন, বুঝলে। ঘরসংসার হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।—বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই তিনি হা-হা করিয়া হাসিয়া সারা হইলেন। কৃষ্ণবাবু নীরব হইয়াই রহিলেন।

* * *

তরুর জীবন-ভূমিকার একটি পট পরিবর্ত্তিত হইল। অদৃষ্ট নাট্যাকারকে মানিতে গেলে বলিতে হয় তাহারই নির্দ্দেশ-অনুযায়ী তরু একদিন রাঙা চেলী পরিল, চোখে কাজল পরিল, আভরণ পরিল, বসনে ভূষণে রাজকন্যা সাজিয়া রাঙা টুকটুকে বরের প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া রহিল।

তার পর শুভক্ষণে বিপদতারণের জীবনের সহিত নিজের জীবনের গ্রন্থি বাঁধিয়া লইল। ধনদাবাবু কন্যার বিবাহে খরচের ত্রুটি করেন নাই। বরাভরণে, দানে তিনি ভার বোঝাই করিয়া দিয়া কন্যাকে জামাতার সহিত পাঠাইয়া দিলেন।

ফুলশয্যার রাত্রে তরু বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তারণের খোঁজ ছিল না—সে কোথায় গিয়াছে। অস্বাভাবিক হইলেও বরের বাড়িতে এ লইয়া কোন ব্যস্ততা বা আন্দোলন ছিল না। অকস্মাৎ কাহার আস্ফালন-আহ্বানে বহির্দ্বারে উচ্চ আঘাত-শব্দে তরুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। রাত্রি বোধ হয় গভীর, বাহিরে কোথাও আর কোন শব্দ নাই। সদ্য ঘুম ভাঙিয়া অপরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে আপনাকে দেখিয়া তরু ভয় পাইয়া গেল—তার পর তাহার মনে পড়িল এ স্বামীর ঘর। ওদিকে দরজা-খোলার শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে কাহার কণ্ঠস্বরও সে শুনিতে পাইল—আজকের দিনেও কি এই কাণ্ড করে—? জড়িত উচ্চ স্বরে কে বলিয়া উঠিল—কেয়া হ্যায়—কোন শালার পরোয়া করি আমি!

কে বলিল—ওরে শোন—শোন—

সেই মুহূর্ত্তেই তরুর শয়নঘরের দরজা প্রচণ্ড আঘাতে আছাড় খাইয়া খুলিয়া গেল—টলিতে টলিতে প্রবেশ করিল তারণ, তাহার এক হাতে একতাল কি রহিয়াছে।

তারণ আসিয়াই বলিল—ইধার আও—এই—ইধার আও।

সে মূর্ত্তি ও আস্ফালন দেখিয়া তরু ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

তারণ বলিল—তোর মুখের ছাঁচ তুলব আমি—এই কাদা দিয়ে, এই কাদা দিয়ে—।

হাতটা নাড়িয়া কাদার তালটা দেখাইতে গিয়া হাত হইতে কাদার তালটা থপ করিয়া পড়িয়া গেল। তরু সভয়ে ফোপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তারণ কাদার তালটা মাটি হইতে চাঁচিয়া তুলিতে তুলিতে বলিল—পরী দেখ্‌তে চেয়েছে তোর মুখের ছাঁচ—তোর মুখের ছাঁচ তুলব আমি।

পরী একটা নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক—পরীর কথা তরু জানে, বিবাহের পূর্ব্বেই শুনিয়াছে। তরুর চেতনা যেন লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল—গলা দিয়া স্বর তাহার বাহির হইল না।

তারণ বলিল—পরীকে বালা দিতে হবে—খুলে দে তোর বালা।

তরু বালা দুইগাছা খুলিয়া ফেলিয়া দিল। তারণ খুশী হইয়া বলিল—আব্ ইধার আও, মুখের ছাঁচ লেঙ্গে—আও, আও—।

কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া তারণ অগ্রসর হইল। তরু এবার প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া উঠিয়া দরজার দিকে ছুটিল। তারণও ছুটিল, দরজার মুখেই সবলে তরুকে ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহার মুখের উপর কাদার তালটা চাপাইয়া দিল। কাদার তালটা তুলিয়া লইয়া দেখিয়া বলিল—ওঠে নাই ভাল।—বলিয়া আবার সেটা তরুর মুখের উপর চাপাইয়া দিল। তরুর শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। সে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া মত্ত তারণকে

একটা ধাক্কা দিল। নেশার উত্তেজনায় দুর্ব্বল তারণ পড়িয়া গেল—সেই অবসরে দরজা খুলিয়া ছুটিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু বাহিরেও নিষ্কৃতি ছিল না—সেখানে শাশুড়ী প্রহরা দিতেছিল বাঘিনীর মত। তারণের ঘরের দরজায় অতি ক্ষিপ্রভাবে শিকল দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া বধূকে আটক করিয়া কহিল—পালাবি কোথায় শুনি? হারামজাদী, স্বামীকে ফেলে দিয়ে তুমি পালাবে? কেলেঙ্কারী করবে আমার?

তরু সভয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। শাশুড়ী তাহাকে সেই অবস্থাতেই আপনার ঘরে বন্ধ করিলেন। তরুর কাঁদিবার সাহস ছিল না, কিন্তু কান্নার আবেগে বুক যেন তাহার ফাটিয়া যাইতেছিল। সে নিদ্রাহীন চক্ষে আবেগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিস্ফারিত চক্ষে ঘরভরা অন্ধকারের দিকে চাহিয়া পড়িয়া রহিল।

ভোরের দিকে শাশুড়ী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—ও ঘরে তারণের নাসিকা-গর্জ্জনের ধ্বনি শোনা যাইতেছিল। তরু উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভয়ে যেন সে পঙ্গু হইয়া গেছে। কিছুক্ষণ পর আবার সে উঠিল। দরজার কাছে আসিয়া অর্গলে হাত দিল।

ধনদাবাবু গ্রামের মধ্যে প্রত্যূষে উঠিয়া থাকেন—অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই তিনি বাহিরে আসেন। সেদিন প্রত্যূষে বহির্দ্বার মুক্ত করিবা মাত্র প্রথম দর্শন করিলেন নববিবাহিতা কন্যার কর্দ্দমলিপ্ত মুখ। তিনি শিহরিয়া প্রশ্ন করিলেন—তরু—মা!

তরু উত্তর দিতে গেল, কিন্তু পারিল না—সে এতক্ষণে মুর্চ্ছিত হইয়া পিতার কোলে ঢলিয়া পড়িল।

তরুর জীবনের এইখানেই বোধ হয় প্রথম অঙ্ক শেষ হইল।

* * *

পরদিন প্রভাতেই তরুর শাশুড়ী বউ লইতে আসিয়া বলিল—আরও পঞ্চাশ টাকা তোমাকে লাগবে বেয়াই। তারণ ত আমার রেগে খুন—বলে ও পরিবার আমি নোব না। আমি অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—

অসহিষ্ণু ভাবে ধনদাবাবু বলিলেন—না।

সবিস্ময়ে চমকিয়া উঠিয়া তরুর শাশুড়ী বলিল—না কি?

এক কথায় ধনদাবাবু বলিয়া দিলেন—মেয়ে আমি পাঠাব না।

তরুর শাশুড়ী বলিল—অ—তা বেশ। কিন্তু গয়নাগুলি আমার দাও। গয়না ত আমার তারণের।

ধনদাবাবু বলিলেন—গয়না আমার মেয়ের।

ইহার উত্তরে তরুর শাশুড়ী চীৎকার করিয়া পথে পথে তরুর গতরাত্রির নৈশ অভিসারের একটা রচিত কাহিনী রচনা করিয়া বাড়ি ফিরিল।

ধনদাবাবু প্রতিজ্ঞা করিলেন—ও জামায়ের আমি মুখ দেখব না। আমার মেয়ের ভাবনা! এক লাখ টাকা দেব আমি তরুকে—বেটা নিজে এসে গড়িয়ে পড়বে—তবে আমার নাম!

কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা তাঁহার থাকিল না।

চার বৎসর পরের কথা। তরুর বয়স তখন সতের বৎসর।

তরুর মা সেদিন ধনদাবাবুকে বলিলেন—হ্যাঁ গো—মেয়েটার একটা ব্যবস্থা কর।

ধনদাবাবু বলিলেন—পাঁচ হাজার টাকা দেব আমি তরুকে—ভাবনা কি?

গৃহিণী বলিলেন—টাকা নিয়ে কি করবে তরু? কে ভোগ করবে?

ধনদাবাবু সচকিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—হুঁ।

গৃহিণী বলিলেন—জামায়ের সঙ্গে কি মাথা তুলে চলা চলে, যার পায়ে ধরে মেয়ে দিয়েছ! তরুর দিকে চেয়ে দেখ দেখি।

ধনদাবাবু কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু সন্ধ্যার সময় নিজেই গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন—তরু ত বেশ রয়েছে—কেবল দেখলাম আজকাল বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বেশী।

গৃহিণী বলিলেন—ঝগড়া করাটা বুঝি ভাল মনের লক্ষণ?

ধনদাবাবু ডাকিলেন—তরু—তরু!

তরু তখন নীচে ঝগড়াই করিতেছিল—সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে অন্ধকার বাড়িটার প্রাঙ্গণে একা দাঁড়াইয়া বলিতেছিল—

গোপালের মা সব—গোপাল কোলে ক'রে শুয়েছেন। আর আমি—দাসী-বাঁদী আমার ত না খাটলে উপায় নেই। আমি ত গোপালের মা নই।

ধনদাবাবু গৃহিণীকে বলিলেন—হুঁ।

তরু তখনও আপন মনেই বকিতেছিল—কাল যে ষষ্ঠী—তা সে-উদ্যুগও আমাকে করতে হবে? কেন—শুনি? ঝাঁটা মারি আমি ষষ্ঠীর মুখে।

* * *

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই ধনদাবাবু গৃহিণীকে বলিলেন—কুমুঠাকরুণকে একবার ডাক দেখি!

গৃহিণী বলিলেন—কেন?

—তারণের মায়ের কাছে একবার পাঠাব।

কুমুঠাকরুণ দৌত্য লইয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তারণ আসতে-যেতে রাজী আছে। কিন্তু য-দিন আসবে সম্মানী দিতে হবে পাঁচ টাকা ক'রে। প্রথম দিন কিন্তু দশ টাকা লাগবে।

ধনদাবাবু বলিলেন—দশ টাকা, মোটে দশ টাকা! দুশ-পাঁচ-শ দেব আমি। চাঁদির জুতো মারব আর নিয়ে আসব বেটাকে—যাও তুমি কুমুদিদি, নেমন্তন্ন ক'রে এস—রাত্রে সে এখানে খাবে।

কুমু আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—টাকা কিন্তু আগাম দিতে হবে।

দশ টাকার দুইখানি নোট বাহির করিয়া তিনি কুমুর হাতে তুলিয়া দিলেন, বিশ টাকা দিলাম—আবার দেব। ভাবনা কি! বাড়িতে নানা আয়োজন হইল। তরু নিজে হাতে শয্যা রচনা করিল।

ছোট ভাজ রসিকতা করিয়া বলিল—ঠাকুরঝিকে আজ ভাই বড় খুশী খুশী দেখছি।

ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া তরু বলিল—মরণ আর কি!

বড় ভাজ যত্ন করিয়া কেশবিন্যাস করিয়া দিল।

রাত্রে শুইতে যাইবার সময় সে আঁচলের খুঁট খুলিয়া কয়টা বেলফুল খোঁপায় পরিয়া লইল। কখন গোপনে সে কৃষ্ণবাবুর বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল।

প্রভাতে উঠিয়া তরু দেখিল শয্যাশূন্য—তারণ কখন উঠিয়া চলিয়া গেছে। দেওয়ালে ঝুলানো আয়নায় সে বিশৃঙ্খল মাথাটা ঠিক করিয়া লইতে গিয়া শিহরিয়া উঠিল—তাহার কানের একটা মাকড়ী নাই। বিছানা খুঁজিতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না—কিন্তু তবুও একবার খুঁজিয়া দেখিল।

সে বেশ ভাল করিয়াই জানিত মাকড়ী পাওয়া যাইবে না—পাওয়া গেলও না।

কয় দিন পর আবার সেদিন সকালে কুমু-ঠাকরুণকে দেখিয়া তরু মাকে বলিল—কুমুঠাকরুণ কেন এসেছিল মা?

মা বলিলেন—তারণকে নেমন্তন্ন করতে পাঠালাম।

তরু বলিল—আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব মা।

সবিস্ময়ে মা প্রশ্ন করিলেন—কেন?

তরু বলিল—হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ পর কুমু আসিয়া বলিল—কই গো তরুর মা—টাকা-পাঁচটা দাও বাপু—আগাম না হ'লে তোমার জামায়ের চলবে না।

তরুর মা বাক্স খুলিতেছিলেন—তরু আসিয়া তাঁহার পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আমাকে আর আত্মহত্যা করিও না মা—তোমার পায়ে ধরছি আমি।

মা সস্নেহে তরুকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—কেন সে-কথা আমায় বলবি না তরু?

মায়ের আকর্ষণেও তরু উঠিল না, সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া মায়ের পায়ে মুখ লুকাইয়া বলিল—চোর—চোর, মা, সেদিন আমার মাকড়ী চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছে।

* * * *

আট বৎসর পরের কথা—

পশ্চাতের পটভূমির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া গেছে। জীবনেও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ধনদাবাবুর বড় বাড়িটা ছোট ছোট ভাগে ভাগ হইয়াছে। ধনদাবাবুও নাই—তাঁহার স্ত্রীও নাই। বাড়িটা চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছে—তিন ভাইয়ের তিন অংশ, তরুর এক অংশ। তরুকে তিনি দিয়া গিয়াছেন নগদ পাঁচ শত টাকা ও হাজার-দেড়েক টাকা মূল্যের জমি। লাখ-পঞ্চাশ হাজার-দশ হাজার-পাঁচ হাজার ওটা ছিল ধনদাবাবুর স্বভাবসিদ্ধ আস্ফালনের অঙ্ক। বড় ভাইয়ের বাড়ি বন্ধ, বড়ভাইও

নাই—ছেলেটিকে লইয়া বড়ভাজ ভাইপোর কাছে গিয়া আছেন। মেজভাই এখানকার বাসই তুলিয়া দিয়াছে—সমস্ত বিক্রয় করিয়া সে শ্বশুরবাড়িতে গিয়া বাস করিতেছে। থাকিবার মধ্যে আছে তরু ও তরুর ছোটদাদা। তরুও স্বতন্ত্র ভাবে সংসার পাতিয়াছে। ধনদাবাবুর শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়া যাওয়ার কিছুদিন পর সেদিন তরুর দূর-সম্পর্কীয়া এক ননদ আসিয়া ডাকিল—বৌ রয়েছ না কি?

তরু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কে?

ননদ রসিকতা করিল—কুটুম হে কুটুম—সন্দেশ বার কর।

তরু বলিল—এস—ব'স।

ননদ বলিল—পাল্কী এনেছি—নিতে এলাম তোমাকে।

একখানা আসন পাতিয়া দিয়া তরু বলিল—ব'স।

বসিয়া ননদ চারি দিক দেখিয়া বলিল—বেশ বাড়ি হয়েছে। কারু সঙ্গে কোন লেপ্‌চ নাই।

তরু শুষ্কস্বরে বলিল—হুঁ।

ননদ বলিল—আর কি দিয়ে গেল বাবা? কেউ বলছে পাঁচ হাজার, কেউ বলছে দশ হাজার—তা অবিশ্বেসের ত কথা নয়—বাপ ত তোমার বড় বাপই ছিল।

তরু গম্ভীর ভাবে বলিল—পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন।

ননদ বলিল—তা আমাকে কিছু শিরোপা দিও ভাই, আমি সুখবর এনেছি।

তরু কোন উত্তর দিল না—সে সুখবরটার জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কেহ কোথাও ছিল না—তবুও অনাবশ্যক ভাবে মৃদুস্বরে ননদ গোপন সংবাদটি প্রকাশ করিল—দাদার মন টলেছে হে—তোমার কপাল খুলেছে।

বিচিত্র হাসি হাসিয়া তরু বলিল—তাই না কি?

—হ্যাঁ, তাই ত বললাম—তোমাকে নিতে এসেছি।

—ও—।

—তা হ'লে কবে যাবে বল—এ মাসের ২০শে, ২৫শে, ২৭শে এই তিনটি দিন আছে।

তরু কঠিন স্বরে অপ্রত্যাশিত রূঢ়ভাবে এবার জবাব দিল—বলতে তোমার লজ্জা লাগল না ঠাকুরঝি—ছি—ছি। এজন্মে তোমার দাদাকে তপস্যা করতে বল গে—আসছে জন্মে যাব। আমার টাকার লোভে নিতে এসেছ—আবার দু-দিন পরে টাকা ক'টা কেড়ে নিয়ে আর একটা কলঙ্ক দিয়ে বিদেয় ক'রে দেবে, কেমন?

ননদ মুখ কালো করিয়া উঠিয়া গেল। তরু পূজার জন্য ফুল বাছিতে বসিল। সে এখন নিত্য নিয়মিত পূজা করে—ব্রত-নিয়মের কোনটি সে বাদ দেয় না।

ছোট ভাজ আসিয়া দাঁড়াইল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তরু বলিল—কি?

বৌটি ভয়ে ভয়ে বলিল—তোমার দাদা একবার ডাকছে।

কর্কশভাবেই তরু উত্তর দিল—কেনে?

—সে ত আমি জানি না ভাই।

—তুমি জান না—আমি জানি—বল গে টাকা আমি দিতে পারব না।

বৌটি চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরই ইমনকল্যাণ ভাঁজিতে ভাঁজিতে ছোটদাদা আসিয়া বিনা-ভূমিকায় বলিল—পাঁচটা টাকা দে ত তরু।

তরু ভাইকে দেখিয়া একটু কোমল হইয়া উঠিল—এই ছোটদাদাটিকে সে বাল্যকাল হইতেই বড় ভালবাসে। তরু একটু কোমল কণ্ঠেই বলিল—টাকা আমার নাই ছোট্‌দা।

ছোটদাদা বসিয়া পড়িয়া থামের গায়ে টোকা দিয়া বোল বাজাইতে বাজাইতে বলিল—আঃ আজ একটা গানের মজলিস বসবে—এক জন সেতারী ওস্তাদ এসেছে।

তরু বলিল—এই ক'রেই তুমি সব নাশাবে ছোটদা।

ছোটদাদা আংটিটা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—এইবার দিবি ত!

আংটিটা কুড়াইয়া লইয়া তরু পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া দিল। খুশী হইয়া ছোটদাদা টাকা লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু তরু আবার ডাকিল—ছোট্‌দা—নিয়ে যাও তোমার আংটি। আংটিটা সে ভাইয়ের দিকে ফেলিয়া দিল।

দিনকয়েক পর—সেদিন তখন সে রান্না করিতেছিল। কাহার গলার সাড়া পাইয়া সে বুঝিল ছোটদাদা আজও

াবার টাকার জন্য আসিয়াছে। সে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। নে মনে শক্ত কথার সারি সাজাইয়া তুলিতেছিল সে।

—একটু আগুন দাও দেখি।

তরু চমকিয়া উঠিল—মুখ ফিরাইয়া দেখিল—বিপদতারণ নির্লজ্জ ভাবে দাঁত মেলিয়া হাসিতেছে।

হি-হি করিয়া হাসিয়া বিপদতারণ বলিল—চম্‌কে উঠ্‌লে যে—ভূত নাকি আমি?

দেওয়ালে ঠেস দিয়া তরু কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

তারণ বলিল—বেশ ঘরদোর হয়েছে। তা আমাকে একদিন নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন কর।

তরু এবার বলিল—না।

তারণ কৃত্রিম ভয়ে একটু পিছাইয়া আসিয়া বলিল—ও রে বাপ রে! সাপিনী রে—নাগিনী রে ফোঁস্!

তরু কিন্তু এ রসিকতায় হাসিল না।

তারণ বলিল—তা হ'লে কবে নেমন্তন্ন করছ বল?

তরু বলিল—বললাম ত—না।

—না! কেন শুনি?

তরু অনুচ্চ কণ্ঠে দৃঢ়তার সহিত বলিল—চোরকে আমি বড় ঘেন্না করি।

এক মুহূর্ত্তে তারণের কাল মুখও কেমন অস্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করিল। মাথাও নত করিতে হইল।

তরু বলিল—মাকড়ী তুমি আমায় চাইলে না কেন?

তারণ বলিল—চাইলে তুমি দিতে?

—চেয়ে দেখলে না কেন তুমি? মুখে মাটির ছাঁচ তুলেছিলে, তবু ত আমি রাগ করি নি!

তাহার দুটি চোখ জলে টল্ টল্ করিতেছিল।

তারণ আসিয়া তাহার দুটি হাত ধরিয়া অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিল—আমাকে মাফ্ কর তরু।

তরু ঝরঝর করিয়া কাঁদিল শুধু। তারণ তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বার-বার তাহাকে চুম্বন করিল।

তার পর যাইবার সময় বলিল—রাত্রে আমার নেমন্তন্ন রইল এখানে।

* * *

জীবনের এই তৃতীয় অঙ্কে নাট্যকার সুখের চিত্র আঁকিয়াছিলেন। বিপদতারণ তাহাকে ধরা দিল, সত্য সত্য স্বামীর মতই ধরা দিল। অর্থ চাহিল না—সম্পদ চাহিল না—আপনার মত করিয়াই সমস্ত জোতজমার তদারক করিল, তরুর সেবাও লইল—শাসনও মানিল। মাস-চারেক পর সেদিন তারণ মাঠ হইতে ফিরিয়া দেখিল তরু শুইয়া আছে। প্রশ্ন করিয়া জানিল তাহার জ্বর হইয়াছে। তারণ নিজেই রান্না করিতে বসিল।

তরু বলিল—ছোটবৌ যে নেমন্তন্ন ক'রে গিয়েছে সকালেই। জ্বর দেখে বললে—ঠাকুরজামাই তা হ'লে আমার বাড়িতেই খাবেন।

দুম্ করিয়া কড়াটা নামাইয়া দিয়া তারণ বলিল—বাঁচলাম বাবা। একটান তামাক খাই বরং—কাজ দেখবে। আজ কিন্তু একটা টাকা দিতে হবে—অনেক দিন মদটদ খাই নাই। কে—কে গো?

তরুর ননদ প্রবেশ করিয়া বলিল—তোমাকে একবার ডাকছে দাদা। কটি লোক এসেছে বাড়িতে। দাদা আজ বাড়িতেই খাবে বউ।

তারণ বলিল—লোক—কে রে বাপু? কার ধার ধারি আমি!

তরু বলিল—দেখেই এস না বাপু!

তারণ গেল, কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যেও আর ফিরিল না। অপরাহ্নে ছোটবধূ আসিয়া বলিল—ঠাকুরজামাই ফেরেন নি ঠাকুরঝি?

তরুর জ্বর ছাড়িয়া আসিতেছিল—সে বলিল—সেই জলখাবার বেলাতেই গিয়েছে বাড়ি—কে লোক এসেছে। এখনও ত ফিরল না। কাউকে যে পাঠাব এমন লোক নাই।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বউ বলিল—তোমার কলকার সতীন এসেছে।

তরু চমকিয়া উঠিয়া বলিল—কে বললে?

অপরাধিনীর মত বউটি বলিল—পাড়াতেই শুনলাম—খবর সত্যি।

তরু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—দেখি কিছুক্ষণ। তুমি ছোট দাকে একবার ডেকে দিও ভাই।

ডাকিতে কিন্তু পাঠাইতে হইল না—তারণ নিজেই সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিল।

তরু প্রশ্ন করিল—ঝল্‌কার বৌ এসেছে ?

তারণ বলিল—হ্যা। দেখ কেনে, বলা নাই, কওয়া নাই—ড্যাং ড্যাং এক-কাপড়ে এসে হাজির। শালারা মদ খাইয়ে বিনা পয়সায় বিয়ে দিয়েছে—এখন বলে ভাতকাপড় দাও—নিয়ে ঘর কর।

তরু চুপ করিয়া রহিল। তারণ বলিল—দিলাম বিদেয় ক'রে। বলে ভেসে যাবে—আমি ব'লে দিলাম—গলায় কলসী বেঁধে দিও ডুবে যাবে—ভেসে যাবার ভয় থাকবে না।

তরু বলিল—ছি—ওই কি বলে গো।

আবার কিছুক্ষণ পর তরুই বলিল—আজই কেন বিদেয় ক'রে দিলে বল ত? না-হয় একটা রাত থাকত। না-হয় সম্মানীটা আমি দিতাম।

তারণ বলিল—একটা টাকা দাও দেখি—একটা বোতল আনব আজ।

তরু বলিল—বাক্সটা আন না, লক্ষ্মী!

তারণ বাক্স আনিলে তরু একটা টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল—রেখে এস এটা—আমি পারছি না। তারণ তখন বহির্দ্বারের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে—ফিরিয়া চাহিবার তাহার সময় ছিল না। তরু শুধু হাসিল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তরু ডাকিল—ছোটবৌ! ছোটবৌ আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—কেমন আছ ঠাকুরঝি? ঠাকুরজামাই কই?

তরু বলিল—মাঠ গিয়েছে। আমি ভালই আছি। আজ আমরা দু-জন এবেলা তোমার কাছেই খাব। আর ওবেলার জন্যে কিছু মাছ আনিয়ে ভেজে রেখ ত ভাই। বাক্সটা বের ক'রে আন, পয়সাটা দি—নিয়ে যাও।

ঘরে ঢুকিয়া ছোটবৌ বলিল—বাক্স কই ঠাকুরঝি? এ কি—তোমার সিন্দুকের তালা খোলা কেন?

তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া তরু দেখিল—কাঠের হাত-বাক্সটা নাই—সিন্দুকের তালাটা খোলা ঝুলিতেছে।

ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া তরু সিন্দুকের ডালা খুলিয়া দেখিল—শূন্য—গহনার বাক্স—টাকার বাক্স কিছুই নাই।

তরু থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

বৌ ডাকিল—ঠাকুরঝি—ঠাকুরঝি!

তরু বলিল—গোল ক'রো না—গোল ক'রো না বৌ। গেছে যাক।

তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা বোধ করি ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল।

* * *

তরু আবার পূর্ব্বের মত জীবন আরম্ভ করিল। তিল তিল করিয়া সঞ্চয়ে আপনার ভাগ্য আবার সে গড়িয়া তুলিতেছিল—আর আবার সেই পূজা-অর্চ্চনা—বারব্রতের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিল।

কিন্তু কঠোরতা তাহার পূর্ব্বের চেয়ে অনেক গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। সংসারে করুণা সে কাহাকেও করে না। ছোটদাদার এখন যথেষ্ট অভাব—একে একে সে সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছে—তবু একটি পয়সা সাহায্য সে করে না। দু-দশ টাকা ধার দেওয়া ব্যবসায়ে সুদ সে একটি পয়সা ছাড়ে না। তাহার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ সে ঐ শূন্য সিন্দুকটি পূর্ণ করিবার জন্য কঠোর ভাবে নিয়োজিত করিয়া বসিল।

তারণ ঝলকার বৌকে লইয়া সংসার পাতিয়াছে। কয়টি ছেলেমেয়েও হইয়াছে। তরু পাড়ার সে-দিকটা মাড়ায় না পর্য্যন্ত। কিন্তু মুখে সে কোনদিন একটা কথা বলিল না।

দশ বৎসর পর।

সেদিন ছোটদাদা আসিয়া বলিল—তরু একটা কথা বলছিলাম তোকে—।

বাধা দিয়া তরু বলিল—নিজে খেতে পাই না আমি, আমি কোথা সাহায্য করতে পাব বল!

ছোটদাদা নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিল। বলিল—সে কথা ঠিক তোকে বলতে আসি নাই আমি তরু—অন্য কথা বলছিলাম—তা থাক—।

সে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার কথাগুলির মধ্যে কণ্ঠস্বরের দীনতায় তরু আজ একটু বেদনা বোধ না-করিয়া পারিল না। ছোটদাদা চলিয়া গেল—তরুর আজ মনে হইল ছোটদাদা যেন বড় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অথচ বয়স ত তাহার বেশী নয়। চল্লিশ এখনও পূর্ণ হয় নাই। সে দরজাটায় কুলুপ বন্ধ করিয়া ছোটদাদার বাড়িতে চলিল।

কার্ত্তিক মাস, রাস-পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বাবুদের গোবিন্দ-মন্দিরে রোসনচৌকী বাজিতেছে। তরু শুনিল ছোটদাদা

বলিতেছেন—কি রাগিণী আলাপ করছে জান?—বাগেশ্রী।—বলিয়া নিজেই গুণ-গুণ করিয়া রাগিণী ভাঁজিতে আরম্ভ করিল। তরু আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

ছোটদাদা বলিল—তরু? আয়—ব'স্‌!

তরু ছোটদাদাকে দেখিতেছিল—সত্যই ছোটদাদার ঢেউ-খেলানো চুলে আজ সাদা রং ধরিয়াছে—তাহাতে আর সে বিন্যাসও নাই।

কাঁচা সোনার মত রং তামাটে হইয়া আসিয়াছে—বাল্যের ব্যায়ামপুষ্ট সবল দেহ যেন জীর্ণ শিথিল—গায়ের চামড়ায় কুঞ্চন ধরিয়াছে।

ছোটদাদা বলিল—কেটেছে তাল বেটাচ্ছেলে।

তরু বলিল—রাগ করেছ ছোট্‌দা?

হাসিয়া ছোটদাদা বলিল—না রে—রাগ করব কেন?

—তবে কি বলছিলে না ব'লে চলে এলে যে?

—তুই শুন্‌লি কই—আঃ, আবার তাল কেটেছে—দাঁড়া ত ব'লে আসি বেটাকে!

তরু বলিল—কি কথা ছিল ব'লে তবে যেতে পাবে। চিরকালই কি মানুষের একভাবে যায়? ছি—ছি—ছি!

ছোটদাদা বলিল—বলছিলাম কি—ছোটবৌ বড় কাতর হয়ে পড়েছে—মানে ওর ছেলে হবে তা জানিস ত?

হাসিয়া ফেলিয়া তরু বলিল—হ্যাঁ তা জানি।

ছোটদাদাও একটু বোকার মত হাসিয়া বলিল—মানে বেশী বয়সে ছেলে হবে—আর আজকাল হবেই আছে। মানে—কাল থেকেই শরীর যেন—আঃ বল না গো তুমি!

তরু আবার হাসিয়া বলিল—তুমিই বল।

ছোটদাদা বলিল—তাই বলছিলাম—রান্নাটা যদি এক জায়গায় এ-কদিন তুই চালিয়ে দিস, তবে বড় ভাল হয়।

তরু ছোটবৌয়ের নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিল—শরীর কি ভেঙেছে ছোটবৌ?

ছোটবৌ বলিল—হ্যাঁ ভাই কেমন যেন—।

তরু ভাইকে প্রশ্ন করিল—দাই এখুনি ব'লে রেখেছ ত ছোট্‌দা?

* * * *

সেইদিনই রাত্রে ছোটবৌ একটি পুত্র প্রসব করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ছোটদাদা ছল-ছল নেত্রে তরুর দিকে চাহিয়া বলিল—কি হবে তরু?

তরু কোন কথা বলিল না—সে আপনার বাড়ি চলিয়া গেল।

মিনিট কয়েক পরেই আবার ফিরিয়া দুইটি টাকা ভাইয়ের হাতে দিয়া বলিল—যাও ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস।

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া ভরসা দিয়া বলিলেন—বিশেষ কিছু ভয় নেই

নবজাত মানবকটি তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। ডাক্তার তাহাকে কোলে লইয়া বলিলেন—বাঃ বড় সুন্দর খোকা হয়েছে। এর যে একটা ব্যবস্থা করা দরকার—এক-আধ দিন ত নয়, এখন মাসখানেকই ধ'রে রাখুন।

তরু অসঙ্কোচে আঁতুরঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল।

এই বোধ হয় চতুর্থ অঙ্কের সমাপ্তি।

* * * *

ছোটবৌ ভাল হইয়া উঠিল। কিন্তু মা হওয়া তাহার হইল না। সে-ই হইল ধাত্রী—আর তরু হইল মা।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনে একটা অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। যে-কয়দিন সে তারণকে জীবনে নিবিড় ভাবে পাইয়াছিল, সে-কয়দিনের মধ্যেও তাহার এত মিষ্ট কথা কেহ কোন দিন শুনে নাই। জীবনের স্নেহের সুধার ভাণ্ডার সে যেন উজাড় করিয়া দিল। শুধু স্নেহই নয়—তাহার জীবনের সঞ্চয় সামর্থ্য সমস্ত দিয়া ছোটদাদার সংসারটি প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিল। সঙ্গীতবিৎ ছোটদাদাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলিল—আঃ, বাঁচলাম আমি তরু—তরুর ছায়ায় এবার জুড়োব আমি। তরু এখন আর রাগ করিল না—হাসিয়াই বলিল—ওই শিখেছিলে শুধু—কথার ঝুড়ি—আর কত্তে ধাগিনাক্‌।

ছোটদাদাও হাসিয়া বলিলেন—আয় আজ একবার তোর মাথায় কত্তে ধাগিনাক বাজিয়ে দি।

—খবরদার ছোট্‌দা—ভাল হবে না বলছি। খোকার দুধ গরম করব, সরো।

ছোটদাদা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত করিয়া কিছু বলে নাই। তাহার সম্পত্তি যাহা কিছু সবই প্রায় গিয়াছে—এখনও ঋণ পর্ব্বতপ্রমাণ। তরুর সঞ্চয় ও সম্পত্তি হইতে বহুদিন পরে পরিবারটির অবস্থা সচ্ছল হইয়া উঠিল। কিছুদিনের মধ্যেই অকালবৃদ্ধ ছোটদাদার শরীরে চিক্কণতা দেখা দিল। তরুর তাড়ায় মাঝে মাঝে জোতজমার তদারক করিতে যাইতে হয়—অন্য সময়ে আপনার দাওয়াটির উপর বসিয়া কণ্ঠে ধাগিনাক করেন—কখনও বা ইমন-কল্যাণের রাগিণী একটু হেরফের করিয়া একটা নূতন সুর সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। মধ্যে মধ্যে বলেন—তরু তুই আপত্তি করিস নে—আমি ওস্তাদি করতে আরম্ভ করি। দশ টাকা আসবে—আমার পেটটাও বাইরে-বাইরে—

তরু বলে—হ্যাঁ—নেশাভাংটা চলবে—সেইটাই হ'ল আসল কথা তোমার ছোটদাদা।

ছোটদাদা অপ্রতিভের মত হাসে।

তরু বলে—না—চুল রেখে, গাঁজা খেয়ে বেড়াতে হবে না ছোটদাদা। বড় হ'লে ছেলেটা যাতে বাপ ব'লে পরিচয় দিতে পারে তার মুখ রেখে যাও।

ছোটদাদা আরও কি বলিতে যায়—কিন্তু তরু শোনে না—খোকার কোন পরিচর্য্যার সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে অজুহাতে সে সেখান হইতে চলিয়া যায়।

বৎসর-তিনেক পর ছোটবৌ আর একটি কন্যা প্রসব করিল।

তরু হাসিয়া বলিল—নাও ছোট্‌দা—মহাজন হ'ল তোমার।

ছোটদাদা হাসিয়াই উত্তর দিলেন—মহাজন নয় বোন—পাথর। সংসারসমুদ্রে কোন রকমে ভাসছিলাম—এইবার বুকে চাপল পাথর।

তরু সজল চক্ষে বলিল—ছি, ছোট্‌দা! জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। তোমার ভাবনা ত মিছে।

ছোটদাদা শুধু হাসিল।

তরু বলিল—ওর ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না ছোটদা—আমাকে ভার দিও—কুলের মাথা খেয়ে আমি ওকে সুখী করব।

ছোটদাদা হাসিয়াই উত্তর দিল—আমার ভারই তোর হাতে তরু। সংসারের হাটে ভারী ত দূরের কথা বাঁকা-মুটে হবার সামর্থ্যও আমার নাই। এ সংসারের সব ভারই তোর।

ইহার কিছুদিন পরই একদিন ছোটদাদা সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া সেগুলা ব্যবহারের যোগ্য করিতে বসিল। তরু বলিল—যত বাজে কাজ কি তোমার ছোট্‌দা!

ছোটদাদা বলিলেন—এবার এগুলোকে কাজেই লাগাব তরু। আর তোর কথা শুনব না। মান যাক—তানে যদি পেট ভরে তাতে দোষ কি?

তরু এবার আর আপত্তি করিল না। তাহার সঞ্চয় প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাপকে মনে পড়িয়া গেল—সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। ছোটদাদা তানপুরা ঘাড়ে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। মাসখানের পরে ছোটদাদা ফিরিয়া ডাকিলেন—তরু।

খোকাকে কোলে লইয়া তরু তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—ছোটদাদা!

দশটি টাকা তরুর হাতে দিয়া ছোটদাদা বলিলেন—রাখ্।

তরু বলিল—খোকার জন্যে কি এনেছ, দাও।

অপ্রতিভ হইয়া ছোটদাদা বলিলেন—কিছু ত আ[illegible] নাই তরু—ও কথা আমার মনেই হয় নাই।

তরু ছেলেমানুষের মত অভিমান করিয়া বলিল—তোমার টাকা তুমি রাখ দাদা—আমার দরকার নাই বেশ ত তোমার সংসার তুমি চালাও—খোকার ভাব[illegible] তোমাকে ভাবতে হবে না।

বহু কষ্টে ছোটদাদা তরুকে শান্ত করিলেন। মাসখানে[illegible] পর আবার ছোটদাদা বাহির হইয়া গেলেন।

মাস-ছয়েক পর।

সন্ধ্যার সময় ননদ ও ভ্রাতৃজায়ার সুখদুঃখের ক[illegible] হইতেছিল। তরুর কোলে খোকা, বৌর কোলে ছিল খুকী ছোটদাদা বাড়িতে নাই—বাহির হইয়া গিয়াছেন। খো[illegible] বায়না ধরিয়াছিল সে মাতৃদুগ্ধ পান করিবে।

বৌ বলিল—না ঠাকুরঝি, মেয়েটা ত এক ফোঁটা[illegible] পায় না—তার ওপর মাইদুধে ভাগ বসালে ও বাঁচে ক'রে বল!

তরু বলিল—ও হে—কুলীনের ঘরের মেয়ে অক্ষয় অমর—দেখছ না আমাকে! দাও ভাই দাও খোকাকে আমার—একবার দুধ দাও। তাতে তোমার রাজকন্তের কম পড়বে না।

বাহির হইতে কে ডাকিল—কে রৈছেন গো ঘরে!

তরু সাড়া দিল—কে? কোথা বাড়ি?

উত্তর হইল—আমরাই গো—ওস্তাদজীকে নিয়ে এসেছি অসুখ তেনার।

তরু ছুটিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল—ছোটদাদা গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে অসাড়ের মত পড়িয়া আছে। সে ব্যাকুল ভাবে ডাকিল—ছোট্‌দা—ছোট্‌দা গো!

গোঙাইয়া গোঙাইয়া ছোটদাদা যে কি উত্তর দিল তরু বুঝিতে পারিল না। সে গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করিল—কি হয়েছে গো?

গাড়োয়ান বলিল—আজ্ঞে কবরেজ দেখাল্‌ছিলাম আমরা—ডাক্তারও দেখেছে—এক অঙ্গ প'ড়ে গিয়েছে ঠাকুরের।

তরু বুঝিল পক্ষাঘাত।

পক্ষাঘাত ভাল হইবার ব্যাধি নয়—ভাল হইল না। পঙ্গু অক্ষম হইয়া ছোটদাদা তরুর স্কন্ধেই বোঝা হইয়া চাপিয়া রহিলেন। তরু চিকিৎসায় কিছু অর্থব্যয় করিল, কোন ফল হইল না।

কিন্তু এততেও তরু দমিল না। তাহার জোতজমা হইতেই নিপুণ বন্দোবস্তে সে সংসারটির অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া চলিল। ছোটদাদা আরও বৎসরখানেক বাঁচিয়া রোগ-ভোগ করিয়া তবে গেলেন। তিনি বোধ করি ছিলেন তরুর জীবনের প্রবলতম মন্দগ্রহ। তাহার পিতা তাহার এত ক্ষতি করেন নাই—তারণও করে নাই—কিন্তু ছোটদাদা তাহাকে পথে বসাইয়া দিয়া গেলেন। জীবনে অমিতব্যয় ছাড়া তিনি আর কিছু করেন নাই—স্নেহে তাহার জন্য শেষপর্য্যন্ত হইল পক্ষাঘাত—আর যে ঋণ তাঁহার অবশিষ্ট ছিল তাহাই একদিন সুদে আসলে আদালত-খরচায় ষোল শত টাকার বডিওয়ারেন্টরূপে আসিয়া হাজির হইল। মহাজন গ্রামের লোক—তিনি তরুর সম্পত্তিটুকুর দিকে লক্ষ্য করিয়া জাল নিক্ষেপ করিলেন।

উঠানে আদালতের পেয়াদা—মহাজন ওয়ারেণ্ট-হাতে অপেক্ষা করিতেছিল। চিন্তা করিবার অবসর ছিল না—তরু ছল-ছল চোখে আসিয়া জোড়হাত করিয়া মহাজনকে বলিল—আমার সম্পত্তিটুকু নিয়েও আপনি দাদাকে রেহাই দেন।

সেই দিনই দলিল লেখাপড়া রেজেষ্ট্রারী হইয়া গেল। তরু মহাজনকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল।

ইহার ঠিক দিন দুই পর। ছোটবৌ বলিল—চাল ত আজ নাই ঠাকুরঝি!

তরু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বাহির হইয়া গেল। কত বাড়ির দুয়ার পর্য্যন্ত গিয়াও সে ফিরিয়া আসিল। সে ধার চাহিবার জন্য বাহির হইয়াছিল। পথে সহসা তাহার মনে হইল—শোধ করিবে কি করিয়া?

এই লজ্জাতেই সে ফিরিল—অনেক ক্ষণ অর্থহীনভাবে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া সে বাড়িই ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বাড়ির দুয়ারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

জড়িত স্বরে রুগ্ন ছোটদাদা চীৎকার করিতেছেন—খিদে—খিদে।

খোকা কাঁদিতেছে—ভাত—খা—বো!

তরু আবার ফিরিল—দ্বিধা তাহার কাটিয়া গিয়াছে। সে সইয়ের বাড়িতে গিয়া সইকে বিনা-ভূমিকায় বলিয়া ফেলিল—পাঁচ সের চাল দিতে পারবে সই?—ভিক্ষে—শোধ দেবার ত উপায় নাই।

সই কোন কথা বলিল না—একটি ধামাতে সের-সাতেক চাল ভরিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিল। এতক্ষণে তরু ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—কি হবে সই?

* * *

আরও বৎসর-দুয়েক পরে তরুকে দেখা যায়—কিন্তু চেনা যায় না। ছোটদাদা আর নাই—ভিক্ষা এখন তরুর উপজীবিকা। ভিক্ষা করিয়াই সে খোকাকে পড়াইতে সুরু করিয়াছে। বাঁড়ুজ্জেদের পুকুরে সেদিন মাছ-ধরানো হইতেছিল—খুচরা চুনামাছ। চারিদিকে ছোটলোকের ছেলেমেয়ের ভিড় জমিয়া গিয়াছে।

পাড়ের উপর একটা পরিষ্কার স্থানে মাছ ঢালিয়া ভাগ হইতেছে।

ছোটলোকের ছেলেগুলাকে ধমক দিয়া কে বলিল—সর্ সর্ এই ছেলেগুলো—পথ দে।

একটা ছেলে হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—যেখেনে মাছ ধরবে—আম পাড়বে—সেইখানেই ঠাক্‌রুণের ভাগ আছে।

তরু একটি কচুপাতা হাতে পথ খুঁজিতেছিল। ভিড়ের ভিতরে আসিয়া সে বলিল—ছোটবাবু—মাছ দুটো দাও বাপু—ছেলে কাঁদছে—ঘরে।

বারব্রতে সে সধবা খাইয়া ব্রতদান গ্রহণ করিয়া ফেরে। সেদিন যোগেন গাঙ্গুলীর স্ত্রীর এয়ো-সংক্রান্তির ব্রত। তরু আগে হইতেই গাঙ্গুলী-গিন্নীকে ধরিয়াছিল—সধবা তুমি আমাকেই কর দিদিমা!

গাঙ্গুলী-গিন্নী মুখ এড়াইতে পারিলেন না—দয়াও হইল। গাঙ্গুলীর ভাইপো শুধু বলিল—না—না—ও ছ্যাঁচড় মেয়েটাকে আবার পূজো কেন? ভিক্ষে বরং দাও ত কিছু দাও।

গাঙ্গুলী-গিন্নী কিন্তু বলিলেন—আহা বাবা—দুঃখী ব'লে যা তা বলতে নাই—ছি।

ব্রতের দিন তরুকে আপনার শয়ন-ঘরে বসাইয়া, জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া নূতন শাড়ী পরাইয়া দিলেন—সীঁথিতে সিঁদুর দিয়া সুগন্ধ তেলে চুল আঁচড়াইয়া দিলেন, পায়ে আলতা পরাইয়া দিয়া নানাবিধ মিষ্টান্নভরা পাত্র সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলিলেন—খাও।

তরু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—বাড়ি নিয়ে যাই দিদিমা—ছেলেগুলো আছে—বিধবা বৌটা আছে।

গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—না—না—তুমি ওগুলো খাও তরু, আমি ছেলেদের জন্যে আলাদা এনে দিচ্ছি।

তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

নির্জ্জন ঘরে তরু পরমতৃপ্তিভরে খাইতে খাইতে চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছিল। ঘরের চারিদিকে সুশোভন প্রাচুর্য্য! কিছুই তরুর অপরিচিত নয়—একদিন এ সবই তাহাদের ছিল। দেওয়ালের ছবি, আলমারী, পুতুল, খাট, বিছানা—সবই সে ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার পক্ষে সবই অপরূপ। পূর্ব্বদিকের খোলা জানালা দিয়া রৌদ্র আসিয়া সমস্ত ঝক্‌মক্ করিতেছে।

বালিসের নীচে ওটা কি? রৌদ্রাভায় আগুনের মত রাঙা—ধ্বক ধ্বক করিতেছে। এক মুহূর্ত্তে তরুর সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল—সে চিলের মত ছোঁ মারিয়া সেটাকে টানিয়া লইল। সোনার চেন তাগা এক ছড়া!

তাহার বুকের মধ্যে যেন রেলগাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে! থর থর করিয়া সমস্ত অঙ্গ তাহার কাঁপিতেছিল। ঘরখানা যেন ঘুরিতেছে! তরু দ্রুতপদে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া আসিল।

গাঙ্গুলী-গিন্নী একটা ঠোঙ্গা হাতে উপরে যাইতে-ছিলেন—পিছনে পিছনে তাহার ভাসুরপো।

গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—খাওয়া হয়ে গেল তোমার? ভাসুরপো অসহিষ্ণু ভাবে বলিল—কোথা রেখেছ আমাকে বল না—আমি বার ক'রে নোব।

গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—তোমার বাবা, ঘোড়ায় চড়ে কাজ করা স্বভাব—মাথার বালিসের নীচেই আছে তোমার তাগা নাও গে।

সে চলিয়া গেল। গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন—কোথায় জেটিমা—পাচ্ছি নে যে।

বিরক্তভাবে গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—বালিসের নীচে—ভাল ক'রে চোখ মেলে চেয়ে দেখ। আচ্ছা আমি যাই।

তরুর হাতে ঠোঙ্গাটা দিয়া তিনি বলিলেন—এস ভাই। তরু দ্রুতপদে চলিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কম্পিত পদে তাহার গতি ব্যাহত হইয়া যাইতেছিল। উপরে তাহারা খুঁজিতেছে। হয় ত—সেই মুহূর্ত্তে বাড়ির ভিতর হইতে ডাক আসিল—তরু—তরু—এই মাগী। তরু তখন গাঙ্গুলীদের বাড়ির ঠিক বাহিরে। তরু এদিক-ওদিক চাহিয়া তাগাটা বাহির করিয়া গাঙ্গুলীদের নর্দ্দমার তরল পঙ্কের মধ্যে ফেলিয়া দিল। কিন্তু তখনও সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

দ্রুত পদধ্বনির সঙ্গে গাঙ্গুলীবাবুর ভাইপো আসিয়া বলিল—বের কর্ তাগা—বের কর্ বলছি।

পিছন হইতে গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—তরু!

তরু কি বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না।

গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—নিয়ে থাক ত দাও তরু—পাঁচটা টাকা আমি দেব।

তরু তবুও নির্ব্বাক।

গাঙ্গুলীবাবুর ভাইপো চীৎকার করিয়া ডাকিল—মোক্ষদা—মোক্ষদা। মোক্ষদা বাড়ির ঝি। সে আসিতেই তাহাকে হুকুম হইল—দেখ্‌ত মাগীর কাপড়চোপড় খানাতল্লাস ক'রে।

তরু শিহরিয়া উঠিল—তাহার হাত হইতে খাবারের ঠোঙাটা পড়িয়া গিয়া সন্দেশগুলা ছড়াইয়া পড়িল।

মোক্ষদা তাহার দিকে সত্যই অগ্রসর হইল।

*　　*　　*　　*

যোগেন গাঙ্গুলীকে তরু যে পত্র দিয়াছিল—তাহাতে ওই তাগার কথাই লেখা ছিল। লেখা ছিল—আপনাদের তাগা—আপনাদের নর্দ্দমার মধ্যে পড়িয়া আছে।

মধুগন্ধি বনে

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

প্রিয়তমে, ছিল সাধ যাবে দিন মধুগন্ধি বনে,
সজিনার মৃদু বাসে সুগন্ধি দক্ষিণ সমীরণে
যাবে দিন,—ভেবেছিনু, এ বঙ্গের নিভৃত পল্লীতে
আম্র-পনসের কুঞ্জে কালো জলে হংসের সঙ্গীতে
বাঁধিব আমার বীণা—ভেবেছিনু তারি সুরে সুরে
দরিদ্রা এ বঙ্গভূমি দেখা দিবে অশ্রুর মুকুরে,
দরিদ্র কবির স্বপ্নে দেখা দিবে জীর্ণ ভিখারিণী
সুকরুণ অশ্বত্থ-ছায়াতে! অনাহত সে রাগিণী
জাগায়ে তুলিবে মনে কত দূর বিস্মৃত বেদনা,
কত স্বপ্ন, কত গান, কত চিত্র, কত আরাধনা—
সে শুধু রহিল স্বপ্ন, প্রিয়তমে, রহিল তা মনে—
ভেবেছিনু যাবে দিন নদীতীরে মধুগন্ধি বনে!

আজ দাঁড়ায়েছি আসি নগরীর উচ্চ কোলাহলে
জীবিকার জয়-যাত্রা-পথে, ম্লান কেরানীর দলে
লিখেছি আপন নাম, ললাটের স্বেদধূলি-রেখা
স্মিতহাস্যে মুছিয়াছি, চলিয়াছি ধীর পদে একা
এ পুরীর প্রান্তসরণীতে! প্রিয়তমে, চাহো মোর পানে—
দেখো আমি সেই কবি, আজো আছি মগ্ন অভিমানে,
ললাটে রয়েছে লেখা জন্ম হ'তে অস্থির অক্ষরে
অসহন দুঃখের তিলক, ডাকো আজ স্নেহস্বরে
পরাইয়া দাও মালা, তব প্রেম—এই অহঙ্কার
ভুলায়েছে জীবনের তুচ্ছতম অজস্র ধিক্কার—
দেখো চলিয়াছে কবি দুঃখ হ'তে কা'র অন্বেষণে!
প্রিয়তমে, ছিল সাধ যাবে দিন মধুগন্ধি বনে।

তবু ডাকে সেই বন, তারা যেথা হয়েছে কুসুম,
ঘনচ্ছায়াতলে যেথা বর্ণারুণ আলোর কুঙ্কুম
পড়েছে কপোলে তব, নতনেত্রে, স্নিগ্ধ কেশপাশে—
ছিল সাধ যাবে দিন তাহারি মধুর অবকাশে!
সেই ছায়া-অন্তরালে নব শিল্প করিব রচনা,
রূপায়ন জীবনের,—হেরি কা'র মূর্ত্তি অসহনা
নামিয়া আসিনু পথে, দেখিলাম তাহারি ইঙ্গিতে
ছুটেছে নিখিল পৃথ্বী অবিশ্রাম উদাত্ত সঙ্গীতে
মুখরিয়া মহাকাশ, কহিলাম, কর সঙ্গী মোরে
তোমাদের যাত্রাপথে, বাঁধিও না মুগ্ধ মায়া-ডোরে—
আজ তবু মনে হয়, বেদনার নিগূঢ় বন্ধনে,
ভেবেছিনু যাবে দিন তব সাথে মধুগন্ধি বনে!



পুরাণপ্রবেশ—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু। প্রকাশক—এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৪৲।

অনেক দিন পরে বাঙ্গালা ভাষায় পুরাণ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক বাহির হইল। এ রকম বই বাঙ্গালায় এই নূতন। এখানি বইয়ের মত বই। প্রাণ খুলিয়া সুখ্যাতি করিবার মত বই। পুরাণপ্রবেশ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, গ্রন্থকার নিষ্ঠার সহিত খাটিয়া খুটিয়া বইখানি লিখিয়াছেন। নিষ্ঠার ফলে পুরাণে তাঁহার রুচি জন্মিয়াছে। পুরাণের প্রকৃত ভাব ও অর্থ কি তাহা তিনি নিজে বুঝিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রয়াস ও প্রযত্ন অনেকটা সফলও হইয়াছে।

পুরাণপ্রবেশ ২৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অধ্যায়গুলিতে পুরাণ সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলির বিচার ও আলোচনা আছে। এই ২৭টি অধ্যায়ে গ্রন্থকার ১২৩টি গুরুতর সমস্যার সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। পুরাণকে তিনি পুরাপুরি History বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তের সমর্থনকল্পে নানা বিষয়ের অবতারণা করিয়া নানা দিক দিয়া তাঁহার সংগৃহীত প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: পক্ষান্তরে 'ইতিহাস' যে History নয় তাহাও দেখাইতে তিনি ক্রটি করেন নাই। বস্তুতঃ ইতিহাস ও পুরাণের পার্থক্য কি তাহাও তিনি পাঠকের সম্মুখ ধরিয়াছেন। তিনি পুরাণের স্বরূপ কি তাহা বুঝাইয়াছেন। ইহা যে রূপকথার ন্যায় নানাপ্রকার অসম্ভব, অবাস্তব ও অতিপ্রাকৃত ঘটনা-সম্ভার গ্রন্থ নয় তাহা তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুরাণের সকল কথা এ-পর্যন্ত কেহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। পুরাণে রাজাদের বংশতালিকা যে-রকম সুনিবদ্ধ সুষ্ঠু প্রণালীতে প্রদত্ত হইয়াছে এ-রকম আর কোথাও দেখা যায় না। ভিন্সেণ্ট স্মিথ এ-বিষয়ে পরম্পরাগত রীতি যে পুরাণে অক্ষুণ্ণ আছে তাহা স্বীকার করেন। তিনি বলেন খাঁটি বংশতালিকা বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড ও ভাগবত পুরাণে পাওয়া যায়। তিনি এ-কথাও বলেন যে বর্ত্তমান ইউরোপীয় লেখকগণ পৌরাণিক বংশতালিকা মানিতে চাহেন না; কিন্তু যতই পুরাণের অনুশীলন হইতেছে ততই পুরাণে খাঁটি ঐতিহাসিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

গিরীন্দ্র বাবু তাঁহার গ্রন্থে বহু বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সকল বিষয় সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা এই অল্প পরিচয়ে সম্ভবপর নয়। তিনি যে পৌরাণিক সারণী ও কালনিদেশ দিয়াছেন তজ্জন্য ইতিহাসপাঠক মাত্রই গিরীন্দ্র বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। তিনি মন্বন্তরাদি, ইক্ষ্বাকু, পুরু প্রভৃতি বংশবিচারে যে সূক্ষ্ম বিচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। প্রদ্যোত, শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ, কণ্ব প্রভৃতি বংশপরম্পরা বিচারে বিভিন্ন পৌরাণিক মতের তিনি পরিচয় দিয়াছেন। এ-সমস্ত বিষয়ে তাঁহার প্রদত্ত সারণীগুলি যথেষ্ট সাহায্য করিবে। সমপর্যায়ে বিভিন্ন বংশীয় প্রাচীন রাজগণের সারণীর বিচারকৌশল অতি সুন্দর হইয়াছে। পুরাণ বিষয়ে বিদেশীদের পক্ষপাত সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে লেখক যে-পরিমাণ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা অমূল্য। কেবল পুরাণের অত্যুক্তিবিচার অধ্যায়ে লেখকের অনেক সিদ্ধান্তই আমরা মানিতে পারিলাম না। কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিতান্তই বিসদৃশ হইয়াছে। এ অধ্যায়টি কাটিয়া-ছাঁটিয়া নূতন করিয়া লেখা আবশ্যক।

গ্রন্থের সকল মতের সহিত সকলের মতের ঐক্য না থাকিতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিজেরও কতকগুলি বিষয়ে মতান্তর আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গ্রন্থখানি যে সুন্দর পদ্ধতিতে লিখিত তাহাতে সকলেই আকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। লেখকের বলিবার প্রণালী যেমন সরল ও বিশদ, বিচারপদ্ধতিও তেমনই বিশ্লেষণমূলক। পুরাণ তথা ইতিহাস (History) সম্বন্ধে এরূপ সারবান্ অথচ প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট গ্রন্থ অতি অল্পই দেখা যায়। ইহা যুগপৎ বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ পাঠকের উপজীব্য হইবে। সকল গ্রন্থাগারে ইহা রক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

জীবনযাত্রায় মনোবিদ্যার প্রয়োগ— দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ।০ চারি আনা। ৯২ নং আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মনোবিজ্ঞানাগার হইতে শ্রীযুত সুধীরকুমার বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা-প্রয়োগশালায় অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক এই পুস্তিকাখানি লিখিত হইয়াছে। কি করিয়া শিশুর মন বিকশিত হয়, কি ভাবে পালন করিলে শিশুর মন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, কি করিয়া বালক-বালিকাকে লেখাপড়া শিখাইতে হয়, মানসিক স্বাস্থ্য কেমন করিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, দুষ্ট বা দুর্ব্বোধ্য শিশুকে কি করিলে ভাল করা যায়, মানসিক বিকারের প্রাথমিক লক্ষণগুলি কি কি ও কোন্ উপায়ে তাহা নিবারিত হইতে পারে, কিশোর-কিশোরীর নানা মানসিক সমস্যা কি করিয়া নিরাকৃত হইতে পারে, কোন্ বালকের পক্ষে ভবিষ্যৎ জীবনে কোন্ বৃত্তি উপযুক্ত হইবে, ইত্যাদি বহুবিধ অত্যাবশ্যক বিষয়ের উপদেশ বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক এই পুস্তিকায় লিখিত হইয়াছে। আমার মতে প্রত্যেক পিতামাতার এই পুস্তকখানি অবশ্যপাঠ্য। বাংলা ভাষায় এইরূপ পুস্তিকা একেবারে নূতন। কলিকাতা মনোবিদ্যা-প্রয়োগশালার অধ্যাপকগণ যে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও চেষ্টালব্ধ জ্ঞান সাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিতেছেন ইহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। শরীরের দিকে এখন অনেকেরই নজর পড়িয়াছে, কিন্তু শরীরের ন্যায় মনের স্বাস্থ্যও যে অত্যাবশ্যক সম্পদ, একথা আমরা সকলে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না। এই পুস্তিকা পাঠে আমাদের অনেকেরই চক্ষু ফুটিবে। সাধারণে ইহাতে বহু নূতন ও বাস্তব জীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাইবেন। শিক্ষকগণও অনেক নূতন জিনিষ শিখিবেন। পুস্তকাস্থ প্রবন্ধগুলির মধ্যে কোন-কোনটি পূর্ব্বে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রত্যেক

প্রবন্ধেরই লেখক আলোচ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। এইরূপ পুস্তিকা প্রকাশে বাংলা-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। পুস্তিকা প্রথম সংস্করণ সাধারণের হিতকল্পে কলিকাতা স্বাস্থ্যপ্রদর্শনীতে বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। এই অমূল্য পুস্তিকাখানির দ্বিতীয় সংস্করণের মূল্য নামমাত্র চারি আনা করা হইয়াছে। ইহার বহুল প্রচারই সম্পাদকমণ্ডলীর উদ্দেশ্য। পুস্তিকাখানিতে অনেক মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে এগুলি সংশোধিত হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্যবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ৭ম সংস্করণ। কলিকাতা, ৮৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা।

গ্রন্থকার এক জন স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। তিনি নিজে হাতে-কলমে কাজ করিয়া ব্যবসায়-সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরিশিষ্টে গ্রন্থকারের আত্মকথায়, কিরূপে অতি সামান্য অবস্থা হইতে অধ্যবসায়, সততা ও পরিশ্রমের ফলে তিনি উন্নতিলাভ করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা আছে। ব্যবসায়কামী ব্যক্তিগণ এই পুস্তক পাঠে ব্যবসায়-সম্বন্ধে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিবেন।

দানবিধি—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা, ৮৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা।

গ্রন্থকার নিজে এক জন দানবীর। দেশ কাল ও পাত্র-ভেদে কিরূপে দান করিলে দান সফল হয়, তাহাই এই পুস্তিকায় আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

তৃষা। শ্রীতারাপদ রাহা। পি. সি. সরকার এণ্ড কোং, ২ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা, পৃ. ১১০।

ছোটগল্পের বই। গল্পগুলি সুখপাঠ্য, এর বেশী আর কিছু বলা যায় না। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

মায়ামুক্তি। শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কমলা পাবলিশিং হাউস। ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি উপন্যাস। বেশী ঝরঝরে ভাষায় লেখা একটি সুমিষ্ট গল্প। স্মৃতির চরিত্র আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

এগারোই ফাল্গুন—শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। কমলা পাবলিশিং হাউস। ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট। দাম পাঁচ সিকা। পৃ. ১৪৮।

বইখানি পড়িয়া ভাল লাগিয়াছে। লেখক চরিত্রাঙ্কনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। রমলা তো একেবারে জীবন্ত। টেক্‌নিকের দিক হইতেও বইখানি নতুন ধাঁচের।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

খেয়াল—শ্রীহরিনয় রায় চৌধুরী। ৫ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হইতে আশুতোষ লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য গল্পপুস্তক। ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধ নয়টি গল্প আছে,—পাগলের খেয়াল, নাম-না-জানা ফল, পিস্তলের গুলি, কুঁড়ের কীর্ত্তি, বারবেলা, অমাবস্যার অন্ধকারে, গুপ্তধনের নেশা, নিরুদ্দেশ ও নামচুরি। শেষের গল্পটি একটি জাপানী গল্পের ভাবানুসরণে লিখিত। গল্পগুলি যেমন সুপাঠ্য, তেমনই ছেলেদের মনোরঞ্জনের উপযোগী রসধারায় ভরপুর। পুস্তকখানি সর্ব্বাংশে শিশুদিগের মনোরঞ্জন করিবে বলিয়া মনে হয়। গল্পের মধ্যে সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলিও স্থান, কাল ও পাত্রের উপযোগী হইয়াছে। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ বেশ সুন্দর। কয়েকখানি সুন্দর চিত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রবাসী বাঙালী—শ্রীঅবনীনাথ রায়। ২ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে পি. সি. সরকার এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তকখানি লেখকের চৌদ্দ-পনর বৎসর প্রবাসের স্মৃতি লইয়া রচিত। দিল্লীর কথা, মীরাটের কথা, আগ্রার কথা, পুণার কথা, দেওঘরের কথা, শিলঙের কথা—এই কয়টি নিবন্ধ লইয়া এই গ্রন্থ রচিত। পরিশিষ্ট ভাগে কয়েকটি মৃত প্রবাসী বাঙালীর জীবন সম্বন্ধে কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ স্থানে যে-সকল দ্রষ্টব্য বস্তু বা প্রবাসী বাঙালী লেখকের মনের উপর একটা রেখাপাত করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে; সুতরাং এই পুস্তকে কেবল তথ্য নাই, আবার কেবল কল্পনাও নাই, দুইটির সংমিশ্রণে কোন কোন বর্ণনা লেখকের দেখার ভঙ্গীর ভিতর দিয়া বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রচনাগুলির মধ্যে দিল্লীর কথা, মীরাটের কথা ও আগ্রার কথা—এই তিনটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোজ্ঞ হইয়াছে। লেখকের ভাষা এমন সরস ও সরল এবং বর্ণনাভঙ্গী এমন চিত্তাকর্ষক যে স্থানে স্থানে উহা উচ্চাঙ্গের উপন্যাসের মত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। স্থানে স্থানে লেখক মহাশয় কিছু কিছু অবান্তর উচ্ছ্বাস আনিয়া ফেলিয়াছেন, উহা তাঁহার এমন মনোরম বর্ণনার মধ্যে না থাকিলেই ভাল হইত। লেখকের বর্ণিত স্থানগুলির মধ্যে অনেকগুলিই দেখিবার সুযোগ অনেকেরই হইয়াছে, কিন্তু লেখকের মত এমন অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতিপূর্ণ মন লইয়া দেখিবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই আছে। সুতরাং এই রচনাগুলি সকলের নিকটই বিশেষ উপাদেয় হইবে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণের মন ও অন্তরের যে পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়া যায়, তাহাতে মুগ্ধ হইতে হয় এবং আমাদের সেই একান্ত আপনার লোকদিগের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রীতিনিবেদন জানাইতে হৃদয় উৎসুক হইয়া উঠে। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই, কাগজ পুস্তকের রচনার মতই সুন্দর।

ভেক রাজকুমার—শ্রীবিনয় সিংহ। ২৭।১ কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বিচিত্রা-নিকেতন হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন আনা।

ইংরেজী শিশুপাঠ্য উপকথার Frog Prince নামক গল্প অবলম্বনে ইহা রচিত। যে-সকল শিশু সবেমাত্র অল্প বাংলা পড়িতে শিখিয়াছে, তাহাদের জন্য ইহা লিখিত। এই পুস্তকের বড় গুণ যে ইহা খুব সরল ভাষায় লিখিত, একেবারে একটিও যুক্তাক্ষর নাই। ছেলেদের রং দিবার জন্য দুইখানি চিত্রের রেখাঙ্কনও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ বেশ ভাল।

গায়ে কাঁটা—শ্রীহৃষীকেশ মৌলিক প্রণীত। ৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কুলজা সাহিত্য-মন্দির হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা।

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য উপন্যাস। একটি বালক কলিকাতা হইতে মাদারীপুরে তাহার পিসিমার বাটীতে গিয়া, সেখান হইতে নিকটবর্ত্তী গ্রামে তাহার পিস্তুত বোনের শ্বশুর-বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার পথে তাহার ছোট পিস্তুত বোনের সহিত রাত্রিকালে যে ভীষণ বিপদে পড়িয়াছিল তাহারই বিবরণ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। বালকটি বিপদে পড়িয়া যে অদ্ভুত সাহস, উপস্থিত-বুদ্ধি ও সতর্কতার সাহায্যে উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহাই এই পুস্তকে বেশ ভাল রকম ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। গল্পটি আগাগোড়া বেশ জমিয়াছে, দুই-একটি চিত্রের সমাবেশে আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ভাষা সরল ও লিখিবার ভঙ্গীও সরস; শিশুরা এই পুস্তক পাঠে বেশ আমোদ পাইবে। বাঁধাই, ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

তৃষিত—শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বরেন্দ্র লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲টাকা।

ইহা একখানি গল্পসংগ্রহ পুস্তক; ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ এগারটি গল্প স্থান পাইয়াছে। গল্পগুলি পাঠ করিয়া মনে হয় উহাদের রচনার সময়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান আছে, উহাদের ভাব ও ভাষার ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য করিলেই একথা বেশ বোধগম্য হয়। কয়েকটি গল্পের রচনাভঙ্গী চমৎকার। ছোটগল্পের রচনার যে একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে, তাহা লেখকের কয়েকটি রচনায় সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে, নিদর্শন-স্বরূপ "আতঙ্ক", "রায়বাড়ী" ও "নারীর মূল্য" কয়টির উল্লেখ করা যাইতে পারে; "পথ-ভোলা" গল্পটিতেও বেশ একটু সরলতা ও করুণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গল্প "অপরাধ" সমাজের একটি জটিল সমস্যার কথা তুলিয়া নির্ভীকভাবে তাহার সমাধান করিয়াছে, এই গল্পটির রচনা ও বর্ণনা বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে। মোটের উপর ছোটগল্পের আর্ট জিনিষটা লেখকের আয়ত্ত আছে বলিয়া বোধ হয়। আশা করি তিনি ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে আরও কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভালই হইয়াছে।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

জাতীয় সাহিত্য—স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত এবং ৭৭, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, হইতে শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

ভৌগোলিক সীমার বন্ধনের মধ্যেই দেশ এক নয়, ভাবগত ঐক্যই ভারতবর্ষকে সমগ্রতা দান করিয়াছে। সেই ঐক্যবোধের উপর জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা। এই বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া যে-সাহিত্য সমগ্র-ভারতের জনগণের মন উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবে, তাহাই জাতীয় সাহিত্য। গ্রন্থের সকল আলোচনার মূলে এই প্রধান কথাটি রহিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় বইখানির নাম 'জাতীয় সাহিত্য' দেওয়া হইয়াছে। কর্ম্মে কবির অথবা ভাবপ্রকাশে কর্ম্মীর শক্তি-প্রয়োগের প্রণালী ও নৈপুণ্য আমাদের কৌতূহলী মনকে চিরদিন উত্তিক্ত করে। প্রতিভা আপন প্রকৃতি অনুসারে আপনার ক্ষেত্র বাছিয়া লয়। কর্ম্মের মধ্য দিয়া আশুতোষের প্রতিভা স্ফুরিত হইয়াছে। এখানে সাহিত্যে তাঁহার আত্মপ্রকাশ। যে ভাব ও কল্পনা তাঁহার সৃষ্টিকুশলী শক্তিকে কর্ম্মে প্রেরিত করিয়াছে তাহারই সাহিত্যিক পরিচয় এই পুস্তকখানিতে পাওয়া যায়। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 'আশুতোষ ভারত-ব্যাপী বিশাল ভূমিকায় তাঁর মনের সর্ব্বোচ্চ কামনায় ও সাধনায় যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে এই কর্ম্মবীরের ধ্যানের মহত্ত্ব আমি স্পষ্টরূপে অনুভব করেছি।' পূর্ব্বাভাষে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র গ্রন্থ ও জীবন-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 'ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ', 'কৃত্তিবাস', 'মহাকবি মধুসূদন', 'জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি', 'বঙ্গ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'—এই প্রবন্ধপঞ্চকে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ: প্রথম ও শেষটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের এবং চতুর্থটি উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ। ব্যক্তি-মানসের সুষ্ঠু প্রকাশে সাহিত্যের সার্থকতা। উৎসাহ, সাহস, নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি এবং প্রাণশক্তির প্রবলতায় যে ব্যক্তিত্ব আবেগশীল তাহার পরিচয় এই প্রবন্ধগুলির রচনাভঙ্গীতে পরিস্ফুট। আশুতোষ বলিতেছেন, 'আজ বঙ্গসাহিত্যকে সমগ্র-ভারতের আত্ম-সাহিত্য করিতে হইবে।' তিনি জানিতেন, 'অল্প কয়েক জন মাত্র ইংরেজী ভাষায় অনুশীলন করে।...জাতীয় ভাব বজায় রাখিতে হইলে ভারতীয় ভাষার সেবা আবশ্যক।' ভাব ও চিন্তার পারস্পরিক আদান-প্রদান সহজ করিবার অভিপ্রায়ে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় যদি অন্য প্রদেশগুলির ভাষার অনুশীলনের ব্যবস্থা বিধান করে তাহা হইলে 'স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য না হারাইয়া......সমগ্র-ভারতে জাতীয় সাহিত্যগত একতার সমাধান করা যাইতে পারে।' কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণতি দিয়া গিয়াছেন। শেষ প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন, 'যদি এমন ভাবে বঙ্গ-ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করা যায় যে, সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে হইলে অপরাপর ভাষার ন্যায় বঙ্গ-ভাষাও শিখিতে হয়, এবং না-শিখিলে অনেক অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় চিরকালের মত অজ্ঞাত থাকিয়া যায় ও অন্য শত ভাষা শিক্ষা করিয়াও পূরা মানুষ হওয়া না যায়, তবেই বঙ্গ-ভাষা চিরস্থায়িনী হইবে।'

সুন্দরের সীমানা—শ্রীঅরবিন্দ, সুরেশ, দিলীপ, নলিনী লিখিত এবং কলিকাতা, ৬৩ কলেজ ষ্ট্রীট, আর্য্য-পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। দাম বার আনা।

চার জনের লেখা পাঁচটি প্রবন্ধের সমষ্টি। আলোচনাগুলি পত্রচ্ছলে লেখা। বইখানিতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দিলীপকুমার রায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত আর্টের এবং আর্টসম্পর্কিত মতের বিচার করিয়াছেন। তর্কের নিষ্পত্তি-স্বরূপ এ সম্বন্ধে অনুবাদ-সহ শ্রীঅরবিন্দের একখানি ইংরেজী পত্র প্রকাশিত। তর্কের বিষয়, আর্ট ফর আর্টস্-সেক সূত্রটি সত্য কি না এবং সত্য হইলে কতদূর সত্য এবং কতখানি গ্রাহ্য। আর্ট লইয়া তর্ক করিতে গেলে সৌন্দর্য্যের কথা আপনিই আসিয়া পড়ে। এই হিসাবে 'সুন্দরের সীমানা' নাম দেওয়া হইলেও, নাম হইতে বিষয়ের স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে না। শ্রীসুরেশচন্দ্র সূত্রটির নীতি সমর্থন করিয়া বলিতেছেন, 'বস্তু-জগতের ধর্ম্ম সাম্য ধর্ম্ম... প্রত্যেক আর্টিষ্টের মাঝে একটি স্বতঃসিদ্ধ মুক্ত আত্মা আছে যা সব কিছুরই ঊর্দ্ধে......তাই সে হাতের একই তুলি দিয়ে রাজপ্রাসাদ ও কুঁড়েঘর আঁকে, ডেসডেমোনা ও ইয়াগোকে রচনা করে' ইত্যাদি। উত্তরে শ্রীদিলীপকুমার বলেন, 'জীবনের মত আর্টেও চুটকি ও গভীর, চকচকে ও সুন্দর, মেকি ও সাঁচ্চা, নুড়ি ও হিরে এক দর হতেই পারে না।...ছোট ও বড়র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিব্যক্তি তুল্যমূল্য নয়।' শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত বলেন, 'উভো তো'—দুই-ই সত্য। 'যে নৈপুণ্য দিয়ে কালিদাস তাঁর মহাদেবকে এঁকেছেন, সেই নৈপুণ্য দিয়েই এঁকেছেন মহাদেবের বৃষটিকে। দু-জনার মর্য্যাদা এক নয়, কিন্তু সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হিসাবে দুটিই সমান নয় কি? শ্রীঅরবিন্দের মতে, 'তিনটি জিনিষ নিয়ে আর্টের সমগ্রতা। প্রথম, প্রকাশক্ষম রূপের অনবদ্যতা,

সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার; দ্বিতীয়, বস্তুর যে মূল সত্তা বা অন্তরাত্মা তার অভিব্যক্তি; তৃতীয়, এই দুটি অঙ্গ যার বাহন সেই সৃষ্টিপটু চৈতন্যের ও আনন্দের শক্তিরাজি। এই তিনটি যদি আমরা এক সাথে গ্রহণ করি তবে……মীমাংসায় হয়ত আমরা পৌঁছতে পারি।' যাঁহারা ইংরেজী জানেন তাঁহাদের পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী লেখাটি অনুবাদের অপেক্ষা সুবোধ্য হইবে। পূর্ব্বোক্ত সূত্রটির প্রচলন অবধি আর্ট সম্বন্ধে তর্কের এই ত্রিধারা চলিয়া আসিতেছে। এক দল আর্টকে বিষয়-নিরপেক্ষ প্রকাশ সৌষ্ঠবের দিক দিয়া, আর এক দল রচনার অন্তর্গত বিষয়বস্তুর দিক দিয়া, এবং তৃতীয় দল রূপ ও বিষয়ের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার করিয়া আর্টকে সমগ্রভাবে দেখিয়াছেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পরিচয়—শ্রীনিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। পৃ. ২০২।

প্রথম দিকটায় কতকগুলি চিঠি; তার পর এক উপন্যাস ফাঁদা হইয়াছে। চিঠিগুলি মোটের উপর ভালই; কিন্তু উপন্যাসে কাঁচা হাতের ছাপ সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার অসংখ্য ছাপার ভুলের জন্য তাহাও শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া ওঠা দুঃসাধ্য।

শ্রীমনোজ বসু

ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ভামতী, কল্পতরু ও নবীন টীকা ভামতীপ্রভা ও বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য বিবরণ সহিত। টীকাকার ও অনুবাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ তর্কতীর্থ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ সম্পাদিত। দ্বিতীয় অধ্যায় স্মৃতিপাদ নামক প্রথমপাদ।

আমরা এই নবীন টীকা ও বঙ্গানুবাদ দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। ব্রহ্মসূত্রের স্মৃতিপাদ ও তর্কপাদ অতি জটিল ও সমস্যাপূর্ণ। যে-সমস্ত মতবাদের আলোচনা ও খণ্ডন এই পাদদ্বয়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎপরিচয় বহুদিন হইতেই পণ্ডিতসমাজের সংঘটিত হয় নাই। এমন কি ইহা বলিলে অতিরঞ্জন করা হইবে না যে এই গ্রন্থালোচনাকালেই এই সমস্ত মতবাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম অভিজ্ঞতা জন্মে। ভামতী গ্রন্থে এই সমস্ত মতবাদের সংক্ষিপ্ত ও সুসম্বদ্ধ বিবরণ আমরা পাই বটে, কিন্তু তাহাতে জানিবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায় অথচ সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা সম্ভবপর হয় না। বর্ত্তমান কালে বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে সে-সমস্ত দর্শন ও মতবাদ আলোচনা করিবার সৌকর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সুধীসমাজে সে-সমস্ত মতের অনুশীলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতসমাজ এ জাতীয় আলোচনা হইতে এতকাল উদাসীন ছিলেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম যে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ তর্ক-বেদান্ততীর্থ মহাশয় সে-সমস্ত আকর গ্রন্থের আলোচনা করিয়া নিজ টীকা মধ্যে সে-সমস্ত মতের বিনিবেশ করিয়াছেন। এ-টীকায় অনুশীলন বৃদ্ধি পাইলে বিদ্যার প্রসার বাড়িয়া যাইবে সন্দেহ নাই। এ-সংস্করণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমরা উপলব্ধি করিয়াছি—তন্মধ্যে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ মহাশয়ের অবলম্বিত সূত্রাক্ষর সাহায্যে অধিকরণনির্ণয়-প্রণালী আমাদের নিকট একেবারে নবীন বলিয়া মনে হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় ভূমিকামধ্যে বলিয়াছেন যে, এ শৈলী তিনি সম্প্রদায়ক্রমে পূজ্যপাদ স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নকালে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে যদি বর্ত্তমান কোন গবেষণাকারী এ শৈলী অবলম্বনে সূত্রার্থ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে হয়ত অনেক সাম্প্রদায়িক বিবাদের মীমাংসা সুকর হইবে। দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে—ভাষ্য ও ভামতী মধ্যে যে-সমস্ত প্রামাণিক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার যথাসম্ভব আকর নির্দ্দেশ হইয়াছে।

এ-জাতীয় গ্রন্থের প্রচার বঙ্গদেশে অনতি-পূর্ব্বকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রার্থনা করি 'অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু'। বঙ্গদেশবাসী পণ্ডিতগণ যখন বেদান্ত-অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন ইহা আশা করিতে পারা যায় যে বেদান্ত চিন্তার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্ত্তন অসম্ভব হইবে না। বাঙালী যে-সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, তাহারই মধ্যে স্বতন্ত্র প্রজ্ঞতার পরিচয় বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নব্য ন্যায় ও নব্য স্মৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মীমাংসাদর্শন-মধ্যে গুরুমতের প্রকর্ষ ও বাহুল্য বঙ্গদেশেই সাধিত হইয়াছিল। বেদান্তের মধ্যেও এ অভিনব ধারা প্রবর্ত্তিত হইবে ইহা আশা করা যাইতে পারে।

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

প্রসূতি ও সন্তান—শ্রীগিরীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, এম-বি, এল্-এম (ডাব্লিন) প্রণীত ও বেঙ্গল পাব্লিশিং হোম হইতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

ধাত্রীবিদ্যা ও প্রসূতি পরিচর্য্যা সম্বন্ধে আমাদের বাংলা ভাষায় মাত্র দুই-তিনখানি ভাল বই আছে। সে স্থলে গিরীন্দ্রবাবু আর একখানি বই লিখিয়া বাঙালী গৃহস্থ সমাজের অনেক কল্যাণসাধন ও উপকার করিয়াছেন। যে-দেশে শিশুর জন্ম ও মৃত্যুহার এত অধিক, যে-দেশে অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও অলসতা এত ভীষণ, সে-দেশের প্রসূতি ও সন্তান পালনের জন্য এ রকম পুস্তকের নিতান্ত প্রয়োজন—একথা বলা বাহুল্য। আলোচ্য বইখানি বিশেষজ্ঞদিগের জন্য নহে—সাধারণ নর-নারীদের পাঠোপযোগী করিয়াই লেখক লিখিয়াছেন। প্রসূতির প্রসবের পূর্ব্বাবস্থা হইতে প্রসবের পর পর্য্যন্ত সমস্ত অবস্থাই লেখক খুঁটিনাটি ভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন। প্রসবের সময়কার কথা আরও বিশদভাবে বর্ণনা করা উচিত ছিল; বইখানি ডাক্তারি-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ লোকের জন্যই লিখিত, সে স্থানে ডাক্তারি উপকরণের কথা না বলিয়া যাহা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর তাহাই লেখা উচিত ছিল। মোটের উপর বইখানি সুলিখিত হইয়াছে ও গৃহস্থ-সংসারের অনেক উপকার সাধন করিবে। বইয়ের দামও খুব অল্প।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

প্রেত

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

বনমালীবাবু প্রথমটা একটু ইতস্তত: করিয়াছিলেন, কিন্তু না বলিলে চলিবেই না। নিজের জামাই হইলেই বা কি? দরদ দেখাইতে গিয়া শেষে গোষ্ঠীসমেত মরিবে নাকি? কবিরাজ যাহা বলিলেন, সে অতি ভয়ানক কথা। এ-সব ব্যাধি লইয়া ছেলেখেলা নয়!

দিবাকর ঘরের ভিতরে বসিয়া কাশিতেছিল। একবার থুক্ করিয়া খানিকটা গয়ের জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিল।

শব্দটা শুনিয়া বনমালীবাবু পুনরায় শিহরিয়া উঠিলেন।

দিবাকর থাকিয়া থাকিয়া কাশিতেছেই। বনমালী আস্তে আস্তে ঘরের সম্মুখে আসিয়া দিবাকরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, বুঝলে দিবাকর, তুমি যে আর এখানে থাক [illegible] আমার মত নয়। এ-সব ব্যাধির পক্ষে শহর জিনিষটাই খারাপ। আমার মতে তোমার এখন দেশে যাওয়াই উচিত। হাজার হ'লেও গ্রামে খাবার জিনিষপত্র প্রচুর মেলে, জিনিষও সব টাট্‌কা। আর কি বলে, হ্যাঁ, ইস্কুলের ছুটির জন্যে একখানা দরখাস্ত ক'রে কি দিয়েছিলে?

দিবাকর বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। দরখাস্ত ক'রেছিলুম, তিন মাসের ছুটি মঞ্জুর করেছে।

—বেশ বেশ। তিন মাস বাড়িতে গিয়ে থাক, ভগবানের কৃপায় এর ভিতরেই সুস্থ হ'য়ে যাবে। মাইনেটা পুরোই দেবে ত?

—ইস্কুলের অবস্থা ত তেমন ভাল নয়, প্রথমটা আপত্তি করেছিল। শেষে হেড্ মাষ্টারকে ব'লে-ক'য়ে পুরো মাইনেতেই গ্র্যাণ্ট করিয়ে নিয়েছি।

দিবাকর আবার কাশিতে লাগিল।

বনমালীবাবু বলিলেন—তা'হলে আর দেরি ক'রে দরকার নেই, কালকেই তুমি চ'লে যাও।

দিবাকর যেন একটু বিপন্ন বোধ করিল। বলিল—যাব তো, কিন্তু বাড়ি গিয়ে কি অবস্থার ভেতরে প'ড়ব ঠিক বুঝতে পারছি নে। আর মাধুরীকেও নিয়ে যাব ভাব্‌ছি—

বাধা দিয়া বনমালীবাবু বলিলেন,—না না, মাধুরীকে নিয়ে আর কাজ নেই, ওরা সবাই এখানেই থাক্। শুধু যে ঝঞ্ঝাট বাড়্‌বে তাই নয়, মাধুরীর এখন যাওয়াও ত অসম্ভব। কোলে ওই কচি ছেলে—

একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন—তোমাদের ভিটেয় এখন যে ঠাক্‌রুণটি বাস করছেন, তোমার একলা মানুষের সামান্য জোগাড়, তিনিই করতে পারবেন। আর এই ত ক'টা দিন মোটে···

শ্বশুর-মহাশয়ের কথার উত্তরে দিবাকর আর কিছু বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। আবার কাশির বেগ আসিল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সারা হইয়া গেলে নিজের ঘরে বসিয়া দিবাকর কন্যাকে বলিল—মীরা, তোমার মাকে একবার ডেকে নিয়ে এস ত একটু!

আজ দু-তিন রাত্রি মাধুরী পুত্রকন্যা লইয়া পৃথক ঘরে শোয়, স্বামীর ঘরে থাকে না। কবিরাজ কড়া ভাবে এই রকম থাকিতেই বলিয়া দিয়াছেন। কবিরাজ যেটুকু বারণ করিয়া দিয়াছেন, মাধুরী তাহাও ছাড়াইয়া আরও অধিক দূরে যায়—সে পারতপক্ষে স্বামীর কাছে ঘেঁষেই না! এমন ব্যাধির কথা শুনিবার পরমুহূর্ত্ত হইতে স্বামীর প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণায় তাহার মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সন্দেহ একটু একটু তাহারও পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছিল, এখন স্বামীর ওই শীর্ণ দেহের প্রতি তাকাইয়া মন তাহার সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, কাশির কুৎসিত শব্দ কানে গেলে গায়ের ভিতরে কাঁটা দিয়া উঠে! তিন দিন পূর্ব্বেও স্বামীর পার্শ্বে এক বিছানায় শুইয়া সে রাত্রি কাটাইয়াছিল, কিন্তু এখন সেই কথা স্মরণ করিতেই যেন মাধুরী ভয় পায়।

মীরা মাকে গিয়া বলিল—মা তোমায় বাবা ডাক্‌ছে।

মাধুরী কোলের ছেলেটির জন্যে দুধ গরম করিতেছিল। মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

—তা জানি না, এক্ষুনি যেতে ব'লল।

—এক্ষুনি যেতে পারব না, ব'লগে যা। ওকে দুধ খাইয়ে শুইয়ে রেখে আরও দুটো-একটা কাজ আছে সব সেরে তবে যাবো'খন। আর তুই ও-ঘরে অত যাস্ নি, খুকি? যা, শুধু এই কথাটা ব'লে এসে শুয়ে পড়গে।

মীরা আসিয়া বাবাকে বলিল। শুনিয়া ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া দিবাকর মাধুরীর অপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আধ ঘণ্টা খানেক পরে মাধুরী দরজার গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে না-ঢুকিয়া ওখান হইতেই জিজ্ঞাসা করিল—ডাক্‌ছিলে কেন?

মাধুরীর দিকে তাকাইয়া দিবাকর কহিল—ভিতরে এস।

—বল। এখান থেকেই শুনছি।

দিবাকরের চোখ দুইটি একটু নত হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে বলিল—দ্যাখ, ইস্কুল থেকে তিন মাসের ছুটি পেয়েছি। তোমার বাবা ব'লছেন এই তিন মাস বাড়িতে গিয়ে কাটাতে। তা জানই ত, আমার আর কেউই নেই। বাড়িতে শুধু একটা ভিটে প'ড়ে আছে। এত দিন বন-জঙ্গলেই ছেয়ে যেত, তা যায় নি শুধু গ্রামের এক বিধবা ঠাকরুন আমাদের ভিটের ওপরে দুখানা ঘর তুলে বাস ক'রছেন সেই জন্যে। আমি ভেবেছিলাম যে তোমাদের নিয়েই যাই, সেই স্বর্ণ-দিদির ঘরেই এই তিনটে মাস গিয়ে থাকব। তিনি বুড়ো মানুষ, অতি ভাল মানুষও। ছোটবেলা থেকেই আমাকে বড় স্নেহ ক'রতেন।...তা তোমার বাবা'র এতে অমত। তুমি কি বল?

—তা বাবার অমত হ'লে আমি কেমন ক'রে কোন কথা বলি? আমার যাওয়া হয় না।

—অবিশ্যি তুমি যা ভাবছ, তোমাদের তেমন কোন অসুবিধা হবে না। আমরা স্বতন্ত্র ভাবেই থাকব, স্বর্ণ-দিদির সাহায্যও খানিকটা পাওয়া যাবে। তা'ছাড়া সেদিন মীরা বলছিল, বাড়ি কেমন তার দেখতে ইচ্ছে করে। কোনো দিন দেখে নি ত!

একটু অসহিষ্ণু হইয়া মাধুরী বলিল—আচ্ছা, সে বাড়ি দেখা হবে'খন্।...তা তুমি তোমার সেই স্বর্ণ-দিদির কাছেই এই তিনটে মাস থেকে এসগে না? মিথ্যে আমাদের নিয়ে আর টানাটানি করছ কেন? হাঙ্গামা নিশ্চয়ই হবে। নিজেদের বাড়ি নেই, ঘর নেই—তার পরে আবার প্রায় চিরদিনই দেশ ছাড়া!

—না, না তুমি যা ভাবছ—

—ঠিকই ভাবছি আমি। বাবার পরামর্শই ভাল। কব্‌রেজের কাছ থেকে ওষুধপত্তর নিয়ে চ'লে যাও—

কাপড়ের আঁচল দিয়া মাধুরী মুখটা একবার মুছিয়া ফেলিল।

দিবাকর ঘরের মেঝের দিকে মুখ নীচু করিয়া তাকাইয়া মাঝে মাঝে দু-একবার কাশিতেছিল। ধীরে ধীরে বলিল—এই জন্যেই তোমায় ডেকেছিলুম, আর কোন কিছু নয়। আচ্ছা, তাই-ই করব।

ও-ঘরে ছেলেটা আবার কাঁদিয়া উঠিয়াছে, মাধুরী এক-পা দু-পা করিয়া করিয়া চলিয়া গেল।

বহুকাল পরে গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে একটি নূতন অনুভূতিতে দিবাকরের মন ভরিয়া উঠিল। তাহারও পরিবর্তন হইয়াছে, গ্রামেরও পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু এত দিন পরেও যেন পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিতেছে। এই গ্রামে সে অনধিকারপ্রবেশ করিতেছে, এমন কথা তাহার মনে হইল না, বরং কত যুগ আগেকার শৈশব-স্মৃতিগুলিই অন্তরে এক-এক করিয়া জাগিয়া উঠিতে থাকিল।

দিবাকর হালদার-বাড়ি ছাড়াইয়া গেল; নবীন দাসের পানাপুকুর পার হইয়া মা ভবতারিণীর মন্দির। বহুদিন পূর্ব্বেই মন্দির হইতে ইট খুলিয়া খুলিয়া পড়িতেছিল, এখন তাহার আরও জরাজীর্ণ অবস্থা। মন্দিরের মাথার উপর দিয়া একটি বিশাল বটগাছ ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে। দিবাকর মা-ভবতারিণীর উদ্দেশে দুই হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিল।

এখনই কাহারও সঙ্গে দেখা হয়, ইহা দিবাকর চাহিতেছিল না। চুপে চুপে যথাসম্ভব এক-একটি বাড়ির পিছন দিয়া, যে-সব পথে বেশী লোকজন সর্ব্বদা চলাচল করে না এমন পথ ধরিয়া নিজের বাড়ির দিকে চলিতেছিল।

কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও নরেশ-কাকার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

দিবাকর নরেশ-কাকাকে দেখিয়াই চিনিয়াছে, কিন্তু নরেশ প্রথমটা বুঝিতেই পারেন নাই। প্রণাম করিয়া দিবাকর পরিচয় দিতেই নরেশ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—আরে! এত কাল পরে বাড়ি এলি দেবা? তা তোর একি ছিরি হয়েছে রে? অসুখ-টসুখ না কি? তোকে যে মোটে চেনারই জো নেই!

নরেশ-কাকার কথার দুই-চারিটা উত্তর দিয়া তাঁহার কৌতূহল যথাসম্ভব প্রশমিত করিয়া দিবাকর পুনরায় চলিতে থাকিল। আর বেশী দূর নয়!

নিজের বাড়ির উপরে আসিয়া যখন দিবাকর দাঁড়াইল, তখন স্বর্ণ-ঠাকুরাণী ঘরের বারান্দার উপরে বসিয়া বসিয়া একখানা কাঁথা সেলাই করিতেছিলেন। সহসা দিবাকরকে দেখিয়া কাঁথা, ছুঁচ, মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

—ওমা, দেবা' যে! ওমা—কতকাল পরে তোকে দেখলুম! আয় বাছা আয়, সঙ্গে আর কে?

দিবাকর বারান্দায় উঠিতে উঠিতে উত্তর দিল—আর কেউ নয় সন্নোদিদি, আমি একলাই।

ঘরের ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি একটা মাদুর আনিয়া বারান্দায় বিছাইয়া দিয়া স্বর্ণময়ী বলিলেন—ব'স্ বাছা, ব'স্। পাখা এনে দি···

স্বর্ণদিদি পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া একখানা পাখা আনিয়া দিবাকরের হাতে দিলেন,—শার্টের বোতাম খুলিতে খুলিতে দিবাকর নিজেকে হাওয়া করিতে লাগিল।

দিবাকরের মুখের দিকে তাকাইয়া স্বর্ণদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই কি কোন ব্যামোতে ভুগছিস দেবা? তোর সেই অমন মোটা-সোটা নাদুস্-নুদুস্ শরীর তা কোথায় গেল?

দিবাকর হাসিয়া বলিল—আচ্ছা সে-সব পরে হবে সন্নোদিদি, এখন তুমি আমায় এক গ্লাস খাবার জল এনে দাও দেখি!···

রাত্রে দিবাকর সকল কথাই খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া স্বর্ণদিদি বলিলেন—তা বেশ ক'রেছিস্ বাপু। তিনটে মাস থাক, কবরেজ যে ওষুধ দিয়েছে নিয়ম-মতন খা, মা-ভবতারিণী তোকে অবিশ্যিই ভাল করবেন।··· বৌমাও যদি আস্‌ত, তা হ'লে বেশ হ'ত, বড় দেখতে ইচ্ছে হয়। অসুবিধে আর কিই-বা হ'ত, তোরা সবাই মিলে এই ঘরে থাকতিস্, আমি না-হয় ওই ঘরে গিয়ে থাকতাম।

দিবাকর নিয়ম-মত কবিরাজী ঔষধ খাওয়া সুরু করে। দুপুরের ঔষধটা কেবল মাত্র মধু দিয়া খাইতে হয়, তেমন কিছু হাঙ্গামা নাই। দিবাকর নিজেই সেটা পারে; কিন্তু সকালে, বিকালে এবং রাত্রে স্বর্ণদিদির সাহায্য লইতে হয়।

সকালবেলাকার পাঁচনের উপকরণগুলি সে কিনিয়াই লইয়া আসিয়াছিল। সেগুলি বাছিয়া ওজন করিয়া পৃথক পৃথক মোড়কে এক-এক দিনের মত দিবাকর বাঁধিয়া রাখে। স্বর্ণদিদিকে বলিল—তোমাকে কিন্তু এই ক'টা দিন একটু বিরক্ত করব সন্নোদিদি। আমার ওষুধ-পত্তরগুলি তোমার একটু গুছিয়ে-টুছিয়ে দিতে হবে।

স্বর্ণদিদি উত্তর করিলেন—ওমা, বিরক্ত হব সে আবার কি কথা? তোর যখন যা ক'রে দেবার দরকার হবে সবই আমায় বলবি। মুড়িতে গুড় মাখিয়ে, শশা কেটে, নারকেল কুরিয়ে কত খেতে দিয়েছি, মনে নেই? পুলীপিঠে তৈরি ক'রে দেবার জন্যে দিন-রাত আমায় কত জ্বালাতন করতিস্, সব ভুলে গেছিস্ বুঝি? সেই দেবা আমার এখন ভদ্দন্নোক হয়েছেন!···

দেড় সের জল এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া পরিষ্কার একখণ্ড ন্যাকড়া দিয়া ছাঁকিয়া স্বর্ণদিদি পাঁচনটা আনিয়া দিবাকরের হাতে দিলেন। খাইতে বিশ্রী তেতো এবং কটু, কিন্তু দিবাকর সযত্নে পাঁচনের বাটিটা তুলিয়া ধরিয়া তলানিটুকু পর্য্যন্ত গলার ভিতরে ঢালিয়া দিল।

বিকালের ঔষধটা খাইতে হয়, চালকুমড়ার রস দিয়া। দিবাকর গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহু কষ্টে চালকুমড়া জোগাড় করিয়া লইয়া আসিল। স্বর্ণময়ীই ছেঁচিয়া রস বানাইয়া দিলেন।

রাত্রের জন্য কবিরাজ বুকে একটি মালিশের ঔষধ দিয়াছেন। ঔষধ মালিশ করিয়া আকন্দ-পাতা আগুনের উপর অল্প গরম করিয়া তার পরে বুকে সেক দিতে হইবে। ইহাতে ত স্বর্ণদিদির সাহায্য লওয়া ছাড়া উপায়ই নাই!

দিবাকরের বুকে মালিশটা লাগাইয়া দিতে দিতে স্বর্ণদিদি বলিলেন—বুকের পাঁজরাগুলো একেবারে বেরিয়ে পড়েছে—আহা! যাবে, ভাল হ'য়ে যাবে, কিছু তুই ভয় করিস্ নে দেবা! মা-ভবতারিণী, তুমি আমার দেবাকে ভাল ক'রে দাও—।

এই মুহূর্ত্তে সহসা মাধুরীর কথা দিবাকরের মনে পড়িল, অকারণে বুকের ভিতরটায় একটা মোচড় দিয়া উঠিল।

ঔষধ খাওয়া প্রত্যহ চলিতে থাকিল।

কিন্তু একদিন দিবাকরের দিকে তাকাইয়া স্বর্ণদিদি বলিলেন—আজ প্রায় ছুটি মাস কেটে গেল দেবা, কিন্তু কই, চেহারা ত তোর মোটে ফেরে না! আরও যেন বেজায় কাবু হ'য়ে যাচ্ছিস, আর কাশিটাও ত কিছুতেই কমছে না।

দিবাকরও নিজের শরীরের অবস্থা বেশ বুঝিতে পারে। বলিল—তাই ত সন্নোদিদি, কি যে করি তাও ত বুঝি না।…

হঠাৎ কাশি আসিল। কাশিতে কাশিতে দিবাকরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। বলিল—সন্নোদিদি, একটা শিশিতে কালো মতন কতকগুলি বড়ি আছে। ওরই একটা বড়ি আমায় শীগ্‌গীর এনে দাও ত—

স্বর্ণদিদি তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর যান্; কিন্তু দিবাকর যেটা চায়, সেটা তিনি ঠাহর করিতে পারেন না। দু-তিনটা শিশি আনিয়া দিবাকরের হাতে দিলেন, দিবাকর বাছিয়া একটি শিশি হইতে একটি বড়ি বাহির করিয়া মুখে পুরিয়া চুষিতে থাকিল। কিন্তু তবুও কাশি দমন হইল না।

স্বর্ণদিদি বলিলেন, কবরেজকে বরং একখানা চিঠি লিখে দে, দেবা, শরীরের সব কথা জানিয়ে। তিনি যদি নতুন ব্যবস্থা কিছু করেন—

—নতুন ব্যবস্থা আর কি-ইবা ক'রবেন, যে-ওষুধপত্র দিয়েছেন এ সবই অন্ততঃ মাসচারেক খেতে বলেছেন। এখন ত সবে ছুটি মাস হ'ল। আর আছিই বা কত দিন। দিন-পনর-বিশের ভেতরেই তো চলে যেতে হবে, সামনে গিয়েই দেখানো যাবে।

—চ'লে ত যাবি বাছা, কিন্তু—

কিন্তু বলিয়া স্বর্ণদিদি থামিয়া আছেন দেখিয়া দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু কি?

—না বলছিলাম যে তোর শরীরের দিকে তাকিয়েই যে মনে শান্তি পাচ্ছি নে। আমি বলি কি, চাকরি-বাকরি ক'রে এখন আর তোর কাজ নেই। প্রাণে বাঁচলে সব হবে। অসুখের জন্যে একটু ভাল রকম চেষ্টা-চরিত্তির কর।

—ভাল রকম চেষ্টা-চরিত্তির আর কি করব তাই বল।

—আমি আর সে-কথা কি বা বলি, কবরেজকে আবার দেখিয়ে তিনি কি ব্যবস্থা করেন সেইটেই ত জান্‌বার দরকার।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া স্বর্ণদিদি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ রে দেবা, বৌমার চিঠি-টিঠি পাস্? কেমন আছে ওরা সবাই?

দিবাকর চুপ করিয়া থাকিল।

—কিরে, কথা বলছিস্ না যে?

ধীরে ধীরে দিবাকর উত্তর দিল—না সন্নোদিদি, ওদের কোনো চিঠিপত্রই আমি পাই নে।

স্বর্ণদিদি বিস্ময় বোধ করিয়া বলিলেন—ওমা এত দিনের ভেতরে চিঠি পাস্ নি, সে কেমন কথা? তুই লিখেছিস্ ত?

—হ্যাঁ সন্নোদিদি, একখানা নয় পর-পর কয়েকখানা লিখেছি।

মুখ নীচু করিয়া পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া দিবাকর উঠানের মাটি খুঁড়িতে থাকিল।

দিবাকরের ছুটি ফুরাইয়া আসিল।

রওনা হইবার সময়ে স্বর্ণদিদি দিবাকরের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন—মা-ভবতারিণীকে আমি সর্ব্বদা ডাকছি, তিনি তোকে নিশ্চয়ই সুস্থ ক'রে দেবেন। আর ভাল হ'য়ে মাঝে মাঝে আসিস্ বাছা। তোর মুখখানা দেখে যে কত শান্তি পেয়েছি, তা বল্‌তে পারি নে। এবারে যখন কোনদিন আস্‌বি—বৌমাকে, ছেলেমেয়ে ছুটোকে নিয়ে আস্‌বি—

দিবাকর একটু হাসিল।

বাসায় ঢুকিবার পূর্ব্বেই রাস্তার উপর বনমালী বাবুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। বনমালী বাবু বলিলেন—এই যে দিবাকর, কেমন আছ?

—আজ্ঞে তত সুবিধার নয়।

—তা চেহারা দেখেই বুঝ্‌তে পারছি। তোমার এখন বাড়ি থেকে চলে আসাটা মোটেই ঠিক হয় নি!

দিবাকরের শরীরের অবস্থা দেখিয়া বনমালী বাবু অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিলেন। গাল একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, চোখ দুটি যে কোথায় গিয়া ঢুকিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আর থাকিয়া থাকিয়া ঐ কুৎসিত কাশি!

দিবাকর বলিল—না এসেই বা কি করি। ছুটিও ফুরিয়ে গেল, কবরেজকেও আবার দেখানো দরকার—

এবারে মাথা চুলকাইয়া বনমালী বাবু বলিলেন—এলে ত, বাসায়ই যে কেউ নেই! আমি একলা শুধু ঠাকুর আর ঝিটাকে নিয়ে আছি। সেদিন আমার শালা এসেছিল, ওদের সবাইকে সে মাস-দেড়েকের জন্যে তার কাছে নিয়ে গেল। আমি আছি সে এক মহা বিভ্রাটের ভেতরে। তোমার ত অসুবিধার একেবারে চরম হ'বে। ওরা থাক্‌লে বরঞ্চ এক রকম হ'ত। না হে বাপু, তুমি রোগা মানুষ, সকল সময় তোমার ঠিক-মতন তদারক হওয়া চাই, বাসায় গিয়ে আর কাজ নেই।...বনমালী বাবু পুনরায় মাথা চুল্‌কাইলেন—তুমি বাড়িতেই ফিরে যাও আবার। কবরেজ যা বলে শোন গে, আর—

বনমালী বাবু পকেটে হাত দিলেন, একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিবাকরের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—এই টাকাটা রাখ। দরকার মতন—

দিবাকর একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিল, বুঝিতে পারিল, তাহার বাসায় যাওয়াটাকেই বনমালী বাবু পছন্দ করিতেছেন না। নতুবা উঁহারা কেহ না থাকিলেই বা কি? বাড়ি হইতে এতদিন পরে আসিয়াছে, অন্ততঃ বিশ্রামের জন্যেও ত তাহাকে একটি কি দুটি দিন থাকিয়া যাইতে বলা উচিত!

মাধুরী কেন তাহার চিঠির উত্তর দেয় নাই, মামার নিকট যাওয়ার উপরে কারণটি আরোপ করিতে দিবাকর চেষ্টা করিল। কিন্তু মামার কাছে গিয়াছে ত সেদিন, এত দিন কেন মাধুরী চিঠি দেয় নাই? আর মামার কাছে গেলেই বা কি, তাহাতে চিঠি লিখিবার বাধা কোথায়? তাহার এমন অসুস্থতা, একটু খোঁজ লইবারও কি ইচ্ছা হয় না?

বুদ্ধিমান দিবাকর মাধুরীর মনের গতি বুঝিতে পারিল। মুহূর্ত্তের জন্য মাধুরীর, মীরার, খোকনের মুখগুলি স্মরণ করিয়া তাহার অন্তর বেদনাতুর হইয়া উঠিল।

বনমালী বাবু বলিলেন—এখন তা'হলে কবরেজ-বাড়িই যাও দিবাকর—

তাহ'কে এড়াইবার জন্য শ্বশুর-মহাশয়ের এত বেশী গরজ দেখিয়া দিবাকর সত্যই দুঃখিত না-হইয়া পারিল না। কিন্তু আর বেশী কোন কথা বলিতে তাহার প্রবৃত্তিও হইতেছিল না। ওই অবস্থায়ই সে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

রাস্তার মোড় ঘুরিতেই হঠাৎ বাসার ঝি কাদুর সঙ্গে দেখা। কাদু বাজার হইতে ফিরিতেছে, হাতে ঝুড়িতে বাজারের সওদা।

—ওমা দাদাবাবু যে! কখন এলে?

দিবাকর উত্তর দিল—এই ত একটু আগে। ভাল আছিস্ ত?

—এই চলে যাচ্ছে, এক রকম। আমাদের আবার ভাল থাকা আর মন্দ থাকা। তা এখনই চলেছ কোথায়? তোমার চেহারা ত বেজায় খারাপ হয়ে গেছে দাদাবাবু! কবরেজ এখন কি বলছে?

—কবরেজের কাছেই ত যাচ্ছি।

হাসিয়া কাদু বলিল—খোকনমণিকে কেমন দেখলে দাদাবাবু? তোমার কোলে এল না? উঃ, যা দুরন্ত হয়েছে! হামাগুড়ি দিতে শিখেছে—চার হাত পায়ে এমন ছুটবে, ওর সঙ্গে পারে কার সাধ্যি? গায়ে আবার জোরও হয়েছে বাবুর! কালকে রাত্তিরে খাটের ওপর থেকে মীরাকে মাটিতে ফেলে দেবার জন্যে কি চেষ্টা! আমরা ত হেসে বাঁচি নে!

দিবাকর স্তব্ধ হইয়া কাদুর কথা শুনিতেছিল। এক মুহূর্ত্তের ভিতরে সে সমস্ত বুঝিল।

শ্বশুর-মহাশয়ের উপরে এতটুকু আক্রোশের ভাব তাহার মনে জাগিল না, কিন্তু তার মাধুরী—?

কাদুকে কোনো কথাই সে জিজ্ঞাসা করিল না, এমন কি তাহার মুখ-চোখের চেহারা দেখিয়া কাদু পাছে কিছু সন্দেহ করে এই ভয়ে দিবাকর নিজেকে সম্পূর্ণ সংযত করিয়া অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে বলিল—দেখ কাদু, তুমি একটা

কাজ কর ত, বাসায় গিয়েই মীরাকে পাঠিয়ে দিও। খোকনকে যেন কোলে ক'রে নিয়ে আসে। বাসায় পৌছতেই মীরা বলেছে তার ছটো পুতুল ভেঙে গেছে, খোকনমণির ঝুমঝুমি নাই, আর কত ফরমায়েস! বাজারের পাশেই ত কবরেজের বাসা, বাজার থেকে মীরাকে সব কিনে দেব'খন্, আর ওদের সঙ্গে করেই কবরেজের বাড়ি থেকে ঘুরে আসব'খন্।

কাহু পা বাড়াইল। দিবাকর বলিল—হ্যা, ওর মা যদি আবার বারণ করে, তুমি শুধু চুপি চুপি মীরাকে ডেকে খোকনকে কোলে দিয়ে আমার কথা ব'লে পাঠিয়ে দিও, বুঝেছ?

কাহু একবার পা বাড়াইয়া আবার ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—মাঘ মাসের একুশে তারিখে খোকনমণির মুখে ভাত, শুনেছ ত? আমায় কিন্তু বখশিশ্ দিতে হবে দাদাবাবু। একজোড়া কাপড়ের কমে ছাড়ছি না।

দিবাকরও হাসিতে চেষ্টা করিল। বলিল—দেব বইকি কাহু, নিশ্চয় দেব।

—হ্যা, মনে থাকে যেন···

কাহু চলিয়া গেল। দিবাকর রাস্তার দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল।

পাঁচ-সাত মিনিট কাটিয়া যায়, কিন্তু কেহই আসিল না। দিবাকর তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল।

আধ ঘণ্টা খানেকের ভিতরেও যখন কেহ আসিল না, দিবাকর এক পা দুই পা করিয়া রাস্তা দিয়া একটু আগাইয়া আসিল। বাসা দেখা যায়, কিন্তু আর কাহাকেও দেখা যায় না।

দিবাকর আরও কিছু ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের রেখা ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু বহু ক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন মীরা আসিল না, দিবাকর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া গেল; হয়ত বা চক্ষু দুইটি একটু সিক্ত হইয়া উঠিল!

কবিরাজের বাড়িতে আর দিবাকর গেল না। দশ টাকা করিয়া সপ্তাহ, চালাইবারও উপায় নাই—আর এই কবিরাজের উপর বিশ্বাসও তাহার কিছু কমিয়া গিয়াছে।

আশুবাবু নামজাদা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। শহরের কোনো য়্যালোপ্যাথও তাঁহার মত যশ অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। দিবাকর আশুবাবুর বাড়ির দিকে যাইতে লাগিল। ডাক্তারও ভাল, আর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় খরচও কম।

সমস্ত শুনিয়া আশুবাবু ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। আশুবাবুর ডিস্‌পেন্সারী হইতেই দিবাকর ঔষধ কিনিয়া লইল। বাহির হইয়া আসিবার আগে অল্প একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু? ভাল হব ত?

আশুবাবু ঘাড় কাৎ করিয়া বলিলেন—অবিশ্যি। ভয় কিছু নেই, তবে হ্যা, একটু সাবধান।

আশুবাবুর বাড়ি হইতে দিবাকর সোজা ইস্কুলে আসিল। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—কিছু মনে কর্‌বেন্ না দিবাকর বাবু, কাজ থেকে আপনার জবাব দিতে হবে। আপনার যে ব্যাধির কথা শুনলাম, এতে আপনাকে আর রাখতে পারি নে এবং এই কথা জানাবার জন্যে সেক্রেটারীও আমায় সেদিন খবর পাঠিয়েছিলেন।

দিবাকরের মুখ শুকাইয়া গেল। বলিল—যদি আমা'কে আর কিছু দিনের ছুটি দিতেন স্যর, অন্ততঃ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তাম। এই অবস্থায় এখন যদি আমায়—

—তা আমি আর কি কর্‌তে পারি দিবাকর বাবু? আমার কোনো হাত নেই। আপনাকে তিন মাসের ছুটি পুরো মাইনেয় দিয়েছি। আর ছুটি দেওয়া অসম্ভব। এতে ইস্কুলের কাজে বিশৃঙ্খলাও হয়, আর ইস্কুলের আর্থিক অবস্থাও—

কাতর ভাবে দিবাকর কহিল—পুরো মাইনে আমি চাই নে, দয়া ক'রে যদি অর্দ্ধেক মাইনেতেও—

হেড্‌মাষ্টার একটু অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন—আপনি বুঝতে পারছেন না দিবাকর বাবু। আপনার ওই ব্যাধিটাই যে সব গোলমাল করছে। আপনার যা শরীরের অবস্থা দেখ্‌ছি, এতে আপনি নিজেই যে কাজ করতে পারবেন না। আর আপনাকে আমরা য়্যাল'উই বা করি কি ক'রে? দশ বিশ দিন বা এক মাসের ছুটিতে আপনার

কিছুই হবে না। আপনার জন্যে আমি বড়ই দুঃখিত হচ্ছি দিবাকর বাবু, কিন্তু কোন উপায় নেই। আমি আপনাকে বলি, এখানকার প্রভিডেণ্ট্ ফাণ্ডের টাকাটা আপনি তুলে নিয়ে যান্—তা সে যা-ই হোক্ না কোন, নিয়ে গিয়ে ওরই ভেতর নিজের যথাসম্ভব চিকিৎসার বন্দোবস্ত করুন।

দিবাকর আর কোনো কথাই বলিতে পারিল না। চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

* * *

স্বর্ণময়ী বলিতেছেন, তা ভালই করেছিস দেবা, ফিরে এসে। একেবারে মড়ার হাল হয়েছে, এই শরীর নিয়ে কেউ খাটুনীর কাজ ক'রতে পারে? চাকরিতে জবাব দিয়ে এসেছিস্, তাতে কি হ'য়েছে? মা-ভবতারিণীর দয়ায় সেরে উঠ্‌লে, অমন চাকরি আবার পাবি। তুই মন খারাপ করিস্ নি বাছা।

দিবাকর বলিল—না সন্নোদিদি, মন আর কি খারাপ ক'রব, তবে আবার চলাও তো চাই! তবুও যাহোক কটা টাকা পাচ্ছিলাম, কিন্তু এখন যে আর উপায় নেই। কে আমায় সাহায্য ক'রবে?

—তা বাবা এই অবস্থায় শ্বশুর কি আর কিছু না-ই ক'রবেন? অবিশ্যিই ক'রবেন। এত দিন তাঁর কাছেই ত থাক্‌লি!

স্বর্ণদিদি অবশ্য সরল মনেই বলিলেন, কিন্তু সেখান হইতে কোন সাহায্য প্রার্থনা করিবার কথা ভাবিতেও দিবাকর মনের ভিতরে কেমন একটা গ্লানি অনুভব করে। কিন্তু তাই বলিয়া সে মাথাটাকে প্রথমেই খারাপ করিয়া বসে না।

আশুবাবুর দেওয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিশ্বাসের সহিত খাইতে থাকে। কখনও কখনও কলিকাতায় গিয়া এক জন বড় ডাক্তার বা কবিরাজকে দিয়া দেখাইবার ইচ্ছা মনে জাগে; কিন্তু পরক্ষণেই সে-চিন্তা সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া দেয়। কলিকাতা যাওয়া এবং থাকার খরচ, ডাক্তারের ফি, ঔষধপত্র, বড় ডাক্তারের বড় ফরমায়েশ …অসম্ভব!

তা আশু ডাক্তারই বা কম কিসে? বঙ্কিম মোক্তারের অতবড় অসুখ, তা শেষে আশুবাবুর হাতেই ত সারিল! সে ত কলিকাতাও গিয়াছিল, পয়সাও ঢালিয়াছিল দুই হাতে; কিন্তু কই, কলিকাতার ডাক্তাররা ত কিছুই করিতে পারিলেন না, শেষকালটায় ত এক রকম জবাবই দিয়া দিলেন!

আশুবাবুর দেওয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুঁড়া শিশি হইতে কাগজের উপর মাত্রা ঠিক করিয়া দিবাকর ঢালিয়া লইল; মুখের ভিতর ফেলিয়া জিহ্বা দ্বারা চাটিতে চাটিতে মনকে প্রবোধ দিতে থাকিল।

কিন্তু কিছুই হইল না!

দিবাকরের শরীর যেন ক্রমেই ভাঙিয়া পড়িতে চায়। কাশিতে কাশিতে বুক পিঠ বাঁকা হইয়া আসে, পেটের নাড়িগুলি ছিঁড়িয়া আসিবার উপক্রম করে। গায়ে জ্বর সর্ব্বক্ষণ লাগিয়া আছে। সন্ধ্যার দিকে দিবাকর বেহুঁসের মত বিছানার উপর পড়িয়া থাকে।

পাড়ার ভিতরে নরেশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লোক, তাঁহার বিজ্ঞতার উপরেও সকলের আস্থা।

স্বর্ণ-ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ নরেশ, দেবা যে বড় ভাবনার ভিতরে ফেলল। কি করা যায় বল দেখি!

নরেশ প্রথমটা কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পরে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন—আসল কথা বলতে কি সন্নো? এ-সব শিবের অসাধ্য ব্যাধি। তবে ভাগ্যের জোর থাক্‌লে সেরেও যায়, একেবারে যে না-সারে এমন না। এই ত ধর না কেন, আমার খুড়ো-মশায়েরই ত এই ব্যাধি ছিল। তা তিনি সম্পূর্ণ সারেন নি বটে কোনোদিন, তবে একেবারে ভেঙেও পড়েন নি। একটু-আধটু উপসর্গ থাকতই, মাঝে মাঝে আবার ভালও থাকতেন! ওই নিয়েই ত পঁচাশী বছর তিনি বেঁচেও গেলেন—ছেলে, মেয়ে, বউ নিয়ে ঘর-গেরস্তালী ক'রেই!

—কিন্তু দেবা যে ক্রমেই শয্যে-ধরা হ'তে চ'লল।

—তাই ত সন্নো, কি করা যায়।

—তুমি না-হয় যেয়ো বাবা একবার বাড়ির ওদিকে। দেবাকে একটু দেখে এস।

—যাব'খন্; তবে আজকে ত আর পারব না। নায়েব-কাছারীতে একটু যেতে হবে, লাটের কিস্তির তারিখ আবার। কাল সকালের দিকে যাব।…

একদিন কাহার নিকট হইতে নরেশ যশোরের কোন

এক ভদ্রলোকের খবর স্বর্ণর নিকটে আনিয়া হাজির করিলেন। বলিলেন—আমার মনে হয় এটা একবার দেখলে মন্দ হয় না।

স্বর্ণময়ী বলিলেন—আমার তো কোনই আপত্তি নেই, দেবা মত ক'রলে হয়।

—এতে আর অমত করবার কি আছে? সে ভদ্রলোক নাকি অনেককেই সারাচ্ছেন শুন্‌লাম। তিনি কতকগুলো শেকড় দেবেন, পনের দিন তাই রোজ বেটে খেতে হবে। এটায় এমন খরচ কিছু নয়, হাঙ্গামাও নেই। কার কিসে যে কি হয়, বলা ত যায় না! ব'ল তুমি দিবাকরকে।

রাত্রে দিবাকর বসিয়া রুটি খাইতেছে। স্বর্ণময়ী আস্তে আস্তে তাহার পাশে আসিয়া বসিলেন।

—একটা কথা, দেবা।

দিবাকর মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি কথা সন্নোদিদি?

—নরেশ বলছিল, সে কা'র কাছে শুনেছে যশোরের এক জন ভদ্রলোক নাকি এই ব্যামোর ভাল চিকিচ্ছে ক'রছেন, অনেককে সারিয়েছেন। তাঁর ওষুধ হচ্ছে কতকগুলি শেকড়, মাত্তর পনর দিন খেতে হবে। আমি বলি কি, এটা একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে হয়। তুই কি মত করিস্?

একখানা রুটি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে দিবাকর বলিল—আমার ত অমত কিছু নেই, তবে কেমন ক'রে বা সেই ওষুধ আনান যাবে, আর খরচ-টরচ—

—সে সবের জন্যে তোর বেশী ভাব্‌না ক'রতে হবে না। সে ভদ্রলোক মোটে নাকি পাঁচটি টাকা নিয়ে থাকেন। আর তাঁর কাছে নাকি কারও নিজে গিয়ে ওষুধ নিয়ে আস্‌তে হবে, ডাকে তিনি পাঠান না। কিন্তু তাও আমি ভেবে রেখেছি। হালদার-বাড়ির বিনোদ ত নিষ্কর্ম্মা হয়েই বাড়িতে ব'সে থাকে, আমি ভাবছি ওকেই ব'লে-ক'য়ে পাঠাব। তুই বাবা এই কটা টাকা খরচের জন্যে ভাবিস্ নি। এমন সাংঘাতিক ব্যামো যদি ভাল হ'য়ে যায়—

দিবাকর মত করিল। স্বর্ণদিদি দিবাকরের পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া মানৎ করিলেন, আমার দেবাকে তুমি ভাল ক'রে দাও মা-ভবতারিণী, আমি তোমার পুজো দেব।

একটু পরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন — হ্যাঁরে দেবা, বৌমার চিঠি-পত্তর পাস্ নে?

দিবাকর মুহূর্ত্তের জন্য স্বর্ণদিদির মুখের দিকে তাকাইয়া চোখ নামাইয়া লইল। কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাটির ভিতরে গরম দুধটা আঙুল দিয়া নাড়িতে নাড়িতে ধীরে ধীরে বলিল—তারা ত ওখানে নেই সন্নোদিদি, মামার কাছে গেছে। এক শ্বশুরমশায় ছাড়া বাসায় আর কেউই নেই। আর বোয়েরও চিঠি-পত্তর লিখবার অভ্যেস আবার একটু কম কিনা! তা পেয়েছি, একখানা চিঠি এই ত কিছু দিন আগে পেলাম। ভালই আছে ওরা।

কথাটা বলিতে গিয়া দিবাকরের বুকের ভিতরটা টাটাইয়া উঠিল। তবু ইচ্ছা করিয়াই মিথ্যা কথা বলিল। স্বর্ণদিদির মনে কোন বিস্ময় জাগিয়া উঠিবার আগে, কোনো হা-হুতাশের কথা শুনাইবার আগে, আজ সে কোনগতিকে কথাটা এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিল।

বাহিরে আসিয়া মুখ ধুইয়া জলের ঘটিটাকে হাতে করিয়াই দিবাকর কিছু ক্ষণের জন্য সম্মুখের অন্ধকারের দিকে স্তব্ধ হইয়া তাকাইয়া থাকিল। একুশে মাঘ, তার খোকনের অন্নপ্রাশন!…

তিন-চারি দিন পরে বিনোদ যশোর হইতে ফিরিয়া আসিল। ঔষধ স্বর্ণময়ীর হাতে দিতে দিতে বলিল—যত্ন ক'রে তুলে রেখে দাও সন্নো-মাসি। সকালবেলা উঠে কাপড় ছেড়ে তুলসীজল মাথায় ছিটিয়ে তুমি বেটে রেখে দেবে, দিবাকর চান্ ক'রে ভিজে কাপড়েই পূবের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে ওষুধটা খেয়ে ফেল্‌বে। পনর দিন। এই নাও, ধর—

ঔষধ হাতে লইতে লইতে স্বর্ণময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—তোর বাছা কষ্ট হয় নি ত কোন?

—সে কথা আর কেন বল মাসি, দুর্ভোগ কিছু গেছে বইকি,…

বিনোদ হাত-মুখ ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল, যাওয়ার দিন অবিশ্যি তেমন কিছু অসুবিধে হয় নি; কিন্তু ফেরবার সময়েই সব চিত্তির ক'রে ফেল্‌লাম। ওই গাঁ থেকে বেরিয়ে

মাইলখানেক দূরে বাজারের ওপর এসে চ'ড়তে হয় মটোরে। মটোরে আট্ মাইল এসে তবে ইস্‌টিসান। শালার ম.টারই দিলাম ফেল মেরে। কিন্তু বিনোদ হাল্‌দার মোটে সেই বান্দাই নয় যে আবার ফিরে গিয়ে ভদ্দর লোককে উৎপাত কর্‌বে। পা তো নয় মাসি, যেন বজ্‌রা নৌকো! দিলাম চালিয়ে। সে ট্রেন আর ধর্‌তে পার্‌লাম না। মাঝ রাত্তিরের আগে আর ট্রেনও নাই। কিন্তু এ বাবা বিনোদ হালদার, ইস্‌টিসানে সিঁট্‌কে প'ড়ে থাক্‌বার পাত্তর নয়! খানিক পরেই এল এক মাল গাড়ী। তা পরে বুঝ্‌লে মাসি,—

হাসিয়া বিনোদ বলিতে থাকে, দিলাম হাতে গুঁজে আট গণ্ডা মুদ্রা। এর নাম বাবা রূপচাঁদ, পেছন দিক দিয়ে সুড়্ সুড়্ ক'রে নিলে গার্ড্ বেটা আমায় তুলে। তা পরে রাণাঘাটে এসে আর ট্রেনের অভাব কি? যে একটা টাকা বাঁচ্‌লো, রাণাঘাটে এসে এক মেঠায়ের দোকানে ঢুকে,—

হাসিয়া বিনোদ বলে,—বুঝলে ত মাসি?

তা যা ক'রেছিস্ বাপু ক'রেছিস্, এখন এই কষ্ট আর পয়সাবায় সার্থক হয় যদি দেবা আমার এই ঔষধে উপ্‌কার পায়—

—কিছু ভয় নেই সয়োমাসি, সুরু ক'রে দাও ভরসা ক'রে। সেরে যাবে।

—এই কথাই বল্ তোরা সকলে বাছা।

নরেশ পঞ্জিকা দেখিয়া একটি শুভদিন ঠিক করিয়া দিলেন, স্বর্ণ সেইদিন হইতে দিবাকরকে ঔষধ খাওয়াইতে সুরু করিলেন।

স্নান করিয়া আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দিবাকর পূবমুখী হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কপালে ঔষধের বাটিটা একবার ছোঁয়াইয়া স্বর্ণময়ী বলিলেন—ভক্তি ক'রে খেয়ে ফেলে দে বাবা।

দিবাকর ঔষধটা গিলিয়া ফেলিবার সময়ে অনুভব করে যেন গলা হইতে পেট পর্য্যন্ত একেবারে জ্বলিয়া উঠিল।

কয়েক দিন ঔষধ খাইবার পরেই হঠাৎ একদিন এমন জোরে জ্বর চড়িল আর সারা শরীরে এমন একটা অসহ্য যন্ত্রণা হইল যে দিবাকর একেবারে পাগলের মত বকিতে সুরু করিয়া দিল। কাটা-ছাগলের মত ছট্‌ফট্ করিতে থাকিল। পর-পর তিন চারি দিন কাটিয়া গেল, তবুও উপশম হইল না।

স্বর্ণময়ী শুষ্কমুখে বিনোদের কাছে গিয়া ঔষধ খাওয়ানোর পরে দিবাকরের যে অবস্থা হইয়াছে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়াই, বিনোদ তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল—ওঃ, বল্‌তে ভাহা ভুল হ'য়ে গিয়েছিল মাসি, এই ওষুধ খাবার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম ঠাণ্ডা জিনিষ খেতে হবে, ভদ্দরলোক ত ব'লে দিয়েছিলেন! ঠাণ্ডা জিনিষ মানে ধর এই যেমন —ঘোল, ডাবের জল, মিছরীর পানা…এই সব। আর খালি ওষুধ-খাওয়ার সময়ে নয়, সন্ধ্যেবেলায়ও আর একবার চান ক'র্‌তে হবে। ওষুধটা নিশ্চয়ই বড় বদরাগী…

তা একথা আগে বল্‌তে হয়। মানুষের জীবন নিয়ে খেলা ত নয়! তোর খেয়ালটাই একটু কম বাপু…

বিরক্তির সঙ্গে বিনোদকে তিরস্কার করিয়া আসিয়া স্বর্ণময়ী যথোপযুক্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

দিবাকরের মনের ভিতরে বার-বার জাগিয়া উঠে, একুশে মাঘ তার খোকনের অন্নপ্রাশন! ছোট্ট ফুট্‌ফুটে সেই কচি মুখখানি দিবাকরের মনের প্রত্যেকটি অলি-গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাদু বলিল, খোকন বড়ই দুষ্টু হইয়াছে। দিবাকরের চোখের সামনে যেন ভাসিয়া উঠে মাধুরী বসিয়া হয়ত চুল বাঁধিতেছে। খোকন কিছুতেই যেন মীরার কোলে থাকিবে না—মায়ের কাছে আসিবেই! মীরা ওর মতলব বুঝিয়া ঝুপ্ করিয়া মাটিতে নামাইয়া দিল। হামাগুড়ি দিয়া আগাইয়া আসিয়া পিঠ বাহিয়া বাহিয়া মায়ের কাঁধের উপর হাত দিয়া খোকন দাঁড়াইল। তাহার পরে কতকগুলি চুল মুঠির ভিতরে লইয়া এমনভাবে টানিতেছে যে, মাধুরী চীৎকার করিয়া উঠিল—উঃ, কি দস্যি ছেলে মাগো, চুলটাও বাঁধ্‌তে দেবে না! তার পরে যেন মীরাকে অনুনয় করিয়া বলিল—লক্ষ্মীটি ওকে একটু নাও—

মীরা বলিল—নিয়েছিলামই ত, তা বাপু কিছুতেই কোলে থাক্‌বেন্ না—তার পরেই গাল ফুলাইয়া চোখমুখ পাকাইয়া এক ধমক—ও দুষ্টু খোকন্, ফেল্‌বো একেবারে মেরে, চল্, শীগগীর……

খোকন হয়ত দিদিকে গ্রাহ্যও না করিয়া মায়ের কতগুলি চুল নিজের মুখের মধ্যে নির্ব্বিকারভাবে পূরিয়া দিল!

পরের দিনকার ডাকে দিবাকর মাধুরীকে একখানা চিঠি লিখিল—

পরম কল্যাণীয়াসু

মাধু, অনেক দিন তোমাদের কোনই খবর জানি না। কত চিঠি লিখি, কিন্তু একখানারও ত উত্তর দিবে না!

কাল রাত্রে তোমাদের অনেক স্বপ্নে দেখিয়াছি। খোকনের জন্যে মনটা এক সময়ে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। সে কেমন আছে, তাহার সমস্ত কথা আমায় জানাইবে কি?

মীরাও কি আমায় ভুলিয়া গিয়াছে? আমার কথা সে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে না? তোমার শরীর ভাল আছে ত? সর্ব্বদা সাবধানে থাকিও। লক্ষ্মীটি, চিঠির উত্তর দিতে ভুলিও না। আমার স্নেহাশীষ লও। ইতি দিবাকর।

পনের দিন কাটিয়া গেল। দিবাকর যশোহর হইতে আনা ঔষধের কোন গুণই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু স্বর্ণময়ী বলিলেন, আগের চাইতে একটু ভালই দেখা যায় যেন রে দেবা। তোর কেমন ঠেকছে?

—কি জানি সন্নোদিদি, কিছুই ত বুঝি-টুঝি নে!

—আরও দুটো দিন যেতে দে, দেখাই যাক্।...

সহসা স্বর্ণদিদির আর একটি কথা মনে পড়িয়া গেল, বলিলেন—হ্যাঁ—পুন্নু-ঠাকুরকে ব'লে এলাম একটা সত্যিনারাণ পূজো ক'রে দিয়ে যাবার জন্যে। অনেক দিন সত্যিনারাণের পুজো বাড়িতে হয় না, তোরও এই রকম ব্যামো। দেবতার পূজো একটা ক'রে ফেলাই দরকার।

দিবাকর স্বর্ণদিদির কোনো কাজেই বাধা দেয় না।

পূর্ণ-ঠাকুরের নির্দ্দিষ্ট দিনে স্বর্ণ-ঠাকুরাণী পূজার আয়োজন করিয়া ফেলিলেন।

পূজা দুই মিনিটেই হইয়া গেল। পূর্ণ-ঠাকুর পাঁচালী পাঠ করিতে সুরু করিলেন।

গণেশ-বন্দনার আরম্ভটা সামান্য একটু বোঝা গেল, তার পরে সত্যনারাণদেবের প্রসাদ অবহেলা করিবার ফলে সওদাগরের ডিঙ্গা নিমজ্জন, কারাবাস, ইত্যাদি অশেষ দুর্গতির শেষে পুনরায় গভীর বিশ্বাসের সহিত স্তব-স্তুতি করিয়া তাঁহার কৃপায় সমস্ত পুনঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত—এক নিঃশ্বাসেই সমাপ্ত হইয়া গেল। জল-ভরা হুঁকায় তামাক খাইবার সময়ে যেরূপ একটা শব্দ হয়, সেইরূপ একটি শব্দ পূর্ণ-ঠাকুর কিছু ক্ষণ করিয়া গেলেন মাত্র। এক বাড়িতেই বেশী সময় নষ্ট করিলে চলিবে না, আরও পাঁচখানা সত্যনারাণ পূজা তাঁহার সেই রাত্রেই করিতে হইবে।

ভক্তিভরে একটি ফুল পূজার স্থান হইতে তুলিয়া আনিয়া স্বর্ণদিদি দিবাকরের কপালে ছোঁয়াইয়া কানে গুঁজিয়া দিলেন। অতঃপর সিন্নি-চটকানো চলিতে থাকিল।

এতকাল পরে এই সত্যনারাণ পূজা দেখিয়া দিবাকরের শৈশবের একটি কথা মনে পড়িয়া গেল।

দিবাকরের পিতা ঠিক পুরোহিত না হইলেও সর্ব্বপ্রকার পূজা-পদ্ধতিই জানিতেন এবং সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। লক্ষ্মীপূজা, কার্ত্তিকপূজা ইত্যাদি অনেক সময়ে তিনি অনেক বাড়িতে করিতেন। তিনি যখন মরিয়া গেলেন, তখন দিবাকরকে মাঝে মাঝে এক-এক বাড়িতে ধরিয়া বসিত, তাহাদের পূজা করিয়া দিতে হইবে। দিবাকর পূজার কিছুই জানিত না, কাজে কাজেই এড়াইয়া যাইত।

কিন্তু কায়েত-পাড়ার হরিদাসই দিত মুস্কিল করিয়া। দাদাঠাকুরের প্রতি তাহার অগাধ বিশ্বাস, অসীম শ্রদ্ধা। তিনি মরিয়া গেলে কি হইবে, তাঁহার পুত্র—সে ছেলেমানুষই হউক আর যাহাই হউক—তাহাকে দিয়া পূজা করাইয়াই তাহার তৃপ্তি! জোর করিয়া সে দিবাকরকে একবার তাহার ঘরে লক্ষ্মীপূজা করিয়া দিবার জন্য লইয়া গেল; আদর করিয়া, যত্ন করিয়া তাহাকে পূজার আসনে বসাইয়া বলিল—তুমি যেমন ক'রে পুজো করবে তাই তেই আমার পুণ্যি হবে ছোটদাদা!

দিবাকর আসনে বসিয়া ঘামিয়া উঠিল। হরিদাসের বড়মেয়ে কাছে বসিয়া দিবাকরকে সব দেখাইয়া দিল। না-জানা আছে মন্ত্র, না-জানা আছে কিছু—তবুও তাহাকে ধরিয়া টানাটানি! দিবাকর মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া ফার্ষ্ট বুক অব রিডিং-এর ঘোড়ার গল্পটা বিড় বিড় করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মুখস্থ বলিয়া লক্ষ্মীর ঘটের উপর ফুল এবং আলোচাল ছিটাইয়া দিল।

পূর্ণ-ঠাকুরকে তাহার নিজের চাইতে বড় বেশী কিছু তফাৎ বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু পূর্ণ-ঠাকুর যাহাই হউক না কেন, সত্যনারায়ণদেবকে সে অশ্রদ্ধা করে না; পাঁচালী-পাঠ সমাপ্ত হইয়া গেলে দিবাকর মাটিতে মাথা রাখিয়া দেবতার কাছে অন্তরের একান্ত প্রার্থনা জানাইল—আমায় সুস্থ ক'রে দাও ঠাকুর!

কিন্তু দেবতার কানে সে-প্রার্থনা পৌঁছাইল না। দিবাকরের স্বাস্থ্য ক্রমেই আরও বেশী ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল।

ইতিমধ্যে নরেশ আর একটি খবর পুনরায় স্বর্ণময়ীর নিকটে লইয়া আসিলেন। খবরটি আর কিছু নয়, কোন একখানি পুস্তকে নাকি এই কাল ব্যাধির সন্ন্যাসী-উক্ত একটি ঔষধের বিবরণ হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িয়া গিয়াছে।

সমস্ত শুনিয়া স্বর্ণময়ী দিবাকরকে আসিয়া বলিলেন। দিবাকর মনোযোগ দিয়া শুনিল।

স্বর্ণময়ী মন্তব্য করিলেন, যশোরের এই ওষুধে কিছুই হ'ল না যখন, তখন নিশ্চিন্তি হয়ে ত আর বসে থাকা যায় না, যা হোক আর কিছু দেখতেই হবে। আর এ-ওষুধটা ত খালি বাসকের পাতার রসেরই ব্যাপার, উপগার না হোক, অপকার কিছুতেই হবে না।

দিবাকরও জুড়িয়া দিল—সব রকম কাশির পক্ষেই ত বাসকের রস ভাল ব'লে শুনেছি। কিন্তু বড় নটখট—

—তা ব'লে এখন আর কি করা যাবে? প্রাণের চাইতে আর কছুই বড় নয়! বিনোদটাকেই লাগিয়ে দেব ভাবছি।

বিনোদ বাড়ির কাজকর্ম্ম কিছু করুক-না-করুক, অপরের বাড়ির এই সব হুজুগে কাজে বড় পটু।

নরেশ যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন, স্বর্ণময়ী বিনোদকে সেইভাবে বুঝাইয়া দেন। বাসকের পাতা লাগিবে এক মণ। সেই পাতা একটা মাটির হাঁড়িতে বোঝাই করিয়া মাটির ভিতরে গর্ত্ত ক রয়া রাখিতে হইবে। হাঁড়ির তলায় থাকিবে একটা ছ্যাঁদা, তার নীচে বসানো থাকিবে একটা পাথুরে বাটি। শেষে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া গর্ত্তের ভিতরেই হাঁড়ির চারি পাশে করিতে হইবে আগুন। আগুনের তাপে পাতা হইতে রস বাহির হইয়া যেটুকু বাটিতে পড়িবে, তাহাই হইবে ঔষধ। আগুনও যার তা নয়; করিতে হইবে গোবরের ঘুঁটের।

স্বর্ণময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—পারবি ত বিনোদ? এক কষ্ট ক'রেও তোকে বাবা ক'রতেই হবে, তা না হ'লে আ[illegible] যে আর কাউকে ব'লব এমন মানুষও তো দেখছি নে—

বিনোদ উৎসাহের সহিত বলিল—আরে সে-সব কি[illegible] ভেব না মাসি, দ্যাখ না সবই জোগাড় ক'রে নিচ্ছি এ বাবা বিনোদ হালদার।

একটু পরে মাথা চুলকাইয়া বলিল—কিন্তু—

—কিন্তু কি, ব'লে ফ্যাল বাপু।

—কিন্তু কথা হচ্ছে, এক মণ বাসকের পাতা জোগা[illegible] করাই যে অসম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে। কোথায় পাব অ[illegible] বাসকের পাতা? আর অতবড় হাঁড়িই বা মিল[illegible] কোত্থেকে?

ভাবিবার বিষয় বটে। এ গ্রামে ত বাসকের গাছ নাই-[illegible] এক পাশের গ্রামে দু-এক বাড়িতে আছে; কিন্তু সম[illegible] গাছ মুড়া করিয়া আনিলেও এক মণ হইবে না। আ[illegible] যাহাদের বাগানে গাছগুলি আছে, তাহারাই বা তা করি[illegible] দিবে কেন? কত সময়ে কত দরকার হইয়া পড়ে!

অগত্যা স্বর্ণময়ী পুনরায় বিনোদকে সঙ্গে করিয়াই নরেশে[illegible] নিকট উপদেশ লইতে গেলেন। তিন জনে পরামর্শ করি[illegible] অবশেষে স্থির হয়, এক মণ-টন দিয়া আর কাজ নাই, [illegible] পরিমাণ পাতা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, তাহা দিয়াই ঔ[illegible] বানাইতে হইবে।

সমস্তই হইল।

কিন্তু আসল জিনিষ লইয়াই শেষ-পর্য্যন্ত গোলমা[illegible] বাধিল। পাথুরে বাটিটায় বাসকের রসের মত কিছু পড়ে নাই, একটু সাদা জলের মত জমা হইয়াছে।

নরেশ বলিলেন—সাবধান, ওর ভেতর মাটি না পড়ে শিশিতে পুরে রেখে দাও।

কিন্তু বিনোদ বলিল—এই নাকি তোমার বাসকের রস আমার বিশ্বাস গরমে পাথর ঘেমে, যা দেখছো—জ[illegible] হয়েছে।

সন্দেহেরই ব্যাপার।

খানিকটা কথা-কাটাকাটি চলিল বিনোদ আর নরেশে[illegible]

মধ্যে। নরেশ বলিবেই যে ওই তরল পদার্থটা হাঁড়ির ভিতর হইতেই চুয়াইয়া পড়িয়াছে; বিনোদও বলিতে থাকিবে পাথরের বাটি-ঘামা জল!

দিবাকর খানিক ক্ষণ পরে বলিল—থাক্ গে নরেশ-কাকা, এক কাজ করুন্, মিটে যাক্। হাঁড়ি থেকে পাতাগুলি বের ক'রে নিংড়ে রস বানিয়ে পাথুরে বাটির এই জিনিষটুকু তাতে ঢেলে মিশিয়ে বোতল ভ'রে রেখে দেওয়া যাক্, রোজ একটু একটু ক'রে খাই। বাসকের পাতার রসও তো উপকারীই, তা ছাড়া ওটা নিয়ে যখন একটু সন্দেহই হচ্ছে—এ ব্যবস্থা মন্দ নয়!

অতঃপর তাহাই করা হইল।

দিবাকর সকালে বিকালে দু-বার করিয়া তিন-চারি দিন খায়, কিন্তু তার পরেই সে রস বোতলের ভিতরে বিশ্রী রকম পচিয়া উঠিল।

একদিন মুখের কাছে লইয়া গন্ধে বমি আসিল। দিবাকর বোতলশুদ্ধ সব রস ঢালিয়া ফেলিয়া দিল।

কিছুই আর ভাল লাগে না, দিবাকর সমস্ত আশাই ছাড়িয়া দিল। হাতের টাকা কয়টিও প্রায় ফুরাইয়া আসিল। দিবাকর আর কূল-কিনারা করিতে পারে না।

প্রত্যহ ডাকের আশায় তাকাইয়া থাকে, মাধুরীর চিঠি আসে না। যে-মাধুরী ছাড়া এই পৃথিবীতে তাহার আর কেহই নাই, সেই মাধুরী তাহাকে এত ঘৃণা করে! খোকনের অন্নপ্রাশন—একখানা চিঠি, শুধু একখানা চিঠি ইহাও সে তাহাকে লিখিবে না? মীরাও কি তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, সেও কি মায়ের কাছে গিয়া তাহার কথা কখনও জিজ্ঞাসা করে না? করিলে, সে তার কি উত্তর দেয়? তাহার কথা মনে করিয়া মাধুরীর মনটা কি একবারও একটু কাঁদিয়া ওঠে না।

শীর্ণ হাঁটু দুইটি জোড়া করিয়া তাহার উপরে অরাতুর মাথাটা রাখিয়া দিবাকর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

একদিন যোগান্ দুধ দিতে আসিয়া আব্দুল বলিল—হ্যাঁ দা-ঠাকুর, আমার একটা কথা রাখ না কেনে, এতই ত ক'র্লে!

দিবাকর কাশিতে কাশিতে জিজ্ঞাসা করিল—কি কথা আব্দুল?

—তোমার ওই কাশির লেগেই বল্‌বার চাই।

—কি বল দিকিন্?

—নওপাড়া গেছ কোনোদিন? মধুখালীর বাজার ছাইড়েই ওই পাশে যে গাঁও?

—ছোটবেলায় একবার গিয়েছিলাম, মনে প'ড়্‌ছে। কেন বল দেখি?

—নওপাড়ায় এক ভৈরবী মা-ঠাক্‌রেণ আসেছে। বড় ভারি সাধু। শনি-মঙ্গলবারে কালীমুর্ত্তির পুজো করেন, পুজোর খ্যাবে তেনার আদেশ হয়। তখন তিনি তেনার কাছে যারা গেছে—কি মনে ক'রে গেছে, কারু বেয়ারাম থাকলে সারবে কিনা—সকল কথাই ব'লে দেন, ওষুধও দেন। কত লোকে নিত্যি যাচ্ছে। তা দা-ঠাকুর, এনার কাছে তুমি একবার গিয়ে ঘুরে আসো না! দৈব ওষুধের তুল্যি ওষুধ আর কিছু নাই।

দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, সেই ভৈরবী মায়ের কাছে গিয়ে কেউ কোনো শক্ত অসুখ থেকে ভাল হ'য়ে সেরে গেছে এমন তুমি নিজে জান?

দুধের শূন্য ভাঁড়টাকে মাটিতে উপুড় করিয়া রাখিয়া আবদুল বলিল—জানি নে দা-ঠাকুর? সাধে কি আর বল্‌ছি? আমারই এক ফুফার সে যা বিপরীত হাঁফানি হয়েছেল, বাঁচবার ত কথাই না মোটে! এক দুই দিনেরও নয়—বিশ বছরের বেয়ারাম। সেই বেয়ারাম তার নির্দোষ হয়ে সেরে গেল ভৈরবী মায়ের ঠেঁয়ে ওষুধ পেয়ে!

দিবাকর আব্‌দুলের কাছে সমস্ত খোঁজখবর জানিয়া রাখে।

স্বর্ণময়ী পাড়ায় কি কাজে বাহির হইয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিতেই আব্‌দুল যাহা বলিয়াছে, দিবাকর সমস্ত বলিল। শুনিয়া স্বর্ণময়ী আগ্রহের সহিত বলিলেন—তা'হলে দেবা, তুই আর গিয়ে নওপাড়া থেকে একবার ঘুরে। আব্‌দুল ঠিক্ কথাই ব'লেছে, দৈব ওষুধের মত ওষুধ সত্যিই আর কিছু নেই।

তার পরে স্বর্ণ-দিদি তাঁহারও জানা এবং শোনার ভিতরে কয়েকটি কঠিন রোগী দৈব ঔষধ লাভ করিয়া কেমন করিয়া ভীষণ কঠিন ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি

পাইয়াছিল, তাহার অত্যাশ্চর্য্য বিবরণী দিতে আরম্ভ করিলেন। যে লোক ডুবিয়া যাইতেছে, একটি তৃণ পাইলে সে চাপিয়া ধরে, দিবাকর কিছুই অবিশ্বাস করিল না; কিছুই অস্বীকার করিল না। বলিল—সবই ত বুঝ্‌লাম সন্নোদিদি, কিন্তু আসল কথা, সেখানে যাই কেমন ক'রে। পথ তো আট-নয় মাইলের কম হবে না।

কিছু ক্ষণ ভাবিয়া স্বর্ণদিদি বলিলেন—তাতেও আট-কাবে না, ডুলীতে ক'রে যাবি।...

নরেশও শুনিয়া বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও সেদিন শুন্‌লাম বটে—নওপাড়ার সেই ভৈরবীর কথা। যে-সব আশ্চর্য্যি কথা তাঁর সম্বন্ধে শুন্‌লাম, উড়িয়ে দেওয়া যায় না! দিবাকর ওর কাছে গিয়ে ঘুরে আসে, এতে আমারও মত আছে।

স্বর্ণময়ী দিবাকরের নওপাড়া যাওয়া স্থির করিয়াই ফেলিলেন। রওনা হইবার আগে দিবাকর স্বর্ণদিদির পায়ের ধূলা গ্রহণ করিলেন, তাঁহার মাথার উপরে হাত রাখিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বর্ণময়ী চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

মাঠের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে প্রচণ্ড রৌদ্র আর ডুলীর অনবরত ঝাঁকানি। নওপাড়া আসিয়া যখন দিবাকর পৌঁছায়, শরীরের আর তাহার কিছু অবশিষ্ট নাই। লোকের নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আগাইয়া ভৈরবীর ঘরের পার্শ্বে আনিয়া বেহারারা ডুলী রাখিল।

অন্য কোন্ এক গ্রাম হইতে আরও একখানা ডুলী আসিয়াছে। ডুলীখানা কাপড় দিয়া ঘেরা, ভিতরে কে আছে দিবাকর বুঝিতে পারিল না। সেই ডুলীখানা ছাড়াও স্ত্রী-পুরুষে আরও দশ-বারো জন লোককে তথায় দেখা গেল। সকলেই হয়ত ভৈরবীর নিকটে কোনো-না-কোনো প্রার্থনা লইয়া আসিয়াছে!

কালীর ঘরের দরজা বন্ধ। দিবাকর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল ভৈরবী ভিতরে আছেন, সন্ধ্যার আগে তিনি দরজা খোলেন না।

যাহার সহিত দিবাকরের কথা হইল, সেই লোকটিই অপর ডুলীর সহিত আসিয়াছে। ডুলীর ভিতরে তাহার ভগ্নী, কোনো একটি শক্ত ব্যাধিতে ভুগিতেছে। ভৈরবী মায়ের যদি কৃপা হয়!

সন্ধ্যার পরে ভৈরবী ঘরের দরজা খুলিলেন। একে একে সমস্ত লোক গিয়া বারান্দার উপরে সারি সারি বসিল। দিবাকরও ধীরে ধীরে গিয়া সকলের সহিত বসিল।

একটি আধা-বয়সী কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীলোক। পরনে লাল-রঙের ছোপানো কাপড়। কপালে একটি প্রকাণ্ড সিন্দূরের ফোঁটা। স্থূলশরীরা।

সম্মুখেই মৃন্ময়ী কালীমূর্ত্তি। মুক্তকেশী, গলায় মুণ্ডমালা, হাতে খড়্গ, বুকের উপর দিয়া রুধির বহিয়া যাইতেছে, চক্ষুর দৃষ্টি ভীষণ। শিবের বুকের উপর পা রাখিয়া জিহ্বা দংশন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া ভৈরবী কালীমায়ের পূজা করিলেন।

সহসা কিরূপ একটি গোঁ-গোঁ শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই ভৈরবীর হাত-পা কি রকম কাঁপিতে থাকিল, ক্রমে মাথাটা প্রবল বেগে ঝাঁকাইয়া উঠিল। সকলে তটস্থ হইয়া বসিয়া রহিল।

ভৈরবী উচ্চারণ করিলেন—বসুদেব মাইতী।

—এই যে মা......একটি লোক সম্মুখের দিকে আগাইয়া গেল।

দিবাকর লক্ষ্য করিয়া বুঝিল যে-লোকটির সঙ্গে তাহার কথা হইয়াছিল, সেই।

—বোনের ব্যামো?

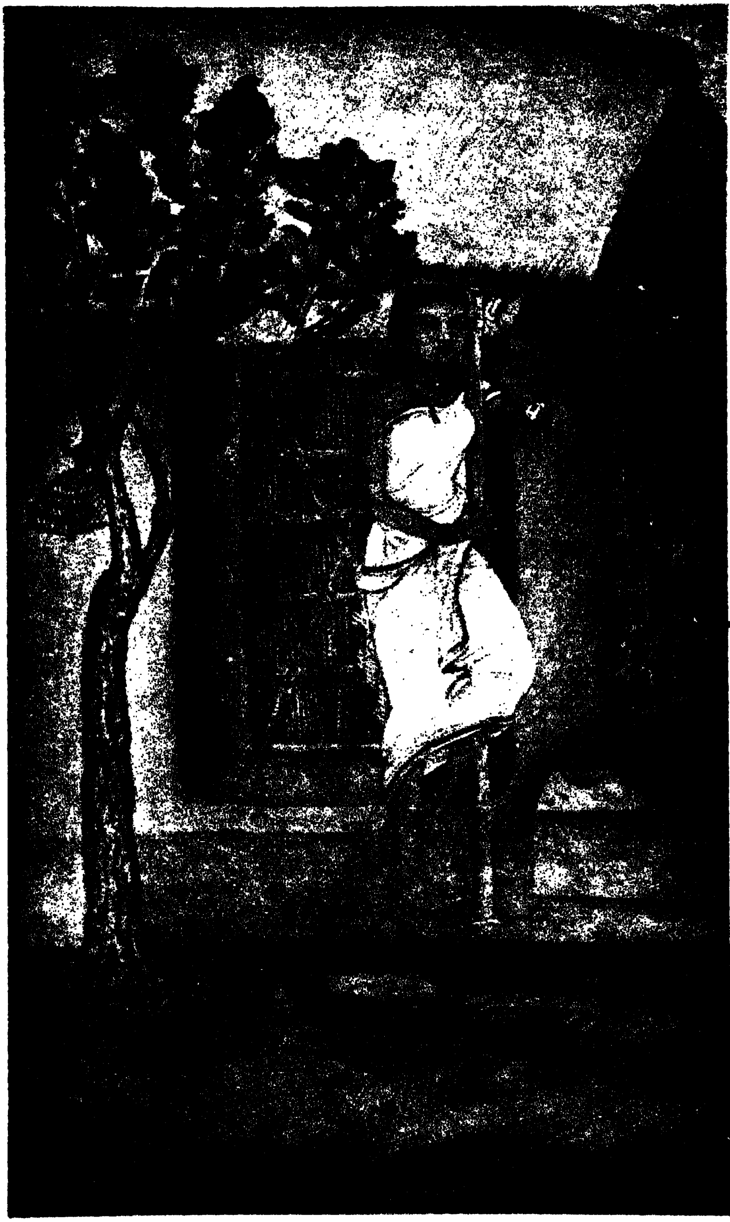
দুই হাত জোড় করিয়া বসুদেব কহিল—হ্যাঁ মা।......

—হুঁ।

ভৈরবী একটু ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন। হঠাৎ মাটি হইতে কি একটু কুড়াইয়া বসুদেবের হাতে দিয়া বলিলেন, যাঃ—

বসুদেব পরম ভক্তিভরে হাতের মুঠাটি কপালে ঠেকাইল।

এই লোকটির নাম বসুদেব এবং ইহার ভগ্নীর অসুখ, ভৈরবী কেমন করিয়া টের পাইল? দিবাকর একটু বিস্মিত হইয়াই বসিয়া রহিল। পূর্ব্ব হইতেই জানিত-



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নীল বালিকা
শ্রীশরদিন্দু সিংহ

টানিত না কি? সন্দেহের দোলায় দিবাকর দুলিতে থাকে।

আরও দু-চারি জনের নাম ভৈরবী উচ্চারণ করিলেন। ব্যাধি-মুক্তির জন্যেই প্রায় সকলেই আসিয়াছে। কেহ বা নিজের জন্য, কেহ বা পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী অথবা অন্য কোনো আত্মীয়স্বজনের জন্য। আরও দু-চারি জনকে ভৈরবী ঔষধ দিলেন, কাহাকেও একটি ফুল, কাহাকেও বা একটি বিল্বপত্র, কাহাকেও বা কালীর বেদীর নীচে হইতে একটু মাটি। কবচ করিয়া ইহাই ধারণ করিতে হইবে, পূর্ব্ব হইতেই সকলে জানে।

সহসা গম্ভীর কণ্ঠে ভৈরবী ডাকিলেন—দিবাকর চক্রোবর্ত্তী!

দিবাকরের বুকের ভিতরে ধড়াস্ করিয়া উঠিল, সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া যেন একটি তীব্র বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিয়া গেল। কাঁপিতে কাঁপিতে আড়ষ্ট স্বরে বলিল—মা!

—মিথ্যে এসেছিস্, সারবে না। এই মাঘ মাসখানা টেনেটুনে……

* * *

বনমালী বাবুর বাসার সম্মুখে এক দল কাঙালী জটলা করিতেছে।

আশপাশে এধারে-ওধারে ছেঁড়া কলার পাতা, ভাঙা মেটে গেলাস, ভাত, ডাল, তরকারি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। কয়েকটি কুকুর আসিয়া পাতাগুলি চাটিতেছে।

বনমালী বাবুর নিজের পুত্রসন্তান নাই, একমাত্র কন্যার শিশুপুত্রের অন্নপ্রাশন তিনি ঘটা করিয়াই করিয়াছেন; খরচ মন্দ করিলেন না।

দুপুরবেলা শহরের বাবুরা খাইয়া গিয়াছেন, নিমন্ত্রিতা মহিলার সংখ্যাও নিতান্ত কম হয় নাই। এখন দুঃখী, ভিখারীদিগকে খাওয়ানো চলিতেছে।

সন্ধ্যার আবছা আঁধারে একটি শীর্ণ, কঙ্কালসার লোককে বাসার সম্মুখে কয়েক বার ঘুরিতে দেখা গেল। একবার একপাশে সরিয়া আসিয়া বাসার ভিতরকার একখানি ঘরের দিকে লোকটি কাতর, সতৃষ্ণ নয়নে, নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

একটি ভিখারী তাহার ছিন্ন বস্ত্রে কতকগুলি ভাত আর তরকারী বাঁধিতে বাঁধিতে আগাইয়া আসিয়া লোকটিকে বলিল—বাপু হে, এখানে দাঁইড়ে থেকে কি হবে, পেটের গরজ থাকে ত সুমুকে ঠোঙা হাতে ক'রে দাঁড়াও গে যাও।

কোনো উত্তর না দিয়া লোকটি ভিখারীর মুখের দিকে একবার অর্থশূন্য একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সেখান হইতে পুনরায় ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

একঘুম রাত্রের পরে মীরা সহসা বিকট চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মাধুরী ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল রে মীরা, কি হ'ল তোর…?

মীরা প্রাণপণে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে লাগিল।

ওই ঘরে বনমালী বাবুর ঘুম ভাঙিয়া গেল, তাড়াতাড়ি লণ্ঠন হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। ধাক্কা মারিতে মারিতে বলিলেন—দোর খোল ত মাধু—

মাধুরী দরজা খুলিয়া দিলে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপার কি?…কি হ'ল মীরার —অমন করছে কেন?…

কোলের ছেলেটাও ইতিমধ্যে জাগিয়া উঠিয়া কান্না সুরু করিয়া দিল।

মাধুরী বলিল—কি জানি, কিছুই তো বুঝ্তে পারছি না, হঠাৎ এক চীৎকার দিয়ে কেঁদে উঠেছে—

বনমালী বাবু মীরাকে কোলের কাছে টানিয়া অনেক করিয়া অনেক রকম ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

মীরার কান্না থামিল বটে, কিন্তু কাঁপুনি আর তাহার যায় না। কোনো কথা মুখ দিয়া বাহির করিতে পারে না।

অবশেষে কোনো গতিকে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে যাহা বলিল: ছারপোকার কামড়ে তাহার ভাল ঘুম আসিতেছিল না। একবার আসে, আবার ভাঙিয়া যাইতে থাকে। হঠাৎ জানালার দিকে চোখ পড়িতেই দেখে একটা মানুষ জানালার ভিতর দিয়া তাহাদের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে।

মীরার অর্দ্ধেক কথা মুখ দিয়া বাহির হইতেছে, অর্দ্ধেক মুখের ভিতরেই থাকিয়া যাইতেছে। জড়াইয়া জড়াইয়া যাহা বলিতেছে, কাঁপুনির চোটে তাহাও স্পষ্ট হইতেছে না। বনমালী বাবু বুঝিলেন, মীরা যাই হোক্ একটা-কিছু দেখিয়া ভয় পাইয়াছে।

লণ্ঠন হাতে করিয়া বাহির হইয়া তিনি জানালার ধার, ঘরের আনাচ-কানাচ ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলেন, কোথাও কিছু নাই!

বলিলেন—দুঃ, মানুষ না হাতী। চল্, আমার সঙ্গে, নিজেই দেখ বি!

কিন্তু মীরা কিছুতেই বাহিরে যাইতে রাজী হইল না।

মাধুরী বলিল—স্বপন-টপন দেখেছে নাকি তার ঠিক কি!

বনমালী বাবু বলিলেন—তা ত নয়, আমার বিশ্বাস ওই যে আমগাছের পাতাসুদ্ধ ডালটা জানালার সাম্‌নে এসে পড়েছে, ঘুমের চোখে ওই দেখেই হয়ত মানুষ ভেবে চেঁচিয়ে উঠেছে!

মীরা তথাপি কাঠের মতন্ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালী বাবু হাসিয়া বলিলেন—দিদির আমার কি সাহস! যা যা শুয়ে পড় গে যা!…

পিতা ঘর হইতে চলিয়া গেলে কি ভাবিয়া মাধুরী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দুই ফোঁটা চোখের জল মুছিল কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল—কার মত দেখ্‌তে রে সে?

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

অধ্যাপক শ্রীললিতমোহন কর, কাব্যতীর্থ, এম্-এ, বি-এল্

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন বঙ্গ-সাহিত্যের কেন্দ্রস্থানে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। নিকট ও দূর হইতে দুই শতাধিক প্রবাসী মাতৃভূমিতে আসিয়া মাতৃভাষার সেবার সুযোগ পাইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। যাঁহাদের প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রমে এইরূপ বিরাট ব্যাপার সম্ভবপর হইয়াছিল, তাঁহাদের সময়, সামর্থ্য ও অর্থব্যয়—উচ্চ মন্দিরের অলক্ষিত ভিত্তির মত—সাধারণের অজ্ঞাত হইলেও, প্রণিধান ও সাধুবাদের যোগ্য।

ইহার পূর্ব্ব অধিবেশনে, গোরক্ষপুরে, যখন এই মহা-সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মহাকবি অতুলপ্রসাদ তাঁহার শেষ সাহিত্যিক অতুল প্রসাদ বিতরণ করিতে আসিয়া বলিতেছিলেন, "প্রবাসী! চল্ রে দেশে চল্," তখন ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনকে দেশে লইয়া যাইবার কল্পনা করিতেছিলেন। এই কল্পনা সত্যে পরিণতও হইল; কিন্তু হায়! সেই মহাপ্রবাসী তখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত দেশ হইতে বহুদূরে।

প্রথমে প্রবাসিগণের মধ্যে একটা আশঙ্কা উঠিয়াছিল—প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন বঙ্গে গিয়া নিজের নিজ[illegible] হারাইয়া না ফেলেন। হয়ত একাদশ বর্ষের বালক মাতৃ ক্রোড় হইতে ফিরিয়া আসিতে চাহিবে না; কিংবা হয়[illegible] সম্মেলনের নাম ও রূপ বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু এরূ[illegible] কিছুই ঘটে নাই। বরং, সম্মেলনের মূল সভাপতি, শা[illegible] সভাপতি প্রবাস হইতেই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রবাস[illegible] সভাপতির অভাবে সাংবাদিকী শাখার অধিবেশন হয় নাই প্রবন্ধ-পাঠকগণও সকলেই প্রবাসী ছিলেন।

সম্মেলনের এবার মহাসৌভাগ্য যে, যেসকল মনীষী[illegible] ব্যষ্টিরূপে সভাপতি-পদে পাইলেই ধন্য মনে করিতেন, তাঁহা[illegible] সমষ্টিরূপে ইহার মূলের ও শাখার উদ্বোধনকর্ত্তা রূপে কা[illegible] করিয়াছেন। ব্রহ্মর্ষিকল্প কবিকে ও বিজ্ঞানতাপস আচা[illegible] বসুকে সভায় লাভ করিয়া সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাখা দু[illegible] কলে পূর্ণ হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদ্-গৃহে কর্ম্মবীর আচা[illegible] রায় মূলের উদ্বোধন করিয়াছেন। প্রবাসে যেখা[illegible]

বঙ্গসাহিত্য-সমিতি হউক না কেন, উহা যদি কেন্দ্রস্থানীয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অঙ্গীভূত হয়, তাহাতে উভয়েরই সাফল্য ও সার্থকতা। প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিকট এই সম্মান পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। এই অঙ্গাঙ্গিভাব চিরস্থায়ী হইয়া অশেষ কল্যাণকর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সভার সমারোহ বঙ্গদেশের রাজনগরীর মতই হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে যে আন্তরিকতা ও আত্মীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই প্রবাসীদিগের বিশিষ্ট সম্পদ্। শুনিয়াছি, অভ্যর্থনা-সমিতি যে-সকল প্রান্তের নিকট মূল ও শাখার উদ্বোধনের প্রস্তাব লইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রবাসিগণের নামে সানন্দে সম্মতি দিয়াছিলেন। বসুধাকুটুম্বগণের এই স্বজনবাৎসল্য স্মরণীয় ও অনুকরণীয়। সাহিত্যের আসরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রের অরুণালোকে জাগৃতি দিয়া গমনের পর, সভায় শরচ্চন্দ্রের উদয় ও আ-বিদায় আলোকদানে, প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ, বঙ্গসাহিত্যের 'সোনার কাঠি—রূপার কাঠি'র স্পর্শ পাইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা লেডী সরকার ও শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, সত্যচরণ লাহা, নগেন্দ্রনাথ বসু, যামিনীকান্ত রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার এবং আনন্দবাজার সম্প্রদায়, সাংবাদিক-সঙ্ঘ প্রভৃতি সহৃদয় ব্যক্তিগণ, প্রবাসীদিগকে সামাজিক মেলামেশার সুযোগ ও জলে স্থলে জলযোগ দান করিয়া তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর ও তাঁহার ছাত্রীগণের গান এবং অপর্ণা দেবীর কীর্ত্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজও বাঙালীর নিজস্ব সঙ্গীত বাঙালীর ভাবে গীত হইলে সামাজিকগণের কিরূপ প্রীতির উদ্রেক করে, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন।

যে-সকল খ্যাতনামা সাহিত্যিক সভা উজ্জ্বল করিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছেন প্রবাসী বাঙালীগণ তাঁহাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। হয়ত তাঁহারা প্রবাস হইতে দেশে উপস্থিত হইয়া আরও অধিকসংখ্যক শ্রুতনামা সাহিত্যিকগণের উপস্থিতি দেখিলে ও তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইবার শুভ অবসর পাইলে অধিক আনন্দলাভ করিতেন। অবশ্য কোন সাহিত্যিকেরই পক্ষে অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য হইবার বাধা ছিল না—দ্বার অবারিত ছিল; সদস্য না-হইয়াও সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া সহজ ছিল। তবে, "আশার অন্ত নাহিক ঘটে," এই নীতিবাক্য সর্ব্বদাই স্মর্তব্য।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন যে-কোন প্রকারে ত্রয়োদশ বৎসর বাঁচিয়াছে। এখন ইহাকে কিরূপে দীর্ঘজীবী ও কার্য্যকরী করা যায় তাহা চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। এরূপ প্রতিষ্ঠান এই নূতন। বঙ্গদেশ যে কত মহীয়ান্—বাংলা ভাষার স্থান যে কত উচ্চ—তাহার সাধকগণ একনিষ্ঠ সাধনায় সিদ্ধির পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বাঙালীর ও অবাঙালীর বুঝিবার ও বোঝাইবার সময় আসিয়াছে। ভারতচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ যে বাংলার জয়গানে দেশকে মুগ্ধ করিয়াছেন—রামেন্দ্রসুন্দর, দীনেশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার প্রমুখ যে ভাষার প্রতিষ্ঠা স্থাপন ও খ্যাপন করিয়াছেন, তাহা বাঙালীর গৌরবের ও গর্ব্বের ও অবাঙালীর প্রশংসা ও অনুকরণের বিষয় হইয়াছে। অনেক অবাঙালী অনুভব করেন যে বাংলা ভাষার মর্য্যাদা অন্য প্রচলিত ভাষায় এখনও আসে নাই। বহুস্থানে এম্-এ পরীক্ষায় অন্য ভাষার অবান্তর ভাষারূপে পঠনীয় হওয়ায় বাংলা ভাষার ব্যাপকতা অনেক বাড়িয়াছে। বিহারে ও কাশী-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপনা হয়। সংযুক্ত-প্রদেশে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষ হইতে চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে ইহাকে বি-এ পরীক্ষার পাঠ্য করা হয়। ম্যাট্রিক, আই-এ ও এম-এ পরীক্ষায় ইহা পরিগণিত হইয়াছে। প্রবাসে বঙ্গভাষার জয়যাত্রায় দেশবাসিগণের সহকারিতা, সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

নিরভিমানে বাংলার সকল সাহিত্যিকই, রাহিত্য না দিয়া, সাহিত্য দান করুন, ইহাই প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের আকাঙ্ক্ষিত। এ বৎসরের অভ্যর্থনা-সমিতি যে "বিবরণ-পঞ্জী" সভাস্থলে বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিগত একাদশ বর্ষের অধিবেশনের উল্লেখ আছে। ইহাতে দেখা যায় যে প্রবাসে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালীগণ সাগ্রহে এই সম্মেলনকে আহ্বান করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মভূমিতে দু-তিন দিনের জন্যও মাতৃভাষার সার্ব্বজনীন সেবায় আত্মনিয়োগ

করিয়াছেন। তাঁহাদের কৃত কার্য্যের কৃতকার্য্যতা নির্ভর করিতেছে প্রত্যেক ভবিষ্যৎ অধিবেশনের উপর। এই দ্বাদশ অধিবেশনটি পূর্ব্ববর্ত্তী একাদশ অধিবেশনের সার্থকতা দান করিয়াছে। আগামী ত্রয়োদশ অধিবেশন এই দ্বাদশটির সার্থকতা দিবে। বিগত বারোটি অধিবেশন প্রমাণ করিয়াছে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন বাংলার বাহিরের ও অন্তরের। কাণ্ড শক্তিমান্ থাকিলেই শাখা-প্রশাখাও শক্তিমান্ হয়। মাতৃভূমির সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন মূলস্বরূপ থাকিয়া প্রকৃতির যে রস ও প্রাণশক্তি আহরণ করিয়া কাণ্ডের ভিতর দিয়া শাখা-প্রশাখায় প্রেরণ করিবেন তাহাতেই নিকট ও দূরের প্রশাখা পল্লবে, ফুলে, ফলে শোভিত হইবে।

প্রবাসে বিশেষরূপে অনুভূত একটি বাস্তবিক অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া তাহার নিরাকরণের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। প্রবাস হইতে সাহিত্যিকগণের আমন্ত্রণকালে, তাঁহাদের সকলের নাম ও ধাম সংগ্রহ করা অতি কঠিন হইয়া উঠে। তাহার ফলে অনিচ্ছাকৃত আংশিকমাত্র ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ ঘটিয়া থাকে। ইহার সংশোধনে কিরূপ সদুপায় হইতে পারে? যদি বঙ্গদেশে একটি সাধারণ সাহিত্যিক কেন্দ্র পরিগণিত হয় এবং তাহাতে সকল সাহিত্যিক অন্তর্ভুক্ত হন—যথা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—তাহা হইলে এক স্থান হইতেই এই সমস্ত পাওয়া যায়, অথবা উত্তমাঙ্গে জল ঢালিলে তাহা যেমন সর্ব্বাঙ্গে পড়ে সেইরূপ কেন্দ্রে আমন্ত্রণ পাঠাইলে উহা সর্ব্বত্র পৌঁছিতে পারে। তাহা যত দিন না-হইবে তত দিন সংবাদপত্রে ও মাসিক পত্রিকায় সাধারণ ভাবে আমন্ত্রণ পাঠানই সকলের নিকট নিবেদন জানাইবার একমাত্র উপায়রূপে অবলম্বিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

প্রবাসিগণের ভাষাসেবার একটা দিক এবারকার সম্মেলনে প্রস্ফুট হইয়াছিল। মূল সভাপতি ও বৃহত্তর-বঙ্গ-শাখার সভাপতি বাংলার বাহিরে ব্যবহৃত শব্দ হইতে কয়েকটি বাংলা শব্দের আগতি, বাংলা প্রথার সহিত অন্য প্রদেশের প্রথার তুলনা ও পরস্পরের ভাষাগত আদান-প্রদানের সংবাদ দিয়া দেখাইয়াছেন যে বাংলা ভাষা, অন্য প্রদেশে প্রচলিত—শুধু পুস্তকগত নয়—জীবিত ভাষার সহিত কিরূপ সম্পৃক্ত তাহা অনুসন্ধানের যোগ্য। যে-সকল নিকট বা দূর প্রদেশে প্রবাসী বাঙালী আছেন, তাঁহারা যদি সেই সেই প্রদেশের ভাষার সহিত বাংলা ভাষার, ভাবের বা প্রথার তুলনামূলক আলোচনার সামগ্রী পান, তাহা সংগৃহীত হইলে বাংলা ভাষার শব্দ ও সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া প্রচুর পুষ্টি হইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কল্পিত বাংলার প্রতি জেলার ভাষার তুলনামূলক অধ্যয়নের মত, ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশের সহিত বাংলার সাদৃশ্যমূলক গবেষণা সমভাবে উপকারী হইবে।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের একটি স্থায়ী পরিচালক সমিতি আছে। নিত্যকার্য্যের ভার এই সমিতির উপর ন্যস্ত আছে। বার্ষিক অধিবেশন নৈমিত্তিক ব্যাপার। নীরব কর্ম্মী ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ঐ পরিচালক-সমিতির সভাপতি। তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রবাসের বিভিন্ন স্থানের বাঙালীগণের সংখ্যা ও পরিচয় সংগৃহীত হইতেছে।

দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে প্রবাসীকে জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়, নহিলে না কি তাহার দেশের সহিত সম্বন্ধবিচ্যুতি ঘটে। প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন সে কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছেন। যুগে যুগে সম্মেলন গৃহে যাইবেন, এবং একাদশ বৎসর দেশবাসিগণ প্রবাসে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন এরূপ হইলে বঙ্গ ও প্রবাসের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন থাকিবে। যে সম্মেলনে প্রবাসী বাঙালীর ও বঙ্গের বাঙালীর সাহিত্য বা একযোগ ঘটে তাহাতেই "প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে"র সার্থকতা।

যাঁহারা প্রয়োজনাধিক আয়োজনে, আমন্ত্রণে ও আতিথ্যে, তত্ত্বাবধানে ও সাহিত্যদানে, উদ্বোধনে ও সম্বোধনে, অভিভাষণে ও ভাষণে, ছন্দে ও প্রবন্ধে, গানে ও কীর্ত্তনে প্রবাসীদিগকে ধন্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধুর স্মৃতি প্রবাসী বাঙালীগণের চিত্তে চিরজাগরূক থাকিবে।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিনিধিগণের স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক প্রতিনিধির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনলস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় কখনও সম্মুখে ও কখনও অন্তরালে থাকিয়া সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র রায় পুত্রের ঘোর অসুস্থতা সত্ত্বেও আহারাদির সুব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই। ভগ্নস্বাস্থ্য শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যতক্ষণ পারিয়াছেন প্রতিনিধিনিবাসে আসিয়া দেখাশুনা করিয়াছেন। প্রবীণ

জলধর সেন মহাশয় প্রতিকক্ষে নিত্য আসিয়া এবং সভার প্রতি কার্য্যে ও সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিয়া প্রতিনিধিগণকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। স্যর যদুনাথ সরকার পুরঃসর থাকিয়া তাঁহাদিগকে বিভিন্ন আমন্ত্রণস্থলে যাতায়াতের সতর্ক সঙ্গী ছিলেন। এইরূপে রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বজনের স্বাচ্ছন্দ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আমাদিগের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ভদ্রের অধিনায়কত্বে সুকুমার বালক হইতে তরুণ স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রতিনিধিগণের অক্লান্ত ও পর্য্যাপ্ত সেবা করিয়াছেন। অভিজ্ঞ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের কন্যা কুমারী উমা ঘোষ মহিলা-প্রতিনিধিগণের জন্য সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন। প্রতিনিধি-নিবাসের বৃহৎ প্রাসাদে চাবি বন্ধ করিবার ব্যবস্থা ছিল না, অথচ পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধিবর্গ নিঃশঙ্ক চিত্তে জিনিষপত্র ফেলিয়া রাখিয়া যাইতেন ও ফিরিয়া আসিয়া সকল বস্তুই স্বস্থানে পাইতেন। স্বেচ্ছাসেবকগণের এরূপ সতর্কতা ও সকল আমোদ-প্রমোদে যোগদানে প্রলোভনত্যাগ প্রশংসার্হ ও স্বেচ্ছাসেবকমণ্ডলীর কর্ত্তৃপক্ষের কর্ম্মকুশলতার নিদর্শন।

সাবিত্রী

শ্রীঅমরেশ রায়

অক্ষম নিষ্ফল মৃত্যু হ'তে মোরে রক্ষা কর
হে সাবিত্রি,—তব পুণ্য প্রেম-শিখা ধর,
ক্ষুব্ধ মোর জীবনের লক্ষ্যহারা শূন্য অন্ধকারে
যেথা পলে পলে কোন তৃপ্তিহীন বেদনার ভারে
বিলুপ্তির ভস্মতলে মিশে যাই চিররাত্রিদিন
পরম ব্যর্থতা ল'য়ে অগৌরবে—পরিচয়হীন!
এস সেথা,—আনো তব দৃপ্ত শুভব্রত,
মৃত্যু মোর কর প্রতিহত;
নূতন জীবন কর দান
মোরে কর উজ্জীবিত পূর্ণ সত্যবান!

যেথায় গহন বনতলে
নামহারা, রাজ্যহারা, একাকী বিফলে
ভ্রমিনু হেলায়,
স্পন্দিত পল্লব-আলো-ছায়ার খেলায়;
আত্মবিস্মৃতির মাঝে
ফিরিনু মলিন দীন সাজে!
একদিন সেথায় সহসা
পড়ুক তোমার জ্যোতি, যেন কোন স্বর্গ হ'তে খসা;
জাগায়ে আঁধার বনভূমি
দাঁড়াইবে তুমি,
জানিবে আমার নাম, কহিবে আমার পরিচয়,
ঘুচিবে সকল গ্লানি জীবনের সর্ব্ব-পরাজয়!
সে দিন জাগিবে মোর হিয়া!
তার পর, হে সাবিত্রি,—যাবে কি ফিরিয়া
আপন প্রাসাদ মাঝে;—হর্ম্ম্য-বাতায়নে
বিচিত্র খচিত রত্নাসনে
বসিবে নীরবে
বাজিবে পূরবী তান সন্ধ্যার উৎসবে!
হেথা বনতলে
চিত্ত মোর ব্যথা-দীর্ণ ব্যাকুল উচ্ছলে,
উৎকণ্ঠ অধীর,
ব্যগ্র আঁখি বিদ্ধ করে গহন তিমির;—
সর্ব্ব দেহে-মনে কোন খর-অগ্নি করেছি বরণ,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সহি জাগ্রত মরণ!
তবে এস ত্বরা,
হে সাবিত্রি, হও স্বয়ম্বরা!
তার পর দিনে দিনে তিলে তিলে মোরে করহ উদ্ধার;
বিশ্বের গৌরব মাঝে ফিরে দাও মোর অধিকার।

আলোচনা

"কোন্‌টি চান ?"

শ্রীশচীন সেন রায়

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের "কোন্‌টি চান ?" নামক সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধের প্রতিবাদকল্পে শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ মহোদয় "কলিকাতা ও মফস্বলের কলেজসমূহের তুলনা" শীর্ষক প্রবন্ধে যে-সমস্ত তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই সমালোচনা প্রসঙ্গে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

প্রথমতঃ বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় নজিরস্বরূপ ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলর সুরাওয়ার্দ্দি সাহেবের বক্তৃতা হইতে একটি অংশ তুলিয়া লিখিয়াছেন যে মফস্বল কলেজে গুণী শিক্ষক নাই যত আছেন কলিকাতায়। কথাটার সম্পূর্ণ সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিলেও না-হয় তাঁহার পাণ্ডিত্যে আস্থাই স্থাপন করা গেল। তাই বলিয়া একথা মোটেই স্বীকার্য্য নয় যে কলিকাতায় গুণী অধ্যাপকগণ ছাত্রদের নিকট আপনাদের বিদ্যাবত্তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন—কারণ বাহিরে ছেলে পড়ান এবং অন্যান্য কার্য্যে তাঁহাদের অনেকেই বেশীর ভাগ সময় ব্যাপৃত থাকিয়া নিজেদের অধ্যাপনা করিবার শক্তির ব্যত্যয় ঘটান—ফলে সুস্থমনে বক্তৃতা দিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় আরও বলিয়াছেন—"মফস্বল শহরের আবহাওয়া সাধারণতঃ জ্ঞান-পিপাসা বৃদ্ধি ও তাহার তৃপ্তির পক্ষে অনুকূল নয় এবং কলিকাতায় গ্রন্থশালা, পাঠশালা, সভা-সম্মেলনে ছাত্রগণ প্রতিদিন নিতান্ত সুবোধ বালকের মত যোগদান করিয়া নিত্য নূতন জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, মিউজিয়াম ইত্যাদিতে যত ছাত্র যায় তাহার সহিত সিনেমা হাউস, খেলার মাঠ, ও থিয়েটার দর্শক ছাত্রদের সংখ্যা তুলনা করিলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় আপনার যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন। ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম ইত্যাদি সৎ-প্রতিষ্ঠানে যে নিতান্ত নগণ্য-সংখ্যক ছাত্র যোগদান করে ইহা আমরা খুব ভালভাবেই জানি, আর আমাদের সত্য ঘটনার সহিতই কারবার করিতে হইবে। এক্ষেত্রে একটি উপমা দেওয়ার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কাহাকেও যদি প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন করা যায় যে সে কত বই পড়িয়াছে আর সে যদি উত্তর দেয় যে তাহার বাড়িতে এক লক্ষ বই আছে, তবে যে তাহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হয় ইহা সকলেই জানেন। শ্রীযুক্ত অনিল বাবু তাঁহার প্রবন্ধে আরও বলিয়াছেন যে মফস্বলে অধ্যাপকচক্রের বাহিরে এমন লোক খুব কমই থাকেন যাঁহাদের সংস্পর্শে, উপদেশে ও সাহায্যে মানসিক উন্নতি লাভ সম্ভবপর হয়। এ স্থলে তাঁহার নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই যে কলিকাতার ছাত্রগণের মধ্যে কয় জন অধ্যাপকচক্রের সহিতই বা জ্ঞানালোচনা করে ?

তৃতীয়তঃ, বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে মফস্বল কলেজে অনেক স্থলে অনার্সের ব্যবস্থা এবং ভালরকম যন্ত্রাদি না থাকায় অনেক ছেলে কলিকাতায় যায়। আমরা জানি ভাল ছেলেরাই অনার্স লয়। কাজেই মফস্বলে ভাল ছাত্র কদাচিৎ থাকে। সুতরাং অল্পবিদ্যান্ ছাত্র লইয়া কারবার করিয়াও যে মফস্বল কলেজ কলিকাতার অনেক কলেজ হইতে ভাল ফল করে ইহাতে কি তথাকার অধ্যাপকগণের কৃতিত্ব প্রকাশ পায় না ?

বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় হেতমপুর প্রভৃতি কয়েকটি কলেজকে অপকৃষ্ট কলেজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া যে অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদকল্পে বাঙ্গালা-সরকারের "Eighth quinquennial Report on the Progress of Education" হইতে কলিকাতার ও তথাকথিত উৎকৃষ্ট মফস্বল কলেজ ও হেতমপুর কলেজ হইতে শতকরা কত ছাত্র আই-এ ও বি-এ পরীক্ষায় ১৯৩২ সনে উত্তীর্ণ হইয়াছিল তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

	আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
কলেজ	শতকরা	শতকরা
হেতমপুর	৫৭.১	৬৮.৭
হুগলী	৫৩.৫	৬৭.৫
রাজশাহী	৪৮.৫	৫১.৬
ময়মনসিংহ	৩৪.৬	৬১.৬
বরিশাল	৪৮.৯	৩৮.৩
ফেণী	৪৫.৫	
মেদিনীপুর	৫৫	
ফরিদপুর	৫৫.৫	
শ্রীরামপুর	৫০	
সেন্টপল্‌স	৪৯.১	
কুমিল্লা	৫৩.২	
বঙ্গবাসী	৪৪.৮	৪৯.১
সিটি	৪৩.৬	৪২.২
রিপন	৫৫.৫	৪৫.৬
আশুতোষ	৫২.৪	৬১.৫
বিদ্যাসাগর	৪৭.৭	৪৫.২
সংস্কৃত		৬২.৫

এ বিষয়ে আর কোন চিঠি ছাপা হইবে না। প্রবাসীর সম্পাদক।

"বিক্রমপুর—একালে ও সেকালে"

শ্রীকুমুদলাল গঙ্গোপাধ্যায়

গত ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'তে আড়িয়ল পল্লীমণ্ডলের দশম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের অভিভাষণ বাহির হইয়াছে। তাহার পরিশিষ্টের একাংশে চন্দ-মহাশয় লিখিয়াছেন—"আশা করিয়াছিলাম গত ১৫ বৎসর যাবৎ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ঢেউ যে-ভাবে পল্লীসমাজ আন্দোলিত করিয়াছে, তাহার ফলে পল্লীর ভদ্রলোকেরা অন্ততঃ দলাদলি ভুলিয়া একযোগে কাজ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, লোকশিক্ষার হিসাবে বিক্রমপুরের এই অংশে আন্দোলন নিষ্ফল হইয়াছে। গ্রাম্য দলাদলির ফলেও বোধ হয় অনেক হতভাগ্য যুবকের পরকাল নষ্ট হইতেছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না ; কে যে বন্ধু, কে যে গুপ্তচর (spy) তাহা চেনা যাইতেছে না। কথায় বলে

'আঁধার ঘরে সাপ, সুতরাং সকল ঘরেই সাপ'। এইরূপ সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া বিক্রমপুরের পল্লীবাসী দরিদ্র ভদ্রলোকগণ অতিকষ্টে দিনযাপন করিতেছেন।" চন্দ মহাশয় গত ১৫ বৎসরের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ফলে পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা দলাদলি ভুলিয়া একযোগে কাজ করিতে অভ্যস্ত হয় নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য আমরাও দুঃখিত। কিন্তু এই দোষটা কি কেবল পল্লীগ্রামেই দৃষ্ট হয়? (রমাপ্রসাদ বাবু বলেন নাই বা ইঙ্গিতও করেন নাই, যে, ইহা কেবল পল্লীগ্রামেই দৃষ্ট হয়।—প্রবাসীর সম্পাদক।) শহরে—যেখানে পল্লীবাসীদের চেয়ে শিক্ষাদীক্ষায় অধিক অগ্রসর লোকের বাস, সেখানেও কি এই দলাদলি আদৌ নাই? কংগ্রেস, কনফারেন্স, কর্পোরেশন প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য সভাসমিতি পর্যান্ত এই মতানৈক্য এবং দলাদলির চিহ্ন সুস্পষ্ট বিদ্যমান। চন্দ-মহাশয় নিশ্চয়ই একথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না এবং গত ১৫ বৎসরের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ফলে শহরের লোকেরা যদি একযোগে কাজ করিতে অভ্যস্ত না হইয়া থাকে, তবে শুধু পল্লীবাসীদের ঘাড়ে এ দোষ চাপাইলে চলিবে কেন? পল্লী যে শহরের আদর্শই অনুকরণ করে। আর এই জন্যই যদি লোকশিক্ষা হিসাবে বিক্রমপুরের এই অংশে আন্দোলন নিষ্ফল হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়, তবে এই কারণেই কি শহরে তাহা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে? (রমাপ্রসাদ বাবু ইহাও বলেন নাই বা ইঙ্গিত করেন নাই।—প্রবাসীর সম্পাদক।) বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলে দেশের অন্যত্র সেকালের লোকের চেয়ে একালের লোকের মধ্যে যদি সৎসাহস, কর্ম্মপ্রবণতা, নির্ভীকতা এবং স্বার্থত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায় তবে বিক্রমপুরের এই অংশের লোকের মধ্যেও যে এই সব গুণের অসদ্ভাব নাই তাহা লেখক মহাশয় যদি তাঁহার বিরল অবসরের মধ্যেও কষ্ট করিয়া একটু অনুসন্ধান করিতেন, তবে আশা করা যায় তিনি এতটা দুঃখিত হইতেন না। গ্রাম্য দলাদলির ফলে তিনি বহু যুবকের পরকাল নষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। তিনি নিশ্চয়ই "অন্তরীণে" আবদ্ধ যুবকদিগের এবং যাহাদের উপর পুলিসের নজর আছে, তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া এই কথা লিখিয়াছেন। বঙ্গদেশের সমস্ত শহরে এবং পল্লীগ্রামে উক্ত প্রকার যুবকের সংখ্যা যে প্রচুর তাহা অবশ্যই প্রবীণ লেখক মহাশয় অবগত আছেন। সর্ব্বত্রই কি এই দলাদলির অনিবার্য্য কারণে এই সকল যুবকের এই অবস্থা ঘটিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন? যদি তাহা না-হয়, তবে এখানেই বা তাহা হইবে কেন? গভর্ণমেণ্ট কি প্রকারে গোয়েন্দা দ্বারা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এই সকল যুবককে অন্তরীণে আবদ্ধ অথবা পুলিসের নজরবন্দী করেন, তাহা সাধারণ পল্লীবাসীদের ধারণারও অতীত।

যাঁহাদের সাদর আহ্বানে লেখক মহাশয় সুদূর পল্লীগ্রামে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রশংসায় তাঁহার অক্ষয় লেখনী সার্থক হউক, ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু তিনি যদি এই প্রসঙ্গে অবান্তর কথার অবতারণা করেন, তবে তাহা একান্তই দুঃখের বিষয় হয়।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র"

শ্রীবিজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত বাবু সনৎকুমার সিংহ বাংলা ভাষার প্রশ্নপত্রে প্রশ্নগুলি ইংরেজীতে করা হয় বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন। আপত্তির প্রধান কারণ "বঙ্গভাষা এখন কিয়ৎ পরিমাণে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য ভাষারও পরীক্ষা হয়, "সে-সব ভাষার মধ্যে সবগুলি না হউক অনেকগুলিই "কিয়ৎ পরিমাণে সমৃদ্ধিশালিনী" সে-সব ভাষার প্রশ্নপত্রও সেই সেই ভাষায় লেখা হউক বলেন নাই। বিশেষ সংস্কৃতের প্রশ্নগুলি সংস্কৃতে করা হউক ও উত্তরগুলি দেবনাগরীতে লেখা হউক, তাহাও বলেন নাই।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মেনিতে সেই সেই দেশের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষার প্রশ্নপত্র সেই সেই দেশের ভাষাতেই হইবার সম্ভাবনা।

ইংরেজী রাজভাষা, বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষের lingua franca, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব লেখা-পড়া, কাজকর্ম্ম ইংরেজীতে হয়। ইংরেজীর সঙ্গে ফরাসী বা জার্ম্মান ভাষার তুলনায় অর্থ বুঝা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে সব প্রশ্নই ইংরেজীতে হওয়া ঠিক বলিয়া মনে হয়।

"বাঁকুড়ার পুরাকৃতি-রক্ষা"

শ্রীযুগলকিশোর চট্টোপাধ্যায়

ফাল্গুন সংখ্যার 'প্রবাসী'তে মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় 'বাঁকুড়ায় পুরাকৃতি-রক্ষা' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বাঁকুড়াবাসীর মধ্যে কাহার মনে না আনন্দ হয়? বাস্তবিকই বাঁকুড়া প্রত্নতত্ত্বভবন-অনুষ্ঠানের একটি কেন্দ্র হওয়া বিশেষ আবশ্যক। কত শত অমূল্য গ্রন্থ ও পুঁথি যে বাঁকুড়া হইতে ভিন্ন দেশে স্থানান্তরিত হইয়াছে, বাঁকুড়ার কত পুরাতন শিলামূর্ত্তি যে বিভিন্ন জেলার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। এতদিন যে বাঁকুড়াবাসী উপেক্ষা করিয়া কাল কাটাইয়াছেন সেজন্য তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এখনও সময় আছে। এখনও বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী ও প্রবাসী সকলকেই বাঁকুড়ার সারস্বত-সমাজকে কেন্দ্র করিয়া পুরাকৃতি-রক্ষার আয়োজন করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় যে প্রত্নতত্ত্বভবন-অনুষ্ঠানের অনুযোজক হইয়া এ অমূল্য প্রস্তাব দিয়াছেন তাহার জন্য বাঁকুড়াবাসী সকলেই কৃতজ্ঞ। বাঁকুড়ার স্বদেশহিতৈষী দানশীল এমন অনেক ধনী অধিবাসী আছেন যাঁহারা উক্ত প্রস্তাব মত ২৫০০০৲ অনায়াসেই দান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারেন।

ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই বাঁকুড়ার অধিবাসী ধনী প্রবাসী হইয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদেরও এ শুভচেষ্টায় যোগদান করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

নিশীথে ডাকিল কে!

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

কথাটা বীণাও শুনিল।

দয়াল রান্নাঘরের পৈঠার উপর পা তুলিয়া বলিতেছিল—জানলে খুড়ী আজ রাইগড়ের হারান কবরেজের ওখানে গেছলুম। ওষুধ আন্‌লুম। ওষুধ ত খাওয়ানো হচ্ছে কিন্তু মেয়েটা সার্‌ছে না কেন কে জানে! মেয়েটার চেহারা যা হয়েছে খুড়ী জানলে? ঠিক এমনি, পাট-কাঠির মত—

দয়াল তাহার হাতের একটি আঙুল উঁচু করিয়া দেখাইল। তাহার পর বলিতে আরম্ভ করিল—সেই যে গো সেবার আশ্বিন মাসে বিষ্টি আরম্ভ হ'ল! মেয়েটা কিছুতেই শুন্‌লে না—জলে ভিজে ভিজে ঘাটে গা ধুতে যেত রোজ দুটি বেলা। তার পর সেই যে জ্বরে ধর্‌লো আর ছাড়ছে না—

রান্নাঘরের ভিতর হইতে মোক্ষদা দেবী দয়ালকে কি যেন বলিলেন। কিন্তু বীণা তাহাতে কান দিল না। সে আস্তে আস্তে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। ঘরে আসিয়া শুক্‌নো কাপড়গুলি আঙুলে করিয়া কোঁচাইতে কোঁচাইতে বাহিরের দিকে তাকাইল।

...জানালাটি খোলা। জানালার গণ্ডীর পারেই বিষ্টুদের উঠান। উঠানে প্রথমেই ধানের মরাইটা তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহার পর একটু দূরে একটি নারিকেল গাছ দেখা যায়। বাতাসে তাহার পাতা দুটা একটু ফাঁক হইয়া গেলে দেখিতে পাওয়া যায়,—হাঁ বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, বিমলাদের টিনের-ছাদ। ঐখান হইতে বিমলা তাহাকে রোজ দুপুরে ইসারা করিত না? ঠিক! বীণার ঠিক মনে পড়িল—দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গেলে পর শাশুড়ী বলিতেন—'যাও বউমা যাও এইবেলা একটু গড়িয়ে নাও গে যাও। বাগো যে রোদ্দুর! মাথা যেন ঝিম্ ঝিম্ করে!'...বীণা ঘরে ঢুকিয়া চুপি চুপি দরজা বন্ধ করিয়া দিত। তাহার পর ছাদের উপর হইতে বিমলা ইসারা করিলে বীণা প্রস্তুত হইয়া থাকিত। কিছু ক্ষণ পরে বিমলা আসিয়া আস্তে আস্তে ঘরের শিকল নাড়িত। সে চুপি চুপি দরজা খুলিয়া তাহার সহিত বাহির হইয়া যাইত।—দুপুরবেলা পাড়ার পথ নির্জ্জন। তাহারা দুই বন্ধুতে খিড়কী পার হইয়া 'কচে' পুকুরের পাড়ে যেখানে একটা সজিনা গাছ ঝড়ে নুইয়া পড়িয়াছে সেইখানে গিয়া বসিত। তার পর দু-জনায় কত কথা—।

বীণার এখনও মনে পড়ে...

হঠাৎ তাহার চিন্তাসূত্রে বাধা পড়িল। বিনয় স্নান করিয়া আসিয়া বলিল—ওগো একখানা কাপড় দাও ত!

বীণা স্বামীকে কাপড় দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বেলা হইয়া গিয়াছিল। কিছু ক্ষণ পরে বিনয় আসিয়া খাইয়া গেল। তাহার পর সরকারদের অনেকে। তাহার পর মেয়েরা খাইয়া লইল। দুপুরবেলা বীণার নিরবচ্ছিন্ন অবকাশটুকু যেন ফুরাইতে চাহে না! সে আস্তে আস্তে ছাদে চলিয়া গেল। ছাদের আলিসার পাশ হইতে দূরে অনেক দূর দেখা যায়। রৌদ্রে চুল মেলিয়া দিয়া সে দেখিতে লাগিল চাষারা বিলের ধারে পাট কাচিতেছে। এখান হইতে শব্দ শোনা যাইতেছে ধপ্... ধপ্...ধপ্... ভাদ্রের রৌদ্রে একটুতেই মাথা ঘুরিয়া যায়। বীণা একটু ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। দুপুরবেলা সমস্ত বাড়িটা নির্জ্জীব, নিস্তব্ধ। তাহার মনটা কেমন শূন্য হইয়া পড়ে। বিমলার কথা মনে পড়িত। কিন্তু রাণু আসিয়া অন্য কথা পাড়িল।

রাণু বীণার ছোট ননদিনী। বীণা তাহাকে একটা কাজে পাঠাইয়াছিল।

রাণু বলিল—দিয়ে এসেছি বৌদিদি। দাদা বললে—আচ্ছা আচ্ছা আমার মনে আছে, তুই এখন যা!

কথাটা শুনিয়া বীণার মনে হইল তাহার এইরূপ

করা উচিত হয় নাই। হয়ত বৈঠকখানা-ঘরে নবদেব বলিতেছে—গত সনের একটা মাস মাপ ক'রে দাও দাদামণি! পামারের যা হাল! এবার থেকে আলু খেয়ে থাকব। আর তোমার ধানের চাষ নয়!

বিনয় হাসিয়া বলিতেছে—সে সব জানি না। খড়ের দামটা ওতেই কাটান গেল।

সরকার-মশাই কানফোঁড় খতিয়ানে কলমের খোঁচায় কসি টানিতেছেন। খস্ খস্ শব্দ হইতেছে। এমন সময় রাণু গিয়া চিঠিখানি দিল। চিঠিখানি দেখিয়া বিনয়ের কান লাল হইয়া উঠিল। সরকার-মশাই একবার চশমার ফাঁকে বিনয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া লইলেন। ছিঃ! ছিঃ! বীণার লজ্জা করিতে লাগিল। সরকার-মশাই বুড়ো মানুষ, বিনয়কে এ বাড়িতে হইতে দেখিয়াছে, আর তাহারই কাছে…!

রৌদ্র এবার বেজায় চড়া হইয়া পড়িয়াছে। ছাদে আর বসিয়া থাকা যায় না। রাণু চলিয়া গিয়াছে।… বীণা ছাদ হইতে নামিয়া আসিল। আপনার ঘরে আসিয়া আস্তে আস্তে আঁচল হইতে চাবি লইয়া আলমারী খুলিল। আলমারীর ভিতর তাহার কাপড়-চোপড়গুলি গোছানই ছিল তবুও তাহার মন উঠে না। সেগুলি আবার নামাইয়া গোছাইতে লাগিল। হঠাৎ একখানি কাপড়ের ভাঁজের ভিতর তাকাইয়া—'যাঃ, কাপড়খানা রং লেগে একদম গেছে …কি ক'রে লাগ্‌ল?'—বীণা তাড়াতাড়ি কাপড়ের ভাঁজ খুলিয়া ফেলিল। ভাঁজ খুলিয়া ফেলিতেই তাহার ভিতর হইতে ফস্ করিয়া একটি সিন্দুরের কৌটা বাহির হইয়া পড়িল। কাপড়ের ভিতর সিন্দুর পড়িয়া গিয়া লাল হইয়া গিয়াছে! বীণা দু'হাতে কৌটাটি তুলিয়া লইল। কিন্তু ওকি? স্পষ্ট বাহিরে কাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। হাঁ, ঠিক তাহারই কণ্ঠস্বর বটে। বীণা চোখ বুজিয়া ফেলিল। সে এমনি করিয়া চোখ বুজিয়া থাকিবে। ঐ যে সে ঠিক শুনিতে পাইল—

'রাঙাদিদি খোকার মা
আমি না এলে যেয়ো না!'

বীণা বেশ চাপিয়া চোখ বুজিয়া ফেলিল। বিমলা আসিয়া না তাহার চোখ টিপিয়া ধরিলে সে খুলিবে না। একদিনের কথা তাহার মনে পড়িল। উঃ, সেদিন যা বীণা ভয় পাইয়া গিয়াছিল। তাহার এখনও মনে আছে। দুপুর-বেলা দালানে কেহ নাই। রান্নাঘরে বড় পিসিমা নারিকেল পাতা আর পাঁকাটি পোড়াইয়া রান্না করিতেছেন। তাহার একটা তীব্র গন্ধ আসিতেছে। একলা দালানে বসিয়া থাকিয়া বীণার কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। দালানের একদিকে বহু চাল-বোঝাই বস্তা পর্ব্বত-আকার সাজান ছিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল কে যেন তাহার ভিতর হইতে নড়িয়া উঠিল। ভয়ে তাহার আকণ্ঠ শুকাইয়া গেল। একবার ভাবিল দৌড়াইয়া রান্নাঘরে পলাইবে। কিন্তু সে অনেকখানি পথ। দরদালান পার হইয়া রান্নাঘরে দৌড়াইয়া পলাইবার সাহস তাহার ছিল না। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া চোখ বুজিয়া সে বসিয়া ছিল এমন সময় আবার—

রাঙাদিদি খোকার মা,
আমি না এলে যেয়ো না!

তখন বীণা বুঝিতে পারিল। 'উঃ, বিমলা এমনি ক'রে ভয় দেখাতে হয়!' আজও ভাবিল সে আসিয়াছে। কিন্তু আজ সে চোখ বুজিয়া থাকিবে। সে চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল। সে স্পষ্ট বিমলার আঙুলের স্পর্শ পাইল। সে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। বীণা দুই হাতে তাহার হাত দুখানি ধরিল। হাত ধরিয়া সে বিস্মিত হইল—একি বিমলা, তোর নরম হাত দুখানা একি হয়েছে! ইস্!

বিমলা বলিল—জানিস্ না বুঝি সেই যে তোর বাবার অসুখ করতে কলমিডেঙা গেলি। তার পর যে জ্বর ধরল আর কিছুতেই সারল না। কত সালসা, কত পাঁচন খেলাম, সব বৃথা গেল। তুই বুঝি আর কোন খবর রাখিস নে?

বীণা উত্তরে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। সত্যই বিমলাকে চিনিবার জো নাই! কি চেহারা ছিল তাহার—কি হইয়াছে! চুলগুলি উস্কখুস্ক, মুখখানি মলিন। রোগে মানুষকে দু-দিনেই এতখানি বদলাইয়া ফেলে! বীণার মনে ভারী দুঃখ হইল। বিমলা তাহার কত আপন ছিল। শ্বশুরবাড়ি আসিয়া সে এক জন সমব্যথী বন্ধু পাইয়াছিল বটে, কিন্তু অসুখ করিয়া সে যেন কত দূরে চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে আর দেখিতে পায় না। তাহার

বড় একলা-একলা ঠেকে। মিশিবার মত বীণার এখানে আর কেহ নাই।...

...শাশুড়ী ডাকিতেছিলেন—বউমা! ওমা এ কি মেয়ে তুমি! এই অবেলায় ভুঁয়ে শুয়ে থাকে বাছা? উঠে পড়, উঠে পড়!

ধড়মড় করিয়া বীণা উঠিয়া বসিল। কিন্তু কোথায় বিমলা, কোথায় কে! বীণা আলমারীসুদ্ধ কাপড় বিছাইয়া মেঝেয় আঁচল বিছাইয়া কখন শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অলক্ষ্যে কখন বেলা বহিয়া গিয়াছে। দূরে নারিকেল-বনের মাথার উপর বেলাশেষের রৌদ্র কাঁপিতেছে। বীণা লজ্জায় পড়িল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া সে কাপড় গুছাইতে লাগিল। শাশুড়ী বলিয়া গেলেন—দেখ মা, অমন অবেলায় আর ঘুমিও নি। অবেলায় ঘুমুলে গা ভারী করে!

* * * *

হারু সে দিন আসিয়াছিল।

উঠানে দাঁড়াইয়া সে বলিতেছিল—আমি আবার তেমনি সেয়না ছেলে খুড়ী! আমি আর সেদিন সারারাত ঘুমুলুম না। জেগে বসে রইলুম। তোমার বউমা আমাকে শোনালে। জানলার কাছকে এসে তিনবার ফুক্‌রুলে 'হারু! হারু! হরু!!' আমি কোন জবাব দিনু না। তার পর আর এক পোয়র বাদে একবার, তার পর আবার, এটা কি ভাল কাজ হচ্ছে খুড়ী। দয়ালদার এটা করা সমৃচীন হল? তুমি বল খুড়ী।

মোক্ষদা বলিলেন—সত্যি হারু, দয়ালের এ কাজ ভাল হচ্ছে না। মেয়ের অসুখ, ডাক্তার বদ্যি দেখাও। তা নয় এ সব আবার কি! তুকতুক আমি দেখতে পারি নে বাপু।

হারু আবার দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত বলিতে আরম্ভ করিল—তা জান না বুঝি খুড়ী, হারান কবরেজ যে এসে দিয়েছে? বলছে বাঁচবে না। তাই কোথা থেকে এক সাধু বাবাকে এনেছে। খুব তুকতুক হচ্ছে। হুম যাগ হচ্ছে।

তাহার পর কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস-ফিস্ করিয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ এই:—

রাত্রি দশটার পর সাধুবাবা হোমে বসেন। হোম শেষ করিয়া তিন প্রহরের সময় একটি ডাবের মুখ কাটিয়া জল বাহির করিয়া শুক্‌নো ডাবটি হাতে করিয়া বাহির হইয়া যান। তাহার পর নিজের সুবিধামাফিক কাহারও বাড়ির সম্মুখে গিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকেন। যদি সে সাড়া দিয়া ফেলে ত তখনই শুকনো ডাবের ভিতর জলের তরঙ্গ ফুটিয়া উঠিবে। সেই জল রোগীকে খাওয়াইবে। কিন্তু যাহার নাম ডাকা হইল সে সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া ভুগিয়া মরিবে।

কথাটা শুনিয়া মোক্ষদা দেবী অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহারই বাড়ির পাশে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এক জন হইয়া দয়াল এ কি আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। ঘরে বসিয়া সুস্থ শরীরে সবাইকে প্রাণের ভয়ে কাঁপিতে হইবে, এ কি অন্যায় কথা।

কথাটা ক্রমশঃ অনেকের নিকট রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মোক্ষদা সেদিন বীণাকে ডাকিয়া বলিলেন—বৌমা, আজ থেকে আর তোমার ঘাটে গিয়ে কাজ নেই; নবনে বালতি ক'রে জল তুলে এনে দেবে, তাতেই চান ক'রো—

বীণা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কেন মা, কি হয়েছে?

তিনি বলিলেন—না মা দিন-কাল ভাল নয়। ডামাডোলের দিন বাতাস খারাপ। হারুর বউকে বাতাস লেগেছে, আজ দু-দিন সে হাত-পা খিঁচে পড়ে আছে। মুখে জল দিচ্ছে না—দাঁতে কুটো কাটছে না, সে এক কাণ্ড!

বীণা অবাক হইয়া গেল। 'বাতাস লেগেছে!' যে বাতাস পাতায় পাতায় করুণ মর্ম্মর তোলে, হেনার শাখে দোলন দেয়, যে বাতাস ভুবন ভরিয়া ছড়াইয়া আছে, সেই বাতাস মানুষের মনের ভিতর অলক্ষ্যে আবার কি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে!

বীণার উপর মোক্ষদা দেবীর নজর আছে।

তিনি বধূর সম্বন্ধে বিশেষ কারণে উদ্বিগ্ন ছিলেন। বীণার ছেলেবেলা হইতে কি এক বদ স্বভাব সে ঘুমাইতে ঘুমাইতে অনেক সময় চলিয়া বেড়ায়। কখন কখন আবার ঘুমাইতে ঘুমাইতে 'উঃ' করিয়া সাড়া দিয়া উঠিয়া বসে। যেন কে তাহাকে ডাকিয়াছে। বিনয় তাহাকে দু-একবার ধরিয়া ফেলিয়াছিল। একদিন বেশ মনে পড়ে রাত্রিবেলা কে যেন ধড়াস করিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

:স উঠিয়া দেখিল তাহার পাশে বধূ নাই! তাহার ঘোর ‌:ন্দেহ হইল। তখন বাহিরে গিয়া দেখে ছাদের সিঁড়িটির রজা খোলা। তাহার ভিতর হইতে শুভ্র জ্যোৎস্নার খানিকটা াসিয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি সে ছাদে উঠিয়া পড়িয়া দখিল বীণা চোখ বুজিয়া ছাদে আলিসার পাশে গিয়া াড়াইয়া আছে।...আর একদিনের ঘটনা মোক্ষদা দেবী বিনয়কে শুনাইয়াছিলেন—গভীর রাত্রে তিনি দরজা খুলিয়া াহিরে যাইতেছিলেন, হঠাৎ দেখেন দরজার পাশে বধূ াক গ্লাস জল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

—ওমা, বউমা তুমি এত রাত্তিরে দাঁড়িয়ে?

বীণার স্বপনের আমেজ ভাঙিয়া গেল। সে বলিল—ুমি যে জল চাইলে মা খানিক আগে, তাই জল নিয়ে এলুম!

তিনি অবাক হইয়া গেলেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে াপনের মধ্যে হয়ত তাহার মনে হইয়াছে শাশুড়ী জল াহিয়াছেন, তাই জল লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। াশ্চর্য্য!

এই সমস্ত কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া একদিন মোক্ষদা-দবী পুত্র বিনয়কে বলিলেন—ওরে সজাগ হয়ে শুস; বউ যন রাত্রিরে কারুক সাড়া দিয়ে ফেলে না।

বিনয় বলিল—কই মা, আজকাল ত আর সে রকম করে না। সে অসুখ সেরে গেছে।

তিনি বলিলেন—সেরে যাক আবার ধরতে কতক্ষণ! ঃনিস নি বুঝি আবার কি হয়েছে। তোকে বলতে ভুলে গেছি। দয়ালদের বাড়ির পুব দিকের ঐ তেমাতাটা দিয়ে ার হাঁটিস নে। আজ সকালে গয়লা আসে নি, হারুকে াকতে যাচ্ছিলুম গাই দুয়ে দেবার জন্যে—দেখি তেমাতার াপর খেজুর-গাছটার গায়ে কে একটা ঘট বেঁধে রেখে গছে।

বিনয় শুনিয়া বলিল—তাই না কি! আমারও সেদিন জর পড়েছিল। দয়ালদার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম, দখি রাস্তার মাঝখানে কে খানিকটা চুল খুতকুড়ি দিয়ে ফলে রেখে গেছে। তখুনি আমি গিয়ে দয়ালদাকে াকলুম। সাড়া পেলুম না তাই, তা না হ'লে সেদিনই কচোট হ'য়ে যেত। মেয়ের অসুখ, ডাক্তার-বদ্যি দেখাও, া নয়। তুকতাক আবার কি!

মোক্ষদা ইসারা করিলেন—বীণা আসিতেছে, শুনিতে পাইবে। কাজেই বিনয় অন্য কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

আশ্বিন মাস পড়িয়া গেল। পূজা এবার মাসের মাঝেই। বোধন বসিয়াছে। পটুয়ারা রোজ দুপুরবেলা উৎসাহের সহিত ঠাকুর গড়িতেছে। নিস্তব্ধ ঠাকুর-দালানটি প্রাণ-প্রাচুর্য্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট বহু ছেলে-মেয়ে আসিয়া জড়ো হইয়াছে। দালানের এক পাশে বহুৎ কাদা ভিজান হইয়াছে। এক জন কাদা ঠেসিয়া মাখিতেছে। আজ হইতে কাঠামোর গায়ে কাদা দেওয়া হইবে।

বীণার আজকাল অবকাশ কম। দুপুরবেলা পটুয়াদের খাইবার সময় তাহাকে দাঁড়াইয়া তদ্বির করিতে হয়। সকাল-বেলা জনেরা মাঠে যাইবার পূর্ব্বে উঠানে আসিয়া বসে। তাহাদের সবাইকার কোঁচড়ে মুড়ি ঢালিয়া দিতে হইবে। মাঠে বসিয়া বিশ্রামের সময় তাহারা খাইবে—সে কাজের ভারও বীণার উপর। কাজেই সারা দিবসের মধ্যে বীণার অবকাশ অত্যন্ত অল্পই।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর হইতেই হঠাৎ সেদিন বৃষ্টি আসিল। বীণার কাজ সারিয়া আসিয়া শুইতে, যে রাত্রি হইল, পাড়াগাঁর পক্ষে তাহাকে ভারী রাত্রিই বলিতে হইবে। ঘরে আসিয়া বীণা দেখিল বিনয় পরিশ্রান্ত হইয়া বেঘোরে ঘুমাইতেছে। চারি দিক নিস্তব্ধ। শুধু যা জলপড়ার ছড় ছড় শব্দ হইতেছে। এলোমেলো বাতাস বহিতেছে। জানালাগুলো তাহার ধাক্কায় মাঝে মাঝে দুমদুম করিয়া উঠিতেছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় গোয়াল হইতে গরুগুলো ডাকিয়া উঠিতেছে। বীণা বেশ শুনিতে পাইল। তাহার পর সে কুলঙ্গীতে প্রদীপটির সলিতা টানিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রে তাহার মনে হইল কে যেন তাহার দরজা ঠেলিয়া ডাকিতেছে। আস্তে আস্তে উঠিয়া সে দরজা খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু কাহাকেও ত দেখিতে পাইল না! দরজা বন্ধ করিয়া দিতেছিল এমন সময় আবার সেই

'রাঙাদিদি খোকার মা
আমি না এলে যেয়ো না—'

বীণা অবাক হইয়া গেল। আবার সেই হাস্যময়ী বিমলা আসিল কি করিয়া! তার ত আর সে রূপ নাই।

আবার পূর্ব্বের শ্রী ফিরিয়া পাইয়াছে ; বীণা তাহাকে চিনিতেই পারে নাই। না চিনিবারই কথা।

বিমলা হাসিয়া বলিল—এত রাতে দেখে অবাক হয়ে গেছিস না বীণা? কিন্তু কি ক'রে দিনের বেলা আসবো বল্? জানিস্ না বুঝি আমার আজকাল তোদের বাড়ি আসা বন্ধ—রাত্তিরে লুকিয়ে—

বিমলার অসুখ সারিয়া গিয়াছে অথচ তাহাকে আসিতে দেওয়া হয় না! এইবার বীণা সমস্ত বিষয় পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারিল। সে বুঝিতে পারিল এই কারণেই সে যখন শাশুড়ীকে বিমলার কথা জিজ্ঞাসা করিত তখনই তিনি নয় সে-কথা উল্টাইয়া দিতেন আর নয় বলিতেন—থাক্ গে মা ওসব কথা! তুমি ঘরের বউ—ঘরের কথা বল! পরের কথায় কাজ কি আমাদের।…শাশুড়ীর উপর দারুণ বিতৃষ্ণায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। বিমলা বলিল—চল্ বউ, এক জায়গায় যাবি?…বীণা বলিল—যাব? এত রাত্রে আবার কোথায় যাব?…বিমলা বলিল—চল্ চিলমারীর জলার ধারে বর্ষায় রাশি রাশি কেয়াফুল ফুটে আছে। নিয়ে আসি গে যাই!

'কেয়াফুল'! পৃথিবীর মধ্যে বীণার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু এই কেয়াফুল। বিমলা পূর্ব্বে তাহাকে কত এই কেয়াফুল আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু চিলমারির জলা যে এখান হইতে বহুদূর। সেখানে কি এই দারুণ বর্ষায় নিশীথ রাত্রে যাওয়া যায়? কিন্তু দস্যি বিমলা ছাড়িল না। সে তাহাকে জোর করিয়া টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। ঘর ছাড়াইয়া, গণ্ডী পার হইয়া তাহারা পথে আসিয়া নামিল। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে। দারুণ বৃষ্টির মুখে কুলবধূর আর সে বেশবাস রহিল না; ঘোমটা তাহার খসিয়া পড়িল—অঙ্গের বসন লুটাইতে লাগিল। তীরের ফলার মত তীক্ষ্ণ বৃষ্টির বিন্দুগুলি তাহার সুকোমল অঙ্গটি বিদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু কি এক অজানা নেশার ঘোরে সে ছুটিতে লাগিল। বিমলা বলিল—'বউ পাচ্ছিস না গন্ধ! ঐ যে কেমন সুন্দর কেয়ার গন্ধ আসছে!' সত্যই বীণার মনে হইতে লাগিল দূর-দূরান্ত হইতে মাঠ পার হইয়া মাতাল কেয়াগন্ধের বন্যা আসিতেছে। কি সুন্দর সে গন্ধ। বীণার প্রাণ আকুল হইয়া ওঠে। কিন্তু অনভ্যস্ত পদক্ষেপে আর কত ক্ষণ সে ছুটিতে পারিবে? বার-বার সে বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—কোথায় রে! আর কত দূর? বিমলা বলিল—'ঐ যে জল দেখা যাচ্ছে, ঐ ত জলা!' কিন্তু বীণা কিছুতেই দেখিতে পাইল না। বিমলা তাহাকে ভীম-বলে টানিয়া লইয়া চলিল। সে ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িল। কিন্তু তবুও টলিতে টলিতে চলিতে লাগিল।… শেষে সত্য সত্যই তাহার সম্মুখে কেয়াবন আসিয়া দাঁড়াইল। হাজার হাজার কেয়াফুল ফুটিয়া আছে। সদ্য বর্ষায় স্নাত হইয়া তাহারা আকুল গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। পাগলের ন্যায় বীণা বনের ভিতর নামিয়া পড়িল। কাদায় তাহার পা ডুবিয়া গেল। কাঁটায় তাহার অঙ্গ কাটিয়া ছড়িয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। তবুও সে আরও ঘন বনের ভিতর ঢুকিতে লাগিল। কিসের নেশায় তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে যেন! হঠাৎ তাহার পায়ে কট্ করিয়া কি যেন কামড়াইয়া দিল। তীব্র যাতনায় কাতর হইয়া সে ডাকিয়া উঠিল—'বিমলা, ও বিমলা! দেখ্ ত কি কামড়াল' কিন্তু কোথায় বিমলা! সে চারি দিকে কোথাও বিমলাকে দেখিতে পাইল না। সে বহুক্ষণ মিলাইয়া গিয়াছে। এমনিতে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া সে ভয়ানক ভয় খাইয়া গেল কেয়াবনের পাশেই জলার কালো জল। বর্ষার আকাশের তলায় যেন তাহা আরও কালো মনে হইতেছিল। সেই দিকে তাকাইয়া তাহার মনে হইল বুঝি বর্ষায় জলার জল লক্ জিহ্বা বাড়াইয়া, প্রবল বন্যায় তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! ভয়ে, দংশনের অসহ্য যন্ত্রণায় সে কাতরাইতে লাগিল। নিস্তব্ধ রাত্রে, বিজন জলার তটটিতে তাহার আকুল কান্না ক্রমশঃ নীরব হইয়া আসিতে লাগিল।

*　　*　　*　　*

সেই রাত্রের শেষে…

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে কাহারা হ্যারিকেন হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি যাইতেছিল একটা ঝোপের কাছে আসিয়া তাহারা দাঁড়াইল। ঝোপের ভিতর হইতে ঠক্ ঠক্ শব্দ আসিতেছে। এক জন বলিতেছে—'সরল দেখে কাট হে, নইলে কাঁধে লাগবে—' আর এক জন কি বলিল ঠিক বোঝা গেল না।

লণ্ঠন-হাতে লোকগুলিকে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে

এক জন বলিল—'কেও—কে যায়?' 'আমরা—' 'ও গীণু দা, এত রাতে—?' 'দরকার আছে—তোমরা এখানে কন?' 'আজ দয়ালদার মেয়েটি মারা গেল কি না—বিমলা গো—!'

কথাটা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনয় খানিকটা দূর অগ্রসর হইয়া পড়িল। দূরে মাঠের দিক হইতে কে তাহাকে আলো নাড়িয়া সঙ্কেত করিতেছিল। সে সেইদিকে গিয়া পড়িলে নব্‌নে তাহাকে বলিল—'পাওয়া গেছে দাদাবাবু জলার ধারে—'

বিনয় তাড়াতাড়ি জলার দিকে চলিল—সেখানে পৌঁছিয়া সে দেখিল হারু কেয়াবনের ধারে জলের দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছে। বিনয় আসিয়াই জলের ভিতর নামিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু খপ্‌ করিয়া হারু তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—দাঁড়াও, দাঁড়াও, নেম না! এবার দশহারায় মা'র পুজো দাও নি। দেখ্‌তে পাচ্ছ না, জলের ভেতর কি?

বিনয় একবার জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর হাতে তুড়ি দিতেই সেটি মিলাইয়া গেল। সে ঝপ্‌ করিয়া জলে নামিয়া বীণাকে টানিয়া তুলিয়া আনিল।

সে অঙ্গে আর লাবণ্য নাই। বিষের ক্রিয়ায় অঙ্গ নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই দিকে তাকাইয়া বিনয় বলিল—যা হারু, শিগ্‌গীর রতন-ওঝার বাড়ি যা। বাড়ি চিনিস ত? তাড়াতাড়ি আসবি। দেরি করিস নি যেন!

হারু ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেল।

ভারতে নিম্নজাতি-সমস্যা

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, এম-এ, পিএইচ-ডি

বহুবর্ষ পূর্ব্বে বড় দুঃখে কবি লিখিয়াছিলেন :—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

তখন প্রায় কেহ কবির এই খেদোক্তিতে সাড়া দেয় নাই। তার পর যখন ভারত বহু ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া আসিয়া আপনার অবস্থা কতকটা বুঝিতে পারিল, তখন কেহ কেহ এই নিম্নজাতি-সমস্যা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সচেতন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে-চেতনাও ক্ষীণ, একান্ত বিদ্ধ না হইলে সে-চেতনা জাগে না। অথচ এই সমস্যার সমাধান না হইলে ভারতের মুক্তি সুদূরপরাহত।

ভারতবর্ষের সমাজে উচ্চ-নীচ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, আচরণীয়-অনাচরণীয় লইয়া বিচার যে অনুদারতার সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে, তাহা একান্ত শোচনীয় বিষয়। এই বিচারের ভিত্তিতে যে-সামাজিক কুপ্রথার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা ত নহেই, হিন্দুশাস্ত্রের নিত্যসিদ্ধ বিধিও নহে। অথচ এই নিয়ম তথা পাতিত্য আমাদের সামাজিক জীবনের সহিত এমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে, যে, উহার প্রাণঘাতী পীড়নে সামাজিক জীবন পঙ্গু ও ক্লিষ্ট ত হইয়াছেই, উহার সহজ গতিবেগ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে; তাই পাশ্চাত্য দেশের এক জন মনীষী ভারতবর্ষের মানুষকে এক প্রকার স্বতন্ত্র জীব বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন—homo dissidens, সে শুধু আপনাকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতেই ব্যস্ত—বর্তমান হিন্দুসমাজে বিভেদনীতি এতই প্রবল। সমস্যাটি কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই একটি কথা বলিলেই বুঝা যাইবে যে, ভারতের অর্দ্ধাধিক সংখ্যার হিন্দু অস্পৃশ্য বলিয়া তথাকথিত উচ্চজাতি হিন্দুর নিকট গণ্য হইয়া আসিতেছে।

অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যে, সমাজের ক্রম-বিকাশের ধারায় স্তরবিভাগ অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্র ও সভ্যতা গঠনের একটা প্রধান উপকরণ জেতা ও বিজিত জাতির

বৈষম্য। আর এই বৈষম্য যে ভারতবর্ষের অতীত যুগের ইতিহাসের জাতি-বিভাগের মূল তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবাগত শুক্লবর্ণ আর্য্য ও আদিম কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যের বিরোধই আহার বিহার ও যৌন সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইউরোপীয় জগতে রাষ্ট্ররূপ যুদ্ধ-বিগ্রহকে আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিয়াছে বলিয়া সেখানে জেতা জাতি বিজিত সমাজ হইতে চিরকালই আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। ইউরোপের মধ্যযুগের 'শিভ্যালরি'র (chivalryর) উৎপত্তি এইখানে। আমেরিকার প্রজাতন্ত্রেও আজ পর্য্যন্ত অভিজাতবর্গ ও জনসাধারণের বৈষম্য সমান অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সেখানে নিগ্রোদিগের প্রতি নির্ম্মম সামাজিক নিগ্রহ প্রজা-তন্ত্রের একটি দুরপনেয় কলঙ্ক। জার্ম্মেনীতে মধ্যযুগে সামরিক শ্রেণী,ব্যবসায়ী, শিল্পী ও কৃষকের যে ভেদবিভাগ ছিল, তাহা এমন একটা অসামঞ্জস্য সমাজে জাগাইয়া রাখিয়াছে, যাহার ফলে শ্রমিক-বিপ্লবের ইতিহাসে জার্ম্মেনীতে কার্ল মার্কসের এত প্রভাব হইয়াছিল। শ্রেণীচৈতন্য সেখানে ইউরোপের অন্য দেশের বহু পূর্ব্বে জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং আজও তাহা পাশ্চাত্য দেশের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত রাখিয়াছে। আর রুশিয়া দেশে এই অসামঞ্জস্য এমনই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, উহার ফলে একটা প্রচণ্ড বিপ্লব সংঘটিত হইল। রুশিয়ার এই বিপ্লব এখনও শান্ত হয় নাই, সামাজিক অসামঞ্জস্য দূর হইয়া কিরূপে আবার নূতন সমাজ-বিন্যাস দেখা দিবে তাহার নিরূপণ করিবার এখনও উপায় নাই। সমগ্র ইউরোপখণ্ডেই এখন ভাঙাগড়ার পালা চলিয়াছে, ব্যবসায়ী ও ধনীর প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে শ্রমজীবীর প্রভুত্ব ইউরোপের সমাজভিত্তি শিথিল করিয়া দিতেছে।

ভারতবর্ষ ও চীনদেশের অতীত ইতিহাসে সামাজিক স্তরবিভাগ যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা তত অধিক নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। তাই যুদ্ধের ক্রীতদাস গ্রীস ও রোমের ন্যায় ভারতের সমাজে তত পরিচিত নহে। পরিবার, কুল, জাতি ও শ্রেণীর প্রসার ও সমবায়ে প্রাচ্য সভ্যতায় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ বলিয়া ভারতে আর এক প্রকার শ্রেণী-বিভাগ জন্মলাভ করিয়াছে। কর্ম্ম, ক্রিয়া ও ব্যবসায় হিসাবে শ্রেণী-বিভাগ সেই কারণেই ভারতের আদিম বর্ণবিভাগের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে এবং চিরাচরিত শান্তিপূর্ণ কৃষিবৃত্তির অনুশীলনের ফলে এক দিকে যেমন শাস্ত্রবক্তা ব্রাহ্মণ জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছিল, অপর দিকে তেমন অগণ্য অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল; ইহারাই কৃষিকর্ম্মের নিম্নস্তরের কার্য্য চালাইয়া আসিতেছে, যথা চামার, নমঃশূদ্র, জালিক, ভুঁইমালী, ঈড়ভ, পুলেয়া, মাহার প্রভৃতি। চীনদেশে আমাদের ব্রাহ্মণ জাতির ন্যায় মাণ্ডারীণ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বাভাবিক, কিন্তু ভারতবর্ষের মত সেখানে সমাজ এত শতধাবিভক্ত নহে, সেখানে বিবাহ-বিচার নাই, অন্ন-বিচার নাই, সামাজিক নির্যাতন নাই। চীনদেশে যে-কেহ শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া মাণ্ডারীণের পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে ব্রাহ্মণত্বলাভের অনুরূপ অধিকার বহুকাল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান কালে অন্ন-বিচার ও স্পর্শ-বিচারের ভ্রান্ত বিশ্বাস অনেক সময়ে যে কিরূপ অযৌক্তিকতার প্রশ্রয় দিতেছে, যদি এখন তাহা ভাবিয়া না দেখা যায়, তাহা হইলে এদেশে সত্য, ন্যায় ও প্রেম আর অক্ষুণ্ণ থাকিবে কিনা সন্দেহ।

সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ও লজ্জাজনক বিষয় ভারতের পাতিত্য-প্রথা। নিম্নশ্রেণীর যে অশুচি ও অসভ্যতা ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে নিন্দা ও ঘৃণার মূল কারণ, তাহা অপরিহার্য্যভাবে এদেশে থাকিয়া গিয়াছে। বাংলা দেশে এই পাতিত্য-প্রথার বন্ধন নানা কারণে কতকটা শিথিল হইলেও মান্দ্রাজ ও রাজপুতানা প্রদেশে সে-বন্ধন বিশেষ-রূপেই কঠোর রহিয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে, বিশেষতঃ মালাবারে, ইহা কি নিদারুণ সামাজিক নিগ্রহের কারণ হইয়াছে তাহা বহু লেখক অতি করুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—সে বর্ণনা পাঠ করিয়া কোন্ হিন্দু লজ্জায় ও বেদনায় মস্তক অবনত না করিবেন ?

অথচ এই তথাকথিত নিম্ন ও পতিত জাতির মধ্যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই অন্তর্ভুক্ত; তাহারাই সমাজের মূলভিত্তি। জাতির এত বড় একটা অংশকে চিরকাল পঙ্গু করিয়া রাখা সমাজের পক্ষে কিরূপ আত্মঘাতী ব্যাপার তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার কিরূপ নিদারুণ বিষময় ফল হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সকল তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকই সামাজিক নির্যাতনে

পীড়িত ও অতিষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজকে হীনবীর্য্য করিয়া দিতেছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের নিম্নশ্রেণীর লোকের প্রতি দুর্বিনীত ব্যবহারের ইহা অপেক্ষা তীব্র নিন্দাবাদ আর কি হইতে পারে।

ভারতের তথাকথিত নিম্নজাতিরা নানা প্রকার অসুবিধা ও সামাজিক বাধার মধ্যে জীবনযাপন করিতেছে; তাহারা শিক্ষাবিষয়ে যথেষ্ট সুযোগ পায় না, তাহাদের নৈতিক উন্নতিবিধানের সুবিধা অল্প, তাহাদের রাজনীতিক ক্ষমতা সঙ্কীর্ণ, তাহারা সামাজিক বিধানে পঙ্গু এবং তাহাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ বাধাপ্রাপ্ত। তাহারা অধিকাংশ স্থলেই অশিক্ষিত, অথচ উচ্চজাতির অবহেলায় তাহাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা নাই বলিয়া, তাহারা নৈতিক বিষয়েও তেমন উন্নতি করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং যে-যুগে রাজনীতিক যোগ্যতা, অধিকার ও ক্ষমতা সকলই বহুলপরিমাণে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে, সে-সুযোগে শিক্ষার অভাবে তাহারা যে রাজনীতিক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? তাহারা সমাজের কঠোর বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে এমনই আবদ্ধ যে কোন দিক দিয়াই তাহারা মুক্তির আস্বাদ পায় না। ধর্ম্মানুষ্ঠানেও তাহারা তেমনই বাধাপ্রাপ্ত, জগৎপিতার সান্নিধ্য হইতে তাহারা বলপূর্ব্বক অন্যায়ভাবে বিতাড়িত। এই সমস্ত বাধা ও নির্যাতনের ফলে তাহারা তাহাদের সধর্ম্মী উচ্চশ্রেণীস্থ ভ্রাতৃবর্গের প্রতি বিমুখ ও মমতাশূন্য, এবং এই বৈরিভাব একান্ত স্বাভাবিক। একই ধর্ম্মের উচ্চ ও নিম্ন দুই শ্রেণীর মধ্যে এমন বিরোধের ভাব সমাজের পক্ষে কত দূর অকল্যাণকর, তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। বর্ত্তমান সময়ের অস্পৃশ্য জাতির মন্দিরপ্রবেশ-আন্দোলন কেবল এক দিক দিয়া সমাজের এই অকল্যাণ দূর করিবার একটি সামান্য উপায়। কিন্তু এই ব্যাধি এত সরল নহে, ইহা আরও অনেক জটিল এবং ইহার প্রতিবিধানের উপায়ও বহুমুখী।

তথাকথিত নিম্নজাতির সমুন্নয়ন ব্যতিরেকে ভারতের জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত। যেমন, কোনও একটি অঙ্গের পুষ্টির অবহেলায় সমগ্র দেহের পুষ্টি অসম্ভব, সেইরূপ এক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট উন্নতি না হইলে সমগ্র জাতির উন্নতির চেষ্টা নিষ্ফল; এবং ভারতের হিন্দুজাতির সামাজিক ভিত্তি এমনভাবে গঠিত যে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ এবং এক অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সুতরাং হিন্দুর এইরূপ সামাজিক গঠনে অনুন্নত শ্রেণীর সম্যক উন্নয়ন ব্যতীত সমগ্র জাতির উন্নতিসাধন অলীক কল্পনা মাত্র।

অতীত কালে হিন্দুসমাজ নিম্ন ও পতিত জাতির উন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল—বর্ণব্রাহ্মণ ও পুরোহিত-সম্প্রদায় উহাদের শিক্ষা-দীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল, শিব ও শক্তি পূজা তাহাদের আদিম গাছ, পাথর ও সূর্য্যপূজাকে রূপান্তরিত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অপক্ব মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, নিম্নজাতির নেতাকে রাজবংশী, উগ্রক্ষত্রিয়, ব্যাগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, পুরাতন 'টোটেম' (totem)-এর পরিবর্ত্তে গোত্রের প্রভাব ও বিবাহ-বিচার দেখা দিয়াছিল। এইরূপে নানা উপায়ে নূতন বিধিনিষেধের বলে যে কত নিম্নজাতি শৌচাচার লাভ করিয়া হিন্দুসমাজের গণ্ডীর মধ্যে সহজে অতর্কিত ভাবে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। অতীত যুগে হিন্দুধর্ম্ম ডঙ্কা না বাজাইয়া এইরূপে আপনার সংস্কারসাধন করিয়াছিল। সেই জন্যই ইহা আরও দুঃখের বিষয় যে, হিন্দুসমাজের এই কল্যাণকর অনাড়ম্বর প্রচার ও প্রসার কার্য্য আর সেইরূপ কল্যাণের পথে চলিতেছে না। যাহা অস্ফুট, যাহা প্রতিরুদ্ধ, তাহাকে জাতীয়তার নূতন আদর্শের প্রেরণায় প্রস্ফুট ও প্রখর করিয়া তোলা আমাদের সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য। উচ্চজাতির মনোভাবের পরিবর্ত্তনের উপর নিম্নজাতির উন্নয়ন নির্ভর করিতেছে। উচ্চজাতির লোকেরা আপনাদিগকে পতিত জাতির অবস্থাপন্ন মনে করিয়া লইয়া যদি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, তবেই আন্তরিক সহানুভূতি দিয়া তাহারা নিম্নজাতির প্রকৃত উন্নতিসাধন করিতে পারিবে, নতুবা কৃত্রিম চেষ্টায় কোনও সুফলের আশা নাই। কেবল বক্তৃতা বা সভাসমিতিতে মন্তব্যগ্রহণ এ সমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধান করিবে না। কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার মহান্ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী প্রাণের আবেগে আন্তরিকভাবে হিন্দুসমাজের নেতৃগণকে এই কর্ত্তব্যের দিকে আহ্বান করিয়াছেন। সেদিন ত তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন, নিম্ন ও পতিত জাতির

উন্নয়ন না করিলে স্বরাজলাভ অসম্ভব ও অলীক। নিম্ন ও পতিত জাতিরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; কেবল পরমুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না, অনেক স্থলে তাহাদের আত্মনির্ভরশীল হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগের মধ্যে যে কতকগুলি কুপ্রথা ও কু-অভ্যাস আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, উহাদের প্রভাব হইতে তাহাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে, তাহাদের মনে রাখিতে হইবে যে বাস্তবিক যোগ্য না হইলে কেহ কোনও বিষয়ের অধিকারী হয় না। হিংসা বা দ্বেষে কোনও উচ্চ কার্য্য সাধিত হয় না, প্রেম ও যোগ্যতায় মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

এখনও ভারতের স্থানে স্থানে সমাজের সেই প্রাচীন সজীবতা বর্ত্তমান রহিয়াছে, এখনও প্রেম ও সহানুভূতির ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত প্রবাহিত হইতেছে। উৎকট ভেদনীতির প্রভাব সত্ত্বেও এখনও মান্দ্রাজের অনেক গ্রামে গ্রাম্য পঞ্চায়েতে নিম্নশ্রেণীর লোকেরও বিচার করিবার অধিকার আছে, গ্রাম্য উন্নতির জন্য যে-সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় তাহাতে নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও চাঁদা দিয়া থাকে, নিম্নশ্রেণীর ভগবতী-পূজায় মহিষের মূল্যের জন্য ব্রাহ্মণগণও অর্থ দিয়া থাকে। জাতিপঞ্চায়েৎ যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চ-নীচ জাতির আত্মরক্ষার সহায়ক, তেমনই গ্রাম-পঞ্চায়েতে বিভিন্ন জাতির ক্রিয়া ও স্বার্থের সমবায় সাধিত হয়। যদিও আধুনিক কুপ্রথা ও কুরীতি এই সমবায়কে যথেষ্ট লাঞ্ছিত করিয়াছে, তথাপি এই সমবায়ই ভারতের সনাতন প্রথা, নিত্যসিদ্ধ রীতি। নিম্ন ও উচ্চ জাতির মিলন ঘটাইতে হইলে এই সমবায়কে পুনরায় জাগাইয়া তুলিতে হইবে। জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে এই সমবায় যাহাতে শুধু বারোয়ারী পূজায় নহে, নিম্নশ্রেণীর শিক্ষোপযোগী নৈশবিদ্যালয়, বিজ্ঞানাগার, কৃষি ও শিল্প সমবায়ের অনুষ্ঠানে নূতন মূর্ত্তি লাভ করে, তাহার জন্য নূতন করিয়া সেবা ও সাম্যের বার্ত্তা প্রচার করিতে হইবে।

এই ভারতেই কবে কোন্ অতীত যুগে প্রথম রবির কিরণ-সম্পাতের সঙ্গে সঙ্গে তপোবনে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রসঙ্গে সাম্যমন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহার অনুরণন এখনও থামিয়া যায় নাই। সেই সাম্যমন্ত্রের দ্বারাই বৈষম্যের মধ্যে ঔদার্য্য, অসামঞ্জস্যের মধ্যে সমন্বয় ফিরিয়া আসিবে। যুগে যুগে ইতিহাস যে মনকে হীনবীর্য্য করিয়া দিয়াছে; বিদেশীর সংস্পর্শে হৃতগৌরব ভারতবর্ষে আত্মরক্ষাকল্পে কঠোর বিধানে বিধিনিষেধের লৌহশৃঙ্খলের প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন জাতীয় বিশুদ্ধিরক্ষা-নিবন্ধন ক্রিয়া ও কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক জন্মবিচার জাতি-বিভাগের ভিত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছিল, তখন বীরাচারের বন্যায় প্লাবিত ও নানা বিদেশীর আচার-ব্যবহার ও মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের দুর্নীতির প্রকোপে জর্জ্জরিত দেশকে বাঁচাইবার জন্য বিবাহ-বিচারের দ্বারা সমাজস্থিতি রক্ষার আবশ্যকতা হইয়াছিল, তখন ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শ হইতে রক্ষাকল্পে ধর্ম্মমন্দিরে কঠোর রক্ষী ও পর্য্যবেক্ষকের কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহার পর কত যুগ অতীত হইয়াছে, কখনও কৃষ্ণ, কখনও বুদ্ধ, কখনও রামানুজ, কখনও কবীর, কখনও চৈতন্য ভারতে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের দ্বারা এই অধিকার-ভেদকে খর্ব্ব করিয়াছেন, জাতি-বৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, প্রীতির দ্বারা সামাজিক শৃঙ্খল ভাঙিতে চাহিয়াছেন এবং সমবেদনা ও সহানুভূতির দ্বারা উচ্চ ও নীচের প্রভেদ ঘুচাইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার এখন নূতন শিক্ষার আলোকে বৈষম্যের অন্ধকার দূর করিয়া সাম্যের আসন প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় আসিয়াছে, পাঞ্চজন্য-নির্ঘোষে ভারতবাসীকে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইবার আহ্বান আসিয়াছে। সে-আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিলে হিন্দুর বাঁচিবার আর উপায় থাকিবে না, তাহার শক্তি পঙ্গু হইবে, তাহার সুখ-সৌভাগ্য চিরতরে অন্তর্হিত হইবে।* বহু বর্ষ পূর্ব্বে কবির সাবধান-বাণী বজ্রনির্ঘোষে বাজিয়া উঠিয়াছিল :—

শতেক শতাব্দী ধরে' নামে শিরে অসম্মানভার
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার!
তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও নাকি
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান্,
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।
দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে!
সবারে না যদি ডাক,
এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হবে তব চিতাভস্মে সবার সমান।

* এই প্রবন্ধের ঐতিহাসিক উপকরণ অধ্যাপক ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বিশ্বভারত" গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

সে-কালিনী ও আধুনিকা

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

শুনেছিনু, নারী প্রাচীন ভারতে
অশ্ববল্‌গা ধরেছিল রথে—
দ্রুত পলাইতে প্রিয়তমসহ।
কাব্যে কেবা তা রচে নাই কহ?
পদগতি নয় রথগতিশীলা!—
আজো বহু কবি গাহে সেই লীলা!
মণিপুর-সুতা—দুহিতা রাজার,—
করে লয়ে ধনু পিঠে তূণভার,
পুরুষের বেশে ছুটেছে যখন,—
গজগামিনী কি ছিল সে তখন?
পদগতিবেগ কে মেপেছে তার
ঘন বনে যবে খুঁজেছে শিকার?—

অতীতে একদা ধনু তরবারি
ধরেছে শুনেছি একাধিক নারী!
অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিয়াছে বেগে,—
গেয়েছে নেচেছে নিশি নিশি জেগে।
দেখেছি তাদের কুঞ্জগলিতে
ক্ষিপ্রচরণে একাকী চলিতে।
দুর্য্যোগ-রাতে গভীর আঁধারে
কত সাহসিকা গেছে অভিসারে।
মরালগামিনী,—হ'লে প্রয়োজন
মৃগগামিনী কি হন্ নি তখন?—
গৌড়ে না হোক্ আর্য্যাবর্ত্তে
হেন বীরনারী ছিল এ মর্ত্ত্যে।

সেই গজ-বাজী-রথ-পথ যুগে
কবি কালিদাসও গিয়েছেন ভুগে।
নূপুরহীনার চপল চরণ
করেছে সমানই হৃদয়হরণ!
অপ্সরী চেয়ে তাপসীরা তাই
তাঁহার কাব্যে ছোট হন নাই।
নারী-প্রগতির প্রার্থিত দিনে
ধরে যদি গাড়ী, ছুটে পথ চিনে
কোনো আধুনিকা নবীনা তরুণী
কেন বিস্ময় সে ঘটনা শুনি?
পাদুকা-মুখর চরণ-শব্দ
করে নি ত কোনো কবিকে জব্দ?—

চুপি চুপি, শোন, বলি কানে কানে,—
জাগায় কাব্য-অনুভূতি প্রাণে
রম্য মধুর যাদের সঙ্গ,—
তাদের কোমল চরণভঙ্গ
নূপুর ত্যজিয়া হ'ল সম্প্রতি
পাদুকা-মুখর,—তাহে কী বা ক্ষতি?
স্নিগ্ধচ্ছায়া সে অতীত দিবা,
ছিল না রবির খর-কর বিভা!
মেঘদূত তাই রচিত অতীতে!—
বিদ্যুৎ-দূত রচিবেন গীতে—
আধুনিকাদের আধুনিক কবি,
আলোকদীপ্ত উজ্জ্বল রবি।

এই কবিতাটির নামটির জন্য লেখিকা দায়ী নহেন। প্রবাসীর সম্পাদক।

আধুনিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠি তব পড়িলাম, বলিবার নাই মোর,
তাপ কিছু আছে তাহে, সন্তাপ তাই মোর।
কবি-গিরি ফলাবার উৎসাহ-বন্যায়
আধুনিকাদের 'পরে করিয়াছি অন্যায়
যদি সন্দেহ করো এত বড়ো অবিনয়
চুপ ক'রে যে সহিবে সে কখনো কবি নয়।
বলিব দু-চার কথা, ভাল মনে শুনো তা ;
পূরণ করিয়া নিয়ো প্রকাশের ন্যূনতা।

পাঁজিতে যে আঁক টানে গ্রহ-নক্ষত্তর
আমি তো তদনুসারে পেরিয়েছি সত্তর।
আয়ুর তবিল মোর কুষ্ঠির হিসাবে
অতি অল্প দিনেই শূন্যেতে মিশাবে।
চলিতে চলিতে পথে আজকাল হর্‌দম
বুকে লাগে যম-রথ-চক্রের কর্দ্দম।
তবু মোর নাম আজো পারিবে না ওঠাতে
প্রাত্নিক তত্ত্বের গবেষণা-কোঠাতে।
জীর্ণ জীবনে আজ রং নাই মধু নাই
মনে রেখো তবু আমি জন্মেছি অধুনাই।
সাড়ে আঠারো শতক A.D. সে যে B.C. নয়
মোর যারা মেয়ে বোন, নারদের পিসি নয়।
আধুনিকা যারে বলো তারে আমি চিনি যে,
কবি-যশে তারি কাছে বারো আনা ঋণী যে।
তারি হাতে চিরদিন যৎপরোনাস্তি
পেয়েছি পুরস্কার, পেয়েছিও শাস্তি।
প্রমাণ গিয়েছি রেখে, এ-কালিনী রমণীর
রমণীয় তালে বাঁধা ছন্দ এ ধমনীর।

কাছে পাই হারাই-বা তবু তারি স্মৃতিতে
সুর-সৌরভ জাগে আজো মোর গীতিতে।
মনোলোকে দূতী যারা মাধুরী-নিকুঞ্জে
গুঞ্জন করিয়াছি তাহাদেরি গুণ-যে।
সেকালেও কালিদাস বররুচি আদিরা,
পুরসুন্দরীদের প্রশস্তিবাদীরা,
যাদের মহিমাগানে জাগালেন বীণারে,
তারাও সবাই ছিল অধুনার কিনারে।
আধুনিকা ছিল নাকো হেন কাল ছিল না,
তাহাদেরি কল্যাণে কাব্যানুশীলনা।
পুরুষ কবির ভালে আছে কোনো সুগ্রহ
চিরকাল তাই তারে এত মহানুগ্রহ।
জুতা পায়ে খালি পায়ে স্লিপারে বা নূপুরে
নবীনারা যুগে যুগে এল দিনে দুপুরে,
যেথা স্বপনের পাড়া, সেথা যায় আগিয়ে,
প্রাণটাকে নাড়া দিয়ে গান যায় জাগিয়ে।
তবু কবি রচনায় যদি কোনো ললনা
দেখো অকৃতজ্ঞতা, জেনো সেটা ছলনা।
মিঠে আর কটু মিলে মিছে আর সত্যি
ঠোকাঠুকি ক'রে হয় রস-উৎপত্তি।
মিষ্ট কটুর মাঝে কোন্‌টা যে মিথ্যে
সে কথাটা চাপা থাক্ কবির সাহিত্যে।
ঐ দেখো, ওটা বুঝি হ'ল শ্লেষবাক্য।
এ রকম বাঁকা কথা ঢাকা দিয়ে রাখ্য।
প্রলোভনরূপে আসে পরিহাসপটুতা,
সামলানো নাহি যায় অকারণ কটুতা।
বারে বারে এই মতো করি অত্যুক্তি,
ক্ষমা ক'রে কোয়ো সেই অপরাধমুক্তি॥

আর যা-ই বলি নাকো এ কথাটা বলিবই
তোমাদের দ্বারে মোরা ভিক্ষার থলি বই।

অন্ন ভরিয়া দাও সুধা তাহে লুকিয়ে,
মূল্য তাহারি আমি কিছু যাই চুকিয়ে।
অনেক গেয়েছি গান মুগ্ধ এ-প্রাণ দিয়ে,
তোমরা তো শুনেছ তা, অন্ততঃকান দিয়ে।
পুরুষ পরুষ ভাষে করে সমালোচনা,
সে অকালে তোমাদেরি বাণী হয় রোচনা।
করুণায় ব'লে থাকো, "আহা, মন্দ বা কী !"
খুঁটে বের করো না তো কোনো ছন্দ-ফাঁকি।
এইটুকু যা মিলেছে তাই পায় ক'জনা,
এত লোক করেছে তো ভারতীর ভজনা।
এর পরে বাঁশি যবে ফেলে যাব ধূলিতে
তখন আমারে ভুলো পারো যদি ভুলিতে।
সেদিন নূতন কবি দক্ষিণ পবনে
মধু ঋতু মুখরিবে তোমাদের স্তবনে,
তখন আমার কোনো কীটে-কাটা পাতাতে
একটা লাইনো যদি পারে মন মাতাতে
তা হ'লে হঠাৎ বুক উঠিবে যে কাঁপিয়া
বৈতরণীতে যবে যাব খেয়া চাপিয়া।
এ কী গেরো ! কাজ কী এ কল্পনা-বিহারে,
সেন্টিমেণ্টালিটি বলে লোকে ইহারে!
ম'রে তবু বাঁচিবার আব্‌দার খোকামি,
সংসারে এর চেয়ে নেই ঘোর বোকামি।
এটা তো আধুনিকার সহিবে না কিছুতেই
এস্‌টিমেশনে তার পড়ে যাব নীচুতেই।
অতএব মন, তোর কল্‌সী ও দড়ি আন্‌
অতলে মারিস্‌ ডুবঃMid-Victorian।
কোনো ফল ফলিবে না আঁখিজল-সিচনে,
শুকনো হা'সিটা তবে রেখে যাই পিছনে।
গদ্‌গদ স্বর কেন বিদায়ের পাঠটায়,
শেষ বেলা কেটে যাক্‌ঠাট্টায় ঠাট্টায়॥

তোমাদের মুখে থাক্ হাস্যের রোস্‌নাই,
কিছু সীরিয়াস্ কথা বলি তবু, দোষ নাই।
কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী
শুধু এ-কালিনী নয়, যারা চিরকালিনী।
এ কথাটা ব'লে যাব মোর কন্‌ফেশানেই
তাদের মিলনে কোনো ক্ষণিকের নেশা নেই।
জীবনের সন্ধ্যায় তাহাদেরি বরণে
শেষ রবি-রেখা র'বে সোনা-আঁকা স্মরণে।
সুর-সুরধুনীধারে যে অমৃত উথলে
মাঝে মাঝে কিছু তার ঝ'রে পড়ে ভূতলে,
এ জনমে সে কথা জানার সম্ভাবনা
কেমনে ঘটিবে যদি সাক্ষাৎ পাব না।
আমাদের কত ত্রুটি আসনে ও শয়নে,
ক্ষমা ছিল চিরদিন তাহাদের নয়নে।
প্রেম-দীপ জ্বেলেছিল পুণ্যের আলোকে,
মধুর করেছে তারা যত কিছু ভালোকে।
নানারূপে ভোগসুধা যা করেছে বরষণ
তারে শুচি করেছিল সুকুমার পরশন।
দামী যাহা মিলিয়াছে জীবনের এ পারে
মরণের তীরে তারে নিয়ে যেতে কে পারে।
তবু মনে আশা করি মৃত্যুর রাতেও
তাহাদেরি প্রেম যেন নিতে পারি পাথেয়।
আর বেশি কাজ নেই, গেছে কেটে তিনকাল,
যে কালে এসেছি আজ সে কালটা Cynical।
কিছু আছে যার লাগি সুগভীর নিশ্বাস
জেগে ওঠে, ঢাকা থাক্ তার প্রতি বিশ্বাস।

একটু সবুর করো, আরো কিছু ব'লে যাই,
কথার চরম পারে তার পরে চলে যাই।
যে গিয়েছে তার লাগি খুঁচিয়ো না চেতনা,
ছায়ারে অতিথি ক'রে আসনটা পেত না।

বৎসরে বৎসরে শোক করা রীতিটার
মিথ্যার ধাক্কায় ভিৎ ভাঙে স্মৃতিটার।
ভিড় ক'রে ঘটা ক'রো ধরা-বাঁধা বিলাপে
পাছে কোনো অপরাধ ঘটে প্রথা-খিলাপে,
ভারতে ছিল না লেশ এই সব খেয়ালের,
কবি 'পরে ভার ছিল নিজ মেমোরিয়ালের।
"ভুলিব না ভুলিব না" এই ব'লে চীৎকার
বিধি না শোনেন কভু, বলো তাহে হিত কার।
যে ভোলা সহজ ভোলা নিজের অলক্ষ্যে
সেই ভালো হৃদয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে।
শুষ্ক উৎস খুঁজে মরুমাটি খোঁড়াটা,
তেলহীন দীপ লাগি দেশালাই পোড়াটা
যে-মোষ কোথাও নেই সেই মোষ তাড়ানো,
কাজে লাগিবে না যাহা সেই কাজ বাড়ানো.
শক্তির বাজে ব্যয় এরে কয় জেনো হে,
উৎসাহ দেখাবার সদুপায় এ নহে।
মনে জেনো জীবনটা মরণেরই যজ্ঞ.
স্থায়ী যাহা, আর যাহা থাকার অযোগ্য
সকলি আহুতি রূপে পড়ে তারি শিখাতে,
টি'কে না যা, কথা দিয়ে কে পারিবে টি'কাতে।
ছাই হয়ে গিয়ে তবু বাকি যাহা রহিবে
আপনার কথা সে তো আপনিই কহিবে॥

লাহোর
১৫ ফেব্রুয়ারী
১৯৩৫

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

৫

ট্রাম-চলা বড় রাস্তা হইতে সরু-ফুটপাথওয়ালা পথ সোজা পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে ; তাহার এক প্রশাখার মত গলিটি দক্ষিণ দিকে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আবার পূর্ব্বদিকে আঁকিয়া-বাঁকিয়া বৃহৎ বাড়িগুলির সীমান্তে হারাইয়া গিয়াছে। অরুণদের বাড়ির সম্মুখে গলিটি সরু, সোজা, নিঝুম। উত্তরে ঘোষ বংশের প্রাচীন প্রাসাদভূমির জীর্ণ হলদে দেওয়াল, দক্ষিণে মল্লিকদের বাগানের উচ্চ শুভ্র প্রাচীর ও কয়েকটি ক্ষুদ্র পুরাতন বাড়ি। আম, নিম, কদম্ব নানা বৃক্ষের শাখা গলির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। প্রভাতের রৌদ্র তির্য্যকভাবে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য গলিটিকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে, মধ্যাহ্নে বৃক্ষশাখাগুলির সুস্নিগ্ধ ছায়াপাত হয়, রাত্রে জ্যোৎস্না মায়াজাল বোনে। এখানে কলিকাতার জনস্রোত অতি মন্দ ; সকালে ছেলেরা হল্লা করিয়া স্কুলে যায় ; দুপুরে কোন পথভ্রান্ত ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া চলে, 'চুড়ি চাই' 'ছাতা সারাবে গো', তাহাদের উদাস কণ্ঠের সুর করুণ প্রতিধ্বনির মত গলিটিতে ঘুরিয়া বেড়ায় ; সন্ধ্যার পর সব নিস্তব্ধ, ঘুমন্ত। কোন ভাড়াটে গাড়ী যখন ঝন্ ঝন্ শব্দে চলিয়া যায়, ঘোড়ার খুরের শব্দে সমস্ত পথ কাঁপিয়া উঠে। গভীর রাত্রে যখন ব্যারিষ্টার ঘোষের লম্বা বড় মোটরকার হেড লাইট জ্বালাইয়া প্রবেশ করে, মনে হয় কোন অতিকায় সরীসৃপ মাথায় মণি জ্বালাইয়া অন্ধ বিবরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এ গলিতে মোটরকার মানায় না। পূর্ব্বে যখন ঘোষেদের, মল্লিকদের বাবুরা জুড়ি গাড়ী হাঁকাইয়া বাহির হইতেন, পাড়ার গৃহিণীগণ পাল্কী চড়িয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন, তখন গলিটি সজীব ছিল।

গলিতে ছয় ঋতুর লীলা করুণ সুন্দর। ফাল্গুনে ঝরা-পাতার পীত আবর্জ্জনায় বসন্ত-বাতাস হতাশ্বাসের মত বহিয়া যায়। গ্রীষ্মে আম্রমুকুল বকুল ফুল ঝরিয়া পড়ে, রৌদ্রে পাথরগুলি ঝিকিমিকি করে। বর্ষার সঘন অন্ধকারে গৈরিক স্রোত বন্যাজলের মত বেগে প্রবাহিত হয়, ছোট ছেলেমেয়েদের কাগজের নৌকা ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। কত বিগত আশ্বিনে এখানে পূজার বাজনা বাজিয়াছে, লোকে লোকারণ্য, কোন্ বাড়ির প্রতিমা আগে যাইবে, বলিয়া লাঠালাঠি হইয়াছে, এখন কেবল দুই পার্শ্বের বাগান হইতে উদাস স্মৃতির মত শেফালীর মৃদু গন্ধ আসে, অপরাজিতা লতার নীল ফুলগুলি হলদে দেওয়াল ভরিয়া গলির উপর ঝুলিয়া পড়ে।

খিলানওয়ালা বড় গেট পার হইয়া অরুণদের বাড়িতে প্রবেশ করিলে প্রথমেই চোখে পড়ে বৃহৎ প্রাসাদের দ্বিতল অংশের আইয়োনিক থামগুলির সারি। ছাদওয়ালা ঝিলিমিলি-ঢাকা প্রশস্ত বারান্দার সম্মুখে আইয়োনিক থামগুলি যেমন মোটা তেমনি উঁচু, দুই কোণে ও মধ্যে এক জোড়া করিয়া।

দক্ষিণমুখী প্রাসাদের সম্মুখে ডিম্বাকৃতি ফোয়ারা ও বড় বড় কালো পাথর-গাড়া কৃত্রিম পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা বিশেষ কিছু নাই ; ফোয়ারার স্বচ্ছ জলে লাল নীল মাছ খেলা করে, এই মাছগুলি প্রতিমার প্রিয় ; তাহাদের পরিচর্য্যার ভার সে লইয়াছে।

দুই মহলওয়ালা চক-মিলান বাড়ি। ঢুকিয়াই চকবন্দী বৃহৎ অঙ্গন। প্রাচীন কালে এখানে কত যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, কবির লড়াই হইয়াছে, এখন শূন্য অঙ্গন দেখিলে বুকটা খচ্ খচ্ করে। সম্মুখে পূজার দালান, মেঝের মার্ব্বেল পাথর অধিকাংশ ফাটিয়া ভাঙিয়া গিয়াছে, এক কোণে কয়েকটি ভাঙা চেয়ার ও বাক্স জড়ো করা, যেন গুদামঘর ; শূন্য ঠাকুর-দালান দেখিলে মনে বেদনা হয়।

অঙ্গনের পূর্ব্বদিকে লাইব্রেরী-ঘর। সাহেবী দোকানে তৈরি নানা আসবাবে ভরা : আলমারীগুলিতে নানা পুরাতন গ্রন্থ—শেক্সপীয়ারের অষ্টাদশ শতাব্দীর এক সংস্করণ, স্কটের ওয়েভারলি উপন্যাসাবলী, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ছাপা ;

ডিকেন্স, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের নানা গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ, প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি ; ফার্দ্দুসী, হাফেজ, নানা ফারসী কবির গ্রন্থ। দেওয়াল জুড়িয়া অরুণের প্রপিতামহের অয়েল পেন্টিং—মাথায় কাজ-করা শামলা, গায়ে শালের চোগাচাপকান, বীর্য্যব্যঞ্জক মুখ, ওষ্ঠাধর পাতলা ও চাপা, টানা চোখ দুটি জ্বল জ্বল করিতেছে।

অঙ্গণের পশ্চিমে দপ্তরখানা। ময়লা ফরাসের ওপর সরকার-মহাশয় সকালে হিসাব লেখেন, দুপুরে গড়গড়া টানিতে টানিতে নিদ্রা যান। অঙ্গনের দক্ষিণে দুইটি বৈঠকখানা-ঘর। একটিতে তক্তার ওপর ফরাসপাতা, মোটা মোটা তাকিয়া সাজান। সে ঘরে কেহ বসে না। সরকার-মহাশয় রাত্রে নিদ্রা যান।

অপর বৈঠকখানায় চেয়ার-টেবিল সাজান। ষোড়শ লুই চেয়ারগুলির বাঁকা পায়া নড়বড় করে, কার্পেটগুলির চিত্র মলিন। ইহাদের মধ্যে নূতন হালফ্যাসানের চেয়ারগুলি বড় বেমানান দেখায়। প্রয়োজন হইলে অরুণের সাহেব-কাকা এই ঘরে মাঝে মাঝে বসেন। তাঁহার ঘর বৈঠকখানা-ঘরগুলির উপর দোতলায়।

শিবপ্রসাদ দিনের বেলায় বাড়িতে অল্প সময়ই থাকেন। আইয়োনিক থামওয়ালা প্রশস্ত বারান্দায় যখন প্রভাতের রৌদ্র আসিয়া পড়ে, তাঁহার শোবার ঘরের জানালা বন্ধ থাকে। সকাল আটটার সময় ছকু খানসামা চায়ের পেয়ালা ও দাড়ি-কামাইবার গরম জল লইয়া শিবপ্রসাদের শয়নগৃহে প্রবেশ করে। নয়টার সময় স্নান করিয়া তিনি ব্রেকফাষ্ট খান। দপ্তরখানার উপর দোতলায় তাঁহার খাবার ঘর। মেহগ্নী কাঠের লম্বা বড় সাইডবোর্ড, দেওয়ালে অনেকগুলি বাঁধানো ছবি, ঘরটি সুসজ্জিত। ছবিগুলি তাঁহার ইউরোপের যৌবনের আনন্দস্মৃতি, অধিকাংশই উপহার—রেনোয়ার "স্নানরতা তরুণী," রসেটির "দান্তের স্বপ্ন," দেগার "নর্ত্তকী," নানা ছবি; ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনের খেলাধুলা, পিকনিক, নিশীথোৎসবের চিত্র, প্রাণোল্লাসপূর্ণ বিচিত্র বেশসজ্জিত নর-নারীদের ফটো।

সকাল সাড়ে দশটার সময় শিবপ্রসাদ বাহির হইয়া যান। ক্লাব হইতে ফিরিতে রাত এগারটা হয়। তার পর সাপার। ঠাণ্ডা মাংস ও সবজী খাওয়া উপলক্ষ্য মাত্র, মদ খাওয়াই উদ্দেশ্য। গভীর রাত্রে তাঁহার গ্রন্থপাঠের সময়। তিনি বহুভাষাবিৎ। ইংলণ্ডে থাকিবার সময় জার্ম্মাণ, ইতালীয়ান, রুশ ও সুইডিস্ ভাষা আয়ত্ত করেন। দেশে আসিয়া শিক্ষক রাখিয়া সংস্কৃত ও ফারসী শিখিয়াছেন। এখন তন্ত্রশাস্ত্র ও ইতালীয় কবি কারদুচি পাঠে নিমগ্ন। বারান্দায় লম্বা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া মদ ও বই লইয়া রাত একটা কাটিয়া যায়।

কিন্তু কোন কোন রাতে কালিদাস বা কারদুচি, হাফেজ বা পুস্কিন, কোন দেশের কোন কবিই তাঁহার চিত্তকে শান্ত করিতে পারে না।

তাঁহার শয়নগৃহে টেবিলের উপর রূপার ফ্রেমে বাঁধানো দুইখানি ফটো পূর্ব্বে ছিল। একটি, এক সমুদ্রনীলনয়না সুরূপা ইংরেজ ললনার, মাথায় কৃত্রিম ফুলভরা টুপি, কলকাওয়ালা কাশ্মীরী শাল হইতে তৈরি জামা ও স্কার্ট, মুখখানি কৃত্রিম ফুলের মত, শোভনতা আছে, প্রাণের দীপ্তি নাই। আর একটি ফটো একটি ছোট মেয়ের, তাহার নীলনয়ন স্নিগ্ধ, চুলগুলি একটু কালো, ফুটন্ত গোলাপের মত মুখখানি, হাসিটি চমৎকার।

এখন সে নীলনয়না ইংরেজ-দুহিতার ফটো নাই, কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। আর বেবীর ফটো খাটের মাথায় দেওয়ালে ঝুলান। নিদ্রাহীন অশান্ত রাত্রে কখনও কখনও শিবপ্রসাদ খুকীর ফটোটি হুক হইতে খুলিয়া হাতে ধরিয়া বারান্দায় পদচারণা করেন। তার পর ফটোটি যথাস্থানে রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া অন্ধকার গলির দিকে চাহিয়া থাকেন।

চৈত্রের জ্যোৎস্না। পলাশ বৃক্ষের শাখায় শাখায় রক্তিম পুষ্পগুচ্ছ পুঞ্জিত ; নারিকেল বৃক্ষগুলির আড়ালে শুভ্র মেঘস্তূপে চন্দ্রমা যেন স্বপ্নতরী। শিবপ্রসাদের রক্তে বসন্ত-রাত্রির মত্ততা লাগে। মনে পড়ে ইংলণ্ডের বসন্তাগমন। আপেল পিয়ার চেরীগাছে নবপুষ্পস্তবকের কি অপরূপ সৌন্দর্য্যোচ্ছ্বাস! শিশুমুখের মত কচি পাতাগুলি এলম বৃক্ষের ডালে।

শিবপ্রসাদ ভাবেন সেই বেবী এখন কত বড় হইয়াছে। তাহার বয়স এখন প্রতিমার সমান হইবে।

গলির অন্ধকারের দিকে শিবপ্রসাদ চাহিয়া থাকেন কোথায় কোন্ নিশাচর পাখী ডাকিয়া ওঠে।

ছুটির দিন। চৈত্রের নিঝুম দুপুর। স্বচ্ছ রৌদ্র যেন কোন নিস্তরঙ্গ রঙহীন সমুদ্রের স্রোত; এই শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় শব্দহীন ধারায় ঘরবাড়ি গাছ পথ সব পরিপ্লুত। ঝিরি ঝিরি ঈষদোষ্ণ বাতাসে বসন্ত-স্পন্দিত মৃত্তিকার সুরভি। এইরূপ রৌদ্রের দিকে চাহিয়া স্বপ্ন বোনা যায়। মনে হয় এই দীপ্ত স্তব্ধতা কোন গভীর প্রাণস্রোতে পূর্ণ।

এইরূপ আলোভরা দিনে অরুণ বাড়ি থাকিতে চায় না, রথঘর্ঘরপূর্ণ জনস্রোতময় কলিকাতার পথের জীবনকল্লোল-মধ্যে তাহার ঘুরিতে ইচ্ছা করে। রাত্রির স্তব্ধতায় মনে শান্তি আনে, কিন্তু এই সূর্য্যালোকপূর্ণ নিশব্দতায় প্রাণে চঞ্চলতা জাগে।

খাওয়ার পর অরুণ একেবারে প্রতিমার ঘরের দিকে চলিল। প্রতিমা নিজের ঘরে নাই, ঠাকুরমার ঘরে; তাঁহাকে রামায়ণ পড়াইয়া শোনাইতেছে। বারান্দায় ময়না ও কেনারী পাখীগুলি খাঁচায় ঝিমাইতেছে। সাদা কাকাতুয়াটি ছোলা ও ছাতু খাইতেছিল, অরুণকে দেখিয়া লাল ঠোঁট নাড়িয়া চেঁচাইল—গুড্‌ মর্নিং। সমস্ত বাড়ি সচকিত হইয়া উঠিল। অরুণ তাহার জলপাত্রে জল ভরিয়া দিয়া বলিল, চুপ কুম্ভকর্ণ। এই পক্ষীগুলি প্রতিমার পোষ্য জীব। কাকাতুয়ার নামকরণ তাহারই।

অরুণ বাড়ি হইতে বাহির হইল। জয়ন্তের বাড়ি যাইবে ঠিক করিল। জয়ন্ত গতকল্য স্কুলে আসে নাই। অসুখ হইল কিনা খোঁজ লওয়া দরকার।

জয়ন্তের বাড়িতে তাহার যাইতে ইচ্ছা করে না। সে-বাড়ির আবহাওয়া, জীবন-প্রণালী সুস্থ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

জয়ন্তের মেসো-মহাশয় তাহার পূজনীয়। কিন্তু তিনি অরুণের সহিত এত বিনীত ব্যবহার করেন, তাহার বংশ-গরিমার এত উচ্চ প্রশংসা করেন যে অরুণের লজ্জা হয়। পীতাম্বরের কপালে চন্দনের তিলক, গলায় কণ্ঠী, গায়ে ময়লা ফতুয়া, নয় হাত ছোট মোটা কাপড় পরা, সব সময় জোড়হাতে নম্র সুরে কথা বলেন, যেন সবার দাসানুদাস। সরল কৈশোর বুদ্ধি দিয়া অরুণ এই লোকটিকে ঠিক বিচার করিতে পারে না, সে কিন্তু বুঝিতে পারে লোকটি খাঁটি নয়। বস্তুতঃ, অতি পরমবৈষ্ণব বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিতে চাহিলেও পীতাম্বর ভণ্ড ও অত্যাচারী। তাঁহার গৃহিণী মৃন্ময়ীকে দিনরাত খাটিতে হয়; কাজ বড় কম নয়, নিজের চার ছেলে, চার মেয়ে, তাছাড়া জয়ন্ত ও মণ্টু আছে; বাড়িতে পীতাম্বর ঝি রাখিতে দেন নাই, কারণ সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ছেলেমেয়েরা ভাল খাইতে ও পরিতে পায় না, কারণ দারিদ্র্য-দীনতাই বৈষ্ণবের ভূষণ। কাহারও অসুখ হইলে ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা হয় না, হরিনাম গান হয়। পীতাম্বর কিন্তু সুন্দর নাম-সংকীর্ত্তন করিতে পারেন। আসলে লোকটি অতি কৃপণ ও স্বার্থপর।

জয়ন্তের মাসতুতো ভাইবোনগুলির ব্যবহারও অতি অদ্ভুত অস্বাভাবিক লাগে। তাহাদের শীর্ণ বুভুক্ষু চেহারা ময়লা ছোট কাপড় জামা দেখিলেও দুঃখ হয়। বড় বোন দুর্গা প্রতিমার বয়সীই হইবে, কিন্তু অরুণকে দেখিলে কেবল মাত্র সে নয় তাহার তিন-পাঁচ-সাত-নয়-দশ-এগার বৎসরের ভাইবোনগুলি লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা সকলে ছুটিয়া পলায়—পীতাম্বর তাঁহার সকল পুত্রকন্যার নাম দেবদেবীর নামে রাখিয়াছেন, হ্যাল-ফ্যাসানের নাম মোটেই পছন্দ করেন না—তার পর সকলে দরজার আড়াল হইতে কৌতুকপূর্ণ নেত্রে অরুণকে দেখে, যেন সে কোন অপরূপ জীব। একদিন ঘটনাক্রমে দুর্গা তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়াতে লজ্জায় পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল, তার পর লম্বা ঘোমটা টানিয়া ছুটিয়া পলাইয়াছিল। ইহাতে অরুণের যেমন হাসি পাইয়াছিল তেমনি রাগও হইয়াছিল।

কিন্তু কি কারণে দুর্গা ঘোমটা টানিয়া পলাইয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলে, অরুণ আর জয়ন্তের বাড়ি যাইত না।

একদিন খাবারের পর পান চিবাইতে চিবাইতে পীতাম্বর তাঁহার গৃহিণীকে বলিয়াছিলেন—দেখ, আমাদের দুর্গার সঙ্গে অরুণের বেশ মানায়। কি বল? চেষ্টা করব?

স্বামীর সকল মতে সমর্থন করা মৃন্ময়ীর অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। কোন আপত্তি বা তর্ক করা সেবিকার ধর্ম্ম নয়। কিন্তু মৃন্ময়ী স্বামীর এই কথায় সায় দিতে পারিলেন না। নিজ পুত্রকন্যা সম্বন্ধে পিতামাতার এক বিচারহীন শ্রেষ্ঠত্ববোধ আছে। পীতাম্বর দুর্গাকে অরুণের বিবাহযোগ্যা ভাবিলেও মৃন্ময়ী তাহা পারিলেন না। এই সুদর্শন নম্র বালকটির

প্রতি তাঁহার কেমন গভীর স্নেহ জন্মিয়াছে। তিনি ধীরে বলিলেন—কি যে বল, অরুণ কত বড় ঘরের ছেলে, আর আমার মেয়ে ত পেত্নী।

পীতাম্বর রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। অতি মিহি সুরে তিনি নিজ বংশের খ্যাতি ও গুণগরিমা এবং তালপুকুরের ঘোষ-বংশের অসচ্চরিত্রতার ইতিহাস সম্বন্ধে তুলনামূলক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। নানা কাজ বাকী থাকিলেও মৃন্ময়ীকে দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল। সমস্ত বাসন মাজা বাকী। অবশেষে মৃন্ময়ীকে স্বীকার করিতে হইল, এমন বংশে বিবাহ-করা অরুণের মহাসৌভাগ্য। স্বামী যদি এ-বিষয়ে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিবেন। ঠিক হইল, অরুণকে নিমন্ত্রণ করিয়া একদিন দুর্গার হাতের রান্না খাওয়াইতে হইবে, অবশ্য মৃন্ময়ীই সমস্ত রাঁধিবেন।

জয়ন্তের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া অরুণ দেখিল বাড়ির দরজা বন্ধ। পীতাম্বর অতি ভীত প্রকৃতির মানুষ। তাঁহার বিশ্বাস কলিকাতার সকল গুণ্ডা ও চোরের দৃষ্টি তাঁহার বাড়ির ওপর।

দরজায় কড়াও নাই। অরুণ মৃদু আঘাত করিল, কোন সাড়া পাওয়া গেল না। জয়ন্তের ছোট ভাই মণ্টু এক হাতে কয়েকখানি ঘুড়ি ও অপর হাতে লাটাই লইয়া আসিতেছে দেখিয়া সে আশান্বিত হইয়া দাঁড়াইল।

মণ্টু চেঁচাইতে চেঁচাইতে ছুটিয়া আসিল—অরুণদা, যাবেন না, দাদা বাড়ির ভেতর আছেন। দাদা! দাদা!

বন্ধ দরজায় মণ্টু দমাদম লাথি মারিতে লাগিল। বলিল—দাঁড়ান অরুণদা, বাড়ির সবাই একদম কালা, দরজা দেব এক দিন ভেঙে!

বাড়ির মধ্যে এই ছোট ছেলেটি উন্মত্ত প্রাণে-ভরা; সে বিদ্রোহী, কাহারও কথা শোনে না, শাসন মানে না, আপন খুশী-মত হাসিয়া-খেলিয়া বেড়ায়; পাড়ার সকল দুষ্ট ছেলের সর্দার। এই অশান্ত ভ্রাতাটিকে জয়ন্ত অত্যন্ত ভালবাসে। নিজের মধ্যে প্রাণের যে তেজ নাই, নিজ বালক-ভ্রাতার মধ্যে তাহা দেখিতে পাইয়া সে গৌরবময় আনন্দ উপভোগ করে; তাহার সকল অনিয়ম অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেয়। বালকের স্বাভাবিক ব্যবহার নিরোধ করিলে অমঙ্গল হয়, ইউরোপের এই আধুনিক শিশুশিক্ষানীতি তাহার জানা না-থাকিলেও সে বুঝিয়াছে প্রাণের সহজ প্রকাশকে বাধা দিলে মানুষ সজীব স্বাধীন হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না, এই শাসন-অনুশাসনের পীড়নে সমস্ত জাতি স্বাধীনতা হারাইয়াছে।

জয়ন্ত দরজা খুলিয়া অরুণকে দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল।

—আরে ভাই, তোর কথাই ভাবছিলুম, জানি তুই আসবি। একে বলে টেলিপ্যাথি।

—কাল স্কুলে যাও নি কেন?

—ও যে ভীষণ কাণ্ড কাল, ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ঘরে আয় বলছি।

জয়ন্তের 'ভীষণ' 'ভয়ঙ্কর'কে কেহ সত্যই ভীতিপ্রদ বলিয়া ভাবে না। সবাই জানে অতিরঞ্জিত করিয়া বলা তাহার অভ্যাস। সে আবেগের সহিত কথা বলে, নিজেকে কোন করুণ জীবন-নাট্যের ট্রাজিক অভিনেতা রূপে সকলের সম্মুখে পরিচিত করিতে সুখ পায়, সমবেদনার জন্য তৃষিত।

অরুণ ইচ্ছাপূর্ব্বক অতি গম্ভীর মুখ করিয়া বলিল,—কি ব্যাপার, আবার কোন নূতন দুর্ঘটনা? আমি কাল থেকে তোমার কথা ভাবছি।

উচ্ছ্বাসের সহিত জয়ন্ত বলিল—অরুণ, তুই সত্যি আমার বন্ধু! নিজের ঘরে লইয়া কোঁকড়া চুল দুলাইয়া হাত নাড়িয়া জয়ন্ত যে দীর্ঘ কাহিনী বলিল তাহার মর্ম্মাংশ এইরূপ—

দুই দিন হইল জয়ন্তের পিতা কামাখ্যাচরণের একখানি পত্র আসিয়াছে হরিদ্বার হইতে। তিনি জয়ন্তকে লেখেন নাই পীতাম্বরকে লিখিয়াছেন, এজন্য জয়ন্ত বড় ব্যথিত। কামাখ্যাচরণ লিখিয়াছেন, তিনি এক সন্ন্যাসী-দলের সহিত শীঘ্রই বদরিকাশ্রম যাইবেন, সেখান হইতে মানস-সরোবরে যাইবারও ইচ্ছা আছে। শেষে তিনি লিখিয়াছেন রাধাবাজারের দোকানের তাঁহার অংশের সমস্ত উপস্বত্ব তিনি ত্যাগ করিয়া পীতাম্বরকে দিতেছেন, দোকানের একমাত্র মালিক পীতাম্বর এ-বিষয়ে যথোচিত দলিল করিয়া পাঠাইলে তিনি সই করিয়া দিবেন। ইহা লইয়া পারিবারিক কলহ চলিতেছে। পীতাম্বরের ইচ্ছা ছিল, চিঠি সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিবেন না, দলিলটি

লুকাইয়া পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু কোনরূপে চিঠিখানি মৃন্ময়ীর হস্তগত হয়, তিনি সকল কথা জয়ন্তকে বলেন। কাল সে মেসোমহাশয়ের সহিত রীতিমত ঝগড়া করে, গালাগালি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। রাগ করিয়া অভুক্তাবস্থায় বাড়ি ছাড়িয়া সে চলিয়া যায়। সেজন্য কাল সমস্ত পরিবার উপবাসী ছিল; মাসীমা, ছোট ভাই-বোনেরা কেহই খাইতে চায় নাই। মণ্টু পর্য্যন্ত সারাদিন কিছু খায় নাই জানিয়া সন্ধ্যায় জয়ন্ত বাড়ি ফিরিয়া আসে। মাসীমা, দুর্গা, লক্ষ্মী সকলে তাহাকে ঘিরিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করে। অগত্যা তাহাকে রাতে এ-বাড়িতেই অন্নগ্রহণ করিতে হইয়াছে ও আপাততঃ বাড়ি-ছাড়ার সঙ্কল্পও ত্যাগ করিতে হইয়াছে। মেসো-মহাশয়ের সহিতও তাহার একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। তাহার মাসীমা ও ভাইবোনদের ছাড়িয়া সে-ও থাকিতে পারিবে না। মেসো-মহাশয় বলিয়াছেন বটে তিনি এখন কোন দলিল পাঠাইবেন না, তবে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করা যায় না।

দীর্ঘ বৃত্তান্ত শুনিয়া অরুণ বলিল—তা হাঙ্গাম চুকে গেছে ত। অল্‌স্ ওএল্ দ্যাট্ এণ্ড্‌স্ ওএল্ (সব ভাল যার শেষ ভাল)। এখন চল কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক, আমি আজ ঘুরে বেড়াবার mood-এতে।

—হ্যাঁ, আমারও তাই ইচ্ছে করছে, মনটা ভাল নেই। আজ আমরা দু-জনে যাই চল।

অরুণ ভাবিল, দুই-জনে বেড়াইতে গেলে জয়ন্ত সমস্ত পথ তাহার দুঃখের কথাই বলিবে; বাণেশ্বরকে ডাকিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

এই কিশোরদের নিকট বিপুল কলিকাতা নগর এক রহস্যপুরী। নানা অজানা পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতে তাহাদের অফুরন্ত উৎসাহ। তাহাদের মন উৎসুক, দৃষ্টি নবীন, অপরিচিতকে জানিবার অপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় পূর্ণ।

চার-পাঁচ জন সহপাঠী লইয়া অরুণ প্রায়ই ছুটির অপরাহ্ণে কলিকাতার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিতে বাহির হয়। মাণিকতলা খালের ধার; খাল-পারে কদর্য্য পল্লী, বৃহৎ বাগানবাড়ি, বিপুল গড়ের মাঠ, গঙ্গার ধার, খিদিরপুরের ডক; অজানা বস্তি, সংকীর্ণ বক্রগলির অপরিচিত পাড়া, পুরাতন গোরস্থান, কলিকাতার নানা অংশে তাহারা দল বাঁধিয়া বেড়ায়। জয়ন্ত হাত দোলাইয়া মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে; বাণেশ্বর তর্ক করে, ব্যঙ্গ করে, আদিরসাত্মক সংস্কৃত শ্লোক বলে; অরুণ তর্কে ফোড়ন দেয়, খাবার কিনিয়া খাওয়ায়; যতীন চুপ করিয়া চলে, মাঝে মাঝে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করে; হরিসাধন কুলীমজুরদের জীবন, বস্তির অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে। কোন পথিক, পথদৃশ্য, সামান্য কথা, তুচ্ছ ঘটনা লইয়া কত তর্ক, কৌতুক, হাস্য। এই কিশোরদের নিকট নগরের পথ, জনস্রোত, ট্রাম-মোটর-ধ্বনি, তাহার কদর্য্যতা, বীভৎসতা সমস্তই নবীন সুন্দর কৌতুককর লাগে, এ যেন কোন নবদেশ-আবিষ্কারের আনন্দময় অভিযান।

বাণেশ্বরকে ডাকিয়া লইয়া অরুণ ও জয়ন্ত যখন ট্রাম-রাস্তার মোড়ে আসিয়াছে, দেখিল মোটা বৃন্দাবন এক বড় ঠোঙা হাতে তাহাদের দিকে আসিতেছে। অরুণের দলটিকে বৃন্দাবন ভয় করে না, সে জানে ইহারা পেটে খুঁষি মারিবে না। সে হাসিয়া বলিল—হ্যালো বয়েজ, এত নয়েজ ক'রে কোথায় চলেছিস্?

বাণেশ্বর উত্তর দিল—হ্যালো ফ্যাটি, মারবো চাটি, এত গপ্‌গপ্ করে কি খাচ্ছিস্?

বৃন্দাবনের উত্তর দিতে হইল না। জয়ন্ত তাহার হাতের ঠোঙা ছিনাইয়া লইল, তার পর সকলে মিলিয়া টেপারি ও অবাক-জলপান খাইতে লাগিল। বৃন্দাবন তাহাতে বাধা দিল না। তাহার ইচ্ছা, অরুণ তাহাকে বেড়াইবার দলে লয়।

সহসা বৃন্দাবন চেঁচাইয়া উঠিল—ওরে!

পথের মোড়ে হেডপণ্ডিত মহাশয়ের ছাতা দেখা গেল, উদ্যত শিখা।

অরুণ বলিল—চুপ্। বৃন্দাবন, সামনে দাঁড়া আর বাণেশ্বর আমাদের পেছনে লুকিয়ে ব'স্।

বিপদ কাটিয়া গেল। পণ্ডিত-মহাশয় এক ট্রামে উঠিলেন। বাণেশ্বর হাসিয়া বলিল—এ জগতে কিছুই বৃথা নয়, ভোঁদাদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

অরুণ বলিল—এখন্ ঠিক কর কোন দিকে যাওয়া যায়। বিজ্রে যাবি নাকি?

—নিশ্চয়। আমি বলি, চল ট্রামে।

—ও, তাহ'লেই হয়েছে। না বাপু, তোমার গিয়ে কাজ নেই, কিছুদূর গিয়ে বলবে কোলে কর। আমরা এখন সাত-আট মাইল হাঁটব।

—সে আমি খুব পারি। একবার আমি দেওঘরে দশ মাইল হেঁটেছিলুম।

—আরে, এ দেওঘর নয়। এখন কোথায় যাওয়া যায়?

—যে পথে যায় চোখ চল সেই পথে।

—রাখ তোমার কবিত্ব পড়বে চাপা রথে, ওরে সরে দাঁড়া।

—আমি বলি, যে নতুন যুদ্ধজাহাজ এসেছে সেটা দেখে আসা যাক্।

—জাহাজে উঠতে দেবে? ভেতরে যেতে দেবে?

—তা দেবে না।

—জাহাজ দেখে কিন্তু চৌরঙ্গী হগ্ সাহেবের বাজার হয়ে আসব।

—না ভাই, আমাদের বোটানিক্যাল গার্ডেন যাবার কথা ছিল।

—বেশ, জাহাজ দেখে চাঁদপাল-ঘাট থেকে যাওয়া যাবে।

—আমি দেখি নি বোটানিক্যাল গার্ডেন।

—কি বা তুমি দেখেছ!

—কিন্তু আমার সঙ্গে ত বেশী পয়সা নেই।

—আমার আছে, এক টাকা—

হাপ্ প্যাণ্টের পকেট হইতে বৃন্দাবন এক চক্‌চকে টাকা ও কতকগুলি খুচরা পয়সা বাহির করিল।

বাণেশ্বর বলিল—অচল টাকা নয় ত!

অরুণ কহিল—আমার ব্যাগেও কিছু আছে।

হিসাব করিয়া দেখা গেল ষ্টীমারে যাতায়াতের ভাড়া যথেষ্ট হইবে। চারি জন হাস্যে গল্পে পথ মুখর করিয়া চলিল।

কিছু দূর গিয়া বৃন্দাবন এক দেশী হোটেলের সম্মুখে দাঁড়াইল। বলিল—ভাই, কিছু চপ্-কাট্‌লেট কিনে নেওয়া যাক্। ফিরতে ত সন্ধ্যে, খিদে পাবে।

—কি পেটুক বাবা! চপ্-কাটলেট কিনলে ষ্টীমারের ভাড়াটা কোথা থেকে আসবে শুনি?

—ও তাই ত। আচ্ছা, চার পয়সার চিনেবাদাম কেনা যেতে পারে। আবার কিছু দূর গিয়া মুসলমানদের এক খাবারের দোকানের সামনে বাণেশ্বর থামিল। জয়ন্ত তখন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছে—সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া—

বাণেশ্বর গম্ভীর ভাবে বলিল—অরুণ তুমি সেদিন বলেছিলে, একদিন শিক-কাবাব খাওয়াবে।

জয়ন্ত ও বৃন্দাবন চমকিয়া উঠিল—শিক-কাবাব? মুসলমানের দোকানের!

—হ্যাঁ।

—কি মাংসের জান?

—জানি।

—তুমি খাবে?

—কেন খাব না?

অরুণ বলিল—না, না, পাগল নাকি!

বাণেশ্বর উত্তর দিল—আচ্ছা, আজ আমার সঙ্গে পয়সা নেই; দেখো, এক দিন খাব তোমাদের দেখিয়ে।

—তোর বাবা জানতে পারলে যে বাড়ি থেকে দূর ক'রে দেবেন।

—আমি কেয়ার করি না। আচ্ছা, আর চার বছর যাক্, তার পর সবার সামনে খাব।

—ছি।

—তুমি খাও নি ও মাংস?

—না।

—আচ্ছা, সেদিন যে ছকু খানসামা আমাদের স্যাণ্ড-উইচগুলি খাওয়ালে, সে কিসের মাংস বাবা?

—সে হাম।

—ও, একদিন তুমিও খাবে দেখো। তোমার কাকা খান না?

—না, বাড়িতে খান না। ঠাকুমা তা হ'লে মনে কষ্ট পাবেন।

—আর আমাদের কষ্ট কে দেখে শুনি। বাবা হলেন ভাটপাড়ার পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ, সুতরাং রোজ কেবল শাক-চচ্চড়ি ভাত খাও গব্য ঘৃত দিয়ে।

—আমরাও ত বাড়িতে মাছমাংস খাই না।

—চল্ চল্, কি পাগলামি করিস।

বাণেশ্বর সত্যই শিক-কাবাব খাইতে চায় না, কিন্তু পিতার অর্থহীন নির্ম্মম শাসনের বিরুদ্ধে তাহার অন্তরে যে বিদ্রোহের কালো মেঘ ঘনাইয়া ওঠে, এ তাহারই বজ্রগর্জ্জন। ঘরে মমতাহীন শাসন-বিদ্রূপ, অপমানিত আত্মা মূক থাকে; বাহিরে সে সারাক্ষণ ব্যঙ্গোক্তি কথা-কাটাকাটি করে। শিশু গাছ যেমন সোজা চলিয়া আলোক না-পাইলে আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলে, শিশুমনও তেমনই স্নেহ আনন্দের অভাবে অস্বাভাবিক বক্র হইয়া যায়।

বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে কোন গূঢ় শক্তি এক আনন্দময় সামঞ্জস্যের সন্ধানে একবার কেন্দ্রাতিগ, একবার কেন্দ্রাভিগ। নটরাজের নৃত্যছন্দে নদীর এক পাড় ভাঙে, নূতন তীর জাগে; প্রাচীন বংশ বিরাট সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়, নব বংশ নব সভ্যতার জন্ম হয়। নটরাজের এক চরণে প্রলয়ের অগ্নি, অপর চরণে নবসৃষ্টির শতদল।

যুদ্ধ-জাহাজ দূর হইতে দেখিতে হইল। পুলিস ঘাটের নিকট পাহারা দিতেছে। বৃন্দাবন কাহাকেও নিকটে যাইতে দিল না।

চাঁদপালঘাটে আসিয়া জানা গেল, পরবর্ত্তী ষ্টীমার আসিতে আধ ঘণ্টা দেরি। এক নৌকার মাঝি আসিয়া বলিল—আধ ঘণ্টার মধ্যে সে বোটানিক্যাল গার্ডেন পৌঁছাইয়া দিবে, ভাড়াও খুব সস্তা।

জয়ন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিল। বৃন্দাবন ভয় পাইল, কিন্তু আপত্তি করিতে সাহস করিল না। অরুণ ভাবিল, সকলেই সাঁতার জানে, ভয়ের কিছুই নাই। অরুণদের বাড়ির পুষ্করিণীতে ছুটির সকালে প্রায়ই সন্তরণ-লীলা হয়। অজয়ই এ-সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী। বৃন্দাবনকেও ধরিয়া নাকে মুখে জল খাওয়াইয়া সাঁতার শিখাইয়াছে।

হল্লা করিয়া সকলে নৌকায় উঠিল। মাঝি পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। সমুদ্রগামী জাহাজগুলির পাশ দিয়া নৌকা তরতর করিয়া চলিল। সকলের বড় স্ফূর্ত্তি। শুধু বৃন্দাবনের বড় অসোয়াস্তি, মাঝি তাহাকে বার-বার সাবধান করিতেছে, সে যেন ধারে হেলিয়া না বসে, তাহা হইলে নৌকা উল্টাইয়া যাইতে পারে।

জয়ন্ত গান ধরিল,—

আরে মন-মাঝি, তোর বৈঠা নে রে—
আমি আর বাইতে পারলাম না!

কলের চিমনী, ষ্টীমারের ধোঁয়া, ক্রেনে গাঁটতোলা, মাল-ভরা গাধাবোট, বণিক-সভ্যতা-কলুষিত কলিকাতার গঙ্গার ওপর অপরাহ্নের আলোকে কিশোরকণ্ঠে ভাটিয়ালী সুর যেমন বিসদৃশ তেমনই করুণ মনে হইল।

বোটানিক্যাল বাগানে সকলে খুব হল্লা করিয়া ঘুরিল; ডাব খাইল; ছুটোছুটি করিল; বড় বটগাছের উচ্চতা কত, তর্ক বাধিল। সকলে চপ-কাট্লেটের অভাব অনুভব করিল।

ফিরিবার সময় ষ্টীমারে আসা ঠিক হইল। ষ্টীমার-ঘাটে আসিয়া বৃন্দাবন কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—ভাই, আমার টাকা?

—টাকা! কি হয়েছে?

—আমার টাকা হারিয়ে গেছে, কোথায় পড়ে গেছে। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

—যেমন চাল ক'রে হাফপ্যান্টের পকেটে রেখেছিলি।

—কাঁদিস না, তোর নিজের টাকা ত?

—হ্যাঁ, মা দিয়েছিলেন। চল খুঁজি গে।

—কোথায় খুঁজবি এখন, এ ষ্টীমারে না যেতে পারলে রাত হয়ে যাবে ফিরতে।

অরুণ বলিল—আচ্ছা, আমি তোকে একটা টাকা দেব'খন।

—দেবে ভাই?

—বা, তুমি কেন দেবে? ভাব্ না, চপ কিনে খেয়েছিস।

—আমার এত কল্পনা নেই, আমি ত কবি নই।

ষ্টীমার আসিয়া পড়াতে আর টাকার সন্ধান হইল না।

চাঁদপাল-ঘাটে সকলে পরিশ্রান্ত হইয়া নামিল। সঙ্গে ট্রামে ফিরিয়া যাইবারও পয়সা নাই।

অরুণ বলিল—চল হেঁটেই যেতে হবে।

বৃন্দাবন অতি শ্রান্ত, তার পর টাকা হারাইয়া বিমর্ষ। সে ভগ্নস্বরে বলিল—আমি আর হাঁটতে পারছি না।

—খুব যে দেওঘরে দশ মাইল বেড়িয়েছিলে।

—না ভাই, আমার নতুন জুতো, পায়ে ফোস্কা পড়েছে।

অরুণের মনে পড়িল মামীমা রাত্রে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন,

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ি ফেরা দরকার। সে এক ফিটন-গাড়ীর গাড়োয়ানকে ডাকিল।

গাড়োয়ানটি সন্দিগ্ধ স্বরে বলিল—বাবু পয়সা আছে ত? অরুণ গম্ভীরভাবে দরাদরি সুরু করিল।

পিছন হইতে কে ডাকিল—হ্যালো, অরুণ না'কি?

অরুণ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, নূতন সুন্দর মোটরকারের ষ্টীয়ারিং-হুইল ধরিয়া বসিয়া কোটপ্যাণ্ট-পরিহিত এক যুবক তাহাকে ডাকিতেছে। সে মোটরকার চালাইয়া যাইতেছিল, অরুণকে দেখিয়া গাড়ী থামাইয়াছে।

যুবকটি বলিল—কোথায় যাবে—এস— joy ride—

অরুণ তাহাকে ঠিক চিনিতে পারিল না, ধীরে বলিল, —না, থ্যাঙ্কস্, আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে, আমরা গাড়ী ঠিক ক'রে ফেলেছি।

—অল্ রাইট্ (আচ্ছা)।

ধুলি উড়াইয়া সশব্দে মোটরকার চলিয়া গেল।

গাড়োয়ান আর ভাড়ার টাকার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করিল না। সকলে ফিটন-গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল—কে রে ছোকরা? খুব চাল্।

অরুণের তখন মনে পড়িল, যুবকটিকে সে মামাবাবুর বাড়িতে কোন সন্ধ্যায় দেখিয়াছে।

গাড়ী ধীরে চলিল।

জাহাজের মাস্তুল, কলের চিমনীগুলির আড়ালে গঙ্গার পশ্চিম তীরে সূর্য্য অস্ত গেল। অরুণের মনে হইল সূর্য্যের এরূপ রক্তিম বর্ণ সে কখনও দেখে নাই।

সমস্ত পথ সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পথ, মাঠ, জনস্রোত, প্রাসাদশ্রেণী সব যেন অবাস্তব, রঙীন স্বপ্ন।

গাড়ী যখন অরুণদের বাড়ির সরু গলির মধ্যে আসিয়া ঢুকিল, অন্ধকার আকাশ তারায় তারায় ভরিয়া গিয়াছে।

ক্রমশঃ

সিন্ধু-তটে

শ্রীগোপাললাল দে

আমি এরে বাসিয়াছি ভালো!
মুক্ত নীলাকাশ এই স্নিগ্ধ স্বর্ণ শরতের আলো,
আর্দ্র শান্ত শীত বায়ু, তারই মাঝে অসীম সাগর
সুনীল সফেন-পুঞ্জ সচঞ্চল আদিম জাগর!
দূর দিগন্তর হ'তে বহে আসে তরঙ্গ উত্তাল
উচ্ছসিয়া, উদ্বেলিয়া, আলোড়িয়া পড়ে চিরকাল,
উন্মত্ত আপন রঙ্গে, নাহি থামে, নাহি শোনে বাণী,
ক্ষণতরে দ্বিধা নাই, এতটুকু নাহি কানাকানি,
শাসন মানে না কোন কারো পানে ফিরিয়া না চায়,
লক্ষ বাহু পসারিয়া ধরণীরে আলিঙ্গিতে ধায়।

গগনেতে নাহিক বাদল,
তবু দূরে দূরে বাজে গুরু গুরু শতেক মাদল,
ঊর্ম্মি আসে মহোল্লাসে অতি দীর্ঘ তুঙ্গ টলটল,
ভাঙি ভাঙি ফেনপুঞ্জ উচ্ছসিয়া উঠে ছলছল;
প্রবল তরঙ্গঘাতে তটপ্রান্তে পড়ে আছাড়িয়া,
ধ্বনি উঠে প্রতিধ্বনি' অকস্মাৎ কাঁপি উঠে হিয়া!
তীব্রবেগে ফিরে যায় জলতলে বিপরীত স্রোতে,
যাহা পায় টানি লয়, রোধে নাক কভু কোন মতে;
কখনও বা দুই দিকে তীরবেগে সংঘর্ষি ভীষণ,
আকাশের পানে উঠি বিথারিছে অশনি-নিস্বন।

সত্যই কি আদিম জাগর!
চিররাত্রি চিরদিন এই মত আছিলে সাগর?
নামে যবে নিশীথিনী অন্তরীক্ষে তুলে কেশভার
আঁচলে আনন ঢাকি, বাম কক্ষে শান্তিঘট তার;
সুষুপ্তির মায়াদণ্ড পরশনে লুপ্ত চরাচর,
আঁখি ঢুলে ঢুলে পড়ে সপ্তর্ষি ও স্বর্গের উপর;
কেহ নাহি চেয়ে দেখে নববধূ লজ্জা-বিভূষণা,
স্রস্ত বাস সংবরিতে ত্রস্তা নহে স্বপ্ন-নিমগনা,
তখনও কি জেগে থাক? মহোদধি! এই জলোচ্ছ্বাস
অনন্ত অস্ফুট নাদে কি কহিছে চির বর্ষমাস?

আমি বড় ভালবাসিয়াছি,
নীলাকাশ নীল সিন্ধু চুমি আছে তারই কাছাকাছি,
মেঘ ভেলা ভেসে যায়, অন্তরালে উঁকি মারে চাঁদ,
ঊষার অঞ্চলতলে স্বর্ণরবি রচে মায়াফাঁদ!
মধ্যাহ্নের খর দীপ্তি, গোধূলির পুলকিত বেলা,
আনন্দিত নরনারী সিন্ধুতীরে করে ছেলেখেলা।
বালুকামন্দির রচি, শুক্তি দিয়া নয়নাভিরাম,
'কমল' 'চপল' দোঁহে লিখে গেছে আপনার নাম।
যে যাহারে ভালবাসে, মাতা, পিতা, সখা, প্রিয়তমা,
সাথে তারে আনিয়াছে! জীবনের সার্থক সাধনা!

কথাকলি

শ্রীশরদিন্দু সিংহ

দক্ষিণ-ভারতে মালাবার অঞ্চলে প্রচলিত কথাকলি নৃত্য-সম্প্রদায় আজিও প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রানুসারী নৃত্যাভিনয়কে অভ্যাসের ভিতর বাঁচিয়ে রেখেছে। এদের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে কেরল-কথামণ্ডল নাম দিয়ে ও-দেশের কবি ভাল্লাথোল আজ চার বৎসর হ'ল যে নৃত্য-বিদ্যালয় খুলেছেন, আমি গত জুন মাসে তারই ছাত্রদলভুক্ত হই।

স্বদেশ থেকে দেড় হাজার মাইলের দূরত্ব রেলপথে অতিক্রম ক'রে যখন ও-দেশে গিয়ে পৌঁছেছিলাম তখন শেষ রাত্রি। রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে প্রায় ছ-সাত মাইল মোটর-বাসে ক'রে গিয়ে কেরল-কথামণ্ডলে পৌঁছতে হয়। মোটর-বাসের অপেক্ষায় প্রায় ঘণ্টা-তিনেক ষ্টেশনে ব'সে কাটাতে হয়েছিল। সেই সময়ে পথশ্রম ও ঘুমের ব্যাঘাত খুবই অসুখকর মনে হয়েছিল। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন ও-দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল তখন সেই অভাবিতের রূপে মোহিত হয়েছিলাম ও নিজের ক্লান্তি ভুলে যেতে দেরি লাগে নি। জায়গায় জায়গায় আমাদের শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে হুবহু মিল দেখতে পেয়ে একটা নিগূঢ় আনন্দ উপভোগ করেছিলাম। ও-দেশবাসীদের অনেকের মুখে শুনেছি যে যখন মহাত্মা গান্ধী ও-দেশে গিয়েছিলেন, তখন ওদের ত্যামারুণ, অর্থাৎ প্রাচীন শাসনকর্ত্তা, মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করায় উনি বলেছিলেন এ ত স্বর্গ। সত্যই ও-দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা রক্ষা করতে এক কবির লেখনীই সমর্থ। ও-দেশের ছোট-বড় বৃক্ষবহুল পাহাড় বর্ষাজলের সুতা দিয়ে গাঁথা আঁকাবাঁকা সবুজ ধানের ক্ষেতের মালা গলায় ঝুলিয়ে এবং কোথাও বৃক্ষশূন্য তৃণাচ্ছাদিত যেন সবুজ গালিচা বিছান সুপ্রশস্ত উন্নত ভূমি কোলে কোলে আম কাঁটাল ও সুপারি গাছের বাগান-ঘেরা টালির বাড়িকে নিয়ে যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ করেছে, সেটা কবি এবং শিল্পীর লেখনী ও তুলিকাকে অফুরন্ত খোরাক দিতে সমর্থ। ও-দেশের ধানের ক্ষেতে কৃষক-রমণীরা তাদের নিরাবরণ সুপুষ্ট বক্ষ নিয়ে শস্যভারনত ধানগাছের বঙ্কিম ভঙ্গীর ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে সারাদিন কাজ করছে যেন রূপদক্ষের তুলিকার অপেক্ষা করেই আনন্দের চিরস্থায়ী প্রতীকে রূপান্তরিত হবার জন্যে।

আমাদের কাছে স্বপ্ন ব'লে মনে হয় যখন দেখি ও-দেশের লোকেরা প্রাচীন ভারতের আদর্শ জীবনযাত্রা আজিও মেনে চলেছে। আমার এক মাসীমা বলেছিলেন, যে, বাঙালীর জিভ্ স্বদেশ ছাড়া অন্য কোথাও খেয়ে তৃপ্তি পায় না, এ-কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলাম।

ও-দেশে কথাকলি ছাড়াও আরও কতকগুলি জনপ্রিয় নৃত্য প্রচলিত আছে, যেমন, "কুমি" "কাইকট্টুকেলি" "আটম্ তুলাল," "মোহিনী আটম্" ইত্যাদি। প্রথমোক্ত দুইটি ওখানকার বালিকা-বিদ্যালয়েও শেখান হয়। অবশ্য শ্রেষ্ঠতায় কথাকলি এদের সকলের অগ্রণী। কথা অর্থাৎ গল্প এবং কলি অর্থাৎ নৃত্যাভিনয়। কথাকলি অর্থে আখ্যানের নৃত্যাভিনয় করা। এদের সমস্ত অভিনয়ের আখ্যান-বস্তু হচ্ছে পুরাণ, এবং নৃত্যরত অবস্থায় কোন রকম কথা না-ব'লে হাতের মুদ্রার দ্বারা কথোপকথন ও চোখ, ভ্রূ, মুখের ভাবভঙ্গীর সাহায্যে অর্থপূর্ণ ভাব প্রকাশ এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঠিক কবে থেকে এই সম্প্রদায়ের অভিনয় চলে এসেছে, সে-কথা কেউ স্মরণ করতে পারছেন না। কেউ কেউ বলেন, "কূড়ী-আটম্" ব'লে এক সম্প্রদায়ের অভিনয় মন্দিরে শুধু ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তারই একটি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ এই কথাকলি। কূড়ী-আটম আজকাল খুবই বিরল, নেই বললেই চলে।

কোন স্থানগত ও জাতিগত বাধা না-থাকায় কথাকলি জনপ্রিয় ও দীর্ঘজীবী হ'তে পেরেছে। কথাকলি মন্দির থেকে যে জন্মলাভ করেছে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এদের ঐকতান বাদ্য। এদের ঐকতান বাদ্যে থাকে দুই

জন গায়ক, একটি মাদল, একটি চণ্ডা (ঢাক), এক জন গায়কের হাতে একটি কাঁসর ঘণ্টা ও আর এক জনের হাতে এক জোড়া করতাল। অভিনয়কালে এই সঙ্গীত ও বাদ্য মন্দিরের আরতির ভাব প্রকাশ করে।

যাত্রার মত খোলা জায়গায় সামিয়ানার নীচে অভিনয় হয়। গায়কেরা থাকে অভিনেতাদের পেছনে; সামনের দিকে দু-ধারে দুটা, সময়ে সময়ে একটি প্রায় চার ফুট উঁচু পিতলের প্রদীপে নারকেল-তেল ও তুলোর পলতে জ্বলতে থাকে। এই আলোর হলদে আভা ও কম্পন গিল্‌টি-করা গহনা ও বিচিত্র বর্ণের পোষাককে জমকালো ক'রে তুলতে ও বহুবর্ণ-রঞ্জিত মুখের সজ্জা-রচনাকে দীপ্তিমান করে তুলতে সহায়ক রূপে বিশেষ উপযোগী ব'লে ব্যবহার করা হয়। আলোর ঠিক পরেই দু-জন সুবেশধারী ব্যক্তি একখানি বিচিত্র বর্ণের পর্দা ধরে থাকে। একে যবনিকা-রূপে ব্যবহার করা হয়। সারা রাত্রি ধ'রে অভিনয় হয়ে থাকে। আজকাল এ-প্রথা শিথিল হয়ে এসেছে। স্থানীয় জমিদার কিংবা বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা আহূত হয়ে গিয়ে এঁরা অভিনয় করে থাকেন, সময়ে সময়ে নিজেদের উদ্যোগেও করে থাকেন।

অভিনয়ের দিন সন্ধ্যার সময়ে ঢাক পেটান হয়। এই ঢাকের শব্দ শুনলে লোকেরা বুঝতে পারে, যে, সেদিন রাত্রে কথাকলির অভিনয় হচ্ছে এবং লোকের মুখে মুখে বহু দূর দূর গ্রামেও খবর ছড়িয়ে পড়ে। এই ঢাক-পেটানকে "কেলীকট্টু" বলে। এই হ'ল এদের বিজ্ঞাপনের প্রথা। তার পর রাত্রি প্রায় নটা-সাড়ে-নটার সময় প্রকৃত অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্ব্বে পর্দার পেছনে বন্দনার শ্লোক-আবৃত্তি, ও মাদল, চণ্ডা, কাঁসর ঘণ্টা ও করতালের বাদ্য সহকারে এক নৃত্য করা হয়। একে "তড়েম" বলে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নটরাজকে বন্দনা করা। তার পর পর্দা সরিয়ে "পুড় পাড়" নামক আর একটি নৃত্য করা হয়, পুড়পাড় অর্থে সমগ্র কাজের সূচনা। এর পর করতাল ঘণ্টা মাদল ও চণ্ডা সহকারে জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে একটা গান গাওয়া হয়। একে "মেলাপদ" বলে। "মেলা" অর্থাৎ ঢাকবাজান ও "পদ" অর্থাৎ গান। "মেলাপদ" অর্থে ঢাকের সঙ্গে গান গাওয়া। এই সময়ে শুধু গায়ক এবং বাদ্যকরদের স্বীয় কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ দেওয়া হয় ব'লে মনে হয়। এই "তড়েম" থেকে "মেলাপদ" পর্য্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। আজকাল সব সময়ে এ-সব না ক'রে একেবারে অভিনয় আরম্ভ করা হয়ে থাকে।

রামায়ণ ও মহাভারতের সমস্ত উপাখ্যান গীতের উপযোগী ভাষায় রূপান্তরিত করা আছে। এই কার্য্যে ত্রিবাঙ্কুড়-রাজকুমারদের মধ্যে কেউ কেউ উদ্যোগী হয়ে স্বীয় রচনার দ্বারা সাহায্য করেছেন দেখতে পাওয়া যায়। গায়কেরা অভিনয়ের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত গান গেয়ে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন এবং এই গানের কথা অনুসরণ ক'রে অভিনেতারা হাতের মুদ্রার দ্বারা কথোপকথন করেন। সঙ্গীতের ধরণ কতকটা বাংলার কীর্ত্তনের মত। একই পদকে অনেক ক্ষণ ধ'রে বিভিন্ন সুরে গাইতে হয়। কারণ, মুদ্রার সাহায্যে সেটাকে বলতে যতটা সময়ের দরকার তার দিকে নজর রাখতে হয়েছে। এদের এক-একটা দৃশ্য প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট ধ'রে থাকে। প্রত্যেক দৃশ্যের শেষের দিকে দশ-পনর মিনিট গান বন্ধ থাকে, শুধু বাজনা বাজতে থাকে। সেই সময়ে অভিনেতাকে স্বীয় ভূমিকা, মূল আখ্যানকে অক্ষুণ্ণ রেখে, স্বাধীন ভাবে অভিনয় করতে দেওয়া হয়। এই সময়ে অভিনেতারা প্রায়ই কোন যুদ্ধ অথবা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিস্তারিত বর্ণনা ক'রে থাকেন। সুখ দুঃখ কিংবা বীরত্ব প্রভৃতি ভাব প্রকাশের সময়ে সুর যাতে অভিনেতাকে সাহায্য করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য আছে। এদের সঙ্গীতে সুরের গমক, হুঙ্কার ও স্বর-বিন্যাস বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

অভিনয় ও নৃত্য দুটাকে আলাদা ভাবে দেখলে বুঝবার সুবিধা হবে। অভিনয়ের ভেতর প্রথমতঃ হচ্ছে চোখ ভ্রূ ও ঠোঁটের সাহায্যে নব রস, যথা—আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত, এদের অভিনয়। শেষোক্ত রসের অভিনয় খুবই বিরল। এই রসের অভিনয়ের পেছনে গভীর রসানুভূতি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও দীর্ঘ অভ্যাস বর্ত্তমান, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর অভিনয় না দেখলে বোঝান শক্ত। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে হাতের মুদ্রার দ্বারা কথোপকথন। নৃত্যের সময় অভিনেতার পক্ষে কথাবলা সম্ভব নয় ব'লে এই



কথাকলির অভিনেতাবর্গ

প্রথার উদ্ভব। হাতের আঙুলকে নানান্ রকমে সাজিয়ে নিয়ে হাত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিশেষ ভঙ্গীর দ্বারা বিশেষ অর্থ প্রকাশ করা হয়।

এই রকম প্রায় চারি শত মুদ্রা কথাকলি অভিনয় কালে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই মুদ্রার সাহায্যে সমগ্র রামায়ণ ও মহাভারত অভিনীত হচ্ছে, এই বললেই বুঝতে পারা যাবে এ কতখানি সফলতা লাভ করেছে। এর দ্বারা এমন কি



উদয়শঙ্কর, সিম্‌কী ও কথাকলির আচার্য্য নাম্বুদ্রি

সাহিত্যিক রসও যে কতখানি ব্যক্ত করা যেতে পারে তার একটা উদাহরণ না-দিয়ে থাকতে পারলাম না। যেমন, নায়ক অভিনয়-প্রসঙ্গে নায়িকাকে জিজ্ঞাসা করছেন, "তোমার মুখের সৌন্দর্য্য দেখে চন্দ্র লজ্জিত, তোমার সুসজ্জিত অলকগুচ্ছ মুখের ওপর এসে পড়েছে, মনে হচ্ছে যেন মধুলোভী ভ্রমর পদ্মের ওপর শোভা পাচ্ছে, মত্ত গজের গমনভঙ্গীর মত তোমার গতি, এইরূপ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট নারী তুমি বনে বিচরণ করছ, তুমি কে?

আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত অভিনেতারা মুদ্রার দ্বারা এই রকম কথা বলার সময়ে যে কথা যে রসাত্মক তার সঙ্গে সেই রসের অভিনয় ক'রে সেটাকে সপ্রাণ ক'রে তোলেন।



স্ত্রীলোকের বেশে কথাকলির অভিনেতা

১। পতাকা, ২। ত্রিপতাকা, ৩। কর্ত্তরিমুখম, ৪। অর্দ্ধচন্দ্র, ৫। এলারম্, ৬। মুকতুণ্ড, ৭। মুষ্টি, ৮। শিখরম্, ৯। কপিত্থম, ১০। কটাকামুখম্, ১১। সূচিমুখম, ১২। মুদ্রা, ১৩। সর্পশীর্ষ, ১৪। মৃগশীর্ষ, ১৫। অঞ্জলি, ১৬। পল্লবম্, ১৭। মুকুরম্, ১৮। ভ্রমর, ১৯। হংসম্, ২০। হংসপক্ষম, ২১। বর্দ্ধনম্, ২২। মুকুলম্, ২৩। উর্ণভম, ২৪। কটক। এই চব্বিশটি মূল মুদ্রা। এদের সংমিশ্রণে এবং ব্যবহারের প্রকারভেদে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করা হয়।

নৃত্যের ভিতর প্রথমতঃ লালিত্যপূর্ণ দৈহিক ভঙ্গীর বাহুল্য আধুনিক যে-কোন ভারতীয় নৃত্যসম্প্রদায়কে ছাড়িয়ে গেছে এবং এদের তালের হিসাবের জটিলতার সমকক্ষ লক্ষ্ণৌর কথক-সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত তাল ছাড়া আর কোথাও নাই। কিন্তু কথক-সম্প্রদায়ের নৃত্যে কমনীয় দৈহিক ভঙ্গীর যথেষ্ট অভাব আছে। এদের ভঙ্গিমার ভেতর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা সুসংযত ও দৃঢ় ভাব। এই ভাবের ব্যঞ্জনার

কথাকলি-অভিনয়ের চিত্র





আটম তুলাল পদ্ধতিতে অভিনয় ও নৃত্য

যারা সমস্ত ভঙ্গিমা মণ্ডিত এবং দক্ষিণ-ভারতের নৃত্য-সম্বন্ধীয় অধিকাংশ ভাস্কর্য্যের রচয়িতা যে এদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন, সেটা অস্পষ্ট নয়। এঁদের নৃত্য-রচয়িতারা সুকৌশলে লাফান, ঝুঁকে পড়া প্রভৃতির সাহায্যে দৈহিক ভঙ্গিমার সৌন্দর্য্য প্রকাশ ক'রে ক্ষান্ত হন নি। ফণাযুক্ত সাপের ডাইনে বাঁয়ে দোল খাবার ভঙ্গীর অনুকরণে একটি নৃত্যভঙ্গীর রচনা, ও অভিনয়-প্রসঙ্গে ময়ূরের বর্ণনা দেবার জন্য উক্ত পক্ষীর চোখ-মুখের হাবভাব ও নৃত্যভঙ্গীর অনুকরণে নৃত্যের সৃষ্টি—এঁদের সৃষ্টি শক্তির পরিণত অবস্থার রসানুভূতি ও পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা কোথায় পৌঁছেছে, এইগুলি তার প্রমাণ দেয়। মুদ্রাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত মত্ত গজের গমনভঙ্গীর যে অভিনয় সেটাও উল্লেখযোগ্য। না দেখলে এ-সবের সম্পূর্ণ রস উপভোগ করবার অন্য কোন চেষ্টা নিষ্ফল। এদের নৃত্যে ব্যবহৃত সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ, যথা—চম্পরা, চম্পা, পাঞ্চাহারি, তৃপটা ও আরন্দা। প্রত্যেক তালের তিন-চার রকম পরনের উপর গৎ-বাঁধা নৃত্য আছে। এগুলোকে এঁরা "কালাসম্" বলেন। অভিনয়কালে আগাগোড়া মাদল, চণ্ডা ও করতালের সাহায্যে তাল বাজতে থাকে। তারই ঝোঁকে ঝোঁকে মুদ্রার দ্বারা এক-একটি পদকে অভিনয় ক'রে এই রকম একটি "কালাসম্" দিয়ে সেটাকে শেষ করা হয়, একে "খণ্ড" বলে। নর্ত্তকরা যখন সংযত ও দৃঢ়পদক্ষেপে তালের নানান্ ছন্দে কখনও দ্রুত ও কখনও ঢিমা লয়ের ওপর নাচতে থাকেন, তখন তাঁদের তালজ্ঞান ও অঙ্গসঞ্চালনের দক্ষতা যে কতখানি সাধনাসাপেক্ষ, তার আভাস সহজে সূচিত হয়। পুরুষের নৃত্যে ও স্ত্রীর নৃত্যে পার্থক্য আছে। পুরুষরাই স্ত্রী-বেশ নিয়ে নৃত্য করছেন। স্ত্রী এবং পুরুষের একসঙ্গে অভিনয়ের



রাক্ষস-বেশে কথাকলির অভিনেতা

প্রথা প্রচলিত নাই। পূর্ব্বে ছিল, এবং সেটাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা হচ্ছে।

কথাকলিতে বিভিন্ন 'রসে'র অভিব্যক্তি





কথাকলির যোদ্ধা

এদের ব্যবহৃত পোষাক ও চূণ এবং চালের গুঁড়ার সাহায্যে মুখোস রচনা একটি প্রধান অঙ্গ ও খুবই সময়-সাপেক্ষ। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে এঁদের আখ্যানবস্তু হচ্ছে পুরাণ, অর্থাৎ দেবতা ও রাক্ষসদের কাহিনী। এঁদের নায়ক-নায়িকাকে সত্ত্ব, রজ, তম প্রভৃতি গুণের বিচার হিসাবে ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা। প্রথম হচ্ছে দেবতা, মুখের রং লালচে হলদে, ঠোঁটে সিঁদুর, চোখ ও ভ্রূ কজ্জল দিয়ে ফোটান এবং কানের কাছ থেকে আরম্ভ ক'রে দুই গালের ওপর দিয়ে এসে চিবুক ও ঠোঁটের মাঝামাঝি জায়গায় মেশা, চূণ ও চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি এক দেয়াল তু'ল দেওয়া থাকে। ওঁদের কাছ থেকে জেনেছি, রসাভিনয়কালে মুখের অনাবশ্যক অংশকে আবৃত রেখে মুখকে কান্তিমান ক'রে তে উদ্দেশ্যে একে ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং আধুনিক রঙ্গমঞ্চের "স্পট" লাইটের ব্যবহারের অর্থও এতে আছে। এই রকম চূণ ও চালের গুঁড়ার সাহায্যে মুখের ওপর নানান্ রকম নক্সায় ভাগ ক'রে রাক্ষস প্রভৃতি তমোগুণ-বিশিষ্ট ভাবকে রূপ দিয়েছে। বিশেষ ক'রে রাক্ষসের এই রকম মুখস-রচনা খুবই সফল হয়েছে। দ্বিতীয় "পাচো," সত্ত্বগুণবিশিষ্ট। মুখের রং সবুজ, ঠোঁটে সিন্দুর, চোখ ও ভ্রূ কাজল দিয়ে ফোটান এবং ঐ রকম দেয়াল। তৃতীয় "কাত্তি" রজোমিশ্রিত তমোগুণবিশিষ্ট, যেমন রাবণ, কীচক



রাবণ-বেশে কথাকলির অভিনয়

প্রভৃতি। চতুর্থ "তাড়ি" ঘোর তম। তিন শ্রেণীতে একে ভাগ করা হয়, যেমন, বীভৎস, রৌদ্র, শান্ত। বীভৎস হচ্ছে কীরাত ও রাক্ষসী। রৌদ্র,—দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও বকাসুর প্রভৃতি। শান্ত হচ্ছে হনুমান। পঞ্চম, "মিনু

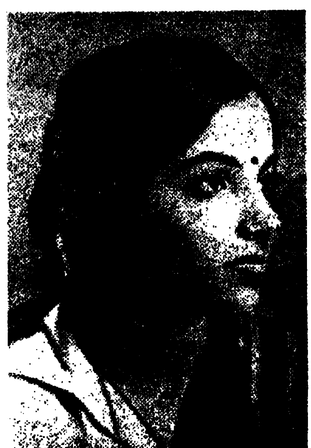
র্ষি। এদের মুখের রং লাল্‌চে হলদে,
ও ভ্রূ কাজল দিয়ে ফোটান এবং
ান"। এ হচ্ছে যারা ক্ষতবিক্ষত
নে উপস্থিত হয়, যেমন—শূর্পনখা
প্রভৃতি। এই মুখোস জাপান কিংবা জাভার মুখোসের মত স্থায়ী নয়। প্রত্যেক বার অভিনয়ের সময়ে নূতন ক'রে তৈরি করতে হয়। এতে খুবই সময় লাগে। তবুও মুখ থেকে পৃথক্‌ কোন স্থায়ী মুখোসে ইহা রূপান্তরিত হয় নাই। কারণ, রসাভিনয়ের জন্য মুখের পেশীর সঞ্চালনের কোন বাধা না দিয়ে এই রকম মুখাবরণ তৈরি করতে হয়েছে। এদের ব্যবহৃত পোষাক ও গহনা ছবিতে বেশী স্পষ্ট হবে।

মহিলা-সংবাদ



রাণী লক্ষ্মীবাঈ রাজবাড়ে

রাণী লক্ষ্মীবাঈ রাজবাড়ে এক জন বিখ্যাত কর্ম্মী ও সমাজসেবিকা। তিনি গোয়ালিয়রের কাউন্সিল অব রিজেন্সীর সৈন্য-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের সহধর্ম্মিণী। নারীজাতির উন্নতিকল্পে তাঁহার প্রচেষ্টা সর্ব্বজনবিদিত। তিনি এই জন্য গোয়ালিয়র ও বাহিরের অনেকের আদর্শস্থানীয়া। সামাজিক কুসংস্কার ও দুর্নীতি-নিবারণেও তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব আছে।



ডক্টর শ্রীমতী শান্তা সপ্তর্ষি

ডক্টর শ্রীমতী শান্তা সপ্তর্ষি তৃতীয় এম্‌-বি, বি-এস্‌ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন।

নুটু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফাল্গুনের পূর্ণিমার আমন্ত্রণ পল্লবে পল্লবে
এখনি মুখর হোলো অধীর মর্ম্মর কলরবে।
বৎসে, তুমি বৎসরে বৎসরে
সাড়া তারি দিতে মধুস্বরে,
আমাদের দূত হয়ে তোমার কণ্ঠের কলগান
উৎসবের পুষ্পাসনে বসন্তেরে করেছে আহ্বান ॥

নিষ্ঠুর শীতের দিনে গেলে তুমি রুগ্নতনু ব'য়ে
আমাদের সকলের উৎকণ্ঠিত আশীর্ব্বাদ ল'য়ে।
আশা করেছিনু মনে মনে
নব বসন্তের আগমনে
ফিরিয়া আসিবে যবে লবে আপনার চিরস্থান,
কানন-লক্ষ্মীরে তুমি করিবে আনন্দ-অর্ঘ্যদান ॥

এবার দক্ষিণবায়ু দুঃখের নিঃশ্বাস এল ব'হে ;
তুমি তো এলে না ফিরে ; এ আশ্রম তোমার বিরহে
বীথিকায় ছায়ার আলোকে
সুগভীর পরিব্যাপ্ত শোকে
কহিছে নির্ব্বাক্‌বাণী বৈরাগ্য-করুণ ক্লান্ত সুরে,
তাহারি রণন-ধ্বনি প্রান্তরে বাজিছে দূরে দূরে ॥

এখনো তেমনি হেথা আসিবে দিনের পরে দিন,—
তবুও সে আজ হ'তে চিরকাল র'বে তুমিহীন।
ব'সে আমাদের মাঝখানে
কভু যে তোমার গানে গানে
ভরিবে না সুখ-সন্ধ্যা, মনে হয় অসম্ভব অতি,
বর্ষে বর্ষে দিনে দিনে প্রমাণ করিবে সেই ক্ষতি ॥



শ্রীমতী রমা কর

শিশুকাল হ'তে হেথা সুখে দুঃখে ভরা দিনরাত
করেছে তোমার প্রাণে বিচিত্র বর্ণের রেখাপাত।
কাশের মঞ্জরী-শুভ্র দিশা ;
নিস্তব্ধ মালতীঝরা নিশা ;
প্রশান্ত শিউলি-ফোটা প্রভাত, শিশিরে ছলোছলো ;
দিগন্ত-চমক-দেওয়া সূর্য্যাস্তের রশ্মি জ্বলোজ্বলো ॥

বারে বারে নিতে তুমি গীতিস্রোতে কবি-আশীর্ব্বাণী,
তাহারে আপন পাত্রে প্রণামে ফিরায়ে দিতে আনি'।
জীবনের দেওয়া নেওয়া সেই
ঘুচিল অন্তিম-নিমেষেই ;
স্নেহোজ্জ্বল কল্যাণের সে সম্বন্ধ তোমার আমার
গানের নির্ম্মাল্য সাথে নিয়ে গেলে মরণের পার ॥

প্রিয় এতই দুর্লভ যে-সঞ্চয়
াৎ তারো যে ঘটিতে পারে লয়।
, তব বক্ষোমাঝে
া কিছুই না বাজে,
সৃষ্টির নেপথ্য সেও আছে তব দৃষ্টির ছায়ায় :—
শুদ্ধ-বীণা রঙ্গগৃহে মোরা বৃথা করি হায় হায় ॥

হে বৎসে, যা দিয়েছিলে আমাদের আনন্দভাণ্ডারে
তারি স্মৃতিরূপে তুমি বিরাজ করিবে চারিধারে।
আমাদের আশ্রম-উৎসব
যখনি জাগাবে গীতরব
তখনি তাহার মাঝে অশ্রুত তোমার কণ্ঠস্বর
অশ্রুর আভাস দিয়ে অভিষিক্ত করিবে অন্তর ॥*

১৮ মাঘ, ১৩৪১

* শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতশিক্ষয়িত্রী পরলোকগতা শ্রীমতী রমা করের উদ্দেশে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি "বিশ্বভারতী নিউস" পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। রমা তাঁহার বন্ধু স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অন্যতমা কন্যা ও তাঁহার স্নেহভাজন ছিলেন, ডাক-নাম ছিল 'নুটু'।

দিবাস্বপ্ন

শ্রীসীতা দেবী

দূরের গির্জ্জার-ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিয়া গেল। মিনি আর সন্তু এতক্ষণ ছটফট করিয়া সবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যা হইতে এমন ভীষণ গুমোট হইয়াছিল যে মানুষ সিদ্ধ হইয়া যাইবার জোগাড়। কোথাও হাওয়ার লেশমাত্র নাই। বাতাস থাকিলে, সামনের এক ফালি বারান্দাতে বসিলে, গা বেশ জুড়াইয়া যায়। বাড়ির ভিতর ঐটুকু জায়গা খালি ফাঁকা। আর বাড়ি বলিতে ত মস্ত বাড়ি, ১০০৲ টাকা মাহিনা যার, সে কেরাণীবাবুর আর কত বড় বাড়ি ভাড়া করিবার ক্ষমতা হইবে? দুই খানি থাকিবার ঘর, ঐ ছোট বারান্দাটুকু, ইহাই বিনোদিনীর বাড়ি। কলের ঘর, রান্নাঘর প্রভৃতি এমন ছোট ছোট যে পুতুলের ঘর বলিয়া বোধ হয়। যাহা হোক, তাহারা চারিটি প্রাণী, কোনোমতে ঠাসাঠাসি করিয়া ইহারই ভিতর কুলাইয়া যায়। প্রকাশ বাহির হয় সাড়ে নটায়, আর বাড়ি ফেরে সন্ধ্যার পর, কাজেই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তাহার আট-ন ঘণ্টার বেশী নয়। সন্তুটা ছ-সাত বৎসরের হইয়াছে, সামনের জানুয়ারিতে তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিবার কথা। সেও চলিয়া গেলে বাকি থাকিবে বিনোদিনী আর মিনি। সুতরাং ইহার চেয়ে বেশী জায়গায় তাহাদের প্রয়োজনই বা কি? আর প্রয়োজন থাকিলেই বা হইতেছে কি? কোনো কালে অবস্থার উন্নতি হইবার আশা বিনোদিনী ছাড়িয়াই দিয়াছে।

তাহার বিবাহ হইয়াছে ন-দশ বৎসর আগে। তখন প্রকাশ মাহিনা পাইত মাত্র পঞ্চাশ টাকা। এত দিন ধরিয়া দুই-চার টাকা করিয়া বাড়িয়া এখন ১০০৲ দাঁড়াইয়াছে। তেমনি প্রকাশের বয়স ত বসিয়া নাই, তাহাও বাড়িয়াছে। বিনোদিনীই বুড়ী হইতে চলিল, তাহারই গেল মাসে পঁচিশ পূরিয়া গিয়াছে। প্রকাশ তাহার চেয়ে বছর-দশের বড়। বাঙালীর স্বাস্থ্য ত? কত দিনই আর পূর্ণোদ্যমে কাজ করিতে পারিবে? চল্লিশ বৎসরে পা দিতে না-দিতেই ত তাহাদের চোখের দৃষ্টি কমিয়া যায়, পিঠ কুঁজা হইয়া পড়ে, হাজার ব্যাধি আসিয়া জোটে! যা উন্নতি করিবার তাহা এই ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে।

এমন সময় গির্জ্জার ঘড়ির শব্দে তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। ওমা, আটটা বাজিয়া গেল, এখনও মানুষের ফিরিবার নাম নাই। কি আক্কেল বলিহারি যাই। স্ত্রীলোক বলিয়া তাহারা কি

জানোয়ারেরও অধম? তাহাদের সময়মত খাওয়া-শোওয়া কিছুরই প্রয়োজন নাই। যখন কর্ত্তার মর্জ্জি হইবে, তখন তিনি ফিরিবেন এবং খাইয়া-দাইয়া স্ত্রীকে কৃতার্থ করিবেন। তাহার পর সে নিজে খাইবে, হেঁসেল তুলিবে, তাহার পর শুইতে যাইবে।

কিন্তু স্বামী বাড়ি না ফিরিলে বেশ প্রাণ খুলিয়া তাহার উপর রাগও করা যায় না যে? ফুর্ত্তি করিয়া দেরি করিতেছে কি? আহা তাহাই যেন হয়। যে স্থানে তাহাদের বাস, শহর না ত মানুষখেকো রাক্ষস। ব্যাধি ত হাজার রকমের বৎসর-ভোর লাগিয়াই আছে, তাহার উপর যমের আর এক নূতন দূত হইয়াছে এই মোটরকার আর বাস্‌গুলি। খবরের কাগজ খুলিলেই হইল, দুইটা কি একটা এই খবর চোখে পড়িবেই পড়িবে। হাজার সাবধান মানুষ হোক, কখন কি ঘটে, বলা যায় কি? ভগবান না-করুন, ঢের কষ্ট সে সহিয়াছে, স্বামী পুত্রের মুখ চাহিয়া আরও সহিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আছে, কিন্তু ঐগুলি বাদে।

পুরুষমানুষ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে, মাঝে মাঝে একটু ফুর্ত্তি করিবার তাহাদের প্রয়োজন হয় বইকি? বিনোদিনীর অসুবিধা হয় বটে, কিন্তু সত্যই ব্যাপারটা এমন কিছু দোষের নয়। সেও সারাদিন খাটে, ঘর ছাড়িয়া কোথাও নড়িতে পায় না, জীবনে তাহার কোনোই বৈচিত্র্য নাই, দুশ্চিন্তার ভারে জীবন হইতে সব সৌন্দর্য্য, সব আনন্দ তাহার মুছিয়া যাইতে বসিয়াছে। প্রকাশ সে-কথা একবার ভাবিলেও পারে—কিন্তু বাংলা দেশে মেয়েমানুষ সম্বন্ধে কে আবার কবে এত ভাবনা ভাবিতে যায় বল? একটা আছে, সেটা না থাকিলে আর একটা আসিবে, এই ত? বিনোদিনীর মেজাজটা অনেকখানি কোমল হইয়া আসিয়াছিল, দুর্ঘটনার ভাবনায়, উহা আবার ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হইতে আরম্ভ করিল।

ঘরের ভিতর নিদ্রিত সন্তু সজোরে পা ছুড়িয়া মিনিকে লাগাইয়া দিল। মিনি ঁয্যা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাড়াতাড়ি বারান্দা হইতে উঠিয়া আসিয়া চাপ্‌ড়াইয়া চাপ্‌ড়াইয়া মেয়েকে আবার ঘুম পাড়াইয়া দিল। ঠাকুরুণ এখন জাগিয়া উঠিয়া বসিলেই হইয়াছিল আর কি? প্রকাশের সঙ্গে দুইটা কথাও বলিতে দিবে না, ঘ্যান-ঘ্যান করিয়া জ্বালাইয়া মারিবে।

সাড়ে আটটা হইয়া থাকিবে, বোধ হয়। ঐ ত পাশের বাড়ির মণ্টুর মাষ্টার পড়াইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। মাগো মা, এত দেরি কেন? আপিস হইতে বাহির হইয়া কোথায় গেল এ মানুষ? কোথাও যাইবার কথা আছে, তাহাও ত বলে নাই সকালে? আজ আবার মাহিনা পাইবার দিন, সঙ্গে টাকাকড়ি থাকিবে। মাঃ, আর দুর্ভাবনার বোঝা সে বহিতে পারে না, কবে যে তাহার মুক্তি হইবে। ইহার চেয়ে তাহার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে গিয়া থাকা ভাল। খাইবার-পরিবার কষ্ট সেখানে হয়ত আরও বেশী হইতে পারে, কিন্তু এত ভাবনা ভাবিতে হইবে না। স্বামী ত সারাক্ষণ চোখের উপর থাকিবে? বিনোদিনীর চোখ দুইটা ছল ছল করিয়া উঠিল, গলাটাও যেন ব্যথায় টন-টন করিতে লাগিল।

সারাটা মাস কি টানাটানির ভিতর দিয়াই চলে। মাহিনার টাকাটা হাতে পাইতে-না-পাইতেই ত আগের মাসের বাকী শোধ করিতে অর্দ্ধেকটা ফুরাইয়া যায়। একটা দিনও নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই, একটা দিনও প্রাণ খুলিয়া আট গণ্ডা পয়সা নিজের ইচ্ছামত খরচ করিবার উপায় নাই। খালি ভাবনা, খালি অনটন, খালি পাই-পয়সার হিসাব। তাও এত হিসাব করিয়াও যদি কিছু হইত। কোনো দিন যে ইহার শেষ হইবে তাহা ত আর মনে হয় না।

বিনোদিনী বড়লোকের মেয়ে নয়, গৃহস্থ ঘরেরই মেয়ে। তবু তাহার বাপের বাড়ির অবস্থা ইহার চেয়ে খানিকটা সচ্ছল ছিল বইকি? এত কষাকষি করিতে মাকে সে কোনো দিন দেখে নাই। তাহার ত সন্তান মাত্র দুইটি, ভাই-বোনে কিন্তু তাহারা বাপের বাড়িতে পাঁচ জন ছিল। দুই বোন তিন ভাই। তা ভালমন্দ সর্ব্বদাই তাহারা খাইয়াছে, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিয়াও বেড়ায় নাই। ফলপাকুড় যে-সময়কার যা সবই তাহাদের মুখে উঠিয়াছে। পূজার সময় নূতন কাপড় পরিয়াছে, পৌষ-পার্ব্বণে পেট ভরিয়া পিঠাও খাইয়াছে। মা অবশ্য পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকেন নাই কোনো দিন, সংসারের কাজকর্ম্ম সবই করিতেন

একটা ঠিকা-ঝি সম্বল করিয়া। মেয়েরাও তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিত।

তা বিনোদিনীই কি খাটিতে কিছু কসুর করে? ঠিকা-ঝিও ত তাহার সব সময় জোটে না? কিন্তু দিনের ধরা-বাঁধা চার আনার বেশী বাজার খরচ করিতে কোনো দিন ত পাইল না। ভাল ফল, বা সন্দেশ রসগোল্লা কাহাকে বলে তাহা ছেলেপিলে জানেও না। কালেভদ্রে কোথাও নিমন্ত্রণে গেলে এ-সব জিনিষ তাহাদের পেটে পড়ে। খেলনা, দু-এক পয়সা দামেরও কখনও সে সখ করিয়া তাহাদের কিনিয়া দেয় না। কাজ কি বাপু? ইহা লইয়া কে আবার কথা শুনিতে যাইবে? পূজার সময় সস্তা ছিটের জামা কিনিয়া দিয়া সে বেচারীদের ভুলায়। বৎসর-কার দিন কি করিয়া আর পুরান ন্যাকড়া পরাইয়া তাহাদের লোকসমাজে পাঠাইবে? কিন্তু নিজেও নূতন কাপড় এ-পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহার অঙ্গে উঠে নাই। পাঁচ বৎসর হইল মা স্বর্গে গিয়াছেন, বিনোদিনীকে নূতন কাপড় পরাইবার কথা কে আর ভাবিতেছে বল? প্রকাশ অবশ্য নিজের জন্যও পূজার সময় কাপড় কেনে না। কিন্তু পুরুষ-মানুষ তাহাকে আপিসে যাইতে হয়, কাজেই মাঝে মাঝে নূতন কাপড়-জামা করাইতে হয় বইকি। সব ক'খানাই তাহার ছেঁড়া নয়। বিনোদিনীর যা দশা তাহা আর বলিয়া কাজ নাই।

গলির দরজায় মৃদু শব্দ হইল, ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্। বিশেষ তেজ নাই আজকার আহ্বানে। বিনোদিনী মনে মনে বকুনিটা মুখস্থ করিয়া নামিয়া গিয়া, হড়াৎ করিয়া দরজাটা খুলিয়া দিল। প্রকাশ যেন না-দেখিয়াই আবার তড় তড় করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল।

প্রকাশের জানাই ছিল, আজ অভ্যর্থনাটা ইহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর হইবে না। দশ বৎসর ঘর করিতেছে ত, বিনোদিনীকে তাহার দশবার-পড়া বইয়ের মত জানা হইয়া গিয়াছে। কখন সে কি বলিবে, কোন্ অবস্থায় কেমন ব্যবহার করিবে, সব তার জানা। কিছু লইয়াই তাহার আর কল্পনা খরচ করিতে হয় না। ঋষিরা বৃথাই বলিয়া গিয়াছেন স্ত্রী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। বাংলা দেশে অন্ততঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কথাটা ঠিক নয়।

সে সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করিয়া বিনোদিনীর পিছন পিছন উপরে উঠিয়া আসিল। বিনোদিনী চুপ করিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে, প্রকাশ যে একটা মানুষ কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা যেন দেখিতে পাইতেছে না। গভীর মনোযোগ দিয়া সে রাস্তার গাড়ী ও লোক-চলাচল দেখিতেছে।

প্রকাশ আরও কাছে আসিয়া স্ত্রীর কাঁধে হাত দিয়া বলিল, "কি গো খেতে-টেতে দেবে? খিদেয় ত পেট চোঁ-চোঁ করছে।"

বিনোদিনী অসহিষ্ণু ভাবে তাহার হাতখানা ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল, "তাই নাকি? এত ক্ষণ যেখানে ছিলে তারা খেতে দেয় নি?"

প্রকাশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "সেটা আমার মামা-বাড়ি নয়?" মুখে হাসি আছে বটে, কিন্তু মনে যে একটু রাগও না-হইতেছে তাহা নয়। এই এক ব্যাপার লইয়া চিরকালই কি রাগারাগি করিতে হইবে? নব-বিবাহিত অবস্থায় যে-মানঅভিমানগুলি মধুর লাগে, বেশী দিনের পর তাহাই মনে হয় অনাবশ্যক উৎপাত বা ন্যাকামী। এত দিনে বিনোদিনীর একটু বুদ্ধি-বিবেচনা হওয়া উচিত, সংসারকে একটু চিনিতে শেখা উচিত। অর্থাৎ সোজা ভাষায় কর্ত্তার খেয়াল-খুশীগুলি নির্ব্বিবাদে সহিয়া যাওয়া উচিত।

বিনোদিনী ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "মামার বাড়ি নয় তা ত জানিই। সে কি আর জানতে বাকী আছে? তবু কোথায় যাওয়া হয়েছিল সেটা শুনিই না-হয়?"

প্রকাশ মোড়ায় বসিয়া জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে বলিল, "বুঝতেই ত পারছ যে বায়োস্কোপে গিয়েছিলাম। সেটা আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলে বেশী কি মিষ্টি লাগে?"

"হঁ! কত চমৎকার খবর, মিষ্টি আর লাগবে না?" বলিয়া বিনোদিনী হন-হন করিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। ঝনাৎ করিয়া শিকল খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া স্বামীর জন্য ভাত বাড়িতে বসিয়া গেল।

দুইখানি ঘরের ভিতর একটিতে ছেলেমেয়ে লইয়া বিনোদিনী শোয়, অন্যটাতে প্রকাশ শোয়। ছেলেপিলের

উৎপাতে তাহার ঘুম হয় না। সারা দিন ভূতের মত খাটিবে, আবার রাত্রে উহাদের চীৎকার উপভোগ করিবে, অত সখে আর কাজ নাই। বিনোদিনী অবশ্য খাটে তাহার চেয়ে বেশী, কিন্তু সে একে মেয়েমানুষ তাহার উপর তাহার খাটুনিতে পয়সা আসে না, সুতরাং তাহার পরিশ্রমকে কেহ খাতির করে না।

ভাত বাড়িয়া আনিয়া, প্রকাশের ঘরেই আসন পাতিয়া বিনোদিনী জায়গা করিয়া দিল। জামা-জুতা ছাড়িয়া, আপিসের ধুতিখানিও বদলাইয়া প্রকাশ আসিয়া খাইতে বসিল। বিনোদিনী সামনে মাটিতে বসিয়া খাওয়া দেখিতে লাগিল। স্বামীর খাইবার সময় তাঁহার কাছে বসিতে হয়, মাছি থাকিলে মাছি তাড়াইতে হয় এবং হাজার রাগিয়া থাকিলেও তখন রাগের কথা কহিতে হয় না, ইহা বিনোদিনী বাপের বাড়ি হইতেই শিখিয়া আসিয়াছে। মাকে চিরকালই সে এমনি ভাবে চলিতে দেখিত।

প্রকাশ যেন ইচ্ছা করিয়াই খাওয়া শেষ করিতে দেরি করিতে লাগিল। এইটুকু সময়ই সন্ধির সময়, ইহার পরই বিনোদিনীর মূর্ত্তি বদলাইয়া যাইবে। তবে আজ একটা ব্রহ্মাস্ত্র হাতে আছে, আজ মাহিনার টাকা তাহার সঙ্গে আছে। বিনোদিনীর টাকা-ক'টা হাতে করিয়া নাড়িয়াই যা সুখ। ইহার একটা পয়সা পর্য্যন্ত সে নিজের জন্য, বা নিজের ইচ্ছামত কোনো দিন খরচ করিতে পারে না।

প্রকাশ অবশেষে খাওয়া সারিতে বাধ্য হইল। মুখ-হাত ধুইয়া, বিনোদিনীর হাত হইতে পান লইয়া চিবাইতে চিবাইতে বিছানায় গিয়া বসিল। এখন তাহার মেজাজটা বেশ আছে। বিনোদিনীর মেজাজটাও যদি ভাল থাকিত ত খানিক মিষ্টালাপ এই সময় করা যাইত। ছেলেমেয়ে দুটাও পাশের ঘরে ঘুমাইয়া আছে। কিন্তু মুস্কিল ত এইখানেই! দু-জনের মেজাজ এক সময় ভাল থাকাটা অতি কালেভদ্রে ঘটিয়া থাকে। বিনোদিনী মুখ বুজিয়া সারা দিন খাটে বটে, কিন্তু নিজের জেদ কখনও ছাড়ে না। প্রকাশ স্বীকার না-করুক, সে নিজে জানে যে সে কাহারও বসিয়া খাইতেছে না। অতএব কাহারও অঙ্গুলি-হেলনে হাসিতে বা কাঁদিতে সে বাধ্য নয়। বিনোদিনী তাড়াতাড়ি করিয়া এঁটো বাসন-কোসন তুলিতে আরম্ভ করিল। প্রকাশ গলার স্বরটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া বলিল, "তোমার এখনও খাওয়া হয় নি বুঝি?"

বিনোদিনী ফোঁস করিয়া উঠিল, "তোমার আগে কবে আমি গিলে ব'সে থাকি শুনি?"

প্রকাশ এখন ঝগড়া বাধাইতে চায় না, বলিল, "তা যদি থাকতেও ত কিছু চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যেত না। তোমার ভাত এইখানেই নিয়ে এস না?"

"থাক, অত আদরে আর কাজ নেই, আবার এখানে আর এক পালা এঁটো পাড়তে বসি। তার চেয়ে আমার রান্নাঘরই ভাল।"—বলিয়া বাসন হাতে করিয়া বিনোদিনী চলিয়া গেল।

প্রকাশ হতাশ ভাবে শুইয়া পড়িল। নাঃ, এদের সঙ্গে আর পারা যায় না। বিনোদিনীকে সুখে রাখিতে তাহার কি অসাধ? সাধ্যে কুলাইয়া উঠে না তা সে কি করিবে? সেই জন্য কি চিরদিন ধরিয়া খালি মুখ-ঝামটা খাইতে হইবে? পান থেকে একটু চূণ খসুক দেখি, অমনি গৃহিণীর মুখ তোলা-হাঁড়ির মত হইয়া উঠিবে। বাহিরে পরের দাসত্বের জ্বালা, আর ঘরে খালি খিচিমিচি, কাঁহাতক আর মানুষ পারিয়া ওঠে?

বিনোদিনীর খাইতে সময় বেশী লাগে না। সারাদিন ভূতের মত খাটিয়া সে এত শ্রান্ত হইয়া পড়ে যে খাওয়া-দাওয়া কিছু তাহার ভালও লাগে না। এই ক্ষুদ্র খোঁপের মত ঘরে বসিয়া বসিয়া প্রাণ তাহার হাঁপাইয়া ওঠে, দম যেন বন্ধ হইয়া আসে। চব্বিশটা ঘণ্টার মধ্যে একটি বার পাঁচ মিনিটের জন্যও যদি সে বাহিরে যাইতে পারিত, তাহা হইলে খানিকটা যন্ত্রণা তাহার হয়ত কমিয়া যাইত। কিন্তু কেইবা তাহাকে লইয়া যাইবে? বিকালে তাহার সময় হয় না এবং প্রকাশও বাড়ি ফেরে না। ভোর-বেলা হইলে সে যাইতে পারে। কিন্তু ভোরে প্রকাশকে উঠান একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।

খাওয়া শেষ করিয়া এঁটো বাসনের রাশ সে কলতলায় ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। এখন আর মাজিতে বসিতে পারে না, সকালে দেখা যাইবে এখন। রান্নাঘরটা চট করিয়া ধুইয়া দিয়া সে দুরজায় শিকল তুলিয়া দিল। তাহার পর একটা পান মুখে দিয়া, শুইবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

এতক্ষণে ঝির-ঝির করিয়া একটু হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিনোদিনী ঘরের সব-ক'টা জানলা-দরজা খুলিয়া দিল, একটু ঠাণ্ডা হোক ঘরখানা। ছেলেমেয়ে দুইটা ঘামে যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছে। নিতান্ত শিশু তাই, বয়স্ক লোক হইলে আর এত গরমে ঘুমাইতে হইত না।

পাশের ঘর হইতে প্রকাশ ডাকিয়া বলিল, "ও গো, শুনে যাও।"

বিনোদিনী মুখখানার উপর আবার গাম্ভীর্য্যের আবরণ টানিয়া দিয়া, পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। প্রকাশ তখন লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। বলিল, "আমার পাঞ্জাবীটা নিয়ে এস ত, ওঘরে আল্‌নায় রেখে এসেছি।"

বিনোদিনী আবার বিনা-বাক্যব্যয়ে পাশের ঘরে গিয়া পাঞ্জাবীটা লইয়া আসিল। প্রকাশ তাহার হাত হইতে জামাটা লইয়া বলিল, "ব'স না বাপু, এখানে বস্‌লে ত আর তোমার জাত যাবে না?"

বিনোদিনী ভ্রূকুটি করিয়া সেইখানে, বিছানার এক পাশে বসিয়া পড়িল। প্রকাশ জামার পকেট হইতে খান-কয়েক নোট্ আর খুচরা কয়েকটি টাকা বাহির করিয়া হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও।"

নোট এবং টাকা এক নিমেষে গণিয়া লইয়া বিনোদিনী বিরক্ত কণ্ঠে বলিল, "আর দুটো টাকা কম কেন? যা-খুশী তাই নিয়ে আস্‌বে, আর তাই দিয়েই আমাকে সব চালাতে হবে। কেন, আমি কি ভেল্‌কি জানি?"

প্রকাশ বলিল, "দুটো টাকা বেশী আর কমে কিই বা এসে যায়? থাকলেও যা, না থাকলেও তা। একই অভাবের পালা চলতে থাকবে।"

বিনোদিনী বলিল, "আহা তা আর নয়। হাতে ক'রে কিছু ত খরচ করতে হয় না, কাজেই লম্বা লম্বা কথা বল। দুটো টাকায় এক হপ্তার বাজার-খরচ চলে, তার খেয়াল আছে?"

প্রকাশ চটিয়া বলিল, "নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। কি এমন মহাপাপ ক'রে এসেছি যে, তখন থেকে খালি খ্যাঁক-খ্যাঁক করছ? সত্যি এক-একবার ইচ্ছে হয় ঘরবাড়ি ছেড়ে বিবাগী হয়ে চলে যাই।"

বিনোদিনী টাকা নোট সব বিছানায় ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার তখন দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। ভাঙা গলায় বলিল, "এই রইল তোমার টাকা-কড়ি, আমার খ্যাঁক খ্যাঁক করেও কাজ নেই, তোমার টাকা নিয়েও কাজ নেই। তুমি কিনে-কেটে এনে দিও, আমি রেঁধে-বেড়ে দেব এখন। তা হলেই আমার কথা আর সইতে হবে না।" সে নিজের ঘরে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল

বিনোদিনীর মুখঝামটাটা প্রকাশের অসহ্য লাগিত বটে, কিন্তু তাহার চেয়েও অসহ্য লাগিত বিনোদিনীর চোখের জল। এই অস্ত্রটির সাহায্যে চিরদিনই প্রকাশকে বেশ চট করিয়া হার মানাইয়া দেওয়া যায়।

প্রকাশ উঠিয়া বসিয়া স্ত্রীর দুই হাত ধরিয়া টানিয়া একেবারে নিজের বুকের উপর আনিয়া ফেলিল। বিনোদিনী আর তাহার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল না, প্রকাশের বুকে মুখ গুঁজিয়াই কাঁদিতে লাগিল।

প্রকাশ তাহার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "এই সামান্য কথাতেই কেঁদে ফেল্‌লে? ছি, ছি, তুমি আবার বয়স-বাড়ার গর্ব্ব কর। আসলে তোমার বয়স দশ বছর, ঐ ও-বাড়ির পুঁটির মত। সেও যেমন সব কথায় ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ওঠে, তুমিও তাই।"

বিনোদিনী মাথা তুলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "হ্যাঁ, তা আর না। যা ক'রে আমার দিন কাটে, অমন যেন শত্রুরও না হয়।"

প্রকাশ বলিল, "দুনিয়াসুদ্ধ সবাই এমনি ক'রে দিন কাটছে, কেই বা সুখে আছে বল? আমরা তবু খেটে-খুটে দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পাচ্ছি, অনেকে ত তাও পাচ্ছে না?"

বিনোদিনী বলিল, "সবাই কেন আমাদের মত হ'তে যাবে? তোমার মেজভাইরাই ত বেশ রয়েছে। যাক্ গে, পরের হিংসে ক'রে লাভই বা কি? যে যেমন অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছে।"

প্রকাশ বলিল, "তাই বোঝাও নিজের মনকে।" খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ঐ টাকা-দুটো দিয়ে কি করেছি জান? একটা লটারীর টিকিট কিনেছি, যদি কপাল ফেরে।"

বিনোদিনী বলিল, "তুমিও যেমন। আমাদের কপালে

ও-সব নেই। ভগবান জানেন খালি তেলা মাথায় তেল ঢালতে। দেখ, গরিবরা কেউ কিছু পাবে না, যার দরকার নেই কিছু, এমন কোনো মানুষ পাবে।"

প্রকাশ বলিল, "সে এক রকম জানা কথাই। তবু একবার কপাল ঠুকে দেখি। মাঝে মাঝে পানবিড়িওয়ালা, গাড়োয়ান এরাও পেয়ে যায় কি না।"

বিনোদিনী বলিল, "তা দেখ, কত টাকাই ত কত রকমে যাচ্ছে, এ-ও না হয় যাবে। বাবা, কি গরম আজ। এ বছর দেখি বেশ সকাল-সকালই গরম পড়ে গেল।"

প্রকাশ বলিল, "সত্যি, একেবারে সেদ্ধ ক'রে দেবার জো। পাখা একখানা নিয়ে এস ত।"

বিনোদিনী উঠিয়া পাশের ঘর হইতে পাখা লইয়া আসিল। সেইখানেই আধশোয়া অবস্থায় নিজেও হাওয়া খাইতে লাগিল, প্রকাশকেও হাওয়া করিতে লাগিল। তন্দ্রায় কখন তাহার অলক্ষ্যে হাত হইতে পাখাখানা খসিয়া পড়িয়া গেল। মাঝরাত্রে মিনির চীৎকারে জাগিয়া উঠিয়া আবার তাহাদের কাছে গিয়া শুইল। মাহিনার টাকা বালিসের তলাতেই গোঁজা রহিল, ঘুমের ঝোঁকে আর বাক্সে তুলিয়া রাখা হইল না।

পর দিন ভোর হইতেই উঠিয়া আবার দিনের খাটুনির পালা। আজ তবু তাহার মনটা একটু ভাল আছে। সকাল হইতে যত ছোট ছোট পাওনাদার আসিয়া জোটে, ছিনে-জোঁকের মত পিছন ছাড়িতে চায় না। অন্য দিন কেবলই তাহাদের ফিরাইয়া দিতে হয়। তাহারা কেহবা নীরবে যায়, কেহবা দুইটা কথা শুনাইয়াও দিয়া যায়। ছোটলোকের মুখে যখন কথা শুনিতে হয়, তখন বিনোদিনীর ইচ্ছা করে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে। কিন্তু ছেলেমেয়ে দুইটার মুখের দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া থাকে। ইহাদের যে সে ভিন্ন গতি নাই। বাপ রোজগার করিয়া আনে বটে, কিন্তু মা না-থাকিলে বাপ পর হইয়া যাইতে কত ক্ষণ?

আজ তবু সকলকে দু-এক টাকা করিয়া দিতে পারিবে, কথা শোনার পরিবর্ত্তে, সেই কথা শুনাইতে পারিবে, জানিয়া সকাল হইতেই বিনোদিনীর চিত্ত প্রসন্ন ছিল। চা খাইবার জন্য প্রকাশ যখন রান্নাঘরে স্ত্রীর খোঁজ করিতে গেল, বিনোদিনীর হাসিমুখ দেখিয়া তাহারও মনটা একটা অকারণ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। ভাবিল "মাসের সব-ক'টা দিন 'পে ডে' (মাহিনার দিন) হ'লে তবু কিছু সুখে থাকা যেত।"

চা খাইয়া সে বাজার করিতে বাহির হইল। আগে এ-কাজটা ঠিকা-ঝিয়ের দ্বারাই হইত। এখন কিন্তু তাহাকে বিনোদিনী বিদায় করিয়া দিয়াছে। মাস সাত-আট আগে মিনির টায়ফয়েড্ ফিভার হয়, তখন চিকিৎসার জন্য বেশ খানিক দেনা হইয়া গিয়াছে। গরিবের এক পয়সা সঞ্চয়ের উপায় নাই। বিপদ-আপদ ঘটিলে তখন হয় ধার কর, না-হয় স্ত্রীর গায়ের গহনা থাকিলে তাহা বাঁধা দাও। বিনোদিনী কিন্তু এ-ক্ষেত্রে খুব শক্ত। গহনা বিশেষ যে তাহার বেশী আছে তাহা নয়, কিন্তু সেগুলিতে সে হাত দিতে দেয় না। মেয়ের বিবাহ ত দিতে হইবে? তখন কোথা হইতে কি জুটিবে? এই কয় টুকরাই ত সম্বল? তাহার চেয়ে ধার করা ভাল, সে যেমন করিয়া পারে শোধ করিবে। করিতেছেও তাহাই, ঠিকা-ঝিটাকে পর্য্যন্ত বিদায় করিয়া দিয়াছে।

প্রকাশ বাজার করিয়া আনিল। ইহার পর সব রান্না করিতে গেলে সময় থাকে না, কাজেই নিরামিষ রান্না বিনোদিনী আগে সারিয়া রাখে, মাছের ঝোলটা শুধু তাড়াতাড়ি নামাইয়া দেয়। তরকারি আগেকার দিনের বাজার হইতে রাখিয়া দেয়।

স্নান করিয়া খাইয়া প্রকাশ আপিসে চলিয়া গেল। বিনোদিনী তখন মিনিকে, সন্তুকে খাওয়াইতে বসিল। প্রকাশ একটা কাজ তাহার করিয়া দেয়, ছেলেমেয়ে দুইটাকে স্নান করাইয়া দিয়া যায়। নীচের তলার বাঁধান উঠানে বেশ বড় চৌবাচ্চা আছে, সেইখানে প্রকাশ যায় স্নান করিতে। সন্তু ও মিনিও তাহার পিছন পিছন ছোটে, তাহারাও বাবার সঙ্গে স্নান করিবে। উপরে মা মাত্র এক বালতি তোলা জলে দু-জনের স্নান সারিয়া দেয়, সে উহাদের ভাল লাগে না। টিনের মগে করিয়া ঝপাঝপ্ জল মাথায় ঢালিতে ঢালিতে সন্তু চীৎকার করিতে থাকে, "মা, আমাদের তোয়ালে আর সাবান ফেলে দাও, আমরা এইখানে চান করছি।" একটা দায় হইতে মুক্ত হইল মনে করিয়া আনন্দিত চিত্তে বিনোদিনী হাত বাড়াইয়া তোয়ালে সাবান নীচে ফেলিয়া দেয়।

খাইতে বসিয়াও ছেলেমেয়ের হাজার হাঙ্গামা। সহজে কি ভাত তাহাদের মুখে ওঠে? এ মাছ ভাল নয়, ও তরকারিতে ঝাল। সন্তুকে মা বড় মাছখানা দিয়াছে, মিনিকে দেয় নাই। নয় ত মা নিজে খাইবে বলিয়া বড় মাছের মুড়াটা লুকাইয়া রাখিয়াছে। আবার কোনো দিন বা বায়না ধরে যে তাহারা মাছ খাইবে না। রোজ কেন মাছ খাইবে? মণ্টুদের বাড়ি কেমন মাংস হয়, ডিম হয়, মা বুঝি তাহাদের একদিনও কিছু ভাল জিনিষ দিতে পারে না? দুইটি ছোট মানুষকে খাওয়ান শেষ করিতে প্রায় বিনোদিনীর এক ঘণ্টা কাটিয়া যায়।

তাহার পর ধীরেসুস্থে স্নান সারিয়া, ঘরে আসিয়া বসে। ছেলেমেয়ের এখন ঘুমাইবার কথা, কিন্তু দুই বৎসরের ভিতর কখনও তাহাদের দিনের বেলা ঘুমাইতে দেখা যায় নাই। মাদুর পাতিয়া শুইয়া তাহারা কেবল পরস্পরের সঙ্গে খুনসুটি করে, এ উহাকে চিমটি কাটে, নয় ত পা দিয়া ঠেলা দেয়, আবার থাকিয়া থাকিয়া বালিশ ছোঁড়াছুড়িও হয়। বিনোদিনী আসিয়া দুইজনের মাঝখানে শুইয়া পড়ে, কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাদের খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু চুপ করিয়া থাকাটা যে একেবারেই অসম্ভব? অথচ এখন মারামারি করিতে গেলে মা বিরক্ত হইয়া দুই-একটা চড় যে লাগাইবেন না, তাহাও বলা যায় না। সুতরাং খানিক অপেক্ষা করিয়া তাহারা আস্তে আস্তে উঠিয়া নীচে মণ্টুদের ঘরে পলায়ন করে বিনোদিনী তত ক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বেশী ক্ষণ অবশ্য ঘুম তাহার হয় না। পাড়ার মেয়ে-ইস্কুলে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিতেই সে উঠিয়া পড়ে। উনুনে আঁচ দিয়া ছেলেমেয়েকে ডাকিয়া উপরে লইয়া আসে। দুধটুকু কোনোমতে গিলিয়া আবার তাহারা যে যার খেলার সাথীর সন্ধানে প্রস্থান করে। তাহার পর রান্না করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, শুকনো কাপড় তোলা, বিছানা পাতা, একটানা কাজের স্রোত বহিতে থাকে, রাস্তার আলো জ্বলিবার আগে তাহার আর নিঃশ্বাস লইবার অবসর থাকে না।

আজ কেবলই কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাহার মনে হইতে লাগিল, লটারীর টিকিটটার কথা। আচ্ছা, ধর যদি সত্যই কিছু পাওয়া যায়? এমনও ত হয়? কেহ-না-কেহ ত প্রাইজগুলি পাইবেই? প্রকাশ পাইলেই বা? আঃ, তাহা হইলে চিরদিনের মত হাড় ক'খানা বিনোদিনীর জুড়ায়। পাঁচ লাখ, দশ লাখ কিছু সে চায় না, অতি লোভ তাহার নাই। শুধু এই নিত্য দুশ্চিন্তা, নিত্য অপমানের হাত হইতে যদি সে নিষ্কৃতি পায় তাহা হইলেই যথেষ্ট। মোটা ভাত, মোটা কাপড় আর মাথা গুঁজিবার মত নিজের একটু ঘর, ইহা হইলেই হয়। কতই বা তাহাতে লাগে? কে জানে, অত হিসাব করিয়াই বা কি হইবে? সত্যই ত আর সে টাকা পাইবে না?

কিন্তু এই অতিলোভনীয় চিন্তাটিকে কিছুতেই সে মন হইতে দূর করিতে পারে না। লটারীর টিকিট কেনা এই তাহাদের প্রথম, তাই আশা বেশী, উৎকণ্ঠাও বেশী। যদিই হয়, হওয়া এমনিই কি অসম্ভব?

সেদিন প্রকাশ একটু সকাল-সকাল বাড়ি ফিরিল। আজ আর স্ত্রীকে রাগাইবার তাহার ইচ্ছা ছিল না। বিনোদিনী তাড়াতাড়ি চা করিয়া আনিল, দুটি খানি চিঁড়াও ভাজিয়া দিল। পাখা হাতে করিয়া স্বামীর কাছে আসিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যা গা, লটারীর ফল বেরবে কবে?"

প্রকাশ চিঁড়াভাজা খাইতে খাইতে বলিল, "বেশ আছ, ঐ ভাবছ বুঝি সারাক্ষণ? সে এখনও ঢের দেরি, মাসখানেক ত হবেই।"

বিনোদিনী ছাড়িবার পাত্রী নয়, বলিল, "তা একটু ভাবছি বইকি? নগদ দু-দু-টাকা খরচ ক'রে টিকিট কেনা হ'ল। আচ্ছা, টাকা পেলে তুমি কি কর?"

প্রকাশের যে একটু লটারীর নেশা লাগে নাই তাহা নয়। সে বলিল, "কতটা পাব, তার উপর নির্ভর করে। লাখ টাকার প্রাইজও হয়, আবার পাঁচ-শ'রও হয়। পাঁচ-শ পেলে কিছুই করি না, তোমায় দিয়ে দিই বোধ হয় গহনা গড়াবার জন্যে।"

বিনোদিনী হাসিয়া বলিল "ইস্‌, তা আর না? কতই গহনা দিয়েছ এই দশ বছরে, তার আবার কথা।"

চায়ের পেয়ালা খালি করিয়া প্রকাশ বলিল, "কি দিয়ে দেব শুনি? টাকা যে-কটা আনি তাত দেখতেই পাও? সত্যি এবার টাকা পেলে একখানা গহনা তোমায় ভাল

দেখে ক'রে দেবই, যা তুমি চাও। সব চেয়ে ভাল হয় ফার্ষ্ট প্রাইজ্‌টা পেলে। তোমার গহনাও হয়, আমার সখও মেটে।"

বিনোদিনী বলিল, "কি তোমার সখ শুনিই না একটু ?"

প্রকাশ বলিল, "তাহ'লে হাজার পঞ্চাশ তোমার নামে লিখে দিই, যাতে তোমাদের কোনোদিকে কোন কষ্ট না হয়। বাকীটা নিয়ে একবার কেটে পড়ি পৃথিবীটা ভাল ক'রে দেখবার জন্যে। বায়স্কোপের কল্যাণে ছবিতে ঢের দেশই দেখলাম, একবার সত্যিটা কেমন দেখতে চাই। ওদের জীবনটাও একবার উপভোগ ক'রে দেখতে ইচ্ছে করে।"

বিনোদিনী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "মাগো মা, কি ছিরির সখ। ভগবান তোমায় কখনও প্রাইজ দেবেন না। স্ত্রী-পুত্র ফেলে পালাতে চাও এমনি অমানুষ তুমি। লোকে কোথায় টাকা চায় এদেরই সুখী করবার জন্যে, না তোমার মতলব কি ক'রে তাদের ফাঁকি দেবে।"

প্রকাশ বলিল, "বেশ, এমন না হ'লে আর স্ত্রী-বুদ্ধি। পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যাব, তার নাম হ'ল ফাঁকি দেওয়া ? একসঙ্গে লেপ্‌টে পড়ে থেকে, সবাই মিলে না-খেয়ে মরলে, সেইটেই বুঝি সবচেয়ে চমৎকার হয় ? আর ভগবান যাদের প্রাইজ্‌গুলি দেন, তারা বুঝি সবাই তখনই তা দিয়ে দেবালয় ফেঁদে বসে ? আমোদ-প্রমোদ করেই লোকে এ-সব টাকা উড়িয়ে দেয়।"

বিনোদিনী বলিল, "তোমার টাকায় আমার কাজ নেই বাপু। পঞ্চাশ হাজার তোমারই থাক। ছেলেমেয়ে নিয়ে বিলেত হয়, আমেরিকা হয় যেদিকে খুশী যেয়ো, আমি তাদের মানুষ করতে পারব না। আমি গরিবের মেয়ে, দু-মুঠো আমার খেতে পেলেই হ'ল।"—বলিয়া পাখা ফেলিয়া উঠিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

প্রকাশ বলিল, "ভাল যা হোক, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। প্রাইজ ত পাচ্ছি নগদ, তার ভাগ-বাঁটোয়ারা ঝগড়া-ঝাঁটি সব আগে ভাগে হয়ে গেল।" সে উঠিয়া পড়িয়া ছেলেমেয়েদের সন্ধানে চলিয়া গেল। বলিতে গেলে ইহাদের সঙ্গে প্রকাশের দেখাই হয় না রবিবার ছাড়া।

রান্নাঘরে বসিয়া বসিয়া বিনোদিনীর রাগও হইতে লাগিল, হাসিও পাইতে লাগিল। কোথায় কি তার ঠিক নাই, ইহারই মধ্যে চটাচটি। কিন্তু ধন্য পুরুষ-মানুষের মন, কি করিয়া সবাইকে ফেলিয়া চলিয়া যাইবার কথা ভাবিতে পারিল ? বিধাতা স্ত্রী-পুরুষকে সত্যই আলাদা ধাতুতে গড়িয়াছেন। বিনোদিনী ত লক্ষ টাকা পাইলেও স্বামী বা সন্তানদের ফেলিয়া গিয়া আমোদ করার কথা ভাবিতেও পারে না। যাহা হউক, এ লইয়া আর বেশী বাড়াইয়া কাজ নাই, ব্যাপারটা সত্যই কল্পনা ছাড়া ত কিছু নয় ?

তবু রাত্রে শুইবার সময় আবার এই কথা না-পাড়িয়াই সে পারে না। প্রকাশ যদিও তাহাকে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেয় না, বলে, "কাজ কি বাপু, অত আলনস্করের স্বপ্নে ? মাঝ থেকে লাথি লেগে বাসন-কোসন ভাঙবে।"

বিনোদিনী বলিল, "ওগো, মেয়েমানুষ অত ক'রে স্বপ্ন দেখে না। তাদের বাস্তব নিয়ে নাড়াচাড়া সারাদিন, দুটোর তফাৎ তারা রাখতে জানে। তুমি কথাটা তখন বললে কি না তাই ভাবছিলাম টাকা পেলে একটা মুক্তোর সরস্বতী-হার করতাম, যেমন আমাদের বড়বৌয়ের আছে। ভারি সুন্দর জিনিষটা, তুমিও ত দেখেছিলে ?"

প্রকাশ বলিল, "কে জানে অত শত আমার মনে নেই। তোমাদের বড়বৌ বেশ সুন্দর, সেইটে মনে আছে, অত লক্ষ্মী-হার সরস্বতী-হার মনে নেই বাপু।"

বিনোদিনী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "তা ত থাকবেই, বলিহারি তোমাদের জাতকে।"

প্রকাশ বলিল, "তা কি করব বল, যেমন যাকে বিধাতা করেছেন। তোমরা গহনা কাপড় দেখ, আমরা দেখি মানুষকে।"

বিনোদিনী জানিত এ সবই তাহাকে ক্ষ্যাপাইবার চেষ্টা, তবু না ক্ষেপিয়াও পারিত না। রাত্রে আর ঝগড়া বাধাইতে ইচ্ছা করে না, চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর এইটুকুই যা গল্পগাছা করিবার সময়। বলিল, "তা বেশ। আর কি কিনি জান ? দুখানা ভাল শাড়ী আর দুটো ভাল ব্লাউজ। বাক্সে একখানাও আমার ভাল শাড়ী কি জামা নেই। কোথাও যাই না তাই, না হ'লে মান থাকত না।"

প্রকাশ তন্দ্রার ঝোঁকে বলিল, "বেশ ত তাই কিনো।"

সকালে উঠিয়া কাজের ভীড়ে লটারীর ভাবনা চাপা পড়িয়া যায়, কিন্তু দ্বিপ্রহরের নিশ্চিন্ত অবসরে আবার তাহা বিনোদিনীকে পাইয়া বসে। কত কল্পনাই করে, কত ভাঙাগড়াই যে তাহার মনে চলিতে থাকে। স্বামীর কাছে বেশী কিছু বলিতে সাহস হয় না, সে যা ঠাট্টা করে। প্রকাশও যে কথাটা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু সেও বিনোদিনীর সঙ্গে এ-সব কথা আলোচনা করে না, আবার পাছে ঝগড়া-ঝাঁটি বাধিয়া যায়।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া যায়, লটারীর ফলাফল জানিবার দিন ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া আসিতে থাকে। উভয়েই উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু পরস্পরের কাছে ধরা পড়িতে চায় না।

কিন্তু সন্ধ্যার সময় প্রকাশ ম্লানমুখে বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া বলে, "না গো, ও সব আমাদের জুটবে কেন?"

বিনোদিনী নিজের আশাভঙ্গের দুঃখ ভুলিয়া প্রকাশকে সান্ত্বনা দিতে বসে, বলে, "হ্যাঁ, ও কি আর কেউ পায়? কই কখনও ত চেনাশুনোর মধ্যে কাউকে পেতে দেখি নি?" তাড়াতাড়ি করিয়া কড়াইসুঁটির কচুরি ভাজে, স্বামীকে যত্ন করিয়া খাওয়ায়। বিকালে কাজের অজুহাতে কখনও সে বাহির হইতে চায় না, আজ নিজের থেকে কাজ সারিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া ছেলেমেয়ে দুটিকেও পরিষ্কার কাপড় পরাইয়া, স্বামীর সঙ্গে বাহির হয়। ট্রামে চড়িয়া গড়ের মাঠে গিয়া খুব খানিক বেড়াইয়া আসে।

বিধাতার একটু যেন ইহাদের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছিল। পরদিন আপিস হইতে আসিয়া প্রকাশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও গো জান, আমরা একটা কাঁদুনে প্রাইজ্‌ পেয়েছি, ৫০০ টাকার।"

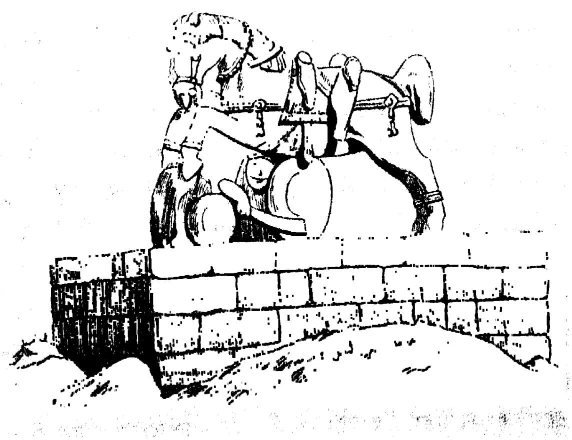
বিনোদিনীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কাঁদুনে প্রাইজ কেন?"

প্রকাশ বলিল, "এই স্কুলের প্রাইজে ছোট ছেলেগুলোকে কান্নার ভয়ে প্রাইজ্‌ দেয় দেখ নি? সেই রকম আর কি? তা সরস্বতী-হারের আর বেনারসীর ফরমাস দেব ত?

বিনোদিনী বিজ্ঞভাবে মুখ নাড়িয়া বলিল, "যা বলেছ, টাকা ক'টা অমনি ক'রে জলে দিই আর কি? ও থাক, ওর একটি টাকাও তুমি ছুঁতে পারবে না।"

প্রকাশ বলিল, "কি হবে একটু শোনাই যাক না?"

বিনোদিনী বলিল, "ডাক্তারের দেনাটা দিয়ে দিই, তার পর শ্বশুরের ভিটেয় একখানা ঘর তুলব। মাঝে মাঝে এই ঘিঞ্জি থেকে বেরুলে ছেলেমেয়েগুলো বাঁচে, আমিও বাঁচি।"



অর্ধোদয়-যোগ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

হিন্দুর যত ধর্মকৃত্য আছে, এত আর কারও নাই। দৈনিক কর্মে, সংসার-চিন্তায়, সুখে ও দুঃখে দিন যায়, কৃত্য এলে সে একটানা স্রোত থমকে থেকে অন্য পথে বয়। এক দিনের জন্য হ'ক, এক বেলার জন্য হ'ক, ইষ্টপথ দেখতে হয়। হিন্দু ভাগ্যবান্। আর, যিনি, যে ব্রাহ্মণ, সে পথ বেঁধে দিয়েছেন, তাঁর চরণে কোটি নমস্কার।

শৈশবে পাঠশালায় প'ড়তাম। মাসে মাসে শুক্ল-পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা ক'রতে হ'ত। পৌষ মাঘ মাসেও প্রাতঃকালে পুকুরে ডুব দিতে হ'ত, শীতে ও বাতাসে থর্থর করি, স্নান ক'রতেই হ'ত। অন্য দিন সকালবেলা কিছু খেয়ে পাঠশালায় ব'সতাম। এ দিন পূজা না হ'লে খাবার জো ছিল না। পীড়ি কিম্বা জল-চৌকিতে তালপাতার তাড়ি, দেশী কালির দোয়াত, দেশী কলম। এই, সরস্বতী। কিন্তু রূপে কিছুই আসে যায় না, ভাবগ্রাহী ভগবান্। পূজার পর কি আনন্দ! মনে হ'ত, যেন নূতন জন্ম হয়েছে। ইংরেজী ইস্কুলে ঢুকলাম, সরস্বতী-পূজাও হারালাম। রবিবারে ইস্কুলের ছুটি, সেটা খেলবার ছুটি ছিল।

ধর্মকৃত্য অনেক। পাঁজিতে গ'ণলে ১৬০।১৭০টি হবে। কেহ এতগুলি ক'রতে পারেন না, করবার কথাও নয়। ধর্ম, আচার। যিনি বৈষ্ণবের আচার পালন করেন, তিনি বৈষ্ণব। যিনি শাক্তের আচার পালন করেন, তিনি শাক্ত। এইরূপ, শৈব, সৌর, গাণপত্য। এক এক ধর্মের এক এক কৃত্য ছিল। পরে পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রচলিত হয়েছে। তাতেই কৃত্য বেড়ে গেছে। বঙ্গদেশে সৌরধর্ম যদি বা ছিল, গাণপত্য প্রায় ছিল না।

যে-সে দিনে যে-সে কৃত্য হয় না। বৈষ্ণব শুক্ল-একাদশী বেছে নিলেন, শাক্ত শুক্ল-অষ্টমী, শৈব কৃষ্ণ-চতুর্দশী, গাণপত্য শুক্ল-চতুর্থী নিলেন। সৌর, তিথি ছেড়ে সৌর দিন বাছলেন। পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রচলিত হ'লেও অজ্ঞদের পক্ষে—

শোআ ওঠা পাশমোড়া।
তার অর্ধেক ভীমে জোড়া॥
ক্ষেপার চৌদ্দ, ক্ষেপীর আট।
এই নিয়ে কাল কাট

অর্থাৎ হরির জন্য শয়ন, উত্থান, পার্শ্বপরিবর্তন, ও ভীম-একাদশী। শিবের জন্য শিব-চতুর্দশী, এবং অম্বিকার জন্য মহাষ্টমী। এই ছয়টি।

ধর্মকৃত্য ব্যতীত নিমিত্ত-কৃত্য আছে। কারও বিবাহ, কারও অন্নপ্রাশন হবে, কেহ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ক'রবে, ইত্যাদি।

যে-কোন কৃত্য হ'ক, প্রথমে সংকল্প, ও তপস্যা, তার পর কৃত্যকর্ম। বিনা সংকল্পে ইষ্ট সিদ্ধ হয় না। তপস্যা ত্রিবিধ, শারীর বাচিক মানস। তপস্যা ক্লেশকর। কিন্তু বিনা ক্লেশে ইষ্ট সিদ্ধ হয় না। কেহ একাদশী-ব্রত ধারণ ক'রবে। কেন ক'রবে, তা সংকল্পের সময় স্পষ্ট উচ্চারণ করা চাই। একাদশীর উপবাস ক্লেশকর হ'লেও সেটা বড় নয়। যে জন্য উপবাস, সে জন্যটা ব্যর্থ হ'লে ক্লেশভোগ ব্যর্থ। বিষ্ণু-উপাসক হরিস্মরণ নিমিত্ত একাদশী কেন বেছেছিলেন, সে কেন-র উত্তর এখন নাই। কোন বৎসর কোন শুক্ল-একাদশীতে জ্যোতিষিক কিছু একটা ঘটেছিল, সে ঘটনা স্মরণীয় হয়েছিল, বিষ্ণু-উপাসক সেদিনের সঙ্গে কৃত্য জুড়ে দিয়েছেন। তার পর মাসে মাসে সে দিন, তার পর মাসে মাসে দুই দিন একাদশী-ব্রত-পালন বিহিত হয়েছে। এ সব কি অল্পকালের কথা? শত শত বৎসর গেছে, একটি একটি বিধি ব্যবস্থিত হয়েছে। কয়েকটার তিথি নক্ষত্র দিন স্মরণ করে ব'লতে পারা যায়, এই জ্যোতিষিক যোগ এই সময়ে হয়েছিল, অতএব সে যোগ ধরে যে কৃত্য, সে কৃত্য সে সময়ের পরে প্রবর্তিত হয়েছে। পূর্বকালে ব্রাহ্মণ পাঁজি গ'ণতেন, স্মৃতি অর্থাৎ ধর্মব্যবস্থা তাঁর হাতে ছিল।

২

গঙ্গার অশেষ মহিমা। গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাজলে স্নান, গঙ্গাজল পান,—এ সকলের মহিমা আমরা বুঝতে পারব না। যাঁরা প্রথমে গঙ্গাতীরে বাস করেছিলেন, তাঁরা বুঝতেন। যাঁদের সে ভাগ্য ছিল না, যাঁরা গঙ্গা হ'তে দূরে বাস ক'রতেন, তাঁরা গঙ্গাকে তীর্থজ্ঞান ক'রতেন। তীর্থ-দর্শনের বহু ফল। গঙ্গা-স্নানেরও বহু ফল। কিন্তু টো-টো করো ঘুরতে ঘুরতে তীর্থদর্শনে ফল নাই। রেলে মোটরে আরাম ক'রতে ক'রতে গেলে তীর্থ অদৃশ্য হন। বিনা সংকল্পে গঙ্গাস্নানেও ফল নাই। সহজে মনঃ স্থির করবার উদ্দেশ্যে কয়েকটা জ্যোতিবিক যোগে গঙ্গাস্নান প্রশস্ত করা হয়েছে। যেমন, জ্যৈষ্ঠ-শুক্ল-দশমীতে দশহরা-স্নান। দশহরা, গঙ্গা। লোকে দশবিধ পাপ করো থাকে, সেদিন গঙ্গাস্নানের পূর্বে সে সব পাপ স্মরণ ক'রতে হয়, তার পর শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন হয়ে ব'লতে হয়, "জাহ্নবি, আমার পাপ হরণ কর।" পাপ-খ্যাপন দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। মনুস্মৃতিতেও আছে। কিন্তু পাপ-খ্যাপন কি সোজা কথা? গঙ্গা মাতৃস্বরূপা; মায়ের কাছে ছেলের গুণাগুণ অজানা থাকে না। মাকে ব'লতেও তেমন সঙ্কোচ হয় না। আর, যে ব'লতে পারে সে এই দুষ্কর্ম করেছে, সে সে পাপ হ'তে মুক্ত হবার পথে এসে:

গঙ্গাস্নানের আর একটি বিশেষ দিন বারুণী। শতভিষা-নক্ষত্রযুক্ত মুখ্য ফাল্গুন কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী। সেদিন শনিবার হ'লে মহাবারুণী। বারুণীতে গঙ্গাস্নান ক'রলে বহু ফল, মহাবারুণীতে ক'রলে বহু বহু ফল। স্মৃতিতে লিখিত আছে, বহু শত সূর্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানজন্য ফলের সমান ফল। মহাবারুণীতে স্নান ক'রলে কোটি সূর্যগ্রহণকালীন স্নান-ফলের সমান ফল। চন্দ্রসূর্যগ্রহণ এক একটা উপলক্ষ, এক একটা নৈসর্গিক নিমিত্ত। ভক্তিশ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে স্নান ক'রলে দেহ-মন শুদ্ধ হয়। যে কর্মের দিন স্থির নাই, সে কর্ম হয় না। স্নানের পর দান, এটি মুখ্য উদ্দেশ্য। যে যোগ যত দুর্লভ, মানুষ সেটি তত আদর করে। বারুণী দুর্লভ নয়, মহাবারুণী সুদুর্লভ। বার-যোগ এর কারণ। শতভিষা নক্ষত্রের অধিপতি বরুণ। বরুণ বৈদিক দেবতা। অগস্ত্য, বেদের এক ঋষি। তাঁর নামে এক তারার নাম অগস্ত্য হয়েছে। অগস্ত্য তারা, বরুণের সন্তান, বারুণি। এই কয়েকটি সূত্র ধরো বারুণী-যোগের ইতবৃত্ত অনুমান অসাধ্য নয়। সপ্তবার গণনা-প্রচলনের পরে, কোনও জ্যোতিষী বারটি পেয়েছিলেন, শনিবার জুড়ে দিয়েছেন। পরে দেখা যাবে, বারুণী-স্নানে বহু পুরাকালের নিদর্শন আছে।

অর্ধোদয়-যোগও সুদুর্লভ। পৌষ মাঘ মাসে রবিবারে অমাবস্যা হবে, শ্রবণা-নক্ষত্র-যুক্ত হবে, ব্যতীপাত 'যোগ' হবে, অর্ধোদয়ের এই লক্ষণ। কিন্তু এই বর্ণনা পরবর্তী কালের। কারণ, 'অর্ধোদয়' এই নামের সার্থকতা নাই। অর্ধোদয়, রবিবিম্বের অর্ধোদয়, অরুণোদয়, ঠিক যে ক্ষণে দিবা আরম্ভ হয়। সেই ক্ষণে অমাবস্যা ও শ্রবণা চাই। পৌষ মাঘ মাসে, অবশ্য চান্দ্র, মুখ্য চান্দ্র পৌষ, গৌণ চান্দ্র মাঘ। দুই এক তিথি। কেহ কেহ সৌর পৌষ কিম্বা সৌর মাঘ বুঝেছেন। সেটা ভুল। কারণ, অমাবস্যা একটা তিথি, চান্দ্রমাসের একটা দিন। চান্দ্রমাসের নাম না ক'রলে কোন্ মাসের তিথি, তা বুঝতে পারা যায় না। আজ মাসের ১৫ই ব'ললে দিনটি নির্দিষ্ট হয় না। তিথি দ্বারা বুঝি সূর্য হ'তে চন্দ্র কত দূরে। নক্ষত্র দ্বারা বুঝি, চন্দ্র নক্ষত্রচক্রের আদি হ'তে কত দূরে। আর, 'যোগ' দ্বারা বুঝি সে আদি হ'তে চন্দ্রের দূরত্ব ও সূর্যের দূরত্বের যোগ-ফল কত। অতএব চান্দ্রমাসের নাম না ক'রলে তিথি ও নক্ষত্র দ্বারা চন্দ্র ও সূর্যের স্থিতি জানতে পারা যায় না। আরও দেখা যাচ্ছে, তিথি ও নক্ষত্র পেলে চন্দ্র ও সূর্যের স্থিতি পাই। 'যোগ'টা একটা অঙ্কমাত্র, এর নৈসর্গিক অর্থ নাই, দিনজ্ঞাপনে একেবারে অনাবশ্যক। জোষীরা (ফল-জ্যোতিষীরা) 'যোগ'টি জুড়ে দিয়েছিলেন। অর্ধোদয়, মুখ্য চান্দ্র পৌষ-অমাবস্যায়। আমরা বঙ্গদেশে মুখ্য চান্দ্রমাস গণি। এই প্রবন্ধে সে রীতি ধরোছি। অমাবস্যা, অতএব চন্দ্র সূর্য এক স্থানে আছে। চন্দ্রের নক্ষত্র শ্রবণা, অতএব সূর্যের নক্ষত্রও শ্রবণা। এই হেতু ব্যতীপাত 'যোগ' হবেই হবে। কিন্তু তিথি ৩০, নক্ষত্র ২৭, 'যোগ' ২৭টি বর্ষে বর্ষে অগ্রপশ্চাৎ হয়ে পড়ে। ভোগও সমান থাকে না। চান্দ্রমাসেরও অগ্র-পশ্চাৎ হয়। কোন বৎসরে ১২টা, কোন বৎসরে ১৩টা চান্দ্রমাস। সবের

উপরে বার অলজ্ঞাল পেতেছে। বৎসরে ১.২৬ বার বাড়ে। কিন্তু বারের উনাধিক হয় না, নিয়ত ৬০ দণ্ড। এই ৬০ দণ্ডের মধ্যে যে-কোন সময়ে অমাবস্যা শ্রবণা ও ব্যতীপাত শেষ হ'তে পারে। এই সব কারণে অর্ধোদয়ের চক্রনির্ণয় কঠিন হয়েছে। ন্যূনপক্ষে ১৭ বৎসর পরে অর্ধোদয় হ'তে পারে। ২৭ বৎসর পরে আরও বেশী সম্ভাবনা।

গত ২০ মাঘ অর্ধোদয় যোগ গেছে। দেখি, কি হয়েছিল। সেদিন রবিবার মুখ্য চান্দ্র পৌষ-অমাবস্যা ৪০ দং, শ্রবণা ৫০ দং। অতএব অর্ধোদয়কালে পৌষ-অমাবস্যা ও শ্রবণা ছিল, যোগও হয়েছিল। কিন্তু অর্ধোদয়ে ব্যতীপাত হয় নি, ৬।৷ দং পরে, প্রায় বেলা ৯টার পরে হয়েছিল। অতএব প্রকৃত অর্ধোদয় হয় নি, ব্যতীপাত 'যোগ' অগ্রাহ্য ক'রতে হয়েছিল। বেলা ৯টা হ'তে সন্ধ্যা পর্যন্ত যোগ ধরাও চলে না। তাতে অর্ধোদয় নামটি ব্যর্থ হয়। যে দুর্লভ কালে যে-কোন জলে স্নান ক'রলে কোটি সূর্যগ্রহণকালীন স্নানজন্য ফলের সমান ফল হয়, সে কাল দীর্ঘ হ'তে পারে না। ফলে বলা হয়েছে, ২০ মাঘ বেলা ৯টার পর যে-কোন সময় স্নান ক'রবে। এটা আর নূতন কি? সকলেই স্নান করে। অর্ধোদয়ের মাহাত্ম্যের উৎপত্তি চিন্তা ক'রলে মনে হয়, ব্যতীপাত 'যোগ'টি উৎপত্তির বহুকাল পরে যোজিত। বারুণী ও মহাবারুণী স্নানে 'যোগ' দেখা হয় না। এ বৎসর ১৮ চৈত্র ১ এপ্রেল সোমবার মুখ্য ফাল্গুন কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী ৪১ দং, শতভিষা নক্ষত্র ২৪ দং। অতএব বারুণী-যোগ। কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী ও শতভিষা নক্ষত্র হ'লে শুভ নামক 'যোগ' হয়। এদিন শুভযোগ ১৯ দং থাকবে। সোমবার না হয়ে শনিবার হ'লে মহাবারুণী যোগ হ'ত।

অর্ধোদয়-যোগে লোকসমাগমহেতু কলিকাতা মুনসিপালটির খরচ হয়। খরচ লিখতে হ'লে যোগের সাল ও তারিখও লিখতে হয়। মুনসিপালটির "গেজেটে" পূর্ব তিনটি যোগের সাল ও তারিখ দেওয়া হয়েছিল।

(১) সন ১২৭০। ২৬ মাঘ, ইং ১৮৬৪। ৭ ফেব

(২) সন ১২৯৭। ২০ মাঘ, ইং ১৮৯১। ৮ ফেব

(৩) সন ১৩১৪। ১৯ মাঘ, ইং ১৯০৮। ২ ফেব

আর, এবার

(৪) সন ১৩৪১। ২০ মাঘ, ইং ১৯৩৫। ৩ ফেব

দেখা যাচ্ছে, প্রথমটির ২৭ বৎসর পরে দ্বিতীয়টি, দ্বিতীয়টির ১৭ বৎসর পরে তৃতীয়টি, এবং তৃতীয়টির ২৭ বৎসর পরে চতুর্থ-টি হয়েছে। এই ক্রম ধরে দেখছি, ১৭ বৎসর পরে, ১৩৫৬ সালে যোগটি হ'তে হ'তে হবে না। কলিকাতায় সূর্যোদয়ের সময় অমাবস্যা থাকবে না। ২৭ বৎসর পরে সন ১৩৬৮। ২১ মাঘ, ইং ১৯৬২। ৪ ফেব সূর্যোদয়কালে পঞ্চলক্ষণ যোগটি পাওয়া যাবে।

৩

গত অর্ধোদয়-যোগে কলিকাতায় নাকি চারি-পাঁচ লক্ষ নরনারী এসেছিল। শিয়ালদহ রেল-ষ্টেশন কলিকাতায়। কলিকাতার প্রতি আরও টান ছিল। সেখানে এলে কালীঘাট-দর্শনও হয়। রাজধানী-দর্শনের আকাঙ্ক্ষাও কম নয়। হাওড়ার দিকে তিন-চারি লক্ষ নরনারী এসে থাকবে। গঙ্গা এই খানেই নয়, হাওড়ার উত্তরে হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গা। সর্বত্র লোকে যোগটি মেনে গঙ্গাস্নান করেছিল কি না, জানি না। আন্ধ্রেরা গোদাবরীকে গঙ্গা বলেন।

স্মার্তাচার্য রঘুনন্দন ভট্টাচার্য এক পাশ্চাত্য "নির্ণয়ামৃত" হ'তে অর্ধোদয়কাল বুঝিয়েছেন। তিনি বরাহকৃত "কৃত্যচিন্তামণি" ও স্কন্দপুরাণ হ'তেও বচন তুলেছেন। আমি "নির্ণয়ামৃত" দেখি নি। "কৃত্যচিন্তামণি" পাওয়া যায় কি না, জানি না। স্কন্দপুরাণ বৃহৎ গ্রন্থ, প'ড়তে পারি নি। বুঝছি, যোগকালে স্নান ও দান কর্তব্য। গঙ্গায় স্নান চাই, এমনও নয়। যে-কোন নদী কিম্বা পুষ্করিণীতে স্নান ক'রলেও চলে। দিনটা অশুভ। ব্যতীপাত যোগ নামের অর্থ দারুণ দুর্নিমিত্ত। অমাবস্যা তিথিটাও অশুভ।

যোগকালটা অশুভই বটে, বৎসরের অন্তিমকাল। তখন পৌষ শ্রবণায় রবির উত্তরায়ণ-প্রবৃত্তি হ'ত। অর্ধোদয়ের পরে নববর্ষ আরম্ভ হ'ত। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০১ অব্দের, শকপূর্ব ৪৭৯ অব্দের কথা। কেবল নববর্ষপ্রবেশ নয়, সে বৎসর হ'তে এক নূতন অব্দ-গণনা প্রচলিত হয়েছিল। অশ্বিনীর আদি বিন্দু খুজতে যেয়ে খ্রি-পূ ৪০১ অব্দটি পেয়েছি * (খুঁজ অতিগ্রাম্যভাষা)

* যাঁরা ইংরেজী জানেন, তাঁরা The First Point of Asvini নামক পুস্তিকা প'ড়তে পারেন। পুস্তিকা "প্রবাসী প্রেসে" পাওয়া যাবে।

পৌষ শ্রবণা হ'তে বর্ষগণনা তৎকালের পক্ষে এক নূতন কাণ্ড। কিন্তু শ্রবণা অস্বীকারের উপায় ছিল না। সেটা প্রত্যক্ষ। রামায়ণ ও মহাভারত বিশ্বামিত্রকে এনেছেন। রামায়ণে (আদি কাণ্ডে) আছে, তপোধন বিশ্বামিত্র গুরুশাপে চণ্ডালত্ব-প্রাপ্ত নরপতি ত্রিশঙ্কুকে স্বশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন। ইন্দ্র স্বর্গে স্থান দিলেন না। বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে আকাশের দক্ষিণ দিকে নূতন "নক্ষত্র-বংশ" সৃষ্টি ক'রলেন।* নূতন সৃষ্টি হেতু তিনি অপর প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রহ্মা হ'লেন। পূর্বকালে ব্রহ্মা সপ্তবিংশতি নক্ষত্র সৃষ্টি করে্যে যে নক্ষত্রকে আদি করে্যেছিলেন, সেটা রহিত ক'রলেন। শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, এই ক্রম। ব্রহ্মা ধনিষ্ঠাকে প্রথম করে্যেছিলেন, বিশ্বামিত্র ধনিষ্ঠার পূর্ববর্তী শ্রবণাকে ক'রলেন। একথা মহাভারতে (আদি পর্বে ৭১ র্‍য অধ্যায়ে, অশ্বমেধ-পর্বে ৪৪ শ্য অধ্যায়ে) আছে। সেখানে ধনিষ্ঠার নাম নাই বটে, কিন্তু এই নক্ষত্র লক্ষ্য ছিল।

বৈদিক যজ্ঞকর্ম যে-সেদিন করা হ'ত না। সে কর্মের নিমিত্ত অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দুই বিষুব, দুই অয়ন দিন গ'ণতে হ'ত। একদা ধনিষ্ঠা নক্ষত্র-ভাগের আদিতে উত্তরায়ণ হ'ত। তখন সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে মৃদঙ্গাকার ধনিষ্ঠা-তারা-চতুষ্টয়ও দেখা যেত। লোকে অক্লেশে উত্তরায়ণ-প্রবৃত্তি কাল বুঝতে পারত।† যাঁরা ধনিষ্ঠায় উত্তরায়ণ দেখতেন, তাঁরা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, তাঁদের তিথি নক্ষত্রের পরিপুষ্ট জ্ঞান ছিল। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বৈদিক কৃত্য ছিল। যাজ্ঞিকেরা যেদিন পৌষ-অমাবস্যার অন্ত ও ধনিষ্ঠার আরম্ভ সেদিন স্থির ক'রলেন। পরদিন মাঘ-শুক্ল-প্রতিপদে নববর্ষ আরম্ভ। এ-সব কথা ষড়ঙ্গ-বেদের জ্যোতিষ-অঙ্গে ও পুরাণে বিস্তারিত আছে। পিতামহ ব্রহ্মা যাবতীয় সৃষ্টির কর্তা। ধনিষ্ঠাদি-গণনাও তাঁর কৃত। কবে এই ঘটনা হয়েছিল? অশ্বিনীর আদি নির্ণয় ক'রতে যেয়ে অব্দটি পেয়েছি। সেটি খ্রি-পূ ১৩৭২ অব্দ। তারিখ ২ জানুআরি।

কিন্তু উত্তরায়ণ-বিন্দু স্থির থাকে না, পিছাতে থাকে। ধনিষ্ঠার আদি হ'তে শ্রবণার আদিতে এসে প'ড়ল। এ সময়ে নিশ্চয় দু-দল হয়েছিল। এক দল বলে্যেছিল, "যেমন আছে তেমন থাক, ধনিষ্ঠাই নক্ষত্রের প্রথম ধরা হ'ক। এই বিধি ব্রহ্মার কৃত। এর জায়গায় শ্রবণাকে বসালে ধর্মকর্ম সব পণ্ড হবে।" অন্য দল বলে্যেছিলে, "তোমরা রাখতে চাও, রাখ। আমরা যেটা প্রত্যক্ষ ক'রছি, সেটা ধ'রব। উত্তরায়ণ-কালে সূর্যোদয়ের পূর্বে শ্রবণা দেখতে পাচ্ছি, কেমনে বলি ধনিষ্ঠা।" বাস্তবিক উত্তরায়ণকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে ত্রিপদাকার ত্রিতারকা শ্রবণা দেখা যেত। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তেজস্বী ও ক্রোধনস্বভাব ছিলেন, তাঁকে দিয়ে নূতন সৃষ্টি করালেন। অবশ্য নামটি কাল্পনিক। গাধি-পুত্র বিশ্বামিত্র বহুকাল পূর্বে ছিলেন। এত দিন এই বিধি-প্রচলনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই নি। অর্ধোদয়-যোগের উৎপত্তি চিন্তা ক'রতে যেয়ে দেখছি, অদ্যাপি আমরা সে নূতন সৃষ্টি স্মরণ ক'রছি। খ্রি-পূ ৪০১ অব্দে ৫ জানুআরি অর্ধোদয়-'যোগ' প্রথম হয়েছিল। সূর্যের অর্ধোদয় কালে অর্থাৎ দিবারম্ভে পৌষ-অমাবস্যা ও শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয়েছিল।

তৎকালে রব্যাদি সপ্তবার, আর বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশ 'যোগ' গণনা ছিল না। বহুকাল পরে যখন এই দুই গণনা পাঁজির অঙ্গীভূত হয়েছিল, তখন কোন জ্যোতিষী প্রথম অর্ধোদয়ের বার ও 'যোগ' গণে্যেছিলেন। দেখেছিলেন সেদিন রবিবার, ব্যতীপাত 'যোগ'। গণে্যেও দেখছি, ঠিক। বারের ঐক্যে অব্দ-নির্ণয় সমর্থিত হ'চ্ছে।

শ্রবণাদি-গণনা কতকাল চলে্যেছিল, ভারতের কোন্ প্রদেশে চলে্যেছিল, কিছুই জানি না। কিন্তু যে-টা একবার চলে, সে-টার চিহ্ন থেকে যায়। আমাদের পাঁজিতে এমন স্মৃতি অসংখ্য আছে। বহু বহু পুরাকালের স্মৃতি আছে। পৌষ অমাবস্যায় অর্ধোদয়, মাঘ কৃষ্ণ-চতুর্দশীতে শিবরাত্রি, ফাল্গুন কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে বারুণী। বারুণী দেখি। খ্রি-পূ ১৩৭২ অব্দে ধনিষ্ঠার আদ্যে উত্তরায়ণ হ'ত। বোধ হয় অমাবস্যায়

---

* ত্রিশঙ্কু দক্ষিণ আকাশে এক নক্ষত্র হয়েছিলেন। "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" দেখুন।

† এর অনুরূপ বাঁকুড়াতে পেয়েছি। কৃষক মাত্রেই বর্ষা-আরম্ভ প্রতীক্ষা করে, বলে 'মিগের বাত' হ'লেই বর্ষা আরম্ভ হবে। 'মিগের বাত' মৃগশিরা নক্ষত্রের বায়ু, আবহের প্রকৃতি। রবি মৃগশিরায় এলে প্রথম বর্ষা হয়। কিন্তু রবির উদয়ে সকল তারাই অদৃশ্য হয়। রোহিণীর পর মৃগশিরা। সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে পূর্বাকাশে রোহিণীর উদয় হ'লে বুঝতে পারা যায়, প্রথম বর্ষা আসন্ন, দিন তের চৌদ্দ পরে 'মিগের বাত' প'ড়বে। রোহিণী শকটাকার, সহজে চিনতে পারা যায়। বাঁকুড়ায় ও মানভূমে অশিক্ষিত গ্রাম্যজনও রোহিণীর উদয় লক্ষ্য ক'রতে থাকে। কথাটা স্মর্তব্য।

অরুণোদয় বেলায় স্নান বিহিত ছিল। সেটি প্রথম অর্ধোদয়ে স্নান। তৎপূর্বে, প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে, শতভিষা নক্ষত্রের আদ্যে হ'ত। ইহা গণিত দ্বারা জানছি। স্মৃতি অর্থাৎ ধর্ম-ব্যবস্থা হ'তে প্রমাণ পাচ্ছি, বৈদিক ঋষিরা শতভিষায় উত্তরায়ণ দেখেছিলেন। না দেখলে স্মৃতি থাকত না। তাঁরা এটা গণিত দ্বারা পেয়েছিলেন, শতভিষা-তারাপুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হ'ত না। বোধ হয়, অগস্ত্য-তারার উদয় দেখা হ'ত। অগস্ত্যোদয় প্রসিদ্ধ ছিল। তখন শতভিষার বিপরীত দিকে মঘা নক্ষত্রে দক্ষিণায়ণ হ'ত। বৈদিক গ্রন্থে এর অনেক প্রমাণ আছে। এরও পূর্বে, প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে, ফল্গুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়ণ, এবং ভাদ্রপদা নক্ষত্রে উত্তরায়ণ হ'ত। এই দক্ষিণায়ণের প্রমাণ বৈদিক গ্রন্থে আছে। অদ্যাপি আমরা দোলযাত্রায় ও ঝুলনযাত্রায় সে কাল স্মরণ ক'রছি। যাতে চন্দ্র সূর্য সাক্ষী তাতে অবিশ্বাস ক'রতে পারি না। স্মৃতিশাস্ত্র, স্মৃতিরক্ষার শাস্ত্র। ভারতের অতীত, স্মৃতিমুখে কথা কইছে, আকাশের তারা অনিমেষ চেয়ে আছে।

প্রাচীন স্মৃতি রক্ষা দ্বারা হিন্দুজাতি বেঁচে আছে। সে স্মৃতি লোপ ক'রলে আশ্রয়হীন হবে, নূতন জাতি হয়ে প'ড়বে। স্মৃতির উৎপত্তি না জেনে উদ্দেশ্য না বুঝে কেহ কেহ মনে করেন, স্মৃতির ব্যবস্থা কুসংস্কার। তাঁরা জিজ্ঞাসেন, স্নান ক'রলে কি হবে? আমিও জিজ্ঞাসি, জন্মতিথি পালন ক'রলে কি হবে? এই যে, সে বৎসর জয়ন্তীর ধুম পড়েছিল, জয়ন্তী-পত্রও দেওয়া হয়েছিল; কার কি ফল হয়েছিল? এই যে অমুকের পঞ্চবিংশ বার্ষিকী, অমুকের শতবার্ষিকী হ'চ্ছে, কার কি ফল হ'চ্ছে? মানুষের পূজা অহরহ হ'চ্ছে। পটের উপরে ফুলের মালা দেওয়া হ'চ্ছে। এসব হ'চ্ছে, মিটিং করে, নাম স্মৃতি-সভা, স্মৃতি-তর্পণ। প্রাচীনেরা মিটিং ক'রতেন না, হাকা-হাকি ডাকা-ডাকি ক'রতেন না, যথা তিথিতে প্রাতঃস্নান দ্বারা দেহ নির্মল ক'রতেন, দান দ্বারা পুণ্য ক'রতেন, তপস্যা দ্বারা মনঃসংযম ক'রতেন, ইষ্টের পূজা দ্বারা আত্মার প্রসন্নতা ক'রতেন। সে ইষ্ট, মানুষের অনুগ্রহ নয়, কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন নয়।

রাজা রামমোহন রায়

শ্রীদীননাথ সান্যাল

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ২৭শে তারিখে রাজা রামমোহন রায় বিলাতে দেহত্যাগ করেন এবং সেই দেশেই ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার সমাধি হয়। এই উপলক্ষে ইহা ভারতের এবং বিশেষ করিয়া বাংলার এক স্মরণীয় দিন।

কিছুকাল পূর্ব্বে ভারত ব্যাপিয়া তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তির শত-বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং সেই উপলক্ষে তাঁহার জীবন-চরিত সম্বন্ধে অনেক আলোচনাও হইয়াছে। নিরপেক্ষ ও ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহা হইতে এই সত্যটুকু নিষ্কাশিত হয় যে, রামমোহনের জীবন-চরিত যাহা প্রচলিত, তাহা ভ্রম-প্রমাদ-বর্জ্জিতও নয় এবং সম্পূর্ণও নয়। পক্ষান্তরে, যিনি যুগ-মানব বলিয়া গণ্য, তাঁহার জীবনী অতি নিরপেক্ষভাবে ও সত্যানুসন্ধিৎসু মনে, কেবলমাত্র সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, দুষ্প্রাপ্য ঘটনাগুলির সন্ধান সযত্নে সংগ্রহ করিয়া, লিখিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

ইহা একটি চিরন্তন সত্য যে, অ-লোকসামান্য ব্যক্তিগণকে সাধারণ মানব হইতে পৃথক করা যত সহজ, তাঁহাদিগের মনস্তত্ত্বে প্রবেশ করা তত সহজ নয়, বাস্তবিকই যুগ-মানবদিগের মনস্তত্ত্ব দুরবগাহ—বিশেষতঃ সমসাময়িক কালে। উপস্থিত প্রসঙ্গে জীবদ্দশায় যে-কলিকাতায় বন্ধুদের পরামর্শে রামমোহনকে প্রাণভয়ে সাবধান থাকিতে হইত, শত বর্ষ পরে সেই কলিকাতায় তাঁহার শত-বার্ষিক

উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। যুগ-মানব বা অতি-মানবদিগের মনস্তত্ত্ব বাস্তবিকই দুরবগাহ—সকল দেশে এবং সকল কালে। বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশেও ইহার উদাহরণ একান্ত দুর্লভ নয়।

যাহা হউক, শত বৎসর পরে আমরা এই যুগ-মানবের মনস্তত্ত্ব যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়,—রামমোহনের স্বভাব-গত দুইটি মনোবৃত্তি তাঁহাকে জীবন-পথে চালিত করিয়াছিল—অসাধারণ ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা অর্থাৎ প্রচলিত বিবিধ ধর্ম্মগুলির তত্ত্বানুসন্ধান করিবার ইচ্ছা এবং প্রবল কর্ম্মপ্রচেষ্টা। ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসাই তাঁহাকে সংস্কৃত-শিক্ষায় প্রণোদিত করিয়াছিল,—যাহার ফলে তিনি তন্ত্র-পুরাণাদি শাস্ত্র-সকল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম-প্রতিপাদক উপনিষদাদি গভীর ভাবে অনুশীলন করিতে এবং তাৎকালিক পণ্ডিতগণের সহিত সমকক্ষভাবে তর্কযুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার মনোবৃত্তিই তাঁহাকে দুরূহ আরবীয় ভাষা আয়ত্ত করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল;—যাহার ফলে, ধর্ম্মান্দোলনকালে তিনি মুসলমান মৌলবীদিগের সহিত সতেজে তর্ক করিয়া তাঁহাদের কাছে "জবরদস্ত মৌলবী" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার প্রবল তাড়নাতেই তিনি ইংরেজী বাইবেলে পরিতুষ্ট থাকিতে না-পারিয়া মূল বাইবেল পড়িবার উদ্দেশ্যে হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেন এবং সেই বলে বলীয়ান হইয়া তর্কযুদ্ধে খ্রীষ্টান পাদ্রীদিগকে পরাস্ত করিতে পারিতেন। কথিত আছে, য়্যাডাম নামক এক ইংরেজ পাদরী রামমোহনকে খ্রীষ্টধর্ম্মে ভজাইতে আসিয়া নিজেই রামমোহনের কাছে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং কলিকাতায় ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চ স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার তাৎকালিক সাহেবেরা ঐ য়্যাডাম সাহেবকে "Second Fallen Adam" বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। ফলে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে রামমোহন বিবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং নিজ পক্ষে এমন ধীরতার সহিত যুক্তি প্রয়োগ করিতেন, যাহাতে অপর পক্ষ চমকিত না-হইয়া থাকিতে পারিত না। এ-সকলই তাঁহার অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা-মনোবৃত্তির গুণে।

তাহার পর, তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা। সেই যুগ-সন্ধির কালে কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি শিক্ষা, এমন কি, তর্ক করিবার ও গ্রন্থাদি লিখিবার জন্য বাংলা ভাষায় গদ্যে কয়েকখানি উপনিষদের অনুবাদ, এমন কি ব্যাকরণ, ভূগোল ইত্যাদিও তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টার অন্তর্গত। ইহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্য সবিস্তারে বলা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এ-স্থলে আমি কেবল তাঁহার তিনটি কার্য্যের প্রেরণা সম্বন্ধে বলিতে চাই:—

(১) মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, (যাহা রামমোহনের করামলক-স্বরূপ ছিল), দেখিলেই সুস্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, রামমোহনের ব্রহ্মোপাসনার প্রেরণা ঐ তন্ত্র হইতে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের প্রথম তিনটি উল্লাস ব্রহ্মোপাসনা-বিষয়ক এবং সে উপাসনার পদ্ধতি সনাতন শাস্ত্রানুযায়ী নয়। মহানির্ব্বাণের ব্রহ্মোপাসনায়—

> "নায়াসো নোপবাসশ্চ কায়ক্লেশো ন বিদ্যতে।
> নৈবাচারাদি নিয়মো নোপচারাশ্চ ভূরিশঃ॥"
> "ন দিকাল-বিচারোঽস্তি ন মুদ্রা-ন্যাস-সংহতিঃ।
> যৎ সাধনে কুলেশানি তং বিনা কোঽন্যমাশ্রয়েৎ॥"
> (২য় উল্লাস—৫৩ ও ৫৪ শ্লোক)
>
> "অস্নাতো বা কৃতস্নানো ভুক্তোবাপি বুভুক্ষিতঃ।
> পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্ম্মল-মানসঃ।"
> (৩য় উল্লাস—৭৮ শ্লোক)
>
> "পূজনে পরমেশস্য নাবাহন-বিসর্জ্জনে।
> সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু সাধয়েদ্ ব্রহ্মসাধনম্॥"
> (ঐ—৭৭)
>
> "ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারোঽত্র ত্যাজ্যং গ্রাহ্যং ন বিদ্যতে।
> ন কালশুদ্ধি নিয়মো ন বা স্থান-নিরূপণম্॥"
> "অভুক্তো বাপিভুক্তো বা স্নাতো বাস্নতি এব বা।
> সাধয়েৎ পরমং মন্ত্রং স্বেচ্ছাচারেণ সাধকঃ।"
> (ঐ—১১৬, ১১৭)

রামমোহন উপনিষদে যে নিরাকার ব্রহ্মের সন্ধান পাইয়াছিলেন, মহানির্ব্বাণোক্ত ব্রহ্মোপাসনার ব্রহ্মও তাহাই;—

> "যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
> যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্ ব্রহ্মলক্ষণৈঃ॥"
> (ঐ—৯)

মহানির্ব্বাণোপদিষ্ট ব্রহ্মোপাসনার বিধি ও পদ্ধতি এবং রামমোহনের তান্ত্রিক মনোভাব একত্রে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই ধারণা হয় যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মসভার বীজ ঐ তন্ত্র হইতে সংগৃহীত।

(২) সতীদাহ-প্রথা-নিবারণ-কল্পে রামমোহনের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার বীজও ঐ তন্ত্র হইতে সংগৃহীত, একথা অকুণ্ঠিত-ভাবে বলা যাইতে পারে। কারণ, দশম উল্লাসে উল্লিখিত ;—

"ভর্ত্রা সহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্।
তব স্বরূপা রমণী জগত্যাচ্ছন্ন বিগ্রহা।"
মোহাদ্ ভর্ত্তুশ্চিতারোহাৎ ভবেন্নরক-গামিনী॥"
(১০ম উল্লাস—৭৯, ৮০)

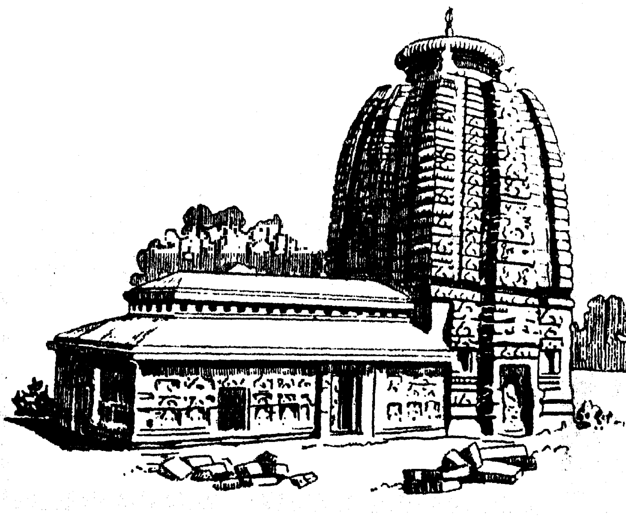
এ-বিষয়ে মহানির্ব্বাণের নির্দ্দেশটি যেমন সুস্পষ্ট, অভিশাপটি তেমনই তীব্র ও রোষ-কষায়িত। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, ঐ তন্ত্ররচনার পূর্ব্ব হইতেই সতীদাহ-প্রথার অমানুষিক নিষ্ঠুরতা লোক-সমাজের হৃদয়-তন্ত্রীকে আলোড়িত করিতেছিল এবং মহানির্ব্বাণে সেই প্রতিক্রিয়াই শাস্ত্রোচিত শাসন-বাক্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। আরও বোধ হয়, তান্ত্রিকতা-প্লাবিত তাৎকালিক বাংলা দেশে মহানির্ব্বাণের আদেশ একেবারে নিষ্ফল যায় নাই ;—সতী-দাহ সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। পরে, যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা রামমোহনের চেষ্টায় রাজ-আজ্ঞা দ্বারা একেবার বন্ধ হইয়া যায়। এ-কার্য্যে রামমোহনের কৃতিত্ব যথেষ্ট থাকিলেও প্রেরণা মহানির্ব্বাণ হইতে, এ-কথা না-বলিয়া থাকা যায় না। তবু কিন্তু এ-কথা, মহানির্ব্বাণের অনুবাদ ও টীপ্পনীকার জগন্মোহন তর্কালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ তীর্থনাথ ভিন্ন আর কেহ বলিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

(৩) এদেশে রীতিমত প্রথায় স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন সম্বন্ধেও রামমোহনের প্রেরণা ঐ তন্ত্র হইতে। উহার অষ্টম উল্লাসের ৪৭ সংখ্যক শ্লোকটি এখন সর্ব্বজনবিদিত হইয়া পড়িয়াছে ;—

"কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥

আমি রামমোহনের মনস্তত্ত্বের সন্ধানে তাঁহার কয়েকটি প্রধান কার্য্যের প্রেরণা সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। প্রেরণায় মানুষকে খর্ব্ব করে না; বরং প্রেরণা গ্রহণ এবং তদনুসারে অক্লান্ত-ভাবে কার্য্যসাধনই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। সে পক্ষে, তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ, অদম্য চেষ্টা, ও অসীম সহিষ্ণুতা তাঁহার অ-লোকসামান্য ও সমুন্নত ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় প্রদান করে।*

* গত ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে কৃষ্ণনগরে রামমোহন স্মৃতিসভার অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।



পরমহংস রামকৃষ্ণ

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

[১৯১০ সালের অক্টোবর মাসে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। উহার সমগ্র বাংলা অনুবাদ করিলে তাহা ছাপিতে প্রবাসীর ন্যূনকল্পে দশ পৃষ্ঠা লাগিবে। এখন সমগ্র অনুবাদ করিয়া ছাপিতে পারা গেল না। পরমহংসদেবের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে শাস্ত্রী-মহাশয়ের প্রবন্ধের কেবল কয়েকটি অংশের তাৎপর্য্য নীচে দেওয়া হইল।]

"পরমহংস রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনা সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার অনেক কথা আমার মনে আছে।...দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, এক হাতে কিছু ধুলা ও অন্য হাতে কয়েকটি মুদ্রা লইয়া তিনি নদীর ধারে বসিয়া ধ্যানস্থ হইতেন, এবং উভয়েরই সমান অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার পর তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন, 'টাকা ধুলা, ধুলা টাকা, টাকা ধুলা, ধুলা টাকা,' এবং এই সত্যের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইবার পর ধুলা ও টাকা দুই-ই নদীতে ফেলিয়া দিতেন।"

"এক জন সাধু তাঁহাকে দীনতা সাধন করিতে, আপনাকে হীনতম মেথরের সমান মনে করিতে, বলেন। রামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ মেথরের কাজ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি গোপনে এক প্রতিবেশীর পায়খানার নীচের দরজা দিয়া ঢুকিয়া ময়লার গামলা হইতে ময়লা ফেলিয়া দিয়া তাহা নদীতে ধুইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। কিছু দিন তিনি এইরূপ করিবার পর ব্যাপারটি জানা পড়িল, এবং তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি ও অনুযোগ হইল। তখন তাঁহাকে মেথরের কাজ ছাড়িয়া দিতে হইল।"

"বস্তুতঃ তাঁহার সহিত মিলামিশায় আমার মনে এই ধারণা জন্মে, যে, আমি কচিৎ এমন আর একটি মানুষকে দেখিয়াছি আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য যাঁহার আকাঙ্ক্ষা এত অধিক এবং যিনি ধর্ম্ম সাধনের জন্য এত দুঃখ ভোগ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, যে, তিনি এখন আর সাধক নহেন কিন্তু সিদ্ধ হইয়াছেন। যে সত্তাটির তিনি আত্মিক সাক্ষাৎ-দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং যাহা হইতে তিনি স্বীয় আত্মার মহৎ প্রেরণা লাভ করিতেন, তাহা পরমাত্মার মাতৃত্ব। তিনি পরমদেবতাকে মা বলিয়া উল্লেখ করিতে ভালবাসিতেন, ঐশী মাতৃত্বের চিন্তায় তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ভাবাবেশ হইত, এবং বিশ্বজননীর বাৎসল্যের গান গাহিতে গাহিতে উত্তেজনার আধিক্যে তিনি সংজ্ঞাহারা হইতেন। তাঁহার এই বিশ্বমাতৃত্বের ধারণা কোন বিগ্রহ বা মূর্ত্তিকে অতিক্রম করিয়া অনন্তের ধারণায় পরিণত হইত।"

"ভবানীপুরের এক জন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচারক আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি একবার রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকারে আমার সঙ্গী ছিলেন। এই বন্ধুকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্য আমি বলিলাম, 'আজ এক জন খ্রীষ্টীয় প্রচারককে আপনার নিকট এনেছি। তিনি আমার কাছ থেকে আপনার কথা শুনে আপনাকে দেখতে খুব ব্যগ্র ছিলেন।' রামকৃষ্ণ তখন মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া বলিলেন, 'আমি যীশুর পায়ে বার বার প্রণাম করছি।' তাহার পর এইরূপ কথোপকথন হইল :—

আমার খ্রীষ্টীয় বন্ধু—আপনি যীশুর পায়ে প্রণত হচ্ছেন এ কেমন কথা? আপনি তাঁকে কি মনে করেন?

রামকৃষ্ণ—কেন আমি তাঁকে ঈশ্বরের এক জন অবতার মনে করি।

আমার বন্ধু—ঈশ্বরের অবতার! আপনি কি দয়া ক'রে বলবেন আপনার কথার অর্থ কি?

রামকৃষ্ণ—আমাদের রাম বা কৃষ্ণের মত এক জন অবতার। আপনি কি জানেন না, যে, ভাগবতে একটি উক্তি আছে, যে, বিষ্ণু বা পরব্রহ্মের অবতার অসংখ্য?

আমার বন্ধু—আপনি দয়া ক'রে আরও ব্যাখ্যা করুন; আপনার কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি না।

রামকৃষ্ণ—সমুদ্রের কথা ধর না। মহাসাগর বিশাল ও প্রায় অপার জলরাশি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কারণে,

মহাসমুদ্রের বিশেষ বিশেষ অংশে, জল জমে বরফ হয়ে যায়। যখন তা জমে বরফ হয়, তখন তা সহজে নাড়া-চাড়া করা এবং বিশেষ বিশেষ রূপে ব্যবহার করা যায়। অবতার কতকটা তার মত। যেমন মহাসমুদ্র, তেমনি আছেন জড়ের ও চেতনের মধ্যে অনন্ত শক্তি; কিন্তু কোন কোন উদ্দেশ্যে কোন কোন স্থানে ঐ অনন্ত শক্তির এক একটি অংশ যেন ইতিহাসে মূর্ত্তিমান হন। তাঁকে তোমরা বল মহাপুরুষ, মহামানব। কিন্তু তিনি ঠিক্ বলিতে গেলে সর্ব্বব্যাপী ঐশীশক্তির স্থানীয় প্রকাশ, অর্থাৎ কিনা ভগবানের এক অবতার। মহাপুরুষদের মহত্ত্ব সারতঃ ঐশীশক্তির প্রকাশ।

আমার বন্ধু—আপনার মত বুঝলাম, যদিও আমরা তাতে সম্পূর্ণ সায় দি না। (তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া আমার খ্রীষ্টীয় বন্ধু বলিলেন) আমার ব্রাহ্ম বন্ধুরা এ-বিষয়ে কি বলেন জানতে চাই।

রামকৃষ্ণ—(ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া) ও আহাম্মকদের কথা বলবেন না, এ-সব জিনিষ দেখবার চোখ তাদের নাই।

আমি—(রামকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া) আপনাকে কে বলেছে, মশায়, যে, মানবসমাজের বড় বড় উপদেষ্টাদের মহত্ত্ব ঐশীশক্তির প্রকাশ ব'লে আমরা বিশ্বাস করি না, এবং সেই অর্থে তাঁহাদিগকে ঐশ কোন ভাবের ("idea"র) অবতার মনে করি না?*

রামকৃষ্ণ—তোমরা কি সত্যি তাই ব'লে বিশ্বাস কর? আমি তা জানতাম না।"

"একবার এক জন দর্শক তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ। রামকৃষ্ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী লিঙ্গ অনুসারে জ্ঞান ও ভক্তি শব্দ দুটির মধ্যে জ্ঞানকে পুরুষ ও ভক্তিকে নারী বলিয়া উপদেশ দিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না, যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে জ্ঞান ক্লীবলিঙ্গ। যাহা হউক, এক্ষেত্রে তাঁহার জ্ঞানানুযায়ী লিঙ্গভেদের চমৎকার প্রয়োগ তিনি করিলেন। একটিকে পুরুষ ও অন্যটিকে নারী বলিয়া বর্ণনা করিয়া এবং নারীদিগের অন্তঃপুরে থাকিবার ভারতীয় প্রথার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন:—'জ্ঞান পুরুষ ব'লে মা'র বাড়ির বাইরের মহলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়; কিন্তু ভক্তি নারী ব'লে একেবারে সোজা মা'র অন্তঃপুরে গিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়।"

"আর একদিন এক জন দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমরা সংসারে নিত্য নানা উদ্বেগ ও কর্ত্তব্য নিয়ে থাকি; এ অবস্থায় পারমার্থিক বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে হ'লে কি করতে হবে?' রামকৃষ্ণ বলিলেন, 'ঢেঁকিতে মেয়েদের চিঁড়া তৈরি করতে দেখেছ? ঢেঁকির মুষল যে গর্ত্তটিতে ক্রমাগত পড়ে ও তার থেকে ওঠে, তার কাছে একটি স্ত্রীলোক ব'সে থেকে তাতে ধান দেয় আর কুটা ধানগুলি সরিয়ে নেয়। তাকে গর্ত্তটি থেকে কুটা ধান খুব সাবধানে সরাতে হয়, নইলে তার আঙুলগুলি থেঁতলে যেতে পারে। এই স্ত্রীলোকটির কথা ভাব। আর এও বিবেচনা কর, যে, সে তখন অন্য কাজেও ব্যাপৃত থাকে। তার কোলে একটি শিশু আছে, তাকে সে মাই দিচ্ছে, বাঁ হাত দিয়ে কুটা ধান রোদে দিবার জন্যে ছড়াচ্ছে, আবার এক জন প্রতিবেশীকে কিছুক্ষণ আগে যে চিঁড়া দিয়েছিল তার সঙ্গে তার দামের কথাও বলছে। ঐ স্ত্রীলোকটির মন সকলের আগে সকলের চেয়ে বেশী কিসে আছে মনে কর? নিশ্চয়ই সেই ঢেঁকির গর্ত্তে ঢুকান হাতটিতে, যাতে ক'রে মুষলে হাতটা থেঁতলে না যায়। সেই রকম তোমরা এই সংসারে নানা ব্যাপারে লিপ্ত থেকো, নানা কর্ত্তব্যে ব্যস্ত থেকো, কিন্তু সকলের আগে সকলের চেয়ে মন দিও তোমাদের পারমার্থিক কল্যাণের বিষয়ে, যাতে তা নষ্ট না হয়।'"

"আর একবার কথা উঠে, মালা জপ করা বা ঠাকুর দেবতার নাম বার বার উচ্চারণ করার বিষয়ে। সিদ্ধ সাধুপুরুষ বলিলেন, 'একটি নাম বার-বার আওড়ান কিছুই নয় যদি তার সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ ভাবের উদ্রেক না হয়। একটা টিয়া পাখীর দৃষ্টান্ত নাও। তার মালিক তাকে নিজের

* শাস্ত্রী-মহাশয়ের ব্যবহৃত ইংরেজী কথাগুলির অবিকল অনুবাদ করা গেল না বলিয়া মূল ইংরেজী দিতেছি :—

"Myself—(addressing Ramakrishna) Who told you, Sir, that we do not believe that the greatness of the great teachers of humanity was a Divine communication, and in that sense they were incarnations of a Divine Idea?"

দেবতাদের নাম শিখিয়েছে। তাই সে দিন নাই ক্ষণ নাই সকাল-সন্ধ্যা কেবলই রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ ব'লে চলেছে—যেন সে তাঁদের প্রেমে আত্মহারা। কিন্তু একদিন একটা ধূর্ত্ত বেরাল পেছন থেকে এসে তাকে ধরল ও মেরে ফেলবার চেষ্টা করল। তখন কি শুনতে পেলে ? তখন তার কণ্ঠ থেকে আর রাধাকৃষ্ণ বেরয় না ; তার জায়গায় তার যন্ত্রণার স্বাভাবিক ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ বেরতে থাকে। এই রকম, তোমাদের জপওয়ালা মানুষ প্রলোভন ও পরীক্ষার সময় হয়ত আওড়ান নামটি ভুলে যায় ; তোমাদের ভগবৎপ্রেমিক তার ভগবানের নাম ভুলে যায় ; তার মামুলি অবিশ্বাস এসে পড়ে, ভগবানের চরণে তার যে আত্মসমর্পণ নাই তা ধরা পড়ে। যে ভগবদবিশ্বাস জীবনের নানা পরীক্ষায় টিকে থাকতে না পারে, তা বিশ্বাসই নয়।'"

"একদিন তাঁহার নিকট বসিয়া আছি, এমন সময় কতকগুলি লোক আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে এই প্রশ্ন করিলেন, যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মানুষের গুরু অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শিক্ষাদাতার পরিচালন ও উপদেশের আবশ্যক কিনা। রামকৃষ্ণ বলিলেন, 'যদি কেউ তার আধ্যাত্মিক জীবনের যোগ্য পরিচালক পায়, তা হ'লে তা নিশ্চয়ই সুবিধাজনক ও মহা সৌভাগ্য ; এরূপ লোক তাকে বিশেষ সাহায্য করবেন। সে যে স্বচেষ্টায় প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারে না এমন নয়, কিন্তু এরূপ লোকের সংসর্গে আধ্যাত্মিক উন্নতি অধিকতর সহজে হয়।' তাহার পর নদীবক্ষে তখন যে ষ্টীমারটি যাইতেছিল তাহা দেখাইয়া সুধাইলেন, 'ঐ ষ্টীমারটা কখন্ চুঁচুড়া পৌছবে মনে কর ?' প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, 'সন্ধ্যার আগে ৫টা ৬টার সময়।' রামকৃষ্ণ বলিলেন, 'ষ্টীমারের পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা নৌকা দেখছ। ষ্টীমারটার সাহায্যে নৌকাটাও ঐ সময়ে চুঁচুড়া পৌছবে। কিন্তু ধর, নৌকাটাকে ষ্টীমার থেকে খুলে নেওয়া হ'ল এবং তাকে ষ্টীমারটার সাহায্য না নিয়ে যেতে হবে ; তা হ'লে সেটা কখন্ চুঁচুড়া পৌছবে ?' লোকটি বলিলেন, 'সম্ভবতঃ কাল প্রাতঃকালের আগে নয়।' তখন রামকৃষ্ণ বলিলেন, 'ঠিক্ সেই রকম, মানুষ নিজের আধ্যাত্মিক জীবনে তার দুর্ব্বলতা ও ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে বিনা সাহায্যে অগ্রসর হ'তে পারে—এতে কেবল বেশী সময় লাগে মাত্র ; অন্য দিকে, যদি সে কোন অগ্রসর আত্মার সঙ্গ ও সাহায্যের সুবিধা পায়, তা হ'লে সে দশ-বার ঘণ্টার পথ চার ঘণ্টায় অতিক্রম করতে পারে।"

"থাক্, তাঁহার উপদেশের কথা অনেক বলিলাম। এখন তাঁহার ব্যক্তিগত স্নেহ আমার প্রতি কিরূপ ছিল, তাহা কিছু বলি। এক সময় তিনি তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য আমাকে বার-বার অনুরোধ পাঠাইতেছিলেন, কিন্তু আমি ব্রাহ্মসমাজের কাজে ব্যস্ত থাকায় যাইতে পারিতেছিলাম না ; তখন তিনি একদিন স্বয়ং আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন—হয়ত অন্য কোথাও কোন কাজে যাইবার পথে। তখন আমাদের মধ্যে এই কথাবার্ত্তা হইল—

"রামকৃষ্ণ—আমি বার-বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও এবং তুমিও বার-বার আসবে বলা সত্ত্বেও তুমি অনেক দিন আমার সঙ্গে দেখা কর নাই, এ কেমন কথা ?

"আমি—ব্রাহ্মসমাজের কাজে আটক পড়ে গিয়েছিলাম। আজকাল আমি বড় ব্যস্ত।

"রামকৃষ্ণ—চুলোয় যাক্ তোমার ব্রাহ্মসমাজ যদি তা তোমাকে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে!

"তার পর আমার মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি হাসিলেন ও বলিলেন—'আমি যখন তোমার কাছে আসছিলাম তখন লোকগুলা (অর্থাৎ তাঁহার নূতন শিষ্যেরা) বললে, 'আপনি একটা ব্রাহ্মের কাছে কেন যাবেন, সে আপনার দর্শন পাবার যোগ্য নয়।' তাতে আমি তাদের কি বলেছিলাম জান ?'

"আমি—আপনি তাদের কি বলেছিলেন ?

"রামকৃষ্ণ—আমি তাদের বললাম, দ্যাখ, আমি সব্বাইকার জন্যে।"

"আর একবার তিনি দমদমায় [এক বাগান-বাড়িতে একটি ব্রাহ্ম উৎসবে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আমার সেখানে যাইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। পৌছিয়া দেখি, তিনি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া গান করিতেছেন। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন ও বলিলেন, 'আঃ এখন আমার বুকটা

জুড়াল!' তাহার পর তাঁহার সঙ্গীতাদি অসাধারণ উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল।"

"একদিন আমি দীর্ঘকাল পরে যখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইতেছি, তখন দেখি এই সাধুপুরুষ তাঁহার সরল বালকোপম ভাবে তীর-ধনুক হাতে নিকটের গাছগুলার থেকে কতকগুলা কাক তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া আমি চমকিত হইলাম। বলিলাম, 'কি হচ্ছে? তীরন্দাজ হয়েছেন?' তাহাতে তিনিও আমাকে এত দিন পরে আসিতে দেখিয়া সমান বিস্মিত হইলেন ও তীর-ধনুক ফেলিয়া দিয়া দৌড়িয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার এত আনন্দ হইয়াছিল, যে, তিনি ভাবাবেগের আতিশয্যে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। আমি তাঁহাকে ধীরে ধীরে তাঁহার কক্ষের মধ্যে লইয়া গেলাম, বিছানায় শুয়াইলাম, এবং যত ক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁহার জ্ঞান হইল তত ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। যখন তিনি আবার কথা কহিতে পারিলেন তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে আলিপুরের "চিড়িয়াখানায়" যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার কয়েক জন শিষ্য তাঁহাকে সিংহ দেখাইতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি সিংহগুলা দেখিতে পাইবার চিন্তায় আনন্দ যে-ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সরলতা অতি মধুর। তিনি বার-বার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'তুমি কি সিংহগুলিকে দেখতে ভালবাস না? মা-দুর্গার বাহন সিংহগুলিকে?' আমি হাসিয়া বলিলাম, 'আমি অনেক বার তাদেরকে দেখেছি।' তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন, তাদেরকে আর একবার দেখতে আমার সঙ্গে যাওয়া খুব মজা নয় কি?' আমি বলিলাম, 'হাঁ, নিশ্চয়ই খুব মজা; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাকে আর একটা কাজে যেতে হবে। আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে সুকিয়াস ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত যাব; তার পর নরেনকে তার ইস্কুল থেকে ডেকে পাঠাব, সে আপনাকে সঙ্গে ক'রে জু'তে নিয়ে যাবে।' পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত নরেন্দ্রনাথ তখন মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনে কাজ করিতেন।

"শেষে সেইরূপ ব্যবস্থাই হইল, এবং এক জন যুবা শিষ্য একখানা ছেকড়া গাড়ী ডাকিয়া আনিলেন। আমার যত দূর মনে পড়িতেছে, তিনিও গাড়ীতে আমাদের সঙ্গে উঠিলেন। কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়া রামকৃষ্ণ আমার বামদিকে বসিবার জিদ ধরিলেন। আমি প্রথম প্রথম তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু যখন গাড়ীটা চলিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি চাদর দিয়া বাঙালী নববধূদের মত মাথায় ঘোমটা দিলেন। আমি তাঁহাকে সেরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'দেখছ না, আমি এখন বৌ হয়েছি; আমার বরের সঙ্গে যাচ্ছি।' এই বলিয়া তিনি তাঁহার হাত দিয়া আমার কোমর জড়াইয়া ধরিলেন, এবং উপবিষ্ট অবস্থাতেই আনন্দে নৃত্যের ভঙ্গী করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার ভাবাবেশ হইল। তখন যাহা দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিব না। তাঁহার সমগ্র মুখমণ্ডল অসামান্য আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে দীপ্তিমান হইয়া উঠিল, এবং সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহারা হইবার পুর্ব্বে তিনি আধ আধ স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'মা, ওমা, আমাকে সংজ্ঞাহীন কোরো না মা। ওমা, আমি চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখতে যাচ্ছি। ওমা, আমি গাড়ী থেকে পড়ে যেতে পারি। এই যাওয়া-আসাটা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে বেশ ভাল থাকতে দাও।' অতঃপর তিনি আমার বাহুতে ভর দিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি আবার তাঁহার বালকোপম সরল ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন। সুকিয়াস্ ষ্ট্রীটের মোড় পোঁছিবার পর নরেনকে ডাকা হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ আসিলেন এবং তাঁহার গুরুদেবকে জু'তে লইয়া গেলেন। এখানে বলা দরকার, যে, মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশ্যন তখন সুকিয়াস ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল।"

[শাস্ত্রী-মহাশয়ের প্রবন্ধের শেষ তিনটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।]

"My acquaintance with him, though short, was fruitful by strengthening many a spiritual thought in me. I owe him a debt of gratitude for the sincere affection he bore towards me. He was certainly one of the most remarkable personalities I have come across in life."

তাৎপর্য্য। "তাঁহার সহিত আমার পরিচয় অল্পকাল-স্থায়ী হইলেও, তাহা এই ফল দান করিয়াছিল, যে, তাহা আমার অনেক আধ্যাত্মিক চিন্তাকে পুষ্ট করিয়াছিল। তিনি আমার প্রতি যে অকপট স্নেহ হৃদয়ে পোষণ করিতেন, তাহার জন্য আমি কৃতজ্ঞতাঋণে ঋণী। আমি জীবনে যে-সকল ব্যক্তিত্ববৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অসাধারণ মানুষদের সংস্পর্শে আসিয়াছি, তিনি নিঃসন্দেহ তাঁহাদের মধ্যে এক জন।"

[এই প্রবন্ধটিতে শাস্ত্রী-মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধের কোন কোন অংশের তাৎপর্য্যানুরূপ অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে পরমহংসদেবের নিজস্ব বচনভঙ্গীর আভাস পাওয়া যাইবে না। শাস্ত্রী-মহাশয়েরও বাংলা ইহা নহে।

চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ শহরের প্রসিদ্ধ চিত্রকর ডোরাকের অঙ্কিত তৈলচিত্রের ফোটোগ্রাফ হইতে পরমহংস রামকৃষ্ণের ছবি দিলাম। ফোটোগ্রাফটি ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

দেশ-বিদেশের কথা

ভারতবর্ষ

অঙ্গহীন ও বিকলাঙ্গ ভিখারী ও স্বাবলম্বী মানুষ—

গত অর্দ্ধোদয় যোগের সময় প্রয়াগের বেণীঘাটে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রী, ভিখারী ও স্থানীয় স্নানার্থীর সমাগম হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দুটি অঙ্গহীন মানুষের ফোটোগ্রাফ প্রয়াগের ডাক্তার ললিতমোহন বসু তুলিয়া পাঠাইয়াছেন। একজন প্রাপ্তবয়স্ক।



প্রয়াগের বেণীঘাটে বিকলাঙ্গ ভিখারী

তাহার হাত গজায় নাই। দুটা হাতের জায়গায় দুটা মাংসপিণ্ড আছে। জন্মঅবধি এইরূপ। মাংসপিণ্ড দুটা সরু, ৫। ৬ ইঞ্চি লম্বা। ইহার একটা দিয়ে লোকটি মালা জপে, পয়সা কড়ি দিলে অন্যটা দিয়ে নমস্কার করে। অন্য ব্যক্তি বালক, বয়স বছর আঠার হইবে। জন্মঅবধি ইহার বাম হাত নাই, গজায় নাই। ডান হাতের গড়ন ভাল ও স্বাভাবিক। ইহার কোমর থেকে মাথা পর্য্যন্ত গড়ন স্বাভাবিক; কিন্তু কোমরের নীচের অংশে ডান পা মাত্র ৮ ইঞ্চি লম্বা ও তাহাতে হাঁটু নাই, বাম পা ১৩ ইঞ্চি লম্ব এবং তাহাতে উরু ও হাঁটু দুই আছে। ইহার মা ইহাকে একটা চার চাকার কাঠের গাড়ীতে বসাইয়া ভিক্ষার জন্য ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। এইরূপ অঙ্গহীন ও বিকলাঙ্গ মানুষ নিতান্ত বিরল নহে। তাহাদের উল্লেখ করিবার কারণ এই, যে, আমাদের দেশে তাহারা স্বয়ং ভিখারী হয় বা অন্যের দ্বারা ভিক্ষাসংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়; ইউরোপে কিন্তু এরূপ মানুষকেও শিক্ষা দিয়া স্বাবলম্বী ও আত্মসম্মানবান্ করা হয়। ১৯২৬ সালে আমি যখন চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ শহরে একটি অনাথ বালকবালিকাদের বিদ্যালয় দেখিতে যাই, তখন দেখি, জন্মাবধি উভয় হস্তহীন কিঞ্চিৎ কুব্জ একটি ১৮। ১৯ বৎসরের ছেলে কেবল দুটি পা ও পায়ের আঙুলগুলির সাহায্যে কাঠের সুন্দর সুন্দর আসবাব প্রস্তুত করিয়াছে ও করিতেছে। সে যে পায়ের দ্বারাই সব কাজ করিতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য কাঠের আসবাবের



প্রয়াগের বেণীঘাটে বিকলাঙ্গ ভিখারী

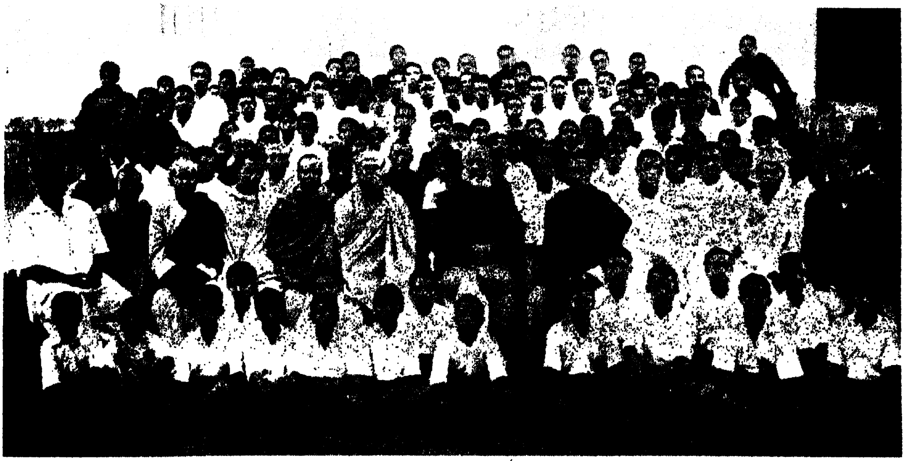
উপর সুন্দর রেখাচিত্র আঁকিল এবং দিয়াশলাইয়ের বাক্স খুলিল, একটা কাঠি লইল, সেটা জ্বালাইল, মুখে চুরুট লইল এবং চুরুট ধরাইল। আমার ইউরোপ দর্শন বিষয়ক একটা সম্পাদকীয় চিঠিতে আমি ইহার বিষয় লিখিয়াছিলাম। সে প্রায় ৯ বৎসরের কথা।

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের বিষয় আগে কাগজে ও রিপোর্টে পড়িয়াছিলাম। এবার তাহার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার সম্বন্ধে কিছু সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করিলাম। বিদ্যাপীঠটি বেশ উঁচু খোলা বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত, জায়গাটি স্বাস্থ্যকর,



বিদ্যাপীঠের একটি অংশ



দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা। বিদ্যাপীঠের ছাত্র ও শিক্ষকগণ এবং প্রবাসী-সম্পাদক।

ঘরবাড়িগুলিও পাকা ও স্বাস্থ্যকর। ছাত্রেরা যাহাতে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং যাহাতে তাহাদের নৈতিক ও দৈহিক উন্নতি হয় তাহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা শিক্ষাদান ও তত্ত্বাবধান করেন। ছেলেদের ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে। তাহারা ফুলের বাগানে নানাবিধ ফুলের ও তরকারীর ক্ষেতে নানা প্রকার তরকারীর চাষ করে। দেওঘর গোলাপ ফুলের জন্য বিখ্যাত। বিদ্যাপীঠে বেশ বড় বড় গোলাপ হয়। এখানকার একটি অসুবিধা এই, যে, গরমের সময় কূয়ার জল কমিয়া যায় বা থাকে না। একটি খুব গভীর নলকূপ হইলেই এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। তাহাতে অধ্যাপক ও ছাত্রদের স্নান, রন্ধন, পান ত হইতেই পারে, নানা প্রকার কৃষিকার্যও যথেষ্ট বাড়াইতে পারা যায়। কতিপয় ধনী লোক বিদ্যাপীঠের সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদেরই কেহ বা অন্য কোন সদাশয় সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি নলকূপের ব্যয় অনায়াসে দিতে পারেন। ছাত্রেরা ড্রিল ও ব্যায়াম ভালই করিল, আবৃত্তিও মন্দ নহে। তাহারা সঙ্গীত এবং চিত্রাঙ্কণও করে। দেশী বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান বাদ্য ভাল লাগিয়াছিল। কণ্ঠসঙ্গীতের একজন শিক্ষকের ব্যয় কোন ধনী লোক দিলে ভাল হয়। কোন এক জন ধনী লোকের সাহায্যে চিত্রাঙ্কণ শিক্ষকও নিযুক্ত হইতে পারেন।



দেওঘর বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রবাসী-সম্পাদককে সম্মান প্রদর্শন করিতেছে



শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী শোভা ভট্টাচার্য্য। ইঁহারা মিঃ ডি, আর, ভট্টাচার্য্যের কন্যা

সাজাহানপুরে সঙ্গীত সম্মেলন—

গত ফেব্রুয়ারী মাসে সাজাহানপুরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ ডি, আর, ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে একটি সঙ্গীত সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অন্য অঞ্চল হইতেও বহু সঙ্গীতবিৎ ইহাতে যোগদান করেন। কলিকাতা হইতে আগত শ্রীমতী বীণাপাণি মুখুজ্যে ও শ্রীমতী সুষমা দে সঙ্গীতে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া বহুসংখ্যক পদক লাভ করিয়াছেন। সভাপতি-মহাশয়ের কন্যারা নৃত্যকৌশলের জন্যও কয়েকটি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পাইয়াছেন। মিঃ এন, আর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত চন্দ্রশেখর পন্তের খেয়াল ও শ্রীমতী বিন্দুবাসিনীর হারমোনিয়ম সঙ্গীত সকলকে মুগ্ধ করে। সাজাহানপুরবাসীদের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় প্রবাসী বাঙালী বালকের কৃতিত্ব—

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রহ্মদেশে বেসিন শহরে একটি ব্যাডমিণ্টন্ খেলায় প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। দুইজন বর্ম্মী ও দুইজন প্রবাসী বাঙালী বালকের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা হয়। বেসিন



শ্রী স আং ডোয়ে, শ্রী স বা গিন্, এবং শ্রী বিপুল সিংহ, শ্রীরমেন দাস

শহরস্থ সম্ভ্রান্ত বর্ম্মীগণ ও মিঃ এস্, বি, সেন, মিঃ এ, কে, বসু ও শ্রীমতী সুরভি সিংহ, বি-এল্ প্রমুখ বহু মান্যগণ্য বাঙালীর সম্মুখে এই ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালী বালক দুইটি বর্ম্মীদ্বয়কে হারাইয়া দিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। ইঁহাদের চিত্র এখানে দেওয়া হইল।

হরসুন্দরী ধর্ম্মশালা কাশী—

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও দানবীর ত্রিপুরানিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাশী গোধূলিয়া অঞ্চলে একটি ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছেন। হিন্দুর সর্ব্ববিধ পূজার্চ্চনা এখানে বিনা ভাড়ায় অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

—

বাংলা

বাণীবন বালিকা বিদ্যালয়—

এই বিদ্যালয়ের উন্নতিবিধানের জন্য ১৭ বৎসর পূর্ব্বে একটি বোর্ডিং খোলা হয়। এই বোর্ডিংএ বর্ত্তমানে ২৫টি বালিকা আছে। ইহাদের মধ্যে একটি বালিকা সুদূর মান্দ্রাজের অন্তর্গত পীঠপুরম্ হইতে আসিয়াছে। অবশিষ্ট ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, যশোহর, খুলনা, পাবনা, দিনাজপুর, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, বর্দ্ধমান, মুর্শীদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, কলিকাতা, মেদিনীপুর প্রভৃতি পনেরটি জেলা হইতে আসিয়াছে। এই বালিকাদের মধ্যে তিনটি বিবাহিতা ও তিনটি বিধবা অনুন্নত শ্রেণীর বালিকার সংখ্যা পাঁচটি। এই ছাত্রী-নিবাসটিই এই বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব, বাংলা দেশের আর কোনও মধ্য ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী-নিবাস নাই।

স্ত্রী-শিক্ষা সহজলভ্য করিবার জন্য বোর্ডিং ফি স্কুল ফি সহ মাত্র ৭৲ টাকা করা হইয়াছে। বোর্ডারগণকে স্বতন্ত্র বেতন দিতে হয় না।

ব্রাহ্ম ব্যতীত স্থানীয় বালিকাগণ সকলেই এ পর্য্যন্ত বিনা বেতনে পড়িয়া আসিয়াছে।

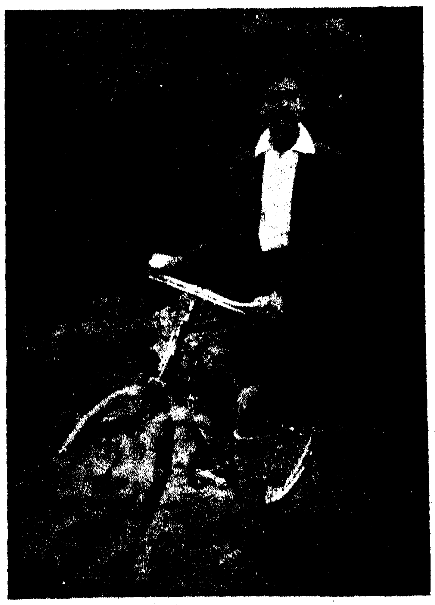
বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রী সংখ্যা বর্ত্তমানে ৮২টি, তার মধ্যে ২টি মুসলমান। এই বিদ্যালয় গত দুই বৎসর মধ্য ইংরেজী বৃত্তি পরীক্ষায় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কয়েক বৎসর হইল এই বিদ্যালয়ে একটি চরকা ও বয়ন বিভাগ খোলা হইয়াছে। একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক ইহাতে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। এখানে গামছা, তোয়ালে, চাদর, শাড়ী, ধুতী, টেবিল-ঢাকনা, ঝাড়ন ও জামার কাপড় বোনা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

এই বিদ্যালয় বাংলা দেশের একটি বড় অভাব পূরণ করিয়া আসিতেছে। ইহা গভর্ণমেণ্টের ও জনসাধারণের সাহায্য পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইহা অনেক গরীব বিধবা ও অনুন্নত শ্রেণীর বালিকা-দিগের স্বাধীনভাবে উন্নত জীবন যাপনের পথ শুধু উন্মুক্ত করিয়া দেয় নাই, এখানে আসিয়া না পড়িতে পারিলে অনেক বালিকার কোনরূপ শিক্ষালাভের সুযোগই মিলিত না। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে, যাঁহারা আসিতে চায় তাঁহাদের সকলকেও কর্ত্তৃপক্ষ স্থান দিতে পারেন না। এই জন্য অবিলম্বেই একটি পৃথক স্কুল বাড়ি অত্যাবশ্যক হইয়াছে। তাহা হইলে এই সমগ্র বাড়িটাই বোর্ডিংএর জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। স্থানাভাব ছাড়াও একই বাড়িতে স্কুল ও বোর্ডিং থাকাতে বোর্ডারদিগের অনেক অসুবিধা হইয়া থাকে। এই সকল অভাব ও অসুবিধা দূরীকরণ-উদ্দেশ্যে স্কুল কমিটি বিদ্যালয়সংলগ্ন উত্তরদিকের জমির উপর বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণের জন্য আট বৎসর পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের নিকট আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ সহ একটি নক্সা পেশ করিয়াছেন। কিন্তু টাকার অভাবের জন্য গভর্ণমেণ্ট কিছুই করিতে পারেন নাই। এই গৃহ নির্ম্মাণের জন্য স্কুল কমিটি গত বৎসর ৫২০০০ ইট প্রস্তুত করিয়াছেন, এখন গভর্ণমেণ্টের আশ্বাস পাইলেই কার্য্য আরম্ভ করিতে পারা যাইবে।



দণ্ডায়মান—শ্রীঅলোককুমার রায় চৌধুরী, শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়



শ্রীনীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

বাইসিক্লে দিল্লী গমন—

চারিটি বালক বাইসিক্লে দিল্লী গিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোককুমার রায় চৌধুরী, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহাদের ছবি দেওয়া হইল।

পরলোকে প্রেমলতা দেবী—

সুগায়িকা প্রেমলতা দেবী মহোদয়া গত ২৩এ পৌষ ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



প্রেমলতা দেবী

মহোদয়ের তৃতীয় কন্যা ও শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী। তিনি সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একজন গুণী ছাত্রী ছিলেন। গোপেশ্বর বাবুর নিকট ১৫ বৎসর যাবৎ খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন সঙ্গীত সাধনা তাঁহার অতি প্রিয় বস্তু ছিল। তাঁহার রচিত 'সঙ্গীত সুধা' খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী ও বাংলা গানের একখানি উৎকৃষ্ট স্বরলিপি পুস্তক। তিনি প্রত্যেক গানটির অলঙ্কার বিস্তারিত ভাবে দিয়াছেন। এলাহাবাদে 'সঙ্গীত সুধা'র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে এবং হিন্দুস্থানী ওস্তাদগণ এই পুস্তকটির বিশেষ সমাদর করেন।

ডক্টর শ্রীনিবাসচন্দ্র রায় মহাপাত্র—

মেদিনীপুর জেলার পালপাড়া গ্রামে একটি অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত বংশে শ্রীমান্ শ্রীনিবাসচন্দ্র রায় মাহাপাত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার



ডক্টর শ্রীনিবাস রায় মহাপাত্র

পিতার নাম উপেন্দ্রনাথ রায় মাহাপাত্র। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাধারণ ইতিহাসের সহিত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় মহাশয়ের সহায়তায় স্বর্গীয় প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্ররূপে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে গবেষণা আরম্ভ করেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া অতিকষ্টে দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে গবেষণা করিয়া ডি, লিট, উপাধির জন্য তাঁহার মৌলিক প্রবন্ধ দাখিল করেন। পরীক্ষায় তাঁহার প্রবন্ধের যোগ্যতা বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হওয়ায় কাশীহিন্দু-বিশ্বদ্যিালয় ১৯৩৪ সালের সমাবর্ত্তন উৎসবে তাঁহাকে ডি, লিট, উপাধি ভূষিত করিয়াছেন। শ্রীমান্ রায় মহাপাত্র প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টি ভিন্ন সাধারণ ইতিহাস, পৌরশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রনীতি, শাসনতন্ত্র, সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়েও জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

—

বিদেশ

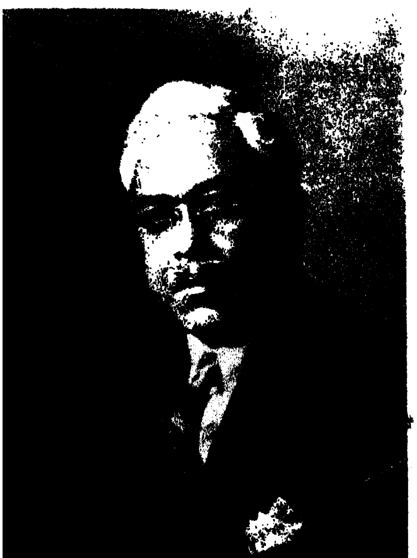
জাপানে ভারতীয় নারীদিগের ঈদ্ পর্ব্ব—

কোবে জাপানের একটি প্রধান শহর। সেখানে ভারতীয় নারীদের একটি ক্লাব আছে। সেই ক্লাবের উদ্যোগে কোবেতে ঈদ্ পর্ব্বের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। তাহাতে হিন্দু মুসলমান পার্সী ও খ্রীষ্টিয়ান মহিলারা এবং শিশুরা যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের ফোটোগ্রাফ এখানে মুদ্রিত হইল। ইহা দিল্লী হিন্দুস্থান টাইমসের শ্রীযুক্ত চমনলালের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

—



জাপানে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভারতীয় নারীগণ ঈদপর্ব্ব উদ্‌যাপন করিতেছেন।



ডাঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ

ডাঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ—

ডাঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ প্রথম জীবনে একজন পশুচিকিৎসক ছিলেন। পশুচিকিৎসায় অধিকতর জ্ঞান আহরণের জন্য তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যান ও [illegible] সনে এই বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। [illegible] সন পর্য্যন্ত ঘোষ-মহাশয় শিকাগো ও ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-বিষয় আরও অধ্যয়ন করেন।

তিনি অতঃপর দেশে না ফিরিয়া শিকাগো শহরে ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। তেইশ বৎসর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ঘোষ-মহাশয় সেখানে ধূপের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া অনেকে এখন ধূপ উৎপাদন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঘোষ-মহাশয়ের কোম্পানীর নাম ইণ্ডিয়া ইনসেন্স কোম্পানী। ধূপের উপাদানের অনেকগুলি তিনি ভারতবর্ষ হইতে লইয়া থাকেন। তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, ধূপ ছাড়া মার্কিনীদের উপযোগী অন্যান্য কি কি জিনিষ আমেরিকায় চালান দেওয়া যাইতে পারে তাহা অনুসন্ধান করাই তাঁহার ভারত-আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

—

স্বরলিপি

গান

কোন গহন অরণ্যে তারে এলেম হারায়ে—
কোন দূর জনমের কোন স্মৃতি বিস্মৃতি ছায়ে।
আজ আলো আঁধারে
কখন বুঝি দেখি কখন দেখি না তারে
কোন মিলন সুখের স্বপন সাগর এলো পারায়ে॥
ধরা অধরার মাঝে
ছায়ানটের রাগিণীতে আমার বাঁশি বাজে।
বকুলতলায় ছায়ার নাচন ফুলের গন্ধে মিশে
জানি নে মন পাগল করে কিসে
কোন নটিনীর ঘূর্ণী আঁচল লাগে আমার গায়ে॥

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার।

সা সা || রা ^রগা গা | ধা ধা -ণা | ^ণপা হ্মা -ণা | ধা পা -া | রা -া -গা |

কো ন্ || গ হ ন | অ র ০ | ণ্যে ০ ০ | তা রে ০ | এ ০ ০ |

| গা -মা মা | -া -া -া | -া -া -গা | রা রা -পা | হ্মা পা -া | হ্মা পা ধা |

| লে ০ ম্ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | এ লে ম্ | হা রা ০ | য়ে ০ ০ |

| না র্সা র্রা | র্সা র্সা র্সনা | ধা ধা -ণা | পা হ্মা -ণা | ধা পা -া |

| ০ ০ ০ | গ হ ন ০ | অ র | ণ্যে ০ ০ | তা রে ০ |

সা সা | সা -মা মা | মা গমপ -পা | পা -পা -া | ধা ধা না | র্সা -া র্গা |

কো ন্ | দূ র জ | ন মে০০ র্ | কো ন্ ০ | স্মৃ তি ০ | বি ০ স্মৃ |

| র্রা র্সা -া | সা রা গা | মা পা ধা || ধা ধা -ণা | ধা ধা -ণা | পা হ্মা ণা

| তি ছা ০ | য়ে ০ ০ | ০ ০ ০ || গ হ ন | অ র ০ | ণ্যে ০ ০

| ধা পা -া |

| তা রে ০ |

| পা পা || পা পা -া | না -ধা না | র্সা -া -া | -া -া -া | ^সর্গা র্গা -র্গা |

| আ জ || আ লো ০ | আঁ ০ ধা | রে ০ ০ | ০ ০ ০ | ক থ ন্ |

| র্গা র্গা -া | র্মা র্গা -া | র্রা র্সা -র্সা | না না -ধা | না -া না | র্সা -া -া |

| বু ঝি ০ | দে খি ০ | ক থ ন্ | দে খি ০ | না ০ তা | রে ০ ০ |

| -া না -না | র্সা র্সা র্গা | র্রা র্সা -র্সা | র্সা না র্সা | ধা পা পা | রা রা গা |
| ০ কো ন্ | মি ল ন | সু খে র্ | স্ব প ন | সা গ র | এ ০ ০ |

| গা -মা -া | রা রা -পা | ক্ষা পা -া | ক্ষা পা ধা | না র্সা র্রা || র্সা র্সা র্সনা | ধা ধা ণা- |
| লো ০ ০ | এ লো ০ | পা রা ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ || গ হ ন | অ র ০ |

| -া -া || স সমা মা | মা মগা -পা | পক্ষা ধপা -া | -া -া -া | ধা ধা -র্সা | ধা পা -পা |
| ০ ০ || ধ রা অ | ধ রা০ র্ | মা ঝে ০ | ০ ০ ০ | ছা য়া ০ | ন টে র্ |

| ক্ষা পক্ষা ক্ষা | ধা পা -মা | মা মা -মা | মা মগা পা | পক্ষা পা -া | -া -া -া |
| রা গি০ ০ | গী তে ০ | আ মা র্ | বাঁ শি০ ০ | বা০ জে ০ | ০ ০ ০ |

| ধা ধা -র্সা | ধা পা -া | রা গা মা | পা মা রা | রসা -া -া | -া -া -া |
| আ মা র্ | বাঁ শি ০ | বা ০ ০ | ০ ০ ০ | জে ০ ০ | ০ ০ ০ |

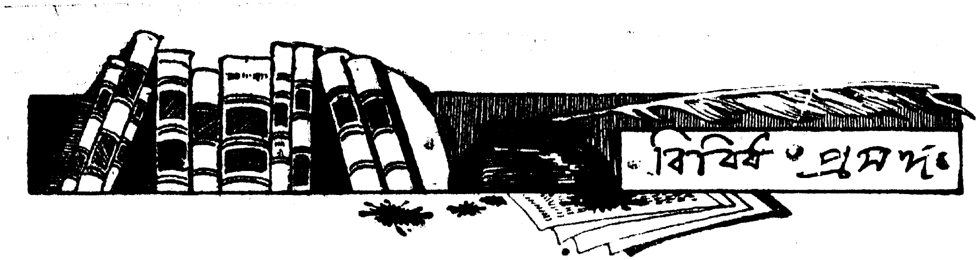
| র্সর্গা র্গা -র্গর্ | র্গা র্গা র্গা | র্মা র্গা র্গা | র্রা র্সা র্সা | না না ধা | না -না র্সা |
| ব কু ল | ত লা য় | ছা য়া র্ | না চ ন্ | ফু লে র | গ ন্ ধে |

| না সা -া | -া -া -া | র্সা র্সা র্গা | র্রা র্সা -র্সা | না না ধা | না র্সা র্রা | না র্সা -া |
| মি শে ০ | ০ ০ ০ | জা নি ০ | নে ম ন্ | পা গ ল | ক রে ০ | কি সে ০ |

| -া -া -া | র্সা -র্গা র্গা | র্রা র্সা র্সা | না -না র্সা | ধা পা -পা | রা রা গা | গা -মা -া |
| ০ ০ ০ | কো ন্ ন | টি নী র | ঘূ র ণী | আঁ চ ল্ | লা ০ ০ | গে ০ ০ |

| -া -া -া | -া -া গা | রা রা -পা | ক্ষা পা -পা | ক্ষা পা ধা | না র্সা র্রা | না -া র্সা |
| ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | লা গে ০ | আ মা র্ | গা ০ ০ | ০ ০ ০ | য়ে ০ ০ |

| ধা পা পা || রা রণা ণা | ধা ধা -ণা | পা ক্ষা -ণা | ধা পা -া |
| ও কো ন্ || গ হ ন | অ র ০ | ণ্যে ০ ০ | তা রে ০ |



ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আসন-বণ্টনে অবিচার

ভবিষ্যতে যে আইন অনুসারে ভারতবর্ষ শাসিত হইবে, তাহার খসড়ার এক একটি ধারা বিলাতী পার্লেমেণ্টের হাউস অব কমন্সে বিচারবিতর্কের পর গৃহীত হইতেছে। ভারতবর্ষের লোকেরা সমগ্র খসড়াটার ও ধারাগুলার যত সমালোচনাই করুক না, তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না। ইংরেজদের মধ্যেও যে-সব পার্লেমেণ্ট-সদস্য সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দলের নহেন, তাঁহাদেরও উপস্থাপিত কোনও ধারার বিশিষ্ট রকমের সংশোধক প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে না। তথাপি সমগ্র বিলটার এবং ধারাগুলার সমালোচনা আবশ্যক, সর্ব্বসাধারণের জানা আবশ্যক ভারতবর্ষের পক্ষে অনিষ্টকর কিরূপ আইন হইতে যাইতেছে। দৈনিক কাগজে ইহা দেখান যতটা সম্ভবপর, মাসিক কাগজে ততটা নহে। তথাপি, আমরা কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি ও অবিচার দেখাইয়া থাকি।

গত মাসের 'প্রবাসী'তে আমরা সমগ্রভারতের জন্য অভিপ্রেত ভবিষ্যতের ব্যবস্থাপক সভার য়্যাসেম্ব্লীতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলিকে যেভাবে আসনগুলি বাঁটিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহার দোষ দেখাইয়াছিলাম। এবারে ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপক সভার কৌন্সিল অব্ ষ্টেট্ এবং য়্যাসেম্ব্লী উভয়েরই আসন বণ্টনের কোন কোন দোষ দেখাইব।

—

য়্যাসেম্ব্লীর আসন বণ্টন

নূতন ভারতশাসন বিল অনুসারে য়্যাসেম্ব্লীতে ৩৭৫ জন সদস্য থাকিবেন। এই ৩৭৫ জনের ৩৭৫টি আসন কি প্রকারে বণ্টিত হইয়াছে বলিতেছি।

ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করা হইবে ঠিক্ হইয়াছে। শুধু ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির ও দেশী রাজ্যগুলির মোট লোকসংখ্যা ৩৩,৫৯,০১,৯১২। এই তেত্রিশ কোটির অধিক লোকদের প্রতিনিধি হইবেন ৩৭৫ জন। তাহা হইলে প্রতি ৮,৯৫,৭৩৮ জনের সমষ্টির প্রতিনিধি হইবেন এক জন করিয়া। (কেন না, ৩৩,৫৯,০১,৯১২কে ৩৭৫ দিয়া ভাগ করিলে ৮,৯৫,৭৩৮ হয়।) অতএব যে-সব দেশী রাজ্যের ফেডারেশ্যন-ভুক্ত হইবার কথা, তাহাদের অধিবাসী ৭,৮৮,০১,৯১২ জনের প্রাপ্য হয় ৮৭ এবং ভগ্নাংশ, ধরুন ৮৮ জন, প্রতিনিধি। ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির অধিবাসী ২৫,৭১,০০,০০০ জন অধিবাসীর প্রাপ্য হয় ২৮৭ জন প্রতিনিধি। কিন্তু দেশী রাজ্যগুলিকে দেওয়া হইয়াছে ১২৫টি প্রতিনিধি ও আসন, অর্থাৎ তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য অপেক্ষা ৩৭টি বেশী, এবং প্রদেশগুলিকে দেওয়া হইয়াছে ২৫০টি অর্থাৎ ন্যায্য প্রাপ্য অপেক্ষা ৩৭টি কম। বলা হইয়াছে বটে, যে, প্রদেশগুলিকে ২৫০টি আসন দেওয়া হইবে, কিন্তু বাস্তবিক দেওয়া হইবে ২৪৬টি। কারণ ৪টি আসন বিশেষ কোন প্রদেশকে দেওয়া হইবে না। সেগুলির সদস্য গবর্ণর-জেনার্যাল মনোনীত করিয়া দিবেন। অতএব বাস্তবিক প্রদেশগুলিকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য অপেক্ষা ৪১ জন কম প্রতিনিধি দেওয়া হইবে।

—

প্রদেশগুলির মধ্যে আসন বণ্টন

২৫,৭১,০০,০০০ ব্রিটিশভারতীয়দের প্রতিনিধি হইবেন ২৪৬ জন। ২৫,৭১,০০,০০০কে ২৪৬ দিয়া ভাগ করিলে পাওয়া যায় ১০,৪৫,১২১। তাহা হইলে প্রত্যেক ১০,৪৫,১২১ জনের সমষ্টি এক জন করিয়া প্রতিনিধি পাইবেন। এই সংখ্যা অনুসারে হিসাব করিয়া আমরা নীচের তালিকায় দেখাইব, কোন্ প্রদেশের কত জন প্রতিনিধি ও আসন প্রাপ্য হয় এবং ভারতশাসন বিলে তাহাকে কত দেওয়া হইয়াছে। প্রদেশগুলির যে লোকসংখ্যা তালিকায় দিলাম, তাহা ভারতশাসন বিলের ভিত্তীভূত জয়েণ্ট

পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী। সেন্সস রিপোর্টে যে লোকসংখ্যা আছে, তাহায় মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, ও উড়িষ্যার লোকসংখ্যা তাহা হইতে কিছু ভিন্ন দেখা যাইবে। কারণ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অল্প অংশ উড়িষ্যা প্রদেশে যাইবে, সিন্ধু ও এখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে পৃথক্ করা হইবে, এবং বিহার ও উড়িষ্যা দুটি আলাদা প্রদেশ হইবে।

প্রদেশ	লোকসংখ্যা	ন্যায্য আসন	প্রদত্ত আসন
মান্দ্রাজ	৪৫৬০০০০০	৪৫.[illegible]	৩৭
বোম্বাই	[illegible]০০৭৫	১৭.১	৩০
বাংলা	৫০১১৪০০২	৪৭.৯	৩৭
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৮৪০৮৭৬৩	৪৬.[illegible]	৩৭
বিহার	৩২৪০০০০০	৩১.০	৩০
পঞ্জাব	২৩৫৮০৮৫২	২২.৫	৩০
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	১৫৫০৭৭২৩	১৪.[illegible]	১৫
আসাম	৮৬[illegible]	৮.২	১০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	২৪২৫০৭৬	২.৩	৫
উড়িষ্যা	৬৭০০০০০	৬.৪	৫
সিন্ধু	[illegible]০০০০	[illegible]	৫
ব্রিটিশ বালুচিস্থান	৪৬৩৫৮০	ভগ্নাংশ	১
দিল্লী	৬৩৬[illegible]৪	,,	২
আজমীর-মেরোয়াড়া	৫৬০২৯২	,,	১
কূর্গ	১৬৩৩২৭	,,	১

এই তালিকা হইতে বুঝা যাইবে, যে, কতকগুলি প্রদেশ অনুগ্রহভাজন ও কতকগুলি প্রদেশ ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। অনুগ্রহ করিবার কারণ যেমন বলা হয় নাই, বঞ্চিত করিবার কারণও তেমনই বলা হয় নাই।

দেশীরাজ্যসমূহের নরেশদের ও ব্রিটিশ-শাসিত ভারতীয়দের মূল্য

দেশীরাজ্যসমূহের অধিবাসীরা তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে, ইহা ধরিয়া লইলে দেখা যাইবে, যে, ৭,৮৮,০১,৯১২ জন মানুষের প্রতিনিধি হইবেন ১২৫ জন। তাহা হইলে প্রত্যেক ৬,৩০,৪১৫ জনের সমষ্টি এক জন করিয়া প্রতিনিধি পাইবে। কিন্তু ব্রিটিশ-শাসিত ভারতীয় প্রদেশগুলিতে প্রত্যেক ৭,৪৫,১২১ জনের সমষ্টি এক জন করিয়া প্রতিনিধি পাইবে। যদি দেশীরাজ্যগুলির অধিবাসীরাই বাস্তবিক প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকার পাইত, তাহা হইলে না-হয় এই বৈষম্য অন্যায় হইলেও সহ্য করা চলিত। কিন্তু দেশীরাজ্যের প্রজারা ত প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকার পাইবে না, তথাকার প্রতিনিধিরা তথাকার নৃপতিদের দ্বারা মনোনীত হইবে। ভারত-শাসন বিলের তপশীলে দেখিতেছি ১৫০ জন রাজা মহারাজা রাণা মহারাণা নবাব নিজাম জাম ১২৫ জন প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। অর্থাৎ ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে এক এক জন প্রতিনিধি পাইবে মোটামুটি দশ লক্ষাধিক লোকের সমষ্টি, কিন্তু এই নরেশগণ প্রায় গড়ে এক এক জন এক এক প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। অর্থাৎ তাঁহাদের এক এক জনের মতের দাম আমাদের মত দশ লাখ অ-নরেশদের মতের সমান! কি বিষম, অসাধারণ, অতি-মানব তাঁহারা!

ইহাতেও কিন্তু অনেক জন নরেশের অতিমানবতার ঠিক পরিচয় পাঠকেরা পাইবেন না। আরও কিছু জানা দরকার।

কোন কোন দেশীরাজ্যের নরেশ একাই কয়েক জন করিয়া প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। হায়দরাবাদের নিজাম ষোল জন প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। অর্থাৎ ব্রিটিশ-ভারতের এক কোটি ষাট লক্ষ লোকের প্রতিনিধি হইবে ১৬ জন, কিন্তু একা নিজামেরই প্রতিনিধি হইবে ১৬ জন! মহীশূরের মহারাজা, কাশ্মীরের মহারাজা, গোয়ালিয়রের মহারাজা শিন্দে, বড়োদার মহারাজা গায়েকোআড়, যথাক্রমে ৭, ৪, ৪, ও ৩ জন প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। তাঁহাদের এক এক জনের মতের মূল্য যথাক্রমে ব্রিটিশ ভারতের ৭০ লক্ষ, ৪০ লক্ষ, ৪০ লক্ষ ও ৩০ লক্ষ লোকের মতের মূল্যের সমান। ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাজা ৫ জন, উদয়পুরের মহারাণা ২ জন, জয়পুরের মহারাজা ৩ জন, যোধপুরের মহারাজা ২ জন, ইন্দোরের মহারাজা হোল্কার ২ জন, রেওয়ার মহারাজা ২ জন ও পাটিয়ালার মহারাজা ২ জন প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। ১ জন করিয়া প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন অনেক নরেশ। সর্ব্বশেষে আছেন তাঁহারা যাঁহারা ২ হইতে ৮ জনে মিলিয়া এক একটি বা ২।৩টি প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন।

দেশীরাজ্যের প্রজাদের মতের মূল্য

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের লোক'দর অন্ততঃ কতকগুলি লোক প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবে। কিন্তু দেশীরাজ্যসমূহের নরেশরাই সর্ব্বেসর্ব্বা, প্রজাদের এক জনেরও নির্ব্বাচনাধিকার নাই। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট তাহাদের অস্তিত্ব বরাবর কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া আসিতেছেন। অথচ তাহারা সবাই আমাদেরই মত মানুষ। খুব বড় বড় জননায়ক দেশীরাজ্যসকলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে জন্মতঃ কোল্হাপুর রাজ্যের প্রজা ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী জন্মতঃ পোরবন্দর রাজ্যের প্রজা। ব্যবসাবাণিজ্যেও দেশীরাজ্যসকলের অনেক প্রজা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মাড়োয়ারীরা ও কচ্ছীরা সবাই দেশী রাজ্যের প্রজা। ঘনশ্যামদাস বিড়লা জয়পুরের এবং অমৃতলাল ওঝা কচ্ছের প্রজা। অথচ দেশী রাজ্যের কোন প্রজারই মতের মূল্য নাই,তাহাদের কাহারও নির্ব্বাচনাধিকার নাই!

—

কৌন্সিল অব্ স্টেটের আসন বণ্টন

ভবিষ্যৎ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় য়্যাসেমব্লীর আসন-বণ্টন সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছি। ভবিষ্যৎ কৌন্সিল অব্ ষ্টেট্ সম্বন্ধে তত না হইলেও কিছু লিখিতেছি।

কৌন্সিল অব ষ্টেটে মোট ২৬০ জন প্রতিনিধি ও তাহাদের ২৬০টি আসন থাকিবে। ব্রিটিশশাসিত প্রদেশগুলি পাইবে ১৫০টি আসন, দেশীরাজ্যগুলি ১০৪টির অনধিক, এবং ফিরিঙ্গীরা ১, ইউরোপীয়েরা ৭, ও দেশী খ্রীষ্টিয়ানেরা ২টি আসন পাইবে। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা প্রায় ২৬ কোটি এবং দেশীরাজ্যগুলির প্রায় আট কোটি। সুতরাং হিসাব-মত দেশীরাজ্যগুলির প্রতিনিধি মোটামুটি ৬০।৬২ জনের অধিক হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তাহাদিগকে তদপেক্ষা ৪০এর অধিক প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে, এবং ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিকে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যায় কম প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, দেশীরাজ্যগুলির প্রজাদিগকে কৌন্সিল অব্ ষ্টেটের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনেরও অধিকার দেওয়া হয় নাই।

দেশী খ্রীষ্টিয়ানদের সংখ্যা ফিরিঙ্গী ও ইউরোপীয়দের চেয়ে অনেক বেশী। তাহাদিগকে ২টি আসন দিয়া ইউরোপীয়দিগকে ৭টি দেওয়ায় তাহাদের অপমান করা হইয়াছে।

কৌন্সিল অব্ ষ্টেটে প্রদেশ অনুসারে আসন বণ্টন

ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলি মোট ১৫০টি আসন পাইবে। তাহাদের ২৫,৭১,০০,০০০ অধিবাসীর প্রতিনিধি ১৫০ জন হইবে, অর্থাৎ প্রতি ১৭,১৪,০০০ মানুষের সমষ্টি এক জন করিয়া প্রতিনিধি হইবে। এই হিসাবে প্রত্যেক প্রদেশের যত প্রতিনিধি হওয়া উচিত, সকলকে সেরূপ দেওয়া হয় নাই—কোথাও কম কোথাও বেশী দেওয়া হইয়াছে। তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। প্রত্যেক প্রদেশের প্রাপ্য আসন কয়টি হয়, তাহা উহার লোকসংখ্যাকে ১৭,১৪,০০০ দ্বারা ভাগ করিলেই পাওয়া যাইবে। বঙ্গের প্রাপ্য হয় প্রায় ৩০টি আসন, কিন্তু তাহাকে দেওয়া হইয়াছে ২০টি। বোম্বাইয়ের প্রাপ্য হয় ১০টি, দেওয়া হইয়াছে ১৬টি। পঞ্জাবের প্রাপ্য হয় ১৩টি, দেওয়া হইয়াছে ১৬টি। উত্তর-পশ্চিমসীমান্তের দেড়টিও পাওনা হয় না, দেওয়া হইয়াছে ৫টি, সিন্ধুর ২টি পাওনা হয়, দেওয়া হইয়াছে ৫টি।

প্রদেশ বা সম্প্রদায়	লোকসংখ্যা (লক্ষে)	প্রদত্ত আসন
মান্দ্রাজ	৪[illegible]	২০
বোম্বাই	১৮[illegible]	১৬
বাংলা	৫০১	২০
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৮৪	২০
পঞ্জাব	২৩৬	
বিহার	৩২[illegible]	[illegible]
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	১৫[illegible]	৮
আসাম	৮[illegible]	৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	২৪	৫
সিন্ধু	৩৯	[illegible]
উড়িষ্যা	৬৭	৫
দিল্লী	৬	১

প্রদেশ বা সম্প্রদায়	লোকসংখ্যা (লক্ষে)	প্রদত্ত আসন
আজমীর-মেরোআড়া	৬	[illegible]
ব্রিটিশ বালুচীস্থান		[illegible]
কুর্গ	[illegible]	১
ফিরিঙ্গী	—	১
ইউরোপীয়	—	৭
দেশী খ্রীষ্টিয়ান		২

—

আমেরিকার দৃষ্টান্ত অননুসৃত

ভারতবর্ষকে ভবিষ্যতে ফেডারেশ্যন অর্থাৎ সংযুক্তরাষ্ট্রমণ্ডল করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। পৃথিবীতে বর্ত্তমানে সকলের চেয়ে বড় ফেডারেশ্যন আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স্‌ বা সংযুক্তরাষ্ট্রমণ্ডল। ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভায় যেমন হইবে কৌন্সিল অব ষ্টেট ও য়্যাসেম্ব্লী, আমেরিকার ব্যবস্থাপক সভা কংগ্রেসে তেমনি আছে সেনেট ও প্রতিনিধি-ভবন (House of Representatives)। আমেরিকার প্রতিনিধি-ভবনে প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার লোকসংখ্যা অনুসারে প্রত্যেক ২১০৪১৫ জনের সমষ্টি প্রতি ১ জন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে। ইহাতে পাছে বড় বড় রাষ্ট্রগুলির অপ্রতিহত প্রাধান্য স্থাপিত হয়, সেই জন্য তাহা নিবারণার্থ সেনেটে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক রাষ্ট্রই ২ জন করিয়া সদস্য নির্ব্বাচন করে। ভারতবর্ষে য়্যাসেম্ব্লীতে লোকসংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হয় নাই; কৌন্সিল অব্‌ ষ্টেটেও লোকসংখ্যা অনুসারে প্রদেশগুলিকে আসন দেওয়া হয় নাই, অথচ আমেরিকার রীতি অনুসারে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক রাষ্ট্রকে সমান সমান সদস্যও দেওয়া হয় নাই। কোন ন্যায্য বা যুক্তিসঙ্গত নিয়মই অনুসৃত হয় নাই।

লোকসংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দেশ বিলাতেও আছে। তথাকার পার্লেমেণ্টের হাউস অব কমন্সে জেলা ও শহরগুলি প্রত্যেক ৭০,০০০ লোকের সমষ্টি এক জন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকারী।

—

আসনবণ্টন বৃহত্ত্ব অনুসারেও নহে

প্রতিনিধি দেওয়া হয় সব দেশেই মনুষ্যদিগকে; ভূখণ্ডকে নহে, তাহার উপরিস্থিত বৃক্ষলতাতৃণাদিকে নহে, বালুকারাশি বা ধূলিকণাকে নহে, এবং বন্য ও গৃহপালিত পশুপক্ষীদিগকেও নহে। সুতরাং ইহা বলিলে চলিবে না যে, দেশীরাজ্যসমূহের ও ব্রিটিশ ভারতের বৃহত্ত্ব অনুসারে এবং প্রদেশগুলির বৃহত্ত্ব অনুসারে তাহাদের প্রতিনিধিসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা হইলে সাতিশয় অলৌকিক ব্যবস্থা হইত। কিন্তু ব্যবস্থা সে-প্রকারও হয় নাই। ব্রিটিশ ভারতের আয়তন ৮,৬২,৬৭৯ বর্গ-মাইল, এবং [illegible] মোট আয়তন ৭,১২,৫০৮ বর্গ-মাইল। ইহাদের মধ্যে আসন-বণ্টন আয়তন অনুসারে হয় নাই। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যেও আসন-বণ্টন আয়তন অনুসারে হয় নাই। নীচের তালিকা দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে।

প্রদেশ।	বর্গমাইলে আয়তন।	য়্যাসেম্ব্লীতে আসন।	কৌন্সিল অব ষ্টেটে আসন।
মান্দ্রাজ	১,৪২,২৭৭	৩৭	২০
বোম্বাই	৭৭,২২১	৩০	[illegible]
বাংলা	৭৭,৫২১	৩৭	২০
আগ্রা-অযোধ্যা	১,০৬,২৪৮	৩৭	২০
পঞ্জাব	[illegible],২০০	৩০	১৬
বিহার	৬৯,৩৪৮	৩[illegible]	১৬
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	[illegible],৯২০	১৫	৮
উড়িষ্যা	১৩,৭০৬	৫	৫
আসাম	৫[illegible],০১৪	১০	৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	১৩,৫১৮	৫	৫
ব্রিটিশ বালুচীস্থান	৫৪,২২৮	১	[illegible]
আজমের-মেরোআড়া	২,৭১১	১	১
কুর্গ	১,৫৯৩	১	১
দিল্লী	৫৭৩	২	১
সিন্ধু	৪৬,৩৭৮	৫	৫

লোকসংখ্যা ও আয়তন দুই-ই একসঙ্গে বিবেচনা করিয়া প্রতিনিধির সংখ্যা নিরূপণ করিবার এমন কোন নিয়ম জানি না যাহা গণিতশাস্ত্রের ও ন্যায়শাস্ত্রের অনুমোদিত। বস্তুতঃ এরূপ কোন নিয়মও অনুসৃত হয় নাই।

—

আসনবণ্টন শিক্ষানুযায়ীও নহে

একটা কথা মনে হইতে পারে, যে, লিখনপঠনক্ষম লোকদের সংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। বাস্তবিক তাহাও হয় নাই। দেশী রাজ্যসমূহের ও ব্রিটিশ ভারতের লিখনপঠনক্ষমদের সংখ্যা নীচে দিতেছি।

ভারতবর্ষের অংশ।	লিখনপঠনক্ষম পুরুষ।	লিখনপঠনক্ষম নারী।
ব্রিটিশ ভারতবর্ষ	১,০৮,৪৫,২৮৭	২২,৩৯,০৪৬
দেশী রাজ্যসমূহ	৪৪,৪৮,৬৭৪	৯,১৯,৭৬১

আসনবণ্টন এই সংখ্যাগুলি অনুসারেও হয় নাই।

ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিতেও লিখনপঠনক্ষমদের সংখ্যা অনুসারে আসন বণ্টিত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে প্রদেশগুলিকে প্রদত্ত আসনের যে-যে তালিকা দিয়াছি, তাহার সহিত নীচের তালিকা বিবেচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

প্রদেশ।	লিখনপঠনক্ষম পুরুষ।	লিখনপঠনক্ষম নারী।
মান্দ্রাজ	৩০,০৬,৯৭৫	৬,[illegible],৯০৫
(সিন্ধুসহ) বোম্বাই	১৭,৭০,০১০	২,৭৯,৩৭৫
বাংলা	৪০,[illegible],২৫২	৬,৩০,৯৫১
আগ্রা-অযোধ্যা	২০,৭৩,৪১০	২,[illegible],২২৮
পঞ্জাব	১০,৯৭,০৪৪	১,৫০,৭১৩
বিহার-উড়িষ্যা	১৫,১৪,০০৫	১,২৬,৩৬০
মধ্য প্রদেশ-বেরার	৭,৯০,০১৮	[illegible],১৮৩
আসাম	৫,৯১,৬০০	৭৪,৬৩৬
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	[illegible],০৫৮	১১,৩০৮
ব্রিটিশ বালুচীস্থান	৩১,৯[illegible]	৩,৬৫৮
আজমীর-মেরোআড়া	৫১,৪৭৮	৭,১৭৩
কুর্গ	১৯,৮৯২	৫,৪৪৪
দিল্লী	৭৩,৩৭৭	১৬,০৯৫

—

আসনবণ্টনে অন্যায়ের প্রতিবাদ

আমরা দেখাইলাম, যে, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আসনবণ্টনে কোন নিয়ম অনুসৃত হয় নাই। বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভাতেও এইরূপ নিয়মাভাব, অযৌক্তিকতা ও অবিচার আছে। তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবিচার হইয়াছে বঙ্গের উপর। ইহা আমরা এই প্রথম বলিতেছি না। আগেও বলিয়াছি ও তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাঠকদিগকে জানাইতেছি, আমরা প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম (পরেও লিখিয়াছি) এবং তাহা নিখিলভারতীয় কংগ্রেস কমিটির, নিখিল-ভারতীয় মুস্লিম লীগের, ভারতীয় জাতীয় উদারনৈতিক ফেডারেশ্যনের, হিন্দু মহাসভার, ও (মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর) অব্রাহ্মণ ফেডারেশ্যনের সম্পাদকদিগকে পত্রসহ পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু এক জনও তাহার প্রাপ্তিস্বীকার পর্য্যন্ত করেন নাই। অন্যান্য প্রদেশের কথা দূরে থাক্, বাংলা দেশেও এই অবিচারের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন হয় নাই। তাহাতে বাংলা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে।

—

কৌন্সিল অব্ ষ্টেটে দেশী রাজ্যের নরেশদের মতের মূল্য

আগে বলিয়াছি, ব্রিটিশ-ভারতের ১৭,১৪,০০০ মানুষের সমষ্টি কৌন্সিল অব্ ষ্টেটে একটি করিয়া প্রতিনিধি পাইবে। কিন্তু দেশী রাজ্যের নরেশরা অনেকে একাই একাধিক প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। যথা—

হায়দরাবাদের নিজাম ৫ জন। তাঁহার মতের মূল্য ব্রিটিশ-ভারতবর্ষের ১৭,১৪,০০০ × ৫ = ৮৫,৭০,০০০ জন মানুষের মতের মূল্যের সমান।

মহীশূরের মহারাজা তিন জন, এবং কাশ্মীর, গোয়ালিয়র, ও বড়োদার মহারাজারাও তিন জন করিয়া।

প্রত্যেকে দু-জন করিয়া প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন কালাত, ত্রিবাঙ্কুড়, কোচিন, উদয়পুর, জয়পুর, যোধপুর, বিকানের, ইন্দোর, ভোপাল, রেওয়া, কোল্হাপুর, পাটিয়ালা, ও বাহাওলপুরের নরেশগণ।

এক জন করিয়া করিবেন অনেকে, এবং কয়েক জনে মিলিয়া এক এক জন প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন আরও কতকগুলি নরেশ।

এই সমুদয় ব্যক্তির মতের মূল্য ব্রিটিশ-ভারতবর্ষের কত জন করিয়া মানুষের মতের মূল্যে সমান, তাহা পাঠশালার ছাত্রছাত্রীরাও গুণ করিয়া সংখ্যা বাহির করিতে পারিবে।

—

দেশী নরেশদের গুরুত্ব কেন এত

এটা খুব জানা কথা, যে, অনেক বিষয়ে দেশী নরেশদের স্বাধীনতা ব্রিটিশ-ভারতের সাধারণ প্রজাদের চেয়েও কম। তাঁহাদিগকে রেসিডেণ্ট ও পলিটিক্যাল এজেণ্টদের তাঁবে যেরূপ থাকিতে হয় এবং হুকুম ও ধমক সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে শুনিতে হয়, আমাদিগকে কোন রাজকর্ম্মচারীর তাঁবে সেরূপ থাকিতে হয় না এবং হুকুম ধমক শুনিতে হয় না। তথাপি এই মানুষগুলির মতের দাম ব্যবস্থাপক সভাতে ও কৌন্সিল অব্ ষ্টেটে লক্ষ লক্ষ সাধারণ ব্রিটিশ প্রজার

সমান ধরা হইতেছে। তাঁহাদিগকে ভারতীয় ফেডারেশুন বা রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে আনিবার জন্য বিলাতী গবর্ন্মেণ্ট এত বেশী ব্যগ্র, যে, ব্রিটিশ-ভারতের সব ন্যাশন্যালিষ্ট কাগজ, সব রাজনৈতিক নেতা, সব রাজনৈতিক দল ভবিষ্যৎ ভারত-শাসন বিল সম্বন্ধে কত সমালোচনা করিলেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহার বিরুদ্ধে প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল, কিন্তু বিলাতী গবন্মেণ্ট বিলাতী ভারত-সচিব ভ্রূক্ষেপও করিলেন না—অটল অচল রহিলেন; কিন্তু যাই দেশী নরেশরা পরামর্শ করিয়া একটা প্রস্তাব ধার্য্য করিলেন, অমনি ভারত-সচিব স্যার সামুয়েল হোর লম্বা কৈফিয়ৎ দিলেন, বিলাতী সম্পাদক ও রাজনীতিজ্ঞদের মহলে হৈ চৈ পড়িয়া গেল, ভারত-সচিব নরেশদিগকে খুশী করিবার জন্য তাঁহাদের মতানুযায়ী পরিবর্ত্তন বিলের কোন কোন ধারায় করা হইবে বলিলেন।

নরেশদিগকে এত তোয়াজ কেন করা হইতেছে? এর উত্তর দেওয়া কঠিন নহে। ব্রিটেন জগৎকে দেখাইতে চায়, যে, ভারতবর্ষকে স্বশাসন-অধিকার দেওয়া হইতেছে, অথচ ভবিষ্যৎ শাসনবিধি এরূপ করা হইতেছে, যে, তাহা বর্ত্তমান ভারতশাসনবিধি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। ভারতবর্ষের লোক-দিগকে কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে না, গবর্ণর-জেনার‍্যাল ও গবর্ণরদিগকে এরূপ প্রভুত্ব দেওয়া হইতেছে, যাহা হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে স্বাধীন হিন্দুরাজাদের ছিল না ও নাই, মুসলমানশাস্ত্র অনুসারে স্বাধীন মুসলমান রাজাদের নাই, ইংলণ্ডের খ্রীষ্টীন রাজার নাই। ভারত-গবর্ন্মেণ্টের রাজস্বের শতকরা ৮০ টাকার উপর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন অধিকার থাকিবে না। বাকী শতকরা ২০ টাকার উপর তর্কবিতর্ক করিবার যে ক্ষমতা দেওয়া হইবে, এবং অন্য ক্ষমতা যাহা দেওয়া হইবে, তাহার ব্যবহার দ্বারা যাহাতে ব্রিটিশ-ভারতীয় লোকেরা স্বরাজ একটুও না পাইতে পারে, তাহার প্রধান উপায়-স্বরূপ য়্যাসেমব্লীর এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি ও কৌন্সিল অব্ ষ্টেটের এক-তৃতীয়াংশের অধিক প্রতিনিধি নরেশদিগকে মনোনীত করিতে দেওয়া হইবে; কারণ, নরেশরা স্বেচ্ছাকারী, গণতান্ত্রিক শাসক নহে, সুতরাং তাঁহাদের মনোনীত সদস্যেরা গণতান্ত্রিকতার অগ্রগতিতে বাধা দিবে এবং ইংরেজদের প্রভুত্বে আপত্তি করিবে না (কেন না, ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টও দেশীরাজ্যগুলিতে নরেশদের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব মানিয়া লইয়াছে)। সংক্ষেপে, নরেশদের দ্বারা নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ইংরেজরা তাঁহাদের ওজন বাড়াইতেছে।

গণতান্ত্রিকতার অগ্রগতি রোধ করিবার অন্যান্য উপায়ও অবলম্বিত হইয়াছে। যেমন, ব্রিটিশ-ভারতে মুসলমানেরা শতকরা ২৪.৬৯, কিন্তু তাহাদিগকে ব্রিটিশ-ভারতের আসন-গুলির শতকরা ৩৩⅓টি দেওয়া হইয়াছে; হিন্দু এবং অন্যান্য অখ্রীষ্টিয়ান, অমুসলমান ও অশিখ বাজে লোকেরা ব্রিটিশ-ভারতের শতকরা ৭২.৭১ জন হইলেও তাহাদিগকে য়্যাসেমব্লীর ব্রিটিশ-ভারতীয় ২৫০টি আসনের মধ্যে ১২৪টি অর্থাৎ শতকরা ৪৯.৫টি আসন দেওয়া হইয়াছে। সংখ্যাভূয়িষ্ঠদিগকে এই প্রকারে সংখ্যালঘিষ্ঠ করা হইয়াছে। কারণ, হিন্দুরাই গণতান্ত্রিক স্বরাজ সকলের চেয়ে আগে সকলের চেয়ে বেশী চাহিয়াছিল। ভারতশাসন বিল তাহাদিগকে বলিতেছে, "তোমরা স্বরাজ চেয়েছিলে, এই নাও স্বরাজ!"

—

আসনবণ্টনের দোষোদ্‌ঘাটন করি কেন

কংগ্রেস প্রস্তাবিত ভারতশাসনবিধি অগ্রাহ্য বলিয়াছেন ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিলেও তাহা যে মন্দ তাহা বলিয়াছেন, ভারতীয় জাতীয় উদারনৈতিক সংঘ ভারতশাসন বিলের বিরোধী, এবং কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণী উহাতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নহেন। সেই জন্য কেহ খুলিয়া প্রশ্ন না করিলেও মনে মনে ভাবিতে পারেন, সমস্ত জিনিষটাই যখন অধিকাংশ ভারতীয়ের চক্ষে নামঞ্জুর, তখন আসনবণ্টন লইয়া এত লিখিবার কি প্রয়োজন?

জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী রিপোর্টের এবং ভারতশাসন বিলের অন্য সমালোচনার যেরূপ প্রয়োজন, আসনবণ্টনের সমালোচনারও প্রয়োজন সেইরূপ। ব্রিটিশ-ভারতীয়দের কোন সমালোচনাতেই কোন ফল ফলিবে না। আমরা সমালোচকেরা গীতার উপদেশ অনুসারে নিষ্কামভাবে সমালোচনা-কর্ম্ম করিতেছি, ফল পাইব না জানিয়াও কর্ম্ম করিয়া যাইতেছি!

ভবিষ্যৎ শাসনবিধি অগ্রাহ্য যাঁহারাই বলুন, উহা আইনে পরিণত হইবে, এবং কংগ্রেসওয়ালারাও ব্যবস্থাপক সভায় তদনুসারে ঢুকিবেন। সুতরাং উহার গঠনের দোষগুলা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

কেহ কেহ যেমন বলেন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটার প্রতিকূল সমালোচনায় সাম্প্রদায়িক রেষারেষি বাড়ান হয়, তেমনি কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আসনবণ্টনের দোষোদ্ঘাটন করিলে প্রাদেশিক ঈর্ষ্যাদ্বেষ বাড়িবে। কোন জায়গায় খুব মশা বাড়িলে যদি কেহ তাহার অনিষ্টকারিতা দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে কেহ কি বলে, "ঐ লোকটা ম্যালেরিয়াবৃদ্ধির জন্য দায়ী?" সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যে বিদেশীরা করিয়াছে, তাহারা সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যাদ্বেষ উস্কাইবার জন্য দায়ী নহে, দায়ী উহার প্রতিবাদকারীরা, ইহা যেমন চমৎকার যুক্তি, আসনবণ্টন যাহারা করিয়াছে তাহারা প্রাদেশিক ঈর্ষ্যাদ্বেষ বৃদ্ধির জন্য দায়ী নহে, দায়ী আসনবণ্টনের মর্ম্মোদ্ভেদকারী, ইহাও সেইরূপ চমৎকার যুক্তি।

বস্তুতঃ, আমরা দেশে ন্যায়সঙ্গত সাম্যের ভিত্তির উপর গণতান্ত্রিক স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি বা না-পারি, ভবিষ্যতে তাহার প্রতিষ্ঠার কত প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করা হইতেছে, তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক। বিঘ্নবাধার সম্যক জ্ঞান না জন্মিলে তাহা দূর করিবার ইচ্ছা জন্মে না, এবং দূর করিবার উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হয় না।

—

বাঙালীর প্রভাব হ্রাস

আমরা বাঙালীরা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া থাকিব, এরূপ কোন দুরভিসন্ধি ও দুরাশা আমাদের নাই, কিন্তু স্বভাবতঃ আমাদের ন্যায্য যতটুকু প্রভাব হইয়াছিল ও থাকিতে পারে, তাহার হ্রাসে নিশ্চয়ই আমাদের ন্যায়সঙ্গত অসন্তোষ হইতে পারে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ নিবারণ ব্যপদেশে যখন ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল, তখন সেই পরিবর্ত্তনে বাঙালীর প্রভাব কমিল। ভারতীয় জনমতের যতটুকু প্রভাব ভারত-গবর্মেণ্টের উপর হইতে পারে, বাঙালী কাগজপত্রের মত ও জনমত সেরূপ প্রভাব অনেকটা ভারত-গবর্মেণ্টের উপর বিস্তার করিত। ভারত-গবর্মেণ্টকে সেই প্রভাব হইতে দূরে লইয়া যাওয়া হইল, অথচ দিল্লীতে এমন কোন জনমত ছিল না এবং এখনও নাই যাহা তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিল বা হইতে পারে। যাহারা বাঙালীর ঈর্ষ্যা করে, বাঙালীকে দেখিতে পারে না, তাহারা এই পরিবর্ত্তনে খুশী হইলেও ইহা প্রজাশক্তিবৃদ্ধির অনুকূল হয় নাই। মনস্বী গোখলে যখন বলিয়াছিলেন, "আজ বাংলা যাহা ভাবে, কাল ভারতের অবশিষ্ট অংশ তাহা ভাবিবে," তখন রাজধানী কলিকাতায় ছিল।

এ প্রশ্ন হইতে পারে, স্থায়ী রাজধানী হইবার কোন বিধিদত্ত অধিকার ত কলিকাতার ছিল না, সুতরাং রাজধানী অন্যত্র হওয়াতে যদি বাঙালীর প্রভাব হ্রাস ও অন্য অসুবিধা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সে পরিবর্ত্তনের প্রতিবাদ করিবার কি অধিকার তোমার আছে? বাঙালী বলিয়া প্রতিবাদ করিবার, বঙ্গের প্রভাবহ্রাস হেতু প্রতিবাদ করিবার অধিকার আমাদের না থাকিতে পারে; কিন্তু আমরাও ভারতীয় বলিয়া এবং রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় গবর্মেণ্টের অপকর্ষ ঘটায় (অন্ততঃ উৎকর্ষলাভের ব্যাঘাত হওয়ায়), সে দিক দিয়া সমালোচনা করিবার অধিকার আমাদের আছে।

রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার অধিকার গবর্মেণ্টের থাকিতে পারে, কিন্তু যে-সব জেলার বা মহকুমার অধিকাংশ লোক বাঙালী, বঙ্গসংলগ্ন সেই সব স্থানকে বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্যপ্রদেশভুক্ত করিয়া বাঙালীর সমষ্টি-সমুদ্ভূত শক্তি ও প্রভাব কমাইবার ন্যায্য অধিকার কাহারও ছিল না। বাঙালীর অধ্যুষিত ঐ সব জেলা ও মহকুমা বঙ্গের সামিল থাকিলে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আরও আসন পাইবার বাঙালীর ন্যায্য অধিকার থাকিত। বাংলা দেশটাকে ছোট করিয়া বাঙালীকে সেই আসনগুলি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

আমরা অনেক বৎসর আগে হইতে দেখাইয়া আসিতেছি, যে, বর্ত্তমানে বলবৎ ভারতশাসনবিধি অনুসারেও বাংলা দেশকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কম আসন দিয়া তাহার ন্যায্য প্রভাব হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

বাংলার লোকসংখ্যা সব প্রদেশের চেয়ে বেশী অথচ তাহার আসন-সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী নয়। বঙ্গের লোকসংখ্যা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আড়াই গুণেরও অধিক। অথচ বর্ত্তমান ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা দেশের প্রতিনিধি-সংখ্যা বোম্বাইয়ের আড়াই গুণ, দ্বিগুণ, দেড় গুণ বা কিছু বেশীও নহে।

এই অন্যায় ও অবিচার ভবিষ্যৎ শাসনবিধিতেও যে থাকিবে, তাহা ভারতশাসন বিলের আসন সম্বন্ধীয় ধারা ও তপশীল হইতে বুঝা যায়, ইহা আমরা একাধিক তালিকাতে অঙ্ক দ্বারা দেখাইয়াছি। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এক-একটি প্রদেশকে যত আসন দেওয়া হইয়াছে, কেবল তাহার দ্বারা বিচার করিলেও বঙ্গের প্রভাবকে যে কমান হইয়াছে, তাহা বুঝা যায়। এই ক্ষতিপূরণ পরোক্ষভাবে কিছু হইতে পারিত, যদি বাংলাভাষী অনেক এমন দেশী রাজ্য থাকিত যাহার রাজা নরেশরা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গভাষী সদস্য মনোনীত করিয়া পাঠাইতেন। কারণ, এমন অনেক বিষয় আছে যাহাতে মাতৃভাষা অনুসারে সদস্যেরা পরস্পরের সঙ্গে সহানুভূতি করে এবং পরস্পরের সহযোগিতায় একত্র ভোট দেয়। কিন্তু বঙ্গভাষাভাষী কুচবিহারের ১টি প্রতিনিধি মনোনীত হইবে, এবং ত্রিপুরা ১টি প্রতিনিধি মনোনীত করিবে। মণিপুরকে যদি ঠিক বঙ্গভাষাভাষী ধরি, তবে তাহারও এক জন প্রতিনিধি আছে। অন্য দিকে মান্দ্রাজ পঞ্জাব উড়িষ্যা প্রভৃতির সহিত এক ভাষী অর্থাৎ মরাঠী গুজরাটী কন্নাড তেলুগু তামিল মলয়ালম্‌ভাষী হিন্দী ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষাভাষী বিস্তর দেশী রাজ্য আছে যে-সকল হইতে মনোনীত সদস্যেরা বোম্বাই মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যাদির সদস্যদের সহিত ভাষার ঐক্য হেতু দল বাঁধিতে পারিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, এক দিকে বাংলা দেশকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য আসন-সংখ্যা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, অন্য দিকে বাংলাভাষী দেশী রাজ্য নিতান্ত কম থাকায় দেশী রাজ্য হইতে যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙালী সদস্য বেশী করিয়া আসিয়া জুটিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। অন্য অনেকগুলি প্রদেশের এই সম্ভাবনা আছে। পঞ্জাব বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশ ন্যায্য প্রাপ্যের অধিক সদস্য পাইয়াছে। অধিকন্তু তাহারা নিকটবর্ত্তী দেশীরাজ্যসমূহ হইতে মনোনীত এক এক ভাষাভাষী এমন অনেক সদস্য পাইবে, যাহারা তাহাদের সহিত সহানুভূতি ও সহযোগিতা করিবে। মান্দ্রাজ ন্যায্য প্রাপ্য হইতে কম আসন পাইয়াছে, কিন্তু পরোক্ষভাবে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ তেলুগু তামিল কন্নাড প্রভৃতি ভাষাভাষী দেশী রাজ্য হইতে মনোনীত অনেক সদস্যের সহযোগিতা পাইবে। আগ্রা-অযোধ্যা ন্যায্য প্রাপ্য অপেক্ষা কম আসন পাইবে, কিন্তু ইহাও সংলগ্ন দেশী রাজ্য-সমূহ হইতে মনোনীত হিন্দীউর্দ্দুভাষী অনেক সদস্যের সহযোগিতা পাইবে।

এই সকল কারণে বাংলা দেশের ন্যায্য প্রাপ্য আসন পাইবার জন্য আন্দোলন হওয়া উচিত ছিল। তাহাতে হয়ত ফল কিছুই হইত না—গবর্ন্মেণ্টের মত ও উদ্দেশ্যের বিরোধী কয়টা আন্দোলনই বা সফল হয়? কিন্তু ফল হয় নাই বা হইবে না বলিয়া আমরা অন্য নানা আন্দোলন হইতে যেমন নিবৃত্ত হই নাই বা হইব না, এই বিষয়ে আন্দোলন হইতেও তেমনি নিবৃত্ত থাকা উচিত হয় নাই ও হইবে না।

বাঙালীদের নিজেদের দোষ-ত্রুটিতেও যে বাঙালীর প্রভাব কমিয়াছে, তাহা ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। রাজনৈতিক দলাদলি, অতিরিক্ত আরামপ্রিয়তা ও আমোদপ্রিয়তা, লঘুচিত্ততা, ঈর্ষ্যাপরায়ণতা প্রভৃতি অন্য কোন লোকদের যে নাই, তাহা নহে। কিন্তু অন্যদের তাহা আছে বলিয়া সেই দোষগুলি আমাদের গুণে পরিণত হইতে পারে না।

—

মিঃ জিন্নার রফার সর্ত্ত

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে আপোষে মীমাংসা করিবার নিমিত্ত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মিঃ মোহম্মদ আলী জিন্নার মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল ও যাহা আপাততঃ নিষ্ফল হইয়াছে, তাহা যে সর্ত্তগুলিকে ভিত্তি করিয়া চলিতেছিল, সেগুলি খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার আগে ও পরে আমরা দিল্লীতে ও কলিকাতায় একাধিক ব্যক্তির নিকট উহা ইংরেজীতে টাইপলিখিত আকারে দেখিয়াছি। সেই জন্য ঐগুলিই যে রফার ভিত্তিরূপে

আলোচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সর্ত্তগুলি কাগজে প্রকাশিত হওয়া এবং তাহার আলোচনা হওয়া বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ পছন্দ করেন নাই, এইরূপ কথা সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। প্রকাশে আপত্তি না হইলেই ভাল হইত। তবে সর্ত্তগুলির ঝাঁঝাল রকমের আলোচনা বাঞ্ছনীয় নহে বটে।

প্রথম ও চতুর্থ সর্ত্তটি সম্বন্ধে বাংলা দেশের হিন্দুদের পক্ষ হইতে কয়েক জন হিন্দু আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা সেই আপত্তি যুক্তিসঙ্গত মনে করি। আপত্তির কারণ বুঝিতে হইলে সর্ত্তগুলির উদ্দেশ্য জানা আবশ্যক।

যে খসড়া চুক্তিপত্রে সর্ত্তগুলি আছে তাহার শেষে বলা হইয়াছে, যে, উপরিলিখিত সর্ত্ত অনুসারে সম্মিলিত নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্ব্বাচনে পক্ষগণ সম্মত আছেন।

সম্মিলিত নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্য এই, যে, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী হিন্দুর নির্ব্বাচনে অহিন্দু নির্ব্বাচকদিগেরও ভোটের প্রভাব অনুভূত হইবে, এবং মুসলমান প্রার্থীর নির্ব্বাচনে অমুসলমান নির্ব্বাচকদিগেরও ভোটের প্রভাব অনুভূত হইবে। যেরূপ যোগ্যতা অনুসারে নির্ব্বাচকদের নাম নির্ব্বাচক-তালিকাভুক্ত হইবে, সেই যোগ্যতা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের জন্য এক ও সমান হওয়াই ন্যায়সঙ্গত। যোগ্যতার এইরূপ সমান মাপকাঠি অনুসারে যদি কোথাও হিন্দু নির্ব্বাচকদের সংখ্যা অহিন্দুদের চেয়ে কম বা বেশী হয়, বা মুসলমান নির্ব্বাচকদের সংখ্যা অমুসলমান নির্ব্বাচকদের চেয়ে কম বা বেশী হয়, তাহাতে কাহারও ন্যায়সঙ্গত কোন আপত্তির কারণ থাকে না। কিন্তু প্রথম সর্ত্তে বলা হইয়াছে, যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যোগ্যতার মাপকাঠি এ প্রকারে ভিন্ন রকম করিতে হইবে, যাহাতে (দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্গে) মুসলমান নির্ব্বাচকদের সংখ্যা শতকরা মোটামুটি ৫৫ হয় ও হিন্দু নির্ব্বাচকদের সংখ্যা শতকরা মোটামুটি ৪৪ হয়। অর্থাৎ হিন্দু নির্ব্বাচকদের চেয়ে মুসলমান নির্ব্বাচকদের সংখ্যা, যে-কোন বিভিন্ন যোগ্যতার মাপকাঠি অনুসারেই হউক, বাড়াইতেই হইবে। আনুমানিক দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সর্ত্তটির উদ্দেশ্য বুঝাইতেছি। যদি এইরূপ স্থির হয়, যে, যাহারা ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে, তাহারা ভোট দিবার অধিকার পাইবে, এবং যদি তাহাতে দেখা যায়, যে, মুসলমান ভোট-দাতাদের সংখ্যা হিন্দু ভোটদাতাদের সংখ্যার চেয়ে অনেক কম, তাহা হইলে এইরূপ কোন নিয়ম করিতে হইবে, যে, হিন্দুরা ম্যাট্রিক পাস করিলে ভোটাধিকার পাইবে, মুসলমানরা উচ্চ প্রাইমারী বা তদ্রূপ নিম্ন অন্য কোন পরীক্ষা পাস করিলে ভোটাধিকার পাইবে, যাহাতে মুসলমান ভোট-দাতাদের সংখ্যা হিন্দু ভোটদাতাদের চেয়ে শতকরা ১০।১১টি বেশী হয়। অথবা, ধরুন যদি নিয়ম হয়, যে, ১০ টাকা খাজনা বা ট্যাক্স দিলে ভোটাধিকার মিলিবে, এবং যদি তাহাতে দেখা যায়, যে, মুসলমান ভোটদাতার সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে বেশী হয় নাই, তাহা হইলে নিয়মটা বদলাইয়া এইরূপ করিতে হইবে, যে, হিন্দুদের বেলায় যোগ্যতা ১০ টাকা খাজনা বা ট্যাক্স দেওয়া, মুসলমানদের বেলায় ২ টাকা বা তদ্রূপ এরূপ কিছু যাহাতে মুসলমান নির্ব্বাচকেরা হিন্দুদের চেয়ে শতকরা ১০।১১ জন বেশী হয়।

এইরূপ সর্ত্ত সম্বন্ধে আপত্তির কারণ বলিতেছি। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে পৃথক্ রাখিবার জন্য ভেদ-নীতি অবলম্বিত হইয়াছে। বাঁটোয়ারাটার অনিষ্টকারিতা দূর করিতে হইলে, সকল সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে একই নিয়ম চালাইয়া তাহাদের মধ্যে মিলন ও সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু জিন্না-রাজেন্দ্রপ্রসাদ আলোচনার কোন সর্ত্তেই তাহা করা ত হয়ই নাই, অধিকন্তু তাহার উল্টা দিকে গিয়া এই একটি নূতন ভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইতেছে, যে, সম্পত্তি বা শিক্ষার দিক্ দিয়া কোন মুসলমান হিন্দুর চেয়ে কম যোগ্য হইলেও তাহাকে ভোটাধিকারের যোগ্য মনে করিতে হইবে।

এস্থলে আমরা বলিয়া রাখি, যে, ভারতবর্ষে যদি সম্পত্তি বা শিক্ষাঘটিত কোন যোগ্যতার মাপকাঠি অবলম্বিত না হইয়া প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী মাত্রকেই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভোটের অধিকার দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় এবং যদি তাহাতে দেখা যায়, যে, কোথাও হিন্দু কোথাও মুসলমান কোথাও শিখ ইত্যাদি কম বা বেশী সংখ্যায় ভোটাধিকার পাইতেছে, তাহা হইলে ন্যায্য আপত্তি থাকে না; কারণ একই যোগ্যতার নিয়ম সকলের প্রতি খাটিতেছে। আপত্তির কারণ তখনই ঘটে, যখন কৃত্রিম উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়

সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা আদির লিখিত বা অলিখিত নিয়ম চালাইয়া কাহাকেও নিগ্রহ, কাহাকেও অনুগ্রহ করা হয়। এরূপ করিলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটার জাতীয় ঐক্য স্থাপনে বাধাজনকতারূপ অনিষ্টকারিতার আংশিক প্রতিকারও না-হইয়া বরং নূতন ভেদ-নিয়ম প্রয়োগহেতু ঐ অনিষ্টকারিতা বাড়িবে।

অতএব মিঃ জিন্নার প্রথম সর্ত্তটি গ্রহণযোগ্য নহে।

প্রথম সর্ত্তটির সম্বন্ধে আরও আপত্তি আছে। তাহার একটি বলিতেছি। সম্মিলিত নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা সম্মিলিত নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্য এই নিবন্ধিকার তৃতীয় অনুচ্ছেদে কিছু বলিয়াছি। অপর উদ্দেশ্য, সদস্যপদপ্রার্থীদের ধর্ম্ম কি তাহা বিবেচিত না-হইয়া সদস্যের কাজ করিবার যোগ্যতা তাহাদের কিরূপ আছে, তাহাই যেন বিবেচিত হয়। কিন্তু মিঃ জিন্নার প্রথম সর্ত্তটির মধ্যে এই জেদ রহিয়াছে, যে, মুসলমান নির্ব্বাচকদের সংখ্যা বাড়াইতেই হইবে। উদ্দেশ্য এই, যে, যে-হিন্দু সদস্যপদপ্রার্থী ও যে-মুসলমান সদস্যপদপ্রার্থী অধিকাংশ মুসলমান নির্ব্বাচকের ভোট পাইবেন, তিনিই যেন নির্ব্বাচিত হন এবং হিন্দু নির্ব্বাচকদের ভোটের প্রভাব যেন অনুভূত না হয় বা খুব কম অনুভূত হয়। সম্মিলিত নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা সম্মিলিত নির্ব্বাচনের যে যে উদ্দেশ্য পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, মিঃ জিন্নার সর্ত্তটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য তাহার ঠিক বিপরীত এবং তাহাকে অসিদ্ধ করিবার উপায় মাত্র।

অতএব এই সব কারণেও মিঃ জিন্নার প্রথম সর্ত্তটি গ্রহণযোগ্য নহে।

চতুর্থ সর্ত্তটিতে আছে, যে, বঙ্গে ইউরোপীয়দিগকে (তাহাদের সংখ্যা হিসাবে প্রাপ্য নহে এরূপ) অত্যন্ত বেশী যে আসনগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের হাত হইতে তাহার কয়েকটা পাওয়া গেলে মুসলমানেরা তাহার শতকরা মোটামুটি ৫৫টি ও হিন্দুরা মোটামুটি শতকরা ৪৪টি পাইবে। ইহা কালনেমির লঙ্কাভাগের মত; ইউরোপীয়েরা কোন আসন ছাড়িয়া দিবে না, হিন্দু মুসলমানে বখরাও হইবে না। যাহা হউক, ইহা অপ্রাসঙ্গিক।—সকলেই জানেন, অন্ততঃ সকলেরই জানা উচিত, যে, শুধু লোকসংখ্যা হিসাবেও বঙ্গে হিন্দুদের যতগুলি আসন পাওনা হয়, তাহা তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। লোকসংখ্যা হিসাবে মুসলমানদের যত পাওনা হয়, তাহাদিগকেও তাহা দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু হিন্দুদিগকে যতগুলা আসন হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, মুসলমানদিগকে ততগুলা হইতে বঞ্চিত করা হয় নাই। সুতরাং ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে, কিংবা সাধারণত সকল খ্রীষ্টিয়ানদিগের নিকট হইতে কতকগুলি আসন পাইলে তাহার বেশীর ভাগ ন্যায়ানুসারে হিন্দুদেরই পাওয়া উচিত। কিন্তু মিঃ জিন্নার চতুর্থ সর্ত্ত বেশীর ভাগ মুসলমানদিগকেই দিতে বলিতেছে। এই কারণে এই সর্ত্ত গ্রহণযোগ্য নহে।

খসড়া চুক্তিপত্রটি সম্বন্ধে আরও একটি বক্তব্য আছে। উহার কোথাও এ কথা লেখা নাই, যে, হিন্দু মুসলমান শিখ কেবল নির্ব্বাচনের জন্য নহে, পরন্তু স্বরাজ-সংগ্রাম চালাইবার জন্য মিলিত হইবে। যে-কেহ স্বরাজ-সংগ্রাম চালাইবে, সে-ই ইংরেজের বিরাগভাজন এবং অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবে। খসড়া চুক্তিপত্রটিতে এই প্রকারে ইংরেজের বিরাগভাজন হইতে প্রস্তুতির কোন লক্ষণ নাই। তাহাতে কেবল ইহাই দেখা যাইতেছে, যে, ইংরেজের অনুগ্রহে মুসলমানেরা যাহা পাইয়াছেন, মিঃ জিন্না তাহা সমস্তই রাখিতে চান এবং মুসলমানদের জন্য আরও কিছু লাভ চান।

মান্দ্রাজের কংগ্রেসী নেতা শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী বঙ্গের হিন্দুদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, মুসলমানদিগকে কিছু ত্যাগ করিতে বলেন নাই।

খবরের কাগজে ইহাও বাহির হইয়াছে, যে, তিনি এইরূপ বলিয়াছেন, যে, সব প্রায় ঠিকঠাক হইয়া গিয়াছিল, কংগ্রেস এবং মুসলিমলীগ তাহাতে রাজী হইতেন, কেবল বাহিরের লোকদিগের সহিত ("outsiders"দের সহিত) আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে রাজী করিতে যাওয়ায় চেষ্টাটা পণ্ড হইয়াছে। পঞ্জাবের কথা আমাদের বলা উচিত নয়, তাহা খুব ভাল করিয়া আমাদের জানাও নাই। বাংলা দেশের হিন্দুরা প্রায়ই শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারীর দলের বাহিরের লোক বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তাহাদেরই অভিযোগ একটা বড় অভিযোগ। শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারীর আদালতে ফরিয়াদীকে বাদ দিয়া বিচার চলে, ত চলুক। কিন্তু

ফরিয়াদীকে সেই আদালতের রায় শিরোধার্য্য করিতে বলিলে তাহা কিঞ্চিৎ জবরদস্তী হইবে না কি ?

—

বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলগুলির উন্নতিসাধন

জলসেচনের ব্যবস্থা দ্বারা, এবং পয়ঃপ্রণালী খনন ও নির্ম্মাণ দ্বারা অনাবশ্যক জল নিঃসারণের ব্যবস্থা করিয়া, বাংলা-গবন্মেণ্ট বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলগুলির উন্নতিসাধন করিতে চান, এই রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। তদর্থে একটি আইন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইয়াছে। গবন্মেণ্ট এই বিষয়ে একটি পুস্তিকা কয়েকটি মানচিত্র সহ প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গের বহু জেলায় এইরূপ চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন আছে। গবন্মেণ্ট এরূপ চেষ্টা যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে করেন ও তাহাতে সুফল হয়, তাহা সন্তোষের বিষয় হইবে। তবে, পুস্তিকাটির মুখবন্ধ-স্বরূপ জলসেচ-বিভাগের কমিটির রিপোর্ট হইতে ও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন হইতে যে-সব বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সামান্য কিছু বলিতেছি।

—

জলসেচন সম্বন্ধে ঘুমন্ত কে ?

জলসেচ-বিভাগের কমিটি বলিয়াছেন, বাঙালীদিগের মনে এই মিথ্যা বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাদিগকে ঘুমন্ত রাখা উচিত নয়, যে, ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলগুলির উন্নতিসাধন কঠিন ও দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছু। কমিটি এবং গবন্মেণ্ট কি জানেন না, যে, ওয়াকিফ-হাল বাঙালীরাও তাহাদের নেতা ও সাংবাদিকরা এই বিশ্বাসে কখনও ঘুমায় নাই; অন্য কারণে যদি ঘুমাইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের ঘুম ভাঙিয়াছে অনেক বৎসর আগে, এবং ঘুমন্ত বা নিদ্রিতম্মন্য আছেন সরকারী বড় ও ছোট কর্ত্তারা ?

—

বঙ্গে জলসেচন অনাবশ্যক, এ ভ্রম কাহার ?

বঙ্গে জলসেচনের বেশী প্রয়োজন বা মূল্য নাই, জলসেচ-বিভাগের কমিটি এই ভ্রম ভাঙিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই ভ্রমটা দেশের লোকের চেয়ে গবন্মেণ্টই বেশী করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ কয়েক বৎসর ধরিয়া পুনঃ পুনঃ সাংখ্যিক তত্ত্ববিষয়ক সরকারী পুস্তক (Statistical Abstract for British India) হইতে আমরা দিয়াছি। ঐ বিষয়ক সর্ব্বাধুনিক পুস্তক (Eleventh Issue of Statistical Abstract for British India, ১৯৩৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর মুদ্রিত ও বর্ত্তমান ১৯৩৫ সালের প্রথম বা দ্বিতীয় মাসে প্রকাশিত) হইতে আবার কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

কোন্ প্রদেশে গবন্মেণ্ট ধনোৎপাদক (productive) জলসেচনের খাল কত মাইল খুলিয়াছেন, তাহার হিসাব নীচের তালিকায় দিতেছি। ইহা যে-বৎসরের (১৯৩০-৩১এর) শেষ পর্য্যন্ত তাহার পর আর সব প্রদেশের তুলনামূলক সংখ্যাগুলি একসঙ্গে ছাপা হয় নাই। কিন্তু এই তালিকা হইতেই বঙ্গের প্রতি অবহেলা বুঝা যাইবে। ঐ সালের পর বঙ্গে এমন কিছু করা হয় নাই, যাহাতে বঙ্গের প্রতি যত্ন অন্য সব প্রদেশের সমান বলিয়া বুঝা যায়।

প্রদেশ।	খালগুলির দৈর্ঘ্য।	উপখালগুলির দৈর্ঘ্য।	ব্যয়িত মূলধন।
মান্দ্রাজ	৩,৫৫[illegible]	৯,০০০	১৩,৪২,৭০,৭০০
বোম্বাই	৫,০৮[illegible]	১৫৮	২২,৯৬,৪৪,৪১[illegible]
বাংলা	১১	৭	৮৭,৮৭,৩[illegible]
আগ্রা-অযোধ্যা	২,৩৭১	১১,৬২৮	২২,২৭,৩১,৫১[illegible]
পঞ্জাব	৩,২৫২	১৬,৬৩২	৩৩,১৭,৭০,৭[illegible]

অ-ধনোৎপাদক (unproductive) খাল কোথায় কত মাইল কত ব্যয়ে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার তালিকা নীচে দেওয়া হইল।

প্রদেশ।	খালগুলির দৈর্ঘ্য।	উপখালগুলির দৈর্ঘ্য।	ব্যয়িত মূলধন।
মান্দ্রাজ	৯১১	৮২৮	৪,৩৬,৫০,১১০
বোম্বাই	২,৯০৪	১,৮১৩	১২,৯৫,৫৭,[illegible]
বাংলা	৬৫	০	৮৪,৯২,[illegible]
আগ্রা-অযোধ্যা	৪২৮	১,৭৪১	৩,৩৫,৫০,২[illegible]
পঞ্জাব	১,০৫০	৯৬২	৫৯,৬১,২৮[illegible]

এই দুটি তালিকা হইতে বুঝা যাইবে, যে, গবন্মেণ্ট বঙ্গে জলসেচন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। বরাবরই বঙ্গ মোট রাজস্ব আদায় অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বেশী বই কম হয় নাই। সুতরাং টাকার অভাবে গবন্মেণ্ট বঙ্গে কিছু করিতে পারেন নাই, অন্য সব প্রদেশ খুব রাজস্ব দেয় বলিয়া তথায় প্রচুর জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা সত্য